মানসী

ও

মর্ম্মবাণী

(সচিত্র মাসিক পত্রিকা)

৮ম বর্ষ—১ম খণ্ড

(ফাল্গুন ১৩২২—শ্রাবণ ১৩২৩)

সম্পাদক—

মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ্ রায়

ও

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি-এ, বার-এট-ল

কলিকাতা

১৪ এ রামতনু বসুর লেন, "মানসী" প্রেসে

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৩২৩

ষাণ্মাষিক সূচীপত্র

(ফাল্গুন ১৩২২—শ্রাবণ ১৩২৩)

বিষয়-সূচী

লেখক সূচী

পূর্ণপৃষ্ঠা চিত্রের সূচী

(বর্ণানুক্রমিক)



চিত্রা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MANASI PRESS, CALCUTTA

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

৮ম বর্ষ } ফাল্গুন ১৩২২ সাল { ১ম খণ্ড
১ম খণ্ড } { ১ম সংখ্যা।

বসন্তে

কবে কোন্ অমরার কল্পলোকমাঝে
অভিনব সাজে,
কোন্ এক মাহেন্দ্র লগনে
মহেন্দ্রের নিকুঞ্জভবনে—
লভেছিলে আপন জনম
হে বসন্ত, হে বিশ্বের নয়নরঞ্জন !
কণ্ঠে বক্ষে প্রকোষ্ঠে তোমার
শতফেরে বেঁধেছিলে নন্দনের পারিজাতহার ;
সঙ্গে লয়ে এসেছিলে দক্ষিণ বাতাস
নিখিলের সর্ব্ব অঙ্গে বুলাইতে আনন্দ আশ্বাস !
অগ্নি-গর্ভ-গিরি-ভস্ম-প্রক্ষেপে মলিন
পর্ব্ব-বিধু ছিল রসহীন ;
তুমি দিলে সুধার প্রলেপ,
ঘুচিল অন্তরদাহ জন্মভরা দারুণ আক্ষেপ ।

সে দিনের সুধাভরা পূর্ণিমানিশায়
বেদনার অশ্রুহীন দেব অমরায়
উচ্ছ্বাসে নাচিয়াছিল আনন্দবাহিনী,
অপ্সরীর কণ্ঠে-কণ্ঠে উঠেছিল অপূর্ব্ব রাগিণী !

সে দিনের পরে
বর্ষে বর্ষে একবার আমাদের ঘরে
দেখা দাও অমর পথিক ;
সারা বর্ষ আঁখি অনিমিখ
একান্ত আগ্রহে যাচি তব দরশন —
বর্ষ ভরে' রাখি মনে দুদিনের আনন্দ স্বপন।
তব আগমনে
সুনীলিম গগন অঙ্গনে
কার প্রেমাকুল আঁখি দেখা দেয় মানস নয়নে ;
কার সুধা সঙ্গীত আলাপ
অন্তরে জাগায়ে তুলে নিকুঞ্জের পুষ্পিত প্রলাপ ?
গুঞ্জনমুখর মত্ত মধুপের রব
কার স্বর্ণনূপুরের শিঞ্জন উৎসব ?
জ্যোৎস্নাভরা ফাল্গুন-নিশায়
হিরণ্য অঞ্চল কার ভেসে আসে আকাশের গায় ?
সে যে কামনার ধন, সে যে প্রাণপ্রিয়—
ব্যথাভরা বক্ষমাঝে অপূর্ব্ব অমিয় ;
তব সনে সেও যে গো আসে
জল স্থল শূন্য সব ভরে' যায় তাহারি আভাসে !

তাই ডাকি এস ঋতুরাজ !
এস আজ
পীত বাস পরি',
অঙ্গে-অঙ্গে জড়াইয়া কাননের পুষ্পিত বল্লরী ;
মাধবীর বিশুষ্ক বিতান
তোমার মোহন মন্ত্রে জাগুক পাইয়া নব প্রাণ ;

মল্লিকার মধুময় বাস
প্রিয়পরিরম্ভসম রচে' দিক সম্মোহনপাশ ;
সরসীর দ্রবীভূত স্ফটিকের বুকে
নিদ্রিত নলিন-আঁখি উন্মীলিত হোক আজি সুখে ;
বর্ষপরে ভুখারী ভ্রমর
মধুমদিরায় মাতি' হোক আজি আনন্দমুখর ;
পঞ্চমে করুক গান তব আগমনী
চূতনিকুঞ্জের মাঝে কোকিলের কলকণ্ঠধ্বনি ।

পূর্ণ হয়ে আসে দিন আজি ;
ডাকিছে সঘনে ওই খেয়া পার করিবার মাঝি ;
ঘনাইয়া আসিছে আঁধার,
তরঙ্গ-উদ্বেল সিন্ধু একাকী হইতে হবে পার !
নাহি শক্তি নাহিক সম্বল,
শুধু আছে ভাঙা বুক—আছে অশ্রুজল !
সংসার-তরুর শাখে বাঁধিতে পারিনি সুখনীড়,
জীর্ণ পঞ্জরের তলে দুরাশা করেছে শুধু ভিড় ;
সন্ধ্যা হয়-হয়,
ক্ষোভ ক্ষতি শোক সুখ গণিবার নহে এ সময় !
আসিয়াছে বিদায়ের বেলা,
ভাঙিতে হইবে আজি লাভহীন বাণিজ্যের মেলা ;
তার আগে হে বসন্ত, এস লয়ে বর্ণ বাস রব —
বিদীর্ণ এ বক্ষমাঝে কর' আজি শেষের উৎসব ।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় ।

যাত্রারম্ভে

যেদিন মানসী পত্রিকার সম্পাদনভার লইয়া সকলের নিকট সভয়ে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তাহার পরে অনেক সময় অতিবাহিত হইয়াছে। জাগতিক বৃহৎ ব্যাপারের কথা দূরে থাকুক্, আমাদের সুখ দুঃখময় দিনপাতের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যেও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। জগতের যে কোন ব্যাপারেই হউক, যে স্থান হইতে যে শক্তি যে সম্বল যে সহায় সংগ্রহ করিয়া যে উদ্যমে আমরা যেখান হইতে আরম্ভ করি, কিছুদিন পরে দেখিতে পাই শক্তির হ্রাস হইয়াছে, সম্বল প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে, সহায় যাহা ছিল, তাহাকে আর সহায় বলা যায় না ;

নিরন্তর আশ্বাসের অভয় এবং আনন্দের মধ্যে যাহার আরম্ভ হইয়াছিল, দেখিতে পাই, নয়নজলে তাহার অবসান ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। নবোদ্ভিন্নমঞ্জরী চূতনিকুঞ্জবিহারী পরভৃতের কলকূজনের মধ্যে, নব-বসন্তের অজস্র আলোকসম্পাতোজ্জ্বল দিনে যাহার সম্ভব হইয়াছে, প্রাবৃটের কুহুনিশীথিনীর ঘনান্ধকারে বাতবিধ্বস্ত বনভূমির আর্ত্ত চীৎকারে পত্রান্তগলিত বসুধার অবিরল অশ্রুধারার মধ্যে আর কি তাহা সম্ভব হয়! বসন্তের সে নবারুণপ্রফুল্ল প্রভাতের আনন্দ শিহরণ যে বিলুপ্ত হইয়া যায়, বনবৈতালিকের মধুমন্ত্রময় আবাহনগীতি যে স্তব্ধ হইয়া পড়ে! বিমানবিদারিণী উন্মাদিনী তড়িল্লতার বিকট বিস্ফুরণের মধ্যে অন্তর যে সেদিন কাঁপিয়া উঠে; শ্রাবণের অবারিত প্লাবনের অবিরল ধারায় বসন্তের কুসুমাস্তীর্ণ কুঞ্জবীথিকা যে সেদিন কর্দ্দমাক্ত হইয়া যায়! ইহাই জগতের নিয়ম এবং আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রজীবনের মধ্যে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে একথা বলিবার সৌভাগ্য আমাদের দুরদৃষ্টবশে না হইলেও পত্রিকার পত্রান্তরালে যে মানসবিহারিণীর পূজার পুষ্পপাত্র অনুক্ষণ ভরিয়া উঠিয়াছে—নানা ক্ষোভ ক্ষতি শোক ও সন্তাপের মধ্যেও মানসপূজা তাঁহার চরণোপান্তে পঁহুছাইবার চেষ্টায় ত্রুটি হয় নাই এবং আজও হইতেছে না—ইহাই মাত্র গর্ব্ব এবং তাহার মূলেও সেই অন্তরদেবতারই অহৈতুকী অজস্র করুণা দেখিতে পাই বলিয়াই গর্ব্ব করিবার স্পর্দ্ধা হৃদয়ে জন্মিবার অবসর পাইয়াছে; নতুবা ধূলার ধরণীর যাত্রাশেষের অপরাহ্ণবেলায় অদৃষ্টদেবতা গর্ব্ব করিবার মত আজ আর কি রাখিয়াছেন? যাহা দিব বলিয়া কুশবারিসংযুক্ত হইয়া বসিয়া আছি, গ্রহীতা বিপুল আশ্বাসে নির্ভর করিয়া আশার আনন্দে দুইকর বিস্তার করিয়া উদ্বেগের সহিত অপেক্ষা করিতেছে, হঠাৎ দেখিতে পাই অদৃষ্টের ফেরে সে মহাদানযজ্ঞের মহা-আয়োজনসম্ভার বিরাট ব্যর্থতার মধ্যে হাহাকার করিয়া মরে! যাহাকে যাহা দিব বলিয়া বারম্বার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, যে যাহা পাইবে বলিয়া বারম্বার আশ্বাসের উপর বিপুল আশা স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত মনে প্রতীক্ষা করিতেছিল, সে সমস্তই কুটীল কালের লৌহনিয়মের ভ্রূকুটিভঙ্গীতে ক্ষণভঙ্গুরত্বের পরিচয় দিয়া পলায়ন করিয়াছে।

আমাদের স্থিরা ধরিত্রীর এই অস্থিরতার মধ্যে নিরুপায় মানবশিশুর দিনযাত্রা কেমন করিয়া অতিবাহিত হয়, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। বিপুল ব্যর্থতার বক্ষভরা গুরুভার লইয়া মানসতামরসবিহারিণী আনন্দময়ী মানসীর চরণপ্রান্তে আনন্দময় পুষ্পোপচার সৃজন কঠিন অপেক্ষাও সুকঠিন; যতটুকু সম্ভব হয় বা হইয়াছে তাহা স্নেহশীল বন্ধুস্বজনের কৃপাকণার প্রসাদে। যাঁহাদের অক্ষুণ্ণ করুণা ও অপার স্নেহের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া দেবার্চ্চনার মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়াছিলাম, যে চিরন্তন বন্ধুজনের স্নেহসঞ্জাত আশ্বাসভরা অভয়বাণী দেবতার বরাভয়ের মত শিরোধার্য্য করিয়া চিরন্তনী দেবীর পাদপীঠতলে বসিতে সাহস পাইয়াছি; প্রত্যক্ষে হউক পরোক্ষে হউক, সে স্নেহের আশ্বাস আজও আমাকে দুর্ভেদ্য কবচাবরণে আবৃত রাখিয়াছে এ বিশ্বাস ও আশাকে হৃদয়ের মধ্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়া আজ যুক্তপত্রিকার সম্পাদনভার স্কন্ধে নিয়া আবার পথে বাহির হইলাম—যাত্রাপথ ছায়াসুশীতল সরঃশীকরস্নিগ্ধ ও কুসুমগন্ধামোদিত হইবে কি না, তাহা সেই চিরপ্রিয়া চিরারাধ্যা অন্তরদেবতা মানসীই জানেন, যাঁহার পাদপদ্মে পত্রিকার পত্রান্তরাল দিয়া পূজোপচার পঁহুছাইবার জন্য জীবনভরা এই প্রাণপণ আকিঞ্চন।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

নববর্ষ

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অশেষ করুণায় "মানসী" আজ তাহার জীবনের সাতটী বৎসর অতিক্রম করিয়া অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিল। মানসীর শুভানুধ্যায়ী ও পৃষ্ঠ-পোষকবর্গ আজ ইহার জন্মতিথি উপলক্ষে আন্তরিক আহ্লাদিত সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথের আশীর্লিপি ললাটে ধারণ করিয়া মানসী লোক-লোচনের গোচরীভূত হয়। তাহার পর দিনে দিনে শুক্লপক্ষ শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছিল। গাছ যেমন প্রথমাবস্থায় অঙ্কুর হইতে ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠে, ছোট ছোট সুকুমার শিশুগুলি যেমন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ ও সবল হইতে থাকে, মানসীও সেইরূপ বৎসরের পর বৎসর শুধু আয়তনে ও অঙ্গ-সৌষ্ঠবে নহে, আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যেও শোভনতর হইতে লাগিল। কর্তৃপক্ষগণের অদম্য উৎসাহে মানসী সাধারণের প্রীতি-ভাজন হইয়া নিজের জীবনের উপযোগিতার যোগ্য প্রমাণ দিতে সমর্থ হইল। দুই বৎসর পূর্ব্বে সেই ক্ষুদ্র বালিকা যখন মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের পালিত কন্যা বলিয়া পরিগণিত হইল, তখন ইহার শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নব নব আশা পোষণ করিতে লাগিলেন।

মানসীর বহিঃসৌন্দর্য্যও যেরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার অন্তঃসৌন্দর্য্যবৃদ্ধিকল্পে এই প্রবীণ-সাহিত্যিক ও নবীন-সম্পাদকের চেষ্টাও তদ্রূপ ফলবতী হইয়াছে—এ কথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। রস-পিপাসুগণ জগদিন্দ্রনাথের রচনায় ভাব ও ভাষার অপূর্ব্ব-সম্মিলনে—তাঁহার রচনার কলা-কৌশলে—তাঁহার মানব চরিত্র বিশ্লেষণ শক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয়ে যে আনন্দলাভ করিয়াছেন, তাহার জন্য সকলেই তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবেন। গুরুতর সম্পাদন কার্য্য করিয়া যশোলাভ করা অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না; কিন্তু সুখের বিষয় বাণী ও কমলার বরপুত্র নাটোরাধিপের ভাগ্যে তাহাও ঘটিয়াছে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আকার বৃদ্ধি প্রকৃতির রীতি। সেই স্বাভাবিক নিয়মবশে "মানসী"কে আজ নূতন ও বর্দ্ধিত আকারে দেখিয়া ইহার শুভাকাঙ্ক্ষীরা আনন্দিতই হইবেন। মানসীর বর্দ্ধিতায়তন ও সহজ সরল গতিঃ ইহার প্রাণ শক্তির পরিচয় দিতেছে।

"মানসী" এতদিন একা ছিল; আজ সে "মর্ম্মবাণী"কে সখীরূপে পাইয়াছে। দুইসখী যেন পরস্পরের বাহু ধরিয়া সাহিত্যের নন্দন-কাননে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ফাল্গুনের প্রথম মলয়-সমীরণ তাহাদের চূর্ণ এলায়িত অলকদামে মৃদু হিল্লোল তুলিয়া বহিতেছে। শীতের শেষ শিহরণ ও প্রথম বসন্তের মৃদু বেণুগুঞ্জন আজ তাহাদের মনে প্রাণে এক নূতন আকুলতা আনিয়া দিতেছে। পিকগণ কুঞ্জভবনে বৈতালিক গীত আরম্ভ করিয়াছে, নব মুকুলিত কিশলয় পল্লব, শ্যামলে-হরিতে, উজ্জ্বলে-মধুরে আজ অপূর্ব্ব সজীবতার আভাস আনিয়া দিতেছে। আজ বিশ্বভুবন তাহাদের চোখে আশা আনন্দ উৎসাহে পরিপূর্ণ।

প্রভাত বাবুকে সহযোগীরূপে পাইয়া সম্পাদক জগদিন্দ্রনাথও যেমন নব বলে বলীয়ান হইলেন, তেমনি পাঠকবর্গও তাঁহাকে এই যুগ্মপত্রিকার অন্যতম সম্পাদকের আসন অলঙ্কৃত করিতে দেখিয়া মনে নব নব আশা পোষণ করিতেছেন।

মাসিকপত্র পরিচালন বাঙ্গালাদেশে একটা আশঙ্কা-সঙ্কুল অনুষ্ঠান। কর্তৃপক্ষ ও গ্রাহকবর্গের মধ্যে সহানুভূতি না থাকিলে ও পরস্পর পরস্পরের সহায়তা না করিলে এই অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুরূপে চলিতে পারে না।

আমার মনে হয়, দেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি সম্যক্ লক্ষ্য রাখিয়া মাসিকপত্র পরিচালন করা উচিত। যতদিন না দেশে শিক্ষার প্রসার বর্দ্ধিত হয় ততদিন সাধারণের মুখ চাহিয়া সাধারণকে আনন্দ ও তৃপ্তি দিবার জন্য, তাহাদের কর্ম্ম-ক্লিষ্ট অবসাদগ্রস্ত প্রাণে সাহিত্যের সজীব সরসতা ঢালিয়া দিবার জন্য, সহজ-বোধ্য ভাষায় কাজের কথা লিখিতে হইবে—যাহাতে

তাহারা শিক্ষার সহিত আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়।

দেশবাসীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চরিত্রোন্নতি, অবস্থার উৎকর্ষ সাধন, দারিদ্র্যনিবারণ, অভাব মোচন ও আনন্দ বিধানের জন্য লিখিতে হইবে; পত্রিকা-সম্পাদক ও লেখকগণের সে কথা স্মরণ না রাখিলে চলিবে না।

শিক্ষাদ্বারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়, মানবপদবাচ্য হইতে পারা যায়। সেই শিক্ষার বিস্তারকল্পে সহায়তা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে মাসিক পত্রিকায় আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে দেখাইয়াছেন যে স্বাস্থ্যের কথাও সাহিত্যের একটী প্রয়োজনীয় অংশ। শরীর সবল না হইলে মনের স্ফূর্ত্তি থাকে না—সাহিত্যালোচনা করিবার,রস গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি থাকে না। জীবন্মৃত নর-কঙ্কালে সাহিত্যের কি সেবা করিবে। ডাক্তার চুণীলাল বসু-প্রমুখ কৃতবিদ্য মনীষিগণ পূর্ব্বে 'ভারতী' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় শারীর-তত্ত্ব-বিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া আলোচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গতবৎসর সেরূপ প্রবন্ধ আমাদের চক্ষে পড়ে নাই। দেশের কৃতবিদ্য ডাক্তার ও কবিরাজ মহাশয়েরা এ বিষয়ে অবহিত হইয়া মাসিক পত্রিকার সাহায্যে সাধারণকে উপদেশ দান করিলে আমাদের অনেক উপকার হইতে পারে।

আর একটা কথা, দারিদ্র্য আমাদের এখন চির-সহচর। নিত্য অভাবের তাড়নায় ঘরে ঘরে ক্রন্দনের সুর উঠিয়াছে। ভবিষ্যৎ যেরূপ অন্ধকারময় দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয় এই ক্রন্দন শীঘ্র ভারত-আকাশ বিদীর্ণ করিবে। ইহার প্রতীকার না করিতে পারিলে ভারতবাসীর অস্তিত্ব থাকিবে না-'সুজলা-সুফলা-মলয়জ-শীতলা' বঙ্গভূমি মরুভূমিতে পরিণত হইবে। অন্নচিন্তা চমৎকারা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থাগমের সুবিধা বিষয়ক ব্যবহারিক প্রবন্ধাদি মাসিক পত্রিকায় আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পরদুঃখকাতর সমবেদনাতুর অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় দরিদ্রের ক্রন্দন দেখিয়া যে 'ক্রন্দন' করিয়াছেন তাহা আন্তরিকতাপূর্ণ, পবিত্র। বৈষয়িক উন্নতির কতকগুলি পন্থা প্রদর্শন করাইয়া তিনি আমাদের ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলিয়া রাখি। ভারত ভাবুকতার দেশ সত্য, কিন্তু বাস্তবকে অবহেলা করিলে ত চলিবে না। দারিদ্র্য-রাক্ষসী আমাদিগকে নিষ্পেষণ করিবার জন্য আপনার সবল হস্ত উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে, ইহা বাস্তব সত্য—ইহাকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। 'অর্থমনর্থম্ ভাবয় নিত্যম্' বলিয়া উপদেশ দিতে আসিলে উপহাসাস্পদ হইতে হইবে না কি? তাই বলিয়া একথা বলিতেছি না যে ভারতের চিরন্তন ভাবুকতাকে সমুদ্রপারে দূর করিয়া দিতে হইবে। ভাবুকতা চাই বাস্তবের কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য—ভাবুকতা চাই কর্ম্মে প্রেরণা আনয়ন করিবার জন্য—ভাবুকতা চাই কর্ম্ম করিবার জন্য। শুধু বাস্তবতা বা শুধু ভাবুকতাকে ধরিয়া থাকলে চলিবে না। বাস্তবের পূজা করিয়া 'অতিমানুষে'র দেশ পাশ্চাত্য জগতে কি ভয়ঙ্কর প্রলয় কাণ্ডের সূচনা করিয়াছে তাহা কে না জানে। আবার প্রাচ্যজগতে চীন ও ভারতবর্ষ ভাবুকতার মাদকতায় বিভোর থাকিয়া উন্নতির কতদূর নিম্নে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা আর কাহাকেও কি বলিয়া দিতে হইবে? ভাবুকতা ও বাস্তবতার অপূর্ব্ব সম্মেলনে বঙ্গ সাহিত্যে নবপ্রয়াগের সৃষ্টি হউক।

আমাদের আধুনিক সাহিত্যে চিন্তাশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। নূতন ভাবের সৃষ্টি হইতেছে না—যে ভারত এককালে জগৎকে ভাবের বন্যায় প্লাবিত করিয়াছিল সে ভারত আজ ভাবের কাঙ্গাল। আমাদের সেই পৈত্রিক পুরাতন চিন্তাখাত আজিও বর্ত্তমান, কিন্তু ভাবের প্রবাহ তাহাতে অতি মৃদু, অতি ক্ষীণ। সুমহান্ পর্ব্বতের জল-স্রোতের ন্যায় চিন্তা-স্রোত আসিয়া মরা-গাঙে বান না ডাকাইলে আমাদের চিত্ত-দুকূল ভাসিবে কিসে! নূতন ভাব-গঙ্গা আনয়ন করিতে হইবে, পুরাতনের স্মৃতির দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া

থাকিলে ত চলিবে না। বর্ত্তমান জগৎ হইতে ভাব-পসরা আনিতে হইবে। মধু-মক্ষিকার ন্যায় ভাব-সঞ্চয় করিয়া মধুচক্র রচনা করিতে হইবে! যেখানে নূতন ভাবের দর্শন পাইব সেইখান হইতেই উহা গ্রহণ করিব, কারণ ভারতবাসী ত বর্জ্জন জানে না—জানে কেবল গ্রহণ। এ গ্রহণ চৌর্য্য-বৃত্তি নহে। ভাব সকলকে আপনার করিয়া,দেশকাল পাত্রোপযোগী করিয়া লইতে হইবে। মধু-মক্ষিকা নানা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, কিন্তু যখন মধুচক্র হইতে মধু ক্ষরিত হয় তখন কতটুকু মধু কোন পুষ্পের তাহার কি হিসাব থাকে? সেই রূপ গৃহীত ভাবগুলি মনীষার অপূর্ব্ব কৌশলে নবজীবন লাভ করিবে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তিনি "বর্ত্তমান জগতে" বৈদেশিক বহুতর ভাবের সহিত আমাদিগকে পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। ভ্রমণকারীর দেশ-ভ্রমণের প্রকৃত অভিজ্ঞতা এইরূপ ধরণেই লিখিত হওয়া উচিত। অন্য দেশের প্রাণের ধারাকে বুঝিতে হইলে দেশবাসীর প্রকৃতিগত পরিচয় জানা আবশ্যক। তাহাদের ভাবরাশি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে তাহাদের সহিত ভাবের আদান প্রদান করিতে হইবে—জানিতে হইবে তাহাদের বিশেষত্ব কিসে—বুঝিতে হইবে কোন অবস্থায় পড়িয়া কোন ভাব-কুসুম ফুটিয়া সুগন্ধে সকলকে আমোদিত করিতেছে। আর সেই সকল ভাববৃক্ষের চারা ভারতে আনিয়া 'কলম' করিয়া, ভারতীয় ভাবের সহিত মিলন করিয়া ভারতভূমিতে রোপণ করিতে হইবে। যাহা কিছু মহৎ—যাহা কিছু সৎ, তাহাকেই বরণ করিয়া লইতে হইবে। যেখানেই উচ্চ আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়, সেইখানেই মস্তক আপনা হইতে নত হইয়া পড়ে। সেই উচ্চ আদর্শগুলিকে আপনার করিয়া লইতে হইবে।

এখানে একটা কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। নূতন চিন্তা আনিতে হইবে সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্য-সমাজের শুধু অন্ধ অনুকরণ করিলে চলিবে না, বা আপাত-মনোহর নয়নাভিরাম গন্ধহীন 'পরগাছা' আনিলে চলিবে না। পত্রবহুল ফলপুষ্পদায়ী বৃক্ষ আনিতে হইবে—যাহার তলদেশে বসিয়া সংসারক্লিষ্ট পথিক সুশীতল ছায়া পাইবে—সুগন্ধে তাহার প্রাণ মাতোয়ারা হইবে—ফলাস্বাদে তাহার জীবন ধন্য হইবে। অশ্লীল নগ্ন-সৌন্দর্য্যের উপাসক জনকতক লেখক অশ্লীল চিত্র অঙ্কিত করিয়া আর্টের ও বাস্তবতার দোহাই দিয়া মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিতেছেন। কি বলিয়া তাহাদিগকে বুঝাইব আর্ট উদ্দেশ্যহীন নহে; আর,সকল বাস্তব জিনিস সকলের সমক্ষে বলা উচিত নয়। আমাদের গৃহের সুন্দর চিত্রগুলি কি বাস্তব নয়? প্রতিভার তুলিকার সাহায্যে তাহাদিগকে ফুটাইয়া তুল না কেন? ভারতীয় আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিও না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন পাপের চিত্র অঙ্কিত না করিলে পাপের প্রতি ঘৃণা আসিবে না। এ কথাটা কি সত্য? পাপের পরিণাম দেখিয়াও কোন্ ব্যক্তি কবে পাপকর্ম্মে বিরত হইয়াছে? পাশ্চাত্য ঔপন্যাসিক ও গল্প-লেখকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই পন্থাই প্রকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন সত্য, কিন্তু দেখিতে হইবে তাহাদের সামাজিক ব্যাধিগুলি কতদিনের পুরাতন ও সেগুলির প্রসার ও গভীরত্বই বা কতদূর। তাহাদের দেশে সূচিকাভরণ মহৌষধ হইতে পারে—কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের ও সমাজের অবস্থা এখনও তাদৃশ নহে।

এখন দেশে একটা নূতন হাওয়া উঠিয়াছে সেটা হইতেছে ব্যক্তিত্ববাদ (Individualism)—আপনার প্রতি প্রীতি। আপনার শক্তির প্রতি একটা বিশ্বাস থাকা মন্দ নহে; কিন্তু তাই বলিয়া আমি যাহা বলিব তাহাই বেদবাক্য, আমি যাহা করিব তাহা সকলেরই করণীয়, এরূপ চিন্তা করা উচিত নয়। আপনাকে মানবের উপরে 'অতি মানুষ'রূপে স্থাপন করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নয়। পাশ্চাত্য-জগতে ব্যক্তিত্ববাদের স্থান একটু আছে, কারণ সে দেশে 'সবাই স্বাধীন,' 'সবাই প্রধান'—আর আমাদের দেশে আমরা যে 'তৃণাদপি সুনীচ', আমরা যে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ছাড়া থাকিতে জানি না—আমাদের চরিত্র যে তাহাদের

মধ্য দিয়া স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে রস গ্রহণ করিয়া আমরা যে পুষ্ট হইয়াছি। আমাদের ত নিজেদের স্বাতন্ত্র্য নাই। পাশ্চাত্য দেশে এই স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ববাদের আধুনিক ঋষি হইতেছেন ইব্‌সেন। আজকাল কেহ কেহ ইব্‌সেনের নাম শুনিলেই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। ইব্‌সেনেজিম্ যেন অশ্লীলতা ও কুরুচির একার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিকই কি তাহাই? এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। ইবসেনকে বুঝিতে হইলে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। দেশে সামাজিক দুর্দ্দশা, নরনারীর ব্যভিচার, সমাজ ও ধর্ম্মের ভণ্ডামীর প্রবল স্রোত বহিতেছে দেখিয়া মোহনিদ্রায় অভিভূত সমাজসংস্কারকগণের চক্ষু উন্মীলন করাইবার জন্য ইব্‌সেন্ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। নরওয়ের সমাজে তখন তামস-যুগ। এই সকল দুশ্চিকিৎস্য রোগে সূচিকাভরণই প্রকৃত ঔষধ; তথাপি তিনি কোথাও এই মহৌষধির প্রয়োগ করেন নাই, তিনি দ্রষ্টার ন্যায় রোগ নির্ণয় করিয়াছেন। আর এক কথা, ইব্‌সেন হইতেছেন একজন অতীন্দ্রিয়বাদী (mystic)। তিনি কোথাও অশ্লীল নগ্নচিত্র (nude) অঙ্কিত করেন নাই। তাঁহার ব্যক্তিত্ববাদে আত্মম্ভরিতা নাই। তাঁহার কথায় বলিতে গেলে "To make every man in the land a noble man" মানবকে প্রকৃত ভদ্র করাই ব্যক্তিত্ববাদের আদর্শ। এই আদর্শ কি সর্ব্বত্র প্রযুজ্য হইতে পারে না? ইহার মধ্যে দোষের কি আছে? কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার স্বাধীনতা-প্রয়াসী নারীজাতির ব্যক্তিত্ববাদ আমাদের দেশে চালাইতে গেলে চলিবে না। Doll's Houseএর নোরার চরিত্র অদ্ভুত। অব্যবস্থিত চিত্ত 'নোরা' সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে যখন সুপ্ত মনুষ্যত্ব ফিরিয়া পাইল, তখন সেই মনুষ্যত্বের সম্যক্ বিকাশের জন্য—তাহারই সাধনার জন্য—পুত্র, কন্যা ও স্বামীকে ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। পাশ্চাত্যরমণী আপনার ন্যায্য দাবী আদায় করিতে জানে, কিন্তু কর্ত্তব্য কি তাহা তাহাদের মধ্যে অনেকেই জানেনা—জানেনা স্বার্থত্যাগ করিতে—জানে না ত্যাগের বিমল আনন্দ অনুভব করিতে। তিনটি শিশু পালন করা কি নোরার কর্ত্তব্য ছিল না? স্বামীর প্রতি কি তাহার কোন কর্ত্তব্য নাই। তবে ইব্‌সেন নোরার প্রত্যাবর্ত্তনের একটা আশা রাখিয়া দিয়াছেন। এ চিত্র আমাদের দেশে কখনই শোভন হইবে না। আবার, এই ব্যক্তিত্ববাদের অত্যুক্তিকে পরিহাস করিয়া ইব্‌সেন Wild Duck লিখিয়াছেন। নারীর ব্যক্তিত্ববাদ ও স্বাধীনতার পৃষ্ঠপোষক হইলেও তিনি বুঝিয়াছিলেন, নারীর স্বাধীনতা তাঁহার মাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

গত কয়বৎসর "মানসী" বঙ্গ-সাহিত্যে কি উপহার দিয়াছে তাহার একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না; কারণ নূতন কিছু করিবার চেষ্টা করিতে হইলে পুরাতন যাহা কিছু ছিল তাহার দোষগুণ বিচার করিতে হইবে। দেখিতে হইবে অভাব ও অভিযোগগুলি প্রকৃত কি না, সেগুলি সহজে কিরূপে পূর্ণ করা যায়। এই কয়বৎসরে "মানসী" জলধরবাবুর 'বিশুদাদা, রাখাল বাবুর 'শশাঙ্ক', প্রভাতবাবুর 'রত্নদীপ' প্রকাশ করিয়া উপন্যাস পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিগতবর্ষে লব্ধপ্রতিষ্ঠা লেখিকা অনুরূপা দেবীর 'উল্কা' উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। প্রভাতবাবুর 'জীবনের মূল্য' ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইতেছে। দুঃখের বিষয় গতবর্ষে "মানসী"তে প্রভাতবাবুর 'বাল্যবন্ধু', 'মাতৃহীন' 'খোকার কাণ্ড' প্রভৃতির মত সুন্দর গল্প একটিও প্রকাশিত হয় নাই। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিগত কয়েক বর্ষে শিক্ষিত ছাত্র সম্প্রদায়ের জীবিকাসমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। গতবর্ষে এ বিষয়ে 'মানসী'তে কিছুই আলোচিত হয় নাই। 'অভয়ের কথা', 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' প্রভৃতির মত সারবান প্রবন্ধনিচয় আমরা আর পাইতেছি না কেন? বৈদিশিকসাহিত্যের পরিচয় মানসীতে প্রকাশিত হইলে ভাল হয়। "মানসী" গতবর্ষে কবিতা সম্পদে সমুজ্জ্বল। মহারাজ

জগদিন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রমোহন, বসন্তকুমার, করুণানিধান, কালিদাস রায় প্রভৃতি কবিগণের কতকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। জগদিন্দ্রনাথের কবিতাগুলি মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠদেশে আর কতদিন পড়িয়া থাকিবে? ছোট গল্পের জন্য এককালে মানসীর বিশেষ খ্যাতি ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় গত বৎসর সে গৌরব কথঞ্চিৎ ম্লান হইয়াছে। আশা করি "মানসী ও মর্ম্মবাণী" নববর্ষে নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবে। রোগাতুর শর্ম্মার "রোগশয্যার প্রলাপ"-এর মত চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ পাঠে দেশের কথা, সমাজের কথা প্রভৃতি অনেক চিন্তিতব্য বিষয়ের উপাদান পাওয়া যায়। ভগবান রোগাতুর শর্ম্মাকে নিরাময় করুন।

মানসীর স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্বের জন্য সম্পাদক ও লেখকবর্গ যথেষ্টই করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু এই কার্য্য জন কয়েকের চেষ্টায় হইবে না, সাধারণের সহানুভূতি ও সমবেত চেষ্টায় হইতে পারে।

পরিশেষে মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' যেন জ্ঞানের বর্ত্তিকা লইয়া অন্ধকারকে দূর করিতে পারে, শিক্ষার বিস্তার করিতে পারে, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের সন্ধান বলিয়া দিতে পারে, বিমল সাহিত্যের রস দান করিয়া শুষ্ক তৃষ্ণার্ত্ত পিপাসু কণ্ঠকে সরস করিতে পারে, মানবের চিত্তবৃত্তির স্ফুরণ করিবার সহায় হইতে পারে, মানবকে প্রকৃত মানবত্বে উন্নীত করিবার সহায়ক হইতে পারে, বাঙ্গালার লিখনভঙ্গীতে সবল সুস্থ নৈতিক সুর দিতে পারে। দয়াময়ের কৃপায় নূতন 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' অজর ও অমর হইয়া নূতন ভাবের বন্যায় বাঙ্গালা দেশকে প্লাবিত করিয়া দিউক।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র।

নূরজাহান।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

স্নেহশালিনী রমণীর প্রেম এই দুঃখ দৈন্য জরামরণগ্রস্ত ধরণীর অসহায় মানবের হৃন্মর্ম্মব্রণের সুশীতল সুধালেপ, ভাগ্যবান জাহাঙ্গীর সে সুধার আস্বাদ প্রচুর পরিমাণে পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। মানবজীবনের চিরাকাঙ্ক্ষিত সার্থকতা, যাহা রাজজীবনে সুদুর্ল্লভ, সে সার্থকতা জাঁহাপনা জাহাঙ্গীর তাঁহার চিরাভিলষিত আদর্শ রমণী মেহেরেরই হস্তে লাভ করিয়া তাঁহার জন্ম ও জীবন সফল করিয়া গিয়াছেন। বহু-বল্লভ নৃপতির ক্ষণিক প্রণয়ের সৌভাগ্যস্মৃতি লইয়া মেহেরকে অনাবশ্যক জীবন অনাদরের অন্ধকারে যাপন করিতে হয় নাই, তাঁহার প্রাণাধিক বল্লভতম রাজকান্তকে যে অজস্র স্নেহ প্রীতি তিনি দান করিয়া তাঁহার রাজজীবন ও মানবজীবন ধন্য করিয়া দিয়াছিলেন, রাজাধিরাজ জাহাঙ্গীরও স্বামীরূপে প্রণয়ীরূপে সে প্রেমের প্রচুর প্রতিদান দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে চিন্তায় বৈধব্যের বিপুল বিরহের দিনে শান্তি সান্ত্বনা কি পাওয়া যায়? জীবনারম্ভের একমাত্র অভিলষিত, জীবনশেষের একমাত্র স্নেহাবলম্বন, প্রেম-পিঞ্জরের একমাত্র শুক বিহঙ্গ, হৃদয়-পঞ্জর ভাঙ্গিয়া যে দিন অনির্দ্দিষ্ট লোকান্তরের উদ্দেশে অনন্তকালের জন্য পলায়ন করে, চিরবিরহাতুর বিধবার পক্ষে সে দিন যে কি দিন তাহা কেমন করিয়া বলি? সারা বুক ভরিয়া যে বাস করে, সারা দিনের কর্ম্মের মধ্যে যে বিরাজিত, সমস্ত দিন রাত্রির চিন্তার মধ্যে যাহার অটল আসন স্থাপিত, সে আসন শূন্য হইলে, সে বুক খালি হইয়া গেলে কেমন হয় তাহা যাহার না হইয়াছে সে বলিতে পারে না এবং যাহার হইয়াছে সেও এক নিমেষে পাষাণ হইয়া যায়। সমস্ত বলার অতীত যে দুঃসহ দুঃখ, সে কথার বর্ণন কেমন করিয়া কে করিবে? পরমায়ুর যে কয়টা দিন দুঃখের ধরণীতে থাকিতে হইবে, তাহা থাকিতেই হয়, তবে কেমন করিয়া যে থাকে, তাহা সেই চিরদুঃখীর দুঃখময় দিনযাত্রার মধ্যে কথঞ্চিৎ প্রকাশ পায়। মেহেরও সেইরূপ তাহার দারুণ দুঃখ-দিনের

কিছু পরিচয় দিয়া গিয়াছে। আজ আর সেদিন নাই, রাজদণ্ড হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে, মহার্ঘ্য মণিমণ্ডিত মুকুট আজ শিরশ্চ্যুত, একান্ত প্রিয়জনের স্বেচ্ছাদত্ত প্রেমমন্দারমালা আজ কণ্ঠবিচ্যুত, ভারতপতি জাহাঙ্গীরের হৃদয়াশ্রিতা প্রেম-লতিকার মূর্ত্তিমতী আনন্দ-মঞ্জরী আজ ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা জানি ও বিশ্বাস করি যে অনন্ত আকাশ-তলের রবি সোম শনি মঙ্গল বুধ শুক্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক এই ধরাধামের অসহায় নরনারীর অদৃষ্টের উপর আধিপত্য করিয়া, কখনও সুখ সম্পদ, কখনও বা দুঃখ দৈন্য দিয়া, আমাদের জীবন-যাত্রার কোন মতে শেষ করিয়া দেয় এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে অজ্ঞাত লোক-লোকান্তরের যাত্রী করিয়া আমাদিগকে অন্ধকার পথে বিদায় করে—সে কথা সত্য নহে ; কোন্ অজ্ঞাত দেবতার আজ্ঞায় জানি না, এই ধরণীর একটি মানুষ আর একটি মানুষের অদৃষ্টের উপর একাধিপত্য করে। যতদিন সেই দৈব-প্রেরিত, অন্তরের অন্তরতম, একমাত্র শুভগ্রহের স্নেহ-হস্তের করুণ ছায়া ও প্রেম সম্নত আনন্দ দৃষ্টি আমাদের উপর অক্ষয় হইয়া থাকে, আকাশের জ্যোতিষ্কের খর তাপ বা গ্রহের বক্রদৃষ্টি আমাদিগকে কোন দুঃখই দিতে পারে না। যে দিন প্রাপ্তকালে বা অকালে, সকারণে বা অকারণে, আমরা সেই শুভ গ্রহের শুভদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হই সে দিনের দুঃখ বেদনার নিকট শনি বা অশনির ব্যথা কিছুই নহে। কিশোরী মেহেরুন্নিসার অনুত্তরঙ্গ স্তব্ধ প্রেম-সাগরে ভারতাকাশের পরিপূর্ণ চন্দ্রমা কুমার সেলিম যে জোয়ারের বান ডাকাইয়াছিল, সে তরঙ্গ মেহেরের হৃদয়তটে আজীবন কেমন করিয়া কত আঘাত করিয়াছে তাহা কেবল মেহেরই জানিত। জীবনসায়াহ্নে সে চাঁদের পরম স্নিগ্ধ প্রেমচন্দ্রিকা মেহেরের অতৃপ্ত হৃদয়ের ক্ষত বেদনার উপর কেমন করিয়া সুধালেপ দিয়া শান্ত করিয়াছিল তাহা মেহেরই জানিত। আজ সে হৃদয়-চন্দ্রমা অস্তশিখরীর পরপারে চিরদিনের জন্য লুকাইয়া মেহেরকে কি অপার দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে তাহাও মেহেরই জানে।

এ জীবনের একান্ত আবশ্যকীয় অন্তরের প্রিয় মানুষটির স্নেহলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটেনা। নৈরাশ্যের মধ্যে জীবন আরম্ভ করিয়া নৈরাশ্যেই তাহার অবসান হইবে ভাবিয়া আছি, তখন যদি চিরারাধ্য চিরাভিলষিত নয়নাভিরাম মনের মানুষটি জীবনভরা নিরাশার দুঃখ মিটাইয়া দেয়, সে যে কত বড় সুখ তাহা কি বলিয়া শেষ করা যায়? তাহার পরেও যাহার দগ্ধভাগ্য প্রতিকূল হইয়া সুচিরলব্ধ একান্তবাঞ্ছিত চিন্তামণিহার কণ্ঠ হইতে খুলিয়া লয়, সে দুঃখ রাখিবার স্থান ত্রিভুবনে মেলে কি? সে দিনে এই আকাশভরা আলোক এক নিমেষে কেমন করিয়া নিবিয়া যায়, দক্ষিণাপথের মন্দ মলয়মারুত কেমন করিয়া বিষদিগ্ধ হইয়া উঠে, নিকুঞ্জের পুষ্পমঞ্জরী এক পলে কেমন করিয়া বিফল হয়, বসুধার বন-বৈতালিকের কলগীতি কেমন করিয়া নিঃশেষে তাহার মাধুর্য্য হারায়, বসন্তের নবোদ্ভিন্ন-তৃণ-স্তীর্ণ কুঞ্জবীথিকা কেমন করিয়া আরব সাগরের বালুবেলায় পরিণত হয়, সমগ্র জীবন কেমন করিয়া দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে, পলে পলে কেমন করিয়া যে মরণ যাচ্ঞা করিতে হয় তাহা কেমন করিয়া বলি? প্রাণ-প্রিয় ধনকে কেমন করিয়া সুখী করিব, কি করিলে তাহার মুখে আনন্দের হাস্যমাধুরী বিকশিত হইয়া উঠিবে, আমার সব দিয়া তাহার সব দৈন্য কেমন করিয়া মিটাইব এই চিন্তায় যাহার দিনরজনী ভরিয়া ছিল, হটাৎ একদিন এক নিমেষে সে সুখচিন্তার নিকট হইতে বিদায় পাইলে, সে বিদায়ের নিদারুণ অদৃশ্য শেলাঘাত যে শত শক্তিশেলের মত হৃন্মর্ম্মের উপর লক্ষ ছিদ্র করিয়া অসহ বেদনায় সমস্ত অন্তরকে কেমন করিয়া মূর্চ্ছিত করে, তাহা যাহার করে সেই জানে, কিন্তু সে ব্যথা বলিবার ভাষা কি আছে?

এ যে দিনের কথা—সে দিনে মোগল সাম্রাজ্য ধন, সম্পদ, বল, বীর্য্য, গৌরব গরিমায় জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিল। সমুদ্রমেখলা ধরিত্রীর যেখানে যে লুক্কায়িত ঐশ্বর্য্য ছিল, দিল্লী সিংহাসনের অধিষ্ঠাতা সম্রাটের পাদপীঠতলে সমস্তই আসিয়া লুণ্ঠিত হইত। চিরধৈর্য্যময়ী ধরিত্রী বুক চিরিয়া তাহার গোপন খনির

রক্তমাণিক রাজচরণে উপহার দিত। অতলস্পর্শ জলনিধি রসাতলচারিণী রূপকথার রাণীর কণ্ঠ হইতে মুক্তামালা খুলিয়া আনিয়া সম্রাজ্ঞীর কম্বুকণ্ঠের চারু ভূষণ গড়িয়া দিত, অলকার ন্যায় গোলকুণ্ডার অফুরন্ত ভাণ্ডার সে দিন রাজকোষ পূর্ণ করিয়া আজও শূন্য হইয়া বসিয়া আছে। দেশ দেশান্তর হইতে সমাহৃত 'কোহিনূর', 'দরিয়ানূর' প্রভৃতি অমূল্য মণি দেশ দেশান্তরের কত 'নাদির', কত 'আব্দালীর' কত আবদারই যে কত দুঃখে পূর্ণ করিয়াছে!

কত দিক্‌দিগন্তরের দিগ্বিজয়ী রাজার রাজদূত দিল্লী সিংহাসনের পাদপীঠতলে কত বৎসর বৎসর যাপন করিয়াও অভিলষিত বরলাভ করিতে পারে নাই। এ হেন ইন্দ্রতুল্য চক্রেশ্বরের প্রিয়তমার সুখ-সমৃদ্ধি উন্মাদ কল্পনারও অতীত, সেই স্বপ্নাতীত সুখ-স্বর্গ হইতে এক নিমেষে বিচ্যুতা হইয়া যে নারী ধরণীর ধূলিতলে মিশাইয়া যায়, সে দুঃখ-বেদনার নিকট বজ্র-বেদনাও কি লঘু নয়? যাহার অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য এবং অপার প্রেমের উপরে প্রতিষ্ঠিত আছি তাহার ক্ষণ-বিরহেই পাগল হইতে হয়। পরলোকপ্রবাসী সেই প্রিয়জনের চিরবিরহ 'অসহ্য' একথা বলিলে কিছুই বলা হইল না। জাহাঙ্গীরের অবসানের পর কি বেদনায় মেহেরের দীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ কাটিয়াছে তাহা সমদুঃখীর কল্পনার সামগ্রী—কোন লেখকের বর্ণনার জিনিষ নহে। জাহাঙ্গীরের বিয়োগ মেহেরের পক্ষে কেবল পতি-বিয়োগ নহে—পিতামাতার প্রতিকূলতায়, রাজ্যেশ্বর সম্রাটের অনুজ্ঞায়, পরম প্রেমে যাহাকে জীবনপ্রভাতে হৃদয়ে স্থান দিয়াও বুকের কাছে পাই নাই, জীবন-সন্ধ্যায় তাহাকে দিনরাত্রির সহচরস্বরূপ পাইয়াও হারাইলাম, এ বেদনার সঙ্গে কোনও বেদনার তুলনা হয় কি? সমগ্র জীবনকাল যাহাকে পাইবার জন্য আকাশের সকলগুলি দেবতার কাছে কায়মনে প্রার্থনা জানাইয়াছি, তীর্থমন্দিরের দ্বারে দ্বারে বাঞ্ছিত লাভের জন্য মনে মনে কত মানতই করিয়াছি, জীবনশেষে তাঁহাকে পাইয়াও রাখিতে পারিলাম না, তাঁহার স্নেহকোমল বক্ষে মাথা রাখিয়া নয়নের শেষ নিমেষপাত করিবার অবসর আমার হইল না, অন্তিম দিনে যখন পথের উপর আমার শেষ শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইবে, তখন আমার একান্ত প্রিয়, প্রাণাধিক, নয়নমণি, জীবিতাবলম্বন, যে আমার সকল বাড়া, অন্তরতলে চরম দেবতার আসনে যাহাকে পরম প্রেমভরে বসাইয়াছিলাম, আকুল নয়নে খুঁজিয়া তাহার সাক্ষাৎ আর জীবনে পাইব না,—এ দুঃখ যাহার ঘটিয়াছে, সে ভিন্ন অপরে কি বুঝিবে? চক্ষু তারকার সহিত যে মিশিয়া ছিল সে চলিয়া গেলে চক্ষু অন্ধ হয়, দেহমনে যাহার প্রেমস্পর্শ বাসন্তিলতিকার মত অন্তরে বাহিরে আমাকে মঞ্জরিত করিয়া তুলিয়াছিল তাহার অভাবে এক মুহূর্ত্তে পাষাণ হইতে হয়—মেহের ইন্দ্রিয়হীনা অন্ধ পাষাণী হইয়াই অষ্টাদশ বর্ষ যাপন করিয়াছে।

মেহেরের প্রতি জাহাঙ্গীরের জীবনভরা প্রেম কেবল সোহাগ আদরেই পর্য্যবসিত হয় নাই, বাদশাহের কৃপায় মেহের হিন্দুস্থানের যথার্থ সম্রাজ্ঞী হইয়াছিল একথা আমরা জানি—বাদশাহের জীবনান্ত হইবার পর যাহাতে সম্রাজ্ঞীর অশন বসনের কোন ক্লেশ না হয়, তাঁহার অভাবের পর যে বিপ্লব উপস্থিত হইবে, তাহা তিনি অনুমান করিয়াই বিধবা সম্রাজ্ঞীর পদমর্য্যাদার অনুরূপ বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—শুধু তাহাই নহে, স্বর্ণপ্রসূ গুর্জ্জর প্রদেশের মধ্যমণিস্বরূপ আহ্‌মেদাবাদের সমস্ত রাজস্বও যাহাতে মেহেরের করায়ত্ত থাকে, সে ব্যবস্থাও তিনি করিয়া গিয়াছিলেন। হায়রে, যাহার সব ফুরাইয়া গিয়াছে, জীবন যাহার নিকট দুর্ব্বহ, অশন বসনের সৌকর্য্য তাহাকে কি সান্ত্বনা দিবে? বৈধব্যের নিদারুণ দুঃখাভিঘাতে মেহেরের মন দীনবন্ধুর চরণে শরণাপন্ন হইয়াছিল, যাঁহার দত্ত জীবন তাঁহাকেই উৎসর্গ করিয়া দিয়া মেহের প্রতিদিন শেষ দিনের প্রতীক্ষায় বসিয়া ছিল, তাহার ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন কি কিছু ছিল? বাদশাহ-দত্ত বৃত্তির অতি নগণ্য অংশে তাঁহার এক সন্ধ্যার হবিষ্যান্নের ব্যয় কুলান হইত, বাকি সমস্ত অর্থ

সরাই মসজিদ কূপ কবর প্রভৃতি নির্ম্মাণে ব্যয় করিয়া, নিরন্নের মুখে অন্ন তুলিয়া দিয়া, গৃহ-হীনের শেষ শয়ন বিছাইবার উপায় করিয়া দিয়া, বিধবার বিপুল দুঃখের দিন অতিবাহিত হইত। শুভ্র বসন-ধারিণী, শুভ্রায়িতকেশা, বর্ষীয়সী বিধবা নূরজাহানকে দেখিয়া সে দিনে কে বলিবে এই সেই কিশোরী মেহের, জীবন বসন্তের এক শুভ-সন্ধ্যায় দীপালোকিত সুসজ্জিত কক্ষে যাঁহার বিলোলাপাঙ্গ-নির্জ্জিত হইয়া জগজ্জয়ী জাহাঙ্গীর এক দিন ইহারই রক্তকোকনদ পদে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন এবং ইহাকে একদিনের জন্যও লাভ করিতে পারিলে জীবনের বাকী পরমায়ুর সব কয়টা দিন অকাতরে দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কে বলিবে এই সেই নূরজাহান, স্বামীর রক্ষাথে অসীম বিক্রমশালী সেনাপতি মহাবতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মানসে বর্ষাস্ফীতা পার্ব্বত্য তরঙ্গিণীর মৃত্যু-তরঙ্গ মধ্যে ঝাঁপ দিতে যাহার কেশাগ্রও কম্পিত হয় নাই; কে বলিবে এই সেই নূরজাহান, যাঁহার রাজকার্য্য-কুশলতায় মোগল সাম্রাজ্যের অর্থ ঐশ্বর্য্য গৌরব গরিমা বল বীর্য্য সমস্তই একদিন বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল; কে বলিবে এই সেই নূরজাহান, যাঁহার সহিত তুলনায় পৃথিবীর কোন দেশের কোন সম্রাজ্ঞীই কোন গুণেই সমকক্ষ হইতে পারেন নাই, ভবিষ্যতে হইবার সম্ভাবনাও অতি বিরল। হায় রে আমার প্রাণাধিক প্রিয়জনের নয়নের সম্মুখে তাহার স্নেহস্পর্শে, তাহার সোহাগ আদরের মধ্যে, তাহার দিনান্ত-ক্ষণ-দর্শনের আনন্দে আমি যাহা, তাহার নয়নান্তরালে তাহার স্নেহ বিচ্যুত হইয়া তাহার সান্নিধ্য সাহচর্য্য সঙ্গ হারাইয়া আমি কি তাই? প্রেমের সঙ্গে, প্রেমাস্পদের সঙ্গে, দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাণ যায় না, তাই ছায়ামাত্রাবশিষ্ট কঙ্কালসার দেহভার বহিয়া পথে প্রান্তরে অনাবশ্যক উদ্দেশ্যহীন বন্ধনবিহীন জীর্ণ জীবন কোন মতে যাপন করিতে করিতে অন্তিম নিষ্কৃতির দিনের অপেক্ষা করিতে হয়, নতুবা আজ মরিতে পাইলে পরদিবসের জন্য অপেক্ষা কি কেহ করে, না করিত?

জাহাঙ্গীর দিল্লী বা আগরায় অধিক সময় থাকিতেন না, লাহোর আজমীর এবং কাশ্মীরে তাঁহার বেশী সময় কাটিত। বাদশাহের দিন-যামিনীর অবিচ্ছেদসঙ্গিনী মেহেরুন্নিসা স্বামী-সান্নিধ্যের আনন্দলোভে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতেন। বৈধব্যের বিপুল বেদনার দিনেও বাদশাহের প্রিয় রাজধানী লাহোরেই মেহের তাঁহার পরম দুঃখের দিনযাত্রার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ইহার আরও একটি কারণ ছিল। জাহাঙ্গীরশাহের পার্থিব দেহাবশিষ্ট লাহোরে সাহদারায় সমাহিত করা হইয়াছিল। মর্ম্মর-নির্ম্মিত অনিন্দ্যসুন্দর এই মৃত্যুমন্দিরের প্রতি অনিমেষ দৃষ্টি রাখিয়া মূর্ত্তিমতী বেদনা মেহেরুন্নিসা তাঁহার প্রিয়-বিরহের দারুণ দিনগুলি কোন মতে যাপন করিতেন এবং তদানীন্তন সম্রাট সাজাহানের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিয়া রাখিয়াছিলেন, যেন তাঁহারও জীবনাবসানে সমগ্র জীবনের একান্ত কামনার প্রিয়তম ধন, ব্যর্থপ্রায় জীবনাপরাহ্নের সর্ব্বসার্থকতার নিদান ও সুখশান্তি-বিধাতা বাদশাহের পার্শ্বেই তাঁহাকেও সমাহিত করা হয়। একান্ত স্নেহমুগ্ধ জনের মনের এ ইচ্ছা বড়ই স্বাভাবিক ইচ্ছা, অশরীরী দেবতার মোহন মন্ত্রবলে প্রথম দর্শনের দিনেই যাহাকে অন্তরের নিভৃত আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, তাহার পরে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সংসারের কণ্টকময় দুঃখপথে বিচরণ করিবার সময়ে যে অভীষ্টের প্রতি সূর্য্যমুখী পুষ্পের ন্যায় উন্মুখী হইয়াই দিন কাটিয়াছে, বিগতপ্রায় বাসরে দু'দিনের সঙ্গ সাহচর্য্য পাইয়াও প্রতিক্ষণে উপচীয়মান প্রেমামৃতের অজস্রধারায় যাহার মনোভিমত তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া দিবার অবসর এবং অদৃষ্ট আমার হইল না, লোকলোকান্তরে তাঁহাকে পাইবার তপস্যা না করিয়া, তাঁহার সমাধিভবনের প্রতি সাশ্রুনয়ন বারম্বার না ফিরাইয়া, তাঁহারই দেহাবশিষ্টের নিকট সমাহিত হইবার বাঞ্ছা হৃদয়ে পোষণ না করিয়া থাকা কি যায়?

মেহেরুন্নিসা বিদুষী ছিলেন, বুদ্ধিমতী ছিলেন, কবি ছিলেন—যাহাই কেন থাকুন না, সর্ব্বোপরি তিনি মানুষ



সাহদারা সমাধি-ভবন

MANASI PRESS, CALCUTTA.

ছিলেন। তাঁহার অনবদ্যসুন্দর দেহের অভ্যন্তরে অপরিমেয় স্নেহভরা মানবীর মন ছিল, যে মন প্রথমজীবনে, মনচোরের সহিত প্রথমদর্শন দিনে, এই জীবনের প্রথমানুভূতির দিনে অপহৃত হইয়াছিল এবং সে মনচোর ভারতের ভাবী সম্রাট ভুবনৈকসুন্দর কুমার সেলিম। সব্যসাচী অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত বজ্রসার লৌহশায়ক যেমন বসুধার বক্ষ বিদারণ করিয়া রণক্লিষ্ট যোদ্ধার তৃষ্ণার তৃপ্তিরূপিণী ভোগবতী ধারার সৃজন করে, অনঙ্গ-দেবতার করক্ষিপ্ত প্রথম পুষ্পশায়ক তেমনি মেহেরের হৃদয়পদ্মের মধুকোষ ভেদ করিয়া তাহার রাজকান্তের সর্ব্ববিধ তৃষ্ণানিবারণক্ষম অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় সুধাশীতল প্রেমরসের সৃজন করিয়াছিল। কিন্তু রাজরাজের দুর্ভাগ্য যে যথাসময়ে সে সুধার আস্বাদ পাইয়া তাঁহার মানব জীবনের সব আশা আকাঙ্ক্ষা মিটিতে পারে নাই, মেহেরেরও দুর্ভাগ্য যে জীবনসন্ধ্যায় যতটুকু তৃপ্তিদান করা সম্ভব তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা আশ্বাস শতবার করিয়া দিয়া নিয়াও সে সাধ মিটাইবার যথেষ্ট সময় হইল না। যে দিনে সেবা সাহচর্য্য সান্নিধ্য সঙ্গের বড় প্রয়োজন, সে দিনে তাঁহার মানসবিহারী রাজাধিরাজ, তাঁহার প্রিয় দয়িত, তাঁহার একান্ত বাঞ্ছিততম-রাজকান্ত, তাহার জীবন বান্ধব, পথের ধূলার উপরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অকুরান পথের পথিক হইয়া বাহির হইলেন। অতৃপ্ত তৃষার্ত্ত ক্ষুধিত হৃদয় লইয়া যে নারীকে আরও কিছুকাল এ সংসারে দুঃখের দিন যাপন করিতে হইয়াছিল, সে দিন যে কেমন করিয়া গিয়াছে তাহা সেই জানিত এবং তাহারই মত দুঃখীজনে জানে— অন্তর্য্যামী জানেন কি না সে কথা কে বলিয়া দিবে?

এই প্রিয়বিচ্ছেদ-কাতরা চিরবিরহিণী বিধবার বিপুল দুঃখের দিনে তাহার বিদ্যা-বুদ্ধি কবিত্ব কিছুই তাঁহাকে কোন শান্তি বা সান্ত্বনা দিতে পারে নাই; সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া তিনি তাঁহার শেষ নিষ্কৃতির দিনের দিকে তাকাইয়া বসিয়া ছিলেন এবং দুর্ব্বার মনঃক্লেশের তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের অক্ষরে যে সকল কবিতা সময়ে সময়ে তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহারই একতম আজও আমরা তাঁহার সমাধির উপরে দেখিতে পাইয়া অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারি না।

"বর্ মজারে মা গরীবাঁ না চিরাগে না গুলে,
না পরে পর্ওয়ানে আয়েদ্ না সদায়ে বুল্‌বুলে।"

হায়রে, সাগরান্তা ধরিত্রীর একাধীশ্বর জাঁহাপনা জাহাঙ্গীরের বাঞ্ছিততমা, প্রিয়তমা, প্রাণতমা, অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী প্রেমাশ্রিতা দয়িতার সুখদুঃখময় সুদীর্ঘ জীবনের পরিণাম কি এই দীর্ঘনিঃশ্বাস!

জীবনের প্রথম প্রভাত অরুণোদয়ে, যৌবনবসন্তের প্রথম দক্ষিণানিল-স্পর্শে তোমার ঈষদুদ্ভিন্ন-মঞ্জরী-হৃদয়বল্লরী তাহার আকাঙ্ক্ষিত আশ্রয়কে নিকটে পাইয়াও তাহাতে ভর করিয়া শোভা সৌন্দর্য্যে সুখে ও সুষমায় সার্থক হইতে পারে নাই - নানা বাধাবিঘ্নময় সংসারের কণ্টকপথে রুধিরাক্ত পদে চলিয়া দিনান্তের ঘনায়মান অন্ধকারের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে দু'দণ্ডের ঈপ্সিত মিলনে তোমার কোন তৃপ্তিই হয় নাই—পরলোক-প্রবাসী প্রিয়তমের মৃত্যুমন্দিরে স্বীয় দেহাবশিষ্টের সমাধি পাইবার প্রার্থনাও তোমার যথাকালে পূর্ণ হয় নাই! জীবন থাকিতে জীবিতনাথের সহিত তোমার মিলন যেমন আয়াসলব্ধ ও সুচিরাগত, জীবনান্তে ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া-নিষ্পন্নের স্থানটুকু লইয়াও সংসার তোমায় দুঃখ দিতে ছাড়ে নাই, নিজে মরিয়াও মৃতের পার্শ্বে স্থানটুকু পাইতে তোমার শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে!

হে প্রেম ও সৌন্দর্য্যের আদি-সৃষ্টি-স্বরূপিনী চির দুঃখিনী মেহের, এ সংসারে যাহা পাও নাই, এ জীবনে যাহা হয় নাই, লোক লোকান্তরে তাহা প্রাণ ভরিয়া পাইও, জন্ম জন্মান্তরের আনন্দের দিনে যেন বলিতে পার—

"রয়েছ নয়নে নয়নে
* * * *
তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই
কোন বাধা নাই ভুবনে।"

সমাপ্ত।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

বৈদেশিকী

ডেনমার্কের সঙ্কট।

(“ফর্ট্‌নাইটলি রিভিউ”, জানুয়ারি)

১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে য়ুরোপে লঙ্কাকাণ্ড আরম্ভ হইলে, অনেকেই ভাবিয়াছিলেন যে অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে জর্ম্মনি ডেনমার্কের দক্ষিণাংশ কাড়িয়া লইয়াছে বলিয়া, আজও তাহার বৈরশুদ্ধি বলবতী আছে। কিন্তু রুসো-জাপান যুদ্ধের পরে যেমন দুই শত্রুতে গলাগলি হইয়াছে, সেই রূপ জর্ম্মান-সম্রাট ও ডেনমার্ক-রাজে কোলাকুলি হইবে, এরূপ আশঙ্কা অমূলক নহে।

উত্তর সমুদ্র হইতে বল্টিক সাগরে যাইতে হইলে, সাউণ্ড, গ্রেট বেল্ট্‌ ও লিট্‌ল্‌ বেল্ট নামক তিনটি প্রণালী অতিক্রম করিতে হয়। সাউণ্ড দিয়া যাওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময় সাধ্য। এল্‌সিনোরের নিকট এই প্রণালীর বিস্তৃতি দেড় মাইল মাত্র। এই সাউণ্ডের তীরেই ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন নগরের দুর্গ। য়ুরোপীয় যুদ্ধের সময় দক্ষিণে ডার্ডেনেল্‌জ এবং উত্তরে কোপেনহেগেন করায়ত্ত থাকিলে, রুসিয়াকে তালা-চাবির মধ্যে রাখা যায়।

যে দিবস ইংলণ্ড ও জর্ম্মনিতে যুদ্ধ বাধিল, তাহার পরদিন প্রাতঃকালে জর্ম্মন গভর্মেণ্ট ডেনমার্কের উপর হুকুম জারি করে যে, উত্তর ও বল্টিক সমুদ্রের মধ্যস্থ প্রণালীগুলিতে বোমা ফেলিয়া, ব্রিটিশ রণতরীর বল্টিক অভিযানের পথ বন্ধ করিতে হইবে।

বেল্‌জিয়ম ও পোলাণ্ডের রণক্ষেত্রে যখন টিউটন ও স্লাভ বাহিনীর তাণ্ডব আরম্ভ হইল, তখন ডেনমার্ক, নরোয়ে ও সুইডেনের নরপতিত্রয়, য়ুরোপীয় আহবানল হইতে আত্মরক্ষার্থ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে, তাঁহারা কয়েকজন অমাত্য সমভিব্যাহারে, সাউণ্ডের নিকটবর্ত্তী মালমু নগরে সমবেত হন। সুইডেনের রাজা Gustav Bernadotte জাতিতে ফরাসী—তিনি নেপোলিয়ান বোনাপার্টের এক সেনাধ্যক্ষের প্রপৌত্র। ডেনমার্কের রাজস্ব-সচিব Edvard Brandes জাতিতে ইহুদী। অনেক বৎসর ধরিয়া নরোয়ে ও সুইডেন এক রাজ্যভুক্ত ছিল। কিছুকাল কলহের পর, ১৯০৫ সালে, ডেনমার্কের এক রাজকুমার নরোয়ের রাজ-সিংহাসন লাভ করেন। সুইডেনের সহিত নরোয়ে ও ডেনমার্কের মনোমালিন্য প্রায় স্থায়ী রকমের হইয়া উঠিতেছিল। রুসিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ড গ্রাস করিয়াছে বলিয়া, সুইডেন রুসের সর্ব্বনাশ কামনা করে। আবার শ্লেজ্‌ভিক্‌ হাতছাড়া হওয়ায়, জর্ম্মনি ডেনমার্কের চক্ষুশূল। সুইডেন রুসিয়াকে ভয় করে, নরোয়েকে ঘৃণা করে এবং জর্ম্মনিকে শ্রদ্ধা করে। ডেনমার্ক জর্ম্মনির নামে কাঁপে, নরোয়েকে স্নেহ করে এবং রুসিয়ার নিকট অনিষ্টের আশঙ্কা করে না। স্কাণ্ডিনেভিয় প্রতিনিধিগণের মধ্যে সংঘর্ষণের অনেকগুলি কারণ সত্ত্বেও, পাছে ক্ষুদ্র বেল্‌জিয়ামের মত, প্রবল প্রতিবেশীর কুক্ষিগত হইতে হয় এই ভয়ে, তাঁহারা কাজ চালান গোছের সদ্ভাব করিয়া লইলেন। স্থির হইল যে, বিপদের সময় তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিবেন এবং যুদ্ধনিরত জাতিগণের কোনও পক্ষ অবলম্বন করিবেন না।

ইংলণ্ডের প্রতি ডেনমার্ক বিশেষ অনুরক্ত নহে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মনি যখন ডেনমার্কের সর্ব্বনাশ করে, তখন ইংলণ্ড টুঁ শব্দ করে নাই। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ পার্কার, কোপেনহেগেনের উপর গোলা বর্ষণ করে, এবং ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে, ব্রিটিশরাজ, ডেনমার্কের সমস্ত রণতরি ও বাণিজ্যপোত অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ডেনমার্ক এ সকল কথা একেবারে ভুলিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

গত দেড় বৎসরের মধ্যে, জর্ম্মনি বা ইংলণ্ড কোপেনহেগেন দখল করিবার চেষ্টা করেন নাই বলিয়াই যে, উহার মস্তকের উপর খড়্গ ঝুলিতেছে না, ইহা মনে করা ভুল।

এখন ডেনমার্কের দক্ষিণে কীল খালে, জর্ম্মনির অধিকাংশ রণতরি আবদ্ধ রহিয়াছে। যদি ইংলণ্ড ও রুসিয়ার যুদ্ধ-জাহাজ একত্র হইয়া, জর্ম্মনির কোনও

অংশ আক্রমণ করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে কি কীল খালের রণপোতগুলি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে? জর্মনি তখন ইংলণ্ড ও রুসিয়ার একযোগে আক্রমণের পথে বিপুল বাধা দিবে। এই বাধা দিতে হইলে কোপেনহেগেন অধিকার করা একান্ত আবশ্যক। তখন এক দিকে পরাক্রান্ত ইংরাজ ও রুসিয়া, অপর দিকে দুর্ধর্ষ জর্মনি—দু'ধারের এই চাপে ডেনমার্ক ছাতু হইয়া যাইবে।

ডেনমার্কের জনসংখ্যা ত্রিশ লক্ষ অর্থাৎ কলিকাতা নগরের প্রায় তিনগুণ। ইহার স্থায়ী সৈন্য সংখ্যা মাত্র চৌদ্দ সহস্র। রাজাজ্ঞানুসারে সুস্থকায় যুবকদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে বাধ্য করা হয় বলিয়া, অতি সহজে দেড় লক্ষ ফৌজ সংগ্রহ করা যায়। জর্মন অক্ষৌহিণী দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়া, দু'এক দিনেই, ডেনমার্কের Esbjerg Kolding রেলওয়ে দখল করিতে পারে। তখন ইংলণ্ড বা ফ্রান্স হইতে কোপেনহেগেনের জন্য সাহায্য প্রেরণের পথে অনেক বিঘ্ন ও বিলম্ব ঘটিবে। এই সকল হিসাব করিয়াই ডেনমার্ক হয় ত' জর্মনির পক্ষ অবলম্বন করিতে পারে।

জন্সনের কথার কামড়।

("ফর্টনাইটলি রিভিউ", জানুয়ারি)

হক কথা ঠক করিয়া বলিলে, অনেক সময়, ডাক্তার জন্সনের ন্যায় মানবদ্বেষীর (Cynic) পর্যায়-ভুক্ত হইতে হয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। জন্সন বলিয়াছেন, "Women have a perpetual envy of our vices; they are less vicious than we, not from choice but because we restrict them .... Women set no value on the moral character of men, who pay their addresses to them; the greatest profligate will be as well received as the man of the greatest virtue, and this by a very good woman, who says her prayers, three times a day." অর্থাৎ পুরুষে ষড়রিপু চরিতার্থ করিয়া যে মজা লোটে, স্ত্রীলোকে তাহা দেখিয়া হিংসা করে ও ভাবে, হায় আমরা সাগরের তীরে তৃষ্ণায় ছটফট করিতেছি। স্ত্রীলোক যে পুরুষের চেয়ে কতক বিষয়ে ভাল, তাহা প্রবৃত্তির গুণে নহে, পুরুষের শাসনের ফলে। রমণীর, এমন কি শুদ্ধাচারিণী রমণীর, দাঁড়িপাল্লায়, কামজিৎ ও পাঁঠা-প্রকৃতি পুরুষের সমান ওজন।

স্ত্রীজাতির দায়ে পড়ে সতী হওয়া সম্বন্ধে এই উক্তি, সার রবীন্দ্রনাথের "দায়ে পড়ে মোহিনী হওয়া" স্মরণ করাইয়া দেয়। কবিবর লিখিয়াছেন:—"মেয়েরা জানে পুরুষ জাতটা স্বভাবতঃ ফাঁকি ভালবাসে, সেই জন্যে তারা পুরুষের কাছ থেকেই কথা ধার করে ফাঁকি সেজে পুরুষকে ভোলাবার চেষ্টা করে। তারা জানে খাদ্যের চেয়ে মদের দিকেই স্বভাব-মাতাল পুরুষ জাতটার ঝোঁক বেশী, এই জন্যেই নানা কৌশলে নানা ভাবে ভঙ্গীতে তারা নিজেকে মদ বলেই চালাতে চায়, আসলে তারা যে খাদ্য সেটা যথাসাধ্য গোপন করে রাখে। মেয়েরা বস্তুতন্ত্র, তাদের কোন মোহের উপকরণের দরকার করে না—পুরুষের জন্যেই ত' যত রকম বেরকম মোহের আয়োজন। মেয়েরা মোহিনী হয়েচে নেহাৎ দায়ে পড়ে।" ("সবুজ পত্র", ২য় বর্ষ, ২১৫ পৃষ্ঠা)।

ডাক্তার জন্সন তাঁহার বন্ধুবর্গকে বলিতেন যে, সমাজে প্রতিপত্তি অর্জ্জনের সর্ব্বপ্রধান পন্থা অনেক লোককে অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়া। একটু নাকি সুরে আবেদন শুনিলেই যিনি চেক সহি করেন অর্থাৎ যাঁহার মাথায় সহজেই পাকা কাঁঠাল ভাঙ্গিতে পারা যায়, মানুষ তাঁহার জন্য একটুও চক্ষুলজ্জা ("transient kindness") বোধ করে না, কিন্তু যাহার কাছে টাকা ধার করে, তাহার কাছে টিকি বাঁধা বলিয়া, লোকে শিষ্টাচার করিতে শৈথিল্য করে না।

ঋণ করিয়া আরাম ভোগ করা জন্সন ধৃষ্টতা মনে করিতেন। বাগ্মিবর এড্মণ্ড বার্ক, অনেক টাকা দেনা করিয়া, যে প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন, তাহা জন্সনকে দেখাইলে, তিনি শ্লেষ করিয়া বলেন, "What splendour! But to be sure you deserve it!" (আহা চমৎকার! ইহা নিশ্চয়ই হুজুরের উপযুক্ত!)।

রজতচক্রকে যাহারা মনে মনে সুদর্শন চক্রের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী মনে করে, কমলার কৃপালাভে অসমর্থ হইলে, তাহারাই কাঞ্চন-কৌলিন্যের বিপক্ষে অতিরিক্ত মাত্রায় চিৎকার করে। তাহারা ধনাঢ্যের অপদার্থ সন্তানকে, চিনির বলদ মনে করিয়া দয়া করে না, ভাগ্যবান মনে করিয়া হিংসা করে। জন্সনের মতে প্রতি দশজনের মধ্যে নয় জনের মনের ভাব এইরূপ। বিলাতের সর্ব্বপ্রধান ডিউক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষী এই দুই জনের নিকট হইতে একই সময়ে নিমন্ত্রণ আসিলে কোথায় যাওয়া উচিত, এই কথা জন্সনকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর

গৃহ-হীন

(১)

মাতব্বর চাষী গৃহস্থ গোবিন্দ দাসের পুত্র মহেশ দাসকে দেখিয়া কেহ বলিতে পারিত না যে, সে কলি-কালের মানুষ; কিন্তু তাহাকে সত্য যুগের মনুষ্য বলিয়া ভ্রম হইবারও কোন কারণ ছিল না। ক্ষুদ্র ফতাই-পুর গ্রামে তাহার বাস।—তাহার পিতা একজন সম্পন্ন চাষী গৃহস্থ ছিল, এবং তাহার আঙ্গিনাস্থিত ধানের গোলা দু'টি ধানে পূর্ণ থাকিত; দু'খানি লাঙ্গল, চারি-জোড়া লাঙ্গলা বলদ, দুইটি গাই গরু; 'থাদা'থানেক ধানের জমী, দু'খানি চৌরী ও একখানি গোয়ালঘর;—এবং একখানি পাকশালা—পল্লীগ্রামে চাষী গৃহস্থের যাহা যাহা থাকা আবশ্যক,--সমস্তই রাখিয়া মহেশ দাসের পিতা গোবিন্দ দাস তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষ্যে বৃন্দাবনধামে গিয়া ভবের খেলা সাঙ্গ করে। তাহার দুই বৎসর পূর্ব্বে মহেশ দাসের কন্যা গৌরীর জন্ম হয়।

পিতার মৃত্যুর পর মহেশ দাস চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল।—বয়স বত্রিশ বৎসর হইলেও এ পর্য্যন্ত সে লাঙ্গল বহা ও গোরুর রাখালী করা ভিন্ন আর কিছুই শিখিতে পারে নাই; তবে সে তামাক সাজিতে ও তাহাদের ঘরামীপাড়ার বেহুলার দলে লখিন্দর সাজিয়া ভাঙ্গা গলায় বক্তৃতা করিতে খুব ওস্তাদ হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর সে কাছা গলায় দিয়া তাহার প্রধান মুরুব্বি ও 'মেণ্টর' জগবন্ধু দাসকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন করি কি?"—জগবন্ধু বলিল, "খুব ধুমধামে বাপের ছেরাদ্দ কর।"—কিন্তু শ্রাদ্ধটা যে কতদূর গড়াইবে—জগবন্ধু তাহা ঠাহর করিতে পারিল না, কিংবা সে সম্বন্ধে চিন্তাও করিল না। এক শ্রেণীর লোক আছে তাহাদের 'মটো'—"মোর বুদ্ধি তোর কড়ি, ফলার করি আয়!" এই ফলারে বুদ্ধিতে জগবন্ধু দাস তাহাদের গ্রামের কৈবর্ত্ত সমাজে অদ্বিতীয় ছিল।

গৌরীর মা কাদি কৈবর্ত্তিনী সিক্ত বস্ত্রে সিক্ত কেশে উঠানে বসিয়া তিনটা জিউলি কচার ডালের উপর একটা মালসা রাখিয়া অরহর কাষ্ঠের অগ্নিতে 'হবিষ্যি' পাকাইতেছিল।—মহেশ দাস দীঘিতে স্নান করিয়া আসিয়া তাহার গলার কাছাখানি পরিধান করিল, এবং পরিহিত কাছাখানি প্রসারিত উভয় বাহুর উপর ছড়াইয়া দিয়া পাখীর ডানা ঝাড়ার মত করিয়া, তাহা সবেগে আন্দোলিত করিতে করিতে গৌরীর মাকে বলিল, "দেখ্, দেখ্তে দেখ্তে দশদিন ত কেটে গেল। আঃ শীতকালে মা বাপ মরা কি ফ্যাসাদ; জাড়ের (শীতের) ঠ্যালায় বুকের ওপর য্যানো ঢেঁকিতে পাড় পড়চে! জলের য্যানো দাঁত বেরিয়েছে, কি জাড় রে বাবা!—তা দেখ্ গৌরীর মা, বেঁচে থাক্লে আওলাৎ পত্তর ঢের হবে।—বাবা কিছু ফিরে আস্বে না। জগো দা বল্‌ছিল, পাঁচগাঁয়ের দশ ঠাকুরকে ফলারটা ভাল করে দিতে হবে।—গোলার ধানগুলো বের করে কতক চিঁড়ে কুট্‌তে দে, কতক মুড়ির জন্যে সেদ্দ-কর। আমাদের কুলে এঁড়েটা দেগে 'বিষোচ্ছুগ্গু' (বৃষোৎসর্গ) করবো। আর রাঢ় থেকে, কি বলে ওর নাম, নটোবর দাসের কেত্তনের দলটা আন্‌বো মনে করেছি।—চব্বিশ পহর করার ইচ্ছেটা আমার বড্ড বেশী।—তা আমাকে কিছু ভাব্‌তে হবে না, জগদা সব ভার নিতে চেয়েছে।—দশ ট্যাকা খরচ হবে, তা বলে আর কি কর্‌চি? বাপের ছেরাদ্দ ত একবার বই পাঁচবার হবে না।"

গৌরীর মা মাল্‌সার নীচে খানদুই খড়ি ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "কেত্তনের দল আন্‌তে চাইচ, কত ট্যাকা খরচ হবে?"

মহেশ দাস শুষ্কপ্রায় কাছাখানি পরিধান করিতে করিতে বলিল, "তা স গাড়েক ট্যাকাত লাগবিই, তাতে পার পেলে হয়!"

পুত্র-হীন

মাতব্বর চাষী গৃহস্থ গোবিন্দ দাসের পুত্র মহেশ দাসকে দেখিয়া কেহ বলিতে পারিত না যে, সে কলিকালের মানুষ; কিন্তু তাহাকে সত্য যুগের মনুষ্য বলিয়া ভ্রম হইবারও কোন কারণ ছিল না। ক্ষুদ্র ফতাই-পুর গ্রামে তাহার বাস।—তাহার পিতা একজন সম্পন্ন চাষী গৃহস্থ ছিল, এবং তাহার আঙ্গিনাস্থিত ধানের গোলা দু'টি ধানে পূর্ণ থাকিত; দু'খানি লাঙ্গল, চারিজোড়া লাঙ্গলা বলদ, দুইটি গাই গরু; 'থালা'খানেক ধানের জমী, দু'খানি চৌরী ও একখানি গোয়ালঘর;—এবং একখানি পাকশালা—পল্লীগ্রামে চাষী গৃহস্থের যাহা যাহা থাকা আবশ্যক,—সমস্তই রাখিয়া মহেশ দাসের পিতা গোবিন্দ দাস তীর্থপর্য্যটন উপলক্ষ্যে বৃন্দাবনধামে গিয়া ভবের খেলা সাঙ্গ করে। তাহার দুই বৎসর পূর্ব্বে মহেশ দাসের কন্যা গৌরীর জন্ম হয়।

পিতার মৃত্যুর পর মহেশ দাস চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল।—বয়স বত্রিশ বৎসর হইলেও এ পর্য্যন্ত সে লাঙ্গল বহা ও গোরুর রাখালী করা ভিন্ন আর কিছুই শিখিতে পারে নাই; তবে সে তামাক সাজিতে ও তাহাদের গয়লাপাড়ার বেহুলার দলে লখিন্দর সাজিয়া ভাঙ্গা গলায় বক্তৃতা করিতে খুব ওস্তাদ হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর সে কাছা গলায় দিয়া তাহার প্রধান [illegible] ও 'মেণ্টর' জগবন্ধু দাসকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন করি কি?"—জগবন্ধু বলিল, "খুব ঘুমধামে বাপের ছেরাদ্দ কর।"—[illegible] কথাটা যে কতদূর [illegible] ভাইবে—জগবন্ধু তাহা [illegible] করিতে পারিল না, [illegible]

গৌরীর মা কাদি কৈবর্ত্তিনী [illegible] রোদে উঠানে বসিয়া তিনটা ঝিউলি কলার ডালের উপর একটা মাদুর রাখিয়া অরহর কাঠের আগুনে 'হবিষ্যি' পাকাইতেছিল।—মহেশ দাস দীঘিতে স্নান করিয়া আসিয়া, তাহার গলার কাছাখানি পরিধান করিল, এবং পরিহিত কাছাখানি প্রসারিত উভয় বাহুর উপর ছড়াইয়া দিয়া পাখীর ডানা ঝাড়ার মত করিয়া, তাহা সবেগে আন্দোলিত করিতে করিতে গৌরীর মাকে বলিল, "দেখ্, দেখ্তে দেখ্তে দশদিন ত কেটে গেল। আঃ শীতকালে মা বাপ মরা কি ফ্যাসাদ; জাড়ের (শীতের) ঠ্যালায় বুকের ওপর য্যানো ঢেঁকিতে পাড় পড়চে। জলের য্যানো দাঁত বেরিয়েছে, কি জাড় রে বাবা!—তা দেখ্ গৌরীর মা, বেঁচে থাক্লে আওলাৎ পত্তর ঢের হবে।—বাবা কিছু ফিরে আস্বে না। অগো দা বল্ছিল, পাঁচগাঁয়ের দশ ঠাকুরকে ফলারটা ভাল করে দিতে হবে।—গোলার ধানগুলো বের করে কতক চিঁড়ে কুটতে দে, কতক মুড়ির জন্যে সেদ্ধ কর। আমাদের কুলে এঁড়েটা দেগে 'বিষোচ্ছুগ্গু' (বৃষোৎসর্গ) করবো। আর রাঢ় থেকে, কি বলে ওর নাম, নটোবর দাসের কেত্তনের দলটা আন্বো মনে করেছি।—চব্বিশ পহর করার ইচ্ছেটা আমার বড্ড বেশী।—তা আমাকে কিছু ভাব্তে হবে না, জগদা সব ভার নিতে চেয়েছে।—দশ টাকা খরচ হবে, তা বলে আর কি করচি? বাপের ছেরাদ্দ ত একবার বই পাঁচবার হবে না।"

গৌরীর মা রান্নাঘরের নীচে থালাহই [illegible] ঠেলিয়া [illegible] কেত্তনের দল আনিতে চাহিছ, কত টাকা [illegible]

[illegible] কাছাখানি পরিধান করিতে

গৌরীর মা চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "সে ক কুড়ি ট্যাকা ?"

মহেশ দাস বলিল, "ফেল্লি আবার নিকেশের তলায় !—জগদা বলেছে—স ত্যাড়েক টাকাতেই হতি পারে। ত্যাড়শো টাকা যে ক কুড়ি, তা কি তাকে জিজ্ঞেস করেছি ? তা দশ-বারো কুড়ি হতি পারে।"

গৌরীর মা টাকার পরিমাণ শুনিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিল, "দশ বারো কুড়ি ট্যাকা ! আমরা গরীব মানুষ, দু'বিগে চাষ আবাদ করে গেরস্তালি চালাই, এত ট্যাকা কুতায় পাবো ?"

মহেশ দাস রাগ করিয়া বলিল, "রাজারা হাতী ঘোড়া কোথায় পায় ? আমার একখাদা জমি, আট দশটা গরু। ট্যাকার ভাবনা কি ?—গুপি পোদ্দার বলেছে ট্যাকায় চার পয়সা সুদ দিলে এ সব বন্ধক রেখে যত ট্যাকা লাগে—সে দেবে। জগদাই ট্যাকা নিয়ে দেবে।"

গৌরীর মা ললাটে করাঘাত করিয়া বলিল, "তবেই হয়েছে ! এই ছরাদেই তুমি ফতুর হবা।" সে আঁখোট কলাপাতে মালসার হবিষ্যান্ন ঢালিয়া একতাল মটরের ডাল-বাটা সিদ্ধ ও আধখানা কাঁচাকলা সিদ্ধ ছানিতে আরম্ভ করিল।

একে এত বেলা পর্য্যন্ত অনাহার,-তাহার উপর পত্নীর মর্ম্মভেদী বাক্যবাণ !—মহেশ দাস একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। সে সক্রোধে বলিল, "তোর বাপের ছেরাদ্দ হলে আর একথা বল্তি নে। আমার বাপের ছেরাদ্দ কি না, তাই ট্যাকা খরচের নাম শুনে আঁত্‌কে উঠছিস্‌। আমি আমার বাপের ট্যাকা খরচ করব।—তোর বাপের ঘরে ত আর সিঁদ দিতে যাচ্ছি নে।"

গৌরীর মা চটিয়া বলিল, "আমোলো শগুন, যত বড় মুখ নয়—তত বড় কথা ! আমার বাপ তুলছিস ? আমার বাপের ছেরাদ্দ করতে চাস্‌! মুখে না নুড়ো জ্বেলে দেব। অলপ্পেয়ে ড্যাক্‌রা মিন্‌সে !"

মহেশ দাস চাবি বাঁধা উত্তরীয়খানি তাড়াতাড়ি কোমরে জড়াইয়া সক্রোধে বলিল, "তবে রে হারামজাদি !—আমার খাবি পরবি—আবার আমাকেই গাল ? আয়, আগে তোরই ছেরাদ্দ করি।"—সে তাহার সহধর্ম্মিণীর রুক্ষ চুলের গোছা ধরিয়া একটানে তাহাকে চিৎ করিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিল। তাহার পর 'হবিষ্যের মুখে বাদার বাড়ি' বলিয়া অদূরবর্ত্তী মালসাটা তুলিয়া লইয়া তাহা সবেগে সেই কদলিপত্রস্থিত হবিষ্যান্নের উপর নিক্ষেপ করিল।

গৌরীর মা উঠানে পড়িয়া "বাবারে, মেরে ফেল্লেরে, এমন হাভাতের হাতেও পড়েছিলাম !"—ইত্যাকার আর্ত্তনাদে পাড়ার লোক জড় করিতে লাগিল।—কানকাটা একটা কালো বেঁড়ে কুকুর কিছু দূরে বসিয়া এক একবার লুব্ধনেত্রে কদলীপত্রস্থিত সুলোহিত আতপান্নের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল,—এইবার সুযোগ বুঝিয়া সে একলম্ফে আসিয়া 'হবিষ্যি' আরম্ভ করিয়া দিল।

শ্রাদ্ধ উপস্থিত না হইতেই শ্রাদ্ধ এইরূপে অনেক দূর গড়াইল।—গৌরীর মা সেইদিন অপরাহ্ণে গৌরীকে কোলে লইয়া মবারকপুরে বাপের বাড়ী চলিল।

(২)

কিন্তু শ্রাদ্ধ আটক রহিল না। মহেশ দাসের পরমাত্মীয় ও পরামর্শদাতা জগদা বলিল, "মরদ কি বাৎ, আর হাতী কি দাঁত!—হাতী কি না, তা দাঁত দেখলেই বুঝতে পারা যায়, আর মরদ কি না তা কথাতেই মালুম হয়।—পরিবার গোসা করে বাপের বাড়ী গিয়েছে, যাক্‌; যত টাকা লাগে খরচ করে বাড়ীতে দশ ঠাকুরের পাতা পাড়াও।—আর কেত্তন; বৈষ্টব সেবা, দশটা কাঙ্গালী বিদেয় এ করা চাই-ই। গোবিন্দ খুড়ো স্বর্গে থেকে দেখ্‌বে, হাঁ, ছেলে বটে, ছরাদের মত ছরাদ করেচে !"

মহেশ দাস সোৎসাহে পিতৃ-শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। গৌরীর মা রাগ করিয়া বাপের বাড়ী গিয়াছিল, কিন্তু লোকের গঞ্জনায় সেখানে দু'দিনের

বেশী থাকিতে পারিল না; স্বামীগৃহে ফিরিবার সময় তাহার মা, মাসী এবং ছোট ভগিনীটিকে সঙ্গে লইয়া আসিল। দিবারাত্রি ঢেঁকি পড়ার শব্দে পাড়ার লোকের মাথা নড়িতে লাগিল।

কিন্তু হঠাৎ একটা গোল বাধিয়া গেল। তাহার হিতৈষী মুরুব্বি জগদাকে সঙ্গে লইয়া সে গ্রামের সর্ব্বপ্রধান উত্তমর্ণ গোপী পোদ্দারের নিকট দলিল দিয়া টাকা ধার পাইল না!—গোপী পোদ্দার বড় হিসাবী লোক; টাকায় চারি পয়সা হিসাবে সুদ খাইয়া তাহার উদর অসম্ভব রকম স্থূল হইয়াছিল। গোপীনাথ পোদ্দার পরম বৈষ্ণব; দাড়ি গোঁফ কামান; হাঁড়ীর মত গোল মুখখানিতে বয়স্তের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন; নাকের উপরে সুদীর্ঘ তিলক; কণ্ঠে তিনকণ্ঠি স্থূল তুলসীর মালা। পরিধানে আটহেতে একখানি নরুণপেড়ে ধুতী; ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতশালা হইতে বাহির হইয়া এ পর্য্যন্ত তাহার রজকালয় দর্শনের সুযোগ হইয়াছে কি না সন্দেহ; সুতরাং যৎপরোনাস্তি ময়লা,—তদ্দ্বারা তাহার বিশাল উদরের বর্ত্তুল-পরিধি কোনরূপে পরিবেষ্টিত হইয়াছে; কাছা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে নাই, অগত্যা পোদ্দার মশায় মুক্ত কাছ!—অপরাহ্ণ কালে গোপীনাথ তাহার 'কাঁচা' চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসিয়া পরকালের জন্য কিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চয়ের চেষ্টায় ভাগবত গ্রন্থখানির পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে ইহকালের সঞ্চয়ের কথাই চিন্তা করিতেছিল; এবং কাহার নিকট কত সুদ বাকি আছে, কে কোন্ কিস্তী খেলাপ করিয়াছে, ও পরদিন প্রভাতে উকীলবাড়ী গিয়া কোন্ কোন্ খাতকের নামে নালিশ রুজু করিবে, তাহাই ভাবিতেছিল; এমন সময় রুক্ষকেশ, মলিন বদন মহেশ দাস কাছা গলায় তাহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। অশৌচবশতঃ সে তাহাকে নমস্কার না করিলেও জগবন্ধু দাস তাহার পায়ের কাছে মাথা নোয়াইয়া একপাশে খুঁটির মত দাঁড়াইয়া রহিল। পোদ্দার পুঁথি হইতে মুখ তুলিয়া ডালভাঙ্গা সুতাবাঁধা চস্‌মাখানির ভিতর দিয়া জগবন্ধুর মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর হাঁই তুলিয়া তুড়ি দিয়া বলিল, "হরি হে দীনবন্ধু! পার কর ভবসিন্ধু;—তারপর জগবন্ধু, কি মনে করে এমন অবেলায়?"

জগবন্ধু বিনীতভাবে ঘাড় চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "এজ্ঞে কর্ত্তা, আপনার ছিচরণ দর্শন করতে আস্‌বো, তার আর সকাল সন্ধ্যে কি?—আপনি ত জানেন আমাদের মহেশ দাসের বাপ ছিবিন্দাবনধামে গিয়ে কৃষ্টপ্রাপ্তি হয়েছেন; তা, তার ছেরাদ্দর আর দিন নেই। আপনার ভরসাতেই ময়শা দশ ঠাকুরকে নেমন্তন্নো—"

গোপীনাথ বাধা দিয়া বলিল, "এ অতি উত্তম কাজ। বাড়ীতে দশজন কুটুম্বের পায়ের ধূলো পড়ে, এ কি কম ভাগ্যের কথা?—কিছু টাকা ধার নেবে বুঝি?—মহেশের বাপের 'আবস্তা' বেশ ভালই ছিল।—সোণাদানা কিছু এনেছে? আমি কিন্তু টাকায় চার পয়সার কম সুদে টাকা ধার দিইনে। মহাজনী কারবার—ঝকমারি কত? নালিশ ছাড়া আজকাল টাকা আদায় করা মুস্কিল!—আর নালিশ করতে গেলেই, বুঝ্‌ছো কি না, উকীল বেটারা রাঘব বোয়ালের মত হাঁ করে আছে! উকীলের মুহুরী বলে তহরি দাও, হাকিমের পেস্কার বলে 'দাখিলী' দাও; সুদ তো চুলোয় যাক্, আসল নিয়ে টানাটানি! যেন টাকার জলছত্র খুলে বসেছি!—মহাজনী কারবারে আর সুখ নেই!"

জগবন্ধু বলিল, "ওর বাপের সোণা রূপো যে দশ তোলা ছিল, তা সে তিথ্যি করতে যাবার সময় বেচে কিনে চলে গিয়েছিল। থাকবার মধ্যে আছে গোটা আষ্টেক দশেক গরু, খান দুই লাঙ্গল, আর খাদা খানেক ভুঁই।"

পোদ্দার বলিল, আরে ভুঁই ত জমিদারের; চাষ করে, উঠ্‌বন্দি জমীর খাজনা দেয়, আজ আছে কাল নেই; সে জমী আবার বন্দক কি দেবে?—পাকা মাল ছাড়া আমি বন্দক রেখে টাকা ধার দিইনে।—আর যে গরুটা বাছুরটার কথা বল্‌ছো ও ত মুচির চাম্‌ড়া! বিশেষ হালের গরু বন্দক রেখে আজ কাল কি নালিশ করে

টাকা আদায় করবার যো আছে ?—আমার কাছে হবে টবে না ; দেখ যদি আর কোথ্ পাও।”

গোপী পোদ্দারের মন কিছুতেই নরম্ হইল না। অগত্যা জগবন্ধুকে বেকুব হইয়া বাড়ী ফিরিতে হইল। মহেশদাস বাড়ী আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল। চিঁড়া কুটিবার ‘ধপাধপ্’ শব্দ শুনিয়া তাহার মনে হইল, ঢেঁকির ‘চুরুণ’ তাহার মাথায় পড়িতেছে। সে দশদিক অন্ধকার দেখিল !—এখন উপায় ?—জগবন্ধু তাহাকে পূর্ব্বে আশা দিয়াছিল, গুপি পোদ্দার টাকা হাতে লইয়া বসিয়া আছে, চাহিতে যে কিছু বিলম্ব ! জগবন্ধুর উপর সে বিষম ‘ব্যাজার’ হইয়া উঠিল।

(৩)

পৃথিবীতে কিছুই আটক থাকে না। মহেশ দাসের পিতৃশ্রাদ্ধও বন্ধ হইল না। মহা সমারোহে শ্রাদ্ধ শেষ হইল। শ্রাদ্ধান্তে তাহার আঙ্গিনায় নৌকার পাল টাঙ্গাইয়া তাহার নীচে রাঢ়ের কীর্ত্তনওয়ালা নটবর দাস দুইদিন কীর্ত্তন করিয়া গেল। কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে সুদখোর গুপি পোদ্দারের মুহুর্মুহু ভাব লাগিতে লাগিল, এবং সে ভাবাবেশে বিভোর হইয়া কয়েকবার ‘খুলী’কে আলিঙ্গন করিতে গেল ! ভক্তি বিহ্বল গুপি পোদ্দারের বিশাল ভুঁড়ির সংঘর্ষণ হইতে মৃদঙ্গখানি রক্ষা করিবার জন্য, ভীতি ব্যাকুল খুলী যতই সরিয়া যায়, গুপি পোদ্দার ততই উৎসাহের সহিত ‘অহঃ’ ‘অহঃ’ বলিয়া ভাবাতিশয্যে তাহার দিকে অগ্রসর হয়। চোখের জলে তাহার গোলগাল ক্কালো গাল দুখানি ভাসিয়া গেল। মুহুর্মুহু হরিধ্বনিতে ক্ষুদ্র ফতাইপুর গ্রাম সঘন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কীর্ত্তন শেষ হইলে গুপি পোদ্দার সতরঞ্চির ধূলা তুলিয়া কণ্ঠে ওষ্ঠে মস্তকে ধারণ করিল। মহেশ দাসকে বলিল, “ধন্যি ভাই, বাপের ছেরাদ্দটা তুমিই কল্লে ! আমরা মিথ্যে মনিষ্যি হয়ে জন্মেছি।”

কিন্তু শ্রাদ্ধ শেষ করিতে মহেশদাসকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইল। তাহার ধান, গোলা, গরু, বাছুর যাহা কিছু ছিল, সমস্ত বিক্রয় করিয়া শ্রাদ্ধের খরচ যোগাইতে হইল। দুইখানি কুটীর ভিন্ন তাহার আর কিছু সম্বল রহিল না। অবশেষে পৌষমাসের একদিন রাত্রিকালে মহেশ দাসের প্রতিবেশী অঘোর দাসের গোয়াল ঘরে ‘সাঁজালের’ আগুন লাগিয়া তাহার সেই ঘর দুইখানিও এন্ধার কুক্ষিগত হইল। মহেশ দাস পথে বসিল।

বিপন্ন মহেশ দাস তাহার মুরুব্বি জগবন্ধু দাসকে জিজ্ঞাসা করিল, “জগদা, এখন করি কি ?—তোমার বুদ্ধিতেই ত আমি মারা গেলাম।”

জগবন্ধু দাস তখন তাহার খর্জ্জুর পত্রাচ্ছাদিত ‘বাইনে’ বসিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুইখানি খোলায় খেজুরের রস জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করিতেছিল ; এবং শতধাছিন্ন মলিন চাদর গলায় জড়াইয়া ও তদ্দ্বারা কোনরূপে পিঠ ঢাকিয়া, দুর্জ্জয় শীত-কম্পিত পল্লীবালক দল ‘খোলা’র চারিদিকে বসিয়া বহ্নি সেবন করিতেছিল। কেহ কেহ বা শুষ্ক আখ্খাওড়া ও ভাটবাকসের স্তূপ হইতে খড়ি টানিয়া প্রকাণ্ড চুলির মুখে নিক্ষেপ করিতেছিল ; আর খোলার লোহিতাভ খর্জ্জুররস টগবগ করিয়া ফুটিতেছিল। অদূরবর্ত্তী ছাই গাদায় একটা খেঁকিকুকুর কুণ্ডলী পাকাইয়া নিমীলিতনেত্রে শয়ন করিয়াছিল, এবং তাহার শাবক চতুষ্টয় জগবন্ধুর আস্তাকুড়ে দুই একটি উচ্ছিষ্ট অন্নের আশায় ব্যাকুলভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। জগবন্ধু সবেমাত্র তাহার গেঁটে কল্‌কেটাতে একটু দাকাটা তামাক দিয়া ধূমপানের আয়োজন করিয়া লইয়াছে,—এমন সময় মহেশ দাসের উদ্ভট প্রশ্নে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।—সে একখানি জ্বলন্ত খড়ি উনান হইতে টানিয়া তুলিয়া তাহার দুই এক টুক্‌রা কলিকায় তুলিতে তুলিতে মহেশ দাসকে বলিল, “আমার দোষ ত তুমি এখন দিবাই ! এ কলিকালে কি লোকের ভাল কর্‌তে আছে ? আমি কি তোমাকে বলেছিলাম—সব্বস্বি ঘুচিয়ে তোমার বাপের ছরাদ্দ কর ?—না, আমি তোমার ঘরে আগুন দিতে গিয়েছি ? বাপের ছরাদ্দ করলে, বাড়ীতে দশঠাকুরের পায়ের ধূলো পড়লো, কেত্তন দিলে, এ তল্লাটের লোক তোমার সুখ্যাতি কর্‌তে লাগলো ; আর এখন অখ্যাতি করে বেড়াচ্ছ আমার ? আগুনে ত তোমার সবই যেত, তা আগুনে না পুড়ে—

তোমার বাপের ছরাদে গিয়েছে, সে ত তোমার বাপের ভাগ্যি!—আমার দোষ দেও কেন?"

মহেশ দাস সবিনয়ে বলিল, "না, তোমার দোষ দিচ্ছিনে; তবে এখন কুতায় মাথা রাখি তাই পুছচি।—এ গাঁয়ে ত আমার মাথা রাখবার ঠাঁই নেই।"

জগবন্ধু তামাকে একটা উৎকট দম্ কষিয়া নাক মুখ দিয়া আগ্নেয়গিরির ধূম্রোদ্গারের ন্যায় ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, "তুমি কি উপায় করবে, তা আমি কি বলবো? তোমার মত আহাম্মুখকে শলা পরামর্শ দেওয়াও ঝক্‌মারি!—গাছতলা ত আর কেউ নেয়নি। তোমার ভিঁটেয় যে তেঁতুল গাছটা আছে, তার ওতে খেজুর পাতার খানদুই টাঁটি বেঁধে, এখনকার মত থাক গে। তারপর তোমার পরিবারের হাতের খাড়ু দুগাছা বেচে গাড়ীখানেক খড় কিনে একখান কুড়ে তুলো।—কেন, পরাণ মণ্ডল কি তোমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে?"

পরাণ মণ্ডল মহেশ দাসের সম্বন্ধে মামা শ্বশুর; গৃহহীন হইয়া মহেশ দাস তাহার বাড়ীতেই আশ্রয় লইয়াছিল। পরাণ মণ্ডল ঘরামীর কাজ করিয়া কষ্টে সৃষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। বাড়ীতে তাহার দুইখানি মাত্র ঘর, তাহার সংসারে অনেকগুলি পরিবার, স্ত্রী, চারি পাঁচটি ছেলে মেয়ে, একটি ছোট ভাই, একটী বিধবা ভগিনী এবং বাতব্যাধিগ্রস্তা স্থাবর শাশুড়ী। এতগুলি পরিবারের দুইখানি ঘরে স্থান সঙ্কুলান হওয়া কঠিন, তাহার উপর চক্ষুলজ্জার খাতিরে এই বিপন্ন পরিবারটিকে আশ্রয় দান করিয়া, সে বিষম বিপদে পড়িয়াছিল; সে মহেশকে সঙ্গে লইয়া কয়েকদিন জোগালে-গিরিতে লাগাইয়াছিল। কিন্তু মহেশ দাস এমন অকর্ম্মণ্য যে, খড়ের আটিটি পর্য্যন্ত বাঁধিতে পারিত না, তাহাকে দিয়া কোন কাজ পাওয়া যায় না দেখিয়া গৃহস্থেরা ঘরামীকে তিরস্কার করিত, কেহ কেহ বলিত, "এমন একেজো জোগালে নিয়ে বাপু কাজে এসো না।—দুপোর গড়াতে না গড়াতে চারগণ্ডা পয়সা নিয়ে বাড়ী যাবে, চারটি পয়সার কাজ করতে পারবে না!"—প্রমাদ গণিয়া পরাণ মণ্ডল মহেশ দাসকে বলিয়াছিল, তুমি বাপু তোমার পথ দেখ, আমি আর কতদিন তোমাকে পুষবো?"

কিন্তু কোনদিকে পথ দেখিতে না পাইয়া মহেশ দাস নিরুপায় হইয়া আজ তাহার মুরুব্বি জগবন্ধু দাসের নিকট সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছে। জগবন্ধু তাহাকে গাছের তলা দেখাইয়া দিল।

মহেশ দাসের এ পরামর্শটা ভাল লাগিল না। সে বলিল, "পৌষমাসের এই হাড়ভাঙ্গা শীতে কুকুরটা মেকুরটা (বিড়াল) গাছতলায় থাক্‌তে পারে না, আর তুমি আমাকে গাছতলায় আশ্রা নিতে বলছো। আমরা নয় দুটোতে ক্যাথা মুড়ি দিয়ে থাক্‌লাম। গৌরী আমার দু'বছরের মেয়ে সে যে হিমে মরে যাবে।"

জগবন্ধু বিরক্তি ভরে বলিল, "তা এখন রাজ অট্টালিকে কুতায় পাবে? আমার বলে, 'আপনি শুতে ঠাই পায় না, শঙ্করকে ডাকে!'—আমি নিজের ভাবনায় পথ দেখ্‌তে পাইনে, তোমাকে কি পথ দেখাব বল?"

(৪)

মহেশ দাস নিরুপায় হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক সেখান হইতে উঠিল। আজ পৃথিবী তাহার নিকট অন্ধকার। দুর্ভাগ্যের ফুৎকারে যেন জীবনের সকল আলোক নিভিয়া গিয়াছে। একদিন যাহারা তাহার সর্ব্বপ্রধান সুহৃদ ও পরামর্শদাতা ছিল, তাহারা আজ তাহাকে দেখিয়া অবজ্ঞাভরে সরিয়া যাইতেছে, কেহ বা তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার নিন্দা করিতেছে, তাহার পিতৃশ্রাদ্ধের সময় যাহারা পরমাত্মীয় হইয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল, দুর্দ্দিনের ঝটিকার ফুৎকারে শুষ্ক বৃক্ষপত্রের মত তাহারা কোথায় অদৃশ্য হইল।

একখানি ছেঁড়া ন্যাকড়ায় গৌরীর সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া তাহাকে কোলে লইয়া গৌরীর মা পরাণ মণ্ডলের পাচিলের ধারে বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল, কিন্তু ভাবনার কুল কিনারা পাইতেছিল না। অবশেষে সে ময়লা অঞ্চলে চোখের জল মুছিয়া মেয়েটাকে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল। তখন বেলা হইয়াছিল; গ্রামের মজুরেরা নিজের নিজের কাজে গিয়া-

ছিল, গোরুর পাল লইয়া রাখালের দল অনেকক্ষণ মাঠে চলিয়া গিয়াছে। ছুঁড়োরা মূলো, বেগুন, সাদা-আলু প্রভৃতি বড় বড় ঝোড়ায় বোঝাই করিয়া গ্রাম হইতে লক্ষ্মীপুরের হাটের দিকে দৌড়াইতেছিল, এবং অদূরবর্ত্তী দীঘির জলে জেলেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খ্যাপলা জাল দিয়া চিংড়ি পুঁটি প্রভৃতি মাছ ধরিতেছিল।

মহেশ দাস মুখ ভার করিয়া স্ত্রীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। গৌরীর মা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি করে এলে? মামী ত আজ জবাব দিয়েছে, বলেছে, 'তুমি পথ দেখ বাছা! আমি আর কদিন তোমাকে পুষবো?'—চল আমরা এ গাঁ থেকে চলে যাই।"

মহেশ দাস হতাশভাবে বলিল, "কোথায় যাব? আমাদের যে মাথা রাখবার ঠাঁই নেই।"

গৌরীর মা বলিল, "আমাদের যে দুখানা পেতল কাঁসার বাসন আছে, নিয়ে মায়ের কাছে যাই, তার কুঁড়েখানা ত আছে।"

মহেশ দাস অগত্যা সেই যুক্তিই সঙ্গত মনে করিল। সেইদিনই সে সপরিবারে চিরজীবনের মত গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিল। ফতাইপুরের তিনক্রোশ দূরবর্ত্তী মবারকপুরে যাত্রা করিল। গৃহদাহের পর তাহার যে কিছু তৈজসপত্র বাঁচিয়াছিল, তাহা ও দুই একখানি কাপড় চোপড় লইয়া একটা বোঁচকা বাঁধিয়া মহেশ দাস তাহা মাথায় তুলিয়া লইল, এবং গৌরীর মা গৌরীকে কোলে লইয়া তাহার অনুসরণ করিল। তখন বেলা প্রায় দশটা, গ্রামের ভিতর দিয়া কিছুদূর যাইয়া তাহারা মাঠে পড়িবে, এমন সময় গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী কলুপাড়ার পথে আসিয়া মহেশ দাস শুনিতে পাইল—কলুবাড়ীতে তখনও 'বেহুলা'র গান চলিতেছে। কলু-বাড়ীর প্রাঙ্গণে একখানি জীর্ণ সামিয়ানার নীচে গ্রামের অনেক চাষা দলবদ্ধ হইয়া নিবিষ্টচিত্তে গান শুনিতেছে। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পর বেহুলার পালা আরম্ভ হইয়াছে, এত বেলা পর্য্যন্ত সে সঙ্গীতের বিরাম বিশ্রাম নাই; ঢোলক ও খঞ্জনী বাজিতেছে, গান গায়িতে গায়িতে গায়কদের গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পৌষের দারুণ হিমে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহাদের চোখ বসিয়া গিয়াছে, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, তথনও স্ত্রী বেশে সজ্জিত এক চাষা হাত নাড়িয়া মুখভঙ্গী করিয়া যে গান গায়িতেছে, দশ বারজন গায়ক তাহারই আবৃত্তি করিয়া গলার শিরা ফুলাইয়া মাথা নাড়িয়া, মুখব্যাদান পূর্ব্বক সমস্বরে বলিতেছে—

"ও হাটে যেওনা বেউলো, বেউলো আমার মা!
চাঁদের ব্যাটা ৬সমন নথা দেখলে ছাড়বে না।"

এই চিরপরিচিত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া মহেশ দাস চলিতে চলিতে পথপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইল, তাহার পা আর চলিতে চাহিল না। গৌরীর মা পশ্চাৎ হইতে বলিল, "হাঁ করে ও কি শুনচ! তিন তিন কোস পথ যেতে হবে, তা মনে আছে? এই কাল বেউলোর গানেই তোমাকে খেয়েচে।"

মহেশ দাস বলিল, "তা কি করে বুঝবি তুই মাগী! চল, এমন গাঁয়ের মায়া কাটাতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।" দুই বিন্দু অশ্রুত্যাগ পূর্ব্বক মহেশ দাস দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বন্ধ্যার ব্যথা

তোমাদের ও কেমনধারা কথা !
ওগো পুরুষ, বারেক বোঝ' নারীর মনব্যথা।
বল্‌বে তুমি, "খরচ বাড়ে তা'তে,
কিম্বা এখন কাজ কি সে কথাতে ;
মিথ্যা কেন ভাবনা ডেকে আনা"—
তফাৎ যে সেইখানে ;
মায়ের মনটি পেতে যদি, বুঝতে তাহার মানে।

তবু যদি ধরতে হ'ত পেটে—
পাঁচটি বছর মায়ের ব্যথায় করতে মানুষ খেটে !
ছেড়ে আপন দুঃখ লজ্জা রোগ
তুচ্ছ করে' সকল সুখ ভোগ ;
দাসীর সেবা, রক্ষা দেবীর মত
করতে যদি হ'ত—
তবেই তুমি বুঝ্‌তে আমার সখের দুঃখ কত।

বত্রিশপাক নাড়ীর বাঁধন ছিঁড়ে'
মাগ্‌ছি যারে রাত্রিদিনে আসবে না সে ফিরে ?
যারে পেতে মরণ সাথে যুঝে'
বুকের রক্ত মুখে যাহার গুঁজে—
তাইত মায়ে ছেলের দরদ বুঝে
সে তার প্রাণাধিক,
ওগো স্বামি, বারেক তুমি দেখ্‌ছ না সে দিক !

সবাই দেখ, সুখে কাটায় দিন—
ছেলের খাওয়ায় নাওয়ায় ধোয়ায় শ্রান্তি আলসহীন !
খোকার দুধটি শিকায় শোবার ঘরে,
খোকার শয্যা শুকায় দাওয়ার পরে ;
কাঁদলে ছেলে হাজারো কাজ ফেলে
বক্ষেতে লয় তুলে'—
লক্ষ লোকের মধ্যে বসেও থাকে যে সব ভুলে' !

তোমায় আমায় এতই ভালবাসা—
সেও যেন হায়, কেমনতর ঠেক্‌ছে ভাসা-ভাসা !
ঢুকলে ঘরে চক্ষে আসে বান—
কোথায় আমার ছোট্ট শয্যাখান ?
ঘরে তোমার এত জিনিষ, ওগো,
এত টাকার ধন—
নাই যে কেবল শিশুর কাঁথা, হায়রে আকিঞ্চন !

যতই বয়স হোক্‌না আমার কেন—
গিন্নী হওয়া জোর করে' সে—মানায় নাক' যেন !
একটি ছেলে থাক্‌ত যদি শুধু—
মায়ের মাঝে লুপ্ত হ'ত বধূ !
বাল্যকালের পুতুল-খেলা থেকে
হয়গো যারা মা—
সত্যিকারের মা-না-হওয়া কি তার যাতনা !

ভিক্ষুকও যে নেয়না আমার ভিখ্‌—
গরীব দুঃখী—লুকিয়ে তারাও দেয়গো আমায় ধিক্‌ !
শিশু কোথাও দেখ্‌তে পেলে, হায়,
অমনি বুকে তড়িৎ খেলে' যায় !
ঘরে মোদের নাইক ছেলে, ওরে
ডাক্‌বে কে মা বলে'—
একটা কিছু—হে ভগবান, দাও এ পোড়া কোলে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ভক্তকবি রসিকলাল

বাঙ্গালা দেশ কবিত্বের লীলাভূমি। কবিরা এদেশে হৃদয় দিয়া, প্রাণ দিয়া, জীবনের সকল শক্তি উজাড় করিয়া ভগবানের মহিমা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। উপাস্য দেবতার উদ্দেশে ভক্তকবির হৃদয়মন্দিরে যে গভীর প্রার্থনা সমুত্থিত হয়, তাহারই অনুভূতি কবিতাকারে, সঙ্গীতাকারে ফুটিয়া উঠে; তাই এদেশে বহুকাব্যের মূলেই প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা দেদীপ্যমান।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, বিশ্বেশ্বর, রামকৃষ্ণ-ইঁহারা সেই একই স্রোতে ভাসিয়াছেন এবং বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ-কাব্য "গীতাঞ্জলি" সেই সুচির অধ্যাত্মবাদেরই অভিব্যক্তি মাত্র।

আজ আমরা যে কবির কথা পাঠকসমক্ষে উপস্থাপিত করিব, তিনিও অধ্যাত্ম-পথের পথিক হইয়াছিলেন, তিনিও প্রেমের আদর্শ, হিন্দুজীবনের আদর্শ 'কানুর সঙ্গীত' গাহিয়াছিলেন।

৺রসিকলাল চক্রবর্ত্তী বর্ত্তমান সময়ের লোক হইলেও সকলে তাঁহার জীবনের সহিত পরিচিত নহে। বাঙ্গালা ১২৬৩ সালের পৌষমাসে যশোহর জেলার অন্তর্গত রায়গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামরতন চক্রবর্ত্তী। রসিকলাল ছাড়া রামরতনের আর তিনটি পুত্র ছিল—হরলাল, কৃষ্ণলাল ও রামলাল। রসিক সর্ব্বকনিষ্ঠ। কৃষ্ণলাল একজন সুবিখ্যাত বাদক ছিলেন, রসিকও কালে একজন ভাল বাদক হইয়াছিলেন। দশ বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রসিকলালের লেখাপড়া কিছুই হয় নাই। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি স্বগ্রামের বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন বলিয়া শুনা যায়; কিন্তু পরীক্ষা দেন নাই। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার দুইচারি বৎসর পরেই তিনি রায়গ্রামে স্থানীয় বালকগণের শিক্ষাদানের নিমিত্ত একটা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

যৌবনে রসিকলালের চরিত্র ভাল ছিল না; এ সময় কিছুকাল উচ্ছৃঙ্খলভাবেই তিনি অতিবাহিত করেন।

১২৮৮ সালে রসিকের তৃতীয় অগ্রজ ৺রামলাল চক্রবর্ত্তী একটি যাত্রার দল খুলিলেন। রসিক এই সময় অগ্রজের যাত্রারদলে যোগদান করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয়ে কবিত্বকোরক মুকুলিত হইতে আরম্ভ করে এবং তিনি সঙ্গীত-রচনায় প্রবৃত্ত হন।

১২৯৩ সালে রামলাল চক্রবর্ত্তী ঋণজালগ্রস্ত হইয়া দেশত্যাগ করেন। রসিক দল ছাড়িয়া দিয়া যশোহর গিলাপোলের সুবিখ্যাত হরেন্দ্ররূপ গোস্বামী মহাশয়ের যাত্রার দলে প্রবেশ করেন। গোস্বামী মহাশয় রসিকের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহারই হস্তে দলের যাবতীয় ভার অর্পণ করিলেন। এই সময়ে রসিকলাল সঙ্গীত-রচনায় সমধিক মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

গোস্বামীর দলে রসিক বেশী দিন থাকিতে পারেন নাই, ১২৯৪ সালে পীড়িত হইয়া রায়গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। উক্ত বর্ষের শেষভাগে তিনি "জীবোদ্ধার" নামে একটি পালা রচনা করেন এবং উহা গাহিবার জন্য গ্রামের কতিপয় বালক লইয়া "বালকসঙ্গীত" দল গঠন করেন। কিন্তু আরম্ভেই বাধা পাইলেন। ঐ বৎসর চৈত্র মাসে রসিকের মাতৃদেবী স্বর্গারোহণ করিলেন। ইঁহাদের সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল; কায়ক্লেশে একপ্রকার গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যাইত। বহুকষ্টে শ্রাদ্ধাদি উপরতক্রিয়া শেষ হইল। পুনরায় বালক সঙ্গীতের মহলা চলিতে থাকিল।

১২৯৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্যভাবে বালকসঙ্গীতের অভিনয় হয়। রসিকের পূর্ব্বে বালক-সঙ্গীত কখনও ছিল না, তিনিই ইহার প্রবর্ত্তনা করেন।

দেখিতে দেখিতে বালকসঙ্গীত দলের সুনাম প্রচারিত হইয়া গেল। নবীন ভাবের একটা মধুরপ্লাবনে

সন্নিহিত গ্রামগুলি মাতিয়া উঠিল। তিন চারিখানি খঞ্জনী এবং দুই তিনটি খোলের বাস্থ, তৎসহ সুললিত হরিনাম-গানে পল্লী সকল মুখর হইয়া উঠিল। বালক-কণ্ঠে মধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন বড়ই মধুর শুনাইল, যশোহরের বহুস্থান হইতে রসিকের নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। রসিকের দলের গান শুনিবার নিমিত্ত শত শত লোকের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল।

বালকসঙ্গীত প্রথমে কতিপয় সঙ্গীতের সমষ্টিমাত্র ছিল, অবশেষে তাহার সহিত রসিকলাল শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর জীবনকথা কবিতাকারে সংশ্লিষ্ট করিয়া দেন। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটা স্থান উদ্ধৃত হইল :—

গীত।

শ্যাম-সুন্দর রূপ-মনোহর, মরি মুরহর
কি মুরতি রে।
কিবা সু-অঙ্গ ত্রিভঙ্গ অনঙ্গ-মোহন,
নীলকান্ত জিনি জ্যোতি রে ॥
কিবা সুচারু চাঁচর চিকুরপরে
শোভিছে মোহন চূড়া,
তায় ললাট-ফলকে, বিজলি ঝলকে,
ঝালরে মুকুতাপাঁতি রে ॥
কিবা শ্রবণযুগলে মকর-কুণ্ডল,
অলকা-তিলকা ভালে,
তায় খঞ্জন জিনি নয়নযুগলে,
অঞ্জনে শোভা অতি রে॥
কিবা তিলফুল জিনি, অতুল নাসিকায়
পুলকে নলক দোলে,
তায় বিম্বাধরে সুমধুর হাসি,
দশনে হীরক ভাতি রে ॥
শ্যামের গণ্ডস্থল ঝলমল কিবা,
গলে দোলে বনমালা,
তায় যুগল বাহুতে, মোহন মুরলী
মোহিতে গোপীর মতি রে ॥
* * *
কিবা অকলঙ্ক পূর্ণ কোটি ইন্দু যেন
উদিত পদ-নখরে,
তায় চকোর চকোরী দিবা বিভাবরী,
ভ্রমে ভেবে নিশাপতি রে ॥
কিবা গোষ্পদাদি ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ রেখা
শোভিছে শ্রীপদতলে,
তায় ও পদ-সরোজ ভুলনা রে দ্বিজ
রসিকের মূঢ়মতি রে ॥

ইহার পরেই শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন কথা যথাক্রমে আরব্ধ হইয়াছে।

ত্রিপদী।

গয়াক্ষেত্র পরিহরি, নদীয়ায় গৌরহরি,
পুনরায় করি আগমন।
ত্যজ্য করি গৃহবাস, সদা বাসনা সন্ন্যাস
উপায় ভাবেন অনুক্ষণ ॥
* * *
পাইলে মানবজন্ম, পালিতে সংসারধর্ম্ম,
সর্ব্ব কর্ম্ম হবে সাধিবারে।
করিয়া ত্যাগ স্বীকার, পুরুষার্থ যে আমার
পরে আমি দেখাব সবারে ॥
অন্ন না থাকিলে ঘরে, যদি উপবাস করে,
তারে অন্নত্যাগী কেবা বলে?
আছে অন্ন রাশিরাশি, কিন্তু থাকে উপবাসী,
অন্নত্যাগী হয় হেন হ'লে ॥
এইরূপ মনে মনে, ভাবেন বসি ভবনে,
হেনকালে এলেন নিতাই।
গৌরাঙ্গে ল'য়ে সঙ্গে, বাহির হলেন রঙ্গে,
নগরে বেড়াতে দুটি ভাই ॥
* * *

একটা গান থামিল, অমনি কথকতা আরম্ভ হইল; পরে আবার কথা শেষ হইলে বালকের দল গীতঝঙ্কার তুলিল।

১২৯৫ সালের ৺বিজয়াদশমীর দিনে রসিকের বালকসঙ্গীতের দল গ্রামের ৺জয়গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে "জীবোদ্ধার" অভিনয় করিল। দল হইতে একটু দূরে ভক্ত রসিক বসিয়া আছেন; দেবতার বিদায়-অশ্রু যেন ভক্তের নয়নযুগল দিয়া দরবিগলিত ধারায় প্রবাহিত হইতেছে, শত শত লোক উৎসুকচিত্তে সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছে;—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! বালকগণ গাহিয়াছিল :—

কল্পনা-কুসুমে গাঁথিবারে হার,
সতত বাসনা করে মন আমার,
নাহি বিদ্যা-বুদ্ধি, ভরসা তোমার
ও মা শ্বেতবরণী।

এই সময় হইতে রসিকের জীবনে একটা পরিবর্ত্তনের সূচনা হইল, জীবনের গতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিল। তিনি সাধনায় মনোনিবেশ করিলেন। এই সময় বরিশালে গাহিবার জন্য তাঁহার দলের নিমন্ত্রণ হয়। ১২৯৫ সালের পূজাবসানে তিনি সদলবলে বরিশালে গমন করেন। বরিশাল-বাসিগণ তাঁহার দলের সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। রসিক সেখানে প্রভূত অর্থ ও যশোলাভ করেন। পূর্ব্বে তাঁহার অনেক ঋণ হইয়াছিল, ক্রমে রসিক সে সকল পরিশোধ করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছু পরে রসিকলাল পুণ্যধাম নবদ্বীপে গমন করেন এবং স্বরচিত সঙ্গীতে সমগ্র সুধীমণ্ডলীকে আপ্যায়িত করিয়া "গুণাকর" উপাধি লাভ করেন। কবিকুলশিরোমণি ভারতচন্দ্রের পর রসিকলালই নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এই দুর্লভ উপাধি দ্বারা গৌরবান্বিত হইলেন। অতঃপর রতনপুর গ্রামের বারোয়ারীতে রসিকের যাত্রার অভিনয় হয়। তথায় বহুসংখ্যক পণ্ডিত সম্মিলিত হইয়া রসিককে "গীত-রত্নাকর" উপাধি প্রদান করেন। ১২৯৬ সালে তাঁহার দল কলিকাতায় আগমন করিয়া যথেষ্ট যশঃ লাভ করে। এই বৎসর রসিকলাল গুরুর নিকট হইতে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিলেন।

রসিক পূর্ব্বে বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসনা করিতেন; কিন্তু গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া জানিলেন, তাঁহারা বংশানুক্রমে শক্তিমন্ত্রের উপাসক। এখন হইতে তিনি হরিসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত উভয়ই রচনা করিতে লাগিলেন, ভক্তের মানসপটে বিষ্ণু ও কালী যুগপৎ প্রতিভাত হইল।

১২৯৮ সালে নাটোরের নিকটবর্ত্তী হিলি নামক ষ্টেশনে তাঁহার সহিত শ্রীমৎ সদানন্দ স্বামীর সাক্ষাৎ হয়। এই মহাত্মার নিকট হইতে তিনি অনেক সদুপদেশ লাভ করেন। "সীতার পাতালপ্রবেশ," "চণ্ডে পাগল", "মাধবের মধুর-লীলা" প্রভৃতি গীতাভিনয় এই সময়ে রচিত হইয়াছিল।

১৩০৭ সালের ফাল্গুন মাসে রসিকলাল ৺রাধারাণীর মন্দির ও দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠাকার্য্য যেরূপ ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল, সেরূপ বর্ত্তমান সময়ে বড় একটা কোথাও দেখা যায় না। প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিবস হইতে পঞ্চদশ দিন ধরিয়া ক্রমাগত উৎসব হয়; নৃত্য গীত ভোজন প্রভৃতিতে শত শত লোক যোগদান করিয়াছিল। রাধারাণীর মন্দির-প্রতিষ্ঠা রসিকের জীবনের একটা প্রধান কার্য্য; কিন্তু ইহাতে তিনি ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া পড়েন; জীবনে তাহা আর পরিশোধ হয় নাই। মন্দির-প্রতিষ্ঠার পর নাটোরের স্বনামধন্য মহারাজ উহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পঞ্চাশ বিঘা জমী নিষ্কর করিয়া দেন।

১৩১১ সালের আশ্বিন মাসে রসিক সাধন-সঙ্গীতের দল গঠন করেন। এই সকল সঙ্গীতে তাঁহার ভগবৎ প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। পাঠকগণের তৃপ্তির জন্য আমরা তদ্‌রচিত অসংখ্য সঙ্গীতের মধ্য হইতে কেবল দুইটি মাত্র উদ্ধৃত করিলাম :—

(১)

ভবে তার কি ভাবনা আছে রে, যেজন
ভব-ভামিনী ডাকে,
সে যে ভেবে ব্রহ্মময়ী, হ'য়ে সর্ব্বজয়ী,
সদানন্দে সদা থাকে রে ফাঁকে॥
ধরেছে যে তাঁর অভয়চরণ, ভয় করে সে কি ভাবিয়া মরণ,
হয়ে সর্ব্বত্যাগী লইয়া শরণ, আত্মসমর্পণ করেছে মাকে॥
অমৃত গরল স্বরগ নরকে, সমতুল তার আপন পরকে,
ভাবে কি প্রভেদ সে হরি-হরকে, দয়াময়ী
দয়া করেছে যাকে॥
ভবারাধ্য তার ভবহৃদি পরে, রেখে ও শ্রীপদ সর্ব্বাপদে তরে,
ভয় কি রসিক ভেবনা অন্তরে, মনে প্রাণে সদা
ডাকরে তাঁকে॥

(২)

সেই দিন আমার কবে মা হবে।
কবে বাসনাকে ছাই,   অঙ্গে মেখে ছাই
পাগল হব আমি দেখ্‌বে সবে॥
পরে অঙ্গে ছেঁড়া ধটী,   ক'রব ছুটাছুটি,
রটিবে নাম মম ক্ষেপা ভৈরবে।
মুখে আবোল-তাবোল বোল,   কিন্তু অন্তরে নির্গোল,
ভজিব যুগলপদ-পল্লবে॥
যাবে জাতি-কুল-মান,   লজ্জা ভয়ে ত্রাণ,
বল, দুর্গে, আমি পাব মা কবে।
হয়ে সবার ঘৃণিত,   আনন্দে পূর্ণিত
হবে চিত, নাচিব গৌরবে।
যাবে সুখে দুঃখে রুচি,   শুচি কি অশুচি,
পাপ-পুণ্য-জ্ঞান কিছু না রবে,
হবে মাটি সোনা তুল্য,   ভুলে যাব মূল্য,
অভেদ স্বরগে আর রৌরবে॥
কবে তাড়াবে অনঙ্গ,   হব মা উলঙ্গ
এসেছিনু আমি যেভাবে ভবে।
সেই বালক-স্বভাব   পেয়ে মা অভাব
ঘুচাব কাঁদিয়ে মা-মা রবে॥
করে বালক আখুটী   করব কাঁদাকাটি,
থাবনা যতক্ষণ কোলে না লবে।
কেঁদে থাও রে বাছা ব'লে,   করবি এসে কোলে,
পাবে এখন রসিক ভবার্ণবে॥

রসিকলালের কতকগুলি গানে সামাজিক ব্যঙ্গ-চিত্রও দেখা যায়। তিনি একসময় লিখিয়াছিলেন ঃ—

গেল বাঙ্গালা রসাতলে।
মেয়েমানুষে হায়, মাই-ডিয়ার বলে॥
আর্য্য স্ত্রী-শিক্ষাকে এখন রং নোসান সবাই বলে,
(শুনি)—দেখি ইংরাজিতে সবাই রাজি,
বাঙ্গালা ছেলে কেউ না চলে॥
নাই সাবেক শাড়ীপরা, সিন্দুরের বিন্দু ভালে,
(এখন)—প্রায় বডি গায়ে গাউন পরা,
বুট পায়ে ছুট্ বলে চলে॥

১৩১১ সালে বরিশাল হইতে রসিকলালের নিমন্ত্রণ আসে। তাঁহার দল সেখানে গান করিতে গেল। রসিকও সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর করাল-ছায়া অচিরে তাঁহার উপর ঘনীভূত হইয়া আসিল। দারুণ রক্তামাশয় ও জ্বরে কবিবর আক্রান্ত হইলেন। অগ্রজ রামলাল রসিককে লইয়া রায়গ্রামে আসিলেন। ১৩১১ সালের অবশিষ্ট কয়েকমাস কাটিয়া গেল, ১৩১২ সালও অতিবাহিত হইল। ১৩১৩ সালের ১২ই বৈশাখ তারিখে রসিকের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণের বৈরাগ্য-সঙ্গীত রসিকলালের কণ্ঠে আসিয়া নীরব হইল।

শ্রীননীগোপাল মজুমদার

ছুটি

সব দেবতায় স্মরিব আজিকে, গণেশে নয়—
সিদ্ধির ঝুলি শূন্য থাকুক—তাহারি জয়!
আপনার বোঝা—সেই গুরুভার,
সে ভার বাড়া'তে চাহিনাক আর;
নিস্ব রিক্ত ভাগ্যহীনের কিসের ভয়?
গণেশের মত লক্ষ্মীও মোরে বড় সদয়!

অসিদ্ধি-দেবী অকৃতকার্য্যে ডেকেছে আজ—
ঘর ছেড়ে তাই করেছে বাহির ছাড়ায়ে কাজ।
সব আশা হ'তে সকলের কাছে
চিত্ত আমার ছুটি পাইয়াছে;
ছাড়ি ভয় লাজ তাই সে যে আজ রাজাধিরাজ—
গৃহ ছাড়ি' তাই দিগ্বিজয়ের যাত্রা আজ!

পর-পর-পর বহু বৎসর গেল ত চলি'—
সুখ বলে' কিছু পেয়েছি সে কথা কেমনে বলি ?
আজি দিনশেষে সন্ধ্যার বায়
মনে হয় যেন লাগিয়াছে গায়,
আজ আর কভু মিছা ছলনায় নিজেরে ছলি ;
আশার আলোক দিনশেষ সাথে গিয়াছে চলি'।

দূর করি' যত জাল-জঞ্জাল হাল্কা আজি ;
যেমন করেই যা-কিছু আসুক—তাতেই রাজি ;
হাওয়ায়-হাওয়ায় ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ভাসা,
যখন যেখানে সেইখানে বাসা ;
দৈন্য-মায়ের শূন্য নায়ের মুক্তি-মাঝি—
আসুক না বান, জাগুক তুফান—তা'তেই রাজি।

জোর করে' হাসি, হাল্কা ভাবিবে কে আছে ভাই ?
প্রাণ ভরে' কাঁদি, 'আহা'-অভিনয়ে মানুষ নাই ;
চুপ করে' থাকি, নাই কোন গোল—
কেহ কোথা নাই ভাবে যে পাগল ;
তার বেশী আর শান্তি হেথায় কিছু না চাই ;
কান্না বা হাসি বাধা দেয় আসি' মানুষ নাই।

একি আনন্দ'! চারিদিক ফাঁকা—একিরে সুখ !
কোথা এর কাছে মায়ের বক্ষ প্রিয়ার মুখ !
খ্যাতির মঞ্চ বিত্তের রাশি—
শত নাগপাশে বাঁধা পড়ে' হাসি—
বন্দী দেখায় পায়ের শিকল—কি কৌতুক !
দূর হ'তে দেখি স্বাধীন মুক্ত—কি মহাসুখ !

মরুকৃগে ছাই—তুচ্ছ কথায় আর যাবনা—
সকল ভাবনা এড়ায়ে এ ফের কোন্ ভাবনা !
পরপারে পাড়ি ধরেছে যে আজ,
পরচর্চ্চায় তার কিবা কাজ—
সাজে কি তাহার স্মৃতির পত্র সমালোচনা !
দূর হোক ছাই—তুচ্ছ কথায় আর যাব না।

ছুটি মোর ছুটি—প্রাণে মনে আজ পেয়েছি ছুটি'—
ভুল যত সব ফুল হয়ে তাই উঠেছে ফুটি' !
আকাশের সাথে হব সে আকাশ,
বাতাসের সাথে মিশাব বাতাস ;
ধরণীর ধার শুধিব ধূলার বাঁধন টুটি'—
ছুটি সেই ছুটি দেহে মনে যবে মিলিবে ছুটি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

ফলিত জ্যোতিষ

আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকাখণ্ডে ফলিত জ্যোতিষের চর্চ্চা পূর্ব্বেকার হইতে কিয়ৎপরিমাণে অধিকতর হইতেছে। উভয় মহাদেশেই ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে একাধিক সাময়িক-পত্র সুচারুরূপে চলিত। এবং সম্প্রতি যে সর্ব্বনাশকর যুদ্ধ বাধিয়াছে, তাহাতে জনসাধারণের দৃষ্টি অধিক পরিমাণে ফলিত জ্যোতিষের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়—এমন কি এই জ্ঞানগর্ব্বিত বিংশ শতাব্দীর একাধিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, আগেকার মত ইহাকে অবজ্ঞার ভাবে দেখিতেছেন না। পুরাকালেও যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকমাত্রই ইহার বিরুদ্ধ ছিলেন, তাহা বলা যায় না। ইহাতে বিশ্বাস-পরতন্ত্রতা সম্বন্ধে বিজ্ঞান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের নামের উল্লেখ করা যাইতে পারে। Bacon, Keple এবং Newton ফলিত জ্যোতিষ বিশ্বাস করিতেন।

আমাদের দেশ, প্রায় সকল বিদ্যারই যেমন, তেমনই ফলিত জ্যোতিষেরও জন্মস্থান। অতি প্রাচীনতম কাল হইতেই ইহার চর্চ্চা ছিল। বেদে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। আমাদের দেশে ইহা ধ্রুববিদ্যা (Positive Science) বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়

আমাদের আধুনিক শিক্ষাভিমানী-সম্প্রদায় ইহাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন এবং যাহারা ইহাতে বিশ্বাস-পরায়ণ বা আস্থাবান তাহাদের লইয়া রহস্য করিতে ছাড়েন না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি আমাদের দেশে ফলিত জ্যোতিষ ধ্রুববিদ্যা এবং প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলিয়া আদৃত। আমাদের পণ্ডিতেরা বলেন ঃ—

"চিকিৎসিত জ্যোতিষ তন্ত্রবাদাঃ
পদে পদে প্রত্যয়মাবহন্তি।"

যখন ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে এই উচ্চ দাবী স্পষ্টতঃ পরিষ্কার ভাষায় করা হইয়াছে, তখন বিবাদীর পক্ষে ইহা বড়ই সুবিধার বিষয়। তাঁহারা এক কথায় দ্বন্দ্ব শেষ করিয়া দিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন তোমাদের দলিল দস্তাবেজ প্রমাণাদি উপস্থিত কর—পরীক্ষা করিয়া দেখি। তাহা হইলেই তর্ক যুদ্ধ মীমাংসিত হইবে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেই প্রমাণাদির আলোচনা করিব। কিন্তু, তৎপূর্ব্বে দেখিব ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে কেবলমাত্র যুক্তি কি বলে। ইহার a priori কোন ভিত্তি আছে কি না।

ফলিত জ্যোতিষ বলে, মানুষের জীবনের উপর দুইটি প্রভাব লক্ষিত হয়। (১) তাহার নিজের কর্তৃত্ব—পুরুষকার, (২) অদৃষ্ট। এই দুই প্রভাবের অস্তিত্ব কেবল বিজ্ঞান-সম্মত নহে—সর্ব্ববাদিসম্মত। নাস্তিক বা অজ্ঞলোকেরা যাহাকে luck বা কপাল বলে, এই অদৃষ্ট সর্ব্বতোভাবে না হউক, আংশিকরূপে অজ্ঞ বিজ্ঞ সকল লোকের দ্বারাই স্বীকৃত। তাহার ভিতর কর্ম্মফল, পরিবেষ্টনী (envir nment), luck প্রভৃতি আসিয়া পড়ে। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মানুষের কার্য্যকলাপ এবং চরিত্র-গঠন সম্বন্ধে তাঁহার আত্মপ্রভাবকে অতিক্রম করিয়া বা তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট অথবা মিলিত হইয়া দেশ, কাল, সমাজ, বংশ প্রভৃতি কার্য্য করে। তুমি দেশবিশেষে যেমন ভারতবর্ষে, কালবিশেষে যেমন আধুনিক কালে এবং বংশবিশেষে, যেমন চণ্ডালবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ বলিয়া তুমি পরাধীন, স্বায়ত্ত-শাসন বঞ্চিত, নিরক্ষর, সমাজে উপেক্ষিত। তুমি কুষ্ঠী পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া আজীবন স্বাস্থ্য সুখ পাও নাই এবং তজ্জনিত নানা অভাব এবং দুঃখে পীড়িত। অদৃশ্য কারণসঞ্জাত তোমার সেই সকল অবস্থার দরুণ তোমার জীবন বিশেষ বিশেষ ঘটনাসঙ্কুল, তোমার বিশেষ বিশেষ সুখ দুঃখ, তোমার চরিত্রে বিশেষ বিশেষ দোষ গুণ। বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে জন্মিলে তোমার জীবনের ঘটনা সকল, সুখ দুঃখ, চরিত্রের বিকাশ বিভিন্ন প্রকারের হইত। কিন্তু দেশ কাল প্রভৃতি নির্ব্বাচনে মানুষের কোন কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা লক্ষিত হয় না। আমি কোন দেশ, কাল বা বংশে জন্মিব, তাহাতে আমার দৃশ্যতঃ কোন হাত নাই। সুতরাং জীবনে বহুল অংশই অদৃশ্য প্রভাব বা অদৃষ্টের দ্বারা শাসিত এবং অন্ধকারে আবৃত। ফলিত জ্যোতিষ জীবনের সেই অন্ধকারের কিয়দংশে আলোক প্রদান করে। জ্যোতিষীরা বলেন, গ্রহনক্ষত্রাদি তোমার দেহ এবং মনের উপর শক্তি সঞ্চালন করে এবং দেখাইয়া দেয় তোমার জীবনে কি কি ঘটনা ঘটিবে বা ঘটিতে পারে। জীবনের উপর বাহ্যপ্রভাবের মধ্যে সৌরজগতের গ্রহনক্ষত্রাদি অন্যতম। তাহারা মানব-জীবনের ঘটনাদি কতক অংশে পরিচালিত করে এবং পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দেশ বা জ্ঞাপন করে। জ্যোতিষীদের এই সকল কথার মধ্যে একটিও প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধ বা বহির্ভূত নহে। আমরা দেখিতে পাই, ভিন্ন ভিন্ন ঋতু দেহ এবং মনের উপর ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব বিস্তার করে ; বসন্ত ঋতু শুধু "তপঃ সমাধেঃ প্রতিকূলবর্ত্তী" নহে।

In the springs a fuller crimson comes
upon the robin's breast,
In the spring the wanton lapwing gets
himself another crest,
In the spring a livelier iris changes on
the burnished dove,
In the spring a young man's fancy
lightly turns to thoughts of love

বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রোগ উৎপাদিত হয়। "সূর্য্যাবর্ত্ত" (Sunstroke) প্রভৃতি রোগ সূর্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট, গণ্ডরোগাদি চন্দ্র হইতে সঞ্জাত, ইহা অস্বীকার করিবার পথ নাই। তবে জ্যোতিষীরা যখন বলেন হাম রোগ মঙ্গল গ্রহ হইতে উৎপন্ন তখন তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে কেন? চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে অনেক রোগই জড়িত; তাহা পাশ্চাত্য-আয়ুর্ব্বেদেও স্বীকৃত। ফলতঃ যতই আলোচনা করা যায় ততই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, চরাচর সৌরজগৎ একটি বৃহৎ পরিবার এবং সেই পরিবারভুক্ত পদার্থসমূহের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ আছে—ঘাত প্রতিঘাত আছে।

"Star to star vibrates light"
"তারায় তারায় * * * ব্যথা গিয়া লাগে।"
"We are what suns and winds and
waters make us"

সুতরাং মানবজীবনের উপর গ্রহনক্ষত্রের যে প্রভাবের কথা জ্যোতিষীরা বলেন, তাহা নৈসর্গিক নিয়মের বহির্ভূত বা বিরোধী নহে। ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, ফলিত জ্যোতিষের পক্ষে পূর্ব্বযুক্তি অনুকূল।

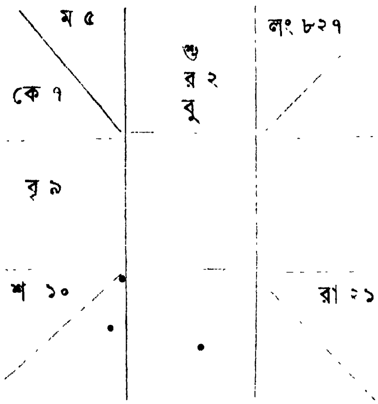
এ স্থলে আমি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় কর্ত্তৃক বহুপূর্ব্বে লিখিত একটি প্রবন্ধের (প্রবাসী চৈত্র ১৩০৫) উল্লেখ করিব। ঐ প্রবন্ধে ত্রিবেদী মহাশয় সতর্ক, সন্দিহান, বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের হাসি হাসিয়া প্রচুর এবং সুলভ ব্যঙ্গের সহিত বলিয়াছেন অবিশ্বাসীরা যে প্রমাণ চান, বিশ্বাসীরা তাহা দেন না, তাহার বদলে বিস্তর যুক্তি দেন। কিন্তু প্রমাণের আসনে বসাইবার জন্য আমি যুক্তির কথা উত্থাপন করি নাই। পৃথিবীতে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, প্রকৃতির নিয়ম সকলের মধ্যে, এমন অনেক নিয়ম আছে, যাহাদের সম্বন্ধে অনুকুল যুক্তি পাওয়া যায় না; কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে ফলিত জ্যোতিষীরা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের এজেহার মতে অবিশ্বাসীদের যে দণ্ডপ্রয়োগ করেন, তাহাতেই শাস্তির অবসান হয় না—তোমার পৃষ্ঠ এবং উদরদেশ উভয়ই পীড়িত হয়। যুক্তির কথার উল্লেখের হেতু এই যে অবিশ্বাসীদের বিজ্ঞ অবজ্ঞা এবং উপেক্ষার অন্ততঃ কোন বৈজ্ঞানিক কারণ নাই তাহা বিনীত ভাবে দেখাইবার জন্য। পরন্তু রামেন্দ্রসুন্দর বাবু যুক্তিকে যতই হাসিয়া উড়াইয়া দিন, ফলিত জ্যোতিষ পদে পদে যে প্রত্যয় উৎপাদন করিবার দাবী করে, তিনি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ চান। অতএব আমরা সেই প্রমাণের যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

(১) জন্মকালে গ্রহসংস্থান দেখিয়া জ্যোতিষীরা জাতকের সাধারণ জীবন এবং প্রকৃতি নির্দ্দেশ করেন; অর্থাৎ জাতক কি প্রকার লোক, তাহার বুদ্ধি, ধর্ম্ম-ভাগ্য প্রভৃতি কিরূপ, বলিয়া দেন। তাহার পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী ও সন্তানাদির নির্দ্দেশ করেন। জীবনের বিপদ আপদ, সুখ দুঃখ বলিয়া দেন। (২) গ্রহগণের রাশিচক্র পরিভ্রমণকালে এবং ভিন্ন ভিন্ন দশায় জাতকের জীবনে কোন্ কোন্ সময়ে কি কি ঘটনা ঘটিবে, তাহা নিরূপণ করেন। বলা আবশ্যক এই ফলাফল-গণনা গণিত-জ্যোতিষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। গণিত জ্যোতিষ যে মুহূর্ত্ত, জাতকের জন্ম-মুহূর্ত্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত করে, তাহা নির্ভুল হওয়া চাই—এবং সেই মুহূর্ত্তে গ্রহগণের আকাশের কোন্ অংশে স্থিতি—তাহার দ্রাঘিমা লঘিমা, ইত্যাদি অভ্রান্তরূপে নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। গণিতে ভুল—গোড়ায় গলদ। তাহাতে ফলের তারতম্য হইবেই!

এখন আর সাধারণ কথা না কহিয়া—ব্যক্তি-বিশেষের কোষ্ঠী আলোচনা করিব। এক দুই জনের কোষ্ঠী মিলিলে যে ফলিত-জ্যোতিষ ধ্রুব-বিজ্ঞান প্রমাণ হয় না—তাহা আমরা জানি। বৈজ্ঞানিকপ্রবরদিগকে তাহা বলিয়া দুঃখ পাইতে হইবে না। কিন্তু এই প্রবন্ধে বহুলোকের কোষ্ঠী পরীক্ষা অসম্ভব। আমরা যদি কোন একখানি কোষ্ঠী পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে পারি যে, তাহা জাতকের প্রকৃতি এবং জীবনের ঘটনাদির সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলিতেছে, তাহা হইলে অনুসন্ধানের পথ খুলিয়া দিয়া সত্য এবং প্রকৃত

তথ্য নির্দ্ধারণে সাহায্য করিব। তাঁহাই আমাদের উদ্দেশ্য।

নিম্নে একটি জন্মকুণ্ডলী অর্থাৎ কোন জাতকের জন্মমুহূর্ত্তে গ্রহসংস্থানের চিত্র প্রদর্শিত হইল।



ইহা পরীক্ষা করিবার পুর্ব্বে পাঠকের বুঝিবার সৌকর্য্যার্থ ফলিত-জ্যোতিষের কতকগুলি মূল-কথা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। আমরা ধরিয়া লইতেছি, জ্যোতিষশাস্ত্রে পাঠকের বর্ণপরিচয় পর্য্যন্ত নাই। এই সকল কথা সামান্য ফলিত-জ্যোতিষের গ্রন্থে, এমন কি পাঁজিতেও আরও বিস্তৃতরূপে পাঠক দেখিতে পাইবেন।

উপরে যে চিত্র দর্শিত হইল, তাহা নভোমণ্ডলের চিত্র—আকাশের যে অর্দ্ধাংশ পৃথিবীর উপরে দৃষ্ট হয় এবং যে অপরার্দ্ধ পৃথিবীর নিম্নে। চক্রটি ১২ অংশে বিভক্ত, এক একটি অংশকে মেষ বৃষ, ইত্যাদি দ্বাদশ-রাশি কহে। ঐ ১২ রাশি ১২টি মাসের অনুরূপ। অর্থাৎ মেষরাশি বলিলে বৈশাখ মাস বুঝায়—সূর্য্য ঐ মাসে মেষরাশিতে অবস্থান করে। জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ রাশিতে; এবং এইরূপ ক্রমান্বয়ে। রবি প্রভৃতি নবগ্রহ ঐ রাশিচক্রে পরিভ্রমণ করে। ঐ এক-একটি রাশি আবার কোন গ্রহের গৃহ—অর্থাৎ সেই অংশে অবস্থান করিলে গ্রহের স্বকীয় বা স্বাভাবিক তেজ অক্ষুণ্ণভাবে প্রকাশ পায়—সেই গ্রহকে সেই রাশির স্বামী বা অধিপতি বলে। কোন গ্রহের তুঙ্গস্থান সেই রাশিতে থাকিলে গ্রহের তেজ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়;—কোন গ্রহের নীচাংশ, সেই রাশিতে থাকিলে সেই গ্রহ একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে; এবং কোন গ্রহের মিত্র বা শত্রু-গৃহ—সেই সেই গৃহে থাকিলে গ্রহের তেজের বৃদ্ধি বা হ্রাস হয়। ইহা ফলিত জ্যোতিষের কল্পিত কথা নহে—নৈসর্গিক পর্য্যবেক্ষণের ফল। দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা সহজে বুঝা যাইবে। মেষরাশি সূর্য্যের তুঙ্গস্থান-অর্থাৎ মেষে অবস্থানকালে সূর্য্যের তেজ সর্ব্বোচ্চ সীমা প্রাপ্ত হয়; তাঁহা আমরা দেখিতে পাই। বৈশাখ মাসে সূর্য্য মেষরাশিতে থাকে এবং বৈশাখ মাসেই সূর্য্যের প্রচণ্ডতম তেজ। তুঙ্গরাশি হইতে ৭ম রাশি গ্রহের নীচস্থান। মেষ হইতে ৭ম রাশি তুলা—তুলা সূর্য্যের নীচ স্থান, অর্থাৎ তুলায় অবস্থানকালে—কার্ত্তিক মাসে, সূর্য্য একেবারে নিস্তেজ নিষ্প্রভ। সিংহ-রাশি সূর্য্যের নিজ গৃহ—তাহাতে স্থিতি হইলে সূর্য্যের তেজ অক্ষুণ্ণ এবং খুব প্রবল থাকে। সিংহরাশির অনুরূপ মাস ভাদ্র মাস। ভাদ্র মাসে সূর্য্যের উত্তাপ অসহ্য। রবির শত্রু শনি—শনির গৃহ মকর এবং কুম্ভ—এই দুই রাশিতে সূর্য্য পৌষ ও মাঘ মাসে থাকে। এই দুই মাসে সূর্য্যের তেজ অপেক্ষাকৃত কম। সেইরূপ অন্যান্য গ্রহের দীপ্তি, ও তেজ নৈসর্গিক নিয়মের ভিত্তির উপর প্রত্যক্ষ-সংস্থিত।

আবার কতকগুলি গ্রহ শুভ—যথা বৃহস্পতি এবং শুক্র। কতকগুলি অশুভ—যথা মঙ্গল, শনি, রাহু। কতকগুলি শুভাশুভ অর্থাৎ বিশেষস্থলে বা শুভাশুভ-গ্রহের সংযোগে অথবা অন্যান্য কারণে কখন শুভ, কখন অশুভ হয়। ঐ দ্বাদশ রাশিতে ফলিত জ্যোতিষের দ্বাদশ ভাব স্থিত, অর্থাৎ ঐ ১২ ঘরে জাতকের দেহ-মন, অর্থ, ভ্রাতা, ভগিনী, মাতা, বন্ধু, প্রভৃতি নিরাকৃত হয়। জাতক যে মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করে, সে সময়ে যে রাশি পূর্ব্বদিকে উদয় হয়, তাহাকে লগ্ন এবং যে রাশিতে চন্দ্র থাকে তাহাকে জাতকের রাশি বলে। ভাববিচার অতি দুরূহ ব্যাপার। ইহাতে নানাদিক দেখিতে হয়—অসংখ্য অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া যাহা বিচারে নিরবশেষ থাকে, তাহা নিরাকরণ করিতে হয়। গুরুশিক্ষা, বিস্তৃত ও গভীর

শাস্ত্রজ্ঞান ভূয়োদর্শন ত চাই—তাহার উপর বিচার শক্তির প্রাখর্য্য আবশুক। বিচার কার্য্যে পরীক্ষকের নিজ শক্তির যোগ্যতা বা প্রচুরতার অভাব (want of personal equation) ভ্রান্তির প্রধান কারণ। তবে ভাববিচার সম্বন্ধে মোটামুটি এই সহজ এবং সংক্ষিপ্ত নিয়ম অবলম্বন করিলে যদিও সম্পূর্ণ তথ্য স্থিরীকৃত না হয়, তবুও অনেকটা সত্য জানা যাইতে পারে। সেই নিয়ম এই ;—যে ভাব "সৌম্যস্বামী যুতেক্ষিত" সেই ভাবের পুষ্টি এবং তদ্বিপরীতে হানি। অর্থাৎ যে ভাব, তদাশ্রিত রাশির অধিপতিগ্রহ কিম্বা শুভগ্রহ কর্ত্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট হয়, তাহার ফল শুভ—অন্যথা বা তদ্বিপরীতে অশুভ।

এখন উপরের কোষ্ঠীবিচার করা যাক্।

এই জাতক যখন জন্মিয়াছিল, তখন পূর্ব্বাকাশে মীনরাশি উদীয়মান; সুতরাং ইহার লগ্ন মীন। লগ্নে জাতকের আকৃতি, রূপ, স্বাস্থ্য, বল ও বংশ প্রভৃতি নিরাকৃত হয়। এই প্রবন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কোষ্ঠীবিচার হইতে পারে না এবং তাহাও আমাদের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য নয়। তবে জাতকজীবনে যাহা উল্লেখযোগ্য তাহাই বলিব। এবং যে যে ভাব তাঁহাকে অপর সকল লোক হইতে বিশেষত্ব দিয়াছে তাহা দেখাইব। এক কথায় উদ্ধৃত কোষ্ঠী জাতক সম্বন্ধে কি বিশেষ ভাগ্য নির্দ্দেশ করে, তাহা বাস্তবের সঙ্গে মিলাইয়া ফলিত জ্যোতিষ যে ধ্রুববিদ্যা—উপন্যাস বা গালগল্প নহে, তাহা বুঝাইব।

জাতকের লগ্ন মীন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভগ্রহ বৃহস্পতির গৃহ। মীনরাশি স্বচ্ছবর্ণ। সুতরাং জাতকের বর্ণ গৌর। সেখানে আবার গ্রহদিগের মধ্যে যে দুটি গ্রহ গৌরবর্ণ, চন্দ্র এবং বৃহস্পতি, তাহাদের পূর্ণপ্রভাব লক্ষিত হয়। চন্দ্র, মীনরাশিতেই অবস্থিত এবং স্বামীগ্রহ বৃহস্পতি লগ্নকে পূর্ণদৃষ্টি করিতেছে। তাহাতে বর্ণকে আরও উজ্জ্বল তর করিয়াছে। রূপ এবং আকৃতি কান্ত, মনোহর এবং শোভন। স্বাস্থ্য এবং বলসম্বন্ধে ঐ কথাই খাটে। তিনি সুস্থদেহ এবং বলশালী। তাঁহার বংশ সমাজের শীর্ষস্থানীয় এবং উজ্জ্বল আভিজাত্য-গৌরবে অলঙ্কৃত। নৈসর্গিকতেজে সর্ব্বাপেক্ষা তেজোময় গ্রহরাজ সূর্য্য, এবং সর্ব্বাপেক্ষা শুভগ্রহ বৃহস্পতি, উভয়েই তুঙ্গী হইয়া জাতককে অপরদিক হইতে, উচ্চবংশ-গৌরব এবং সুস্থ সুন্দর দেহ, উন্নত মানসিক বৃত্তিসকল দিয়াছে। লগ্ন সম্বন্ধে জাতকের এই বিশেষত্ব।

২য় স্থান বা ধনসম্বন্ধে জাতকের এই অসামান্য সৌভাগ্য দৃষ্ট হয় না। তবে জাতক ধনহীন নহে। তিনি ধনী। তুঙ্গগ্রহ রবি দ্বিতীয়স্থ বলিয়া তাহাকে ধন দিয়াছে, কিন্তু ঐ রবি শত্রু ভাবের অধিপতি বলিয়া মাঝে মাঝে ধনের হানি হইয়া থাকে। ধনভাবস্থ বুধ ও শুক্র দুইটি সৌম্যগ্রহও তাঁহাকে ধন দিয়াছে, শুক্রগ্রহ উত্তরাধিকারীসূত্রে। কিন্তু তাহারা অস্তগত বলিয়া ধনের হানি করিয়াছে। পরন্তু ধনসম্বন্ধে জাতকের বিশেষত্ব এই যে, বুধ ও শুক্র দ্বিতীয়স্থ থাকায় তাঁহার স্বীয় বিদ্যাবলে ধন উপার্জ্জন হইবে।

৩য় বা ভ্রাতৃস্থান অশুভগ্রহ মঙ্গলযুক্ত এবং শনি কর্ত্তৃক পূর্ণ বীক্ষিত; তজ্জন্য অনুজ না হইবার সম্ভাবনা, —হইলেও তাঁহার মৃত্যু সম্ভাবিত; অন্ততঃ জাতকের অব্যবহিত অগ্রজ এবং কনিষ্ঠের অমঙ্গল স্পষ্টতঃ সূচিত।

৪র্থ অর্থাৎ মাতৃস্থান কেতুযুক্ত। রাহু কর্ত্তৃক পূর্ণদৃষ্ট। স্বামীগ্রহ বুধ অস্তগত এবং ষষ্ঠাধিপতি রবি এবং মরণাধিপতি শুক্রযুক্ত সুতরাং জাতক অল্প বয়সেই মাতৃস্নেহ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত। তাঁহার বন্ধুত্ব-সৌভাগ্যও স্থায়ী নয়। একাধিক বন্ধুর সহিত মৃত্যুজনিত বিচ্ছেদ বা অপ্রীতি ঘটিতে পারে।

৫ম স্থানে বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়। "বুদ্ধি প্রবন্ধাত্মজ মন্ত্র-বিদ্যা"। মুনিঋষিগণ মানসপুত্র এবং ঔরসজাত পুত্রের কল্পনা একই স্থানে করিয়াছেন। এইভাবে জাতকের অসামান্য সৌভাগ্য। ৫মস্থান কর্কটরাশি, সৌম্যগ্রহ চন্দ্রের গৃহ এবং চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শুভগ্রহ বৃহস্পতিযুক্ত। সুতরাং ৫ম স্থান "সৌম্য স্বামী যুতেক্ষিত" বলিয়া জাতকের বিদ্যাবুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। তাহাতে

কর্কটরাশি বৃহস্পতির তুঙ্গ বা সর্ব্বোচ্চস্থান। সে কারণে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি গরীয়সী। সেই বৃহস্পতি আবার লগ্নাধিপতি হইয়া পঞ্চমে অবস্থিত; সুতরাং আজন্ম বিদ্যানুশীলনে ও জ্ঞানচর্চ্চায় রত এবং তাহাতে অসীম এবং অসামান্য সৌভাগ্যশালী। এখনও শুভপ্রভাবের শেষ হয় নাই। পঞ্চমাধিপতি চন্দ্র লগ্নগত। একেত' "লগ্ন চাঁদা বেদ বাখানে", তাহাতে এস্থানে লগ্ন এবং পঞ্চম ভাবে বিনিময়। ইহা একটি অত্যন্ত দুর্ল্লভ এবং অমৃততুল্য যোগ। পঞ্চমভাবে এতগুলি শুভযোগ হাজার, দশহাজার বা লক্ষেও ঘটে না। জাতকের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় একটি কথায় এবং কেবলমাত্র একটি-মাত্র কথায় দেওয়া যাইতে পারে; তাহা প্রতিভা—অসাধারণ প্রতিভা। এবং লগ্নস্থ চন্দ্র তাঁহাকে সুন্দর এবং অনন্য সাধারণ কল্পনাশক্তি দিয়াছে।

৭ম অর্থাৎ জায়াভাবে তাদৃক্ সৌভাগ্য দৃষ্ট হয় না। জায়াভাব গ্রহশূন্য—স্বামীদৃষ্টি বর্জ্জিত। এবং সৌম্য গ্রহ-দিগের মধ্যে কেবলমাত্র বৃহস্পতি কর্ত্তৃক পাদ দৃষ্ট। যেমন জায়াভাব জায়াধিপতির দৃষ্টিরহিত – জায়াকারক গ্রহের শুক্রেরও দৃষ্টি রহিত। এবং জায়াধিপতি এবং জায়াকারক গ্রহ, উভয়েই অস্তগত। অধিকন্তু মঙ্গলের ক্ষেত্রে শুক্রের অবস্থানহেতু জায়া-হানি সূচিত। এবং শুক্র মরণাধিপতি হইয়া জায়াপতি বুধের সহিত যুক্ত। এই সকল প্রবল কারণে জাতক দাম্পত্যসুখ বহুদিন ভোগ করিতে পারেন নাই।

৯ম বা ভাগ্যস্থান উৎকৃষ্ট। স্বামীগ্রহ মঙ্গল এবং সৌম্যগ্রহ বৃহস্পতি কর্ত্তৃক পূর্ণদৃষ্ট। সুতরাং জাতক ভাগ্যবান। অধিকন্তু ভাগ্যস্থান সর্ব্বগ্রহ বীক্ষিত বলিয়া জাতকের ভাগ্যের পরম উৎকর্ষসাধন করিয়াছে।

১০ম, কর্ম্ম এবং যশের স্থান। ইহার পরীক্ষা করিয়াই এই কোষ্ঠীর সাধারণ বিচার শেষ করিব। ১০ম স্থান বৃহস্পতির ক্ষেত্র, ধনুরাশি এবং যদিও উহা স্বামীগ্রহের দৃষ্টি বঞ্চিত—কিন্তু অপর সমস্ত গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইবার কারণ শুভ-ফল-সূচক। পরন্তু ১০ম ভবন-নাথ বৃহস্পতি তুঙ্গী এবং ত্রিকোণস্থিত বলিয়া জাতক প্রসিদ্ধ "ক্ষেত্রসিংহাসন" যোগ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার ফলে জাতকের বিশ্ববিখ্যাত কীর্ত্তিলাভ করিবার কথা। তবে সে স্থানে রাহু অবস্থিত এবং বৃহস্পতির দৃষ্টি নাই বলিয়া সময়ে-সময়ে জাতকের অপযশ এবং অখ্যাতি ঘটে।

এই ১০ম স্থানে পিতৃ-প্রকৃতি নিরূপিত হয়। জাতকের পিতা পরম ধার্ম্মিক উন্নত এবং সাধুচরিত্র। এবং যে যে কারণে মধ্যে মধ্যে জাতকের যশের হানি হয়, সেই সেই কারণে তাঁহার পিতারও সময়ে সময়ে স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় এবং শারীরিক এবং মানসিক কষ্টও পান।

এখন উপরে দর্শিত কোষ্ঠীবিচারে জাতকের যে জীবন স্থিরীকৃত, চিত্রিত, তাহা বাস্তবের সঙ্গে মিলে কি না? আমি বলি অত্যাশ্চর্য্য রূপে মিলে এবং ফলিত জ্যোতিষে আমার বিশ্বাস-স্থাপন করিবার নানা প্রমাণের মধ্যে ঐ কোষ্ঠী তাহাদের অন্যতম।

এক্ষণে পাঠকের স্বভাবতই কৌতূহল হইতেছে যে, ঐ কোষ্ঠী কল্পিত পুরুষ কে? কে সেই সৌম্যমূর্ত্তি, সুন্দর, উচ্চবংশজাত, অভিজাত্য-গৌরবে অলঙ্কৃত, সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রতিভার কিরীট মণ্ডিত, বরেণ্য পিতার পুত্র এবং বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তি?—তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঐ পিতৃদত্ত অনুপম সুন্দর নামের পূর্ব্বে রাজদত্ত গৌরবের কুৎসিত উপসর্গ-অত্যাচার "Sir Doctor" বসাইতে লেখনী সরে না।

পরিশেষে যখন ব্যক্তি ব্যক্ত হইল, তখন পাঠক সহজেই কোষ্ঠীলিখিত নির্দ্দেশসকল জাতকের জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

তিনি যে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সুন্দর পুরুষ, উচ্চবংশ-সম্ভূত, আভিজাত্য গৌরবে সমন্বিত, সমাজমান্য, ধর্ম্মনিষ্ঠ পিতার পুত্র, তাঁহার যে অসাধারণ প্রতিভা এবং বিশ্বব্যাপী যশ ও গৌরব, ইহা সকলেই জানেন এবং সে-সকল কোষ্ঠীনির্দ্দিষ্ট মাত্রা এবং পরিমাণ হইতে তিলমাত্র কম নহে। অর্থ সম্বন্ধে ইহা সকলে অবগত আছেন যে, তিনি স্বীয় বিদ্যাবলে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, ও

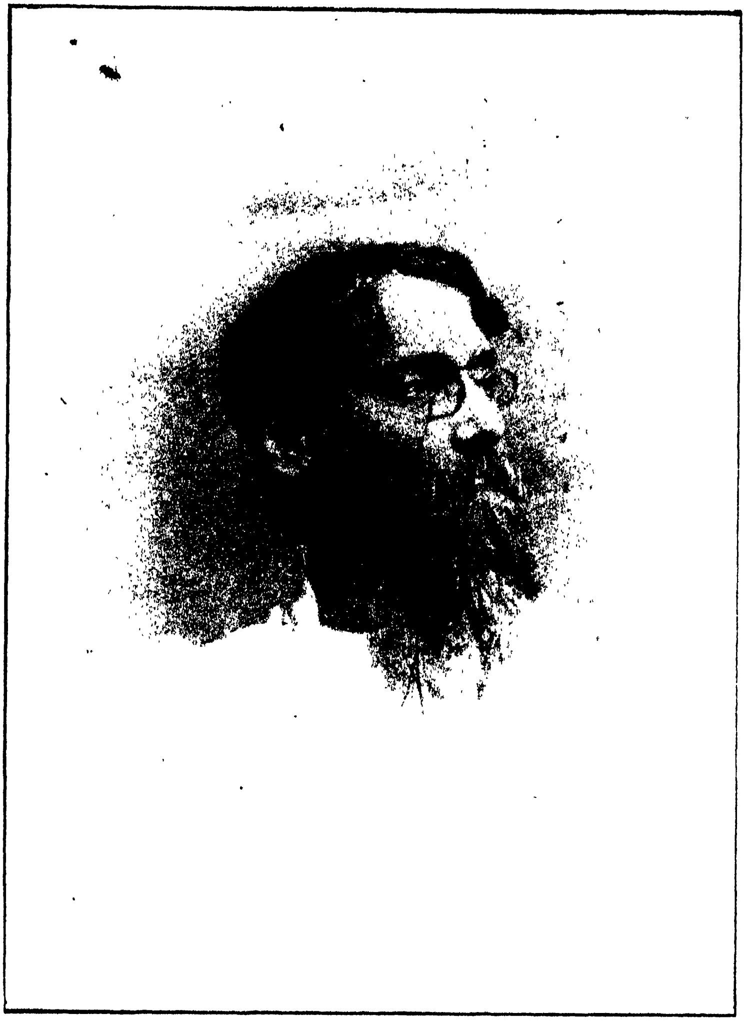
করিতেছেন। কিন্তু এ কথা সকলে নাও জানিতে পারেন যে, সময়ে সময়ে তাঁহার অর্থনাশ হইয়াছে।

তাঁহার অনুজ শৈশবেই মারাগিয়াছে এবং তাঁহার অব্যবহিত অগ্রজের শারীরিক এবং মানসিক নিরাময় নহে।

তিনি বালককালেই মাতৃহারা হইয়াছেন। এবং তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে একাধিক পরলোকগত হইয়াছেন এবং একাধিকের সহিত প্রীতির অসদ্ভাব হইবার কথা।

অসময়ে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটিয়াছে। অনেক সময়েই তাঁহার পিতা বিশেষরূপে পীড়িত হইয়াছিলেন, এমন কি স্থায়ী রোগে কষ্ট পাইয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনে কি কি শুভাশুভ কখন, কোন্ সময়ে ঘটিয়াছিল, তাহা দশা, গোচর, বর্ষপ্রবেশ ইত্যাদি বিচারে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তাহার জন্য সূক্ষ্ম গণনা ও বিচার আবশ্যক এবং তাহা সময় সাপেক্ষ। পাঠকদিগের কৌতূহল হইলে তাহা প্রবন্ধান্তরে লিপিবদ্ধ করা যাইবে। কিন্তু উপরে কোষ্ঠীর যে সাধারণফল লিখিত হইল, তাহা হইতে নিরপেক্ষ পাঠকগণ বিচার করিবেন, ফলিত জ্যোতিষকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া কতদূর সঙ্গত।

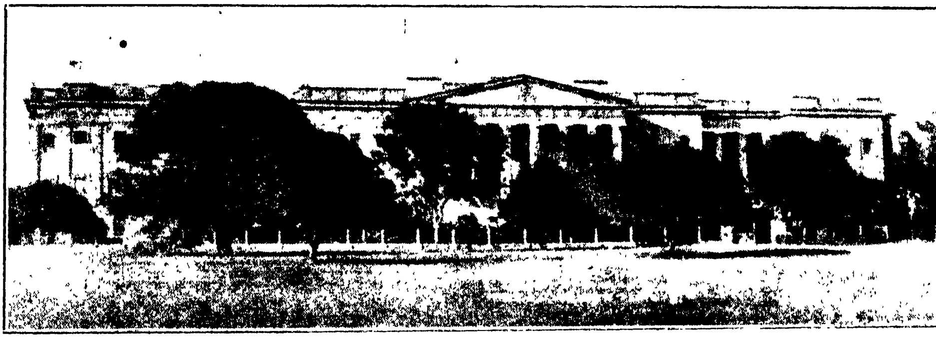


কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

মুর্শিদাবাদের কয়েকটা স্মৃতিচিহ্ন

যজ্ঞাবসানে সুবিস্তীর্ণ হোমকুণ্ডের বিপুল ভস্মাস্তরালে আহুতির বিরাট্ অনুষ্ঠান যেমন আপনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেইরূপ মুসলমান-রাজধানী দিল্লী আগ্রার সুবিপুল বৈভবসমূহ নির্ম্মম কালের প্রভাবে স্মৃতিমাত্রাবশেষ হইলেও এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা হইতে তাহাদের প্রাচীন সমৃদ্ধির বিষয় বিলক্ষণ অবগত হওয়া যায়-এখনও যে সকল স্মৃতিচিহ্ন আছে, তাহা মোগল-গৌরবের



মুর্শিদাবাদ রাজবাটী।

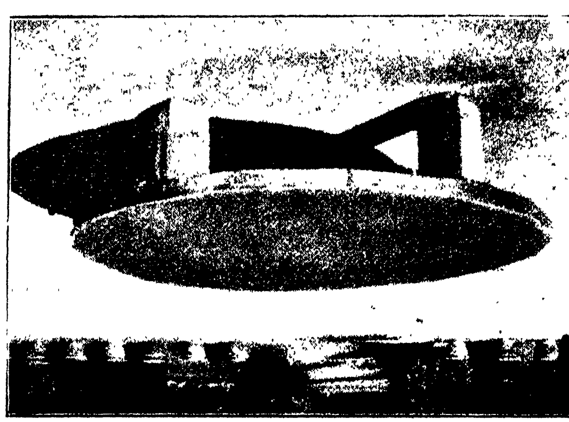
ও তৎকালীন ভাস্কর ও স্থপতিদিগের কর্ম্মকুশলতার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। এখনও শাহ্‌জহানের মর্ম্মরস্বপ্ন—আগ্রার তাজমহল জগতে অতুলনীয়। দিল্লী ও আগ্রা এখনও যে সকল স্মৃতিচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া আছে, তাহা তাহাদের পূর্ব্ব গরিমার ভস্মস্তূপ। ভারতবাসী অতি প্রাচীন জাতি। প্রাচীনের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিতে—প্রাচীনের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা দেখাইয়া চলিতে ভারতবাসী জানে। পাশ্চাত্য-জগৎ ভারতবাসার এই প্রাচীন প্রীতি অবসন্নতার লক্ষণ বলিয়া থাকেন; কিন্তু আমরা জানি, এ প্রীতি অসাড় প্রাণে আশার অরুণালোক দেখাইয়া দেয়—এই প্রাচীন প্রীতি কর্ত্তব্যকে সজাগ করিয়া রাখে—বুঝাইয়া দেয়, জগতের অনিত্য দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে এমন কিছু স্থায়ী জিনিষ দিয়া যাইবে, যাহা দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত হইবে। এই প্রাচীন-প্রীতি হেতু আজ আমরা বাঙ্গালার শেষ মোগল-রাজধানী মুর্শিদকুলি খাঁর বড় সাধের, বড় সোহাগের মুর্শিদাবাদের কয়েকটা স্মৃতিচিহ্নের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব।

কবি সত্যই বলিয়াছেন—

"দিল্লী মুর্শিদাবাদ হইবে এখন,
মুসলমান-গৌরবের সমাধি-ভবন।"

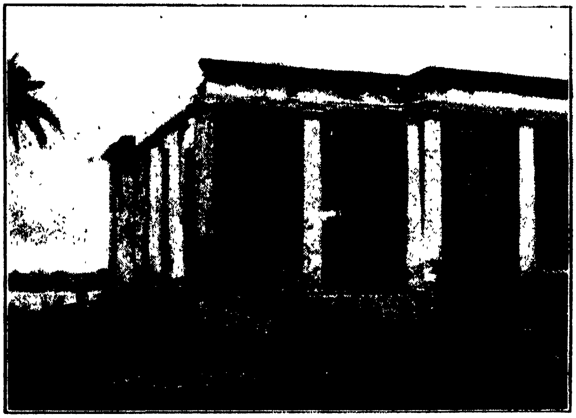
দিল্লী ও আগ্রার এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাতে তাহাকে বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী বলিয়া চেনা যায়; কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ মুসলমান রাজধানী মুর্শিদাবাদের পক্ষে এ কথা আর বলা চলে না। যে মুর্শিদাবাদ প্রসঙ্গে ক্লাইভ একদিন বলিয়াছিলেন—

'The city of Murshidabad is as extensive popu-



বঙ্গের সুবাদারগণের পুরাতন সিংহাসন

lous and rich as the city of London, with this difference that there are individuals in the first possessing infinitely greater prosperity than in the last city"



মোতিঝিল—লর্ড ক্লাইবের দেওয়ানখানা।

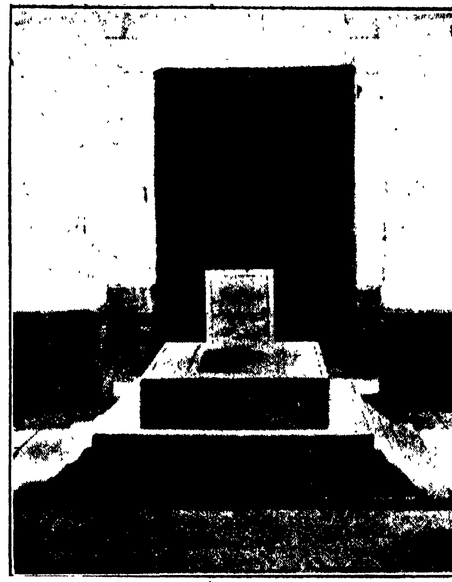
তাহার আর সে শ্রীসম্পদ নাই—সেই মুর্শিদাবাদের গৌরবচিহ্ন প্রায় সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে—আছে কেবল দু'একটী সমাধি-মন্দির। শ্মশান মুর্শিদাবাদ এখন তাহাই বক্ষে ধারণ করিয়া আপনার অতীত-গৌরবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার সমস্ত



খোসবাগ।

রাজনীতিক ব্যাপারের সহিত মুর্শিদাবাদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ট-ভাবে বিজড়িত; এই জন্যই কথিত হইয়া থাকে—

'The history of Murshidabad is the history of Bengal during the 18th century.'



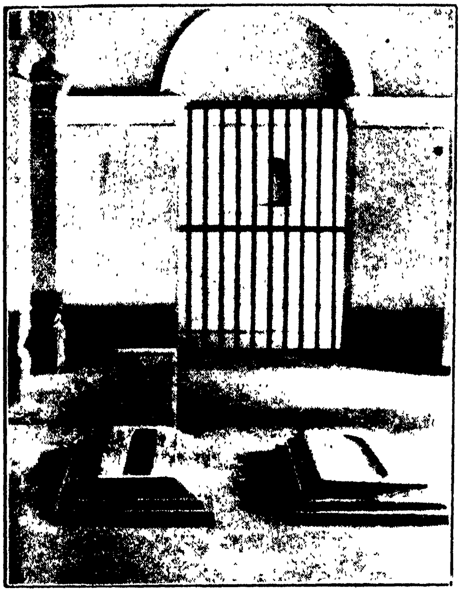
আলিবর্দ্দী খাঁর সমাধি।

এই মুর্শিদাবাদেই আবার বাঙ্গালার মুসলমান রাজত্বের অবসান এবং এই মুর্শিদাবাদেই ব্রিটীশ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়।

খোসবাগ

আলিবর্দ্দী খাঁ এই খোসবাগের নিম্মাণকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করেন। প্রথমেই তাঁহার জননী এই স্থানে সমাহিতা হ'ন।

এই সমাধি-ভবনে বাঙ্গালার প্রজাপ্রিয়, আদর্শ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ ও তাঁহার দৌহিত্র সিরাজুদ্দৌলা চিরশান্তিতে শয়ান আছেন। আলিবর্দ্দীর পদতলে তাঁহার মহিষী সমাহিতা,—এবং ইহার সন্নিকটেই সিরাজের পদতলে তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী—সুখদুঃখের সহচরী—লুৎফুন্নিসা চিরনিদ্রিতা। সিরাজের সমাধি বোধ হয় অল্পদিন পরেই মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া যাইবে—ইহার উপরে কোন প্রস্তরখণ্ড নাই; কেবল বিলাতী মাটী দ্বারা উহা আবৃত।



নবাব সেরাজদ্দৌলার সমাধি।

সিরাজের মৃত্যুর পর লুৎফুন্নিসা ঢাকায় নির্ব্বাসিতা হ'ন। পরে ইংরেজদের যত্নচেষ্টায় মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়া খোসবাগে আলিবর্দ্দী ও স্বামীর সমাধির তত্বাবধানে নিযুক্তা হ'ন।

মন্থরগতি কলনাদিনী ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী কুসুমিত-তরুলতা-সমাকীর্ণ ছায়াস্নিগ্ধ শোকমৌন এই খোসবাগে লুণ্ঠিত হইয়া স্বামীর সমাধিবক্ষে লুৎফুন্নিসা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। প্রতিদিবস প্রভাতে স্বহস্তে পতির সমাধিভবন সদ্যপ্রস্ফুটিত কুসুমদামে সুসজ্জিত ও প্রতি সন্ধ্যায় সুরভি দীপমালায় বিভূষিত করিতেন—ইহাই তাঁহার নিত্যকার্য্য ছিল।

লুৎফুন্নিসার জীবদ্দশাতেই তাঁহার কন্যা উম্মৎ জহুরার মৃত্যু হয়। সেইজন্য লুৎফুন্নিসার মৃত্যুর পর উম্মৎজহুরার চারি কন্যাই খোঁসবাগের তত্বাবধানের জন্য ওয়ারেণ্ হেষ্টিংসের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ তাঁহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

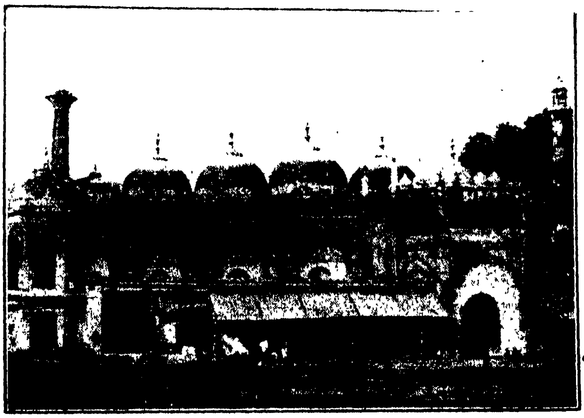
গভীর পরিতাপের বিষয়, যিনি এ সময়ে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন—যাঁহার সামান্য তর্জ্জনী হেলনে কত বড় বড় লোকের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিত—সেই সিরাজের সমাধিগৃহে দীপ জ্বালিবার জন্য এক্ষণে মাসিক চারি আনা মাত্র তৈলের ব্যবস্থা হইয়াছে!

চক্ মস্‌জিদ

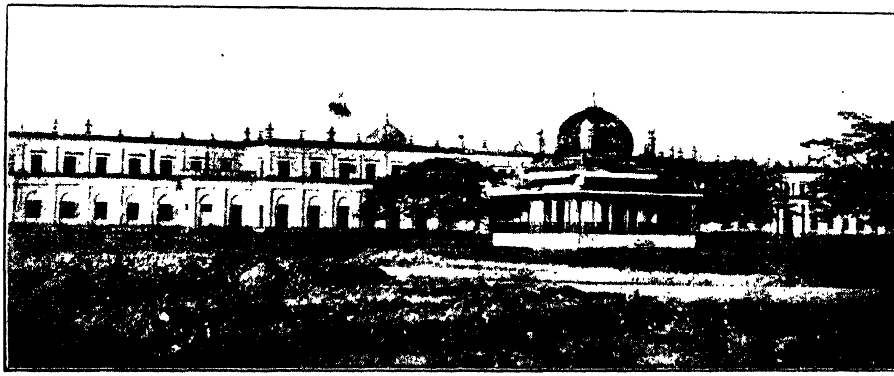
ইহা অদ্যাপি মুর্শিদাবাদ সহরে বিদ্যমান থাকিয়া মীর্জ্জাফরের প্রিয়তমা মহিষী মণিবেগমের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে মণিবেগমের অর্থ সাহায্যে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। দানশীলতার জন্য লোকে মণিবেগমকে কোম্পানীর মাতা বা 'Mother O' Company' বলিয়া অভিহিত করিত।

ইমামবারা

বর্ত্তমান ইমাম্‌বারা সিরাজ-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত পুরাতন ইমাম্‌বারার সন্নিকটেই অবস্থিত। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে নবাবনাজিম ফেরাদুন জা ছয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহা নির্ম্মাণ করান। মুসলমানগণের পবিত্র তীর্থ মক্কা হইতে মৃত্তিকা আনিয়া এই সুবৃহৎ অট্টালিকার মধ্যস্থলে প্রোথিত করা হয়। শুনা যায়, কেবল মুসলমানদিগের দ্বারাই ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। এই সৌধের একস্থলে পারস্যভাষায় যাহা খোদিত আছে, তাহার মর্ম্মার্থ এই—'ভারতে অপর একটী কারবালা স্থাপিত হইল।'



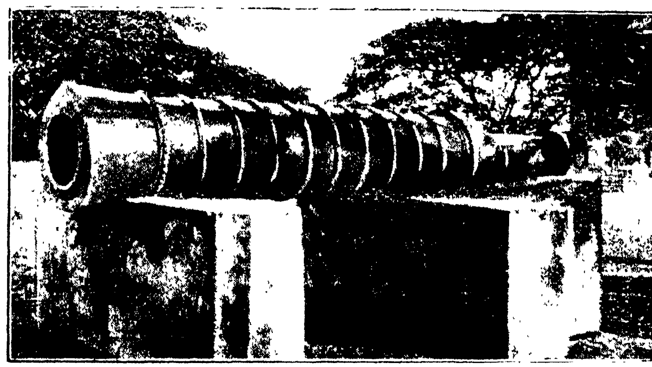
চক্ মসজিদ।



ইমামবারা

ঢাকা কামান

কাটরার এক মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে এই কামানটী কাষ্ঠখণ্ডের উপর স্থাপিত রহিয়াছে। বহুদিন হইতেই এই কামানটী জমিতে পড়িয়া ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই কামানের নিম্নস্থ জমি হইতে উত্থিত একটী পিপুল বৃক্ষের শিকড় সাহায্যে কামানটী পাঁচ ফুট উচ্চে স্থাপিত হয়।



ঢাকা কামান।



ণ্টার সাহেব 'জাহান-কোষা' তোপকে ঢাকা কামান ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

জাফরাগঞ্জ

এইস্থানেই সিরাজের হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়। একজন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন,—ইহা বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার মোগল স্বাধীনতার সমাধি। যে গৃহে নির্ম্মম নিষ্ঠুর মহম্মদী বেগ অস্ত্রাঘাতে সিরাজকে হত্যা করে, মুর্শিদাবাদবাসিগণ অদ্যাপি তাহাকে "নেমকহারামী দেউরী" বলিয়া থাকে। আলিবর্দ্দীর প্রিয় দৌহিত্র—বাঙ্গালার শেষ হতভাগ্য নবাবের শোচনীয় পরিণাম অবলোকন করিয়া, ধনজন-যৌবন-গর্ব্ব-গর্ব্বিত সিরাজের দোষের তুলনায় শাস্তির নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতা দর্শনে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হয় নাই কে?



মোতিঝিলে ঘসিটী বেগমের প্রাসাদের প্রবেশদ্বার।

এই জাফ্‌রাগঞ্জ আবার বঙ্গের শেষ নবাব-নাজিম-গণের সমাধিভবন। এই স্থানে নবাব মীর্জ্জাফর হইতে তদ্বংশীয় নবাব-নাজিমগণ সমাহিত আছেন। মীর্জ্জাফর-বনিতা মণিবেগম ও বব্বুবেগমও এই সমাধি-ভবনে চিরনিদ্রিতা।

সিরাজের বধ্যভূমি ও নবাব নাজিমগণের সমাধি-স্থল বলিয়া জাফ্‌রাগঞ্জ ঐতিহাসিকের নিকট বড় আদরের সামগ্রী।

মোতিঝিল

ইহা বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত। রেনেল, হামিলটন্ প্রভৃতি অনুমান করেন যে, পূর্ব্বে ইহা ভাগীরথীর গর্ভ ছিল। উভয় পার্শ্বের প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া এই-রূপ ঝিলে পরিণত হইয়াছে। ইহার গর্ভে বহু শুক্তি পাওয়া যাইত বলিয়া ইহার নামকরণ মোতিঝিল হইয়াছে।

নওয়াজিস মহম্মদের সহিত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সিরাজের সদ্ভাব ছিল না। আলিবর্দ্দী সিরাজকে প্রকাশ্যভাবে উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিলে, নওয়াজিস্ মহম্মদ রাজধানী হইতে দূরে একটী সুরক্ষিত স্থানে বাস করিতে সঙ্কল্প করেন এবং মোতিঝিলের অবস্থান তাঁহার ইচ্ছানুরূপ হওয়ায়, ইহারই তীরে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন।

মোতিঝিলের সুরম্য প্রাসাদের সন্নিকটেই একটী



মোতিঝিলের নিকট পুরাতন মস্‌জিদ।

মস্‌জিদ ও অতিথিশালা আছে। ১১৬৩ হিজিরা (১৭৫০।৫১ খৃঃ) ইহা নির্ম্মিত হয়। মস্‌জিদটী অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। নওয়াজিস এই মস্‌জিদ ও অতিথিশালার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতেন।



চক্ মস্‌জিদ।

মুর্শিদকুলি খাঁর সমাধি

মুর্শিদাবাদের অনতিদূরে যে বিরাট্ ভগ্নপ্রায় মসজিদ আজিও সগৌরবে মস্তকোত্তলন করিয়া রহিয়াছে—তাহাই মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠাতা মুর্শিদ-কুলির সমাধি। কাটরা নামক স্থানে এই মস্‌জিদ

নির্ম্মিত হয় বলিয়া লোকে ইহাকে কাটরার মসজিদও বলিয়া থাকে।

মুর্শিদকুলি, নিজের স্বাস্থ্যের অবস্থা সুবিধাজনক নয় বুঝিয়া জীবদ্দশাতেই মন্দির নির্ম্মাণের আদেশ দেন। ১১৩৭ হিজিরায় মক্কার প্রসিদ্ধ মন্দিরের অনুকল্পে এই মসজিদ নির্ম্মিত হয়। নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইবার অল্পদিন পরেই ১১৩৯ হিজিরায় মুর্শিদ-কুলির মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তিনি এই মসজিদে সমাহিত হন।



মুর্শিদকুলিখাঁর সমাধি।

কিন্তু হায়! কাটরা মসজিদের বর্ত্তমান ভগ্নাবস্থা দেখিয়া মনে হয়, বুঝি বা নির্ম্মম কাল অল্পদিন পরেই মুর্শিদাবাদ হইতে মুর্শিদকুলির সম্বন্ধ লোপ করিয়া দিবে!

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বারাঙ্গনা।

১

কালামুখী হতভাগি! "মৃগ শিকারের" লাগি
এ মহা ছলনা—
করি নিত্য নানা ছাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ
পুলকে মগনা!
কে অবোধ ভাগ্যহীন পড়ি যাবে জালে,
সকলি বিকায়ে পদে মরিবে অকালে!

২

ওরে নারি নিরমমা, পাষাণী রাক্ষসী সমা,
হাসি রঙ্গে মনে,
রক্ত মাংস শুষি নিয়ে, দীন হীন সাজাইয়ে
দিলি অভাজনে!
"বিজয় নিশান" সেই পরশে অম্বর—
নারী আর রাক্ষসীতে এতই অন্তর!

৩

এত ভ্রান্ত চিত্ত নর ভাবে না কি "তারপর?"
বুঝিয়া বোঝেনা—
উন্মত্ত পতঙ্গ প্রায়, দীপ্ত কালানলে ধায়,
ফিরিতে পারে না?—
"অদৃষ্ট" কাহারে ব'ল এ যে কর্ম্ম ফল,
বিধি তো সংযম দেছে চিত্তে দেছে বল?

৪

মাতৃ চক্ষে অশ্রুধারা, পতিপ্রাণা পতিহারা,
পুত্র কন্যা কাঁদে,
তবু এ মোহের ঘোর, ভাঙেনা নির্ব্বোধ তোর,
পড়ে আছ ফাঁদে!—
শিহরিয়া উঠে দেহ—এত ভুল মনে,
সুধা ভাবি কালকূটে মজিলি কেমনে?



অম্বর প্রাসাদের অভ্যন্তর।

৫

হায় অন্ধ! দেখ্ চেয়ে, যার গা'র গন্ধ পেয়ে,
কৃমি কীট ছুটে,
যাহার বাতাস পাপ, মূর্ত্তিমতী অভিশাপ,
চতুর্ব্বর্গ লুটে!—
তুই তার ক্রীতদাস, খেলিবার ঘুটি,
জীবন মরণ—ছি ছি, তারি পায়ে লুটি!

৬

ওর ও চাহনি হাসি, ও যে মরণের ফাঁসি,
নির্দ্দয় নির্ম্মম,
লালসা লোলুপ চক্ষে, অভাগা! লইছ বক্ষে
কাল ভুজঙ্গম!
ছি ছি ছি পুরুষ তুমি, পশুবৃত্ত অত,
মরিবে?—মরিয়া যাও মানুষের মত।

৭

আর তো সহেনা দুঃখ, ফিরে যা—ঘরে যা মূর্খ,
সে যে স্বর্গধাম,
মা'র আঁখিজল মুছি, আবার হইবি শুচি,
লভিবি আরাম;
প'ড় গে' সতীর পা'য়, তারি পুণ্য-শুভ্রতায়,
মুছি যাবে ঘুচি যাবে কলঙ্কের কালি,
সন্তানের চাঁদ মুখ, ভরিবে আনন্দ, সুখ,
দেবতা দিবেন শিরে স্নেহাশীষ ঢালি।

শ্রীবীরকুমার বধ-রচয়িত্রী।

ফুলের তোড়া

পূজার ছুটি উপলক্ষে কোর্ট বন্ধ হইল। চোগা চাপকান ফেলিয়া বাঁচিলাম। এইবার একবার ম্যালেরিয়া-জীর্ণ শরীরটাকে মেরামত করিয়া লইতে হইবে।

অনেক পরামর্শের পর স্থির হইল বাঁকীপুরে চিঠি লিখিয়া জানিতে হইবে সেখানে যাওয়া চলিবে কি না। প্লেগের জন্যই কাকা মহাশয়ের ভয়। যামিনী আমার বন্ধু, সে এখন বাঁকীপুরে ডেপুটী। প্রায় আট বৎসর সে ঐখানেই অচল হইয়া বসিয়া আছে। তাহাকেই চিঠি লিখিলাম—জল বায়ুর কথাও জিজ্ঞাসা করিলাম—সেটা যদি নিরাপদ হয়, তবে আমার জন্য সুবিধামত একটি বাসা সে খুঁজিয়া দিতে পারে কি না তাহাও জানাইতে কহিলাম। পত্রের উত্তর আসিল। যামিনী আমার বাসা খুঁজিয়া দিবার অনুরোধে অভিমান করিয়াছে। লিখিয়াছে, শীতের আরম্ভে প্লেগের প্রকোপ সেখানে কমই থাকে, এখন শরীর সারিবার পক্ষে উৎকৃষ্ট সময়। তাহার বাটীতে যতদিন ইচ্ছা আতিথ্য গ্রহণের জন্য সাদর নিমন্ত্রণে পত্রের উপসংহার করিয়াছে।

দেবীপক্ষে যাত্রার দিনক্ষণ দেখিবার প্রয়োজন হয় না। টিকিটের কন্‌সেস্‌নও আরম্ভ হইয়াছিল। জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়া দুইদিন পরেই যাত্রা করিলাম।

বাঁকীপুর ষ্টেশনে যামিনীর পুত্রদ্বয় শ্রীমান মৌলিভূষণ ও ময়ূখভূষণ আমায় অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য পিতার আর্দ্দালীর সহিত প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া ছিল। ডেপুটী যামিনী বাবুর বাড়ী আমি যাইব শুনিয়া ছেলে দুটি আমায় প্রণাম করিয়া "কাকা বাবু" বলিয়া দুইদিক হইতে দুইখানা হাত দখল করিয়া ফেলিল। আর্দ্দালী, কুলী ডাকাইয়া জিনিষ পত্র নামাইয়া লইল। প্রণাম ও সম্বোধন সম্বন্ধে বোধকরি পূর্ব্বাহ্ণেই ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া ছিল, কারণ তাহারা আমায় আর কখনও দেখে নাই। প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমি আর একবার এখানে যামিনীর বাসায় আসিয়াছিলাম, তখন ময়ূখ ওরফে মণ্টু জন্মগ্রহণ করে নাই; মুলী তখন মাস কতকের শিশুমাত্র। ছেলেদুটিকে আদর করিয়া চুম্বন করিলাম—যেন দুটি ননীর পুঁতুল! যামিনীর সন্তান-ভাগ্য ভাল।

একটা উচ্ছ্বসিত বেদনার নিঃশ্বাস রোধ করিতে পারিলাম না। সেইটি—যামিনীর সেই প্রথমকারটি—সে আজ কোথায়? সে আমার ভাল করিয়াই চিনিত; যদি বাঁচিয়া থাকিত, সেও কি ষ্টেশনে আসিত না? তেমন রং, তেমন গঠন হাজারে একটা চোখে পড়ে না। মুখখানিও ছিল নিখুঁত সুন্দর! কি মিষ্টিই ছিল তার হাসিটুকু আর কথাগুলি! মনে হয় যেন সেদিনের কথা—কিন্তু তাহা পাঁচ বৎসর হইয়া গিয়াছে।

গাড়ী ষ্টেশনের পথ ছাড়াইয়া বাড়ী পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শ্রীমান্ মুলী ও মণ্টুর সহিত আমার সখ্য গাঢ় হইয়া উঠিল। তাহাদের কয়টি পায়রা, কতগুলি বিড়াল ছানা, খাঁচায় বদ্ধ ময়ুরা নীলকণ্ঠ পাখীর অদ্ভুত ইতিহাস—কিছুই আর আমার অজ্ঞাত রহিল না। মণ্টু যখন আধ-আধ বাধ-বাধ ভাষায় তাহার নাম বলিল—অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া মুলী তাহার ভ্রম সংশোধন করিয়া বলিল, "ভাইটি ছেলেমানুছ কি না তাই ময়ূখ বল্‌তে পারে না ময়ূছ বলে!" মৌলির বয়স এখন ছয়, সুতরাং তাহার নাম বলিতে বাধিল না—ছিযুক্ত বাবু মৌলিভূষণ। আমি যখন বাড়ী আসিয়া ট্রাঙ্ক খুলিয়া তাহাদের জন্য আনীত টিনের মোটর-কার, রবারের বল, কাঠের ঘোড়া বাহির করিয়া দিলাম, তখন কাকাবাবুর প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধার আর অন্ত রহিল না।

(২)

যামিনীর বাসাটি হাল ফ্যাসানের বাংলা। দেয়াল-গুলি পাকা ইঁটের গাঁথনি, সাদা চূণকাম করা, ছাদ রাঙ্গাটালীর ছাওয়া। বাড়ীর চারিধারে বাগান, মাঝে মাঝে চলন পথ, কোথাও চাকরদের ঘর। পশ্চাদ্দেশে আস্তাবল। বাগানের বাহিরে সরকারী রাস্তা। রাস্তার অপর পারে দুইচারিখানা খোলার ঘর। তাহার পশ্চাতে প্রকাণ্ড আম-বাগান। গ্রীষ্মকালে বানর তাড়াইয়া ফল রক্ষা করিবার জন্য ঝুপড়ি বাঁধিয়া মালী বাগানে আসিয়া বাস করে, এখন মাটীর দেওয়াল্ ফুসের চাউনি ছোট ছোট ঝুপড়িগুলা খালি পড়িয়া আছে। খোলার ঘর কয়খানার মধ্যে একখানা মুদীর দোকান, একখানা পাণওয়ালার দোকান, বাকী দুইখানা লইয়া যামিনীর বাগানের মালীর বাড়ী। মালী বুড়া মানুষ, তাহার উপর বাতে পঙ্গু—কাজ কর্ম্ম কিছুই করিতে পারে না। বাগানে ঘাস গজাইয়া জঙ্গল হইয়া উঠিলে একবার নগ্‌দা মজুর লাগাইয়া বাগান সাফ করাইয়া লওয়া হয়। ফুলগাছগুলা জলাভাবে অনেক সময় শুকাইয়া যায়—ধরিত্রীর স্নেহে তাহারা যতটুকু জীবন-রস সঞ্চয় করিতে পারে, সেইটুকুই মাত্র তাহাদের খোরাক। সে বার যখন আসিয়াছিলাম, যামিনীর তখন বাগানের ভারি সখ ছিল। তেমন গোলাপ আর কাহারও বাগানে ফুটিত না, ততবড় মল্লিকা বেহারে আর কোথাও ছিল না।—এখন তাল পুকুরের নামের মত "ডেব্‌টি সাহেবের" বাগানের নামই আছে—সে সব অতীতের চিহ্ন আর কিছুই নাই।

এবার আসিয়া অবধি যামিনীর একটু পরিবর্ত্তন আমি লক্ষ্য করিতেছিলাম। পূর্ব্বের সে হাসিখুসী তাহার আর নাই—যেন কিছু গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে। আমি যখন মুলী মণ্টুর সহিত সমবয়সী সাজিয়া পূরা উৎসাহে খেলায় যোগ দিতাম—যামিনী গম্ভীরমুখে উদাসীনের মত বসিয়া দেখিত, উৎসাহ দেখাইত না যোগও দিত না। মণ্টু আধ আধ সুরে—"লাম লহিম না জুদা কলো দিল্‌কো সাচ্চা লাখো জী--দেছেল কথা ভাব ভাইলে দেছ আমাদেল মাতা জী" গাহিয়া শুনাইত, মুলী তাহার উচ্চারণ ভ্রম সংশোধন চেষ্টায় বিপন্ন হইয়া পড়িত। আমি হাসি খেলায় যোগ দিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতাম। শেষে চাহিয়া দেখিতাম যামিনী তাহার দুই উদাসনেত্র রাস্তার ধারের তেঁতুল গাছটার উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া আছে; এ সব আনন্দের কল্লোল কোলাহল তাহার অন্তরে কোন উচ্ছ্বাস জাগাইতে পারে নাই। হয়ত তখন আর একখানি মধুর মুখের করুণস্মৃতি তাহার মনের মাঝে ফুটিয়া থাকিত। চারুর কথা সে একদিনও

ভুলে নাই, তাহার সম্বন্ধে কোন আলোচনাই সে করিত না। সে যখন দুপুর বেলা কাছারীতে আবদ্ধ থাকিত, তখন কোন কোন দিন অন্তঃপুর হইতে চারুর মার করুণ ক্রন্দনের মৃদুধ্বনি আসিয়া আমার বুকেও একটা অস্ফুট ব্যথা জাগাইয়া তুলিত। কিন্তু যামিনীর বাক্যালাপে তাহার এতটুকুও আভাস কোন দিন শুনিলাম না। তাহার হৃদয়ের ক্ষত যে কতখানি গভীর—তাহার অন্তরলীন উচ্ছ্বাসহীন শোকই তাহার পরিচায়ক।

কিছুদিন হইতে আর একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম। প্রতি সন্ধ্যায় যখন দিকচক্রবালে সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখাটুকুও মিলাইয়া গিয়া, ধরণীর বক্ষে ছায়া ফেলিয়া অন্ধকার নামিয়া আসিত, "ভীখণ-দাসের" ঠাকুরবাড়ীতে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিত, ঘরে ঘরে দীপ জ্বালিয়া দিত, তখন সহস্র কার্য্য ফেলিয়াও, যামিনী তাহার রাস্তার ধারের বারান্দাটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। তাহার দৃষ্টির অনুসরণে আমিও কত দিন সেই দিকে চাহিয়া দেখিয়াছি। মালীর ঘরের ঠিক সম্মুখে রেলিংঘেরা একটুখানি জমির ভিতর গাঁদাফুলের কেয়ারি করা গাছের মধ্যে ছোট একটি পাথরের ঢিবি। কতদিন সেটির দিকে চাহিয়া দেখিয়াছি, হিন্দিতে কোন মৃতের নামও সে স্মারক-স্তম্ভে লেখা আছে। গাঁদাফুলের প্রাচুর্য্য বশতঃ সহজেই সেদিকে লোকের চক্ষু আকৃষ্ট হয়। প্রতি সন্ধ্যায় হলুদ রঙের কাপড় পরা, ফাঁদি নথ নাকে একটি ছোট মেয়ে তার ভূষণবিহীন হাতখানিতে একটি মৃৎ-প্রদীপ জ্বালিয়া ঢিবির উপর আলো রাখিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইত। কোথায় যাইত তাহাও দেখিতে পাইতাম। দৃশ্যটি করুণ। হয়ত ঐ স্তম্ভটি উহারই কোন প্রিয়জনের পুণ্যস্মৃতির তীর্থভূমি। কিন্তু যামিনী ইহাতে এমন কি রস পায় বুঝিতে পারিতাম না। প্রতিদিন দেখিয়াও তাহার আশা মেটে না!

একদিন যামিনীকে ধরিয়া বসিলাম, "ব্যাপার কি বল দেখি? মেয়েটি রোজ ওখানে আলো দেয় কেন? ও মালীর নাত্‌নী না?"

যামিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "ওর বাপের স্মৃতি ওরই ভিতর ঘুমিয়ে আছে, যমুনা তাই রোজ আলো দিয়ে যায়।"

আমি কহিলাম, "আহা। বড় দুঃখের বিষয় ত! যমুনা বল্লে বুঝি মেয়েটির নাম? তা যমুনা ছাড়া বুড়োর আর কেউ নেই?"

ঘটির গলায় দড়ি বাঁধিয়া ঐ ছোট মেয়েটিকেই কূপ হইতে জল তুলিতে দেখি, পথের ধারে পোড়া বগনো লইয়া মাজিতে দেখি, আর কাহাকেও কথনও দেখি নাই--তাই একটুখানি বিস্ময় বোধও করিয়াছিলাম।

যামিনী মুখ ফিরাইয়া কহিল, "না ওদের আর কেউ নেই। ওরাই দুজনে পরস্পরের অবলম্বন।"

মনে হইল আমার প্রশ্নে যামিনী যেন ব্যথা পাইয়াছে, কিন্তু কারণ বুঝিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওদের কি হয়েছিল?"

যামিনী বলিল "সে শুনে কি করবে? সে বড় দুঃখের কাহিনী।"

মনের কৌতূহল আমি দমন করিতে পারিলাম না। সে কাহিনী শুনিবার জন্য আগ্রহ জানাইলাম।

যামিনী উঠিয়া লম্বা দালানটা বার দুই এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিক্রমণ করিয়া আসিয়া পুনরায় আসন গ্রহণ করিল। কহিল, "শোন তবে"—

(৩)

যামিনী বলিতে লাগিল—

আট বৎসর পূর্ব্বে বক্‌সার হইতে বদলী হইয়া আমি যখন এখানে আসিলাম, তখন সঙ্গে ছিল আমার স্ত্রী আর আমার মেয়ে চারু। এই বাড়ীতেই আমি প্রথম আসিয়া উঠি; আর তখন হইতেই ঐ বুড়া গোকুল আমার বাগানের মালী। তখন সে একা নয়—তাহার স্ত্রী ও পুত্র সীতারাম তাহার সঙ্গে ছিল। সীতারামেরও বিবাহ হইয়াছিল কিন্তু তাহার স্ত্রী তখন পিত্রালয়ে—আসন্নপ্রসবা।

গোকুল তখন পূর্ণ উৎসাহে যুবকের ন্যায় কাজ করিত। সীতারাম বাপের সাহায্য করিত। তাহাদের কাজের পরিচয় আমার বাগান দেখিয়াই লোকে বুঝিতে পারিত। ছেলেটি যেমন কর্ম্মদক্ষ তেমনি বুদ্ধিমান ও বিনয়ী। আমরা সকলেই তাহাকে স্নেহ করিতাম। আমার চারুকে সে একেবারে বশ করিয়া লইয়াছিল। সীতারাম নহিলে তাহার দুধ খাওয়া হইত না, পোষাক পরা চলিত না, বেড়াইতে যাইবার সময়ও তাহাকে প্রয়োজন হইত। রাত্রে গল্প বলিবার জন্য, ঘুমাইবার সময়ও "সীতারাম ভাইয়া"র তলব পড়িত।

ক্রমে চারুকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য আমরা খুব মনোযোগী হইয়া উঠিলাম। বালিকা বিদ্যালয়ে তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া দিলাম। সন্ধ্যায় মাষ্টার আসিয়া তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে লাগিল। "সীতারাম ভাইয়া" তাহাকে স্কুলে পৌছিয়া দিয়া আসিত, সঙ্গে করিয়া বাড়ী আনিত। এইরূপ কিছুদিন যায়। একদিন সীতারামের মার কান্না শুনিয়া খবর লইয়া জানিলাম, সীতারামের 'নকরী' হইয়াছে, সে মুঙ্গের যাইবে। ভারী নাকি মান্যের কাজ, সে জমাদারের পদ পাইয়াছে। খবর শুনিয়া খুসী হইলাম। ছেলেটি ভাল, ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে। চারুর জন্য ভাবনাও হইল। বুঝি মনে মনে একটুখানি আনন্দও হইয়াছিল—খেলা গল্পের লোভ কমিলে লেখাপড়ায় তাহার চাড় হইবে।

একদিন সকাল বেলা, নূতন জামা টুপী ও ময়লা কাপড়ে সাজিয়া আমার পায়ের কাছে দীর্ঘচ্ছন্দে এক প্রণাম করিয়া, "খোকীদিদির" কাছে বিদায় লইয়া সীতারাম মুঙ্গের চলিয়া গেল। যতক্ষণ দেখা গেল, চারু জানালার উপর উবুড় হইয়া পড়িয়া তাহাকে দেখিতেছিল। যখন গাছের ঝোপে, মোড়ের বাঁকে আড়াল পড়িয়া আর "ভাইয়া"কে দেখা গেল না, তখন সে ছল ছল নেত্রে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইল।

তার পর কিছুদিন ধরিয়া চারুর অকারণ বিদ্রোহ থামাইতে দাসী চাকরদের কষ্টের শেষ রহিল না। দিনরাত নানা ছুতায় কান্না বাহানায় বিরক্ত হইয়া চারুর মা আমার কাছে নালিশ করিতেন, "মেয়েকে কিছু বল্‌বে না—এর পর সামলাবে কেমন করে?" আমি জানিতাম কেন সে কাঁদে। স্ত্রীকে প্রবোধ দিতাম, "ভয় নেই বড় হলে আপ্‌নিই সেরে যাবে—এক আধ-বার কাঁদ্‌তে না পেলে ছেলেমানুষ পারবে কেন?"

সময়ে সীতারামের অভাব দুঃখ চারুর মন হইতে কমিয়া আসিল। লেখাপড়ার নূতন উৎসাহে মাতিয়া মালীর বাড়ী যাতায়াতও সে প্রায় বন্ধ করিল। আমরাও হাঁফ্‌ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সেই সময়ই বোধ হয় তুমি তোমার কাকার মেয়ের জন্য পাত্রের সন্ধানে এখানে আসিয়াছিলে। আমি তখন অন্তরে বাহিরে পুরাদস্তর "সাহেব"। সাহেবী ধরণে পা ফাঁক করিয়া চুরুট খাওয়া হইতে হাঁচি কাসিটির অনুকরণেও ভুল করি না। তাই চারুর উজ্জ্বলবর্ণ ও বিশেষ তাহার কটাচুল আমার গর্ব্বের বিষয় ছিল। চারুর মা অনেক বিখ্যাত ও অখ্যাত কেশ তৈলে তার কটা চুলের দোষ ত্রুটি সংশোধন করিবার জন্য ব্যস্ত হইলে তাহাকে মিনতি করিয়া বলিতাম, "চারুকে তোমার শিক্ষা থেকে রেহাই দাও। তোমার নিজের উপর যত ইচ্ছে অত্যাচার কর কেউ বাধা দেবে না, ওকে আমার পছন্দ মত করে মানুষ করে তুল্‌তে দাও।" স্ত্রী রাগ করিয়া বলিতেন, "এর পর যখন কটাচুলো বলে কেউ পছন্দ কর্‌বে না তখন মেয়েকে বিবি করবার মজা টের পাবে।" আমি তাহার শাসনে ভয় না পাইয়া হাসিতাম।

স্ত্রীকে নিভৃতে একদিন কহিলাম, "চারুকে আমি সাহেব সুবার কাছে বার্ করবার মত করে গড়ে তুল্‌ব,—দোহাই তোমার, তুমি ওর উপর শত্রুতা সাধ্‌তে এস না।" স্ত্রী শুনিয়া প্রথমে অবাক হইয়া গেলেন। প্রথম প্রথম কিছুদিন রাগ করিতেন—অবশেষে হাল ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ফলে আমার ইচ্ছাই জয়ী হইল।

চারুকে আমি আমার আদর্শের মত করিয়াই গড়িয়া তুলিতেছিলাম। ছয় বৎসরের মেয়ে তেমন ইংরাজী সুরে কথা বলিতে বাঙ্গালীর ঘরে খুব কমই পারে।

তবু আমি জানিতাম, সে তাহার মায়ের নীতি পদ্ধতিই পছন্দ করে। সে পা ঢাকিয়া শাড়ী পরিতেই ভাল বাসিত, কিন্তু আমায় খুসী করিবার জন্য খাটো ফ্রক, জুতা মোজা পরিয়া থাকিত।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া যামিনী হঠাৎ চুপ করিল। তাহার মুখ পানে চাহিয়া দেখিলাম—চক্ষু দুটিতে জল ভরিয়া আসিয়াছে। তাহা দেখিয়া আমারও চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

এই সময় এক চাপরাসী কি কতকগুলা কাগজপত্র আনিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। যামিনী সেগুলা পড়িয়া, হুকুম লিখিয়া দিল। এই কার্য্যে পাঁচ সাত মিনিট অতিবাহিত হইল।

(৪)

চাপরাসিটা চলিয়া গেলে দেখিলাম, যামিনী অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। আবার সে বলিতে আরম্ভ করিল—

একদিন খবরের কাগজে পড়িলাম, মুঙ্গেরে এক ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটের ছেলে নৌকায় জল বিহারকালে ঘূর্ণি জলে পড়িয়া যায়। সেখানটায় নাকি প্রকাণ্ড এক দহ ছিল, আর সে দহের সম্বন্ধে অনেক ভৌতিক প্রবাদও প্রচলিত ছিল, তাই মাঝি মাল্লা কেহ তাহাকে তুলিতে জলে নামে নাই! জমাদার সীতারাম নদী তীরে সেই সময় সরকারী কাজে নৌকা ডাকিতে আসিয়া, সেই অবস্থা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সাহসে ঘূর্ণ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বালককে উদ্ধার করে। সেই সাহসী পরোপকারী যুবাকে গবর্ণমেণ্ট "সম্মানের মেডেল" পুরস্কার দিয়াছেন। সংবাদটা আমি তৎক্ষণাৎ চারুকে ডাকিয়া শুনাইলাম।—তাহার চক্ষু দুইটি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

তখন বড়লাট সাহেবের বাঁকীপুরে আসিবার দিন সন্নিকট। সারা সহরটা সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। মিউনিসিপালিটি দীর্ঘকালের নিদ্রা ভঙ্গের পর বহুদিনের কর্ত্তব্যের ত্রুটি দুই দিনে সারিয়া ফেলিবার জন্য বদ্ধপরিকর। রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও মেরামত করার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। চিরদিনের সঞ্চিত ধুলা, চন্দনের ছড়ার পরিবর্ত্তে তৈল জলে সিঞ্চিত হইয়া গেল। বড় বড় বাড়ী চুণকামের নূতন পোষাক পরিয়া লইল। ষ্টেশন হইতে পথের উভয় পার্শ্বে প্রত্যেক বাড়ী ও দরজার মাথায় দেবদারু পাতার মালা টাঙ্গান হইল। কেহ কেহ দরজার দুই ধারে কলাগাছ দিয়া মঙ্গলাচরণ করিলেন। "লাইনের মাঠে" আলো দিবার ও বাজী পোড়াইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। দেশের ছেলে-মেয়েদের বাজী দেখিবার আনন্দে অনিদ্রা রোগ জন্মাইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। লাট সাহেবের গমন পথের দুই ধারে পুলিশ আফসাররা কোথাও ছদ্মবেশে কোথাও স্ব-মূর্ত্তিতে সতর্ক হইয়া রহিলেন।

এই উপলক্ষে পোষাকের দোকানের দর্জ্জি মিঞা সাহেবদের কদর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। বাবু সাহেবদের ফরমাসী পোষাক তৈয়ার করিয়া, তাহারা আর আহার নিদ্রার অবসর পায় না। কালকাতা হইতে আমিও চারুর জন্য এক প্রস্থ পোষাক আনাইলাম। চারুর মা সঞ্চয়-নীতির চিরন্তন নিয়মানুসারে পোষাক দেখিয়াই অপছন্দ করিলেন। "এত খাটো—এ ত দুমাসও পর্‌তে পাবে না! মেয়ে ত দিন দিন তালগাছই হচ্চে—আর কি ঐ ঠ্যাং বেরকরা ফ্রকে মানায়? কি যে তোমার পছন্দের শ্রী! নীলাম্বরী শাড়ীখানি পরে জ্যাকেট গায়ে দিলে খাসা মানাত। খামখা কতকগুলো পয়সা জলে ফেলা—যেন খোলামকুচি!" অবুঝকে বুঝাইবার বৃথা পরিশ্রম না করিয়া কহিলাম, "হোক, একটা মেয়ে বইত নয়! কতই আর ওর জন্যে খরচ কর? না হয় এবারটা কিছু লোক্‌সানই কর্‌লে।"—স্ত্রী অবশ্য বুঝিলেন না।

চারুকে কহিলাম, "ফুলঝরিয়ার কাছে গিয়ে পোষাকটা পরে আয় ত চারু, কেমন দেখায় আমি আগে দেখি।" মেয়ে তার সাজ সজ্জা লইয়া চলিয়া গেল। ফিরিতে তাহার বিলম্ব দেখিয়া নিজেই খোঁজে গেলাম।

সেখানে গিয়া শুনিলাম, মুদি তামাসা করিয়া সীতারামের মাকে বলিয়াছে, "তোমার সীতারাম

আস্‌চে যে। তাই এ সব হচ্চে। কোম্পানী বাহাদুর তাকে বিলেত থেকে নিজের হাতে তক্তি পাঠিয়ে দিয়েচে—আর দেশের লোকে আলো দেবে না—ধুম ধাম কর্‌বে না? কত বড় বীর তোমার ছেলে!”—বুড়ী সেই কথা সত্য মনে করিয়া সকলকে ডাকিয়া ডাকিয়া তাহা শুনাইতেছে।

সীতারাম যে কাল দেশে আসিবে, এ খবর আমিও চারুর কাছে খুব কম পঞ্চাশ বার শুনিয়াছি। সীতারামের মা তাহার জন্য কত রকম পিঠা, কত প্রকার ব্যঞ্জন আর কি যে সব তৈয়ারী করিতেছে—সে কথাও আমার আর অজ্ঞাত নাই। কিন্তু আমার তখন সীতারামের ভাবনার চেয়ে অনেক বেশী ভাবনা রহিয়াছে, চারু কেমন করিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট অভিনয়টুকু সম্পন্ন করিবে। হাজার বার পরীক্ষা দিয়া দিয়া চারুও ক্রমে যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল।

(৫)

পরদিন সস্ত্রীক লাটসাহেব বিহারবাসীর অতিথির বেশে আসিয়া দেখা দিলেন। দ্বারভাঙ্গার মহারাজের প্রকাণ্ড বাগান-বাড়ীখানা তাঁহার বাসের জন্য সাজান হইয়াছিল। দেশে উৎসব উৎসাহের অন্ত ছিলনা। হুজুগপ্রিয়েরা হুজুগ খুঁজিয়া, আর আমরা সরকারী কর্ম্মচারীরা সেলাম দিবার শুভ মুহূর্ত্ত খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম।

পাটনার নবাব সম্প্রদায় লাটসাহেবকে সেখান কার খোদাবক্‌স লাইব্রেরী দেখিতে যাইবার নিমন্ত্রণ করিলেন। আমাদের কমিটিতে স্থির হইল, সেই-দিন চারু লাটপত্নীর হাতে ফুলের তোড়া দিয়া স্বাগত বন্দনা শুনাইবে।

সেদিন প্রাতে বাগানের বাছাবাছা ফুলপাতায় একটা প্রকাণ্ড তোড়া তৈয়ারি করিয়া গোকুল যখন আমায় দিয়া গেল, তখন জানাইয়া গেল, সেইদিনই তাহার সীতারাম বাড়ী আসিবে। চারু আমার কাছেই ছিল, আনন্দে তাহার কালো চোখে যেন আলো চমকিয়া উঠিল। অন্তরে বাহিরে সে যেন ছাড়া পাইবার জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করিতে-ছিল। কিন্তু আমার তখন তাহার উপর সহানুভূতি ছিল না। সে যে কেমন করিয়া নির্ভুল ভাবে নিজ ভূমিকাটুকু অভিনয় করিবে, সেই চিন্তাতেই আমি বিমনা ছিলাম। তাহার চুলে সাবান পাউডার দিয়া মাজিয়া ঘষিয়া, তাহার স্বাভাবিক শ্রীকে আরও উজ্জ্বল করিয়া পোষাক পরাইয়া গাড়ীতে তুলিয়া লইলাম। সে একবার কেবল বলিল, “আজ সীতারাম ভাইয়া আস্‌বে বাবা।”

আমি বলিলাম “জানি। ততক্ষণে তুমিও ফিরে আস্‌বে?”

চারু প্রকাণ্ড ফুলের তোড়াটির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। গাড়ী খোদাবক্স লাইব্রেরিতে গিয়া পৌছিল।

পত্র-পুষ্প-ভূষিত তোরণদ্বারে ফুলের তোড়া হাতে লইয়া চারু দাঁড়াইয়া রহিল।

যথাসময়ে পত্নীসহ লাটসাহেব আসিয়া পৌছিলেন। তাঁহারা গাড়ী হইতে নামিবামাত্র, চারু অভিবাদন করিয়া লাটপত্নীর হস্তে ফুলের তোড়াটি দিয়া বন্দনা আবৃত্তি করিল। কথাগুলি সুস্পষ্ট ও যথাযথ ভাবে উচ্চারণ করিতে পারায় শুধু আমার নয়—সমাগত সকল সম্ভ্রান্ত লোকের চোখেই সাফল্যের গর্ব্ব ফুটিয়া উঠিল। লাটপত্নী মধুর হাসি হাসিয়া, চারুকে ধন্যবাদ দিয়া ফুলের তোড়াটি লইলেন। দুইতিনবার হাসিমুখে চারুর দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

লাটপত্নী লাইব্রেরি দেখিতে গিয়াছেন, লাটসাহেব নবাব রাজা মহারাজাদের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন, আমরা বাগানে চারুর কৃতকার্য্যতার সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছিলাম। হঠাৎ হুঁস হইল চারু নাই! গোল-মালে সে কখন যে নিকট হইতে সরিয়া গিয়াছে, তাহা জানিতেও পারি নাই। ভয় ডরের সে বড় ধার ধারে না—হয়ত লাটপত্নীর সমক্ষে গিয়াই সে হাজির হইবে! না জানি কি বিভ্রাটই বাধাইয়া বসে!

ব্যস্তভাবে খোঁজ করিতেছি, এমন সময় মৌলবী-

সাহেব আসিয়া খবর দিলেন যে লাইব্রেরী-ঘরে লাট-পত্নীরই সহিত চারু কথা কহিতেছে, তিনি দূর হইতে দেখিয়াছেন।

দ্রুতপদে লাইব্রেরী-গৃহের দিকে আমি অগ্রসর হইলাম। কিয়দ্দূর গিয়া দেখি, চারু ফিরিয়া আসিতেছে। সর্ব্বনাশ! সেই ফুলের তোড়া, তাহার হাতে!

দেখিয়া আমার আপাদ মস্তক রাগে জ্বলিয়া গেল। সবলে তাহার কোমল হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া, টানিয়া তাহাকে বাহিরে আনিলাম।

সে প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। "উঃ, বাবা যে জোরে ধরেছ, এমন লাগচে!" বলিয়া হঠাৎ আমার মুখের দিকে চাহিয়াই সে নীরব হইল। আমার মনের দানবটা মুখেও বোধ হয় নিজ প্রতিবিম্ব বিস্তার করিয়াছিল, তাই সে ভয় পাইল। পরের সাহায্যে গাড়ীতে উঠিতে নামিতে সে বরাবরই নারাজ ছিল। আমি গাড়ীর কাছে আসিয়াই সহিসকে হুকুম দিলাম, "উঠা দেও।"

চারু কোনও আপত্তি জানাইল না। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে কঠোরস্বরে তাহাকে বলিলাম, "তোড়া কোথা পেলি?"

সে ভয়ে ভয়ে কহিল, "মেম্ সাহেব দিলেন?"

আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম, "মিথ্যেবাদী! তোকে ডেকে দিলেন?"

সে বলিল, "না বাবা আমি চেয়েছিলুম।"

"কেন চাইলি? ভিকিরি! ছোট লোক! বুড়ো মেয়ে!"—বলিয়া সবলে তাহার গালে একটা প্রকাণ্ড চড় বসাইয়া দিলাম।

সেই কচি গালটিতে আমার অঙ্গুলির দাগ রক্তবর্ণ হইয়া দেখা দিল। ভয়ে সে কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু কাঁদিল না। তাহার জীবনে আমার কাছে সে আর কখনও প্রহার খায় নাই। সেই প্রথম এবং সেই শেষ।

যামিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া অন্ধকার পথের পানে চাহিয়া রহিল। আকাশ জুড়িয়া অন্ধকার, নক্ষত্র ফুটিয়াছে, চাঁদ তখনও উঠে নাই। মণ্টু মুন্নী বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, বাড়ীর ভিতর হইতে তাহাদের উদ্দাম হাসির লহর বাহির হইয়া আসিতেছিল। বাগানের গেটের ধারে শিউলী গাছটায় গোটাকতক কুঁড়ি সবে মাত্র প্রস্ফুটিত দল মেলিয়া মৃদুগন্ধ ছড়াইবার উপক্রম করিয়াছে। চানাচুর-ওয়ালা প্রকাণ্ড ছড়া কাটিয়া "চানা ˙জোর গরম" হাঁকিয়া গেল।—যামিনী নিঃশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় তাহার অসমাপ্ত কাহিনী বলিতে লাগিল।—

সারাপথটা তাহাকে তাড়না তিরস্কারে এমনই অভিভূত করিয়া তুলিলাম যে সে কোন কথাই ভাল করিয়া আমায় বুঝাইতে পারিল না। সুধু এইটুকুই বুঝিলাম যে, ফুলের তোড়াটি সে সীতারামের জন্য চাহিয়া আনিয়াছে। ইচ্ছা হইতেছিল, তোড়াটা ছিঁড়িয়া শত খণ্ড করিয়া পথের ধূলায় ছড়াইয়া দিই; কেবল তাহার মাকে মেয়ের কীর্ত্তি দেখাইবার জন্যই সে প্রলোভন সম্বরণ করিলাম।

স্ত্রী আমাদের পথ চাহিয়াই পথের ধারে পর্দ্দার পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমার মূর্ত্তি আর মেয়ের অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন।

আমি চারুকে ধাক্কা দিয়া তাহার মার দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলাম, "যেমন নিজে, তেমনি ত মেয়ে হবে! ওকে আবার আমি মানুষ কর্ত্তে চাই!"

সহিস তোড়াটা আমার ঘরে টেবিলের উপর রাখিয়া গেল। আমি সেটা স্ত্রীর গায়ে ছুড়িয়া দিয়া বলিলাম, "মেয়ে ভিক্ষে করে এনেচে, যত্ন করে তুলে রাখ।"

এতক্ষণের পর বোধ হয় চারুর মা ব্যাপারটা কতক বুঝিতে পারিলেন। মেয়েকে কাছে টানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েচে সব বল্ত চারু। তোড়াটা চাইলি কেন? বড্ড নিতে ইচ্ছে কচ্ছিল?"

চারু তাহার মার বুকে মাথা রাখিয়া হাঁফাইতেছিল, কহিল, "আমি সুধু রাঙ্গা গোলাপটা সীতারামের জন্যে দিতে বলেছিলুম, আর কিছু না?"

চারুর মা একটি একটি করিয়া সব কথা জানিয়া লইলেন। তখন প্রকাশ হইল, চারু লাইব্রেরী ঘরের দরজার কাছে ঘুরিতেছিল, লাটপত্নী তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করেন সে কিছু চাহে কিনা। চারু বলে, সীতারামের জন্য ঐ লাল গোলাপ-ফুলটি পাইলে সে খুসী হয়। তাহাতে লাটপত্নী জিজ্ঞাসা করেন, সীতারাম কে? সীতারাম যে কে, কত বড় মহৎ কাজই যে সে করিয়াছে, বিলাত হইতে রাজা যে তাহাকে মেডেল পাঠাইয়াছেন, সে যে অদ্যই মুঙ্গের হইতে বাড়ী আসিতেছে, মা তার জন্য কত রকম পিঠা ও ব্যঞ্জন রাঁধিয়া রাখিয়াছে, বাপ্ কি রকম তুলার কুর্ত্তা কিনিয়াছে—লাটপত্নীর অবশ্য-জ্ঞাতব্য এই সমস্ত তত্ত্বই সে তাঁহার গোচর করিয়াছে। তিনি সীতারামের বীরত্বের কাহিনী নাকি পূর্ব্বেই তিনি শুনিয়াছিলেন। সুধু একটি ফুল নয়, খুসী হইয়া সমস্ত তোড়াটাই তিনি সীতারামের জন্য দিলেন এবং বলিয়াছেন কল্য প্রভাতে সীতারাম যেন তাঁহার বাড়ীতে লাট সাহেবকে সেলাম করিবার জন্য যায়।

মেয়ের কথা শুনিয়া তাহার মা হাসিয়া লুটাইতে লাগিলেন। আমিও রাগ ভুলিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলাম। এতক্ষণের পর সে আমার বুকে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

সারাদিন কোনও গাড়ীতে সীতারাম আসিয়া পৌঁছিল না। রাত্রে শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে চারু বলিল—"বাবা, রাত একটার সময় মুঙ্গের থেকে আবার গাড়ী আস্‌বে, সীতারাম ভাইয়া নিশ্চয়ই সে গাড়ীতে আসছে।"

সে রাত্রে সে ঘুমাইয়াছিল কি না জানি না। আমি কিন্তু ঘুমাইতে পারি নাই। ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা আসিলে সে আমায় ডাকিয়া বলিল, "বাবা সীতারাম ভাইয়া বোধ হয় রাত্রে এসেছে। লাট-সাহেবের বাড়ী তাকে যেতে বলে আস্‌ব কি?"

আমি উঠিয়া বসিয়া কহিলাম, "চল্ আমিও যাই, এসেছে কিনা দেখি। আমারও ত তাকে কিছু দেওয়া হয়নি। কি দেওয়া যায়?"

স্ত্রী লেপের ভিতর হইতেই কহিলেন, "টাকা দাও। গরীব মানুষের টাকায় উপকার হবে।"

চারু বলিল, "বাবা, সীতারাম ভাইয়ার ঘড়ি নেই।"

আমি খুসী হইয়া কহিলাম, "চারু, টেবিলের উপর থেকে আমার ঘড়িটা নিয়ে আয়, ঐটেই তাকে দেব।"

কন্যার সহিত বাহিরে আসিলাম। ঐ ত তাদের বাড়ী। বুড়া বুড়ী দুইজনেই উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে পথের ধারে দাঁড়াইয়া ছিল। সীতারাম রাত্রেও আসিয়া পৌঁছে নাই। কি অসহ্য উদ্বেগে তাহাদের রাত কাটিয়াছে, বুড়ী সালঙ্কারে চারুকে তাহাই বলিতে লাগিল। আমি রাস্তাটা বার কতক এপার ওপার পায়চারি করিলাম। দূরের যাহা কিছু, কুয়াশার ধোঁয়ায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। রাস্তার ধারের গাছগুলা বাতাসের নাড়া পইয়া টপ্ টপ্ করিয়া বৃষ্টির জলের মত হিম জল ফেলিতেছিল।

লাটপত্নী সীতারামের জন্য ফুলের তোড়া দিয়াছেন, তাহাকে যাইতে বলিয়াছেন, একথা বুড়া গোকুল গতকল্যই চারুর নিকট শুনিয়াছিল। আমাকে দেখিয়া কহিল, "বুড়ী বলে তার লেড়কার জন্যেই সহরে এত ধুমধাম হচ্চে, আমি তাকে ধমকে থামাতে পাচ্ছিলাম না। কোম্পানী বাহাদুরের যে গরীবের উপর এত দয়া তা ত জান্‌তুম না হুজুর!"

এমন সময় ভোরের কুয়াসা ভেদ করিয়া টেলিগ্রাফ পিয়ন তাহার সাইকেল হইতে নামিয়া আমায় সেলাম করিয়া, গোকুলের হাতে একখানি টেলিগ্রাম দিল। নিশ্চয়ই সীতারামের খবর। আমি সহি দিয়া, টেলিগ্রামখানি গোকুলের হাত হইতে লইলাম। তিনটি দর্শকই আমার মুখের দিকে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

টেলিগ্রাম পড়িবামাত্র আমার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, হাত কাঁপিতে লাগিল।—"হা ঈশ্বর!"—বলিয়া আমি মাথাটি নত করিয়া, টেলিগ্রামখানা মাটীতে ফেলিয়া, লাঠিতে ভর দিয়া দাঁড়াইলাম। বোধ করি আমার চক্ষু দিয়া তখন জলও পড়িতেছিল। আমার অবস্থা

দেখিয়া, কিছুই তাহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না। "ওরে আমার বাপরে"—বলিয়া সীতারামের মা, চীৎকার করিয়া মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িল।

গোকুল স্থিরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর—বাছা আমার কি করে গেল? সে যে আমার জুয়ান ছেলে!"

আমি কহিলাম, "প্লেগে।"

চাকর বাকর পথের লোক অনেকে সেখানে জড় হইয়া গেল। আমি আমার লোকেদের উপর বুড়া বুড়ীর ভার দিয়া তাড়াতাড়ি মেয়ে কোলে করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। চারু যেন নেতাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মা তখন তরকারী-ওয়ালীর সঙ্গে দরদস্তর করিয়া সওদা করিতেছিলেন। আমাদের অবস্থা দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া মেয়ে কোলে লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হল, মেয়ে আমার এমন হয়ে গেল কেন?"

সংক্ষেপে জানাইয়া দিলাম, "সীতারাম নেই!"

সীতারামের মা পুত্রশোক সহিতে না পারিয়া এক-মাসের ভিতর মরিয়া গেল। সীতারামের স্ত্রী, বুড়া-শ্বশুরের সেবা করিবার জন্য আসিল। তখন মুনী হইয়াছে। চারুর মা ছেলে লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। চারু সীতারামের মেয়ে যমুনার তদ্বিরেই দিন কাটাইত, তাহারই ইচ্ছানুসারে সীতারামের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ দিয়া ঐ প্রস্তর বেদী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলাম। উহার ভিতর কি আছে জান? সেই রাজসম্মান ফুলের তোড়া। রোজ সন্ধ্যাবেলা চারু নিজ হস্তে একটি করিয়া লাল বাতী ঐ সমাধির উপর জ্বালিয়া দিত। আমার যাদু যখন চলিয়া গেল, তাহার নিত্য কাজের ভার দিয়া গেল সীতারামের কন্যা যমুনাকে। যমুনা তাহার পিতার স্মৃতির আলোটি তেমনি করিয়াই জ্বালিয়া রাখিয়াছে।

চাহিয়া দেখিলাম যামিনীর চোক দিয়া জল পড়িতেছে। এ শোকের সান্ত্বনা দিবার ভাষা নাই। সংসারের অনিত্যতা অথবা বিশ্বব্যাপী দৃষ্টান্তের নিরর্থক প্রসঙ্গ না তুলিয়া, নীরবে দুইটি অশ্রুবিন্দু মুছিয়া ফেলিলাম।

শ্রীইন্দিরা দেবী।

বাঙ্গালীর উৎপত্তি

বিগত মাঘ সংখ্যা "ভারতবর্ষ" পত্রে "বাঙ্গালীর আদিম সভ্যতা" নামক প্রবন্ধে (৩১০-৩১৮ পৃঃ) শ্রীযুক্ত ননী-গোপাল মজুমদার মহাশয় বাঙ্গালীর উৎপত্তির প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে, এই প্রসঙ্গে বিগত নয় বৎসরে এই ক্ষুদ্র লেখক যেখানে যাহা কিছু লিখিয়াছে, মজুমদার মহাশয় তাহার উল্লেখ করিয়া লেখকের প্রতি বিশেষ সমাদর: প্রদর্শন করিয়াছেন। মজুমদার মহাশয় আর একটি কারণেও বিশেষ ধন্যবাদার্হ। এদেশে এখন সমাজ-সংস্কারকগণ কর্ত্তৃক জোরের সহিত জাতিতত্ত্ব আলোচিত হইতেছে। কিন্তু এই আলোচনা অন্যায় অবৈজ্ঞানিক পথে চলিয়াছে। অজ্ঞাত অশ্রুত অপ্রকাশিত শাস্ত্রের এবং কুলশাস্ত্রের অসংলগ্ন বচন প্রমাণ এই প্রকার জাতিতত্ত্ব আলোচনার প্রধান অবলম্বন। এই প্রকার আলোচনার ফলে সমাজে যথেষ্ট অসুখ অশান্তিও উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে যিনি জাতিগত অনুরাগ বা বিরাগশূন্য চিত্তে জাতিতত্ত্ব আলো-চনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি যে সুধু সাহিত্যিকের নিকট সাধুবাদ পাইবার যোগ্য তাহা নহে, সমস্ত বাঙ্গালীর নিকটই সাধুবাদ পাইবার যোগ্য। ভরসা করি মজুমদার মহাশয় জাতিতত্ত্ব চর্চ্চা ছাড়িবেন না। এ ক্ষেত্রে কর্ম্মী বড়ই কম।

বাঙ্গালীর উৎপত্তি এবং বাঙ্গালীর সভ্যতার প্রাচী-নতা সম্বন্ধে এই লেখক যে যে মত প্রকাশ করিয়াছে, মজুমদার মহাশয় তাহার আমূল প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই প্রতিবাদের আগাগোড়া আলোচনা, এ প্রবন্ধে সম্ভব নহে এবং প্রয়োজনীয়ও নহে। মূল কথা, বাঙ্গালীর

উৎপত্তি সম্বন্ধে রিসলি সাহেবের মত কতটা বিচারসহ, তাহা আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু সূচনায় দুই একটি অবান্তর কথা বলিয়া লইব।

বৌদ্ধ পালি ও সংস্কৃত গ্রন্থে কথিত মধ্যদেশের সম্বন্ধে ননীগোপাল বাবু লিখিয়াছেন—

"যে বৌদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ের [বিনয়পিটক ও দিব্যাবদান] যে স্থল বিশেষের উপর নির্ভর করিয়া শ্রদ্ধেয় চন্দ মহাশয় উক্ত তথ্যের প্রচারে সমুৎসুক, সেই বৌদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ের সেই স্থলের উপর টিপ্পনী করিয়া পণ্ডিতবর রীস ডেভিড্স [T. W. Rhys Davids] যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রসঙ্গক্রমে এখানে উদ্ধৃত হইতে পারে। বিনয় পিটক সম্বন্ধে [এবং প্রসঙ্গতঃ সমগ্র পালি সাহিত্য সম্বন্ধে] তিনি বলেন, 'The whole of the Pali Literature including the work are simply forgeries concocted in Ceylon.'......অতএব বিনয়পিটক ও দিব্যাবদানের উপর রমাপ্রসাদ বাবু যতটা নির্ভর করিয়াছেন, ততটা নির্ভর করা সমুচিত হয় নাই (৩১৪ পৃঃ)।"

বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, রীস ডেভিড্স বিনয়পিটক সম্বন্ধে এবং প্রসঙ্গতঃ সমগ্র পালি সাহিত্য সম্বন্ধে এরূপ কথা কখনও বলেন নাই, ইহার ঠিক উল্টা কথাই বলিয়াছেন। রীস ডেভিড্সের উক্তি আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিতেছি—

"The document [Mahavagga IX. 4. 1; Vinaya Pitaka] in which this statement occurs was considered by Professor Oldenberg, in the introduction to his edition of the text (dated May, 1879), as being about 400 B. C. and probably a little earlier The only alternative theory is that the whole of the Pali literature, including this work, are simply forgeries concocted in Ceylon. But no attempt has been made to show how this latter theory can be made to square with the facts ; it is put forward by way of innendo rather than as a serious and considered opinion ; and would not now, I think meet anywhere with approval (Journal of the Royal Asiatic Society, 1904. p. 85)"

রীস ডেভিডস্ যে মতের প্রতিবাদ করিবার জন্য এই অংশের অবতারণা করিয়াছেন, ননীগোপাল বাবু সেই মতকে রীস ডেভিড্সের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু রীস ডেভিড্সের নিজের মত যে অংশে নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই। এমন কি উদ্ধৃত বাক্যের গোড়ার অংশও [The only alternative theory is that] বাদ দিয়াছেন। এ বিষয়ে অধিক কিছু বলা অনাবশ্যক।

ঐতরেয় আরণ্যকে আছে (২।১।১) "ইমাঃ প্রজা স্তিস্রো অত্যায়মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ।" এই বচন সম্বন্ধে ননীগোপাল বাবু লিখিয়াছেন—"শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয় ঐতরেয় আরণ্যকের উক্ত অংশ যে ভাবে বুঝিয়াছেন, মোক্ষমুলর ও কীথপ্রমুখ পণ্ডিতগণও উহার অর্থ প্রায় সেই ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন—ইঁহাদের অনুসরণ করিয়া উহার এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারে —বঙ্গ-মগধ-চের এই তিনটি জনপদ [বৈদিকমার্গ হইতে] অত্যায় প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহারা পক্ষী বলিয়া ['কাক গৃধ্রাদি'] বিশেষিত হইবার যোগ্য (৩১২ পৃঃ)।"

মোক্ষমুলরের অনুবাদ আমার হাতে নাই। কীথের (Keith) অনুবাদ এইরূপ—

"In the verse 'Three people transgressed', the three peoples which transgressed are the Vayases, the Vangavagadhas, and the Cheraradas (p. 200)"

কীথের এই অনুবাদ মূল সংস্কৃতের অনুগত, ননীগোপালবাবুর অনুবাদ মূলানুগত নহে। মূলে (বৈদিক মার্গ) লঙ্ঘনকারী তিন প্রকার প্রজার নাম আছে ; যথা —বয়াংসি, বঙ্গাবগধাঃ,চেরপাদাঃ। 'বঙ্গাবগধাঃ' অর্থ বঙ্গ-মগধাঃ এবং 'চেরপাদাঃ' অর্থ চের বা কেরলগণ হইতে পারে। কিন্তু বয়াংসি = বঙ্গাবগধাঃ অর্থাৎ বাঙ্গালী এখানে পক্ষী বলিয়া কথিত হইয়াছে একথা শাস্ত্রী মহাশয় এবং ননীগোপাল বাবু কি করিয়া বুঝিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তিন প্রকার প্রজার মধ্যে একপ্রকার বয়াংসি, এক প্রকার বঙ্গাবগধাঃ, এবং আর এক প্রকার

চেরপাদাঃ। সুতরাং বঙ্গাবগধাকে বয়াংসি বলা হইল কেমন করিয়া? "মনুষ্য পশুপক্ষী" বলিলে যেমন মনুষ্যকে পক্ষী বলা হয় না, মনুষ্য নামক স্বতন্ত্র জীব বুঝায়, তেমনি পূর্ব্বোদ্ধৃত আরণ্যকের বচনে "বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ" বলায় বঙ্গাবগধাকে বয়াংসি বলা হয় নাই, "বয়াংসি" হইতে "বঙ্গাবগধা"র স্বাতন্ত্র্যই সূচিত হইয়াছে।

পঞ্জাব এবং হিন্দুস্থানের আর্য্যভাষী অধিবাসিগণের এবং মধ্যভারতের ও দক্ষিণ ভারতের মুণ্ডা ও দ্রবিড় ভাষাভাষী অধিবাসিগণের মধ্যে অধিকাংশই দীর্ঘ করোটি (dolichocephalic), পক্ষান্তরে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের পাঠান ও বেলুচগণের মধ্যে এবং গুজরাতী মরাঠী উড়িয়া ও বাঙ্গালিগণের মধ্যে অধিকাংশই প্রশস্ত (brachycephalic) বা মধ্যম করোটি (mesaticephalic)। শেষোক্ত জাতি নিচয়ের মধ্যে যাহারা দীর্ঘ করোটি বা তাহাদের মধ্যে দীর্ঘ করোটির যে ভেজাল আছে তাহারা যে দ্রবিড়, মুণ্ডা, বা হিন্দুস্থানীর শোণিত পরিপুষ্ট একথা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু এই সকল জাতিতে প্রশস্ত করোটির যে ভেজাল আছে তাহা কোথা হইতে আসিল ইহাই তর্কের বিষয়। রিস্‌লি সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, পাঠান এবং বেলুচগণ তুরুষ্ক-ইরাণীর সঙ্কর অর্থাৎ পাঠান এবং বেলুচগণের মধ্যে প্রশস্তকরোটির যে ভেজাল আছে তাহা তুরুষ্ক জাতীয়; গুজরাতী এবং মরাঠাগণ শক-দ্রবিড় সঙ্কর, অর্থাৎ গুজরাতী এবং মরাঠাগণের মধ্যে যে প্রশস্তকরোটির ভেজাল আছে তাহা শক জাতীয়; উড়িয়া এবং বাঙ্গালী মোঙ্গল-দ্রবিড় সঙ্কর, অর্থাৎ উড়িয়াদিগের এবং বাঙ্গালীর মধ্যে যে প্রশস্ত করোটির ভেজাল আছে তাহা মোঙ্গলীয় জাতীয়। ননীগোপাল বাবু লিখিয়াছেন, "রমাপ্রসাদ বাবু বাঙ্গালীর দ্রবিড় সম্পর্ক সম্বন্ধে নীরব কেন, বুঝিতে পারি না (৩১৮ পৃঃ)।" সাঁওতাল ওড়াঁও প্রভৃতি যাহাদের প্রতিবেশী, এবং সমাজের নিম্নতর স্তরে দীর্ঘ করোটির সংখ্যা যাহাদের মধ্যে বেশী, তাহাদের ধমনীতে যে তথা কথিত দ্রবিড় শোণিত যথেষ্ট আছে একথা রিস্‌লি সাহেবের মতের প্রতিবাদ উপলক্ষে এতদিন বলা বাহুল্য মনে করিয়াছি। আমার বিরোধ বাঙ্গালী, মরাঠা, গুজরাতী প্রভৃতির মধ্যে যে প্রশস্ত করোটির ভেজাল আছে তাহার উৎপত্তি সম্বন্ধে রিস্‌লি সাহেব যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিত। গুজরাতী এবং মরাঠাগণের অর্দ্ধশোণিত শকশোণিত একথা যে ইতিহাস বিরুদ্ধ তাহা বিদেশীয়গণ এখন স্বীকার করেন। এই বিষয়ে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মত হেডন (Haddon) এই প্রকারে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"But evidence seems to be lacking that the Scythians penetrated far into the Deccan, and and apart from brachycephaly there is little to associate these peoples with Scythians. It seems quite possible that these brachycephals are the result of an unrecorded migration of some members of the Alpine race from the highlands of south-west Asia in prehistoric times (The Races of Man, pp 40-91)"

অর্থাৎ শকগণ যে দাক্ষিণাত্যে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না, এবং প্রশস্ত করোটি ভিন্ন সকল (মারাঠা প্রভৃতি) জাতির শকগণের সহিত সম্বন্ধ-সূচক আর কোনও লক্ষণও নাই। প্রাগৈতিহাসিক যুগে দক্ষিণ-পশ্চিম এসিয়ার মালভুমি হইতে আগত আল্পাইন জাতীয় আগন্তুকগণের মিশ্রণের ফলে (দাক্ষিণাত্যে) এই প্রশস্ত করোটি জনগণের অভ্যুদয় হইয়াছে এইরূপই খুব সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

দাক্ষিণাত্যের সুধু মারাঠাগণের মধ্যে বহুসংখ্যক প্রশস্ত করোটি দৃষ্ট হয় না, কন্নড় (Canarese) ভাষাভাষী এবং তেলুগু ভাষাভাষী জনগণও যে এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত থার্ষ্টন (Thurston) তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। দ্রাবিড় ভাষাভাষী সুসভ্য জনগণের মধ্যে তামিল এবং মলয়ালম ভাষাভাষীরা দীর্ঘকরোটি, অবশিষ্ট সকলেই প্রশস্ত বা মধ্যম করোটি। সুতরাং দাক্ষিণাত্যের এই বৃহৎ প্রশস্ত করোটি জনসঙ্ঘের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা রিস্‌লির মত পরিত্যাগ করিতে

এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগে একটি প্রশস্ত করোটি জনসঙ্ঘের আগমন কল্পনা করিতে বাধ্য। এসিয়ার পশ্চিমভাগ হইতে এইরূপ জনসঙ্ঘের আগমন কল্পনা করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে আল্পাইন জাতীয় মনে করিতে হয়। য়ুরোপের আর্য্য ভাষাভাষী স্লাভ (Slav), কেল্ট (Celt), এবং ফরাসী দেশের এবং য়ুরোপের মধ্যভাগের অন্যান্য দেশের অধিবাসিগণ আল্পাইন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। হেডনের গ্রন্থ প্রকাশেরও পূর্ব্বে ১৯০৭ সালে বাঙ্গালার প্রশস্ত করোটি জনগণকে এই লেখক ও মারাঠাগণের সঙ্গে সঙ্গে এই আল্পাইন শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিল। নেচার (Nature) পত্রের একজন লেখক বাঙ্গালী সম্বন্ধে এরূপ দাবী স্বীকৃত হইবে না বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মরাঠাগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে হেডন প্রভৃতি ঐরূপ মত স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

য়ুরোপীয় আল্পাইনগণের সহিত ভারতীয় আল্পাইনগণের যে বন্ধন সূত্র, অর্থাৎ মধ্যএসিয়ার অধিবাসিগণের জাতিতত্ত্ব কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভাল করিয়া জানা ছিল না। ষ্টিন (Sir Aurel Stein) মধ্য এসিয়া হইতে যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন তাহা দ্বারা এই অভাব পূর্ণ হইয়াছে। জয়েস (T. A. Joyce) এই সকল প্রমাণ আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

"To sum up, the measurements show that the majority of people surrounding the Taklamakan desert have a very large common element. Further this element is seen in its purest form in the Wakhi, The fact that the Wakhi display so close a relationship with the Galcha proves that the basis of Taklamakan propulation is Iranian. At the North-west edge of the desert an intrusive elemen, which can be shortly differentiated from the Iranian, makes its appearance, the Turki element. Besides this there seems to be some common bond between the peoples of the desert and Tibet......In the Pamirs is a series of tribes, who, though chiefly of Iranian stock, begin to exhibit slight traces of Indo-Afghan blood. In at least one tribe, the Kafir, these traces are considerably more than slight. The Chitrali also seem to stand in closer relationship to an Indo-Afghan people (for a rather specialized Indo-Afghan people) than the other Pamir tribes. Some admixture has token place between the Turki and Desert folk. ....Faizabad appears to be a mixture of all three groups, Pamir, Turki, and Desert, and this is what might be expected, the root stock of the population would thus be Iranian, though it has been exposed to Turki influences since Indo-scythian times and has thus become somewhat modified. In the East, Chinese influence begins to make itself felt, but only over a very restricted area...... The great differntiation of the Chinese and Turki groups is interesting, since both are regarded as 'Mongolian. It is evident that they belong to widely differnt branches of the Mongolian race, and it must be concluded that the Turki are allied to the Southern Mongolian.........If this is so, and the Turki peoples do, in fact, contain a large southern Mongolian element, their stature has been greatly increased in the course of their wanderings, by contact, probably, with Iranian peoples.........Finally, the point which emerges most clearly from the welter of measurements and descriptive data contained in this paper is this: That the original inhabitants of the Pamirs and Taklamakan Desert, including the cities now buried beneath the sand, is that type described by Lapouge as HOMO ALPINUS with, in the west, traces of the Indo Afghan and that the Mongolian has had very little influence upon the population (JOURNAL OF THE ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE, 1912, pp. 467-468)."

এই উদ্ধৃত অংশের সার কথা এই,—মধ্য এসিয়ার অন্তর্গত পামির প্রদেশের তক্লমকান মরুদেশের এবং এই মরুভূমির বালুকার নীচে প্রোথিত প্রাচীন নগর সমূহের অধিবাসিগণ "হোমো আল্পাইনস" লক্ষণাক্রান্ত এবং কার্য্যত মোঙ্গলীয় প্রভাব বর্জ্জিত।

ইহারা ভাষায় আর্য্য এবং আকারে প্রশস্ত করোটি। জয়েস ইহাদিগের সম্বন্ধে ইরানীয় আর্য্য বংশ (Iranian stock)" সংজ্ঞাও ব্যবহার করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। মরুভূমির উত্তর পশ্চিম প্রান্তে-তুরুষ্ক গণের বাস। তুরুষ্কগণ মোঙ্গলীয় এবং ইরানীয় আর্য্য গণের মিশ্রণে উৎপন্ন। পামির প্রদেশের অধিকাংশ জাতি ইরানীয় আর্য্য হইলেও, তাহাদের মধ্যে হিন্দু-আফগান লক্ষণও দৃষ্ট হয়। জয়েস প্রশস্ত করোটি মরুভূমির ইরানীয় আর্য্যের প্রধান লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং মধ্য করোটি (Mesaticephalic head) "হিন্দু আফগান" জাতির বিশিষ্ট লক্ষণ ধরিয়া লইয়াছেন। আমি এই মত মানিয়া লইয়া ভারতবর্ষের প্রশস্ত বা মধ্যম করোটি অধিবাসিগণের সম্বন্ধ নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছি। এই জন্য ননীগোপাল বাবু লিখিয়াছেন—

"মধ্য এসিয়ার ষ্টীনের অনুসন্ধান ফলে যে প্রশস্ত করোটি আর্য্য ইরাণীভাষী মোঙ্গল সম্পর্ক বর্জ্জিত জন সঙ্ঘের আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে, তাহারা যে চিরকাল আর্য্য ইরাণী ভাষা ব্যবহার করিতেছে, প্রমাণাভাব সত্ত্বেও রামপ্রসাদ বাবু তাহা অনুমান করিয়া লইয়াছেন। তিনি ইহাদিগকে আর্য্য বলিয়াছেন, তাহাও বিনা প্রমাণে (৩১৮ পৃঃ)।"

যে প্রবন্ধ উপলক্ষ করিয়া (সাহিত্য ১৩২১,৬২০-৬২১ পৃঃ) ননীগোপাল বাবু মধ্য এসিয়ার মরুভূমির অধিবাসিগণকে ইরাণী আর্য্য জাতীয় বলার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপাইয়াছেন, সেই প্রবন্ধে আমি জয়েসের প্রবন্ধের উল্লেখও করিয়াছি, এবং তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃতও করিয়াছি। সুতরাং জয়েসের প্রবন্ধটি একবার না দেখিয়া, এবং তৎসম্পর্কীয় প্রমাণ অনুসন্ধান না করিয়া, আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির স্কন্ধে অতবড় একটা মতের দায়িত্ব চাপাইয়া, তারপর মতটাকে এক তুড়িতে উড়াইয়া দিবার এই উদ্যমের জন্য আমি ননীগোপাল বাবুকে সাধুবাদ দিতে পারি না। এক সময়ে মধ্য এসিয়া আদিম আর্য্য জাতির আদিনিবাস ক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হইত। তৎপর মানবতত্ত্ববিদ্‌গণ য়ুরোপের কোনও স্থানকে আদিম আর্য্য নিবাস বলিয়া স্থির করেন। উজফেল্‌ভি (Ujfalvy) নামক মানবতত্ত্ববিৎ পামির প্রদেশের আর্য্যভাষী গালচা-গণকে আবিষ্কার করেন এবং প্রতিপাদন করেন যে গালচাগণ বরাবরই আর্য্যভাষা বলিয়া আসিতেছে। রোমের প্রসিদ্ধ মানবতত্ত্ববিৎ সার্জি (Sergi) ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করেন যে, গাল্‌চাগণের বাসস্থান, পামির প্রদেশেই, আর্য্যগণের আদিনিবাসভূমি, এবং আর্য্য-গণ আদৌ প্রশস্ত করোটি ছিলেন। এই কথা অবশ্যই সকলে স্বীকার করেন না। কিন্তু গাল্‌চার ভাষা যে ধার করা ভাষা একথাও কেহ বলিতে চায় না। অবশ্যই ননীগোপাল বাবু বলেন, "এমনও হইতে পারে যে, গাল্‌চা প্রভৃতি জাতির সহিত আর্য্য জাতির আদৌ কোনও সম্পর্ক ছিল না, পরে পরাজিত হইয়া তাহারা আর্য্য জাতির ভাষা গ্রহণ করে (৩১৮)।" কিন্তু যাঁহারা গাল্‌চা ভাষা আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা কেহ এতটা বলিতে সাহস করেন নাই। ননীগোপাল বাবু গাল্‌চা ভাষাতত্ত্ব বিচার করিয়া যদি এইরূপ একটা সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে পারেন, তবে সকল জাতিতত্ত্ববিৎ এবং ভাষাতত্ত্ববিৎ কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা গ্রহণ করিবেন। তক্লমকান মরুভূমির অধিবাসি-গণের ব্যবহৃত আর্য্যভাষা আবিষ্কৃত হওয়ার পরও মধ্য এসিয়ায় যে আর্য্যগণের আদি নিবাসভূমি, এই মত পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। অধ্যাপক মোর্ল্টন (Encyclopædia of Religion and Ethics, Vol. VII. p 418) ইরাণীয় নামক প্রবন্ধের টীকায় লিখিয়াছেন—

"It should be noted, however, that, S. Feist (Kultur, Ausbrictung and Herkunft der Indogermanen, Berlin, 1913, p, 518 ff) is strangely inclined, in part on the evidence of the recently discovered Tocharic language, to revert to the older view and seek the original home of the Race in Asia, more specially in Russian Turkestsn. This is chonicled without suggesting that the writer finds himself shaken by this novel and able argument."

অধ্যাপক মোর্ল্টনের মতে আর্য্যগণের অর্থাৎ যাহারা আর্য্যভাষার আদি গুরু, তাহাদের আদি নিবাস-

ক্ষেত্র য়ুরোপ। তথাপি টীকায় লিখিয়াছেন, মধ্য এসিয়ার অন্তর্গত তুর্কিস্থানে যে তুখারীয় ভাষা আবিষ্কৃত হইয়াছে, কতক পরিমাণে তাহার উপর নির্ভর করিয়া জর্ম্মানদেশীয় পণ্ডিত ফিষ্ট (Feist) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তুর্কিস্থান আর্য্যগণের আদি নিবাসক্ষেত্র এই পুরাতন মতই সমীচিন। মোণ্টন এই মত স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তথাপি সত্যের অনুরোধে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহারা আর্য্যভাষার এবং আর্য্য সভ্যতার আদি গুরু, তাহাদের আদি বাসস্থান এসিয়ায় কি য়ুরোপে ছিল; তাহারা দীর্ঘকরোটি কি প্রশস্ত: করোটি ছিল, এ সকল প্রশ্নের আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। এই প্রবন্ধের আলোচ্য কথা—স্মরণাতীত কাল হইতে তক্লমকান মরুদেশে আর্য্যভাষা প্রচলিত ছিল বা আছে কি না। এই বিষয়ে এই ভাষাই আমাদের প্রধান সাক্ষী। এই ভাষার সহিত ভারতীয় আর্য্য-ভাষানিচয়ের, ইরাণীয় ভাষার বা অন্য কোন নিকট-বর্ত্তী জনপদে কথিত আর্য্যভাষার তুলনায় আলোচনা করিয়া যদি দেখা যায় যে, মধ্য এসিয়ায় কথিত আর্য্য ভাষার সহিত এই সকল আর্য্যভাষার কোনটির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে—ইহা পার্শ্ববর্ত্তী জনপদে কথিত কোনও একটি আর্য্য ভাষার শাখা মাত্র—তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, মধ্য এসিয়ার আর্য্যভাষা ধার করা ভাষা—বিজিত কর্ত্তৃক পরিগৃহীত বিজেতার ভাষা। আর যদি মধ্য এসিয়ার আর্য্যভাষায় এরূপ সম্বন্ধের কোন চিহ্ন না পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই ভাষাভাষি-গণকে ভাষায় আর্য্য বলিতে বাধা কি? আর্য্য বলিলে স্মরণাতীত কাল হইতে যাহারা ভাষায় আর্য্য তাহা-দিগকে বুঝায়, দেহের আকারে আর্য্য বা শোণিতে আর্য্য বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্ব বিজ্ঞান স্বীকার করে না। যাঁহারা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বা ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করেন তাঁহারাও এখন একবচনান্ত 'আর্য্য-জাতি' (Aryan race) শব্দ ত্যাগ করিয়া আর্য্য অর্থে বহুবচনান্ত 'আর্য্যজাতিনিচয়' (Aryan races) বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত শ্রেডারের (Dr Otto Schrader) লেখার উল্লেখ করা যাইতে পারে (Encyclopaedia of Religion and Ethics, II, Aryan Religion p. 11 etc.) সুতরাং রিস্‌লি সাহেব যে আকারের মানুষকে আর্য্য সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন তদ্ব্যতীত অন্য আকারের আর্য্যভাষী জনগণকে যদি আর্য্য বলা যায় তবে দোষ হইতে পারে না।

মধ্য এসিয়ার অন্তর্গত খোটান এবং কুচার নামক জনপদদ্বয়ের নিকটে, বালুকাস্তূপ হইতে অপরিচিত ভাষায় ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত অনেক কাগজপত্র এবং বৌদ্ধ গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'খোটান প্রদেশে আবিষ্কৃত কাগজপত্র ও গ্রন্থের ভাষা, এবং কুচার প্রদেশে আবিষ্কৃত কাগজপত্র ও গ্রন্থের ভাষা, ঠিক একরূপ নহে। জর্ম্মান-পণ্ডিতেরা খোটানের কাগজপত্রের ভাষাকে "তুখারীয় A" সংজ্ঞা এবং কুচার প্রদেশে প্রাপ্ত কাগজপত্রের ভাষাকে "তুখারীয় B" সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। ফরাসী এবং জর্ম্মাণ পণ্ডিতগণ এই ভাষা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমার দুরধি-গম্য। ১৯১৪ সালের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ষ্টেন কনো (Khotan Studies by Sten Konow) এই ভাষা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিব—

"It will be seen that the two Iranian documents thus conclusively show that the language in which they are written was the vernacular of the Khotan oasis. I think that it can be made almost certain that the same tongue has been spoken in Khotan since the beginning of our Era" (p. 343)

ষ্টেন কনো এখানে খোটানের এই ভাষাকে ইরা-নীয় সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই ভাষা খৃষ্টাব্দের সূত্রপাত হইতে খোটানে প্রচলিত ছিল। কিন্তু পারস্যের বিভিন্ন স্তরের ইরাণীয় ভাষার সহিত খোটানী ভাষার কি সম্বন্ধ, সে বিষয়ে তিনি বিশেষ কিছু বলেন নাই।

উক্ত পত্রিকার একই খণ্ডে, আর একটি প্রবন্ধে, কুচার প্রদেশে আবিষ্কৃত ভাষা সম্বন্ধে ফরাসী পণ্ডিত সিলভেন লেভি কয়েকটি মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। লেভি বলেন, "কুচার রাজ্যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে তথাকথিত "তুখারীয় B" ভাষা প্রচলিত ছিল। তিনি এই ভাষাকে "কুচীয় (Kuchean)" সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন; এবং লিখিয়াছেন—

"The political histo y of Kucha is perfectly clear to us from the Chinese annals since the first century B. C. But who could have suspected that Kucha, in the heart of Chinese Turkistan, on the very border of Chinese and Turkish dominions, was an Aryan City as far as race is indicated by language? There the word for 'father' was PATER, for 'mother' MATER, for a 'horse' YAKWE (cf. Latin EQUUS), for 'eight' OCT (Latin and Greek OCTO), for 'he is' STE (Latin EST) etc. One would expect the Kuchean to be intimately connected with the Aryan languages of Iran and India. Not at all. Special features show its near relationship to the Western languages of Europe, particularly to Italo-Celtic; there and there only outside Itaco-celtic you, will find medio-passive forms with a final r: emetir 'he is born,' as Latin NASCITUR (p. 959)."

এখানে লেভি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, ইরাণে বা ভারত-বর্ষে প্রচলিত আর্য্যভাষা সমূহের সহিত কুচীয় ভাষার কোন সম্বন্ধ নাই; কুচীয় ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে য়ুরোপের পশ্চিমভাগে প্রচলিত আর্য্য ভাষা-নিচয়ের, বিশেষতঃ ইটালীয় ও কেল্ট ভাষার। এমত অবস্থায় কুচ প্রদেশের অধিবাসিগণ যে তাঁহাদের কোনও আর্য্য প্রতিবেশীর নিকট হইতে আর্য্যভাষা শিখিয়াছিল, এরূপ মনে হয় না, পক্ষান্তরে স্মরণাতীত কাল হইতে কুচবাসিরা আর্য্যভাষাভাষী, বা আর্য্য এইরূপ অনুমানই সমীচিন। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতানুসরণ করিয়াই জয়েস সাহেব মধ্য এসিয়ার প্রশস্ত করোটি অধিবাসিগণকে Ir nian stock বা আর্য্যজাতির সামিল করিয়াছিলেন, এবং এই লেখক তাঁহার ও ষ্টীনের অনুসরণ করিয়া মধ্যএসিয়ার অ-তুরুষ্ক এবং অ-মোঙ্গল জনসঙ্ঘকে আর্য্য বলিয়াছিল, "বিনা প্রমাণে" বলে নাই।

মধ্য এসিয়ার অধিবাসিগণকে যে আর্য্য বলা যায়, একথা যেমন আমার নিজস্ব নয়, ইহাদিগকে যে, ভাষার এবং আকৃতির হিসাবে য়ুরোপীয় আল্পাইন জাতির (Homo Alpinus) তুল্য মনে করা যায়, ইহাও আমার একার কথা নয়। দাক্ষিণাত্যের প্রশস্ত করোটি জনগণকে যে, এসিয়া খণ্ডের এই আল্পাইন জনসঙ্ঘের সহিত সম্পর্কিত মনে করা যাইতে পারে, এই মত হেডন কর্ত্তৃক প্রচারিত হওয়ার, বাঙ্গালী সম্পর্ক দোষ হইতে মুক্ত, এবং ননীগোপালবাবু এবং তাঁহার বন্ধুগণের বিবেচনার যোগ্য, হইয়াছে। তারপর উড়িয়ার এবং বাঙ্গালীর কথা। বাঙ্গালীর দ্রবিড় সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না। রিস্‌লি সাহেব মনে করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর মধ্যে যে অনেক প্রশস্ত করোটি বা মধ্যম করোটি লোক আছে তাহারা মোঙ্গলীয় আগন্তুকগণের বংশজাত বা মিশ্রণজাত। এইরূপ মনে করিবার একটা কারণ করোটির আকার, আর একটা কারণ উত্তর বঙ্গের কোচগণকে বিশুদ্ধ শোণিত বাঙ্গালী বলিয়া গণনা। কোচগণ যে বিশুদ্ধ শোণিত বাঙ্গালী নহে তাহা তাহাদের ইতিহাস, আকার এবং আচার সপ্রমাণ করিতেছে। তারপর রহিল বাঙ্গালীর প্রশস্ত বা মধ্যম করোটি। প্রশস্ত করোটি যে মোঙ্গলীয় জাতির একচেটিয়া সম্পত্তি নহে, আর্য্যভাষী বিরাট আল্পাইন জাতিই তাহার জলন্ত প্রমাণ। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের সীমান্তে এখন মোঙ্গলীয় ঢঙ্গের জাতি আছে—যাহারা প্রশস্ত করোটি নয়। কগিন ব্রাউন এবং কেম্প (J Coggin Brown & S. W. Kemp) ৮৪ জন আবর (Abor) জাতীয় পুরুষ মাপিয়াছেন, যাহাদের মধ্যে শতকরা ৩২ জনই দীর্ঘ করোটি এবং ৭ জন মাত্র প্রশস্ত করোটি।* সুতরাং আকারের হিসাবে বাঙ্গালীকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি যে শ্রেণীর বাঙ্গালীর মধ্যে প্রশস্ত করোটি এবং মধ্যম করোটি সংখ্যায় বেশী, তাহাদিগকে করোটির হিসাবে মোঙ্গলীয় বলিবার কোনও বাধ্যবাধকতা নাই।

* Memoirs of A. S. B. Vol. V., Extra No. p. 91.

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কুল শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বাঙ্গালার ব্রাহ্মণজাতিকে সরাইয়া রাখিয়া বাঙ্গালী সাধারণকে মোঙ্গল দ্রবিড় সঙ্কর বলিতে চাহেন। তাই বলিয়াছি, শাস্ত্রী মহাশয়ের জাতিতত্ত্ব উদ্ভট বস্তু। যদি প্রশস্ত করোটিকে মোঙ্গল সম্পর্কের চিহ্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে তাহা ব্রাহ্মণের পক্ষেও স্বীকার করিতে হইবে, চণ্ডালের পক্ষেও স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান লেখকের মতে রিস্‌লির কথা যদি আপ্তবাক্য বলিয়া না ধরা যায়, তবে প্রশস্ত করোটি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতিকে মোঙ্গলীয় বলিয়া স্বীকার করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা দেখা যায় না। নেপালের স্বয়ম্ভূপুরাণে কথিত হইয়াছে, আদৌ মঞ্জুদেব "চীনদেশজ মানুষ" আনিয়া নেপালে স্থাপন করিয়াছিলেন। কালিকা পুরাণে (৩৯।১০৪) কামরূপ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—

"কিরাতৈর্বলিভিঃ ক্রূরৈ রক্তৈরপি চ বাসিতঃ।"

বাঙ্গালায় চীন বা কিরাত জাতির অভ্যুদয় সম্বন্ধে এইরূপ কোন পৌরাণিক কথাও প্রচলিত নাই। তবে কেন স্বীকার করিব, বাঙ্গালার প্রশস্ত করোটি ব্রাহ্মণ কায়স্থ মোঙ্গলীয় আগন্তুকগণের বংশধর।

পক্ষান্তরে মারাঠাগণের মধ্যে যাহারা প্রশস্ত করোটি এবং বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারা প্রশস্ত করোটি, ইহাদের সকলকে এক বংশোদ্ভব মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথম কারণ, বাঙ্গালীর এবং মারাঠার মধ্যে আকারের সাদৃশ্য। একদল প্রশস্ত করোটি ভুটিয়া, একদল প্রশস্ত করোটি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ, এবং একদল প্রশস্ত করোটি মারাঠা পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলে, বাঙ্গালী-মারাঠার ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ প্রতিভাত হইবে, না বাঙ্গালী-ভুটিয়ার ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ রহিয়াছে মনে হইবে, এই প্রশ্ন আমরা ননীগোপাল বাবুকে জিজ্ঞাসা করি।

তারপর ভাষার কথা। মারাঠী, হিন্দুস্থানী এবং বাঙ্গালা এই তিনটী আর্য্য ভাষার সম্বন্ধ বিচার করা যাউক। এই বিষয়ের চূড়ান্ত বিচার একজন সাহেব, স্যার জর্জ্জ গ্রিয়ার্সন, করিয়াছেন। গ্রিয়ার্সন আধুনিক কালে কথিত ভারতীয় আর্য্যভাষাগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এক শ্রেণীর নাম দিয়াছেন মধ্য-দেশীয় ভাষা—প্রধান নিদর্শন, হিন্দুস্থানী। অপর শ্রেণীর নাম দিয়াছেন বাহ্যভাষাচক্র। কাশ্মীরী, লণ্ডা (পঞ্জাবের পশ্চিমভাগে কথিত), সিন্ধী, মারাঠী, উড়িয়া, বিহারী, বাঙ্গালী ও আসামী ভাষা এই বাহ্যভাষাচক্রের অন্তর্গত। উভয় শ্রেণীর ভাষার মধ্যে মিশ্রভাষার চক্র। মধ্যদেশীয় হিন্দুস্থানীর এবং বাহ্য দেশীয় ভাষাচক্রের মধ্যে এতটা প্রভেদ যে হোর্ণলি এবং গ্রিয়ার্সনের ন্যায় দুইজন প্রবীণ সাহেব পণ্ডিত মনে করেন যে, উভয় প্রকার ভাষার আদিম বাহকগণ পৃথক সময়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে—এক সঙ্গে আসে নাই। * সুতরাং মধ্যদেশ হইতে আবর্ত্তে আবর্ত্তে যে সকল আর্য্য বাঙ্গালায় আসিয়াছে তাঁহাদের নিকট হইতে যে, বাঙ্গালার দ্রবিড় বা মোঙ্গল বাসেন্দাগণ বাঙ্গালা শিখিয়াছে, একথা কেহ বলিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে বলিতে হইবে, যাহারা বাঙ্গালায় বাঙ্গালা ভাষা আনিয়াছে তাহারা ভাষার হিসাবে কাশ্মীরী বা মারাঠাগণের জ্ঞাতি। মারাঠাগণের এবং বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারা দীর্ঘকরোটি, তাহাদের অধিকাংশই যখন তথাকথিত দ্রবিড়বংশীয়, মধ্যদেশ হইতে যাহারা আসিয়া মারাঠা বা বাঙ্গালীর সহিত মিশিয়াছে, তাহারা ও যখন দীর্ঘকরোটি এবং মধ্যদেশীয় ভাষাভাষী, তখন মহারাষ্ট্রে এবং বাঙ্গালায় বাহ্য আর্য্যভাষা বহনার্থ বাকী থাকে প্রশস্ত করোটি আগন্তুকগণ। অর্থাৎ মহারাষ্ট্রের এবং বাঙ্গালার যে সকল প্রশস্ত করোটি আগন্তুক আসিয়া, মধ্যদেশীয় আর্য্যগণের এবং দ্রবিড়-গণের সহিত মিশিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতিগঠন করিয়াছে, তাহারা ভাষায় আর্য্য ছিলেন। সে আর্য্যভাষা তাহারা মধ্যদেশীয়দিগের নিকট হইতে শিখেন নাই সুতরাং তাহারা নিজেরাই আর্য্যভাষী অর্থাৎ এক প্রকারের আর্য্য ছিলেন। ভারতের এই প্রশস্ত করোটি

* Indian Empire, vol. I. pp. 357-359.

আর্য্য আগন্তুকগণের সহিত খোটানের এবং কুচারের প্রশস্ত করোটি আর্য্য অধিবাসিগণের সম্বন্ধ অনুমান অসঙ্গত নহে,—সঙ্গত।

রিস্‌লি সাহেবের অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালীর আর এক শ্রেণীর পূর্ব্বপুরুষগণকেও ঠিক দ্রবিড় বলা চলে না। রিস্‌লি সাহেব দাক্ষিণাত্যের এবং মধ্য ভারতের সকল অনার্য্যভাষী অধিবাসিগণকেই "দ্রবিড়" সংজ্ঞা দিয়াছেন। কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ এখন একবাক্যে বলিতেছেন, সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতির কথিত ভাষায় এবং দ্রবিড় ভাষায় কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। দাক্ষিণাত্যে যাহারা দ্রবিড়ভাষা ব্যবহার করে, আকৃতির হিসাবে তাহাদের :সকলকে রিস্‌লি ভিন্ন আর কোন সাহেবই (যথা Thurston, ewell, Ke ne, Crooke) এক জাতীয় বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। ১৩২০ সালের "সাহিত্য" পত্রে প্রকাশিত "নিষাদ" নামক প্রবন্ধে এই বিষয়ে কিছু কিছু প্রমাণ দিয়াছি, দরকার হইলে, আরও প্রমাণ দিতে পারি। সাহেবেরা দ্রবিড় ভাষাভাষী ইরুলা, পানিয়ান প্রভৃতি কৃষ্ণকায় স্থূলনাসিকাযুক্ত,খর্ব্বাকৃতি জাতিনিচয়কে প্রাক্‌দ্রবিড় (Pre-Dravidian) বলিতে চাহেন, আমি ইহাদের নামকরণ করিয়াছি "নিষাদ"। বাঙ্গালার আসেপাশে, ছোটনাগপুরে এবং উড়িষ্যায়, এই প্রি-দ্রবিড় (নিষাদ) লক্ষণাক্রান্ত বর্ব্বর জাতিনিচয়ই বিস্তর দেখা যায়। ইহাদিগকে বাদ দিয়া বহুদূরে অবস্থিত,সুসভ্য দ্রবিড়গণের সহিত বাঙ্গালীর সম্বন্ধ কল্পনা এবং বাঙ্গালাকে দ্রবিড় সভ্যতার একটা প্রাচীন কেন্দ্র বলিয়া ঘোষণা যুক্তিযুক্ত কি? তেলুগু বা তামিল দেশে পুরাতন কবরের মধ্যে প্রাচীন দ্রবিড় সভ্যতার যেরূপ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, বাঙ্গালায় তেমন কোন নিদর্শন আজও পাওয়া যায় নাই। সুতরাং প্রমাণাভাবে শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত সায় দিয়া কেমন করিয়া বলিব, বাঙ্গালা এক সময় প্রাচীন দ্রবিড় সভ্যতার একটা কেন্দ্র ছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত বাঙ্গালার প্রাচীন অনার্য্য সভ্যতার বিবরণ যদৃচ্ছা কল্পিত নয় ত কি?

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

বহ্নিশিখা

দীপ্তিরূপিনী হে বহ্নি-শিখা, হে মোর অমৃত আলো,
আমারে তোমার দীপটি করিলে, ওগো ভালো সেই ভালো;
জ্বালাও বন্ধু জ্বালাও—
এমনি করিয়া জীবন-রাত্রে যাত্রীরে তব চালাও।

আমার বলিয়া যাহা-কিছু, কোন' অর্থ কি তার আছে—
তোমারি পরশ শুধু তারে প্রিয় সার্থক করিয়াছে!
ওগো সুন্দরী শিখা,
চিরদহনের এ কোন্ মিলন দগ্ধ-ললাট-লিখা!

কবে কোন্‌দিন প্রথম সে দেখা, অলস্ত মনে আছে—
প্রাণপতঙ্গ পলকে যেদিন আপনারে সঁপিয়াছে!
গিয়াছে তাহার সব—
তবু নিবিল না হে অগ্নি, তব অনন্ত খাণ্ডব!

হায় একি প্রেম, মিলন যাহার বিচ্ছেদ পলে-পলে;
বেদনা-অশ্রু শিখারূপে যার জ্বালামুখী হয়ে জ্বলে!
আলো ভাবে তারে আঁখি—
অন্তর মাঝে যে দাহ বিরাজে অন্যে বুঝিবে তা কি?

অঙ্গে-অঙ্গে রন্ধ্রে-রন্ধ্রে হানি' বিদ্যুৎ-জ্বালা
অবলুণ্ঠিত-কণ্ঠে পরালে কণ্টকে গাঁথা মালা;
ওগো সেই মণিহার
মর্ম্মের সাথে গাঁথা হয়ে গেছে—সাধ্য কি ভুলিবার!

তবে তাই হোক্—দহন তোমার, হে সর্ব্বভুক্ শিখা,
পরাক্ তাহার ললাটের 'পরে বেদনার রাজটীকা;
তোমার সে মহাদান
হানুক তাহার বক্ষের মাঝে মরণ-বজ্রবাণ!

হে মোর মরণ! শেষ নিবেদন—নির্ব্বাণে শুধু তার
ধূম-অঙ্কিত লাঞ্ছনা-কালী লিখোনা ললাটে আর;
দীপ্তি—সে থাক্ পরে,
দাহ থাক্ তার গোপন গর্ব্ব আপনার অন্তরে!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

নিষিদ্ধ ফল

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বাগবাজারের দুর্গাচরণ বাবু তাঁহার দ্বাদশ বর্ষীয়া সুসজ্জিতা সালঙ্কারা কন্যাটির হস্তধারণ করিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"এইটি আমার মেঝ মেয়ে, রায় বাহাদুর।"—কন্যাকে বলিলেন—"মা, এঁকে প্রণাম কর।"

ভবানীপুর নিবাসী রায় প্রফুল্লকুমার মিত্র বাহাদুর পারিষদগণ পরিবৃত হইয়া দরিদ্র দুর্গাচরণের তক্তপোষে বসিয়া বাঁধা হুঁকায় ধূমপান করিতেছিলেন। মেয়েটি সলজ্জভাবে তাঁহার পায়ের কাছে মাথা ঠেকাইয়া নত নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

রায় বাহাদুরের বয়স পঞ্চাশৎ বর্ষ হইবে। দিব্য গৌরবর্ণ পুরুষ, মোটা সোটা, হাস্যোজ্জ্বল বড় বড় চক্ষু, গোঁফ ও দাড়ি দুই-ই কামানো। খুব চওড়া হাঁসিয়া-যুক্ত বহুমূল্য শালের যোড়া গায়ে দিয়া বসিয়া ছিলেন। প্রসন্নদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত কন্যাটির পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"বাঃ, বেশ মেয়ে, খাসা মেয়ে, বেঁচে থাক মা, সুখে থাক। দিব্যি মেয়েটি, নয় হে সুরেশ?"

সুরেশ-নামা পারিষদ বলিল—"আজ্ঞে তার আর সন্দেহ কি?"

রায় বাহাদুর বলিলেন—"মা, তোমার নামটি কি বল ত।"

মেয়েটির ওষ্ঠযুগল ঈষৎ কম্পিত হইল, কিন্তু কোনও শব্দ উচ্চারিত হইল না। দুর্গাচরণ বাবু উৎসাহ দিয়া তাহাকে বলিলেন—"বল মা, বল।"

মেয়েটি তখন অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল—"শ্রীমতী নন্দরাণী দাসী।"

রায় বাহাদুর বলিলেন—"নন্দরাণী? বেশ বেশ। নামটিও বেশ। কেমন হে যতীন দাদা?"

যতীন্দ্র নামধারী পারিষদ বলিল—"খাসা নাম।"

দুর্গাচরণ বাবু বলিলেন—"নন্দরাণী নাম—বাড়ীতে সবাই রাণী বলেই ডাকে।"

"রাণী? তা আপনার মেয়ে রাজরাণী হওয়ারই উপযুক্ত বটে। মুখখানি নিখুঁৎ। চোখ দুটিও চমৎকার। ঘোষাল মশায় কি বলেন?"

ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—"এ মেয়ে আপনারই পুত্রবধূ হবার উপযুক্ত।"

রায় বাহাদুর বলিলেন—"তা মা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বস, এইখানে বস। দুর্গাচরণ বাবু, আপনিই বা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।"

মেয়েটি ইতস্ততঃ করিতেছিল। তাহার পিতা বলিলেন—"বস মা, বস।"—বলিয়া নিজেও উপবেশন করিলেন। মেয়েটিও মাথা নীচু করিয়া পিতার কাছ ঘেঁসিয়া বসিল।

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি পড় মা?"

"আখ্যানমঞ্জরী দ্বিতীয় ভাগ, পদ্যপাঠ প্রথম ভাগ আর সরল শুভঙ্করী।"

"পাণ সাজতে জান?"

"জানি।"

দুর্গাচরণ বাবু বলিলেন—"আমার বড় মেয়ে শ্বশুর-বাড়ী গিয়ে অবধি বাড়ীর সব পাণ ঐ ত সাজে। যা খেলেন, ওরই সাজা পাণ।"

রায় বাহাদুর রূপার ডিবা হইতে একটা পাণ লইয়া কপ্‌ করিয়া মুখে দিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন—"বেশ পাণ। রান্না-বান্না কিছু শিখেছ মা?"

রাণী বলিল—"শিখেছি।"

"তাও শিখেছ? বেশ বেশ। আলুভাজা, পটল ভাজা, মাছের ঝোল—এ সব রাঁধতে পার?"

মেয়েটি ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"পারি।"

রায় বাহাদুর তাহার স্কন্ধদেশে সস্নেহে মৃদু মৃদু

আঘাত করিতে করিতে বলিলেন—"এরই মধ্যে শিখেছ ? লক্ষ্মী মেয়ে !"

দুর্গাচরণ বাবু বলিলেন—"আমি আর বাপ হয়ে কি বলব রায় বাহাদুর—যদি আমার মেয়েটিকে গ্রহণ করেন তবে দেখতেই পাবেন। গত মাসে আমার স্ত্রী যখন আঁতুড়ে, বড় মেয়েটি শিবপুরে, অনেক কাকুতি মিনতি করাতেও বেয়াই মশাই তাকে পাঠালেন না, রাণীই আমাদের সংসার চালিয়ে দিয়েছে। ওকে যদি নেন, সবই জানতে পারবেন।"

মাথাটি দুলাইতে দুলাইতে সহাস্যে রায় বাহাদুর বলিলেন—"নেব না ? নেব না ? লুফে নেব। এমন মেয়ে পেলে কেউ ছাড়ে ? কি বল হে সতীশ ?"

সতীশ বলিল—"আজ্ঞে তার আর সন্দেহ কি ?"

রায় বাহাদুর বলিলেন—"আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তার পর মাকে ছুটি দিই।"—বলিয়া নন্দরাণীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া তাহার দিকে ঝুঁকিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ মা, আমার মাথার পাকাচুল তুলে দিতে পারবে ? দুপুরবেলা, খেয়ে যখন আমি শোব, বিছানায় তোমার এই বুড়ো নতুন বাবাটির কাছে বসে বসে, একটি একটি করে পাকাচুল তুলে দিতে পারবে কি ?—এটি বোধ হয় শেখনি, কি বল মা ?—তোমার বাবার মাথায় ত পাকাচুল নেই !"—বলিয়া তিনি উচ্চ-হাস্য করিয়া উঠিলেন।

নন্দরাণীর মুখেও ঈষৎ হাস্য সঞ্চার হইল। সে মুখটি তুলিয়া রায় বাহাদুরের মস্তকখানির দিকে চাহিল। দেখিল, সেখানে "কলৌ ইব সজ্জনা" চুলের সংখ্যা খুবই কম এবং দুর দুরান্তে অবস্থিত।

তাহার মৌনকেই সম্মতিজ্ঞান করিয়া রায় বাহাদুর বলিলেন—"আচ্ছা মা, সে পরীক্ষাও হবে। যাও এখন বাড়ীর ভিতর যাও।"

বাহিরে ঝি দাঁড়াইয়া ছিল। নন্দরাণী তক্তপোষ হইতে নামিবামাত্র, সে আসিয়া তাহার হস্তধারণ করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৈঠক হইতে হুঁকাটি তুলিয়া লইয়া প্রায় এক মিনিট কাল রায় বাহাদুর নীরবে ধূমপান করিলেন। পরে হুঁক দুর্গাচরণ বাবুর হাতে দিয়া বলিলেন—"তার পর ভায়া, কবে বিয়ে দেওয়া তোমার মত বল। ঐ যা, একবারে আপনি থেকে তুমি বলে ফেল্লাম।"

দুর্গাচরণ বাবু বলিলেন—"তুমিই বলুন। আপনি বল্লেই বরং আমাকে লজ্জা দেওয়া হয়। আমি আপনার চেয়ে সব বিষয়েই ছোট। বয়সে—ধনে—মানে—"

রায় বাহাদুর বলিলেন—"হ্যাঁ হে—হ্যাঁ। তুমি বয়সে আমার চেয়ে ছোট তা ত স্বীকারই করছি। তা বলে, চুল পেকেছে বলেই আমি যে খুব বুড়ো হয়ে গেছি তা ভেব না—হা হা হা।"—বলিয়া তিনি দুর্গাচরণ বাবুর পৃষ্ঠ চাপড়াইয়া দিলেন। পারিষদগণও খুব হাসিতে লাগিল।

দুর্গাচরণ বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"যবে অনুমতি করেন তবেই বিবাহ হতে পারে। এই ফাল্গুন মাসেই হোক্। তবে আমি অতি সামান্য লোক —গরীব—"

রায় বাহাদুর বলিতে লাগিলেন—"গরীব ত কি হয়েছে ? গরীব ত কি হয়েছে ? গরীবই বা কিসের ? তুমি কি কারু কাছে ভিক্ষে চাইতে গিয়েছ ? আর, হলেই বা গরীব ? গরীবের মেয়ের বিয়ে হবে না ? সে আইবুড়ো থাকবে ? হিন্দুশাস্ত্রের এমন বিধান নয়। তুমি বোধ হয় আজকালের বরপণ প্রথা ভেবে এ কথা বলছ ? সে প্রথার আমি বিরোধী—ভয়ঙ্কর বিরোধী।"

দুর্গাচরণ বাবু বলিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা শুনেই ত—"

"শুনেই ত কি ? পড়নি ? আমার 'সামাজিক-সমস্যা-সমাধান' কেতাব পড়নি ? তাতে বরপণ বলে একটা চ্যাপ্টারই যে রয়েছে। বরপণ প্রথাকে আমি যাচ্ছেতাই করে গালাগাল দিয়েছি—একেবারে যাচ্ছে-তাই করে। পড়নি ?"

দুর্গাচরণ বাবু বলিলেন—"পড়েছি বৈ কি। আপনার বই কে না পড়েছে? আপনি একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার।"

রায় বাহাদুর বলিলেন—"কোথা বিখ্যাত? বঙ্কিমচন্দ্র একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার বটে। সে আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু কি না। প্রেসিডেন্সি কলেজে একসঙ্গে আইন পড়্‌তাম। আজকের কথা? বঙ্কিমের খুব নাম হয়েছে বটে। তার একখানি নতুন বই বেরিয়েছে, রাজসিংহ। পড়েছ? হু হু করে বিক্রী হচ্ছে। অথচ আমার বই পোকায় কাটছে, কেউ কিনছে না। তাই বঙ্কিমকে বলছিলাম সেদিন।"

একজন ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কি কথা হল?"

রায় বাহাদুর বলিতে লাগিলেন—"বঙ্কিমকে বল্লাম ওহে, তোমার যে রকম নাম হয়েছে, তুমি এখন ঐ সব লভ্‌ আর লড়াই ছেড়ে, এমন খানকতক উপন্যাস লেখ যাতে দেশের উপকার হয়। আমার কথা ত কেউ শোনে না, তোমার কথা শুন্‌বে। এই যে বরপণ প্রথাটি সমাজের মধ্যে প্রবেশ করেছে, ক্রমে যে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে! বরপণ প্রথার দোষ দেখিয়ে চুটিয়ে একখানা নভেল লেখ। আর একখানা লেখ, যা পড়ে বাঙ্গালীর বিলাসিতা—বিশেষ চা খাওয়াটা—একটু কমে। একখানা লেখ যৌথ কারবার সম্বন্ধে। কেন বাঙ্গালীর যৌথ কারবার ফেল হয়ে যায়, কি কি উপায় অবলম্বন করলে তা সফল হতে পারে, তার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি বেশ করে বুঝিয়ে দাও। তাতে দেখাও যে জনকতক বাঙ্গালী যুবক কলেজ থেকে বেরিয়ে এক সঙ্গে মিলে যৌথ কারবার আরম্ভ করলে, আর দিন দিন তাদের খুব উন্নতি হতে লাগল। ক্রমে তারা এক একটি লক্ষপতি হয়ে দাঁড়াল, গভর্ণমেন্ট থেকে খেতাব পেলে ইত্যাদি। তা নয়, খালি লভ্‌ আর লড়াই—লভ্‌ আর লড়াই!—ও সব লিখে কি হবে বল দেখি?"

ঘোষাল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল্লেন বঙ্কিমবাবু?"

হুঁকাটি হাতে লইয়া রায় বাহাদুর বলিলেন—"হাস্‌তে লাগল। বিদ্রূপ করে বল্লে—'আচ্ছা তা হলে হলে যৌথ কারবারের নভেলটাই আরম্ভ করি। কাঁচা মালের কি দর আর কোথায় কোন্‌ জিনিষ পাওয়া যায়, রেলভাড়াই বা কত, সে গুলোও পরিশিষ্ট করে ছেপে দেব কি?'—'তোমার যা খুসী তাই কর'—বলে রাগ করে আমি চলে এলাম।"

রায় বাহাদুরের মুখখানি অত্যন্ত অপ্রসন্ন দেখাইতে লাগিল। প্রায় পাঁচ মিনিট কাল তামাক খাইয়া তবে তিনি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন।

দুর্গাচরণ বাবু বলিলেন—"টাকা কড়ি সম্বন্ধে আমার প্রতি অনুগ্রহ যদি করেন, তা হলে ত আর কোন বাধাই নেই। যে দিন অনুমতি করবেন, সেই দিনই বিবাহ হতে পারে। সামনে ফাল্গুন মাসে—"

রায় বাহাদুর বলিলেন—"রও—রও। আরও কথা আছে। আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছিলাম। বিবাহ সম্বন্ধে আমার আর একটি মত আছে। সেটি যদি তুমি স্বীকার হও, তবেই আমি ছেলের বিবাহ দিতে পারি।"

দুর্গাচরণ বাবু একটু শঙ্কিত হইয়া বলিলেন—"কি মত, আজ্ঞা করুন।"

রায় বাহাদুর একটু নড়িয়া চড়িয়া ভাল করিয়া বসিয়া বলিলেন—"সামাজিক-সমস্যা-সমাধান কেতাবে বাল্যবিবাহ বলে একটি পরিচ্ছেদ আছে। পড়েছ?"

দুর্গাচরণ বাবু বিপন্নভাবে বলিলেন—"আজ্ঞে—বোধ হয়—কি জানি—ঠিক মনে পড়্‌ছে না।"

"সে প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছি, বাল্যবিবাহ খুব ভাল জিনিষ। আমাদের সমাজে এই একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা যতদিন প্রচলিত থাক্‌বে, ততদিন বাল্যবিবাহ ভিন্ন উপায় নেই। কেবলমাত্র স্বামীটিই স্ত্রীলোকের পরিজন নয়, তার শ্বশুর, তার শাশুড়ী, ভাসুর, দেওর, ননদ, ভাজ এ সব নিয়ে তাকে ঘরকন্না করতে হবে। সুতরাং ছোটবেলা থেকেই বউকে সেই পরিবারভুক্ত হতে হবে। কেমন কি না?"

দুর্গাচরণ বাবু বলিলেন—"আজ্ঞে হাঁ—ঠিক কথা।"

"আচ্ছা, প্রমাণ হল, বাল্যবিবাহ আমাদের সমাজের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। এটা অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু—এর মধ্যে একটু কিন্তু আছে ভায়া। সেটি আমার আবিষ্কার। কি বল দেখি? কিন্তু—কি?"

দুর্গাচরণ বাবু মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। কিছুই বলিতে পারিলেন না।

রায় বাহাদুর বলিতে লাগিলেন—"বাল্যবিবাহ হবে বটে, কিন্তু একটু বয়স না হলে স্বামী স্ত্রীর দেখা সাক্ষাৎ হবে না। আমার কেতাবে, মেয়ের বয়স ষোল আর ছেলের বয়স চব্বিশ—এই নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছি। এর পূর্ব্বে তাদের একত্র হতে দেওয়া উচিত নয়। ডাক্তারি শাস্ত্র খুলে দেখ, আমার মত যথার্থ কি না বুঝতে পারবে।"—বলিয়া রায় বাহাদুর একটু গর্ব্বের হাসি হাসিয়া, মুখটি উন্নত করিয়া রহিলেন।

দুর্গাচরণ বাবু অধোমুখে কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন—"কথা ত ঠিকই। কিন্তু বড় মুস্কিল যে! আমার রাণীর বয়স, এখন ধরুন বারো, শ্রাবণ মাসে বারো বেরিয়ে তেরোয় পড়বে। তবে কি তিন চার বছর এখন জামাই আনতে পাব না? বাড়ীর মেয়েরা তা হলে যে—"

রায় বাহাদুর বাধা দিয়া বলিলেন—"কেন জামাই আন্‌তে পাবে না? অবশ্যই পাবে। যেদিন বলবে, তোমার জামাইকে পাঠিয়ে দেব। তাকে খাওয়াও দাওয়াও, আদর কর, যত্ন কর—বাড়ীর মেয়েরা আমোদ আহ্লাদ করুক—কিন্তু ঐ নিয়মটি প্রতিপালন করতে হবে।"

দুর্গাচরণ বাবু বলিলেন—"বড় সমস্যার কথা।"

রায় বাহাদুর উৎসাহে উচ্চ হইয়া বসিয়া বলিলেন—"সমস্যাই ত! সমস্যাই ত!—এই রকম সব সমস্যার সমাধান করেছি বলেই ত আমার কেতাবের নাম 'সামাজিক-সমস্যা-সমাধান।' এর সুন্দর উপায় আমি বের করেছি। যদিও হঠাৎ সেটা কারু মনে আসে না, আসলে উপায়টি কিন্তু খুবই সোজা।"

"কি উপায়?"

"বউ অন্দরে থাক্‌বে, ছেলে বাইরের ঘরে শোবে। বস্, হয়ে গেল।—কেমন, সহজ উপায় নয়?"—বলিয়া রায় বাহাদুর হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

দুর্গাচরণ বাবু কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন—"লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সেটা কি ভাল হয়?"

কেহ কথার প্রতিবাদ করিলে রায় বাহাদুর অত্যন্ত রাগিয়া যান। বলিলেন—"আমি ভাল বুঝেছি— তাই লিখেছি। তোমার ভাল বোধ না হয়, অন্যত্র তোমার মেয়ের বিয়ের চেষ্টা দেখতে পার। আমার এক কথা। পাহাড় নড়ে ত নড়বে, প্রফুল্ল মিত্তিরের কথা নড়বে না।"—বলিয়া তিনি গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিলেন।

রায় বাহাদুরের এই ভাবান্তর দেখিয়া দুর্গাচরণ বাবু ভীত হইয়া পড়িলেন। পাত্রটি হাতছাড়া হইলে, বড়ই দুঃখের বিষয় হইবে। বৎসরে চল্লিশ হাজার টাকা জমিদারী আয়, কলিকাতায় দুই তিনখানি বাড়ী আছে, রায় বাহাদুরের ঐ একমাত্র পুত্র, বি-এ পড়িতেছে, সুশীল, সচ্চরিত্র, সুপুরুষ—এক পয়সা পণ দিতে হইবে না—এমন সুযোগটি আর কোথায় পাওয়া যাইবে? তাই সবিনয়ে, নানা মিষ্ট কথায় দুর্গাচরণ বাবু তাঁহার ভাবী বৈবাহিকের মনস্তুষ্টি সম্পাদনে যত্নবান হইলেন। "বাড়ীতে" পরামর্শ করিয়া যেমন হয়, আগামী কল্য প্রাতে গিয়া রায় বাহাদুরকে জানাইয়া আসিবেন বলিলেন।

রায় বাহাদুর তখন, হাসিতে হাসিতে, স-পারিষদ বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বৃহৎ ল্যাণ্ডো গাড়ী, যুগল ওয়েলারের পদভরে দুর্গাচরণ বাবুর ক্ষুদ্র গলি কাঁপাইয়া সদর রাস্তায় বাহির হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ফাল্গুন মাসেই শুভবিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। রায় বাহাদুরের পুত্রের নাম, শ্রীমান হেমন্তকুমার।

ফুলশয্যা হয় নাই? হইয়াছিল বৈকি। কিন্তু তাহার পর যে কয়টি দিন বধূ সেখানে রহিল, বরের সহিত আর তাহার দেখা সাক্ষাৎ হইল না। রায় বাহাদুর পূর্ব্বেই

তাঁহার স্ত্রী ও পরিবারস্থা অন্য সকলের প্রতি তাঁহার ভীষণ আজ্ঞা প্রচার করিয়া রাখিয়াছিলেন। গৃহিণী, নিজের স্বামীকে বেশ চিনিতেন, সুতরাং হুকুম রদ্ করাইবার জন্য আর বৃথা চেষ্টা করিলেন না।

সপ্তাহকাল থাকিয়া রাণী পিত্রালয়ে চলিয়া গেল।

দুর্গাচরণ বাবু জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা সুবুদ্ধির কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। গৃহিণী কর্ত্তৃক এ বিষয়ে বার বার অনুরুদ্ধ হইয়া কহিলেন—"দেখ, জামাইকে সকাল বেলা নিয়ে এসে বেলাবেলি ফিরে পাঠাতে পারি। কিন্তু তাঁর ছেলের সঙ্গে বউয়ের দেখা হয় নি, এ কথা বেয়াই যদি বিশ্বাস না করেন, আমি তখন সাফাই সাক্ষী পাব কোথা? বেয়াইয়ের মেজাজ জান ত?"

জ্যৈষ্ঠমাসে জামাই ষষ্ঠী হইল। দুর্গাচরণ বাবু রাণীকে শিবপুরে তাঁহার বড় মেয়ের শ্বশুরবাড়ীতে রাখিয়া, মাতব্বর এলিবাই সাক্ষী সৃষ্টি করিয়া, তাহার পর হেমন্তকুমারকে গৃহে আনিয়া জামাতার্চ্চন করিলেন।

আষাঢ় মাসে রায় বাহাদুর বধূকে নিজ বাটীতে আনয়ন করিলেন। হেমন্ত এতদিন অন্তঃপুরেই শয়ন করিত, এইবার বহির্ব্বাটীতে নির্ব্বাসিত হইল। এ বৎসর তাহার এগ্‌জামিনের পড়া, কিন্তু মেঘদূত মুখস্থ করিয়া ও পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে বিরহমূলক নানা কবিতা লিখিয়া সে বর্ষাযাপন করিতে লাগিল।

দুইবার জলযোগ ও দুইবার আহার করিবার জন্য মাত্র হেমন্তকুমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিত। বধূ আসিবার দিন পনেরো পরে একদিন হটাৎ উভয়ের চোখোচোখী হইয়া গেল।

মাঝে মাঝে এইরূপ চোখোচোখী হইতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট চারিবার ভিন্ন, আরও দুই তিনবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার অছিলা হেমন্ত আবিষ্কার করিয়া লইল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে একদিন জল খাইয়া ফিরিবার পথে হেমন্ত দেখিল, বধূ একস্থানে জড়সড় হইয়া ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আশে পাশে কেহই নাই। যাইবার সময় সে বধূর শাড়ীটি স্পর্শ করিয়া গেল।

ইহার পর হইতে প্রায় প্রতিদিনই এরূপ ঘটনা ঘটিত। ক্রমে পত্র বিনিময়, তাম্বুল বিনিময় এবং আরও কি কি বিনিময় ঠিক জানি না—সেই মুহূর্ত্তের মিলনেই সম্পন্ন হইতে লাগিল।

বর্ষা কাটিল, শরৎকাল আসিল। ভাদ্রের শেষ সপ্তাহে, (মাসের পয়লা তারিখে কাগজ বাহির হওয়া তখন রেওয়াজ হয় নাই) "বঙ্গবাণী" মাসিক পত্রিকায় "চকোরের ব্যথা" শীর্ষক হেমন্তের এক কবিতা ছাপা হইল। নিম্নে তাহার নামও স্বাক্ষরিত ছিল। কবিতাটি কেমন করিয়া রায় বাহাদুরের চক্ষে পড়িয়া যায়—পরদিন তিনি বৈবাহিককে পত্র লিখিলেন—"বধূমাতা অনেকদিন আসিয়াছেন। মার জন্য বোধ হয় তাঁহার অত্যন্ত মন-কেমন করে। অতএব আশ্বিন মাস পড়িলেই তাঁহাকে তুমি কিছুদিনের জন্য লইয়া যাইবে।"—দুর্গাচরণ বাবু আসিয়া কন্যাকে গৃহে লইয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কার্ত্তিকমাসে প্রেসিডেন্সি কলেজ খুলিবার দুই তিন দিন পরে ক্লাসে বসিয়া হেমন্ত একখানি পত্র পাইল। শিরোনামার হস্তাক্ষর অপরিচিত—বাঙ্গালায় লেখা এবং স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া বোধ হইল।

দেখিয়া হেমন্ত একটু আশ্চর্য্য হইল, কারণ কলেজের ঠিকানায় কখনও তাহার পত্রাদি আসে না। টিকিটের উপর মোহর দেখিল—শিবপুর। পার্শ্বোপবিষ্ট জনৈক ছাত্র বলিল—"গিন্নীর চিঠি নাকি?"—"না"—বলিয়া পত্রখানি হেমন্ত কোটের বুক পকেটে লুকাইয়া রাখিল এবং অধ্যাপকের বক্তৃতার প্রতি বিশেষ মনঃসংযোগের ভাণ করিয়া রহিল।

আসলে তাহার মনের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উদিত হইতেছিল—

(১) শিবপুরে আমার বড় শ্যালীর শ্বশুরবাড়ী, সেখান হইতেই কি পত্র আসিল?

(২) কখনও ত আসে না, আজ আসিল তাহার কারণ কি?

(৩) রাণী কি তাহার দিদির মারফৎ আমাকে এ চিঠি পাঠাইয়াছে ?

(৪) তাহাই যদি হয়, তবে দিদির মারফৎ তাহাকে চিঠি লেখা আমার উচিত হইবে কি না ?

(৫) যদি লিখি তবে বাবার তাহা ধরিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা আছে কি না ?

(৬) সকলের বাবা যেরূপ, আমার বাবা সেরূপ নহেন কেন ? এমন কঠিন এমন নিষ্ঠুর কেন ?

এই সকল দুরূহ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ হেমন্ত পিপাসা অনুভব করিল। ক্লাসের শেষ দিকে এবং দরজার অতি-নিকটেই সে বসিয়া ছিল—সুরুৎ করিয়া বাহির হইয়া গেল। জলের জন্য দ্বারবানের নিকট তাহাকে যাইতে হইল না—কারণ পকেটের ভিতর লেফাফার মধ্যেই তাহা ছিল। বাগানে নামিয়া গিয়া পত্রখানি খুলিয়া সে পাঠ করিল।

তাহাতে লেখা ছিল—

১৭নং বিনোদ বোসের গলি,
শিবপুর।
২৫শে কার্ত্তিক।

কল্যাণবরেষু

ভাই হেমন্ত, তুমি আমাকে চিনিতে পারিবে কি না বলিতে পারি না, কারণ একদিন মাত্র বাসরঘরে আমায় তুমি দেখিয়াছিলে, তাহাও ৮।৯ মাস পূর্ব্বে। আমি তোমার দিদি হই, তোমার শ্বশুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। উপরে লিখিত ঠিকানায় আমার শ্বশুরালয়।

আমার দিদিশাশুড়ী তোমায় দেখেন নাই—একবার দেখিতে ইচ্ছা করেন। তোমার কলেজ হইতে শিবপুর এমন ত কিছু দূর নহে—বড় জোর এক ঘণ্টার পথ। শিবপুর ঘাটে নামিয়া যাহাকে আমাদের ঠিকানা বলিবে, সেই পথ দেখাইয়া দিতে পারিবে। তোমার সঙ্গে আমারও অনেক অত্যাবশ্যকীয় কথা আছে—অতএব যত শীঘ্র পার, অবশ্য অবশ্য একদিন আসিবে। বেলা বারোটা হইতে দুইটার মধ্যে আসিলেই ভাল হয়। আমার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর অনুমতি অনুসারে এ পত্র তোমায় লিখিতেছি।

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার দিদি যামিনী।

পুঃ রাণী গতকল্য হইতে এখানে। আগামী রবিবার বাবা তাহাকে লইয়া যাইবেন।

পত্রখানি, বিশেষতঃ শেষ দুই লাইন দুই তিনবার পাঠ করিয়া হেমন্ত ক্লাসে ফিরিয়া গেল। অধ্যাপক মহাশয় তখন সনেটের স্বরূপ বুঝাইয়া বলিতেছিলেন—শেষ দুই লাইনেই সনেটের সমস্ত মিষ্ট রসটুকু জমা হইয়া থাকে।

সেদিন কলেজে বাকী কয় ঘণ্টা কি যে বক্তৃতা হইল হেমন্ত তাহা কিছু বলিতে পারে না।

রাত্রে শয়ন করিয়া সে ভাবিতে লাগিল, রাণী আসিয়াছে বলিয়া কি দিদি ডাকিয়া পাঠাইলেন ? না তাঁহার দিদিশাশুড়ী সত্যসত্যই আমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল ? সেখানে গেলে, রাণীর সঙ্গে আমার দেখা হইবে কি ? যে রকম কপাল, ভরসা হয় না। "পিতৃসত্য রক্ষা করিবার জন্য রামচন্দ্র বনে গিয়াছিলেন—আমি কন্যা হইয়া বাবার সত্যভঙ্গ করাই কেন"—এইরূপই যদি দিদির মনের ভাব হয় ?—হয়, হউক। তাহারা যদি আমায় জল খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করে, কখনই খাইব না। একটা পাণ পর্য্যন্ত খাইব না।—আবার তাহার মনে হয়—না, দেখা হইবে বৈকি, অবশ্যই হইবে। সকল কথা জানিতে পারিয়াই বোধ হয় দিদি তাহাকে সেখানে লইয়া গিয়াছেন। দিদির বাবাই সত্যবদ্ধ—দিদি ত আর সত্যবদ্ধ হন নাই। বোধ হয় আমাদের দুঃখে প্রাণ কাঁদিয়াছে—তাই এ কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। নহিলে, বাড়ীর ঠিকানায় চিঠি না লিখিয়া কলেজের ঠিকানায় চিঠি লিখিলেন কেন ? রাণী সেখানে রবিবার অবধি আছে, এ কথাই বা বিশেষ করিয়া লিখিবার কারণ কি ?—দেখা বোধ করি হইতে পারে।

এইরূপে নানা চিন্তায় রাত্রি প্রভাত হইল। হেমন্ত আজ স্নানাহার একটু তাড়াতাড়ি সারিয়া লইল—অন্য দিন অপেক্ষা একঘণ্টা পূর্ব্বেই আজ কলেজ যাত্রা করিল। আজ নাকি এগারোটা হইতেই লেকচার আরম্ভ।

পৌনে এগারোটার সময় কলেজের সম্মুখে গাড়ী হইতে নামিয়া কোচম্যানকে হেমন্ত বলিল আজ বাড়ী ফিরিতে তাহার দেরী হইবে, চারিটার পূর্ব্বে গাড়ী আনিবার প্রয়োজন নাই।

গাড়ী চলিয়া গেল। দ্বারবানের নিকট পুস্তকাদি রাখিয়া হেমন্ত একখানি ঠিকা গাড়ী লইল। তখনও কলিকাতায় বৈদ্যুতিক ট্রাম হয় নাই—ঘোড়ার ট্রাম—মাঝে মাঝে অচল হইয়া পড়িত। ট্রামকে হেমন্ত বিশ্বাস করিতে পারিল না।

ঠিকা গাড়ীতে প্রিন্সেপ্‌স্ ঘাট—সেখান হইতে নৌকা যোগে শিবপুর। গঙ্গাবক্ষ হইতে শিবপুর দেখা যাইতে লাগিল। হেমন্ত সেইদিকে ব্যাকুল ভাবে চাহিয়া রহিল। নৌকা চলিতেছে—একবারে গজেন্দ্র গমনে!—দাঁড়ি বেটারা কুড়ের বাদশাহ!

শিবপুর ঘাটে নামিয়া, বাড়ী অনুসন্ধান করিয়া লইতেও কিছু সময় নষ্ট হইল। শুনিল, গৃহকর্ত্তা হাওড়ার উকীল। তাঁহার পুত্র—বাগবাজারে যাহার বিবাহ হইয়াছে—সে কলিকাতায় কোন হউসের নায়েব খাজাঞ্চি। পথের লোকের নিকটেই এ সকল সংবাদ হেমন্ত সংগ্রহ করিল।

১৭ নম্বরের সম্মুখীন হইবামাত্র হেমন্ত ঘড়ি খুলিয়া দেখিল—কলেজ হইতে আসিতে এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট লাগিয়াছে।

ডাকাডাকিতে একজন ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। পরিচয় লইয়া অন্তঃপুরে সে সংবাদ দিতে গেল। ক্রমে একজন ঝি আসিয়া বলিল—"জামাই বাবু ভাল আছেন ত? আসুন, বাড়ীর ভিতর আসুন।"—তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হেমন্ত ক্রমে দ্বিতলের একটি কক্ষে উপনীত হইল।

অল্পক্ষণ পরেই, "কি ভাই চিন্‌তে পার?"—বলিয়া উনিশ কিম্বা কুড়ি বৎসর বয়সের গৌরবর্ণা হাস্যময়ী এক যুবতী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কোলে এক বৎসরের একটি শিশু।

হেমন্তের মনে পড়িল, বাসরঘরে ইঁহাকে দেখিয়াছিল বটে।—"যামিনী দিদি?"—বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইল।

যামিনী বলিল—"হয়েছে ভাই, আমি অমনিই তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি। আর, আশীর্ব্বাদের দরকারই বা কি? রাণীর সঙ্গে যেদিন তোমার বিয়ে হয়েছে—সেইদিনই ত রাজা হয়েছ।"—বলিয়া যামিনী সুমিষ্ট হাসির লহরী তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে, রুদ্ধজানালার বাহিরে বারান্দা হইতে একাধিক তরুণীকণ্ঠে চাপা হাসির একটা গুঞ্জনধ্বনিও শুনা গেল।—"কে লা ছুঁড়ি গুলো—পালা এখান থেকে বলছি"—বলিয়া যামিনী বাহির হইবামাত্র ঝম্ ঝম্ শব্দ করিতে করিতে কয়েক যোড়া পদ সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

যামিনী ফিরিয়া আসিলে হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিল—"দিদি, আমায় ডেকেছেন কেন?"

"কেন বল দেখি? যদি বলতে পার ত—সন্দেশ খাওয়াব"—বলিয়া যামিনী হাসিতে লাগিল।

"বল্‌তে পারলাম না দিদি—সন্দেশ আমার ভাগ্যে নেই"—বলিয়া হেমন্ত খোকাকে কোলে লইবার জন্য হাত বাড়াইল।

খোকা এই অপরিচিত ব্যক্তির কোলে যাইতে রাজি হইল না। তাহার মা তাহাকে কত করিয়া বুঝাইল—"যাও বাবা—কোলে যাও; তোমার মেছো মছাই হন, তোমায় কত ভালবাসবেন, কত আদর করবেন, লক্ষি বাবা—যাও বাবা—পাজি হতভাগা ছেলে, কোলে না গেলি ত তাঁর বয়েই গেল।"

বাড়ীর কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর যামিনী বলিল—"হ্যাঁ ভাই, কটা অবধি তুমি এখানে থাকতে পারবে?"

হেমন্ত এ অঙ্কটি পূর্ব্বেই মনে মনে কষিয়া রাখিয়া-

ছিল। বলিল—"বেলা আড়াইটের সময় আমাকে বেরুতে হবে দিদি।"

ঘরে ক্লক ছিল, যামিনী দেখিল সাড়ে বারো প্রায় বাজে। বলিল—"আচ্ছা দিদিমাকে তবে ডেকে আনি।"

দুইমিনিট পরে হেমন্ত শুনিল, ঝুম্ ঝুম্ করিয়া মলের শব্দ নিকটে আসিতেছে। হেমন্ত ভাবিল, দিদির পায়ে ত একগাছি করিয়া ডায়মন-কাটা মল দেখিয়াছি—ঝুম্ ঝুম্ করিয়া কে আসে? দিদিমার আওয়াজ কি এ রকমটা হইবে?

সে শব্দটা কিন্তু ঘর অবধি আসিল না, বাহিরেই থামিয়া গেল। যামিনী একাকিনী প্রবেশ করিয়া হাসিয়া বলিল—"দিদিমার এখন অবসর হল না ভাই—এখন তঁার আহ্নিক সারা হয় নি। অন্য কাউকে তোমার যদি দরকার হয় ত বল। আর কাউকে চাই?"

হেমন্তের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। আশায় ও আনন্দে তাহার বুকটি ঢিব্ ঢিব্ করিতে লাগিল।

যামিনী হাসিয়া বাহির হইতে যাহাকে টানিয়া আনিল, কুসুম রঙের শাড়ীতে তাহার আপাদমস্তক আবৃত। তাহাকে ভিতরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া সে বলিল—"এই নাও—তোমার রাণী নাও ভাই রাজা। রাজা ও রাণীর অভিনয় আমরা কেউ আড়ি পেতে দেখব না—সে আমরা থিয়েটারেই দেখে নিয়েছি। আমি এখন চল্লাম, নিশ্চিন্ত হয়ে দুটো অবধি তুমি রাজত্ব কর। আমি ততক্ষণ তোমার জন্যে জল খাবার তৈরি করিগে।"—বলিয়া কোন উত্তরের অপেক্ষা মাত্র না করিয়া সশব্দে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কার্ত্তিক মাস কাটিল, অগ্রহায়ণ আসিল। এখন আর হেমন্তের কলেজ নাই, বক্তৃতা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, ফাল্গুন মাসে পরীক্ষা। কয়েকদিন বাড়ীতে থাকিয়া হেমন্ত বলিল—"এখানে গোলমালে আমার পড়াশুনোর বড়ই ব্যাঘাত হচ্ছে। কল্‌কাতায় মেসে গিয়ে এ কটা মাস আমি থাকি।"

পুত্রের এই অধ্যয়নস্পৃহায় পিতা কোনও বাধা দিলেন না।

হেমন্ত মেসে গিয়া রহিল। ইতিমধ্যে তাহার শ্যালীপতি কুঞ্জলালের সহিতও আলাপ হইয়াছিল। মাঝে মাঝে আপিসের পর কুঞ্জ আসিয়া তাহাকে শিবপুরে ধরিয়া লইয়া যাইত। যামিনীর ভগ্নীস্নেহও এ সময় অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল—প্রায়ই সে রাণীকে পিতৃগৃহ হইতে আনাইয়া নিজের কাছে রাখিত।

ফাল্গুন মাসে হেমন্তের পরীক্ষা হইলে, রায় বাহাদুরও বধূকে নিজ বাটীতে পুনরানয়ন করিলেন।

বৈশাখের শেষে বি এ পরীক্ষার ফল বাহির হইল। হেমন্তের নাম গেজেটে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

গ্রীষ্মের ছুটির পর কলেজ খুলিলে রায় বাহাদুর পুত্রকে বলিলেন,—"বাড়ীতে গোলেমালে পড়াশুনো ভাল হবে না। তুমি বরং কলকাতায় মেসে গিয়ে থাক।"

পিতাকে হেমন্ত কিছু বলিতে সাহস করিল না। মার কাছে গিয়া মেসে থাকা যে কি কষ্ট, আহারাদির বন্দোবস্ত সেখানে যে কিরূপ শোচনীয় ও স্বাস্থ্যহানিকর, সমস্তই সবিস্তারে বর্ণনা করিল। গৃহিণী সভয়ে স্বামীর নিকট এ কথা উত্থাপন করিয়া তর্জ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। মেসেই হেমন্তকে যাইতে হইল।

পিতৃআজ্ঞা অনুসারে প্রতি রবিবার প্রাতে হেমন্ত বাড়ী আসে, জলযোগাদির পর বৈকালে আবার বাসায় ফিরিয়া যায়।

অন্তঃপুরে যাতায়াতের পথে রাণীর শাড়ীর রঙটি পর্য্যন্ত আর সে দেখিতে পায় না।

দুইতিন রবিবার এইরূপে কাটিলে, বাড়ীর একজন ঝিকে ঘুষ দিয়া, স্ত্রীর নিকট হেমন্ত পত্র পাঠাইল। রবিবারে রবিবারে ঝির মারফৎ উভয়ের পত্র ব্যবহার চলিতে লাগিল।

ক্রমে পূজা আসিল। ছুটিতে হেমন্ত বাসা ছাড়িয়া বাড়ী আসিল। বড় আশা করিয়াছিল, অন্ততঃ বিজয়ার প্রণাম করিবার উপলক্ষ্যেও রাণী একবার তাহার কাছে আসিতে পাইবে কিন্তু তাহার সে আশাও বিফল হইল। হেমন্ত এখন হইতে বড়ই হতাশ্বাস হইয়া পড়িল। যখন বাড়ী আসে, চুপ করিয়া উদাসনেত্রে বসিয়া থাকে। কখনও কখনও মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবে।

এক রবিবারে ঝি নিরিবিলি পাইয়া হেমন্তকে বলিল—"দাদা বাবু, বউদিদিমণি রোজ রাত্রে কাঁদেন।"

হেমন্ত বলিল—""কেন ঝি? কাঁদে কেন?"

ঝি বলিল—"হাজার হোক দাদাবাবু, সোয়ামি ত। বউদিদিমণি বলেন, এমন কপাল করে ভারতেও এসেছিলাম যে সোয়ামিকে চোখেও একবার দেখ্‌তে পাইনে।"

"তুই কি করে জান্‌লি ঝি?"

"যে ঘরে বউদিদিমণি শোন, আমিও সেই ঘরেই নীচে বিছানা করে শুই কি না।"

পর রবিবারে ঝি বলিল—"দাদাবাবু, একটিবার আপনি বউদিদিমণির সঙ্গে দেখা করুন।" হেমন্ত বলিল—"উপায় কি?"

"আপনি যদি এক কায করেন ত হয়।"

"কি কায ঝি?"

"আপনি যেমন রবিবারে আসেন, একদিন যদি বলেন আমার শরীর খারাপ হয়েছে কি কিছু হয়েছে, এই বলে যদি রাত্রে এখানে থেকে যান, তাহলে অনেক রাত্রে সবাই ঘুমুলে আমি আস্তে আস্তে উঠে এসে আপনাকে দোর খুলে দিতে পারি।"

হেমন্ত বসিয়া ভাবিতে লাগিল। রাণী যে ঘরে শয়ন করে, সিঁড়ি দিয়া দুতালায় উঠিয়া সেই প্রথম ঘর। তাহার পিতার শয়ন ঘর, সেখান হইতে কিছু দূরে। খুব সাবধানে যাইতে পারিলে, বোধ হয় সফল হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু বড় ভয় করে। যদি ধরা পড়িয়া যায়—ছি ছি—সে বড় কেলেঙ্কারি।

ঝি বলিল—"কি বলেন দাদাবাবু?"

"তোর বউদিদিমণি কি বলেন?"

"তিনি বলেন, না ঝি ওসব কায নেই, আমার বড় ভয় করে।"

"আচ্ছা আমি ভেবে দেখ্‌ব"—বলিয়া ঝিকে হেমন্ত আপাততঃ বিদায় দিল।

বাসায় ফিরিয়া গিয়া রোমিও ও জুলিয়েট পড়িতে পড়িতে হঠাৎ তাহার মনে হইল, যদি দড়ির মই পাই, তবে বাগান দিয়া, পশ্চাতের জানালা পথে রাণীর শয়ন ঘরে প্রবেশ করিতে পারি। অনেক সন্ধানে জানিতে পারিল, সাহেব বাড়ীতে ১৫৲ মূল্যে দড়ির মই কিনিতে পাওয়া যায়। কালবিলম্ব না করিয়া সেই মই একটি হেমন্ত কিনিয়া আনিল।

পরবর্ত্তী রবিবারে ছোট একটি ব্যাগের মধ্যে সেই মইটি লুকাইয়া হেমন্ত বাড়ী গেল। যথাসময়ে ঝির দ্বারায় সেই মই এবং একখানি পত্র স্ত্রীর নিকট চালান করিয়া দিল।

পত্রে এই প্রকার লেখা ছিল :—

আমার হৃদয়ের রাণী,

একবৎসর কাল বিচ্ছেদ সহিলাম, আর পারি না। তোমায় একটিবার দেখিতে না পাইলে এইবার আমি পাগল হইয়া যাইব। ঝি যে উপায় বলিয়াছিল, তুমি তাহাতে অমত করিয়াছিলে। আমিও অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, উহা নিরাপদ নহে। এবার কিন্তু একটি সুন্দর উপায় আমি আবিষ্কার করিয়াছি। তুমি যদি সাহস কর, তবেই আমাদের মিলন হইতে পারে।

ঝির হাতে যে জিনিষটি পাঠাইলাম, তাহা একটি দড়ির মই। উহার একটা প্রান্ত, তোমার ঘরে বাগানের দিকে যে জানালা আছে, সেই জানালায় বাঁধিয়া যদি নিয়ে ঝুলাইয়া দাও, তবে আমি বাগান হইতে ঐ মই দিয়া অনায়াসে তোমার ঘরে উঠিয়া যাইতে পারি। দড়ি খুব শক্ত—ছিঁড়িবার কোনও ভয় নাই। এখন তুমি সাহস করিলেই হয়।

কল্য রাত্রি এগারোটার সময় মইটি জানালায় বেশ শক্ত

করিয়া বাঁধিয়া উহা নীচে ফেলিয়া দিবে। এগারোটা হইতে সাড়ে এগারোটার মধ্যে আমি প্রাচীর ডিঙাইয়া বাগানের ভিতর দিয়া তোমার জানালার নিকট গিয়া পৌছিব।

এ প্রস্তাবে তুমি যদি সম্মত না হও তাহা হইলে আমার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইবে জানিও। লক্ষীটি আমার, ইহাতে অমত করিও না। কোনও ভয় নাই, বিপদের কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। আবার ভোর বেলায় ঐ মই দিয়া নামিয়া আমি কলিকাতায় চলিয়া আসিব।

পাণ গোটাকতক বেশী করিয়া আনিয়া রাখিও। ইতি।

তোমার স্বামী।

ঘণ্টা দুই পরে ঝি ফিরিয়া আসিলে হেমন্ত জিজ্ঞাসা করিল—"কি ঝি, মত হয়েছে?"

ঝি বলিল,—"হয়েছে, কিন্তু অনেক কষ্টে।"

"তবে, কাল রাত্রে এগারোটার পর আমি আসব?"

"আস্‌বেন।"

"আচ্ছা, তবে কথা রইল। তোমরা ঠিক থেক।"

"ঠিক থাকব দাদা বাবু।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায় শীতটা এবার বড় শীঘ্রই পড়িয়া গিয়াছে। যদিও এখনও অগ্রহায়ণ শেষ হয় নাই তথাপি জলের দাঁত বেশ তীক্ষ্ণ হইয়াছে, সন্ধ্যারাত্রেও গায়ে লেপ সহ্য হয়, দিবসেও লোকে গরম মোজা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ কোহাট গিরিবর্ত্মে তুষারপাত হইয়া গিয়াছে।

অন্ধকার রাত্রি। বির্জ্জিতলার ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া এগারোটা বাজিল। ভবানীপুরের যে অংশে রায় বাহাদুর প্রফুল্ল মিত্রের বাস, তাহা রসা রোড্ হইতে কিছুদূর পশ্চিমে। সদর ফটকটি বড় রাস্তার উপর, বাড়ীর পশ্চাতের বাগানের দুইদিক দিয়া অপেক্ষাকৃত জনহীন পথ। বাগানের পশ্চিম দিকের পথটি ত আরও জনহীন, কারণ তাহার অপর পারে কয়েকটা সুর্কির কল, রাত্রে সেখানে কেহ বড় থাকে না।

এগারোটা বাজিবার অল্পক্ষণ পরেই কাঁসারিপাড়া রাস্তার মোড়ে একখানি ঠিকা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। কালো আলোয়ানে আবৃত দেহ একব্যক্তি গাড়ী হইতে নামিয়া কোচম্যানকে ভাড়ার টাকা দিল। গাড়ী তখন ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া গেল।

বলা বাহুল্য যুবক আর কেহ নহে, বিরহজ্বরাক্রান্ত আমাদেরই হেমন্ত।

হেমন্ত তখন দ্রুতপদক্ষেপে তাহাদের বাগানের পশ্চাতের রাস্তাটির দিকে চলিল। কাছাকাছি আসিয়া সে নিজ গতিবেগ কিঞ্চিৎ হ্রাস করিয়া দিল।

রাস্তাটি যেখানে বাঁকিয়া বাগানের দিকে গিয়াছে, সেখানে হেমন্ত দেখিল একজন কন্‌ষ্টেবল কম্বলের ওভারকোট গায়ে দিয়া একজনের বাড়ীর দেউড়িতে বসিয়া সিগারেট খাইতেছে। চোরের মন—হেমন্ত আড়চোখে তাহার পানে চাহিতে চাহিতে গেল।

সেই মোড়ের উপর যে লণ্ঠন ছিল, কিছুদূর অবধি বাগানের প্রাচীর তদ্দ্বারা আলোকিত। তাহার পর অন্ধকার। হেমন্ত ভাবিল, ঐ অন্ধকার অংশের কোনও একটা সুবিধামত স্থানেই প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে হইবে।

অনেক বয়স অবধি সে জিম্‌ন্যাষ্টিক করিয়াছিল, এখনও রীতিমত ফুট্‌বল খেলে—তাহার হাতে পায়ে বিলক্ষণ বল। লঙ্ঘনের উপযোগী প্রাচীরের একটা স্থান সে অন্বেষণ করিতে লাগিল।

এমন সময় দূরে কাহার পদশব্দ শুনিল। সুতরাং অপেক্ষা করিতে হইল। অথচ এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকাও চলে না। যে দিক হইতে পদশব্দ আসিতেছিল, সেই দিকেই হেমন্ত যাইতে লাগিল। ক্রমে দেখিল দোকানী অথবা মিস্ত্রী শ্রেণীর একজন লোক তাহাকে অতিক্রম করিয়া গেল।

হেমন্ত আবার ফিরিল। যে স্থানটা সে লঙ্ঘনের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়াছিল, তাহার অপর দিকে একটা বৃহৎ জামরুল গাছ আছে। প্রাচীর হইতে লাফ দিয়া

সেই গাছের একটা ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া পড়াই তাহার অভিপ্রায়।

অনেক কষ্টে হেমন্ত প্রাচীরে উঠিল। উঠিতে তাহার হাঁটু ছড়িয়া গেল, কুনুইয়ে আঘাত লাগিল। আহা, কবি সত্যই বলিয়াছেন, প্রেমের পথ মসৃণ নহে।

প্রাচীরে বসিয়া, ডাল ধরিবার চেষ্টায় হেমন্ত হাত বাড়াইল। কিন্তু কোনও ডাল নাগাল পাইল না। একে অন্ধকার, তাতে ডালগুলাও কালো কালো।

এবার হেমন্ত কষ্টেসৃষ্টে প্রাচীরের উপর দণ্ডায়মান হইল। হাত বাড়াইল, তথাপি ডাল ধরিতে পারে না।

এমন সময় আর এক ব্যক্তির পদধ্বনি সে শুনিতে পাইল। ভাবিল, প্রাচীরে দাঁড়াইয়া থাকিলে ও নিশ্চয় দেখিতে পাইবে, অন্ধকারে এইখানে ঘুপটি মারিয়া বসিয়া থাকি।—বসিবার সময় প্রাচীরের সিমেণ্ট কিছু খসিয়া নিম্নে পড়িয়া গেল।

যে আসিতেছিল, সে এই শব্দে, দাঁড়াইল, ভাবিল বোধ হয় জামরুল পড়িয়াছে। সে এই পাড়ারই লোক, পূর্ব্বেও এখান হইতে জামরুল কুড়াইয়া খাইয়াছে। জামরুল খুঁজিতে খুঁজিতে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া, "বাবা গো, চোর!"—বলিয়া সে দৌড় দিল।

তাহার কীর্ত্তি দেখিয়া হেমন্তের হাসি পাইল। কিন্তু পরক্ষণেই ভয়েরও কারণ উপস্থিত হইল। শুনিল, মোড়ের উপর হইতে একটা গম্ভীর স্বর—"আরে কোন্ হায়? ক্যা হায় রে?"

কম্পিত স্বর—"একঠো চোর হায় কনেষ্টবলজি।"

"কাঁহা কাঁহা?"

"ঐ হুঁয়া। মিত্তির বাবুদের পাঁচিলমে একঠো চোর বৈঠা হায়। বৈঠ্‌কে বৈঠ্‌কে জামরুল খাতা হায়।"

এই কথা শুনিবামাত্র "জোড়িদার হো" বলিয়া কনেষ্টবল এক ভীষণ চীৎকার ছাড়িল।

হেমন্ত প্রাচীরে বসিয়া প্রমাদ গণিল। পরক্ষণেই শুনিল, নাগরা জুতার আওয়াজ ছুটিয়া আসিতেছে। বুল্‌স্‌-আই লণ্ঠনের তীব্র আলোকও পথে পড়িল।

হেমন্ত তখন নিরুপায় হইয়া বাগানের ভিতর লাফ্ দিল। সেখানে কতকগুলা ভাঙ্গা ইঁট পড়িয়াছিল, তাহাতে হেমন্তের শরীরের স্থানে স্থানে আঘাত লাগিল।

কনষ্টেবলটা ছুটিতে ছুটিতে সেইখান বরাবর আসিয়া দাঁড়াইল। প্রাচীরের উপর গাছের উপর তীব্র আলোকপাত করিয়া, আবার ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া গেল।

হেমন্ত তখন আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল, দ্বিতলের একটি জানালা হইতে সামান্য আলোক আসিতেছে—অপর সমস্ত জানালাগুলি একবারে অন্ধকার।

দাঁড়াইয়া, ধুতিখানি হেমন্ত খুলিয়া ফেলিল। নিম্নে ফুটবল খেলিবার হাঁটু অবধি পা-জামা পরিয়া আসিয়াছিল, কারণ ধুতি লটর-পটর করিয়া দড়ির মইয়ে চড়া অসুবিধা হইবে। ধুতিখানি সে জামরুল গাছের ডালে টাঙাইয়া রাখিল, ভোরে ফিরিবার সময় আবার পরিয়া যাইবে। কোমরে আলোয়ানখানি যেমন বাঁধা ছিল, তেমনি বাঁধা রহিল।

এই অবস্থায় হেমন্ত জানালার দিকে অগ্রসর হইল। কোনও ফুলগাছ পাছে মাড়াইয়া নষ্ট করিয়া ফেলে, এই ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে, আলপথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া যাইতে লাগিল।

যখন অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়াছে, তখন হঠাৎ বাগানের দরজা খুলিয়া গেল। তিন চারিজন লোক লণ্ঠন হস্তে প্রবেশ করিয়া বলিতে লাগিল—"কাঁহা—কাঁহা কনেষ্টবলজী?"—কনেষ্টবল বলিল—"জামরুলকে পেঁড়োয়া ভিরে।"—তখন তাহারা ধীরে ধীরে জামরুল গাছের দিকে অগ্রসর হইল।

হেমন্ত একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইল। কণ্ঠস্বরে চিনিল তাহাদের জমাদার মহাবীর সিং এবং দুইজন দারবানের সঙ্গে কনেষ্টবলটা আসিয়াছে।

কিয়দ্দূর গিয়া মহাবীর সিং বলিল—"কেহু ত না বুঝায়হে।"

কনেষ্টবল বলিল—"ভাগ গেলই কা ?—আপন আঁখিয়াসে হাম কুদ্‌তে দেখলি হো, তোহর্ ফির্।" এক মুহূর্ত্ত পরে—"উ কা হায়—উ কা হায়" বলিতে বলিতে সকলে জামরুল গাছের দিকে চলিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে হেমন্ত দেখিল, বৃক্ষশাখা হইতে লম্বিত তাহার সেই শ্বেত বস্ত্রখানার উপরে লণ্ঠনের আলোক পড়িয়াছে। সেই বিপদের সময়েও তাহার হাসি পাইল।

"ধোগ হো—পাকড়্‌লি চোর"—বলিয়া তাহারা হাল্লা করিয়া সেই বস্ত্রাভিমুখে ছুটিল। নিকটে গিয়া তাহারা বলিল—"ধত্তেরিকে—ই ত খালি লুগা বুঝাহে।" —বস্ত্রখানা তাহারা নামাইয়া লইয়া লণ্ঠনের আলোকে পরীক্ষা করিতে লাগিল।

এমন সময় দ্বিতলের আর একটা জানালা খুলিয়া আলোক-রশ্মি বাহির হইল। রায় বাহাদুরের কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"ক্যা হায় ? ক্যা হায় মহাবীর সিং ?"

কনষ্টেবল প্রভৃতি সেখান হইতে চীৎকার করিয়া বলিল—"হুজুর বাগিচা মে চোর ঘুষা হায়।"

রায় বাহাদুর হাঁকিলেন—"খোজ, খোজ পাকড়ো।"

তখন তাহারা লণ্ঠন লইয়া বাগানের ভিতর খুঁজিতে আরম্ভ করিল।

হেমন্ত দেখিল, বিপদ—এখনি উহারা আসিয়া পড়িবে। এখন উপায় কি ? প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন ভিন্ন উপায় নাই। হেমন্ত জুতা খুলিয়া ফেলিল। ইহারাও যেমন বাগানের ভিতর প্রবেশ করিতেছে, সেও গাছের আড়ালে আড়ালে প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল—"উ কা শারোয়া ভাগে হে।"—সেখানে একটা কৃত্রিম পাহাড় ছিল। হেমন্ত একটা পাথর তুলিয়া সজোরে তাহাদের দিকে ছুড়িয়া দিল।

"আরে বাপ্‌রে বাপ্—জান গইল রে বাপ্"—বলিয়া একজন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

রায় বাহাদুর হাঁকিলেন—"ক্যা হুয়া ?"

এই সময় আরও দুই তিনখানা প্রস্তর সবেগে আসিয়া সেখানে পড়িল। লোকগুলা হটিয়া গেল। বলিল—"হুজুর—পাথলসে মহাবীর সিংকা কপার ফোড় দিহিস হে।"

"আচ্ছা রহো, হাম বন্দুক নিকালতেঁহে"—বলিয়া রায় বাহাদুর সশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন।

হেমন্ত দেখিল, প্রাচীরের নিকট যাওয়া এখন নিরাপদ নহে, রাণীর শয়ন-কক্ষের জানালা বরং কাছে। কোনও গতিকে যদি সে জানালার কাছে পৌছিতে পারে, তবে মই দিয়া উঠিয়া যায়,—তাহার পর বাগানে যত ইচ্ছা উহারা খুঁজুক—বাবা আসিয়া যত পারেন বন্দুক আওয়াজ করুন। এই ভাবিয়া সে গাছের আড়ালে আড়ালে গুটি গুটি জানালার দিকে অগ্রসর হইল। ক্রমে মই পাইয়া উঠিতে আরম্ভ করিল।

সে যখন অর্দ্ধপথে উঠিয়াছে, তখন খিড়কী দরজা হইতে গুড়ুম করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল। লণ্ঠনবাহী ভৃত্য সহ রায় বাহাদুর বাগানে প্রবেশ করিলেন। বধুর জানালার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র তিনি হাঁকিলেন—"কে রে ? কে রে ?"

বলিতে বলিতে হেমন্ত জানালায় পৌছিয়া গেল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ মই টানিয়া তুলিয়া, জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

রায় বাহাদুর হাঁকিলেন—"চোর ঘরমে ঘুষা—চোর ঘরমে ঘুষা। দোড়ো—সব আদমি ভিতর চলো—পাকড়ো"—বলিয়া তিনি সদলবলে বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া আসিলেন। লোকগুলা উঠানে ঘাঁটি দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তিনি বন্দুক হস্তে ছুটিয়া উপরে গিয়া বধূর শয়ন-কক্ষের দ্বার ঠেলিলেন।

ঝি কাঁপিতে কাঁপিতে দ্বার খুলিয়া দিল।

রায় বাহাদুর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মেঝের উপর তাঁহার পুত্রবধূ মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া, চোর পালঙ্কের উপর লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে।

*   *   *   *

পরদিন রায় বাহাদুর "সামাজিক-সমস্যা-সমাধান" পুস্তকের একস্থান খুলিয়া "ষোড়শ" কথাটি কাটিয়া "চতুর্দ্দশ" এবং "চতুর্ব্বিংশতি" কথাটি কাটিয়া "দ্বাবিংশতি" করিয়া দিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণে এইরূপ সংশোধিত আকারেই বহিখানি ছাপা হইবে।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

তীর্থ-ভ্রমণ

জয়পুর।

পূজার ছুটিতে হঠাৎ একদিন কবি করুণানিধান, "মানসী" কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পরিচয়-পত্র লইয়া গয়াতে আমাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। তিনি পশ্চিম বেড়াইতে যাইতেছেন, যাইবার পথে আমার পিতৃদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গয়াতে নামিয়াছেন।

ইহার পূর্ব্বে আমি একবার এলাহাবাদ গিয়াছিলাম সময়াভাবে আগ্রা পর্য্যন্ত যাইতে পারি নাই। তাজমহল দর্শন করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই। ভাবিলাম এইবার এক সুযোগ উপস্থিত। করুণা বাবু বলিলেন, তিনি আজমীর পর্য্যন্ত ত যাইবেনই, আর যদি সময় পান তাহা হইলে উদয়পুর চিতোর পর্য্যন্তও যাইবেন। ভাবিলাম আমরাও তাঁহার সঙ্গে বেড়াইয়া আসিব। বাবাকে বলিলাম, তিনি সম্মত হইলেন। স্থির হইল প্রথমে জয়পুর যাওয়া হইবে। তাহার পর আজমীর প্রভৃতি হইয়া, ফিরিবার পথে আমরা আগ্রা, বৃন্দাবন ও মথুরা দেখিয়া আসিব।

তখনও পূজার কনসেসন্ টিকিট পাওয়া যাইতেছিল। আমি, আমার কনিষ্ঠ প্রশান্তকুমার এবং আমার পিতামহী ঠাকুরাণী, করুণা বাবুর সহিত নবমীর দিন রাত্রি ৮॥০ টার ট্রেণে গয়া ছাড়িলাম। ট্রেণে মোটেই ভীড় ছিল না—সুতরাং আমরা এক-একখানি লম্বা বেঞ্চি অধিকার করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

পরামর্শ ছিল, এলাহাবাদে করুণাবাবুর ভগ্নীর বাড়ীতে নামিয়া আহারাদি করিয়া পুনরায় আমরা রওনা হইব। সেই অনুসারে ভোর পাঁচটার সময় আমরা এলাহাবাদে নামিয়া পড়িলাম।

করুণাবাবু অনেক দিন এলাহাবাদে আসেন নাই। পূর্ব্বে তাঁহার ভগিনী ও ভাগিনেয়রা যে বাড়ীতে থাকিতেন এখন তাঁহারা সে বাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহা করুণাবাবু শুনিয়াছিলেন। মা (আমার পিতামহী ঠাকুরাণীকে আমি মাতৃ সম্বোধন করিয়া থাকি) ও প্রশান্তকুমারকে জিনিষপত্র সহ ষ্টেশনের নিকবর্ত্তী ধর্ম্মশালায় রাখিয়া করুণাবাবুর সহিত আমি তাঁহার ভগ্নীর বাড়ীর সন্ধানে বাহির হইলাম। প্রায় দুইঘণ্টা কাল অনুসন্ধান ও ঘোরাঘুরি করিয়া বাড়ীর সন্ধান পাওয়া গেল। তখন পুনরায় ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিয়া জিনিষপত্র লইয়া সকলে করুণাবাবুর ভগ্নীর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম।

তখন বেলা প্রায় আটটা—আবার দ্বিপ্রহর বারোটায় পঞ্জাব মেল ছাড়িবে—মাত্র চারিঘণ্টা ব্যবধান—সময় অতি অল্প। সে কারণেও বটে ও করুণাবাবুর ভগ্নীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে আমরা সেই দিন ও সেই রাত্রি এলাহাবাদে কাটাইয়া তৎপরদিবস বেলা দ্বিপ্রহরের সময় পঞ্জাব মেলে আরোহণ করিলাম।

গাড়ী ছাড়িবার পরই করুণবাবু তাঁহার ব্যাগ হইতে একখানি খাতা ও একটি পেন্সিল বাহির করিলেন। মনে করিলাম বুঝি কবিতা লেখা আরম্ভ করিবেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার খাতা-পেন্সিল যথাস্থানে রাখিয়া আমাদের সহিত গল্পগুজব আরম্ভ করিলেন।

রাত্রি আট ঘটিকার সময় টুণ্ডলা ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিতে হইল। টুণ্ডলা হইতে একটি ব্র্যাঞ্চ লাইন আগ্রা ফোর্ট ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তাতেই যমুনানদীর উপর নির্ম্মিত "ষ্ট্র্যাচি ব্রিজ"—এই সেতু পার হইয়া আমরা আগ্রা ফোর্টে আসিলাম। করুণাবাবু বলিয়াছিলেন যে ষ্ট্র্যাচি সেতুর উপর হইতে তাজমহল দেখিতে পাওয়া যায়। একাদশী রজনীর জ্যোৎস্না-তাজমহল দেখিবার জন্য গাড়ীর জানালা হইতে সতৃষ্ণ নয়নে আমরা চাহিয়া রহিলাম, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। যাহা হউক আগ্রা ফোর্টে পুনরায় গাড়ী বদল করিয়া ছোট লাইনের (রাজপুতানা-মালবা রেলওয়ে) গাড়ীতে চড়িলাম। এ গাড়ীখানিও আবার

বরাবর জয়পুর যাইবে না। রাত্রি তিনটার সময় বান্দিকুই ষ্টেশনে নামিয়া পুনরায় অন্য গাড়ীতে চড়িতে হইবে। শুইয়া পড়িলে যদি ঘুমাইয়া পড়ি, তাহা হইলে বান্দিকুই ষ্টেশন পার হইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা—সুতরাং নিদ্রার আয়োজন করিতে পারা গেল না—বসিয়া বসিয়াই আমরা গল্পগুজব করিতে লাগিলাম।

যথাসময়ে বান্দিকুই ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলাম। এখানে প্রায় একঘণ্টা ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মের উপর অপেক্ষা করিতে হইল। যে গাড়ীতে এবার আমরা চড়িলাম—ইহা মেল-ট্রেণ; ইহাতে আবার ইণ্টার ক্লাস নাই। অন্য রেলোয়ের ইণ্টার ক্লাস টিকিটধারী লোকদের এ ট্রেণে থার্ড ক্লাসে বসিতে হয়।

এই ট্রেণে চড়িয়া আমরা ভোর পাঁচটার সময় জয়পুর ষ্টেশনে পৌছিলাম।

জয়পুর মহারাজার দেওয়ান স্বনামধন্য ৺সংসারচন্দ্র সেন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র, বর্ত্তমান মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নামে করুণাবাবু পরিচয়-পত্র আনিয়াছিলেন। একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া তাঁহাদের বাড়ী গিয়া উঠিলাম।

জয়পুর সহরে ইঁহারাই একমাত্র বাঙ্গালী। সুতরাং বাঙ্গালী তীর্থভ্রমণকারিগণ জয়পুরে আসিলেই ইঁহাদের আতিথ্য স্বীকার করেন—কারণ "নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

পরিচয়-পত্র ভিতরে পাঠাইয়া দিতেই অবিনাশবাবুর ভগ্নীপতি, "পঞ্চপ্রদীপ," "লিখন" প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদার মহাশয় স্বয়ং আসিয়া আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। মাকে ভিতরে পাঠাইয়া দিলেন। করুণাবাবুকে বলিলেন—"পরিচয় পত্র নিষ্প্রয়োজন—আপনার কবিতাই বহুকাল হইতে আপনাকে আমাদের আত্মীয় করিয়া রাখিয়াছে।"

তখন জয়পুরে অত্যন্ত প্লেগ হইতেছে, তাই ইঁহারা সহরের বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া সহরের বাহিরে তাঁহাদেরই একখানি সুন্দর বাগানবাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত অবিনাশবাবু বাহিরে আসিলেন। তিনি আমাদের দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বলিলেন—"তোমরা '—' বাবুর ছেলে? কাল রাত্রেও আহারের পর বিছানায় শুইয়া '—' পড়িতেছিলাম"—আমার পিতৃদেবপ্রণীত একখানি গ্রন্থের তিনি উল্লেখ করিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর চা পান করিয়া আমরা সুবোধ বাবুর নিকট জয়পুরের দ্রষ্টব্য স্থান গুলির কথা শুনিতে লাগিলাম।

রিটার্ণ টিকিট আমরা ক্রয় করিয়াছিলাম—নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে ফিরিতে হইবে। সময় অল্প—অথচ অনেকগুলি তীর্থস্থান দর্শন করিবার বাসনা আছে—সুতরাং আমরা সুবোধ বাবুকে বলিলাম যে অল্প সময়ে যাহাতে জয়পুরের সমস্ত দেখা হয় তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিন। তাহাতে তিনি একখানি কাগজে আমাদের প্রোগ্রাম ঠিক করিয়া দিলেন।

সমস্ত রাত্রি উঠানামা করিবার দরুণ রাত্রে নিদ্রা না হওয়াতে আমার শরীরটা বিশেষ খারাপ বোধ হইতেছিল—তথাপি স্নান করিলাম। স্নানের পর আহারের ডাক পড়িল। ইঁহাদের বাড়ীতে সকলেই নিরামিষভোজী--এদেশে মৎস্যের অভাবই বোধ করি ইহার কারণ। সিদ্ধ চাউল এখানে পাওয়া যায় না--সকলেই আতপ চাউল ব্যবহার করিয়া থাকেন। তরীতরকারীও দুষ্প্রাপ্য। ইঁহারা দিনের বেলা ভাতের সহিত রুটিও খান,—রাত্রে রুটি। ঘৃত ও দুগ্ধ এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

আহারের পর আমরা পাণ মুখে দিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলাম। পরে শুনিয়াছিলাম যে ইঁহারা অতিথিদের জন্য কলিকাতা হইতে পাণ আনাইয়া থাকেন।

বেলা প্রায় একটার সময় আমরা চারিজন সহর দেখিতে বাহির হইলাম। সুবোধ বাবু আমাদের জন্য একখানি ঘোড়ার গাড়ী আনাইয়া দিয়াছিলেন।

জয়পুর সহরটি অতি সুন্দর। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ জয়সিংহ শিল্পশাস্ত্রের নিয়মানুসারে এই সহর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন! সহরের তিনদিকে দূরে অত্যুচ্চ

পর্ব্বতশ্রেণী—তাহার চূড়ায় দুর্গশ্রেণী। একটি দুর্গের নাম শুনিলাম "নাহার গড়"—নাহার অর্থে ব্যাঘ্র। এই নাহারগড়ে সরকারী তহবিলখানা রক্ষিত। পূর্ব্বে ইহা কারাগার রূপেও ব্যবহৃত হইত।

সমস্ত সহরটি প্রাচীর বেষ্টিত। প্রাচীরটি উচ্চতায় অনুমান বিশফুট ও প্রস্থে প্রায় নয়ফুট। স্থানে স্থানে সাতটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সিংহদ্বার আছে। পূর্ব্বদ্বার হইতে পশ্চিমদ্বার পর্য্যন্ত যে রাজপথটি, সেইটিই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ—প্রায় দুই মাইল। প্রস্থে ঠিক একশত এগার ফুট। এই দীর্ঘ রাজপথের ঠিক মাঝখানটি কাটিয়া উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত আর একটি রাজপথ। ইহা দৈর্ঘ্যে এক মাইলের কিছু উপর।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রাস্তার দুইদিকে বাড়ীগুলি সবই দেখিতে এক রকম। তিনতলা হইতে পাঁচ ছয় তলা পর্য্যন্ত বাড়ী দেখিলাম। কেবল রাজপ্রাসাদটি সাত-তলা। যে পথেই যাওয়া যাক্ না কেন, সর্ব্বত্রই এক প্রকার বাড়ী—আর সমস্ত বাড়ীর বহির্ভাগ গোলাপী রঙের।

এইবার জয়পুরের দ্রষ্টব্য স্থানের কথা কিছু কিছু বলিব। সুবোধবাবু শিল্প-বিদ্যালয় ও রাজপ্রাসাদের কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট আমাদের নামে পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন—সুতরাং যেখানেই গিয়াছিলাম. সেখানেই অতি যত্নের সহিত আমাদের দেখান হইয়াছিল।

শিল্প বিদ্যালয় (SCHOOL OF ARTS)

মাদ্রাজ শিল্প বিদ্যালয় হইতে একদল শিক্ষক আনাইয়া মহারাজা ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ হইতে ইহা Dr. De Fabeck ও James Scorgeeর তত্ত্বাবধানে ছিল। এখানে ছাত্রদিগকে ছবি আঁকা, সূত্রধরের কার্য্য, বই বাঁধাই, electro-plating, ইমারৎ তৈয়ারী, কাষ্ঠখোদাই, ভাস্কর্য্য, সূচীশিল্প প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়। "জয়পুর এনামেল" নামক বিখ্যাত বাসনও এখানে প্রস্তুত হয়। শুনা যায় যে লণ্ডন, প্যারিস, ভিয়েনা, রোম্ প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কারিগরগণও স্বীকার করে যে তাহারা জয়পুর এনামেলের মত এনামেল এ পর্য্যন্ত তৈয়ারী করিতে পারে নাই। এই বিদ্যালয়ে একটি কক্ষে নানাপ্রকার প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র রক্ষিত রহিয়াছে।

এখান হইতে বাহির হইয়া আমরা রাম-নিবাস বাগান ও পশুশালা দেখিতে গেলাম।

অতি বৃহৎ বাগান, তাহার মধ্যস্থলে পশুশালা। বড় বড় বাঘ, চিতা, নানাবিধ পক্ষী—এ সকল জীবজন্তুদের পালন ব্যয় রাজকোষ হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। রাজকীয় আস্তাবলও এখানে—সেখানে তিনশত ঘোড়া ও পঞ্চাশটি হস্তী থাকে।

জয়পুর মিউজিয়ম—আলবার্ট হল।

এই সুন্দর মিউজিয়মটি রাম-নিবাস বাগানের পাশেই অবস্থিত। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গগত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড (তখন প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ছিলেন) কর্ত্তৃক এই মিউজিয়মের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। সেই জন্য ইহার নাম আলবার্ট হল। এখানে ভারতীয় কারিগরগণের প্রস্তুত নানাবিধ উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্যের নমুনা রক্ষিত রহিয়াছে। কাষ্ঠের ও হস্তিদন্ত নির্ম্মিত বিবিধ দ্রব্য, প্রস্তর মূর্ত্তি, lacquer work—ইহা ছাড়া এখানে একটি ছোট খাট সুন্দর Biological museum ও রহিয়াছে। এক কথায় ইহা কলিকাতা মিউজিমেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

এখান হইতে বাহির হইয়া আমরা সহরের প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান রাজপ্রাসাদ (Palace) দেখিতে গেলাম। এই অট্টালিকার উত্তরে তালকটোর দীঘি—তাহার চারিদিক প্রাচীর-বেষ্টিত। তাহার উত্তরে আবার রাজামল-কা-তলাও। এখানে অনেক কুম্ভীর আছে।

সিংহদ্বার পার হইয়া রাজবাটীর সীমানায় প্রবেশ করিতে হইল। তাহার পর, আর একটি দ্বার পার হইয়া আমরা এক প্রশস্ত অঙ্গনে উপস্থিত হইলাম। এইখান হইতে অন্তঃপুর, রন্ধনবাড়ী ও আস্তাবলে



৺সংসারচন্দ্র সেন।

যাইবার বিভিন্ন রাস্তা। তৃতীয় দরজা পার হইয়া সরকারী ছাপাখানা ও মন্ত্রণাগৃহের প্রবেশ দ্বার। তাহার পর বিস্তীর্ণ বাগনের দিকে সম্মুখ করিয়া সপ্ততল রাজ অট্টালিকা **চাঁদমহাল**। একতলায় "শীতগৃহ", এই গৃহের দেওয়াল talc দ্বারা আচ্ছাদিত। দ্বিতীয় তল পুষ্পচিত্র-সমন্বিত সুন্দর "শোভানিবাস"। তৃতীয়তল "সুখনিবাস"—ইহার দেওয়াল ও ছাদ কাচ-দ্বারা আবৃত। তাহার উপর "ছবি-নিবাস"—পরে "শীশমহাল" ও সকলের উপর "মুকুট।"

রাজপ্রাসাদে মহারাজার নিজস্ব পুস্তকাগার রহিয়াছে। চাঁদমহালের দক্ষিণের বাটীতে এই পুস্তকাগার ও অস্ত্রাগার স্থাপিত।

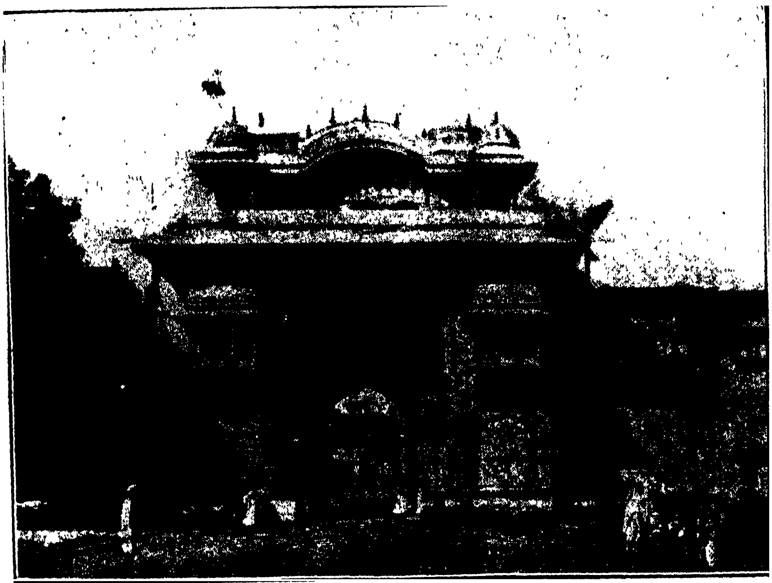
রাজপ্রাসাদের পাশেই সুবৃহৎ **মানমন্দির**। ইহা দ্বিতীয় মহারাজ জয়সিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। তিনি একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন। শুধু এখানে নয়, দিল্লী, কাশী, মথুরা, উজ্জয়িনীতেও তিনি মানমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখানে বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রাদি রহিয়াছে, তদ্দ্বারা গ্রহনক্ষত্রাদি অবলোকন করা যায়।

প্রাসাদের ঠিক সম্মুখেই জয়পুরের "**মহারাজা-কলেজ**।"

এখান হইতে ফিরিবার পথে আমরা **হাওয়া-মহল** দেখিলাম। বড় রাস্তার ধারে এই সুন্দর অট্টালিকা। ইহা নয়তালা গোলাপী রঙের পর্ব্বত বিশেষ। সূর্য্যাস্তের সময় আমরা এই হাওয়ামহল দেখিলাম—সোণালি রৌদ্র সেই গোলাপীরঙের উপর পড়িয়া সমস্তটা ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। "India under the Royal Eyes" নামক পুস্তকে এই অট্টালিকার নিন্দাবাদ পাঠ করিয়াছিলাম। গ্রন্থকার লিখিয়াছিলেন, ইহা দেখিতে একখানি cakeএর মত—খাইয়া ফেলিলেই হয়। লেখক মহাশয়ের রাক্ষসী ক্ষুধা! Sir Edwin Arnold তাঁহার "India Revisited" নামক পুস্তকে বলিয়াছেন—হাওয়া-মহল দেখিলে মনে হয়, আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ-ধারী দৈত্য কর্ত্তৃকই এরূপ অট্টালিকার সৃষ্টি সম্ভব।



জয়পুর—রাজপথের দৃশ্য।



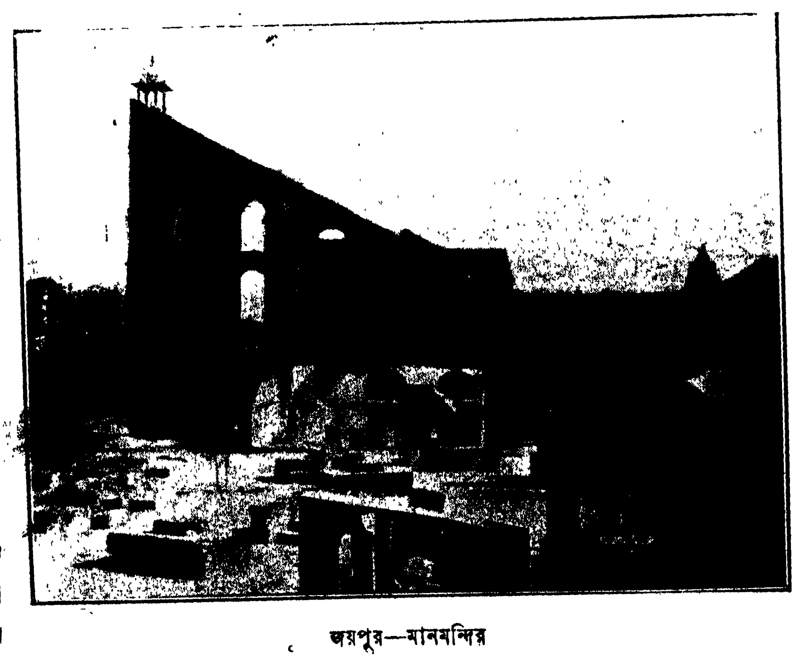
জয়পুর রাজপ্রাসাদের প্রবেশ দ্বার।

করিলাম। মার জন্য একখানি কাপড় ঘেরা একা ও আমাদের জন্য একখানি ফীটন্ ভাড়া করা হইল।

অম্বর। জয়পুর সহর হইতে অম্বর পাঁচ মাইল। এই রাস্তার দুইধারে সুন্দর সুন্দর মন্দির ও বাগান। পথটি সমতল নহে, পার্ব্বত্য-পথ যেরূপ উচ্চনীচ হইয়া থাকে এ পথটিও সেইরূপ। পর্ব্বতের নীচে যেখান হইতে প্রথম চড়াই আরম্ভ হইয়াছে, সেই পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়ী চলে। আমাদের সেইখানেই নামিতে হইল। একাখানি উপরে উঠিতে পারিল। আমার শরীর দুর্ব্বল বলিয়া আমিও একার উপর বসিলাম। করুণাবাবু ও প্রশান্ত উভয়ে পদব্রজে আসিতে লাগিলেন।

এইবার আমরা বাড়ী ফিরিলাম। শরীরটা জ্বরভাব বোধ হইতেছিল—বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম বেশ জ্বর হইয়াছে। তখন আবার জয়পুরে প্লেগ হইতেছে—ভাবিলাম অবশেষে জয়পুর প্রাপ্তি কপালে না ঘটে! অনেক রাত্রে জ্বর ছাড়িল—তখন আচ্ছা করিয়া কুইনিন সেবন করিলাম। তাহার পর আর জ্বর আসে নাই।

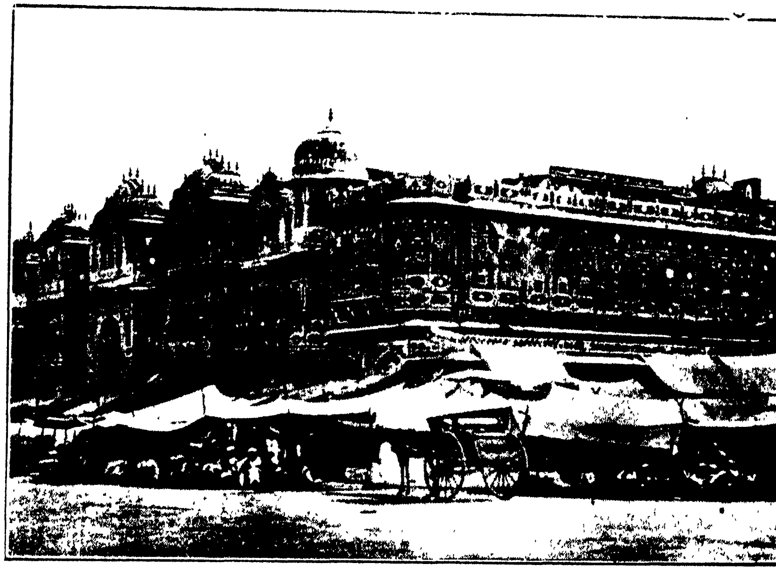
তৎপরদিন খুব সকাল সকাল অম্বর দেখিতে যাইবার কথা ছিল। আমার জ্বর দেখিয়া সকলে ভাবিলেন—বুঝি বা প্রোগ্রাম সব ওলট পালট হইয়া যায়! যাহা হউক, যখন বাড়াবাড়ি আর হইল না—তখন সকালে উঠিয়া পুনরায় কুইনিন ও চা সেবন করিয়া আমরা চারিজন অম্বরাভিমুখে যাত্রা



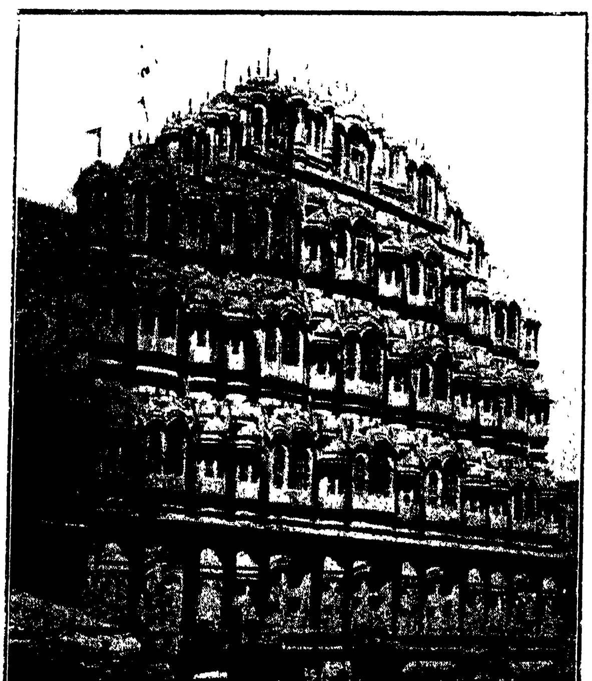
জয়পুর—মানমন্দির

পর্ব্বত মালার সানুদেশে বিস্তীর্ণ উপত্যকা—তাহার এক-পার্শ্বে একটি বৃহৎ হ্রদ—এই হ্রদ ও পর্ব্বতের মধ্য দিয়া অম্বর যাইবার পথ। চারিদিকে পাহাড় থাকাতে ও পাহাড়ের উপর দুর্গ থাকাতে স্থানটি অতি সুরক্ষিত।

অম্বর পূর্ব্বে জয়পুর রাজ্যের রাজধানী ছিল। অম্বর নামটি "অম্বিকেশ্বর" হইতে উৎপন্ন। কেহ কেহ বলেন যে অযোধ্যার রাজা মান্ধাতার পুত্র "অম্বরীষ" হইতে অম্বরের নামকরণ। এখানে অতি প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে ৯৫৪ খৃষ্টাব্দে এই শিলালিপি খোদিত হইয়াছিল।



জয়পুর—মহারাজার কলেজ।



জয়পুর—হাওয়া মহল।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কুশাবহ রাজপুতগণ, তত্রত্য আদিম অধিবাসী মানগণের নিকট হইতে এই স্থান অধিকার করেন। তাহার পর ছয় শতাব্দী অম্বর রাজপুতদের রাজধানী ছিল।

রাজা মানসিংহ ১৬০০ খৃষ্টাব্দে এখানে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন, তাহার পর প্রথম মহারাজ জয়সিংহের সময় আরও কিছু কিছু নির্ম্মাণ কার্য্য হয়। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় মহারাজ জয়সিংহ কর্ত্তৃক প্রাসাদ নির্ম্মাণ সমাপ্ত হয়। এখান হইতে রাজধানী জয়পুরের নূতন সহরে আনয়ন করিবার পূর্ব্বে জয়সিংহ অম্বরের প্রাসাদে একটি সুন্দর সিংহদ্বার প্রস্তুত করাইয়া দেন। এই দ্বার অদ্যাবধি তাঁহার নামধারণ করিয়া রহিয়াছে।

প্রাসাদের মধ্যে দর্শনীয় স্থান, দেওয়ানী খাস, যশোরেশ্বরীর মন্দির, ও সোয়ারী ফটক।

জগৎ-শিরোমণির মন্দির ও অম্বিকেশ্বর মন্দিরও এখানে।

অম্বর প্রাসাদের কক্ষগুলি অতি সুন্দর। মর্ম্মর নির্ম্মিত দেওয়ালগুলি অতি সূক্ষ্ম নয়নবিমোহন রঙীন প্রস্তরে কারুকার্য্য খচিত। সেগুলি এরূপ সুন্দর কায করা যে দেখিলে হঠাৎ মনে হয় বুঝি আসল মণি মাণিক্য জহরৎ প্রভৃতি দেওয়ালে বসান রহিয়াছে। ছাদগুলিতে ছোট ছোট আর্শীর টুকরা বসান। কোনও কোনও কক্ষে চিত্রিত কাচের জানালা এবং সব জানালা খুলিলেই হ্রদবক্ষে অম্বর রাজপ্রাসাদের প্রতিচ্ছায়া দেখা যায়।

রঙীন কাচ দেওয়া একখানি স্নানকক্ষ দেখিলাম। শুনিলাম সেই কাচগুলি নাকি বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভেনিস নগর হইতে আনীত হইয়াছিল। আর একখানি কক্ষের দেওয়ালে বারাণসী, মথুরা প্রভৃতি প্রধান প্রধান তীর্থ-স্থানের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে।

যশোরেশ্বরীর মন্দির।

ইতিহাস পাঠকেরা জানেন যে রাজা মানসিংহ ভবানন্দের চক্রান্তে বঙ্গের শেষবীর প্রতাপ-আদিত্যকে পরাজিত করিবার পর যশোরেশ্বরীর প্রতিমা (মূর্ত্তি) যশোর হইতে লইয়া যান। তিনি সেই মূর্ত্তি এই অম্বরের রাজপ্রাসাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এখানে প্রত্যহ ছাগ বলি দেওয়া হইয়া থাকে। বহুপূর্ব্বে এখানে প্রত্যহ নাকি নরবলি দেওয়া হইত।

সেদিন আমরা প্রায় ১২ টার সময় বাড়ী ফিরিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও বিনয়কুমার সরকার উভয়ে জয়পুর ভ্রমণে আসিয়াছেন। ইঁহাদের উভয়েরই সহিত পূর্ব্ব হইতেই আলাপ ছিল—করুণাবাবুর সহিত এখন আলাপ হইল।

সেই দিন সন্ধ্যার পর আমরা মাকে লইয়া গোবিন্দ-জীর আরতি দেখিতে গেলাম। রাজপ্রাসাদের উত্তরে এই মন্দির। এই বিগ্রহ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। বহু পূর্ব্বে এখানকার মহারাজার এক কন্যা অতি শৈশবে বিবাহিত হইয়া শৈশবেই বিধবা হন।



জয়পুরের বর্ত্তমান মহারাজা।

যখন তিনি বড় হইলেন, তখন মাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন, "মা, আমার স্বামী কোথায়? তিনি আসেন না কেন?" মা বলিতেন, "বাছা, ওই গোবিন্দজী তোমার স্বামী,—তাঁকেই স্বামীজ্ঞানে তুমি সেবা কর।"

একদিন রাত্রে মা দেখিলেন, কন্যা কাছে নাই। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, যে ঘরে গোবিন্দজীর বিগ্রহ, সেই ঘরে দ্বার বন্ধ। দুয়ারে ধাক্কা দিতেই কন্যা দুয়ার খুলিয়া দিলেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"এত রাত্রে এখানে কি করিতেছ?" কন্যা বলিল—"কেন, গোবিন্দজী আমাকে ডাকিয়াছিলেন, তাই আসিয়াছি। আমি পাণ সাজিয়া আনিয়াছিলাম, তিনি তাহা খাইতে ছিলেন ও আমি তাঁহার পদসেবা করিতেছিলাম। তুমি দুয়ারে ধাক্কা দিতেই তিনি কোথায় যে লুকাইলেন, দেখিতে পাইতেছি না।" মা এ কথা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। প্রথমটা তাঁহার বিশ্বাস হইল না।

কন্যা একমনে স্বামীজ্ঞানে গোবিন্দজীকে ডাকিয়াছেন, তাঁহার প্রার্থনা যে সফল হইয়াছে, মা একথা বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, "আচ্ছা, গোবিন্দজী যখন আসবেন, তখন আমাকে দেখাতে পার ?"

কন্যা। হাঁ, কাল তুমি রাত্রে এসে দরজা একটু ফাঁক করে দেখো, তাহলেই দেখতে পাবে গোবিন্দজী এসেছেন।

পরদিন রাত্রে গোবিন্দজী আসিয়া রাজকন্যার হস্ত হইতে তাম্বুলগ্রহণ করিতেছেন, এমন সময়ে মা কপাটের ফাঁক দিয়া উঁকি মারিলেন। মা, কন্যা, ও গোবিন্দজী তৎক্ষণাৎ পাষাণ মূর্ত্তি হইয়া গেলেন। এখানে মন্দিরে বিগ্রহ সম্বন্ধে এই গল্পটি শুনা যায়। এখানে বাঙ্গালী পুরোহিত দেখিয়া মনে বড় আনন্দ হইল।

আমাদের জয়পুর দেখা শেষ হইল। স্থির হইল পরদিন প্রাতের গাড়ীতে আমরা আজমীর রওনা হইব। সুবোধ বাবু বলিলেন, যদি আমরা যোধপুর যাইতে চাহি, তাহা হইলে তিনি যোধপুরের কলেজের একজন বাঙ্গালী অধ্যাপকের নামে পরিচয় পত্র দিতে পারেন।

আজমীরে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী "হিন্দু হোটেলে" ঘর ভাড়া লইয়া থাকিলে বিশেষ সুবিধা হইবে এই কথা বলিয়া দিলেন। আর যোধপুরে একখানি পরিচয় পত্রও দিলেন।

যথাসময়ে ইঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমরা আজমীর রওনা হইলাম।

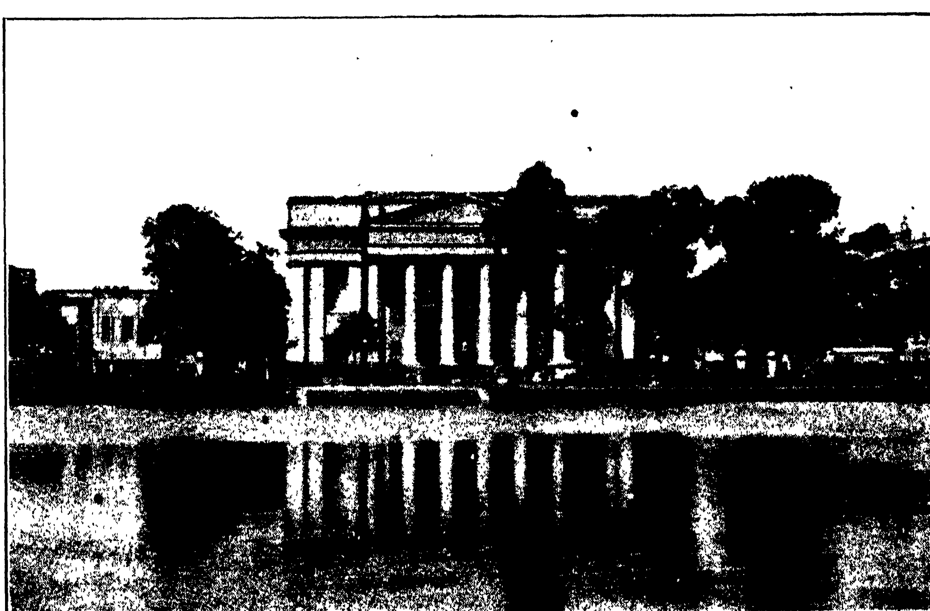
ক্রমশঃ

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

পাল সাম্রাজ্যের অধঃপতন

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনেট হাউসে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের বক্তৃতার সারাংশ]

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বাঙ্গালায় ঘোর 'মাৎস্য ন্যায়' (অরাজকতা) উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে পুনঃ পুনঃ উৎপীড়িত হইয়া, বঙ্গীয় প্রজাবৃন্দ অবশেষে গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে রাজপদে বরণ করিয়াছিল। সর্ব্ব-



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউস্।

বিদ্যাবিৎ দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র, যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ বপ্যটের পুত্র, সমরকুশল গোপালদেব যে রাজবংশের প্রথম রাজা, তাহাই ইতিহাস-বিখ্যাত পাল-রাজবংশ। প্রজাপুঞ্জের শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই রাজবংশ অচিরে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল ভোজ, মৎস্য, মদ্র কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার, কীর এবং পঞ্চাল দেশের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। (১) তৎপুত্র দেবপাল হিমালয় হইতে বিন্ধ্য, এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী সমুদয় ভূভাগ করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (২)

এই দেবপালদেব উৎকুল-কুল উৎকিলিত করিয়া, হূণগর্ব্ব খর্ব্বীকৃত করিয়া, এবং দ্রবিড়-গুর্জ্জরনাথ দর্প চূর্ণীকৃত করিয়া, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমুদ্র মেখলাভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (৩)।

পালরাজবংশের এই বিস্তৃত প্রভাব অধিককাল স্থায়ী না হইলেও, তাঁহারা দীর্ঘকাল আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বভাগের অধীশ্বর ছিলেন। গোপালের অধস্তন দশম পুরুষে রাজা বিগ্রহপাল (৩য়) যখন মহীপাল (২য়), শূরপাল (২য়) ও রামপাল নামক তিন পুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন গৌড় বঙ্গ ও মগধ পাল রাজগণের অধীন ছিল ; কিন্তু মহীপাল রাজ্যলাভ করিবার অনতি-কাল পরেই অনীতিক আচরণ আরম্ভ করেন এবং তাঁহার দুই ভ্রাতাকে কারাগারে আবদ্ধ করেন। ইহার ফলে বরেন্দ্রভূমির প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া, মহীপালকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করে। এই বিদ্রোহের নায়ক কৈবর্ত্তজাতীয় দিব্বোক তাঁহার ভ্রাতা রুদোক ও ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম যথাক্রমে বরেন্দ্রভূমির শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত রামচরিত কাব্যে এই বিদ্রোহের বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিদ্রোহের কারণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সন্ধ্যাকর নন্দী স্পষ্টতঃ কিছুই লেখেন নাই ; কিন্তু তাঁহার কাব্য হইতে এ বিষয়ে কতকটা আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। রামচরিতের টীকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে,—কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপাল "সর্ব্ব সম্মত," এবং সম্ভবতঃ গৌড় রাজ্য অধিকার করিবে, এই আশঙ্কায় মহীপাল তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। (৪) এই "সর্ব্বসম্মত" কথায় মনে হয় যেন রাজার নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তখনও গৌড়ীয় প্রজাবৃন্দের কিছু কিছু অধিকার ছিল। মহীপাল তাঁহাদের এই অধিকার অস্বীকার করিয়া কেবল মাত্র উত্তরাধিকারের দাবীতে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গোপালদেব প্রজাগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া রাজত্ব পদ লাভ করিয়াছিলেন ; তারানাথের উক্তি অনুসারে ধর্ম্মপাল দেবও এইরূপ প্রজাপুঞ্জের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া ছিলেন। কালে এই নির্ব্বাচন-প্রথা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আসিলেও, রাজার সিংহাসনারোহণ সম্ভবতঃ কতক পরিমাণে প্রজাগণের সম্মতির উপর নির্ভর করিত। মহীপাল এই চিরাচরিত প্রথা পদ-দলিত করিয়া প্রজাগণের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন এবং ইহাই বোধ হয় বিদ্রোহের মূল কারণ। কৈবর্ত্ত নায়ক দিব্বোকের অধীনে সংঘটিত হইয়া থাকিলেও, ইহা কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ নহে ;—বরেন্দ্রের সমস্ত প্রজাপুঞ্জের বিদ্রোহ, সমস্ত সামন্ত-চক্রের বিদ্রোহ। যে প্রজাশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া পাল সাম্রাজ্য উন্নতির চরমশীর্ষে আরোহণ করিয়াছিল, সেই প্রজাশক্তির বিরাগই পাল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের মূল কারণ। সুতরাং অতঃপর আমরা এই বিদ্রোহের বিস্তৃত বিবরণ ও পরিণাম অনু-সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই বিদ্রোহের সময়ে রামপাল ও শূরপাল কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। কিরূপে তাঁহারা এই কারাগার হইতে পলায়ন করেন, সন্ধ্যাকর নন্দী সে বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। কারাগার হইতে পলায়ন

(১) গৌড়লেখমালা—পৃঃ ১৪—খালিমপুর লিপি।
(২) গৌড়লেখমালা—পৃঃ ৭৮—গরুড়স্তম্ভলিপি।
(৩) গরুড়স্তম্ভলিপি—গৌড়লেখমালা পৃঃ ৮১।

(৪) রামচরিত—১।৩৭ টীকা।

করিয়া, রামপাল পিতৃভূমি বরেন্দ্রীর উদ্ধারের জন্য যাহা যাহা করিয়াছিলেন, রামচরিতে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শূরপাল এবিষয়ে কোন চেষ্টা করিয়াছিলেন কিনা, সে বিষয়ে রামচরিতে কোনও আভাস পাওয়া যায় না। মদনপালের মনহলি-লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শূরপাল মহীপালের পরে রাজা হইয়াছিলে;—"মহেন্দ্রতুল্য মহিমান্বিত, স্কন্দতুল্য প্রতাপশ্রীসমন্বিত, সাহস-সারথী নীতিগুণসম্পন্ন শ্রীশূরপাল নামক নরপাল তাঁহার [মহীপালের] এক অনুজ ছিলেন। তিনি সর্ব্ববিধ অস্ত্রশস্ত্রের প্রাগল্‌ভ্যে শত্রুবর্গের স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক বিভ্রমাতিশযাধারী মনে শীঘ্রই বিস্ময়-ভয় বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিলেন।" (৫)

বৈদ্যদেবের কমৌলি-তাম্রশাসনে বিগ্রহপালের পরেই রামপালের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে মহীপাল বা শূরপালের নামোল্লেখ নাই। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে প্রধানতঃ পালরাজগণের মন্ত্রীবংশই বর্ণিত হইয়াছে। মহীপাল এবং শূরপালের অল্পকাল স্থায়ী রাজ্যের সহিত বৈদ্যদেবের বংশের ইতিহাস তেমন ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত নহে। এই কারণেই তাঁহার তাম্রশাসনে ঐ দুইটি নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ কারণেই সন্ধ্যাকর নন্দীর কাব্যের সকল অংশে শূরপালের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। শূরপাল পিতৃভূমি উদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টা করিয়া থাকিলেও, অনতিকাল মধ্যেই তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে চেষ্টার পরিসমাপ্তি হইয়াছিল। এই পিতৃভূমির উদ্ধার-রূপ মহৎ কার্য্য প্রধানতঃ রামপাল কর্ত্তৃকই সাধিত হইয়াছিল;—সুতরাং শূরপালের অল্পকাল স্থায়ী রাজ্য ও মৃত্যুর বিষয় রামচরিত কাব্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত নাও হইতে পারে। রামচরিত কাব্যে শূরপালের নামোল্লেখ না থাকায়, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত হইবে না যে রামপাল জ্যেষ্ঠভ্রাতা শূরপালকে বধ করিয়াছিলেন এবং সন্ধ্যাকর নন্দী ইচ্ছাপুর্ব্বক এই ঘটনা গোপন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'বাঙ্গালার ইতিহাস' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"রামচরিতে' শূরপালের সিংহাসন লাভের, তাঁহার রাজ্যকালীন ঘটনার এবং তাঁহার মৃত্যুর বিবরণের অভাব দেখিয়া অনুমান হয় যে, রামপাল কোন উপায়ে শূরপালকে সংহার করিয়া পৈতৃক রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন" (২৫৫ পৃঃ)। এইরূপ অনুমান যে কেবল অসঙ্গত তাহা নহে, ইহা স্পষ্টতঃ রামচরিতের বর্ণনার বিরোধী। রামচরিত কাব্যের নিম্নলিখিত শ্লোকে রামচন্দ্রের ও রামপালের সহিত ইন্দ্রের তুলনা করা হইয়াছে, যথা,—

"অভিতরকরোক্ষতবলোপামরূত্বান
প্রভূত মন্যুরপি।
যোভূদগোত্রভিদ পাক শাস (নাশ) নোপি
চ সুনাসীরঃ॥" (৬)
[প্রথম পরিচ্ছেদ পঞ্চদশ শ্লোক]

এই শ্লোকের টীকায় রামপাল-পক্ষের অর্থে টীকাকার 'অগোত্রভিদ্' এই পদের "ন গোত্রভিৎ কুলাঘাতী" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রামপাল তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া থাকিলে, কদাপি তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বিশেষণ প্রযুক্ত হইতে পারিত না।

মদনপালের মনহলি লিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে, বরেন্দ্রভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াও, শূরপাল রাজ-উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার

(৫) গৌড় লেখমালা—১৫৬—১৫৭ পৃঃ

(৬) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত এবং এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত 'রামচরিত' গ্রন্থে "সুনাশীরঃ" এই পদ দেখিতে পাওয়া যায়। মূল পুঁথীতে "সুনাসীর" আছে; তাহা "সুনাশীর" রূপে মুদ্রিত হইয়াছে কেন, তাহার কারণ উল্লিখিত হয় নাই। এই শব্দটি দ্বিদন্ত্য, দ্বিতালব্য, তালব্যাদি হইতে পারে, যথা— সুনাসীর, শুনাশীর, শুনাসীর, কিন্তু "সুনাশীর" এইরূপ বর্ণবিন্যাসযুক্ত শব্দ সংস্কৃতভাষায় দেখা যায় না।

কনিষ্ঠ সহোদর রামপাল রাজ উপাধি গ্রহণ করেন, এবং পিতৃভূমি বরেন্দ্রীর উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হন।

রামচরিতের প্রথম পরিচ্ছেদের ২৩শ শ্লোকের টীকায় "নন্দনৈঃ পুত্রৈঃ রাজ্যপালাদিভিঃ" এই বাক্য হইতে জানা যায় যে,—বরেন্দ্রী ত্যাগ করিবার সময় রামপালের অন্ততঃ তিনটি পুত্র ছিল, এবং তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ছিল, রাজ্যপাল। পুত্রকলত্রাদি লইয়া প্রথমেই রামপালকে কোন সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই আশ্রয় স্থান কোথায়, রামচরিতের নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

"স বিনাশিত মারীচোপগতেষ্টতমো ভুজোদধদ্বিফলৌ।
ধাম নিজং পরিকলয়াং চকার শূন্যং সসুন্দরথরামঃ॥" (৭)।
(প্রথম পরিচ্ছেদ—৪০শ শ্লোক)

এই শ্লোকের টীকায় রামপালপক্ষের অর্থে "উপগতা ইষ্টতমা মিত্রাণি মাতৃবন্ধবো যস্য" এই পদসমষ্টি হইতে অনুমিত হয় যে, রামপাল তাঁহার মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সীতাহরণে রাম যেরূপ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন, রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া রামপালও সেইরূপ শোকাভিভূত হইয়াছিলেন। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী অতি অল্প কথায় দ্ব্যর্থবোধক শ্লোকের দ্বারা যুগপৎ রাম ও রামপালের মনোভাব বর্ণনা করিয়াছেন। শোকের প্রথম মুহূর্ত্তে রামপাল পিতৃরাজ্য উদ্ধারের বিষয়ে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন (৮)। কিন্তু লক্ষ্মণের সান্ত্বনাবাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া রাম যেমন সীতান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, পুত্র ও সহচরগণের পরামর্শে রামপালও সেইরূপ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধারের উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু অর্থ ও বিস্তৃত ভূভাগ দান করিয়া তিনি ক্রমে সামন্তরাজগণকে স্বীয় পক্ষে আনিতে সমর্থ হইলেন। "ভূমের্বিপুলস্য ধনস্য চ দানতস্ত্যাগাৎ অনুকূলিতঃ"—(১।৪৫) টীকাকারের এই উক্তি হইতে অনুমিত হয় যে অধীন সামন্তরাজগণ স্বেচ্ছায় কর্ত্তব্যপ্রণোদিত হইয়া রাজা ও প্রভু রামপালের সাহায্য করেন নাই। বালীবধের পর রাজ্যলাভের বিনিময়ে যেমন সুগ্রীব রামের সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেইরূপ অর্থ ও ভূসম্পত্তির বিনিময়ে রামপালের সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে বরেন্দ্রের বহির্ভাগে গৌড়বঙ্গমগধেও পালরাজগণের পুরাতন প্রভুত্ব শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। রামপাল বরেন্দ্রের পুনরধিকারের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা সাম্রাজ্যের এক অংশের বিরুদ্ধে অপর অংশের যুদ্ধ (civil war) নহে—একদল ভাড়াটিয়া (mercenary) সৈন্যের সাহায্যে প্রজাশক্তির বিরুদ্ধে অভিযান মাত্র।

এই অর্থগৃধ্নু কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন সামন্তচক্রের মধ্যে কেবলমাত্র রামপালের মাতুল বীরাগ্রগণ্য মথন স্বেচ্ছায় কর্ত্তব্য প্রণোদিত হইয়া সমগ্র শক্তি সহকারে ভাগিনেয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। রামচরিতের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অষ্টম শ্লোকের টীকায় এই মথনের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। বরেন্দ্রের অনুকরণে পীঠীপতি দেবরক্ষিত মগধে বিদ্রোহের ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছিলেন কিন্তু বীরবর মথন তাঁহাকে পরাভূত করিয়া বিদ্রোহবহ্নি প্রশমিত করেন। বিষ্ণু যেমন বরাহাবতারে সিন্ধুর গর্ভ হইতে বসুন্ধরার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন সুবিখ্যাত রণকুঞ্জর 'বিন্ধ্যমাণিক্যে"র উপর আরূঢ় হইয়া অদ্ভুত পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া বীরবর মথনও সেইরূপ সিন্ধুরাজপীঠীপতি দেবরক্ষিতের হস্ত হইতে মগধের উদ্ধার সাধন করেন।

সারনাথের ধ্বংসমধ্যে প্রাপ্ত কান্যকুব্জের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের পত্নী কুমারদেবীর শিলালিপিতেও রাজমাতুল অঙ্গরাজ মথন কর্ত্তৃক পীঠীপতি দেবরক্ষিতের

(৭) মুদ্রিত পুঁথিতে 'বিকলৌ' এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু ইহাতে অর্থসঙ্গতি হয় না। মূলের টীকায় 'বিফল' পাঠ আছে—ইহাতে সুসঙ্গত অর্থ হয় বলিয়া ইহাই গ্রহণ করা গেল।

(৮) "অবনীপতিতাং তনুমপি ন তদা সম্ভাবয়ামাস।" (১।৪১)
রামপাল পক্ষে অর্থ "অবনী পতিতাং পৃথ্বীপতিতাং তনুং অল্পমপি ন সম্ভাবিতবান্"।
রাম পক্ষে অর্থ "মূর্চ্ছিতঃ সন্ অবনীপতিতাং তনুং দেহং ন সম্ভাবিতবান্"।



শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

মানসী প্রেস, কলিকাতা।

পরাভব-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই শিলালিপি হইতে আরও জানা যায় যে মথনের কন্যা শঙ্করদেবীর সহিত দেবরক্ষিতের বিবাহ হইয়াছিল। এইরূপে রামপালের মাতুল মথনের পরাক্রম ও বিচক্ষণতায় রামপালের একজন প্রধান শত্রু, মিত্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। মথন কর্ত্তৃক মগধের বিদ্রোহ দমন না হইলে, রামপালের পক্ষে পিতৃরাজ্য লাভ করা হয়ত অসম্ভব হইত। রামপাল আমরণকাল পর্য্যন্ত মাতুলের এই মহৎ উপকার কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

যে সমুদয় প্রধান প্রধান সামন্ত রাজগণের সাহায্যে রামপাল বরেন্দ্রভূমি পুনরধিকার করিয়াছিলেন, রাম-চরিতে তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। রামচরিতের টীকায় তাঁহাদের সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য জ্ঞাত হওয়া যায়। রামচরিতের টীকার এই অংশ তৎকালীন বঙ্গদেশের ভূগোলের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান।

প্রথম সামন্তরাজ রামচরিত কাব্যে বন্দ্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। টীকা হইতে জানিতে পারা যায় যে তাঁহার নাম ভীমযশ, তিনি মগধ ও পীঠীর অধিপতি ছিলেন, এবং তিনি একসময়ে কান্যকুব্জের অশ্ববাহিনীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় সামন্তরাজের নাম বীরগুণ। ইনি কোটার অধিপতি ছিলেন। মগধের পরেই কোটার নামোল্লেখ দেখিয়া মনে হয় কোটা সম্ভবতঃ মগধের দক্ষিণভাগে অবস্থিত ছিল—কাহারও কাহারও মতে আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত সরকার কটক ও কোটা অভিন্ন।

তৃতীয় সামন্তরাজ দণ্ডভুক্তিপতি জয়সিংহ "উৎকলেশ-কর্ণকেশরী-সরিদ্বল্লভ-কুম্ভসম্ভবঃ" (২।৫) রূপে বর্ণিত হইয়াছেন; অর্থাৎ অগস্ত্য যেমন সিন্ধুকে গ্রাস করিয়াছিলেন, তিনিও তদ্রূপ উৎকলদেশের অধিপতি কর্ণকেশরীকে পরাভূত করিয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, উৎকলের অধিপতি কর্ণকেশরী স্বাধীনতা অবলম্বন করায়, জয়সিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন।

চতুর্থ সামন্তরাজ বিক্রমরাজ, "দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধ-বসুধাচক্রবাল--বালবলভি-তরঙ্গবহল-গলহস্ত-প্রশস্ত-হস্ত-বিক্রমঃ"রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। এই বর্ণনা হইতে জানা যায় যে,—বিক্রমরাজ দেবগ্রামের রাজা ছিলেন, এবং এই দেবগ্রাম রাজ্য বালবলভীর অপর পারে বর্ত্তমান ছিল। দেবগ্রাম ও বালবলভী এ উভয়ের মধ্যে যে নদী প্রবাহিত ছিল, তাহাতে তাঁহার নৌকার বহর (বহল) সজ্জিত থাকিত; এবং এই নৌসৈন্যের সাহায্যেই তিনি বিপক্ষপক্ষকে গলহস্ত-প্রদান (পরাজিত) করিতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন।

পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম সামন্তরাজের নাম যথাক্রমে লক্ষ্মীশূর, শূরপাল, রুদ্রশিখর ও ময়গল সিংহ। রামচরিতের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পঞ্চম শ্লোকের টীকায় ইহাঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবরণ পাওয়া যায়।

নবম সামন্তরাজ প্রতাপসিংহ ঢেক্করীর অধিপতি ছিলেন। রামচরিতের ভূমিকায় এই স্থানকে বর্ত্তমান কাটোয়ার অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত কযঙ্গলীর মণ্ডলাধিপতি নরসিংহার্জ্জুন, সঙ্কটগ্রামের চণ্ডার্জ্জুন, নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ, কৌশাম্বীপতি দ্বোরপবর্দ্ধন, পদুবন্বা মণ্ডলের অধিপতি সোম এবং অন্যান্য সামন্তগণ রামপালের সাহায্যার্থে সমাগত হইয়াছিলেন (রামচরিত—২।৬)। কোন কোন লেখক কৌশাম্বীর সহিত রাজসাহার অন্তর্গত কুসুম্বার এবং পদুবম্বার সহিত পাবনার অভিন্নতা প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু এই সমুদয় লেখকগণ একটি বিষয় লক্ষ্য করেন নাই। উল্লিখিত সামন্ত রাজগণ গঙ্গার অপর পার হইতে বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কেহই বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত রাজসাহী বা পাবনার লোক হইতে পারেন না।

এই সমুদয় সামন্তগণের সাহায্যে হস্তী, অশ্ব, নৌ, পদাতি এই চতুরঙ্গ সেনার সমাবেশ হইল। এই সেনার পরিচালন কার্য্যে রামপালের প্রধান সহায় ছিলেন মথন, মথনের পুত্র মহামাণ্ডলিক কাহ্নুরদেব, এবং মথনের ভ্রাতা সুবর্ণদেবের পুত্র মহাপ্রতীহার শিবরাজদেব।

উল্লিখিত সামন্তরাজগণের মধ্যে মহামাণ্ডলিক কাহ্নুরদেব এবং মণ্ডলাধিপতি নরসিংহার্জ্জুনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পুরাকালে 'মণ্ডল' শব্দে দ্বাদশজন রাজার রাজ্য-পরিমাণ বুঝাইত। মণ্ডলের অধিপতি এই সমুদয় রাজগণের উপর প্রভুত্ব করিতেন। মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনে দেখা যায়, যে রাজাধিরাজগণের ন্যায় তিনিও বহুসংখ্যক সামন্ত রাজগণের উপর আধিপত্য করিতেন। ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে মহাসামন্তাধিপতি এই উপাধিভূষিত রাজ কর্ম্মচারীর উল্লেখ দেখিয়া অনুমান হয় যে, সামন্ত রাজগণের মধ্যে একজন সমুদয় সামন্তরাজগণের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইতেন, এবং তদনুরূপ সম্মান পাইতেন। সুতরাং এই মহামাণ্ডলিক বা মহাসামন্তাধিপতির স্থান মহারাজাধিরাজার ঠিক নিম্নে বলিয়াই গণ্য হইত।

সামন্তরাজগণের বর্ণনা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, রামপাল পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য বিপুল আয়োজন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই আয়োজনের বিপুলতা হইতেই বরেন্দ্রভূমির বিদ্রোহের গুরুত্ব অনুভব করা যায়। এইরূপ প্রভূত বলশালী হইয়াও রামপাল সহসা বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ করিতে সাহসী হন নাই। মদনপালের মনহলি লিপিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, দৈত্যকর্ত্তৃক স্বর্গচ্যুত ইন্দ্রের ন্যায় রামপাল অসীম ধৈর্য্য ও সাবধানতা সহকারে ধীরে ধীরে স্বীয় কার্য্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বরেন্দ্রভূমির বিদ্রোহ যদি কেবলমাত্র ব্যক্তি বা জাতিবিশেষের বিদ্রোহ হইত, তাহা হইলে এরূপ প্রভূত বল বা সতর্কতার আবশ্যক হইত না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বরেন্দ্রের বিদ্রোহ সমগ্র প্রজাশক্তির বিদ্রোহ। রাজার নির্ব্বাচনে প্রজাগণের যে অধিকার ছিল মহীপাল তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অনীতিক আচরণই বরেন্দ্রের বিদ্রোহের মূল কারণ। রামপাল এই বিদ্রোহের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন বলিয়াই অপরিমিত অর্থব্যয়ে বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সাবধানে এই বিদ্রোহ দমন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার ভাড়া করা সৈন্যের সাহায্যে তিনি প্রজাশক্তি উন্মূলিত করিয়া পুনরায় পিতৃ সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তিনি যাহা হারাইয়াছিলেন তাহা আর ফিরাইয়া পাইলেন না। যে প্রজাশক্তির উপর পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, যে প্রজাশক্তি পাল-সাম্রাজ্যের সঞ্জীবনী শক্তির আধার ছিল, অর্থবলে ক্রীত বিপুল সৈন্যের শাণিত তরবারির আঘাতে চিরদিনের নিমিত্ত তাহার মূলচ্ছেদ হইয়া গেল। যে প্রজাশক্তির সাহায্যে আসমুদ্র হিমালয় পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহের উপর দিয়া শকট চালাইয়া রামপাল পিতৃরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু সে রাজ্যের শ্রী তখন চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে কেবল প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি বহন করিবার জন্যই তাহার কঙ্কালমূর্ত্তি বরেন্দ্রের বিরাট শ্মশানে তখনও দণ্ডায়মান ছিল। গৌড়রাজমালায় (৫২ পৃঃ) ইহা কাব্যের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—

বরেন্দ্রভূমির বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করিয়া, এবং কামরূপ ও কলিঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়া রামপাল যে গৌড়রাষ্ট্র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন সেই অভিনব গৌড়রাষ্ট্রের সহিত রামপালের পূর্ব্বপুরুষগণের শাসিত গৌড়রাষ্ট্রের অনেক প্রভেদ ছিল। প্রজাসাধারণের নির্ব্বাচিত গৌড়াধিপ গোপালের গৌড়রাষ্ট্র, প্রজার প্রীতির এবং প্রজাশক্তির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু হতভাগ্য দ্বিতীয় মহীপালের "অনীতিকারম্ভের" ফলে এবং দিব্বোক নিয়ন্ত্রিত বিদ্রোহানলে, সেই ভিত্তি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। রামপালের পক্ষে, গৌড়রাজ্যের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুনরায় একত্রিত করিয়া, উহার পুনর্গঠন সম্ভব হইলেও, সেই দেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা—সেই ভগ্ন অট্টালিকার বহিরঙ্গের সংস্কার সম্ভব হইলেও, উহার নষ্টভিত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা,—অসম্ভব হইয়াছিল।"

ক্রমশঃ

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

খোলা চিঠি

একদিন রবিবার এক বন্ধুর গৃহে নিমন্ত্রণ ছিল। বেলা এগারোটার সময় যখন তাঁহার বাহিরের ঘরে উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি সবেমাত্র নিদ্রাত্যাগ করিয়া উঠিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিলেন নাকি ?"

বন্ধু বলিলেন, "কাল রাত্রে থিয়েটার দেখ্‌তে গিয়েছিলুম।"

আমি বলিলাম, "বুড়ো বয়সেও থিয়েটার দেখবার বাই যায় নি ?"

বন্ধু বলিলেন, "আজকাল সত্যি সত্যিই দু একখানা ভাল নাটক বাজারে বেরিয়েছে।"

এইবার তিনি নাটকের গল্পাংশ বলিতে আরম্ভ করিলেন। আমি বলিলাম, "থাক আপনার গল্প শুন্‌তে চাই না, আপনি স্নান করুণ গিয়ে।"

এমন সময় হাতে একখানি তুজা-কি-জাহাঙ্গিরী ও কতকগুলা কাগজ খাতা পত্র লইয়া এক ঐতিহাসিক বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "থাক্ আপনার গল্পটার শুন্‌তে আমরা মোটেই প্রস্তুত নই।"

আমি বলিলাম, "আপনার ইতিহাস শুন্‌তে কিন্তু বেশী অপ্রস্তুত একথা জেনে রাখ্‌বেন।"

ঐতিহাসিক বন্ধু বই খাতা পত্র সশব্দে টেবিলের উপর রাখিয়া বসিয়া পড়িলেন। ডিবা হইতে দুইটা পান মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "আঃ, এইবার বাঁচব বলে মনে হচ্ছে, আগে আগে কাগজ গুলো যখন পড়্‌তুম, তখন দেখ্‌তুম কেবলই ছোট গল্প আর কবিতা। এখন দেশের অবস্থাটা কিছু ফিরেছে বলে মনে হচ্ছে— গল্পওয়ালারা এখন ডুবে যাচ্ছে, সাহিত্যক্ষেত্রে জনকতক ঐতিহাসিক মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।"

প্রথম বন্ধু বলিলেন, "তোমার কথাটা একেবারেই মিথ্যা।"

আমি বলিলাম, "যাই বলুন, আমি আগে গল্প কবিতা ভালবাস্‌তুম, ইতিহাস জানি না, তবুও—কালের গুণ কোথায় যাবে, ইতিহাসের দিকে কেমন একটা ঝোঁক অজ্ঞাতে এসে পড়েছে।"

ঐতিহাসিক বন্ধু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি রকম ঝোঁক ?"

"সেদিন এই ঝোঁকে পড়েই একটা ভয়ানক আবিষ্কার করে ফেলেছি।"

"আবিষ্কারটা ঐতিহাসিক ?"

"হাঁ।"

"কি আবিষ্কার ?"

"একটা লিপি।"

"শিলা-লিপি ?"

"না না হস্তলিপি। অমাদের গ্রামে একটা অতি পুরাতন চতুষ্পাঠীর ধ্বংসাবশেষ আছে, তারই ভেতর থেকে আমি এই হস্তলিপিটা বার করেছি, এটা মনোযোগ করে পড়্‌লে সেকালের অনেক কথা জান্‌তে পারা যায়।"

"আপনার কাছে সেটা আছে ?"

"আপনি এখানে আসবেন জেনে সেটা সঙ্গেই এনেছি।"

"তবে পড়ুন। আমি গত পঞ্চাশ বৎসরের কলিকাতার ইতিহাস লিখ্‌তে ইচ্ছা করছি, দেখি আপনার লিপি থেকে কোন উপকরণ পাওয়া যায় কি না।"

আমি বলিলাম, "আহারের পরই পড়বো।"

তিনি বলিলেন, "না এখনই; আহারের বিলম্ব আছে।"

আমি পকেট হইতে কতকগুলা কাগজ বাহির করিয়া বলিলাম, "তবে শুনুন, এক ছাত্র টোলের একটি পড়ুয়া বন্ধুকে পত্র লিখ্‌ছে।" এই বলিয়া আমি পড়িতে আরম্ভ করিলাম—

পরম পূজনীয়

শ্রীরামকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়

শ্রীচরণ কমলেষু—

রামকমলদাদা,

তুমি আমার কথা জানিতে চাহিয়াছ। এই দীর্ঘপত্রে সব কথাই বলিব। তোমরা জান আমার পাপের জন্য অধ্যাপক মহাশয় আমাকে টোল হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। তাহাই জানিয়া রাখিও; লোকের নিন্দায় আমার কিছুই যায় আসে না, কেন না আমি এখন লোকসমাজের বাহিরে।

আমি সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। পিতা আমাকে যথেষ্ট শাসন করিতেন। সত্য কথা বলিতেছি তাঁহার নিকট হইতে আমি কখন কোন স্নেহের কথা শুনি নাই। তাঁহার পুত্র-স্নেহ হয়ত ছিল, কিন্তু আমি তাহার কোন প্রমাণ পাই নাই। আমার মা ছিলেন স্নেহময়ী, তাঁহার স্নেহ আমাকে মুগ্ধ বিহ্বল করিয়া তুলিত, বিশেষতঃ পিতার শাসনের পর।

মা যেদিন ইহলোক ত্যাগ করিলেন, সেদিন সংসারটা বড়ই শূন্য বলিয়া বোধ হইল, সেখানে যে কোন কালে কোন সুখ পাইতে পারি সে কল্পনাটিও করিতে পারিলাম না।

পিতা দিনকতক পরে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলেন। লোকের কথায় ধারণা হইল বিমাতা কোন-না-কোনদিন আমাকে অন্নের ভিতর বিষ পুরিয়া অথবা ছুরিকার সাহায্যে হত্যা করিবে।

এত বিপদ, তবুও দুষ্টামি ছাড়িতে পারিলাম না। সমস্ত দিন রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। প্রতিবেশীর ঘরে উপদ্রব করিতাম। একদিন পিতা যখন আমাকে প্রহার করিবার জন্য সদর রাস্তার উপর দিয়া নানা অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে ছুটিতে লাগিলেন, রাস্তার লোকেরা হাসিতে লাগিল। সেদিন আমি আপনাকে ধিক্কার দিলাম; নিজের দোষের জন্য নয়—পিতার অদ্ভুত আচরণের জন্য।

তোমাদের টোলের অধ্যাপকের সহিত আমার পিতার কোন প্রকার একটা সম্পর্ক ছিল। এই কেলেঙ্কারের পর তাঁহার নিকট বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠাইবার ইচ্ছা যেদিন তিনি প্রকাশ করিলেন সেদিন আমি কোন প্রকার আপত্তিই উত্থাপন করিলাম না।

গ্রাম ছাড়িয়া আসিতে প্রথম প্রথম বড়ই কষ্ট হইল। তবুও তোমাদের টোলে আসিয়া নীরবে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। বোধ হইল—এবার হয়ত একটু আনন্দ পাইব কিন্তু দিন কতক পরে অধ্যাপক মহাশয়ও আমাকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। গঙ্গায় ঘণ্টাখানেক সাঁতার না কাটিলে আমার স্নান হইত না, ইহাতে হয়ত তাঁহার কাজের কিছু ক্ষতি হইত। আমার ছেলেবেলাকার খানিকটা আনন্দের বিনিময়ে তিনি আপনার স্বার্থ কিনিতে চাহিতেন; আমি প্রথমে নির্ব্বোধ ছিলাম কিন্তু শীঘ্রই আপনার প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে শিখিলাম।

অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট পড়িতেছিলাম মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ হিতোপদেশের মিত্রলাভ আর প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব। সত্য কথা বলিতে কি একখানা বইও আমাকে ভাল লাগিত না। প্রতিদিন দুপুর বেলা এক ফিরিওয়ালা বটতলার কতকগুলা বই বিক্রয় করিবার জন্য হাঁকিয়া হাঁকিয়া সম্মুখের বড় রাস্তাটি ধরিয়া চলিয়া যাইত। গ্রামের বধূরা সংসারকর্ম্মের অবসর সময়টুকু কাটাইবার জন্য দু একখানা বই সেই ফিরিওয়ালার নিকট হইতে কিনিতেন। আমি একদিন তাহাকে ডাকিলাম, সে টোলের সাম্‌নেকার তেঁতুলগাছটির তলায় ঝুলি খুলিয়া আমাকে বই দেখাইতে আরম্ভ করিল। নানা প্রকার দৈত্যদানবের ছবি দেখিয়া একখানা বই আমি বাছিয়া লইলাম।

বই খানার নাম 'আরব্য উপন্যাস'। দুপুরবেলা অধ্যাপক মহাশয় যখন টোলে থাকিতেন না, তখন আমি বিছানায় শুইয়া নিবিষ্টমনে বইখানি পড়িয়া যাইতাম, কোন্ একটা অজ্ঞাত জগতের কত অস্পষ্ট স্বপ্নময় ছবি, কত বিচিত্র বন উপবন, নদ-নদী সমুদ্র পর্ব্বত, কত পাখী, কত দৈত্য, কত রকমের মানুষ দিবারাত্র

যেন কোন্ ইন্দ্রজালের শক্তিতে আমার নয়ন সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইত।

আমার চক্ষের সম্মুখে আর একটা জিনিস ভাসিয়া বেড়াইত, তাহাকে স্পষ্টরূপে কোনদিন অনুভব করিতে পারি নাই, তবুও আকাশে-বাতাসে, দক্ষিণে বামে, আমার বাহিরে ভিতরে তাহার সত্তা স্পষ্টই অনুভব করিতাম। তুমি হয়ত জিজ্ঞাসা করিবে:সেটা কি? বন্ধু, তোমার কাছে কোন কথা গোপন রাখিব না—সে একটি সুন্দরী রমণী।

কে সে সুন্দরী রমণী তাহা জানি না। প্রভাতের আলোক-হিল্লোলে, দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতায়, বিষণ্ণ সন্ধ্যার শ্যামায়মানা পুষ্করিণীর স্তিমিত পথে তাহাকে কভু অন্তরে কভু বাহিরে দেখিতে পাইতাম। সে আমার প্রাণমন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

সেদিন বাসন্তী পূর্ণিমা, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গ্রামের লোকেরা কেন যে সেদিন বাহিরের জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পথটির উপর বিচরণ করিতেছিল তাহাই ভাবিতে ভাবিতে কখন আমি তন্দ্রামগ্ন হইয়াছিলাম বুঝিতে পারি নাই। হঠাৎ বোধ হইল যেন আমি কোন সমুদ্রের ফেনিল তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া একটা দ্বীপের উপর উঠিয়াছি। আমার শরীরে অবসাদ না, একটু নিদ্রার ঘোর যেন একটা অপূর্ব্ব সুখবেদনার মত আমাকে অবশ করিয়া রাখিয়াছিল। চারিদিকে দেখিতেছি শ্যাম তরুপুঞ্জ জ্যোৎস্না মাখিয়া বাতাসে অসীম আনন্দে শিহরিয়া উঠিতেছে, নিকটেই একটা পাহাড় তাহা হইতে একটি ঝরণা অব্যক্ত মধুর ধ্বনিতে জননীর 'ঘুমপাড়ানি গানের' মত তাহার সুপ্তি আবেশ ঘনাইয়া তুলিতেছিল। সুকোমল তৃণশয্যায় আমি পড়িয়াছিলাম সহসা মনে হইল—যেন কাহার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছি তাহার নিঃশ্বাস আমার গায়ে লাগিতেছে, তাহার অসংস্কৃত কেশ আমার অঙ্গে,—সর্ব্বাঙ্গে, সর্ব্ব হৃদয়ে, সর্ব্ব প্রাণে অনুভব করিতেছি। চাহিয়া দেখিলাম। বন্ধু, কি দেখিলাম বলিতে পারিব না। তবে যাহা দেখিলাম তাহাকেই এতদিন ধরিয়া কামনা করিয়াছি।

পরদিন সকালে অধ্যাপক মহাশয় আসিয়া যখন ব্যাকরণের পাঠ বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন; তখন হঠাৎ আমার মনে হইল ব্যাকরণ পাঠ করিবার জন্য আমার জীবন গঠিত হয় নাই। পথের জন কোলাহল অধ্যাপকের ব্যাখ্যা আর আগন্তুকের ধূমপান আমার কাছে বড়ই বিরক্তিকর বলিয়া মনে হইল।

আমরা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে বিছানা হইতে উঠিতাম, তখনও আকাশের প্রান্তে শুকতারাটি উজ্জ্বল থাকিত। প্রাতে উঠিয়া দেবতার নাম স্মরণ করিতে গিয়া, তাহাকে মনে করিতাম, শুকতারাটির পানে চাহিয়া এক একদিন আমি তন্ময় হইয়া পড়িতাম, মনে হইত তাহার সহিত আমার মানসী সুন্দরীর বিশেষ সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সাদৃশ্যটা যে কোন্‌খানে তাহা কোন দিন ঠিক করিতে পারি নাই।

একদিন প্রভাতে বাহিরে বসিয়া আছি—না, না ঠিক প্রভাত নয়, তখনও আকাশে দুই চারিটা তারা অপেক্ষা করিতেছে, আমি শুকতারাটির পানে চাহিয়া আছি, এমন সময়ে দেখিলাম অনেক রমণী কথা কহিতে কহিতে গঙ্গাস্নানে চলিয়াছে। পূর্ব্বদিকে খণ্ডচাঁদ হেলিয়া পড়িয়াছিল, পথটি তখনও জ্যোৎস্নায় রঙীন।

রমণীরা চলিয়া যাইতেছিল। আমি ভদ্রসন্তান, টোলের অধ্যাপকের ছাত্র। অপরিচিতা রমণীদের দিকে চাহিয়া থাকা একটা দোষ, আমার পক্ষে সে দোষ অমার্জ্জনীয়। তবুও সে দোষ করিলাম। রমণীরা চলিয়া গেল, আমি বসিয়া বসিয়া যে আমার কামনার ধন, যে আমার হৃদয়ের আরাধ্যা, যাহাকে মনে মনে গড়িয়া তুলিয়াছি, একদিন শুধু যাহাকে স্বপ্নে মাত্র দেখিয়াছিলাম সেই অনিন্দ্যা সুন্দরীর রমণীয় চিত্রখানি অন্তরের মধ্যে আঁকিতে লাগিলাম। সহসা দেখিলাম একটি বৃদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে একটি রমণী কিছুক্ষণ পরে নীরবে পথ দিয়া যাইতেছে। রমণীর অনাবৃত মুখের উপর জ্যোৎস্না

পড়িয়াছিল। হঠাৎ আমার দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইল। আমি দেখিলাম।

কি দেখিলাম! আমি দেখিলাম স্বপ্ন সত্য হয়, বিশ্ব জুড়িয়া যে মহাপুরুষ বিরাজ করিতেছেন তিনি জীবের ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন না, তাঁহার করুণা অপার, অপরিমেয়। ভগবান্‌কে যদি কোন দিন অনুভব করিয়া থাকি তবে সেইদিনই করিয়াছি।

আমি তাহার পানে চাহিতেই আমার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত করিয়া সেও আমার দিকে চাহিল। সে আমাকে দেখিতে পাইল কিনা ঠিক বলিতে পারি না, হয়ত দেখিয়াছিল।

মনে করিলাম—তাহার অনুসরণ করি, কিন্তু যদি কেহ জাগিয়া আমাকে অনুসরণ করে, সেই জন্য বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করিলাম।

নিকটেই গঙ্গার ঘাট। একটু পরেই দু একজন ছাত্র যখন জাগিয়া উঠিল, তখন একজন সহপাঠীকে বলিলাম 'আজ হতে প্রাতস্নান আরম্ভ কর্‌লুম'—এই বলিয়া গামছা কাঁধে ফেলিয়া ঘাটের দিকে অগ্রসর হইলাম।

মনের ভিতর কি একটা আবেগ গুমরিয়া উঠিতেছিল। মনে করিতেছিলাম, জীবনের বিশ পঁচিশ বৎসর কাটাইয়া দিয়াছি।—পিতার তাড়না সহিয়া টোলের গ্রন্থ পড়িয়া, লোকের বাড়ীতে পূজা করিয়া; কতকগুলি প্রাণহীন জড়বস্তুর সেবায় এত কাল উৎসর্গ করিয়া পৃথিবীর যেখানে রস, যেখানে আনন্দ, যেখানে সারা জীবনের সার্থকতা যাহার অভাবে বিশ্ব মরুভূমি হইয়া যায়, তাহার সন্ধান করিতে পারি নাই। আজ মনে হইল, তাহারই পথ ধরিয়াছি, গত রজনী আমার পুরাতন জীবনকে লইয়া অতিবাহিত হইয়াছে,-আজিকার প্রভাত হইতে আমার মধ্যে একটা নূতন জীবনের সাড়া পাইয়াছি।

সোজা পথ ধরিয়া গেলেই গঙ্গার ঘাটে পৌঁছানো যায়, টোলের উপর দিককার পথটা ধরিয়া চলিলাম। মনে করিলাম হয়ত তাহাকে দেখিতে পাইব।

কিছু দূর আসিয়াছি, এমন সময়ে দেখিলাম—আমাদের অধ্যাপক মহাশয় সেই পথ দিয়া টোলের দিকেই আসিতেছেন, আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, "বিভূতি যাচ্ছ কোথা?" আমি একটু থতমত খাইয়া বলিলাম, "স্নান করতে।" তিনি বলিলেন "এত সকালে?" আমি বলিলাম, "আজ হতে প্রাতঃস্নান কর্‌ব ঠিক করেছি। তিনি বলিলেন, "আজ এস, কাজ আছে।"

অধ্যাপক মহাশয়ের উপর আমি বড়ই চটিয়া গেলাম। তাঁহার নামাবলী, মালা, তিলক আমার কাছে অসহ্য হইয়া উঠিল। মনে করিলাম তাঁহার কথা অবজ্ঞা করি, কিন্তু সাহস হইল না।

ফিরিলাম, অধ্যাপক মহাশয়ের কাজও করিলাম, কিন্তু সমস্ত দিন অন্তরটা পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল। কোন কাজ করিতে ইচ্ছা নাই, তবুও সবই করিতে হইল। মনে করিলাম—আমি একটা দাস—অধ্যাপক মহাশয় যেন কোন্ মরুপ্রান্তের হাটে আমাকে কিনিয়া আনিয়াছেন।

দুই তিন দিন কাটিয়া গেল। তাহার স্মৃতি শাণিত ছুরিকার মত আমার অন্তর দিবানিশি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল। বুঝিলাম—একটি মুহূর্ত্তের শুভদৃষ্টিতে আমি তাহাকে চিরদিনের জন্য আপনার করিয়া লইয়াছি। সে যেই হোক, সবর্ণা, অসবর্ণা, পতিতা, পরনারী বা নীচকুলোদ্ভবা যেই হোক না কেন আমি তাহাকে চাই, তাহাকে পাওয়া সম্ভব হোক, অসম্ভব হোক, আমি তাহাকে চাই, সে যদি আমার না হয়, তবুও আমি তাহাকে চাই, তাহাকে চাহিতে চাহিতেই যেন এ জীবন কাটিয়া যায়।

আর এক দিন বোধ হয় তাহাকে দেখিলাম। বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই—তখন প্রভাত হইয়াছে—পূর্ব্বদিকটা লাল হইয়া উঠিয়াছে, বুকভরা অনুরাগের মত।

আমি তাহার দিকে চাহিলাম, সেও আমার পানে চাহিল, আমার অন্তরাত্মা আহত পক্ষিশিশুর মত কাঁপিয়া উঠিল। আজ আমি তাহাকে অনুসরণ করিলাম।

বন্ধু, তুমি হয়ত আমার কথা শুনিয়া আমাকে নিতান্ত পাপী বলিয়া স্থির করিবে। তাহা করিও ভাই, কিন্তু প্রথমে আমার কথা শেষ করিতে দাও।

আমি চলিলাম। পথে বোধ হয় অধ্যাপক মহাশয় আমাকে দেখিয়াছিলেন। হয়ত সেদিনও তিনি আমাকে ফিরিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করি নাই।

রমণী স্নানান্তে সিক্তবস্ত্রে যখন একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন বেলা হইয়াছে। হঠাৎ মনে হইল অধ্যাপক মহাশয় ও অন্যান্য ছাত্রেরা এতক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, এখনই যাইতে হইবে। হায়রে পৃথিবী শত বাধাবিঘ্নে পরিপূর্ণ, যাঁহারা আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের মত শত্রু আর জগতে নাই।

এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে যখন আমি আমার মনকে তাহার পথ হইতে সবলে টানিয়া আনিলাম, তখন অন্তরের মধ্যে যে বেদনা গুমরিয়া উঠিল, তাহা আমিই বুঝিয়াছি। টোলে উপস্থিত হইয়া অধ্যাপক মহাশয়ের তিরস্কার শুনিলাম, কোন কথা কহিলাম না। দ্বিপ্রহরের পর যখন পথ মাঠ, ঘাট নিস্তব্ধ হইয়া উঠিল, তখন ঘরটিতে একা একখানি মাদুর পাতিয়া শয়ন করিলাম, হু হু করিয়া বাহিরের বাতাস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সারাদিন দুঃখের ভাবনায় কাটিয়া গেল। বৈকালে অধ্যাপক মহাশয় আসিয়া বলিলেন, "বিভূতি আজ চক্রবর্ত্তী মশায়ের বাড়ী জন্মাষ্টমীর পূজাটা শেষ করে এস।"

আমি বলিলাম, "আমিত উপবাস করিনি, কাল হতে শরীরটা বড়ই অসুস্থ বোধ করছি।"

অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন, "কি, আজ জন্মাষ্টমী, উপবাস করনি? তোমরা ম্লেচ্ছ, অনাচারী।"

আমি বলিলাম, "আপনিই যদি ও কাজটা আজ শেষ করেন বড় ভাল হয়।"

অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন, "তোমাদের দুবেলা খাওয়াচ্ছি তবুও আমাকে খাটতে হবে? যাও তুমিই পূজা করবে, আমি যেতে পারব না।"

অধ্যাপক মহাশয় তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিলেন। কাজটা গোপনেই হইতেছিল, আমি কিন্তু তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। বলিলাম, "উপবাস না করে আমি কেমন করে পূজা করব?"

তিনি বলিলেন, "আমি বলছি তোমায় করতে হবে।"

আমি বলিলাম, "অশাস্ত্রীয় কাজ আমি করতে পারব না।"

আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম কখনই পূজা করিতে যাইব না। পূর্ব্বে উপবাস না করিয়া অধ্যাপকের আদেশমত অনেকবার পূজা করিয়াছি। পৃথিবীতে কেবল কঠোরতার ছবি দেখিয়া মনটাও কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল, সেইজন্য মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতিকে এতদিন ঘৃণা করিতে শিখি নাই।

অধ্যাপক মহাশয় খুবই চটিয়া গেলেন, কিন্তু কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন, আমিও চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

ইহার পর গুরু-শিষ্যের সাক্ষাৎ হইলে দুজনে পরস্পর কথা কহিতাম না। একদিন এক বন্ধুর অনুরোধে তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলাম।

পূর্ব্বের মত সবই চলিতে লাগিল। তবে অধ্যাপক মহাশয় সেই দিন অবধি আমাকে অন্যায় আদেশ করেন নাই। বেশ বুঝিতে পারিলাম—আমাকে মুখে ক্ষমা করিলেও তিনি অন্তরে আমার প্রতি খানিকটা ক্রোধ পোষণ করিতেছেন।

যাক—তাহার জন্য আমার বিশেষ ভাবনা হয় নাই। কেবল একখানা ছবি দিবারাত্র শয়নে স্বপনে, অবসরে অনবসরে আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইত।

অবসর পাইলেই সহপাঠীদের সঙ্গ ছাড়িয়া এদিকে সেদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। কেন বেড়াইতাম, তখন বুঝি নাই, এখন বুঝিতেছি—তাহাকে দেখিবার আশাই আমাকে পথের পথিক করিয়া তুলিত।

প্রায় একমাস কাটিয়া গেল, একদিনও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। অস্থির হইয়া পড়িলাম, ক্রমশঃ বাহিরে যাওয়া আসা বন্ধ হইল। নিরাশার বেদনা ও দুশ্চিন্তা আমাকে আকুল করিয়া তুলিল। অধ্যাপক মহাশয় হঠাৎ একদিন আমাকে বলিলেন, "বিভূতি, তোমার পরিবর্ত্তন দেখে বড়ই সুখী হলুম।"

ঠিক জানিনা—হয়ত অধ্যাপক মহাশয়ের উপর রাগ করিয়াই সে দিন দ্বিপ্রহরের সময় টোলের বহির্ভাগে আসিয়া দাঁড়াইলাম—অন্যের দোষারোপও সহ্য হয়, কিন্তু অধ্যাপকের সুখ্যাতিও অসহ্য—আমি বাহির হইলাম, মনে করিলাম—এমন কোন কাজ করিব যাহাতে তাঁহার নিকট হইতে সুখ্যাতি আর না শুনিতে হয়।

কোন্ দিকে যাইব ঠিক করি নাই। যে গলিতে সে প্রবেশ করিয়াছিল, দেখিলাম বহুদিন পরে আজ কিসের আশায় সেই গলিতেই প্রবেশ করিয়াছি। যেখানে আসিয়া থামিলাম সেখানে একটা বটগাছ কতকগুলি সিঁদুর মাখানো শিলা-খণ্ডকে আশ্রয় দিয়াছে। নিকটেই একটি বাড়ী।

চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। বাধাপ্রাপ্ত নদী কল কল ছল ছল করিয়া সবেগে যেমন আপনার পথ কাটিয়া উদ্দাম হইয়া ওঠে, সেই ভাবেই আমার পূর্ব্ব-কামনা আবার আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

ছাদের উপর একখানি কাপড় শুকাইতেছিল। তাহার দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। মনে করিলাম এই ডুরে কাপড় খানি পরিয়াই তাহাকে সে দিন স্নান করিয়া ফিরিতে দেখিয়াছিলাম। হায়রে মনে একটুও সন্দেহ আসিল না।

কাপড় খানির দিকে চাহিয়া আমার সাধ মিটিল না। মনে হইল—ওই কাপড় খানিও যদি পাই তাহা হইলে ওইটাকে বুকে চাপিয়া ধরি। অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কেবল তাহার মুখ খানি মনে পড়িতে লাগিল। কেবলই ভাবিতে লাগিলাম একবার তাহাকে দেখিতে পাইব।

সন্ধ্যার সময় টোলে আসিয়া বুঝিলাম—তাহার জন্য উৎকণ্ঠা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে।

এই ভাবে দিন কতক কাটিল। একদিন সকাল বেলা শীতের শেষে একটা নূতন ধরণের বাতাস হঠাৎ আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিল, আমি বুঝিলাম—আর গোপনে গোপনে তাহাকে দেখিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ানো চলে না, তাহাকে নিকটে পাইতে চাই, আমার আঁধার হৃদয় তাহারি হাতে দীপান্বিত হইয়া উঠুক।

টোলের ছাত্রেরা স্নানের পর যে যাহার কাজে বাহির হইয়া গিয়াছে। তখনও আমি চুপ করিয়া বসিয়া আছি, নিকটের আমগাছটির মুকুলের গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কে একটি অপরিচিতা বৃদ্ধা আমাকে বলিল, "হাঁগা বাবা আমাদের বাড়ী পুজো করতে পারবে?"

আমি বলিলাম, "আমার শরীর ভাল নয় বাছা।"

সে বলিল, "না বাবা, করতেই হবে, আমি কোন বামুনকে এখানে খুঁজে পেলুম না।"

আমি ভাবিলাম, কি আপদ, বুড়ী কথা শোনে না কেন? জোর করিয়া বলিলাম, "আমি পারব না, তুমি যা হয় করগে যাও।"

বুড়ী বলিল "বাবা, সরস্বতী ঠাকুরের পুজো তোমরা পোড়োরা করবে না ত কে করবে? তোমার পায়ে পড়চি বাবা, চল। লোক পাচ্ছিনি, পেলে বাবা তোমায় কষ্ট দিতাম না।"

বুড়ী ছাড়িবার পাত্র নয়, তাহার আকুলতা দেখিয়া কতকটা দয়ারও উদ্রেক হইল, বলিলাম, "অপেক্ষা কর, স্নান করে আসি।"

স্নান করিয়া প্রায় একঘণ্টা পরে টোলে ফিরিয়া দেখিলাম বুড়ী রাস্তার উপর পায়চারি করিতেছে। বলিলাম, "তুমি বসে একটু বিশ্রাম করতে পারতে।"

বুড়ী কথা কহিল না, আমি পট্টবস্ত্র পরিয়া নামা-বলীটা গায়ে জড়াইলাম, তারপর বুড়ীকে বলিলাম, "চল বাছা—চল।"

বুড়ী অগ্রসর হইল। আমি তাহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলাম।

পূজা করিতে হইবে বলিয়া কতকটা বিরক্ত হইয়াছিলাম, নানা চিন্তা মনটাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল—সেই জন্য কোন্ পথে যাইতেছি, তাহা ভাল করিয়া দেখি নাই।

বুড়ী যখন বলিল, "এস বাবা ঘরে এস," তখন চমকিয়া উঠিলাম—সম্মুখে চাহিয়া দেখি একটা বিপুল বটগাছের নীচে সিঁদুরমাখানো কতকগুলা শিলাখণ্ড। সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। দেখিলাম, সেই বাড়ীখানা যাহার কাছে অদম্য বাসনা লইয়া বহুদিন দাঁড়াইয়াছি, যাহার প্রতি জানালা, প্রতি ইষ্টকখণ্ড পর্য্যন্ত আমার প্রাণের মধ্যে তাড়িত সঞ্চার করে, সেই বাড়ীটার দুয়ারে দাঁড়াইয়া বুড়ী বলিতেছে, "এস বাবা ঘরে এস, মেয়ে এখনও জল খায় নি।"

মেয়েটি কে—তাহা নিমেষের মধ্যে বুঝিয়া লইলাম।

গৃহে প্রবেশ করিলাম। তখন আমি আত্মহারা, কি করিতেছি জ্ঞান নাই। পূজার ঘরে আসিয়া উপবেশন করিলাম।

গন্ধপুষ্প, উপকরণ, দেবীপ্রতিমা কিছুরই অভাব ছিল না। মন্ত্র পাঠ করিলাম, মন্ত্র মাঝে মাঝে ভুলিয়া যাইতেছিলাম, কেননা যে তরুণী পূজার আয়োজন করিয়া দিতেছিল, তাহার প্রতিই আমার প্রাণ আকৃষ্ট হইতেছিল। ধ্যানে সরস্বতী মূর্ত্তি ভাবিতে গিয়া মানসপটে তাহারই ছবি আঁকিতেছিলাম। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেখিতেছিলাম সে কি করিতেছে। হঠাৎ মনে হইল—সে যেন আমার মুখপানে চাহিয়া আছে। দেবীর ধ্যান আর হইল না! আমি চক্ষু চাহিলাম—দুই চক্ষু তাহারই দুইটি চক্ষুর সহিত মিলিত হইল। সে মুখ অবনত করিল।

পূজা ঠিক করিতে পারিলাম কি না জানি না, তবে পূজা শেষ করিলাম। মধ্যাহ্ন-ভোজন সেখানেই শেষ হইল, পরিবেষণ করিল সে নিজে।

আহারান্তে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় সে আমার দুটি পা জড়াইয়া ধরিল, বলিল, "ক্ষমা করুন, আমি অপরাধিণী।"

আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম, কোন কথা বলিতে পারিলাম না। সে ব'লল, "আমি অপরাধিণী, ক্ষমা করুন।"

বর্ত্তমান অবস্থা আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। বলিলাম, "কেন? কি অপরাধ?"

সে বলিল, "এ বাড়ীতে আপনাকে আনিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "কেন? তাতে দোষ কি?"

বুড়ী দূরে দাঁড়াইয়া ছিল,সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "না গো বাবাঠাকুর, তুমি ঘরে যাও, কি করব, বামুন পাইনি, তাই তোমায় ডেকে এনেছি।"

ব্যাপারটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু যখন সে বুড়ীর দিকে সক্রোধে মুখ বিকৃত করিয়া চাহিল, তখন আমি ভাবিলাম এ কি পতিতার বাড়ী পূজা করিতে আসিলাম না ত?

সব সন্দেহ মিটিয়া গেল। সে বিষণ্ণভাবে অতি ধীরে ধীরে বলিল, "আমি পতিতা, আপনাকে দেখেছি, আপনি কে আমি জানি, এ বাড়ীতে আপনি পূজো করতে আসবেন, একথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। একটু আগে জান্‌লে—"

আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, তবুও তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলাম, "আপনার আমার দেবতা একই, আমার বাড়ীতে যদি তাঁকে পূজো করতে পারি, আপনার বাড়ীতেই বা তা করব না কেন?"

স্পষ্ট দেখিলাম তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, উদ্বেগের চিহ্ন ক্রমশঃ মিলাইয়া যাইতেছে। সে আমার মুখপানে চাহিল। আহা! সে চাহনি আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না।

আমি বলিলাম, "আমার দেবতা সর্ব্বত্রই আছেন, তাঁর কাছে এ বাড়ীও যা পুরীর জগন্নাথক্ষেত্রও তাই।"

তাহার মুখে কেবল একটা বিষণ্ণতার ছায়া দেখিয়া আসিয়াছি, আজও তাহা দেখিতেছিলাম। এখনও

ইয়া বর্ত্তমান জগতে টানিয়া আনিল। এখন বুঝিলাম —আমি অভিসন্ধি বাহির হই নাই। আমি যেখানে আসিয়াছি সেখানে আছে একজন গুরু আর একটি একান্ত অনুগত শিষ্যা।

সে বলিল, "আপনি আসিবেন বলিয়াছিলেন, কই আসেন নি ত।"

আমি বড়ই সঙ্কুচিত হইলাম। তাহার একটি কথা আমাকে মিথ্যাবাদী ও অপরাধী করিয়া তুলিল, আমি ভাবিলাম—এতদিন না আসিয়া নিতান্ত কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছি।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। সে বলিল, "আপনিই আমাকে আশা দিয়েছেন তাই বাঁচ্তে চাই; বাঁচ্তে হলে আপনাকে না দেখে আমি থাক্তে পার্ব না।"

আমি বলিলাম, "আপনাকে বাঁচ্তেই হবে, আপনার জীবন বৃথা একথা কেহ বলে নাকি?"

সে স্তম্ভিত হইয়া আমার মুখপানে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সে আত্মকাহিনী প্রকাশ করিল।

তাহার নাম মাধবী, সে পিতার একমাত্র কন্যা। কন্যাটিকে পিতা যথাসময়ে একটি ধনীর সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করেন। তাহার ধারণা ছিল সে ধনী স্বামীকে লাভ করিয়া সুখী হইবে।

কিন্তু বিবাহের কিছুকাল পরে কন্যা বুঝিল—স্বামীর সহিত ঘর করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। স্বামীর যে বিশেষ কোন দোষ আছে তাহা নয়, তবে দুজনের মত, দুজনের চাল চলন সম্পূর্ণ বিপরীত। একদিন কন্যা কাঁদিয়া কাটিয়া বাপের বাড়ী আসিল, আর শ্বশুরবাড়ী যাইতে চাহিল না।

বাপের বাড়ীতেই তাহার সেই সময় আসিল যখন মানুষ কোনমতেই আপনাকে চাপিয়া রাখিতে পারে না, যখন প্রতিক্ষণে বাসনা উন্মত্ত হইয়া উঠে, ও তাহাকে চাপিতে গেলে অন্তর বেদনায় ভরিয়া যায়। এই সময় সে ভাসিল—বাড়ীর সীমা অতিক্রম করিয়া যেদিন সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, সেদিন ভবিষ্যতে কোথায় আশ্রয় পাইবে, কে তাহাকে আপনার পার্শ্বে স্থান দিবে, তাহা সে ভাবিয়া দেখিল না, বর্ত্তমানের উন্মাদনায় বিহ্বল হইয়া আপনাকে ও আপনার জ্ঞান-বুদ্ধিকে ভুলিয়া গেল।

একদিন সে দেখিল, যাহাকে বিশ্বাস করিয়া সে গৃহের সীমা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহারও নিকট সাবধানে থাকিতে হইবে, কেন না যখন তখন সে তাহার অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে চায়। প্রথম প্রথম সে কিছুতেই আপনার অলঙ্কার তাহার হাতে তুলিয়া দিত না কিন্তু তারপর তাহার মত পরিবর্ত্তিত হইল।

যে বর্ত্তমানের একমাত্র সঙ্গী, পিতামাতা স্বামী ও আত্মীয় পরিত্যাগ করিয়া যাহাকে একমাত্র আশ্রয়রূপে মানিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করা মাধবীর কাছে হঠাৎ নিতান্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হইল। সে তাহার অলঙ্কারগুলি একে একে সঙ্গীর হাতে তুলিয়া দিল। সে এ কথাও মনে করিয়াছিল যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া রিক্ত অবস্থায় যে দিন সে সঙ্গীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইবে, সেদিন হয়ত ধর্ম্মের খাতিরে সে একান্ত আশ্রিতাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।

হায়রে ধর্ম্ম, পৃথিবীতে ধর্ম্ম যদি থাকিত তাহা হইলে এত অত্যাচার কেন? একটা অন্ধকার রাত্রে যখন সমগ্র পৃথিবী সুপ্ত, তখন মাধবী সঙ্গীর পা-দুটি জড়াইয়া বলিল, "ওগো, আমাকে ছাড়িয়া যাইও না।" তবুও সেই নরপিশাচ তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তাহাকে বিশাল বিশ্বে নিরাশ্রয় অবস্থায় একা ফেলিয়া চলিয়া গেল। দুদিন উপবাসের পর এই বুড়ী তাহার সন্ধান পাইয়া আপনার গৃহে লইয়া আসে। প্রতিদিন সে তাহাকে পণ্যস্ত্রীর ব্যবসায় আরম্ভ করিতে অনুরোধ করে, কিন্তু তাহার মনে আর পাপ নাই।

সে অবলা, কি করিবে। যাঁহারা সবল, তাঁহারাও যে প্রবৃত্তিকে দমন করিতে পারেন না। সে অশিক্ষিত অজ্ঞান; যাঁহারা শিক্ষিত ও জ্ঞানী তাঁহারাও যে ভ্রমে পতিত হন। সমাজ তাঁহাদের শাসন করিতে পারে না, তাহার যত বীরত্ব দুর্ব্বল রমণীর কাছে।

সমাজ, ধর্ম্ম বা ন্যায় শুধু দুর্ব্বলকেই বাঁধিবার জন্য, বলীরা স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ইহাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

জানি তুমি তর্ক করিবে, কথার ফাঁদে ফেলিয়া আমাকে মহাপাপী প্রমাণ করিবে। আমি যাহা শুনিয়াছি বা পড়িয়াছি তাহা লিখি নাই; যাহা বুঝিয়াছি, প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি।

তাহাকে বলিলাম, "তুমি কি তোমার স্বামীর কাছে যেতে ইচ্ছা কর?" এই প্রথম তাহাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিলাম।

সে বলিল, "তিনি দেবতা, তাঁহাকে আমি পূজা করি, তবে তাঁর কাছে এ মুখ নিয়ে আর দাঁড়াতে পার্‌ব না।"

দেখিলাম—তাহার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। যেন সে কলঙ্কের বোঝা লইয়া স্বামীর নিকটেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমি বলিলাম, "তুমি বলেছ—বুড়ী তোমাকে বড়ই অযত্ন করে—এখন তোমার উপায় কি?"

সে বলিল, "উপায় কি জানি না, তবে আপনার কথা আমার প্রাণে আশা এনে দিয়েছে—তা না হলে হয়ত আমি বুড়ীর কথামত কাজ করতুম।"

আমি বলিলাম, "তুমি যে খেতে পরতেও পাও না, তা তুমি না বল্‌লেও আমি বুঝ্‌তে পেরেছি।"

তাহার মুখচোখে সঙ্কোচের রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া সে বলিল, "আমি আমার অলঙ্কারগুলি সবই হারিয়েছি। আমার হাতে এখন একটি কড়িও নাই।"

হঠাৎ মনে হইল—সে কি আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করে? কিন্তু তাহার মুখে যে অনুতাপের কালিমা ও শান্ত কোমলতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা শুধু যে মন হইতে সে সংশয়টি দূরীভূত করিয়া দিল তাহা নহে, একটা নিতান্ত অসম্ভব কথা ভাবিয়া তাহার প্রতি অন্যায় বিচার করিয়াছিলাম বলিয়া একটু লজ্জা দিতেও ছাড়িল না।

আমি বলিলাম, "অলঙ্কারের মধ্যে ত দেখছি একটি আংটি মাত্র রয়েছে।"

সে আংটিটি আর এক হাতে চাপা দিল। যেন নিজের কাছেও সেটিকে লুকাইয়া রাখিতে চায়। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বলিলাম, "তুমি সুখী হও, সৎপথে থাক, কিন্তু এ আংটিতে তোমার ত বেশী দিন চলবে না?"

সে নিতান্ত সঙ্কোচের সহিত বলিল, "এ আংটি আমার স্বামীর দান।" আমি বুঝিলাম সে এটিকে কাছ-ছাড়া করিতে অনিচ্ছুক।

অপরাহ্ণে টোলে ফিরিলাম। কেবল আংটির কথাটা আমার মনের ভিতর তোলাপাড়া করিতে লাগিল।

এই ভাবে দু-একদিন কাটিয়া গেল। হঠাৎ একদিন পিতা আমাকে বাড়ীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

সেই দিন দ্বিপ্রহরের সময় টোলের চাবি বন্ধ করিয়া মাধবীর নিকট উপস্থিত হইলাম, বলিলাম, "বাড়ী যেতে হবে, হয়ত মাসখানেক দেরী হতে পারে, তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।"

সে অনেকক্ষণ নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর বলিল, "কি কথা?"

"যদি কিছু মনে না কর তাহলে বলি।"

মাধবী বলিল, "বলুন।" বলিলাম, "তোমার হাতে কিছু টাকা দিয়ে যেতে চাই।" সে বলিল, "আমি টাকা চাই না, আমি পাপী, আপনার পরিশ্রমের জিনিস নিয়ে আরও পাপী হব, আমাকে রক্ষা করুন।"

আমি বলিলাম, "আমি তোমার কাছে এ টাকা গচ্ছিত রাখলুম, আমাকে আবার ফেরত দিও।"

সে বলিল, "তবুও পারব না।"

তাহাকে বুঝাইলাম, বলিলাম তাহাকে নিকট-আত্মীয়ার মত দেখি, আমার দান গ্রহণ করিতে তাহার কোন প্রকার সঙ্কোচ হওয়া উচিত নয়। তাহার কম্পিত অবশ হাতটি হাতের উপর তুলিয়া লইলাম। দুখানি দশ টাকার নোট তাহার উপর রাখিয়া সেই কোমল স্নিগ্ধ হাতখানি চাপিয়া ধরিলাম। সে নীরবে

অবনত মুখে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি বাহিরে আসিতে আসিতে বলিলাম—প্রয়োজন হইলে যেন সে আমার গচ্ছিত টাকা হইতে খরচ করে। কাজগুলা নিমেষের মধ্যে শেষ হইয়া গেল।

* * * *

বাড়ীতে আসিলাম। মাধবী আমার অবর্ত্তমানে অর্থাভাবে কষ্ট পাইবে না বলিয়া প্রাণটা নিশ্চিন্ত ছিল। পিতা নানান্ কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। আমি সারাদিন পথে পথে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতাম। পিতা যে কাজের জন্য আমায় ডাকিয়াছিলেন, তাহা শেষ হইলেও আমাকে দুমাস বাড়ীতে থাকিতে হইল।

সময়ে সময়ে মনটা হু হু করিয়া উঠিত, বোধ হইত কি যেন আমার নাই, অথচ তাহা না পাইলে আমার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে। সন্ধ্যার সময় লোকেরা যে যাহার কাজ সারিয়া যখন সারাদিনের শ্রম ও দুঃখের ভার নাশ করিবার জন্য আকুল ভাবে গৃহপানে ছুটিয়া আসিত, তখন ভাবিতাম—কেন তাহারা গৃহকে এত ভালবাসে। সঙ্গে সঙ্গে এক একটি গৃহের ছবিও আমার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিত—সে গৃহে পিতার তিরস্কার নাই, নিষ্ঠুরতা নাই, অশান্তি নাই; মাতার স্নেহ, পিতার উদারতা, ভ্রাতা ও ভগিনীর ভালবাসা তাহাকে রমণীয় শান্তিকুঞ্জে পরিণত করিয়াছে; সেখানে আরও একজন আছে—সে গৃহের সৌন্দর্য্য, গৃহের লক্ষ্মী—হায়রে, সে কে? তখন তাহাকে চিনিয়াছি—সে রমণী, গৃহিণী, নিরাশ হৃদয়ের আশা, হতশ্রীর সমৃদ্ধি, সর্ব্বদুঃখের শান্তি, পরিত্যক্তের আশ্রয়।

একদিন শুনিলাম—পিতা আমার বিবাহ দিতে চান্—খুব সহজ কথা, সকলেই বিবাহ করে—তাহাতে আবার ভাবনা কিসের? কিন্তু আমার অন্তরে কোথা হইতে কি একটা ভাবনা ঘনাইয়া উঠিল। কি ভাবনা ঠিক করিতে পারি না, তবে মাধবীর আংটির কথাটা প্রায়ই মনে পড়িত। আর একটা জিনিসের কথা মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মত অন্তরে চমক দিয়া যাইত, সে জিনিসটি আর কিছু নয়—সেটা মাধবীর সেদিনকার কোমল করস্পর্শ।

বিবাহের কথা লইয়া আলোচনা যখন বেশী মাত্রায় হইতে লাগিল, তখন একদিন পিতাকে বলিয়া ফেলিলাম, আমি বিবাহ করিব না।

পিতা ভয়ানক রাগিয়া গেলেন, চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তবে রে বেটা, আমার কথা শুনবি না? দুর হ, এখনই দুর হয়ে যা।"

পিতা হয়ত মনে করিয়াছিলেন তাঁহার কথাটা পুত্র পালন করিবে না। পুত্র কিন্তু পরদিন পিতার কথা-মতই কাজ করিয়া বসিল।

সকালে বাড়ী ছাড়িলাম। প্রথমে ভাবিলাম কোথায় যাইব? তারপর ভাবিতে হইল না। টোলে আসিয়াই উপস্থিত হইলাম।

অধ্যাপক মহাশয়কে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

পরদিন মধ্যাহ্নে একবার ভাবিলাম—মাধবীর নিকট যাইব। অমনই কোথা হইতে একটা সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হইল।

কোন দিন একথা আমি ভাবি নাই—এতদিন তাহাকে শিষ্যার মত দেখিয়াছি। তাহার কাছে যখনই দাঁড়াইয়াছি, তখনই গুরুর গাম্ভীর্য্য আমার অন্তর ভরিয়া দিয়াছে। আজ এ সঙ্কোচ কোথা হইতে আসিল? আমার পুরাতন সম্পর্ক কি শিথিল হইয়া গিয়াছে?

তবুও চলিলাম। পথে লোকজন নাই—চারিদিক নিস্তব্ধ—বহুদূর হইতে কেবল একটা চাতকের ক্ষীণ শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। আমি অগ্রসর হইলাম।

সেই পরিচিত গৃহের নিকটে আসিলাম। প্রবেশ করিতে খুব সঙ্কুচিত হইলাম, তবুও আপনাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলাম না, কিসের একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম।

ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম—সে সম্মুখে

দাঁড়াইয়া আছে—তাহার পরিধানে একখানি লাল তিন পেড়ে শাড়ী—সুন্দর হাতটিতে দুগাছি কাঁচের চুড়ি চিকমিক করিতেছে। মাথায় কাপড় আছে, তবে মুখখানি স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। হায়রে, তাহাকে দেখিতে ঠিক কুলবধূর মত, তাহার মুখখানি, তাহার দাঁড়াইবার ভঙ্গী ঠিক লক্ষ্মীর মত। তাহার দিকে চাহিতেই আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল! সেও আমার পানে চাহিল। সে দৃষ্টিতে যে কি একটা অপূর্ব্ব ভাব অস্ফুট অথচ দীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না।

আমি উপরে উঠিয়া একটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মাধবী ধীরে ধীরে আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, তারপর ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল আছ?" সে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে ভাল আছে। দু চারিটা কথা কহিলাম, কিন্তু বেশ বুঝিলাম প্রাণের কথা একটিও এখনও বলা হয় নাই।

অন্য দিন গুরুর মত তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। গুরুর গৌরবে মাতিয়া উঠিয়া তাহার সহিত বন্ধুর মত আলাপ করিতে উৎসুক হই নাই। আজ সেই গুরুর গৌরব আমার কাছে গুরুভার বলিয়া মনে হইল। আমি আজ বন্ধুর মত তাহার সহিত কথা কহিতে চাহিলাম। কিন্তু ভাষা মিলিল না। আমার শত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল।

কোন কথা বলিবার অবকাশ না পাইয়া মানুষ প্রার্থিতের দর্শন লাভ করিয়াও যেমন ফিরিয়া আসে, সেই রূপ ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ সে বাহিরে চলিয়া গেল।

আমি এদিকে-সেদিকে পায়চারি করিতেছি; ইচ্ছা একবার তাহাকে দেখিয়া যাইব, এমন সময় সে একটি টাকার থলি আমার হাতে দিয়া বলিল, "আপনার গচ্ছিত টাকাগুলি আমার কাছে ছিল।"

বলিবার অনেক কথা ছিল, কিন্তু বলিতে পারিলাম না; থলিটা হাতে দিবার সময় দেখিলাম তাহার অনামিকায় সেই অঙ্গুরীটি ঝক্‌মক্ করিতেছে। আমি থলিটি লইয়া নিঃশব্দে বাহিরে আসিলাম। মনে হইল আমার যাহা প্রাপ্য, তাহা সবই বুঝিয়া পাইয়াছি। এ বাড়ীতে আসিবার প্রয়োজন সবই ফুরাইয়া গিয়াছে।

কেবলই আংটির কথাটা মনে পড়িতে লাগিল। থলি খুলিয়া দেখিলাম—মাধুরী একটি টাকাও খরচ করে নাই। আর কি? সবই ত মিলিয়াছে। এই থলিটি তাহার আমার মধ্যে এতদিন একটা বন্ধনের কাজ করিয়াছে, আজ তাহা ফিরাইয়া লইয়াছি; সকল বন্ধন আজ কাটিয়া গিয়াছে।

টোলে ফিরিলাম, কেবলই সেই আংটিটা চোখের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মনে করিলাম—গুরু হইতে চাই না, তাহার বন্ধু হইতে চাই; সে প্রস্ফুটিত কমলের মত, আমি মধুকরের মত সারাজীবন তাহার আশে পাশে শুধু ঘুরিয়া বেড়াইতে চাই, সে আংটিটা খুলিয়া ফেলুক।

সত্য সত্যই তাহার আংটিটা মন্ত্রপূত। আংটিটা দেখিলে আর তাহার কাছে একদণ্ড তিষ্ঠিতে পারি না। আগে পারিতাম, তখন গুরু ছিলাম। হায়, গুরুত্ব আমার কাছে এখন বিস্ময় হইয়াছে!

দুইদিন মাধবীর সহিত দেখা করিতে পারিলাম না। তিন দিনের দিন দ্বিপ্রহরে পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

ভাবিলাম সে ত আমাকে তাড়াইয়া দেয় নাই, তবে যাইব না কেন?

চলিলাম, কিন্তু প্রতিপদে আজ চমকিতে হইল। মনে হইতে লাগিল সকলেই যেন আমার মনের নিভৃত কথাটিও বুঝিয়া লইয়াছে।

ধীরে ধীরে মাধবীর গৃহে প্রবেশ করিলাম। সে নীচেই দাঁড়াইয়া ছিল, আমাকে দেখিয়াই সে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল। দেখিলাম তাহার মুখে একটা অনন্দের দীপ্তি, তাহার চুলগুলি তখনো এলানো। আমাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার সময় কতকগুলি চুল মুখের উপর, কতকগুলি স্কন্ধে বক্ষে ছড়াইয়া পড়িল। আমি তাহাও দেখিলাম।

প্রণামের পর আজও মুখ ভার করিয়া উপরে উঠিলাম, কিন্তু অন্তরে একটা বেদনা অনুভূত হইল। গুরুর মত নিঃসঙ্কোচে তাহার প্রণামটা গ্রহণ করিবার শক্তি আমার যে আর নাই তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না।

হঠাৎ মনে হইল তাহার মুখে একটা আনন্দের জ্যোতি দেখিলাম কেন? সে কি আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করে?

ঘরে বসিয়া আছি, ভাবিতেছি এখনও সে আসিতেছে না কেন। সে কি আমাকে দেখিয়া লজ্জিত হয়?

সামান্য শব্দটিও আমি কান পাতিয়া শুনিতেছিলাম, কেবলই মনে হইতেছিল এইবার সে আসিতেছে। হঠাৎ বোধ হইল কে যেন সোপান দিয়া উঠিতেছে, কে বোঝা যায় না—তবুও মনে হইল এইবার মাধবী আসিতেছে।

একটু :পরেই দেখিলাম যাহা ভাবিয়াছি তাহাই ঠিক। মাধবী আমার নিকটেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যদিন কথা কহিতে দ্বিধা বোধ করি নাই, আজ কিন্তু সঙ্কুচিত হইলাম।

সে বলিল, "আপনি এত দিন আসেন নি কেন?"

আমি বলিলাম, "বাড়ীতে কতকগুলো কাজ নিয়ে বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম।"

সে বলিল, "কি কাজে?"

তাহার বলিবার ভঙ্গীতে কথাটার গুরুত্ব অনুভব করিলাম। সে এমনভাবে কথা কহিল যেন সে কথাটা যতই গুরু হোক না কেন তাহার শুনিবার অধিকার আছে এবং আমিও তাহার সম্মুখে সে কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য।

বলিলাম, "বাবা অনেকগুলো কাজ করতে বলেছিলেন!"

মাধবী আবার পূর্ব্বের মতই বলিল "কি কাজ?"

ইচ্ছা হইল সব কথা প্রাণ খুলিয়া বলি, তাহার মুখে যে সরলতার আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেখিলে কে আত্মগোপন করিতে পারে? মনে হইল পৃথিবীর মধ্যে ইহারই কাছে সব কথা প্রকাশ করিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করিতে পারি।

অনেক কথা বলিলাম। শেষে ভাবিয়া দেখিলাম, যাহাতে আত্মগৌরব প্রকাশ পায়, এমন কথাই তাহাকে বলিয়াছি, যাহা দুর্ব্বলতার পরিচায়ক, তাহার একটিও প্রকাশ করি নাই।

এতদিন গুরু ছিলাম—সে আমাকে ছাড়াইয়া উঠিবে, এ আশঙ্কার লেশও ছিল না। আজ দেখিলাম সহসা সে মহামহিমায় মণ্ডিত হইয়া মনঃকল্পিতা সুরসুন্দরীর উচ্ছল লাবণ্যে আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া জীবনের যে অভাব সুদূর অতীত হইতে আজ পর্য্যন্ত জ্ঞানে-অজ্ঞানে, সুখে-দুঃখে, মিলন-বিরহে নিশিদিন অন্তরে পোষণ করিয়া আসিতেছি, তাহাই মিটাইবার জন্য চিরপ্রার্থিতা বরদাত্রীর মত স্বেচ্ছায় আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি তাহার নিকট দীন, অতি দীন, আত্মগৌরব প্রকাশ না করিলে আমার অস্তিত্ব যে লুপ্ত হইয়া যায়। আমি যে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি না, আমি যে আছি, সে কথাও যে ভুলিয়া যাই।

সে বলিল, "এত কাজ ছেড়ে আপনি চলে এলেন কেন?"

সত্য কথাটা আগেই প্রকাশ পাইতে চায়। বহু কষ্টে সেটাকে চাপিয়া রাখিলাম, কিন্তু কথাটার এর্ত্তিটা উত্তর ভাবিয়া পাইলাম না।

সে আবার সেই প্রশ্ন করিল। আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বলিয়া ফেলিলাম, "বাবা বিবাহ দিতে চান—সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি চলে এলুম।"

মাধবী চুপ করিল। হঠাৎ দেখিলাম—তাহার মুখের উপর একটা গাম্ভীর্য্যের ছায়া অল্পে অল্পে ঘনাইয়া আসিতেছে।

সে বলিল, "আপনি কি বিবাহ করেন নি?"

বলিলাম, "না।"

অনেক প্রশ্ন করিতে পারিত, হয়ত দু একটা তাহার মনেও আসিয়াছিল, কিন্তু কি জানি কেন সে

তাহা প্রকাশ করিল না। দেখিলাম সে ঈষৎ অবনত মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

উন্মুক্ত জানালা দিয়া একটা বাতাস মাধবীর অবগুণ্ঠন খুলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি মস্তক আবার অবগুণ্ঠনে আবৃত করিল। আমি দেখিলাম।

দেখিলাম তাহার সলজ্জ অনাবৃত মুখখানি, দেখিলাম তাহার চঞ্চল মৃণাল-বাহু, আর দেখিলাম তাহার অনামিকায় সেই উজ্জ্বল জ্বালাময় আংটিটি। আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল।

মাধবী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে আমি বলিলাম, "এখন তোমার কোন কষ্ট নাই?"

সে বলিল, "না"।

সংক্ষিপ্ত উত্তরটা ভাল লাগিল না। বলিলাম, "যদি তোমার অর্থের প্রয়োজন হয় বোলো।"

সে বলিল, "এখন আর প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না।"

আমি বলিলাম, "তোমার আংটিটিই সম্বল, ওটি যদি বিক্রয় কর, আমাকে বোলো, বেশী দাম যাতে হয় তার চেষ্টা করব।"

সে বলিল, "আমি ও আংটি বিক্রয় করব না।"

আমি কক্ষের বাহিরে আসিয়া ভাবিলাম—মাধবী কি আমার মনের ভাবটা বুঝিয়াছে? সে কি বুঝিয়াছে —আমি তাহাকেই চাই, আমার প্রাণ তাহারই কাছে বাঁধা?

যাই হোক্—আমি ধীরে ধীরে বাটির বাহিরে আসিলাম। আসিবার সময় মাধবী আমাকে অন্য দিনের মত প্রণাম করিয়াছিল কি না সেকথা মনে নাই।

টোলে ফিরিয়া আসিলাম। মাথায় একটার পর আর একটা ভাবনা স্রোতের মত আসিতে লাগিল। চোখের সাম্‌নে কেবলই দেখিতে লাগিলাম সেই আংটিটি। মাধবীকে পাইলে আমার জীবন সার্থক হয়, কিন্তু সেই আংটিটা আমার শত্রু, সেটাই ত তাহার ও আমার মধ্যে একটা দারুণ ব্যবধান সৃজন করিয়াছে।

মনে করিয়াছিলাম টোলে আশ্রয় পাইব, কিন্তু দু একদিন কাটিতে-না-কাটিতেই একটা প্রভাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় খুব গম্ভীর ভাবে আমাকে বলিলেন, "দেখ বিভূতি, তোমার বাবা পত্র লিখেচেন, তাঁর ইচ্ছা তুমি এখানেও থাকতে পাবে না।"

পরদিন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "আমি চল্‌লুম।" তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কি করি বাবা, আমার ইচ্ছা নয়, তোমার বাপের ইচ্ছা।"

যাহারই ইচ্ছা হোক, আমি চলিলাম, কোথায় চলিলাম তাহা প্রথমে ঠিক করিতে পারি নাই। হরিনাথ ঘটক একদিন আমাকে তাঁহার ছেলেটিকে পড়াইতে বলিয়াছিলেন, তাঁহারই বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, আমার মাসিক বেতন হইল কুড়ি টাকা।

কিছু দিন কাটিল; কেবলই মাধবীর জন্য প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। একদিন ভাবিলাম—কেন আপনাকে বঞ্চিত করি—শুধু খানিকটা সঙ্কোচ ও চক্ষুলজ্জার খাতিরে জীবনটাকে বিষময় করিয়া তুলি কেন?

সে দিন অপরাহ্নে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, পথে কাদা জমিয়াছে। আকাশের দিকে চাহিলেই মনে হয় আরো দুএক পসলা বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা। সে দিন মাহিনা পাইয়াছি—হাতে কুড়ি টাকা জমিয়াছে—এতগুলা টাকা কখনও একসঙ্গে হাতে পাই নাই।

সন্ধ্যার পর ছাত্রকে বলিলাম, "আমার বাইরে নিমন্ত্রণ আছে, ফিরতে হয়ত রাত হতে পারে।" ছাত্রের নিকট কথাটা খুবই ভাল লাগিল। আমি কাপড় জামা পরিয়া বাহিরে আসিলাম।

গাড়ী ঘোড়া ও লোকজনের যাতায়াতে পথ তখন খুবই কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে। আকাশ ভার ভার, মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে, বৃষ্টি আসিতে আর বিলম্ব নাই। লোক-বিরল পথটি নীরব—শুধু মাঝে মাঝে দু একটা আর্দ্র বাতাসের ফিস্ ফাস্ শব্দ শোনা যাইতেছে। স্তব্ধ অন্ধ রজনী আমার কাছে যেন একটা মূক বিরাট রহস্যের মত মনে হইতে লাগিল; মনে করিলাম যেন

সেই রহস্যের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইতেছি, মৌনমুগ্ধ ধরণীর কত যুগের কত বিরহের করুণ গান আমি শুনিতে পাইতেছি, তাহার হৃৎস্পন্দনটুকুও আমার অগোচর নয়।

ধীরে ধীরে পরিচিত গলিটির মধ্যে প্রবেশ করিলাম; অন্যদিন দুইদিকে অনেক পতিতা রমণীদের দেখিয়াছি। আজ কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। অগ্রসর হইলাম, সেই বটগাছটার নিকটে আসিয়া দেখিলাম, মাধবীর গৃহদ্বারে একটি রমণী দাঁড়াইয়া আছে। বুঝিলাম সেই মাধবী।

তাহাকে কখনও বারাঙ্গনার মত বাহিরে দাঁড়াইতে দেখি নাই। যাই হোক, নিকটে আসিয়া বলিলাম, "কে? মাধবী? তুমি এখানে দাঁড়িয়ে যে?"

সে আমার দিকে চাহিল। গ্যাসের আলোক মুখে পড়িতেই দেখিলাম তাহার নয়নে অশ্রুবিন্দু।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কাঁদ্‌চ? কেন?"

সে উত্তর দিল না, অবনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি গৃহে প্রবেশ করিলাম।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম, তবুও মাধবী আসিল না। ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম, কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম—মাধবী জড়সড়ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, যেন সে আমার সমক্ষে আসিতে নিতান্ত কুণ্ঠিত। আমি স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, তারপর বলিলাম, "মাধবী ভিতরে এস।"

মাধবী ধীরে ধীরে সেই ঈষৎ আলোকিত কক্ষটির মধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ সে অঞ্চলে মুখ আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর বসিল, আমি বলিলাম, "মাধবী, তুমি কাঁদ্‌ছিলে কেন?"

সে বলিল "বুড়ী আজ বড় রেগেচে, আমাকে তাড়িয়ে দিতে চায়।" কথার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্রন্দনের সুরও শুনিতে পাইলাম।

আমি বলিলাম, "তুমি কি তারই কথায় নীচে দাঁড়িয়েছিলে?"

মাধবীর বক্ষ স্পন্দিত হইতে লাগিল, অন্তর আলোড়িত করিয়া একটা রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস বাহিরে প্রকাশ পাইল।

আমি বুঝিলাম সে নিরাশ্রয় হইবার ভয়ে নিতান্ত অনিচ্ছায় বারাঙ্গনার মত দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিল। বলিলাম, "তুমি ভেব না, টাকা দিচ্ছি, বুড়ীকে দিও, তাহলে সে সন্তুষ্ট হবে।"

মাধবী কোন কথা কহিল না। বাহিরে কড়্ কড়্ শব্দে বজ্রাঘাত হইল। একটা ঈষৎ উন্মুক্ত জানালা দিয়া বিদ্যুতের আলোক দেখিতে পাইলাম। ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

আমি পকেট হইতে কুড়িটা টাকা বাহির করিয়া মাধবীর হাতে দিবার উপক্রম করিলাম। সে হাত পাতিল না, অঞ্চলে মুখ আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এবার তাহার রোদনধ্বনিও শুনিতে পাইলাম।

আমি তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিলাম। বলিলাম, "তুমি কেঁদ না, ভাবনা কি? এই নাও টাকা।"

সে উঠিল; তখনও আমি তাহার হাত ধরিয়া আছি। এই অবস্থাতেই সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওগো, তুমি আমাকে টাকা দিও না।"

সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, তাহার হাত ছাড়িয়া দিলাম। বলিলাম, "এ কি? এ কথা বল্‌চ কেন?"

সে অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিল, "আজ বুড়ীর কথায় ভয়ে ভয়ে বাইরে দাঁড়িয়েছিলুম, আজ যদি আপনি টাকা দেন, আমার মনে হবে আজ বুড়ীর কথা শুন্‌তে বাধ্য হয়েছি।"

আমি বলিলাম, "আর 'আপনি' নয়, 'তুমি' বলেই সম্বোধন কর। আমার টাকা তুমি নিবে না কেন? জান তুমি, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভিন্ন রকমের?"

হায়, এখনও মিথ্যাটাকে আঁকড়িয়া ধরিতে চাই। মাধবীর সহিত আমার সম্পর্কটা ভিন্ন রকমের হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন যে তাহা বদলাইয়া গিয়াছে।

মাধবী দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার হাতের আংটিটি ম্লান আলোকে একটা ভয়াবহ উল্কার মত ঝক্‌মক্

করিতে লাগিল, দৃশ্যটা সহ্য করিতে না পারিয়া চক্ষু ফিরাইয়া লইলাম। বলিলাম, "মাধবী, বুড়ীকে টাকা দেওয়া দরকার. তুমি টাকা নাও, আগে নিয়েছ, এখন নেবে না কেন ?"

মাধবী বলিল "এখন সময় বদ্‌লে গেছে ?"

"কি রকম ?"

"আগে তোমার কাছ হতে টাকা নিতে সঙ্কোচ হয় নি, আজ হচ্ছে।"

মাধবী চুপ করিয়া অঙ্গুলিতে আঁচলের খুঁট জড়াইতে লাগিল। আমি বলিলাম, "বেশ, তোমার আংটিটা আমাকে দাও, মনে কর আংটিটা বিক্রয় করে তুমি টাকা পেয়েছ।"

মাধবী বলিল, "ওগো চুপ কর. এ আংটি আর তুমি চেয়ো না।"

সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বৃষ্টি তখন থামিয়া গিয়াছে। চারিদিকের স্তব্ধতা তখন নিবিড় হইয়া আমার বুক চাপিয়া ধরিয়াছে। আমারও কণ্ঠরোধ হইয়াছিল, কথা কহিতে পারি নাই।

অনেকক্ষণ পরে সহসা মাধবী মাথা তুলিয়া বলিল, "সত্য করে বল—আমার আংটিটা তুমি বার বার চাও কেন ?"

তাহার দীপ্ত মুখপানে চাহিতেই মনে হইল—সে যেন আমার অন্তরের অন্তরতম কথাটিও বুঝিয়া লইয়াছে। আমি কোন উত্তর দিতে পারিলাম না, কেবল তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম।

আমার শিরায় শিরায় তাড়িত প্রবাহিত হইতেছিল। উত্তর দিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু একটি কথাও বলিবার শক্তি তখন অন্তর্হিত হইয়াছে।

অনেকক্ষণ পরে উঠিলাম। কক্ষের বাহিরে আসিয়া বলিলাম "মাধবী, আজ আসি।"

মাধবী বলিল, "রাত্রি অনেক হয়েছে, আজ না হয় তুমি এখানেই থাক।"

থাকিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু থাকিতে সাহস করিলাম না। পরের বাড়ীতে থাকি, একরাত্রি না আসিলে তাহারা কিছু মনে করিতে পারে।

কিন্তু হায়, মাধবী যদি আর একটিবারও ঐ কথাটি বলিত, তাহা হইলে কোন মতেই সে আদেশ উপেক্ষা করিতে পারিতাম না।

যখন দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন একটা ঠাণ্ডা বাতাস আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিল। স্তব্ধ অন্ধকার রাত্রি. গ্যাসের আলোটা সে অন্ধকার ভেদ করিতে পারে না, কতকগুলা অস্পষ্ট প্রবল ভাবনা অন্তরে চাপিয়া পথে পা দিয়াছি, এমন সময় সহসা কাহার করস্পর্শ অনুভব করিলাম। চাহিয়া দেখিলাম মাধবী আমার হাত ধরিয়াছে। তাহার হাতের আংটিটা ধারাল ছুরিকার মত ঝক্ মক্ করিয়া উঠিতেছে। আমি স্তম্ভিত হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম।

মাধবী কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "টাকা নিলুম না বলে তুমি কি দুঃখিত হলে ?"—মুখ দিয়া বাহির হইল, "না"।

মাধবী আবার বলিল, "কাল একবার আস্‌বে, আমার কতকগুলো কথা আছে।"

বলিলাম, "আসবো।"

আকাশের মেঘপুঞ্জ একদিক হইতে উড়িয়া আসিয়া আর একদিকে জমিতেছিল, আমি কাঁপিতে কাঁপিতে হরিনাথ বাবুর গৃহদ্বারে যখন করাঘাত করিলাম, তখনও হাতের উপর মাধবীর করস্পর্শ স্পষ্ট অনুভূত হইতে লাগিল।

দরওয়ান উঠিল, মনে মনে নিশ্চয়ই সে আমাকে গালাগালি দিতে ছাড়িল না। আমি নিঃশব্দে আমার নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিলাম। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না।

পরদিন আহারাদির পর বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলাম। মনে হইতেছিল হয় ত মাধবীর মন ফিরিয়াছে, আমার কামনা বিফল হইবে না। কিন্তু মনটাকে কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কেবলই

ভাবিতে লাগিলাম মাধবী আমাকে কি কথা বলিতে চায়।

কখনও আশা, কখনও নিরাশা পর্য্যায়ক্রমে আমাকে আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। বৈকালে হরিনাথবাবু বলিলেন, "কাল আপনার ফিরতে খুব দেরী হয়েছিল, ছেলেটার পড়া হয় নি, এমন হলে কেমন করে চল্‌বে ?"

আমি বলিলাম, "কাল একটা নিমন্ত্রণ ছিল।" আজ আর মিথ্যা কথা বলিতে একটুও দ্বিধা করিলাম না।

হরিনাথ বাবু চলিয়া গেলেন। আজও যে মাধবীর নিকট যাইতে হইবে সেজন্য ছুটির কথাটা তাঁহাকে বলিতে সাহস হইল না।

সন্ধ্যার পর ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার বাবা বাড়ী আছেন ?"

ছাত্র বলিল, "না।"

আমি বলিলাম "আজও আমি বাইরে যাব, আজও একটা নিমন্ত্রণ আছে।"

ছাত্র নিশ্চয়ই আনন্দিত হইল। আমি বাহিরে আসিলাম—ভাবিলাম—মনিব যাই বলুন না কেন, মাধবীর নিকট আমাকে যাইতেই হইবে, তাহাতে যদি চাকুরী যায়, কি করিতে পারি ?

সেদিনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ; তবে সমস্ত দিন বৃষ্টি হয় নাই। যখন মাধবীর গৃহের নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি নামিল।

আজ গৃহদ্বারে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। গৃহে প্রবেশ করিতেই একটা নীরবতার বিষণ্ণতা আমার প্রাণমন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

উপরে সেই পরিচিত কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম সেই কেরাসিনের আলোটা অবিরল ধূম উদ্গীরণ করিতেছে। মেঝের উপর মাধবী চুপ করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে।

গৃহের নীরবতা, অনুজ্জ্বল আলোক, বাহিরের মেঘাবৃত আকাশ ও এই চিন্তাকুল, অবসন্ন রমণী আমার চক্ষের সম্মুখে কোন এক বিষণ্ণ রহস্যময় জগতের ছবি প্রসারিত করিয়া দিল।

মাধবী একবার মাথা তুলিয়া আমার দিকে চাহিল—দেখিলাম একটা দারুণ দুশ্চিন্তা তাহার মুখে চোখে কালি ঢালিয়া দিয়াছে।

আমি সেই ঘরেই চেয়ারের উপর বসিলাম। দুজনেই নীরব, নিস্পন্দ।

আমার মনে হইল যেন স্বপ্ন দেখিতেছি। মাধবীর মাথায় কাপড় আছে, কিন্তু তাহার মুখটি সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইতেছি। এমন করিয়া চাহিয়া দেখিবার অবসর কখনও আমার ঘটিয়া উঠে নাই। আমার দৃষ্টি সার্থক, জীবন সার্থক। মনে করিলাম এমনই করিয়া চাহিয়া চাহিয়াই যেন এ জীবন শেষ হইয়া যায়।

মাধবী উঠিল, যন্ত্রচালিতের মত ধীরে ধীরে আমার নিকটে অতি নিকটে, আসিয়া দাঁড়াইল, তারপর ধীরে ধীরে আমার হাতে তাহার আংটিটি পরাইয়া দিল। আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। যে ঘটনাটা ঘটিয়া গেল, তাহা এতই বড়, এতই ঈপ্সিত যে তাহা ভাবিবার সাহসও আমার হইল না, মনে করিলাম—ভাবিতে গেলে কাঁদিয়া ফেলিব।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম, কিন্তু মাধবী আমার সম্মুখে ঋজুভাবে দণ্ডায়মান হইল, তাহার মুখ চোখের আকস্মিক দীপ্তি দেখিয়া বুঝিলাম সে কথা কহিবে—তাহার অন্তরের অন্তরতম অপ্রকাশ্য কথাগুলি সব বাধা অগ্রাহ্য করিয়া নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করিবে।

মাধবী বলিল, "আজ হতে এ আংটি তোমার।" আমি তখন নিস্পন্দ, বুঝিয়া উত্তর দিবার সামর্থ্য নাই। তবুও মুখযন্ত্র হইতে আপনি বাহির হইল, "কেন এ কথা বল্‌চ ?"

মাধবী বলিল, "আমি অনেকদিন মনের সঙ্গে ঝগড়া করিচি আর পারি না ; একদিন ভোর বেলা গঙ্গা নাইতে যাবার সময় তোমাকে দেখেছিলুম, আর একদিন স্নান করে উঠে আসবার সময়।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। সে বলিল, "তারপর তোমাকে দেখবার জন্যে এদিকে সেদিকে অনেকবার চেয়ে দেখেচি।"

আমার অন্তরের মধ্যে রুদ্ধ আবেগ কেবলই গুমরিয়া উঠিতে লাগিল, কথা কহিতে পারিলাম না।

সে বলিল "তারপর তুমি এলে—গুরুর মত আমাকে আশা দিলে; আমার পাপপথের সঙ্গী সর্ব্বস্ব গ্রহণ করলেও যা অপহরণ করতে পারে নি, সেই, আংটি-টির দিকে চেয়ে আমি বুক বাঁধলুন।"

আমার মনে হইল—আমি যেন বিচারালয়ে দাঁড়াইয়াছি, একটা গুরুতর অপরাধের জন্য আমার বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

মাধবী বলিল, "তারপর তুমি বার বার অনুরোধ করে সে আংটি চেয়ে নিলে; শুধু আংটি কেন তুমি যে আমাকেও চাইলে সে কথা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি।"

আমি বলিলাম "আমি ত তোমাকে কোন কথা বলিনি।"

মাধবী বলিল "তুমি বল নি, তোমার মুখ বলেচে, তোমার চোখ বলেচে।"

আর আমি কথা কহিতে পারিলাম না।

কিছুক্ষণ পরে মাধবী আবার বলিল "আমি বিচার শক্তি হারিয়েছি—বল এখন আমার পথ কোথায়?"

আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, তারপর বলিলাম, "তোমার যা ইচ্ছা তাই তুমি করতে পার।"

মাধবী দৃঢ়স্বরে বলিল, "এখন আমাকে এতদূর এনে এত সহজে কথা কইলে বলবে না। তোমার কথা অবজ্ঞা করবার শক্তি আমার নাই—অনেক ভেবে দেখেচি।"

একটা ঝড় উঠিয়াছিল। এই বার বৃষ্টি নামিল। মাধবী নিকটে আসিয়া আমার পাদুটি জড়াইয়া ধরিল, বলে, "ওগো আজ আমি রিক্ত, আমার পথ কোথায় বলিয়া দাও। তোমার একটি কথার ওপর আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।"

আমি বলিলাম, "মাধবী, তুমি ওঠ, একথার উত্তর কাল দিব, আমাকে ভাবতে দাও।"

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তারপর মাধবীকে বলিলাম, "মাধবী, আজ আসি।"

মাধবী বলল, "নিশ্চয় এস, না এলে আমি হত্যাও করতে পারি।"

আমি ধীরে ধীরে কক্ষের বাহিরে আসিলাম, মাধবী আমার অনুসরণ করিল না। আমি একা নির্জ্জন অন্ধকার পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

রাত্রি কাটিল। প্রভাতে হরিনাথবাবু আমার হাতে একখানা পত্র দিলেন। দেখিলাম পিতার হস্তলিপি; এই সামান্য চাকরী করিতেছি, তাহাও তাঁহার সহ্য হয় নাই; তাই তিনি আমি দুশ্চরিত্র বলিয়া হরিনাথ বাবুকে সে চাকরীটিও ছাড়াইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

হরিনাথবাবুও আমাকে চলিয়া যাইতে বলেন, আমিও চাকরীটি ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত। তবে আমার কি উপায় হইবে তাহাও একটা ভাবিবার জিনিস; কিন্তু সে কথা ভাবিবার সময় নাই।

আজ মাধবীর ভাবনাটা চারিদিক হইতে আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। পৃথিবীর অনেক প্রাণীর মত সে বাসনার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে। কেহ তাহাকে আশ্রয় দেয় নাই। অন্যে পাপকাজ করিয়াও সংসারও সমাজে আশ্রয় পায়, এই অবলা রমণী আশ্রয় দূরে থাকু কাহারও সমবেদনার সামান্য আভাসটুকুও পায় নাই। সংসার ও সমাজ তাহার পাপটিকে নির্ম্মম-ভাবে বাহিরে প্রকাশ করিয়া লোক শিক্ষা দিতে চায়। জগতে কেহ তাহাকে সামান্য আশার কথাটিও শুনাইতে সাহস করে নাই।

আমি সে সাহস করিয়াছি, আমি তাহার মলিন মুখে হাসি ফুটাইয়াছি—তাহার কুসুমপেলব অন্তরে যে দারুণ বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহা নিবাইয়া দিয়াছি। সত্য সত্যই সে কুসুমের মত মৃদু, চাঁদের মত স্নিগ্ধ তাহাকে দেখিলে অন্তর সুধারসে ভরিয়া যায়। আমিই তাহাকে বল দিয়াছি—আমারই কথায় সে এখনও পৃথিবীর নিদারুণ মরুক্ষেত্রে জীবন ধারণ করিয়া আছে।

কিন্তু কেন তাহাকে আশা দিলাম কেন? আমার

জন্য। আমি তাহাকে চাই, তাহাকে না পাইলে আমার জীবন বৃথা।

সে যাহাকে জীবনের সঙ্গী মনে করিয়া সংসার, কুল, ধন সম্পদ, পিতামাতার স্নেহ, কুটুম্বের আত্মীয়তা স্বামীর ভালবাসা সবই ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, সে ছাড়িয়া গিয়াছে, যাইবার সময় তাহার যাহা কিছু ছিল সবই অপহরণ করিয়াছে। জানিনা কেমন করিয়া সে তাহার আংটিটি রক্ষা করিয়াছিল। তারপর যেদিন সে বুঝিল সে কি করিয়াছে সেদিন নিশ্চয়ই সে ঐ আংটিটি বুকে চাপিয়া অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে। একদিন সে বুঝিয়াছিল—এই বিশাল বিশ্বের মাঝখানে তাহার এই আংটিটি ছাড়া আর কোন সঙ্গী নাই। সে এখন স্বামীতে একান্ত অনুরক্ত বলিয়া এ আংটি কাছ ছাড়া করিতে চায় না তাহা নয়। সে স্বামীকে কখনও ভালবাসে নাই, আজিও বাসিবে না, তবে এই আংটিটি তাহার স্বামীর ভালবাসার নিদর্শন, ইহার সহিত তাহার অতীত ব্যর্থ বিবাহজীবনেরর গৌরব জড়িত আছে, এ আংটি তাহার দুঃখরজনীর সখা, তাহার বিপদের সহায়' তাহার হৃদয়ের শক্তি। সেই শক্তিরই উত্তেজনায় সে আজ এই পৃথিবীর বিশাল শুষ্ক নির্ম্মম মরুভূমির উপর আপনার জন্য একটা সুপথ বাছিয়া লইতে চায়। এমন আংটিটি আজ তাহার অপহৃত।

কে অপহরণ করিয়াছে? আমি। কেন করিয়াছি? এই আংটিই যে তাহার আমার মধ্যে দারুণ ব্যবধান সৃজন করিয়াছিল। আংটি পাইয়াছি, তাহাকে চাই বলিলেই হয়ত—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই—সে আমার হাতে হাত তুলিয়া দেয়। এখন তাহাকে কি করিতে বলিব! গুরুর মত তাহাকে আশা দিয়াছি, এখন নিজে কেমন করিয়া তাহাকে আবার বাসনার স্রোতে ভাসিয়া যাইতে বলি। সে আপনার পথ ধরিয়া চলুক, সে যাহা ইচ্ছা করে তাহাই করুক। কিন্তু আপনার পথ ধরিয়া চলিবার সামর্থ্য তাহার আছে কি?

কত ভাবিলাম, কিন্তু একটা সিদ্ধান্তে আসিতে পারিলাম না।

সন্ধ্যার পর বাহির হইলাম। চাকুরী গিয়াছে; সুতরাং? আর কাহারও অনুমতি লইলাম না?

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। একটা নূতন বাতাসের স্পর্শ অনুভব করিলাম। বুঝিলাম বসন্ত আসিয়াছে। জ্যোস্নালোকিত স্নিগ্ধ আকাশ আমার অন্তরে একটা বিমল শান্তির সঞ্চার করিতে লাগিল।

জানিনা কিসের ভাবনায় তন্ময় হইয়া ছিলাম। মনের মধ্যে নানা তর্কবিতর্ক ক্রমশঃ থামিয়া গেল। কি করিব, মাধবীকে কি উত্তর দিব তাহা মনে মনে ঠিক হইয়া গেল, আমি কিন্তু তাহা স্পষ্ট করিয়া তখনও জানিতে পারি নাই।

পৃথিবী একদিনে এতটা পরিবর্ত্তিত কেমন করিয়া হইল, তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। চারিদিকে একটা স্ফূর্ত্তি একটা আনন্দের আভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। রূপ, স্পর্শ ও গন্ধ আমার কাছে কোন সুদূর স্বর্গলোকের বারতা বহন করিয়া আনিল।

সেই বটগাছটার নিকটে খানিকটা অন্ধকার জমাট বাঁধিয়াছিল। সেই খানে দেখিলাম শুভ্রবস্ত্রে আচ্ছন্ন কে একজন রমণী দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া সে নড়িল। পত্রগুলার অন্তরাল হইতে খানিকটা জ্যোৎস্না একস্থানে পড়িয়াছিল, রমণী সেইখানে দাঁড়াইতেই তাহাকে চিনিলাম। চমকিয়া বলিলাম, "মাধবী, তুমি এখানে কেন?

মাধবী বলিল "আজ আর গৃহে থাকিবার অধিকার আমার নেই, বুড়ী আমাকে তাড়িয়ে দিয়াছে!

আমি কিছুক্ষণ দাঁড়াইলাম, তার পর বলিলাম "ভালকথা, এখানে আর দাঁড়িয়ে লাভ কি? এস।"

চলিলাম, নির্জ্জন আঁকা-বাঁকা গলির ভিতর দিয়া কোথায় চলিলাম কে জানে। আমারও চাকরী গিয়াছে, আশ্রয় কোথায় জানি না; আর এই অবলা, এও আজ পৃথিবীর মধ্যে কোথায় আশ্রয় পাইবে, তাহাও আমার অগোচর।

কিছু দূর আসিয়া একটা বড় রাস্তায় পড়িলাম।

দেখিলাম তাহার পাশেই গঙ্গার ঘাট, নিঃশব্দ, নির্জ্জন। চাঁদের আলোক তরঙ্গে তরঙ্গে ঝকমক্ করিয়া উঠিতেছে। উপরে বিশাল জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশ, নিম্নে স্তব্ধ পৃথিবী যেন কোন ভক্তিবিহ্বল আত্মহারা পূজারীর মত কোন্ অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশে একটা প্রাণভরা চিরন্তণ প্রণামে আপনাকে লুটাইয়া দিয়াছে। এদিকে সেদিকে বিক্ষিপ্ত তরুগুলির স্নিগ্ধ চিক্কণ পত্রাঞ্চল দক্ষিণ বাতাসে কাঁপিয়া উঠিতেছে। আমরা নিরাশ্রয় দুটি প্রাণী ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তার পর মাধবী বলিল, "আমার কথাটা একবার ভেবে দেখেছ কি ?"

আকাশ, পৃথিবী ও বায়ুর মধ্য দিয়া আমার অন্তরাত্মা কোন্ সুদূর কল্পনালোকে কিসের ভাবনায় তন্ময় হইয়াছিল বলিতে পারি না। কথাটা শুনিয়া সুপ্তোত্থিতের মত জাগিয়া উঠিলাম, বলিলাম "কি কথা ?"

মাধবী বলিল, "আমার সবই তোমাকে দিয়েছি ; এখন আমার উপায় ?"

আমি অঙ্গুরীটি খুলিয়া ফেলিলাম, বলিলাম "এ আংটি তুমি আমাকে দিয়েছ, এতে তোমার অধিকার নেই ; তোমাকে এটা ফিরিয়ে দেবারও প্রয়োজন নেই কেননা নিশ্চয়ই তুমি তোমার স্বামীকে ভালবাস না।"

মাধবী নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল।

আমি বলিলাম "এই আমি আংটিটাকে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিলুম।"—বলিয়া আংটিটা সত্যই আমি গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিলাম।

মাধবী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল ; তারপর ধীর অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, "যাক, এখন তবে বল—আমার পথ কোথায় ?" তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষণে-ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

আমি সেই স্রস্তকুন্তলা, ক্লিষ্টা, রমণীর দিকে একবার চাহিলাম ; আর দেখিলাম—পরিশ্রান্তা গঙ্গা অলস-মন্থর গমনে গদ্‌গদ্ নাদে তাহার গিরিনিবাস ত্যাগ করিয়া প্রার্থিতের মধ্যে আপনাকে নিঃশেষে বিলীন করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। আকাশের গায়ে উজ্জ্বল শুকতারাটি তাহার স্নিগ্ধকোমলজ্যোতির চক্ষু দিয়া এই গৃহহারা স্বজনত্যক্ত নিরুপায় মানবমানবীকে যেন স্নেহসম্নত নির্নিমেষ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছে। আকাশ বাতাস জলস্থল যেন একবাক্যে একতানে আমাকে বলিতে লাগিল—"একান্ত,পদাশ্রিত গতিহীনকে ত্যাগ করিও না, ত্যাগ করিও না।" আমি প্রকৃতির মধ্য দিয়া পরম দেবতার এই আদেশবাণী অশরীরী বাণীর মত শিরোধার্য্য করিয়া আমার প্রসারিত আলিঙ্গনের মধ্যে মাধবীকে জড়াইয়া ধরিলাম, বলিলাম "তোমার আমার আজ এই পথ, এবং এই পথই ঠিক পথ।"

মাধবী কথা কহিল না, ভূমিষ্ঠ হইয়া দুই হাতে আমার পদধূলি মস্তকে তুলিয়া লইল।

তারপর কি হইল, বন্ধু, সে কথা বলিতে চাই না। এখন তুমি আমাকে পাপী বল, আমি দুঃখিত হইব না ; আজ বিদায়, ইতি।

তোমার
বিভূতি

ঐতিহাসিক বন্ধু বলিলেন "একটা গল্প শুনিয়ে দিলে দেখছি।"

আমি বলিলাম "যাই হোক, আপনি গত পঞ্চাশ বৎসরের কলিকাতার ইতিহাস লিখ্‌ছেন ত ? এ গল্পে তার অনেক উপকরণ আছে।"

বন্ধু বলিলেন "রাম, রাম, ইতিহাসের উপকরণ কাকে বলে জানেন ? ইতিহাস কখন পড়া হয়েছে ?"

আমি বলিলাম "না, সেই জন্যই ত আপনার সঙ্গে তর্ক করতে যাচ্ছি।"

একটা হাসির পর সংবাদ আসিল "আহার প্রস্তুত।"

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

লুকোচুরী

তোর সনে ভাই লুকোচুরি খেলা চলিতেছে
মোর নিশিদিন !
ধরে' ফেলি তোরে যেমনি লুকাস্,
বোধহীন !
লুকাস্ যেথায় সে ঠাঁই হরষ সমাকুল,
গরবে গোপন করিতে সদাই করে ভুল,
চরণ ফেলিলে সুধা ছুটে, ফুটে তারা ফুল,
অলিকুল জুটে, চাঁদ লুটে, বাজে
বেণু-বীণ !
যুগ যুগ ধরি' একই খেলা ভাই চলিতেছে
তাই নিশিদিন !

গগনে যখন লুকাস তখন দেখিতে যে পাই মেঘে-মেঘে ;
হয় ঘন শ্যাম তোর তনুটির
রঙ লেগে !
চিনি-চিনি বলে' যদি দেরি হয় তবে তায়,
হাসিয়া ফেলিস্ রে চপল তুই চপলায় ;
মেঘ-আবরণে শিখীচূড়া ঢাকা নাহি যায়—
ইন্দ্রধনুতে মাঝে মাঝে তাই
উঠে জেগে !
চপল, আপন তনুটি গোপন কেমনে করিবি মেঘে-মেঘে !

কাননে যখন লুকাস তখন ধরিয়া ফেলার বাধা নাই ;
বৃন্দারণ্য স্মরিয়া সেথায়
আগে যাই ।
বনমালী, তুই নূপুর না খুলি' যাস্ ছুটে,
ঝিল্লীর তানে পক্ষীর গানে জেগে উঠে,
চরণ অধর পরশে অশোক উঠে ফুটে ;
কীচক-বনেও মাঝে মাঝে সাড়া
দিস্ ভাই—
অসাবধানেরে কাননের মাঝে ধরিয়া ফেলার গোল নাই !

হ্রদের সলিলে ডুবিয়া ভাবিলি, এইবার বুঝি যাব হারি' !
জলে ডুব দেওয়া নূতন তোর কি
দহচারী ?
দেরি হলে' তুই উঁকি দিস যে রে আঁখি মেলি',
নীল কুমুদের বিকাশের মাঝে ধরে' ফেলি,
বাহুদুটি তুলি' ডুবিয়া' করিলে জলকেলি
জাগে যে মৃণালে কমল কলিকা
সারি-সারি ;
লহর-লাস্য নটবর তোর গোপন নৃত্য-অনুকারী !

শেষে ঘরে ঘরে হৃদয়ে-হৃদয়ে লুকাতে লাগিলি
ননীচোরা—
গৃহকোণগুলি খুঁজিতে কি বাদ
দিব মোরা ?
প্রিয়ার প্রণয়ে প্রতিবিম্বিত তব প্রীতি,
সখার সখ্যে শুনি তব দূর বেণুগীতি,
চিনি যে শিশুর চপলতা মাঝে নিতি-নিতি—
নিষেধ না মানে গোপন কথাটি
কহে ওরা !
ধরা যে সহজ, ছায়াটি লুকাতে পারিস না যে রে
ননীচোরা ।

শ্রীকালিদাস রায় ।

জীবনের মূল্য

(উপন্যাস)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত দ্বাদশ পরিচ্ছেদের চুম্বক—গল্পারম্ভে ত্রিবেণীবাসী ধনশালী গিরিশ মুখোপাধ্যায় প্রৌঢ়বয়স প্রাপ্ত হইয়াছেন—পনেরো বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার প্রথমা পত্নী এবং একবৎসর পূর্ব্বে দ্বিতীয়া পত্নী পরলোকগতা। প্রথমার গর্ভজাত পুত্রদ্বয় নরেন্দ্র ও সুরেন্দ্র কলিকাতায় পড়ে, দ্বিতীয়া ছুইটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। মুখোপাধ্যায়ের সংসারে তাঁহার পিসিমাতা আছেন, তাঁহার বহু অনুরোধসত্বেও মুখোপাধ্যায় তৃতীয় সংসার করিতে সম্মত হন নাই। গল্পারম্ভের পূর্ব্বদিন গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিবার পথে, গ্রামস্থ জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তেরো-চৌদ্দ বৎসরের মেয়ে প্রভাবতী ওরফে পটলিকে দেখিতে পাইয়া হঠাৎ গিরিশের মনে হইল—এই মেয়েটিকে যদি আমি বিবাহ করি, তবে পিসিমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়—অর্থাৎ তাঁহার সংসারটি "বজায়" থাকে। রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহার প্রথমা পত্নী আসিয়া বিছানার পাশে বসিয়া বলিতেছেন, "তোমায় ভুলিতে না পারিয়া আমিই জগদীশ বাঁড়ুয্যের মেয়ে প্রভাবতী হইয়া জন্মিয়াছি, তুমি আবার আমায় বিবাহ কর।"

গল্পারম্ভের প্রাতে মুখোপাধ্যায় তাঁহার বন্ধু ও পুরোহিত ভট্টাচার্য্য-দাদাকে গিয়া স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলেন। ভট্টাচার্য্য শাস্ত্র দেখাইয়া বলিলেন, "এরূপ স্বপ্ন যে দেখে, সে রাজা হয়—এ বিবাহ করিলে তোমার সৌভাগ্যের অন্ত থাকিবে না।" গিরিশের কাছে জগদীশের বাড়ী ও জমিজমা বন্ধক ছিল। ভট্টাচার্য্যই ঘটক হইয়া ঋণ মাপের ও সমস্ত ব্যয় বহনের লোভ দেখাইয়া বুড়া-বরে কন্যা দিতে অনেক কষ্টে জগদীশকে সম্মত করিলেন। দেড়মাস পরে জ্যৈষ্ঠের প্রথমে বিবাহ স্থির হইল। অনেকেই বিদ্রূপ করিত লাগিল, কেবল ইস্কুলের পণ্ডিত সতীশ দত্ত আসিয়া মিথ্যা করিয়া বলে "প্রভাবতী আপনার সহিত বিবাহ না হইলে বিষ খাইয়া মরিবে বলিয়াছে," "আপনিই পূর্ব্ব-জন্মে উহার স্বামী ছিলেন, এই প্রকার উহার ধারণা"—ইত্যাদি এবং টাকা ধার লয়।

মেয়ের ভাই হরিপদ কলিকাতায় পড়ে, সে আসিয়া সকল শুনিয়া ঘোর আপত্তি জানাইল। শেষে গোপনে পরামর্শ হইল, হরিপদ যদি বৈশাখ মাসের মধ্যে অন্য কোনও ভাল পাত্র আনিতে পারে এবং টাকা না লাগে, তবে তাহার সঙ্গেই প্রভার বিবাহ দেওয়া হইবে, নচেৎ গিরিশ মুখুয্যেকেই দেওয়া হইবে।

মুখোপাধ্যায় এদিকে কলিকাতায় গিয়া নিজের জন্য নব-জামাতা-উপযোগী পোষাক পরিচ্ছদ কিনিয়া, বধূর জন্য আগা-গোড়া নূতন গহনার ফরমাস দিলেন। ডার্ব্বি লটারির কথা প্রথম শুনিয়া একখানি টিকিটও কিনিয়া আনিলেন—তাঁহার মনে খুব ভরসা হইল, স্বপ্নের ফলে প্রথম প্রাইজ ছয় লক্ষ টাকা তাঁহারই কপালে নাচিতেছে। বৈশাখের প্রথমে বাড়ী ফিরিয়া সম্বন্ধ পাকা-পাকি করিবার অভিপ্রায়ে, আশীর্ব্বাদটা শেষ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। পাছে একুল ওকুল দুকুল যায়, এই ভাবিয়া জগদীশ আসিয়া গিরিশকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বরপক্ষ হইতে কন্যা আশীর্ব্বাদও হইয়া গেল।]

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আশা ও নিরাশা।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কুড়ি একুশ বৎসর বয়স্ক একটি যুবক বউবাজারের দিক হইতে পদব্রজে ধীরে ধীরে গোলদীঘির ফটকের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে চাহিয়া কাহাকে যেন অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহার পর হ্যারিসন রোডের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

এই যুবকের নাম রাজকুমার চট্টোপাধ্যায়। গায়ে শাদা জিনের একটি কোট, তাহার পাঁচটি বোতামের তিনটি আছে দুইটি নাই। যে তিনটি আছে, তাহার দুইটি একরমের, তৃতীয়টি আর এক রকমের। আস্তিন উঠিয়া পড়িয়া হাতের কব্জীর অনেক খানি অংশ দেখা যাইতেছে, একটা পকেটের একধারের শেলাই খানিকটা খুলিয়া গিয়াছে। একটি পাকানো চাদর তাহার গলায় ঝুলিতেছে—কিন্তু পাকানো থাকা সত্বেও দুই এক স্থানে ছেঁড়া দেখা যাইতেছে। একজোড়া বাদামী রঙের জুতা তাহার পায়ে রহিয়াছে—তাহারও দুই স্থানে তালি দেওয়া।

রাজকুমার বড় গরীব। সংসারে কেবল তাহার এক বিধবা মাতা ছিলেন, প্রায় একবৎসর হইল তাঁহার

মৃত্যু হইয়াছে। ভাই নাই, বোন নাই, খুড়া নাই, জেঠা নাই, মামা নাই, পিসা নাই—তাহার আর কেহই নাই। তাহার মত একা, কোথাও কোনও আত্মীয় স্বজন নাই—এরূপ বাঙ্গালী প্রায় দেখা যায় না। আত্মীয় নাই—গৃহও নাই। দেশে তাহার পৈত্রিক বাড়ীখানি, যেখানে তাহার মার মৃত্যু হইয়াছিল, এখন পরহস্তগত। সামান্য কয়েক বিঘা জমি ছিল, তাহাও পরহস্তগত। মার মৃত্যুর পর একজন প্রতিবেশী বাড়ীখানি জমিগুলি দখল করিয়া লইয়াছেন। তিনি বলেন, রাজকুমারের মা নাকি তাঁহার নিকট ২০০৲ ধার লইয়া বাড়ী ও জমিজমা তাঁহার নিকট বন্ধক দিয়াছিলেন—সুদে আসলে তাহা এখন ৫০০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। গ্রামের লোকের পরামর্শে রাজকুমার তাঁহার নিকট গিয়া বন্ধকী দলিলাদি দেখিতে চাহিয়াছিল। ভদ্রলোকটি বলিল—"বাপুহে, আমার কথা যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তবে দলিল দেখ্‌লেই কি বিশ্বাস হবে? তুমি তখন যদি বলে বস দলিল জাল? আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, নালিশ করগে—দলিল দেখাতে হয়, আদালতে দেখাব।"

রাজকুমার কিয়ৎক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া, গোলদীঘির ফটক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিমূর্ত্তি হইতে অনতিদূরে একটি বেঞ্চিতে বসিয়া ফটকটির দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজকুমারকে বড় শ্রান্ত দেখাইতেছিল। সারাদিন আপিস করিয়া এখন সে বাসায় ফিরিতেছে। সেই কোন সকালে মেসের বাসায় তাড়াতাড়ি চারিটি খাইয়া বাহির হইয়াছে—তাহার পর সারাদিন আপিসে হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি—দুই তিন গ্লাস কলের জল ভিন্ন আর কিছুই তাহার উদরস্থ হয় নাই। তাই মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে।

রাজকুমার চাকরিতে প্রবেশ করিয়াছে এই কয়েক মাস মাত্র। যতদিন তাহার মাতা জীবিতা ছিলেন, ততদিন ছেলেকে মাসে মাসে তিনি কিছু কিছু করিয়া টাকা পাঠাইতেন রাজকুমার কলেজে পড়িত। তাঁহার পূর্ব্ব সঞ্চিত কিছু ছিল হয়ত—জমিতে যাহা ধান হইত তাহাও সমস্ত তাঁহার প্রয়োজন হইত না—একটা পেট বৈত নয়—ধান বেচিয়াও টাকা পাঠাইতেন। হয়ত ঋণও কিছু করিয়াছিলেন। তাঁহার টাকায় রাজকুমারের পড়ার সমস্ত ব্যয় অবশ্য নির্ব্বাহ হইত না—ছেলে পড়াইয়া বাকী টাকা তাহাকে উপার্জ্জন করিতে হইত। এফ্‌ এ পরীক্ষার পর তাহার মাতৃবিয়োগ হইল। তাহার পর কিছুদিন সে ত শোকেই অবসন্ন হইয়া রহিল। পরে দেখিল, লেখাপড়া করিতে হইলে ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ছেলে পড়াইতে হয়। ছেলে পড়াইতে হইলে নিজের পড়ার সময় আর পাওয়া যায় না।—আর কাহার জন্যই বা এখন পড়িবে? তখন পড়িত, একদিন মার দুঃখ ঘুচাইবে বলিয়া। সেই মা-ই যখন চলিয়া গেলেন, তখন কাহার জন্য আর উদ্যম?—জ্ঞানোপার্জ্জন? তজ্জন্য কলেজে যাইবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। একটা যেমন তেমন কেরাণীগিরি করিলেই তাহার উদারন্নের সংস্থান হইয়া যাইবে। নিজের জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত যে পড়াশুনা, প্রভাতে ও রাত্রিকালে বরং নিশ্চিন্ত মনেই সে তাহা করিতে পারিবে। তাই সে আপিসে ঢুকিয়াছে। মাত্র কুড়িটি টাকা বেতন পায়। আপিস ভাল—ভবিষ্যতে যথেষ্ট উন্নতির আশা আছে। মেসের খরচ দিয়া যাহা কিছু থাকে, তাহা হইতে প্রতিমাসেই কিছু কিছু পুস্তক কেনে,—সুতরাং কাপড় জামা প্রভৃতি কেনার টাকা বড় জুটিয়া ওঠে না।

সন্ধ্যা হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। বিস্তর ছাত্র গোলদীঘির তীরে বায়ু সেবন করিতে আসিয়াছে। তাহারা উচ্চহাস্যে, কলরবে, তর্ক বিতর্কে সে স্থান সরগরম করিয়া তুলিয়াছে। রাজকুমার যাহাকে অন্বেষণ করিতেছে—সে ত কৈ এখনও আসিল না।

গুড্‌ফ্রাইডের ছুটির সময় ত্রিবেণী হইতে হঠাৎ কলিকাতায় ফিরিয়া, হরিপদ নিজ অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবকে সকল কথা খুলিয়া বলিল—রাজকুমারকেও বলিল, কারণ রাজকুমারের সহিত কয়েক বৎসর হইতেই তাহার সম্প্রীতি। রাজকুমার দুই তিন বার হরিপদ'র

সহিত ত্রিবেণীত তাহাদের বাড়ীতে গিয়াছিল—ছয় মাস পূর্ব্বেও প্রভাবতীকে সে দেখিয়াছে। প্রভাবতীর এই রূপ আসন্ন বিপদের কথা তাহার ভ্রাতার নিকট শুনিয়া রাজকুমারের মনটিও সমবেদনায় আতুর হইয়া উঠিয়াছিল। রাজকুমার হরিপদদের পাল্টা ঘর—তাহার সহিত প্রভাবতীর বিবাহ অনায়াসেই হইতে পারে, কিন্তু তাহার দারিদ্র্য নিবন্ধন হরিপদ সে প্রস্তাব তাহার কাছে করে নাই। হরিপদ অপরাপর বন্ধুকেও যেমন বলিয়াছিল, সেই রূপ রাজকুমারকেও একটি সুবিধামত পাত্র খুঁজিয়া দিতেই অনুরোধ করিয়াছিল।

যেদিন হরিপদ পাত্র খুঁজিতে বলিল রাজকুমার সেই দিন সন্ধ্যাবেলাই বাসায় গিয়া তাহার ছিন্ন মাদুরের উপর উবু হইয়া শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে-পাত্রের সন্ধান পাইল। জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিল যেন প্রভাবতীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে—প্রভাবতীর বাপ, মা, ভাই তাহার বাপ, মা, ভাই হইয়াছে—সে আর সহায়হীন আত্মীয়বর্জ্জিত লক্ষ্মীছাড়া নহে। মধ্যে সে পীড়িত হইয়া পড়ে—চারি পাঁচ দিন আপিস যাইতে পারে নাই। রোগ শয্যায় পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতে করিতে সে স্বপ্ন দেখিত যেন প্রভাবতী তাহার কাছে বসিয়া আছে, তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে। পীড়ার সংবাদ পাইয়া হরিপদ তাহাকে দেখিতে আসিল—প্রভাবতী সম্বন্ধে মনে মনে রাজকুমার যে সুখ কল্পনা করিয়াছিল—হরিপদ বাস্তবেই তাহা করিল—কাছে বসিয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিল, তৃষ্ণার সময় তাহার মুখে জল তুলিয়া ধরিল, স্নেহভরে কত আশা ভরসার কথা বলিয়া তাহার সান্ত্বনা-বিধান করিল। উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতায় রাজকুমার যখন যখন "ভাই" বলিয়া হরিপদ'র হাতটি স্পর্শ করিতে লাগিল—সেই "ভাই" কথাটির মধ্যে যে কতখানি আকাঙ্ক্ষা ও মিনতি লুকাইত ছিল, হরিপদ তাহা জানিতেও পারে নাই।

বিগত কয়েকদিন দুই তিনবার হরিপদ'র সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে—প্রভাবতীর জন্য পাত্রের কথাও দুইজনে আলোচনা করিয়াছে। হরিপদ কোথাও সুবিধা করিতে পারে নাই—আশাও বড় নাই। সেদিন সে স্পষ্ট করিয়া বলে নাই—কিন্তু কথার ভাবে রাজকুমারের মনে হইয়াছে, হরিপদ এখন তাহাকেই যেন নিজ ভগ্নীর জন্য কামনা করে। অদ্যও আপিস যাইবার সময় বউবাজারের মোড়ে হরিপদ'র সহিত দেখা হইয়াছিল, হরিপদ বলিয়াছিল, বিশেষ কথা আছে, আজ সন্ধ্যার সময় কোথায় দেখা হইতে পারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। রাজকুমার, হরিপদ'র বাসায় যাইতে চাহিয়াছিল কিন্তু হরিপদ বলে—কথাটা গোপন, অনেকক্ষণ লাগিবে—বাসায় পাঁচজনের মধ্যে সুবিধা হইবে না, আজ বিকালে গোলদীঘির ধারে দেখা হইলেই ভাল হয়। রাজকুমার বলিয়াছিল—"আচ্ছা বেশ, আপিসের ফেরৎ ছটার সময় আজ আমি গোলদীঘিতে আস্‌ব—তুমিও সেই সময় এস।"—বিদ্যাসাগর প্রতিমূর্ত্তির নিকট উভয়ের সাক্ষাতের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল—তাই রাজকুমার এখানে আসিয়া বসিয়া আছে।

কিন্তু হরিপদ এখনও ত কৈ আসিল না। বউবাজারে যখন কথা হইয়াছিল, তখন রাজকুমার মনে করিয়াছিল, বোধ হয় ভগ্নীর বিবাহের কথাই হরিপদ বলিবে এবং তাহাকেই বিবাহ করিতে অনুরোধ করিবে। হরিপদর বিলম্ব দেখিয়া রাজকুমারের মনে মনে আশঙ্কা হইতে লাগিল,তবে কি হরিপদ আজ দিনের মধ্যে অন্য কোনও পাত্র হাতে পাইয়াছে—তাই আমায় পরিত্যাগ করিল?

কিন্তু ইহা মনে ভাবিতেও রাজকুমারের ক্লেশ হইল। কয়দিন গোপনে মনে মনে যে আশাটি সে পোষণ করিয়াছিল, তাহা কি বিফল হইবে?

মনকে সে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল—আমি ত সে মেয়েটির মঙ্গলের জন্যই তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, যদি আমার সাহায্য ব্যতিরেকেও তাহার সে মঙ্গল হয়, তাহাতে আমার ক্ষতি কি?—মন কিন্তু সে কথা শুনিতে চাহিল না—সে যেন কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, হাঁ ক্ষতি আছে বৈ কি! জীবনটা যে বিস্বাদ হইয়া যাইবে।

এই প্রকারে আশা ও নিরাশার দোলায় কখনও তাহার মনটি উচ্চে উঠিতেছে—কখনও নিম্নে নামিয়া যাইতেছে। এমন সময় চারিদিকে সরকারী আলোক গুলি জ্বলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে হরিপদও আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"আমার ভাই বড় দেরী হয়ে গেল, তুমি কতক্ষণ এসেছ ?"

"ঘণ্টা খানেক হবে।"

"বাসায় যাওনি ?"

"না—আপিস থেকে সোজা এসেছি। সেই রকমই ত কথা ছিল।"

"তোমাকে ভারি কষ্ট দিলাম ভাই। তোমার বোধ হয় খুব ক্ষিধে পেয়েছে ?"

রাজকুমার হাসিয়া বলিল—"আমি কি বালক ?"

হরিপদ বলিল—"তুমি আপিসে কখনও কিছু খাওনা জানি। বাসার গিয়ে বিকেলে খাও। তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। চল, বরং একটা চায়ের দোকানে গিয়ে দুজনে কিছু খেয়ে আসি।"

"আবার ও সব কেন ?"

"তোমার সঙ্গে আমার যে কথা আছে তা দু পাঁচ মিনিটে শেষ হবে না। দেরী হবে—হয়ত রাত্রি নটা বাজবে। ততক্ষণ তুমি কিছু না খেয়ে থাকলে নিশ্চই তোমার কষ্ট হবে। চল—আমার পকেটে একটা সিকি আছে।"

রাজকুমার আপত্তি করিতে লাগিল কিন্তু হরিপদ শুনিল না, তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।

পথে যাইতে যাইতে রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিল—"কি কথাটা বল ত।"

"সে অনেক কথা ভাই।"

"একটু আভাস দাও।"

"আমার বোনের বিয়ের কথা।"

"কিছু সুবিধে কোথাও করতে পারলে ?"

"না।"

রাজকুমার আর কিছু বলিল না। নীরবে হরিপদ'র সহিত একটা চায়ের দোকানে গিয়া উঠিল। সেখানে এক এক পেয়ালা চা এবং কিছু কেক্ বিস্কুট প্রভৃতি খাইয়া উভয়ে আবার গোল দীঘির ধারে প্রবেশ করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আশা ফলবতী।

তখন রাত্রি প্রায় আটটা—ছাত্রের দলের ভীড় অনেক কমিয়া গিয়াছে। উভয়ে একটা বেঞ্চির অনুসন্ধান করিয়া কোথাও না পাইয়া অবশেষে একস্থানে একটু নিরিবিলি পাইয়া ঘাসের উপর বসিল।

হরিপদ বলিল—"প্রভাকে তুমি দেখেছ ত ?"

"দেখেছি।"

"কেমন মনে কর ?"

রাজকুমার একটু হাসিয়া বলিল—"ভালই।"

হরিপদ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"তুমিই কেন তাকে বিয়ে কর না না ভাই!"

রাজকুমার বলিল—"আমি ?—আমি কি তার যোগ্য পাত্র ?"

"কিসে নও ?"

"আমার মা নেই, বাপ নেই, ঘর নেই, বাড়ী নেই। মাসে কুড়িটি টাকা মাইনে পাই—নিজের পেটে খেতেই কুলায় না। আমি বিয়ে করলে তোমার বোনের কি সুখ হবে ?"

হরিপদ বলিল—"রাজপুত্তুর একটি পাই-ই বা কোথা ?"

রাজকুমার বলিল—"আরও দিন কতক খুঁজে দেখ না—পাওই যদি।"

এ উত্তর শুনিয়া, হরিপদ একটু বিস্মিত হইয়া রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিল। অভিমান নাকি? তাহা যদি হয়, তবে ত কার্য্য হাঁসিল। বলিল—"ভাই, ও সব কথা ছেড়ে দাও। আমাদের মত অবস্থার লোক কি আশা করতে পারে? বাজার কেমন দেখ্‌ছ ত। কানা খোঁড়া মাতাল বখাট না হয়, কিছু লেখাপড়া জানে—এমন একটি পাত্র পেলেই পরম সৌভাগ্য। তুমি বল্‌ছ, তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে প্রভার কি সুখ

হবে? আমার উত্তর, সোণা দানা, অট্টালিকা, চাকর দাসীর সুখ না হক্, আর সব সুখই ত হবে। আমাদের গ্রামের সেই গিরিশ মুখুয্যে বুড়ো—তার ছেলেরাই ত আমাদের বয়সী—তার সঙ্গে বিয়ে হলে প্রভার কি সুখ হবে বল ত? টাকা কড়ি গয়না গাঁটি যথেষ্টই হবে কিন্তু তাই কি স্ত্রীলোকের একমাত্র সুখ? স্বামীর সঙ্গে যদি মনের মিল না হয়—"

রাজকুমার বলিল—"সে ত ঠিক কথা। কিন্তু ঘরে যদি অন্ন না থাকে তবে মনের মিলে কি পেট ভরবে?"

হরিপদ বলিল—"ঘরে তোমার আজই অন্ন নেই, কিন্তু চিরদিনই কি এ অবস্থা থাকবে?"

"ভবিষ্যতে কি হবে কে বলতে পারে?—এর চেয়ে অবস্থার উন্নতিও যেমন হতে পারে, তেমনি অবনতিও ত হতে পারে!"

"তা ঠিক কথা? কিন্তু একটা সম্ভব অসম্ভব ত দেখ্‌তে হবে। তুমি লেখাপড়া শিখেছ—এফ্, এ পাস করেছ—তোমার দাম অবিশ্যি মাসিক ২০৲ নয়। ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে, ভাল আপিস, তাই তোমার ২০৲ টাকায় ঢুকৃতে হয়েছে। নৈলে যদি তুমি মাষ্টারি কর আর দুই একটি ছেলে পড়াও তা হলে অনায়াসেই ত ওর তিন চারগুণ রোজগার করতে পার। তুমি যে রকম সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী,—তোমার উন্নতি হবেই হবে। এ রকম অবস্থা কতদিন আর থাক্‌বে?"

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিল—"আমার সম্বন্ধে এ উচ্চ ধারণা কতদিন থেকে হয়েছে তোমার?"

হরিপদ আবার বন্ধুর মুখ পানে কৌতূহল দৃষ্টিতে চাহিল। বলিল—"ভাই প্রথমেই তোমায় এ অনুরোধ করিনি, তাই কি তুমি রাগ করেছ?"

রাজকুমার বলিল,—"রাগ করব কেন? রাগ আবার কিসের?"

"তোমায় প্রথম যে বলিনি, তার কারণ কি তা শোন। আমরা এ বিয়েতে একটি পয়সা দিতে পারব না। তুমি লেখাপড়া শিখেছ—চাকরি করছ—ক্রমে উন্নতিও হবে। তখন তুমি বিয়ে করলে আমার বোনের চেয়ে ঢের ভাল মেয়ে পাবে। রূপে গুণে বলছিনে—কারণ রূপে গুণে আমার বোন বড় ফেলা যায় না। সহায় সম্পদ—এই সকল বিষয়ে বলছি। আমার বোনকে যে বিয়ে করবে, তাকে অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। যদি অপরের উপর দিয়ে যায়, তবে তোমার আর কেন ক্ষতি করি?—এই ভেবেই প্রথমে তোমায় বলিনি।"

খাঁটি যত্য কথাটি হরিপদ কিন্তু বলিল না। অন্য বিষয় এবং অন্য কেহ হইলে, রাজকুমার এ জাতীয় কৈফিয়ৎ বিশ্বাস করিত কি না সন্দেহ—কিন্তু প্রাণের টান যাহার প্রতি—তাহার কথা মানুষ সহজেই বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করিলেই সুখ পায়। সুতরাং রাজকুমার হরিপদ'র কৈফিয়ৎটি নির্ব্বিচারে বিশ্বাস করিল।

হরিপদ বলিল—"ভাই, তোমার সঙ্গে আমার অনেক দিনের বন্ধুত্ব—আমার অনেক দায়ে বিপদেই তুমি আমার সহায় হয়েছ। এ দায়টি থেকেও তুমি আমায় উদ্ধার কর ভাই। আমার বাবা মা যে সেই বুড়োর সঙ্গে প্রভার বিয়েতে সম্মত হয়েছেন—সে নিতান্ত নাচার হয়ে। সকল কথাই ত শুনেছ। এবার বাড়ী গিয়ে দেখি, সে বিয়ের নামেই প্রভা ভেবে ভেবে মনের দুঃখে আধখানি হয়ে গেছে, বিয়ে হলে কি আর সে বাঁচবে? দুটো নয় পাঁচটা নয়—আমার ঐ একটিই বোন। সে যদি চির জীবনের তরে অসুখী হল, তা হলে আমি বৃথা তার ভাই হয়ে জন্মেছি। তুমি অমত কোরো না ভাই"—বলিয়া হরিপদ, রাজকুমারেব হস্ত দুইটি ধারণ করিল!

রাজকুমারের যেন কান্না আসিতে লাগিল—কেন যে কান্না আসিতে লাগিল সে কথা কিন্তু বলা শক্ত।

রাজকুমার স্বীকার হইল। বলিল—"অবিশ্যি তুমি যদি ভাল বোঝ, তোমার মা বাপের যদি মত হয়—আমায় যা বল্‌বে তাই করব।"

তাহার পর দুই বন্ধুতে মিলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ চলিল। সুদূর ভবিষ্যতেও যাহা যাহা করিতে

হইবে, তাহারও প্রোগ্রাম এক প্রকার স্থির হইয়া গেল। বিবাহের পর প্রভা এখন ত্রিবেণীতেই থাকিবে। প্রাইবেট ছাত্র হইয়া রাজকুমার আগামী বৎসর হরিপদর সঙ্গে বি-এ পরীক্ষা দিবে—পাঠ্যপুস্তকগুলির মধ্যে অধিকাংশ তাহার ত পড়াই আছে। আগামী বৎসর উভয়ে আইনের শ্রেণীতে হাজিরা দিতে থাকিবে। আইন পাস করিয়া উভয় বন্ধু মফস্বলের কোনও স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া সেখানে গিয়া প্র্যাকটিস আরম্ভ করিবে। দুইখানি বাড়ী পাশাপাশি লইতে হইবে—এবং মাঝখানের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া সেখানে দরজা বসাইতে হইবে যাহাতে মেয়েরা দিবসেও পরস্পরের নিকট যাতায়াত করিতে পারে। বাড়ীওয়ালা যদি দেওয়াল ভাঙ্গিতে দিতে আপত্তি করে, তবে কিছু টাকা তাহাকে ধরিয়া দিলেই হইবে—বলিলেই হইবে—বাপু হে, তোমার দেওয়াল আমরা ভাঙ্গিয়া দিতেছি—যখন আমরা বাড়ী ছাড়িয়া দিব, তোমার দেওয়াল তুমি মেরামত করিয়া লইও—এই লও টাকা—রখিয়া দাও।

রাজকুমার বলিল—"ভাড়ার বাড়ীতেই ত চিরকাল আমরা থাকব না—নিজেদের বাড়ী করতে হবে ত ক্রমশঃ।"

হরিপদ বলিম—"হ্যাঁ তা ত করতেই হবে—কিন্তু প্রথম প্রথম বছর কয়েক কি আমরা তা পেরে উঠব ভাই? কি রকম দিন কাল পড়েছে দেখ্‌ছ ত? নূতন উকীল হয়ে বাসা খরচের টাকাটা রোজগার করাই দায়। হাতে ত কিছু রেস্ত নেই—তোমারও নেই আমারও নেই—দুই ভাই-ই সমান।"

রাজকুমার বলিল—"হা হা হা—দুই ভাই-ই সমান! ঠিক বলেছ। এ বলে আমায় দেখ্‌, ও বলে আমায় দেখ্‌।"

দুইজনেই হাসিতে লাগিল। ধন্য বয়স—যে বয়সে ভবিষ্যতের অতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে এবং নিজ নিজ অভাগ্যের কথা আলোচনাতেও হাসি আসে।

ঢং ঢং করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘড়িতে নয়টা বাজিল। দূর ভবিষ্যতে বায়ুহর্ম্ম্য নির্ম্মাণকার্য্য আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া, উপস্থিত কি কি করা কর্ত্তব্য তাহাই দুইজনে পরামর্শ করিতে লাগিল। হরিপদ বলিল—"২৫শে বৈশাখ এ মাসে বিবাহের শেষ দিন।"

সেই দিনেই বিবাহের দিনস্থির হইল। রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিল—"আপিস থেকে কদিনের ছুটি নেওয়া যায়?"

"এক হপ্তার নাও।"

"একহপ্তা কি দরকার?—আর অতদিন চাইলে সাহেব হয়ত মোটেই মঞ্জুর করবে না। আমি বলি, দুদিন কি তিন দিন।"

হরিপদ, একটু চিন্তান্বিত হইয়া বলিল—"দুদিন সব হওয়া ত অসম্ভব। যে দিন বিয়ে—ঐ ২৫শে—তার পূর্ব্বদিন বিকালের গাড়ীতে এখান থেকে রওয়ানা হওয়া চাই—কারণ বিয়ের দিন ভোরে দধিমঙ্গল আছে—আর কি কি সব মেয়েরা করে,—মেসের বাসায় সেসব ত হবার যো নেই। আমাদের বাড়ীতেই সেগুলো তোমায় সারতে হবে। তারপর, ২৬শে কুসুমডিঙে—সেও সেখানেই সারতে হবে। ২৭শে ফুলশয্যা—এই ত তিন দিন গেল। ফুলশয্যার ভোরে উঠেই তুমি পাড়ি মারবে, সেই বা কেমন দেখায়? অন্ততঃ তিনদিন আরও সেখানে তোমার থাকা উচিত। তা হলে পাঁচ দিন। অন্ততঃ পাঁচদিনের ছুটি নাও হে।"

রাজকুমার বলিল,—সে চেষ্টা করিয়া দেখিবে, কিন্তু সাহেব যদি না শুনে, অন্ততঃ তিন দিনের ছুটি সে পাইতে পারিবে বোধ হয়।

হরিপদ বলিল—"টোপরের কি হবে? দেশে, মালীকে ফরমাস না দিলে ত পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে বরং এখান থেকে তৈরি টোপর কিনে নিয়ে যাওয়া ভাল। টোপর চাই, চেলির জোড় চাই—আরও কি কি সব দরকার হয় জানিও না।"

রাজকুমার বলিল—"তুমি বাড়ী যাও। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে কি কি এখানে থেকে কিনে নিয়ে যেতে হবে, জেনে এস।"

"হ্যাঁ, বাড়ীতে আমায় কাল যেতেই হবে।"

রাত্রি দশটার সময় দুই বন্ধু পরস্পরের নিকট বিদায়গ্রহণ করিল।

পরদিন হরিপদ বাড়ী গেল। তাহার পিতা-মাতা পাত্রের কথা শুনিয়া বিবাহে মত দিলেন, তবে বলিলেন —"ছেলেটির মা বাপ ভাই খুড়ো জ্যাঠা কেউ নেই— এইটিই বড় খুঁৎ রইল।" হরিপদকে তাঁহারা উপদেশ দিলেন, ২৪শে বৈশাখ রাত্রির গাড়ীতে পৌছানই ভাল। আর, বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কথাটা খুব সাবধানে গোপন রাখিতে হইবে—গিরিশ মুখুয্যে জানিতে পারিয়া কোনও হাঙ্গাম হুজ্জৎ বাধা য়া না বসে।

হরিপদ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আবশ্যকীয় জিনিষপত্র ক্রয় করিল। দুই বন্ধুর তহবিল হইতে যাহা বাহির হইল, তাহা মিলাইয়াও কুলাইল না, উভয়কেই কিছু কিছু ঋণসংগ্রহ করিতে হইল।

যথাদিনে সন্ধ্যার গাড়ীতে পরম উল্লাসে দুইজনে ত্রিবেণী যাত্রা করিল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সমস্তরাত্রি ঝড় জল বজ্রাঘাত চলিল, আমি কাপ্টেন্ যেথানে দাঁড়াইয়া লস্করের প্রতি হুকুম চালাইতেছে সেই থানেই কায়ক্লেশে রহিলাম। নৌকা এবং এত-গুলি আরোহী'র কি গতি হয় তাহা দেখিবার উদ্বেগ যে মনে ছিল না এমন কথা বলি না, আরও একটি শৃঙ্খল টুটিল, তরণী আরও দ্রুতবেগে ঘুরিতে লাগিল, রাত্রি শেষের দিকে ঝড়বেগ একবার অতি মাত্রায় বৃদ্ধি হইয়া তার পরেই ক্রমে মন্দ হইতে আরম্ভ হইল। প্রভাতে ঝড়বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল, আকাশ পরিষ্কার হইল, নবোদিত সূর্য্যের অরুণকিরণে নদী তরঙ্গ ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল, আরোহী যাত্রীর দল আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করায় তাহাদের দেহ, মনের আনন্দ রাখিবার যেন স্থান পাইতেছিল না।

প্রথম শ্রেণীর ক্যাবিন ভাড়া করিয়া আর একটি ইংরাজ মহিলা ষ্টীমারে উঠিয়াছিলেন, এই ঝড় বৃষ্টির গোলযোগের মধ্যে তাঁহাকে একবারও দেখি নাই। যে ক্যাবিনে তিনি ছিলেন তাহার দ্বার বন্ধ ছিল। সমস্ত রাত্রি তাঁহার কোন সন্ধান লইবার 'সুযোগ আমি পাই নাই, প্রভাতে যখন নীচে নামিয়া আসি তখন তাঁহাকে তাঁহার কামরার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি সহাস্য-মুখে প্রতিপ্রশ্ন করিয়া নিজ মঙ্গল সংবাদ আমায় জ্ঞাপন করিলেন। কথায় কথায়, তিনি ঝড়ের বেগ জানিতে পরিয়াছিলেন কি নিদ্রায় তাঁহার দুঃসময় কাটিয়া গিয়াছে এই প্রশ্ন করিলাম। উত্তরে তিনি জানাইলেন যে ঝড়বেগ তিনি বিলক্ষণ টের পাইয়াছিলেন, বিপদ তিনি অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন এবং সে জন্য বিষম ভয়ে তাঁহার রাত্রি কাটিয়াছে কিন্তু সকলের সাক্ষাতে তিনি তাঁহার প্রাণভয়-বিহ্বল-মূর্ত্তি দেখাইতে চাহেন নাই, "যাহা হয় হউক" বলিয়া তিনি তাঁহার কামরার দ্বার বন্ধ করিয়া বিছানায় পড়িয়া ছিলেন। মনে ভাবিলাম, যে দেশে জোয়ান অব্ আর্ক জন্ম লইয়াছিল, সে দেশের নারীর পক্ষে নিঃশব্দে জলমগ্ন হইয়া যাওয়া 'থোড়া কথা'। জাহাজের চিমনি দিয়া কলঘরে জল প্রবেশ করায় অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছিল। সে সব ঠিক করিয়া জাহাজ ছাড়িতে প্রায় দুইপ্রহর অতীত হইয়া গেল। বায়ুবিধ্বস্ত বিশাল তরণী স্রোতের প্রতিকূলে মন্দ গতিতে গন্তব্য স্থানের অভিমুখে পুনরায় যাত্রা করিল।

ব্রহ্মপুত্রের উভয় তীরে প্রকৃতির পর্য্যাপ্ত রূপ-সম্ভার যেন ধরে না, মনে হইল এই নগনদী পরি-শোভিত নির্জ্জন প্রদেশে লোক-চক্ষুর বাহিরে বিশ্ব-

রাণী যেন তাঁহার অঙ্গাবরণ উন্মোচন করিয়া নদীতরঙ্গে প্রতিফলিত নিজের অতুলনীয় নগ্ন-সৌন্দর্য্য নিজে দেখিয়া নিজেই মুগ্ধ হইতেছেন।

জন্মাবধি বঙ্গদেশের সমতল ভূমিই দেখিয়া আসিতেছি। নতোন্নত-গিরিমালা-সমন্বিত পর্য্যাপ্তপুষ্পভারাকুল বৃক্ষবল্লরী-শোভিত কামরূপ-ভূমি আমার চক্ষু জুড়াইয়া দিল। পথে আর কোন বিপদ হয় নাই, জাহাজ যথা সময়ে গিয়া গৌহাটির ঘাটে লাগিল। আমার সঙ্গে কোন তীর্থ-পাণ্ডা ছিল না এবং যদি সে নৌকায় কেহ থাকিয়াও থাকে সে আমার ধরণ ধারণ দেখিয়া নিকটে ঘেঁষিতে সাহস পায় নাই। আমার সঙ্গে একটিমাত্র ভৃত্য ছিল—সে আমার বহু পুরাতন ভৃত্য, চিরকাল আমার নিকটেই সে কাজ করিতেছে, জ্ঞান হওয়া অবধি দেখিতেছি নবীন খানসামা আমার সহচর, শৈশবের খেলার সঙ্গী আমার চিরসহচর হইয়া রহিল। আজও সে আছে, আমি যেখানে যে ভাবেই থাকি সে আমার সঙ্গ ছাড়ে না, দেখিতেছি হয় তাহার সৎকারের উদ্যোগ অনুষ্ঠান আমাকে করিতে হইবে কিম্বা সেই আমার শবদেহের সঙ্গে সঙ্গে মলিন মুখ লইয়া শ্মশান পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যগুলি, আজীবন যে নিষ্ঠায় আমার কাজ করিতেছে, সেই নিষ্ঠায় সেগুলিও সম্পন্ন করিয়া যাইবে। সেই নবীনের নিকট আমার বিছানাপত্র, বাক্স-ডেক্স রাখিয়া আমি বাসা খুঁজিতে বাহির হইলাম। যে ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে তাহাতে গৌহাটি সহরের রাস্তা ঘাট অচল হইয়াছিল, রাস্তার কাদায় হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়, পায়ের পাদুকা হাতে লইয়া বিশ্রামের জন্য ঘর খুঁজিতে বাহির হইলাম। তখন সন্ধ্যাকাল—যে যাহার সুখ-দুঃখের ঘরে বিশ্রাম করিতেছে—এই পথশ্রান্ত গৃহহীনকে গৃহ দিবার মত মন লইয়া কে অপেক্ষা করিতেছে বলুন? গৃহহীন শ্রান্ত পথিক কি ইহ সংসারে থাকিবার মত স্থান সহজে পায়? অধিকাংশ স্থল হইতে অতিথি ফিরিয়াই যায়—শকুন্তলার তপোবন হইতেও দুষ্যন্ত ভিন্ন অন্য সকলেই ফিরিয়া গিয়াছে। গৌহাটির গৃহস্থ আমাকে বিমুখ করিবে সে আর বড় কথা কি?

অনেক স্থান হইতেই ফিরিতে হইল, তথাপি আশা ছাড়ি নাই, শ্রান্ত দেহ টানিয়া দ্বারে দ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিতে লাগিলাম।

এক স্থানে বাবুদের সখের থিয়েটারের রিহার্সেল চলিতেছিল; এত দুঃখেও সঙ্গীতের মোহ আমায় ছাড়ে নাই। সেই দ্বারে গিয়া আঘাত করিলাম। দ্বার খুলিল, টেড়ি কাটা বাবু ত্রিভঙ্গিম-বঙ্কিম-ঠামে দাঁড়াইয়া অপাঙ্গ-ভঙ্গীর সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাই?" আমি বলিলাম, "সঙ্গীতের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য আমায় আকর্ষণ করিয়াছে, আমাকে বংশী-স্বরাকৃষ্ট মৃগই ভাবিয়া লউন।" বাবুর হাস্যে বুঝিলাম ফল হইতে পারে, সুতরাং আমন্ত্রণের অপেক্ষা না করিয়া একেবারে ঘরেই ঢুকিয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ বসিয়াই বুঝিলাম বাদকটি তেমন পটু নহেন। আমি সঙ্গীতের তালে তালে তুড়ি বাজাইয়া জানাইলাম বাদন বিদ্যায় আমি কথঞ্চিৎ পারগ। চতুর্দ্দিক হইতে অনুরোধ চলিতে লাগিল, "বাজান মশায়, বাজান।" আমি বৃথা ইতস্ততঃ না করিয়া বাঁয়া তব্‌লা টানিয়া নিয়া বাজাইতে বসিয়া গেলাম। ও বিদ্যায় আমার অনন্য সাধারণ পারগতা ছিল না কিন্তু যাহা জানি তাহাতেই বাবুরা পরিতুষ্ট হইলেন; পুনরায় অনুরোধ উপরোধ চলিতে লাগিল যে আমি তাঁহাদের থিয়েটারটা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত থাকিয়া যাইতে পারি কি না—তাহাতে আর্থিক-লাভের সম্ভাবনা আছে— একথাও বাবুর দল আমাকে নানা ভাবে-ভঙ্গীতে জানাইয়া দিলেন। আমি বলিলাম, "থাকিবার স্থান পাইলেই থাকিয়া যাই।"—কথার ভাবটা এমনি দাঁড়াইল যে 'যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই।' একটি বাবুর বাসায় একখানি অনধিকৃত আল্‌গা ঘর ছিল। সেইখানি পাইবার আশ্বাস পাইয়া আমি উঠিলাম। নবীনের সন্ধানে নদীতীরে গিয়া তাহাকে সঙ্গে নিয়া ঐ ঘর খানিতে আশ্রয় লইলাম। প্রবেশ করিয়া দেখি, ইহার অনতিপূর্ব্বে সেখানি গোশালারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে—সে রাত্রে যথা সাধ্য পরিষ্কার করিয়া নিয়া অনাহারে প্রভু-ভৃত্যে রাত্রি কাটাইয়া দিলাম—পর দিন যাহা হয়

একটা ব্যবস্থা করা যাইবে, চাকর মনিবে এই পরামর্শ রহিল। এইরূপ করিয়া বাসা খুঁজিয়া, বিশ্রামের স্থান খুঁজিয়া জীবনে বহু ঘুরিয়াছি, ভাল বাসা কখনও পাইয়াছি, পাই-ও নাই—আবার পাইয়াও সেখান হইতে তাড়িত হইয়াছি।

পরদিন প্রভাতে স্নানার্থ ব্রহ্মপুত্রের দিকে চলিলাম। শুনিয়াছি ব্রহ্মপুত্র-নদ; নদ এবং নদীতে কি পার্থক্য তাহা আমি আজও বুঝি নাই—সে কালে আরও না বুঝিবার কথা। আমি দেখি দুই কূলে বাঁধা-পড়া অবিরাম জলের স্রোত চলিয়াছে,—কেহ বলেন গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে, কেহ বলেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে,—যেটাই কেন ঠিক হউক না চলাটা সত্য; এবং সকলেরই একই উদ্দেশ্য—সেই নীল সাগরের শীতল বুকে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যাওয়া। দুই কূলে চাপা খাইয়া বাধা পাইয়া যাইতে বড় বিলম্ব হয় তাই সময়ে সময়ে কেহ কেহ কূল ভাঙ্গিয়া উদ্দাম গতিতে অভিলষিতের দিকে দ্রুত চলিতে থাকেন;—এই বিলম্বের সহিষ্ণুতা এবং অসহিষ্ণুতা অনুসারে নদ এবং নদী নামের সৃষ্টি হইয়াছে কি? ব্রহ্মপুত্র নদ হউন বা নদীই হউন তাহাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমার স্নান-পানের পরিমাণ জল তাহাতে যথেষ্টই ছিল এবং একদিন আগেই দেখিয়া আসিয়াছি যে জাহাজ-শুদ্ধ আমাকে এবং আমার অতগুলি সহযাত্রীকে ডুবাইয়া মারিবার মত জলও ইহাতে যথেষ্টই ছিল।

নির্ম্মল জলরাশি কূলে কূলে কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, শারদীয় সুনির্ম্মল স্বচ্ছ আকাশ নদীবক্ষে প্রতিফলিত হইয়াছে—সান্তের মধ্যে অনন্তের সমাবেশের কি সুন্দর উদাহরণ—মানুষের অপরিসর বক্ষের মধ্যে অপার প্রেম বুঝি এমনি করিয়াই বাসা বাঁধে। অনন্ত বাসনায় মানুষের বুকের মধ্যে অনন্ত উর্ম্মি প্রতিনিয়ত যেমন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, স্নিগ্ধ শরতের মন্দ বায়ু নদীবক্ষে তেমনি ঢেউ তুলিয়া কোন দূর দূরান্তরে বহিয়া যাইতেছে কে জানে? তটান্ত-মিলিত বনরাজির হরিত-শোভা দেখিয়া আমার মনে হইল যে অনন্ত-যৌবনা সুন্দরী প্রকৃতি, ধানী রঙের বেণারসী পরিয়া নদী-পুলিনের সঙ্কেত-স্থানে বাঞ্ছিতের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। প্রতীক্ষায় দুঃখ আছে এই কথাই সকলে বলে, আমি জানি এমন প্রার্থিতও আছে যাহার জন্য সারা জীবন প্রতীক্ষা করিতেও মানুষ কুণ্ঠিত হইবে না—কিন্তু হায়, মানুষের জীবন-কাল যে বড় অল্প! আশায় বসিয়া অপেক্ষা করা বড় কথা নহে, কিন্তু বাঞ্ছিত সমাগমের পূর্ব্বেই যে লোকান্তরে যাত্রা করিতে হয়, সে দুঃখ বড় দুঃখ এবং সে দুঃখ বুঝিবার যে মানুষ মেলে না, ইহার মত দুঃখ বুঝি জগতে আর নাই।

এ যে দিনের কথা লিখিতেছি সেদিনে আমি তিন সন্ধ্যা স্নান করিতাম—নিরামিষ ভোজনও আমার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। কারণ বিদ্যালয়ের শীত গ্রীষ্ম এবং পূজার অবকাশে যখন বাড়ী আসিতাম তখন মায়ের পাতের প্রসাদ লইয়া ছোট দিদির সঙ্গে আমার বচসা লাগাই ছিল। আমি বিদেশবাসী বলিয়া মা ডিক্রি আমার অনুকূলেই দিতেন। মেসে মাছ সব দিন মিলিত না, সুতরাং নিরামিষে অভ্যস্ত হইয়া যাওয়া আমার পক্ষে বড় কথা নহে। পরিধানের পারিপাট্য বিশেষ ছিল না; মনের ইচ্ছা গেরুয়াই ধরি, মা তাহাতে মহা গণ্ডগোল করিবেন জানিয়া সে চেষ্টা করি নাই, গরদ তসরের উপর দিয়াই গেরুয়ার সাধ মিটাইয়া লইতাম। বাড়ী থাকিবার সময়ে সর্ব্বক্ষণ গরদ তসর পরা চলিত না, থানধুতি পরিলে মা বড় দুঃখিত হইতেন, সুতরাং আহার করিবার সময়ে যখন মার কাছে যাইতে হইত তখন পাড়ওয়ালা ধুতি পরিয়া যাইতাম। আহারান্তে বাহিরে আসিয়া আবার থানধুতি পরিতাম। মাথার কেশ কিছু দীর্ঘই ছিল তবে জটা নহে। একথা বলিলাম তাহার কারণ পাছে কেহ আমায় সন্ন্যাসী ঠাহর করিয়া লন এই ভয়ে—আমি সন্ন্যাসী ছিলাম না, তবে পুরাপুরি গৃহীও ছিলাম না—দুইয়ের মাঝখানে এক কিস্তুত কিমাকার ব্যাপার ছিলাম। লোকে হয় ত মনে করিত জন্মান্তরের ধ্রুব বা প্রহ্লাদ আসিয়া একালে নাটোরের ঘরে পোষ্যপুত্র হইয়াছে, তবে এই সঙ্গে এ কথাও বলিয়া রাখি-

যে মানুষেরই সে ভ্রম বিশ্বাস আমি বহু পূর্ব্বেই দূর করিয়াছি—আমি যে ধ্রুব বা প্রহ্লাদ নহি তাহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

যে ঘাটে স্নান করিতে নামিয়াছিলাম সে স্থান হইতে নদী-মধ্যস্থ-দ্বীপ-সংস্থিত উমানন্দ ভৈরবের মন্দির দেখা যায়—চতুর্দ্দিকে অপার জলরাশি কলনাদে বহিয়া যাইতেছে, মধ্যে জলান্তমজ্জিত কঠিন শিলাদ্বীপের উপর ভৈরব-মন্দির নীরব নিস্তব্ধ। এ মন্দির মুখরিত করিবার জন্য দেবদাসীর নূপুরনিক্কণ নাই, বনদেবীর খাস মজলিসের অশিক্ষিতপটু নট শিখণ্ডী তাহার বিচিত্র বর্হ বিস্তার করিয়া মহাকালের নিকট নৃত্যের মোহালা দিতেছে। 'উমানন্দে বিভোর' উমানন্দ সে দিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন কিনা জানি না, আমার সে দিক হইতে চক্ষু ফিরান কঠিন হইয়াছিল। ইন্দ্রধনুর রাগানুকারী বিচিত্র বর্ণানুরঞ্জিত বিস্তৃত ময়ূরপুচ্ছ আমার সে দিনের মনঃস্থিত বিচিত্র বর্ণময় আশা ও আকাঙ্ক্ষার মত উজ্জ্বল বর্ণে আমার নয়ন মন কেমন করিয়া অপহরণ করিয়াছিল, আজ তাহা ভাল করিয়া বলিতে কি পারি? শত দুঃখের অভিঘাতে আজ কি আর মনের সে সরসতা আছে?

স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রে নদীকূলে দাঁড়াইয়া গা মাথা মুছিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে দেখি এক ধীবর এবং তাহার সঙ্গিনী দুইটি বৃহৎ মৎস্য—একটি রোহিত এবং একটি চিত্রফল্লী ওরফে চিতল্-আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া দিল এবং তাহাদের আসামী (অসমিয়া) ভাষায় আমাকে অনেকগুলি কথা বলিল, যাহার এক বর্ণেরও শাব্দবোধ আমার হইল না। আকার ইঙ্গিতে বুঝিলাম আমাকে মৎস্য দুইটি লইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। কি সর্ব্বনাশ! একে আমি নিরামিষভোজী, তাহার উপরে সঙ্গী কেহ নাই, কেবল একমাত্র চাকর নবীন আমার সম্বল—রন্ধন-কার্য্য আমাকেই করিতে হইবে এবং সে বিষয়ে নির্ল্লজ্জভাবে স্বীকার করিতেছি যে যদি কোন কারণে পাণ্ডবের ন্যায় আমাকে অজ্ঞাতবাস করিতে হইত তবে ভীমের মত সুপকার হইয়া আত্মগোপন করিতে পারিতাম না এবং এই পরিণত বয়সে আজও তাহা পারি না। আমার অদৃষ্টবিধাতার ইচ্ছায় অনেক সময়ে এখন নিজের আহার্য্য নিজে রন্ধন করিয়া লইতে হইয়াছে এবং হয়। কিন্তু তাহাতে নিজের খোরাক এবং ঠাকুর-ভোগ পর্য্যন্ত চলিতে পারে—কুকুর বিড়ালকে দিলেও তাহারা মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া যায়। পথে প্রান্তরে আমার উদ্দেশ্যবিহীন নিঃসঙ্গ ভ্রমণের সঙ্গীস্বরূপ একটি "জুয়েল কুকার" ক্রয় করিয়াছি, সেটি আমার সঙ্গেই থাকে। যেদিন তাহারই সহায়তায় ক্ষুন্নিবারণের চেষ্টা করিতে হয় সেদিন আমার প্রায় উপবাস ঘটে। আজও যদি আমার রন্ধন পটুতা এইরূপ আমার পাঠকপাঠিকা অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন, যখন আমার কুড়ি একুশ বৎসর বয়স তখন আমি রন্ধনে ভীমসেন বা তস্য পত্নী দ্রৌপদী ছিলাম না। এমন অবস্থায় পয়সা খরচ করিয়া বৃহৎ দুইটি মৎস্য কেনা নিতান্তই বৃথা হইবে তাহা বুঝিয়াও ধীবরের নির্ব্বন্ধাতিশয্য এবং ধীবর-সঙ্গিনীর মৎস্যের প্রতি এবং আমার মুখের দিকে মিনতির দৃষ্টিপাত দেখিয়া অকারণ সওদা করিয়া ফেলিলাম। উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যখন আমার গৌহাটি বসবাসের গৃহখানির (ভূতপূর্ব্ব গোশালা) দিকে চলিলাম তখন নবীনের অগ্নিমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া আমার মনে যুগপৎ ভয় এবং আনন্দ উভয় ভাবেরই আবির্ভাব হইতেছিল। যাহা ভাবিয়াছিলাম, বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গেল। কোন কথা শুনিবার আগেই নবীন 'মারমুখী' হইয়া উঠিল এবং কাহারও দিকে লক্ষ্য না করিয়া অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিল, "নাঃ, এমন লোকের সঙ্গে আর পারা যায় না। নিজে মাছ খায় না, রান্না করা বংশের মধ্যে কেহ জানিত কিনা সন্দেহ, নিজে দেখিয়া থাকিবার জন্য একখানি গোয়াল ঘর পছন্দ করিয়াছে, বারবার মাথা ভাঙ্গিলাম যে ঈশান দাদাকে সঙ্গে করিয়া নিই (ঈশান দাদা আমার পিতামহের সময়ের প্রাচীন পাচক, সে আজও জীবিত আছে, আমাদের কলিকাতার বাড়ীতে থাকে, কিছু কিছু করিয়া পেনশন পায়) সে কথা গ্রাহ্য হইল না। এখন কিনিয়া

বসিলেন দেড়মণ মাছ, কে সে মাছ কাটিয়া কুটিয়া দেয়, কে রাঁধে আর কেই বা খায়? আর যদি কখনও তোমার সঙ্গে কোথাও আমি বাহির হই তবে আমার নাম নবীন নহে একথা জানিও—হ্যাঁ।" নবীনের কথায় রাগ কোনদিনই করি নাই, সে দিনও রাগ হইল না বরং হাসিই পাইতেছিল। কিন্তু সে সময়ে হাসিলে নবীনের রাগ পড়িতে বহু বিলম্ব হইবে ভাবিয়া বহু কষ্টে মুখভার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। স-সঙ্গিনী ধীবর রকম দেখিয়া ভাবিল নবীনই মুনিব আমি তাহার চাকর। বিনা অনুমতিতে বেশী মূল্যে মাছ কিনিবার অপরাধে আমি বকুনি খাইতেছি এই ভাবিয়া বিষণ্ণমুখে মাছ দুইটি তুলিয়া নিয়া প্রস্থান করিবার উদ্যোগে ছিল, আমি হস্তদ্বারা যখন নিষেধ করিলাম তখন তাহারা উভয়েই নবীনের মুখের দিকে চাহিল। ধীবর ও ধীবরপত্নীর এই ব্যবহার দেখিয়া সমস্ত ঘটনার হাস্যরসটি নবীনের মনে সহসা জাগিয়া উঠায় তাহারও মুখে হাসির রেখা দেখা গেল। আমিও বাঁচিলাম স-সঙ্গিনী ধীবরও নিষ্কৃতির নিঃশ্বাস ফেলিয়া রক্ষা পাইল। অতঃপর সমস্যা কে মাছ কুটিয়া দেয়, কে রাঁধে এবং কে খায়? নবীন বলিল,"টাকা আমার কাছে যতক্ষণ আছে, তুমি বলিলেই খরচ করিব, কিন্তু রাঁধিবার বাড়িবার দায় আমার নহে, সে কথা আগেই স্পষ্ট বলিতেছি।" আমি অনন্যোপায় হইয়া ধীবর-জায়াকে ইঙ্গিতে মাছ কুটিয়া দিতে বলিলাম। সে কিছু অধিক প্রাপ্তির আশায় আমার প্রস্তাব সহাস্যে অনুমোদন করিয়া বঁটির জন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিল। যাঁহাদের বাড়ীর এক উপান্তভাগে আমাদের ঐ ঘরখানি, সেই বাড়ীর গৃহিণীর নিকট হইতে ধীবরপত্নী বঁটি চাহিয়া আনিল এবং আমি অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে, এ সওদা তাঁহারই জন্য করিয়াছি একথা কথা জানাইয়া দিলাম এবং ধীবর-পত্নীকে বলিলাম, "বাড়ীর মধ্যে গিয়া মাছ কুটিয়া গৃহিণীমাতার নিকট সব মাছ দিয়া দাও।" সে আমার কথা মতই কাজ করিল। কিছুকাল পরে একটি ৯।১০ বৎসরের বালিকা আসিয়া আমাকে বলিল, "মা বল্লেন, তুমি ও তোমার চাকর আমাদের ঘরেই খেও। এবেলা আর তোমরা রান্না করিও না।" কথা শুনিয়া নবীনের মুখ প্রসন্ন হাস্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আমারও এক সন্ধ্যার ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ জুটিল। বলা বাহুল্য মাছ কুটিয়া দিবার জন্য ধীবর-পত্নী মৎস্যের মূল্য অপেক্ষা কিছু বেশী টাকাই আমার নিকট হইতে পাইল এবং দ্বিপ্রহরের আহারটাও স্বামীস্ত্রীর সেইখানেই হইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় গৃহস্থ বাবুর সঙ্গে তাঁহাদের সখের থিয়েটারের রিহার্সেল দিতে গেলাম। অধিক মূল্যে মাছ কেনা এবং আমার সঙ্গের বাক্স পেটারা দেখিয়া বাবুর মনে কি জানি কেন ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে, অর্থলোভে তাঁহাদের থিয়েটারের বাদকরূপে চাকরি স্বীকার করিবার মত আর্থিক দুরবস্থা আমার নহে। বাবুসম্প্রদায়ের একজন পুনরায় প্রকারান্তরে সে কথা সেদিনও উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়া মাত্র আমার আশ্রয়দাতা বাবু বলিলেন, "না হে, এ ব্যক্তি ছদ্মবেশী, কে আমি জানি না, তবে ইহা নিশ্চয় যে ইনি চাকরী স্বীকার করিয়া এ কার্য্য করিবেন না। এ অনুমান আমার সত্য কি মিথ্যা তাহা ইঁহাকেই না হয় জিজ্ঞাসা কর। এই কথার পরে সমবেত বাবুদের জোড়া জোড়া চক্ষু আমার সর্ব্বাঙ্গে বিঁধিতে লাগিল, আমি একরূপ অভিভূত হইয়া পড়িলাম। নিতান্ত অসংলগ্নভাবে জড়িত স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলাম:—আজ্ঞা না তা নয়, চাকরি সবাই করিতে পারে, বেতনাদি কিরূপ পাওয়া যাইবে তাহা জানিলে তবে বলিতে পারি। আমার বাড়ী অনেক দূরে, মোটা বেতন না পাইলে এতদূরে বাসা খরচ করিয়া খাইয়া পোষায় কি? আপনারাই বিবেচনা করুন।" আর কেহ কথা বলিবার পূর্ব্বেই যে বাবুটি আমাকে ছদ্মবেশী কঙ্ক, বল্লভ বা সৈরিন্ধ্রী মনে করিয়াছিলেন (শেষোক্তটি ভাবিয়া লওয়াই সম্ভব, কারণ তখন মাথার কেশ দীর্ঘ ছিল এবং বদনমণ্ডলে রোমরাজি তাদৃশ আধিপত্য তখনও বিস্তার করিতে পারে নাই। 'বল্লভ' যে ভাবেন নাই, তাহা আমার অন্তরাত্মাই বলিয়া দিতেছিল) তিনি সর্ব্বপ্রথমে বলিলেন,"যাই বলুন

মহাশয়, আমি আপনার সঙ্গের লোকটির রকম সকম এবং আপনার বিছানা বস্ত্রের পরিপাট্য দেখিয়াই বুঝিয়াছি যে আপনি হীনাবস্থার লোক নহেন।”

আমি। হীনাবস্থার লোক না হইলেই যে চাকরী করিতে পারে না এমন কি কথা মহাশয়?

বাবু। তাহা নয়, তবে আমরা কতই বেতন দিতে পারি যে আপনার মত লোককে রাখিব?

আমি। আমি কত চাহিব তাহাওত আপনারা এখনও জানেন না—বিশেষতঃ এটি স্থায়ী চাকরী সম্ভবতঃ নহে, যে কয়দিন রিহার্সাল চলে এবং যে কয়দিন অভিনয় হইবে সেই কয়দিনের চাকরী—তা থোকা-মোক্তা বন্দোবস্ত একটা হইলেও আমি স্বীকার করিতে পারি না এমন কথা ত আমি বলি নাই।

আমার থোকা বন্দোবস্তের কথা শুনিয়া দলের অপরাপর বাবুদিগের মুখ হর্ষোজ্জল হইয়া উঠিল। হয়ত তাঁহারা ভাবিলেন, যাক, কিছু দিয়া ইহাদ্বারাই কাজটা ভাল করিয়া চালাইয়া লওয়া যাইতে পারিবে বোধ হইতেছে। বাবুদের মধ্যে অনেক পরামর্শ চলিতে লাগিল, অবশ্য সব কথা আমি শুনিতে পাই নাই। পূজার যে কয়দিন বাকি আছে, যে কয়দিন আর রিহার্সেল হইবে, যে কয়দিন ষ্টেজ এবং ড্রেস্-রিহার্সেল, যে কয়দিন লোক সমক্ষে অভিনয় সব হিসাব করিয়া দেখা গেল আরও প্রায় কুড়িদিন আমাকে রাখিতে হয়। নানা বাগ্‌বিতণ্ডা বচসা পরামর্শ করিয়া সকলের মুখপাত্রস্বরূপ একটি অর্দ্ধপ্রাচীন বাবু আমায় বলিলেন “আমরা সকলেই গরীব, দূরদেশে পেটের ধান্দা করি, বেশী অর্থব্যয় করিয়া আমাদের আমোদ করা কি সাজে, না শক্তি আমাদের আছে? আমরা চাঁদা করিয়া এই অনুষ্ঠানটি করিয়াছি, সাহায্য করিবার মত বড়লোকও এ দেশে অধিক নাই, আপনাকে কিছু নিয়া আমাদের কাজটি চালাইয়া দিতে হইবে বিশেষ আপনি ‘গুণী’ লোক, সঙ্গীতাদির আনন্দের জন্যও ত ইহা আপনার করা উচিত—কি বলেন?

আমি। আমি কি বলিব? কি দিবেন তাহা ত এখনও শুনিতে পাইলাম না।

অনেক ইতস্ততঃ করিয়া বৃদ্ধবাবু বলিলেন, “মহাশয় আমরা কষ্টে সর্ব্বসাকুল্য কুড়িদিনে একশত টাকা দিতে পারি, তাহাও অতিকষ্টে।”

আমি। মহাশয়, কলিকাতা হইতে কোন লোক আনিতে হইলে পাঁচশত টাকার কমে হইত কি?

বাবু। হইত না, সেই জন্য আনিও নাই। মহাশয়, ঐ একশত টাকা লইয়াই স্বীকার করুন।

আমি। বিশেষ ভাবিবার ভাণ করিয়া বলিলাম, দেড়শত টাকা দিবেন, তাহা হইলে স্বীকার করি।

বৃদ্ধ রাজি নহে কিন্তু যুবকের দল উৎসাহে অধীর হইয়া পড়িয়াছে—এতবড় ‘গুণী’ লোক সহসা কি মেলে!! তাহারা বলিল, “মহাশয় দেড়শতই দিব—না হয় আপনাকে এই অতিরিক্ত টাকাটা দিবার জন্য বিজ্‌নি, গৌরীপুর কোথাও গিয়া রাজধানীতে ভিক্ষা মাগিয়া এ টাকা সংগ্রহ করিবই। আপনি থাকুন মহাশয়, ঐ দেড়শতই স্থির রহিল।

আমি। আচ্ছা তাই হইবে তবে আমায় কিছু অগ্রিম দিতে হইবে—আমার বাসা খরচ চলা ত চাই। চাল ডাল কিনিব কি দিয়া? আর আজ নহে, দিন তিনেক পরে আমায় একটি দিনের ছুটি দিতে হইবে, একবার কামাখ্যা মাতাকে দর্শন করিয়া আসিব। একটি বিশেষ দিনে মার কাছে পূজা মানসিক আছে, সেটি স্বয়ং গিয়া দিতে হইবে।

হিন্দুর সন্তান মানসিকের নামে ভয় পায়, সুতরাং ছুটি মঞ্জুর হইতে বিশেষ আপত্তি হইল না, কিন্তু অগ্রিম বেতনের কথায় আমার আশ্রয়দাতা বাবু বলিলেন, “সে কি মহাশয়, আপনার আবার বাসা খরচ কিসের? আপনি রাঁধিয়া খাইয়া আমাদের শিখাইবার সময় কখন পাইবেন? আমাদের ঘরেই আপনার এবং আপনার সঙ্গের লোকটির আহার হইতে পারিবে। আমরা গরীব বটে তবে ব্রাহ্মণকে দুটি অন্ন দিতে কাতর হইব এমন পাষণ্ড আজও হই নাই।

বাবুর অন্নদানের নিষ্ঠা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, কারণ নবীন শূদ্র—ধর্ম্মভয়ে তাহার স্পৃষ্ট অন্ন আমায় দেয় না। সুতরাং "বিষ্ণুপুরী ভার" আমাকেই লইতে হয়। ও কার্য্যে পটু নহি তাহা আগেই বলিয়াছি। বাবুর নিকটে স্বীকার করিলাম, "তাহাই হইবে।"

সে দিনের মত রিহার্সেল অন্তে সভা-ভঙ্গ হইল। দেড়শত টাকার বিনিময়ে তবলা এস্‌রাজ বাঁশী বাজাইতে, সীন টানিতে, প্রম্‌ট করিতে, ষ্টেজ-ম্যানেজ করিতে, প্রয়োজন হইলে ছোটখাট পার্ট লইতে এবং সর্ব্বোপরি মোশন মাষ্টারি করিতে রাজি হইয়া সকলে বাসায় ফিরিলাম।

রাত্রে শয়ন করিয়া নবীনকে সব কথা বলিলাম। সে ত অগ্নি অবতার। "কি! রাজার ছেলে হইয়া টাকা নিয়া থিয়েটার করিবে এ দুর্ব্বুদ্ধি তোমার কেন হইল? এরূপ যদি কর তাহা হইলে তুমি কে এবং কি জন্য এ দেশে আসিয়াছ সব কথা আমি বাবুকে বলিয়া দিব, তোমার কোন নিষেধ আমি শুনিব না।" আমি প্রমাদ গণিলাম—বলিলাম, "দোহাই তোর নবীন, তুই মজাটা মাটি করে দিস্ না, আমি স্বীকার করিতেছি টাকা লইব না।" নবীন বলিল, "তা যেন হইল, কিন্তু নিত্য এই পরের পাতড়া মারা, সেটা কি ভাল হইতেছে? কর্ত্তা-মা (আমার মাতা) শুনিলে কি বলিবেন?" আমি বলিলাম "নতুবা আমাকে রাঁধিতে হয় যে,—আমি যে রাঁধিতে জানি না তা ত তুই জানিস্।"

নবীন। সেই জন্যই ত ঈশান দাদাকে সঙ্গে আনিতে বলিয়াছিলাম।

আমি। যাহা হয় নাই সে জন্য আর অনুযোগ করিয়া কি হইবে? এই পরান্ন গ্রহণের জন্য না হয় বাড়ী গিয়া একটা প্রায়শ্চিত্ত করা যাইবে, কি বল নবীন?

নবীন। রাজার ছেলে এমন করিয়া দেশে দেশে ফেরে এ কেবল রূপকথায় শোনা যায়, তুমি তাহা চক্ষে দেখাইলে যাহক্।

এই বলিয়া সে রাগে গর্ গর্ করিতে লাগিল—তাহাকে নানা কথা বলিয়া বুঝাইয়া তাহার রাগ শান্ত করিলাম এবং যথা-বিধি প্রায়শ্চিত্ত করিবই এই কথা বলিয়া তাহার সহিত সন্ধি করিলাম—নতুবা সে যদি রাগিয়া সব কথা বলিয়া ফেলে তবে আমোদটা মাটি হয় যে।

কয়েকদিন নিত্য নিত্য রিহার্সেলে যাই, এস্‌রাজে ছড়ি চালাইয়া তাহাকে কাঁদাইয়া তুলি, বাঁশীর মধ্যে ফুঁ দিয়া হয়রান্ হইয়া পড়ি, প্রম্‌ট্ করি এবং আক্‌শান মোশন শিখাইবার ছলে অতগুলি ভদ্র সন্তানের উপর কর্ত্তৃত্ব করি—আমার নিঃসঙ্গ এবং নিষ্কর্ম্মা দিনগুলি কোন প্রকারে ভরপুর হইয়া থাকে। দিন আমার বেশ কাটিতে লাগিল কেবল মধ্যে মধ্যে নবীনের অপ্রসন্ন মুখ এবং শাসানি আমাকে কাতর করিয়া তুলিত, আমি নানা স্তোক-বাক্যে তাহার সঙ্গে সন্ধি করিয়া লইতাম।

এক রবিবারে বশিষ্ঠাশ্রম দেখিবার হুজুগ তুলিয়া দিলাম, পাঁচ ছয়টি বাবু আমার সঙ্গী হইলেন—বলা বাহুল্য যে গাড়ী ভাড়া তাঁহাদেরই স্কন্ধে তাঁহারা স্বেচ্ছায় তুলিয়া লইলেন। সেখানের আহারাদির ভার আমি লইলাম। বলিলাম যে, সে দিনটি আমার প্রমাতামহের শ্রাদ্ধের দিন, সেদিনে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে পুণ্য সঞ্চয় হইবে, সেই জন্য চাকর হইয়াও তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার সাহস পাইতেছি। আমার বিনয়ে বাবুর দল সন্তুষ্ট মনে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন পুণ্য-ভূমিতে পরান্ন গ্রহণ করিব না জানিয়া নবীনের মুখ নবীন প্রভাতের মতই প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

বশিষ্ঠাশ্রম গৌহাটি সহর হইতে কিয়দ্দূরে—পুণ্যভূমিতে পঁহুছিবার কিছু পূর্ব্বেই নির্ঝরের কলঝঙ্কার শোনা যায়—আজ আর সেখানে ব্রহ্মর্ষির তপঃকুটীর নাই, উটজ-প্রাঙ্গণে আজ আর হোমধেনু বিচরণ করিয়া বেড়ায় না, মন্ত্ররাণী গায়ত্রীর তুষ্টি কামনায় সেখানে ঋষি-মূর্ত্তি আজ ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া নাই, অরুন্ধতীর সেবা-হস্তের পরিচর্য্যায় আশ্রম-অতিথির পথক্লেশ আজ দূর হয় না, কিন্তু ঋষিশ্রেষ্ঠের তপোমাহাত্ম্যে সে বনভূমি আজও পরম মহিমায় মণ্ডিত হইয়া বসিয়া আছে; বৃক্ষ

বল্লরীর তেমনি হরিতদ্যুতি, শস্পস্তীর্ণ ভূখণ্ডের তেমন কোমলতা, নির্ঝরের কলকণ্ঠের তেমন মাধুর্য্য আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া আজ মনে পড়ে না। সমস্ত দিন সেখানে থাকা গেল, সকলে মিলিয়া রন্ধনাদি কোন মতে শেষ হইল, আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে করিতে এস্রাজের সহিত কণ্ঠসঙ্গীতের চর্চ্চা চলিল—বলা বাহুল্য যে উহাও সেই অভিনয়ের অঙ্গীয় সঙ্গীত—ইহাও সেই রিহা-র্সেলেরই অঙ্গ—বন-ভোজনের আনন্দের মধ্যেও প্রভুভৃত্য সম্পর্কটা বজায় রহিয়াই গেল—ও সম্বন্ধ-টাই ভাল নয়।

যে নির্দ্ধারিত দিনে আমাকে কামাখ্যা পাহাড়ে যাইতে হইবে সে দিন আসিল, আমি আমার মুনিব সঙ্ঘের নিকট একদিনের বিদায় লইয়া যাত্রার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলাম। ইতিপূর্ব্বে একজন পাণ্ডা স্থির করিয়াছিলাম, সে কহিল পর্ব্বতারোহণের পূর্ব্বে উমানন্দ ভৈরবের দর্শন এবং পূজা শেষ করিতে হইবে। উমানন্দ নির্জ্জন দ্বীপে আনন্দমগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার দরবারে হাজিরা দিতে পারের কড়ি দিয়া নৌকায় পার হইতে হয়—যদিও ইহা বৈত-রণী নহে তথাপি সেখানের নৌকার গঠন-প্রণালী এবং তরণী বাহিবার পদ্ধতি দেখিলে ইহাকে বৈতরণীর দ্বার বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। একটি তালবৃক্ষের ডোঙা—তাহাতে উঠিতে নামিতেই বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে এ আশঙ্কা প্রতিনিয়তই হয়, কোন প্রকারে মাঝি এবং পাণ্ডার গলা জড়াইয়া (তবুও একটি ভাল মানুষ মিলিল না) নৌকায় চড়িয়া বসিলাম। প্রতিকূল স্রোতে নৌকা বাহিয়া দুই রশি স্থান যাইতে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগিল। মাঝি যখন প্রতিকূলের স্রোতে নৌকা ঠেলিয়া শ্রান্ত হয়, তখন আমি তাহাকে সাহায্য করি—এইরূপে বহুশ্রমে উমানন্দের আনন্দ ভবনের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। উজান স্রোতে চলিয়া বড় শ্রান্তই হইয়াছিলাম, উমানন্দের পদতলে অনেক মিনতি করিয়া সে দিন বলিয়াছিলাম, "প্রভু, উজান বাহিয়া আর যেন চলিতে না হয়।"—বিশ্ব-



বশিষ্ঠাশ্রম।

ভুবনের ঈশ্বরের দ্বারে আমার মিনতি পঁহুছিবে, এমন পুণ্য কি আমি করিয়াছি? থাক্ সে কথা। সেখান হইতে পূজা দিয়া হরিশ্চন্দ্রের নির্ম্মিত পার্ব্বত্য-পথে মাহামায়ার মন্দিরের দিকে ধীরে ধীরে চলিলাম। পর্ব্বতারোহণে শ্রম আছে, কিন্তু আসাম প্রদেশের আশ্বিন মাস আমাদের সমতলক্ষেত্রের আশ্বিন অপেক্ষা ঠাণ্ডা। শ্রান্ত হইয়া পথে অল্পক্ষণ দাঁড়াইলেই শীতল বাতাসে শরীর জুড়াইয়া যায়। এইরূপ বিশ্রাম করিতে করিতে পার্ব্বত্য-পথ শেষ হইয়া গেল। পরে সমতলক্ষেত্র পাইয়া হাঁফ ছাড়িলাম। পাণ্ডার ইচ্ছা সে দিন তাহার বাড়ীতে বিশ্রাম করিয়া পরদিন প্রভাতে মহামায়ার দর্শনে যাই। আমার কিন্তু বিলম্ব সহ্য হইতেছিল না। আমি তাহাকে পূজার আয়োজন শীঘ্র করিতে বলিয়া মন্দির দ্বারে এক বৃক্ষতলে বসিলাম। বহু দিনের অভিলাষ ছিল,



কামাখ্যাদেবীর মন্দির।

কামরূপ ভূমি দেখিব, সেই অভিলষিত দেবধানীতে, দাক্ষায়ণীর প্রত্যঙ্গ-স্পর্শ জনিত পুণ্যপীঠে বসিয়া মহাকালের মহাবিরহের দুঃখ-তাণ্ডব আমার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। ভাবিলাম মহাবিবেকী মহাকাল যদি অত ব্যাকুল হইয়া থাকেন, তবে মর্ত্ত্যের মানব যে প্রিয়-বিরহে পাগল হইয়া দেশছাড়া, ঘরছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া হইবে, প্রতি পাদক্ষেপে যে মরণের দিকে ছুটিয়া চলিবে সে কি আশ্চর্য্যের বিষয়? মহেশ্বর ত অর্দ্ধনারীশ্বর হইয়া চিরদিনের জন্য বিরহ-বিচ্ছেদের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। মর্ত্ত্যমানবের দুর্দ্দশার কথা কি অন্তর্য্যামী দেবতার কখনও মনে পড়ে না?

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

পৃথিবীর পুরাবৃত্ত*



লর্ড কেলভিন।

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

পৃথিবীর উৎপত্তি

আজ আমরা আমাদের "ধনধান্য পুষ্পভরা বসুন্ধরা"র মাতৃমূর্ত্তির সঙ্গে এত নিবিড়ভাবে পরিচিত যে, কখনও যে আমাদের এই "জগৎ" জননীর আবার শৈশব, কৈশোর বা যৌবনাবস্থা ছিল, তাহা সহজে আমাদের কল্পনাতেও আসে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিরদিন তাঁহার এ মূর্ত্তি ছিল না।

বিমানচারী নীহারিকালোকে তাঁহার জন্ম, প্রবল কম্প আন্দোলন এবং শীতাতপের মধ্যে তাঁহার বৃদ্ধি, এবং লক্ষ লক্ষ বৎসরের পরিবর্ত্তনের ফলে, তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণতি!

* চৈতন্য লাইব্রেরী হইতে "বিশ্বম্ভর সেন" পারিতোষিক-প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

পৃথিবীর জীবনের এই ক্রম-বিকাশের ইতিহাসই আমাদের বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচ্য। আজি পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সাহায্যে আমরা সরলভাবে এই কথার আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

[নীহারিকাবাদ] পৃথিবী যে আদিম যুগে অন্তরীক্ষচারী নীহারিকামণ্ডল হইতে জন্মলাভ করিয়াছিল, এ বিষয়ে সাক্ষ্য ও প্রমাণের অভাব নাই। নীহারিকার প্রকৃতি এবং বিশেষত্বের সঙ্গে পৃথিবীর প্রকৃতির তুলনা করিলেই একথার যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে।



নীহারিকা (স্ক্রু—আকৃতি)

অনন্ত বিস্তৃত বিশ্বজগতের দিকে লক্ষ্য করিলে, দেখা যায় যে, এক একটি সূর্য্য এবং তাহার প্রদক্ষিণ-কারী গ্রহ ও উপগ্রহের সমষ্টি লইয়াই, এক একটি সৌরজগৎ গঠিত।

এই সকল সৌরজগতের অন্তর্গত গ্রহ এবং উপগ্রহগুলি এক একটি বিশেষ নিয়মাধীন। প্রত্যেক সৌরজগতের গ্রহ এবং উপগ্রহগুলি প্রায় একই সমতলে অবস্থিত থাকিয়া, একই মুখে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। একটু ধীরভাবে এই বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, এই সকল সৌরজগতের অন্তর্গত গ্রহ এবং উপগ্রহমণ্ডলী যদি কোন সময়ে একই বৃহত্তর এবং বিস্তীর্ণতর পদার্থবিশেষের অন্তর্ভুক্ত না থাকিত, তাহা হইলে এই সকল গ্রহ এবং উপগ্রহের



নীহারিকা (অঙ্গুরীয়াকৃতি)

আবর্ত্তন প্রণালীর কখনই এ প্রকার বিশেষত্ব দেখা যাইত না।

পরীক্ষা স্বরূপে একটি সিক্তবস্ত্র গোলককে তাহার অক্ষদণ্ডের উপর দ্রুতবেগে ঘুরাইয়া দেখিলেই এ কথার যাথার্থ্য বুঝা যাইবে। বস্ত্রগোলক ঘুরিতে আরম্ভ করিলেই দেখা যাইবে যে, বস্ত্রগোলক যেদিকে ঘুরিতেছে তাহা হইতে নিঃসৃত জলকণিকাগুলিও তাহার সহিত একই সমতলে থাকিয়া, সেই দিকেই ঘুরিবার চেষ্টা করিতেছে।

সুতরাং সৌরজগতভুক্ত সূর্য্য এবং গ্রহ উপগ্রহাদি, যদি কোন সময়ে একই সামগ্রীর অন্তর্গত না থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে এইরূপ নিয়ম রক্ষা করিয়া, একই অভিমুখে ঘুরা সম্ভবপর হইত না। সুতরাং ইহা হইতে সহজেই অনুমাণ করা যায় যে, আমাদের পৃথিবীও এক সময়ে সৌরজগতভুক্ত অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহাদির সঙ্গে একই বিস্তীর্ণতর ও সূক্ষ্মতর সামগ্রী-বিশেষের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সামগ্রী কি, সে সম্বন্ধে মনীষিবৃন্দ আলোচনার ক্রটী করেন নাই।

[নীহারিকা] আমরা আকাশের স্থানে স্থানে শ্বেত-বর্ণ ধূমের ন্যায় অথবা শুভ্র মেঘখণ্ডের ন্যায় যে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী দেখিতে পাই তাহাদের নীহারিকা কহে। বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর মতে এই নীহারিকাই সৌরজগত সৃষ্টির উপাদান কারণ।

এই নীহারিকামণ্ডলী সংখ্যায় যেমন অনন্ত আকারেও তেমনি বিচিত্র। শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যে আকাশে প্রায় পাঁচ লক্ষ নীহারিকা দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি অঙ্গুরীয়াকৃতি কতকগুলি ক্ষীণ ছটামণ্ডিত থালার ন্যায়, কতকগুলি বিষমাকৃতি এবং কতকগুলি আবার স্ক্রুর প্যাঁচের মত।

নীহারিকার সর্ব্বাঙ্গের ঘনতা সমান নহে। ইহার দেহের স্থানে স্থানে ঘনতর এবং উজ্জ্বলতর অংশ লক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ উত্তরকালে এই ঘনতর অংশগুলি গ্রহে এবং উজ্জ্বলতর অংশগুলি সূর্য্যে পরিণত হয়।

যে নীহারিকা হইতে আমাদের পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে—তাহার প্রকৃতি ঠিক কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর মধ্যে এখনও মতভেদ আছে। লর্ড রস্ (Lord Ross) তাঁহার দূরবীক্ষণের সাহায্যে প্রথমে নির্ণয় করেন যে নীহারিকামণ্ডলী পুঞ্জীভূত নক্ষত্রসমষ্টি মাত্র। লর্ড রসের এই আবিষ্কারের পর অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে উপযুক্ত পর্য্যবেক্ষণের ফলে অব-শেষে সমস্ত নীহারিকাই নক্ষত্রপুঞ্জ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কিন্তু কিছুকাল পরে সার উইলিয়াম হগিন্স (Sir William Hoggins) নীহারিকার আলোক বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন যে নক্ষত্রপুঞ্জরূপী নীহারিকা ব্যতীত সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপাদানে গঠিত নীহারিকামণ্ডলীও বিশ্বজগতে বিদ্যমান।

সকলেই দেখিয়া থাকিবেন যে কাঁচের ঝাড়ের ত্রিকোণাকৃতি দোলকের মধ্য দিয়া দেখিলে নানা বর্ণের আলোক দেখা যায়। সূর্য্যালোক এই দোলকের মধ্য দিয়া যাইবার সময়ে বিশ্লিষ্ট হওয়াতেই এইরূপ নানা বর্ণের আলোক উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এইরূপ দোলকাকৃতি কাচের সাহায্যে একরূপ যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তাহাকে আলোকবিশ্লেষক যন্ত্র (spectroscope) বলে; এবং এই যন্ত্রের সাহায্যে যে নানা বর্ণের আলোক দেখা যায় তাহাকে বর্ণচ্ছত্র (spectrum) বলে।

আলোক বিশ্লেষক যন্ত্রের সাহায্যে সাধারণতঃ তিন প্রকারের বর্ণচ্ছত্র দেখা যায়—

১। নিরবচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্র (continuous spectrum)

যে বর্ণচ্ছত্রে নীল হইতে লোহিত পর্য্যন্ত সপ্ত প্রকার বর্ণই অবিচ্ছিন্ন ভাবে পাশাপাশি বিদ্যমান থাকে তাহাকে 'নিরবচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্র' কহে। প্রজ্জ্বলিত কঠিন, তরল বা ঘন বাষ্পের এইরূপ বর্ণচ্ছত্র দেখা যায়।

২। উজ্জ্বল-রেখাচিহ্নিত বর্ণচ্ছত্র (Bright line spectrum.)। যে বর্ণচ্ছত্রের মধ্যে মধ্যে সারি সারি উজ্জ্বল রেখা থাকে তাহাকে উজ্জ্বল 'রেখাচিহ্নিত বর্ণচ্ছত্র' কহে। প্রজ্জ্বলিত সূক্ষ্ম বাষ্পের এইরূপ বর্ণচ্ছত্র দেখা যায়। প্রত্যেক রাসায়নিক মূল পদার্থের রেখা ভিন্ন প্রকা-

য়ের হইয়া থাকে সুতরাং এইরূপ বর্ণচ্ছত্রের সাহায্যে কোন পদার্থের রাসায়নিক প্রকৃতি সহজেই নির্ণীত হইতে পারে।

৩। কৃষ্ণরেখাচিহ্নিত বর্ণচ্ছত্র (Dark line spectrum)।

যে বর্ণচ্ছত্রের মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবর্ণের অবকাশ দেখা যায় তাহাকে কৃষ্ণরেখা চিহ্নিত বর্ণচ্ছত্র কহে।

যে স্থলে কোন উজ্জ্বল পদার্থের চারিদিকে এমন কোন পরিবেষ্টন থাকে যাহা উক্ত পদার্থনিঃসৃত আলোকের কিয়দংশ শোষণ করিয়া লইতে সমর্থ সেই স্থলে এইরূপ বর্ণচ্ছত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্র এই প্রকারের বর্ণচ্ছত্র।

সূর্য্যের মধ্যদেশ যেরূপ প্রজ্জ্বলিত এবং ঘনীভূত বাষ্পগঠিত, তাহাতে সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্র নিরবচ্ছিন্ন বর্ণচ্ছত্র হইবারই কথা। কিন্তু সূর্য্যের চারিদিকে যে আবেষ্টন আছে তাহা সূর্য্যালোকের কিয়দংশ শোষণ করিয়া লওয়াতেই সূর্য্যের বর্ণচ্ছত্র নিরবচ্ছিন্ন না হইয়া কৃষ্ণরেখা-চিহ্নিত হইয়া থাকে।

নীহারিকার আলোক অত্যন্ত ক্ষীণ হইলেও সার উইলিয়ম হগিন্স ১৮৬৪ সালে সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার করেন যে নীহারিকার বর্ণচ্ছত্র উজ্জ্বল-রেখাচিহ্নিত।

ইহা হইতে অনুমিত হয় যে নীহারিকাগুলি প্রজ্জ্বলিত সূক্ষ্ম বাষ্পগঠিত। বহুদিন পূর্ব্বে (১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে) সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী জ্যোতির্ব্বিৎ লাপ্লেসও (Laplace) ঠিক এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন।

বর্ণচ্ছত্রস্থিত উজ্জ্বল রেখাগুলির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া হগিন্স সিদ্ধান্ত করেন যে নীহারিকাগুলি প্রধানতঃ অজ্ঞাত গ্যাস নেবুলিয়াম (Nebulium) হাইড্রোজেন (Hydrogen) এবং দুষ্প্রাপ্য গ্যাস হেলিয়াম (Helium) নির্ম্মিত।

পরবর্ত্তীকালে সূক্ষ্মতর পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয় যে নীহারিকামণ্ডলী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ইহাদের এক-শ্রেণীর বর্ণচ্ছত্র পূর্ব্বোক্ত প্রকারের উজ্জ্বলরেখা চিহ্নিত এবং অপর শ্রেণীর বর্ণচ্ছত্র কৃষ্ণরেখা চিহ্নিত।

পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর নীহারিকার সংখ্যা শতাধিক নহে; অধিকাংশ নীহারিকাই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত।

সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর নীহারিকা প্রজ্জ্বলিত সূক্ষ্ম-বাষ্পগঠিত হইলেও অধিকাংশ নীহারিকারই উপাদান সূর্য্য এবং সাধারণ নক্ষত্রের অনুরূপ। সুতরাং এই সকল নীহারিকার বহিরাবরণ তাহাদের মধ্যবর্ত্তী উপাদান অপেক্ষা শীতলতর।

যে অল্পসংখ্যক নীহারিকার উজ্জ্বলরেখাচিহ্নিত বর্ণচ্ছত্র দেখা যায়, সম্ভবতঃ তাহাদের চারিদিকে একটা অত্যুষ্ণ বাষ্পের আবেষ্টন থাকাতেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। এই বাষ্প শীতল হইলে ইহাদের বর্ণচ্ছত্রও সাধারণ নীহারিকার বর্ণচ্ছত্রের মত কৃষ্ণরেখা চিহ্নিত হওয়া অসম্ভব নহে।

[উল্কাবাদ] লর্ড কেলভিনের (Lord Kelvin) মতে নীহারিকার বাষ্পরাশি সাধারণ বায়ু অপেক্ষা দশলক্ষগুণ সূক্ষ্মতর। সুতরাং নীহারিকাবাদের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে এত সূক্ষ্ম বাষ্প কিরূপে এতকাল কেবল নিজের উত্তাপে প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় থাকিতে পারে তাহা বুঝা যায় না। এরূপ সূক্ষ্ম পদার্থের তাপ অতি শীঘ্রই বিকীর্ণ হইয়া যাইবার কথা। সুতরাং অল্পকালের মধ্যেই এই সকল নীহারিকার সম্পূর্ণ শীতল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সার নরম্যান লকইয়ার (Sir Norman Lockyer) প্রবর্ত্তিত উল্কাবাদ এই আপত্তির খণ্ডনে সমর্থ হইয়াছে।

সার নরম্যান লকইয়ার এবং তাঁহার অনুগামী শিকাগোর অধ্যাপক টি সি চেম্বার্লিন সাহেবের (T C Chamberlin) মতে নীহারিকামণ্ডলী প্রজ্জ্বলিত বাষ্প গঠিত নহে, ইহারা অসংখ্য কঠিন উল্কাপিণ্ডের সমষ্টিমাত্র। রাত্রে মেঘহীন আকাশে মাঝে মাঝে যে "তারাখসা" দেখা যায়, উল্কা বলিতে তাহাদেরই বুঝায়।

উল্কাপিণ্ড সাধারণতঃ শীতল এবং আলোকহীন। ঘুরিতে ঘুরিতে যখন ইহারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আসিয়া পড়ে তখনই ইহার বায়ুর সহিত সংঘর্ষবশতঃ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। এইজন্য আমরা ক্ষণেকের জন্য ইহাদিগকে প্রজ্জ্বলিত ধূলিরূপে

দেখিতে পাই। ইহাই আমাদের সুপরিচিত "তারা খসা" বা "নক্ষত্রপাত।"

নীহারিকার মধ্যস্থিত উল্কারাশিও এই কারণে পরস্পরের সহিত সংঘর্ষের ফলে অত্যুষ্ণ হইয়া উঠে এবং ক্রমাগত জ্বলন্ত বাষ্পরাশি উৎপন্ন করিতে থাকে। এই জন্যই উল্কানির্ম্মিত নীহারিকাকে এমন উজ্জ্বল ও বাষ্পময় দেখায়।

কিন্তু উল্কাবাদের দ্বারা নীহারিকার তাপরক্ষাসমস্যার সমাধান হইলেও উল্কাবাদের বিরুদ্ধেও এক প্রকারের আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। আলোকবিশ্লেষক যন্ত্রের সাহায্যে নীহারিকার যে রাসায়নিক উপাদান নির্ণীত হয়, উল্কার রাসায়নিক উপাদানের সঙ্গে তাহার সমত্ব লক্ষিত হয় না। উল্কার বর্ণচ্ছত্র হইতে লৌহ, নিকেল, ম্যাগ্নিসিয়ম, কার্ব্বন এবং কার্ব্বনজাত নানা যৌগিক পদার্থের অস্তিত্ব অনুমিত হয়, কিন্তু নীহারিকার বর্ণচ্ছত্রে এ সকল পদার্থের কিছুমাত্র চিহ্ন দেখা যায় না। সুতরাং আলোকবিশ্লেষক যন্ত্রের উপর নির্ভর করিলে উল্কা ও নীহারিকাকে এক প্রকৃতির পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা চলে না। কাজেই নীহারিকা যে উল্কারাশিরই সমষ্টিমাত্র এ মত টিকে না। কিন্তু একটু ধীর ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে বর্ণচ্ছত্র হইতে বস্তুর উপাদান নির্ণয়ের উপর তত বেশী নির্ভর করা চলে না। উদাহরণ স্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে অধিকাংশ পণ্ডিতেরই মতে ধূমকেতু এবং উল্কার উপাদান যে একই প্রকারের এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবসর অল্পই আছে। অথচ ইহাদের বর্ণচ্ছত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। ধূমকেতুর উপাদান মধ্যে যে নানা প্রকারের ধাতু বিদ্যমান আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার বর্ণচ্ছত্রে এই সকল ধাতুর অস্তিত্বের কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যায় না। সুতরাং নীহারিকা উল্কারাশির সমষ্টি হইলেও আলোকের অল্পতার জন্য ইহার বর্ণচ্ছত্রে উল্কার অস্তিত্বের চিহ্ন না পাওয়া নিতান্ত বিচিত্র নহে। সুতরাং উল্কাবাদের বিরুদ্ধে যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে তাহা একেবারে অখণ্ডনীয় নহে।

[পৃথিবীর উৎপত্তি] কিন্তু তথাপি আমাদের পৃথিবী যে উল্কাময়ী নীহারিকা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এ সম্বন্ধে আর একটি আপত্তি রহিয়া যায়।

নীহারিকার মধ্যে যে সকল উল্কারাশি থাকে তাহারা পরস্পর হইতে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন। সুতরাং এই সকল বিচ্ছিন্ন উল্কারাশি কেমন করিয়া পরস্পরের সঙ্গে জমাট বাঁধিয়া যে এক একটা গ্রহে পরিণত হয় তাহা ভাল করিয়া বুঝা যায় না।

সৌরজগতের উপাদান রাশি শূন্যদেশে সমানভাবে বিকীর্ণ হইয়া আছে যদি একথা সত্য হয় তাহা হইলে এই উপাদানগুলি কেবল স্থানে স্থানেই কেন যে জমাট বাঁধিয়া উঠে এবং অন্যত্র তাহাদের কোনই চিহ্ন দেখা যায় না—ইহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই সমস্যার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে বিমানবিহারী উল্কারাশি দুইভাগে বিভক্ত:—এক দল সংযতভাবে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় থাকিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে এবং অপর দল ক্ষিপ্তের মত উচ্ছৃঙ্খলভাবে যদৃচ্ছা আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত উল্কাকে পণ্ডিতেরা "গ্রহাণু" আখ্যা দিয়া থাকেন।

অধ্যাপক চেম্বার্লিনের মতে এই গ্রহাণুদের সাহায্যেই গ্রহোৎপত্তি সম্ভব—অপর শ্রেণীর উল্কার দ্বারা গ্রহনির্ম্মাণ সম্ভব নহে। কারণ তাহাদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে মিলনের সম্ভাবনা বিরল।

গ্রহাণুরা যে নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে সে কক্ষাও সময়ে সময়ে ইতস্ততঃ সরিয়া যায়। এই কারণে প্রত্যেক গ্রহাণুরই কখনও না কখন অপর গ্রহাণুর কক্ষার মধ্যে আসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা ঘটে। এইরূপ নিকটবর্ত্তিতার ফলে তাহাদের পরস্পরের সহিত মিলনের যথেষ্ট সুযোগ ঘটে।

এইরূপে ক্রমশঃ কতকগুলি উল্কা মিলিয়া একটী বৃহৎ উল্কার সৃষ্টি করে। এবং অবশেষে অসংখ্য উল্কার মিলনের ফলে একটী গ্রহের উৎপত্তি হয়। এবং এই নবজাত গ্রহ তাহার অন্তর্গত উল্কারাশি যে সমতলে থাকিয়া যে অভিমুখে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছিল, ঠিক সেই সমতলে এবং সেই অভিমুখেই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং আমাদের নিবাসভূতা বসুন্ধরাও যে এই উপায়েই উল্কাময়ী নীহারিকা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস যতটুকু জানিতে পারা যায়, তাহা হইতেও এই কথাই প্রতিপন্ন হয়।

আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সেই কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। ক্রমশঃ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

যাদুকরী

কে আমি ? কুন্তলে মোর ঝলকিছে স্বর্ণ-প্রজাপতি !
কনককঙ্কণ বাজে দুই ভুজে, কটিতে কিঙ্কিণী !
অধরে ঝরিছে সুধা, দুচরণে মুখর শিঞ্জিনী
গিরিনির্ঝরিণী সম ঝঙ্কারিছে ! ছন্দ আর যতি
লীলায়িত প্রতি অঙ্গে—উচ্ছ্বসিত তরঙ্গিত গতি !
ছিনু সুপ্তা নিগুতির শান্তগৃহে—করি রিণি রিণি,
কোন্ গুণী জাগাইল ? জাগিলাম বিচিত্র রাগিণী
রূপ ধরি ! শব্দে রূপে একি মিল ! মোহিনী মূরতি !
সনেটরূপসী আমি,—অপরূপ মায়ার মুকুর,
করে যাহে ঢল ঢল উপমার রক্তকমলিনী !
কি আসব, কি সৌরভ অঙ্গে সদা করে ভুর্ ভুর্—
শুনিছ না ? চারিধারে মধুকর গাইছে সোহিনী !
কবিচিত্ত রত্নাগারে স্পর্শমণি—চতুর্দ্দশ পলে
ভরি' দিনু হিয়া তব আনন্দের উৎপলে উৎপলে !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন ।

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা ।

সবুজ পত্র, পৌষ—

রবীন্দ্রনাথ "শিক্ষার বাহন" প্রবন্ধে একটি সাময়িক সমস্যার মীমাংসা করিতে চাহিয়াছেন । তিনি বলেন—

"আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই—তার চলাফেরার পথ খোলসা হইতেছে না । এখনকার দিনে সার্ব্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে । যে কারণেই হউক আমাদের দেশে এটা চলিল না । * * * তার উপরে আবার আর এক উপসর্গ জুটিয়াছে । একদিকে আসবাব বাড়াইয়া অন্য দিকে স্থান কমাইয়া আমাদের সঙ্কীর্ণ উচ্চশিক্ষার আয়তনকে আরো সঙ্কীর্ণ করা হইতেছে ।"

এই ত দেশের শিক্ষার অবস্থা । লেখক বলেন, "বিদ্যা-বিস্তারের কথাটা যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি তখন তার সর্ব্ব-প্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে তার বাহনটা ইংরেজি ।" স্কুল, কলেজ এমন কি বাহিরেও যে সব লোকশিক্ষার আয়োজন করা হইয়াছে, সেখানেও বাংলা ভাষার প্রবেশ নিষেধ । ইহাতে দেশে শিক্ষা বিস্তার হয় না । ইংরেজি আমাদের শিখিতেই হইবে । "সেই সঙ্গে একথা বলাও বাহুল্য অধিকাংশ বাঙ্গালী ইংরেজী শিখিবে না । সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিম্বা অর্দ্ধাশনই ব্যবস্থা একথা কোন মুখে বলা যায় ।"

"আজকাল বিশ্ববিদ্যালয় শুধু একজামিন পাশের কুস্তির আখড়া নয় । এখন বিদেশ হইতে বড় বড় অধ্যাপকেরা আসিয়া উপদেশ দিতেছেন,—এবং আমাদের দেশের মনীষীদেরও এখানে আসন পড়িতেছে । এই নূতন বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটাকে যদি সমস্ত বাঙালীর জিনিস করিয়া তোলা যায় তাতে বাধা কি ?"

লেখক বলেন, "এমনি করিয়া বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মত মিলিয়া যায়, তবে বাঙালী শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে । দুই স্রোতের সাদা এবং কালো বিভাগ থাকিবে বটে, কিন্তু তারা

এক সঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষার যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।"

লেখক অন্যত্র বলিয়াছেন, "ভালোমত ইংরেজি শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাংলাদেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছে না?"

লেখক বাংলা ভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিবার পক্ষপাতী। প্রশ্ন হইতে পারে বাংলা ভাষায় উচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? লেখক বলিবেন, "নাই সে কথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কি উপায়ে? বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা।"

এই সাময়িক আলোচনাটি সাহিত্য-রসে ভরিয়া উঠিয়াছে। রসবান্ কথাগুলি ও যে স্থলে কবির রচনাকৌশল প্রকাশ পাইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই। লেখক দেশের সমস্যাটি বড়ই সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার তর্ক-যুক্তি সুদৃঢ়, কথাগুলি পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত করে। প্রবন্ধটি আমরা সকলকেই পড়িতে অনুরোধ করি। লেখক অনেক স্থলে বাঙালীর চোখ ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে তিনি যে সব কথাগুলি বলিয়াছেন তাহাও বিশেষরূপে আলোচনা করিবার যোগ্য।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তীর "নব্যদর্শন" সুন্দর রচনা; দুরূহ বিষয় সহজ ভাষায় প্রকাশ করিবার শক্তি লেখকের আছে। বিষয়টি বাংলায় যেমন নূতন তেমনই দুরূহ, সেই জন্য লেখকের বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। তাঁহাকে পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে হইবে, নচেৎ এরূপ রচনা সম্প্রতি ব্যর্থ হইবারই সম্ভাবনা। মোটের উপর জিনিসটিতে সাহিত্য-রস আনিয়া দেওয়া আবশ্যক।

"ঘরে-বাইরে" এবারে বেশ জমিয়াছে। সন্দীপ ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, বিমলার দেশপ্রীতি ও অনতিস্ফুট মাতৃত্বটুকু কবির তুলিকায় প্রাঞ্জলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিমলার চুরি ও সন্দীপের চোরাই মাল গ্রহণের বর্ণনায় লেখকের যে কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বঙ্গসাহিত্যে অতুলনীয়।

"শেক্স্পিয়র" শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা; কবির মৃত্যুর তিনশো বছর পরের স্মৃতিবার্ষিক উপলক্ষে রচিত। ইংলণ্ড কবিকে আপনার ধন ভাবিয়া কিছুকাল অরণ্যশাখার বাহুজালে, ঢাকিয়া রাখিয়াছিল—

তারপরে ধীরে ধীরে অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে,
দিগন্তের কোল ছাড়ি' শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
উঠিয়াছে দীপ্তজ্যোতি মধ্যাহ্নের গগনের পরে;
নিয়েছ আসন তব সকল দিকের কেন্দ্রদেশে
বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিয়া; তাই হের যুগান্তরশেষে
ভারতসমুদ্রতীরে কম্পমান্ শাখাপুঞ্জে আজি
নারিকেলকুঞ্জবনে জয়ধ্বনি উঠিতেছে বাজি।

বর্ণনায় গাম্ভীর্য্য আছে; শেষের তিনটি পংক্তি মানসপটে একখানি মনোরম চিত্র আঁকিয়া দেয়, মনে হয় যেন সুদূর বিগত মনীষীর আত্মা এ জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল—রবীন্দ্রবাবু 'শিক্ষার বাহনে' যে সব প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা কিরূপে কাজে খাটাইতে পারা যায় তাহার উপায় স্থির করিতে চান্। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা মানিয়া চলিলে আমরা লাভবান হইব সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে বিশ্ববিদ্যালয় যতদিন না বাংলা ভাষায় শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করেন, ততদিন বিশেষ সুফল ফলিবে বলিয়া মনে হয় না। বঙ্গবাসী যদি রবীন্দ্রবাবুর প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিতে চান্ তাহা হইলে বঙ্গভাষায় ভাল ভাল শিক্ষাগ্রন্থ তাঁহাদের লিখিতে হইবে; বিশ্ববিদ্যালয় কৃপাদৃষ্টি করিলে এ কাজ সহজে শীঘ্রই সম্পন্ন হইতে পারে নচেৎ এ কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য আমাদের খাটিতে হইবে, ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। বাংলা ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা কতটা উপকারী যেদিন বঙ্গবাসী তাহা যথার্থ বুঝিতে পারিবে সেদিন শ্রম বা ত্যাগ স্বীকারের অভাব ঘটিবে না। আমরা আমাদের মঙ্গল কি তাহা বুঝি না, যাহা পাইয়াছি তাহা লইয়াই চোখ বুজিয়া থাকিতে চাই।

প্রবাসী, মাঘ—

বিক্রমপুর সম্মিলনীতে শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রবাসীর প্রথম প্রবন্ধ। প্রবন্ধটিতে অনেক সারবান্ কথা আছে। একটু উদ্ধৃত করি—"আমাদের জড়তা সম্বন্ধে যদি আমি কোন তীব্র ভাষা ব্যবহার করি তাহা হইলে ক্ষমা করিবেন। আমার জীবনে যদি কোন সফলতা দেখিয়া থাকেন তবে জানিবেন তাহা সর্ব্বদা নিজেকে আঘাত করিয়া জাগ্রত রাখিবার ফলে। স্বপ্নের দিন চলিয়া গিয়াছে; যদি বাঁচিতে চাও তবে কশাঘাত করিয়া নিজকে জাগ্রত রাখ।"

বর্ত্তমান সময়ে বাংলা দেশে এই উপদেশটার মূল্য বড় কম নয়। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার কেমন করিয়া হইতে

পারে তাহার সম্বন্ধে লেখক যে কথা বলিয়াছেন তাহাও আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"আমার বিবেচনায় স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়, গৃহ ও পল্লী পরিষ্কার, বিশুদ্ধ জল ও বায়ুর ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ, এ সব বিষয়ে শিক্ষাবিস্তার এবং আদর্শগঠিত পল্লী প্রদর্শন অতি সহজেই হইতে পারে। ইহার উপায় মেলা-স্থাপন। পর্য্যটনশীল মেলা বিক্রমপুরের চক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অল্পদিনেই অন্য প্রান্তে পৌঁছিতে পারে। এই মেলায় স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে উপদেশ, স্বাস্থ্যকর ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যায়াম প্রচলন, যাত্রা, কথকতা গ্রামের শিল্পবস্তুর সংগ্রহ, কৃষিপ্রদর্শন ইত্যাদি গ্রামহিতকর বহুবিধ কার্য্য সহজেই সাধিত হইতে পারে। আমাদের কলেজের ছাত্রগণও এই উপলক্ষে তাহাদের দেশ পরিচর্য্যা-বৃত্তি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন।"

প্রতি গ্রামে একথা মানিয়া চলা উচিত। লেখক যে উপায়ের কথা বলিয়াছেন তাহা এ দেশের উপযোগী। এ দেশে এ উপায় কখনও ব্যর্থ হয় নাই. সেই জন্য এখনও ব্যর্থ হইবে না এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে।

আরো একটা কথা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। "সম্প্রতি জাপান হইতে প্রত্যাগত জনৈক বন্ধুর নিকট শুনিলাম যে জাপানে আমাদের সম্বন্ধে দু একটি আমোদ-জনক কথা চলিতেছে। তাহাদিগের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে নাকি আমাদের গৃহিণীদের পট্টবস্ত্র হইতে হাতের চুড়ি পর্য্যন্ত সংগ্রহ হয় না। এখন বাঙালী বাবুদের জন্যও তাহাদিগকে হুঁকার কল্‌কে পর্য্যন্ত প্রস্তুতের ভারগ্রহণ করিতে হইয়াছে।"

মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী জাতিটাও পরদানশীন হইয়া ছিল। এখন সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকে এখন তাহার পানে ফিরিয়া চায়। এমন দিনে আশপাশের দু একটা জাতি আমাদের সম্বন্ধে কি ধারণা করিতেছে তাহা জানিতে ইচ্ছা হয়। উপরের উদ্ধৃত অংশটি আমাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবে না কি?

৺ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মার্কিন মেয়েদের কথা" উল্লেখযোগ্য; লেখকের ভাষা ভাল. প্রকাশ করিবার রীতিও ভাল, রচনায় লেখকের ব্যক্তিত্বটুকু যতখানি প্রকাশ পাইয়াছে তাহারও প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। লেখকের অকাল-মৃত্যু বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে ক্ষতিকর সন্দেহ নাই।

শ্রীবিনয়কুমার সরকারের "আমেরিকায় বিদ্যাচর্চ্চা" বিবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ। প্রবন্ধগুলি শুধু বিদেশের বর্ণনা করিয়াই শেষ হয় নাই। একজন স্বদেশভক্ত ভারতবাসীর চোখে বিদেশের যে বিশেষত্বটুকু প্রতিফলিত হইয়াছে তাহারই বিবরণ আমরা এই প্রবন্ধে দেখিতে পাই। বিদেশের নিকট আমরা কি শিখিতে পারি তাহাই প্রকাশ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রবন্ধের ভাষা ভাল, সর্ব্বত্র লেখকের সরলতার আভাস পাওয়া যায়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত মৌমাছি সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। "বিবিধ প্রসঙ্গে" অনেক সাময়িক উচিত কথা আছে।

উপাসনা, মাঘ—

শ্রীবিনয়কুমার সরকার জাপানের শিল্প ও ব্যবসার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের দেশে যা কিছু আছে, সবই ভাল এ ধারণা লইয়া যাঁহারা চোখ বুজিয়া আছেন, তাঁহারা এ প্রবন্ধ পাঠের কষ্ট স্বীকার না করিলেই ভাল হয়, কেন না বিদেশের অনেক ভাল জিনিষের কথা গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়া ছেন, যাহার তুলনা আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রবন্ধ বিবিধ তথ্যে পূর্ণ, সব তথ্যগুলিই চিত্ত আকর্ষণ করে। বাঙালীকে অন্য জাতির পাশাপাশি রাখিলে কিরূপ দেখায়, তাহাই বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য।

সম্পাদকের "আলোচনী"তে হিন্দুর আধুনিক সমাজদেহের একটা চিত্র প্রকাশ করিবার চেষ্টা আছে। চিত্রটি খুব নূতন না হইলেও ইহাকে সযত্নে রাখিতে হইবে কেননা আমরা এখন নিজের দিকে চাহিতে শিখিয়াছি; এই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা যাহা বলিতেছি ও যাহা লিখিতেছি তাহা একটা নূতন সমাজের সূচনা করিতেছে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্তের "চায়ের মামলায়" কিছু হাস্যরস আছে; আমাদের মনে হয় সামান্য লাভের জন্য এ মামলায় কান দিবার সময় আমাদের নাই। প্রবন্ধটির পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে হাসিয়াছি বটে, কিন্তু আনন্দ পাই নাই।

শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায়ের "বঙ্গদেশীয় প্রজার ভূমিস্বত্ব" সকলের পাঠোপযোগী না হইলেও উল্লেখযোগ্য রচনা; বঙ্গীয় লেখকের লিখিবার বিষয় ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে ইহাও বাংলা সাহিত্যের ক্রমোন্নতির লক্ষণ।

ফিরে' যাও

কে এসেছে আজ আকাশ ভরিয়া ছড়ায়ে আলোক
কে এসেছে আজ রঙিণ করিয়া পাখীর পালক ;
কে এসেছে আজ বনবনান্তে বিতরি' গন্ধ—
কে এসেছে আজ হৃদয় ভরিয়া দিতে আনন্দ ?
কে এলেগো আজ মুখর করিয়া কাননতল,
কে তুমি ফুটা'লে সরসীর বুকে কমলদল ;
কুলায়বিহীনে কে তুমি বাঁধালে নূতন নীড়,
কুসুমের বনে কে তুমি বসালে ভ্রমর-ভিড় !
চাঁদের কিরণে কে তুমি বহালে মদির-ধারা,
ধূলার ধরণী করিলে কে তুমি ত্রিদিবপারা !
কোন্ দেবতার পূজার মন্ত্র পাঠের তরে
কে তুমি এসেছ আমার দীর্ণ জীর্ণ ঘরে ?
এখানে নাইগো প্রতিমা নাইগো দেবতা নাই—
ব্যর্থ আশার অশ্রু-আসার নয়নে তাই !
ফিরে' যাও ওগো তোমার হেথায় নাহিক কাজ—
স্মর নয় যিনি স্মরহর, তাঁরে স্মরিব আজ।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

গ্রন্থ সমালোচনা

গৃহস্থালী। ৺বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত– ১৩২২। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ২৪০ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲

এই পুস্তকখানি বিপ্রদাসবাবুর শেষ পুস্তক। পারিবারিক গৃহ, একান্নবর্ত্তী পরিবার, সূতিকাগৃহ, স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থা ও তৎকালে গর্ভিনীর কি কি বিষয়ে সাবধানতা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ও প্রসবের পরক্ষণে কি কার্য্য করা উচিত—এ সমস্তই এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। গ্রন্থকার 'একান্নবর্ত্তী পরিবারে' লিখিয়াছেন—" * * * বাঙ্গালীর এই একান্নবর্ত্তী পরিবার—দুঃখের সংসারে সুখের প্রস্রবণ—সন্তোষের উৎস উৎপাদন করে। যখন নিরাশায় জীবনে চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় বোধ হয়—যখন বিষাদের প্রচণ্ড আঘাতে হৃৎপিণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া দশদিক শূন্য দেখিতে হয়—যখন অখিল বিশ্বের মধ্যে 'আহা' কথাটি বলিবার জন্য কাহাকেও খুঁজিয়া মিলে না—তখন এই পরিবারমণ্ডলী সেই হতাশ হৃদয়কে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করে—তাহার সজীবতা প্রদান করে।"

আজকাল এই একান্নবর্ত্তী প্রথা আমাদিগের গৃহ হইতে উঠিয়া যাইতেছে—ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

সূতিকাগৃহই মনুষ্যের জন্মাগার। তথায় যে সমস্ত আবশ্যকীয় কার্য্য ও সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক, গ্রন্থকার তাহা অতি সহজ ও সরল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। ইংরাজী পুস্তকে আমরা গর্ভধারণকালের তালিকা দেখিয়াছি, কিন্তু বাঙ্গালা পুস্তকে এ বিষয় এই প্রথম দেখিলাম। এই পুস্তকে উক্ত তালিকা সংযুক্ত করিয়া বিপ্রদাস বাবু প্রত্যেক বঙ্গবাসীর উপকার করিয়াছেন। ইহা কাজে লাগিবে।

এই রোগদুঃখপ্রপীড়িত ধরাধামে অবস্থান করিলে মানবকে কত সময়ে কত দুর্ঘটনায় পড়িয়া ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয়। সেই সকল ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় বিপ্রদাসবাবু এই গ্রন্থে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

গবাদি পশু রোগাক্রান্ত হইলে কিরূপে তাহাদিগকে রোগমুক্ত করিতে হয়, তাহার উপায়ও গ্রন্থকার সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

পরিশেষে তিনি গৃহস্থের নিত্যাবশ্যকীয় কতকগুলি মুষ্টিযোগ পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

নব বসন্ত

আজি না পোহাতে রাতি
কুহরি' উঠেছে নীরব কোকিল
নব-উৎসাহে মাতি'।
দক্ষিণ হ'তে পুলক বহিয়া
ছুটে আসে সমীরণ,
পরশ-রভসে মর্ম্মর রবে
শিহরি উঠিছে বন।
কুয়াশার জাল টুটি'
নূতন উষার অরুণ কিরণ
গগনে উঠিছে ফুটি'।

রিক্ত মলিন শাখী
কোন্ যাদুকর দিয়াছে আবার
সবুজ শোভায় ঢাকি'!
কোথা ছিল এত পত্র-মুকুল—
গুঞ্জন কলগান,
কোথা ছিল এত পুষ্প-গন্ধ—
এত আলো—এত প্রাণ?
জীর্ণ পাতার ভার
বহি' কোন পথে চলে গেছে শীত
সন্ধান নাহি তার।

স্বাগত, হে ঋতুরাজ,
দিকে দিকে একি যৌবনাবেগ
সঞ্চারি' দিলে আজ।
হিমের শাসনে কাননের শোভা
যেতেছিল যবে ঝরি',
তুমি ছিলে রত ভাণ্ডার তব
লইতে পূর্ণ করি'।
এনেছ ভরিয়া সাজি
তাই এ প্রভাতে পলাশ-বকুল—
বন চম্পক রাজি।

ওগো নন্দন বাসী,
ধরণীর জরা দূর কর তুমি
বরষে বরষে আসি'।
শিশিরের শেষে তাই বনে বনে
ফুটে উঠে ফুল চয়,
উচ্ছ্বাস ভরে গেয়ে উঠে পিক
বহে বায়ু মধুময়।
তুমি আসি বার বার
মৃত্যুর মাঝে যৌবন নব—
কহিছ এ সমাচার।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

সাহিত্য সমাচার

বিগত ২৩শে মাঘ, কবিবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় [illegible]ধুরী মহাশয়ের কলিকাতাস্থ ভবনে, "সাহিত্য সঙ্গত"-[illegible] প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। বহু খ্যাতনামা সাহি-[illegible] ও সুধীবৃন্দ সে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। [illegible]বাবু নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণকে অভ্যর্থনা করিয়া [illegible] সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই প্রবন্ধের এক-[illegible] তিনি বলিয়াছিলেন—

[illegible] দেশকে স্বাস্থ্য-শান্তি-সমৃদ্ধিতে উদ্ভাসিত দেখিতে চাও, [illegible] জীবন্মৃত হতভাগ্য জনসাধারণকে মাতৃভাষায় অমৃত-[illegible] জিয়াইয়া তোল। আবার [illegible] [illegible]

সঙ্গত এজন্য একটি সংকল্প আঁটিয়াছে।—সে চায়, কতকগুলি বাংলা বই জড় করিয়া গ্রন্থরক্ষক বা প্রচারক দ্বারা সেই মাতৃ-ভাষার সাধনবীজ পল্লীতে পল্লীতে ঘুরাইয়া পাঠক ও লেখক তৈয়ারী করিতে। বাংলার গ্রন্থকারগণ যদি সদয় হন, বঙ্গের আঢ্যগণ যদি দশের জন্য দানে জাড্য দোষ দূর করিয়া প্রচার-কার্য্যের পৃষ্ঠপোষক হন, তবে ইহার সাফল্য অবধারিত। আশা করি, সঙ্গতের এ বাঞ্ছা অসঙ্গত বিবেচ্য হইবে না, এবং অচিরেই উহা সহৃদয়গণের স্বতঃপ্রবৃত্ত সাহায্য লাভে সমর্থ হইবে।

সভায় সঙ্গীতাদি ছাড়া, পুলিশ কোর্টের বিখ্যাত উকীল ও নব্য-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মনোজমোহন বসু এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় "চুরি-বিদ্যা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন—তাহা শ্রবণে শ্রোতৃবর্গের মধ্যে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়াছিল। সেই "চুরি-বিদ্যা" প্রবন্ধটি আমরা চৈত্র সংখ্যা "[illegible]"তে প্রকাশ করিব।





প্রিয়-পরিত্যক্তা

"ন মানিনী সংসহতেঽন্যসঙ্গমং।"

MANASI PRESS.

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

৮ম বর্ষ (১ম খণ্ড (চৈত্র ১৩২২ সাল) ১ম খণ্ড) ২য় সংখ্যা

কেয়া ফুল

ফুল চাই—চাই কেয়া ফুল !
সহসা পথের পরে
আমার এ ভাঙা ঘরে
কণ্ঠ কার ধ্বনিল আকুল।
তখনো শ্রাবণ-সন্ধ্যা
নিঃশেষে হয়নি বন্ধ্যা—
থেকে-থেকে ঝরিতেছে জল ;
পবন উঠিছে জেগে,
বিজলী ঝলিছে বেগে—
মেঘে-মেঘে বাজিছে মাদল।
জনহীন ক্ষুব্ধ পথ
জাগিছে দুঃস্বপ্নবৎ
বুকে চাপি' আর্ত্ত অন্ধকার ;
কোন মতে কাজ সারি'
যে যার ফিরেছে বাড়ী,
ঘরে-ঘরে বন্ধ যত দ্বার।
সঙ্গীহীন শূন্য ঘরে
হিয়া গুমরিয়া মরে
স্মরি' যত জীবনের ভুল ;
অকস্মাৎ তারি মাঝে
ধ্বনি কার কাণে বাজে—
চাই ফুল—চাই কেয়া ফুল !

পাগল ! আজি এ রাতে,
এ দুর্যোগ-অভিঘাতে—
বৃষ্টিপাতে বিলুপ্ত মেদিনী ;
তার মাঝে কেবা আছে,
কেতকী-সৌরভ যাচে—
কোথায় বা হবে বিকিকিনি ?
পবন উঠেছে মাতি—
কিছুক্ষণ কাণ পাতি'
মনে হ'ল গিয়াছে বালাই ;
সহসা আমারি দ্বারে
ডাক এল একেবারে—
ফুল চাই—কেয়া ফুল চাই !
ভাবিলাম মনে-মনে—
হয়ত বা এ জীবনে
কোনো দিন কিনেছিনু ফুল ;
সেই কথা মনে করে'
আজো বা আশার ঘোরে,
কিম্বা কারে করিয়াছে ভুল !
তাড়াতাড়ি আলো তুলি
বাহিরিনু দ্বার খুলি,
সবিস্ময়ে দেখিলাম চেয়ে—

মাথায় বৃহৎ ডালা,
দাঁড়ায়ে পসারী বালা—
শ্রাবণ ঝরিছে অঙ্গ বেয়ে !
কহিলাম, এ কি কাণ্ড !
তোমার পসরাভাণ্ড
আজ রাতে কে কিনিবে আর ?
এ প্রলয়ে কারো কাছে
কিছু কি প্রত্যাশা আছে—
কেন মিছে বহিছ এ ভার !
আর্দ্র দেহে আর্দ্র বাসে
সে কহিল মৃদুহাসে—
শিরে বায়ু সুগন্ধ ছড়ায়—
যে ফুলে বেসাতি করি,
বাদল যে শিরে ধরি ;
কপালে লিখিল বিধি তাই !
বহিয়া দুখের ঋণ
যে কষ্টে কাটাই দিন,
এ দুর্দ্দিন কিবা তার কাছে ?
—ওগো তুমি নেবে কিছু ?
নয়ন হইল নিচু—
সেথাও বা মেঘ নামিয়াছে !
খোলা দরজার পাশে
বায়ু গরজিয়া আসে,
ফুলবাসে ভরি দেহমন ;
ঝরঝর ঝরে জল,
আঁখি করে ছলছল
ঘনাইয়া প্রাণের শ্রাবণ !
বাদলের বিহ্বলতা—
বুঝি হায় ! লাগিল তা'
নয়নে বচনে সর্ব্বদেহে !
সহসা চাহিয়া আড়
রমণী ফিরাল ঘাড়—
ঊর্দ্ধে যেন কি দেখিবে চেয়ে !

উজাড় করিতে ডালা
কাঁদিয়া ফেলিল বালা—
ওমা এ কি—এত কেন হবে !
কহিনু—যা' কিনিলাম,
এ নহে তাহারি দাম—
প্রতিদিন দিতে হবে মোরে ;
এক পণ দুই পণ—
যেমন হইবে মন ;
তাহারি আগাম দিনু তোরে।
কতক বুঝে' না-বুঝে'
হৃদয়ের ভাষা খুঁজে'—
বহু কষ্টে জানাইয়া তাই,
পুষ্পগন্ধে মোরে ঘিরে'
অন্ধকারে ধীরে ধীরে
পসারিণী লইল বিদায়।

ফিরিনু একলা ঘরে—
বাদর তখনো ঝরে,
পুষ্পগন্ধে পূর্ণ গৃহতল ;
শয্যা লইলাম পাতি,
নিবায়ে দিলাম বাতি ;
আবার আসিল বেগে জল !
রুদ্ধ জানালার ফাঁকে
বাতাস কাহারে ডাকে,
বিজলী চমকি' কারে চায় !
কোন্ অন্ধ অনুরাগে
ত্রিযামা যামিনী জাগে
শ্রাবণ-ব্যাকুল-ব্যর্থতায় !
সঙ্গীহীন শূন্য ঘরে
হিয়া গুমরিয়া মরে—
স্মরিয়া এ জীবনের ভুল ;
সেই সাথে থেকে-থেকে
মনে হয়—গেল ডেকে'
কাননের যত কেয়া ফুল !

ভারতবর্ষে প্রচলিত ওজন ও মাপ-প্রণালী

যখন সমগ্র ভারতবর্ষকে একদেশ বলিয়া দেশবাসীরা ভাবিতে শিখে নাই, এবং যখন রাষ্ট্রীয় জীবন পল্লী-সমাজের বিধি ব্যবস্থাতেই নিযুক্ত হইয়া সার্থকতা লাভ করিত, তখনকার দিনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ওজন প্রচলিত থাকা খুবই স্বাভাবিক। ছোট ছোট রাজা নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিবার জন্য যে সমস্ত অপ্রাকৃত ব্যবধান খাড়া করিতেন, মুদ্রাপ্রচলন তাহার মধ্যে অন্যতম। তাহা ছাড়া এক সম্রাটের শাসনাধীন ভিন্ন ভিন্ন জিলা, তালুক বা পরগণাতে বিভিন্ন মুদ্রা প্রচলিত ছিল। যাঁহারাই বাণিজ্যের উন্নতির কামনা করিয়াছেন এবং সমগ্র দেশকে একই রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারাই এই মুদ্রা—ওজন-মাপের অসামঞ্জস্য দূর করিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন। আকবর একবার ওজন ও মাপ একীকরণের বিশেষ চেষ্টা করেন। এটুকু বেশ জানিতে পারা গিয়াছে যে তাঁহার সময় দৈর্ঘ্য মাপিবার জন্য 'গজ' ব্যবহৃত হইত। সেই গজ প্রায় এক মিটার বা প্রায় ৩৯ ইঞ্চি লম্বা ছিল। আকবরের গজ যে ঠিক কতটুকু ছিল তাহা একেবারে নিঃসন্দেহ প্রমাণ এক্ষণে করা দুঃসাধ্য। লোকে যাহাতে আকবরের গজ বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারে তজ্জন্য ইহাকে ইলাহি গজ এই বিশেষ নাম দেওয়া হইয়াছিল। যে সমস্ত ছোট বড় মাপের প্রচলন রদ করিয়া ইলাহি গজ প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল, মোগল ক্ষমতা মন্দীভূত হওয়ার সহিত সে সমস্তই আবার চলিতে লাগিয়াছিল, এবং কিছুকাল পরেই ছোট বড় তিন চারি রকম গজের ভিতর ইলাহি গজও অন্যতম হইয়া দাঁড়ায়।

কোম্পানীর আমলে মুদ্রা ও ওজন লইয়া ইংরাজদিগকে বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। তারপর ইংরাজেরা তাঁহাদের নিজেদের দেশের ওজন অনুযায়ী একটা ওজন খাড়া করেন। ইংরাজদের ট্রয় ওজনের ১ হন্দরকে তাঁহারা একমণ ধরিয়া লয়েন।

১মণ = ৪০সের = ১০০পাউণ্ড ট্রয়

১সের = ৮০তোলা = ২॥০পাউণ্ড = ১৪৪০গ্রেণ

১তোলা = ১৮০ গ্রেণ।

পূর্ব্ব হইতেই বাংলা অঞ্চলে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তোলা ওজন প্রচলিত ছিল এবং সেরের ওজন তোলার উপর নির্ভর করিত। এবং সে সের ও তোলা উভয়েরই ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ওজন ছিল। ১৮৩৩ সালে ইংরাজের প্রথম মুদ্রা-বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হয়। কলিকাতার "অ্যাসে মাষ্টার" টাঁকশাল হইতে তাহার প্রস্তাব করেন। তাঁহার প্রস্তাবই উল্লিখিত ১০০পাউণ্ড ট্রয়ে ১ মণ ধরা। এই হইতে অন্য সমস্ত ওজন রদ হইয়া ১৮০ গ্রেণে তোলার ওজনে মুদ্রা প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ এই সময় বাংলা দেশে আকবরের সিক্কা টাকা বা রূপা প্রচলিত ছিল। তাহার ওজন প্রায় ১৯২ গ্রেণ। মুদ্রার আদিকে ১৮০ গ্রেণের তোলা করাতে একটা গোলমেলে ভিত্তির উপর ওজনকে দাঁড় করান হইল। ইংলণ্ডে সাধারণ ব্যবসায় ট্রয় ওজন ব্যবহৃত হয় না—এভর্ড্যুপইজ ওজন ব্যবহৃত হয়। এই এভর্ড্যুপইজের সহিত ট্রয়ের কোন সহজ সম্পর্ক নাই। ট্রয় ৫৭৬০ গ্রেণে পাউণ্ড, এভর্ড্যুপইজ ৭০০০ গ্রেণে পাউণ্ড। যদি ইংলণ্ডে সাধারণতঃ ট্রয় ব্যবহৃত হইত তাহা হইলে ১৮০গ্রেণের তোলার সার্থকতা ছিল। ১৮০গ্রেণে তোলা হিসাবে আমাদের ১ মণ এভর্ড্যুপইজ ৮২$\frac{2}{7}$ পাউণ্ডের সমান হয়। এই ১৮০ গ্রেণের তোলায় ওজন ভারতের সর্ব্বত্র সুবিধাজনক বোধ হয় নাই। কিছুদিন পরেই মাদ্রাজের একটি কমিটী ওখানকার ওজন-প্রণালী বদলাইয়া নূতন একটা বিশেষ ওজন অনুমোদন করেন। তাহা তোলার উপর স্থাপিত ছিল না কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট ইহাতে আপত্তি করেন, এবং তোলা গ্রহণ করিতে বলেন। তখন কমিটী হইতে এই ওজন গৃহীত হয়:—

৩ তোলায়—১ পল্লম্

৪০ পল্লমে—১ বিশ

৪ বিশ—১ মণ অর্থাৎ বাংলার ১২ সের।

কিন্তু মাদ্রাজে কখনও এই ওজন চলে নাই। কেবল কাগজ কলমেই পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ইংরাজ আমলে প্রত্যেক প্রদেশের শাসন কর্ত্তাই ওজনের একীকরণের প্রয়োজন অনুভব করিয়া আসিয়াছেন। এবিষয় লইয়া কমিটী ও রিপোর্ট যে কত হইয়াছে, কত সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া জন সাধারণের মত সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং কতই প্রস্তাব যে ভারত গমর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছে তাহার অবধি নাই। ভারত গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ের গুরুত্ব যে উপলব্ধি না করিয়াছেন তাহা নহে। কিন্তু একটা গুরু বিষয়ের দায়িত্ব লইতে মানুষমাত্রেই স্বভাবতঃ নারাজ। যতদিন পরিবর্ত্তন না করিয়া চলে চলুক, এইভাবে ফেলিয়া রাখিতে পারিলে কেহ বড় একটা ছাড়েনা। ভারত গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ের গুরুত্ব বোধে ঠিক সেই প্রকার করিয়া আসিয়াছেন। কখনও বা ভারত গবর্ণমেণ্ট "বিষয়টী বিবেচনাধীন আছে" এই বলিয়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের তাগিদ চাপিয়া রাখিয়াছেন—আবার কখনও ভারত গবর্ণমেণ্ট কাজে নামিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন—আর উপর হইতে সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্ "এখন থাক, পরে হইবে" এই বলিয়া নিরস্ত করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত এই কারণে ভারত গবর্ণমেণ্ট কোনও দায়িত্ব গ্রহণে পশ্চাৎপদ রহিয়াছেন।

ইংরাজদের নিজেদের ঘর এ বিষয়ে দুরস্ত নহে, কাজেই একটা ভাল একীকৃত মান-প্রণালী গ্রহণের জন্য যে ঐকান্তিক উদ্যম, তাহার ভিতর ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে হরেক রকম ওজন চলিত আছে। সাধারণতঃ ব্যবসা বাণিজ্যে এভর্ডুপইজ ব্যবহৃত হয়।

সোনা, রূপা, প্লাটিনাম প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু ওজন করিতে ট্রয় ওজন ব্যবহৃত হয়।

ডাক্তারদের আবার আর এক ওজনে ঔষধ মিশ্রণ হয়, যদিও তাহার নাম আউন্স পাউণ্ড ইত্যাদি। লম্বার মাপ ইঞ্চ, ফুট, গজ, মাইল ছাড়া লিগ, ডিগ্রি, পেস্, ফ্যাদম, রড, চেইন, ফারলং প্রভৃতি নানা নামের ও নানা বিবরণের মাপ আছে। উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যাইতেছে যে ইংলণ্ডের ওজন কি প্রকার বেথাপ্পা। ভারতবাসীদের দোষ দেওয়া হয় যে তাহাদের ওজন ও মাপ দুই গুণ ও চারিগুণ করিয়া উঠিয়াছে। যেমন ৪ ছটাকে পোয়া, ৪ পোয়াতে সের ইত্যাদি। কিন্তু ইংলণ্ডের ওজন প্রণালী কোনও নিয়মের ধার ধারে না। ১২ ইঞ্চে ফুট, ৩ ফুটে গজ, ১৭৬০ গজে মাইল, ইহাতে না আছে ২ এর না আছে ৩ এর বা দশের মাপ। যাহাদের ওজন ব্যাপার এত গোলমেলে ও নিয়মের বাহিরে, সে বৃটীশ প্রণালীকে আদর্শ ভাবিয়া ওজন প্রণালী গড়িলে সে যে শিব গড়িতে বানর হইবে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। বস্তুতঃ হইয়াছেও তাহাই। ইংলণ্ডের ১৮০ গ্রেণকে তোলা বানাইয়া না হইয়াছে ইংরাজী ওজন না হইয়াছে দেশি ওজন। দেশি ওজন বলিয়া একটা কিছু ছিল একথা চট্ করিয়া না মানিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এবিষয়ে অনেক কথা ভাবিবার আছে। অন্ততঃ একজন ইংরাজ সিভিলিয়ানও দেখাইয়াছেন যে ভারতবর্ষে দশমিক ওজন প্রচলিত ছিল এবং যাহা প্রকৃত পক্ষে মেট্রিক প্রণালী বলিলে আমরা যাহা বুঝি তাহাই।

আমরা সব বিষয়েই ইংলণ্ডের দিকে চাহিয়া আছি। ইংরাজের দেশকে স্বর্গ বা আদর্শ মনে করিয়া সুখ পাই। ইংলণ্ডে যাহা ভাল বলে তাহা বরেণ্য, যাহা নাই তাহা তুচ্ছ। শুধু ইংরাজদের স্বদেশের প্রতি প্রীতিবশতঃ যদি এবম্প্রকার মনোভাব হইত তবে তাহা মার্জ্জনীয়, কিন্তু আমাদের দেশবাসীরাও ইংরাজদের অপেক্ষা ইংলণ্ডের কিছু কম পক্ষপাতী নহেন। যে হেতু ইংলণ্ডেই একটি ভাল ওজন প্রথা গৃহীত হয় নাই অতএব ভারতের জন্য ওকথা ভাবাই যাইতে পারে না, এ প্রকার ইংরাজেরা যত না বলিয়াছেন দেশীয়েরা ততোধিক বলিয়াছেন।

কিছুদিন হইল আমি আয়ুর্ব্বেদের মাপ প্রণালী লইয়া চর্চ্চা করিতেছিলাম। ফলে অনেকগুলি গলদ দেখিতে পাই। যে সময় কবিরাজ মহাশয়দের ওজন প্রণালী কি করিয়া এক করা যায় ভাবিতেছিলাম সেই সময় ১৯১৩ সালের "ওয়েট কমিটি"র রিপোর্ট বাহির হইল। আয়ুর্ব্বেদীয় ওজন প্রণালী সম্বন্ধে স্থানান্তরে বলিব। এতাবৎকাল ভারত গবর্ণমেণ্ট ওজন একীকরণের কমিটী গঠন করিতে ও ব্যয় করিতে কুণ্ঠা করেন নাই। কিন্তু কমিটীর রিপোর্টের উপর ভাল-মন্দ কোনও প্রকার কাজ করিতে নারাজ। কমিটীর অনুসন্ধানের বিষয়গুলি কমিটীর সাক্ষ্য ও প্রমাণেই অবসান লাভ করে। ইংরাজ শাসনকালে এপর্য্যন্ত প্রায় ২০টা ওয়েট মেজার কমিটী রিপোর্ট দিয়াছে। ১৯১৩ সালের কমিটীর রিপোর্ট ১৫ সালের আগষ্ট মাসে বাহির হইয়াছে। সংবাদপত্রগুলিতে ইহার যে বিবরণ বাহির হয় তাহাতে দেখি যে এই কমিটী "রেলওয়ে ওয়েট" সমস্ত ভারতে গ্রহণের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন। ইহাতে আমার একটু খট্‌কা লাগে। আজকাল ফরাসী মেট্রিক প্রণালী পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য দেশে গৃহীত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ইতিপূর্ব্বে অনেকবার মেট্রিক প্রণালী গ্রহণ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে কিন্তু গবর্ণমেণ্টের শিথিলতাবশতঃ গৃহীত হয় নাই। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী প্রায় গৃহীত হইয়াছিল, আজও তাহা অনুমোদিত হইল না, ইহা বড় বিস্ময়কর। রিপোর্টখানি খুলিয়া দেখি কাগজে যে সংবাদটা প্রচারিত হইয়াছে ব্যাপারটা ঠিক সে প্রকার নহে। এই কমিটী ৪জন ব্যক্তি কর্ত্তৃক গঠিত হইয়াছিল। পরে ১ জন ভদ্রলোক পদত্যাগ করায় অবশিষ্ট ৩ জন I.C.S ই কমিটীর সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করেন। সিলবেরাড্ হয়েন প্রেসিডেণ্ট আর ক্যাম্পবেল ও রাস্তমজী-ফরিদুনজী এই দুইজন-মেম্বর। রিপোর্ট যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সিলবেরাড ও রাস্তমজীর অনুমোদিত। কমিটীর তৃতীয় ব্যক্তি ক্যাম্পবেল মহাশয় ভিন্ন রিপোর্ট দিয়াছেন। তাহাতে উক্ত দুইজনার সমস্ত মত খণ্ডন করিয়া মেট্রিক প্রণালী গৃহীত হউক এই মত দিয়াছেন। দাঁড়াইতেছে এই যে দুইজন বলিতেছেন যে 'রেলওয়ে ওয়েট' এবং বৃটীশ ইঞ্চফুট গৃহীত হউক এবং একজন বলিতেছেন যে না, তাহা কখনও সঙ্গত নহে। যে সমস্ত সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে তাহা বিচার করিলে মেট্রিক প্রণালী গ্রহণ করাই সর্ব্বথা উচিত। এ অনেকটা সোয়াস্তির বিষয়। যদি কোনও কালে গবর্ণমেণ্ট এ রিপোর্টের উপর কার্য্য করেন, তবে সমস্ত বিষয়টী পুনরায় বিবেচিত হইবার আশা রহিয়াছে।

মেট্রিক প্রণালী কি তাহা জানা দরকার। পৃথিবীর পরিধিকে চারি ভাগ করিয়া প্রত্যেক চতুর্থকে এক কোটী ভাগ করিলে যে দৈর্ঘ্য পাওয়া যায় তাহাকে এক মিটার বলে। পৃথিবীর পরিধির ৪ কোটী ভাগের ১ ভাগ মিটার। পৃথিবীর পরিধির উপর দৈর্ঘ্যের মাপ স্থাপিত করা অপেক্ষা আর কোন সহজ সার্ব্বজনীন মাপ কল্পনা করা যায় না। ইংলণ্ডে প্রচলিত দৈর্ঘ্যের মাপ ইয়ার্ড কাহাকে বলে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে তাহার উত্তর এই যে প্রথম হেনরী তাঁহার বাহুর দৈর্ঘ্যের মাপে যে মাপকাঠি প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহার মাপ, অথবা এতদপেক্ষা ভাল সংজ্ঞা এই যে পার্লামেণ্ট গৃহে সুরক্ষিত প্লাটিনামের তৈয়ারী মাপকাঠির একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে দৈর্ঘ্য তাহাকে ইয়ার্ড বলে। সে যাহা হউক, এই মিটার দৈর্ঘ্যের মাপ দৈনন্দিন প্রত্যেক ব্যবহারের উপযোগী। তবে ইহা অপেক্ষা ছোট ও বড় মাপেরও নাম চাই। মানুষ যে জিনিষ লইয়া নাড়াচাড়া করে তাহার ওজন ও মাপকাঠিও সেই প্রয়োজনানুরূপ করা দরকার। মানুষ যদি রামায়ণের হনুমানের মত বলশালী হইয়া পাহাড় ঘাড়ে করিয়া চলা ফেরা করিতে পারিত, তাহা হইলে সের, কিলোগ্রাম, বা পাউণ্ড তাহার ওজনের একক না হইয়া এক একটী মালগাড়ীর মত মাপের লৌহ বা প্রস্তর খণ্ড অথবা চাই কি একটা পাথরের ঢিবিই ওজনের একক হইত এবং মানবশিশুকে মুখস্থ করিতে হইত

১০ টিবিতে—১ পাহাড়

১০ পাহাড়ে—১ পর্ব্বত

১০ পর্ব্বতে—১ হিমাচল।

কিন্তু মানুষ যাহা তাহাই বলিয়া ওজন ও দৈর্ঘ্যের এককে সব দেশে একটা সুসঙ্গত সাদৃশ্য দেখা যায়। সের, কিলো, ২ পাউণ্ড সমস্ত প্রায় একই ওজনের। ওজনের একক ঐ প্রকার ধরিলে সাধারণ ঘরকন্না ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ বেশ চলে বলিয়াই পৃথিবীময় একই ওজনের একক। ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ ও ফ্রান্সের দৈর্ঘ্যের মাপ ইয়ার্ড, গজ এবং মিটারও প্রায় একই সমান। মিটার অপেক্ষা ছোট বড় দৈর্ঘ্য বলিবার রীতি ১০ গুণ কমাইয়া বা বাড়াইয়া বলা। নীচের দিকে ডেসি, সেন্টি, মিলি; উপরের দিকে ডেকা, হেক্টো, কিলো এই বাক্যগুলি যোগ করিতে হয়।

মেট্রিক নিয়মে ওজনও দৈর্ঘ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এক সেন্টিমিটার লম্বা, এক সেন্টিমিটার চওড়া ও এক সেন্টিমিটার খাড়াই একটা পাত্রে যে জল ধরে, তাহাকে "গ্র্যাম" বলে। অর্থাৎ এক ঘন (কিউবিক) সেন্টিমিটার জলের ওজন ১ গ্র্যাম। তারপর উঁচুনীচু ওজন বলিতে ঐ মাপের শব্দগুলা ব্যবহৃত হয়। উপর দিকে

১০ গ্রামে—এক ডেকাগ্রাম

১০ ডেকা বা ১০০ গ্র্যামে—এক হেক্‌টোগ্র্যাম

১০ হেক্টো বা ১০০০ গ্র্যামে—এক কিলোগ্র্যাম

নীচের দিকে—১০ মিলিগ্র্যামে—১ সেন্টিগ্র্যাম

১০ সেন্টিগ্রামে

বা ১০ মিলিগ্রামে—১ ডেসিগ্র্যাম

১০ ডেসি বা

১০০০ মিলিগ্রামে—১গ্র্যাম।

কোনও জিনিষের ওজন যদি ৫ গ্র্যাম বলি, তবে তাহার অর্থ ৫ ঘন সেন্টিমিটার জলের ওজন। মিটারেরই উপর দৈর্ঘ্যের ও ওজনের পরিমাণ প্রতিষ্ঠা করার এই মেট্রিক প্রণালী পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বদেশ ও লোকের উপযোগী হইয়াছে। অধুনা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদিতে মেট্রিক ওজন ও মাপ লেখা থাকে। দশ দশ করিয়া বাড়িয়া বা কমিয়া যাওয়ায় ইহাতে হিসাব করিবার চরম সুবিধা; আর ওজনের ভিত্তিও এমন যে, সকল লোকে বুঝিতে পারে ও নিজেদেরই বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। ইংলণ্ডে প্রচলিত বৃটীশ ইয়ার্ড আমি মাপ বলিয়া কেন গ্রহণ করিব, পার্লামেন্টের কোন্ গৃহকোণে কি মাপদণ্ড রাখা হইয়াছে, সে খবরে আমার প্রয়োজন নাই, আমি যাহা সহজ বুঝি এমন কিছু বল। এ প্রকার প্রশ্নে মেট্রিক-প্রণালীতে সকলেই বলিতে পারেন যে, হাঁ, ইহার ভিত্তি পৃথিবীর পরিধির ৪ কোটী ভাগের ১ ভাগ; ইহা এমন কিছু, যাহা পৃথিবীর বাসিন্দা সকলেই নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। বৃটিশ ওজনের একক ১ গ্রেণ। গ্রেণ কাহাকে বলে? না এভরডুপইজ পাউণ্ডের ৭০০০ হাজার ভাগের ১ ভাগ। তবে এভর্ডুপইজ পাউণ্ড কি? তাহা জানি না, অথবা ভুলিয়া গিয়াছি। তবে মিণ্টের ছাপমারা লোহার চাকৃতি, যাহাকে পাউণ্ড বলা হয়, তাহাই ১ পাউণ্ড; আর বিশ্বাস না হয় পার্লামেণ্ট-গৃহের Strong roomএ গিয়া দেখিয়া আইস, সেখানে এক্ টুকরা প্লাটিনাম্ রাখা আছে, যাহাকে আমরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাউণ্ড (এভর্ডু) বলিয়া আসিতেছি। এই মেট্রিক-প্রণালীর এমন সার্ব্বজনীন ভিত্তি বলিয়া কাজেও তাহাই হইয়াছে। ফরাসীদেশে মেট্রিক-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার কিছুকাল পরেই বেল্‌জিয়ম উহা গ্রহণ করে, যদিও সে সময়ে বেল্‌জিয়মের সহিত ফ্রান্সের সখ্য ছিল না, অধিকন্তু তদ্বিপরীত ভাবই ছিল। বেলজিয়ম হইতে হলাণ্ড এবং তৎপরে জর্ম্মানি, রুষ, অষ্ট্রীয়া, ইটালি, প্রভৃতি সমস্ত ইউরোপীয় দেশই মেট্রিককে গ্রহণ করিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। সমগ্র ইউরোপের ভিতর কেবল ইংলণ্ড ও তুরস্ক দেশেই মেট্রিক নিয়ম প্রচলিত নাই। এ ছাড়া ক্যানাডা, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ ও মিসর দেশেও মেট্রিক-নিয়ম প্রচলিত। মজা এই যে,

যেদেশে এই প্রণালী একবার অবলম্বিত হইয়াছে, পুনরায় তথায় অন্য কোন প্রণালী চলিত করা উচিত, এমন কথা ভাবাও হয় নাই। যেখানেই গৃহীত হইয়াছে সেইখানেই আদরের সহিত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

ইংলণ্ডে যে মেট্রিক প্রণালী গৃহীত হয় নাই, তাহা যে ইংলণ্ডের পক্ষে হানিকর, তাহার অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে একেবার এই প্রণালী গৃহীত হয় হয় হইয়াছিল, দুই এক বৎসরের মধ্যে গৃহীত হইবে এ প্রকার আভাসও পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু এতাবৎকাল অনেক সূক্ষ্মদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি চেষ্টা করিয়াও বিশেষ কিছুই করিতে পারেন নাই। তবে ইংলণ্ডের ১৯১৪ সালের ফর্ম্মাকোপিয়াতে মেট্রিক-ওজন এবং মাপের ব্যবহার বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ইংলণ্ডের ডাক্তার মহাশয়দিগকে এক্ষণে ঘন-সেণ্টিমিটার ও গ্রামে ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং "এপথিকারীর ওয়েট" নামক জঞ্জাল ইংলণ্ডের দাওয়াইখানা হইতে দূরীকৃত হইয়াছে। ব্যবসায়ে ব্যবহৃত না হইলেও বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিমাত্রকেই মেট্রিক প্রণালীতে ভাবিতে এবং ওজন করিতে হয়। যত ভাল নিক্তি এবং ওজন, তাহা ঐ শত্রু জর্ম্মণদের তৈয়ারী আর যত ভাল পুঁথি, তাহাও ঐ জর্ম্মণদের তৈয়ারী। আমি কেমিক্যাল ব্যালান্স ও কেমিষ্ট্রীর পুস্তকের কথা বলিতেছি। জর্ম্মানদের মেট্রিক প্রণালীতে ওজনকরা ও ভাবা ছাড়া উপায় নাই। ইংলণ্ডের ত এই অবস্থা। শত বাধা সত্ত্বেও মেট্রিক প্রণালী ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়া পড়িতেছে।

ইংরাজ রাজার কয়েক শতাব্দী শাসনের পরও আজিকার দিনে সমগ্র ভারতবর্ষের ওজনের যে অবস্থা, মোগল আমলে বা হিন্দু আমলে ইহার অপেক্ষা কিছু মন্দ ছিল না। বরং বাণিজ্য বাড়িতেছে বলিয়া ক্ষতির পরিমাণ অধিকতর হইতেছে এবং গোল বেশী করিয়া পাকাইতেছে। পূর্ব্বে যেমন ভিন্ন ভিন্ন তালুকে হরেক রকম ওজন ও মাপ চলিতেছিল, আজিও তাহাই আছে। ইংরাজ আমলে কেবল তোলাকে নির্দ্দিষ্ট ওজন করিয়া মুদ্রা এক হইয়াছে। কিন্তু এই তোলার উপর প্রতিষ্ঠিত ওজন সর্ব্বত্র প্রচলিত নহে এবং সর্ব্বত্র একার্থে ব্যবহৃত হয় না। আজ ভারতবর্ষের কোথায় কি ওজন ব্যবহৃত হয়, তাহার তালিকা করিলে একখানা আঁকের খাতা হইবে। ২৪ তোলায় সের হইতে ৩০০ তোলায় সের, আর ২০ সেরে মণ হইতে ২০০ সেরে মণ। ইহাদের প্রত্যেক সংখ্যা এবং তাহাদের যতরকম ঘোরফের হইতে পারে, তাহার সবগুলি দেশে কোনও না কোনও স্থানে প্রচলিত আছে। আমাদের ওজন মাপ কত রকমের আছে তাহার আভাস মাত্র দেওয়ার জন্য বাংলাদেশে ও মাদ্রাজ প্রচলিত ওজন ও মাপের কয়েকটিমাত্র উল্লেখ করিব।

বাংলাদেশের ওজন মাপ।

৫ তোলায় ছটাক

সাধারণতঃ বাংলাদেশে ৪ ছটাকে পোয়া, ৪ পোয়াতে সের, ৪০ সেরে মণ। ৮০ তোলায় সেরের সহিত প্রায় বাংলার সব জেলাতে ৬০ তোলার কাঁচি-সের প্রচলিত আছে। খুচরা বিক্রয়ে বাখরগঞ্জ, বীরভূম বাঁকুড়া, ফরিদপুর, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর, ঢাকা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ৬০ তোলায় সেরের ব্যবহার। এ ছাড়া দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই ৫২, ৫৫, ৫৮, ৫৮৷৶০, ৬২, ৬৪, ৭০, ৭২, ৭৫, ৭৮, ৮১, ৮২৷৶০, ৮৫৶০, ৯০, ৯৬ তোলায় সেরের কোনও না কোনওটি উৎপন্ন দ্রব্যাদির বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ ওজন অনেকস্থলে আছে; যেমন

তুলার জন্য—চট্টগ্রামে
ধান ও গুড়ের জন্য—ঢাকায়
ধান, চাল, সরিষা—দিনাজপুর, মেদিনীপুর বাখরগঞ্জে
} ৮২৷৶০ সের

চিনির জন্য—বাখরগঞ্জ—২২০ তোলায়

পাটের জন্য—ঢাকায়— ৮৪৷৶০

ধান, চাল, পাট, সরিষার জন্য—২৪ পরগণা, পাবনায়, ৮৪৷৶০ আনায় সের।

আবার এ ছাড়া আরো জটিল ব্যবস্থাও আছে।

যেমন, চট্টগ্রামে যে পাট মাণিকগঞ্জ হইতে ক্রয় করা হয়, তাহার ওজন ত্রিশ সেরে মণ। কলিকাতা অঞ্চলে কুঠির-মণ বলিয়া এক প্রকার মণ চলিত আছে, ইহা প্রায় ছত্রিশ সেরে হয়। কুঠির দেড়মণ ইংরাজী এক হন্দর এভর্ডুপইজ ওজনের সমান। আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, ঢালাই লোহার সের ও মণ ওজন-গুলিতে লেখা থাকে। এই বাজার সের ও বাজার মণ লেখার উদ্দেশ্য যে ইহা ৮০ তোলার সেরের হিসাব—কুঠির মণ নহে। ফাক্টরী মণ বা কুঠির মণ, হিসাবের মণ মাত্র। অর্থাৎ ওজনটা বাজার সের মণ দ্বারা বা হন্দর পাউণ্ড দ্বারা হয়, তার-পর হিসাব করিয়া কত কুঠির মণ হইল বাহির করা হয়—সত্য সত্য কুঠির মণ বলিয়া কোনও লৌহ-খণ্ড দ্বারা ওজন হয়না—অন্ততঃ আমার জানা নাই। কলিকাতায় সোরা ক্রয়বিক্রয়ে অনেক লক্ষ টাকার কারবার এই কুঠির মণে হইয়া থাকে।

বাংলা দেশে প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদমতে ওজন এক প্রকার খিঁচুড়ি হইয়া আছে। কবিরাজ মহা-শয়দের ওজন-প্রণালী লইয়া একটু নাড়াচাড়া করাতে এই বিষয়ের সমস্ত গোলমাল আমার নজরে পড়ে। আয়ুর্ব্বেদের শ্লোকগুলি যদি কাহার দ্বারা লিখিত তাহা নিরাকৃত হইত, তবে ওজন বিষয়ের একটা মীমাংসা চলিত। কিন্তু অতি প্রাচীন শ্লোকের মধ্যে নিজেদের মতানুযায়ী শ্লোক প্রবেশ করান আজও কবিরাজ- মহাশয়েরা গর্হিত মনে করেন না। শার্ঙ্গধর ও ভাবপ্রকাশে মাগধ ও কলিঙ্গ মান বর্ণিত আছে এবং মাগধ-মানই প্রশস্ত উল্লিখিত আছে। আয়ুর্ব্বেদের ওজনের একক, রতি বা কুঁচ বা গুঞ্জা—শুধু বাংলা কেন আয়ুর্ব্বেদের ও স্বর্ণকারদের মানের আদি কুঁচ আজও ভারতের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়। সমস্ত দেশেই সভ্যতার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ওজন সম্বন্ধে জ্ঞান পরিস্ফুট হইতে থাকে। সকল হিসাবও সভ্যতার আদি শস্য হইতেই ওজনও আরম্ভ হয়। আমাদের দেশে যেমন কুঁচ, যব, সর্ষপ, ইংলণ্ডেও তেমনি **Barley corn, grain** ইত্যাদি। শস্যমূলক ওজন বড় হইলে উহা হইতে এক খণ্ড ধাতুর ওজন নির্দ্দিষ্ট করিয়া লওয়া হয়। তার-পর আর শস্যে ফিরিয়া যাইবার দরকার নাই। নির্দ্দিষ্ট ওজনের এত অংশ কুঁচ বা grain ধরিয়া লওয়া হয়। এক্ষণে মগধমান অনুসারে ৩ যবে এক রতি বা কুঁচ; ৮ রতিতে ১ মাষা, ৮ মাষায় ১ তোলা,৩৪ তোলায় সের, ৩২ সেরে দ্রোণ। এই সের বা দ্রোণ বলিয়া কত বড় ওজন ব্যবহৃত হইত, তাহা জানিবার উপায় নাই। কবিরাজ-মহাশয়েরাও জানেন না। তবে কুঁচ যখন এখনো ওজন বলিয়া ব্যবহৃত হয়, তবে আমরা নীচের দিক হইতে এই প্রকারে স্থির করিতে পারি—১ সের—৬৪ তোলা, ১:তোলা—৮ মাষা—৪৮ রতি ৮৮টী কুঁচের ওজন ১ তোলা। কবিরাজ মহাশয়েরা যদি ওজন বহাল রাখিতেন, তাহা হইলে কোন গোল হইত না। কিন্তু ৮৮টী কুঁচের ওজন তোলা না করিয়া যখন ইংরাজ-আইনে ১৮০ গ্রেণে তোলা প্রচলিত হইল তখন তাঁহারা সেই মুদ্রাকেই কবিরাজী তোলা করিয়া লই-লেন। এক্ষণে দেখা যায় যে ১১টী কুঁচ না হইলে এক দুয়ানীর সমান হয় না—সেই জন্য সংজ্ঞা বদলাইয়া ১২টী কুঁচ বা রতিতে ১ এক মাষা বা দুয়ানী করি-লেন। ফলে দাঁড়াইল এই যে ৮ × ১২ = ৯৬ রতিতে ১ তোলা হইল। মাগধ-মান অনুসারে ৪৮ রতিতে এক তোলা ছিল। কবিরাজ মহাশয়েরা ইংরাজের তোলাকে কবিরাজী তোলা ধরিয়া আয়ুর্ব্বেদের তোলার দ্বিগুণ ওজন তোলা ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু এই যে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা বলিয়া কহিয়া নহে, পুরাণো সংস্কৃত শ্লোকের মাঝে লিখিয়া দিয়াছেন যে আজকাল ১২ রতিতে মাষা হয়। আয়ুর্ব্বেদের এই প্রকার জটি-লতা ছাড়া আরও গোলমাল আছে, যাহা আবহমান-কাল হইতে প্রচলিত। যেমন কুড়ব বা অর্দ্ধসেরের উপর যেখানে জলীয় দ্রব্যের পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে, ব্যবহারে তাহা দ্বিগুণ দিতে হইবে। ৩২ সের জল ব্যবহার করিতে হইবে। ২ সের ঘি লিখিলে ৪ সের ঘি দিতে হইবে।

বাংলার জমির মাপে হাত গজ, কাঠা, রশি, বিঘা এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তাহার সংজ্ঞা স্থির নাই। ময়মনসিংহে ১৮ হইতে ২০॥ ইঞ্চে এক হাত হয়। ৭ হইতে ১৭॥ হাতে এক নল হয়। বাংলা দেশের মাপ (measure) যে কত রকম তাহা আমাদের সকলেরই কিছু কিছু জানা আছে। এক কাঠা চাউল বলিলে আমরা এক একজন এক এক রকম বুঝিব।

এইবার মাদ্রাজ প্রদেশে প্রচলিত ওজন সম্বন্ধে কিছু বলিব। মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এতাবৎ এই ওজন পছন্দ করিয়া আসিয়াছেন—

৩ তোলায়—১ পলম্।

৮ পলমে—১ সের = ২৪ তোলা।

৫ সেরে—১ বিশ

৮ বিশে—১মণ = ৪০ সের, ২৪ তোলা।

এই পলম ও তোলার পূর্ব্বে অপর ওজন ছিল। ৫ তোলায় পলম বলিত। এক্ষণে নানা রকম তোলা ও পলম সের, বিশ, চলিতেছে। কর্ণাল ও কুডাপাতে ২০ তোলায় সের; কর্ণালে ৬ সেরে বিশ, কুডাপাতে ৪ সেরে বিশ। অনন্তপুর ও বেলারী অঞ্চলে ২১ তোলায় সের ৬ সেরে বিশ, ৮ বিশে মণ। গঞ্জাম ও ভিজগাপটমে ২২ তোলায় সের। ভিজগাপটম অঞ্চলে ইংরাজী এভর্ডু-পইজ ওজন ব্যবহৃত হয়, গ্রামেও নাকি পাউণ্ড ওজনের পাথরের টুকরা ব্যবহৃত হয়। সমস্ত মাদ্রাজের কথা বলিলে ২০ তোলা হইতে ১০৫ তোলায় সের স্থানবিশেষে ব্যবহৃত হয়। পলম্ কোথাও ৩ তোলা, কোথাও ৬ তোলা, আবার কোথাও বা ১০, ১২॥০ ১৪, ১৫ তোলা। তিনিভেলীতে সের নাই, ১৪৪ পলমে এক তুলাম্। সাধারণতঃ ২০ মণে ১ কন্দি হয় কিন্তু তিনিভেলীতে

১ কাঁন্দি তুলা—৫০০ পাউণ্ড,

১ কাঁন্দি পেঁয়াজ—৯০০ "

১ কাঁন্দি খইলা—১২০০ "

মালাবারে ২৫ হইতে ৩৫ পাউণ্ডে এক তুলাম্ হয়। পক্ বলিয়া এক ওজন আছে, তাহা ১০০ হইতে ২৫০ তোলায় হয়। মরদারণ সরকারে ৭ রাথোলে ১ ভেড্ এবং ২৮ রাথোলে ১ মণ, ৪০ তোলায় রাথোল। দক্ষিণ আরকটে চিনাবাদাম, তৈল এবং খইলের জন্য কিলোগ্রাম ব্যবহৃত হয়। স্বর্ণকারদের ৩২ গুঞ্জামণি (কুঁচ), ১ ভার বা প্যাগোডা। এই প্যাগোডা ওজন করিলে দেখা যায় যে, ঐ প্যাগোডায় ১৮০ গ্রেণের তোলা হয়। কোথাও বা ১৬ ফনামে ১ প্যাগোডা হয়। গঞ্জাম, গোদাবরী, গন্টুর জেলায়

২ বিশমে—১ পরকা

২ পরকায়—১ পদিকা

২ পদিকে—১ আধিক

২ আধিকে—১ চিনাম।

ইংরাজী তোলায় ওজন করিলে ৩০ চিনাম ১ তোলার সমান।

লম্বার মাপ—বৃটীশমাপ অনেক জায়গায় আজকাল চলিয়াছে। তাছাড়া দেশী গজও হাত ব্যবহৃত হয়। অনন্তপুরে ২০ ইঞ্চে হাত, ভিজগাপটমে ১৯-২০ ইঞ্চে হাত। দক্ষিণ আরকটে ৵১০ ইঞ্চ মাপের এক ইঞ্চ ব্যবহার হয়। কাণরাতে লম্বামাপের একক ১ অঙ্গুল এবং তাহা একটী টাকার ব্যাসের সমান অর্থাৎ ১ ইঞ্চ। ২৪ অঙ্গুলিতে এক ময়লাকলু, ২৬॥ অঙ্গুলে এক ইরুরীকলু। কৃষ্ণাতে ১৬ বিশামে এক গজ। তাই-জাগে ১৬ গিরাতে গজ। মাদুরা, রামনদ, তিনিভেলীতে তালমুচাম্ নামে মাপ ব্যবহৃত হয়। ইহা কোথাও বা ৩৩ ইঞ্চের সমান কোথাও বা ৩২ ইঞ্চের সমান। মাদ্রাজে তরল পদার্থ সাধারণতঃ মাপে ব্যবহৃত হয়; দুই একটা জিনিষ, যেমন ঘি, ওজনে বিক্রয় হয়। মাদ্রাজ সহরে ঘি পাইকারীতে ওজনে ও খুচরাতে মাপে বিক্রয় হয়। এই তরল মাপের নাম ও আয়তন ওজনের ন্যায় অনির্দ্দিষ্ট এবং এক এক স্থানে এক এক রকম। আবার একই নামে বিভিন্ন আয়তনের মাপ ব্যবহৃত হয়। যেমন "আযক" বলিয়া তাঞ্জোরে যে মাপ তাহাকে

৭০৪ হইতে ৭৫৪ আউন্স জল ধরে। ত্রিচিনপলীতে ৭২০ হইতে ৭৬৮ আউন্স জল ধরে এবং মাদুরাতে ১ আদমে ১৩৭৫ আউন্স জল ধরে। ভল্লম বলিয়া আর এক মাপ আছে, তাহাও ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের সমান।

ঘন মাপ—কিউবিক মেজার। মাদ্রাজ আজকাল অনেক স্থানে বৃটিশ কিউবিক ফিট ব্যবহৃত হয়। আমরা যাহাকে "ফারা" বলি, মাদ্রাজে "পারা" বলিয়া সেই প্রকার মাপ আছে। ২০ পারাতে ১ পুটী, ৬০ পারাতে ১ গ্রেস্। রামনদে 'তুচুমোলাম' ও তিনিভেলীতে 'নোলাম' বলিয়া যথাক্রমে ৩ কিউবিক ফুট, ও ১১৩৫ কিউবিক ইঞ্চের মাপ ব্যবহৃত হয়।

মাপ ও ওজন যে কত সহস্র প্রকার চলিত আছে, উপরোক্ত বাংলা ও মাদ্রাজের কয়েকটীমাত্র দৃষ্টান্তে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। সমস্ত ভারতবর্ষ দূরে থাকুক, এক প্রদেশে কি কি ওজন ও মাপ ব্যবহৃত হয়, তাহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত দেওয়া একপ্রকার অসম্ভব। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা সত্বেও আজ এই অবস্থা। মোগল বা হিন্দু আমলে ইহার অপেক্ষা কিছু খারাপ ছিল না, কেননা আর কি খারাপ হইতে পারে? রেলওয়ে গুয়েট বলিয়া বাংলাদেশের ওজন অনেক স্থানে চলিতে সুবিধা পাইয়াছে, কিন্তু সমস্ত অসম্বদ্ধ ওজনের প্রচলনের তুলনায়, ইহা একপ্রকার না ধরিলেও চলে। কেননা রেলের ওজন লইয়া কতজনের এবং কত দিনেরই বা দরকার? বড় বড় বেপারী, যাঁহারা রেলে মাল আনা-নেওয়া করেন, তাঁহাদেরই রেলের খবরে দরকার—কিন্তু যে লক্ষ লক্ষ ছোট ব্যবসায়ী আছে, তাহারা রেলের তত খবর রাখে না। কোথাও কোথাও ভারত-গবর্ণমেণ্ট একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওজন চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; যেমন মাদ্রাজে পলম্ ও সের এবং বিশ্; মাদ্রাজে এ ওজনের শুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য ষ্ট্যাম্পিং-টিপারও সৃষ্টি হইয়াছিল এবং কোথাও কোথাও আছে। আকবরের সময়ে যেমন হইয়াছিল —পূর্ব্বতন ওজন ও মাপ রদ করিয়া ইলাহি ওজন ও মাপ প্রচলনের চেষ্টায় যেমন পূর্ব্বের ওজন ও মাপের সহিত নূতন ওজন ও মাপ চলিতেছে—এক্ষণে ইংরাজের আমলেও তাহাই হইয়াছে—পুরাণোর বদলে নূতন কিছু হয় নাই, তাহার উপর কিছু হইয়াছে।

এক্ষণে ওজন ও মাপের একীকরণ মানসে ভারত গবর্ণমেণ্ট কি চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন, সে সম্বন্ধে কিছু বলিব। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ডিরেক্টর-জেনারেল অফ পোষ্টঅফিস গবর্ণমেণ্টের নিকট জ্ঞাপন করেন যে, রেলওয়েতে বৃটীশ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওজন ব্যবহার হওয়ায় অসুবিধা হইতেছে। সেই বৎসরেই রেলওয়েতে বাংলা দেশের মণ ব্যবহৃত হইবে গবর্ণমেণ্ট এ প্রকার বিধান করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্ট মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে একটী কমিটী গঠন অনুমোদন করেন। প্রত্যেক প্রদেশে একটী স্বতন্ত্র কমিটী হইবার প্রস্তাব হয়। যাহাতে লোকের বিরক্তিকর কিছু না করা হয়, সেক্রেটারী অফ ষ্টেট এ প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিতে বলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক কমিটীগুলির রিপোর্ট সংগৃহীত হইলে গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন, সে সকল পরস্পর এত বিরোধী যে, তাহা হইতে কোনই কার্য্যকরী সিদ্ধান্তে আসা যায় না। এইজন্য অতঃপর গবর্ণর জেনারেল কলিকাতায় একটী সেণ্ট্রাল কমিটী গঠিত করিতে চেষ্টা করেন। সেক্রেটারী অফ ষ্টেট এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং তৎসহিত "মেট্রিক কমিটী অফ বৃটীশ এসোসিয়েসনে"র নিকট হইতে ভারতবর্ষে মেট্রিক-প্রণালী প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে মন্তব্য প্রেরণ করেন। তিনি জানান যে বৃটীশ ওজন ভারতবর্ষে প্রচলিত করা সমীচীন হইবে না। তিনি আরও বলেন যে, "It would be expedient to establish a system on the best theoretical model," একটী সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণপ্রণালী প্রবর্ত্তন করাই উত্তম।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ষ্ট্রাচী একটী পুস্তিকা প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি রকমারী ওজন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, সমস্ত দেশেই ওজন সম্বন্ধে আইন হইবার পূর্ব্বে এই প্রকার গোলমেলে অবস্থা থাকে। এই সমস্ত বিচার করিয়া তিনি বলেন

যে, পুরাণো সমস্ত ওজন ও মাপ উঠাইয়া দিয়া একটা নূতন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করা সঙ্গত হইবে—এবং মেট্রিক প্রণালীই যে সে নূতন প্রণালী হইবে, তাহা স্বতঃ প্রতীয়মান। ১৮৬৬ সালের কমিটীর অধিকাংশ সভ্যই এই মত প্রকাশ করেন যে ইংলণ্ডে প্রচলিত ওজন ও মাপ ভারতবর্ষে গৃহীত হউক। বিলাতী ব্যবসার সুবিধা হইবে, এই কারণেই উক্ত মন্তব্য গৃহীত হয়। দুঃখের বিষয়, কমিটীর অধিকাংশ সভ্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, বিলাতী ব্যবসা ছাড়াও দেশের অন্তর্বাণিজ্যের জন্য একটা ওজন আবশ্যক আছে। কর্ণেল ষ্ট্রাচী ও অপর দুইজন সভ্য এই মন্তব্যে যোগদান করেন নাই। তাঁহারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, মেট্রিক প্রণালী গ্রহণ করা হউক। এই প্রস্তাব ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকট পহুঁছিলে ভারত-গবর্ণমেণ্ট অধিকাংশ সভ্যের মত প্রত্যাখ্যান করিয়া মেট্রিক প্রণালী গ্রহণ অনুমোদন করেন। এই অর্থে এক কিলোগ্রামের ওজন অর্থাৎ ২২০৫ পাউণ্ডকে এক সের বলা হউক, স্থির হয়। ভারত গবর্ণমেণ্টের এই প্রস্তাব সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট অনুমোদন করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এই মর্ম্মে এক বিল পাশ হয়, কিন্তু তাহা সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটের নিকট গেলে তিনি বলেন যে Lord Northbrook নূতন বড়লাট হইয়া যাইতেছেন, তিনি গিয়া যাহা হয় করিবেন। লর্ড নর্থব্রুক বলেন যে, এই আইনের বাধ্যতামূলক সর্ত্তগুলি রেলওয়ে সম্বন্ধে উঠাইয়া দেওয়া হউক—আর স্থির করেন যে, যদি রেলওয়ে কোম্পানীরা ইচ্ছা না করেন, তবে এ নূতন Weight and Mesures Act কার্য্যতঃ প্রয়োগ করা হইবে না। রেলওয়েরা পুরাণো মণ ব্যবহার করিতেছিলেন; সেইজন্য এ বিষয় অতঃপর আর কিছুই হয় নাই। ১৯০১ সালে আবার এক নূতন পর্ব্ব উপস্থিত হয়। সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট মেট্রিক প্রণালী ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে যুক্তি সকল উল্লেখ করিয়া গবর্ণর জেনারেলকে লেখেন যে ভারতবর্ষে মেট্রিক প্রণালী গৃহীত হউক। ভারত গবর্ণমেণ্ট তখন উল্টা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা এই উত্তর দিলেন যে, হাঁ, মেট্রিক প্রণালী ভাল বটে, কিন্তু এ দেশে মুদ্রাতে সম্ভবপর হইলেও ওজনে প্রচলিত করা শক্ত। আর বলেন যে, ভাল ইংলণ্ডেই আগে মেট্রিক প্রণালী গৃহীত হউক, তারপর আমরা ভারতবর্ষের কথা দেখিব।

অতঃপর রেলওয়ে ওজন ক্রমেই চলিয়াছে এবং রেলের স্বার্থে আঘাত না করিয়া ওজন পরিবর্ত্তন বা সংস্কার করা আরও বেশী অসম্ভব হইয়াছে। ইতিমধ্যে বঙ্গে গবর্ণমেণ্ট ১৮৭১ সালের আইন অনুসারে কিলোগ্রাম ওজন গ্রহণ করিতে চাহিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টকে লেখেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট জবাব দেন যে, সে আইন কিছু নয়, বঙ্গে গবর্ণমেণ্ট যদি কিছু গ্রহণ করিতে চাহেন, তবে রেলওয়ে ওজন লইতে হইবে। উপরন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট বঙ্গে গবর্ণমেণ্টকে বলেন যে, ইচ্ছা করিলে তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে মিউনিসিপাল আইনে এক দফা সর্ত্ত বসাইতে পারেন যে, মিউনিসিপাল সীমার মধ্যে ১৮০ গ্রেণে তোলা ওজন ব্যবহৃত হইবে। গবর্ণমেণ্টের এই চিঠিখানিতে যে পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে, সমস্ত প্রদেশেই শাসনকর্ত্তাগণ ওজন সম্বন্ধে কোন কথা ভারত গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিয়া এই একই উত্তর পাইয়াছেন। অদ্যাবধি এই নিয়মেই কার্য্য হইয়া আসিতেছে। অর্থাৎ ওজন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এই অনুজ্ঞা করিতেছেন যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে মিউনিসিপাল এলেকা গুলিতে ১৮০ গ্রেণে তোলা আইন দ্বারা চালাইতে পারেন। অতঃপর মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ ও বঙ্গে গবর্ণমেণ্ট যখনই ওজন ও মাপ একীকরণ উদ্দেশ্যে নিজ নিজ প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন তখনই উল্লিখিত উত্তর পাইয়াছেন। বস্তুতঃ উল্লিখিত চিঠিখানাই আজকার দিনের চলিত ওজন সম্বন্ধে ব্যবহারিক আইন।

১৯১৩ সালে বঙ্গে কমিটী একটী রিপোর্ট প্রকাশিত করেন, তাহাতে রেলওয়ে ওজন ব্যবহার অনুমোদন করেন। ইহার পরেই ১৯১৫ সালের "ওজন মাপের কমিটী" গঠিত হইয়াছিল; তাহার রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে প্রেসিডেন্ট

ও অপর একজন সভ্য যে মত দিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, রেলওয়ে ওজন ছাড়া অন্য কোন ওজন গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নহে এবং মেট্রিক প্রণালী এ দেশের উপযুক্ত নহে কেননা লোকে বুঝিতে পারে না। এ ছাড়া দৈর্ঘ্যের মাপ ও জলীয় পদার্থের মাপ ইংরাজী ইঞ্চ ফুট ও গ্যালন রাখিতে বলেন। কমিটীর এই দুই-জন সভ্য তাঁহাদের গৃহীত সাক্ষ্য হইতে উপরোক্ত মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করেন। কমিটীর গঠন সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনজন সভ্য দ্বারা এই কমিটীর কার্য্য হয়। তন্মধ্যে দুইজন—সিলবেরাড্ ও রস্তমজী রেল-ওয়েটের পক্ষে ও তৃতীয় ব্যক্তি ক্যাম্পবেল, মেট্রিক প্রণালীর পক্ষে মত দিয়াছেন। যে সকল সাক্ষ্যের উপর সিলবেরাড ও রস্তমজীর মত প্রতিষ্ঠিত, সেই সকল সাক্ষ্যেরই উপর ক্যাম্পবেলের মত প্রতিষ্ঠিত। সাক্ষ্যের সারমর্ম্ম রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রকম রকম লোক রকম রকম মত দিয়াছেন এবং তাহা হইতে কোনই প্রমাণ্য উপসংহারে আসা যায় না যে দেশের সাধারণের বা ব্যব-সায়ীদের বা শিক্ষিত ব্যক্তির মত এই। কোনও উচ্চপদস্থ অভিজ্ঞ এবং শিল্প-ব্যবসায়ী সাহেব বলিয়া-ছেন যে ১৭৫ গ্রেণে তোলা, ২॥ তোলায় আউন্স, ১৬ আউন্সে পাউণ্ড এবং ১০০ পাউণ্ডে মণ, এই প্রকার করা হউক ; এই মতাবলম্বী অনেকে আছেন। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন ২ পাউণ্ডে সের, ২৫ সেরে কোয়াটার, ১০০ পাউণ্ডে হন্দর হউক। অনেকে বলিয়াছেন মেট্রিক প্রণালী গৃহীত হউক। অনেকে বলেন বৃটীশ প্রণালী গৃহীত হউক। দুইজন এই মত উদ্ধার করিয়াছেন যে রেলওয়ে ওজন লওয়া উচিত, তৃতীয় ব্যক্তি মত দিতেছেন যে, সমস্ত সাক্ষ্যের তত্ত্ব ভাল করিয়া বিচার করিলে মেট্রিক প্রণালী গ্রহণ করা উচিত। এই শেষোক্ত মতের সম্বন্ধে একটু বিশদ ভাবে বলিব। বিবেচনা পূর্ব্বক সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও সমস্ত দেশবাসী ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য এই মতেই মত দিবেন ইহাই আশা আছে।

বৃটীশ মাপের জটিলতা সম্বন্ধে বেশী কিছু না বলিয়া একটা হিসাব কষিলেই সহজে বুঝা যাইবে যে বৃটীশ মাপ পদ্ধতি যে পরিমাণে জটিল, মেট্রিক পদ্ধতি সেই পরিমাণে সরল।

মনে করুন ৯ ইঞ্চ চওড়া, ¾ ইঞ্চ পুরু ও ১১৭ ফুট লম্বা একখানা তক্তা আছে তাহার কালি বাহির করিতে হইবে।

$$\frac{৯}{১২} \times \frac{৩}{৪ \times ১২} \times ১১৭ = \frac{৩ \times ১১৭}{৬৪} = \frac{৩৫১}{৬৪}$$

$$= ৫' - ৫'' - ৯\cdot৭ \text{ পয়েণ্ট}$$

যদি মেট্রিক প্রণালীতে এই প্রকার একখানা তক্তার কালি কষিতে হইতে হয় তাহা হইলে ধরুণ

৯ সেণ্টিমিটার চওড়া ৩ সেণ্টিমিটার পুরু × ১১৭ মিটার লম্বা

= ৯ × ·৩ × ১১৭ = ৩১·৫৯ কিউবিক মিটার।

আজকাল যাঁহাদের কাঠের ব্যবসা করিতে হয় তাঁহারাই জানেন যে ফুট ইঞ্চ হইতে কালি করিয়া কিউবিক ফুট বাহির করা কি সাংঘাতিক ব্যাপার। হয় অমনি করিয়া খাটিতে হইবে নয় ত রেডি-রেকনার কিনিয়া উদ্ধার পাইতে হইবে।

যাঁহারা এই তথাকথিত রেলওয়ে ওজনের পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন যে ভারতবাসীরা এই ওজনের সহিত পরিচিত। একথা বলা ঠিক নহে, কেন না মাদ্রাজের লোক বাংলাদেশের ওজন সম্বন্ধে অজ্ঞ। তাহা-দিগকে ৪ ছটাকে সের শিখাইতে হইলে তাহাদের যে কষ্ট হইবে তাহার পরিমাণ বুঝিতে পারেন, যদি আজ আমাদিগকে শিখিতে হয় যে ৩৩ ইঞ্চে এক "তালমুচাম," অথবা ২৪ অঙ্গুলে এক "মলয়াল কলু," ২৬॥০ অঙ্গুলে ১ "ইক্কিড়ি কলু" অথবা ২ পদিকে ১'অধিগ' ২ 'অধিগে' ১ "চিনাম্"। রেলওয়ে ওজনের পক্ষপাতীরা আরও বলেন যে দেশের নিকট নামগুলি পরিচিত, সেইজন্ত নূতন ওজন চালান কষ্ট হইবে না। তা ছাড়া ১৮০ গ্রেণে তোলা ত ভারতে সর্ব্বত্র জানা হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু যখন ১৮০ গ্রেণে তোলা চলে নাই তখন এই নূতন তোলা ওজন চালান যেমন সম্ভবপর হইয়াছিল, এখন মেট্রিক ওজন চালান তেমনি সাধ্য হইবে। কেহ কেহ বলেন যে এই তোলা ওজনটা ভারতের দেশী জিনিষ, কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তোলা কথাটা পুরাণো হইলেও ওজনটা সম্পূর্ণ বিলাতী এবং তোলার উর্দ্ধতন ওজন সের ও মণ বলিতে আমরা এক একজন এক এক রকম বুঝি। একথা পূর্ব্বে বিশদভাবেই বলিয়াছি। এই তোলা সের মণের হিসাব অশিক্ষিত ও গ্রাম্য লোকের মনে রাখা যত কঠিন, মেট্রিক প্রণালী মনে রাখা তেমনি সহজ। যদি এই তোলা ও সের ওজন দেশের সর্ব্বত্র চালাইবার চেষ্টা করা হয় তাহা হইলে আর একটা গোল অবশ্যম্ভাবী। সাধারণে সের মণ বলিতে পুরাণো সের মণ (যথন মাদ্রাজীদের ২৪ তোলায় সের) বুঝিবে ও ইহাতে অজ্ঞ লোকের বিড়ম্বনার অবধি থাকিবে না। যদি পরিবর্ত্তন করিতেই হয় তবে পুরাণো নাম পরিবর্ত্তন করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন কেন না তাহা হইলে নূতন ও পুরাণো ওজনে ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এটা আরও প্রয়োজন এই জন্য যে, কমিটী প্রস্তাব করিয়াছেন, সহর গুলিতেই নূতন ওজনের আইন কার্য্যকরী করা হইবে; তাহা হইলে সহরে ও গ্রামে মাল খরিদ বিক্রয়ে ঝগড়া ও গোলের অন্ত থাকিবে না।

আর এই নূতন প্রস্তাবিত তোলা, সের, মণ দ্বারা বহির্ব্বাণিজ্যের কিছুই সুবিধা হইবে না। মেট্রিক প্রণালীতে সে বিষয়ে ঘরে বাহিরে কোনও তফাৎ থাকে না।

মেট্রিক প্রণালীর অন্য দশ রকম সুবিধার ভিতর একটা এই যে, মেট্রিকে ওজন, মাপ ও মণ পরিমাণ একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং একই ভাষায় ব্যক্ত করা যায়, ইহাতে সকলের বুঝিবার ও মনে রাখিবার বড় সুবিধা। মেট্রিকে হিসাব করা ও রাখা কত সুবিধা তাহা ঘন মাপের উদাহরণ হইতেই বুঝিয়াছেন। যদি গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া সরকারী কার্য্যের জন্য মেট্রিক প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন তাহা হইলে সাধারণে দরকার মত নিজের ওজনের সহিত হিসাব করিয়া এক্ষণে যে স্থানে যে ওজন চলিত আছে সেই ওজনেই ব্যবসা চালাইতে পারে। এই প্রকারে হিসাব করা কষ্ট কিন্তু ১৮০ গ্রেণে তোলায় ৮০ তোলায় সের, ১ কিলোগ্রামের খুব কাছাকাছি। বড় দোকানদারেরা যদি কিলোগ্রামের সহিত পরিচিত হইয়া পড়ে তবে আস্তে আস্তে ছোট দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের ভিতর ইহা প্রবেশ করিবে। অথচ কাহাকেও মানসিক প্রক্রিয়া দ্বারা সংজ্ঞা বদলাইয়া লইতে হইবে না। অর্থাৎ কাহাকেও এ প্রকার ভাবিতে হইবে না যে পূর্ব্বে মণ বলিতে ২৪ সের বুঝিতাম, এক্ষণে ৪০ সের বুঝিব। বোম্বে ও মাদ্রাজবাসিদিগকে নিজেদের চিরকালের অভ্যস্ত ভাবিবার রকমকে বদলাইয়া ২৪ স্থানে ৪০ বা ৪০ স্থানে ২৪ মনে রাখিবার প্রয়াস করিতে হইবে না। একটা পুরাণো ভাবার রকম বদলাইয়া নূতন রকমে ভাবা কত কঠিন তাহার আমরা সকলেই নিজ নিজ দৈনিক ব্যাপারেই পরিচয় পাইতে পারি।

আজকাল বিহারীর জন্য বিহার, ওড়িয়ার জন্য উড়িষ্যা, আসামীর জন্য আসাম ইহার একটা ধুয়া শুনা যাইতেছে। প্রতিবাদ সত্ত্বেও এ ভাবটা গোপন নাই। "বাংলার ওজন" বা "রেলওয়ে ওজন" চালাইতে চেষ্টা করিলে অযথা বাংলার উপর একটা ঈর্ষা আসিয়া কার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে কিন্তু মেট্রিক প্রণালী সার্ব্বজনীন বলিয়া ইহাতে কাহারও সে প্রকার মনোভাব হইবার হেতু নাই। মেট্রিক ওজনের ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও মেট্রিক ওজন ইত্যাদি যথেচ্ছ পাওয়া যাইতে পারে—আর দেশে এত ঢালাইখানা আছে যে মেট্রিক ওজন পাইবার অসুবিধা হইবে এ প্রকার আশঙ্কা করা যায় না।

দেশের হিতের জন্য যদি এক রকমের ওজন মাপ সারা ভারতবর্ষে চলা প্রয়োজন হয়, তবে সে উদ্দেশ্য একমাত্র মেট্রিক প্রণালী গ্রহণেই সম্পন্ন হইতে পারে, অন্য পথ নাই।

গবর্ণমেণ্ট "ওয়েট মেজার" বিষয়ে যে অনুসন্ধান

করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা অত্যন্ত ধন্যবাদার্হ। কিন্তু এই প্রকার কমিটী ও রিপোর্ট অনেকবার হইয়াও কার্য্যতঃ কিছু করা হয় নাই। যুদ্ধের জন্য এদেশে এই প্রকার দরকারী বিষয়ে যে কিছু হস্তক্ষেপ করা হইবে এমন ভরসা করা যায় না। এমন হইতে পারে লর্ড হার্ডিঞ্জের বড় লাটত্বের শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারত গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে ভুলিয়া যাইবেন। আমরা এই বিষয়ের পুরাণো বৃত্তান্তে দেখিয়াছি যে বিষয়টি অত্যন্ত ব্যক্তিগত। কখনও ভারত গবর্ণমেণ্টের নায়ক সেক্রেটারীকে অনুরোধ করিয়াছেন যে এই প্রকার করা হউক, আবার কখনও বা সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্ ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন যে মেট্রিক প্রণালী গ্রহণ কর—কিন্তু শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তনের সহিত বিষয়টির সমস্ত বিচার ও ভাব বদলাইয়া গিয়াছে। কাজেই কমিটীর রিপোর্টে কে কি বলিয়াছেন তাহা বড় একটা কিছু গুরুতর নহে কেন না গুছাইয়া দেখিলে রিপোর্টের মত এক দুই বা তিনজনের ব্যক্তিগত মত ছাড়া কিছু নহে। ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তা ও সেক্রেটারী একমত হইয়া ও তাঁহাদের কর্ম্মকালের মধ্যেই কিছু করিবেন এরূপ স্থির করিয়া বসেন তবেই এ বিষয়ে ভালমন্দ কোনও কার্য্যকরী আইন হইবে। কিন্তু আজ হউক কাল হউক ভারতবর্ষকে এক ওজন ও মাপ প্রণালী প্রদান করিতে গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্মতঃ বাধ্য। কোনও না কোন দিন এ কার্য্য গবর্ণমেণ্টকে হাতে লইতেই হইবে। যত বিলম্ব হইবে, পরিবর্ত্তন জনিত সাধারণের অসুবিধা তত বেশী হইবে। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে শীঘ্র হস্তক্ষেপ করিলেই মঙ্গল। পূর্ব্বে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে dissentকারী সভ্যদের সহিত মত দিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট যেমন মেট্রিক প্রণালী গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন আশা করি এবারেও গবর্ণমেণ্টের সেই প্রকার মতি হইবে। কেন না এ বিষয়টী কোন দিকে কয়জন লোক মত দিয়াছে তাহা গণিয়া বিচার করিবার নহে। কাহার মতের মূল্য কত তাহাই বিচার করা উচিত। নানা লোকে নানা প্রকার মত দিয়াছেন, এক্ষণে সাধারণের কিসে হিত হয়, গবর্ণমেণ্ট ইহা নির্ব্বিকার চিত্তে নির্দ্ধারিত করিবেন। ষ্টেট্ বা প্রাইভেট রেলওয়ের আপাততঃ কি ক্ষতি হইবে না হইবে, আশা করি তাহাই এ বিচারের কেন্দ্রস্থল হইবে না। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ রেলকর্ত্তাদের আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারেন কিন্তু দেশবাসীর হিতের মূল্য তাহাদের আনন্দ অপেক্ষা অনেক অধিক।

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত।

চুরি বিদ্যা *

চুরি বিদ্যা জগতের একটি প্রাচীনতম বিদ্যা। বিশ্ব সৃষ্টির প্রথম অবস্থায়, পৃথিবীর অতি শৈশবকালে, যখন মানুষ পশু কীট পতঙ্গ কিছুরই সৃষ্টি হয় নাই, তখন হইতেই এ বিদ্যার চর্চ্চা চলিয়াছে। শাস্ত্র পাঠে দেখিতে পাই যে সমুদ্র মন্থনের সময়ে দেবদৈত্য উভয় দলে বিস্তর পরিশ্রম করিয়া সুধালাভ করিল, কিন্তু দেবতার দল সুধাভাণ্ডটি চুরি করিয়া মোটা বুদ্ধি অসুর দলকে ফাঁকি দিয়া ষোল আনা নিজেরাই আত্মসাৎ করিলেন। এক বেচারা দৈত্য চোরাই মাল উদ্ধার করিতে গিয়া সুদর্শন চক্রে কাটা পড়িল এবং আজ পর্য্যন্ত যুগল মূর্ত্তি ধরিয়া সুধাকরের উপর গায়ের ঝাল ঝাড়িতেছে। বাস্তবিক, চুরি বিদ্যা বিষয়ে পরম পূজনীয় দেবতাগণ মানুষের ঢের উপরে যান। আয়ুর্ব্বেদাদি অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় এ বিদ্যাও আমরা তাঁহাদের নিকটই পাইয়াছি। শাস্ত্রে উদাহরণের অভাব নাই। দেবতাদের রাজা ইন্দ্রও একজন পাকা চোর। বেচারা সগর রাজা কত আয়োজন সরঞ্জাম করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্যোগ করিল, আর অশ্বমেধের ঘোড়াকে ঘোড়াই চুরি। তারপর চোরাই মাল লুকাইয়া

* বিগত ২৩শে মাঘ, সাহিত্য-সভার নবম অধিবেশনে পঠিত।

রাখিলেন সেই পাতাল-পুরীতে—নিরপরাধ কপিল মুনির কাছে। সেই ঘটনা লইয়া শেষে কত ঝঞ্ঝাট ঘটিল তাহা সকলেই অবগত আছেন।

তারপর বৃন্দাবনের সেই চোরচূড়ামণি—বাঁকা ঠাকুরটির কথা আর বেশী কি বলিব? তাঁর ননীচোরা, বসনচোরা ইত্যাদি নামেই ত ভক্তগণ বিভোর।

শুধু আমাদের দেশে নয়, সব দেশের দেবতাদের মধ্যেই এ বিদ্যার আদর দেখা যায়। রোমীয় পুরাণশাস্ত্রে দেখিতে পাই, দেবরাজ্যের সন্দেশ-বাহক মার্কারি, জন্ম হইতেই চুরি-বিদ্যা-বিশারদ। তাঁহার বয়স যখন কয়েক ঘণ্টা মাত্র, অর্থাৎ তাঁহার জন্মদিনেই, তিনি রোমীয় বিশ্বকর্ম্মা ভলক্যান, দেবতার যন্ত্রপাতি, যুদ্ধ দেবতা মার্সের তরবারি ও জুপিটারের রাজদণ্ডটি চুরি করেন। জুপিটারের বজ্রটিকেও চুরি করিতে গিয়াছিলেন, আঙ্গুল পুড়িবার ভয়ে তাহা পারিয়া উঠেন নাই। একবার বাল্যাবস্থাতেই তিনি প্রণয়-দেবতা কিউপিড্‌কে মল্লযুদ্ধে হারাইয়া দেন। ভীনাস্‌ দেবী তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আদর করিয়া আলিঙ্গন করেন। বালক মার্কারি সেই অবসরে ভীনাসের রত্নখচিত কোমরবন্ধটি ক্ষিপ্র হস্তে অপহরণ করেন। মার্কারির পুত্র অটোলিকস্‌ও পিতার উপযুক্ত সন্তান। তিনি একজন খ্যাতনামা গরুচোর ছিলেন। বায়ুদেবতা ইওলসের পুত্র সিসিফস্‌ একবার তাঁহার উপর বাটপাড়ী করিয়া তাঁর চোরাই গরুগুলি চুপি চুপি সরাইয়া লইয়া যান। অটোলিকস যখন দেখিলেন যে তাঁর চেয়েও চুরি বিদ্যায় অধিকতর বাহাদুর আছে, তখন তিনি এত পুলকিত হইলেন যে নিজের আদরিণী কন্যা অটিক্লির সহিত সিসিফসের বিবাহ দিলেন।

মানব-সমাজেও বিদ্যাটার চর্চ্চা নিতান্ত মন্দ হয় নাই। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এ বিদ্যারও বেশ বৈজ্ঞানিক ভাবে অনুশীলন হইয়াছিল। সংস্কৃত "মৃচ্ছকটিক" নাটকে চারুদত্তের চুরি করিবার সময়ে উক্তি পাঠে জানা যায় যে, সেকালে এ বিদ্যার একটা রীতিমত শাস্ত্র ছিল। কিন্তু অভাগ্য আমরা পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রায় সমস্ত বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এ অমূল্য বিদ্যাও এক রকম হারাইয়া বসিয়া আছি। তবে শুনিয়াছি আমাদের পূজনীয় আচার্য্য মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তিব্বত অঞ্চল হইতে "চৌরশাস্ত্র" নামক একখানি অতি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ নাকি উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন। এ অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থের তিনি এ পর্য্যন্ত কোনও সদ্ব্যবহার করিয়াছেন কি না তাহা আমাদের জানা নাই। তবে আশা করি মাননীয় আচার্য্য মহাশয় শাস্ত্রটি শীঘ্রই সাধারণে প্রচার করিয়া মানব-সমাজের প্রভূত হিতসাধন করিবেন।

যাহা হউক, শাস্ত্রটি লুপ্তপ্রায় হইলেও কার্য্যটি এখনও নানা মূর্ত্তিতে বিরাজমান আছে। বর্ত্তমান কালেও সিঁধচুরি, পকেট মারা, ঠেঙ্গাইয়া কাড়িয়া লওয়া, ইত্যাদি নানাবিধ চুরির প্রচলন দেখা যায়। চুরির বিষয়ও নানা প্রকার। টাকা কড়ি, তৈজস, অলঙ্কার এমন কি স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে—এসব চুরি ত নিত্যঘটনা। পুকুর চুরির কথাও শোনা গিয়াছে। একবার এক প্রবল-প্রতাপ জমিদার তাঁহার বিপরীত পক্ষের সহিত দাঙ্গা হাঙ্গামা করাতে দুইটা লোক খুন হয়, এবং দেহ দুইটাকে এক পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। বিরুদ্ধ পক্ষগণ থানায় যাইয়া খবর দিল যে তাহাদের দুইজন লোককে খুন করিয়া পুকুরে ফেলা হইয়াছে। থানা অনেক দূর, তাহার উপর মফঃস্বল পুলিশের ধীর মন্থর চাল; তদারকে আসিতে কিছু বিলম্ব হইল। ইত্যবসরে সেই দুর্দ্দান্ত জমিদার পুকুরটি একদিনের মধ্যে ভরাট করিয়া তাহার উপর ঘাসের চাপড়া বসাইয়া পার্শ্বের মাঠের সঙ্গে এক করিয়া দিলেন। ফরিয়াদীরা ভিন্ন গ্রামের লোক, তাহারা দেখাইতেই পারিল না যে কোথায় পুকুরটা অবস্থিত ছিল। কাজেই তাহার মামলা টিকিল না।

অবশ্য এ গল্পটার সত্যতার সম্বন্ধে আমি 'সঠিক' বলিতে পারি না। কিন্তু পুকুর চুরি না দেখিলেও একবার একটা বাড়ী চুরির ব্যাপার দেখিয়াছিলাম বটে। সেটাও পুকুর চুরির চেয়ে কম বাহাদুরীর বিষয় নয়।

কলিকাতার কোনও বিখ্যাত ধনী ব্যক্তির শ্যামবাজার অঞ্চলে একখানি ভাড়াটিয়া বাড়ী ছিল। কয়েক মাস তাহাতে ভাড়াটিয়া না থাকাতে বাড়ীখানি বেমেরামত অবস্থায় খালি পড়িয়া থাকে। ইত্যবসরে একজন ভদ্রবেশধারী পাকা চোর, যাহারা পুরাতন বাড়ীর মালমশলার কারবার করে এই রকম কয়েকজন ব্যবসাদারের নিকট গিয়া বলে, "আমার একটা পুরাণো বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণ নূতন বাড়ী করিব, আপনি পুরাণো বাড়ীটার মালমসলাগুলা কিনিবেন কি?" সস্তা দর শুনিয়া ব্যবসাদার তৎক্ষণাৎ রাজী হইল, আর পরদিন হইতে লোকজন গরুরগাড়ী ইত্যাদি লইয়া কার্য্যারম্ভ করিয়া দিল। অবশ্য লোকে একটা বাড়ী খরিদ করিতে হইলে অনেক অনুসন্ধান করে বটে, কিন্তু বাড়ীর মালমসলামাত্র খরিদ করিতে কিছু অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় না। বিক্রেতার ভদ্রবেশই যথেষ্ট। প্রায় কুড়ি পঁচিশ দিন ধরিয়া নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য চলিল। বাড়ীর মালিক সেখান হইতে দূরে বাস করিতেন, কাজেই তাঁহারা কোনও খবর পাইলেন না; আর কাজটা এমন প্রকাশ্যভাবে হইতে লাগিল যে পাড়ার কেহও কোন সন্দেহের কারণ পাইল না। বাড়ীখানি যখন সম্পূর্ণ ভাঙ্গা হইয়া মালমসলা সমস্ত স্থানান্তরিত হইয়া গিয়াছে, সেই সময়ে একদিন বাড়ীর মালিকের পুত্র পার্শ্বস্থ রাস্তা দিয়া বাইসিকেল চড়িয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ দেখিল যে তাহাদের বাড়ীখানা আলাদিনের রাজপ্রাসাদের মত ধরণীর বক্ষ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া, সে যায়গায় শুধু একটা প্রকাণ্ড মাঠ পড়িয়া আছে। তাহার পর পুলিশের অনেক চেষ্টায় অপরাধী ধরা পড়ে।

কিন্তু এই পুকুর-চুরি বাড়ী-চুরির চেয়েও বড় এক রকম চুরী আছে—সেটা হচ্ছে ভাব চুরি—চিন্তা চুরি। এ চুরিটা সাহিত্য-জগতেই প্রচলিত। পরের চিন্তার কর্ত্তা যেমালুম নিজের বলিয়া চালান, এ বিদ্যাটা জগতের সমস্ত সাহিত্যেই প্রচলন আছে। সভ্য-জগতের আদি ভাষা সংস্কৃত হইতে আরম্ভ করিয়া, কোনও দেশের কোনও সাহিত্য নাই, যেখানে এ উপদ্রবের অভাব। পরের দেশের কথা লইয়া নাড়াচাড়া না করিয়া যদি নিজেদের দেশের সাহিত্যের দিকে দেখি, তাহা হইলেও এ চুরির বাহুল্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। কি প্রাচীন, কি আধুনিক, কি ছোট, কি বড় এমন কোন লেখক পাওয়া দুষ্কর, যিনি সম্পূর্ণভাবে এ দোষ বর্জ্জিত। অবশ্য এমন হইতে পারে যে একই ভাব, একই চিন্তা বিভিন্ন পণ্ডিতের মনে বিভিন্ন সময়ে উদয় হইয়াছে। ইংরাজীতে একটা কথা আছে "Great wits jump" অর্থাৎ বিশাল বুদ্ধিশালী ব্যক্তিদের চিন্তা একরকম হইয়া মিলিয়া যায়। কিন্তু অনেক সময় সাদৃশ্যটা এমন হয়, সেটা যে ইচ্ছাকৃত চুরি, তাহা বুঝিতে দেরী লাগে না। দুই একটা সর্ব্বজনবিদিত উদাহরণ দিয়া কথাটা বলিবার চেষ্টা করি। ধরুন জয়দেবের সেই মদনের প্রতি বিরহিণীর উক্তি—

"হৃদিবিলসিতা হারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজোনেদং ভস্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমুধাবসি॥"

বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকার বিরহ বর্ণনায় সেই ভাবেরই ঠিক বাক্যে বাক্যে পুনরুক্তি—

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহে শঙ্কর, হুঁ বরনারী॥
নহি জটা ইহ বেণী বিভঙ্গ।
মালতীমাল শিরে, নহ গঙ্গ॥
মোতিমবদ্ধ মৌলি, নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ, সিন্দুর বিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ, মৃগমদ সার।
নহ ফণিরাজ উরে, মণিহার॥
নীল পটাম্বর, নহ বাঘ ছাল।
কেলিক কমল ইহ, না হয় কপাল॥
বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ, মলয়জ পঙ্ক॥

তার পর প্রসিদ্ধ কবি রাম বসু মহাশয়ের গানে দেখুন—

"হর নহি হে, আমি যুবতী,
কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি ?
কোরো না আমার দুর্গতি।
বিচ্ছেদে লাবণ্য হয়েছে বিবর্ণ,
ধরেছি শঙ্করের আকৃতি ;
ক্ষীণ দেখে অঙ্গ,
আজ অনঙ্গ, একি রঙ্গ হে তোমার !
হর ভ্রমে শরাঘাত
কেন করিতেছ বার বার ?
ছিন্ন ভিন্ন বেশো দেখে কও মহেশো,
চেন না পুরুষো প্রকৃতি।
হায়, শুন শম্ভু-অরি, ভেবে ত্রিপুরারি,
বৈরী হয়োনা আমার।"

সংস্কৃতে একটি উদ্ভট কবিতাও ঠিক এইভাবে আছে, তবে সেটা জয়দেবের পূর্ব্বে বা পরে বিরচিত, তাহা ঠিক বলিতে পারি না।

আর একটি সংস্কৃত শ্লোকে আছে—

লোচনে হরিণগর্ব্বমোচনে
মা বিদূষয়নতাঙ্গি কজ্জলৈঃ।
শায়কো সপদি প্রাণহারকো
কিং পুনর্হি গরলেন লেপিতং ॥

তাহা হইতে নিধু বাবুর—

"কাজল নয়নে আর দিওনা কখনো
শরে কেবা নাহি মরে, বিষ-যোগ তাহে কেন ?"

ইত্যাদি সুবিদিত গানটি রচিত হইয়াছে। কালিদাসের—

"প্রাতাপোঽগ্রে ততঃ শব্দঃ পরাগস্তদনন্তরম্" কথাটি লইয়া মাইকেলের "চলিছে প্রতাপ অগ্রে শব্দ তার পরে, তদনুপরাগরাশি"—সকলেই অবগত আছেন।

বস্তুতঃ সংস্কৃত শ্লোকের ভাব লইয়া বাঙ্গালায় সঙ্গীত বা কবিতা রচনা ভূরি ভূরি দেখা যায়। অধিক উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধ-কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই। আর আমাদের দেশের বর্ত্তমান সাহিত্য হইতে উদাহরণ দিয়া আর আপনাদের সময় নষ্ট করিতে চাই না। কারণ উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম যে দিকে চাহিবেন, সেই দিকেই দেখিবেন চুরির বিপুল স্রোত দামোদরের বন্যার ন্যায় প্রবল বেগে প্রবাহমান। ঠক বাছিতে গেলে গাঁ উজাড় হইবার সম্ভাবনা। তা ছাড়া জীবিত লেখকদের সম্বন্ধে সত্য কথা বলিতে গিয়া হয়ত মানহানির দায়ে ঠেকিয়া, রোজা হইয়া রোগী হইতে হইবে।

সাহিত্যিক চুরি সম্বন্ধে এ সামান্য প্রবন্ধে আর বেশী কথা বলা চলে না। কারণ এ বিষয় বিস্তারিত বলিতে গেলে একখানা বড় গ্রন্থ হয়। সুতরাং অন্যান্য চুরির কথাই বলি।

যেমন অন্যান্য জাতির একটা একপ্রাণতা বা সমানুভূতি বিদ্যমান থাকে, চোরজাতির মধ্যেও সেটা যথেষ্ট দেখা যায়। তাই আমাদের কথায় বলে—চোরে চোরে মাসতুত ভাই। ইয়ুরোপীয় চোরেদের মধ্যে কতকগুলা ভদ্রতার নিয়ম আছে, তাহা সম্ভ্রান্ত চোর মাত্রই মানিয়া চলে। তাই বলে—There is honour even amongst thieves. তবে অন্যান্য জাতির মত ইহাদের মধ্যেও বিশ্বাসঘাতকের অভাব নাই। নতুবা Set a thief to catch a thief—এ প্রবাদ-বাক্য হইত না। আমাদের দেশের পুলিশও এই কৌশলে চোর ধরিবার চেষ্টা করে। সর্ব্বস্থানেই পুলিশের মাহিনা করা কতকগুলা পুরাতন পাকা চোর থাকে—ইহাদের Informer বলে। প্রধানতঃ ইহাদের সহায়তাতেই পুলিশ চোরের সন্ধান করে।

অন্যান্য সমাজের ন্যায় চোর-সমাজেও জাতিভেদ বিলক্ষণ প্রবল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোরেরা অর্থাৎ গাড়ুচোর, ঘটিচোর, ছিঁচকে চোর ইত্যাদি উঞ্ছবৃত্তি-পরায়ণ ব্যক্তিগণ তস্কর-সমাজে নিতান্তই ঘৃণ্য। কিন্তু বড় বড় চোরেদের সম্মান, শুধু চোর সমাজে কেন, সরকার বাহাদুরের কাছেও কম নয়। একটা প্রবাদ আছে যে দুই চারি টাকা চুরি করিলে জেল হয় কিন্তু যে লক্ষ

টাকা চুরি করিতে পারে, তাহার কোন সাজা হয় না। উদাহরণ দিয়া কথাটা বুঝাইতে সাহস করি না—তবে কথাটা যে একেবারেই ভিত্তিহীন, এমনও মনে হয় না। তাহার পর জেলে গেলেও বড় চোরেদের বেশী সম্মান। দুই চারি মাসের জন্য কেহ জেলে গেলে তাহাকে খাটিতে খাটিতে প্রাণান্ত হইতে হয়, কিন্তু বড় বড় চোরেরা অর্থাৎ যাহাদের দুইচারি বৎসর জেল হয়, তাহাদের অবস্থা অনেক ভাল। কিছুদিন খাটিবার পরই তাহাদের Convict warder করিয়া দেওয়া হয়। তখন তাহারা নিজেরা কোন পরিশ্রম না করিয়া, শুধু ছোট ছোট চোরেদের উপর কর্ত্তৃত্ব করে। ইহাতে বুঝা যায় যে, আমাদের গুণগ্রাহী সরকার বাহাদুর মহত্বের আদর যথার্থ ই জানেন।

চোর সমাজের জাতিভেদের আর একটা লক্ষণ এই, যে চোর যেরূপ ভাবে চুরি করিয়া আসিতেছে, সে চিরদিন সেইরূপ ভাবেই চুরি করে। কলিকাতার ডিটেকটিভ্ বিউরোর ভিতর পুরাতন চোরেদের একটা ছবির গ্যালারি আছে। তাহাতে বিভিন্ন প্রকৃতির চোরেদের ছবি বিভিন্নভাবে শ্রেণীবদ্ধ আছে। ধরুন, এক শ্রেণী European House thieves— তাহারা শুদ্ধ সাহেবদের বাড়ী চুরি করে। Railway thieves—শুধু রেলপথে চুরি করে, কদাচ অন্যত্র যায় না। Pick-pockets—শুধু গাঁট কাটিয়াই জীবিকানির্ব্বাহ করে। Poisoners—পথিকের সহিত ভাব করিয়া বিষ মিশ্রিত খাবার বা পান খাওয়ায়, তারপর সে অজ্ঞান হইলে তাহার যথাসর্ব্বস্ব চুরি করে। Children's ornament thieves—ভিড়ের মধ্যে ছেলেদের গাত্র হইতে গহনা অপহরণ করে। Burglars—সিঁধ কাটিয়া বা অন্য উপায়ে গৃহস্থের বাড়ী ঢুকিয়া জিনিষ-পত্র চুরি করে। এইরূপ বিস্তর শ্রেণীবিভাগ আছে। কেহ কাহারও কার্য্যে হাত দেয় না—যে যার নিজের বৃত্তি লইয়াই থাকে। সেদিন একজন পুরাণো চোর পায়রা চুরি করিয়া ধরা পড়িয়াছিল। তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস পাঠে দেখা গেল যে সে তৎপূর্ব্বে ছয়বার সাজা পাইয়াছিল, ছয়বারই পায়রা চুরির অপরাধে। একজন দেখিলাম সাতবার জেল খাটিয়াছে, সাতবারই সে গৃহস্থের বাটীর সংলগ্ন লোহার নল ভাঙ্গিয়া চুরি করিয়াছিল। একবার এই কথা লইয়া একটা বড় কৌতুককর ঘটনা হইয়াছিল। পুলিশ একজন পুরাতন চোরকে চুরির উদ্দেশ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবার অভিযোগে চালান দিয়াছিল। পুলিশের লোক এক গোছা চাবি বাহির করিয়া বলিল যে, চাবির গোছাটি আসামীর নিকট পাওয়া গিয়াছে। চাবির গোছা দেখিয়াই তস্কর-প্রবর মহাক্রোধে বিচারককে সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিল, "হুজুর, এ সব ঝুটবাত হায়। হাম পকেটকা কাম করতা হায়, চাবিকা কাম কভি নেহি করতা।" বাস্তবিকই দেখা গেল যে লোকটা পূর্ব্বে যতবারই সাজা পাইয়াছে, তাহা পকেট মারার জন্য, অন্য কোন প্রকার চুরি কখনও সে করে নাই। বিচারক না বিশ্বাস করিলেও, অপর সকলেই বিশ্বাস করিয়াছিল সে বেচারা সত্য সত্যই "পকেটকা কাম" করিয়াই খায় বটে, চাবির কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ সব হইতে বুঝা যায় যে জাতিভেদের বাঁধনটা অন্য সমাজের অপেক্ষা তস্কর সমাজে কম নাই। তবে চৌর্য্যবিদ্যা বিষয়ে আমাদের দেশের লোক যতই দক্ষতা দেখাক না কেন, বিজ্ঞানবলগর্ব্বিত ইউরোপের তুলনায় আমরা অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছি। বিলাতী চোরেদের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দেখিলে অবাক হইতে হয়। আমাদের চোরেরা ইলেকট্রিক ড্রিল, আটোমেটিক লণ্ঠন ইত্যাদির ত ব্যবহারই জানে না। বিলাতের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড মিউজিয়মে বিখ্যাত চোরেদের নিকট প্রাপ্ত যন্ত্রগুলি সুরক্ষিত আছে। সে গুলির ছবি দেখিলে ইউরোপীয় বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

খ্যাতনামা ফরাসী মানবতত্ত্বজ্ঞ মসিঁও দুবোয়া বলেন যে, মানবগণ অপেক্ষা মানবীগণই নাকি চুরি বিদ্যায় কিছু বেশী সুনিপুণা। মনচুরি প্রাণচুরির কথা নহে, সোণারূপাটা ঘটিটা বাটিটা চুরি সম্বন্ধেই কথাটা বলিয়াছেন। কথাটা সত্য কি মিথ্যা, বলিবার ক্ষমতা

আমার নাই। তবে অবলাজাতির চোখে মুখে কেমন একটা চুরি চুরি ভাব মাখান দেখা যায়, তাহাতে মনে হয় যে তাঁহাদের এবিষয়ে একটা ভগবদ্দত্ত শক্তি আছে—চর্চ্চা করিলে তাঁহারা এ বিদ্যায় আমাদের অপেক্ষা অধিকতর পটীয়সী হইতে পারেন। যাঁহারা কলিকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলের দোকান গুলিতে সুবেশ ও সুন্দরী ইউরোপীয় মহিলাদের দ্বারা গন্ধদ্রব্যের শিশি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলঙ্কারাদি চুরির সংবাদ রাখেন, তাঁহারা বোধ হয় এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে একমত হইবেন।

চুরিবিদ্যা সম্বন্ধে আমাদের দেশে একটা প্রবাদ বাক্য আছে—"চুরিবিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।" বাস্তবিক এ বিদ্যাটার ঐখানেই খুঁত।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মে ঈশ্বরের দশটি আদেশ আছে—পরস্বাপহরণ করিও না, মিথ্যা কথা কহিও না, ব্যভিচার করিও না ইত্যাদি। আজকালকার কোন বিখ্যাত ইংরাজ লেখক বলেন যে, এই সমস্ত আদেশের একটি corollary হওয়া উচিত "Do not be found out."—যাহাই কর ধরা পড়িও না। ধরা পড়িলেই যত গোল। বাস্তবিক মানুষের সমাজে পাপের শাস্তি নাই, ধরা পড়ারই শাস্তি। মানুষ যত পাপ করে, সমাজের বিচারে যদি সেই সমস্ত কার্য্যের শাস্তি বিধান হইত, তাহা হইলে এই বিশাল ধরণীর অর্দ্ধেকটা জুড়িয়া একটা বিরাট জেলখানা তৈয়ার করিতে হইত, এবং তাহার ভিতর কত সাধু সন্ন্যাসী কত রাজা মহারাজা রায় বাহাদুর, দেশের ও সমাজের কত নেতার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত তাহা কে বলিতে পারে?

হয় ত জীবন-মহাসিন্ধুর ওপারে এই রকম একটা জেলখানা তৈয়ারি আছে, তার সংবাদ আমরা এখনও জানি না।

শ্রীমনোজমোহন বসু।

বসন্ত-আগমনী

যাই-যাই করে' শীত চলে গেল সেদিন কুহেলি-প্রাতে,
আজি সন্ধ্যায় বসন্ত এল পঞ্চমী চাঁদ সাথে।
কতদিন পরে আজিকে ফিরিল ধরণীর বরণীয়,
দক্ষিণ বায়ে উড়ায়ে ছড়ায়ে পরাগ-উত্তরীয়।
রাজার নকিব বসন্ত পিক ফুকারিল দিক্ পথে—
হয়েছে সময় ঋতু-অধিপের আসিবার ফুলরথে।
পতঙ্গ-পাখী-মধুপপুঞ্জে ভরিয়াছে দশদিশি,
মাতাল বাতাস নেশা বিলাইছে গানে ও গন্ধে মিশি'।

সারাদিনমান গাহিয়াছে গান বসন্ত-আগমনী,
অরুণ উঠেছে তরুণ বয়ান নবীন আশার খনি।
পল্লব মুখে চুম্বন সম, আলোকের পিচকারী,
সুরভি নেশায় মশগুল্ করা বাসন্তী ফুলঝারি—
আম্রমুকুলে ভরেছে দুকুল সকল বনস্থলী,
গ্রামপথে-পথে সজিনার ফুলে দিয়াছে লাজাঞ্জলি।
আলিপনা এঁকে বসন্তশ্রী-পঞ্চমী আবাহন
হয়ে গেছে আজ—ঘরে ঘরে পূজা মঙ্গল-আয়োজন।

কাননে কাননে শুনিয়া ফিরেছি সকল পাখীর শিস্,
ধান্যরিক্ত ক্ষেত্রসীমায় আহরি যবের শীষ।
স্তব্ধ গভীর নিথর সলিলে আকাশ দেখিছে মুখ,
গুঞ্জনভরা বাতাসের শ্বাসে কভু বা কাঁপিছে বুক;
ডাহুক ডাহুকী পক্ষ ভিজায়—এমন সরসী তীরে,
আর্দ্র শীতল মৃত্তিকা পরে শরবনে এনু ফিরে।
আতপ্ত দিবা দ্বিপ্রহরের আলোক-মদিরা পিয়ে
রসালসে দেহ এলায়েছি মোর ছায়াতরুতলে গিয়ে।
শিয়রে আমার চাহিয়াছে দুটি আঁখিসম নীল ফুল,
তাহারি স্বপন দেখেছি জাগিয়া কেবলি করেছি ভুল।

পথ দিয়ে যবে ঘরে ফিরিয়াছি দিবসের পরিশেষে
বালকের মত বাকস্ বৃন্ত চুষিয়া আপনি হেসে;
ধূলার উপরে দেখিলাম ছবি অফুট রেখায় আঁকা—
পাশে পাশে মোর চলিয়াছে ছায়া; মদনের ধনু বাঁকা।
উদিয়াছে চাঁদ—দেখিনু তখন আকাশের পানে চাহি,
রহস্যলীল মাঠ বাট ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় অবগাহি'।

বনবালাদের কবরীকুসুম ঘোমটা আঁধারে ঢাকা,
বনসৌরভ কোনমতে তবু যায় না লুকায়ে রাখা।
নেবুমঞ্জরী মন্থর বাস অন্তরে গিয়ে পশে,
কেদারবাহিনী দখিন বাতাসে কত কথা কহিল সে!

কতদিন পরে ঘরে ঘরে আজ বাতায়ন খুলিয়াছে,
সোহাগিনী ওই—কবরী গুচ্ছপাশে তার দুলিয়াছে।
ঝিরঝিরঝির বহিছে সমীর বাঁশীর রাগিণী ভাসে—
আজিকে চাঁদিনী চাঁদোয়ার তলে প্রাণ খুলে কারা হাসে।

এমন সময়ে যদি কেহ ডাকে 'প্রিয় মোর, প্রিয়তম—'
সঙ্গীতে পারি উত্তর দিতে প্রতিধ্বনির সম।
মরমের কথা কহেনি যে জন—আজিকে কহিবে যে সে;
শুষ্ক কঠিন হৃদয় হইবে কৃতার্থ ভালবেসে।
মনে হ'ল আজ জীবনের যত নিরাশার পরাভব—
রঙীন রজনী রঙীন বাসনা, কিছু না অসম্ভব।
তৃণভূমি পরে বসিয়া ক্ষণেক হেরিলাম নিশানাথে,—
বুঝিনু আবার বসন্ত এল পঞ্চমী চাঁদ সাথে।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

লাফো

(গল্প)

সে দিন বিজয়া দশমী।

পাঁচ বৎসর রেঙ্গুণে আছি। সুদূর প্রবাসে নির্জ্জন বাসায় কয় দিন হইতে একলা পড়িয়া থাকায় মনটা বড়ই খারাপ হইয়াছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তরফ হইতে নির্দ্দিষ্ট সময়ের কড়ারে যে ঠিকাদারী কাজগুলা লইয়াছি—চোখ কান বুজিয়া সে গুলার ঝক্‌মারী পোহান ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। সারাদিন ছোটলোক চরাইয়া ঘুরিয়া বেড়ান, এবং সন্ধ্যার পর বাসায় বসিয়া কেরোসিন ল্যাম্পের আলোয় টাকা আনা পাইয়ের হিসাব লেখার মত অত্যন্ত নীরস কাজে আবদ্ধ হইয়া প্রবাস-বেদনা-পীড়িত চিত্তটা বড়ই তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সেদিন বৈকালের দিকে কাজ কর্ম্ম সমস্ত ফেলিয়া রাখিয়া, ছড়ি ও চাদর লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল। সহরের কোলাহল ছাড়িয়া নির্জ্জন পথ ধরিয়া মন্থর পদে বাসার দিকে ফিরিতেছি, এমন সময় উৎকট-গন্ধ চুরুটের ধোঁয়া উড়াইয়া একদল ইতর জাতীয় লক্ষী ছাড়া ধরণের 'মগ' হাস্য পরিহাস করিতে করিতে আসিয়া পড়িল। আমায় দেখিয়া তাহারা একটু সংযত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল। আমি চলিয়া যাইতেছি, সহসা সকলের পশ্চাৎ হইতে নীল পাগড়ী, পায়জামা ও মের-জাই আঁটা এক লম্বা-চওড়া আকৃতির বৃদ্ধ মগ অগ্রসর হইয়া সহাস্যে অভিবাদন করিয়া মগ ভাষায় বলিল, "বাবু সাহেব এদিকে যে?"

দেখিলাম কাঠের কারখানাওয়ালা লাফো মগ। লোকে তাহাকে বলিত 'পাগলা লাফো।' পাঁচ বৎসর ব্যাপী আমার এই ঠিকাদারী ব্যবসায়ের খাতিরে এই শ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে বিলক্ষণ আলাপ পরিচয় রাখিতে হইয়াছে। বিশেষ লাফো মগের অমায়িকতার জন্য তাহাকে আমি ব্যবসায় সম্পর্কের অতিরিক্তও একটু ঘনিষ্ঠতা দেখাইতাম—ক্রমে সম্পর্কটা হৃদ্যতায় পরিণত হইয়াছিল। লাফোর প্রশ্নের উত্তরে আমিও মগ ভাষায় বলিলাম, "একটু বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। তুমি কোথায় যাইতেছ?"

স্বভাব-সিদ্ধ সরল হাস্যে বৃদ্ধ মগ কহিল, "আজ্ঞে, আজ আমার এই শ্বশুররা কারখানাতে চড়িভাতি করিযা-ছেন কি না, এবার ঘরে যাইতেছেন। একলাটী কি করি, তাই উহাদের সঙ্গে বাহির হইয়াছি।"

আমি জানিতাম—তাহারই কাছে শুনিয়াছিলাম—লাফোর স্ত্রী পুত্রাদি কেহ নাই। সে দুইবার বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু দুই স্ত্রী অতি অল্প দিনের মধ্যেই

মারা যায়। সে তার পর আর বিবাহ করে নাই। কারবার হইতে বৎসরান্তে তাহার যথেষ্ট আয় হইত। টাকাগুলা মাঝে মাঝে পর্ব্বোৎসব বা অন্য কোন কিছু উপলক্ষ্যে রীতিমত 'দিল্-দরিয়া' মেজাজে সে খরচ পত্র করিয়া উড়াইত। অবশ্য মগের মুল্লুকে লোকেদের স্বভাবটাও অনেকটা এই রকমই বটে, সুতরাং লাফোর কার্য্যকলাপ কোনও দিন আমার বিস্ময় উদ্রেক করে নাই।

লাফোর কথা শুনিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমারই মত তোমারও 'কি করি' অবস্থা হইয়াছে লাফো? চল আমার সঙ্গে আমার বাসায়,—সেখানে বসিয়া গল্প সল্প করা যাইবে!"

আমার কথা শুনিবামাত্র লাফো তৎক্ষণাৎ কারখানার মজুরগুলাকে বিদায় দিয়া আমার সঙ্গে অগ্রসর হইল। অল্প দূরেই লাফোর কারখানা বাড়ী, সে কথা কহিতে কহিতে আসিতেছিল, কারখানা বাড়ীর কাছাকাছি হইয়া একবার দাঁড়াইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বাবু সাহেব, বাসায় নাই বা গেলেন, চলুন ঐ খানে নিরিবিলি বেশ ঘাট আছে, জ্যোৎস্নার আলোয় সেইখানে বসিয়া গল্প করা যাক্।"

বাসায় যাইবার আগ্রহ আমারও বড় ছিল না, সুতরাং লাফোর প্রস্তাব মত তখনি মোড় ভাঙ্গিয়া বামদিকে রাস্তার ধারে বাঁধা ঘাটে আসিয়া বসিলাম।

প্রকাণ্ড দীঘির জল চন্দ্রালোকে ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে। দীঘির চতুষ্পার্শ্বে গোটাকতক বড় গাছ। নিকটে লাফোর কারখানা বাড়ীটা ছাড়া অন্য কোনও ঘর বাড়ী নাই, চারিদিকে মাঠ ধু ধু করিতেছে। চন্দ্রালোকে চারিদিকের দৃশ্য তখন ঠিক একটা চমৎকার চিত্র-শিল্পের মত দেখাইতেছিল।

আমি যেখানটায় বসিয়াছিলাম, লাফো তাহার দুই পৈঠা নীচে বসিল। আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই লাফো বলিল, "বাবু সাহেব, আপনাদের বাংলা দেশের গল্প বলুন।"

আমি একটী ছোট খাট দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, "লাফো, আজ আমাদের দেশে কত ধুম-ধাম হইতেছে যে তার আর কি বলিব। ঘরে ঘরে আমোদ, আজ বিজয়া-দশমী।"

লাফো একটু বিচলিত হইয়া বলিল, "আজ বিজয়া-দশমী?—ওঃ জবর দিন বটে!"

আমি বিজয়া-দশমীর উৎসব সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। লাফো কিছু বলিল না, সে দীঘির জলের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সে যে আমার কথাগুলাই শুনিতেছিল একথা বলিতে পারি না। আমার বক্তব্য শেষ হইতেই লাফো একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "চমৎকার রাত্রি।"

সহসা ঘাটের দক্ষিণ পাশে একটা প্রকাণ্ড প্রাচীন দেবদারু গাছের ডালে দোদুল্যমান একছড়া টাটকা বনফুলের মালা দেখিয়া আমি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "ওটা ওখানে কে রেখেছে লাফো?"

চকিত নেত্রে চাহিয়া শুষ্ক হাসি হাসিয়া লাফো বলিল, "আমি সখ করিয়া মালা টালা মাঝে মাঝে গাঁথিলে ঐ খানে পরাইয়া দিই।"

আমি সংশয়পূর্ণ চিত্তে বলিলাম, "তা ওখানে কেন?"

লাফো জোর করিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, হাসিতে পারিল না। অবনত দৃষ্টিতে ঢোক গিলিয়া, কি যেন একটা কিছু সাম্লাইয়া লইয়া বলিল, "জ্যোৎস্না রাত্রি, চারিদিকে খুব ফুল ফুটিয়াছিল—আর কি জানেন, দেবদারু গাছটা আমি বড়—" লাফো থামিয়া গেল।

আমার কৌতূহল বাড়িল। বলিলাম, "ব্যাপার খানা কি?"

সহসা লাফোর মুখ অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি পাগড়ীটা খুলিয়া দুই হাতের অঙ্গুলি দ্বারায় তাহার দীর্ঘ বাব্রীগুলা উস্কাইয়া বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলিল। চুলগুলা সর্পশিশুর মত মুখের পাশে ফণা ধরিয়া দুলিতে লাগিল। লাফো একবার দেবদারু

গাছটার পানে চাহিল, তারপর দূর আকাশের পানে তাকাইয়া ফিরিয়া বসিল। বেদনা-কোমলকণ্ঠে বলিল, "সত্যই যদি জানিতে চাহেন বাবু সাহেব, আচ্ছা শুনুন তবে বলি।——বাহিরে আপনারা আমার যে চেহারাটা দেখিতে পান,—বাস্তবিক আমি তাহা নহি, এটা আমার ছদ্মমূর্ত্তি!"

আমি অবাক্ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম। গ্রীবা উন্নত করিয়া তীব্র স্বরে লাফো বলিল, "আচ্ছা বাবু সাহেব, আপনিও কি আমায় সত্যকার লাফো বলিয়া বিশ্বাস করেন?"

ব্যাপারটা কি কিছুই বুঝিতে পারি নাই, তার সত্য মিথ্যা কি বিশ্বাস করিব? আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "কি বল দেখি?"

একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া লাফো বলিল, "আপনি বাঙ্গালা হইয়া, এমন বুদ্ধিমান্ লোক হইয়াও আমায় ঠাওরাইতে পারেন নাই? আশ্চর্য্য বটে।—আপনি বিশ্বাস করেন কি, আমি বাংলা দেশের একজন খুনী আসামী?"

আমি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "অ্যাঁ, সত্য নাকি?"

লাফো দেবদারু গাছটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মগ ভাষাতেই বলিল, "ঐ গাছটায় প্রায়ই ফুলের মালা ঝুলাইয়া রাখি, কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করে 'কেন?' —আমি জবাব দিই—'সখ', কিন্তু সখ নয়।"—বলিয়া সে নীরব হইল।

আমি এবার বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি বাঙ্গালী?"

আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া লাফো বলিল —"আজ পঁয়ত্রিশ বছর এ সব কথা কাহাকেও বলি নাই, বলিবার দরকারও হয় নাই। কিন্তু আজ আপনি স্মরণ করাইয়া দিলেন—আজ বিজয়া দশমী। আজিকার রাত্রে এখানে বসিয়া কিছু লুকাইব না, সমস্ত সত্য বলিব। বাবু-সাহেব, পৃথিবীর মধ্যে যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভাল বাসিতাম,তাহাকেই নিজের হাতে খুন করিয়া —ঐ গাছের তলায় তাহার মাথা পুঁতিয়া রাখিয়াছি। এই বিজয়া দশমীর তিথিতে—সে ঠিক আজ পঁয়ত্রিশ বছর পূর্ণ হইল।"

আমি আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলাম। কি ভয়ানক! আমার নিকট হইতে পাঁচ হাত তফাতে একটা মড়ার মাথা প্রোথিত রহিয়াছে, আর যে তাহাকে খুন করিয়াছে, সে আমার সম্মুখে বসিয়া! আমি স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। আমার মুখ হইতে একটা কথাও বাহির হইল না।

সম্মুখের দিকে চাহিয়া লাফো তখন পূর্ব্ববৎ মগ-ভাষায় বলিতে আরম্ভ করিল:—

"আমাদের বাড়ী বাঁকুড়া জেলার সোনাগঞ্জ গ্রামে। রায় বাবুরা সে গ্রামের জমিদার। তাঁহারা যখন দুই তরফে পৃথক হইলেন, তখন 'ভাগের ভাত' খাইতে হইবে বলিয়া বাবুদের নায়েব, আমার পিতৃব্য, বঙ্কু পাঁজা বুড়া বয়সে চাকরী ছাড়িয়া বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন। আমার বয়স তখন বাইশ বছর।

ছেলেবেলা হইতে আমি খুড়ার যত্নেই মানুষ, পিতা মাতা দেখি নাই। খুড়া লেখা পড়া কিছু শিখাইয়াছিলেন। আমার তেরো ও সতের বৎসর বয়সে যথাক্রমে দুইটা ছোট ছোট বালিকার সহিত বিবাহও দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার অদৃষ্টে মৃতপত্নীক যোগটা এমনই প্রবল ছিল যে উভয়ের কোন পক্ষই ছয় মাসের বেশী পৃথিবীতে টিকিতে পারিল না।

পাঁচজন গ্রাম্য যুবকের মত আমিও ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইয়া এতদিন ঘুরিয়া বেড়াইতাম, কিন্তু খুড়ার কর্ম্মত্যাগের পর তাহা আর পোষাইল না। রায় বাবুদের ছোট তরফের আহ্বানে এবং খুড়ার ইচ্ছাক্রমে, আমি সেইখানেই একটা গোমস্তার চাকরী লইলাম।

আমার পিতা পিতামহ সকলেই এই সংসারে কাজ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং মনিব-গোষ্ঠীর উপর আমার এমনই অগাধ শ্রদ্ধা জমিয়া গিয়াছিল যে, সেই পরিবারের একটী অতি নগণ্য প্রাণীর নিকটেও আমি বিনম্র ও কৃতজ্ঞতায় আ-ভূমি প্রণত হইয়া থাকিতাম। কিন্তু

সেইটা আমার অত্যন্ত ভুল হইয়াছিল। আমার বয়স তখন অল্প, তখন জানিতাম না, সংসারে যে যত নম্র ও ভালমানুষ, সে তত অসুবিধা ও অত্যাচার ভোগ করে।

শীঘ্রই আমার 'নম্রতার' ফলভোগ করিতে আরম্ভ করিলাম। চোখ কান বুজিয়া দিন কাটাইতে লাগিলাম। সময় সময় যখন অত্যান্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতাম তখন মনকে বুঝাইতাম যে এই পরিবারে আমার পিতা—পিতামহ জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, সুতরাং আমাকেও তাহাই করিতে হইবে!

কিন্তু সেদিন যখন কাটিয়া গিয়াছে তখন সে সব কথার সবিস্তারে বর্ণনায় কোনি লাভ নাই, সুতরাং কেবল এইটুকু মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে চারিদিক হইতে আঘাত পাইয়া আমার মনের মধ্যে ক্রমশঃ একটা তীব্র বিদ্রোহিতা জাগিয়া উঠিল, এবং আমি তখন নিজেই মানিতে বাধ্য হইলাম যে আমার শরীরটাও রক্ত মাংসে গঠিত।

আমার খুড়ার একমাত্র পুত্র শঙ্কর আমার অপেক্ষা সাত বৎসরের ছোট, এবং তাহার চেয়েও পাঁচ বৎসরের ছোট ছিল খুড়ার কন্যা শোভা। খুড়া নিজে দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন, ছেলে মেয়ে দুটীও তেমনি সুন্দর হইয়াছিল।

খুড়ার পুত্র শঙ্কর ছেলেবেলা হইতে আমার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিল; সমস্ত বিষয়েই আমি ছিলাম তাহার একমাত্র নির্ভর। তাহার প্রকৃতি ছিল, উচ্ছ্বসিত সরল তারুণ্য পূর্ণ, তাহার মুখ খানি বালিকার মত অসঙ্কোচ-আনন্দ-উজ্জ্বল ছিল।

গ্রামে পূজা-পার্ব্বণে উৎসব ব্যাপারে আসর সাজাইতে, আলো জ্বালিতে, প্রতিমার সাজ পরাইতে—এবং যত কিছু বেগার খাটিবার স্থলে সকলেরই আগে শঙ্কর আবির্ভূত হইত! আর যখন নিতান্ত কোন কাজ থাকিত না তখন বাঁশের ডগে লোহার তীক্ষ্ণধার ফলা-যুক্ত 'কুঁচে' হাতে পুকুরের পাড়ে পাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইত, এবং তীর হইতে 'তাক্' করিয়া জলচারী মীনের উদ্দেশে কুঁচে ছুড়িয়া, তাহাকে গাঁথিয়া তুলিত। শুধু যে মাছের উপরই কুঁচের সদ্ব্যবহার চলিত তাহা নয়, অনেক সময় সাপও মরিত।

ছোট'র উপর অবাধ প্রভুত্বের সুযোগ পাইলে, বড়'র স্বাভাবিক স্নেহ স্বতঃই বাড়িয়া উঠে। আমি তাহাকে বড় ভালবাসিতাম, শুধু খুড়ার ছেলে বলিয়া নহে,—অনুগত ছোট ভাই বলিয়া নহে,—তাহার নির্ম্মল আনন্দ-উজ্জ্বল, প্রীতি-প্রবণ অন্তরাত্মার কোমল সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই তাহাকে ভালবাসিতাম!"

লাফো চুপ করিল। আমি বলিলাম—"লাফো বাঙ্গালা কি ভুলে গেছ? আর মগ ভাষা কেন? বাঙ্গালায় বল।"

সে মগ ভাষাতেই বলিল—"ভুলি নাই বাবুজি—মাতৃভাষা কেহ কখনও ভুলিতে পারে? তবে আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর সে ভাষা মুখে উচ্চারণ না করিয়া অভ্যাস হারাইয়াছি।"—এই বলিয়া লাফো স্থিরদৃষ্টিতে দূরস্থ প্রান্তরের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে দাড়ীতে হাত বুলাইতে লাগিল। তাহার ললাটে বিষাদের রেখা অস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আমি চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম, লাফো কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল:—

"আমার খুড়া কিছু দিন পরে, মারা গেলেন। শঙ্করের বয়স তখন ষোল বছর, শোভা বারো বছরে পড়িয়াছে। পিতৃব্যের শ্রাদ্ধ শান্তি চুকাইয়া, আমি ভগিনীর বিবাহ সম্বন্ধে মনোনিবেশ করিলাম। শোভা সুন্দরী মেয়ে ছিল, তাহার মাতুলালয়ের কাছেই কোন গ্রামে এক বর্দ্ধিষ্ণু উগ্র-ক্ষত্রিয়ের পুত্রের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ করিতে লাগিলাম।

কিন্তু সেই সময় এমন কতকগুলি কারণ ঘটিল যে আমাকে বাধ্য হইয়া ছোট তরফের কাজ ছাড়িয়া দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী কুসুমপুরের দে বাবুদের জমীদারী সেরেস্তায় প্রবেশ করিতে হইল।

দুইজন পাশাপাশি জমীদারের মধ্যে অল্প স্বল্প বিবাদ

প্রায় লাগিয়াই থাকে। এই দুই জমীদারেও সেইরূপ ছিল, কিন্তু আমি যখন দে বাবুদের বাড়ী ঢুকিলাম তখন আমার পূর্ব্বকার মনিব-গোষ্ঠী একেবারে খড়্গ-হস্ত হইয়া উঠিলেন। নানা ছুতায় দুই দলে রীতিমত শত্রুতা বাধিয়া গেল।

উত্তেজনার মুখে সন্ধির অপেক্ষা যুদ্ধের দিকেই সকলের ঝোঁক্‌টা পড়ে বেশী। এই দুই জমীদার-গোষ্ঠীও পরস্পরের কুৎসা বিদ্রূপ এবং ছিদ্রান্বেষণ করিয়া খুব রোখের সহিতই লড়িতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে দুই দলে যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইল না—তাহাও নহে, কিন্তু শ্রাদ্ধ বেশী দূর গড়ায় নাই।

এ-তরফ হইতে আমাকে ভাঙ্গাইবার এবং ও তরফ হইতে সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা চলিতে লাগিল। এবং এই টানাটানির ভিড়িকে পড়িয়া, পূর্ব্ব-পক্ষের প্রতি আমার ঘৃণাটা আরও বাড়িয়া উঠিল। অবশেষে আমি সোনাগঞ্জের বাড়ীর সম্পর্ক ছাড়িয়া দে বাবুদের কাছারি বাড়ীতেই আশ্রয় লইলাম। তাহাতে এ-পক্ষের গর্ব্ব এবং পূর্ব্ব-পক্ষের নিস্ফল আক্রোশটা চড়িয়াই গেল।

সোনাগঞ্জের বাড়ীতে ছেলে মেয়ে লইয়া খুড়ী থাকিতেন। আমি সেখান হইতে তাঁহাদের সরাইয়া আনিবার সঙ্কল্প করিলাম। ধীরে ধীরে আয়োজন চলিতেছে, এমন সময় হঠাৎ শোভার ভাবী শ্বশুরের মৃত্যু হইল, এবং কালাশৌচের জন্য বিবাহের সময় আরও পিছাইয়া গেল।

শোভার গড়ন বাড়ন্ত ছিল। আমি চিন্তিত হইলাম, কিন্তু শোভার ভাবী স্বামী মনোরঞ্জন আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "হোক না, ক্ষতি কি!"—আমি 'মোনা'কে ভাল রকমই চিনিতাম, নিশ্চিন্ত হইলাম।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। অগ্রহায়ণ মাসে শোভার বিবাহের দিন ধার্য্য হইল। সাম্‌নে আশ্বিন মাস, দে বাবুদের যত্নে আমি ইতিমধ্যে তাঁহাদের জমীদারীর ভিতরই একটু জায়গা লইয়া ছোট একটি বাড়ী করাইলাম এবং আশ্বিনের পূজার পর ত্রয়োদশীর দিন খুড়ী ও ভাইবোন দুটীকে সোনাগঞ্জ হইতে আনাইবার সঙ্কল্প করিলাম।

রায় গোষ্ঠীর ছোটবাবু যখন দেখিলেন যে আমি সকল রকমে তাঁহাদের হাত হইতে খসিয়া পড়িতেছি তখন তিনি মরণ কামড় বসাইবার আয়োজন করিলেন। তাহার পরিণাম যাহা হইল তাহা ভয়ঙ্কর!"

লাফো দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আর একবার থামিল। তাহার চোখ দুইটা ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল, মুখে বিষণ্ণ-বেদনার সহিত একটা ঘৃণাব্যঞ্জক ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। আমি বলিলাম, "তার পর?"

"সে দিন বিজয়া-দশমী; আশ্বিন কিস্তির খাজনা দাখিল করিতে আর দুইদিন মাত্র বাকী আছে। দে বাবুদের পূজা বাড়ীর গোলে জমিদারী সেরেস্তার লোক জন সবাই কয়দিন ব্যস্ত ছিল। দূরে বেলগাঁয়ের মহাজনের নিকট অনেকগুলি টাকা পাওনা ছিল, নায়েব বাবু সকাল বেলায় বলিলেন, "বীরু মহাজন ক'দিন থেকে লোক ফিরাফিরি করিতেছে, তুমি ভাই আজ গিয়া চেষ্টা কর, যা করিয়া হউক আজই টাকাটা আদায় করা চাই!"

আমি চলিলাম। অনেক চেষ্টায় সমুদয় টাকাটা আদায় করিয়া ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। কাছে এক পরিচিত ব্যক্তির বাড়ীতে কিছু জলযোগ করিয়াছিলাম। আসিবার সময় বিজয়া দশমীর প্রথামত তাঁহার কাছে এক পাত্র সিদ্ধি খাইয়া আসিলাম।

কুসুমপুরের মাঠে যখন আসিয়া পৌঁছিলাম তখন রাত্রি এগারটা; প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর ঢাক ঢোল ও সানাইয়ের বিদায়ী সুর তখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। দুই এক ঘরে গৃহস্থ রমণী তখনও জাগিয়া আছে, কিন্তু গ্রাম্য পুরুষ সম্প্রদায়ের সকলেই তখন সিদ্ধি ও মদের নেশায় অচেতন! ভদ্রঘরের পুরুষগণ, যাহারা কোন দিন কোন মাদক স্পর্শ করে নাই, তাহারাও আজিকার দিনে নিয়ম রক্ষা করিয়া থাকে। এবং কেহ কেহ নিয়মের বাহিরে গিয়াও পৌঁছে।



অর্থমনর্থম্

[সিংহাসনারূঢ় বাদসাহ ঔরংজেব সমীপে আনীত তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারাসেকোর ছিন্নমুণ্ড]

আমি চলিয়াছি। বামে দামোদর, বর্ষা শেষে তখনও নদের স্রোত উদ্দাম কল্লোলে ছুটিতেছে। রাস্তার দুই পাশে ঝাউ ও তেঁতুল গাছের শ্রেণী। শরতের উজ্জ্বল চন্দ্রালোক চারিদিক ছাইয়া হাসিতেছে। সহসা পিছন হইতে ডাক শুনিলাম, "দাদা।"

দেখিলাম, শঙ্কর ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে। সবিস্ময়ে বলিলাম, "শঙ্কর নাকি!"

মাথায় বাব্‌রী চুল, গলায় প্রসাদী ফুলের মালা, আঠারো বছরের গৌর-সুন্দর শঙ্কর আমার কাছে দাঁড়াইয়া হাঁফাইতে লাগিল। আমি তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া দ্রুতস্বরে বলিলাম, "কিরে কি হইয়াছে?"

শঙ্করের হাতে সেই কুঁচেটা ছিল, একটা কোলা ব্যাং লাফাইয়া চলিয়া যাইতেছে; চক্ষের নিমেষে তাহাকে কুঁচেয় গাঁথিয়া শঙ্কর মৃদুস্বরে বলিল, "দাদা, শীঘ্র বাড়ী চল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে!"

আমি অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "কি? কি?"

ব্যাংটা ধড়ফড় করিতেছিল, শঙ্কর তাহাকে কুঁচে শুদ্ধ এক আছাড় দিল; তারপর কম্পিতস্বরে বলিল, "ছোটবাবুর মতিচ্ছন্ন হয়েছে!"

শঙ্কর একটার পর একটা করিয়া সমস্ত কাহিনীটা আমায় শুনাইল; যাহা শুনিলাম তাহাতে আমার শরীরের রক্ত টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে লাগিল, মাথার ভিতর নেশার উষ্ণ-আবেশটা চম্‌ চম্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল!

শঙ্কর বলিল, রায়েদের ছোটবাবু দুইজন নীচ শ্রেণীর প্রজাকে টাকা খাওয়াইয়া বশ করিয়াছেন, শোভাকে তাহারা ছোট বাবুর বৈঠকখানায় বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

আমি কোন কথা ভাবিবার অবকাশ পাইলাম না, আমার সমস্ত অনুভূতি ছাপাইয়া একটা রক্তাক্তিত,দৃপ্ত কঠোরতা হুঙ্কার করিয়া উঠিল,—খুন করিব!

আপাদ মস্তকে আগুনের হল্কা বহিতেছিল, স্ফীত নাসারন্ধ্র দিয়া জ্বালাময় নিঃশ্বাস ছুটিতেছিল, আমি ক্ষিপ্ত-উত্তেজনায় বলিলাম, "চল একেবারে কাজ শেষ করে ফেলি, তার পর অন্য কথা!"

দীর্ঘ দ্রুত চরণে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই মনে পড়িল, মনিবের টাকা আমার কাছে আছে। আমি আবার ফিরিয়া মোড় ভাঙ্গিয়া কুসুমপুরের কাছারির দিকে ছুটিলাম, শঙ্কর আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

অন্তরে রুদ্র-উন্মাদনার প্রখর তরঙ্গ বহিতেছিল। আমি বলিলাম, "শঙ্কর তুই ছেলেমানুষ, আজকের মত কুসুমপুরে থাক্‌বি চ, কাল সকালেই মামার বাড়ী যাস্‌—কিন্তু আমি আজ্‌ রাত্রেই এক কাণ্ড কর্‌ব!"

শঙ্কর সাগ্রহে বলিল, "আমিও তোমার সঙ্গী।"

আমার চক্ষু দুইটা জ্বলিয়া যাইতেছিল। বলিলাম, "মরতে ভয় পাবি না?"

সে দৃঢ়ভাবে বলিল, "না—কিছুতে না!"

আমার মনে পড়িল আজ রাত্রে যে কাণ্ড করিব, সেজন্য কাল সকালে এখানে দাঁড়াইয়া সূর্য্য দেখিতে পাইব না। কিন্তু তাহার ব্যবস্থা কিছুই নাই। আদায়ী টাকা হইতে আমার মাহিনা বাদ ৬০৲ টাকা কাটিয়া লইলাম, তাহার পর বাকী টাকা ও চালানী রসিদ সব একত্র বাঁধিলাম। কুসুমপুরে বাবুদের বাড়ীর সকল আলো তখন নিবিয়া গিয়াছিল, দেউড়ী বন্ধ হইয়াছিল, শ্রমক্লান্ত লোকজন সব ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আমি সদর বাড়ীর প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। নিঃশব্দ পদে বারান্দায় উঠিয়া নায়েব বাবুর বসিবার ঘরের জানালা গলাইয়া টাকার তোড়া ঝনাৎ করিয়া মেঝেয় ফেলিয়া দিলাম। তার পর নগদীর ঘর হইতে একখানা শাণিত ভোজালী সংগ্রহ করিয়া নিঃশব্দে নিদ্রিত পুরী অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিলাম।

আমার হাতে ভোজালী দেখিয়া শঙ্কর সভয়ে বলিল, "দাদা জনকতক লোক নিলে হয় না?"

আমি তীব্র-কণ্ঠে বলিলাম, "না, এ ত সবাইকার কাজ নয়, কেন সবাইকার কাছে হাত পাতব? এ আমাদের ঘরোয়া অপমান, ঘরে ঘরে এর মীমাংসা চাই!"

শঙ্কর মটাশ করিয়া কুঁচের তীক্ষ্ণ মুখটা ভাঙ্গিয়া বাঁশটা ফেলিয়া দিল। বলিল, "আজ এইতে ছোট বাবুর চোখ দুটো কানা করব !"

আমি কিছু না বলিয়া দ্রুতপদে চলিলাম। শঙ্কর আমার সহিত চলিতে পারিতেছিল না, তবুও হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিতেছিল, কিন্তু বিশ্রামের নাম করিল না।

যখন আমরা সোণাগঞ্জে আসিয়া পৌছিলাম, তখন সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ। কোনদিকে একটী মানুষের শব্দ নাই, দূরে দূরে শৃগাল ডাকিতেছে, গৃহস্থের উচ্ছিষ্ট অন্নজীবী কয়েকটা শীর্ণাকৃতি লোমওঠা কুকুর এ দিক ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রকাণ্ড জমিদার বাড়ীর ফটক বন্ধ।

সুকৌশলে লাঠিতে ভর দিয়া আমি তড়াক্ করিয়া প্রাচীরের একস্থানে উঠিলাম। ইঙ্গিত মত শঙ্করও আমার অনুসরণ করিল, কিন্তু পা পিছলাইয়া পড়িবার উপক্রম হইতেই আমি তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। সহসা একটা দ্বিধায় মনটা কেমন বিকল হইয়া গেল; আমি বলিলাম, "শঙ্কর, যদি বেগতিক দেখিস্ যমের হাতে ধরা দিস্ কিন্তু খবরদার ওদের হাতে ধরা দিস্ না !"

প্রাচীর বহিয়া বৈঠকখানা মহলের দিকে অগ্রসর হইলাম, ক্রমে দ্বিতলের বারান্দায় গিয়া উঠিলাম। বাড়ীর সমস্ত স্থানই আমার পরিচিত—দুই বৎসর পূর্ব্বেও শুভাকাঙ্ক্ষী অনুগত ব্যক্তি হইয়া এই বাড়ীতে খাটিয়াছি। আর, আজ আসিয়াছি, প্রতিহিংসা লোলুপ পিশাচের বেশে !

আমার রগের শিরা দুইটা স্ফীত হইয়া আঙ্গুলের মত আকার ধারণ করিয়াছিল। নিষিদ্ধ কার্য্যের উগ্র উত্তেজনা আমার কাণের কাছে তখন প্রলয়ের করাল বিষাণ বাজাইতেছিল, আর চক্ষের সম্মুখে খেলিয়া বেড়াইতেছিল, রক্ত-বিজলীর তীব্র রেখা !

কিন্তু শঙ্কর প্রতিপদে কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে লাগিল। বেশ বুঝিলাম সে জোর করিয়া মনটাকে নিদারুণ দানবীয়তায় মাতাইয়া তুলিবার চেষ্টায় অস্থির হইয়া পড়িতেছে, তবু কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। আমি ঘৃণাভরে বলিলাম, "তুই পালা।"

সে বলিল, "না কিছুতেই না, আজ মনিবই হোক, আর মহাদেবই হোক, কাউকে মানি না, আজ দাদার পাশে দাঁড়িয়ে দাদার ভাই হয়ে কাজ করব !"

বৈঠকখানায় ছোটবাবুকে না পাইয়া আমি অনুমান করিলাম, তবে সে অন্তঃপুরে। বৈঠকখানার ছাদে উঠিয়া, ছাদে ছাদে অন্দর মহলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া ক্রমে আমরা ছোটবাবুর শয়ন কক্ষের মুক্ত দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম মূল্যবান আসবাব সজ্জিত কক্ষে, পালঙ্কের উপর দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় ছোটবাবু নিদ্রা যাইতেছেন, পাশে দুই শিশু পুত্র ও পত্নী নিদ্রা যাইতেছে।

ছোটবাবুর বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হইবে; প্রকাণ্ড মুখে এক যোড়া মস্ত গোঁফ, মাথায় জাঁদ্রেল টাক, চেহারা বিপুল।

ছোটবাবুর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই আমার সর্ব্ব শরীরে এক অসহনীয় জ্বালা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারাইয়া সেই কাদা শুদ্ধ পায়ে লাফাইয়া পালঙ্কে উঠিলাম, নিদ্রিত ছোট বাবুর মাথায় এক পদাঘাত করিলাম।

সশব্দে পালঙ্ক কাঁপিয়া উঠিল; সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, শিশু দুইটী কিছু বুঝিতে না পারিয়া কাঁদিতে লাগিল, ছোটবাবুর স্ত্রী অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গে কেমন যেন হইয়া গেল, তারপর প্রাণপণে চিৎকার করিয়া উঠিল—"ওগো ডাকাত ডাকাত !"

চক্ষের নিমেষে শঙ্কর আসিয়া সবলে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল।

মুহূর্ত্ত পরে নিম্নতলে একটা কোলাহলের সাড়া পড়িয়া গেল। শিশু দুইটা ভয়ে কান্না বন্ধ করিল। আমি ছোট বাবুর বুকে হাঁটু দিয়া, দৃঢ় হস্তে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া সেই শাণিত ভোজালী শূন্যে তুলিলাম।

ক্ষণ মধ্যে আমার মনে হইল, এই ভোজালী এখনি নীচে নামিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তপ্ত রক্ত-ধারা উচ্ছ্বসিত

হইয়া আমার মুখ বুক প্লাবিত করিয়া ফেলিবে!—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তার চেয়েও তপ্ত—তার চেয়ে তীক্ষ্ণ—সকরুণ আর্ত্তনাদ, আমার মর্ম্মে সবেগে আঘাত করিল! চমকিয়া চাহিয়া দেখি,—সবলে শঙ্করের হাত ছাড়াইয়া পত্নী পতির বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ব্যাকুল মিনতিতে বলিতেছে, "রক্ষা কর বাবা, সর্ব্বস্ব নাও,—আমার সর্ব্বনাশ কোর না।"

আমি একেবারে স্তম্ভিত! তাইত! এ প্রতিহিংসা কাহার উপর লইতে আসিয়াছি? কাহার দোষে কাহার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছি? এই নিরপরাধা রমণীর! হাঁ, তা নয়ত কি? এই লোকটার জীবনের যেখানটা লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিব, সেইখান হইতেই এই রমণীর হৃদয় শোণিত উচ্ছলিত হইয়া উঠিবে। তবে, তবে?—

আমি ছুরি নামাইয়া, আক্রান্তকে ছাড়িয়া পালঙ্ক হইতে লাফাইয়া পড়িলাম। নিম্নে, অঙ্গনে তখন হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি পড়িয়া গিয়াছে! দুড়্ দাড়্ করিয়া দ্বার খুলিয়া লোকে বিকট চিৎকার করিতে করিতে দ্বিতলের সিঁড়ি দিয়া ছুটিয়া আসিতেছে!

আত্ম-মুক্তির জন্য রমণীর প্রাণপণে বলপ্রয়োগে শঙ্কর লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। দেখিলাম সে নিশ্চেষ্ট স্তম্ভিত হইয়া, অর্দ্ধোপবিষ্টভাবে তখনও মেঝের উপর বসিয়া। নিষ্ফল উত্তেজনায় আমার অন্তরে তখন যেন একটা প্রবল ঝঞ্ঝা বহিতেছিল; আমি পুরুষ-কণ্ঠে ডাকিলাম—"উঠে আয়!"

শঙ্কর, ভয়ত্রস্তা বালিকার মত চকিত দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল।

বাহিরের পদশব্দ ও চিৎকার খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িল।

ফাঁসী কাঠে উঠিবার সময় খুনী আসামী যেমন মন হইতে সবলে কাতরতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া নির্ভীক ভাবে নিশ্চয়-মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়ায়—আমার নির্ম্মম কণ্ঠস্বরে শঙ্করও যেন তেমনি 'মরিয়া' হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাকে আর ফিরিয়া তাকাইবার অবসর দিলাম না, বজ্র মুষ্টিতে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া ঘরের বাহিরে আনিলাম।

এবার আর ধীরে সুস্থে ফিরিবার উপায় নাই, লোক জন সকলেই প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাকে লইয়া বাগানের দিকে খোলা ছাদে ছুটিয়া গেলাম,—সম্মুখে সঙ্কেত করিয়া আদেশ দিলাম—"লাফিয়ে পড়।"

সভয়ে পিছু হটিয়া শঙ্কর বলিল, "এত উঁচু থেকে?"

আরও কঠোর-স্বরে উত্তর দিলাম, "হাঁ",—সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাৎ হইতে এক ধাক্কা মারিয়া তাহাকে ছাদের প্রান্তভাগে আনিলাম। ঝোঁক সাম্লাইয়া ভয়-কাতর শঙ্কর বলিল, "তুমি আগে লাফাও!"

আমি গর্জ্জিয়া উঠিলাম। সে যখন মরণের ভয়ে অভিভূত হইয়াছে, তখন তাহাকে আর বিশ্বাস কি?

কম্পিত কলেবরে শঙ্কর বলিল, "আমি পারব না, তুমি আগে লাফাও!"

পুনশ্চ তাহার হাত ধরিয়া টানিতেই সে হাত ছিনাইয়া পিছাইয়া গেল, মুখ ফিরাইয়া ব্যগ্র করুণ দৃষ্টিতে ছোটবাবুর শয়ন কক্ষের পানে চাহিল। সে যে কি ভাবিতেছিল, তাহা সেই জানে আর ভগবানই জানেন। আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

ক্ষণ পরেই দ্বিতলের বারান্দায় লোকজনের উচ্চ কলরব ও অগণ্য আলোর জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; আমি রূঢ় স্বরে বলিলাম, "আর এক মুহূর্ত্ত শঙ্কর—এখনো বলছি।"

আর্ত্তনাদ করিয়া সে বলিল, "না—না।"

আমার চোখে তখন জগৎ জুড়িয়া খুনাখুনীর মেলা বসিয়া গিয়াছে, চারিদিক হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্তের উৎস্ ছুটিতেছে, আমার রক্ত-লোলুপ চিত্তে এক রাক্ষসী যেন হুঙ্কার করিয়া উঠিল! দুই হস্তে দৃঢ় মুষ্টিতে শাণিত ভোজালী ধরিয়া, আমি চক্ষের নিমিষে তাহার স্কন্ধে বসাইয়া দিলাম!

মুণ্ডটা দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া গেল। লুণ্ঠিত দেহটা একবার সজোরে আকুঞ্চিত হইয়া, তারপর স্থির।

হইয়া গেল। একটা বিকট পরিতৃপ্তির উল্লাসে আমার সারা অন্তরাত্মা উন্মাদ হইয়া উঠিল। আমি সেই মুণ্ডের চুলগুলা সবলে মুঠা করিয়া ধরিয়া ছাদ হইতে লম্ফ দিলাম।

নীচে বাগানে একঝাড় কলাগাছ ছিল, তাহারই উপর পড়িলাম, পা মচ্‌কাইয়া গেল! ভ্রূক্ষেপ করিলাম না;—সেই রক্তাক্ত মুণ্ড লইয়া তীর বেগে ছুটিলাম।

কতদূর আসিলাম কে জানে? সম্মুখে ভৈরব তাণ্ডবে প্রবাহিত ক্ষিপ্তস্রোত দামোদর। আমি জলের কাছে আসিয়া পড়িলাম। জলরাশি একবার সবেগে ছিট্‌কাইয়া উঠিল। তারপর আমার অবশ ইন্দ্রিয়গ্রাম আর কিছুই অনুভব করিতে পারিল না।

যখন জ্ঞান হইল, দেখিলাম দশমীর ক্ষীণ আলোকে পশ্চিম গগন পাণ্ডুবর্ণে চিত্রিত। আমার হাঁটু ছাপাইয়া দামোদরের স্রোত বহিয়া যাইতেছে, আর আমি বালীর উপর দুই হাতে শঙ্করের মুণ্ড বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া আছি। উঠিয়া বসিলাম, মুহূর্ত্তে সব স্মরণ হইল। আমি বালকের মত হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম।

তখন অনুভব শক্তি ফিরিয়া আসিতেছিল, কিন্তু সে কি অসহ্য যন্ত্রণা! একবার ভাবিলাম, এই মুণ্ডটা লইয়া আমিও ঐ দামোদারের উচ্ছল স্রোতে হাত পা ছাড়িয়া ঝাঁপাইয়া পড়ি;—এই দুর্ব্বহ শোক—এই অসহ্য বেদনাকে ফাঁকি দিয়া আরাম লই।—কিন্তু তখনই মনে পড়িল, সেটা বিষম স্বার্থপরতা হইবে! গৃহে বিধবা জননী আছেন, অন্যান্য পরিজন বর্গ আছে, তাহাদের ভার যে একমাত্র আমারই উপর!—আমার এখন বাঁচিবার শক্তি থাক আর নাই থাক, মরিবার স্বাধীনতা নাই, অবশ্যই নাই!

কেমন করিয়া কয়দিন পরে, কি উদ্দেশ্যে রেঙ্গুণে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম, ঠিক মনে পড়ে না। এই টুকু মাত্র বলিতে পারি, যখন প্রথম আমার মস্তিষ্কে যথার্থ স্থিরতা আসিল, তখন আমি এই নির্জ্জন প্রান্তরে একলা ঐ দেবদারু গাছের তলায় বসিয়াছিলাম। গাছটা তখন ছোট ছিল।

আমার বাক্সে তখনো বস্ত্রাবৃত শঙ্করের মাথা। সেটাকে অনেক রাত্রে গাছ তলায় পুঁতিয়া ফেলিলাম। পাথর দিয়া ঠুকিয়া ঠুকিয়া খোঁড়া জমিকে শক্ত করিয়া তাহার উপর ঘাসের চাবড়া বসাইয়া দিলাম।

পুলিসের জিজ্ঞাসাবাদের ভয়ে পরদিন সহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে প্রবেশ করিলাম। এখান হইতে প্রায় চল্লিশ ক্রোশ দূর এক গ্রামে গিয়া, নিজেকে বিহার-বাসী বলিয়া পরিচয় দিয়া এক বর্দ্ধিষ্ণু মগ-কৃষকের ধান্য-ক্ষেত্রে মজুরী করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলাম। ছয় সাত বৎসর সেখানে থাকিয়া, কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া যখন রেঙ্গুণে আবার ফিরিয়া আসিলাম, তখন হইতে আমার এই বর্ম্মীজ্‌ ছদ্মবেশ ও ছদ্মনাম।

এখানে আসিয়া এক বৃদ্ধ ছুতারের আশ্রয় লইলাম। সে আমার ছদ্মবেশ ধরিতে পারিল না, আমার কল্পিত জীবনেতিহাস শুনিয়া তাহাও অবিশ্বাস করিল না। তাহার কাছে কয় বৎসরের জন্য কাজে চুক্তিবদ্ধ হইয়া, মাতুলের নামে কিছু টাকা পাঠাইলাম। লিখিলাম, "সোণাগঞ্জে আমি একটা খুন করিয়া গোপনে পলাইয়া আসিয়াছি, শঙ্কর আমার কাছে আছে, আপনারা ভাবিবেন না।"

বৃদ্ধ ছুতারের গৃহ এখান হইতে কিছু দূরে ছিল। অবসর পাইলেই এখানে আসিতাম, ঐ দেবদারু গাছটির তলায় বসিয়া থাকিতাম। মাঝে মাঝে ফুলের মালা আনিয়া ডালে টাঙ্গাইয়া দিতাম। আমার এই সব অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া লোকে আমার নাম দিল "পাগলা লাফো।"

দুই সপ্তাহ পরে পত্রের উত্তর আসিলে, সাত বৎসর পরে বাড়ীর সংবাদ পাইলাম। মামা লিখিয়াছেন বিজয়া-দশমীর পরদিন এক পুষ্করিণীতে শোভার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল, পুলিস তদন্তে স্থির হয় যে বালিকা স্নান করিতে নামিয়া অসাবধানে গভীর জলে গিয়া পড়িয়া প্রাণ হরাইয়াছে।—আমার বিশ্বাস কিন্তু অন্যরূপ; ঐ উপায় অবলম্বন করিয়া শোভা নিজ নশ্বর দেহের কলঙ্ক-কালিমা ধৌত করিয়া লইয়া স্বর্গে গিয়াছে।

যতদিন খুড়ী জীবিতা ছিলেন ততদিন এমনি করিয়া শঙ্করের কুশল লিখিয়াছি। তাহার পর তিনিও মরিয়াছেন। এখন শঙ্করের সংবাদের জন্য কেহ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইবার নাই, কারণ শঙ্কর আমার কাছে নিরাপদে আছে, সবাই জানে!

আমার অনুমান, আমার কৃত কার্য্যের জন্য দেশে পুলিসের কিছুই হাঙ্গামা হয় নাই, কারণ রায় বাবুদের কোন লোকই খুন হয় নাই, এবং খুন করিতেও কেহ কাহাকে দেখে নাই!—বিশেষতঃ অন্দর মহলের ভিতর এ সব ছেঁড়া ন্যাঠা লইয়া কি পুলিশে হাঙ্গামা করে? তাঁহারা সব চাপিয়া লইয়াছেন!

সমস্ত জীবনের উদ্বৃত্ত আয় একত্র করিয়া দুই বৎসর হইল এই জায়গাটা কিনিয়া লইয়াছি। একজন অংশীদার জুটাইয়া কাঠের কারখানা ফাঁদিয়াছি।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার মামা, খুড়ীমা কি এখনও জীবিত আছেন?"

সে বলিল—"না বাবুজি। আমাদের বংশে এখন আর কেহই নাই, থালি আমি:আর শঙ্কর। জমির উপর আমি, নীচে শঙ্কর।"

আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া লাফো বলিল—"বাবু সাহেব, সবাই ভুলিয়াছে—আমি পাগল লাফো। আমি ভুলিয়াছি, আমি বাংলাদেশের বীরেশ্বর পাঁজা। কিন্তু যখনই এই গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াই, তখনই অতীতের সমস্ত স্মৃতি সজীব হইয়া আমায় স্মরণ করাইয়া দেয়, আমি পাগল নয়, লাফো নয়, বীরেশ্বর নয়, আমি নরঘাতক দস্যু!

সময় সময় ইচ্ছা হয়, ঐ গাছ তলাটার চারিদিকে লোহার বেড়া দিয়া ওখানটা পাথরে বাঁধাইয়া, উপরে এক বুদ্ধ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করি। কিন্তু তখনই মনে হয়, শঙ্করের অশরীরী আত্মা হয়ত তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবে।"

লাফো চুপ করিল। চারিদিকে শান্ত স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। গাছপালা গুলা সমস্ত নিথর নিস্তব্ধ। আমরা দুইজনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। লাফো স্থির দৃষ্টিতে অল্পক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, তারপর সনিঃশ্বাসে বলিল, "বাবু সাহেব, যে শাস্তি ভোগ করিতেছি, তাহার তুল্য শাস্তি শুধু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কেন, সারা পৃথিবীর কোন শক্তি আমায় দিতে সমর্থ নয়।"

জ্যোৎস্নার আলোকে দেখিলাম, লাফোর চক্ষে অশ্রু চক্ চক্ করিতেছে।

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

চিরবসন্ত

আমার শূন্য কুটীর-দুয়ারে
অতিথি-বেশে
জানিনা কখন বসন্ত আজি
দাঁড়াল এসে।

বনে বনে যত কচি কিশলয়
পুলকিত করি' বহিল মলয়,
নব মুকুলের গন্ধ কখন
আসিল ভেসে!

যুগে যুগে চির-নির্ম্মল তব
কুসুমরাজি,
ওগো ঋতুরাজ, তাই লয়ে পুন
এসেছ আজি।
আজি মধুপের গুঞ্জর তানে
মত্ত মুখর বিহগের গানে
কোন সুদূরের সঙ্গীত যেন
উঠিছে বাজি'।

কত ফুলরাশি সৌরভে দিক
আকুল করি'
কত মধুমাসে নীরবে ধরায়
পড়েছে ঝরি'।
হারায় নি কিছু—কুড়ায়ে সে সবে,
নব নব শোভা—নব সৌরভে
অনন্ত নব ভাণ্ডার তব
রেখেছ ভরি'।

তাই, বসন্ত, এনেছ আবার
আমার তরে
যে ফুল শোভিত প্রিয়ার কণ্ঠে—
অলক 'পরে।

সেই মল্লিকা-শিরীষ-বকুল,
জাগায় তেমনি বাসনা ব্যাকুল;
আপনারে আজ রাখিব ভুলায়ে
কেমন করে'!

সুনীল শান্ত আকাশের তলে
উঠেছে ফুটি'
যেন আজি তার স্নিগ্ধ কোমল
নয়ন দুটি।
হেথা একদিন লয়ে ফুলডালা
তরুর ছায়ায় গাঁথিত সে মালা,
অঞ্চলখানি শ্যামল শয়নে
পড়িত লুটি।

আজি এ বিজন কুঞ্জ ভবনে
সে নাহি আর,
মধুঋতু শুধু এনেছে বহিয়া
বারতা তা'র।
সে মাধুরী তার আছে অমলিন—
চির বসন্ত যেথা প্রতিদিন
সাজায় তাহারে লয়ে নব নব
কুসুম ভার।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

প্রাচীন ভারত।

(১)

পুরাকালে ভারতবর্ষে কিরূপ আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তাহার আভাস আমরা পুরাতন গ্রন্থরাজি হইতে প্রাপ্ত হইতে পারি। আমরা এস্থলে "কল্পসূত্র" নামক একটি প্রাকৃত ভাষায় লিখিত প্রাচীন জৈন-গ্রন্থের স্থান-বিশেষের অনুবাদ প্রকাশিত করিতেছি, ইহাতে সে সময়ের একজন নৃপতি কিরূপভাবে প্রাতঃ-কৃত্য সমাপন করিয়া বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিধান করিতেন, কিরূপভাবে রাজসভায় গমন করিতেন ও কিরূপে রাজসভা সজ্জিত করা হইত—ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ জৈন শেষ-তীর্থঙ্কর শ্রীমহাবীর স্বামীর (খৃঃ পূঃ ৫২৭ অব্দে নির্ব্বাণ) শিষ্য-পরম্পরায়

ষষ্ঠ শিষ্য শ্রীভদ্রবাহু সূরি বিরচিত। ভদ্রবাহুসূরি মহাবীর স্বামীর ১৭০ বৎসর পরে দেবলোক প্রাপ্ত হন। অতএব এই গ্রন্থ খৃঃ পুঃ ৩৫৭ অব্দের পূর্ব্বের রচিত। আমরা এ স্থলে যথাসম্ভব মূলসূত্রের অনুযায়ী হইতে চেষ্টা করিয়াছি।

"তৎপরে প্রত্যূষকালে সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়পুত্র (১) কৌটুম্বিক পুরুষগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে দেবানুপ্রিয়, অদ্য অতি শীঘ্র, বিশেষ প্রকারে বাহিরের উপস্থানশালা(২) গন্ধোদকসিক্ত, সম্মার্জ্জিত, অনুলিপ্ত ও পবিত্র করিয়া তথায় সুগন্ধ পঞ্চবর্ণ পুষ্প স্থাপন কর, ও কৃষ্ণাগুরু, উত্তম কুন্দুরুক্ক, তুরুক (৩) যুক্ত ধূপদ্বারা অত্যন্ত সুগন্ধময় কর ও অন্য লোকদ্বারা করাও এবং তথায় সিংহাসন রচনা করিয়া আমার আজ্ঞা প্রত্যর্পণ কর।—তৎপরে সেই কৌটুম্বিক পুরুষগণ সিদ্ধার্থ-রাজ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হওয়ায় অত্যন্ত হৃষ্ট, তুষ্ট ও আনন্দিত হইয়া উভয়হস্ত যোড় করিয়া মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া 'স্বামী এইরূপই হইবে' বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। তৎপরে সভাগৃহে গমন করিয়া সত্বর তাহা পরিষ্কৃত, সুগন্ধময় ও তাহাতে সিংহাসন রচনা করিয়া সিদ্ধার্থ রাজার নিকট গমন পূর্ব্বক উভয় করতলের দশনখ একত্র করিয়া মস্তকে আবর্ত্তন পূর্ব্বক, মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া সিদ্ধার্থ ক্ষত্রিয়কে তাঁহার আজ্ঞা প্রত্যর্পণ করিল।

"তৎপরে রাত্রি প্রভাত হইলে কমল প্রস্ফুটিত, কোমল কৃষ্ণ-মৃগ-নয়ন উন্মীলিত হইলে, পাণ্ডুর-বর্ণ প্রভাতে রক্তাশোক-প্রকাশের ন্যায়, কিংশুক-শুক-মুখ-গুঞ্জার্দ্ধ-রাগ-সদৃশ, বন্ধুজীব-পারাবতচরণ-পরভৃত-সুরক্তলোচন-জবাকুসুমরাশি-হিঙ্গুল-পুঞ্জবৎ, অথবা এই সমস্ত অপেক্ষা অধিকতর শ্রীযুক্ত, কমলাকরে কমল-সমূহ প্রতিবোধক, দিবাকর সূর্য্য ক্রমে উত্থিত হইলেন। তাঁহার কিরণাভিঘাতে অন্ধকার বিনষ্ট হইল, 'বালাতপ' দ্বারা জীবলোক কুঙ্কুম খচিতবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল। সহস্ররশ্মি দিনকর, তেজঃদ্বারা জাজ্বল্যমান সূর্য্য উত্থিত হইলেন। এ সময়ে সিদ্ধার্থরাজা শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া (নিমন্ত্রিত) পাদপীঠে পদস্থাপন পূর্ব্বক অবরোহণ করিলেন ও যে স্থানে 'অট্টনশালা' (৪) আছে, তথায় গমন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় অনেক প্রকার ব্যায়াম. ভারোৎপাটন, বল্গন, ব্যামর্দ্দন, মল্লযুদ্ধ করিয়া শ্রান্ত পরিশ্রান্ত হইলে প্রীণনীয় (৫), দীপনীয় (৬), মদনীয়, বৃংহণীয় (৭), দর্পণীয় (৮) সর্ব্বেন্দ্রিয়-গাত্র-প্রহ্লাদকারক, শতপাক সহস্রপাক-সুগন্ধ তৈলাদিদ্বারা অভ্যঙ্গন করাইতে লাগিলেন। মর্দ্দনকারী ব্যক্তিগণ—পরিপূর্ণ হস্তপদবিশিষ্ট, সুকোমল-হস্তপদতল-যুক্ত, অভ্যঙ্গন-পরিমর্দ্দন-উদ্বলন ক্রিয়াতে অভ্যস্ত, অবসরজ্ঞ, দক্ষ, শ্রেষ্ঠ, কুশল, মেধাবী ও জিত-পরিশ্রম, ইহারা অস্থিসুখকর, মাংসসুখকর, চর্ম্মসুখকর, লোমসুখকর, এই চতুর্ব্বিধ সুখজনক শুশ্রূষা করিলে সিদ্ধার্থ রাজার পরিশ্রম অপগত হইল ও তিনি অট্টন-শালা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মজ্জনঘরে আগমনপূর্ব্বক তথায় প্রবেশ করিয়া মুক্তাফলখচিত মনোহর-গবাক্ষযুক্ত, বিচিত্র-মণিরত্নজড়িত-ভূমিতল-বিশিষ্ট রমণীয় স্নান মণ্ডপে নানাবিধ-মণিরত্নাদি-নির্ম্মিত-চিত্র-সংবলিত স্নান-পীঠে সুখে উপবিষ্ট হইলেন। পুষ্পোদক, গন্ধোদক, উষ্ণোদক, শুদ্ধোদক (৯) দ্বারা কল্যাণকারক, স্নান করিবার উত্তম বিধি অনুযায়ী, নানা প্রকার কৌতুকপূর্ণ স্নানশেষে রক্তবর্ণ, সুগন্ধ, পক্ষ্মল (১০), সুকোমল বস্ত্রদ্বারা লূষিতাঙ্গ হইয়া অহত (১১) সুমহার্ঘ্য বস্ত্ররত্নদ্বারা সুসংবৃত

(১) বৈশালীর অন্তর্গত "ক্ষত্রিয়কুণ্ড গ্রাম" নগরের অধীশ্বর।

(২) সভাগৃহ।

(৩) শিলারস।

(৪) ব্যায়ামশালা।

(৫) রসরুধির ধাতুর প্রীতিকারক।

(৬) জঠরাগ্ন্যাদির দীপ্তিকর।

(৭) মাংসবৃদ্ধিকারক।

(৮) বলবৃদ্ধিকারক।

(৯) তীর্থাদির জল।

(১০) লোমবিশিষ্ট (টার্কিস্ তোয়ালে?)

(১১) নববস্ত্র। "ঈষদ্ধৌতং নবং শ্বেতং সদৃশং যন্ন ধারিতম্। অহতং তদ্বিজানীয়াৎ পাবনং সর্ব্বকর্ম্মসু।"

হইলেন। তৎপরে সরস সুরভি গোশীর্ষচন্দন দ্বারা শরীর অনুলিপ্ত করিয়া পবিত্র পুষ্পমালা পরিধান ও কুঙ্কুমাদি বিলেপন করিলেন। মণি-সুবর্ণ-নির্ম্মিত আভরণদ্বারা আভূষিত হইলেন—হার (১২), অর্দ্ধহার, ত্রিসরিক হার (১৩) ধারণ করিলেন, কটীদেশে প্রলম্বমান ঝুম্বনকবিশিষ্ট কটীসূত্র সুশোভিত হইল, গ্রীবায় গ্রৈবেয়ক, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়ক ও অন্যান্য ললিত আভরণ পরিধান করিলেন। উত্তম কটক (১৪) ও ত্রুটিত (১৫) দ্বারা ভুজদ্বয় স্তম্ভিত করা হইল,—সিদ্ধার্থ নৃপতি অতীব রূপশ্রীযুক্ত হইলেন:—কুণ্ডল দ্বারা মুখ উদ্যোতিত হইল; মুকুট দ্বারা মস্তক দীপ্তিযুক্ত হইল, হারদ্বারা বক্ষঃস্থল আচ্ছাদিত হইল, মুদ্রিকা দ্বারা অঙ্গুলী পিঙ্গলীকৃত হইল, উত্তম পট্টবস্ত্র নির্ম্মিত প্রলম্বমান উত্তরীয় ধারণ করিলেন, নানা মণিকনকরচিত বিমল, মহার্হ, নিপুণ-শিল্পিবিনির্ম্মিত, দেদীপ্যমান, সুশ্লিষ্ট, বিশিষ্ট, লষ্ট (১৬) বীরবলয় পরিধান করিলেন,—অধিক আর কি বর্ণনা করিব, কল্পবৃক্ষের ন্যায় অলঙ্কৃত বিভূষিত হইলেন। কোরিণ্ট নামক পুষ্পমালা শোভিত ছত্র তাঁহার মস্তকোপরি ধৃত হইল, উত্তম শ্বেতবর্ণের চামর বীজিত হইতে লাগিল, লোকে মাঙ্গলিক জয় জয় শব্দোচ্চারণ করিতে লাগিল; অনেক গণনায়ক, দণ্ডনায়ক, রাজা, যুবরাজ, তলবর(১৭) মাণ্ডবিক, কৌটুম্বিক, মন্ত্রী, মহামন্ত্রী, গণক, দৌবারিক, অমাত্য, চেটক, পীঠমর্দ্দক (১৮), নাগরিক, নিগম (১৯) শ্রেষ্ঠী, সেনাপতি, সার্থবাহ, দূত, সন্ধিপাল (২০) কর্ত্তৃক সংপরিবৃত হইয়া, ধবল মহামেঘ হইতে নির্গত, গ্রহগণ ও ঋক্ষতারাগণ মধ্যে, শশীবৎ প্রিয়দর্শন, নরপতি, নরেন্দ্র, নরবৃষভ, নরসিংহ, অত্যধিক রাজতেজঃ লক্ষ্মী দ্বারা দেদীপ্যমান, সিদ্ধার্থ রাজা মজ্জন-গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, যেখানে বহির্ভাগের সভাগৃহ তথায় আগমন পূর্ব্বক সিংহাসনোপরি পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিলেন; ও নিজের উত্তরপূর্ব্ব কোণভাগে অষ্টভদ্রাসন শ্বেতবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ও তাহাতে শ্বেতসর্ষপ দ্বারা মাঙ্গলিকোপচার করাইয়া স্থাপন করাইলেন। তৎপরে নিজের নাতিদূরে নাতিনিকটে নানামণিরত্নমণ্ডিত, অত্যন্ত-প্রেক্ষণীয়-রূপ-বিশিষ্ট, মহার্ঘ্য, সুবিখ্যাত স্থানে প্রস্তুত, নানাপ্রকার সূক্ষ্ম চিত্রাদি দ্বারা চিত্রিত, ঈহামৃগ, বৃষভ, তুরঙ্গ, নর, মকর, বিহগ, ব্যাল, কিন্নর, রুরুমৃগ, শরভ (২১) চামরীগাভী, কুঞ্জর, বনলতা ও পদ্মলতাদি চিত্রিত অভ্যন্তরের যবনিকা আস্তীর্ণ করাইলেন, ও নানামণিরত্ন-চিত্রিত কোমল-গদীযুক্ত, ও তদুপরি শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত, অত্যন্ত-কোমল অঙ্গসুখস্পর্শবিশিষ্ট ভদ্রাসন ত্রিশলা (২২) ক্ষত্রিয়ানীর জন্য প্রস্তুত করাইলেন।"

শ্রীপূরণচাঁদ সামসুখা।

(১২) হারোষ্টাদশসরিকঃ, অর্দ্ধহারোনবসরিক:—ইতি টীকা।

(১৩) তে'নড়া হার।

(১৪) বলয়।

(১৫) হস্তাভরণ বিশেষ।

(১৬) মনোহর।

(১৭) রাজা সন্তুষ্ট হইয়া যাহাকে রাজস্থানীয় করিয়া লইয়াছেন।

(১৮) বয়স্ত।

(১৯) ব্যবসায়িক।

(২০) রাজ্যসন্ধিসংরক্ষকাঃ—ইতি টীকা।

(২১) অষ্টাপদ, মহাকায় অটবীর পশু-বিশেষ।

(২২) 'ত্রিশলা' সিদ্ধার্থ রাজার স্ত্রী ও মহাবীর স্বামীর মাতা।

কবি ও সমালোচক।

প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা বলিতেন "নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ।" আধুনিক বঙ্গের কবি সম্প্রদায় এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছেন ভাবিয়া বড়ই বিব্রত হইয়াছেন এবং কি উপায়ে আপন যথেচ্ছ বিলাসবিভ্রমের পরিপন্থী একমাত্র কণ্টকস্বরূপ সমালোচকের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন তাহা অবিষ্কার করিতে লেখনীহস্তে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। নীতিকারেরা খল ও কণ্টকের দ্বিবিধ প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করেন। তন্মধ্যে দ্বিতীয়োক্ত বিধান পরিত্যক্ত হইল বুঝিতেছি। কবিও, দেখিতেছি, সাঙ্গোপাঙ্গে সমালোচকের সহিত মসী যুদ্ধার্থ তর্কের ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন—তবে উদ্দেশ্য কি অবশিষ্ট অর্থাৎ প্রথমোক্ত বিধানের পরীক্ষা করা? প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগে "জ্যেষ্ঠ" হইয়া কনিষ্ঠের নিগ্রহের জন্য তিনি এত দৃঢ়সঙ্কল্প কেন? এদেশ ত Primogeniture আইন শাসিত নহে—বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর ব্যবহার বিষয়ে জীমূতবাহনের ব্যবস্থাই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অতএব যতদিন অগ্রজ কবি অনুজ সমালোচকের জ্যেষ্ঠতাতত্ত্বের ভাণ হাসিয়া উড়াইয়া ছিলেন বা নীরবে বালভাষিতবোধে অমৃতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন—ততদিন ছিল ভাল—তিনি সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের এই যুগে, এইরূপ দ্বন্দ্বের ফলে অনুজের কণ্ঠরোধ হইবে—এরূপ সুন্দর পরিণামের ত' সম্ভাবনা দেখি না।

কবি বলিতেছেন তিনি সাধারণ জীব নহেন। তিনি বনের বিহঙ্গের মত অন্তরের উল্লাসে গান গাহিয়া বেড়ান—তিনি মধুকরের মত সৌন্দর্য্য হইতে সৌন্দর্য্যান্তরে বসিয়া, নাচিয়া উড়িয়া ঘুরিয়া থাকেন—তিনি কলকল্লোলিনী নির্ঝরিণীর সহোদর—তিনি স্বভাব জল্পিতের কণ্ঠমাত্র। অতএব তাঁহার ভাষা, তাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার মতামত, তাঁহার কার্য্যকলাপ বিচারণীয় নহে। তিনি Inspiration বা আবেশময়ী কল্পনার দ্বারা চালিত যন্ত্র মাত্র—তিনি ভাবাবিষ্ট বৈষ্ণবের মত—তিনি স্বপ্নরাজ্যের নন্দন-কাননবিহারী শচীর আদরের পুত্রের সদৃশ লোকসমাজের কাঠগড়ায় আসামী হইয়া দাঁড়াইতে পারেন না। যে পুরাণ-কবির রচিত অপূর্ব্ব কাব্য এই পরিদৃশ্যমান চরাচর সেই আদিম ও অদ্বিতীয় শিল্পীর তিনিও অংশবিশেষ—অবতারবৎ। তাঁহার বিচারের জন্য দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারোপযোগী মানদণ্ডের প্রয়োগ—অনুচিত, অনর্থক ও দোষাবহ। তিনি ভাষান্তরিত করিয়া Tennyson-এর সহিত সমস্বরে বলিতেছেন—



টেনিসন্

"I do but sing because I must
And pipe but as the linnets sing."

তিনি Memnonএর প্রস্তর মূর্ত্তির মত রবিকিরণস্পর্শে স্বতঃই সঙ্গীত-মুখর হইয়া উঠেন। তিনি কীচকবংশের মত ভাবের বায়ুপ্রবাহে আপন হইতেই পূর্ণ হইয়া সুস্বরলহরীতে দিগন্ত ব্যাপ্ত করেন। তিনি প্রকারান্তরে বুঝাইতে চাহেন—

Every fiery prophet in old times
And all the sacred madness of the bard,
When God made music through them,
could but speak
His music by the framework and the chord,

তিনি প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি Shellyর বর্ণিত Skylarkএর মত
Hidden
In the light of thought,
Singing hymns unbidden, till the world is wrought
To sympathy with hopes and fears it heeded not.



শেলি।

জনসমাজের অন্তরস্থিত আত্মার আকারেই হউক অথবা যুগ বিশেষের নিয়ামক শক্তিস্বরূপেই হউক—হৃদিস্থিত কোন অতীন্দ্রিয় দেবতার প্ররোচনায় তিনি "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোতি।" তিনি পাঠশালার শিক্ষক মহাশয় নহেন অতএব বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির সম্পাদক সমালোচক মহোদয়ের নিকট নিজের অধিকৃত পরীরাজ্যের ব্যবস্থার জন্য পদে পদে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন। তোমরা তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া নিজ নিজ পারমার্থিক উপকারই কর—এই উপকার সাধনের প্রকৃষ্ট প্রকার জানিবার জন্য তিনি তোমাদের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন এরূপ আশা করা অস্বাভাবিক এবং অন্যায়। তোমার আমার সুখ্যাতিতে তাঁহার অতিমানুষ শক্তির উন্মেষ হয় না। অতএব তোমার আমার রুচিতে তাঁহার রচনা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না।



আরিষ্টটল্।

অপর দিকে সমালোচকও নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন। তিনি কবিকে তাঁহার ছন্দোবদ্ধ রস-রচনার উদ্দেশ্য শুধাইতে চাহেন—তিনি সপ্রমাণ করিতে চাহেন যে সমালোচক উপেক্ষিত বা উপেক্ষণীয় জীব নহেন বরং সবিশেষ অপেক্ষিত কবি যদি লোকব্যবহারের অতীত এরূপ ব্যোমচারী হয়েন তবে তাঁহার মানুষভাষায় ভাবব্যক্তির এত ব্যাকুলতা কেন—ছন্দঃশিল্পে বিচক্ষণতা লাভের এত প্রয়াস কেন—মনুষ্যহৃদয়ে রসের উদ্বোধ ও উজ্জ্বলনে তিনি এত ব্যস্ত কেন? কবিও যে মানুষ—তাঁহার সম্বন্ধেও Aristotle এর প্রদত্ত সামাজিকতার অপবাদ খাটে—তিনি লোক-মুখাপেক্ষী—পাঠকের বাহুল্য তাঁহার নিকটও অনভীষ্ট বা অনপেক্ষিত নহে। যদি এইরূপ আত্মপ্রচার ও প্রকাশ তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত না হইত তাহা হইলে তিনি অনায়াসেই নীরব ধ্যানী-বুদ্ধের মত জগৎ নাট্যশালায়

বিরাজ করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা ত সম্ভব নহে—তিনিও সহৃদয়ের সহিত পরিচয়—সমানধর্ম্মীর সহিত ভাববিনিময়ের জন্য লালায়িত। আত্মপ্রকাশের বা আত্মবিকাশের এই যে তীব্র বাসনা ইহাই তাঁহাকে



ওয়াল্টার স্যাভেজ ল্যাণ্ডর।

কাব্যের পসরা বহন করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরাইতেছে। তিনি উত্তুঙ্গ Olympian শিখরে উদাসীন দেবতার মত বাস করিতে পারেন না—হৃদয়ান্তরে সজীব এই স্পন্দনের সংস্পর্শে আসিবার জন্যই তিনি নির্জন Palace of Art ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ফলতঃ সমালোচকের সহিত সাক্ষাৎকার তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য ঘটনাবলির অন্যতম। আর প্রকৃতপক্ষে সমালোচক বলিয়া হেয় এই জীবটিও ত পাঠক সমাজের বহির্ভূত নহে। সমালোচক পাঠকের শিক্ষিতভ্রাতা—পথ-প্রদর্শক—চক্ষুরুন্মীলক—গুরু। তাঁহাকে বর্জন করিলে পাঠকসমাজ মস্তিষ্কহীন দেহের অবস্থা পায়—সৎ ও অসৎকাব্যের তারতম্য করিতে পারে না—কেন না সমালোচক কাব্যরত্নের পরীক্ষক। এবং সহৃদয় সমাজে তাঁহার সম্মান নিতান্ত অল্প নহে। Landor লিখিত Imaginary Conversations—"কাল্পনিক কথোপকথন" গ্রন্থে Solomon বলিতেছেন, "He who praises a book becomingly is next in merit to the author." তিনি Inspiration বা আবেশময়ী কল্পনার গর্ব্ব করেন না, সত্য, কিন্তু Inspirationএর মূলীভূত যে সহানুভূতি—তাহা তাঁহার হৃদয়েও অনল্প পরিমাণে থাকা আবশ্যক। মনের ক্ষোভে কবি নিজেই বলিয়াছেন—"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মালিখ মালিখ মালিখ।" ইহাতে সমালোচকের অস্তিত্বের প্রয়োজন অস্বীকৃত বা অপ্রমাণিত হয় না। অধিকন্তু ইহাও শুনিয়া থাকি যে "কবিতারসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎকবিঃ।" যদি এরূপ রসজ্ঞ সহৃদয় বোদ্ধা না থাকিত তাহা হইলে কবির বাণী কি অরণ্যে:রোদন হইত না? [redacted]কোকিলের কলকণ্ঠে সম্ভবতঃ মানবকে তৃপ্তি দিবার উদ্দেশ্য নাই—সুগন্ধ মলয়ানিলের হয়ত স্ফূর্ত্তি ও আরাম বিতরণের অভিসন্ধি নাই—কুলুকুলু-নাদিনী ভাগীরথীর অনন্ত অবিশ্রান্ত তরঙ্গভঙ্গপ্রপঞ্চে তীরবাসীর কর্ণে ও অঙ্গে সুধাবর্ষণের অভিপ্রায় নাই—কিন্তু কবির সম্বন্ধে সে কথা ত প্রযোজ্য নহে। কারণ [redacted]কোকিলের সুস্বরে, নদীর কলতানে অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য—অপর কোন বিরাট নিয়ম, হয়ত—আবার হয় ত কেন—যথার্থই প্রতিপালিত হইতেছে। কিন্তু কবির কাব্য যদি বোদ্ধার সাক্ষাৎকার না লাভ করিল—সমাজের মনে অধিকার ও আধিপত্য বিস্তার না করিল—পাঠকের অনুকূল হৃদয়তন্ত্রীতে সমবেদনার ঝঙ্কার না উঠাইল তবে তাহার সার্থকতা রহিল কোথায়? উপস্থিত ক্ষেত্রে সমালোচক Berkeleyর শিষ্যত্বগ্রহণ করিয়া বলিতেছেন—Esse est percipii—অনুভূতিই সত্তার প্রমাণ—কবির রচনার যে চমৎকারিত্ব বা মনোহারিত্ব, শিল্প ও সৌন্দর্য্য, তাহা পাঠক তথা সমালোচকের উদ্বোধসাপেক্ষ।

আধুনিক সময়ে সমালোচকের লেখনী সঞ্চালনের প্রতি কবির মনে যে অসহিষ্ণুতার ভাব দেখা যায় তাহা সর্ব্বতোভাবে সমালোচকেরই অনধিকার চর্চ্চার অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। রামচন্দ্র

জাত হইবার পূর্ব্বে হয়ত রামায়ণ রচিত হয় নাই এবং কবি ও সমালোচক এ দুইজনের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে বোধ হয় সেরূপ কথা খাটে। কিন্তু ইহাও সত্য যে বহু শতাব্দী ধরিয়া এ "দুই ভাই এক ঠাঁই" বহুদেশে বিরাজ করিয়া আসিতেছে; এবং সকল সময়ে তাহাদিগের মধ্যে সৌন্দর্য্যের বর্ত্তমান পরিণতি প্রকট হয় নাই। বর্ত্তমানে কবির নিরঙ্কুশত্ব অধিকারের যে চেষ্টা তাহা মানসিক ধাতুবিশেষের পরিচায়ক। সমালোচনার সম্বন্ধে তিনরকম মেজাজ (temperament) বা মানসিক প্রকৃতি মনুষ্যসমাজে সচরাচর লক্ষিত হয়—প্রথম aristocratic নবাবী বা আভিজাতিক—দ্বিতীয় bureaucratic বা রাজপুরুষ-সুলভ এবং তৃতীয় democratic বা কম্মিসুলভ। বর্ত্তমান কবি সম্প্রদায় প্রথমের গৌরব করেন না—দার্শনিকের মত উদাসীনভাব আর তাঁহাদের নাই; এবং যে ধৈর্য্য ও আত্মশক্তিতে স্থির বিশ্বাস থাকিলে democratic temper এর অধিকারী হওয়া যায় তাহারও তাঁহারা পরিচয় দিতেছেন—কারণ তাহা হইলে সমালোচনা বিরক্তি বা অসরসতা উৎপাদন না করিয়া সত্য নির্ণয়ের ও গুণ-পরীক্ষার প্রকৃষ্ট পন্থা হিসাবে আদর ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু হইত। তাই আশঙ্কা হয় উপস্থিত শাসক সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসিয়া সাহিত্যরথিগণও তাঁহাদিগের প্রকৃতির অনুকরণ-পটু হইলেন। সমালোচনার প্রতি সহিষ্ণুতা ও অসহিষ্ণুতার ভাব যে ব্যক্তিগত temperament বা চিত্তপ্রবণতার ফল তাহার দুটী প্রসিদ্ধ নিদর্শন আছে। মহাকবির বরেণ্য গোষ্ঠীতে কালিদাস ও ভবভূতির নাম প্রায় তুলামূল্য—কিন্তু দুইজনের মনোভাব প্রস্তুত বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত। রাজসভাসদ্‌সুলভ কমনীয় বিনয়ের সহিত কালিদাস জগতের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অন্যতম অভিজ্ঞানশকুন্তলে বলিতেছেন—

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানং
বলবদপি শিক্ষিতানাং আত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ।"

কিন্তু ভবভূতি অমর্ষব্যঞ্জক ভাষায় স্পর্দ্ধা সহকারে শুনাইতেছেন—

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষযত্নঃ।
সম্পৎস্যতে ন ইহ কোঽপি সমানধর্ম্মা
কালোঽহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।

পাশ্চাত্য সাহিত্যিকগণ সমালোচনাকে "সাহিত্যের দর্শনশাস্ত্র" আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। উক্ত শাস্ত্র ব্যবসায়িগণের নিকট কবি ও অন্যবিধ কল্পনাকুশল লেখকের জবাবদিহি করিবার বাধ্যতা আছে কিনা—ইহাই উপস্থিত প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য; বর্ত্তমান সময়ে এ দেশের কবিসম্প্রদায়ের এ সম্বন্ধে মনোভাব তৎপক্ষে প্রবর্ত্তকমাত্র। Aristotleএর সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুষকে আমরা বিবেকসম্পন্ন জীব বলিয়াই মনে করিয়া আসিতেছি। ইতর জন্তু হইতে নিজে বিশেষত্ব বলিয়া মানুষ ইহারই স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে যে সে instinct বা সহজ জ্ঞানের সাহায্যে জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত কার্য্যকলাপের নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ করে না—কিন্তু বিবেক, reason এবং বিচার judgmentএর সাহায্যে। এই বিবেক বা Reasonএর ব্যবহার হইতেই দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি। কবি বলিতে পারেন,

"There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than your philosophy dreams of."

উদ্দাম নিশ্চিন্ত যৌবন সময়ে যখন বাধা বা অসম্ভবতা ভাবনার মধ্যে আইসে না—সকল বিষয়ে সুকরতাই যখন স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়—তখন দর্শনশাস্ত্রকে নিতান্ত নিরর্থক মনে হইতে পারে—কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে মানুষ স্বভাবতঃই চিন্তাশীল—দার্শনিক। অন্তরে গ্রথিত এই বৃত্তি—সত্বর বা বিলম্বে—কখনও না কখনও আপনাকে ব্যক্ত করিয়া থাকে। এই চিন্তাশীলতাই তাহার জীবনের মধ্যে ঐক্য, সুষমা, সামঞ্জস্য, তাৎপর্য্য এ সকলের সৃষ্টি করে। এই অন্তর্নিহিত দার্শনিকতার বীজই অব্যাস্কুরিত হইয়া ভবিষ্যদ্দৃষ্টির আকার ধারণ করে—ব্যক্তি ও সমষ্টির স্থায়িত্ব ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির বিধান করে। ইহাই ভবকর্ণধার—ইহাই জীবনের ধ্রুবতারা। আমাদের যাহা কিছু প্রয়াস ও

অভিলাষ, জ্ঞান ও কর্ম্ম সে সকলেরই নিয়ন্ত্রী ও অবলম্বন স্বরূপ এই দার্শনিকতা বিরাজ করিতেছে। একজন পাশ্চাত্য লেখক বলিয়াছেন—

"It is good sense, reason which does all, virtue, genius, soul, talent and taste. What— is virtue ? reason put in practice ; talent ? reason expressed with brilliance ; soul ? reason delicately put forth ; and genius is sublime reason "

আর এক কথা। নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিলে ইহাও স্থির হয় যে বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্মনীতি, আচার, বিশ্বাস, আমোদ-প্রমোদ ক্রীড়া ও কৌতুক—এ সকলের বিচ্ছিন্নভাবে —পরস্পর হইতে পৃথকভাবে— সার্থকতা নাই বলিলেই চলে। এ সকলই একটা বিরাট জীবনব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গ বিশেষ। যখন ব্যষ্টি বা সমষ্টির জীবনের সহিত এই সকল চেষ্টার অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ বিযুক্ত ও বিপর্য্যস্ত হয় তখন উভয়েরই হানি হইবার সম্ভাবনা। Tolstoy তাঁহার My Confessions গ্রন্থে বলিতেছেন, Art is merely the ornament and charm of life. এবং অলঙ্কারের মূল্য যে অলঙ্কার-পরিহিতের অপেক্ষা অধিক—একথা মানিয়া লওয়া আমার মত অনেকের পক্ষেই বড় কঠিন। সাহিত্যকে এই জীবন ব্যাপারের অঙ্গবিশেষ ভিন্ন অন্যভাবে বাড়াইয়া তুলিবার চেষ্টা —Art for art's sake প্রভৃতি আখ্যায় গৌরবান্বিত হইতে পারে—কিন্তু তাহার অন্তরে একটা ভ্রম থাকিয়া যাইবেই বলিয়া মনে করি।

উপস্থিত যুগে শাস্ত্র প্রমাণকে আমরা নিতান্তই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকি—অন্ততঃ সেই ভাব মুখে প্রকাশ করি, যদিও কার্য্যে ও বাক্যে এ বিষয়ে আমাদিগের অনেক বিরোধ দৃষ্ট হয়। সে যাহা হউক, শুধু নামের মাহাত্ম্যে নয়, অন্তর্নিহিত সত্যের বলে Mathew Arnoldএর কাব্য সংজ্ঞার সূত্রটী আধুনিক সমালোচকগণের মন অধিকার করিয়া আছে। তিনি বলেন— "Poetry is the criticism of life". প্রাচীন গ্রীসীয় আলঙ্কারিকেরা কাব্যের ত্রিবিধ বিভাগ করিয়াছেন এখনও তাহা পরিত্যক্ত হয় নাই। তন্মধ্যে মহাকাব্য (Heroic Poetry) ও দৃশ্যকাব্যে (Dramatic Poetryতে)



টল্‌ষ্টয়।

এই লক্ষণ যে সবিশেষ সঙ্গত তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। এবং M. Arnold উক্ত সূত্রকে "Application of ideas



ম্যাথু আর্ণল্ড।

to life" এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে গীতিকাব্য প্রভৃতি রচনাতেও ইহা বাধিত নহে। বর্ত্তমান যুগের অপূর্ব্ব সম্পদ্ ও সর্ব্বসাধারণের আদরের সামগ্রী উপন্যাসেও যে উক্ত সংজ্ঞা ব্যর্থ প্রয়োগ নহে—তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

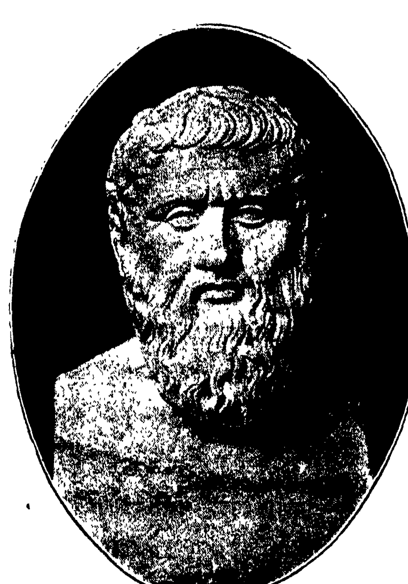
কাব্য তথা সাহিত্যের সহিত ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের যদি এত ঘনিষ্ঠ যোগ প্রকৃতই থাকে—তাহা হইলে তাহার অস্বীকার করা কেবল Arts Collegeএর চতুঃসীমার মধ্যেই শোভা পায় না কি?

এ সম্বন্ধে পুরাকালের অন্যান্য সভ্যদেশের মত এ দেশের আলঙ্কারিকগণও অতি পরিষ্কার ধারণা পোষণ করিতেন। কাব্যের উদ্দেশ্য-পর্য্যালোচনা প্রসঙ্গে মম্মঠভট্ট বলিতেছেন "কাব্যং যশসেহর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষয়তে সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তা সম্মিততয়া উপদেশযুজে।"

সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে আমরা অন্ধ সরল বিশ্বাসকে যেমন পশ্চাতে ফেলিয়া আসি—তেমনি স্পষ্টবাদিতা ও সত্য স্বীকারকেও অনেক সময়ে পরিহার করিতে শিখি। তাই আধুনিক কবিকে "অর্থ বা খ্যাতির জন্য তাঁহার রচনা উদ্দিষ্ট কিনা?" এরূপ উৎকট প্রশ্ন যদি করা যায় তাহা হইলে অন্ততঃ নিজ কলাবিদ্যার মর্য্যাদাজ্ঞানে তাঁহাকে বলিতে হইবে—"না।—

"I do but sing because I must
And pipe but as the linnets sing."

আর পুরাণাদি কাব্য পাঠে কোন অহিতের নাশ যে সম্ভব এরূপ ধারণাকে মনে স্থান দেওয়া বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বাতুলতা মাত্র। উদ্ধৃত সূত্রের মাত্র "কান্তা সম্মিততয়া" এই অংশটুকু কবি মানিয়া লইতে পারেন—কিন্তু ব্যবহার জ্ঞান বা অন্য কোনরূপ উপদেশদান যে কাব্যের লক্ষ্য হইতে পারে তাহা তাঁহার অস্বীকৃত হইবে—ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। কিন্তু কবির এ অস্বীকার সত্ত্বেও যাহারা মানবসমাজের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করিয়া থাকেন তাঁহারা বলিবেন—সাহিত্য জাতিমাত্রেরই ভবিষ্যৎ বংশধরগণের নীতি ও চরিত্র, কর্ত্তব্য ও আদর্শ শিক্ষার শক্তিমান উপায়। এই কারণেই বোধ করি Plato বলিয়া



প্লেটো।

গিয়াছেন "We must look for artists who are able out of the goodness of their own natures to trace the nature of beauty and perfection that so our young men, like persons who live in a healthy place, may be perpetually influenced for good"



চাল স্ ল্যাম্ব।

এরূপ ধারণার চতুঃপার্শ্বে Idealism বা ভাবুকতার মোহনচ্ছটা নাই বটে—কিন্তু অন্তরে সত্যের ও শিবের সৌম্য মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে বলিয়া মনে করি।

অতএব সাহিত্য যদি সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবন গঠন ও জীবন যাপনের উপায় ও অঙ্গ বলিয়া নির্ণীত হয় এবং বিবেক বা Reason যদি মনুষ্যের সকল কার্য্য-কলাপকে অন্য জীবের কার্য্যকলাপ হইতে বিশেষিত করে—তাহা হইলে আমাদিগের উত্থাপিত প্রশ্নের মীমাংসা কিরূপ দাঁড়াইতেছে তাহা পরিস্ফুট করা দুরূহ হইবে না।

ইংরাজী সাহিত্য সমালোচকদিগের মধ্যে Charles Lambএর নাম অতি উচ্চস্থান অধিকার করে। ইংরাজী নাট্যকলার ইতিহাসে Restoration comedy-তে যে বিচিত্র ও বিকৃত রুচি ও নীতির পরিচয় পাইয়া কাব্যামোদিগণ সচরাচর বিরক্ত ও বীভৎস রসাবিষ্ট হইয়া থাকেন—তাহার সমর্থন কল্পে Charles Lamb এক অদ্ভুত যুক্তিজালের অবতারণা করেন। এদেশীয় আধুনিক সমালোচকদিগের নিকট সে যুক্তিজাল কখনই অবিদিত থাকিতে পারে না। সাহিত্য রচনায় যথেচ্ছা-চারিতাকে আবেশময়ী কল্পনার দোহাই দিয়া অথবা "Art for art's sake" এরূপ সম্মোহন রব তুলিয়া যখন সহৃদয় সমক্ষ হইতে আবৃত রাখিবার চেষ্টা করা হয় তখন আমার Charles Lambএর সেই অপূর্ব্ব যুক্তির কথা মনে পড়ে। আধুনিক লব্ধপ্রতিষ্ঠ পাশ্চাত্য সমালোচকগণ Charles Lambএর সেই অপূর্ব্ব সিদ্ধা-ন্তকে "খেয়াল" বলিয়াই পরিহার করিতেছেন। এবং আমার মনে হয় "Art for art's sake" এই মন্ত্রোচ্চারণে যে অভিচার ক্রিয়ার আয়োজন করতঃ সমালোচককে কাব্যের ঐন্দ্রজালিক গণ্ডীর বাহিরে রাখিবার চেষ্টা করা হইতেছে—তাহাও সফলতা লাভ করিবে না। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, কবি অসাধারণ মনুষ্য হইতে



গ্যেটে।

পারেন কিন্তু তিনি অতিমানুষ (Superman) নহেন। অতএব নিপুণ সমালোচক কবির মনোভাব—কবির

মানস ক্রিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না—একথা সত্য নহে। Emerson বলিতেছেন—

Nature never sends a great man into the planet without confiding the secret to another soul.'



এমার্সন

কবির সম্বন্ধে এই another soul এই দ্বিতীয় আত্মা আর কেহই নহেন, যথার্থ সহানুভূতি সম্পন্ন ও রসজ্ঞ সমালোচকই এই "হৃদয়ং দ্বিতীয়ং"—যাঁহার প্রাণে কবির মানসবীণার সুক্ষ্মতম ঝঙ্কারও প্রতিধ্বনিত হয়। বিশ্ব ভুবনের ইতিহাসে সীতাদেবীর উদ্ভব একবারই ঘটিয়া থাকিবে—তদ্ভিন্ন যতকিছু পদার্থ আছে—তাহার প্রত্যেকেরই একটা পৌর্ব্বাপর্য্য, জনক ও সন্তান, কারণ ও পরিণতি আছে। জগন্ময় এই সামগ্রী সজ্জার মধ্যে অনুত্তরণীয় খাত আমরা দেখিতে পাই না। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জড়জগতে এই শৃঙ্খলার সত্যতা সম্বন্ধে আমাদিগেরই সমর্থন করিবেন। পরিশেষে কি সাহিত্যের ক্ষেত্রেই এই বিশ্বব্যাপী সোপান পরম্পরা ন্যায়ের ব্যতিক্রম ঘটিবে? কবির অব্যবহিত নিম্নস্তরে আমরা বড়বাজার-চারী ভারবাহকের প্রত্যাশা না করিয়া Po t critic জাতীয় কোন ব্যক্তির অপেক্ষা কি করিতে পারি না? আমার মনে হয়, আমরা পারি; এবং পারি বলিয়া—বৃথা জ্ঞান গর্ব্বের অপরাধে নিরয়গামী হইব না। তাহার কারণ, গ্রহ উপগ্রহকে বীণা সঙ্গীতের তানে তানে ভ্রমিত করিয়া, আর্ষ তপোবনকে সামমুখর করিয়া, আকাশে বাতাসে সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ স্ফুরিত করিয়া, শ্বেত সরোরুহাসীন রাতুল চরণতলে লুঠিত অগণিত ভ্রমরমালার গুঞ্জনে সমীরণ স্পন্দিত করিয়া, চতুঃষষ্টিকলৈশ্বর্য্যময়ী বাগ্‌দেবী ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম প্রভাত হইতে আজ পর্য্যন্ত অনুক্ষণ সে মণিনূপুরশিঞ্জিতে সুরের তরঙ্গে ব্যোমকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন—উৎকর্ণ হইয়া কবিই যে তাহা শ্রবণ করিয়াছেন এরূপ নহে—আপনার আমার মত স্থূলপটহ জনের কর্ণেও তাহার প্রতিধ্বনি প্রবেশ করিয়াছে—মানুষভাষার অপূর্ব্ব দ্রব্যসম্ভারে যাহারই আদান প্রদান আছে সেই ঐ স্বর্গীয় সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই



সেণ্ট বোভ্।

কারণে Goethe বা Mathew Arnoldএর মত দ্বিভাষী কবি সমালোচকের কথা ছাড়িয়া দিলেও—সাহিত্যেতিহাসে Taine, Schlegel বা Stopford Brookeএর মত শুদ্ধ সমালোচকের সাক্ষাৎ মধ্যে মধ্যে আমরা লাভ

করিয়া থাকি। সমালোচকের নামে একটী বড় অপবাদ আছে; কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—"What is a critic A feeble creature, an artist, who has failed" কিন্তু আমার মনে হয় Taine বা Sainte Beauve বা Mathew Arnoldএর মত অকৃতী শিল্পীর স্থান দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর স্বদোষানভিজ্ঞ অসৎশিল্পী অনেক কবিম্মন্যের বহু উচ্চে।

সমালোচনার প্রকৃত বিষয়—বিধি ও আদর্শ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা—উপস্থিত প্রবন্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। সেই জন্য আর একটী কথার অবতারণা করিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিতে চাই। সমালোচক উপস্থিত যুগে কলাবিচারকের আসন অনেকাংশে বর্জন করিয়াছেন এবং শিল্পীর শ্রেণীতে আসিয়া দেখা দিয়াছেন। আধুনিক সমালোচক আলঙ্কারিকের অধস্তন পুরুষ হইতে পারেন কিন্তু এ ক্ষেত্রে দুইজনের মধ্যে যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। কাব্যের রীতি, অলঙ্কার, গুণদোষ, শুধু এই বিচার ও বিশ্লেষণেই আধুনিক সমালোচকের শক্তি আবদ্ধ নহে। কাব্যের শ্রেণী বিভাগ এবং সমশ্রেণীর মধ্যে তারতম্য নির্দ্ধারণই তাঁহার প্রধান ব্যবসায় নহে। কাব্য সৌন্দর্য্যের সুদীর্ঘ তালিকা সংগ্রহ করিয়া, প্রত্যেক রত্নের ঔজ্জ্বল্য ও গুরুত্বের হিসাব কষিয়া, এবং সে সকল স্থায়ীভাবে গ্রন্থাকারে নিবেশিত করিয়া নবাবিষ্কৃত মণিমাত্রেরই তদনুসারে মূল্য নিরূপণ করাই তাঁহার প্রয়োজন নহে। তিনি সমালোচনাকে এক কলাশিল্পে পরিণত করিতে চাহেন। জীবনের আলোক ও স্পন্দন হইতে দূরে, কাব্যের নরনারী পরিবেষ্টিত ও কাল্পনিক ঘটনা ও কাল্পনিক চিন্তায় রচিত অবাস্তব জগতে তিনি নিজ বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে চাহেন না। তিনি কাব্য-গ্রন্থকে দ্বার করিয়া, আধার করিয়া ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, লোকচরিত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে আপন হৃদগত ভাবরাশিকে লোকলোচনমনোহর বেশ পরাইয়া কবি ও অন্যান্য স্রষ্টক শিল্পীর রচনার পার্শ্বে স্থান দিতে চাহেন। কাব্যের রঙ্গিন কাচের ভিতর দিয়া তিনি বিশ্বব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করেন না—করিলেও তাহাই তাঁহার চরম ও একমাত্র পরিদর্শনের উপায় নহে। ঈশ্বরদত্ত পর্য্য-বেক্ষণ ক্ষমতার ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি সাধারণ পাঠকের সহিত একই গ্রামে অবস্থিত। কিন্তু ইহাতেও পার্থক্য আছে। তিনি সংসার-রঙ্গমঞ্চে পরিদর্শকের ভূমিকা লইয়াই সন্তুষ্ট নহেন তিনি নিজে পরিদর্শনের ফলাফলকে সাধারণের সামগ্রী করিতে প্রয়াসী এবং আমরা মনে করি যে উহাতে তিনি কতক পরিমাণে সফলতারও স্পর্দ্ধা করিতে পারেন। কারণ বাগ্দেবীর বীণাধ্বনি তাঁহারও কর্ণে পৌছিয়াছে—বাক্যের ইন্দ্রজাল বিদ্যাকে আয়ত্ত করিবার জন্য তিনিও সচেষ্ট আছেন। Sainte Beuve বলিতেছেন—

The gentle refined critical faculty is an active faculty. When nothing is to be rendered, nothing is felt or perceived. Taste and easily awakened sensibility suppose much imagination behind."

তাঁহার গতিবিধিতে নৃত্যচঞ্চল নূপুরমণ্ডিত মরাল-পদবিক্ষেপের রুণুঝুণু হয় ত নাই, কিন্তু যে গতি-ভঙ্গিমায় সত্যপথচারী শ্রেয়ের সন্ধানে যাত্রা করে তাহার সৌম্য ও সবল অঙ্গ-সঞ্চালন আছে। সমালো-চনার বর্ত্তমান স্বরূপ সম্বন্ধে এরূপ ধারণা, সম্ভবতঃ অন্ধকার-বহুল মাদৃশের মস্তিষ্ক-গহ্বরেই যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা নহে। নিপুণ সমালোচক Hudson বলিতেছেন—

"True criticism also draws its matter and inspiration from life and in its own way it likewise is creative"—এবং ইহাই আমার মূল কথা।

শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য।

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূজার আয়োজন করিয়া নিয়া পাণ্ডার ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইল, কারণ সেই দিনই পূজা দিতে হইবে একথা তাহার জানা ছিল না—যদিও পূজার উপকরণ ফুল বিল্বপত্র নৈবেদ্যের সামগ্রীসম্ভার সমস্তই সেইখানেই পাওয়া যায়। বলির পশু সংগ্রহ করিতেও কোন কষ্ট নাই তথাপি সমস্ত গুছাইয়া আনিতে কিছু বিলম্ব হইবারই কথা; তদুপরি যদি প্রত্যেক পদার্থের মূল্যের উপর পাণ্ডামহাশয়ের একটা 'চৌথ' বসাইবার ইচ্ছা থাকে, তবে সস্তাগণ্ডা যেখানে মেলে, সেই সব দোকানে দোকানে ঘুরিতে হয়, তাহাতেও সময় দরকার। পূজায় কি চাই না-চাই, তাহা আমার জানা ছিল না সুতরাং পাণ্ডা যাহা আনিল আমাকে তাহাই ঠিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইল—দেখিলাম পুষ্প, পত্র, ফল, নৈবেদ্য, মিষ্টান্ন, সিন্দূর, শঙ্খ, লৌহবলয়, অলক্তক—কিছুরই অসদ্ভাব নাই, বলির পশুও নানাবিধ সংগৃহীত হইয়াছে—ছাগ, মেষ, পারাবত, হংস, কচ্ছপ প্রভৃতি। মহিষ ছিল না, পাণ্ডা জিজ্ঞাসা করায় আমি নিষেধ করিলাম; তাহাতে বোধ হইল, সে যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইল—মহিষের মূল্য অধিক, আমার বিশ্বাস মহিষের উপর চৌথ বেশী করিয়া বসাইবার সুবিধাটা সে হারাইয়া ক্ষুণ্ণ হইতেছে, বস্তুতঃ কথাও তাহাই। যজমানের পূজা করানই যাহাদের জীবনোপায়, জীবন ভরিয়া যাহারা এই অর্চ্চনাতেই অভ্যস্ত, মহাপীঠস্থা মহাদেবীর অলৌকিক দেবত্বে যাহাদের অক্ষুণ্ণ ও অসীম বিশ্বাস, দেবতার সেবক বলিয়া যাহারা সাধারণের নিকট হইতে ভক্তিশ্রদ্ধার দাবী-দাওয়া বিশেষরূপেই রাখিয়া থাকে এবং তাহা আদায়ও করে, যাহারা হিন্দুত্বের মহাগৌরবে নিজকে সর্ব্বদা মণ্ডিত মনে করিয়া সুখ পায় এবং গর্ব্ব করে, আশ্রয়স্বরূপ সেই দেবতারই পূজাগ্রভাগ তাহাদিগকে দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করিতে দেখিয়া তাহাদের উপরে আমার মন বড়ই বিরূপ হইয়া গেল। এই প্রথম আমার তীর্থ-দর্শন এবং এই প্রথম সূচনাতেই তীর্থ-মন্দিরের পূজারীর উপরে আমার সমগ্র অন্তর বিষম বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পরে যত তীর্থস্থানে গিয়াছি, অবস্থা সর্ব্বত্রই সমান দেখিয়াছি এবং সেই তরুণ বয়সে তীর্থ-পুরোহিতের অনাচার দর্শনের বিরক্তি আজ যমদ্বারের সন্নিহিত হইয়াও মন হইতে দূর করিতে পারি নাই, কখনও যে পারিব, এমন মনে করিবার কোন কারণ আজও পাইতেছি না। সুদীর্ঘকাল সংসারে থাকিয়া দেখিলাম, যে যাহার মন্দিরদ্বার আগ্‌লাইয়া থাকে, অসঙ্গত ও উদ্দাম প্রভুত্ব তাহারই সমধিক; উদাহরণ রাজদ্বারের ভৃত্যবর্গ, দেবদ্বারের পূজারী প্রভৃতি। যে যখন পূজার জন্য তাহার দেবতার মন্দিরের সন্নিহিত হয়, সে হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি প্রীতি প্রেম তাহার করপুটের অঞ্জলির মধ্যে সযত্নেই বহিয়া আনে; কিন্তু পরিতাপ এই, যে সকল পরিচারক পরিচারিকা দেবপ্রসাদেই পুষ্ট, তাহাদের অকারণ অসঙ্গত দৌরাত্ম্যে দেবপূজা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়; তাহাতে দেবতার ক্ষতিবৃদ্ধি নাও থাকিতে পারে, ব্যর্থমনোরথ ভক্ত কি মন লইয়া ফিরিয়া যায় সে কথা দেবতা কি ভাবেন? জানি না। ভক্তের যেমন দেবতার প্রয়োজন, দেবতারও কি তেমনি ভক্ত সেবকের প্রয়োজন নাই? হয়ত আছে—তবে আমরা জানিতে পাই না এই দুঃখ।

বলির পশুর প্রাচুর্য্য দেখিয়া আমার মনটা কেমন করিতে লাগিল। এইখানে বলিয়া রাখি, নাটোর রাজ-পরিবার কয় পুরুষ ধরিয়া বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। মহারাজ বিশ্বনাথ শাক্তমন্ত্র ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব মন্ত্র প্রথম গ্রহণ করেন; বিষ্ণুবিগ্রহ শ্যামসুন্দর গৃহদেবতা-

রূপে প্রতিষ্ঠিত সেই সময় হইতেই হইয়াছেন। বংশের আদি পুরুষের স্থাপয়িতা সর্ব্বমঙ্গলার পূজা-অর্চ্চনা যথাবিধি হইয়াছে এবং আজও হইতেছে তথাপি বিশ্বনাথের সময় হইতে শ্যামসুন্দরই নাটোর বড়তরফ রাজধানীর নিজস্ব গৃহদেবতা। এ বাড়ীতে দুর্গাপূজার সময়েও মেষ মহিষ ছাগবলি হয় না সুতরাং বলি দেখিতে আমরা অভ্যস্ত নই। বালককালে যদিও আমার জ্যেষ্ঠতাত রাজা চন্দ্রনাথ, খুল্লতাত যোগেন্দ্রনাথ আমাকে আদর করিয়া বলি দেখিতে লইয়া যাইতেন, আমি পশুর আর্ত্ত চীৎকারে, মুণ্ডহীন ছাগ মহিষের স্কন্ধ হইতে প্রস্রবণের জলধারার ন্যায় রক্তস্রোতে বড় বিপন্ন হইতাম, অনেক সময়ে আমি সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছি। আমার বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মাংস খাই নাই, মাছও ভাল করিয়া তৃপ্তির সহিত কোন দিন খাই নাই। সেই আমি—আমার সম্মুখে অতগুলি বলির পশু রজ্জুবদ্ধ দেখিয়া কি ভাবিতেছিলাম তাহা আমার পাঠক পাঠিকা অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। পাণ্ডাকে বলিলাম, "বিনা বলিতে পূজা কি হইবে না?" সে কহিল, "মহামায়ার জন্য সংগৃহীত বলির পশু ব্যর্থ হইতে পারে না, এ বলি দিতেই হইবে; বিশেষতঃ কামরূপে বলিহীন পূজা হইতে পারে না।" আমি নিরুপায় হইয়া তাহাই স্বীকার করিলাম।

মহামায়ার মন্দিরদ্বারে কাশীর মণিকর্ণিকাস্থিত চক্রতীর্থের ন্যায় একটি অনতিবৃহৎ কুণ্ড আছে; মন্দির প্রবেশের পূর্ব্বে সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া পবিত্র কৌষেয়-বাস পরিধান করিতে হয়। কুণ্ডটি ক্ষুদ্র হইলেও সেই কুণ্ডে একসঙ্গে যত কচ্ছপ দেখিয়াছি তত বোধ হয় কোন বৃহৎ নদীতেও সম্ভব হইবে না; সেই কচ্ছপ-বহুল কুণ্ডে অবগাহন করা সহজ নহে, আমি জল তুলিয়া স্নানকার্য্য শেষ করিলাম এবং যথাবিহিত সজ্জায়, পূজার দ্রব্যসম্ভার সঙ্গে লইয়া পাণ্ডাসহ মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখে বৃহৎ নাটমন্দির, তথা হইতে কয়টি সোপান আরোহণ করিয়া আবার কয়েকটি সোপান অবতরণ করিয়া মন্দিরে যাইতে হয়। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ অন্ধকার, স্থির প্রদীপ দিবানিশি জ্বলিতেছে, বাহির হইতে মন্দিরে গিয়া সে প্রদীপের সাহায্যেও ভাল করিয়া দেখা যায় না; পাণ্ডা যেখানে বসিতে বলিল সেই খানেই বসিয়া পড়িলাম। পাণ্ডা ভাবিয়াছিল, দেবীর পূজা আমি স্বয়ং করিব, কিন্তু আমার একটা ধারণা ছিল যে দীক্ষিত না হইলে দেবী পূজার অধিকার জন্মে না। আমি দীক্ষিত নহি, সুতরাং ষোড়শোপচারের পূজার বরাত আমি তীর্থ-পাণ্ডাকেই দিলাম। সে পূজা করিতে লাগিল, মহাপীঠে আমার ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে আমাকে উপদেশ দিল। অদীক্ষিতের ইষ্টমন্ত্র কি তাহা ত জানি না, ভাবিলাম উপনয়নের সময়ে আচার্য্য যে গায়ত্রীমন্ত্র কাণে দিয়াছেন, তান্ত্রিকমন্ত্রের অসদ্ভাবে ব্রাহ্মণের সেই গায়ত্রীই ইষ্টমন্ত্র; বিশেষ ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ গায়ত্রীরই সিদ্ধিমানসে কামরূপে আসিয়াছিলেন। এই কথা ভাবিয়া মহাপীঠ স্পর্শ করিয়া গায়ত্রীজপ আরম্ভ করিয়া দিলাম, যতক্ষণ পাণ্ডা পূজা করিল, আমি একাগ্রচিত্তে বসিয়া গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিলাম, পূজা সাঙ্গ হইলে আমার মন্ত্রজপও সমাধা করিলাম। এইবার বলির পালা, সে কার্য্যের ভার পাণ্ডার উপর দিয়া সে স্থল হইতে কিছু-দূরে বসিয়া উত্তর নীলাচলের নৈসর্গিক শোভা দেখিতে লাগিলাম। কামরূপ শৈল অধিক উচ্চ নহে, সেই জন্যই হয়ত সমতল ভূমির তরুলতাও এ পার্ব্বত্য ভূমিতে জন্মে; দেশের আম কাঁঠাল বেল প্রভৃতি গাছ কামরূপে অনেক আছে এবং পর্ব্বত-সুলভ বৃক্ষবল্লরীরও এখানে অভাব নাই। এই কামরূপ শৈল সমতল মর্ত্ত্যভূমি নহে এবং সু-উচ্চ স্বর্গধামও ইহাকে বলা যায় না, কারণ এখানকার শৈলশৃঙ্গ মেঘলোক ভেদ করিয়া সদর্পে ইহার শির ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরে নাই, ইহা যেন স্বর্গ-মর্ত্ত্যের সঙ্গমস্থল; মর্ত্ত্যধাম কিছু উঠিয়াছে, স্বর্গ কিছু নামিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া এই মিলন সম্পূর্ণ করিয়াছে বলিয়া আমার মনে হইল—ফলতঃ নাতিশীতোষ্ণ, বৃক্ষবল্লরী ফুল-মঞ্জরী সমন্বিত, অনতি-উচ্চ এই পার্ব্বত্য ভূমি আমার কাছে বড় রমণীয় বলিয়াই মনে হইয়াছিল।

এই খানে একটি কথা বলিয়া রাখি। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যখন দার্জ্জিলিঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করি, সেই সময়ে খরচের জন্য যে টাকা মাতাঠাকুরাণীর আদেশক্রমে অমাত্যবর্গ আমার হাতে দিয়াছিলেন, সে টাকা দার্জ্জিলিঙ্গের বায়বাহুল্যে এবং গৌহাটী পর্য্যন্ত নানা বিধ খরচে প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল। গৌহাটী হইতে যে দিন কামাখ্যাশৈলে রওনা হই, তাহার এক-দিন পূর্ব্বে রাজধানীতে তারযোগে জানাইয়াছিলাম যে, আমার কিছু টাকার আবশ্যক এবং সে টাকা শীঘ্র চাই বলিয়া তারযোগে টাকা আমার গৌহাটীর ঠিকানায় পাঠাইতে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম। যথাকালে আমার তারের সংবাদ তাঁহাদের হস্তগত না হওয়াতেই হউক বা অন্য কারণেই হউক, আমি গৌহাটী থাকা সময়ে সে টাকা পাই নাই, হাতে যাহা ছিল তাই লইয়াই কামাখ্যা রওনা হইয়াছিলাম। যে দিন প্রাতে আমি গৌহাটী ছাড়িয়াছি, সেই দিন বৈকালে টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডারে টাকা আসিয়াছে এবং যাঁহারা পাঠাইয়া-ছেন তাঁহারা পাছে টাকাটা মারা যায় এই ভয়ে আমার নাম পুরাপুরিই লিখিয়া দিয়াছিলেন অর্থাৎ কেবল আমার নাম নহে, নামের পূর্ব্বস্থ উপসর্গও তাহাতে যুক্ত ছিল।

পোষ্ট আফিসের পিয়ন খুঁজিতে খুঁজিতে আমার আশ্রয়দাতার বাড়ীতেই আসিয়া পৌছিয়াছে। যে নামে টাকা আসিয়াছিল, আমার আশ্রয়দাতা সে নাম পড়িয়া তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী যে সত্য অর্থাৎ আমি ছদ্মবেশী একটা "কেষ্ট বিষ্টু"—তাহার অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ হাতে লইয়া গৌহাটীর সখের থিয়েটারের সমগ্র বাবুসম্প্রদায়ের নিকট আধ ঘণ্টার মধ্যে সে কথা জাহির করিয়া দিয়াছিলেন এবং আমার সহিত তাঁহাদের অশিষ্ট ব্যবহারের ক্ষমা প্রার্থনার জন্য পাঁচ ছয় জন একত্র হইয়া পোষ্ট-পিয়নকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে অপর একটি সোজা পথ দিয়া কামাখ্যায় হাজির হইয়াছিলেন। আমি সমস্ত দিন পূজা অর্চ্চনার শ্রমে এবং পথশ্রান্তিতে কিছু ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে পাণ্ডার বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছি। কিঞ্চিৎ জলযোগের পর পাণ্ডার গৃহসংলগ্ন এক আম্রবৃক্ষতলে বসিয়া নিঃসঙ্গের সঙ্গী আমার বাঁশের বাঁশীটিতে ধীরে ধীরে যখন ফুঁ দিবার উদ্যোগ করিতেছি, তখন বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়া দেখি, আমার আশ্রয়দাতা এবং সঙ্গী কয়জন ভদ্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে নমস্কার করিতেছেন (যদিও তাঁহারা সকলেই আমার বয়ো-জ্যেষ্ঠ)। সঙ্গে-সঙ্গে লাল এবং নীল কাপড়ের পাগড়ি মাথায় পোষ্ট পিয়নও লম্বা সেলাম দিয়া আমায় জানাইল যে, সেও চিনিয়াছে আমি কে; সেলামের দৈর্ঘ্য দেখিয়া আমি বুঝিলাম, টাকা বহন করিয়া আনিবার পরিশ্রমের পারিতোষিকের আশাটাও তাহার মনের নিভৃত প্রদেশে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মাঝে মাঝে উঁকি মারিতেছে। আমি সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ আবার কি নূতন অভিনয়? যে নাটকের মোশান-মাষ্টারি আমি করিতেছি তাহার কোন ভূমিকাতেই ত আভূমিনত হইয়া নমস্কারের ব্যবস্থা নাই।" আমার কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন এবং পাঁচ ছয় জনে সমস্বরে বলিলেন, "আর কি ঠকি মহারাজ!" এই 'মহারাজ' সম্বোধনে আমি একেবারে কাঠ হইয়া গেলাম; ভাবিলাম—হায় রে, বহুকাল পরে যদি বা একটা মজা বহুচেষ্টায় যোগাড় হইয়াছিল, আমার নির্ব্বুদ্ধিতায় তাহা মাটি হইল—আমি তখনই বুঝিয়াছিলাম যে, টেলি-গ্রাফিক মানিঅর্ডার আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আমার আশ্রয়দাতা বাবু কহিলেন, "আমি কিন্তু প্রথম হইতেই সন্দেহ করিয়াছিলাম—সে কথা বারবার সকলকে বলিয়াছি; ইহাঁরা আমার কথা কাণে তোলেন নাই! এবার ধরিয়া ফেলিয়াছি, আর পলাইবেন কোথায়?" আমি কহিলাম, "ধরিয়াই যদি থাকেন তবে পলাইবার আমার সাধ্য হইবে কি,—আর যে সত্যসত্যই ধরিতে পারে, তার 'কাছ থেকে পালানো কি যায়?" হায় রে, তখন কি জানি যে, একদিন সকলকেই ক্ষ্যাপার মত বড় দুঃখে বলিতে হয়, "ধরা দিয়া পলাইল সকল বাঞ্ছা" এবং অবশিষ্ট জীবনকাল সেই হারান' স্পর্শমাণিকের

সন্ধানে পথে-প্রান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজকে "নির্দ্দয় লাঞ্ছনা"র মধ্যে কোন প্রকারে টানিয়া বুকভরা নিরাশা ও চক্ষুভরা জল লইয়া শেষ খেয়াঘাটের সোপানের পর সোপান অবতরণ করিতে হয় এবং এতবড় দুঃখ দেখিবার একটি লোকও বিশ্ব ভুবন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এ দুঃখ সকল দুঃখের বাড়া।

সে রাত্রে পাণ্ডার বাড়ীতে আমার আতিথ্য সকলকেই গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম। সে দিন শনিবার; পরদিন আফিস নাই, সকলেই থাকিতে রাজি হইলেন; পাণ্ডার গৃহিণী 'মহাপ্রসাদ' (মহামায়ার নিকট বলির ছাগমাংস) রন্ধনে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আগন্তুক অতিথিদিগের মধ্যে কেহ কেহ 'বামাচারী' ছিলেন, মহাপীঠে অ-'কারণ' 'মহাপ্রসাদ' গ্রহণ না করিয়া তাঁহারা কৌলিক আচার রক্ষা করিলেন; দেখিলাম পাণ্ডাটিও বীরাচারী। আমার তখনও কলেজের ঝাঁঝ যায় নাই, 'মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যম্' এই শাস্ত্রবচন তখনও যথাযথরূপে পালন করি, সুতরাং আমিই কেবল "হংস মধ্যে বকো যথা"—'পশ্বাচারী'র মত অ-'কারণ' পেট ভরিয়া 'মহাপ্রসাদ'ই গ্রহণ করিলাম এবং সেজন্য 'বীর'-দিগের নিকট গঞ্জনা শুনিতে হইল না এমন কথাও বলিতে পারি না।

বলা বাহুল্য পোষ্ট-পিয়ন বহু পূর্ব্বে টাকা দিয়া বক্‌সিস্ নিয়া চলিয়া গিয়াছে—যাইবার সময়ে সেলামের দৈর্ঘ্য কিছু কম বলিয়া আমার অনুমান হইল, কারণ বকশিস তখন বাকী নাই—উহা আমার কল্পনাও হইতে পারে। সে রাত্রি হাস্যকৌতুকে গান-বাজনায় আহার-আচারে কাটিয়া গেল, প্রায় রাত্রি দুইটার সময়ে সকলে শয়ন করিলাম। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়াই দেখি, টেলিগ্রাফের পিয়ন আর একখানি হরিদ্রাবর্ণ লেফাফা হাতে আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। তাড়াতাড়ি 'তার' খুলিয়া দেখি গৃহের 'তার'; একটি দুঃসংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে এবং তাহার মধ্যে, সংবাদ পাওয়া মাত্র আমি গৃহে ফিরি এইরূপ মাতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ অথবা আজ্ঞা প্রচার হইয়াছে। মন বড় বিষণ্ণ হইল, দুঃসংবাদের জন্যও বটে এবং মহাপীঠে যে শারদীয়া পূজা দেখিবার ইচ্ছা ছিল তাহার ব্যাঘাত হইল সে জন্যও বটে, কিন্তু কি করি, উপায়রহিত; সেইদিনই আমাকে যাইতে হইবে। আমার পূর্ব্ব-মুনিবসঙ্ঘ—বর্ত্তমানের বন্ধুবর্গকে আমার দুরবস্থার কথা জানাইলাম, তাঁহারা সকলেই আমার সহিত সমদুঃখী হইলেন এবং বর্ত্তমানক্ষেত্রে আমার থাকা উচিত নহে এই মতই সকলে দিলেন। নবীনকে জিজ্ঞাসা করিলাম; সে কহিল, "নিশ্চয় যাইতে হইবে। এত বড় দুঃসংবাদ পাইয়া কেহ বিদেশে থাকে? আমি বলি, আমরা আজই রওনা হই।" হায় রে, যে নিঃসঙ্গ গৃহের কর্ম্মহীন জীবনের গুরুভার বহন করিয়া বহুদিন পীড়া ভোগ করিতে হইয়াছে, নানারূপ চেষ্টায় যে গৃহের গণ্ডীর বাহিরে কোন মতে আসিয়াছিলাম, সেই নিরানন্দ গৃহে আবার আমাকে ফিরিতে হইবে সে ভাবনা যে আমার কত বড় দুর্ভাবনা, তাহা বেচারা নবীন কি বুঝিবে এবং তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াই বা কি লাভ? সে সময়ে আমি সদ্য কলেজ-ফেরতা, বড় বড় দেশী বিদেশী গ্রন্থকর্ত্তাদিগের বড় বড় গ্রন্থের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বড় বড় উপদেশ সদ্য মনে করিয়া রাখিয়াছি; ভাবিয়া বসিয়া আছি, এই মানব-জীবন কেবল কর্ত্তব্যেরই সমষ্টি, ইহসংসার—নর-নারীর কাছে কেবল শুষ্ক কর্ত্তব্য পরিপালনেরই জন্য, এবং সংসারের পাঁচজনে বাহির হইতে আমার যে কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া দিয়াছে, উহাই আমার অবশ্যকরণীয় বলিয়া দুই হাতে তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিতে হইবে এবং সেই কর্ত্তব্য করিয়া গেলেই আমার ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্বর্গই লাভ হইবে। তখনও আমার এ ধারণা জন্মে নাই যে, একের প্রতি কর্ত্তব্য বলিয়া যাহার অনুষ্ঠান আমরা করিতে বাধ্য হই, অপরের প্রতি তাহাই অন্যায় এবং অকারণ অত্যাচার হইয়া দাঁড়ায় এবং আজ যাহা কর্ত্তব্য, কাল তাহা কর্ত্তব্য নহে। তখনও এ জ্ঞান হয় নাই যে, Ethics যাহাকে "প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধন" বলিয়া বড় গলায় চীৎকার করিয়া জাহির করিয়াছে, সে নীতি কেবল আবহমানকাল দুর্ব্বলের জন্যই রচিত,

সবল তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করে না—এ ধারণা তখনও জন্মে নাই যে, যাহাকে "প্রচুরতম মানুষ" বলিতেছি তাহার হিসাব মাথা গণনায় নহে ; সে হিসাব আমাদের অন্তরের মধ্যে ; বাহিরের গণনার সংখ্যায় যে এক, আমাদের অন্তরের মধ্যে সে সকল গণনা, সকল সংখ্যার অতীত এবং সেই অন্তরের 'একে'র প্রতি কর্ত্তব্য যদি নির্ব্বাহ করিয়া যাইতে পারি, তাহাকে যদি সুখী ও তৃপ্ত করিতে পারি, সকল কর্ত্তব্যের সেইখানেই আনন্দময় অবসান হইবে, নতুবা আজীবন যাহা করিলাম তাহাতে না আছে আমার আনন্দ, না হইল 'প্রচুরতমের প্রভূততম হিতসাধন'। শুধু তাহাই নহে, বৈতরণী-পারের দিনে সমস্ত কর্ত্তব্যের হিসাব নিকাশ যদি লইতে বসি, তখন দেখিব কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছিলাম, তাহা স্বার্থপর সবলের জবরদস্তি এবং সেই জবরদস্তিতে কেবল আমি মরিয়াছি তাহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে এমন কাহাকেও অকারণে মারিয়াছি, যে নির্ম্মম অবিচারের অনুশোচনা রাখিবার স্থান বিশ্বভুবনে খুঁজিয়া মেলে না।

সেই "প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম হিতসাধনের"ও একটা উদ্দেশ্য রহিয়াছে ; বিনা উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে কিছুই হয় না, কেহ কিছু করিতেও চাহে না। আমার জীবনযাত্রার দিনগুলি অপার সুখ ও অবাধ আনন্দের মধ্যে অতিবাহিত করিবার কোন বাধাবিঘ্ন উপস্থিত না হয়, সেই জন্যই 'প্রচুরতম মানুষে'র সুখসাধননীতির সৃজন হইয়াছে। আমার বাটীর শবদাহ করিতে অপরের সাহায্য প্রয়োজন হইবে বলিয়াই আমি অপরের মড়ার খাটে কাঁধ দিতে অগ্রসর হই—নতুবা 'প্রচুরতম মানুষ' আমার কে ? সেই আমিই যদি মরিলাম এবং যে আমার 'প্রচুরতমের' বাড়া, যে আমার সর্ব্বস্বেরও অধিক, তাহাকেও যদি মারিলাম, তবে স্বার্থপর সবলের রচিত শুষ্ক প্রচুরতম নীতির বোঝা ঘাড়ে করিয়া কণ্টকাকীর্ণ মরুবালুকার মধ্য দিয়া চিরজীবন ধরিয়া চলিবার আমার সার্থকতা কি ? নিজে সুস্থ থাকিলে অপরের স্বাস্থ্যের ভাবনা ভাবিবার আমার সময় হয়, নতুবা স্বয়ং চিতাচুল্লীর মধ্যে বসিয়া অপরের—প্রচুরতমের নিদাঘতাপ-নিবারণার্থ চন্দনপঙ্ক প্রস্তুত কে করে ; তাহা ত জানি না।

বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া যখন সাব্যস্তই হইল, Time Table খুঁজিয়া দেখিলাম, সে দিন আর গৌহাটীতে ষ্টীমার পাইব না। পরদিন প্রত্যুষে ষ্টীমার ছাড়িবে। আমি তাড়াতাড়ি স্নানাদি ক্রিয়া শেষ করিয়া ভুবনেশ্বরীর মন্দির দর্শনে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম; গৌহাটীর বন্ধুবর্গ সে দিনটা আমার সঙ্গে থাকিবেন এই স্থির করিয়া তাঁহারাও প্রস্তুত হইলেন ; পাণ্ডা মহাশয় ত সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন। এ জাতি কখনই এবং কিছুতেই "অপ্রস্তুত" নহে।

উত্তর নীলাচলের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে ভুবনেশ্বরীর মন্দির ; যেখানে পাণ্ডার বাড়ী, সেখান হইতে সমস্তটা পথ চড়াই চড়িতে হয়। বয়স তখন বিংশতি বর্ষ, রোগের তাড়না যাহা ছিল তাহা কাটিয়া গিয়াছে, দেশভ্রমণে নানা স্থানের নানা দৃশ্য দেখিয়া মন প্রফুল্ল, এমন অবস্থায় কোন শ্রমকেই শ্রম বলিয়া আমার মনে হইল না; বিশেষ দার্জ্জিলিঙ্গ-পাহাড়ে যত চড়াই চড়িয়া আসিয়াছি, তাহার নিকট নীলাচলের শৃঙ্গে আরোহণ আমার নিকট শিশুর ক্রীড়া; সকলে একত্র হইয়া চলিয়াছি, কামাখ্যা-মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া যখন অগ্রসর হইতেছি তখন তীর্থবাসিনী কুমারীর দল আমাদিগকে আক্রমণ করিল। জানি না পাণ্ডা মহাশয় কোনও ইঙ্গিত করিয়াছিলেন কি না! কুমারীর দল আমার সঙ্গীদিগকে বিশেষ উৎপীড়ন না করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে নিরীহ আমাকেই আসিয়া ঘেরিয়া ফেলিল। পাণ্ডার ইঙ্গিতের কথা বলিতেছি, কেননা কুমারীদিগের মধ্যে সকলের বড় যে, তাহার বয়স উর্দ্ধ সংখ্যা বার হইবে, কেহ বলিয়া না দিলে সকলের মধ্যে আমিই যে বিশেষ করিয়া তীর্থ করিতে বাহির হইয়াছি, এ কথা সেই শিশুর দল কেমন করিয়া জানিবে ? এবং বলিয়া যদি কেহ দিয়া থাকে তবে ঐ পাণ্ডাই বলিয়াছে এবং তাহারই বলা স্বাভাবিক—কারণ একই শৈলনিবাসে তাহাদের বাস ; সে যজমানের নিকট দান দক্ষিণা পাইয়া

যাইবে আর পার্ব্বতীর দল রিক্ত হস্তে ফিরিবে এই বা কোন কথা! আর তাহা হইলে পাণ্ডা মহাশয়ের পঞ্চায়তের হস্তে নিগ্রহের পার থাকিবে না সে ভয় তিনি রাখেন।

আমার দুইখানি হস্ত বার হইতে চারি বৎসর বয়সের প্রায় পঞ্চাশটি বালিকা ধরিয়া বসিল এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে আর বলে,"মহামায়া তোর মঙ্গল করিবে,বাবা কিছু দে।" আসামীয়া শিশুর মুখে আধ-আধ বাংলা কথা যাহারা না শুনিয়াছে, তাহারা বুঝিবে না কুমারীর দল কি মধুমাখা প্রার্থনাবাণীতে আমার কাণ প্রাণ জুড়াইয়া দিতেছিল। অনুত্তীর্ণ শৈশবা, কুসুমপেলবা পর্ব্বতকুমারী পার্ব্বতীর দল সঙ্গে লইয়া চলিয়াছি, দান যাহা দিব তাহা দিতে ইচ্ছাপূর্ব্বকই বিলম্ব করিতেছিলাম, কারণ দান গ্রহণ করিয়া সফলকামা কুমারীর দল চলিয়া যাইবে; আমার জন্মান্তরের কোন পুণ্যফলে জানি না, যদি এই স্বর্গের আনন্দ আসিয়া ক্ষণেকের তরে আমার চারিদিক বেষ্টন করিয়াছে, ইহাকে যতক্ষণ পারি নিকটে রাখিয়া দিই। আমি নানা প্রকারের প্রশ্ন করিতে করিতে এবং তাহার উত্তর শুনিতে শুনিতে স্বার্থপর হইয়া চলিয়াছি, পুষ্পসুকুমার পর্ব্বত-দুহিতা-দিগের চড়াই চড়িবার ক্লেশের কথা আমার মনেই আসে নাই। কিছু দূর গিয়া একটি পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকা আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আর পারি না, তুই এখানেই দে বাবা।" আহা, সে কথা কয়টি কি মিষ্টই লাগিয়াছিল, তাহা আজ বুঝাইতে পারিতেছি না। আমি দাঁড়াইলাম, সেই বালিকাটিকে কোলে তুলিয়া নিলাম, তাহার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়াছিল, নিজের উত্তরীয় বস্ত্রে তাহা মুছাইয়া লইলাম, সে আমার ক্রোড় হইতে নামিতে চাহিলেও অনেকক্ষণ তাহাকে কোলে করিয়া রহিলাম। এইখানে বলিয়া রাখি যে, বাড়ী হইতে একটি শিশুরই মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিবার সংবাদে আমাকে সত্বর গৃহে ফিরিতে হইতেছিল—যে রোগে সে শিশু শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, আমি জানিতাম তাহা আরোগ্যের অতীত—এমন সময়ে এই বালিকা-দলে পরিবেষ্টিত হইয়া আমার মনের মধ্যে কেমন করিতেছিল তাহা আমার পাঠকপাঠিকাগণের বুঝিতে বিলম্ব না হইবারই কথা। পরের জিনিষকে শত বন্ধনে আঁকড়াইয়া ধরিলেও বহুক্ষণ ধরিয়া রাখিবার আমাদের সাধ্য নাই—'পর' এবং 'অপর' এই আখ্যা শোণিত-সম্বন্ধের অনুপাতে সংসার দিয়া থাকে, হৃদয়ের অনুপাতে নহে। সুতরাং যে বালিকাকে কোলে করিয়াছিলাম তাহাকে নামাইয়া দিতেই হইল। কুমারী-বিদায়ের দ্রব্যসম্ভার আমার সঙ্গেই ছিল, উহা ঐ তীর্থের একতম কৃত্য, সুতরাং পূর্ব্বদিবসই তাহার অনুষ্ঠান শেষ করিয়া রাখিয়াছিলাম; পাণ্ডা আমার নিদেশমত প্রত্যেক কুমারীকে একখানি বস্ত্র, একটি টাকা, একজোড়া শাঁখা এবং কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন বাঁটিয়া দিল; মহা আনন্দে বালিকার দল ফিরিয়া চলিল ও আমার চতুর্দ্দিকে যে আনন্দ-বেষ্টনটি তাহারা রচনা করিয়াছিল, তাহা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইয়া গেল। বারম্বার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতেছিলাম তাহারা কতদূরে গেল—কিছুকাল পরে তাহারা আমার নয়নান্তরালে গেল বটে কিন্তু সে দিনের সে স্মৃতি আজও আমার মনের অন্তরালে যায় নাই। কিছুকাল পরে সু উচ্চ শৈলশৃঙ্গস্থিত ভুবনেশ্বরীর নির্জ্জন মন্দিরের সোপান-মূলে গিয়া দাঁড়াইলাম। কামরূপ শৈলের অপরাপর স্থান জনপূর্ণ কিন্তু এই ভুবনেশ্বরীর মন্দির একান্তে এবং শৈলচূড়ায় বলিয়া অধিক জনসমাগম এখানে নাই—ইহাকে যেন হরপার্ব্বতীর নিভৃত নিলয় বলিয়া দর্শকের মনে হয়। প্রাতে পূজা, দ্বিপ্রহরে ভোগ এবং সন্ধ্যায় আরতি করিয়া পুরোহিত চলিয়া যায়। জনসাধারণের বিশ্বাস—রজনীর অন্ধকারে শিবানী এই মন্দিরপ্রহরায় ডাকিনী যোগিনী প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গিনীগণকে নিয়োগ করেন। এ কথার সত্যা-সত্য বিশ্বাসী হিন্দু ভক্তগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

কাশীবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লোকনাথ শাস্ত্রী নাটোর রাজধানীতে বহুদিন হইতে পরিচিত; তিনি নবদ্বীপের ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন এবং

পাঠের অবসরে শান্তি স্বস্ত্যয়ন উপলক্ষ্যে রাজধানী যাইতেন—তিনি আজও জীবিত আছেন এবং মহানগরী কলিকাতায় জ্যোতিষ শাস্ত্রের ব্যবসায় করেন—রাজধানীর সহিত তাঁহার সংস্রব আজও অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে। আমি তাঁহারই নিকট শুনিয়াছিলাম, তাঁহার ইষ্টদেবতা (কর্ণধার গুরু) সংসার ত্যাগ করিয়া স্বীয় পারলৌকিক মঙ্গলার্থ এই ভুবনেশ্বরীর নির্জ্জন প্রাঙ্গণস্থ বিল্ববৃক্ষমূলে আসন পাতিয়া বসিয়াছেন এবং শুনিয়াছিলাম তিনি তপোমাহাত্ম্যে বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ ও তত্ত্বদর্শী। ইহাঁকে দর্শন করিবার ইচ্ছা বহুকাল হইতেই আমার ছিল, গৌহাটী আসিয়া সে ইচ্ছা আমার দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছিল—আজ বহুদিনের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে ভাবিয়া আমি আনন্দিত হইতেছিলাম একথা বলা বাহুল্য। সোপান আরোহণ করিয়া মন্দিরাঙ্গনে গিয়া দাঁড়াইলাম, মহামায়ার বিগ্রহ-সন্নিধানে ভক্তিভরে প্রণত হইলাম, পাণ্ডাকে পূজা দিতে বলিয়া আমি সেই সন্ন্যাসীর উদ্দেশে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। বিল্ববৃক্ষতলে দৃষ্টি পড়িবামাত্র দেখিলাম—দীর্ঘাকৃতি,শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট, শীর্ণকায়, দীপ্তচক্ষু, প্রসন্নবদন মহাপুরুষ আমারই মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেছেন! সে হাস্যের স্নিগ্ধ জ্যোতি প্রাঙ্গণ আলো করিয়াছে এবং আমার সমস্ত দেহমন ইন্দ্রিয়-আত্মাকে যেন সাদরে তাঁহার সন্নিহিত হইবার জন্য আনন্দ-আহ্বান করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে কোন ঋষিতপস্বী মহাপুরুষকে দেখি নাই; এই আমার প্রথম এবং এই প্রথম দর্শনই আমার শ্রেষ্ঠতম দর্শন; পরে আরও অনেক স্থানে অনেক দেখিয়াছি কিন্তু এমনটি আমি আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। নিকটে গেলাম, একান্ত ভক্তিভরে তাঁহার চরণারবিন্দে প্রণত হইলাম, তিনি বাহু বিস্তার করিয়া আমাকে আলিঙ্গনের মধ্যে অনেকক্ষণ জড়াইয়া ধরিয়া রাখিলেন। যখন ছাড়িয়া দিলেন, আমি আমার ভক্তিপরিপ্লুত দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর স্থাপিত করিতেই দেখিতে পাইলাম, তাঁহার প্রসন্ন নয়নদ্বয় করুণায় ভরিয়া গিয়াছে এবং সেই সকরুণ নয়নপ্রান্ত হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী অপরিচিত নিতান্ত অকিঞ্চনকে বক্ষেই বা কেন জড়াইয়া ধরিলেন এবং তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রুই বা কেন গড়ায় কিছুই বুঝিলাম না, প্রশ্ন করিতেও পারিলাম না। আমি অভিভূতের মত বসিয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ পরে তিনি নিজেই বলিলেন, "বাবা, বহুকাল পরে জানি না কেন আজ তোমায় দেখিয়া আমার সংসারীর মত মনোবৃত্তি জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে—মহামায়া জানেন ইহার কি উদ্দেশ্য। মনে মনে অনেক সময়ে তুমি আমার বিষয় কল্পনা করিয়াছ, সে সমস্তই আমি মন দিয়া জানিতে পারিয়াছি—আশ্চর্য্য হইও না,উহা জানা যায়; ভাল করিয়া অন্তর দিয়া ভাবিতে পারিলে, অন্তর সে ভাবনা জানিতে পারে,বাবা ; ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, একই পদার্থে যে বিশ্বের জল স্থল অন্তরীক্ষ সবই পরিব্যাপ্ত তাহা কি জান না? জানিবে বাবা সবই জানিবে, নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে যখন এ সংসারের সুখদুঃখের আঘাত পরিপাক করিতে থাকিবে তখন অনেক অভিজ্ঞতা তোমারও জন্মিবে তাহা আমি জানি, কারণ বিশ্বের নিয়মই এই।" এই বলিয়া ক্ষণকালের জন্য মহাপুরুষ নীরব হইলেন; সেই অবসরে আমি করযোড়ে বলিলাম, "লোকনাথ পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি, আপনি ত্রিকালজ্ঞ,—আমার কতকগুলি প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে, যদি সেগুলি বলিয়া দিতেন তাহা হইলে চলিবার একটা পথ পাইতাম।" তিনি কহিলেন,"ভবিষ্যৎ জানিতে চাও ত? কিন্তু ভবিষ্যৎ কি কেহ বলিতে পারে, পাগল!" আমি কহিলাম, "আপনি সমস্তই পারেন, আমাকে দয়া করিয়া বলিতেই হইবে; এবং আমাকে দেখিয়া আপনি অশ্রু বিসর্জ্জন কেন করিলেন সে কথা জানিতে পারিলে কৃতার্থ হইব।" তিনি কহিলেন, "ভবিষ্যৎ কেহ বলিতে পারে না এবং পারিলেও বলা উচিত নহে বাবা, সে সব কথা শুনিতে চেষ্টা করিও না। পৃথিবীতে সুখ অধিক; কি দুঃখ অধিক বলা যায় না, বোধ করি দুঃখই অধিক, দার্শনিকদিগেরও অভিপ্রায় তাহাই, সুতরাং তোমার কেন,

সকলেরই দুঃখই অধিক হইবে এইমাত্র বলিতে পারি, আর কিছু আমি বলিতে পারিব না।" আমি বলিলাম; "আপনার নয়নে অশ্রু বহিল কেন, সে কথাটা বলিবেন না কি?" সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, "তুমি বড় ছেলে মানুষ; আমি ভাবিয়াছিলাম, কলেজে পড়িয়া পণ্ডিত হইয়াছ, কিন্তু এখন দেখিতেছি, তুমি নিতান্তই বালক রহিয়া গিয়াছ; বয়স যাইবে কোথায়? শুন, কেন চক্ষু দিয়া জল পড়িয়াছিল তাহার কারণ বলিতেছি। তোমার মত আমিও একদিন সংসার করিয়াছি, উহার সুখদুঃখ সবই জানি; সেই জন্য যখন দেখিলাম, তরুণ দেহমন লইয়া,অন্তরের মধ্যে অপরিসীম আশা আকাঙ্ক্ষার ভার বহিয়া তুমি সংসারের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছ; এই আরম্ভের অবসান কোথায় এই কথা মনে হইয়া আমার হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল; ইহা অপেক্ষা অধিক আমি কিছু তোমাকে বলিতে পারিব না বাবা, আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিওনা।" যে ভাবে তিনি এই কথাগুলি বলিলেন, তাহাতে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেও আর কোন প্রশ্ন করিতে আমার সাহস হইল না। বেলা অধিক হইতে লাগিল দেখিয়া আমি উঠিবার মনস্থ করিতেছি, এমন সময় তিনি পুনরায় বলিলেন, "হাঁ বাবা, বেলা অধিক হইতেছে বই কি, তোমাকে আজই আবার কামরূপ ত্যাগ করিতে হইবে কেমন? তুমি এখন যাও। তোমার প্রথম বেলার উদ্যোগ অনুষ্ঠান তুমি নিজেই কোন মতে করিয়া লইবে তাহা জানি। মহামায়া তোমার শেষের দিকটা দেখিতে কাহারও উপর ভার যেন দেন—তোমায় এই আশীর্ব্বাদ করিলাম বাবা।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী নীরব হইলেন, শুধু নীরব নহে, আমার মনে হইল যেন ধ্যানস্থ বা সমাধিস্থ হইলেন, নীরব নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিলেন, যেন শ্বাসও চলিতেছেনা এমনিই বোধ হইল। আমি আরও কিছুকাল দাঁড়াইব ভাবিতেছি, এমন সময়ে তিনি হস্তের ইঙ্গিতে যাইবার আজ্ঞাই পুনঃ প্রচার করিলেন; আমি দূর হইতে ভূমিষ্ঠ প্রণিপাত করিয়া বিদায় হইলাম। যেটুকু ভবিষ্যতের আভাস সন্ন্যাসী আমাকে দিয়াছিলেন তাহার অর্থ আমি চিরদিনই বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু সে চেষ্টা করিয়া কি হইবে? আজও ত বুঝিলাম না যে, আমাদের সুখ দুঃখ ইহসংসারে নিজে গঠন করিয়া লইতে হয় কিম্বা যাহা গঠিত হইয়াছে, তাহাই অঙ্গীকার করিতে হয়; কবি বলিয়াছেন :—

"That moving finger writes; and having writ
Moves on; nor all thy piety nor wit
Shall lure it back to cancel half a line,
Nor all thy tears wash out a word of it."

এই কথাই কি সত্য? বিশ্বনিয়ন্তা সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ষষ্ঠীজাগরবাসরে মানবমানবীর ললাটফলকে অখণ্ডনীয় অদৃষ্টলিপি লিখিতেই সতত ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন, এই বিশ্বাসে কি আমাদের সমস্ত সুখদুঃখের জবাবদিহি, বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়ের অগোচর যিনি, তাঁহারই স্কন্ধে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকিব? চতুর্দ্দিকস্থ উচ্ছ্বসিত কর্ম্মপারাবারের উদ্বেল তরঙ্গে প্রতিনিয়ত আন্দোলিত হইয়া আমরা কি এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি? জানি না, সত্য কি এবং কোথায়!

শেষের দিনের জন্য মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া বাসায় ফিরিলাম। আমি যখন সন্ন্যাসীর সহিত কথাবার্ত্তায় মগ্ন ছিলাম, সেই সময়ে পাণ্ডা এবং আমার গৌহাটীর বন্ধুগণ বাসায় ফিরিয়াছিলেন। বাসায় ফিরিয়া "সুফল" লইবার পালা—বহু কষ্টে পাণ্ডা মহাশয়ের নিকট হইতে 'সুফল' আদায় করিলাম। মহামায়ার মন্দিরসম্মুখস্থ কুণ্ডে কচ্ছপের ভয়ে স্নানার্থ নামিতে আমার সাহস হয় নাই,—পাণ্ডার দন্ত কচ্ছপের দন্ত অপেক্ষা কম তীক্ষ্ণ বলিয়া মনে হইল না। আহারের পালা শেষ করিয়া অপরাহ্ণে গৌহাটী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। যে পথে নামিয়া আসিতে হয় তাহা বক্র বিসর্পিত পার্ব্বত্য পথের ন্যায় সুগম নহে, এবং পথমধ্যে ইতস্ততঃ যে সকল প্রস্তরখণ্ড যথেচ্ছ পড়িয়া আছে, তাহা সোপানের ন্যায় পরম্পরা স্থাপিতও নহে; উহাদের সাহায্যে অবতরণ এক 'মহামারী' ব্যাপার; প্রতিপদক্ষেপেই পদস্খলনের সম্ভাবনা এবং পর্ব্বত-গাত্রে পদ-

স্খলনের পূর্ণ ফল কি, তাহা অনুমান করাও কঠিন নহে। এহেন সঙ্কটের মধ্যে সাবধান পদক্ষেপে ধীরে অবতরণ করিয়া গৌহাটীর সমতলক্ষেত্র পাইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল।

কিছুকাল বিশ্রামের পর বন্ধুসহ সখের থিয়েটারের রিহার্শেল-ঘরে গেলাম—সেখানে আরও অনেকে সমবেত হইয়াছিলেন—আমার খাঁটি পরিচয় রাষ্ট্র হওয়ায় থিয়েটারের দল ছাড়া স্থানীয় আরও অনেক ভদ্রসন্তান আমার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিবার জন্য সেই খানেই আসিয়া জুটিলেন। নানা কথাবার্ত্তায় রহস্যালাপে গান বাজনায় রাত্রি প্রায় এগারটা হইয়া গেল এবং আমি আমার আশ্রয়দাতা এবং আরও পাঁচ ছয় জন সখের থিয়েটারের বাবুর সহিত একত্রে আমাদের বাসায় ফিরিলাম। আমার বাক্স পেটরা কুলির মাথায় দিয়া নবীনের সঙ্গে ষ্টীমার ঘাটে পাঠান হইল; আহারান্তে আমি গিয়া ক্যাবিনে শয়ন করিয়া থাকিব এই ব্যবস্থা ছিল কারণ ষ্টীমার গৌহাটী হইতে রাত্রি সাড়ে চারিটার সময়ে খুলিয়া যায়। তত ভোরে উঠিয়া ষ্টীমার ধরা বিড়ম্বনা। সকলে একত্রে আহার করিতে বসিলাম। বাটীর গৃহিণী আসিয়া স্বয়ং পরিবেশন করিলেন এবং অনতিদূরে বসিয়া, আমার আহার তৃপ্তিপূর্ব্বক হইতেছে কিনা, তাহারই তদারক করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে "পাক কেমন হইয়াছে, ব্যঞ্জনাদি খাইবার মত হইয়াছে কি" এইরূপ নানা প্রশ্ন আমাকে করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "যদিও জানি, ভাল হইয়াছে বলিলে মনে করিবেন, আমি ভদ্রতা করিয়া ওকথা বলিলাম, তথাপি সত্যের খাতিরে আমাকে বলিতেই হইতেছে যে, এমন আহার আমি অনেক দিন করি নাই।" কথা শুনিয়া গৃহিণী বলিলেন, "আপনার তৃপ্তি বিধান করিতে পারি, এমন খাদ্য যোগাইবার আমাদের সাধ্য কি আছে? দয়া করিয়া আমাদের ঘরে আপনার মত মানুষের পায়ের ধূলা দিয়াছেন, ইহাই আমাদের সৌভাগ্য।" এরূপ কথা শুনিলে বড় বিপন্ন হইয়া পড়িতে হয়, সহসা উত্তর যোগাইয়া আইসে না—একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম, "নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা আমার বন্ধু আমার যে পরিচয় আপনাদের নিকট দিয়াছেন, তাহা সহসা বিশ্বাস করিবেন না, কারণ জানেন ত, আমরা থিয়েটারের দল, থিয়েটারে অনেক রকম সাজিতে হয় তাহার মধ্যে রাজাও একটা সাজা এবং বিশ্বাস করিবেন যে, রাজাও মানুষ; তাহাদেরও অভাব অভিযোগ এবং তৃপ্তি সাধারণ মানুষেরই মত—কোন পার্থক্য কোথাও নাই।" বন্ধুগণ সকলেই হাসিয়া উঠিলেন কিন্তু গৃহিণী-মাতা সে কথার বা হাসির প্রতি লক্ষ্যমাত্র না করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রাজা কোন দিন চক্ষু দিয়া দেখি নাই, আপনার মত অতিথির সম্মান কেমন করিয়া রক্ষা করিতে হয় আমরা তাহা জানি না; সামান্য দরিদ্র গৃহস্থ আমরা, দুঃখের মধ্যে আমাদের দিনপাত হয়—ত্রুটি অপরাধ যথেষ্টই হইয়াছে, নিজ দয়াগুণে মার্জ্জনা করিবেন—সেবার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমাদের বাড়ী আসিয়া প্রথম প্রথম দুই এক বেলা যে আপনি রাঁধিয়া খাইয়াছেন, সে লজ্জা রাখিবার আমার স্থান নাই।" আমি কহিলাম, "আরও কয়দিন এখানে থাকিয়া আপনাকে দিয়া রাঁধাইয়া আপনার সে দুঃখ ও লজ্জা আমি নিবারণ করিয়া যাইতাম। কিন্তু উপায় নাই, আজই আমাকে যাইতে হইবে। যদি কখনও এদিকে আবার আসি, সে সময়ে আর আপনার কোন দুঃখ রাখিয়া যাইব না।" আহার শেষ হইল, বন্ধুপত্নী গলায় আঁচল দিয়া আমার পায়ের গোড়ায় প্রণাম রাখিতে আসিতেছিলেন, আমি পূর্ব্বেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তিনি ভূমিষ্ঠ হইতেই আমার বন্ধুকে আমি জোর করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড় করিয়া রাখিলাম—গিন্নিমা মাথা তুলিতেই দেখিলেন, আমার পরিবর্ত্তে তাঁহার স্বামীই সে প্রণাম নিঃশব্দে গ্রহণ করিতেছেন। তিনি হাসিয়া কহিলেন, "কি মানুষ বাবা, এমন মানুষ বিশ্ববাঙ্গালায় আর একটি দেখি নাই" এই বলিয়া তিনি তথা হইতে দ্রুত অন্তর্দ্ধান করিলেন। ইহার পরে বিদায় লইবার পালা—আমি সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া রাত্রি প্রায় দুইটার সময়ে ষ্টীমার ঘাটের উদ্দেশে রওনা হইলাম; বন্ধুগণ সঙ্গে সঙ্গেই

চলিলেন—তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন, সে রাত্রি আমার সঙ্গে ষ্টীমারে কাটাইয়া প্রত্যূষে যখন ষ্টীমার খুলিবে সেই সময়ে বিদায় হইবেন। আমি তাহাতে নানারূপ আপত্তি করিয়াও তাঁহাদের সে সঙ্কল্প নষ্ট করিতে পারিলাম না। সমস্ত রাত্রি ষ্টীমারের ডেকে নানা কথাবার্ত্তা এবং জাগরণে কাটিল ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যখন ষ্টীমার শঙ্খরবে তাহার যাত্রার মুহূর্ত্ত সমাগত হইয়াছে জানাইল, চিরন্তন বন্ধুপ্রীতির প্রতিশ্রুতি নিয়া এবং দিয়া আমি আমার প্রবাস-সঙ্গীগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

চির-চঞ্চল জীবনস্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া অনেক দেশ দেশান্তরে গিয়াছি; যদিও আমার সেই প্রথম প্রবাসের বন্ধুজনের সঙ্গে কোথাও আর সাক্ষাৎ হয় নাই, তথাপি আমার কামরূপ প্রবাসের সেই কয়টি দিবসের আনন্দময় স্মৃতি মন হইতে আজও মুছিয়া যাইতে পারে নাই। আমার ধূমকেতুর ন্যায় জীবনব্যাপী অনির্দ্দিষ্ট নিঃসঙ্গ ভ্রমণের অনেক নির্জ্জন সন্ধ্যায় যখন বিশ্রামের স্থান খুঁজিয়া ফিরিয়াছি, তখন গৌহাটীর সঙ্গীত-প্রিয় বন্ধুগণের সঙ্গের নিমিত্ত মন কাতর হইয়া উঠে নাই এমন কথা বলিতে পারিব না।

এবার গৌহাটী হইতে অনুকূল স্রোতে ষ্টীমার চলিতে লাগিল; স্বচ্ছ নীল আকাশে একবিন্দু মেঘের সন্দেহও কোথাও নাই—পরিপূর্ণা বর্ষাতরঙ্গিণীর বক্ষস্থিত উর্ম্মিমালার উপরে বালসূর্য্য-কিরণ-সম্পাতে কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল তাহা না দেখিলে সম্যক্ উপলব্ধি করা অসম্ভব। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম উভয় পার্শ্বের ফুলপল্লববৃক্ষবল্লরীসমন্বিত নতোন্নত তটভূমি নব নব শোভা বিস্তার করিয়া সর্ব্ব প্রযত্নে আমার নয়ন মন ভুলাইবার কত চেষ্টাই যে করিতেছিল, তাহা আর কি বলিব। মনে হইতে লাগিল প্রকৃতির এই নির্জ্জন লীলানিকেতন যেন তাহার সহস্র যাদুকরী শক্তি বিস্তার করিয়া এই সঙ্গীহীন তরুণ ব্রাহ্মণ অতিথিকে আরও কিছুদিন ধরিয়া রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু চেষ্টা করিলেই কি বাঞ্ছিতকে ধরিয়া রাখা যায়? সৃষ্টির আদিম প্রভাত হইতে আজ পর্য্যন্ত বসুন্ধরার দুর্ব্বল জীব দুই হস্ত বিস্তার করিয়া অভিলষিতকে—একান্ত বাঞ্ছিতকে প্রাণপণে নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে জড়াইয়া ধরিতেছে, দুই ক্ষুদ্র দৃঢ়মুষ্টির মধ্যে আপনার জীবনসর্ব্বস্বকে লুকাইয়া রাখিতে চাহিতেছে, কিন্তু হায়—জানি না কোন দানবের অভিশাপে মুষ্টি শিথিল করিয়া প্রাণপণ আলিঙ্গনের নিবিড় বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমাদের প্রিয়তম, প্রাণতম, বাঞ্ছিততমকে আমরা বিদায় দিতে বাধ্য; সে বিদায় যে কি বিদায়, তাহা যে না দিয়াছে ও না পাইয়াছে সে জানে না এবং সেই দিন হইতে জীবনের প্রতিদিনের দিনরাত্রি বিচ্ছেদের দুর্ব্বার বহ্নিমুখে হৃৎপিণ্ডকে দগ্ধ করিয়া দুঃখদেবতার ধূপারতি কেমন করিয়া করি, তাহা কি বলা যায়? উভয় তীরের জড়প্রকৃতি যত চেষ্টাই কেন না করুন, ষ্টীমার যে জঙ্গম—সে স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে এবং তাহার আরোহীকেও নিরুপায়ভাবে ভাসাইয়া লইয়াছে—এই জড়-জঙ্গমের যুদ্ধ জীবনে আরও দেখিয়াছি; নিশ্চেষ্ট হৃদয়ের ইচ্ছার সহিত সচেষ্ট কর্ম্মোদ্যমের সঙ্ঘাত এবং ইচ্ছার অশ্রুময় পরাভবে সমগ্র জীবনযাত্রাকে ব্যর্থতার মধ্যে অবসান হইতে আরও দেখিয়াছি—আজ সে কথা থাক্।

ষ্টীমার যথাকালে ধুবড়ীর ঘাটে লাগিল; সেখানে ছোট একখানি ষ্টীমার, যাত্রী লইবার জন্য অপেক্ষায় ছিল, আমি সে খানিতে গিয়া আরোহণ করিলাম এবং জিনিষপত্র যথাস্থানে রাখিয়া একখানি ডেক-চেয়ার লইয়া ষ্টীমারের ছাদে অঙ্গ মেলিয়া দিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম, ক্ষুদ্র ষ্টীমারে নাইনিতাল আলু ছাড়া আর কিছুই নাই। প্রথম শ্রেণীর আরও তিনটি আরোহী ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে দুইটি সাহেব এবং একটি মেম। ইহাঁরা আসামের চা-বাগানের সাহেব—একটি বয়স্ক, আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ বৎসর তাঁহার বয়স হইবে, অপরটির ত্রিশ এবং তাঁহার সঙ্গিনী চব্বিশ পঁচিশ বৎসর অনুমান হইল; তবে ইংরাজমহিলার বয়স সম্বন্ধে বিংশতিবর্ষবয়স্ক ভূয়োদর্শনবিরহিত বাঙ্গালী যুবকের অনুমান সব সময়ে

হয়ত ঠিক হয় না সুতরাং মহিলাটির বয়স সম্বন্ধে আমার অনুমান যে অভ্রান্ত, একথা শপথ করিয়া বলিতে পারিব না। আমি এক সময়ে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া সেই আলুওয়ালার সন্ধানে গেলাম এবং দুইটি আলু তাহার দ্বারা সিদ্ধ করাইয়া একটুকরা কাগজে জড়াইয়া বাঁধিয়া নিলাম। সে দিন এই পরিণত বয়সের অগ্নিমান্দ্যের দিন নহে, তথাপি অন্য কোন পদার্থের অসদ্ভাবে আলুই চরমের বন্ধু মনে করিলাম। জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে, প্রলয় ঝড়ের মধ্যে ক্ষুদ্র ষ্টীমারকে বাঁচাইতেই সমস্ত শক্তি ব্যয় করিতে হইয়াছে, সারঙ্গ মহাশয় উদরস্থ বহ্নির পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া ষ্টীমারে রাখিবার সময় পান নাই। ষ্টীমারের মাঝি-মাল্লাদিগের রন্ধন চলিতেছিল, গন্ধও তাহার পাইতে-ছিলাম। অন্তরের মধ্যে আমার কি হইতেছিল তাহা অন্তর্য্যামী সে দিনে জানিয়াছেন, আজ আমার পাঠক পাঠিকা অনুমানে জানিতেছেন; কিন্তু মুখ ফুটিয়া চাহিবার শক্তি আমার হইল না, কি অনর্থক দুর্ব্বলতা! ভাল করিয়া চাহিতে না জানায় অনেক দুর্লভ পদার্থই জীবনে পাওয়া ঘটে নাই, অপক্ক লঙ্কা-বহুল ব্যঞ্জনাক্ত দুটি মোটা ভাত ত 'থোড়া বাত'। নাইনিতাল আলু দুটিকে স্বর্গচ্যুত অমৃতের মত, বহু আয়াসলব্ধ বালক হস্তগত মিষ্টান্নের মত, বিরহীর পক্ষে প্রিয়-হস্ত-লিখিত প্রেমলিপির মত তাহাকে সমস্ত সময় বুকের কাছেই লুকাইয়া রাখিতে ইচ্ছা হইতেছিল। অসহ্য ক্ষুধার সময়ে উহার সদ্ব্যবহার করা হইবে এই ভাবিয়া বাক্সের মধ্যে তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখিলাম। যাত্রাপুর ঘাটে ষ্টীমার লাগিল; আশা করিতেছি ট্রেণ প্রস্তুত রহিবে কিন্তু যতদূর দৃষ্টি যায় ট্রেণের কোন চিহ্ন কোথাও নাই! জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ট্রেণ এগার মাইল তফাতে অপেক্ষা করিবে। ব্যাপার কি অনুসন্ধান করিতেই জানিলাম, গত ঝড়ে রেলপথের সকলগুলি সেতু-বন্ধই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শুনিয়াছিলাম, সীতা উদ্ধারের পর রামচন্দ্র সাগরসেতু ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, অকারণে প্রভঞ্জন-দেবতা কেন এ সেতুবন্ধ ভাঙ্গিয়া নিরীহ বাঙ্গালীর ছেলেকে এগার মাইলের ফেরে ফেলিলেন তাহা জানি না। কর্ষিত অকর্ষিত ধান্যক্ষেত্র, নদীতীরস্থ বিদীর্ণ বালুতট, শরতের জলমগ্ন প্রান্তর পার হইয়া এগার মাইল পথ দুইখানি চরণের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া যাইতে হইবে এই কল্পনায় ব্রাহ্মণ বালকের চক্ষুর সম্মুখে সার্ষপপুষ্পের প্রাচুর্য্য দেখা দিল, —কিন্তু ভাবিয়া কি হইবে, এই বলিয়া আমার বিছানার বাণ্ডিলটি যাত্রাপুর পোষ্ট আফিসে গচ্ছিত রাখিয়া দুইটি বাক্স প্রভুভৃত্যে ভাগ করিয়া স্কন্ধে লইলাম এবং বামন গণপতি প্রভৃতিকে স্মরণ করিয়াছিলাম কি না মনে নাই—মনে মনে বায়ুদেবতার পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে করিতে যাত্রাপুর হইতে যাত্রা করিলাম।

এ যাত্রা যমমন্দিরে যাত্রা না হইলেও প্রায় তাহারই কাছাকাছি। আশ্বিনের রৌদ্র নিতান্ত ক্ষীণ ও হীনপ্রভ নহে—দীর্ঘপথ পদব্রজে চলিতে যে একান্ত অনভ্যস্ত, তাহার পক্ষে কুলির মত মোট ঘাড়ে করিয়া চলা কি ভীষণ ব্যাপার তাহা অনুমান করা কঠিন নহে, তবে সান্ত্বনা এই যে, সকলেরই সমান অবস্থা। রেলওয়ের শ্রেণীবিভাগ কেবল গাড়ীর মধ্যে, গাড়ী ছাড়িয়া যখন পথে দাঁড়াইতে হইল তখন দেখিলাম প্রথম এবং সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীর যে হাতগড়া পার্থক্য তাহা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, শ্বেত-কৃষ্ণের ব্যবধান তিরোধান করিয়াছে —উচ্চ, নীচ, মধ্য, যুবা, বালক, বৃদ্ধ আজ এই দুঃখের দিনে সব একাকার—শাড়ী গাউন ধুতি ট্রাউজার সকলেরই একদশা! চলিয়াছি, স্কন্ধে বোঝা লইয়া প্রাণপাত চেষ্টায় অফুরন্ত পথ বাহিয়া চলিয়াছি; কোথাও কর্দ্দম, কোথাও কণ্টকবন, কোথাও শস্যশূন্য কঙ্করময় কঠিন ঊষরভূমি, কোথাও জলমগ্ন প্রান্তর—গতির বিরাম নাই, তথাপি গন্তব্য স্থানের কোন চিহ্নই নয়নের সম্মুখে দেখা যায় না! সকল দুঃখ, সমস্ত বেদনারই যদি একটা সীমারেখা চক্ষুর সম্মুখে ভুল করিয়াও দেখা যায়, সেই ভুলকেই বুকে করিয়া চলা তত কঠিন হয় না। কিন্তু যেখানে দুঃখের পথ চক্ষুর সম্মুখে অফুরান্ পড়িয়া আছে, ভুল করিয়াও কোন উপায়

নাই, সেখানে ব্যথাও যে অফুরান্ হইয়া দাঁড়ায়! আজ আমার সেই দুর্দ্দশা। মাথার উপরে মার্ত্তণ্ডদেব বুঝি আমাদের মন্দগতির অপরাধে মহাক্রোধে রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া অগ্নিময় কশার প্রচণ্ড আঘাত করিতেছেন—তাঁহার কি? তাঁহাকে ত চলিতে হয় না, বরং আর সকলে তাঁহাকেই বেষ্টন করিয়া জন্মাবধি চলিতেছে এবং মরণ পর্য্যন্ত চলিবে; বরং তিনি তাঁহার উরুহীন অরুণ-সারথিটিকে একটু শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার অগ্নিরথখানি অস্তশিখরীর দিকে চালাইতে হুকুম দিলে এই তাপক্লিষ্ট নরশিশুগুলি অপেক্ষাকৃত দ্রুত চলিতে পারিত, কিন্তু দীনের দুঃখ দীনবন্ধু বুঝেন কি না জানি না, দিননাথ যে বুঝেন না, সে কথা আমি ভাল করিয়াই বুঝিলাম।

নবনীতকোমলা যবনী শ্বেতাঙ্গিনীটি সময়বিশেষে জবগামিনী কি না জানি না, কিন্তু আজ তাঁহাকে অতি-মাত্রায় উরু-নিতম্ব-ভার-মন্থরা বলিয়া আমার মনে হইল—এবং ভারতীয় শারদ সূর্য্যাস্তের শোভা যেমন করিয়াই ইহাঁর নয়ন মন অপহরণ করে তাহা করুক, কিন্তু শারদসূর্য্যের মধ্যাদিনের ক্রিয়াকলাপ যে তাঁহার তুষ্টিপ্রদ নহে, তাহা তাঁহার রাগরঞ্জিত রক্ত কপোল দেখিয়া বুঝিতে আমার তিলার্দ্ধও বিলম্ব হইল না। কেবল মাত্র এগার মাইল পথ চলিবার শ্রম নহে, তাহাতে হয় ত এতটা কাতর আমরা কেহই হইতাম না, কিন্তু বন্ধুর পথে বক্রবিসর্পিত সরীসৃপগতিতে জলকাদা ভাঙ্গিয়া মোট-মাথায় চলা কঠিন ব্যাপার। পাদুকা জোড়াটি জল কাদায় নষ্ট হইয়া যাইবে বলিয়া আমি পূর্ব্বেই তাহাকে বাক্স বন্ধ করিয়াছিলাম; আমার সাহেব সহযাত্রী দুইটি, বিশেষ করিয়া ইংরাজ মহিলাটি আমার এই "সাবধান বায়কুণ্ঠতায়" অনেক পরিহাস করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু এমন সময় আসিল, যখন সাহেবদ্বয় বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাদের পাঁচ পাঁচসের ওজনের বুট দুই জোড়া খুলিয়া তাঁহাদের চাপরাশির স্কন্ধে তাহাদিগকে ঝুলাইয়া দিলেন। আমি হাসিলাম না, কেবল নীরবে পথিক বন্ধুদ্বয়ের মুখের দিকে চাহিলাম; তাঁহারা সলজ্জভাবে বলিলেন, "You possess more sense than we do, my friend." মহিলাটি কহিলেন "I haven't taken them off yet" আমি বলিলাম "We have several miles ahead of us yet"

তিনি উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। অধিক দূর যাইতে হইল না, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই আমরা দেখিলাম—এক স্থানে প্রায় দুই রশি স্থান কাদা ভাঙ্গিয়াই যাইতে হইবে। ঘুরিয়া ফিরিয়া কোথা দিয়াও এমন পথ পাওয়া গেল না, যাহাতে কর্দ্দম পরিহার করা যাইতে পারে—সে কাদায় বুট সহিত চলা অসম্ভব। মহিলাটি আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিলেন; সে হাসির মধ্যে কৌতুক ছাড়া আর কিছুরই আভাস পাওয়া যায় না। তাঁহার কণ্ঠস্বরের মধ্যে—তাঁহার হাসির শেষের রেশটুকুর মধ্যে এমনি একটু মাধুর্য্য ছিল, যাহাতে জাতিগত, বর্ণগত, সমাজগত, ব্যবহারগত সব পার্থক্য এক নিমেষে ভুলাইয়া দিতে পারে। ইংরাজী রীতিনীতি কিছু কিছু আমার জানা ছিল—যখন বুট খুলিতে এখন তাঁহার আপত্তি নাই, এ কথা বুঝিলাম—তখন ইংরাজদ্বয় এবং আমি এক সময়েই তিন জনে সে গৌরবময় পদের প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলাম। হয়ত বাঙ্গালী বলিয়া—অন্য কোন হেতু থাকিবার কথা নহে—পাদপদ্ম হইতে বুট খুলিয়া নিবার সমস্ত গৌরবগরিমা তিনি আমাকেই দিলেন। আমি যে সে কার্য্যে তৎপর ছিলাম, এমন কথা কি করিয়া বলি, কারণ তৎপূর্ব্বে সে কাজ আর কখনও করি নাই, তাই অনভ্যাসবশতঃ প্রয়োজনাতিরিক্ত বিলম্ব হইতেছিল; বারম্বার ভুল করিয়া উপদেশ অনুসারে নিজকে সংশোধন করিয়া, নীলাভ নয়নের কল্পিত কোপ-দৃষ্টির দ্বারা তর্জ্জিত হইয়া বহু বিলম্ব করিয়া দুর্লভ গৌরবের আনন্দকর কার্য্য সোৎসাহে সম্পন্ন করিলাম। কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে—ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় বলিতে পারি না—আমি ছোট একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বসিলাম। রমণীটি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "Is it a sigh of relief?" আমি কহিলাম, "Of grief, because nothing remains to be done now" সকলেই হাস্য করিলেন,

কিন্তু অপেক্ষাকৃত যাঁহার বয়স কিছু কম, সেই ইংরাজটি আমার দিকে এমন ভাবে চাহিয়া লইলেন, যে দৃষ্টিকে স্নেহবিগলিত বন্ধুর কোমল দৃষ্টি কিছুতেই বলা যায় না। ইহার কারণ সে দিনে আমি অনুমান করিয়াছিলাম, আজ আমার পাঠক এবং পাঠিকাগণ অনুমান করুন। দোহাই ধর্ম্মের বলিতেছি—সেরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টির ছুরিকাঘাত খাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, এমন পাপ কায়মনোবাক্যে করি নাই—দণ্ড যাহা পাইলাম, তাহা বিনাপরাধেই পাইয়াছিলাম। সেই ইংরাজ যুবকটির মনের অবস্থা তখন স্বাভাবিক ছিল না (না থাকিবারই কথা ; অমন অবস্থায় কাহারও থাকে না ; শুনিলাম সে সময়ে তিনি ঐ মহিলাটির পাণীপ্রার্থী ছিলেন) সেইজন্য তাঁহাকে আমি সর্ব্বান্তঃ ক্ষমা করিয়াছি ; অভিলষিতলাভে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে কিনা জানি না ; যদি না হইয়া থাকে তবে কায়মনে আশীর্ব্বাদ করিতেছি—এই পৃথিবীর দিন তাঁহার ফুরাইবার আগে অন্ততঃ এক দিনের জন্যও যেন তিনি তাঁহার বাঞ্ছিতকে মনের মত করিয়া পাইয়া সুখী হইয়া যাইতে পারেন।

চলিতে চলিতে এমন স্থানে উপস্থিত হইলাম যেখানে জল প্রায় এক-কোমর হইবে। ভাগ্যক্রমে রেল-ওয়ের অধ্যক্ষগণ সেখানে একখানি চেয়ার ও চারিজন কুলির বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন ; প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে চেয়ারে করিয়া কুলিরা জল পার করিয়া দিবে। একটা স্থানে দুইখানি বাঁশ বাঁধিয়া দেওয়া ছিল, অপরাপর সকলে তাহার উপর দিয়া কায়-ক্লেশে পার হইয়া যাইবে। স্থির হইল, ইংরাজ রমণীটি আগে চেয়ারে পার হইয়া যাইবেন, পরে একে একে আমরা তিন জন পার হইব। আমি বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া বাঁশের উপর দিয়া পার হইয়া গেলাম, ইংরাজ দুইটিকে বলিলাম, কিন্তু তাঁহারা রাজি হইলেন না। চেয়ারে পার হইয়া রমণীটি এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়াছিলেন, হস্তের ইঙ্গিতে আমাকে তথায় যাইতে বলিলেন। গেলাম, তাহাতে সেই যুবকের বিষনয়নে পড়িবার ভয় আছে জানিয়াও গেলাম। ভাবিলাম যে অমৃত আগে পাওয়া যাইবে তাহাতে ওটুকু বিষ মারাত্মক হইবে না। সকলে পার হই-লেন—ঐ বৃক্ষতলে সমবেত হইলেন। আবার যাত্রা আরম্ভ হইল ; কিন্তু ইংরাজটি নির্ব্বাক হইয়া পথ চলিতে লাগিলেন। প্রশ্ন করিলে 'না' 'হাঁ' মাত্র উত্তর পাওয়া যায় ; সিগারেট দিতে গেলে অল্প কথায় ভদ্রতা করিয়া লইতে অস্বীকার করেন—আমি মহাভাবনায় পড়িয়া গেলাম। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোকটি আমার সহিত অতিরিক্ত মাত্রায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিলেন ; রমণীটির ত কথাই নাই, কারণে অকারণে সেই সুন্দর পুত্তলিকা মূর্ত্তিটির মধ্য হইতে আনন্দ-হাস্যের ফোয়ারা ছুটিতে লাগিল। যুবকটি অতিষ্ঠ হইয়া বলিয়া উঠিল "My word! You people can talk and laugh!" আবার সেই হাসির পিচকারি তাহার সর্ব্বাঙ্গে গিয়া পড়িল—নির্ব্বোধ বোঝে না, সে যত রাগ করিবে, রঙ্গপ্রিয়ার রঙ্গময় হাসি ততই বাড়িয়া চলিবে। আজ অনুপস্থিত ইংরাজবন্ধুকে নির্ব্বোধ বলা বোধ হয় সঙ্গত হইল না। ঠিক জানি না, তবে অনুমান হয় যে, যে বক্ষে প্রেম পারাবত বাসা বাঁধিয়াছে সেখানে ঈর্ষার শ্যেনপক্ষী তাহার পাশে পাশে বুঝি ঘুরিয়াই বেড়ায়—তাহাকে একেবারে তাড়ান' বুঝি সহজ নহে। আমি সত্যের খাতিরে স্বীকার করিতেছি যে, ক্রোধ থামাইবার সদুপদেশ তাঁহাকে আমি দিই নাই। যাহা হউক এইরূপে দুঃখে সুখে এগার মাইল পথ অতিক্রম করিয়া "কাউনিয়া ঘাটে" আমরা পঁহু-ছিলাম। দেখিলাম, বর্ষার স্নেহধারবর্দ্ধিতা বিপুলকায়া ত্রিস্রোতা আজ দু'কূল ছাপাইয়া চলিয়াছে। প্রথম দ্বিতীয় এবং মধ্যম শ্রেণীর জন্য একখানি বজরা ঘাটে বাঁধা, আর তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী পার করিবার নিমিত্ত দুই খানি পারঘাটার 'ছাঁদি'র নৌকা রহিয়াছে। যথাযোগ্য স্থানে আমরা সকলে উপবেশন করিলাম ; দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য যে বেঞ্চখানা বজরার কাছে একধারে রক্ষিত, সেখানে একজন ভদ্রলোক আসিয়া একটি বঙ্গরমণীকে বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেলেন। আমি আমার দুই ইংরাজ সহযাত্রী এবং তাঁহাদের সঙ্গিনী সেই ইংরাজ রমণীটি বজরার অন্যদিকে চারিখানি চেয়ারে উপবিষ্ট

হইলাম। মনে ভাবিতেছি, বঙ্গরমণীর সঙ্গী ভদ্রলোক-টিও সেখানে আসিবেন। কিন্তু বজরার ফিরিঙ্গী কাপ্তান আজ্ঞা প্রচার করিল—নৌকা ছাড়া হইল,তথাপি সে ভদ্র লোকটির কোন সন্ধান পাইলাম না; তিনি ফিরিয়া তাঁহার সঙ্গিনীর নিকট আসিলেন না।

নৌকা ধীরে ধীরে চলিতেছে; শারদ-সায়াহ্নের অস্ত-মান সূর্য্য-কিরণে অম্বুরঞ্জিতা পশ্চিম দিক্‌বধূ লোহিত পট্টাম্বরে সাজিয়া কাহার প্রতীক্ষায় জানালায় দাঁড়াইয়া আছেন কে জানে? আমরা সকলে সেই দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছি; দিন-দেবতার দ্বিপ্রহরের কুকীর্ত্তি এখন সম্পূর্ণ বিস্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে। নৌকার মাঝিমাল্লাগণ ইতস্ততঃ চলিয়া ফিরিয়া তাহাদের কাজকর্ম্ম করিতেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বেঞ্চখানি যে দিকে, সেই দিক দিয়া মাল্লাদের ছাদে গমনাগমনের পথ; একটি মাল্লা পুনঃপুনঃ সেই দিক দিয়া অকারণে যাওয়া আসা করিতেছে এবং এমন রূঢ়ভাবে সেই বঙ্গ রমণীর দিকে চাহিতেছে যাহা দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা জ্বলিয়া উঠিতেছিল এবং আমি মনে মনে সেই রমণীর সঙ্গী ভদ্রলোকটির অনুপস্থিতির জন্য তাহার শ্রাদ্ধ করিতে-ছিলাম। হঠাৎ একটি আর্ত্ত চীৎকার আমার কাণে গেল। আমি এবং সেই দুইটি ইংরাজ একত্রে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলাম,দেখিলাম—সেই মাল্লাটি তখনও মহিলা-টির বাহু ধরিয়া সরিয়া বসিবার জন্য টানাটানি করি-তেছে। আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া গেলাম, নিমেষের মধ্যে চট্টগ্রামের মাল্লাকুলকুলাঙ্গারের গলদেশ বজ্র-মুষ্টিতে ধরিয়া প্রায় তাহার শ্বাস রোধ করিয়া ফেলিলাম, এবং সেই অবস্থাতে তাহাকে টানিয়া সিঁড়ির দিকে লইয়া চলিলাম; ইচ্ছা, তাহাকে জলে ফেলিয়া দিব। ইংরাজদ্বয় সমস্বরে বলিতে লাগিলেন, "Kick him, Kick him" নৌকাখানির মধ্যে একটা বিষম গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিল। ফিরিঙ্গী কাপ্তান আসিয়া আমার হাত হইতে দুষ্টকে ছাড়াইয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার কি সাধ্য যে, আমার বজ্র মুষ্টি হইতে সহসা তাহাকে ছাড়াইতে পারেন! আমি ইস্কুলে পড়িবার সময় হইতে সে সময় পর্য্যন্ত নানাবিধ ব্যায়ামে শরীর সুদৃঢ় করিয়াছিলাম, পাঞ্জাবী পালোয়ানের সাগ্‌রেদ্ হইয়া বহু বৎসর কুস্তি শিখিয়াছিলাম, বিশেষ মনোযোগ এবং যত্ন সহকারে বাঙ্গালী লাঠিয়াল এবং হিন্দুস্থানী পাটাবাজের নিকট লাঠি, তলোয়ার, ছোরা প্রভৃতি ভাঁজিবার বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলাম (আমার শিক্ষকগণের মধ্যে নাছের কাজি এবং কালে খাঁ বোধ করি আজও জীবিত আছেন); সুতরাং কাপ্তা-নের চেষ্টা বিফল হইল, আমি সয়তানকে সিঁড়ি দিয়া টানিয়া নীচে লইয়া গেলাম। ঐ দ্বন্দ্বযুদ্ধের মধ্যে এক সময়ে তাহার দিকে হঠাৎ চক্ষু পড়ায় দেখিলাম যে,তাহার মুখের রঙ্গ শাদা হইয়া গিয়াছে এবং শ্বাস রুদ্ধ-প্রায় হয় হয়। তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিতেই নৌকার গলির উপর সে পড়িয়া গেল। আমি চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সেকেণ্ড ক্লাসের স্ত্রীলোকটির সঙ্গী বাবু কে এবং তিনি কোথায়?" পরক্ষণে দেখিলাম ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট প্লীহাকাতর সেই বাবুটি আমার নিকট দাঁড়াইলেন; আমি সবলে তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া উপরে নিয়া গিয়া তাঁহার সঙ্গিনীর পার্শ্বে তাঁহাকে বসাইয়া দিলাম। তিনি সভয়ে বলিলেন, "আমার ইণ্টার ক্লাসের টিকিট,এখানে কেমন্ করিয়া বসিব?" আমি রাগিয়া বলি-লাম "তাহাতে কিছু আসিবে যাইবেনা,দিতে হয় বাকি ভাড়া দিবেন, না পারেন আমি দিব।" তাহার পর সব নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেল। ফিরিঙ্গী কাপ্তান ইংরাজদ্বয়ের নিকট হইতে বৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বে শুনিয়া নিয়াছিল, আমার নিকট আসিয়া বলিল "I am awfully sorry and I assure you that I shall deal with that man departmentally." Departmentally deal তিনি করুন আর নাই করুন,আমি department এর বাহিরের লোক হইয়াও deal করিয়া ছাড়িয়াছি, এইটুকু আমার সান্ত্বনা। পরে পরিচয় লইয়া জানিলাম যে, ভদ্রলোকটি ঐ অঞ্চলে স্কুলমাষ্টারী করেন, স্ত্রীসহ পূজার বন্ধে বাড়ী যাইতেছেন; নিরাপদ বলিয়া স্ত্রীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর জেনানা-গাড়ীতে দিয়াছিলেন, নিজে অর্থকৃচ্ছ্রতায় মধ্যমশ্রেণীর টিকিট কিনিয়াছিলেন।

বলিলেন, "এমনটা যে হইবে তাহা কি জানি ?" আমি বলিলাম "জানা উচিত ছিল, অতঃপর সাবধান হইবেন।"

এতক্ষণ সেই ইংরাজ-মহিলাটি নীরবে সব ঘটনা দেখিতেছিলেন। আমি তাঁহার নিকট গিয়া সলজ্জভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য বলিলাম, "I am sorry to have created a scene like this"—কথা আমার শেষ করা হইল না—রমণী আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "I wish every one of your country was like you." এরূপ প্রশংসা পরজীবনে আরও দুই একবার পাইয়া থাকিব কিন্তু সেই তরুণ বয়সে, জীবনারম্ভের সেই প্রথম সূচনার সময়ে বিদেশিনী রমণীর সেই প্রশংসাবাণী আজ এই প্রৌঢ় বয়সেও সময়ে সময়ে মনে আইসে এবং সেই কথা মনে পড়িয়া কিছু-কিঞ্চিৎ গর্ব্ব অনুভব করি না একথা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে।

ত্রিস্রোতার অপর পারে নৌকা লাগিল; যে যাহার বাক্স পেটারা লইয়া নিজ নিজ শ্রেণীর গাড়ীর দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। অধিক চলাফেরা করিবার আর আমার শক্তি নাই। সেই রাত্রিতে গৌহাটীর বন্ধুভবনে যে আহার করিয়াছিলাম তাহার পরে আর জল গ্রহণ পর্য্যন্ত ঘটে নাই, তাহার উপর এই এগার মাইলের পথশ্রম, তদুপরি 'যবন যুদ্ধে' শক্তি ক্ষয়—সম্বলের মধ্যে দুইটি নাইনিতাল আলু, পিপাসায় বুক পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—তখন আলু গলাধঃকরণ করিবার মত সময় নহে। মনে হইল আমার ইংরাজ সহযাত্রী ও যাত্রিণী-দের সঙ্গে আহার্য্য এবং পেয় কিছু ছিল কিন্তু সেখানে হাত পাতিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণ জাতভিখারী হইলেও সর্ব্বত্র হাত পাতিতে পারি নাই, ইহ জীবনে একজনকেই অন্নপূর্ণা বলিয়া তাঁহারই নিকট যাচ্ঞা করিয়াছি, যে দিন যতটুকু পাইয়াছি তাহাই অমৃতাধিক বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়াছি।

রেলের সিগ্‌নাল-ম্যানকে একটু লবণ ও দুটি লঙ্কা আনিয়া দিতে বলিলাম; ইচ্ছা, তৎসংযোগে সেই সযত্ন রক্ষিত আলুর কোন ব্যবহার করা যায় কি না তাহারই চেষ্টা দেখিব। সে নানা আপত্তির পর দুই টাকা বকৃশিষের লোভে লবণ ও শুষ্ক লঙ্কা দুইটি তাহারই ঘর হইতে আনিয়া দিল। নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া একবার আপ্রাণ চেষ্টা করিলাম, কিন্তু আলু ধুলা হইয়া মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল, কণ্ঠনালীর নীচে আর তাহা গেল না; উহা দূরে ফেলিয়া দিয়া এক ঘটি জল এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া ফেলিলাম। দুইটি টাকা নবীনের হাতে দিলাম, বলিলাম, "যাহা পাও কিনিয়া খাও।" সে বলিল, "আপনি ?" আমি কহিলাম, "আমার যাহা ছিল আমি খাইয়াছি।" বেচারা জানিতে পারিল না যে, আমি কিছুই খাই নাই। সে ষ্টেশনের এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিল, কহিল, "এখানে কিছু পাওয়া যায় না, আমি অন্য ষ্টেশনে যা পাই কিনিয়া খাইব।" আমি কহিলাম, "সেই ভাল।"

পার্ব্বতীপুর হইতে যে গাড়ীখানি কাটিয়া দার্জ্জিলিঙ্গ মেলে যুড়িয়া দিবে, সেই গাড়ীর একটি কামরা আমি বাছিয়া নিয়া তাহাতেই আমার বিছানা বিছাইয়া নিলাম; ইংরাজ মহিলাটি Ladies Compartment এ তাঁহার রাত্রিযাপনের আয়োজন করিয়া ষ্টেশনের বারান্দায় একখানি বেঞ্চে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন দেখিলাম; বলা বাহুল্য সেই বেঞ্চের এক পার্শ্বে আমার পূর্ব্ববর্ণিত প্রেমমুগ্ধ বন্ধুটিও বিরাজ করিতেছেন। দূর হইতে দেখিয়াই বুঝিলাম সন্ধি হইয়া প্রণয়ীযুগলের কলহ প্রভাতমেঘের মত কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, তাহার কোন চিহ্নই এখন নাই। এখন তাঁহার সে কুঞ্চিত ভ্রূ ও বিবর্ণ মুখশ্রী নাই, প্রফুল্ল হাস্যে তাঁহার দীপ্ত মুখ-মণ্ডল শ্রীযুক্ত হইয়াছে, প্রেমের আদান-প্রদানে শুধু মন নহে, মানুষের দেহও বুঝি সুন্দর সুঠাম হইয়া ওঠে—জানি না একথা ঠিক কিনা। একবার ভাবিলাম এই বেলা বিদায় হইয়া থাকি, কারণ রাত্রি চারিটার সময়ে ডাকগাড়ী নাটোরে পঁহুছে, সে সময়ে বিদায় গ্রহণ সম্ভব হইবে না। আবার ভাবিলাম—থাক্, সময় যথেষ্ট আছে, এক সময়ে বিদায় লইলেই হইবে; এ সময়ে অনাহূত উপস্থিত হইয়া প্রেমিকযুগলের পরমানন্দের মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তটি অকারণ ব্যর্থ কেন করিয়া দিই ? দূরে

দেখিলাম অপর ইংরাজটি প্ল্যাটফরমের উপর পাদচারণ করিতেছেন; আমি গিয়া তাঁহারই সঙ্গে যোগ দিলাম, তাঁহারই প্রদত্ত একটি সিগারেট ধরাইয়া নানা কথায় কালহরণের উপায় ফাঁদিয়া নিলাম। গাড়ী ছাড়িবার প্রথম ঘণ্টা পড়িল, যে যাহার কামরায় যাইবার উদ্যোগ করিতেছে—আমি অগ্রসর হইয়া ইংরাজ রমণীটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "I am afraid we have to part, as best of friends must." তিনি কহিলেন, "Whatever that may be, we will say 'au-revoir' and not good-bye." এইরূপ ভদ্রতার আর দুই চারিটি কথার পরে 'শেক্-হ্যাণ্ড' করিয়া বিদায় নিলাম। এতক্ষণ প্রেমিক বন্ধুটি একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন; তাঁহার নিকট গিয়া হাত বাড়াইয়া দিতেই তিনি কহিলেন, "Not yet my friend, I am coming into your compartment." আমি কহিলাম, "Right you are." কিছুকাল পরে উভয়ে আমার নির্দ্দিষ্ট গাড়ীখানির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িলাম, দেখিলাম পরশমণির স্পর্শ-প্রভাবে লৌহ-প্রকৃতি বন্ধুটি আমার পাকা সোণা হইয়া গিয়াছে—যে দিকে নোয়াইতে চাই সেই দিকেই নমিত হইতে তিলার্দ্ধ গৌণ হয় না; মনসিজের অপ্রতিহত প্রভাবে ধূলার ধরণী এমনি করিয়াই বুঝি এক নিমেষে সোণা হইয়া যায়!

পার্ব্বতীপুরে বন্ধু তাঁহার নিজের কামরায় গেলেন; যাইবার সময়ে তাঁহার কলিকাতার ঠিকানা আমায় দিয়া গেলেন এবং সাক্ষাৎ করিবার জন্য বারম্বার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। আমি বলিলাম, "Don't forget my share of champagne and cake when proper time comes—eh!" ঘাড় ফিরাইয়া উত্তর দিলেন, Right-ho! আমি দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া শয়ন করিলাম। পার্ব্বতী-পুরে গাড়ী অনেকক্ষণ থাকে—আমি সে সময়ে জাগ্রত হইলাম বটে কিন্তু উঠিবার শক্তি আমার নাই; একখানি মোটা চাদরে আপাদ মস্তক ঢাকিয়া পড়িয়া রহিলাম। অনাহারে তৎপূর্ব্বে এত কষ্ট আর কখনই পাই নাই, কিন্তু পরজীবনে অদৃষ্টে উপবাস বহু সময়েই ঘটিয়াছে এবং ভবিষ্যতে ঘটিবার সম্ভাবনা নাই এমন কথাই বা কেমন করিয়া বলি?

আশ্বিনের শেষরাত্রিকে গ্রীষ্মের রাত্রি বলা যায় না; রজনী তিমিরাবগুণ্ঠন ঈষৎ সরাইয়া, নিবিড় দুঃখের দিনে সুখকল্পনার মত প্রভাতপূর্ব্বের অরুণ-লেখা প্রাচীমূলে যখন দেখা দেয়, সে সময়ের সমীরণে শীতের শিহরণের আভাস নাই এমন কথা কে বলে? অন্ততঃ পক্ষে আজ ঋতু-বিপর্য্যয়ের দিনে একথা সত্য না হইলেও, এ যে দিনের কথা সে দিনে আশ্বিনে লেপ গায়ে দিবার ব্যবস্থাই ছিল। যখন মন্দ সমীরণ সর্ব্বাঙ্গে শীতের আমেজ আনিয়া দিল, তখন জানিলাম নাটোর ষ্টেশন প্রায় সমাগত। আমি উঠিয়া বিছানাপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইতে না হইতে শুনিলাম, পরিচিত উত্তরবঙ্গের নিজস্ব টানা সুরে ষ্টেশনের খালাসি দীর্ঘছন্দে একস্থানে দাঁড়াইয়া বলিতেছে:—"না—টো—র—র্—গাড়ী দশ 'মেনিট্'।" জানলা গলাইয়া শরীরের উত্তমার্দ্ধ সম্পূর্ণ বাহির করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিলাম—বাড়ী হইতে কেহ আসিয়াছে কিনা। লোক আসিবার সম্ভাবনা ছিল, কারণ কাউনিয়া হইতে 'তার' করিয়া দিয়াছিলাম—দেখিলাম একটি ভদ্রলোক আমলা এবং দরোয়ান জন-দুই আসিয়াছে, ষ্টেশনের বাহিরে বাড়ীর গাড়ীও অপেক্ষা করিতেছে। গাড়ী আসা নিতান্ত প্রয়োজন ছিল, কারণ নাটোরে সে কালে যে ভাড়া গাড়ী পাওয়া যাইত তাহার নাম ছিল 'টম্‌টম্'; কিন্তু যথার্থ উহা বেহার অঞ্চলের ছাপ্পরহীন একার সর্ব্বাধম সংস্করণ; আরোহী তাহাতে চড়িয়া দশ মিনিটকাল চলিলে গন্তব্য স্থানে পঁহুছিবার বহু পূর্ব্বেই তাঁহার শরীরস্থ সমস্তগুলি অস্থি-সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। দুই দিন দুই রাত্রি অনাহার এবং পথশ্রমের পর একা আরোহণ আমার পক্ষে অসম্ভবই হইত।

গাড়ী হইতে নামিলাম—বাহির হইয়া যাইবার দ্বারের উদ্দেশে চলিয়াছি, এমন সময়ে আমার সেই 'প্রেমিক' বন্ধুর জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বরে 'au-revoir' শুনিতে

পাইলাম, তাঁহার কামরার দ্বারদেশে প্ল্যাটফরমের উপর দাঁড়াইয়া সৌজন্যসূচক দুই চারিটি কথার আদানপ্রদান হইতেই গাড়ী অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল; সমস্ত ট্রেণখানি আমার চক্ষুর সম্মুখ দিয়া ছায়াবাজীর চিত্রের মত নীরব নিঃশব্দে যখন চলিয়া যায়, হঠাৎ জেনানা-গাড়ীর বাতায়নপথে একখানি সুডৌল শ্বেত হস্তের বিদায়সূচক মন্দ আন্দোলন আমি দেখিতে পাইলাম—ইহা প্রত্যাশা করি নাই; অল্প পরিচয়ে বিদেশিনীর নিকট হইতে সে দিনে এই অপ্রত্যাশিত বান্ধবোচিত ব্যবহার পাইয়া বিলাতী শিক্ষিত-সমাজের প্রতি আমার শ্রদ্ধার সূচনা জন্মিবার অবসর হইয়াছিল এবং সেই শ্রদ্ধা বদ্ধমূল হইতে পারে, পরজীবনে আমার সে সুযোগও ঘটিয়াছে। স্বীয় সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া সপ্রতিভ ভাবে বন্ধুজনের সহিত কিরূপ মিষ্ট ব্যবহার করিতে হয়, তাহার উদাহরণ দেখিয়া সে দিনেও ভাবিয়াছি ইহা সকল সমাজের রমণীগণের অনুকরণীয় এবং আজ পরিণত বয়সেও সে মত পরিবর্ত্তন করিবার কোন কারণই পাই নাই।

ষ্টেশনের বাহিরে গিয়া গাড়ীতে চড়িলাম। নবীন জিনিষপত্র সহ ভাড়া গাড়ীতে পরে আসিবে এই বন্দোবস্ত করিয়া, বাড়ীর দিকে ধীরে ধীরে চলিলাম। যে শিশুর সঙ্কটপীড়ার সংবাদে অগৌণে বাড়ী আসিতে হইয়াছিল, সংবাদ লইয়া জানিলাম তখনও তাহার পীড়া সাঙ্ঘাতিক হয় নাই, আপাততঃ প্রাণের আশঙ্কা নাই—কবিরাজী চিকিৎসা চলিতেছে। এতক্ষণের পরে [illegible] সময় একটু পাওয়া গেল। নানা [illegible] রাজবাটীর সম্মুখস্থ [illegible] যে তৃপ্ত হইয়াছিলাম, [illegible] — [illegible] শিশুর পক্ষে মাতৃক্রোড়ের মত নির্ম্মল জলরাশি যেন আনন্দে চঞ্চল [illegible] বাহুতে জড়াইয়া ধরিতে লাগিল অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিয়া পরে আহার করিতে গেলাম; হিসাব করিয়া দেখিলাম ৬০ ঘণ্টারও উপর অনাহারে ছিলাম।

বাড়ী ফিরিয়া আবার সেই কর্ম্মহীন দিন-যাত্রার মধ্যে নিজকে একরূপ সমাধিস্থ করিতে বাধ্য হইলাম। নিঃসঙ্গ অলস দিন এবং চিন্তাক্লিষ্ট বিনিদ্র বিভাবরী আবার আসিয়া আমার বুকের উপর চাপিয়া বসিল। দিনযাপনের নিত্যকৃত্যগুলি কোনরূপে সমাধা করিয়া অবশিষ্ট সময় স্কুলকলেজের বইগুলি যাহা আমার নিকটে ছিল, তাহাই প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বহুবার শেষ করিলাম। তবুও দিন যায় না! যৌবনারম্ভে, জীবনপথের যাত্রারম্ভের সন্ধিমুহূর্ত্তে বিচিত্র আশা আকাঙ্ক্ষা এবং ভবিষ্যৎ জীবনযাপনের অপূর্ব্ব কল্পনা লইয়া দিন মানুষের নৃত্যলীলায় অতিবাহিত হয়, ইহাই আমার শোনা ছিল; অদৃষ্টের ফেরে এ কর্ম্মহীন নিঃসঙ্গ জীবনের হতাশ্বাসের জগদ্দল পাথর আমার বুকে কেন চাপিল, ভাবিয়া তাহার কূলকিনারা করিতে পারি না অথচ বিষাদ-বিন্ধ্যকে বুকের উপর হইতে ঠেলিয়া নামাইয়া দিবার মত ভবিষ্যৎ কল্পনা রঙ্গীন করিয়া আঁকিবার শক্তিও আমার মনে নাই! কি বিপদেই যে পড়িয়াছিলাম তাহা কেবল আমিই জানি।

বুকের মধ্যে যখন এইরূপ জমাট অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিত, আকুল বাষ্পভারে সময় সময় আমার ক্ষীণচক্ষুর দৃষ্টি পর্য্যন্ত যখন ক্ষীণতর হইয়া পড়িত, সে দুর্দ্দিনে রবিচন্দ্রকরোদ্ভাসিত কাঞ্চনশৃঙ্গের স্বর্ণভূষারের মায়াময় দৃশ্য, ব্রহ্মপুত্রপুলিনাসীনা অনন্তরূপশালিনী চিরযৌবনা প্রকৃতির বিলাসবিহ্বল মাধুরী আমার মানসচক্ষুর সম্মুখে এক আনন্দময় স্বপ্নজগতের সৃজন করিয়া তুলিত। এই জরাসন্ধের অন্ধকারাপ্রাচীরের বহির্দ্দেশের জলস্থল ব্যোম বায়ুতে আনন্দযজ্ঞের যে [illegible] অনুষ্ঠান চিরদিন চলিতেছে এবং সে যজ্ঞে অনাহূত [illegible] কাহাকেও যে বঞ্চিত হইয়া ফিরিতে হয় না একথা আমার কাণের কাছে দিগন্তাগত মন্দমারুত প্রতিনিয়ত গুঞ্জন করিয়া—সেই অবারিত আনন্দের সুধাস্বাদের জন্য অন্তরাত্মাকে কি ব্যাকুল করিয়া তুলিত তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানিতেন,—সে কথা সে দিনেও বলিয়া বুঝাইবার লোক পাই নাই, আজও সে কথা বুঝিবার কেহ আছেন

কি না তাহা আমার দেবতা যিনি, তিনিই জানেন। আমার সেই কর্ম্মহীন, নিঃসঙ্গ, নিরানন্দ দিনযাপনের নিবিড় বেদনার দিনে মধ্যে মধ্যে কে যেন কাণে কাণে বলিয়া যাইত—এই বিচিত্র বিশ্বরচনা নিরর্থক নহে, মানবজীবনের একান্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষাগুলি নিষ্ফল নহে, ইহাদের আনন্দময় পরিসমাপ্তি কোথাও রহিয়াছে, যাহার জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষার তিমির-রজনী ধৈর্য্য ধরিয়া যাপন করিতে হইবে; সে দুঃখরাত্রির অবসানে নবারুণোদ্ভাসিত কলবিহঙ্গসঙ্গীত-মুখরিত পুষ্পবাসিত উষার আনন্দ-আগমন অনিবার্য্য, নতুবা শূন্যে জন্মিয়া শূন্যে লয় পাইবার জন্য এত বড় বিশ্বরচনার, বিশ্বজনের অন্তরের মধ্যে এমন বিপুল বাসনার সৃজনের কোন প্রয়োজন ছিল না। জন্ম ও মৃত্যুই কেবল সত্য, মধ্যস্থলটা কেবলই শূন্য এবং হাহাকার দিয়া বিধাতা ভরাট করিয়া রাখিয়াছেন, একথা সে দিনে কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারি নাই; অমন বিরাট নিরাশার অপার দুঃখ বুকে বহিয়া এ পৃথিবী যুগযুগান্ত ধরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে কি পারিত? তাহা হইলে এক নিমেষের অশ্রুজল প্রলয়ের প্লাবন আনিয়া দিত, মুহূর্ত্তের দীর্ঘশ্বাসে কল্পান্তের ঝড় বহিয়া যাইত!

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

বয়ঃসন্ধি

কৈশোর কোরক হ'তে কখন সহসা
যৌবনের ফুল্ল ফুলে হ'লে বিকসিত,
দলের কখন গেল কুঞ্চিত সে দশা—
সর্ব্ব অঙ্গ শিহরিয়া হলো হরষিত!
কবে সে প্রথম ব্যাধ ফুলধনু করে
হৃদয়-আশ্রমে তব সহসা পশিয়া
করে' দিল তোলপাড় তপোবন ভরে'—
একসাথে সব পাখী উঠিল ডাকিয়া!
নবোদ্ভিন্ন পুষ্প কবে ভরি' শস্তে-জলে
ফলের সূচনা ধীরে করে কক্ষতলে!

কোন সে বাসন্তী রাতে দখিন সমীরে
উড়িয়া পড়িয়াছিল আকুল অঞ্চল;
নব নৃপ রাজ্যে তব প্রবেশিল ধীরে,
কৈশোরের সিংহাসন যাহে টলমল!
বিনাযুদ্ধে গেল তার কবচ কৃপাণ,
সুশঙ্ক প্রজার দল দাঁড়া'ল সরিয়া;
অন্তঃপুরে সঙ্কুচিতা—করিল প্রস্থান
কৈশোর সেবিকা যত গুণ্ঠন পরিয়া!
ধরিতে নারিনু আমি, চোরের মতন
হিয়ার সুড়ঙ্গ-পথে পশিল যৌবন!

রহি ইন্দ্রধনু মাঝে জানিনা কখন—
বর্ণ হ'তে বর্ণান্তরে করেছে প্রয়াণ;
সুসম্বৃত হয়ে এল দেহের বসন,
সংযত হইয়া এল উচ্চ হাসি-তান।
চরণের চপলতা কোন্ শুভক্ষণে
গ্রহণ করিল আঁখি—পারিনি ধরিতে;
দোদুল বিতান কবে উড়ন্ত পবনে
উৎফুল্ল-চঞ্চল হল হৃদয় তরীতে!
ক্ষীণ কবে হল পীন, ধনী হল দীন—
একতারা কবে হল সাততারা বীণ!

যেদিন কৈশোর তব লইল বিদায়—
চিত্ত রাজ্যে দৃশ্য আহা হইল কেমন!
উঠিল কি হাহাকার মরম ব্যথায়—
শ্যামহারা বৃন্দাবন আকুল যেমন!
সেদিন কি নেত্রে তব ফুটেছিল জল—
বক্ষ কি করিতেছিল শ্বাস-দুরু-দুরু!
রচিতে রচিতে নব বরণ-মঙ্গল,
সুখে-দুখে হ'তেছিল মন উড়ু উড়ু!
জানিনা কখন কবে কৈশোরের মধু
যৌবনের সুরা হল, ওগো প্রাণ-বধু!

শ্রীকালিদাস রায়

যযাতি-শর্ম্মিষ্ঠা

[সময় গোধূলি]

(বনভূমি পরিক্রমণ করিতে করিতে যযাতির প্রবেশ)

যযাতি।—

পাষাণ-মূরতি ওকি ! কে রাখিল হোথা
নির্জ্জন কূপের পার্শ্বে ? যাই দেখি কাছে।

(নিকটে গিয়া)

তা'ত নয়—কাঁপে ওষ্ঠ ; বিন্দু বিন্দু বারি
ঝরিছে নয়ন হ'তে আরক্ত কপোলে।
কি বলিছে ধীরে ধীরে শুনি দাঁড়াইয়া,—
বাহ্যজ্ঞানশূন্য যেন গঠিত পাষাণে !
আসিয়াছি এত কাছে—নাহিক চেতনা !

শর্ম্মিষ্ঠা (স্বগত)—

এই না সে শুষ্ক কূপ,—দুর্ভাগ্য আমার !
—এরি অন্ধকার হ'তে করেছি অর্জ্জন
দাসীত্ববন্ধন মোর চির জনমের !
হোক্ তাহে নাহি খেদ, দৈত্যবালা আমি—
দৈত্যকুল হিত তরে, পরেছি স্বেচ্ছায়
দাসত্বনিগড় সাধে, চরণ যুগলে।
তবে এ নির্ব্বেদ কেন পারি না বুঝিতে,
কেন মনে হয় সদা শূন্য এ জীবন।
গোপনে লুকায়ে কাঁদে ঐশ্বর্য্যের তরে
রাজপুত্রী প্রাণ—এত দীন-হীন সে কি ?
এই যে উঠেছে ভরে রেখায় রেখায়,
ষোলকলা যৌবনের—পূর্ণ পূর্ণিমায় !
একি তায়, একি তারই নীরব রোদন,
—জীবন মধ্যাহ্নে বহে তারি তপ্ত-শ্বাস !
বেলাভূমি অতিক্রমি ছুটেনা সাগর—
যা কিছু জোয়ার তার তাহারি মাঝারে।
হৃদয়ের মাঝে সদা তুলে হাহাকার,
কোন্ সে অজ্ঞাত লাগি', না জানে আপনি—
এই যে উদার নীল অনন্ত আকাশ,
এই যে সুরভিভরা উন্মুক্ত সমীর ;
এই যে স্বাধীন চিন্তা, হৃদয়-স্বাধীন—
কে রোধে ইহার গতি, এত শক্তিময় !
—কে আছে করিতে পারে তাহারে বন্ধন ?
স্বাধীন মানব চিত্ত বন্ধনের মাঝে
উন্মুক্ত চরণ। সুন্দর এ বনভূমি !—
তার মাঝে, কেন এই চিত্ত-অবসাদ ?
যেন কারে খুঁজে সদা ; যেন কা'র পায়,
অঞ্জলি করিয়া চাহে দিতে আপনারে।
সখী মোর দেবযানী—শুক্রের দুহিতা
—রাণী আজি ; কর্ম্মফলে আমি দাসী তার !
হোক্ রাণী, তাহে নহে শর্ম্মিষ্ঠা কাতর ;
কেন তবে, তবে কেন ভ্রমে তারা যবে
প্রণয় সোহাগে ভরি, করে-করে ধরি,
উছলে প্রাণের হাসি আরক্ত অধরে,—
অজ্ঞাতে নয়নে মোর হেরি তাহা কেন
ভরে জল ? চোরের মতন চুপি-চুপি
বাহিরায় দীর্ঘশ্বাস ? হায়রে কপাল !
ঈর্ষ্যা শেষে নিল বাসা শর্ম্মিষ্ঠা হৃদয়ে !
—রাখিব না এ জীবন, দিব বিসর্জ্জন ;
আজি এই কূপতলে সঙ্কীর্ণ জীবন
সঙ্কীর্ণ কূপের মাঝে হোক অবসান।

(অগ্রসর হইয়া যযাতি)

কেন এ আক্ষেপ শুভে ?
দাসী তুমি ! কা'র দাসী ? রাণী দেবযানী
যযাতি-মহিষী ; দাসীপণে কিনিয়াছে !—
তুমি দাসী তার ; হায়, কি আছে তাহার,
আছে দর্প, আছে গর্ব্ব, আছে অভিমান,
পাপাগ্নি রোষাগ্নি বিপ্রসুতার সম্বল !



যযাতি ও শর্ম্মিষ্ঠা।

[illegible]

MANASI PRESS CALCUTTA

শুনিয়াছি, বাল্যসখী তব দেববানী,
ক্ষম তারে, ঐশ্বর্য্যের শিখরে বসিয়া,
সে নিষ্ঠুরা—গর্ব্ব তার করুক সকল।
যাহার মহিমা-কীর্ত্তি যযাতি মানসে
দিবানিশি জেগে আছে শয়নে স্বপনে।
আরাধ্যা দেবীর মত হৃদয়-মন্দিরে,
রাজিত যে, পূজি যারে সদা মনে মনে।
তৃষিত নয়ন মোর যারে দেখিবারে
আকুল সতত, যারে আঁখিপথ হ'তে
রেখেছে লুকায়ে সদা রাণী দেবযানী—
দেখিতে পেয়েছি তারে আজি ভাগ্যফলে ;
মহীয়সী দৈত্যবালা শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরী।
সাক্ষী এই অস্তমিত দেব অংশুমালী—
সাক্ষী এই স্বর্ণময় সময় গোধূলি !
রাখিনু মুকুট এই তব পদতলে—
আজি হতে দাস তব ভূপতি যযাতি।
দান কর সুকুমারী ওই পদ্মপাণি—
হৃদয়-সম্রাজ্ঞী হও, মহীয়সী রাণী !

(কর ধারণ)

শ্রীগিরিন্দ্রমোহিনী দাসী।

পৃথিবীর পুরাবৃত্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শীতাতপের সাক্ষ্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে পৃথিবী যে প্রজ্জ্বলিত বাষ্পময়ী নীহারিকা হইতে উৎপন্ন না হইয়া উল্কাময়ী নীহারিকা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এই সম্ভাবনাই অধিক। পৃথিবীর আদিম যুগের শীতাতপের সাক্ষ্য হইতেও এই অনুমানই সমর্থিত হয়।

ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা পৃথিবীর জীবনকালকে চারি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। এই সকল বিভাগের এক একটীকে এক এক যুগ (Era) কহে। ভিন্ন ভিন্ন কালে বিদ্যমান জীব এবং উদ্ভিদের পরিণতি অনুসারে এই সকল যুগকে আবার ভিন্ন ভিন্ন যুগাংশে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এই সকল যুগ এবং যুগাংশের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল—

যুগ	যুগাংশ
আদি যুগ (Eozoic)	আর্কীয় (Archean)
	টরিডনীয় (Torridonian)
প্রাচীন যুগ (Palæozoic)	কাম্ব্রীয় (Cambrian)
	অর্ডোভিসীয় (Ordovician)
	সিলুরীয় (Silurian)
	ডিভোনীয় (Devonian)
	অঙ্গারীয় (Carboniferous)
	পার্ম্মীয় (Permian)
মধ্যযুগ (Mesozoic)	ট্রিয়াসীয় (Triassic)
	জুরাসীয় (Jurassic)
	ক্রিটাসীয় (Cretaceous)
আধুনিকযুগ(Koirrozoic)	ইয়োসীয় (Eocene)
	অলিগোসীয় (Oligocene)
	মিয়োসীয় (Meocene)
	প্লিয়োসীয় (Pliocene)
	প্লিষ্টোসীয় (Pleistocene)

পৃথিবী যদি প্রজ্জ্বলিত বাষ্পগঠিত নীহারিকা হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে ইহার পক্ষে শীতল হইতে বহুকাল লাগিত। সুতরাং ইহার আদিম যুগের উষ্ণতা বর্ত্তমান যুগ অপেক্ষা অনেক অধিক হইত।

কিন্তু ভূবিদ্যার সাহায্যে পৃথিবীর শীতাতপের যে ইতিহাস জানিতে পারা যায় তাহা দ্বারা একথা সমর্থিত হয় না।

ভিন্ন ভিন্ন যুগে বর্ত্তমান জীবজন্তু এবং উদ্ভিদাদির প্রকৃতির আলোচনা দ্বারাই পৃথিবীর সেই সেই যুগের শীতাতপের অবস্থা অনুমিত হয়।

উদাহরণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে প্রবাল-নির্ম্মিত গিরিশ্রেণী বর্ত্তমানকালে কেবল উষ্ণমণ্ডল বা নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডলেই দেখা যায়, হিমমণ্ডলে কোথাও তাহাদের অস্তিত্ব দেখা যায় না।

সুতরাং পৃথিবীর কোন প্রদেশে যদি প্রবালগিরির অস্তিত্বের লক্ষণ দেখা যায় তাহা হইলে সহজেই অনুমান করিতে হয় যে কোন না কোন সময়ে সেই প্রদেশ উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্গত ছিল।

ইংলণ্ডের প্রাচীনতম পর্ব্বতে প্রবাল-প্রস্তরের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে তাহার সিলুরীয়, ডিভোনীয়, অঙ্গারীয় এবং জুরাসীয় যুগাংশে উৎপন্ন চূর্ণ প্রস্তরকে (limestone) অনেকে প্রবাল-প্রস্তর গঠিত বলিয়া অনুমান করেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে ইংলণ্ডে আদিম যুগে যেরূপ উত্তাপ ছিল পরবর্ত্তী যুগে সে উত্তাপ তদপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুতরাং আদিম যুগের উত্তপ্ত পৃথিবী ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিতেছে ইহা হইতে সে কথা প্রমাণিত হয় না।

বায়ুর বেগ হইতেও শীতাতপের কতকটা প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে শীতাতপের পার্থক্যই বায়ুর উৎপত্তির কারণ। সুতরাং পৃথিবীর দুইটি বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে শীতাতপের যতই পার্থক্য হয়, বায়ুর বেগ ততই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যদি আদিম যুগে পৃথিবীর স্থলভাগ অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় থাকিত তাহা হইলে উত্তপ্ত ভূভাগ এবং শীতল সমুদ্র পাশাপাশি স্থাপিত হওয়ায় সেকালের বায়ুর বেগ যে একালের অপেক্ষা অনেক অধিক হইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু ভূতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা এরূপ কোন প্রমাণই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। স্কটল্যাণ্ডের অন্তঃপাতী সাদারল্যাণ্ড (Sutherland) প্রদেশের অন্তর্গত লক্ অসাইণ্টের (Loch Assyint) পার্শ্ববর্ত্তী গিরিশ্রেণীই ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে পৃথিবীর প্রাচীনতম পর্ব্বত।

এই পর্ব্বতশ্রেণী এবং তৎসংলগ্ন অধিত্যকাভূমির কিয়দংশ আদিম যুগে বালুকাবৃত হইয়া যায় এবং সেই পুঞ্জীভূত বালুকারাশি হইতে পরবর্ত্তী যুগে বালুকা-পর্ব্বত গঠিত হয়।

বালুকাবৃত হওয়ায় এই প্রাচীন পর্ব্বত শ্রেণীর কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে নাই।

এতকালের পর উক্ত বালুকাপর্ব্বত আবার খণ্ড বিখণ্ড হইয়া বালুকায় পরিণত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এবং পুরাকালে এক সময়ে যেমন দক্ষিণ পশ্চিম বায়ু শিথিল বালুকাকণাকে প্রাচীন গিরিগাত্রে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছিল, আজও আবার সেইরূপ বায়ু স্খলিত বালুকারাশিকে পুনরায় তেমনি করিয়া গিরিগাত্রে নিক্ষেপ করিতেছে।

কিন্তু সে কালের এবং একালের বালুকণার আকারগত সমতা ও সাদৃশ্য দেখিয়া স্পষ্টই অনুমিত হয় যে এই বায়ুর বেগ সেকালেও যেমন ছিল একালেও ঠিক তেমনই আছে। সুতরাং বায়ুর বেগ হইতেও প্রাচীন পৃথিবীর তাপাধিক্য প্রমাণিত হয় না।

হ্রদ বা সমুদ্রের তীরবর্ত্তী কোমল মৃত্তিকার উপর সেকালের বৃষ্টি-বিন্দুর যে চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতেও বুঝা যায় যে সে কালের বৃষ্টিবিন্দুর বেগ এবং আকারও ঠিক একালের মতই ছিল।

সুতরাং সেকালের পৃথিবীর উষ্ণতাসূচক বায়ুর বেগাধিক্যের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

পক্ষান্তরে সেকালে পৃথিবীর কোন কোন প্রদেশ যে বর্ত্তমান কালের অপেক্ষা শীতলতর ছিল তাহারও সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

চীনদেশে এবং দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার অ্যাড্‌লেড্ নগরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে কতকগুলি গিরিশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পর্ব্বত পৃথিবীর

প্রাচীন Palæozoic যুগের আদিমতম যুগাংশে Cambrian হিমশিলার (Glacier) শক্তি প্রভাবে গঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালে এই সকল প্রদেশে হিমশিলার কোন চিহ্নই দেখা যায় না। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে পৃথিবীর প্রাচীন যুগে চীন এবং অষ্ট্রেলিয়া এখনকার অপেক্ষা শীতলতর ছিল।

পরবর্ত্তীকালে পৃথিবীর দক্ষিণস্থ নানা প্রদেশ, আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে হিমশিলার অস্তিত্বে প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং প্রাচীন যুগে পৃথিবীর কোন কোন স্থান বর্ত্তমানকালের অপেক্ষা উষ্ণতর থাকিলেও, সেকালে পৃথিবী যে মোটের উপর এখনকার অপেক্ষা উষ্ণতর ছিল এরূপ কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না।

সুতরাং পৃথিবীর প্রাচীনকালের শীতাতপের সাক্ষ্য হইতে যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি যে প্রজ্জ্বলিত বাষ্পের ঘনীভবন হইতে না হইয়া শীতল উল্কারাশির সংহতি হইতেই ঘটিয়াছে এই উপপত্তিই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

কেহ কেহ তর্ক করিতে পারেন যে আদি যুগে পৃথিবী অতিশীঘ্র শীতল হইয়া যাওয়ায় অল্প দিনের মধ্যেই তাহার উষ্ণতা বর্ত্তমান কালের মত হইয়া পড়িয়াছিল—কিন্তু একথা তেমন যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। পৃথিবী যদি জলন্ত বাষ্প হইতে উৎপন্ন হইত তাহা হইলে তাহার অভ্যন্তর ভাগের প্রচণ্ড উত্তাপ কিছুতেই এত অল্প সময়ের মধ্যে শীতল হইতে পারিত না। ভূপৃষ্ঠের তাপ নিতান্ত ধীরে ধীরে বিকীর্ণ হওয়ায় তাহার অভ্যন্তরভাগের উত্তাপ বহুকাল অক্ষুণ্ণ থাকিত। কেহ বলিতে পারেন যে পৃথিবীর উষ্ণতা তাহার বর্ত্তমানকালের শীতাতপের মাঝামাঝি হইয়া আসার পর পর্ব্বতাদি গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এ উপপত্তিও তেমন সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, পৃথিবীর আদিম উত্তাপ এতদূর হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে যে কত লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগিত তাহার স্থিরতা নাই।

পৃথিবীর তাপহ্রাসের কথা বিবেচনা করিলেও তাহার উল্কারাশির সমষ্টি হইতে উৎপত্তিই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

প্রজ্জ্বলিত বাষ্পে যে প্রচণ্ড তাপ সঞ্চিত থাকে তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে বহুকাল লাগে। কিন্তু শীতল কঠিন পদার্থ সমূহের সংঘাত ও সংকোচ বশতঃ যে তাপ উৎপন্ন হয় তাহা সহজেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

সুতরাং পৃথিবীর দ্রুত তাপহ্রাসের কথা স্মরণ করিলে শেষোক্ত অবস্থাই পৃথিবীর বর্ত্তমানকালের উপযোগী শীতলতা প্রাপ্তির অনুকূল বলিয়া মনে হয়।

সুতরাং প্রাচীনকালের শীতাতপের সাক্ষ্য হইতেও পৃথিবীর উৎপত্তি ব্যাপারে উল্কাবাদই সমর্থিত হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

ফাগুন এসেছে জ্বালায়ে আগুন গগনে গহনে অন্তরে—
দীপক গাহিয়া অরণি বাহিয়া মন্দ মন্দ মন্থরে।
অশোক পাটল শাখায় শাখায়
জ্বালায়ে তুলেছে শিখায় শিখায়,
নাচায়েছে মরীচিকার রেখায় [illegible] প্রান্তরে।

(জলে) সান্ধ্য রবির অভ্রচিতায়, [illegible]বের অকালে,
করুণ হিয়ার উদ্দীপনায়, অতীত স্মৃতির কঙ্কালে;
বিরহীর বুকে জ্বলেছে অনল—
জাগরণ-জ্বালা চোখে ঝরে জল;
দীর্ঘশ্বসনে হৃদয় বিকল, আগুনের জলে সন্তরে।

(জলে) গতকুজ্ঝাটি ধুম, উজ্জ্বল যজ্ঞে উষার আশ্রমে,
ধূর্জ্জটি ভাল নয়নতপনে—মধ্যদিনের সংক্রমে,
অন্তর মাঝে বাসনার ধূপ,
অনলের ধূলি ধরে ফাগরূপ—
হোলির লীলায় তাতায় মাতায় যতেক আবেশ মন্থরে।

শ্রীকালিদাস রায়।

তীর্থ ভ্রমণ

আজমীর।

জয়পুর হইতে রওয়ানা হইয়া সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে আমরা আজমীর পৌঁছিলাম। ট্রেণ হইতে এই পথের দুইদিকে যতদূর দেখিতে পাইয়াছিলাম—কোথাও আমাদের সোণার বাংলার মত শস্যশ্যামল শোভা দেখিতে পাইলাম না। অনুর্ব্বর জলবিহীন প্রদেশ। রাস্তায় একটা ষ্টেশনে তৃষ্ণা পাইয়াছিল, "পানি-পাঁড়ে"কে ডাকিলাম, তাহার বালতিতে দেখিলাম, কর্দ্দমাক্ত অপরিষ্কার জল—তাহাই পান করিতে হইবে ভাবিয়া আমার তৃষ্ণা মাথায় চড়িয়া গেল। বসিয়া বসিয়া আমাদের দেশে পর্য্যাপ্ত জলের কথা স্মরণ করিতে লাগিলাম।

আজমীর ষ্টেশনে নামিয়াই দেখিলাম, "আজমীর হিন্দু হোটেল" তক্‌মা-আঁটা এক চাপরাসী প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছে। আমরা গাড়ী হইতে নামিবামাত্র চারিদিকে পাণ্ডারা ঘিরিয়া দাঁড়াইল। "বাবুজী, মাজী, পুষ্কর যাওয়া হোবে না? আমি অমুক আছি"—ইত্যাদি প্রশ্নে আমাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। আমরা অতি কষ্টে সেই পাণ্ডা-ব্যূহ ভেদ করিয়া হিন্দু হোটেলের চাপরাসীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলাম। সঙ্গে মা না থাকিলে অবশ্য আমাদের এইরূপ অবস্থায় পড়িতে হইত না। কারণ, পাণ্ডারা যখন দেখিল যে বাবুদের সঙ্গে "মা-জী" রহিয়াছেন,—তখন ইঁহারা পুষ্কর সাবিত্রী যাত্রী না হইয়া যান না। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। আমার এক আত্মীয় (ডাক্তার) গয়াতে প্লেগের স্পেশ্যাল ডিউটিতে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। সঙ্গে স্ত্রীলোকেরাও ছিলেন। ডাক্তার মানুষ—হ্যাট-কোট পরাই ছিল। গয়া ষ্টেশনে নামিবামাত্র পাণ্ডারা তাঁহাকে "পাকড়াও" করিল—তিনি পরিত্রাণ পাইবার আশায় বলিলেন—"হাম হিন্দু নেহি হ্যায়, হাম খ্রীষ্টান হ্যায়।" পাণ্ডারা বলিল—"নেহি হুজুর, আপকো সাথ মাইজী লোগ হ্যাঁয়।" সুতরাং এক্ষেত্রেও আমাদের সঙ্গে যখন "মাইজী" রহিয়াছেন, তখন আমরা যাত্রী না হইয়া যাই না।

অনেক কষ্টে পাণ্ডাদের হাত এড়াইয়া হিন্দু হোটেলে পৌঁছিলাম।

সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোটেল। ঘরগুলিতে ম্যাটিং পাতা, প্রচুর আলো ও বাতাস। সাধারণ যাত্রী বাড়ীতে যেরূপ হট্টগোল হয়—এখানে তাহার কিছুই নাই—চারিদিক্ নিস্তব্ধ। চাকর বাকরেরা নিঃশব্দে স্ব স্ব কার্য্য করিয়া যাইতেছে। উঠানের চারিদিকে বড় বড় টবে করিয়া পাতা বাহার ও ফুলের গাছ।

হোটেলের আহার্য্য গ্রহণ করিতে আমাদের আপত্তি থাকাতে আমরা শুধু একখানি ঘরই ভাড়া লইলাম। আমাদের রন্ধনের ব্যবস্থা আমাদের ঘরেরই সন্নিহিত রান্নাঘরে আমরা করিতে পারিতাম, কিন্তু পথশ্রমে সকলে ক্লান্ত থাকাতে সে রাত্রির মত বাজারের খাবার আনাইয়াই চালাইয়া দেওয়া গেল।

পরদিন প্রাতে আমরা সাবিত্রী পাহাড় ও পুষ্করতীর্থে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। একখানি ঘোড়ার গাড়ী ডাকিবার জন্য করুণাবাবু ও আমি রাস্তায় বাহির হইয়াছি, এমন সময়ে আমাদের হোটেলের নীচেই একটি দোকান হইতে একজন ভাঙ্গা বাংলায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয় আপনারা কি বাঙ্গালী?"

ভদ্রলোকটির শ্মশ্রু আবক্ষলম্বিত, মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, গায়ে চুড়িদার পিরিহাণ—দেখিয়া পশ্চিমদেশীয় মুসলমান বলিয়াই মনে হইল। সুদূর রাজপুতানায় চারি[illegible]দেশীয় মধ্যে পরিচিত ভাষা শুনিয়া আমাদের যে [illegible] হইল তাহা বর্ণনাতীত। আমরা বলিলাম—"হাঁ [illegible]ও কি বাঙ্গালী?" তিনি বলিলেন—"এক [illegible] ছিলাম বটে। এখন পাঞ্জাবী হইয়া গিয়াছি। [illegible]মার পিতামহ বাংলা হইতে এখানে

আসিয়া এই দোকান খোলেন। আমরা তিন-পুরুষ আজমীরে বাস করিতেছি।" বিদেশীরা অল্প বাংলা শিখিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় যেরূপ কথা কহেন, এই ভদ্রলোকটির ভাষাও সেইরূপ। ভাবিলাম, হায় রে! তিন পুরুষেই মাতৃভাষা এইরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে—আর দুই পুরুষ পরে ত চিহ্ন মাত্রও থাকিবে না।

এই সময়ে একটি পাণ্ডা (তাহার চেহারা দেখিয়া পাণ্ডা বলিয়াই মনে হইল) আসিয়া আমাদের "পাকড়াও" করিল। বলিল—"বাবু, কাল সন্ধ্যায় আপনাদের ষ্টেশনে দেখিয়াছিলাম। আপনারা এই হোটেলে আসিলেন তাহাও নজর করিলাম। আপনদের পুষ্কর যাওয়া হইবে কখন ?"—এই কথা শুনিয়া, এবং তাহার চেহারা চরিত্র দেখিয়া আমাদের মনে কিছু সন্দেহ হইল। নূতন স্থান—কি জানি শেষে কি চোর বদমায়েসের হাতে পড়িয়া বিপন্ন হইব ? বিশেষতঃ পুষ্কর যাইবার পথ সেই নির্জ্জন পাহাড়ের রাস্তা দিয়া। করুণাবাবু আমার মুখের পানে চাহেন। আমি করুণাবাবুর মুখের পানে চাহি। শেষে করুণাবাবু দোকানদার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"Is this man reliable ?"—(অর্থাৎ, "এ লোকটা কি বিশ্বাসী ?") বাবুটি উত্তরচ্ছলে দীর্ঘদাড়ি দোলাইয়া কম্পিত স্বরে বলিলেন, "হুঁ"।

তাঁহার উত্তর দিবার ভঙ্গী দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল, বোধ হয় ভদ্রলোক ইংরাজী জানেন না। একটু মজা করিবার অভিপ্রায়ে আমি পুনরায় ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ লোককে সঙ্গে লইলে ভয়ের কোনও কারণ নাই ত ?"

তিনি পূর্ব্ববৎ বলিলেন—"হুঁ।" আমার সন্দেহ, বিশ্বাসে পরিণত হইল। করুণাবাবু আরও দুই একটি প্রশ্ন ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবুটির মুখটি ক্রমে চিন্তাযুক্ত ও ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। বৃথা দেরী হইয়া যাইতেছে ভাবিয়া আমি পরিষ্কার মাতৃভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই লোকটি কি আপনার জানিত ও বিশ্বাসী ?"

তৎক্ষণাৎ বাবুটির মুখ হইতে চিন্তার ভাব দূর হইয়া গেল। তিনি বলিলেন—"ওঃ! ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন ? হাঁ, ইহাকে আমি অনেকদিন হইতেই জানি। স্বচ্ছন্দে সঙ্গে লইতে পারেন।"

পুষ্কর যাতায়াতের একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করা গেল। ভাড়া এমন কিছু অধিক নহে, প্রত্যেক জনপ্রতি আনা-ছয় করিয়া পড়িল।

পুষ্কর আজমীর হইতে সাত মাইল দূর। রাস্তাটি প্রথম কয়েক মাইল সমতল ভূমির উপর দিয়া গিয়া এক পর্ব্বতের পাদমূলে গিয়া পড়িয়াছে। সেখান হইতে চড়াই আরম্ভ হইয়া পর্ব্বতের গা বাহিয়া সেই রাস্তা অনেক দূর আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়া অপর দিকে নামিয়াছে। এই রাস্তা দিয়া ঘোড়াগাড়ী অনায়াসে যাইতে পারে। পর্ব্বতের ওপারে যাইবার আর একটি সঙ্কীর্ণ পথ আছে—সেটি ধরিয়া যাইলে অতি শীঘ্র পাহাড়ের ওদিকে পৌছান যায়। এপারে সমতলভূমি হইতে রাস্তা পাহাড়ের উপর খানিকটা উঠিয়া হঠাৎ ডানদিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। যেখানে এই বাঁক, সেইখান হইতেই সঙ্কীর্ণ রাস্তাটি আরম্ভ হইয়াছে। প্রশান্ত ও মাকে লইয়া গাড়োয়ানকে যাইতে বলিয়া আমি ও করুণাবাবু সেই বাঁকের মুখে নামিয়া পড়িলাম। পদব্রজে যাহারা আজমীর হইতে পুষ্কর আসে, তাহারা গাড়ীর পথ না ধরিয়া এই পথ দিয়াই যাতায়াত করে, ইহাতে অনেকটা সময় বাঁচিয়া যায়।

আমি ও করুণাবাবু এই সংক্ষিপ্ত পথ দিয়া পাহাড়ের ওপারে নামিয়া গেলাম। সেদিন অনেক যাত্রী পুষ্কর যাইতেছিল—আমাদের সঙ্গীর অভাব হইল না। পাহাড় হইতে নামিয়া একটি বৃক্ষছায়ায় বসিয়া আমরা শ্রান্তিদূর করিতেছি, এমন সময়ে আমাদের গাড়ী আসিয়া পৌছিল। আমরা পুনরায় গাড়ীতে চড়িলাম। সেখান হইতে পুষ্কর পৌছিতে আধঘণ্টার কিছু বেশী লাগিল।

পুষ্কর একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামের মধ্যস্থলে বহুদূর-ব্যাপী পুষ্কর-হ্রদ। হ্রদের ঠিক ধারেই পাণ্ডাদের যাত্রী বাড়ী, দেবমন্দির ও রাজপুতানার সম্ভ্রান্ত লোকদের

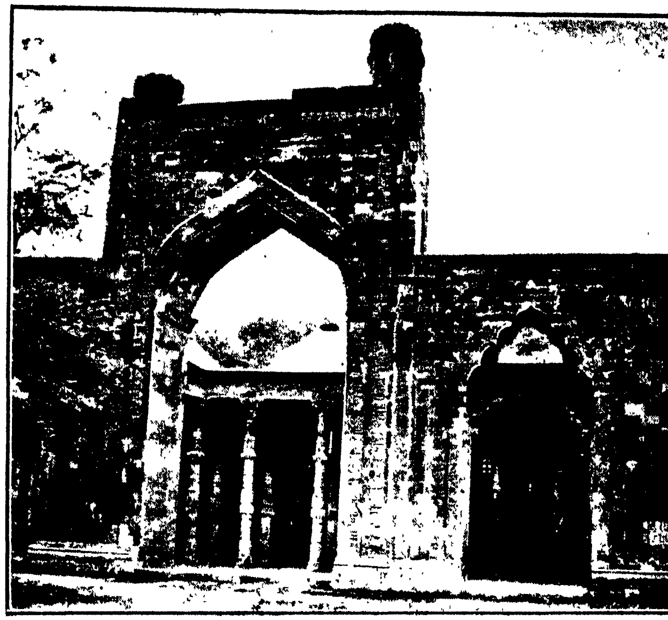
বাসভবন। পুষ্কর হ্রদে বড় বড় হাঙ্গর, কুমীর ইচ্ছা-সুখে বিচরণ করিতেছে—তাহাদের কেহ কিছু অনিষ্ট করিতে পারে না।

প্রবাদ আছে, পুষ্করে স্নান পূজা করিলে ও সাবিত্রী দর্শন করিলে এ জন্মের বিধবাদের পরজন্মে আর বৈধব্য ভোগ করিতে হয় না।

এখানে শীতকালে একটি বৃহৎ মেলা বসে, তাহাতে এই ক্ষুদ্র গ্রামটিতে বিস্তর লোক সমাগম হইয়া থাকে। সে সময় এখানে গরু, মহিষ, ঘোড়া, উট, ভেড়া প্রভৃতি ও অন্যান্য পণ্য-দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় চলিতে থাকে।

পুষ্করে মার স্নান ও পূজা শেষ হইলে আমরা সাবিত্রী পাহাড় দেখিতে চলিলাম। পাহাড়টি পুষ্কর হইতে মাইল তিন হইবে। রাস্তাটি কিছুদূর পুষ্কর গ্রামের ভিতর দিয়া গিয়া এক বালির পাহাড়ের উপর পড়িয়াছে। সেই বালির পাহাড় ভাঙ্গিয়া আরও কিছু দূরে সাবিত্রী পাহাড়ের পাদমূল। মার জন্য একখানি ছোট খাটুলী বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। দুইটী জোয়ান লোক এক একটি খাটুলীর বেহারা। তাহারা একজন মানুষকে খাটুলীতে চড়াইয়া অবলীলাক্রমে সেই বালির পাহাড় ভাঙ্গিয়া সাবিত্রী পাহাড়ের শীর্ষদেশে চড়াইতে ও নামাইতে পারে। ভাড়া একটাকা, বড় জোর পাঁচসিকা। গয়াতে পাহাড়ের উপর উঠিবার যেরূপ পাকা শান-বাঁধান সিঁড়ি আছে, এখানকার সিঁড়ি ঠিক সেইরূপ নহে। পাহাড় কাটিয়া সিঁড়ির মত ধাপ তৈয়ারী করিয়া রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে।

পাহাড়ের উপর একটি সুন্দর ছোট মন্দির। তাহাতে সাবিত্রী ও সরস্বতীদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মা পূজাদি করিতে লাগিলেন, আমরা এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। পূজা শেষ হইলে পূজারী

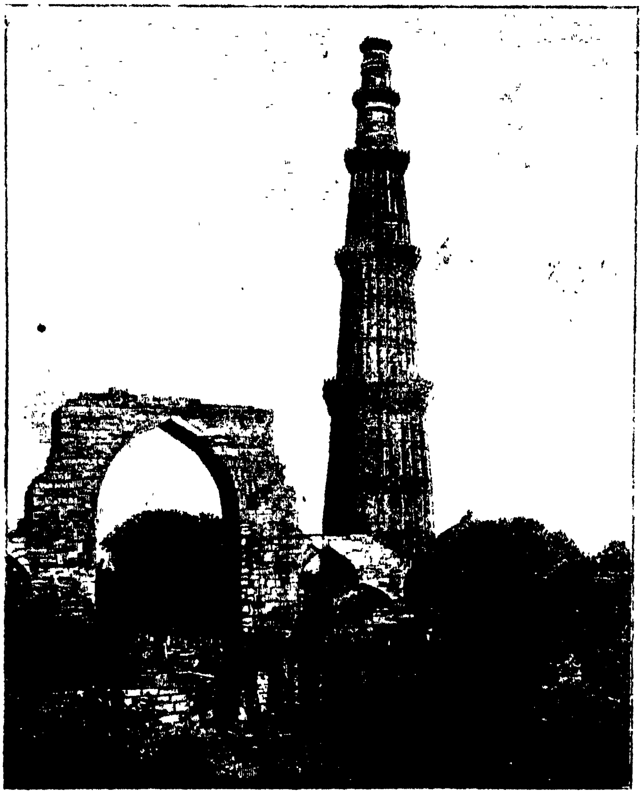


দিলখুশা

আমাদিগকে প্রসাদী ফুলের মালা গলায় পরাইয়া দিলেন ও প্রসাদী সরবৎ পান করিতে দিলেন।

আজমীর হইতেই রাজপুতানার মরুভূমি আরম্ভ। পাহাড়ের উপর হইতে দেখিলাম, নীচে একদিকে পুষ্কর হ্রদ পরিবেষ্টন করিয়া বৃক্ষবহুল পুষ্কর গ্রামটি—ঠিক যেন ছবিখানি। পুষ্করের কিছুদূরে আজমীর সহর ও পুষ্করের মধ্যবর্ত্তী পাহাড়। বাকী তিনদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল ধূ ধূ বালি।

পূজা প্রভৃতি শেষ হইয়া গেলে আমরা যখন নামিয়া আসিলাম, তখন বেলা দ্বিপ্রহর। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। সঙ্গে ছাতি ছিল—কিন্তু ছাতি থাকিলে কি হয়, ছাতির কাপড় ও বাঁট এরূপ তাতিয়া উঠিল যে আমার মনে হইতে লাগিল, আর বেশীক্ষণ ঐ মরুভূমিতে থাকিলে আমাদের ছাতিতেই আগুন ধরিয়া যাইবে। একে সেই রৌদ্র, তাহাতে সেই বালির পাহাড় আবার ভাঙ্গিতে হইবে—যেন সোণায় সোহাগা ! আমাদের সকলেরই অত্যন্ত তৃষ্ণা পাইয়াছিল—চারিদিকে



দিল্লী কুতুব মিনার।

তখন আবার দ্বিগুণ উৎসাহে পথবাহন; কিছুদূর আসিয়া—কৈ, কোথাও ত কিছু নাই—চারিদিকে ধূ ধূ বালি, যাহা জল বলিয়া মনে হইয়াছিল তাহা মরীচিকা মাত্র! তখন তাহাদের যে কি কষ্ট হয়, তাহা, কলিকাতাবাসীর বোধগম্য হওয়া কঠিন। তাঁহারা যে কল খুলিলেই জল প্রচুর পরিমাণেই পান।

যাহা হউক, পুষ্করে ফিরিয়া আসিয়া জল খাইয়া বাঁচিলাম। তাহার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া দোকান হইতে লুচী, তরকারী, আচার, মিঠাই প্রভৃতি আনাইয়া আহার করিয়া অত্যন্ত আরাম অনুভব করা গেল।

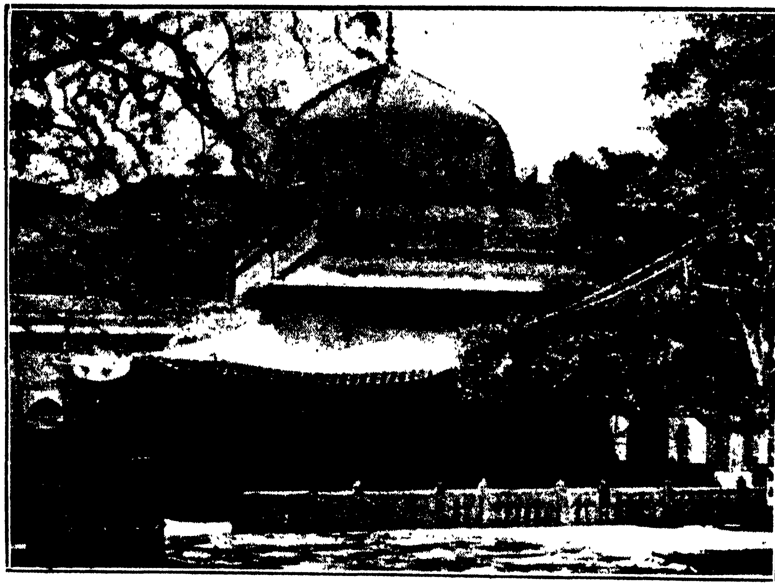
বেলা তিনটার সময় পুষ্কর হইতে রওয়ানা হইয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আজমীর ফিরিয়া আসিলাম।

তৎপরদিন সকালে উঠিয়া আজমীর সহর দেখিবার যোগাড় করা গেল। ঘণ্টা-হিসাবে একখানি গাড়ীভাড়া করিয়া আমরা সহর দেখিতে বাহির হইলাম। এই স্থানে আজমীর সহরের একটু ইতিহাস বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

দেড় মাইলের মধ্যে জলের চিহ্নমাত্রও নাই। তখন মরুভূমি যে কি ব্যাপার তাহা কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। যাহা হউক, মনে আশা ছিল যে আর কিছুদূর যাইলে জল পাওয়া যাইবেই, তখন আকণ্ঠ পুরিয়া পান করিব।

"সাজাহান" থিয়েটারে দেখিয়াছিলাম, দারা স্ত্রী কন্যাসহ গুজরাটের মরুভূমিতে পলায়ন করিয়াছে—চারিদিকে কোথাও জল নাই। দারার স্ত্রী ও কন্যা "জল, জল" করিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। তাহাদের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া মনে বিশেষ কিছু কষ্ট অনুভব করি নাই। এখানে আসিয়া বুঝিতে পারিলাম, মরুভূমিতে যাহাদের তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহাদের কি অবস্থা হয়। নিকটে কোথাও জলের চিহ্ন নাই,—আরও কিছুদূর গিয়া মনে হইল—দূরে ঐ বুঝি তরুছায়া-সুশীতল জলাশয়—আর ভাবনা নাই,—

১৪৫ খ্রীষ্টাব্দে চৌহানবংশীয় রাজা অজ, তারাগড় পর্ব্বতের সানুদেশে আজমীর সহর ও দুর্গের প্রতিষ্ঠা করেন। অজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই সহরের নাম অজ-মের বা আজমীর। তারাগড় পর্ব্বতের চূড়ায় দুর্গ ও পর্ব্বতের ক্রোড়ে সহর। সহর পরিবেষ্টন করিয়া একটি প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীর, তাহাতে পাঁচটি বড় বড় সিংহদ্বার। দেওয়ালটি পর্ব্বতের উপর দিয়া উঠিয়া দুর্গের প্রাচীরের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। মোগল সম্রাটগণ যখন আজমীরে আসিতেন তখন তাঁহারা এই দুর্গেই বাস করিতেন। দুর্গের মধ্যে আজকাল ইংরাজ-রাজের তহশীল অফিস রক্ষিত। এই দুর্গের ভিতর



দরগা খাজা সাহেব।

একটি সাধুর সমাধিস্থান আছে—তাহার নাম 'গঞ্জ শাহিদ্দান।'

তারাগড় পর্ব্বতের নীচে উপত্যকায় মোগল রাজগণ-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি উদ্যান বাটিকা আছে। ইহার নাম "নূর চশমা।" মলদেব রাঠোর নামক এক-জন সর্দ্দার তারাগড় পর্ব্বতের উপর জল তুলিবার এক কলের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আজমীরের উত্তর ফটক হইতে তিন মাইল দূরে "অনাসাগর।"

রাজা অজের পুত্র অনা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া এই সুবৃহৎ জলাশয়ের নাম অনাসাগর। ইহা একটি হ্রদ বিশেষ। ইহার তীরে "দৌলতবাগ" ইহা এক সময় মোগলসম্রাটদের বিলাসকানন ছিল। শুধু কয়েকটি বহু পুরাতন বৃক্ষ ইহার পূর্ব্বগৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই বাগানের মধ্যে আজকাল আজমীর-মারওয়াড়ার চীফ-কমিশনরের আরামবাটী। বাগানের মধ্যে অনাসাগরের তীরে সম্রাট সাজাহান সুন্দর সুন্দর মার্ব্বল-নির্ম্মিত দালান তৈয়ারী করাইয়া ছিলেন। এই জলাশয় ও মার্ব্বল-প্রাসাদ মোগল সম্রাটদের উদ্যানবাটিকা ছিল। এক সময়ে কত নর্ত্তকীর নূপুরশিঞ্জিতে এই দৌলতবাগ মুখরিত ছিল। কালের করাল গতি! এখন তাহার কিছুই নাই—সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে—শুধু চারিটি দালান মাত্র অবশিষ্ট আছে—তাহাই এখন মোগল সম্রাটদের বিলাসিতার মূক সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ঠিক অনাসাগরের তীরেই মোগল অন্তঃপুরিকাগণের জন্য "হামাম্" বা স্নান কক্ষের চিহ্ন এখনও দেখা যায়।

তারাগড় পর্ব্বতের পাদমূলে উপত্যকার উপর আড়াই-দিনকা-ঝোপড়া নামক মসজিদ। পূর্ব্বে ইহা চৌহানরাজ বিশলদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হিন্দু-বিদ্যালয় ছিল। শুনা যায়, মহম্মদ ঘোরী এই বিদ্যালয় ধ্বংস করিয়া ইহাকে মসজিদে পরিণত করেন। কথিত আছে, মহম্মদ ঘোরী একদিন এই পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এই সুন্দর হিন্দু বিদ্যালয়টি দেখিয়া আজ্ঞা দিলেন যে, আড়াই দিন পরে তিনি যখন পুনর্ব্বার এই পথ দিয়া ফিরিবেন, তখন যেন এখানে বসিয়া নমাজ পড়িতে পারেন।

আবার কাহারও কাহারও মতে পূর্ব্বে ইহা একটি জৈন মন্দির ছিল। দশম শতাব্দীতে ইহার অস্তিত্বেরও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দে আলতামস, তদানীন্তন আজমীররাজাকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া আড়াই দিনে এই মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করেন—তাই ইহার এরূপ নাম।

ধ্বংস যিনিই করিয়া থাকুন, মন্দির ধ্বংসের সঙ্গে



দরগার পুষ্করিণী।

সঙ্গে হিন্দু শিল্পও যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হিন্দু বিদ্যা-মন্দিরের পশ্চিম-দিকের স্তম্ভগুলি ও ছাত শুধু রাখিয়া, হিন্দুর শিল্পের নিদর্শন আর যাহা কিছু ছিল সব বিধ্বস্ত হইয়াছিল। সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পাঠান রাজ এমন এক সুন্দর সাতখিলান ওয়ালা [illegible] ([illegible]) নির্মাণ করাইয়াছিলেন যাহা দেখিয়া মুসলমান শিল্পের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

এই প্রকাণ্ড খিলান শ্রেণীর দুইদিকে দুই মিনারেট। দিল্লীর কুতব-মিনার অপেক্ষাও নাকি এই খিলান অধিকতর সুন্দর। ফার্গুসন সাহেব বলেন—এই মসজিদের কারুকার্য্যের সহিত কাইরো, পারস্য, স্পেন বা সিরিয়ার কোন কারুকার্য্যের তুলনা হইতে পারে না।

আজমীরের **মেও কলেজ** একটি দ্রষ্টব্য স্থান। সুপ্রশস্ত বাগানের মধ্যস্থলে এই কলেজ অবস্থিত। এখানে সাধারণে পড়িতে পায় না। ইহা শুধু রাজপুতানার রাজপুত্রগণ ও আভিজাত্য সম্প্রদায়ের ছেলেদের ইয়োরোপীয় মতে শিক্ষা দিবার জন্য লর্ড মেও ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে এই কলেজ বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। রাজপুত্রদিগকে ভবিষ্যতে যে গুরুতর দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার লইতে হইবে, যাহাতে তাঁহারা সে কার্য্যের উপযুক্ত হন সেই অভিপ্রায়ে এই কলেজের সৃষ্টি।

আজমীর সহরের দক্ষিণ ভাগে **দর্গা খাজা সাহেব**। এখানে মৈনুদ্দিন চিস্তী নামক এক মহাত্মা পীরের সমাধি আছে। সমাধির চারিপাশে ছোটবড় নানারূপ মসজিদ—ও একটি পুষ্করিণী—সবটা মিলিয়া এই দর্গা। এটি মুসলমানদের একটি পবিত্রতীর্থ। বহু-শতাব্দী হইতে নানা দেশের মুসলমান আসিয়া এখানে পূজা দিয়া থাকেন। খাজা সাহেবের বংশধর এই মশজিদের প্রধান মোল্লা।

দরগার প্রবেশ দ্বারের নাম "দিলখুসা।" দ্বার পার হইয়া এক প্রশস্ত অঙ্গন, তাহার একদিকে দুইটি বৃহৎ বৃহৎ ডেগ্‌চি। ইহার কথা পরে বলিতেছি।

১২৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্রাট্ আকবর মানত করিয়া ছিলেন যে যদি তাঁহার পুত্রসন্তান হইয়া বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি আগ্রা হইতে আজমীরে আসিয়া এই দরগায় পূজা দিবেন। ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাজকুমার সেলিম জন্মগ্রহণ করিলেন। দশ বৎসর পরে সম্রাট আকবর তাঁহার মানসিক পূজা দিতে এখানে আসিয়াছিলেন। আগ্রা হইতে আজমীরের পথে যেখানে যেখানে তিনি বিশ্রাম করিয়াছিলেন সেখানে সেখানে স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন—এই স্তম্ভগুলি আজিও দেখা যায়।

এই থানেই সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের

জানুয়ারী মাসে ইংলণ্ডের রাজদূত সার টমাস রো'র সহিত সাক্ষাৎ করেন।

এই দরগায় সম্রাট আকবর ও সাজাহান উভয়েই এক একটি মসজিদ নিৰ্ম্মাণ করাইয়া দেন, তাহার মধ্যে আকবরেরটি এখন ধ্বংসোন্মুখ। সাজাহান নিৰ্ম্মিত শ্বেত মার্ব্বলের মসজিদটি অতি সুন্দর।



আকবর।

আলতামসের রাজত্বে এই দরগার নিৰ্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া হুমায়ুনের রাজত্বকালে শেষ হয়। চিতোর ধ্বংস করিবার পর আকবর বড় বড় ঢাক, দামামা, বাতিদান প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য এই দরগায় উপহার দিয়াছিলেন।

খাজা সাহেবের সমাধিটি চতুষ্কোণাকৃতি গম্বুজ—দুই দিকে দুইটি দরজা—তাহার একটির উপর রৌপ্যনির্ম্মিত খিলান। সমস্ত দরগাটি এগারোটি খিলানের উপর নির্ম্মিত। খিলানের ঠিক উপরেই সমস্ত দরগা ঘিরিয়া ফুল লতা পাতার মধ্যে পারসী "বয়েৎ" খোদাই করা।

দরগার মধ্যস্থলে পাথর কাটিয়া নির্ম্মিত একটি অপ্রশস্ত ও গভীর জলাশয়—তাহার দুই পাড়ে সুন্দর সুন্দর শ্বেতমার্ব্বলের সমাধি। এই পুষ্করিণীতে নামিবার জন্য বেশ প্রশস্ত সোপানাবলী রহিয়াছে। তীর্থ যাত্রী যাহারা এখানে পূজা দিতে চায়—তাহারা এক অভিনব উপায়ে পূজা দেয়। তাহা এইরূপ :—পূর্ব্বেই বলিয়াছি উঠানে দুইটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডেগ্ আছে। একটি বড়, অপরটি অপেক্ষাকৃত ছোট। পূজা দিতে হইলে এই ডেগে পোলাও রন্ধন করিবার খরচ দিতে হয়। বড় ডেগের পোলাওয়ের খরচ প্রায় হাজার টাকা, ছোট ডেকে তাহার অর্দ্ধেক বা কিছু কম। এই ডেগে চাল, ঘি, চিনি, বাদাম, কিসমিস ও অন্যান্য মশলা দিয়া পোলাও চড়াইয়া দেওয়া হয়। রান্না যখন শেষ হয়, তখন বড় বড় মাটীর পাত্রে করিয়া আটপাত্র পোলাও বিদেশী যাত্রীদের জন্য আলাদা করিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়। বাকী পোলাও লুঠ হয়। আমাদের হরির লুঠের মত। দরগার চাকর বাকর ও আজমীরের মুসলমানেরা (ইহাদের ইন্দ্রকোটি কহে) এই পোলাও, বংশ পরম্পরাক্রমে লুঠ করিয়া আসিতেছে। ইহা তাহাদের বংশানুক্রমিক স্বত্ব।



জাহাঙ্গীর।

সেই উত্তপ্ত পোলাও লুঠ করিবার জন্য চোখ পর্য্যন্ত ঢাকা দিয়া লুণ্ঠনকারিগণ ডেগের ভিতর লাফাইয়া পড়ে। উদ্দেশ্য সদ্য-রন্ধিত পোলাও তাপে শরীর যাহাতে পুড়িয়া না যায়, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কাহাকেও

পুড়িয়া মরিতে দেখা যায় না। এখানকার লোকেরা বলে—পীর মৈনুদ্দিন চিস্তী তাঁহার ভক্তদের অগ্নি হইতে রক্ষা করেন।



সাজাহান।

হিন্দু মুসলমান সকলেই এই প্রসাদী পোলাও ক্রয় করিয়া থাকেন। কোন জাতিই এই অন্ন গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করে না।

আমাদের আজমীর দেখা শেষ হইল। হিসাব করিয়া দেখা গেল যে যদি আমরা চিতোর, উদয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি আরও পশ্চিমে যাই, তাহা হইলে বাড়ী ফিরিতে আমাদের কনসেশন টিকিটের নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। পূজার ছুটি বেশী দিন পাই নাই, তাই আর পশ্চিম যাওয়া হইল না। ফিরিবার পথে মাকে বৃন্দাবন ও মথুরা দর্শন করাইতেই হইবে। সুতরাং আমরা জিনিষপত্র বাঁধিয়া একদিন রাত্রের মেলে আজমীর ছাড়িলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

পাল সাম্রাজ্যের অধঃপতন

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউসে

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের

বক্তৃতার সারাংশ]

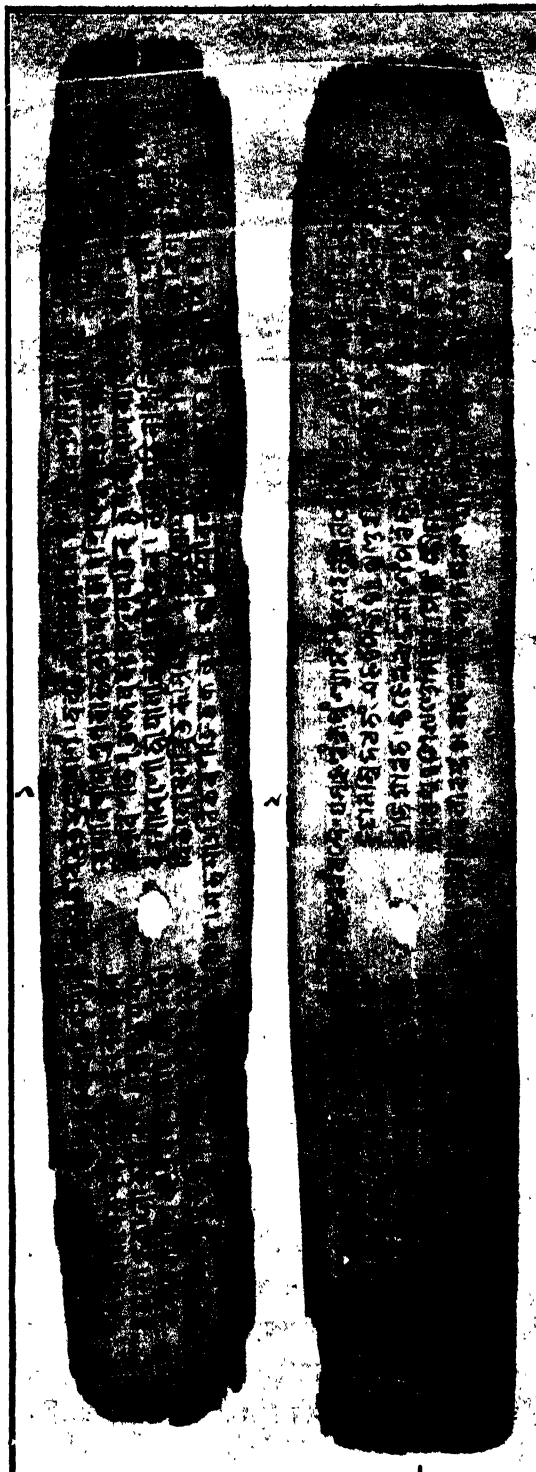
সম্মিলিত সৈন্যসামন্ত লইয়া স্বয়ং অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে, রামপাল বরেন্দ্রভূমির অবস্থা বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত হস্তী-অশ্ব-সমন্বিত সেনা সমভিব্যাহারে মহাপ্রতীহার শিবরাজকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বরেন্দ্রভূমির পর্য্যবেক্ষণ ব্যতীত এই কার্য্যে হয়ত আরও একটি সুবিধা ঘটাইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল। শিবরাজ যে পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, রামপালের সমুদয় সৈন্য হয়ত সেই পথেই বরেন্দ্র আক্রমণ করিবে, ইহা মনে করিয়া, শত্রুপক্ষ হয়ত সেই দিকেই সমগ্র বল একত্র করিয়াছিল। সুতরাং শিবরাজকে প্রেরণ করিয়া রামপাল রণকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়।

রাম চরিতের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৪৬ ৫৭ শ্লোকে এই 'রাষ্ট্রকূট মাণিক্য' শিবরাজের পরিচয় পাওয়া যায়। শিবরাজ কোন্ পথে বরেন্দ্রভূমির দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, 'রামচরিত' কাব্যে তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু তিনি হস্তীযোগে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় যে, যেখানে হাঁটিয়া নদীপার হওয়া যায় এমন কোনও স্থলেই তিনি নদী উত্তীর্ণ হইয়া থাকিবেন। হনুমান যেমন অশোকবনে সীতাকে অভয় প্রদান করিয়া, রাক্ষস

রক্ষিগণকে পরাভূত করিয়া, এবং লঙ্কার ধ্বংসসাধন করিয়া, সীতার সংবাদ সহ রামের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, শিবরাজও সেইরূপ বরেন্দ্রভূমিতে উপস্থিত হইয়া, দেবতা ও ব্রাহ্মণের সম্পত্তির কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না এইরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন; এবং শত্রুপক্ষের সৈন্য পরাজিত ও শত্রুরাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া রামপালের নিকট ফিরিয়া আসিয়া সমুদয় সংবাদ নিবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রমুখাৎ সমুদয় অবগত হইয়া রামপাল বরেন্দ্রভূমি আক্রমণের যথাবিহিত উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

শিবরাজের অভিযান সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "বাঙ্গালার ইতিহাস" নামক গ্রন্থে অন্যরূপ লিখিয়াছেন, যথা—"শিবরাজ বরেন্দ্রী হইতে ভীম কর্ত্তৃক নিযুক্ত রক্ষকগণকে দূর করিয়া দিয়াছিলেন এবং রাজসমীপে প্রত্যাগমন করিয়া রামপালকে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতৃভূমি শত্রুমুক্ত হইয়াছে। শিবরাজকর্ত্তৃক বরেন্দ্রী অধিকার বোধ হয় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই…" (২৫৫ পৃঃ) কিন্তু হনুমানের কার্য্যের সহিত শিবরাজের কার্য্যের তুলনা করিতে দেখিয়া মনে হয়, শিবরাজ কর্ত্তৃক ভীমের পরাজয় বা বরেন্দ্রী অধিকার বর্ণনা করা কবির অভিপ্রেত ছিল না। সুতরাং শিবরাজের অভিযানকে "বরেন্দ্রী-অধিকার" বলিয়া বর্ণনা করা যায় না।

অতঃপর সামন্তচক্র পরিবেষ্টিত হইয়া রামপাল বরেন্দ্র অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। চতুরঙ্গ সেনা-শোভিত রামপালের বিপুল বাহিনীর পক্ষে বরেন্দ্রভূমিতে উপস্থিত হওয়া একটি বিশেষ দুরূহ ব্যাপার হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কারণ বরেন্দ্রভূমির উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত; এবং অপর সকল দিক্ নদীস্রোতে সুরক্ষিত। নদী পার হইতে না পারিলে রামপালের পক্ষে বরেন্দ্রভূমিতে উপনীত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কোন্ স্থানে রামপালের সৈন্য নদী পার হইয়াছিল, রামচরিতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কিন্তু আনুসঙ্গিক বর্ণনা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এই স্থানটি বর্ত্তমান রাজসাহী



জেলার অবস্থিত বরেন্দ্রীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। গঙ্গা ও মহানন্দার সংযোগস্থলে অবস্থিত থাকায় বরেন্দ্র-ভূমির এই প্রদেশটি অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত বলিয়াই চির-কাল পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুনঃ পুনঃ বর্গীর আক্রমণে বিধ্বস্ত হইবার সময় বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ নিরাপদ বিবেচনায় এই প্রদেশেই কেল্লা বারুইপাড়া নামক অধুনা-বিলুপ্ত দুর্গমধ্যে তাঁহার পরিবারবর্গের আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। এইরূপ স্বভাব-সুরক্ষিত বলিয়া রামপালের আক্রমণ সময়ে এই প্রদেশ রক্ষার্থ হয়ত অতি অল্পসংখ্যক সৈন্যই এইস্থানে অবস্থিত ছিল। রামপাল তাঁহার বিপুল বাহিনী লইয়া অন্য কোনও দিক দিয়া অগ্রসর হইলে, তাঁহার গতিবিধি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, এবং তাঁহার পক্ষে নদী পার হওয়া বিশেষ কষ্টকর হইত। রামপাল এইস্থান হইতে কিছু দূরে গঙ্গাতীরে বিপুল নৌ-বাহিনী সংগ্রহ করিয়া সমুদয় সৈন্যসহ যাত্রা করিয়াছিলেন এবং শত্রুপক্ষ সংবাদ পাইয়া বিশেষ বাধা দিবার পূর্ব্বেই সম্ভবতঃ গঙ্গাপার হইয়া এইস্থানে পৌছিয়াছিলেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের রামচরিতের ভূমিকায় এই ঘটনা অন্য রূপে বিবৃত হইয়াছে। তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, রামপাল নৌসেতুর সাহায্যে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। (The alli d army threw a b.idge of boats on the Ganges) রামচরিতের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের দশম শ্লোকের টীকায় "নৌকামেলকেন" কথাটি আছে, সম্ভবতঃ তাহার জন্যই এরূপ সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিবে। মূল শ্লোকটি এই—

"তস্য ম(মা)হা বাহিন্যাং গুপ্তায়াং তরণিসম্ভবেনাভূৎ।
দ্বিবমভিষেণয়তো (১) মুখরিত দিক্কোলাহলঃ সমুত্তারঃ॥"

এই শ্লোকের রামপালপক্ষের টীকা এইরূপ—"মহাবাহিন্যাং গঙ্গায়াং তরণিসম্ভবেন নৌকামেলকেন গুপ্তায়াং ছন্না (যাং) সমুত্তারঃ সম্যগুত্তরণং মুখরিত দিক্কোলাহলো * যস্মিন্।"

ইহা হইতে দেখা যায় যে, রামপাল যখন শত্রু-সেনাভিমুখে "অভিষেণন" করিতে করিতে 'নৌকামেলকে' গঙ্গাবক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া সৈন্যসামন্তসহ অপর পারে উত্তীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহার সৈন্যসামন্তের জয়োল্লাসে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত হইয়াছিল;—তাহাদের সেই "সমুত্তার"-ব্যাপার এমন কোলাহলময় হইয়াছিল যে তাহাতে দিক্ সমূহ যেন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

এই বর্ণনার সহিত রামপালের নৌসেতুর সাহায্যে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইবার কোনরূপ অর্থসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় না। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়—রামপালের নৌবাহিনী গঙ্গাবক্ষ আচ্ছন্ন করিয়াছিল। এইরূপ বর্ণনা নৌসেতুর প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না, কারণ, নৌসেতু গঙ্গাবক্ষ আচ্ছন্ন করিতে অসমর্থ; বরং বাধা সৃষ্টি করিয়া গঙ্গাবক্ষ তরঙ্গায়িত করিয়া তাহাকে অধিক অনাচ্ছন্ন করিত। টীকাকারও "নৌসেতু" না লিখিয়া "নৌকামেলক" লিখিয়াছেন। নৌসেতু স্থাপনা করিতে হইলে গঙ্গার অপর পারে বরেন্দ্রভূমির কিয়দংশের সহিত সেতুকে সংলগ্ন করিতে হইত। তাহা করিবার উদ্যোগ অবশ্যই বাধাপ্রাপ্ত হইত; আর গঙ্গার ন্যায় খরস্রোতার উপর নৌসেতু নির্ম্মাণ করাও সহজ ব্যাপার হইত না। সুতরাং রামপাল যে বহুসংখ্যক নৌকায় গঙ্গাবক্ষ আচ্ছন্ন করিয়া, উজান হইতে ভাটির দিকে অগ্রসর হইয়া সহসা বরেন্দ্রতটে উপনীত হইয়াছিলেন তাহাই কবির বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত।

রামচরিতের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের একাদশ শ্লোক হইতে দেখা যায় যে, গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া, রামপালের সৈন্যগণ শত্রুপক্ষের 'আবার' বা সুরক্ষিত সুদৃঢ় স্থান

(১) মুদ্রিত গ্রন্থে "অভিসেনয়তো" এইরূপ আছে। ইহাতে কোনও অর্থ হয় না। মূল পুঁথিতে "অভিষেণয়তো" এই পদ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাই গ্রহণ করা গেল।

* এটা একটা ছাপার ভুল। মূল পুঁথিতে "দিক্কোলাহলো" নাই। তাহাতে আছে "মুখরিতদিক্ কোলাহলো যস্মিন্"—সমাস ভাঙ্গিয়া বুঝাইবার জন্য টীকাকার এইরূপই পদচ্ছেদ করিয়া-ছিলেন, মূলপুঁথিতেও তাহা এই ভাবেই লিখিত আছে, মুদ্রিতগ্রন্থে তাহাই "মুখরিতদিক্কোলাহলো যস্মিন্" এইভাবে মুদ্রিত হইয়াছে।

পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। এই "আবার" এখন রাজসাহী জেলার "ভীমের ডাইঙ্গ" নামে পরিচিত।

পরবর্ত্তী নয়টি শ্লোকে কবি সন্ধ্যাকর নন্দী একপক্ষে রামপাল কর্ত্তৃক সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধন এবং অপর পক্ষে রামপাল কর্ত্তৃক বরেন্দ্রভূমির অধিপতি ভীমের বন্দীকরণ, বর্ণনা করিয়াছেন। রামপালের সৈন্যের সহিত ভীমের সৈন্যের ভীষণ সমরকাহিনী কবি অতি অল্পকথায় সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ভীষণ যুদ্ধের পর অবশেষে ভীম পরাজিত হইয়া বন্দী হইলে, তাঁহার রণকুরঙ্গগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল, এবং তাঁহার শিবিরস্থ যাবতীয় ধনসম্পত্তি শত্রুপক্ষের করগত হইল। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে মনে করিয়া রামপাল বিজয়ী সৈন্যগণকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু রামপালের পৈতৃক রাজ্যের অবস্থা এতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল যে, এই যুদ্ধজয়ের পরও বরেন্দ্রের অধিবাসিগণ তাঁহাকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিল না; পরন্তু ভীমের সুহৃদ্ হরি ভীমের ছত্রভঙ্গ সৈন্যগণের মধ্যে পুনরায় সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করিয়া, রামপালের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন।

রামচরিত কাব্যের যে অংশে ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা সমূহ বিবৃত হইয়াছে, তাহার টীকা পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এই অংশের ব্যাখ্যা করা একটি দুরূহ ব্যাপার। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এইরূপ টীকাহীন যে চৌদ্দটি শ্লোক আছে, তাহার ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে, মুদ্রিত গ্রন্থের ভ্রম প্রমাদের সংশোধন করিয়া লওয়া আবশ্যক। ৪২শ শ্লোকের শেষে যে 'ইতি' পদটি মুদ্রিত হইয়াছে, উহা শ্লোকের কোনও অংশ নহে; 'শরকলাপম' এই খানেই শ্লোকের শেষ হইয়াছে। তৎপরে "ইতি কুলকং" এইরূপ পাঠ করিতে হইবে। ৪৪শ শ্লোকের শেষ পদটি "নিবেশয়াস" নহে, "নিবেশয়ামাস;" এবং এই শ্লোকের 'অসজত' স্থলে 'অসজৎ' পাঠ করিতে হইবে। ৪৬শ শ্লোকের "জেতা স পরাক্রমেণ হরেঃ" ইহার স্থলে (মূল পুঁথি অনুসারে) "জেতায়ং পরাক্রমেণ হরেঃ" এইরূপ পাঠ করিতে হইবে।

এই সমুদয় শ্লোকে প্রধানতঃ ভীম বন্দী হইবার পরবর্ত্তী নিম্নলিখিত তিনটি ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। (১) বন্ধনের পর ভীমের পলায়ন (২) ভীম বন্দী হইবার পর হরির সহিত রামপালের যুদ্ধ (৩) হরির পরাজয়ের পর বন্ধনমুক্ত ভীমের সহিত রামপালের পুনরায় যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধে ভীমের পরাজয় ও মৃত্যু।—পরাজয়ের পর হরির অবস্থা কি হইয়াছিল, রামচরিতে তাহার কোনও আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩৬শ শ্লোকে ভীমের সহিত অঙ্গদের এবং রাবণের সহিত 'বিত্তপালস্য-সূনোঃ'র তুলনা করা হইয়াছে। অঙ্গদ যেরূপ রাবণের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন, পরাজয়ের পর ভীমও সেইরূপ রামপাল কর্ত্তৃক "বিত্তপালস্য সূনোঃ"র নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে,—ভীমের এই রক্ষক কে? শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে কেবল 'বিত্তপাল' নামে অভিহিত করিয়াছেন; 'সূনু' এই পদের তিনি কোনও ব্যাখ্যা করেন নাই। শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে,—ভীম রামপালের কোনও কর্ম্মচারীর রক্ষণাধীনে ছিলেন। কিন্তু যদি 'বিত্তপাল' শব্দে কর্ম্মচারী বুঝিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, ভীমের রক্ষক কোনও কর্ম্মচারী নহে,—কর্ম্মচারীর "সূনু" অর্থাৎ ভ্রাতা বা পুত্র, অথবা সেই কর্ম্মচারী কেবল কর্ম্মচারী নহে,—রামপালের ভ্রাতা বা পুত্র। তৎকালে রামপালের আর কোনও ভ্রাতা জীবিত ছিলেন না,—তাঁহার পুত্রগণ জীবিত ছিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রামচরিতের একটি শ্লোকের টীকা হইতে জানা যায়, রামপালের অন্ততঃ তিনটি পুত্র ছিলেন; এবং তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ছিল—'রাজ্যপাল'। মদনপালের মনহলি-লিপি হইতে কুমারপাল ও মদনপাল নামে রামপালের দুই পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। রামচরিতোক্ত রাজ্যপাল এবং তাম্রলিপির কুমারপাল যে অভিন্ন, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। সুতরাং বিত্তপাল রামপালের অবশিষ্ট তৃতীয় পুত্রের নাম

হইলেও হইতে পারে, এবং 'বিত্তপালস্য সূনোঃ' এই শব্দে রামপালের পুত্র বিত্তপাল সূচিত হইয়া থাকিতে পারেন। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথ যক্ষপাল নামে রামপালের এক উত্তরাধিকারীর উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যক্ষপাল ও বিত্তপাল একই অর্থ সূচক। সুতরাং বরেন্দ্রভূমি আক্রমণের সময় রামপাল মগধ ও অঙ্গ প্রভৃতি শাসনের জন্য বিত্তপাল নামক তাঁহার এক পুত্রকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। হয়ত এই ঘটনা হইতেই তারানাথ যক্ষপালকে (বিত্তপালকে) রামপালের উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বন্দীকৃত ভীম বরেন্দ্রের জনসাধারণের প্রিয়পাত্র ;—সুতরাং তাঁহাকে নিহত করিলে বিষম অসন্তোষের সৃষ্টি হইতে পারিত,—আবার তাঁহাকে বরেন্দ্রভূমিতে রাখিলেও বিপদের সম্ভাবনা থাকিত। হয়ত এই সমুদয় বিবেচনা করিয়াই রাজনীতি-কুশল রামপাল ভীমকে রাজ্যের সুদূরবর্ত্তী কোনও প্রদেশে বন্দী করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ভীমের পলায়ন ব্যাপার হইতে এইরূপ একটি সম্ভাবনার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩৭শ শ্লোক হইতে জানা যায় যে, অঙ্গদ যেমন রাবণের স্বল্পসংখ্যক রক্ষিগণকে পরাভূত করিয়া, পুনরায় রামের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, ভীমও সেইরূপ তাঁহার রক্ষকের সৌজন্যে শৃঙ্খলমুক্ত হওয়ায় সুযোগক্রমে পলায়ন করিয়া, পুনরায় যুদ্ধে বহুসংখ্যক লোককে নিহত করতঃ যমরাজের আনন্দ-বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

এদিকে হরির সহিত রামপালের ভীষণ যুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩৮শ হইতে ৪২শ শ্লোকে কবি এই যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছেন। এই কয় শ্লোকে প্রথমে হরির সহিত রামের এবং পরে রামপালের সহিত রামের তুলনা করা হইয়াছে। কুম্ভকর্ণের মৃত্যুতে রামচন্দ্রের যেরূপ হর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, হরিকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া রামপালও সেইরূপ উল্লসিত হইয়াছিলেন। (৪৩শ শ্লোক)। হরিকে পরাভূত করার পরে রামপাল বরেন্দ্রমণ্ডলে প্রভাব বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে কবি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন,—

শক্তির্জগদ্বিজয়িনী (বৃষজয়িনী) বৃষজয়িনস্তস্য সূনুমপ্যসজৎ।
স মূর্চ্ছিতোয়মনয়া ধাম ধরায়াং নিবেশয়ামাস ॥

(২।৪৪)

কবি এই শ্লোকদ্বারা রামপক্ষে, বৃষজয়ীর অর্থাৎ ইন্দ্রজিতের জগদ্বিজয়ী শক্তি দ্বারা লক্ষ্মণের সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূমিতলে পতন ; এবং রামপালপক্ষে বৃষজয়ীর পুত্রের জগদ্বিজয়ী শক্তি দ্বারা বরেন্দ্রভূমিতে স্বীয় প্রভাবের (ধাম) বিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। রামচরিতের চতুর্থ পরিচ্ছেদের অষ্টম শ্লোকে রামপালের মাতুল মথনদেবকে "বৃষজিৎ" বলা হইয়াছে। সুতরাং আলোচ্য শ্লোকের 'বৃষজয়ী' শব্দও সম্ভবতঃ তাঁহাকে সূচিত করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত বিচারসহ হইলে বলিতে হইবে,—মথনদেবের পুত্রই হরিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া (ধরায়াং) বরেন্দ্রভূমিতে (ধাম) প্রভাব (নিবেশয়ামাস) বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হরির পরাজয়ের পর ভীম পুনরায় তাঁহার অধীনস্থ সামন্তরাজগণ লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন। নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোকে অতি কৌশলে কবি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

"উরুতর তরসোপক্রমোৎপাট্যাকৃষ্ট বিপুল ভূমিভৃতা।
তদনু জগৎপ্রাণভুবা সম্পাদিত পরমহৌষধীকেন ॥
তেন প্রতিহতমোহেন লক্ষ্মণেনারিরাকলিতমায়ঃ।
নিন্যে মৃত্যুস্থানং জেতায়ং পরাক্রমেণ হরেঃ ॥"

(২।৪৫, ৪৬)

এই শ্লোকদ্বয়ে কবি বর্ণনা করিয়াছেন যে,—জগৎপ্রাণ-(পবন) পুত্র হনুমান্ কর্ত্তৃক আনীত গন্ধমাদন পর্ব্বতস্থিত মহৌষধি দ্বারা লক্ষ্মণের চৈতন্য সম্পাদিত হইলে, যেমন হরির জেতা ইন্দ্রজিৎ (মৃত্যুস্থানং নিন্যে) যমালয়ে নীত অর্থাৎ নিহত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ভীমও সামন্তরাজ-সমভিব্যাহারে হরির পরাজয়ে উল্লসিত রাম-

পালের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া, হরির জেতাকে (মথনের পুত্রকে) শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এখানে "জগৎপ্রাণভুবা"-শব্দে শ্লেষানুরোধে পবনের পুত্র বলিয়া ভীমকেই সূচিত করা হইয়াছে ; কারণ মহাভারতোক্ত মধ্যম পাণ্ডব ভীমও পবনের পুত্র ছিলেন। শ্লিষ্টকাব্যের (জগৎপ্রাণভুবা) "পবনপুত্র" শব্দ এক অর্থে হনুমানকে অন্য অর্থে ভীমকে বুঝাইতে পারে।

সম্ভবতঃ এই শ্লোকের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়াই মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় রামচরিতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে,—'হরি বধ্যভূমিতে নীত হইয়াছিলেন।' (Hari was taken to the place of execution)। কিন্তু "নিন্যে মৃত্যুস্থানং জেতারং পরাক্রমেণ হরেঃ"ই শ্লোকার্দ্ধ হইতে সেরূপ অর্থ প্রতিভাত হয় না ; ইহাতে স্পষ্টই উল্লিখিত রহিয়াছে যে, যাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, অর্থাৎ যাঁহাকে (মৃত্যুস্থানে) যমালয়ে লওয়া হইয়াছিল, তিনি হরি নহেন,—হরির জেতা।—হরির পরাজয়ের কথা রামচরিতে উল্লিখিত হইলেও, পরাজয়ের পর হরির পরিণাম কি হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সন্ধ্যাকর নন্দী কিছুই বলেন নাই।

ভীম পুনরায় যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া, রামপালের সম্মুখীন হইলে, সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে রামপাল তাঁহাকে তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে নিহত করেন। কবি লিখিয়াছেন,—

"নিহত কুটুম্বস্য পুরো দারুণমাস্কন্দনং কিমপি দধতঃ।
ধৃতচন্দ্রহাসধাম্নালঙ্কারাজঃ কৃতোঽস্য বধঃ॥

(২।৪৯)

কবি এই শ্লোকে একপক্ষে রাম কর্ত্তৃক লঙ্কারাজের বধ এবং অপর পক্ষে রামপালের হস্তে 'কারাজং' অর্থাৎ ভণ্ডরাজা ভীমের নিধন বর্ণনা করিয়াছেন।

এইরূপে দিব্বোক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের ধ্বংস হইল। কবির বর্ণনা হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, প্রজাশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই রাজ্য সহজে রামপালের করায়ত্ত হয় নাই। প্রাচ্যদেশে সাধারণতঃ রাজা বা সেনাপতির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধের অবসান হইত কিন্তু আমরা দেখিয়াছি,—ভীমের মৃত্যুর পরও রামপাল বরেন্দ্র অধিকার করিতে পারেন নাই। ভীমের সুহৃদ হরির নেতৃত্বাধীনে, বরেন্দ্রের প্রজাগণ প্রজাশক্তি প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পুনরায় যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়াছিল। হরির পরাজয়েও এই যুদ্ধের শেষ মীমাংসা হয় নাই। ভীম পুনরায় ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্যদল লইয়া রামপালের বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বরেন্দ্রের প্রজাগণ যতদূর সাধ্য প্রাণপাত করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল,—একে একে ভীমের সুহৃদবর্গ নিহত হইয়াছিল,—কিন্তু এত ত্যাগস্বীকার করিয়াও অঙ্গ মগধাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে বরেন্দ্রের ক্ষুদ্র শক্তি জয়লাভ করিতে পারে নাই ;—রামপাল বিজয়-বাহিনী লইয়া বাহুবলের আতিশয্যে বরেন্দ্র অধিকার করিয়াছিলেন, এবং কৈবর্ত্ত-নায়ক প্রতিষ্ঠিত রাজধানী 'ডমর' (উপপুর) ভূমিসাৎ করিয়াছিলেন।

রামপালের বিপুল বাহিনী কর্ত্তৃক ভীম ও হরির পরাজয় কেবল মাত্র ব্যক্তি-বিশেষের জয় পরাজয় নহে ইহা একটি মহাব্রতের অবসান-কাহিনী। দিব্বোক কর্ত্তৃক এই মহাব্রত আরব্ধ হইয়াছিল, সে ব্রত উদ্‌যাপিত হইবার পূর্ব্বেই রামপালের ক্রীতদাস—সামন্তরাজগণ—তাহার ধ্বংসসাধন করিলেন। এইবার পালরাজগণের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের আরম্ভ হইল। প্রজাশক্তির পরিবর্ত্তে, অর্থবলে ক্রীত সামন্তরাজগণের বাহুবলের উপর নবগঠিত পাল রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু রাজশক্তির এই বিজয়বার্ত্তা, প্রজাশক্তির পরাভব কাহিনীর রূপান্তর মাত্র এবং এইরূপ রাজ্যে প্রতিষ্ঠাই পালরাজ্যের অধঃপতনের প্রথম সোপান।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

উকীল-সাহিত্যিক।

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনেকেই গল্প লেখেন, বাস্তব-জীবনের উপর কাল্পনিক রঙ ফলাইয়া। কিন্তু লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও বিবিধ মাসিকপত্রের লেখক শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন ঘোষ, এম-এ, বি-এল একবার ঠিক ইহার উল্টা করিয়াছিলেন। গল্পের দ্বারায় একটা বাস্তব জীবনের গতি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। ব্যাপারটা তবে খুলিয়াই বলি।

মোহিনীমোহনের পিতা কলিকাতার একজন বিখ্যাত উকীল ছিলেন। মৃত্যুকালে স্বোপার্জ্জিত বহুতর ধন সম্পত্তির সহিত অনেকগুলি বড় বড় মক্কেলও তিনি পুত্রকে দিয়া যান। মোহিনী তখন সবে আইন পাস করিয়াছে। সুতরাং পিতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া শেষ হইলে, বাড়ীর গাড়ীতে চড়িয়া নিয়মিত ভাবেই সে আদালতে যাতায়াত আরম্ভ করিল।

বাল্যাবধিই মোহিত কিন্তু একটু আমোদপ্রিয় ছিল। যখন উকীল হইয়া সংসারে প্রবেশ করিল, তখন তাহার বন্ধুগণ, তাহার পৈত্রিক আফিস-গৃহকে কিছু মাত্র সম্মান না করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেটা ক্লাব হিসাবেই ব্যবহার করিতে লাগিল। যে স্থান প্রতিনিয়ত টাকার ঝনৎকার, মক্কেলের মিনতি ও আর্জ্জি-জবাবের পরামর্শে এক সময় মুখরিত ছিল—এখন সেখানে হার্ম্মোনিয়ম-সঙ্গীত, উচ্চ হাস্য-পরিহাস ও অশেষবিধ খোসগল্প নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিতে লাগিল। ল-রিপোর্ট-গুলার মলাটের উপর চায়ের পেয়ালার গোল গোল দাগ পড়িয়া গেল। ফলে মক্কেলও ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল।

এইরূপে কিছুদিন কাটিল, হঠাৎ মোহিনীর সখ চাপিল, সে লেখক হইবে। আদালত কামাই করিয়া ঘরে খিল বন্ধ করিয়া বসিয়া বসিয়া সে লেখে। বন্ধুগণ আর কলিকা পায় না—মোহিনীর কি হইল, কেন এমন হইল, কিছু বুঝিতেও পারে না। কিছু দিন নিষ্ফল চেষ্টার পর তাহারা অন্যান্য আড্ডায় গিয়া ভর্ত্তি হইতে লাগিল।

সাহিত্যিক হইবার পক্ষে মোহিনীর সকল সুযোগ গুলিই ছিল। নীরোগ শরীর, উচ্চশিক্ষা, পৈত্রিক সম্পত্তি ও অখণ্ড অবসর। সুতরাং এই সকল অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া যখন সে সাহিত্য সভার দ্বারে গিয়া আঘাত করিল তখন দ্বারবান বেচারী থতমত খাইয়া কার্ড চাহিতেও সাহস করিল না। কাগজে মোহিনীর অজস্র লেখা ছাপা হইতে আরম্ভ হইল।

এইরূপে মোহিনী যখন ওকালতীর ডাঙ্গা হইতে সাহিত্যের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, তখন তাহার শুভানুধ্যায়িগণ হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন। এমন কি তাহার স্ত্রী লীলাবতী পর্য্যন্ত এই লইয়া মান অভিমানের পালা আরম্ভ করিয়া দিলেন। যতই মোহিনী বাধা পাইতে লাগিল, ততই সে বুঝিল, যশের পথ কুসুমাকীর্ণ নহে। পূর্ব্ব বন্ধুগণ আশ্চর্য্য হইল, কেহ কেহ দুঃখিতও হইল, এবং অনেকে তাহার লেখার তীব্র সমালোচনাও আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু মোহিনীমোহন কিছুতেই দমিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সে দিন প্রত্যূষেই মোহিনী লিখিবার টেবিলে বসিয়াছিল। লিখিবার প্রবন্ধটা ছিল "বৈদিক ও পৌরাণিক ভারত"। এই জমকাল প্রবন্ধটা জমকাল ভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য মোহিনী যখন শব্দ-ভাণ্ডার হাতড়াইয়া বেড়াইতেছিল, সেই সময় তাহার স্ত্রী লীলাবতী হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিয়া কহিল, "আজ যদি তোমাকে একটা সু-খবর দিই, কি দেবে?"

মোহিনী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অন্যমনস্কভাবে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি বলছ? সুখবর? বেশ!"

"সুখবর বেশ, কিগো! মক্কেল। তোমায় একজন মক্কেল যদি যোগাড় করে দি, দালালী পাব না?"

কলম রাখিয়া স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া মোহিনী বলিল, "সুখবর সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্দর দিয়ে মক্কেল আস্তে আরম্ভ হলে, শেষে আমাকেই উকীল হয়ে মক্কেল হতে হবে যে। ব্যাপারটা কি বল দেখি।"

লীলাবতী হাসিয়া মাথা দুলাইতে দুলাইতে বলিল, "সে ভয় নেই উকীল মশায়, এ মক্কেল আমারই স্বজাতি। আমার একজন বাল্যবন্ধু, তোমার কাছে পরামর্শের জন্যে এসেছে। অবিশ্যি ফীজ্ পাবে, নইলে তোমাকে বিরক্ত করতে আসতুম না।"

উকীল মহাশয় কহিলেন, "তা কি করতে হবে? তাঁকে আমার নমস্কার জানিয়ে স্নানাদি করতে বলগে। আমি এই কয় ছত্র লিখেই আস্‌ছি।"

"সে সব হবে। তাঁর কথা কটা শুনে এসেই তুমি কয় ছত্র লেখা শেষ কোরো এখন। এস গো এস।"—বলিয়া লীলাবতী তাহার জামা ধরিয়া টানিতে লাগিল। স্বামীকে একেবারে সে আপনার শয়ন-গৃহে লইয়া গেল। তাহার সখীটি সেই গৃহেই বসিয়া ছিলেন; মোহিনীমোহনকে আসিতে দেখিয়া ঘোমটা দিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

মোহিনী বাহিরে দ্বারের নিকট একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া কহিল, "এইবার তোমার বন্ধুকে তাঁর বক্তব্য বলতে বল; আমি প্রস্তুত। যদি পরিচয় দেওয়া দরকার মনে করেন, দিতে পারেন।"

লীলাবতী বলিল, "সে কাজটা আমিই করিয়ে দিচ্ছি। সুরমা, পলাশপুরের ভবেন্দ্রবাবুর মেয়ে।"

"ভবেন্দ্রবাবুর মেয়ে! তিনি আমার মক্কেল; আমার পিতৃবন্ধু।"

সুরমা অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে নিম্নস্বরে কহিলেন, "সেই জন্যেই ত আপনার শরণ নিয়েছি। আমরা একটু মুস্কিলে পড়েছি মোহিনীবাবু। সব কথা শুনে লীলাই আমাকে এখানে আস্‌তে বলেছিল। লীলাই বলুক।"

লীলা হাসিয়া বলিল, "বেশ ত! আমিই যদি সব বল্‌ব তবে তোমার আসবার কি দরকার ছিল?"

দুইজনে তখন কি ফুস্ ফুস্—"না ভাই"—"যা ভাই"—গা ঠেলাঠেলি প্রভৃতি হইল। শেষে লীলা হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা আমিই বলছি। ব্যাপারটা কি জানেন, উকীলবাবু? এঁদের বাড়ীর পাশেই একটা ছেলেদের মেস্ আছে। সেই মেসে একটি সুন্দর টুকটুকে ছেলে থাকে, তার নাম নরেশ। ছেলেটি বি-এ পড়ে। সুরমার একটি ছোট বোন আছে তার নাম অমলা। সুরমা, সুরমার মা, সুরমার দাদা, সকলেরই ইচ্ছে ছেলেটির সঙ্গে অমলের বিয়ে হয়। আমাকে একদিন নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়ে ছাদ থেকে ছেলেটিকে দেখিয়েওছিল। ছেলেটি দেখতে বেশ। সুরমার দাদা তারই সঙ্গে পড়ে, দু একদিন নিমন্ত্রণ করে ছেলেটিকে বাড়ীতে নিয়েও এসেছিল—"

মোহিনী বলিল, "তুমি উকীলের স্ত্রী হয়ে অত বাজে বক্‌ছ কেন? আসল কথা হচ্ছে এঁদের সকলের ছেলেটিকে পছন্দ হয়েছে, অতএব বিয়ে হওয়া উচিত, কাজে কাজেই বিয়ে হবে।"

লীলা বলিল, "থামুন মশায়, আপনি বেশ জলের মত বুঝিয়ে দিলেন। আদৎ কথাটাই আগে শোন,—অর্থাৎ ইচ্ছা সকলের ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে হওয়া; কিন্তু তা হবার যো নাই। খবর নিয়ে জানা গিয়েছে যে তারা এঁদের চেয়ে নীচুঘর, অবস্থাও তত ভাল নয়। বাড়ীতে জমি জায়গা আছে বটে, একখানা পুরোনো কোঠাবাড়ীও আছে, কিন্তু এঁদের সঙ্গে তাতে বিয়ে হয় না। সুরমার বাবা কি রকম লোক, তাত তুমি জান,—তিনি বলেন, বংশমর্য্যাদায় যারা আমাদের নীচে, তাদের ঘরে কোন মতেই মেয়ের বিয়ে দিতে পারিনে।"

মোহিনীমোহন ঈষৎ শিরশ্চালন করিয়া বলিল,

"এইবার অনেকটা বুঝতে পার্‌ছি, তবে এ হেন ব্যাপারে উকীলের পরামর্শের কি প্রয়োজন ?"

লীলা বলিল, "কথা শেষ কর্ত্তে না দেওয়া তোমার এক স্বভাব। আগে শোনই,—ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম। সুরমার বাবা তোমার মক্কেল, কাজে অকাজে তোমার সেখানে যাতায়াত আছে ; আমাদের ইচ্ছে, যে রকমে হোক, তাঁকে রাজি করে এই বিয়েটা দিয়ে দিতে হবে।"

মোহিনী বলিল, "এত হল ঘটকের কাজ। তা ছাড়া, আমি ভবেন্দ্রবাবুকে বিশেষ করে জানি, তিনি একজন গোঁড়া বংশাভিমানী হিন্দু। তিনি যখন একবার বলেছেন 'না,' তখন তাঁকে রাজি করা শক্ত। ঘটকালি করতে গিয়ে শেষে কি মক্কেলটি হারাব ? এ কাজের মধ্যে আমি নেই। তোমার বন্ধু যদি আমার উপদেশ চান, তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি যে আজ কাল ভাল পাত্রের অভাব নেই ; এই পাত্রকেই যে বিয়ে দিতে হবে, এ জিদের মধ্যে নভেলিভাব অনেকটা আছে বটে, কিন্তু বিশেষ কোন যুক্তি নেই।"

লীলা বাধা দিয়া বলিল, "ধন্যবাদ, তোমার উপদেশটা পরে আমরা বিবেচনা করব ; কিন্তু ইতিমধ্যে তোমাকে এই কাজটা কর্ত্তে হবে।" সুরমা অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে কহিলেন, "আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। লীলা আমাদের সকলকে আশা দিয়ে এসেছিল যে আপনি ইচ্ছে করলেই এ কাজটা কর্ত্তে পারেন।"

মোহিনীবাবু সহাস্যে লীলার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "লীলার এ ভারি অন্যায়। আমার পেশা ওকালতী ; আমি ভাল ঘটকালিও করতে পারি, এ ঝোঁকটা ওর অন্ধ স্বামীভক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়।—আচ্ছা, ছেলেটির এ বিয়েতে মত আছে ?"

"ছেলের খুব মত আছে, সেও অমলাকে দেখেছে।"

"ছেলের বাপ মার ?"

"বাপ মা নেই।"

"তবে বাধা, একমাত্র ভবেন্দ্র বাবু। কিন্তু সে যে বড় শক্ত ঠাঁই !"—বলিয়া মোহিনী উর্দ্ধনেত্রে নিজ গুম্ফপ্রান্ত দংশন করিতে লাগিল।

আরও কিয়ৎক্ষণ এইরূপ আইনসঙ্গত পরামর্শ চলিবার পর স্থির হইল, মোহিনী চেষ্টা করিয়া দেখিবে। ব্যাপারটা বাড়ীতে সকলের কাছে সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখিতে পরামর্শ দিয়া মোহিনী সেদিনকার মত তাহার মক্কেল-সুন্দরীকে বিদায় দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পলাশপুরের সুবিখ্যাত বন্দ্যাবংশ 'সনাতন তাকিয়ার' ঠেস্ দিয়াই এতকাল মানুষ হইয়াছে। এমনি কি দালানের ইঁটগুলাও যেন অতি বনিয়াদি ভাবেই ক্ষয়-প্রাপ্ত। যাহাতে এই বনিয়াদি বংশের খ্যাতি প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, জমিদার ভবেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তজ্জন্য সর্ব্বদাই সতর্ক। ছেলে মেয়েরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও, যাহাতে বংশমর্য্যাদা তাহারা অম্লান রাখিতে পারে, ভবেন্দ্রবাবু সে বিষয়ে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। ভবেন্দ্রবাবু অশিক্ষিত নহেন, হিন্দু ধর্ম্মের সংকীর্ণতার পক্ষপাতী নহেন, কিন্তু কৌলিন্যপ্রথা তিনি মানিতেন, কেন না বন্দ্যাবংশ খাঁটি কুলীন। বংশমর্য্যাদায় তাঁহাদের অপেক্ষা হীন, এমন পরিবারের সহিত কুটুম্বিতা করিলে বন্দ্যবংশের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে ইহাই তাঁহার জন্মগত সংস্কার। তাঁহাদের বংশে যাহা হইয়া আসিয়াছে তাহাই হইবে ; যাহা হইতে পারিত বা হওয়া উচিত, তাহা অন্য সকলে করিতে পারে—কিন্তু পলাশপুরের বন্দোপাধ্যায় গৃহে তাহা হইবে না। সেইজন্য পরিবারস্থ অন্যান্য সকলের ইচ্ছা স্বত্বেও কন্যা অমলার বিবাহ হলদিপাড়ার ৺সতীশ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র নরেশ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত দিতে তাঁহার 'মাথা কাটা' যায়। নরেশের সহিত বিবাহের কথাটা তিনি বনিয়াদি ধরণে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

সেদিন প্রাতঃকালে ভবেন্দ্রবাবু তাঁহার কলিকাতার বাসায় গড়গড়ার নল হস্তে লইয়া কয়েকখানা চিঠি পড়িতেছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে টিপয়ের উপর চায়ের

পেয়ালা, একখানা সংবাদপত্র ও তাহার উপর চশমার খাপ ছিল। এই সময় ধীরপদবিক্ষেপে মোহিনীমোহন আসিয়া প্রবেশ করিল।

ভবেন্দ্রবাবু চশমা কপালে তুলিয়া বলিলেন—"কে—মোহিনী? তোমার যে খোঁজ খবরই পাওয়া যায় না।"

মোহিনী বলিল, "আজ্ঞে, সময়ই পাইনে—"

ভবেন্দ্রবাবু হাসিয়া কহিলেন, "তা হলে এখন চলছে ভাল।"

মোহিনী। হাঁ, চলছে এক রকম, তা ছাড়া মাসিক-পত্র-ওয়ালাদের জ্বালায় একটুও অবকাশ নেই। আজকাল একটু লিখ্‌ছি টিখ্‌ছি কিনা।

ভবেন্দ্র। হাঁা হাঁা—তোমার একটা গল্প কি একটা কাগজে সেদিন দেখ্‌লুম বটে। আমি গল্প টল্প বড় একটা পড়িনে, তবে তোমার নাম দেখে পড়লুম্। তুমি ত এ সংখ্যায় সেটা শেষ করনি।

মোহিনী। আজ্ঞে না, এখনও শেষ হয় নি,—আগামী সংখ্যায় হবে। কেমন লাগল?

ভবেন্দ্র। মন্দ হয়নি। তা, বেশই হয়েছে। তবে একটা কথা আমার মনে হল, তুমি সমাজের বন্ধনটাকে একটু যেন বিদ্রূপ করেছ।

মোহিনী অত্যন্ত বিনয় ও লজ্জার ভান করিয়া বলিল, "আজ্ঞে, ওটা একটা সত্য ঘটনা থেকে লেখা।"

ভবেন্দ্র। সত্য ঘটনা, বল কি হে? আমারও বাড়ীতে যে ঐ রকম একটা 'সত্য ঘটনা'র সূত্রপাত হয়েছে। ঠিক তোমার ঐ গল্পের মতন।

মোহিনী। তাই নাকি? আশ্চর্য্য ত!

ভবেন্দ্র। আমার ছোট মেয়েটিও বড় হয়ে উঠেছে কি না। তার জন্যে একটি পাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছি। এদিকে বাড়ীর মেয়েরা নাকি পাশের ঐ মেসে একটি ছেলেকে দেখে তারি পছন্দ করেছে। আমার আপত্তি ছিল না; ছেলেটি দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল—বি-এ পড়ে, তবে তারা ভঙ্গ—অনেক পুরুষ ধরে ভঙ্গ। অবস্থাও তাদৃশ ভাল নয়। কাজেই ওখানে কি করে হয় বল? তোমার ত অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় আছে। ভাল দেখে একটি পাত্র দিতে পার?

মোহিনী। পাত্র ত একজন ভালই ছিল। কিন্তু সেটি যে হাতছাড়া হয়ে গেল! আগে যদি বলতেন! আহাহা!

ভবেন্দ্র। হাতছাড়া হয়ে গেল কি রকম? কে?

মোহিনী। ঘনশ্যাম বাবুর নাম শুনেছেন ত?—ইন্দোরে যিনি—

ভবেন্দ্র। ঘনশ্যাম বাবু? খুব শুনেছি—তিনি তোমার বাবার সঙ্গে এখানে একবার এসেছিলেন যে।

মোহিনী। আজ্ঞে হাঁা। বাবার খুব বন্ধু ছিলেন কি না। তাঁরই মেঝ ছেলেটি—এম-এ পাস করেছে—

ভবেন্দ্র। বটে? বটে? তাঁরা ত আমাদেরই ঘর। খুব ভাল কুলীন। উচ্চবংশ।—তা, ছেলেটি হাতছাড়া হয়ে গেল কেমন করে? আহাহা—আগে জান্‌লে—

মোহিনী। সেই কথাই ত বল্‌ছি কি না! কি ভুলটাই হয়ে গেছে! এখানে এক এটর্ণির মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলেটির সম্বন্ধ হয়েছে। আমিই ত ঘটকালি করেছি। আহাহা, আগে যদি—

ভবেন্দ্রবাবু আগ্রহের সহিত বলিলেন, "তা, সে বিয়ে কি ঠিক হয়ে গেল নাকি? ঘনশ্যাম বাবুর কথাটা আমার মনেই ছিল না হে। আমার ধারণা ছিল, তাঁর ছেলে পুলে নেই,—নইলে তাঁরা ত বনেদি বংশ, জমিদারিরও বিলক্ষণ আয়!—আচ্ছা বাবাজী, সেটা হয় না, তুমি যদি লাগ?"

মোহিনী। আমিই কথা দিয়েছি, কথা কি করে খেলাপ করি? আহা বড়ই ভুল হয়ে গেছে! এম্‌-এ পাস; বি-এল্ পড়ছে। দেখতেও খুব সুপুরুষ, চরিত্রটিও বড় ভাল।

ভবেন্দ্র বাবুর হস্ত হইতে গড়গড়ার নল পড়িয়া গেল, তিনি উঠিয়া মোহিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "না, মোহিনী, আমি ও সব কথা শুন্‌তে চাইনে। তুমি



পুনরাগমন।

(Return of Persephone)

যদি চেষ্টা কর, তাহলে হয় না,—একথা আমি বিশ্বাস করি নে। এটি করে দাও বাবা।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া বৃদ্ধ ও যুবকে এ বিষয়ের পরামর্শ চলিল। এটর্ণি যাহা পণ দিবে, ভবেন্দ্রবাবু তাহার দ্বিগুণ দিতে স্বীকার করিলেন।

অবশেষে মোহিনী বলিল, "আচ্ছা আমি চেষ্টা করে দেখি কতদূর কি কর্ত্তে পারি। তবে এক কথা, আপনি এ বিষয় এখন কারও কাছে প্রকাশ কর্ব্বেন না।"

ভবেন্দ্রবাবু উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "বেশ তুমি যা বলবে তাই হবে, তোমার উপর সমস্ত ভার রইল বাবা—আমরা সব বুড়ে সুড়ো হয়ে যাচ্ছি।"

মোহিনী বলিল, "না একেবারে এতটা নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন না। তবে এখন আসি।"

মোহিনী চলিয়া গেলেন; ভবেন্দ্রবাবু আর এক ছিলিম তামাক দিতে বলিয়া খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিবার অছিলায় চিন্তামগ্ন হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তিন সপ্তাহ পরে, একদিন বৈকালে মোহিনী কাছারি হইতে ফিরিয়া জলযোগে বসিলে, লীলাবতী মুখখানি কাঁদো কাঁদো করিয়া আসিয়া বলিল, "এ দিকে অমলার বিয়ে ত ঠিক হয়ে গেল। তুমি যে বলেছিলে কোনও চিন্তা নেই, নরেশের সঙ্গে বিয়ে দেব। যদি না পারবে ত কথা দিলে কেন?"

মোহিনী মুখ না তুলিয়াই বলিল, "ঠিক হয়ে গেছে?"

লীলা। না—বাকী থাকবে! কাল গায়ে হলুদ। সুরমা আজ আমাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছিল,—সে খবর রাখ?"

মোহিনী। তাই নাকি? কোথায় বিয়ে?

লীলা। বিয়ে কোথায়, তা বাড়ীর কেউ জানে না, এমন কি পাত্র পর্য্যন্ত দেখা হয় নি। তবে শুনেছি নাকি পশ্চিমে। সুরমার মা অনেক কাঁদাকাটা করার পর ভবেন্দ্রবাবু বলেছেন—অন্য আর এক জায়গা থেকে সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়ে নেওয়া হচ্ছে; তাই গোপন করা দরকার।"

মোহিনী নির্লিপ্তভাবে বলিল, "ওহ্!—আর এক পেয়ালা চা দাও।"

লীলা বলিল, "তোমার ত কোন দিকেই খেয়াল নেই। বোঝ দিকিন কি সর্ব্বনাশটা হল!"

মোহিনী মুখ তুলিয়া বলিল, "কেন? সর্ব্বনাশ কিসের?"

"সর্ব্বনাশ নয়?—একজনকে ভালবাসলে, একজনের সঙ্গে হচ্ছে বিয়ে।"

"কেন, তুমিও ত ছেলেবেলায় সেই মেনি বেরালটাকে ভালবাসতে, তবে আমায় বিয়ে করলে কেন?"

লীলা বলিল, "আঃ, কি জ্বালা! সে ভালবাসা নয় সে ভালবাসা নয়।"

মুখখানি বোকার মত করিয়া মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কোন্ ভালবাসা?"

"স্ত্রী যেমন স্বামীকে ভালবাসে, সেই ভালবাসা।"

মোহিনী গম্ভীরভাবে বলিল, "ওহ্—লভ্?"

লীলা অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিল—"ভাব দিকিন কি হতভাগা! অমলা ভালবাসলে নরেশকে আর বিয়ে হবে আর একজনের সঙ্গে?"

এবার মোহিনী আর থাকিতে না পারিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "দেখ, থিয়েটার দেখে দেখে আর নভেল পড়ে পড়ে, তোমরা কি হয়ে উঠলে বল ত? একেবারে উন্মাদ পাগল! একটা এগারো বারো বছরের মেয়ে, এখনও গোঁফ ওঠেনি—না না, গোঁফ নয় গোঁফ নয়—আমারই বল্‌তে ভুল হয়েছে—একটা দুধের মেয়ে, নাবালিকা, আদালতে মোকদ্দমা করতে গেলে ওলি ভিন্ন হবার যে নেই, সংসারের ভাল মন্দ কিছুই জানে না—সে, বই বগলে করে পাড়ার একটা ছোঁড়া ইস্কুল যাচ্ছে, জানালা থেকে এই দেখেই অমনি প্রেমে পড়ে গেল? আর তোমরা সব বুড়ো বুড়ো মাগীগুলো তাই প্রশ্রয় দিচ্ছ?

এ কি, হল কি ? দেশটা কি ক্রমে মগের মুল্লুক হয়ে দাঁড়াল ?"

লীলা বলিল, "হ্যাঁ গো মশাই, ভারি বক্তৃতা করতে শিখেছ। নিজের যদি হত তবে না বুঝতে ? সুরমা বিয়ের কথা বল্‌তে বল্‌তে কেঁদে ফেল্লে।"

"যেমন তুমি, তেমনি তোমার সুরমা। আর, তোমরা সকলে মিলে সুরমার মা বেচারীকে পর্য্যন্ত বিগ্‌ড়ে দিয়েছ। ও সব পাগলামি ছেড়ে দাও। ও সব লভা-লভি নাটকে উপন্যাসেই ভাল—বাস্তবজীবনে বড় সুবিধে নয়। বিশেষ, হিন্দুর ঘরে ও সব প্রবেশ করতে দেওয়াই উচিত নয়। ওর চেয়ে মুর্গী ভাল।"

লীলা অশ্রুবদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তবে তখন তুমি বল্লে কেন চেষ্টা দেখবে ? নইলে ওরা ত আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিল। তুমি বল্লে কেন ?"

"চেষ্টা দেখব বলেছিলাম, চেষ্টা দেখেওছিলাম। মেয়ের বাপ শুনলে না তা আমি কি করব ? ভবেন্দ্রবাবু যে সম্বন্ধটি করেছেন, নিশ্চয়ই সেটি খুব ভাল সম্বন্ধ। তিনি একজন বোদ্ধা বিচক্ষণ লোক। ও সব ছেলেমানুষি তোমরা ছেড়ে দাও।—আর এক-পেয়ালা চা যে চাইলাম, তা কৈ ? ভালবাসা কাযে দেখাতে হয় গো !"

"ওঃ"—বলিয়া লজ্জিত ভাবে লীলা চা আনিতে গেল।

জলযোগান্তে মোহিনী বহির্ব্বাটীতে গেল। সেখানে কয়েকজন বন্ধু ইতিমধ্যে সমবেত হইয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আজ অমলার বিবাহ। ভবেন্দ্র বাবুর কলিকাতাস্থ ভবনে দ্বিতলের "হলঘরে" সভার স্থান হইয়াছে। বৈকালের ট্রেণে চারিজন বরযাত্রী আসিয়া পৌছিয়া বলিয়াছে, বর ও বরকর্ত্তা বর্দ্ধমানে নামিয়াছেন, সেখানে বরের মাতুলালয়, আহারাদি করিয়া অপরাহ্ণের ট্রেণ ধরিয়া সন্ধ্যাবেলা তাঁহারা হাওড়া আসিয়া পৌছিবেন।

কন্যাপক্ষীয় নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণের সহিত ভবেন্দ্র বাবু পার্শ্বের ঘরে কথোপকথনে নিযুক্ত। বিবাহের সমস্ত ভারই মোহিনীমোহনের উপর দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন কিন্তু পাত্রের পৌছিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ক্রমে একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ঘন ঘন ঘড়ির দিকে চাহিতে লাগিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। মোহিনী আসিয়া বলিল, "তাহলে সকাল করে খাইয়ে দেওয়া যাক্, বিয়ের লগ্নের ত অনেক দেরী।"

ভবেন্দ্র। বরযাত্রীরা সব এখনও পৌছলেন না। বর পৌছলে খাওয়ালে হত না ? আমি বড় ব্যস্ত হয়েছি বাবু।

মোহিনী। আপনার কোন চিন্তা নেই। তাঁরা সন্ধ্যার ট্রেণটা ফেল করেছেন বোধ হয়, পরের ট্রেণে এলেন বলে। রাত্রি এগারোটার সময় লগ্ন তা তাঁরা জানে কিনা। তাঁদের জন্যে অপেক্ষা কর্ল্লে, শেষে একসঙ্গে মহা গোলযোগ হবে।

ভবেন্দ্র। তবে যা বোঝ, তাই কর।

এই সময় একটা পিওন আসিয়া বলিল, "বাবু, একঠো তার হ্যায়—মোহিনী বাবুকা।"

মোহিনী ব্যস্তেভাবে টেলিগ্রাম লইয়া পড়িল। পাঠান্তে চেয়ার ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

ভবেন্দ্রবাবু শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, কি খবর ?"

মোহিনী কোন কথা না বলিয়া টেলিগ্রামখানা তাঁহার দিকে ছুড়িয়া দিল।

ভবেন্দ্রবাবু পড়িয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন ও কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

যাঁহারা গৃহে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা টেলিগ্রামটা পড়িয়া নির্ব্বাক্ হইলেন।

মোহিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "ভবেন্দ্রবাবু, এখন অধীর হলে চল্‌বে না, যা হোক্ একটা উপায় ত কর্ত্তে হবে। আপনারাও ত—পাঁচজন ভদ্রলোক রয়েছেন, কি করা কর্ত্তব্য বলুন।"

ভবেন্দ্রবাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন, ও বলিলেন—"আর উপায়! মোহিনী, তুমি আমাদের সর্ব্বনাশ করলে, আমাদের মাথা হেঁট করে দিলে।"

কন্যাযাত্রী একজন ভদ্রলোক বলিলেন, "এতে আর ওঁর কি অপরাধ? দৈবের উপর কার হাত আছে, ভবেনবাবু? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন যে লগ্নের পর দুর্ঘটনাটা হয় নি।"

মোহিনী। নিশ্চয়ই। তাঁরা অতি ভদ্রলোক, তাই এমন বিপদেও টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছেন। পিওর এসিয়াটিক কলেরা! যারা বৈকালে এখানে পৌঁছেচেন তাঁরা আসবার সময় কিছুই দেখে আসেন নি। এরই মধ্যে এই দুর্ঘটনা! আমার এখনই বর্দ্ধমান যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভবেন্দ্র বাবুকে এ অবস্থায় ফেলেও ত যেতে পারি নে।

একজন বরযাত্রী বলিলেন, "এমন অবস্থায়, যে কেউ একজন পাত্র এনে বিয়ে দেওয়াই রীতি। তাই চেষ্টা দেখুন।"

ভবেন্দ্রবাবু পাগলের মত মোহিনীর হাত দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন,"বাবা রাগ কোরোনা, তোমার কিছুই দোষ নেই। সবই আমার কপাল। এখন আমার যাতে জাত না যায় তাও তোমাকেই করতে হবে।"

মোহিনী হাত সরাইয়া লইয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ! এ বিপদ কি আমার নয়? যাক্, ওসব কথা এখন ছেড়ে দিন। আচ্ছা, আপনি ত আরও দুএক জায়-গায় পাত্রের খোঁজ নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কাউকে এখন পাওয়া যায় না কি?"

ভবেন্দ্র। অসম্ভব! হয়ত কেউই নেই। আর থাকলেও কি এই দু ঘণ্টার মধ্যে কেউ বিয়ে করতে আসবে? মেয়েরা এই পাশের মেসে যে ছেলেটিকে পছন্দ করেছিল, তার সঙ্গে যদি ঠিক্ করতাম তা হলে এ বিপদে পড়তে হত না।

মোহিনী। এখন আর তা ভেবে কি হবে! ভবিতব্য যা তাই হবে। তা সেটিকে এখন পাওয়া যায় না?

ভবেন্দ্র। জানিনে ত। ছেলেটি মেসে থাকে, এই পাশেই। আমাদের অনিলের সঙ্গে পড়ে।

মোহিনীমোহন উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা এই পাশেই ত? একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?"

ভবেন্দ্র। কিছু না। দেখ দেখি, বোধ হয় এখন সে এই বাড়িতেই আছে। অনিলকে সঙ্গে নিও।

মোহিনীকে উঠিতে দেখিয়া বরযাত্রিগণও উঠিল। একজন বলিল, "আমরা তা হলে বর্দ্ধমান চল্লাম। নমস্কার মশায়।"

ভবেন্দ্রবাবু বলিলেন, "কিঞ্চিৎ জলযোগ করে যান। এমন বিপদ হবে কে জান ত!"

ভবেন্দ্রবাবুর এবং মোহিনীর একান্ত অনুরোধ সত্বেও জলস্পর্শ না করিয়াই তাঁহারা প্রস্থান করিলেন।

শুভলগ্নে শ্রীমান নরেশের সহিত শ্রীমতী অমলার বিবাহ হইয়া গেল। কন্যাসম্প্রদানের পর ভবেন্দ্রবাবু নরেশের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমাকে আর কি বলে আশীর্ব্বাদ করব, তুমি চিরজীবী হও। তুমি আমার জাতকুল ফিরিয়ে দিয়েছ।"

*　　*　　*　　*

গভীর রাত্রে ছক্কড় গাড়ীতে বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে স্বামী স্ত্রীতে কথা হইতেছিল। লীলা বলিল, "বলি হাঁগা, সেই যে পাত্রটির সঙ্গে প্রথমে বিয়ের কথা হয়েছিল, তুমিই নাকি তার ঘটক?"

মোহিনী। হাঁ।

লীলা। তুমি কি বিশ্বাসঘাতক গো! তোমায় কোথায় ভার দেওয়া হল যাতে নরেশের সঙ্গে বিয়েটি হয় তাই করে দাও—আর তুমি কি না—

মোহিনী গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল—

Sigh no more ladies, si.h no mo.e,
Men were deceivers ever.

লীলা বলিল, "আর গান গাইতে হবে না, ভারি গাইয়ে হয়েছেন। কেমন তেলপারা মুখখানি করে বলা হয়েছিল—'চেষ্টা ত করলাম, মেয়ের বাপ শুনলে তা

আমি কি করব?—আমার এমন রাগ হচ্ছে! ইচ্ছে হচ্ছে, জন্মের মত তোমার সঙ্গে আড়ি করি।

মোহিনী বলিল, "হাঁ হাঁ হাঁ—এখন নয়, আগে বাড়ী চল।"

লীলা। কেন? বাড়ীতে কি?

মোহিনী। বাড়ী চল, একটা জিনিষ দেখাব। তারপর আড়ি করতে হয়, আড়ি কোরো।

লীলা। জিনিষ দেখাবেন! কি জিনিসটা দেখাবে শুনি?

মোহিনী। সে আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য—ভয়ঙ্কর আশ্চর্য্য জিনিষ।

বাড়ী ফিরিয়া লীলা বলিল, "কৈ, কি আশ্চর্য্য জিনিষ দেখাবে দেখাও।"

"চল, দেখাচ্ছি"—বলিয়া উভয়ে শয়নকক্ষে উপনীত হইল।

মোহিনী দেরাজ টানিয়া টাট্‌কা একখানি মাসিকপত্র বাহির করিয়া স্ত্রীর হাতে দিল।

লীলা বলিল—"আ কপাল! এই আশ্চর্য্য জিনিষ!"

মোহিনী বলিল, আমার "'ভবিতব্যতা' গল্পটার শেষাংশ বেরিয়েছে, পড়ে দেখ না। প্রথমাংশ পড়ে যে বলেছিলে ঠিক অমলাদের কথার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে—শেষাংশে কি আছে দেখ।"

নিকটে একখানা সোফায় লীলা বসিয়া পড়িল। নিবিষ্টচিত্তে গল্পটা পড়িতে লাগিল।

মোহিনী বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া, একটি সিগারেট ধরাইয়া, খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া নক্ষত্রখচিত নৈশাকাশের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, একটি গভীর নিঃশ্বাস পতনের শব্দ শুনিয়া, সেইদিকে মোহিনী ফিরিয়া চাহিল। লীলা বলিল, "শোন। কাছে এস।"

মোহিনী কাছে গিয়া, করযোড়ে বলিল, "কি হুকুম, মহারাণী?"

লীলা। এ কাগজ কবে বেরিয়েছে?

মোহিনী। এখনও বেরোয়নি, কাল বেরুবে। আজ বিকেলেই সম্পাদকের আফিস থেকে আমি এখানা নিয়ে এসেছিলাম।

লীলা। এতে যা সব লিখেছ, কি করে জানলে এই এই সব হবে? চারজন বরযাত্রী আগের গাড়ীতে এসে পৌছবে, খাওয়া দাওয়া করবার জন্যে বরকর্ত্তা বর্দ্ধমানে নাববে, সন্ধ্যাবেলা টেলিগ্রাম আসবে বরের কলেরা হয়েছে, পাশের বাসা থেকে আগেকার সেই ছেলেটিকে এনে বিয়ে দেওয়া হবে—এ সব তুমি কি করে জানলে?"

মোহিনী। বাল্মীকি কি করে রাম না হতে রামায়ণ লিখেছিলেন?

লীলা। না-না—যাও। সত্যি কথা বল না গো?

মোহিনী। চারজন বরযাত্রী যে প্রথমে এসেছিল তার কারণ এই, তারা আমারই বন্ধু কলকাতা থেকেই তারা গিয়েছিল, ইন্দোর থেকে নয়। টেলিগ্রাম যে এল তার কারণ এই, আমিই আমার এক বন্ধুকে ঐ টেলিগ্রাম মুসাবিদা করে দিয়ে দুপুর-বেলার গাড়ীতে বর্দ্ধমান পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

লীলা। তবে সত্যি সত্যি তার কলেরা হয়নি?

মোহিনী। কার কলেরা হবে? ঘনশ্যাম বাবুর কোনও ছেলেই নেই মোটে। তিনি বর্দ্ধমানেও আসেন নি, যতদূর জানি ইন্দোরেই আছেন।

লীলা কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। শেষে বলিল, "ওঃ—বুঝেছি তোমার দুষ্টুমি! ভবেন্দ্রবাবুকে যা যা বলে-ছিলে, আগাগোড়া সব বানানো! উঃ—কি ভয়ঙ্কর লোক তুমি!—আচ্ছা নরেশ যদি শেষকালে রাজি না হত?

মোহিনী। এই জন্যেই বঙ্কিমবাবু বলেছেন, স্ত্রী-লোকের বুদ্ধি সেও ঐ মালার মাপে, আধখানা বৈ পুরো কখনও দেখিলাম না!—সব প্রথমে। নরেশকেই রাজি করেছিলাম—ঐ ত ছিল গল্পের, কি বলে গিয়ে, পিভট্‌। তাকে ঠিকঠাক করে, তার পর ভবেন্দ্রবাবুর কাছে গিয়ে ঐ কাল্পনিক পাত্রটির কথা বলি।

লীলা গালে হাত দিয়া বসিয়া ছিল। স্বামীর

মুখের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

মোহিনী বলিল, "তোমরা যা চেয়েছিলে সবই তো হল। এখন আমার ফীজ্?"

লীলা বলিল, "তোমার মক্কেলের কাছে ফীজ্ নাওগে, আমি ত দালাল।"

মোহিনী বলিল, "মক্কেলকে ত চিনি নে, আমি দালালকেই চিনি। ফী আমি তোমারই কাছ থেকে আদায় করব।"

ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া দুইটা বাজিল।

শ্রীঅতুল চৌধুরী।

বৈদেশিকী।

জাতীয়তা বনাম সার্ব্বজনীনতা।

("হিবার্ট জার্ণাল", জানুয়ারি)

জার্ম্মানি, ইটালি ও গ্রীসের আধুনিক ইতিহাস এবং ফ্রান্সের অষ্টাদশ শতাব্দীর পুরাবৃত্ত আলোচনা করিলে, ক্রমান্বয়ে জাতীয়তার (nation lism) ও সার্ব্বজনীনতার (cosmopolitanism) সুস্পষ্ট প্রভাব স্পষ্টীকৃত হয়। কেবল অষ্টাদশ শতাব্দীতেই যে য়ুরোপে সার্ব্বজনীনতার মুরলী ধ্বনিত হইয়াছিল এমন নহে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, দিগ্বিজয়ী রোম, তাহার বিস্তৃত সাম্রাজ্যে সার্ব্বজনীনতার বীজ রোপণ করিয়াছিল। রোমান ব্যবস্থা সকলের শিরোধার্য্য ছিল, রোমের আচার-ব্যবহার সব জাতির আদর্শ ছিল, তাহার লাটিন ভাষা সর্ব্বত্র শিক্ষিতের শিক্ষণীয় ছিল, রোমান গৃহ-নির্ম্মাণ-পদ্ধতি সকল দেশে অনুকরণীয় ছিল। কিন্তু শক্তিভৃৎ রোমানের দৃঢ় রজ্জুতে বদ্ধ অধীনস্থ বিভিন্ন জাতির মধ্যে, আদর্শের ঐক্য বা স্নেহের বন্ধন ছিল না। দড়ির ফাঁস আলগা পাইলেই তাহারা হয় গুঁতাগুঁতি করিত, নয় চাচা আপন বাঁচার পথ খুঁজিত।

চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গথ প্রভৃতি জাতির আক্রমণে, যখন রোমের তেজোহ্রাস হইল, তখন তাহার অধীনস্থ সামন্তেরা তাহাকে কোনও প্রকারে সাহায্য করিতে পারে নাই। রোমের আওতায় তাহাদের নাবালকত্ব ঘোচে নাই; রোমের সার্ব্বজনীনতার লবণে তাহার অধীনস্থ দেশগুলির জাতীয়তা জরিয়া গিয়াছিল। রোমের জরার সঙ্গে তাহার অধীনস্থ প্রদেশগুলি মুমূর্ষু হইল। য়ুরোপে সার্ব্বজনীনতার বানচালের প্রথম সাক্ষী—অধঃপতিত রোম।

কয়েক শতাব্দী পরে রোমান সম্রাটের স্থান, রোমান পন্টিফ্ (Pontiff) বা পোপের দ্বারা পূর্ণ হইল। নানা দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট পন্টিফ্ দেবতা স্থানীয় ছিলেন—তাঁহার আজ্ঞা অনুল্লঙ্ঘনীয় ছিল। পোপের প্রভাবে, য়ুরোপে, বহুকাল ধরিয়া সার্ব্বজনীনতার বীজ উপ্ত হইয়াছিল। ("A new Cosmopolis was established, the Civitas Dei, embodied i Catholic Church)। মধ্যযুগে অর্থাৎ নবম ও পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সার্ব্বজনীনতার বাহন ছিল। ফ্রান্সের পারিস, ইটালির বলোনিয়া (Bologna) ইংলণ্ডের অক্স্ফোর্ড প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে, দেশ-দেশান্তরের শিক্ষার্থী ও শিক্ষিত ব্যক্তি আসিয়া, ভাবের ও জ্ঞানের আদান-প্রদান করিতেন এবং সময়ে সময়ে চিরসখ্যে বদ্ধ হইতেন। লুথার-প্রমুখ সংস্কারকেরা ক্যাথলিক ধর্ম্মের মূলে যে কুঠারাঘাত করেন, তাহাতে পোপের প্রভাব পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল। য়ুরোপে সার্ব্বজনীনতার গুড়ে বালি পড়িবার দ্বিতীয় সাক্ষী—অধঃপতিত পোপ। ("The Reformation finally

shattered the religious and with it what remained of the political unity of Christendom")

১৪৫০ হইতে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ য়ুরোপে নবজীবনের (Renaissance) সময় ও তৎপরে, কয়েকজন সাহিত্যিক ধুরন্ধর সার্ব্বজনীনতার মন্ত্র আওড়াইয়াছিলেন। ("For the old Civitas Dei, the Humanist movement of the Renaissance offered a Civitas Humana of polite letters and scholarship.") কিন্তু ইঁহারা যে উচ্চ ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেন, দেশের সাড়ে পনের আনা লোক তথায় হাঁপাইয়া উঠিত। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিবশতঃ এই সময়ে য়ুরোপে নানা জাতির নানা লোকের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য বর্দ্ধিত হয়। ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ ব্যবস্থাবিৎ গ্রোশাস্ (Grotius) ভিন্ন জাতি সম্বন্ধীয় ব্যবহার-বিদ্যা সম্বন্ধে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কিন্তু নবজীবনের আলোকে ও বিস্তৃত বাণিজ্যের প্রভাবে সার্ব্বজনীনতার পথ নিরঙ্কুশ হয় নাই।

কয়েক বৎসর পরে সার্ব্বজনীনতার ভাগ্য ফিরিল। ফরাসী সাহিত্যের মাদকতা, ফরাসী জাতির সামাজিকতা, ফ্রান্সের নৃপতি চতুর্দ্দশ লুইয়ের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির ফলে, ফ্রান্স সমস্ত য়ুরোপের মনোহরণ করিয়াছিল। য়ুট্রেকৃটের (Utrecht) সন্ধি হইতে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব পর্য্যন্ত প্রায় এক শত বৎসর, ফরাসীরাই য়ুরোপের শিক্ষাগুরু ছিল। পূর্ব্বে য়ুরোপের বিভিন্ন গভর্মেণ্টের মধ্যে লাটিন ভাষায় পত্র-ব্যবহার চলিত—সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী ভাষা উহার স্থান অধিকার করিল। ফরাসী জাতি সমগ্র য়ুরোপের বরণীয় আদর্শ হইয়া উঠিলে, তাহাদের সাহিত্যে সার্ব্বজনীনতার বন্যা আসিল। বিচার ও মীমাংসার অন্ত রহিল না। দেবতায় ও পুরোহিতে অন্ধ-বিশ্বাসের কুফল, অকুণ্ঠিতভাবে রাজাজ্ঞা প্রতিপালনে লাভালাভ, ব্যষ্টির উপর সমষ্টির অধিকার ও অত্যাচার, ধনাঢ্যের সম্পদ দরিদ্র-শোষণের বনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত কি না, মনুষ্যের পাপই বা কি পুণ্যই বা কি, —এই সকল দুরূহ প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টায়, ফ্রান্সের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ভল্টেয়ার, রুসো, ডিড্রো (Diderot) প্রভৃতি লোকবিশ্রুত মনীষীরা এই তত্ত্বনির্ণয়ের অগ্নিতে অবিশ্রান্তভাবে ইন্ধন জোগাইতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত লিখিয়াছেন—"A new othodoxy of Reason arose to confront the old orthodoxy of Faith. Unhistorical and A PRIORI in temper, it maintained, as against the doctrine of original sin, the natural goodness of man, attributing his errors and misfortunes to the sinister agency of priest and tyrant. Of this pre-Comtist religion of humanity, appearing first under the veil of Deism, Bayle had been the half-conscious fore-runner, Voltaire and Diderot were the chief evangelists, Rousseau the fervent but disconcerting prophet.......Thus proclaimed with its message of hope and light and novelty! the philosophic evangel found ready hearers among the cultivated in every country. The old barriers of superstition and prejudice seemed broken down; to be a PHILOSOPHE was to be a citizen of an ideal world, sharing in a common language, creed and emotion."

এই সার্ব্বজনীনতার ভূত জার্ম্মান সম্রাট ফ্রেড্রিক দি গ্রেটের ঘাড়েও চাপিয়াছিল। তাঁহার উপদেষ্টা সাহিত্যরথী ভল্টেয়ারের পরামর্শে, তিনি ইটালীর চাণক্য ম্যাকিয়াভেলির (Machiavelli) নির্দ্দিষ্ট কপটাচরণের বিপক্ষে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। অবশ্য খেয়ালের ঝোঁকে কলমের ডগায় যাহা বাহির হইয়াছিল, স্বার্থের বশে তলোয়ারের চোটে ফ্রেড্রিক তাহার ঠিক উল্টা করিয়াছিলেন।

কেবল যে জার্ম্মান সম্রাট এইরূপ দিগ্‌বাজি খাইয়াছিলেন তাহা নহে। ফ্রান্সের অনেক নামজাদা বক্তা, গ্রন্থকার ও সংবাদপত্র-সম্পাদকের কাজে ও কথায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ ছিল। ক্রমে সার্ব্বজনীনতার গোলাপী নেশা ছুটিয়া গিয়া, জাতীয়তার কড়া নেশার দাপাদাপি ফরাসী জাতির মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করিয়া

ফেলিল। ক্রমে উৎকট সার্ব্বজনীনতার প্রস্রবণ হইতে উদ্ভূত বিকট জাতীয়তার প্রবাহ ফ্রান্সকে ভাসাইয়া দিল। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর দুগ্ধে নানাবিধ অম্লরস মিশিয়া, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এক অপূর্ব্ব দধি প্রস্তুত হইল। সার্ব্বজনীনতার বিফলতার সর্ব্বাপেক্ষা জবর সাক্ষী—রাষ্ট্রবিপ্লবের আবর্ত্তে পতিত ফ্রান্স।

স্বাধীনতার উপাসক সেনাপতি নেপোলিয়ন যখন স্বাধীনতার অপহারক সম্রাট নেপোলিয়ন রূপে য়ুরোপের বড় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন, তখন জার্ম্মানি, ইটালি, অষ্ট্রিয়া, স্পেন প্রভৃতি দেশের ভাবের কুঁদোয় জাতীয়তার দানা বাঁধিতে আরম্ভ হইল। ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের দফা রফা হইবার পরে, ১৮১৫ সালে, ভিয়েনা নগরের বৈঠকে (Congress) য়ুরোপের এক প্রকার ভাগাভাগি হয়। তাহার ফলে জার্ম্মান প্রদেশগুলির প্রভুত্ব অষ্ট্রিয়া লাভ করে, ডেনমার্ক হইতে ছিন্ন করিয়া নরোয়েকে সুইডেনের সহিত মিলাইয়া দেওয়া হয়, ইটালির উত্তর ভাগের কিয়দংশ অষ্ট্রিয়ার হস্তগত হয়, এবং বেলজিয়মকে জোর করিয়া হলাণ্ডের গাঁটছড়ায় বাঁধিয়া দেওয়া হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, য়ুরোপের অনেক স্থলে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছিল। এই গণ্ডগোলের সময় ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপ ইংলণ্ডে পলায়ন করেন, প্রাসিয়ার রাজা প্রজাদিগকে প্রতিনিধিতন্ত্র শাসনপ্রণালী দেন, ইটালিতে ম্যাটসিনি ও গারিবল্ডি পোপের অধিকার খর্ব্ব করেন, হাঙ্গেরিতে কসুথের (Kossuth) নেতৃত্বে একটি প্রজাতন্ত্র রাজ্যপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের হৃদয় এক সুরে বাঁধিবার উপক্রম হয়। ১৮৪৮ সালে বেশ বোঝা গেল যে, গত তেত্রিশ বৎসরে, য়ুরোপে এক জাতির প্রাপ্য ক্রমাগত অপর জাতির ভোগে আসিয়াছে বলিয়া, জাতীয় স্বাধীনতার বহ্নিশিখা লক্‌লক্ করিয়া উঠিয়াছে। ("The twin aspirations of Nationality and Liberty were fused in a closer union.") এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ, বলিয়াছেন :—"মৃগয়াজীবী পশুকুল যে নিয়মাধীনে একত্রিত হয়, মনুষ্যবংশও সেই নিয়মাধীনে একত্রিত হইয়া জাতি বা দেশবাসীতে পরিণত হয়। একান্ত স্বজাতি-বাৎসল্য ও একান্ত ইরাণ-বিদ্বেষ গ্রীক জাতির, কার্থেজ-বিদ্বেষ রোমের, কাফের-বিদ্বেষ আরব জাতির, মূর-বিদ্বেষ স্পেনের, স্পেন-বিদ্বেষ ফ্রান্সের, ফ্রান্স-বিদ্বেষ ইংলণ্ড ও জার্ম্মানির, ও ইংলণ্ড-বিদ্বেষ আমেরিকার উন্নতির—প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাধান করিয়া—এক প্রধান কারণ নিশ্চিত।" ("বর্ত্তমান ভারত," ৪৫ পৃঃ)

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে স্যাডোভার (Sadowa) রণক্ষেত্রে অষ্ট্রিয়ার, এবং ১৮৭০ সালে সিডানের (Sedan) যুদ্ধে ফ্রান্সের দর্পচূর্ণ করিয়া, জার্ম্মানি য়ুরোপের জুজু হইয়া উঠিয়াছে। য়ুরোপের আঢ্যতম ছয়টি জাতি গত পঞ্চাশ বৎসরে সার্ব্বজনীনতাকে আটলাণ্টিকের জলে ভাসাইয়া দিয়া, জাতীয়তার সুরা আকণ্ঠ পান করিয়াছে। সকলেরই চেষ্টা কি করিয়া এক-পাঁচিলের জ্ঞাতিটির টুঁটি টিপিবে। ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাস হইতে যে প্রতিবিধিৎসা রাক্ষসী প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোকের রক্তে স্নান করিতেছে, প্রত্যহ বাইশ তেইশ কোটি টাকা খরচ করিয়াও য়ুরোপ যাহার ক্ষুন্নিবারণে অসমর্থ, সেই রাক্ষসীর দাপটে সার্ব্বজনীনতা বাস্তবলোক ত্যাগ করিয়া কবির কল্পনা ও সাধকের আশার মধ্যে বাসা লইয়াছে—জাতীয়তা অর্থে এখন জেপ্‌লিন-ড্রেড্‌নটের সাহায্যে প্রকাণ্ড রকমের চৌর্য্য ও দস্যুতা। সার্ব্বজনীনতার বনবাস ও জাতীয়তার ইতরতা সম্বন্ধে এক পাশ্চাত্য পণ্ডিত মন্তব্য করিয়াছেন, "From the agony of Europe, the national idea will emerge, strengthened indeed, but also purified of its baser accretions; and the cosmopolitan idea will be welcomed as its necessary complement and condition."—তাহাই হউক!

আধুনিক গ্রীস।

("এডিনবরা রিভিউ," জানুয়ারি)

বুলগেরিয়া, রুমেনিয়া, সার্বিয়া ও গ্রীস, বহুকাল ধরিয়া তুরস্কের সুলতানের অধীন ছিল। ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে,

বিজয়ী তুর্কি জাতি, এসিয়া হইতে বস্পোরাস প্রণালী অতিক্রম করিয়া য়ুরোপে গমন করে। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে, কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌ল নগর মুসলমানের অধিকারে আসিলে, বাইজানটাইন (Byzantine) সাম্রাজ্যের লোপ হয়। দুই শতাধিক বৎসর অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসনের পর, তুর্কিদের সৌভাগ্য-গগনে মেঘ দেখা দিতে আরম্ভ হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপের খৃষ্টান নরপতিগণ সুলতান সম্বন্ধে নাক সিঁটকাইয়া বলিতেন—মুমূর্ষু ব্যক্তি, the Sick man। কবে এই মুসলমান ভূপতির মক্কা-প্রাপ্তি হইবে এবং তাঁহার কবর-প্রয়াণের পরে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌ল ও ডার্ডেনেল্‌জ্‌ কাহার ভাগে পড়িবে, এ সম্বন্ধে অনেক জল্পনা ও যথেষ্ট কলমবাজি হইয়াছি।

অষ্ট্রিয়া ও রুসিয়ার খৃষ্টান চক্রবর্ত্তীর সহিত তুরুস্কের বাদ্‌শাহের চিরকাল অহিনকুল সম্বন্ধ। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইয়েশি (Jassy) নগরে যে কাগজে-কলমে-প্রেম অর্থাৎ treaty হয়, তাহাতে এই স্থির হয় যে য়ুরোপের পূর্ব্বপ্রান্ত লইয়া সুলতানের সহিত প্রেমালাপ করিতে হইলে, হেপ্‌সবুর্কের (অষ্ট্রিয়া-রাজ) অপেক্ষা রোমানফের (রুসিয়াধিপতি) দাবি অধিক।

তুর্কির প্রচণ্ড প্রতাপে বুলগেরিয়া, গ্রীস, সার্বিয়া প্রভৃতি দেশের জাতীয়তা ঝলসিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু একেবারে লোপ পায় নাই। দেশময় গান গাহিয়া চারণেরা লোকের মনে স্বাধীনতার স্মৃতি জাগরুক রাখিয়াছিল। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ব্ল্যাক জর্জের নেতৃত্বে সার্বিয়া দেশে একটি জাতীয় অভ্যুত্থান সম্ভবপর হইয়াছিল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে বুকারেষ্ট নগরে রুসিয়া ও তুরুস্কের সন্ধির ফলে, সার্বিয়া কতকগুলি অধিকার প্রাপ্ত হয়।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে গ্রীক প্রিন্স্‌ আলেকজাণ্ডার হিপ্‌সিলান্টি (Hypsilanti) মল্‌ডেভিয়া প্রদেশে তুরুস্কের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে, য়ুরোপের কর্ত্তারা বুঝিলেন যে বালকানে যে আগুন জ্বলিয়াছে, তাহা সহজে নিবিবে না। মধ্য-য়ুরোপের নেতৃত্ব তখন অষ্ট্রিয়ার হস্তে—জার্ম্মানি তখনও সাবালক হয় নাই। ঐ সময়ে অষ্ট্রিয়ার রাজমন্ত্রী মেটারনিক (Metterni·h) লাইব্যাক (Laibach) নগরে, য়ুরোপের প্রধান প্রধান রাজপ্রতিনিধিদিগকে লইয়া, স্পেন, পর্টুগাল ও দক্ষিণ ইটালিতে বিদ্রোহ প্রশমনের উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছিলেন।

যাঁহারা ভিতরের কথা জানিতেন, তাঁহারা গ্রীক-বিদ্রোহ সংবাদে আশ্চর্য্য হন নাই। তুর্কিরা ঘোড়ায় চড়িয়া কাফেরের মাথা উড়াইতে যেমন মজবুত ছিল, রাজ্যশাসন সম্বন্ধে নিজেদের মাথা খেলাইতে তেমন পারদর্শী ছিল না। এই জন্য সুলতানের অধিকাংশ উচ্চতম রাজকর্ম্মচারী—যথা মন্ত্রী (Grand Vizier), রণপোতের অধ্যক্ষ (Dragoman of the Fleet), মল্‌ডেভিয়া, ওয়ালেকিয়া প্রভৃতি দেশের শাসনকর্ত্তৃগণ—গ্রীক জাতীয় ছিল। সুলতানের সৈন্যের মধ্যে এক দল খৃষ্টান দেশরক্ষক (Militia) ছিল—তাহাদের মধ্যেও গ্রীকের অভাব ছিল না। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে রুসিয়ার জার তুর্কির সুলতানের সহিত চুক্তি করেন যে গ্রীকেরা রুসিয়ার নিশান উড়াইয়া বাণিজ্য করিতে পারিবে। এই সকল কারণে পরাধীন হইয়াও, গ্রীক দেশে জাতীয়তা লুপ্ত হয় নাই।

গ্রীক-চার্চ-ভুক্ত যাজক-সম্প্রদায় এই জাতীয়তা যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ হোতা ছিলেন। মুসলমানেরাও ইঁহাদের প্রতিপত্তিবর্দ্ধনে সাহায্য করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহম্মদ ১৪৫১ হইতে ১৪৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। গ্রীক চার্চের মুরুব্বি হইয়া, গ্রীক যাজকদিগের অধ্যক্ষকে (Patriarch) ছোট-খাট পোপে পরিণত করিয়া, পশ্চিম য়ুরোপের খৃষ্টান পুরোহিতদিগকে দাবাইয়া রাখিতে, তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। ইহার ফলে উক্ত পেট্রিয়ার্ক, ধর্ম্মসংঘের অধ্যক্ষতা হইতে ক্রমে ক্রমে গ্রীকদিগের নায়কত্ব লাভ করেন।

অনেক দিন হইতে গ্রীসে যে জাতীয়তার বারুদ জমিতেছিল, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের অগ্নিকণা ক্রমে ক্রমে তাহাতে আসিয়া পৌছিল। য়ুরোপ হইতে মুসলমান তাড়াইয়া বাইজানটাইন (Byzantine) বা গ্রীক সাম্রাজ্য

স্থাপনোদ্দেশে, ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে, Philiko Hetairia নামক এক গুপ্ত সভা স্থাপিত হইল।

১৮২১ হইতে ১৮২৯ সাল পর্য্যন্ত গ্রীসে যে জাতীয়তার স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা কেবলমাত্র স্বদেশ-হিতৈষণার মন্দাকিনী ছিল না—তাহাতে অনেক ব্যক্তিগত স্বার্থের পঙ্কিল প্রবাহ আসিয়া মিলিত হইয়াছিল। প্রথম তিন বৎসর গ্রীকেরা সফলতার পথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়াছিল। গতিক মন্দ দেখিয়া, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে, তুর্কির সুলতান, মিসরের শাসনকর্ত্তা মহম্মদ আলির সাহায্য প্রার্থনা করে। উক্ত মহম্মদের পুত্র ইব্রাহিম পাশা ঐ সালে ক্রীট (Crete) দ্বীপ অধিকার করিয়া, পর বৎসর মোরিয়া (Morea) জয় করে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে মিসলঙ্গির যুদ্ধে গ্রীকেরা পরাস্ত হয়। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে এথেন্স নগরী প্রতিপক্ষের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

সব গেল দেখিয়া গ্রীকেরা এইবার রুসিয়ার শরণাপন্ন হইল। রুস-সম্রাটের তদানীন্তন পররাষ্ট্র-সচিব কাপডিষ্ট্রিয়াস (Capodistrias) গ্রীক জাতীয় ছিলেন। কিন্তু অষ্ট্রিয়ান চাণক্য মেটার্নিকের "পবিত্র প্রেমের" ("Holy alliance") বলে, জার আলেকজণ্ডর কিছুতেই "বিদ্রোহী"দিগকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন না। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে আলেকজণ্ডরের মৃত্যু হইলে, তাঁহার ভ্রাতা নিকলাস রুস-সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার গ্রীসের জন্য একটুও টান ছিল না—কেবল সুলতানকে বেগ দিবার জন্য তিনি গ্রীসের পক্ষপাতী হইলেন।

কবিবর বায়রণ, রাজমন্ত্রী ক্যানিং প্রভৃতি বিখ্যাত ইংরাজেরা গ্রীসের আন্তরিক অনুরাগী ছিলেন। ১৮২৫ সালে ইংলণ্ডের নিকট হইতে গ্রীক জাতি একটি রাজা ভিক্ষা চাহে, কিন্তু ইংরাজ গভর্মেণ্ট উপুড়-হস্ত করেন নাই। ১৮২৭ সালের জুলাই মাসে লণ্ডনের সন্ধি অনুসারে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুসিয়া, জোর করিয়া তুর্কি ও গ্রীসের যুদ্ধে ধামা চাপা দেন। এইবার গ্রীস তুর্কির অধীনে স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার পাইল। ("The Powers recognised the autonomy of Greece under Turkish suzereinty.")। তুর্কি-গ্রীক যুদ্ধে কর্ত্তারা ধামা চাপা দিলেন বটে, কিন্তু ১৮২৭ সালের অক্টোবর মাসে, নেভেরিনো (Navarino) উপসাগরে, তাঁহাদের তিন দলের রণতরীর সহিত তুর্ক-মিশরীয় যুদ্ধ জাহাজ গুলির আগুন খেলায় শেষোক্তের চিহ্নমাত্রও রহিল না।

১৮২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, আড্রিয়ানোপল নগরে, তুরুস্ক ও রুসিয়ার সন্ধির ফলে, গ্রীসের স্বাধীনতা প্রায় ষোল আনা ভাবে স্বীকৃত হয়। ১৮৩২ সালের মে মাসে লণ্ডন নগরে এক রাষ্ট্রনৈতিক বৈঠক (Conference) বসে। উহাতে নির্দ্ধারিত হয় যে, ইংলণ্ড, রুসিয়া ও ফ্রান্সের আজ্ঞাবহ হইয়া, গ্রীস একটি রাজতন্ত্র শাসন-প্রণালী পাইবে, এবং ঐ তিন দেশের রাজকোষ হইতে ছয় কোটি ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ কিয়দূন সাড়ে তিন কোটি টাকা ধার পাইবে।

রাজতন্ত্র লাভের পর রাজা খুঁজিবার পালা পড়িল। সাক্সনির প্রিন্স্ জন ও স্যাক্স-কোবুর্গের প্রিন্স্ লিওপল্ড (ইনি পরে বেল্জিয়মের রাজা হন), গ্রীসের রাজ-মুকুট প্রত্যাখ্যান করাতে, উহা বাভেরিয়ার প্রিন্স্ অটোর (Otto) শিরোদেশে আশ্রয় পাইল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে, সতের বৎসর বয়সে, অটো গ্রীসের সিংহাসন লাভ করেন। প্রজাদের সহিত ক্রমাগত মনোমালিন্য হওয়াতে, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজ্যত্যাগ করেন।

এইবার গ্রীকেরা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র প্রিন্স্ আলফ্রেডের এবং তৎপরে লর্ড ষ্টান্লি ও রাজমন্ত্রী গ্লাড্ষ্টোনের দ্বারস্থ হয়, কিন্তু তিনজনেই রাজাগিরিতে অরুচি প্রকাশ করেন। মহামতি গ্লাড্ষ্টোন রাজমুকুট ও সিংহাসনের কথা শুনিয়া হাসিয়া আকুল হইয়াছিলেন। অবশেষে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে, ডেন্মার্কের প্রিন্স্ উইলিয়ম জর্জ্, জর্জ দি ফার্ষ্ট্ এই নাম গ্রহণ করিয়া, গ্রীসের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

গ্রীসকে অনেকবার ক্ষুণ্ন করিয়া, ইংলণ্ডের একটু লজ্জা বোধ হইয়াছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে, আইয়োনিয়ান (Ionian) দ্বীপপুঞ্জ বক্সিস পাইয়া, গ্রীসের মুখে হাসি

দেখা দেয়। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের কৌশলে ঐ দ্বীপগুলি ফরাসীদের হস্তগত হয়। ১৮০৯ হইতে ১৮১৪ সালের মধ্যে ইহাদের অধিকাংশ ইংলণ্ডের অধীনে আসে।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে গ্রীসের শাসন-প্রণালী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হয়। ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য Boule নামক একটি সংসদ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের অন্যূন দেড় শত Deputy বা প্রতিনিধি লইয়া এই সংসদ গঠিত হইয়াছিল। ইঁহারা চার বৎসরের জন্য মনোনীত হইতেন ও বেতন পাইতেন। রাজা কর্ত্তৃক নিযুক্ত সাতজন সচীবের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার ছিল।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল এই প্রকার শাসন-প্রণালী চলিয়া, ১৯১১ সালে ইহার কিছু পরিবর্ত্তন হয়। ঐ সময়ে সামরিক কর্ম্মচারীগণকে Bouleতে স্থান দেওয়া হয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা হয়। বর্ত্তমান বৎসরে গ্রীসের সমস্ত ক্ষমতা রাজা ও সামরিক বিভাগের হস্তে গিয়াছে এবং প্রজার প্রতিনিধিরা সাক্ষীগোপাল হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ ঘটিবার প্রধান কারণ এই যে গ্রীসের অধিকাংশ লোক আজও স্বায়ত্ত শাসনের যোগ্য হয় নাই। অনেক পাঠশালায় যেমন বেত্রধারী গুরুমহাশয়ের আবশ্যকতা, অনেক দেশে তেমনি বন্দুক কামানের মালিক পরাক্রান্ত রাজার প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্য লেখকের উক্তি উদ্ধৃত হইল—"If Parliamentary government has not hitherto prov d a success in Greece, it has not been for lack of meticulous con-titutional d finition. Th Parliamentary government demands, in the first place, a long and laborious apprenticeship in the art of s lf-government; it demands among the elected representatives a substantial unanimity as regards the fundamentals of government; it demands in th Sovereign consummate tact and considerable political ex erience and education. These pre-requisites have not always been forthcoming in the modern Hellenic State."

১৮৮১ সালে তুর্কির কবল হইতে ক্রীট (Crete) দ্বীপ উদ্ধারের জন্য গ্রীকেরা কোমর বাঁধিয়া লাগিল। এই দ্বীপকে য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকেরা গ্রীক শিক্ষাদীক্ষার পীঠস্থান ("Quintessence of Hellenism") বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ক্রিটে বিদ্রোহের আগুন রাবণের চিতার মত বার মাসই জ্বলে; ১৮৪১, ১৮৬৬, ১৮৮৬ ও ১৮৯৭ সালে তথাকার অধিবাসীরা বিদ্রোহী হইয়াছিল। ১৮৯৭ সালে ইহাদের সাহায্য করিতে গিয়া গ্রীস তুর্কির কাছে নাস্তানাবুদ হয়। ইংলণ্ড, রুসিয়া, ফ্রান্স ও ইটালির চেষ্টায়, ১৮৯৯ সালে, ক্রীট দ্বীপ, সুলতানের অধীনে স্বায়ত্তশাসন ("autonomy under Turkish suzereinty") প্রাপ্ত হয়, এবং গ্রীসের রাজা ইহার প্রধান শাসনকর্ত্তা (High Commissioner) নিযুক্ত হন। গ্রীসের সহিত চোক টেপাটিপি করিয়া, ১৯০৫ সালে, তুরুস্কের সম্পর্ক একদম কাটাইতে, ক্রীট একবার চেষ্টা করে, এবং ইহাতে য়ুরোপের কর্ত্তারা ("Powers") বাধা দেওয়াতে, গ্রীসের রাজা অভিমান ভরে হাই কমিশনর রূপ চাকরিতে ইস্তফা দেন। ১৯০৬ হইতে ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত, য়ুরোপীয় চার পাঁচ জাতির সৈন্য জোট বাঁধিয়া ঐ দ্বীপের শান্তি রক্ষা করিয়াছিল।

১৯০৯ সালে গ্রীস দেশে রাজনৈতিক অশান্তি নানামূর্ত্তিতে প্রকট হয় এবং তাহার ফলে একটি সামরিক সমিতি স্থাপিত হয়। ১৯১২ সালে সুবিখ্যাত গ্রীক রাষ্ট্রনৈতিক ভেনিজলসের (Venezolos) উদ্যোগে বল্কান মৈত্রী (Balkan League) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১১ সালে ইটালীর সহিত যুদ্ধের ফলে তুর্কি দুর্ব্বল হইলে, এই বল্কান মৈত্রী—অর্থাৎ বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, গ্রীস প্রভৃতি—ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিল। য়ুরোপে তুরুস্ক সাম্রাজ্য লুপ্তপ্রায় হইল।

মাসিডোনিয়া কার ভাগে পড়িবে এই লইয়া বল্কান মৈত্রীর পাণ্ডারা তাল ঠুকিতে আরম্ভ করে—তাহার ফল ১৯১৩ সালের দ্বিতীয় বল্কান যুদ্ধ। বল্কান মৈত্রী এখন অরি-সংহতিতে পরিণত হইল। এই যুদ্ধের সময় বার্লিন ও ভিয়েনার কর্ত্তারা প্রাণ খুলিয়া নারদ নারদ করিয়াছিল।

বলকান যুদ্ধের ফলে গ্রীসের আয়তন ও জনসংখ্যা

প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যাহা ক্রমান্বয়ে ২৫,০১৪ বর্গমাইল ও ২,৬৬৬,০০০ ছিল, ১৯১৩ সালের পরে, তাহারা যথাক্রমে ৪১,৯৩৩ বর্গ মাইল ও ৪,৩৬৩,০০০ হইয়াছে। গ্রীস এখন ক্রীট দ্বীপ, দক্ষিণ এপিরাস ও দক্ষিণ মাসিডোনিয়ার প্রভু। সুপ্রসিদ্ধ সালোনিকা নগর দক্ষিণ মাসিডোনিয়ায় অবস্থিত। ইজিয়ান সাগরের অধিকাংশ দ্বীপই গ্রীসের অধীন। তুর্ক-ইটালি যুদ্ধের পর রোড্‌স (Rhodes) ও স্পোরে-ডিস (Sporades) এই দুইটি দ্বীপ ইটালীর দখলে আসিয়াছে।

বর্ত্তমান মহাসমরে গ্রীস কোন পক্ষ অবলম্বন করিবে? তাহার এখন জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ। ইংরাজ ও ফরাসীকে চটাইলে তাঁহারা সমুদ্র-তীরের সহরগুলিকে ধূলিসাৎ করিতে পারেন। জার্ম্মানিকে খেপাইলে বেল্‌জিয়াম ও সার্বিয়ার দশা ঘটিতে পারে। উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া গ্রীস এখন ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। গ্রীসের এই মুক্তকচ্ছ অবস্থা দেখিয়া লর্ড বায়রণের সেই মর্ম্মস্পৃক্ কবিত্বোচ্ছ্বাস স্মৃতিপথে জাগরূক হইতেছে :—

"Must we but weep o'er days more blest?
Must we but blush!—Our fathers bled.
Earth! render back from out thy breast
A remnant of our Spartan dead!
Of the three hundred grant but three,
To make a new Thermopylae.

শ্রীগৌরহরি সেন।

গান

সে যে আমার কত আপন আগে জানিনি—
এল কাছে, আরও কাছে কেন আনিনি!
তুলে' নয়ন মুখের পানে,
চাইল কেন সেই তা জানে—
ছিল যে তার গভীর মানে—তখন মানিনি!

ওগো আমার দিনশেষের গভীর আঁধারে
পড়্‌ছে মনে এই কথাটি আজ বারে বারে;
গেল যে দিন দূরে সরে'—
একলা পথের সাথী করে'
বল্‌গো তোরা কেন তারে ধরে' রাখিনি—
ঘরের আগল খুলে' তারে কেন ডাকিনি!

"নিভৃত কুটীর", রাঁচি। শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

গুপ্তবলভী সংবৎ

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার দ্বাবিংশ ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যায় 'গুপ্তবলভী সংবৎ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশে যাহারা মৌলিক গবেষণায় ব্যাপৃত, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা তাঁহাদের মুখপত্র বলিয়া সুপরিচিত এবং বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা অনুমোদিত না হইলে কোন প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হয় না-এই সকল কারণে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে যে সকল মতামত ব্যক্ত হয়, সর্ব্বসাধারণে স্বভাবতঃ তাহাতে বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করেন। এমতাবস্থায় এই সকল প্রবন্ধে কোন ভুল ভ্রান্তি থাকিলে তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং এই সমুদয় ভুল ভ্রান্তির বিশেষ আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

প্রাচীন যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাস উদ্ধার করা কত কঠিন তাহা সকলেই অবগত আছেন। চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত যৎসামান্য উপকরণ মাত্র অবলম্বনে ধীরে ধীরে বহু পরিশ্রম সহকারে এই ইতিহাসের কঙ্কাল গঠন করিতে হয়। এই কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী হন তাঁহাদের ভুল, ভ্রান্তি, ত্রুটি এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী। এই সকল ভুল ভ্রান্তি বা ত্রুটি সম্বন্ধে পরস্পর আলোচনা করিলে ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধার সহজসাধ্য হয়। বস্তুতঃ এইরূপ আলোচনা ব্যতীত ইতিহাস গঠন এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইয়ুরোপের যে সকল মনীষিগণ ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস গঠনে ব্যাপৃত, তাঁহারা সর্ব্বদাই পরস্পরের ভুল ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া ইতিহাস আলোচনার পথ সুগম করিয়া দিতেছেন। আর এই-রূপ আলোচনা সকলেই সহৃদয়তার সহিত গ্রহণ করেন। আমাদের দেশে কিন্তু এই সহৃদয়তার ভাবটা ঠিক তেমন ভাবে জাগিয়া উঠে নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে "প্রতিভা" পত্রে শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত "বাঙ্গালার ইতিহাস" গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষ্যে ইহার কয়েকটি ভুল ও ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়াছিলাম। আমি যতদূর জানি শ্রীযুক্ত রাখালবাবু ইহাতে সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট হন নাই। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কোন ঐতিহাসিক প্রকাশ্য সভাস্থলে আমাকে বলেন যে আমার আচরণ "মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি"র তুল্য এবং এই প্রকার সমালোচনা দ্বারা আমি বাঙ্গালাদেশে ইতিহাস উদ্ধারের পথে অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছি।—যতদিন আমাদের মনে এইরূপ ভাব থাকিবে ততদিন বাঙ্গালাদেশে ইতিহাস উদ্ধারের আশা দুরাশা মাত্র।

যে উদ্দেশ্যে রাখালবাবুর গ্রন্থের সমালোচনা লিখিয়াছিলাম, সেই উদ্দেশ্যেই শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যা-ভূষণ মহাশয়ের লিখিত গুপ্তবলভী সংবৎ নামক প্রবন্ধ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। বলা বাহুল্য যে, এই উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল যাহাতে নিরপেক্ষ ও বিচারপূর্ণ সমালোচনা দ্বারা ইতিহাস আলোচনার পথ সুগম হয় তাহারই চেষ্টা করা। আমাদের দেশে দুর্ভাগ্য যে এই কথাটিও সবিস্তারে বুঝাইবার আবশ্য-হয়।

অমূল্য বাবুর প্রবন্ধ মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত প্রথমভাগে,তিনি এযাবৎ যেথানে যেথানে গুপ্ত সংবৎসম্বে আলোচনা হইয়াছে তাহার সংক্ষেপ উল্লেখ করিয়াছে দ্বিতীয় ভাগে গুপ্ত বলভী সংবতের প্রারম্ভকাল, তৃতীয় ভাগে ঐ সংবতের উৎপত্তি বিষয়ে আলোচ করিয়াছেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব নাই। কারণ ইহা মূল বিষয়ের ভূমিকা মাত্র এব ইহাতে নূতনত্ব কিছু নাই। কেবলমাত্র একটি বাক সম্বন্ধে আমার একটু আপত্তি আছে। অমূল্যবাবু লিখিয়াছেন—"১৯১২ খৃঃ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যা মহাশয় I. A. (?) ৩১৯ খৃষ্টাব্দকে গুপ্তাব্দের প্রার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন" (১১১ পৃঃ)। ইহা পা করিলে এরূপ মনে হইতে পারে যে গুপ্তাব্দের প্রারম্ভ কাল এখনও সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই এবং তাহা ব্যক্তি বিশেষ ইচ্ছা করিলে স্বীকার বা অস্বীকার করিতে পারেন। বস্তুতঃ ফ্লীট সাহেবের গ্রন্থ আবিষ্কারের প গুপ্তাব্দের প্রারম্ভকাল সম্বন্ধে আর কোন মতদ্বৈধ নাই একথা অমূল্যবাবু স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন (১১২ পৃঃ)।

প্রবন্ধের তৃতীয় ভাগে অমূল্যবাবু কয়েকটি মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বিস্তারিত আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

(১) অমূল্যবাবু লিখিয়াছেন—"বাণের মতানুসারে ৬০৬ খৃষ্টাব্দে নেপালের ঠাকুরী বংশের রাজারা হর্ষকাল ব্যবহার করিতেন ;" এই বাক্যার্দ্ধের বিরুদ্ধে আমার তিনটি আপত্তি আছে।

(ক) বাণ কথনই এইরূপ মত প্রকাশ করেন নাই।

(খ) ৬০৬ খৃষ্টাব্দে নেপালের ঠাকুরী রাজবংশের অস্তিত্বই ছিল না।

(গ) নেপালের ঠাকুরীবংশের রাজারা হর্ষকাল ব্যবহার করিতেন ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত সিদ্ধান্ত নহে।

এই আপত্তির কারণগুলি বিস্তৃত করিয়া বলিতেছি।

(ক) বাণভট্টের হর্ষচরিতে বা অন্য কোন গ্রন্থে নেপালে হর্ষসংবতের ব্যবহারের কোন উল্লেখ নাই। এমন কি হর্ষ যে নেপাল জয় করিয়াছিলেন এরূপ প্রমাণও উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অমূল্যবাবু বাণের গ্রন্থের কোন স্থানে এরূপ প্রমাণ পাইয়াছেন তাহার উল্লেখ করেন নাই। আমি যতদূর জানি হর্ষচরিতের কোন স্থানে নেপাল জয়ের স্পষ্ট উল্লেখ নাই তবে ইহার একটি দ্ব্যর্থবোধক বাক্যে এইরূপ ইঙ্গিত করা হইয়াছে বলিয়া বুলার অনুমান করেন ১। বাক্যটি এই—"অত্র পরমেশ্বরেণ তুষার শৈলভুবো দুর্গায়া গৃহীতঃ করঃ।" বুলার বলেন যে এখানে "তুষার শৈলভুবো দুর্গায়াঃ" ইহার শিবপক্ষে অর্থ 'হিমালয় কন্যা দুর্গা' এবং হর্ষ পক্ষে অর্থ 'নেপাল'। কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র 'তুষার শৈলভুবো দুর্গায়াঃ" নেপালকেও বুঝাইতে পারে, আবার কাশ্মীর প্রদেশও বুঝাইতে পারে। আর শেষোক্ত অনুমানই অধিকতর সঙ্গত কারণ আলবেরূণীর গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে কাশ্মীরে হর্ষ সংবতের প্রচলন ছিল। সুতরাং হর্ষ সম্ভবতঃ ঐ প্রদেশ জয় করিয়া থাকিবেন। সিলভান্ লেভির মতে তুষার অর্থে তুখার বা তুরস্কজাতি বুঝিতে হইবে। (২)

(খ) নেপালে ঠাকুরী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা অংশুবর্ম্মণ ৬০৬ খৃষ্টাব্দে রাজত্বপদ লাভ করেন নাই। অমূল্য বাবু গুপ্ত বলভী সংবতে উৎকীর্ণ শিলালিপির যে তালিকা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে ৪৯ নং লিপিতে ৩১৬ বা ৩১৮ গুপ্তাব্দে উৎকীর্ণ মহারাজ শিবদেবের লিপির উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতেই ৬৩৫ বা ৬৩৭ খৃষ্টাব্দেও শিবদেব মহারাজা ও অংশুবর্ম্মা মহাসামন্ত মাত্র (বস্তুতঃ এই লিপির তারিখ ৬২৮ খৃঃ অঃ আমরা তাহা পরে দেখাইব—কিন্তু তাহাতেও অমূল্য বাবুর সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হয় না)। ৩৪ সংবতে উৎকীর্ণ 'বাংমাটি' লিপিতেও অংশুবর্ম্মা মহাসামন্তরূপে পরিচিত। অমূল্যবাবু ইহাকে হর্ষসংবৎ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং ৬৪০ খৃষ্টাব্দেও অংশুবর্ম্মা মহাসামন্তরূপে পরিচিত। ৩৯ সংবতে উৎকীর্ণ একখানি লিপিতে তিনি শ্রী অংশুবর্ম্মা নামে উল্লিখিত হইয়াছেন—সুতরাং ৬৪০ ও ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে তিনি "মহাসামন্ত" উপাধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অবশ্য একথা বলা যাইতে পারে যে পরবর্ত্তীকালের 'উজীর' ও 'পেশবা'র ন্যায় নামে মহাসামন্ত হইলেও তিনি ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে বা তাহার পূর্ব্বেই প্রকৃত রাজকার্য্য পরিচালনা :করিতেন। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে অন্ততঃ ৬২৮ বা ৬৩৭ খৃঃ পর্য্যন্তও মহারাজা শিবদেবের নামযুক্ত লিপিতে তিনি মহাসামন্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন সুতরাং ৬০৬ খৃষ্টাব্দে নেপালের ঠাকুরী রাজবংশের অস্তিত্ব কল্পনা করা অসম্ভব।

(গ) পূর্ব্বে যে ৩৪ ও ৩৯ সংবতে উৎকীর্ণ লিপির উল্লেখ করা হইল ইহা কোন সংবৎ? সাধারণতঃ ইহা হর্ষ সংবৎ বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ আছে। সিলভান্ লেভির মতে এই সংবতের প্রারম্ভকাল ৫৯৫ খৃঃ এবং ইহার উৎপত্তিস্থান সম্ভবতঃ তিব্বত। (৩)

অমূল্যবাবু লিখিয়াছেন—"লিচ্ছবি রাজারাও নেপাল জয়ের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী কোনও প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। এমন কি নেপাল জয়ের পরও ভারতে তাঁহাদের রাজত্ব ছিল। গঙ্গার উত্তরে ভারতের প্রাচীন রাজধানী পুষ্পপুর বা পাটলিপুত্রে তাঁহাদের শাসনাধিকার ছিল (Dr. Bhagawanlal's Nepal Ins. No X V.) (১১৪ পৃঃ)

অমূল্যবাবু যে লিপির উল্লেখ করিয়াছেন উহা ১৫৩ সংবতে উৎকীর্ণ রাজা জয়দেবের পশুপতি মন্দির লিপি। ইহাতে লিচ্ছবি বংশের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। এই বিবরণ অনুসারে নিম্নলিখিত বংশ তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

(১) I. A. XIX. P. 41.

(২) Le Nepal Vol II. P. 145.

(৩) Le Nepal II (153),

ব্রহ্ম
|
......
|
সূর্য্য
|
মনু
|
ইক্ষাকু
|
বিকুক্ষি
|
....
|
বিষগশ্ব
: (২৮ জন রাজা) নাম দেওয়া নাই।
সগর
|
অসমঞ্জস
|
অংশুমৎ
|
দিলীপ
|
ভগীরথ
:
রঘু
|
অজ
|
দশরথ (৮ জন রাজা ও তাঁহাদের পুত্র পৌত্রাদি)।
:
লিচ্ছবি
:
সুপুষ্প (ইনি পুষ্পপুরে বা পাটলিপুত্রে জন্মগ্রহণ করেন)।
: (২৩ জন রাজা
জয়দেব
: (১১জন রাজা)
বৃষদেব
|
শঙ্করদেব
|
ধর্ম্মদেব
|
মানদেব
|
মহীদেব
|
বসন্তদেব

নেপালের রাজগণের যে বংশাবলী পাওয়া গিয়াছে (৪) তাহাতে লিচ্ছবিবংশের তৃতীয় রাজার নাম জয়-বর্ম্মণ ও সপ্তদশ, অষ্টাদশ, উনবিংশ, বিংশ, একবিংশ ও দ্বাবিংশ রাজার নাম যথাক্রমে বৃষদেব বর্ম্মণ, শঙ্কর দেব, ধর্ম্মদেব, মানদেব মহীদেব ও বসন্তদেব দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং জয়দেবের পর হইতে উক্ত শিলালিপির বিবরণের সহিত বংশাবলীর বিবরণের অনেকটা ঐক্য আছে। এমতাবস্থায় উক্ত শিলালিপির বর্ণিত রাজগণের মধ্যে জয়দেবকেই নেপালের প্রথম রাজা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

জয়দেবের পূর্ব্বে যে সকল রাজার বিবরণ এই শিলালিপিতে পাওয়া যায়, অন্যবিধ প্রমাণ ব্যতিরেকে তাঁহাদিগকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সূর্য্য, ইক্ষ্বাকু, দশরথ প্রভৃতি স্পষ্টতঃ পৌরাণিক আখ্যা হইতে গৃহীত এবং লিচ্ছবিগণের সহিত সূর্য্যবংশের সম্বন্ধ স্থাপনা করিবার নিমিত্তই এই সকল নামের অবতারণা করা হইয়াছে। সুতরাং লিচ্ছবির পরবর্ত্তী সুপুষ্প পুষ্পপুরে বা পাটলিপুত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কাহিনী অন্যবিধ প্রমাণ না পাইলে একেবারে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

কিন্তু যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে সুপুষ্প পাটলিপুত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতেও অমূল্য বাবুর

---

(৪) নেপালের বংশাবলীর বিবরণ নিম্নলিখিত ইংরাজী গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়।

(ক) Kirk Patrick—Account of the Kingdom of Nepal (1811)

(খ) D. Wright—History of Nepal (1877)

(গ) Bendall—Catalogue of Buhdhist Sanskrit Manuscripts in the Cambridge University Library. (1883).

(ঘ) Bhagawanlal-Indraji-Buhеer—"Twenty three Inscriptions from Nepal Etc (1885)

(ঙ) Sylvain Levi—"Le Nepal" Vol II (1905)

এই শেষোক্ত গ্রন্থখানিতে অন্যান্য গ্রন্থগুলির বিবরণের সারাংশ দেওয়া হইয়াছে।

কথা প্রমাণিত হয় না। অমূল্যবাবু বলেন, "নেপাল জয়ের পরও ভারতে তাঁহাদের (লিচ্ছবিগণের) রাজত্ব ছিল। গঙ্গার উত্তরে, ভারতের প্রাচীন রাজধানী পুষ্পপুর বা পাটলিপুত্রে তাঁহাদের শাসনাধিকার ছিল।"

পূর্ব্বোক্ত শিলালিপির মতে, সুপুষ্পের পরে ২৩ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন—তৎপরে জয়দেব রাজা হন। বংশাবলীর মতে এই জয়দেব (বা জয়বর্ম্মণ) নেপালের লিচ্ছবিবংশের তৃতীয় রাজা। সুতরাং সুপুষ্পের রাজ্যকাল ও লিচ্ছবিগণের নেপাল অধিকার, এই দুই ঘটনার মধ্যে অন্ততঃ ২১ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ কাল যে পাটলিপুত্র লিচ্ছবিগণের অধীনে ছিল, এবং তৎপরে নেপাল জয়ের পরও যে পাটলিপুত্র তাঁহাদের হস্তচ্যুত হয় নাই এ সমুদয়ের কোন প্রমাণই অমূল্যবাবু দেন নাই, সুতরাং আমরা তাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অক্ষম।

(৩) নেপালে লিচ্ছবিরাজগণের শিলালিপিতে যে সংবতের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় অমূল্যবাবু নির্ব্বিচারে ফ্লীটের মতানুসারে তাহাকে গুপ্তসংবৎ হইতে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অমূল্য বাবুর প্রবন্ধের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, গুপ্তসংবতের উৎপত্তি নেপালে হয় নাই। গুপ্তসংবতের উৎপত্তি নেপালে হইয়াছিল কিনা তাহা অনুসন্ধান করিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে যে, নেপালে যে সংবতের প্রচলন ছিল তাহা গুপ্ত সংবৎ কি না। যদি তাহা গুপ্ত সংবৎ না হয়, তবে তো এবিষয়ে কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হইতে পারে না। অমূল্যবাবু কিন্তু এবিষয়ে কোন অনুসন্ধান না করিয়া, ফ্লীটের অনুসরণ পূর্ব্বক মানিয়া লইয়াছেন যে, নেপালে প্রচলিত সংবৎ গুপ্তসংবৎ হইতে অভিন্ন। ফ্লীট ব্যতীত অন্য যাঁহারা নেপাল সংবতের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, অমূল্য-বাবু সম্ভবতঃ তাঁহাদের সকলের লেখা পড়েন নাই, কারণ তাহা হইলে তিনি নিঃসন্দেহে ফ্লীটের মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারিতেন না। আর নেপালে প্রচলিত সংবৎ গুপ্তসংবৎ হইতে, অভিন্ন, ফ্লীটের এই মত যদি প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ না করা যায়, তাহা হইলে গুপ্তসংবৎ নেপালে প্রচলিত ছিল কিনা এ প্রশ্নই উত্থাপিত হইতে পারে না, সুতরাং অমূল্যবাবু তাঁহার প্রবন্ধে যে সকল যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার আদৌ কোন প্রয়োজন হয় না।

নেপালের লিচ্ছবি সংবৎ সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে তিন জনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম ইন্দ্রজী-বুলার, দ্বিতীয় ফ্লীট, তৃতীয় সিলভান লেভী।

ইন্দ্রজী গুজরাটি ভাষায় যে প্রবন্ধ লেখেন তাহা বুলার কর্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারীর নবম ও ত্রয়োদশ ভাগে প্রকাশিত হয়। পরে ইহা "Twenty three Inscriptions from Nepal collected at the expense of H. H. the Nawab of Junagadh Together with some considerations on the Chronology of Nepal" নামে স্বতন্ত্র পুস্তিকা-কারে প্রকাশিত হয়।

ফ্লীট ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারীর চতুর্দ্দশ ভাগে, ও তাঁহার 'গুপ্তলিপির' (Gupta Inscriptions Corpus Inscriptionum Indicarum III 1888) ভূমিকায় এ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

সিলভান লেভী ১৮৯৫ সালের "জুর্ণাল এশিয়াটিকে" ও পরে 'Le Nepal' (1905) গ্রন্থে তাঁহার মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত বেণ্ডাল্ (Bendall) প্রণীত Journey of Literary and Archæological Research in Nepal and Northern India (1888) এবং Catalogue of the Buddhist Sanskrit manuscripts in the Cambridge University Library (1883)" নামক গ্রন্থদ্বয়েও নেপাল সংবৎ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা আছে।

ইন্দ্রজী-বুলারের মতে লিচ্ছবি সংবৎ ও বিক্রম সংবৎ অভিন্ন। জয়দেবের পশুপতি মন্দির লিপির একটি শ্লোকার্দ্ধের তিনি এইরূপ পাঠ করিয়াছিলেন।

"অস্যান্তরেপ্যুদয়দেব ইতি ক্ষিতীশাজ্জাতা স্ত্রয়োদশ [তত] শ্চ নরেন্দ্র দেবঃ"।

তাঁহার মতে ইহার অর্থ, "তাঁহার (বসন্তদেবের) পরে রাজা উদয়দেব হইতে জাত ত্রয়োদশ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং তৎপরে নরেন্দ্রদেব রাজা হন।"

উক্ত লিপি হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, মানদেব বসন্তদেবের পিতামহ এবং দ্বিতীয় জয়দেব নরেন্দ্রদেবের পৌত্র। সুতরাং ইন্দ্রজীর মতে মানদেব হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯ জন রাজা জয়দেবের পূর্ব্বে রাজত্ব করেন।

ইন্দ্রজী প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করেন যে, জয়দেবের লিপির ১৫৩ বর্ষ হর্ষসংবৎ অনুসারে গণনা করিতে হইবে। সুতরাং জয়দেবের রাজা কাল ৭৫৯-৭৬০ খৃঃ অব্দ। প্রত্যেক রাজার রাজ্যকাল গড়ে ২২।২৩ বৎসর ধরিয়া লইয়া, ইন্দ্রজী মানদেবের রাজ্যকাল জয়দেবের ৪৩০ বৎসর পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট করেন। সুতরাং মানদেবের রাজ্যকাল ৩৩০ খৃঃ অঃ। মানদেবের একখানি লিপির তারিখ ৩৮৬ সংবৎ, সুতরাং এই সংবতের আরম্ভকাল ৫৭ খৃঃ পূঃ, অতএব বুলার ইন্দ্রজীর মতে নেপালের লিচ্ছবিরাজগণ যে সংবতের ব্যবহার করিতেন, তাহা বিক্রম সংবৎ হইতে অভিন্ন।

ইন্দ্রজীর যুক্তি প্রণালী অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, এবিষয়ে তাঁহার প্রধান অবলম্বন, "অস্যান্তরে-প্যুদয়দেব ইতি ক্ষিতীশাজ্জাতা স্ত্রয়োদশ [তত] শ্চ নরেন্দ্র দেবঃ"—পশুপতি-মন্দির-লিপির এই শ্লোকার্দ্ধ। কিন্তু ইন্দ্রজীর এই পাঠ কোন মতেই গ্রহণ করিবার উপায় নাই। ইন্দ্রজী যে অক্ষর চারিটিকে "স্ত্রয়োদশ" পাঠ করিয়াছেন, তাহা এত অস্পষ্ট যে তাহার কোন প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করা অসম্ভব। আর ইহা যে সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ নহে, তাহার কারণ এই যে ইন্দ্রজী ইহার পূর্ব্বের অক্ষর দুইটিকে 'জ্জাতা' পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারই প্রকাশিত লিপিতে স্পষ্ট 'জ্জাত' পাঠ রহিয়াছে। একবচন 'জাত'র সহিত বহুবচন 'ত্রয়োদশে'র অন্বয় হইতে পারে না। আমি যতদূর জানি ফ্লীটই সর্ব্বপ্রথমে এই ভ্রম প্রদর্শন করেন, পরে সিল্‌ভান লেভী ফ্লীটের সমর্থন করিয়াছেন, সুতরাং ইন্দ্রজীর মতের উপর আর নির্ভর করা চলে না।

ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারীর চতুর্দ্দশভাগে ভাটগাঁয়ের নিকটবর্ত্তী গোলমাটিটোল নামক স্থানে প্রাপ্ত এক-খানি লিপির বিবরণ বেণ্ডাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। এই লিপিতে মহারাজ শিবদেব ও অংশুবর্ম্মণের উল্লেখ আছে, এবং বেণ্ডালের মতে ইহার তারিখ ৩১৬ বা ৩১৮ বর্ষ। ফ্লীট প্রধানতঃ এই লিপির সাহায্যেই লিচ্ছবি সংবতের কাল নিরূপণ করেন। হুয়েনসাংএর বিবরণ হইতে জানা যায় যে অংশু-বর্ম্মণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। সুতরাং যে সংবতের ৩১৮ বর্ষে তাঁহার নামোল্লেখযুক্ত লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল তাহার আরম্ভ কাল খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভ। ফ্লীট সাহেব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করেন যে গুপ্তকালের আরম্ভ ৩২০ খৃঃ অব্দ, সুতরাং তাঁহার মতে নেপালে প্রচলিত সংবৎ এই গুপ্তসংবৎ হইতে অভিন্ন।

সিলভান্ লেভি প্রথমে প্রতিপন্ন করেন যে ফ্লীট ও বেণ্ডাল যাহাকে '৩০০'র চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়া-ছিলেন তাহা বস্তুতঃ '৫০০'র চিহ্ন। সুতরাং উল্লিখিত শিবদেব অংশুবর্ম্মার লিপির তারিখ ৩১৬ বা ৩১৮ নহে, ৫১৬ বা ৫১৮। সুতরাং ফ্লীটের যুক্তি অনু-সারেই লিচ্ছবি সংবতের আরম্ভকাল খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ। সৌভাগ্যের বিষয় ইহার সমর্থক আর একটি বিশিষ্ট প্রমাণও সিলভান্ লেভি উদ্ধৃত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। থানকোটের নিকটবর্ত্তী কিসিপিদি নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি লিপির বিবরণ তিনি প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার তারিখ "সম্বৎ ৪০০, ৪০, ৯, প্রথমাষাঢ় শুক্লদশম্যাং"। ইহাতে দেখা যায় যে লিচ্ছবি সংবৎ ৪৪৯ বর্ষে আষাঢ় মাস মলমাস ছিল।

ফ্লীটের মতানুসারে লিচ্ছবি সংবৎ ও গুপ্ত সংবৎ অভিন্ন ধরিলে (৪৪৯+৩১৯) ৭৬৮—৭৬৯ খৃষ্টাব্দে আষাঢ়মাসে মলমাস হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। কিন্তু কোন প্রকার জ্যোতিষিক গণনা দ্বারাই উক্তবর্ষে আষাঢ়মাস মলমাস পাওয়া যায় না। সুতরাং লিচ্ছবি সংবৎ ও গুপ্তসংবৎ অভিন্ন ফ্লীটের এই মত ভ্রান্ত বলিয়াই প্রমাণিত হয়।

কিসিপিদি লিপির সাহায্যে যে কেবলমাত্র ফ্লীটের মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহা নহে, সিল্‌ভান্ লেভি ইহার সাহায্যে লিচ্ছবি সংবতের প্রারম্ভকাল নিশ্চিত-রূপে নির্ণয় করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে অংশুবর্ম্মণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন। তাঁহার নামোল্লেখযুক্ত একখানি লিপির তারিখ ৫২০ বর্ষ। অতএব লিচ্ছবি সংবৎ ৫২০ বর্ষ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগ। সুতরাং কিসিপিদি লিপির ৪৪৯ বর্ষ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগ। এই লিপি অনুসারে এই বর্ষে আষাঢ়মাস মলমাস ছিল। জ্যোতিষিক গণনা দ্বারা দেখা যায় যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে মাত্র তিনবার আষাঢ়মাস মলমাস ছিল, যথা, ৫৫৯-৬০ খৃ: অ:, ৫৭৮-৭৯ খৃ অ:, ৫৯৭-৯৮ খৃ: অ: সুতরাং এই তিনবর্ষের মধ্যে কোন বর্ষে কিসিপিদি লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অতএব লিচ্ছবি সংবতের প্রারম্ভ (১) ১১০-১১ খৃ:-অ: (২) ১২৯-৩০ খৃ: অ:, অথবা (৩) ১৪৮-৪৯ খৃ: অ:

ইহার মধ্যে শেষ দুইটি সম্ভবপর নহে। কারণ মহারাজ শিবদেবের একখানি লিপির তারিখ ৫২০ বর্ষ। উল্লিখিত দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ষ লিচ্ছবি সম্বতের প্রারম্ভ-কাল ধরিয়া লইলে এই লিপিকে ৬৪৮-৪৯ খৃ: অ: অথবা ৬৬৭-৬৮ খৃ: অ: বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। কিন্তু ৩৪ সংবতে উৎকীর্ণ মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মণের লিপিতে শিবদেবের নাম নাই। সুতরাং শিবদেবের ৫২০ বর্ষের লিপি ইহার পূর্ব্বের বলিয়া ধরিতে হইবে। অংশুবর্ম্মণের লিপির ৩৪ সংবৎ সাধারণতঃ হর্ষ সম্বৎ বলিয়া গৃহীত হয়, সিল্‌ভান্ লেভির মতে ইহার আরম্ভ কাল ৫৯৫ খৃ: অব্দ। কিন্তু উভয় মতেই ৬৪০ খৃ: অব্দের পূর্ব্বেই শিবদেবের রাজত্ব শেষ হইয়াছিল। সুতরাং শিবদেবের লিপির ৫২০ বর্ষ যে সংবৎ অনুসারে গণনা করিতে হইবে, তাহার আরম্ভ ১২৯-৩০ অথবা ১৪৮-৪৯ খৃ: অ: হইতে পারে না। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে এই দুইটি ব্যতীত কেবলমাত্র আর একটি বর্ষে লিচ্ছবি সংবতের আরম্ভ হইতে পারে। এই বর্ষ ১১০-১১ খৃ: অ:। সুতরাং ইহাই লিচ্ছবি সংবতের আরম্ভকাল। এই গণনা অনুসারে শিবদেবের লিপির কাল ৬৩০ খৃ: অ:। তৎপরে অংশুবর্ম্মণ স্বাধীন হইয়া প্রথমে মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মণ (৩৪ সংবৎ ৬৪০ খৃ: অ: কিন্তু সিলভান্ লেভির মতে ৬৩০) ও পরে শ্রীঅংশুবর্ম্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন (৩৯ সংবৎ-৬৪৫ অথবা ৬৩৫ খৃ: অ:)

এই আলোচনা হইতে দেখা যায় যে অমূল্য বাবু যে ফ্লীটের মতানুসারে লিচ্ছবি সংবৎ ও গুপ্তসংবৎকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ভুল, অন্ততঃ তাহা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত নহে। সিলভান্ লেভির গ্রন্থ ১৯০৫ সালে বাহির হইয়াছে। যতদূর জানি এই দশবৎসরের মধ্যে ফ্লীট তাঁহার মতের কোন প্রতিবাদ করেন নাই। ভিন্‌সেন্ট স্মিথ স্বীয় ইতিহাসে লেভির মত গ্রহণ করিয়াছেন। এই মতের বিরুদ্ধে কেহ কিছু লিখিয়াছেন বলিয়া জানি না। এমতা-বস্থায় নেপাল সংবৎ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া অমূল্যবাবু বিনা বিচারে ফ্লীটের পরিত্যক্ত ও প্রত্যাখ্যাত মত সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ লেভির মতের নামমাত্র করেন নাই ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং সাহিত্য পরিষদের বিশেষজ্ঞ-গণ কর্ত্তৃক ইহা অনুমোদিত হইয়াছে। সুতরাং সাধারণ পাঠকবর্গ যদি এই প্রবন্ধোক্ত নেপাল সম্বৎ সম্বন্ধে মন্তব্য বিনা বিচারে গ্রহণ করেন, তবে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। যাহাতে এইরূপ:

ভ্রান্ত ধারণা প্রচারিত না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

অমূল্যবাবু প্রবন্ধ শেষে গুপ্তবলভী সংবতের শিলালিপির তালিকা দিয়াছেন। এ যাবৎ ঐ সংবতের তারিখ যুক্ত যত শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের তালিকা করাই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য হইয়া থাকে তবে তাহা কতকাংশে বিফল হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, তাঁহার তালিকায় গুপ্তসংবৎ ৫১০ বর্ষে উৎকীর্ণ তেজপুর লিপির (৫) উল্লেখ নাই। আর এই তালিকাভুক্ত ৪৯, ৬৩, ৬৬ ও ৬৭ সংখ্যক লিপির তারিখ যে গুপ্তসংবতের বর্ষ নহে, তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

দেশ বিদেশের কথা

(১) জল-প্রপাত।

নর্ম্মদা-প্রপাত।

নর্ম্মদার অপর নাম রেবা। ইনি নাকি মহাদেবের দেহ হইতে উৎপাদিত হইয়াছেন; — স্তবে আছে, "নমোহস্তু তে শঙ্করদেহনিঃসৃতে"।

নর্ম্মদা অভিশাপগ্রস্তা নদী। এক সময় ছিল, যখন নর্ম্মদার পবিত্রতা গঙ্গার অপেক্ষাও অধিক বিবেচিত হইত গঙ্গায় মজ্জন না করিলে পাপক্ষয় হয় না — নর্ম্মদা দৃষ্টিমাত্রে পাপ তিরোহিত হইয়া যাইত। স্থানীয় পাণ্ডারা কিন্তু বলে, নর্ম্মদার [illegible]শাপ-কাল স[illegible] [illegible] হইয়া গিয়াছে — [illegible] কর ও দক্ষিণা দা[illegible] [illegible]নুসারে নর্ম্মদার অভিশাপ-কাল কলির পঞ্চসহস্র বর্ষ পাঞ্জিকা অনুসারে, আজ ১৭ বৎসর নর্ম্মদার শাপান্ত হইয়াছে।

শাস্ত্রে আছে, নর্ম্মদার জল একবার পান করিলে, দশমাস কাল শরীর পবিত্র থাকে।—

ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তাভিস্তু যামুনম্।
নর্ম্মদং দশভির্মাসৈর্গাঙ্গং বর্ষেণ জীর্য্যতি॥

ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম।

বিন্ধ্যপর্ব্বতে অমরনাথ মন্দিরের নিকট নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তি। গিরিপথে আসিয়া জব্বলপুরের নিকট জলপ্রপাত। উপর হইতে একশত ফুট নিম্নে জলধারা



নর্ম্মদা প্রপাত।

পতিত হইতেছে। সেখানটা বিস্তীর্ণ হ্রদের মত। মর্ম্মর

(৫) Archaeological Survey of India 1902-3 P. 229.

জল, হ্রদ হইতে মর্ম্মরগিরির (Mor ble Rocks) ভিতর দিয়া পশ্চিমগামী হইয়া ক্রমে তমসা নদীতে গিয়া মিশিয়াছে। এই মর্ম্মর-গিরিখণ্ডে লক্ষ লক্ষ মধুমক্ষিকার বসতি। সময়ে সময়ে অতি সাহস বশতঃ কোন কোনও দর্শক তাহাদিগকে ঘাঁটাইতে গিয়া মৃত্যুমুখেও পতিত হইয়াছে। একবার এক ইংরাজ এই মধুমক্ষিকা-পুঞ্জ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলায়ন কালে জলে পড়িয়া গিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

চুম্বি-উপত্যকার জল-প্রপাত।

তিব্বৎ দেশে চুম্বি-উপত্যকার শিরোভাগে বিখ্যাত ফারি দুর্গ অবস্থিত। সেই দুর্গের কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে এই জলপ্রপাত। এই জলপ্রপাত দারুণ শীতের সময় জমিয়া বরফ হইয়া যায়—এবং না গলা পর্য্যন্ত স্থির মূর্ত্তিতে বিরাজ করে।



চুম্বি উপত্যকার জলপ্রপাত।

রাম্বোদা-প্রপাত।

সিংহলদ্বীপে 'নুয়ারা ইলিয়া' নামক একটি প্রাচীন নগর আছে। য়ুরোপীয়গণ এখন সে স্থান তাঁহাদের গ্রীষ্মযাপনের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। সেখান হইতে ছয়ক্রোশ নিম্নে একটি উপত্যকা আছে। দুই দিকে জঙ্গলপূর্ণ পাহাড়ের পর পাহাড় নামিয়া গিয়াছে—হস্তিযূথ নির্ভয়ে তথায় বিচরণ করে। উপত্যকাভূমিতে, কয়েকটি জলপ্রপাত দেখা যায়। যদিও এগুলি উচ্চতায় অন্য অনেক জলপ্রপাত অপেক্ষা হীন তথাপি সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। সুবৃহৎ পাষাণখণ্ডের শিরোভাগ বিধৌত করিয়া এই প্রপাত প্রথমে কিয়দ্দূর অনতি-উচ্চ সোপানবৎ শৈলমার্গ অতিক্রম করিয়া, একলম্ফে নিম্নে অবতরণ করিয়াছে। যেখানে পড়িয়াছে, সেখানে বহুদূর পর্য্যন্ত শীকরাবৃত করিয়া রাখিয়াছে। স্থানটি দুর্গম নহে—কয়েক মাইল দূর দিয়া রেল-লাইন গিয়াছে।

চুজেঞ্জি জল-প্রপাত।

জাপানে চুজেঞ্জি হ্রদ হইতে "দাইয়া" নদী বাহির হইয়াছে। প্রথমাবস্থায় নদীটি ক্ষীণকায়া—তবে বর্ষা-কালে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে বটে। উভয় তীরে বৃক্ষশ্রেণী। ক্রমে "কিগম্নো-টাকী" পর্ব্বতশিখরে (cascade) আসিয়া, সহসা ২৫০ ফুট নিম্নে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে।

বর্ষের বিভিন্ন সময়ে এই জলপ্রপাতের আকৃতিও বিভিন্ন প্রকার। গ্রীষ্মঋতুতে "দাইয়া" প্রায় জলহীন—সামান্য যাহা থাকে তাহা যেন কুলুকুলু নাদ করিতে করিতে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করে। দুই পার্শ্বে সবুজ পাতাভরা মেপল্‌বৃক্ষ,—তাহার মধ্যে দিয়া



সিংহলে রাম্বোদা জলপ্রপাত।

দাইয়ার জল-জলাশয় চুজেজি হ্রদকে জমাইয়া দিয়া কঠিন করিয়া তুলে—তখন কিগয়োটাকী-গাত্রে কেবল হিমকণার রাশি—সে বেগ নাই, সে গতি নাই, সে গর্জ্জনও নিস্তব্ধ।

ভিক্টোরিয়া জল-প্রপাত।

আফ্রিকা মহাদেশে যতগুলি দীর্ঘ নদী আছে, জাম্বেজি তাহাদের মধ্যে অন্যতমা। মধ্য আফ্রিকার দক্ষিণ পূর্ব্বভাগে যে গ্র্যানিট্ পর্ব্বত-গুলি আছে, সেই খানেই জাম্বেজির জন্মস্থান। কয়েকটি স্রোত বিভিন্ন পথে সেস্থান হইতে বাহির হইয়াছে। "লাইবা" নাম্নী স্রোত-টিই তন্মধ্যে প্রধান। প্রায় একশত ক্রোশ আসিয়া, কাবম্পো নামক স্রোতটির সহিত লাইবা মিলিয়াছে। পরে অন্যান্য স্রোতের সহিত মিলিত হইয়া—জাম্বেজি বিপুল আকার ধারণ করে—প্রস্থে তখন সে প্রায় অৰ্দ্ধক্রোশ। এই ভাবে কিয়দ্দূর আসিয়া, সহসা একস্থানে প্রায় ৪০০ ফুট গভীর এক গিরি-কন্দরে পতিত হইয়া জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে। পড়িয়া, বহুউচ্চ পর্য্যন্ত শীকর রাশি উৎক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। তাহার পর, উত্থান ও পতন উত্থান ও পতন—এই ভাবে কিয়দ্দূর গিয়া আবার নিম্নে পড়িয়া আবার একটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে। এই স্থানের কিছু পূর্ব্বে গার্ডেন নামক দ্বীপ। নদীর সমগ্র প্রস্থভাগ অটুট ভাবে যে পড়ে, তাহা নহে। মাঝে মাঝে উচ্চ শৈলের বাধা আছে। ফলে, কোথাও তিনটি, কোথাও চারিটি, কোথাও বা ছয়টি বিভিন্ন জলস্তম্ভ যেন পাশাপাশি নিম্নে নামিয়া আসিতেছে। পড়িয়া সেই শীকর-মণ্ডিত জল

রূপালী কাযকরা শাদা ওড়নাখানি যেন নাচিতে নাচিতে নামিয়া আসিতেছে। কিন্তু বর্ষার পর, এই "দাইয়া" স্ফীতকলেবরা প্রলয়মূর্ত্তি ধারণ করে এবং যেন অট্টহাস্য করিতে করিতে মহাবেগে ছুটিয়া আসিয়া ভীমগর্জ্জনে নিম্নে লাফাইয়া পড়ে। সে ভৈরব গর্জ্জন বহুদূর পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায়। সে সময় মেপ্‌ল্ বৃক্ষগুলি পুষ্পভারাকুল—সে গুলির রক্তবর্ণ সমস্ত ছবি খানিকে যেন ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রের আকার দান করে। আবার যখন শীত আসে, তুষারপাত আরম্ভ হয়, তখন আবার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। তুষার পড়িয়া পড়িয়া,

আবার লাফাইয়া উচ্চে উঠে—বিপুল বাষ্পপুঞ্জ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। সূর্য্যকিরণ তাহার উপর প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে—সে দৃশ্য দশক্রোশ দূর হইতেও দেখা যায়।

নায়েগ্রা প্রপাত।

এইটিই ভুবনবিখ্যাত এবং পৃথিবীর সপ্ত-বিস্ময়ের মধ্যে একটি বলিয়া বহুদিন হইতে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। এখন কেহ কেহ বলেন যে, যতদিন ভিক্টোরিয়া জল-প্রপাত আবিষ্কৃত হয় নাই, ততদিনই নায়েগ্রার প্রাধান্য ছিল, এখন ভিক্টোরিয়া প্রপাত নায়েগ্রার পূর্ব্বগৌরব হরণ করিয়া লইয়াছে। যাহাই হউক, কোন কোনও বিষয়ে নায়েগ্রার প্রাধান্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নায়েগ্রা প্রপাতাবলীর একটি প্রপাত, উচ্চতায় ভিক্টোরিয়া প্রপাতের দশগুণ এবং বিক্রমে পাঁচগুণ। ইহার উর্দ্ধগামী বাষ্পপুঞ্জ, ভিক্টোরিয়া অপেক্ষা বহু দূরতর স্থান হইতে দেখা যায়।

"গ্র্যাণ্ড আইল্যাণ্ড"-এর নিম্নে, ঈরেরি নদীকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া, নায়েগ্রা প্রবল বেগে ছুটিয়া "গোট্‌ আইল্যাণ্ড" অবধি গিয়াছে। সেখানে, এই দ্বীপ কর্ত্তৃক বহু ভাগে বিভক্ত হইয়া বহু ধারায় নিম্নে পতিত হইতেছে। নদীটি, কানাডা এবং যুক্ত-রাজ্যের প্রান্তসীমায় প্রবাহিত বলিয়া, প্রপাতেরও কিয়দংশ কানাডায় এবং কিয়দংশ যুক্ত-রাজ্য-ভুক্ত।



জাপানে চুজেঙ্গি জলপ্রপাত।

এই প্রপাত প্রস্থে অর্দ্ধ মাইলের উপর। ১৬০ ফুট যুক্তরাজ্য সীমায়, বাকী অংশ কানাডাভুক্ত।

উচ্চ হইতে এই যে জলরাশি নিম্নে পতিত হইতেছে—ইহার কার্য্যকরী বল কত? চল্লিশ লক্ষ অশ্ব পরিশ্রম করিয়া যে কার্য্য করিতে পারে, এই জলরাশিও সেই পরিমাণ কার্য্যক্ষম। যে দেশে নায়েগ্রা এই মহানৃত্য করিতেছে, সে দেশের লোক শুধু তাহার শোভা দেখিয়া ও কবিতা লিখিয়াই ত ক্ষান্ত নহে—নায়েগ্রাকে দিয়া কায করাইয়া লইতেছে। এই বিপুল বল দ্বারায় বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র চালিত করিয়া, সেই বিদ্যুতের দ্বারায় চতুর্দ্দিকে দূর দূরান্তের অসংখ্য

কারখানার কল চালিত করিয়া লইতেছে। এমন কি দশক্রোশ দূরে "বফেলো" নামক নগর, এই বিদ্যুতের দ্বারায় আপনার নৈশদীপ প্রজ্জলিত করে।

ইগুয়াজু প্রপাত।

দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিল দেশে এক পর্ব্বতে ইগুয়াজু নদীর জন্ম। অপর চারিটি বৃহৎ নদী এবং



আমেরিকা যুক্তরাজ্যে ইয়েলোষ্টোন পার্ক জলপ্রপাত।



জাম্বেজি—ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত।

বহুসংখ্যক ছোট ছোট স্রোতস্বিনী আসিয়া ইগুয়াজুতে পড়িয়াছে। এইরূপে বর্দ্ধিতায়ন হইয়া, গভীর অরণ্য ভেদ করিয়া ইয়াগাজু পশ্চিমাভিমুখে চলিয়াছে। ক্রমে পারণা নদীতে গিয়া মিশিয়াছে। এই সঙ্গমের ষোল মাইল বাকী থাকিতে, ইয়াগাজু নিম্নভূমিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। সেখানকার দৃশ্য ভীমকান্ত। প্রপাতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি প্রস্থে আড়াই মাইল। ইহার কিয়দংশ এককালেই ৪০০ ফুট পতিত হইয়াছে—কোথাও কোথাও বা দুই শত ফুট পড়িয়া,দ্বিতীয়বার আর দুইশত ফুট পড়িতেছে। এ প্রপাতের অপর নাম "শত-প্রপাত" কারণ শতধা বিভক্ত হইয়া ইহা পতিত হইয়াছে। এতৎসংলগ্ন চিত্রে এক ভাগের সামান্য অংশ মাত্র পরিদৃশ্যমান।



নায়েগ্রা জলপ্রপাত।

যেখানে প্রপাত, তাহার ছয় মাইল উপরে, প্রস্থে নদীটি তিন মাইল। প্রপাতের নিকট অগ্রসর হইতে হইতে পরিসর অর্দ্ধ মাইল হ্রাস হইয়া গিয়াছে। অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের গাত্র ধৌত করিয়া, পর্ব্বতের যেখানে আসিয়া পতন আরম্ভ করিয়াছে, সে স্থান অশ্বখুরাকৃতি।

ইয়েলোষ্টোন-পার্ক প্রপাত।

আমেরিকা যুক্তরাজ্যের মণ্টানা প্রদেশে কতকটা স্থান আছে, যেখানে কাহাকেও বসতি (settlement) করিতে দেওয়া হয় না। এ স্থান সমতল-ভূমি অপেক্ষা প্রায় আটহাজার ফুট উচ্চে—আমাদের দার্জ্জিলিঙের মত। কোনও সময় আগ্নেয়গিরি-গলিত প্রস্তরাদি উদ্গিরণ করিয়া এই প্রদেশকে উচ্চ করিয়া দিয়াছে। এখানে নানা স্থানে উষ্ণপ্রস্রবণ এবং "গাইসার" আছে—এ সকলই আগ্নেয়গিরি-প্রদেশের লক্ষণ। রক্ত, পীত, নীল বিবিধ-বর্ণের প্রস্তরে এই প্রদেশ গঠিত। জঙ্গলও যথেষ্ট আছে। অনেক গুলি নদী আছে—কিন্তু সে গুলির জল গভীর না হইলেও, উভয়তট হইতে জল অনেক নিম্নে। এ প্রদেশ, গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পাব্লিক পার্ক স্বরূপ ব্যবহৃত করিবার জন্য রক্ষিত।

এস্থানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। নদী ছাড়া অনেক গুলি সুন্দর হ্রদও আছে।

ইয়েলোষ্টোন নদী এই প্রদেশের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। দক্ষিণে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহা প্রথমে ইয়েলোষ্টোন হ্রদে প্রবেশ করিয়াছে। হ্রদ হইতে বাহির হইয়া কয়েক



দক্ষিণ আমেরিকায় ইগাগাজু জলপ্রপাত।

স্থানে দ্রুতগামী হইয়া, এক পর্ব্বত প্রান্তে আসিয়া নিম্নে লম্ফদান করিয়াছে। এ প্রপাত তেমন উচ্চ নহে, ১১২ ফুট মাত্র। তাহার পর আর অর্দ্ধ মাইল অগ্রসর হইয়া, একেবারে ৩০০ ফুট ঝম্প-প্রদান! এখান হইতে, কিয়দ্দূর গিয়া একটি গভীর খাতে প্রবেশ করিয়াছে।

শ্রীকিরণেশ রায়।

দুষ্কর্ম্মার পত্র

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত "মানসী ও মর্ম্মবাণী" সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

বৎসরাধিক পূর্ব্বে যখন আমি বারবার শেষবার "মানসী"র সহকারী সম্পাদকত্ব প্রার্থনা অথবা দাবী করিয়া আপনাদিগকে পত্র লিখিয়াছিলাম, এবং উক্ত পদ অপ্রাপ্তে নিজেই একখানি মাসিক পত্র প্রচার করিয়া, কাহাকেও সম্পাদক নিযুক্ত করতঃ স্বয়ং তাহার সহকারী হইব এবং তদ্দ্বারা আপনাদের ও অন্যান্য অনেকের মাসিক পত্রকে "কাণা" করিয়া দিব বলিয়া শাসাইয়া ছিলাম, তখন আপনারা আমার আবেদন-পত্র খানির শেষে নিম্ন-লিখিত পাদটীকাটি মুদ্রিত করেন :—

"দুষ্কর্ম্মা মহাশয়ের বাতিক বৃদ্ধির এই লক্ষণ দেখিয়া আমরা শঙ্কিত ও চিন্তিত হইয়াছি। * * * দুষ্কর্ম্মা বাবুকে আমরা বন্ধুভাবে পত্র লিখিয়া অনুরোধ করি তিনি যেন কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া কিছু দিন বায়ু পরিবর্ত্তন ও রীতিমত ঔষধ সেবন করেন।"—(মানসী, আশ্বিন ১৩২১)

পত্র প্রাপ্তির পর হইতে আমার বিষম ভাবনা উপস্থিত হইল যে কোথায় গিয়া নষ্ট-স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করি। "নিভৃতালয়," "বিজনালয়," "নিকুঞ্জালয়," "হিমালয়"—যে আলয়ই বলুন্ না কেন, "শ্বশুরালয়ে"র সঙ্গে কোন আলয়েরই তুলনা হয় না—তাই শেষে শ্বশুরালয় গমন করাই স্থির করিলাম। এরূপ স্বাস্থ্যকর স্থান জগতে দ্বিতীয় আর নাই। তদবধি এখানে বায়ু-পরিবর্ত্তন, শ্যালিকা-রহস্যামৃত সেবন, এবং আশাতীত রকমের সুপথ্যের প্রভাবে আমার নষ্ট-স্বাস্থ্য প্রায় ফিরিয়া আসিয়াছে। আমার মস্তিষ্কও স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় "বিনামা" বাহির করিবার সংকল্প একরূপ পরিত্যাগ করিয়াছি। সেজন্য আপনাদের চিন্তিত অথবা শঙ্কিত হইবার আর প্রয়োজন নাই।

কিছু দিন হইতেই আপনাদিগকে একখানিপত্র লিখিব, মনে করিতেছিলাম—কিন্তু সময়াভাবে তাহা আর হইয়া উঠিতেছিল না, এমন সময় হঠাৎ ফাল্গুন সংখ্যা "মানসী ও মর্ম্মবাণী" আমার হস্তগত হইল। আপনাদের পত্রও পাইয়াছি। পত্রে আমার লেখা চাহিয়া আমায় যথেষ্ট সম্মানিত করিয়াছেন। উপস্থিত কোনও লেখা আমার প্রস্তুত নাই—লিখিবার সময়ও নাই। তাহার কারণ, স্থানীয় "বঙ্গসাহিত্যপঙ্কোদ্ধারিণী সভা" তাঁহাদের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে আমাকে সভাপতি মনোনীত করিয়াছেন। সেই সভায় "বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য" সম্বন্ধে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ আমি অভিভাষণ করিব। আপাততঃ সেই প্রবন্ধটির রচনা কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত আছি। সেটি শেষ না হইলে আপনাদের জন্য অন্য কোনও প্রবন্ধ লেখায় হাত দিতে পারিতেছি না। তবে বলেন তো সেই অভিভাষণটিই পাঠাইয়া দিতে পারি।

এবার আপনাদের নূতন আকার, দুইখানি কাগজের সম্মিলন এবং রচনাবলী সম্বন্ধে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহাতেও আমি পরম আপ্যায়িত হইলাম।

আমি কোনও দিন খোসামোদ করিয়া আপনাদের কাগজের প্রশংসা করি নাই—যেহেতু আপনাদের নিকট আমার কিছু মাত্র প্রাপ্যের আশা নাই। আর চক্ষুলজ্জাও আমার যে নাই তাহার প্রমাণও আপনারা ভূরি ভূরি পাইয়াছেন। সুতরাং চিরদিনই আমি আপনাদের নিরপেক্ষ সমালোচনাই করিয়া আসিতেছি, কিন্তু এখন তাহা করিতে আমি অক্ষম, আমায় ক্ষমা করিবেন, মহাশয়। এ সংখ্যায় মলাটের উপর যে বিরাট খেজুর গাছ আপনারা আঁকিয়া দিয়াছেন তাহা দৃষ্টে সমালোচনা করিতে আর সাহসে কুলাইতেছে না। কাযটা মোটেই

নিরাপদ বোধ হইতেছে না। তবে উপর উপর সাধারণ ভাবে দুই চারি কথা বলিব মাত্র।

"মানসী"র যে শীঘ্রই দুইজন সম্পাদক হইবেন—ইহা পূর্ব্বেই গুজবে শুনিয়াছিলাম। শুনিয়া, সুন্দ-উপসুন্দ নামক অসুরদ্বয়ের কাহিনী স্মরণপথে আসিয়াছিল। একটু যে চিন্তান্বিত হই নাই, এমনও নহে। যাহাই হউক, এক্ষণে সে চিন্তা দূর হইল। "মানসী" আর একা নহেন—সখী "মর্ম্মবাণী"র হাত ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সুতরাং সখাদ্বয়ের মধ্যেও শান্তিভঙ্গের আর কোন আশঙ্কা রহিল না। সম্পাদক দুই জন হইয়া ভালই হইয়াছে। বিশেষ, কম্পাস্ গাড়ী অপেক্ষা জুড়ী গাড়ী দ্রুতগামী। কেবল একটু মাত্র খুঁৎ রহিল। আপনাদের একজন ভাল সহকারী সম্পাদক হইলেই ত্র্যহস্পর্শ যোগ ঘটিত। আমার শরীর এখন অনেকটা সারিয়াছে।

আমার বিশ্বাস ছিল, আপনারা বৈষ্ণব। এখন দেখিতেছি আপনারা ঘোরতর তান্ত্রিকতার দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। পঞ্চ 'ম'-কারের চারিটি একত্র হইয়াছে—"মানসী," "মর্ম্মবাণী," "মহারাজ," "মুখোপাধ্যায়"—শেষ মকারটি কি, মহাশয়? সেটি বোধ হয় ভিঃ পিঃ স্লিপ্ সহ এতদিন প্রচুর পরিমাণেই আমদানি হইতেছে, এবং ব্যাঙ্কে গিয়া জমিতেছে। তাই নহে কি?

মলাটের কথা বলিতে বলিতে অন্য প্রসঙ্গে গিয়া পড়িয়াছিলাম—আবার মলাট হইতেই আরম্ভ করি।

"মানসী ও মর্ম্মবাণী"র মলাটের পরিকল্পনাটি দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু বুঝিতে কিঞ্চিৎ গোলমাল ঠেকিতেছে। আর উহার গোড়াতেই গলদ! সর্ব্বোপরি ও গণেশমূর্ত্তি কেন? গণেশ ঠাকুর যে জিনিষের "দাতা" তাহা কি এখন আর সভ্য-সমাজে প্রচলিত আছে? আপনাদের উচিত ছিল, ওখানে গণেশ মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে বিশ্বনাথ লাহা অথবা কেল্‌নার সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করা। এই ত্রুটিটুকু বারান্তরে সংশোধন করিয়া লইতে অনুরোধ করি।

নিম্নে দেখিতেছি, চারি কোণে চারিটি মানুষ। দুইটি হস্তী, দুইটি গরু, কাঁদিসুদ্ধ কলাগাছ, নারিকেল গাছ ও খেজুর গাছ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ইহা রূপকের যুগ—সুতরাং এ পরিকল্পনাটিও যে রূপক, তাহাতে আর সংশয় নাই। কিন্তু অর্থ কি? মানুষ চারিটি না হয়—"কবি," "ঔপন্যাসিক," "প্রবন্ধলেখক" এবং "সমালোচকের" কল্পনা। হস্তিযুগলের মধ্যে দেখিতেছি—একটি কৃষ্ণ এবং অপরটি শ্বেত। ইহা হইতে অনুমান করিতেছি আপনারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় সাহিত্যের দিগ্‌গজগণকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু গরু দুইটি কাহারা? ঐ দুই নিরীহ জীবের দ্বারায় বঙ্গীয় পাঠক ও পাঠিকাগণকে সূচিত করাই কি আপনাদের উদ্দেশ্য? যদি তাহাই হয়, তবে আপনারা বিষম ভুল করিয়াছেন। বঙ্গীয় পাঠক ও পাঠিকাগণ আজ কাল আর গো তো নহেই, গো-পালও নহে—যাহা পায় তাহাই খাইতে আর তাহারা সম্মত নহে। খোরাক্ সম্বন্ধে তাহাদের বেশ একটু বিচার-শক্তি জন্মিয়াছে।*

নারিকেল গাছ সম্বন্ধেও কোন মীমাংসা এ পর্য্যন্ত করিতে পারি নাই। খেজুর গাছের সার্থকতা যে বুঝিয়াছি, তাহা পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি।

মলাটের উপরে কাঁদিসহ কলাগাছ দেখিয়া মনে বড় আশা হইয়াছিল যে ভিতরে বোধ হয় প্রাচ্যকলার প্রচুর নিদর্শন পাইব। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার সে আশা নৈরাশ্যে পরিণত হইল। মানুষগুলাকে যদি মানুষের মত করিয়াই আঁকা হইবে তবে ছবির কি সার্থকতা? পথে ঘাটে তো হাজার হাজার মানুষ বেড়াইতেছে! নূতন কি দেখাইলেন? এমন করিয়া আঁকিতে হইবে যাহাতে মানুষকে আর মানুষ বলিয়া না চেনা যায়। চক্ষু

* আমরা ভুল করি নাই—দুষ্কর্ম্মা বাবুরই ভুল! মলাটের ও পরিকল্পনাটি মোটেই রূপক নহে। গো, হস্তী, নারিকেল, কদলী বৃক্ষ প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্রানুসারে মঙ্গলসূচক—তাই মলাটে ঐরূপ ছাপিয়াছি। যদি রূপকই ধরা যায়, তবে ঐ গোরু দুইটি দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, পাঠকগণকে মাসে মাসে আমরা যে খোরাক্ জোগাইব তাহা হইতে দুধ ঘি'টা একেবারে বাদ পড়িবে না।—মাঃ ও মঃ সম্পাদক।

দুইটি হইবে, অর্দ্ধ-মুদিত, গঞ্জিকা বা কোকেনসেবীর মত। চিবুক, না থাকাই ভাল। হাতগুলি হওয়া উচিত গাছের ডালের মত, আঙ্গুল গুলি লতানে। কোমরের নীচে মূর্ত্তিখানিকে এমন করিয়া বাঁকাইয়া দিতে হইবে যাহাতে আর্ট যে অ্যানাটমির সেবাদাসী নহে, এ তত্ত্ব সম্যকরূপে সকলেরই বোধগম্য হয়। সর্ব্ব সুদ্ধ এমন হওয়া চাই, যাহাতে রাত্রিকালে শিশুগণ দৌরাত্ম্য করিলে সেই ছবি খুলিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখানো চলে। তাহা ছাড়া "আইডিয়া" আঁকিবার আইডিয়া আপনাদের মোটেই নাই! ও কি নূরজাহানের সমাধিভবনের ছবি দিয়াছেন? দেখানো উচিত ছিল "শোক"। মাঝখানে খানিকটা ধ্যাব্ড়া লাল রঙ্, আর চারি দিকে নীল। বুঝাইত, নীল চক্ষু কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাঙা হইয়া উঠিয়াছে! ইহাই "প্রাচ্যকলা" অথবা "ওরিয়েণ্টাল প্ল্যান্টেন্"! থাক, এবার যাহা হইয়াছে তাহা হইয়াছে, ভবিষ্যতে এদিকে দৃষ্টি রাখিবেন।

মলাট ছাড়িয়া সূচীপত্রে পৌছিয়া দেখিলাম প্রবন্ধ ও কবিতাগুলির পারম্পর্য্যে বিস্তর গোলমাল রহিয়াছে। যেটির পর যেটি হইলে মানায়, তাহা হয় নাই। সাজানোটি মোটেই সাইকলজিক্যাল্ হয় নাই। প্রথমে দেওয়া উচিত ছিল "বাঙ্গালীর উৎপত্তি"—তাহার পর "যাদুকরী"—তাহার পর "লুকোচুরী"—তাহার পর "ফুলের তোড়া"—তাহার পর "খোলা চিঠি"—তাহার পর "ফিরে যাও"—তাহার পর "নিষিদ্ধ ফল"—তাহার পর "অধঃপতন" তাহার পর "গৃহহীন,"—তাহার পর "স্মৃতিস্মৃতি"-সর্ব্বশেষে "তীর্থ ভ্রমণ।"

আপনাদিগকে আর কত উপদেশ দিব? আমায় যদি সহকারী সম্পাদক করিতেন, তাহা হইলে আপনাদের এ সমস্ত ত্রুটি যে কখনই ঘটিতে পারিত না তাহা নিশ্চিত। আক্ষেপ করিয়া একজন কবি বলিয়াছেন—হিতং মনোহারি চ দুর্ল্লভং বচঃ! আমি তাহা বলি না। আমি বলি যে হিতোপদেশ অনেকেই দেন এবং বিনামূল্যেই দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা শ্রবণ করিয়া পালন করিবার লোকই প্রকৃত দুর্ল্লভ। তাহা যদি না হইত, তবে এত দিন আমায় নিশ্চয়ই সহকারী করিতেন। কিন্তু এ যে কলিকাল! ঘোর কলিকাল! এই সংখ্যাতেই হাতে হাতে তাহার প্রমাণ দেখুন না—পুত্র "তীর্থ-ভ্রমণ" করিতেছেন, আর পিতা খাইতেছেন "নিষিদ্ধ ফল।"

যাক, পত্র দীর্ঘ হইয়া গেল, সুতরাং আজিকার মত বিদায়। নমস্কার লইবেন। ইতি

শ্বশুরালয়
১৫ই ফাল্গুন
১৩২২

ভবদীয়
শ্রীদুষ্কর্ম্মা নষ্টাচার্য্য।

পুঃ যদি হঠাৎ আমায় সহকারী সম্পাদকরূপে আপনাদের প্রয়োজন হয় তো টেলিগ্রাম করিবেন।

শ্রীদুষ্কর্ম্মা।

মধুমাসে।

আজি কে এলে বল তুমি
উজল করি' বনভূমি
অশোক পরে চরণ রাঙা ফেলে',
বিকাশি তুলি দিকে দিকে
মধুমালতী মাধবীকে
গগন বুকে নয়ন নীল ঢেলে';

আবরি তনু পীতবাসে
কুসুমাকর মধুমাসে
ভ্রমর রবে মাতায়ে বনতল,
নিতল নীল দীঘি জলে
জাগায়ে তুলি কুতূহলে
বরণবাসে সরস শতদল!

কাকলি শুনি মধুভরা
শিহরে বধূ সকাতরা
ঋতুর রাজা তুমি কি আবার এলে
সখারে নিয়ে বনপথে
কনক চম্পক রথে
হিমনিকরে সোণার করে ঠেলে !
আজি যে কিছু নাই নাই
তোমারে কোথা দিব ঠাঁই ?
দুখের ভারে বুকের হাড় ভাঙা ,
মনের বনে পুষ্প যত
ঝরিয়া গেছে লক্ষশত,—
বেদনা শুধু শিমুল সম রাঙা !
বরণ যার চুরি করে'
ফুটিত চাঁপা থরে থরে
সে ফুল আজি হাসেনা ডালে ডালে,
চলিতে যার অঙ্গ ভরি'
নাচিয়া উঠে ছন্দ মরি—
কোথা সে ঢেউ হৃদয় তালে তালে ?
হাসিলে চাঁদ বিমলিন
ভাষিলে পাখী রবহীন
প্রাণের ধন নয়ন আগে নাই ;
অমূল মণি সে আমার
আজিকে দেখা নাহি তার—
স্বাগত তোমা হ'ল না বলা তাই !
আসিতে গতদিনে যবে
কলভাষিত অলি-রবে
বিজয়ী-রাজ-গরবে সখা সনে,
দুজনে মিলি' আগুসরি'
নিতাম তোমা বুকে ধরি
অতিথিসেবা বিবিধ আয়োজনে ;
সেদিন আজি স্বপ্নসম ;
ব্যথিত এই বক্ষে মম
ঝোলেনা আজ দোলের ফুলডোর ;
নিবিড় ঘন এ আঁধারে,
বেদনা ভরা পারাবারে,
মরণ ভেলা চোখের আগে মোর !
ফাগুনে আজি ফুলবাসে
বিরহীজনে পরিহাসে
বিধুর কর বিষের শর হানে,
বিরস দীন প্রাণহীন,
কেমনে আজি কাটে দিন—
মনের ব্যথা দেবতা শুধু জানে !

২৪শে ফাল্গুন, ১৩২২

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

জীবনের মূল্য।

(উপন্যাস)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

রেলপথে।

সেই দিনই অপরাহ্নকালে ত্রিবেণীর একখানা বিবর্ণ প্রাচীন ছক্কড় গাড়ী ছড়্ ছড়্ শব্দ করিতে করিতে মগরা ষ্টেশনের দিকে চলিয়াছিল। হটাৎ সতীশ দত্ত জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"এই গাড়োয়ান, একটু হাঁকিয়ে চল্ বাবা—টেরেণ ফেল করে দিস নে।"—গাড়োয়ান অমনি সপাং সপাং করিয়া নিরীহ ক্ষুধাতুর অশ্বিনীকুমার-যুগলের পৃষ্ঠদেশে চাবুক কষাইয়া দিল—তাহারা প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল।

মগরা ষ্টেশনে গাড়ী পৌছিলে, সতীশ দত্তের সহিত নামিলেন—গিরিশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। সতীশের গায়ে পুরাতন একটি আলপাকার কোট, উড়ানি খানা মাথায় পাগড়ির আকারে জড়ানো, বামহস্তে ক্যাম্বিশের

ব্যাগ তাহার হাতলে দড়িবাঁধা একটা থেলো হুঁকা ঝুলিতেছে, দক্ষিণ হস্তে ছাতা ও ছড়ি। মুখোপাধ্যায়ের গায়ে গরদের কোটের উপর একখানি রেশমী চাদর, মাথার টাকের উপর আশে পাশের চুলগুলি কৌশলে ফিরানো, কপোলদেশ ক্ষৌরচিক্কণ। তাঁহার সঙ্গে তোরঙ্গ, পুঁটুলি এবং কাপড়ে বাঁধা একটি হাঁড়ি ছিল, সেগুলি লইবার জন্য তিনি কুলি কুলি বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কুলি আসিয়া জিনিষগুলি গাড়ী হইতে নামাইয়া লইল; গিরিশ ছুটিয়া টিকিট করিতে গেলেন।

অল্পক্ষণেই কলিকাতাভিমুখী গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। মধ্যম শ্রেণীর একটি কক্ষ খালি পাইয়া উভয়ে উঠিয়া পড়িলেন। সতীশ তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলিয়া একটা ঘটি বাহির করিয়া "পানি পাঁড়ে—পানি পাঁড়ে" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। গাড়ী চলিতে লাগিলে, পানি পাঁড়ে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া ঘটি ভরিয়া দিল।

ঘটি হাতে করিয়া সতীশ বেঞ্চির উপর বসিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল—"বিদ্যা শুভকরী কিন্তু স্বল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী। দেখ্‌লেন? বিনোদের কথা শুনে আরও দেরী করে বেরুলেই হয়েছিল আর কি!—বল্লাম আমি, কলকাতার গাড়ী পাঁচটায় ছাড়ে—সে বলে, না, আমি টাইম টেবেল দেখেছি—সাড়ে পাঁচটায় ছাড়ে। তুত্তোর টাইম টেবেলের কাঁথায় আগুন! আমরা চিরকাল শুনে আসছি পাঁচটার গাড়ী—আজ উনি টাইম টেবেল পড়ে বল্লেন সাড়ে পাঁচটা!—যাক্, এখন একবার তামাক খাওয়া যাক্। আপনার হুঁকোটা বের করুন জল করি।"—বলিয়া সতীশ ব্যাগের হাতল হইতে নিজের হুঁকাটি খুলিতে লাগিল।

মুখোপাধ্যায় তোরঙ্গ খুলিয়া হুঁকা বাহির করিয়া দিলেন। সতীশ দুইটি হুঁকাতেই জল ভরিয়া, তামাক সাজিয়া হাতটি ধুইয়া ফেলিল। মুখোপাধ্যায় ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন—"যাচ্ছি ত ছুটোছুটি করে, গিয়ে যদি শুনি স্বামীজি আগেই চলে গেছেন।"

সতীশ বলিল—"না, লেখাই ত রয়েছে ২৪ শে বৈশাখ অবধি থাক্‌বেন।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"কাগজ খানা সঙ্গে এনেছ?"

"এনেছি বৈ কি। আমি কি কাঁচা কায করি! এই দেখুন না।"—বলিয়া সতীশ ব্যাগ খুলিয়া ভাঙ্গা টাইপে ছাপা একখানি কাগজ বাহির করিল। তাহাতে লেখা ছিল—

"বিনা ব্যয়ে—

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান নির্ণয় এবং সাংসারিক-জীবনের শুভাশুভ বিচারের ব্যবস্থা।

——:০:——

শ্রীমৎ স্বামী জ্ঞানানন্দজী ভারতের বহু তীর্থ ভ্রমণান্তে এক্ষণে ৺কালীঘাটে জেঠমল সুরযমল বাবুদিগের বাগানবাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার সামুদ্রিক, জ্যোতিষ, অলৌকিক বিদ্যা (Occult Science) দর্শন, তন্ত্র ও যোগ বিদ্যায় পারদর্শিতা বিষয়ে আর নূতন করিয়া বিশেষ পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। যোগী ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই তিনি সুপরিচিত। জনসমাজের প্রকৃত কল্যাণ কামনায় ইদানীং তিনি লোকানুরোধে বিনা পারিশ্রমিকে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রত্যহ শত শত ব্যক্তি বিস্ময় সাগরে মগ্ন হইতেছে। জীবের মঙ্গলের জন্য যাগ যজ্ঞ হোম ও পুরশ্চরণও তিনি করিয়া থাকেন এবং আবশ্যক মত কবচ মাদুলী প্রভৃতিও প্রদান করেন।

স্বামীজী আগামী ২৪ শে বৈশাখ বাসরে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধাম ৺জগন্নাথ ধামে যাত্রা করিবেন—আর শীঘ্র তাঁহার কলিকাতায় আসার সম্ভাবনা নাই

ধূম পানান্তে কলিকাটি খুলিয়া সতীশের হস্তে দিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় কাগজখানি পড়িতে লাগিলেন। বলিলেন—"এ লোকটি বোধ হয় সাধু—ঠগ জোচ্চোর নয়, কেমন হে সতীশ ?"

সতীশ বলিল—"কি করে বলব! আপনি নিজে ভালমানুষ, কাযেই দুনিয়াকেও সেই মত দেখেন। শ্লোকই রয়েছে কিনা—

আশ্রমান্তর্গতা বেশ্যা ঋষ্যশৃঙ্গো ঋষেঃ সুতঃ।
তপস্বিনস্তু তা মেনে আত্মবৎ মন্যতে জগৎ॥

—যে যে-রকম লোক, জগতের সবাইকে সে সেই রকম জ্ঞান করে কি না!"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"না না দেখছনা—পয়সা কড়ি কিছুই চাচ্ছেন না। যদি বলতেন আমি এত টাকা নেব অত টাকা নেব তাহলে সন্দেহের কারণ ছিল বটে। এই যে লেখা রয়েছে"—বলিয়া তিনি কাগজ খানি হইতে পড়িতে লাগিলেন—

"বহুতর ধনী, মানী, দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও উচ্চ-পদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের দ্বারা প্রশংসিত ও সহস্র সহস্র অযাচিত প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত। বলা বাহুল্য, স্বামীজীর অর্থের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। কারণ ইহা সর্ব্বজন বিদিত যে, গার্হস্থ্য জীবন পরিত্যাগ কালে ইনি লক্ষাধিক টাকা দীন দরিদ্রগণকে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন।

প্রাতে ৭টা হইতে ১০টা এবং বেলা ১টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত করকোষ্ঠী বিচার, প্রশ্ন গণনা ইত্যাদি ও ঔষধ কবচাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।"

সতীশ হুঁকায় দুইটা সুখটান দিয়া বলিল—"তিনি জোচ্চোর এমন কথা আমি বলছিনে। বিশেষ হরেন্ যে রকম বল্লে, খুব আশ্চর্য্য বটে।"

হরেন্দ্র নামক ত্রিবেণী গ্রামবাসী এক যুবক সম্প্রতি কলিকাতা গিয়া ঐ বিজ্ঞাপন খানি লইয়া আসিয়াছিল। সে স্বয়ং যদিও স্বামীজীকে দেখে নাই তথাপি লোকমুখে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছে। একব্যক্তি নাকি ভীষণ অর্থকষ্টে পড়িয়া, দেনার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া অহিফেন ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল। এমন সময় ঐ বিজ্ঞাপনের একখানি কাগজ তাহার হাতে পড়ে। পরদিন সে কালীঘাটে গিয়া বাবাকে হাত দেখায়। বাবা তাহার হাত দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি বড় কষ্টে আছ, কিন্তু হতাশ হইও না, শীঘ্রই তোমার সুদিন আসিতেছে।"—এই শুনিয়া সে বাড়ী আসিয়া অহিফেনটুকু বাক্সে তুলিয়া রাখে। পরদিনই সংবাদ আসিল, বহুকাল নিরুদ্দিষ্ট তাহার এক খুড়ার, নিঃসন্তান অবস্থায় লাহোরে মৃত্যু হইয়াছে, পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজের সে উত্তরাধিকারী হইয়াছে। বাবাজীর আশ্চর্য্য ক্ষমতার আরও কয়েকটি কাহিনী সে শুনিয়া আসিয়াছিল।—এই সকল কথা গ্রামে প্রচার হইলে গিরিশ মুখোপাধ্যায় উক্ত যুবককে ডাকাইয়া আনেন এবং স্বকর্ণে সমস্ত শুনিয়া স্বামীজীকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার মনে প্রবল বাসনা হয়।—তাই আজ কলিকাতা যাইতেছেন।

এবার মুখোপাধ্যায় মহাশয় হেমবাবুর বাসায় উঠিবেন না। হেমবাবু ইংরাজি-নবীশ লোক, এ সকল কথা শুনিয়া বিদ্রূপ করিবেন এই আশঙ্কা ছিল। ভবানীপুরে সতীশের এক মামাতো ভাই বাস করে; তাহারই বাসায় গিয়া উঠিবার পরামর্শ হইয়াছে। কালীঘাট কাছেও হইবে।

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন ছাড়াইয়া গাড়ী খানি চলিয়াছে। ধূমপান ও গল্পগুজবে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"দেখ সতীশ, প্রাতে ৭টা থেকে স্বামীজীর দর্শন পাওয়া যাবে ত ?"

সতীশ কাগজ খানি পড়িয়া বলিল—"হ্যাঁ।"

"তা হলে, বুঝেছ, তোমার সেই মামাতো ভাইদের কাছেও কোন কথা প্রকাশ করবার দরকার নেই। বেড়াতে এসেছি না বেড়াতে এসেছি—হাট বাজার করতে এসেছি। কাল সকালে উঠে, মা কালীকে একবার দর্শন করে আসি বলে বেরিয়ে পড়া যাবে—বুঝেছ ?"

সতীশ বলিল—"বেশ, তাই হবে। শ্লোকই রয়েছে

—ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রঃ। মন্ত্রণা দুজনেই করতে হয়— তিনজন হলেই গোল।”

মুখোপাধ্যায় হাসিয়া বলিলেন—“আমার ত মন্ত্রী তুমিই।”

সতীশ বলিল—“হ্যাঁ—এখন বটে। আর দুদিন পরে, আমি কি আর কল্‌কে পাব?—আর, কল্‌কে পেলেই ত ষট্‌কর্ণ হয়ে যাবে।”

“কি রকম?”

সতীশ হাসিয়া বলিল—“কর্ত্তা গিন্নীর দুযোড়া কাণ, আর আমার একযোড়া।”

এই কর্ত্তা-গিন্নী কথাটি, মুখোপাধ্যায়ের কাণ যোড়াটিতে যেন মধুবর্ষণ করিল। একমুখ হাসিয়া বলিলেন—“গিন্নী ভারি ত গিন্নী!—সে ছেলে মানুষ, তার সঙ্গে মন্ত্রণাই বা কি!”

সতীশ তাহার ওষ্ঠযুগল আকুঞ্চিত করিয়া মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—“হুঁহুঁ!—হুঁহুঁ!—ছেলে মানুষ বয়সে বটে—চেহারায় বটে!—বুদ্ধিতে যে অনেক বুড়ো মানুষের কাণ কেটে দেয়!”

মুখোপাধ্যায় প্রীতিভরে বলিলেন—“তাই নাকি?”

“ভেবেছেন কি? আর দুদিন পরেই জানতে পারবেন। ভারি কড়া হাকিম।”

“কি রকম?”

সতীশ বেঞ্চির উপর দুই পা গুটাইয়া চাপিয়া বসিয়া কল্পনার সাহায্যে আরম্ভ করিল—“এই কালকেরই ঘটনা মশায়, আপনাকে বলতে ভুলে গেছি। কাল বিকেলে পট্‌লি আমাদের বাড়ী এসেছিল। পাশের ঘর থেকে শুন্‌তে পেলাম আমার মাকে বলছে—‘ঠাক্‌মা, উনি নাকি কাল কল্‌কাতায় যাচ্ছেন?’ মা বল্লেন—‘হ্যাঁ—সতীশ বল্‌ছিল বটে—সতীশও সঙ্গে যাবে কি না।’—পট্‌লি বল্লে—‘কেন ঠাক্‌মা, হঠাৎ কলকাতা যাচ্ছেন কেন? কদিন সেখানে থাকবেন?’—মা হেসে বল্লেন—‘তা যদ্দিনই থাকুক না, বিয়ের আগে এলেই ত হল। এ কটা দিন সে বাড়ীতেই থাকুক আর বিদেশেই থাকুক—তোর তাতে লাভ লোকসান কি লা?’—পট্‌লি বল্লে—‘না ঠাক্‌মা তা বল্‌ছিনে, তা নয়। কলকাতায় শুন্‌লাম নাকি বসন্ত হচ্ছে?’—মা বল্লেন—‘কি জানি ভাই, বসন্ত হচ্ছে কি কোকিল ডাকছে সে সব খবর রাখিনে।’—পট্‌লি বল্লে—‘যাও ঠাক্‌মা তোমার সব কথাতেই ঠাট্টা। পাজি খানা কৈ?’—মা বল্লেন—‘কেন লা? কি দেখবি পাজিতে? ৫ই জষ্টির আর কদিন আছে?’—পট্‌লি বল্লে—‘না, কালকে দিনটে কেমন তাই দেখব, অশ্লেষা মঘা টঘা কি না।’—মা বল্লেন—‘যদি দিন ভাল না-ই হয়; যেতে দিবিনে? এখনও ত হাতে পাসনি, কি করে মানা করবি?’—পট্‌লি বল্লে—‘যদি অদিন হয় তবে যেতে দেব বুঝি? ঈস্! ঠাকুরপোকে দিয়ে বারণ করে পাঠাব না?’—মা বল্লেন—”

মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন—“ঠাকুরপো কে?”

সতীশ বলিল—“আমাকে ঠাকুরপো বল্‌তে আরম্ভ করেছে। আগে বল্‌ত কাকা, আশীর্ব্বাদের পর থেকে বলছে ঠাকুরপো। আমার মাকে আগে ঠাকমা বল্‌ত, এখনও তাই বলে—নইলে প্রাণের কথা কওয়ার সুবিধে হয় না কি না।”

“তোমাকে ঠাকুরপো বলে কেন?”

“ঠাকুরপো বলে, যদি কিছু হুকুম-হাকাম কর্‌বারই দরকার হয়, এ ভেবে বোধ হয়। খুড়োকে ত আর হুকুম করতে পারে না! এই ত আজ যদি অদিন হত, আপনাকে বারণ করবার জন্যে আমায় পাঠাতই ত!—দেখুন একবার বুদ্ধি!”

মুখোপাধ্যায় এ সংবাদটি প্রায় এক মিনিট কাল মনে মনে উপভোগ করিয়া লইয়া বলিলেন—“তার পর, আর কি কথা হল?”

সতীশ কহিল—“মা বল্লেন—‘হ্যাঁ লা, এখন থেকেই তোর এই হুকুমৎ, বিয়ে হয়ে গেলে—”

এই সময় পার্শ্বের লাইন দিয়া একখানি প্যাসেঞ্জার গাড়ী ভৈরব গর্জ্জনে ত্রিবেণীর দিকে ছুটিয়া চলিল। সেই শব্দে সতীশের কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গেল—মুখোপাধ্যায়

বিরক্তিপূর্ণ ভ্রূকুটি করিয়া রসভঙ্গকারী সেই ট্রেণখানার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

সেই ট্রেণেরই একটি কামরায় বরের টোপর কনের চেলি প্রভৃতি বিবাহোপযোগী দ্রব্যভার লইয়া হরিপদ ও রাজকুমার অধিষ্ঠান করিতেছিল।

ট্রেণটা বিদায় হইলে মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন —"হাঁা, তার পর?"

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"কি বলছিলাম?"

"মা বল্লেন হাঁা লা এখন থেকেই তোর এই হুকুমৎ—"

সতীশ বলিল—"হাঁা। মা বল্লেন—'হাঁালা, এখন থেকেই তোর এই হুকুমৎ, বিয়ে হয়ে গেলে তাকে ত দেখছি পাশ ফিরতে দিবিনে।' পট্‌লি হেসে বল্লে—'দেবই না ত।'—আমি যে পাশের ঘরে আছি, সব শুন্‌ছি, তা অবিশ্যি ওরা কেউ জান্‌তে পারেনি।"

মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"পাশ ফিরতে দিবিনে মানে কি?"

বাহিরে চাঁদ উঠিয়াছিল। নৈদাঘ-সন্ধ্যার সুখস্পর্শ সমীরণ গাড়ীর জানালা পথে ছুটিয়া আসিতেছিল। সতীশ একটু চিন্তা করিয়া, হাসিয়া বলিল—"একটা শ্লোকে আছে, একজন নায়ক বলছেন, আমি বিচ্ছেদ-ভয়ে তার গলায় বকুলের মালাটিও পরিয়ে দিতাম না—"

মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন, মালা পরতে বাধা কি?"

সতীশ বলিল—"একজনের গলায় যদি মালা থাক্‌ল, তা হলে দুজনার বুকের মাঝখানে একটা বিচ্ছেদ—একটা ব্যবধান—রয়ে গেল যে!"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"ওঃ—বুঝেছি। শ্লোকটা কি?"

সতীশ বলিল—"শ্লোকটা অবিশ্যি মিলনের নয়—বিরহ অবস্থার।—

বকুলমালিকয়াপি ময়া ন সা
তনুরভূষি তদন্তরভীরুণা।
তদধুনা বিধিনা কৃতমাবয়ো-
র্গিরিদরীনগরীশতমন্তরম্॥"

মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওর মানেটি কি?

সতীশ বলিল—"এর মানে হচ্ছে, নায়ক বলছেন, তার কাছ থেকে পাছে দূরে পড়ে যাই এই ভয়ে, তার গলায়—মুক্তাহার স্বর্ণহার ত দূরের কথা—একগাছি বকুলের মালাও পরিয়ে দিতাম না; কিন্তু আজ বিধাতা তার আমার মধ্যে পাহাড়, পর্ব্বত, বড় বড় সহর তফাৎ করে দিয়েছেন।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"শ্লোকটি সুন্দর ত!"

সতীশ বলিল—"মহানাটকে একটি শ্লোক আছে এটি সম্ভবতঃ সেই শ্লোকটিরই অনুকৃতি। সেটি হচ্ছে—

হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষভীরুণা।
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ॥"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"বাঙ্গালায় ওভাবের কিছু আছে না কি? ভারতচন্দ্রে টারতচন্দ্রে?"

সতীশ বলিল—"না, তবে একটা হিন্দীগান এ ভাবের শুনেছি বটে।

জিনহ্‌ বীচ ন হার পরৈ কভহু,
তিনহ্‌ বীচম্‌ আজ্‌ পহাড় পরে।

বিদ্যাপতিও এ ভাবটির লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। তাঁর রাধা বলছেন—

যহুঁক বিরহডরে উরে হার ন দেলা,
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা।

আর একজায়গায় বিদ্যাপতি, এই ভাবটিকে, অল্প পরিবর্ত্তন করেছেন। রাধিকা বলছেন—'দূর কর সৌতীন মোতিম হার।' শ্রীকৃষ্ণের দেহস্পর্শসুখ যা, তা আমিই ষোলআনা পেতে চাই, আমার গলার এই মোতির মালাটা, আমার সে স্পর্শসুখে ভাগ বসাচ্ছে—অতএব এটা আমার সতীন হয়ে দাঁড়িয়েছে—এটাকে দূর করে দিই।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইতিমধ্যে পকেট হইতে অহিফেনের কৌটাটি বাহির করিয়াছিলেন। কিয়দংশ গুলি পাকাইয়া মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া গাড়ীর জানালার নিকট গিয়া বসিলেন। আকাশে তখন শুক্লাসপ্তমীর অর্দ্ধচন্দ্র প্রতি মুহূর্ত্তে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হৃদয়রূপ আকাশপটে পট্‌লিরূপ পূর্ণচন্দ্রের ধ্যান করিতে লাগিলেন। গাড়ীর চাকার সহিত রেলের সংঘাতের যে অবিরাম শব্দ উত্থিত হইতেছিল, তাহা যেন তালে তালে তাঁহার কাণে বলিতে লাগিল—

বকুলমালিকয়াপি ময়া ন সা
তনুরভূষি তদন্তরভীরুণা—ইত্যাদি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

রাজা ও মন্ত্রী।

ভবানীপুরে পরদিন প্রাতে, সাতটার পূর্ব্বেই দুই বন্ধুতে কালীদর্শন করিতে যাইবার নাম করিয়া জ্ঞানানন্দ স্বামীজীর উদ্দেশে বাহির হইলেন। মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের ঠিকানা অনুসারে সন্ধান করিতে করিতে অবশেষে দুইজনে জেঠমল সুরযমল মারোয়াড়ীর বাগান বাড়ীতে পৌছিলেন।

বাগানের মধ্যে কিয়দ্দূর প্রবেশ করিয়া তাঁহারা একজন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইলেন। জিজ্ঞাসায় সে ব্যক্তি নিজেকে স্বামীজীর চেলা বলিয়া পরিচয় দিল এবং ইঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া বাগান বাড়ীর একটি প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া বসাইল। বলিল,—"স্বামীজী চারটের সময় স্নান করে পুজোয় বসেছেন, আধঘণ্টার মধ্যেই উঠ্‌বেন, উঠ্‌লেই সাক্ষাৎ হবে। বাবুরা তামাক ইচ্ছে করেন কি?"

বাবুদের সে বিষয়ে অনিচ্ছা না হওয়ায়, সন্ন্যাসী একজন ভৃত্য-বালককে ডাকিয়া তামাক সাজিতে আজ্ঞা দিল। বসিয়া ইঁহাদের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। বাবুদের কোথায় থাকা হয়, কি করা হয়, কি উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসা, কতদিন থাকা হইবে, কাহার কয় বিবাহ, কি কি সন্তান সন্ততি প্রভৃতি কৌশলে কথাচ্ছলে পরিচয় লইতে লাগিল। স্বামীজীর মহিমা সম্বন্ধেও অনেক কথাই সে বলিল। ইতিমধ্যে আরও একজন দর্শনার্থী আসিয়া সেখানে বসিল।

অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইলে, অন্য এক প্রকোষ্ঠ হইতে খটাং খটাং করিয়া খড়মের শব্দ উত্থিত হইল। সন্ন্যাসী বলিল—"ঠাকুর উঠেছেন, দেখি।"—বলিয়া প্রস্থান করিল।

দুই মিনিট পরেই সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"আপনারা আসুন।"

সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে দুইজনে কক্ষান্তরে গিয়া দেখিলেন, একখানি মৃগচর্ম্মের উপর অনুমান চল্লিশ বর্ষ বয়স্ক গৈরিকধারী এক কান্তিমান পুরুষ বসিয়া আছেন। উভয়ে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। স্বামীজী আশীর্ব্বাদ করিয়া নিকটস্থ একখানি কম্বলে তাঁহাদিগকে বসিতে আদেশ করিলেন।

কুশল প্রশ্নাদির পর স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি মনে করে তোমাদের আগমন, বাবা?"

গিরিশ করযোড়ে বলিল—"শুনেছিলাম আপনি একজন সিদ্ধপুরুষ—আপনার মাহাত্ম্য শুনে আপনাকে দর্শন করতেই আসা। আর শুনেছি করকোষ্ঠী-বিচারেও—"

স্বামীজী বলিলেন—"এস, কাছে সরে এস, হাত দেখি।"

গিরিশ নিকটে গিয়া দক্ষিণ হস্তটি বাড়াইয়া দিলেন। স্বামীজী কিয়ৎক্ষণ বিশেষ মনোযোগের সহিত হাতখানি দেখিয়া, একদৃষ্টে গিরিশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন—"বাবা, আমি সন্ন্যাসী মানুষ—তোমাদের কি উচিত আমার সঙ্গে ছলনা করতে আসা?"

একথা শুনিয়া উভয়েই বিস্মিত হইলেন। গিরিশ বলিলেন—"কেন স্বামীজী, কি ছলনা করেছি?"

স্বামীজী বলিলেন—"এ ছদ্মবেশে কেন এসেছ?"

গিরিশ বলিলেন—"ছদ্মবেশ কি প্রভু?"

"ছদ্মবেশ নয়? এই কি তোমার বেশ? তোমার রাজবেশ কৈ? তুমি ত একজন রাজা। আর উনি বোধ হয় তোমার মন্ত্রী? তোমার হাতে যে রাজযোগ দেখছি—ভুল দেখলাম না কি?—দাও দেখি হাতখানা আবার।"

গিরিশের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের সেই শ্লোক—স চ রাজা ভবেদ্ ধ্রুবম্—তাঁহার মনে পড়িয়া গেল।

স্বামীজী এবার অধিকক্ষণ ধরিয়া হাতখানি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"ফাঁড়াও আছে দেখ্‌ছি। তোমার বয়স কত?"

গিরিশ বলিল—"আজ্ঞে, আটচল্লিশ বৎসর।"

স্বামীজী বলিলেন—"ওহ্—তাই বল। তোমার চেহারা দেখে তোমায় পঞ্চাশ মনে হয়েছিল। পঞ্চাশ বছরের পূর্ব্বেই তোমার রাজ-সৌভাগ্য যোগ। একটু কিন্তু ফাঁড়াও আছে। বোধ হয় ফাঁড়াটি কাটিয়ে উঠবে।"

গিরিশ ভক্তি গদ্ গদ্ চিত্তে স্বামীজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"প্রভু আমি ত সামান্য অবস্থার লোক—কি করে আমি রাজা হব?"

স্বামীজী বলিলেন—"স্ত্রীভাগ্যে রাজা হবে।"

"প্রভু, আমার স্ত্রী ত গত হয়েছেন।"

স্বামীজী হাতখানি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন—"দুই স্ত্রী গত হয়েছেন। তৃতীয় স্ত্রী?"

সেই চেলা সন্ন্যাসীটিও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, এই সময় তাহার মুখে সামান্য একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

গিরিশ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"এখনও ত তাঁকে বিবাহ করিনি।"

"বিবাহ কর।—তারা—তারা—তারা।"

"আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।"—বলিয়া গিরিশ স্বামীজীর পদধূলি লইয়া নিজ মস্তকে দিলেন।

অতঃপর স্বামীজী অন্যান্য কথা পাড়িলেন। নিজ দেশবিদেশ ভ্রমণের কথা, সাধু মহাপুরুষগণের অলৌকিক ক্ষমতার কথা, ইত্যাদি। প্রসঙ্গ ক্রমে বলিলেন তিনি ৺বদরিকাশ্রমের মধ্যপথে একটি পান্থশালা নির্ম্মাণ করাইতেছেন—সেখানে একজন ডাক্তারও থাকিবে। নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় সমাধা হইয়া আসিয়াছে। পঞ্চাশ হাজার টাকা এষ্টিমেট ছিল। ভক্তগণের শ্রদ্ধাদত্ত অর্থে এ পর্য্যন্ত সাতচল্লিশ হাজার টাকা উঠিয়াছে—আর তিনটি হাজার টাকা হইলেই কার্য্যটি সম্পন্ন হয়। দশের লাঠি একের বোঝা—সকলেই কিছু কিছু করিয়া দিলেই হইয়া যায়। অদ্যই স্বামীজীর ৺পুরীধামে যাত্রা করিবার কথা ছিল কিন্তু ঐ টাকাগুলি সংগ্রহ না হওয়াতে আরও কিছু দিন তাঁহাকে এখানেই আসন রাখিতে হইল।

বেলা বাড়িতেছে দেখিয়া গিরিশ উঠিলেন। স্বামীজীকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলেন, সেই সন্ন্যাসী চেলাটি একখানি বৃহৎ খাতা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। খাতা খানি তাঁহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া সে বলিল—"বাবু, পান্থশালার জন্যে কিছু চাঁদা আপনি দিতে ইচ্ছা করেন কি?"

গিরিশ খাতা খানি হস্তে লইয়া দেখিলেন—তাহাতে ইংরাজি বাঙ্গালা হিন্দী অক্ষরে বহুলোক নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া দশ বিশ পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিয়াছে। গিরিশ মুহূর্ত্ত মাত্র ভাবিয়া, পকেট হইতে দশটাকার একখানি নোট বাহির করিয়া সন্ন্যাসীর হাতে দিলেন। খাতায় নামও সহি করিয়া দিলেন। সন্ন্যাসী তখন খাতা খানি সতীশ দত্তের সম্মুখে ধরিল। সতীশ বলিল—"বাবাজী, আজ ত কিছু আনি নি।"

"আচ্ছা, আমি দিচ্ছি"—বলিয়া গিরিশ পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া সতীশের হাতে দিলেন। সতীশ খাতায় নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া টাকা দুইটি চেলার হস্তে দিল।

উভয়ে পুনরায় স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া তখন বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ইঁহারা চলিয়া গেলে স্বামীজী বলিলেন—"আর কেউ এসেছে না কি ?"

চেলা বলিল—"দু-জন।"

"এক জায়গার ?"

"না। একজন যশোর জেলা থেকে—অল্প বয়স, বাপ আছে, মা নেই—বিমাতা, বোধ হয় খুব অর্থ কষ্ট।"

স্বামীজী বলিলেন—"তাকে একটা বড় চাকরি দিতে হবে—কি বল ? না লটারির টাকা ?"

চেলা বলিল—"চাকরিই ভাল। অন্যলোকটির বয়স চল্লিশ হবে, মোটা সোটা, অবস্থাপন্ন।"

"তাকেও কি রাজা করে দেব ? রাজায় রাজায় দেশ যে ছেয়ে ফেল্লাম! তার স্ত্রী আছেনা মরেছে ?"

"স্ত্রী বেঁচে আছে। সম্প্রতি একটি ছেলে তার মারা গেছে বল্লে। বাড়ী বৰ্দ্ধমান জেলা। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে হাইকোর্টে মোকদ্দমা চলছে।"

"ওঃ—বুঝেছি। আচ্ছা তাকেই প্রথমে নিয়ে এস।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাগানের বাহির হইয়া বলিলেন—"সতীশ, কি রকম বোধ হল ?"

সতীশের মনে স্বামীজীর সম্বন্ধে একটু সন্দেহ যে না হইয়াছিল এমন নয়। কিন্তু সে দেখিল, মুখোপাধ্যায় মহাশয় একবারে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং মনের ভাব মনেই গোপন করিয়া বলিল—"আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! সাধু বটে।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"আমার ত খুব বিশ্বাস হচ্ছে।"

সতীশ বলিল—"প্রথমে কিন্তু আমার ততটা ভক্তি হয় নি। কিন্তু বাবা যখন আমাকে বল্লেন আপনার মন্ত্রী—তখন আমার গা-টা কাঁটা দিয়া উঠ্‌ল।"

"কেন ?"

"কালকে গাড়ীতে আসতে রহস্যছলে আপনি আমাকে বল্লেন না—তুমিই আমার মন্ত্রী! দেখুন একবার দৈবের ঘটনা!"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"হু! ঠিক! বলেছিলাম বটে।"

সতীশ হঠাৎ দাঁড়াইয়া, মুখোপাধ্যায়ের মুখপানে ব্যাকুল ভাবে চাহিয়া বলিল—"যদি সে দিন আসে—কথাটি মনে রাখ্‌বেন দাদা!"

গিরিশ অন্যমনস্কভাবে বলিলেন—"সে দিন আসুকই ত আগে।"

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে কালীমন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। সতীশ দেখিল, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখের ভাব যেন ক্রমে বিকৃত হইয়া উঠিতেছে। সে শুনিয়াছিল, সহসা কোনও একটা বিপুল সৌভাগ্যের কথা শ্রবণ করিলে মানুষের দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় ছুটিয়া উঠে—এমন কি কাহারও কাহারও এমত অবস্থায় মৃত্যুও হইয়াছে। যাহাতে মস্তিষ্ক শীতল হয় এবং মনটা বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত থাকে এরূপ কিছু একটা করা প্রয়োজন। তাই সে বলিল—"দাদা, চলুন আমরা আদিগঙ্গায় স্নান করে মা কালীর পূজোটি দিয়ে একবারে বাসায় যাই।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"কাল ত আমরা আছি। কাল সকালেই পূজো দেওয়া যাবে।"

সতীশ বলিল—"না দাদা—সেটা উচিত হবে না। মার আশ্রয়ে যখন এসেছি—তখন মার পূজো দেওয়াই আমাদের সৰ্ব্বপ্রথম কৰ্ত্তব্য। 'মার পূজো দিতে চল্লাম'—এই মিছে কথাটি বলে আমরা বাসা থেকে বেরিয়েছিলাম। পূজো দেব ভাণ করেই আমাদের কতখানি ভাল ফল হল দেখুন। দাদা, ন চ দৈবাৎ পরং বলম্—দৈব-বলের কাছে কোন বলই নেই। চলুন আমরা মাকে প্রসন্ন করিগে।"

"বেশ, তাই চল তবে।"

দুই জনে আদিগঙ্গায় গিয়া স্নানাদি করিয়া, পূজা সমাপনান্তে যখন বাসায় ফিরিলেন তখন প্রায় মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত।

পরদিন ২৫শে বৈশাখ কলিকাতায় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে দুইজনে ত্রিবেণী যাত্রা করিলেন।

বাড়ী পৌঁছিতে রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিল। মুখ হাত ধুইয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া পূজার ঘরে গিয়া মুখোপাধ্যায় সায়ং সন্ধ্যায় বসিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। এ সময় পাড়ার বামী জেলেনী অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া বলিল—"মা ঠাকরুণ, শুনেছিনু যে বাবুপাড়ার বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের মেয়ে পটুলির সঙ্গে দাদাঠাকুরের বিয়ে হবে?"

পিসিমা বলিলেন—"হঁ্যা।"

জেলেনী বলিল—"তবে তেনার যে আজ বিয়ে হচ্ছে।"

"কার বিয়ে হচ্ছে?"

"পটুলির।"

মুখোপাধ্যায় একথাগুলি ঘরে বসিয়া শুনিতে পাইয়াছিলেন। বারান্দায় বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে, বামী নাকি?"

"হঁ্যা দাদাঠাকুর, পেরণাম।"

"কার বিয়ে হচ্ছে?"

"পটলির।"

"বাবুপাড়ার জগদীশ বাঁড়ুযোর মেয়ে পট্‌লির? বিয়ে হচ্ছে! কার সঙ্গে? কে বল্লে তোকে?"

"আমি যে দেখে এনু দাদাঠাকুর।"

"কি দেখে এলি?"

"তেনাদের বাড়ীতে আলো জলছে, শানাই বাজছে, বর এসেছে—"

মুখোপাধ্যায় রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন—"হঁ্যা পিসিমা?"

পিসিমা মা বলিলেন—"তাই ত শুন্‌ছি বাবা। আগে ত জানতাম না, আজ বিকেলেই শুন্‌লাম। কলকাতা থেকে নাকি পাত্র এসেছে।"

মুখোপাধ্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"এতক্ষণ আমায় বলনি কেন?"

পিসিমা শঙ্কিত স্বরে বলিলেন—"তুমি সন্ধে আহ্নিক করে, খেয়ে দেয়ে ঠাণ্ডা হলে তবে বলব মনে করিয়াছিলাম বাবা। তা, দিচ্ছে দিক না—বয়েই গেল। আমাদের কি আর মেয়ে জুট্‌বে না? মেয়ের ভাবনা কি বাবা? তুমি মন খারাপ—"

পিসিমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই খড়ম সেই খানে ফেলিয়া রাখিয়া নগ্নপদে নগ্নদেহে মুখোপাধ্যায় ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

অন্ধকার গ্রাম্যপথ দিয়া ছুটিতে ছুটিতে তিনি চলিলেন। পথে ইষ্টকাদিতে মাঝে মাঝে হোঁচট লাগিতে লাগিল—তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। পায়ে একটা কাঁটা ফুটিয়া গেল—কিন্তু তাহা তিনি অনুভবও করিতে পারিলেন না। একজন পথচারী রাতকাণা চাষাকে ধাক্কা দিয়া ধরাশায়ী করিয়া তিনি ছুটিতে লাগিলেন। একস্থানে দুইটা কুকুর ভেউ ভেউ করিতে করিতে কিছুদূর তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া শেষে প্রতিনিবৃত্ত হইল। মুখোপাধ্যায় পাগলের মত ছুটিয়া ক্রমে বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহের নিকটবর্ত্তী হইলেন।

অঙ্গনে চাঁদোয়া খাটানো, মাঝে মাঝে দেওয়ালে বাতি জ্বলিতেছে—অনেকগুলি লোক শতরঞ্জির উপর বসিয়া আছে। বারান্দায় পুরোহিত, টোপরধারী বর ও লালচেলি-মণ্ডিত কন্যাকে উভয় পার্শ্বে লইয়া বসিয়া আছেন, কন্যাকর্ত্তাকে মন্ত্র বলাইতেছেন—"বল—এনাং কন্যাং—"

মুখোপাধ্যায় ঝড়ের মত অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া, একলম্ফে বারান্দায় উঠিলেন। পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ বন্ধ হইয়া গেল, কন্যাকর্ত্তার মুখ পাংশু বর্ণ ধারণ করিল, উঠান সুদ্ধ লোক শঙ্কিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

মুখোপাধ্যায় ভগ্ন-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"জগদীশ।—এ কি?"

জগদীশ সভয়ে আগন্তুকের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

মুখোপাধ্যায় নিজ যজ্ঞোপবীতের দুইস্থান দুই হস্তে জড়াইতে জড়াইতে, কম্পিত উচ্চরবে কহিলেন—"ব্রাহ্মণকে কথা দিয়ে, শেষে সত্যভঙ্গ?—উচ্ছন্ন যাও—উচ্ছন্ন যাও—উচ্ছন্ন যাও। আমি যদি ব্রাহ্মণবংশে জন্মে থাকি, তবে এই অভিশম্পাৎ দিচ্ছি—বছর পোয়াবে না—তোমার মেয়ে বিধবা হয়ে যাবে।"—সঙ্গে সঙ্গে বিপুল বলে স্বীয় যজ্ঞোপবীত দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

কাঁপিতে কাঁপিতে, মুখে শুধু একটা 'হা হা হা হা' শব্দ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ছিন্নতরুর ন্যায় সেই স্থানেই তিনি ধরাশায়ী হইলেন। তাঁহার পা লাগিয়া ঘৃতদীপ দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া নিবিয়া গেল।

সতীশ দত্ত উঠানে দাঁড়াইয়া ছিল। দুই তিনজন লোকের সাহায্যে মুখোপাধ্যায়কে উঠাইয়া নিজ গৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা

ভারতবর্ষ, মাঘ ও ফাল্গুন—

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবীর "শিশুমঙ্গলে" শিশুর চিত্রটি মনোজ্ঞ। কবিতাটির মধ্যে একটি অতি কোমল মাতৃস্নেহের সুর উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে।

কি গান শোনাব রাজা তোমাদের সবে—
কণ্ঠপূর্ণ যাহাদের গীত-মহোৎসবে?
* *
পারাবতসম ঘুরে খেলার অঙ্গনে
এক কথা বার বার বল মুগ্ধ মনে।
* *
জননী আড়ালে গেলে, পেলে পুনরায়
বুল বুল সম গাও সুধার ধারায়

এখানে মাতৃস্নেহটুকু বড় উদার বড় ব্যাপক। কবিতাটির ভাবে নূতনত্ব আছে। রস ও কবিত্ব হৃদয়গ্রাহী। শেষাংশ পড়িলে বুঝিতে পারা যায় কবিতাটির মধ্য দিয়া একটি করুণ রসধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বহিয়া গিয়াছে।

শ্রীকান্তর ভ্রমণ-কাহিনী দুইসংখ্যায় যতখানি পড়িলাম, তাহার মধ্যে ইন্দ্রনাথের চিত্রটি সুন্দর হইয়াছে। রচনাটি উপভোগ্য, তবে দীর্ঘ ভূমিকাটি না থাকিলেই ভাল হইত। কোন একটা কথা বলিবার পূর্ব্বে একটা দীর্ঘ ভূমিকা ফাঁদিয়া বসা আমাদের রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোমের "মধু-স্মৃতি"তে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অনেক কথা জানিতে পারা যায়। বাহুল্য অংশ বর্জ্জন করিলে রচনাটির পঙ্কোদ্ধার হইবে।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্নের "কবি ও সাহিত্যিকদিগের নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ" পাঠ করিতে করিতে অনেক কথা মনে পড়িয়া গেল। লেখক বিজ্ঞ, পণ্ডিত। বাংলা সাহিত্য তাঁহার নিকট হইতে অনেক আশা করিয়া আসিতেছে। তিনি যদি কাব্য, অলংকার, দর্শন প্রভৃতি বাংলা ভাষায় আলোচনা না করিয়া, সাধারণে যে প্রবন্ধ লিখিতে পারে তাহা লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যের প্রতি সুবিচার করা হইবে না।

শ্রীরসিকলাল রায় একটি প্রবন্ধে হিন্দী সাহিত্যের এবং হিন্দী লেখকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আবশ্যক। 'ভারতবর্ষ' যদি দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যের বিবরণ প্রকাশ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার নাম সার্থক হইবে।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক ভাসপ্রণীত অভিষেক নাটকের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়ের "ঠাকুরে ভাই" গল্পটিতে করুণ রস ফুটিয়াছে, তবে প্লটটি পুরাতন। চিরকাল একঘেয়ে ধরণটা ভাল লাগে না। শ্রীকালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী 'আচার্য্য দণ্ডী ও তাঁহার দশকুমারচরিত' শীর্ষক প্রবন্ধের রচয়িতা। সেকালে দেশের সামাজিক অবস্থার কথাটা যে সকল গ্রন্থে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, দণ্ডীর দশকুমারচরিত তাহাদের মধ্যে একটা উচ্চস্থানই অধিকার করিয়া আছে। এই গ্রন্থ হইতে সেকালের কথা সযত্নে সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধকর্ত্তা পাঠককে উপহার দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই। শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্তের "যুগ-পরিচয়" সংকলন হইলেও সুন্দর, সুখপাঠ্য; চিত্রগুলিও চিত্ত আকর্ষণ করে।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কপালকুণ্ডলা"র সমালোচনায় রসবোধ ও সূক্ষ্মদর্শিতা অপেক্ষা পাণ্ডিত্যেরই অধিক পরিচয় আছে। এ প্রবন্ধটিও ছাত্রগণের বিশেষ উপযোগী। সাধারণ পাঠক সবটা ধৈর্য্য রাখিয়া পড়িতে পারিবেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ললিতবাবু প্রবন্ধটি ছোট করিলে ইহার উপযোগিতা বাড়িত বই কমিত না।

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্তের "সাময়িকী" সুখপাঠ্য।

প্রবাসী, ফাল্গুন—

"আমেরিকায় এশিয়ার শিক্ষক" প্রবন্ধে শ্রীবিনয়কুমার সরকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিদেশীদের মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি কথা সংকলন করিলাম—

১। ইয়াঙ্কীস্থানের সর্ব্বপ্রধান দার্শনিক জেম্‌সের চিন্তায় বিবেকানন্দের বেদান্তপ্রচার স্থান পাইয়াছে।

এ সংবাদটা পাঠকের নিকট নিশ্চয়ই নূতন নহে। শুধু ইয়াঙ্কীস্থান কেন, অনেক দেশের দার্শনিক যে এখন বেদান্তের আলোচনা করেন ও করিয়াছেন তাহা সকলেরই জানা আছে।

২। জাপানী বৌদ্ধ প্রচারক আনেসাকির উক্তি—

"প্রাচ্যদের একটা গাম্ভীর্য্য ও গভীরতা আছে। আমরা বড়ই হাল্‌কা এবং তরলস্বভাব।"

"নির্ব্বাণের অর্থ বুঝিতে গোল হয়। * * * বৌদ্ধধর্ম্ম দুঃখ হইতে মুক্তির পথ দেখাইতে চাহেন—মানুষকে অকর্ম্মণ্য কাণ্ডজ্ঞানহীন জড় পদার্থে পরিণত করিতে চাহেন না। * * * বুদ্ধদেবের জীবনে কি দেখিতে পাই? * * * ইউরোপ ও ইয়াঙ্কীস্থানের নরনারী যে ধরণের কর্ম্মতৎপরতা দেখিলে সুখী হন বুদ্ধদেবের তাহা কম ছিল না। * * * চীন ও জাপানের বহু প্রতিষ্ঠানে বৌদ্ধদিগের বাস্তবজ্ঞান, কর্ম্মপ্রিয়তা, আশাতত্ত্ব এবং শক্তি পূজা দেখিতে পাই। * * * বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণ চাহে, কিন্তু

কিসের নির্ব্বাণ? দুঃখের, অবিদ্যার, অত্যাচারের, অবিচারের, দুর্নীতির নির্ব্বাণ। এই সকল নির্ব্বাণের জন্য প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করাও ধর্ম্ম সঙ্গত।"

এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্যদিগের গতানুগতিক মত খণ্ডিত হইয়াছে।

আমরাও লেখকের সহিত বলিতে চাই, "সমগ্র এশিয়ার শিল্প বলুন, সমাজ বলুন, রাষ্ট্র পরিচালনা বলুন, বিদ্যাচর্চ্চা বলুন, সাহিত্য বলুন—সকল বিষয়েই পাশ্চাত্যদের ভুল ধারণা আছে। এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাস এতদিন পাশ্চাত্যেরা লিখিয়াছেন। এশিয়া সম্বন্ধে এশিয়ার মত এখনও প্রচারিত হয় নাই।"

৺ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মার্কিণ মেয়েদের কথা" এ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকারের "চীনা রাজ্যের ভবিষ্যৎ" উল্লেখযোগ্য। আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম

"বরাহমিহিরের 'বৃহৎ সংহিতা'য় উপদেশ প্রচারিত হইয়াছে যে ম্লেচ্ছের নিকটও বিদ্যা অর্জ্জন করা কর্ত্তব্য এবং গুরু ম্লেচ্ছ হইলেও পূজনীয়। গ্রীক পণ্ডিতদিগের নিকট হিন্দু জ্যোতিষ্বিদ্গণের ঋণ গ্রহণ উপলক্ষ্যে বরাহমিহির এই কথা বলিয়াছিলেন। সে খৃষ্টীয় পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা। * * কিন্তু মুসলমান অধিকারের পর হইতে ভারত সমাজে স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তাশক্তির কার্য্য কতকটা মন্দীভূত হইয়াছে। পরদেশ ও পরধর্ম্মকে আমরা বিষবৎ বর্জ্জন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। পরকীয় সকল পদার্থই সন্দেহের চোখে দেখিতে শিখিয়াছি। * * অবশেষে ঘটনাক্রমে বিদেশী ম্লেচ্ছরাজগণের অধীনে জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইয়া আমরা আবার বরাহমিহিরের উপদেশ মানিতে শিখিয়াছি।"

জাপান এ উপদেশ মানিয়াছে, চীনও মানিতেছে। লেখক বলিয়াছেন আমরাও মানিতে শিখিয়াছি। কিন্তু শিক্ষাটার অনুযায়ী কাজ এখনও পুরামাত্রায় করিতেছি বলিয়া মনে হয় না।

নব্যভারত, মাঘ—

এ সংখ্যায় গ্রীকদর্শন, হিন্দুধর্ম্ম, বগুড়ায় বৃদ্ধচতুষ্টয় প্রভৃতি অধিকাংশ প্রবন্ধেই সেকালের কথা আছে। নব্যভারতে নব্য ভারতের সাড়া পাওয়া যায় না কেন?

প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটিও পড়িয়া আনন্দলাভ করিলাম না। গ্রীকদর্শনের ভাষা আরও স্বচ্ছ হওয়া উচিত ছিল। 'বঙ্গসাহিত্যে কলঙ্ক রেখা' প্রবন্ধটিতে এমন অনেক কথা আছে যাহা আজকাল ভুলিয়া যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। লেখক বলেন বঙ্গসাহিত্যে জাতীয় ভাব নাই। তাহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলিতে চান—"আমাদিগের চিরপীড়িত ধৈর্য্যশীল স্বজনবৎসল, বাস্তুভিটাবলম্বী প্রচণ্ড কর্ম্মশীল পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তবাসী শান্ত বাঙ্গালীর কাহিনী আজিও আমাদিগের সাহিত্যে স্থান পাইল না, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় কি থাকিতে পারে? আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইল, ম্যালেরিয়া জ্বর বঙ্গের গ্রামে গ্রামে বিরাজ করিতেছে, অথচ বঙ্গসাহিত্যের কবিতায় ম্যালেরিয়া জ্বরের কথা কোথাও নাই।" এ কথার সর্ব্বশেষে লেখক বলিয়াছেন, প্রকৃত বাঙ্গালী আজ পর্য্যন্ত একটিও তাঁহাদের মনোমত কবি পান নাই। ভবিষ্যতে কোন কবি পাইবেন কি না সন্দেহস্থল।

এখন এই 'প্রকৃত বাঙ্গালী' কিরূপ ও তাঁহাদের মনোমত কবিরও কি লেখা উচিত তাহা আমরা জানি না। তবে লেখক যে জাতীয় ভাবের কথা বলিয়াছেন বঙ্গকবি ম্যালেরিয়ার কবিতা না লিখিয়াও তাহা বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের ধারণা 'প্রকৃত বাঙ্গালী' তাহাদের 'মনোমত কবি' পান আর নাই পান, বাঙ্গালী জাতি কবিত্ব প্রভাবে জগতের মধ্যে একটা উচ্চ আসনই অধিকার করিয়াছে। প্রবন্ধ লেখকও কি সে জন্য গর্ব্বিত নহেন?

বগুড়ার বৃদ্ধচতুষ্টয়ের কথা লিপিবদ্ধ করিবার আবশ্যকতা কি? স্বনামধন্য অনেক পুরুষ সহরের আলোকে আত্মপ্রকাশ না করিয়া পল্লীর ছায়ান্ধকারে আত্মগোপন করিতেই ভালবাসিয়াছেন; তাঁহাদের জীবনী লিপিবদ্ধ করা উচিত মনে করি। সে সব জীবনী সংগৃহীত হইলে বাংলার সামাজিক ও নৈতিক অবস্থার অনেক পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে তবে জীবনী যদি শুধু খানিকটা প্রাণহীন বিবরণে পর্য্যবসিত হয় তাহা হইলে সাহিত্যের বা আমাদের কোন লাভ নাই।

ভারতী, ফাল্গুন—

শ্রীবিনয় কুমার সরকারের "বিদেশে আর্য্যসমাজ" ও শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্রের "ভারতের মুদ্রা" উল্লেখযোগ্য। দুটি প্রবন্ধেই কাজের কথা আছে। বাংলার সাধারণ পাঠকগণ গল্প, উপন্যাস পড়িতে পড়িতে এ গুলিও একবার দেখিয়া লইবেন আশা করি। দেশে এমন এমন একটা সময় আসিয়াছে যে এখন শুধু গল্প উপন্যাস বা কবিতা প্রভৃতি সুখপাঠ্য রচনায় মনোনিবেশ করিলে চলিবে না। এখন আমরা দিন দিন উন্নতির পথে কতটা অগ্রসর হইতেছি তাহার হিসাব রাখিতে হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর "সমসাময়িক ভারতের সভ্যতা" প্রবন্ধে কি পরিমাণে ভারতবাসীরা ইংলণ্ড ও য়ুরোপের

প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিয়াছেন। প্রবন্ধটি statisticsএ পরিপূর্ণ তবুও ইহার সরল সহজ ভাষার মধ্যে একটা মনোহারিণী শক্তি আছে! বাঙ্গালা, সিন্ধুদেশ, রাজপুতনা প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিগণের কথা শেষ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"সমস্ত ভারত সমাজে, একটা গোলযোগ, অনিশ্চিততা, চেষ্টা প্রযত্ন, এবং য়ুরোপীয় প্রবণতা ও এসিয়িক প্রবণতার মধ্যে যুঝাযুঝি; সেই সঙ্গে বিরুদ্ধ প্রবণতা সমূহের মধ্যে উত্তরোত্তর আপোস ও মিলন সংস্থাপন- ইহাই সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয়।"

শ্রীনলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়ের "কথা ও কাজ" নব্য দর্শনের অনুযায়ী; প্রবন্ধটি ছোট হইলেও সুপাঠ্য। লেখক বলিতে চান—কথাকে, কল্পনাকে, আদর্শকে উত্তরোত্তর অগ্রগামী করিবারই চেষ্টা করিতে হইবে, কাজ যদি সকল সময়ে কথামত না হয় সে জন্য কথাকে খাটো করিবার প্রয়োজন নাই। কথাকে যদি প্রাণের সংকল্পে বরণ করিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকি তাহা হইলে কাজ একদিন আপনা হইতেই তাহার অনুগামী হইবে।

সবুজ পত্রের সম্পাদক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী "আমাদের শিক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সবুজপত্রে "শিক্ষার বাহন" লিখিয়াছিলেন; প্রবন্ধটি সরলযুক্তিপূর্ণ, যুক্তিগুলি সহজেই বোধগম্য। রবিবাবুর সেই সরল সরস কথার তাৎপর্য্য অস্পষ্ট কষ্টরচিত ভাষায় আমাদের বুঝাইবার জন্য চৌধুরী মহাশয় "সবুজপত্রকে" অব্যাহতি দিয়া ভারতীর পরিণত পত্রকে ভারাক্রান্ত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সুললিত কথা আমরা বুঝি। তাঁহার প্রবন্ধ আমরা অতি আনন্দের সহিতই পড়িয়াছি এবং তাঁহার মতটি যুক্তিসঙ্গত বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কেমন করিয়া তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাহা সংক্ষেপে বলিয়াছেন। সবুজপত্রে তাঁহার সে প্রবন্ধও আমরা পড়িয়াছি। আজ চৌধুরী মহাশয় যে রবীন্দ্রনাথের অক্ষম অনাবশ্যক ভাষ্যকারের পদটিও ছাড়িতে কুণ্ঠিত হইয়া এই তিন পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রবন্ধ ভারতীর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিয়া রবীন্দ্রনাথ ও আমাদের প্রতি অবিচার করিতে একটুও দ্বিধা করিবেন না তাহা আমরা এতদিন ভাবিতে পারি নাই।

ভাষ্যের একটু নমুনা দিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন

"যে ছেলের মাতৃভাষা বাংলা তার পক্ষে ইংরাজি ভাষার মত বালাই আর নাই। ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপের মধ্যে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম।"

বাংলা ভাষা অনাদর সহিতে রাজী কিন্তু অকৃতার্থতা সহ্য করা কঠিন। ভাগ্যমন্তের ছেলে ধাত্রীস্তন্যে মোটা সোটা হইয়া উঠুক না কিন্তু গরীবের ছেলেকে তার মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন?"

প্রমথবাবু ইহার ভাষ্য করিতেছেন—

১। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর লেখাপড়া শিখতে যে কষ্ট আমাদের ভোগ করতে হয়েছে তার হাত থেকে একবার অব্যাহতি পেলে আমরা লেখা পড়ার দিক্ দিয়েও আর ঘেঁসতে চাইনে। পঠদ্দশায় আমরা যে, স্বরস্বতীকে নিত্য বলি—ছেড়েদে মা কেঁদে বাঁচি—তার কারণ তিনি বিদেশিনী। বিদেশী ভাষায় শিক্ষা লাভ করতে হয় বলেই আমাদের শিক্ষার পদ্ধতিটে এত নিরানন্দ। যার ভিতর আনন্দ নেই তা আমরা নিজের মন থেকেই দূর করতেই যখন ব্যস্ত তখন অপরের মনে তা প্রবেশ করিয়ে দেবার প্রবৃত্তি খুব কম লোকেরই হয়ে থাকে। এবং যাঁদের এরূপ সাধু সংকল্প আছে, তাঁরাও সে সংকল্প কার্য্যে পরিণত করতে অক্ষম। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে ইংরাজির সাহায্যে আরোহণ করি বলে বাঙ্গালায় অবরোহণ করতে পারিনে। ইংরাজী সরস্বতী আমাদের জ্ঞানবৃক্ষের আগডালে চড়িয়ে দিয়ে মই কেড়ে নেন্। ফলে আমরা কেউ বা আইনের কেউ বা ডাক্তারির শাখায় বসে ফল পাতা যা পাই তাই পেয়ে জীবন ধারণ করি, অথচ দেশের মাটি নীচে পড়ে রয়েছে, যার আবাদ করলে ফলত সোনা। নবশিক্ষিত মনের যে কৃষিকাজ আসে না তার একমাত্র কারণ এই যে সে মনকে মাতৃভূমির কোল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। একথা বলা বাহুল্য যে মনের মাতৃভূমি হল মাতৃভাষা। রবীন্দ্রনাথ এই সত্যের প্রতিই দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন।"

মূল ও ভাষ্য দুইয়েরই আমরা নমুনা তুলিয়া দিলাম—পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন আমাদের মন্তব্য যথার্থ না ভ্রান্ত।

ভাষ্যে প্রয়োজনীয় কথা কিছুই নাই—আছে কেবল সোজা কথা বাঁকাইয়া বলার, এবং রাশি রাশি অবান্তর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তাঁহার স্বকীয় রসিকতা প্রয়োগের অবসর সৃষ্টির উদাহরণ! উপরের ভাষ্যে যেটুকু নূতন কথা বলিয়া মনে হইতে পারে তাহাও রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে একাধিক স্থলে বর্ত্তমান।

আমরা লেখকের রচনারীতির পক্ষপাতী নই। পক্ষপাতী হইতাম যদি তাঁহার ভাষাটা সুবোধ্য হইত। তিনি চলতি কথা ব্যবহার করেন, শব্দ নির্ব্বাচনের জন্য গলদ্‌ঘর্ম্ম হন, কিন্তু হায় তবুও তাঁহার বক্তব্য সহজে কেহ বুঝিতে পারে না।

রচনায় লেখকের সংযমের একান্ত অভাব লক্ষিত হয়। অনেক গুলি কথা এক সঙ্গে তাঁহার মনে আসিয়া তাঁহাকে যেথা-সেথা টানিয়া লইয়া যায়। সুতরাং তাঁহার কথাগুলি পাঠকের কাছে যে অসম্বদ্ধ মনে হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? ভাষা অনেকস্থলে অর্থহীন। "সেই শ্রোতার দল যাঁরা এককাণে বিলেতি আর এককাণে সংস্কৃত তুলো দিয়ে বসে আছেন" কথাটার অর্থ কি? আরো অনেক উদাহরণ এই প্রবন্ধ হইতেই দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমাদের স্থান ও সময় উভয়েরই অভাব।

সাহিত্য সমাচার।

"হোম্ য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরী"-গ্রন্থমালার অন্তর্গত "Evolution of Industry" নামক পুস্তক অবলম্বনে রচিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা প্রবন্ধ লেখককে, "বিশ্বম্ভর সেন পারিতোষিক" হিসাবে এক শত টাকা দেওয়া হইবে। আগামী ৩০শে নবেম্বরের মধ্যে, চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে।

———

"অন্নদা বুকষ্টল" প্রকাশকও, আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের এই পর্য্যায়ের প্রথম গ্রন্থ, শ্রীযুক্ত শ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত নূতন উপন্যাস "শুভদৃষ্টি" প্রকাশিত হইয়াছে।

———

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম-এ, পি-আর-এস প্রণীত ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস ইংরাজি গ্রন্থের তৃতীয় ভাগ যন্ত্রস্থ—বৈশাখের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে।

সুপ্রসিদ্ধ গল্প-লেখক শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নূতন গল্পগ্রন্থ "পরিকথা" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৷৹

———

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত "নব কথা" গল্প গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ চৈত্রের মাঝামাঝি প্রকাশিত হইবে।

———

সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও কবি মৌলবী মোজাম্মেল হক্ প্রণীত "হজরত মহাম্মদ" গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ চৈত্রের প্রারম্ভেই প্রকাশিত হইবে।

———

"মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী" প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু "পৃথ্বীরাজ" নামে একখানি মহাকাব্য লিখিয়াছেন, উহা যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

———

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রণীত নূতন গার্হস্থ্য উপন্যাস "বিধবার ছেলে" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৲

দ্রষ্টব্য।—এই সংখ্যার ২০০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত চিত্রখানি, নেপাল হইতে আনীত সন্ধ্যাকর নন্দী প্রণীত "রামচরিতং" কাব্যের মূল পুঁথির (১) প্রথম পৃষ্ঠার এবং (২) যে পৃষ্ঠায় তাহার টীকা আছে, তাহার আলোক-চিত্র হইতে প্রস্তুত।



জীবন-সন্ধ্যায়।

[শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরীর অঙ্কিত চিত্র হইতে]

Manasi Press.

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

৮ম বর্ষ
১ম খণ্ড

বৈশাখ ১৩২৩ সাল

১ম খণ্ড
৩য় সংখ্যা

অপমানিত

তোমারে কি বারবার করেছিনু অপমান ?
এসেছিলে গেয়ে গান
ভোর বেলা ;
ঘুম ভাঙাইলে বলে মেরেছিনু ঢেলা
বাতায়ন হতে,
পরক্ষণে কোথা তুমি লুকাইলে জনতার স্রোতে।

ক্ষুধিত দরিদ্রসম
মধ্যাহ্নে এসেছ দ্বারে মম।
ভেবেছিনু, "এ কি দায়,
কাজের ব্যাঘাত এ যে!" দূর হতে করেছি বিদায়।

সন্ধ্যাবেলা এসেছিলে যেন মৃত্যুদূত
জ্বালায়ে মশাল আলো, অস্পষ্ট অদ্ভুত
দুঃস্বপ্নের মত।
দস্যু বলে শত্রু বলে ঘরে দ্বার যত
দিনু রোধ করি।
গেলে চলি, অন্ধকার উঠিল শিহরি।

এরি লাগি' এসেছিলে, হে বন্ধু অজানা ;—
তোমারে করিব মানা,
তোমারে ফিরায়ে দিব, তোমারে মারিব,
তোমা-কাছে যত ধার সকলি ধারিব,
না করিয়া শোধ
দুয়ার করিব রোধ।

তারপরে অর্দ্ধ রাতে
দীপ-নেবা অন্ধকারে বসিয়া ধূলাতে
মনে হবে আমি বড় একা
যাহারে ফিরায়ে দিনু বিনা তারি দেখা।
এ দীর্ঘ জীবন ধরি
বহুমানে যাহাদের নিয়েছিনু বরি'
একাগ্র উৎসুক,
আঁধারে মিলায়ে যাবে তাহাদের মুখ।
যে আসিলে ছিনু অন্যমনে
যাহারে দেখিনি চেয়ে নয়নের কোণে,
যারে নাহি চিনি,
যার ভাষা বুঝিতে পারিনি,
অর্দ্ধরাতে দেখা দিবে বারেবারে তারি মুখ নিদ্রাহীন চোখে
রজনীগন্ধার গন্ধে তারার আলোকে।
বারেবারে-ফিরে-যাওয়া অন্ধকারে বাজিবে হৃদয়ে
বারেবারে-ফিরে-আসা হয়ে॥

শিলাইদা
৮ই ফাল্গুন, ১৩২২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অলোক-পন্থা ও কথা সাহিত্যের ধারা

অলোকপন্থা জিনিষটা কি?

আর যাই থাকুক ভারতে সমালোচন-সাহিত্য ছিল বলিয়া আমার জানা নাই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমালোচনায় য়ুরোপীয় সমালোচন পদ্ধতির শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় দেখি না, ভারতের প্রাচীন সাহিত্যকেও বিশ্বসাহিত্যের উদার আকাশের নীচে তুলিয়া ধরিয়া না দেখিলে প্রকৃত দেখা হয় তাহাও বলিতে পারি না। কাজেই বাধ্য হইয়া আমাদিগকে কতকগুলি বিদেশী কথার, "ism"এর সাহায্য লইতে হয়। এই কথাগুলি দিয়া ইঙ্গিতেই অনেকটা কাজ সারিয়া ফেলা যায় বলিয়া এগুলিকে স্বদেশী সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ ঝাঁটাইয়া দিতে আমরা একান্ত নারাজ। কিন্তু এগুলি আবার আলস্যের প্রশ্রয় না হইয়া উঠে, ভাষার শৃঙ্খল স্বরূপ হইয়া না দাঁড়ায়, এই সব বাঁধা বুলির দাসত্ব আমাদিগকে না করিতে হয়, এই বড় বড় এবং অনেক সময় ফাঁকা আওয়াজের আড়ালে আমরা সমালোচনার হাটে ফাঁকির কারবার না চালাই—সে সম্বন্ধেও আমাদিগকে যথেষ্ট সাবধান হইতে হইবে। অর্থাৎ ভিতরের প্রাণপদার্থ শুকাইয়া গিয়াছে এমন সব শূন্যগর্ভ খোলস লইয়া আমরা নাড়াচাড়া না করি, যে বুলি আওড়াই তাহার পরিষ্কার ধারণাটা যেন আমরা রাখি এবং অন্যকে দিতে চেষ্টা করি, এইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইংরেজী 'মিষ্টিসিজ্‌মে'র পরিবর্ত্তে বাংলায় আমরা অলৌকিকতা বা 'অলোক-পন্থা' শব্দ ব্যবহার করিব। 'মিষ্টিক' কবিদের বাংলায় কেহ কেহ "মরমী কবি" আখ্যা দিয়াছেন। অধ্যাত্ম বিষয়ে অলোকপন্থী কবিদের "মরমী" বলাটা তেমন অসঙ্গত নয়; কিন্তু অলোক-রস অলৌকিতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধার ঈশ্বরকে লইয়া যেমন, লোকাতীত যে-কোনো ব্যাপার লইয়াও তেমনি ফুটিয়া উঠিতে পারে,—অর্থাৎ অলৌকিকতা আধ্যাত্মিকও হইতে পারে, ভৌতিকও হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বা ইয়েট্‌সের কবিতা যেমন অলৌকিক, কবি কোল্‌রিজের "ক্রিষ্টাবেল" বা "পুরানো নাবিকের গান"ও তেমনি অলৌকিক। শেষোক্ত অলৌকিকতার কবিদিগকে কিছুতেই "মরমী" আখ্যা দেওয়া যায় না। আর সাধারণতঃ অধ্যাত্মবিষয়ের অলৌকিকতার মধ্যে যে একটা অনিশ্চয়তা ও রহস্যময়তার গোপনচারী অস্পষ্ট-ভাব আছে সেটা "মরমী" কথার মধ্যে রক্ষিত হয় বলিয়া মনে হয় না। তবে সুনিশ্চয় প্রত্যয়শীল প্রাচ্য ভক্তি-পন্থীদের "মরমী" বলা যায়; সেই হিসাবে প্রাচ্য মরমীরা পাশ্চাত্য 'মিষ্টিক'দের দেশী প্রতিরূপ নহেন, বরং পরিণত রূপ। নিশ্চয়প্রত্যয়ী প্রাচ্যেরা, অনিশ্চয় ও গোপন-কুতূহলী পাশ্চাত্যগণ, আর ভৌতিক অলৌকিকতার কারবারীরা, সকলকেই অলোক-পন্থী বা অলোকী নামে অভিহিত করা যায়। আশা করি ভূত ও ভূতপতিকে এইরূপে একাকার করায় বিশেষ কোনো অসঙ্গতি দোষ ঘটিবে না।

কি অধ্যাত্ম-ব্যাপারে কি ভূত-ব্যাপারে, আমার মনে হয়, এই 'মিষ্টিসিজম্‌' বা অলৌকিকতা জিনিষটা সাহিত্যের পরিণত অবস্থার এবং বিশেষ করিয়া আধুনিক কালের সামগ্রী। সুপ্রাচীন মরমী কবিদেরও আমি এই শ্রেণীতে ফেলিতে কতকটা নারাজ। আর ভূত প্রেত পরী দানার গল্প প্রাচীন কালের নিজস্ব সামগ্রী হইলেও এবং সেই সময়কার রোমান্স প্রভৃতি বয়স্কদের সাহিত্যকে তাহাদের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে উপকরণ যোগাইলেও, সেগুলি যে রসকে ফুটাইয়া তুলিত সেটা হইয়াছে অদ্ভুত রস, বর্ত্তমানের অলোক রস নহে। সে সকল হইতে যাঁহারা আনন্দলাভ করিতেন, তাঁহারা—বয়সেই হউক আর মনেই হউক—শিশু ছিলেন।

আর আধ্যাত্মিক কিম্বা ভৌতিক হইলেই যে রচনা 'মিষ্টিক' হইবে এমন কোনো কথা নাই। খাঁটি ব্রহ্মসঙ্গীত এবং শ্যামাসঙ্গীত বর্ত্তমানকালে রচিত হইলেও এই অলোক রসের কিছুমাত্র ধার ধারে না।

শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্ম ভূতপরীঘটিত রচনাবলী আধুনিক হইলেই যে 'মিষ্টিক' হইয়া যাইবে তাহাও নহে।

অলৌকিকতা একটা রস, সেটা শুষ্ক দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে ত থাকিতেই পারে না, অধ্যাত্ম বিষয়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতির মধ্যেই যে থাকিতে পারে তাহাও নহে। সূক্ষ্ম অপ্রত্যক্ষ অনুভূতি লইয়াই অলোক-পন্থীদের কারবার, জলেস্থলে ফুলেফলে এক গোপন অলক্ষিত পাদক্ষেপের ইতিহাস প্রচার করাই তাঁহাদের কাজ। স্থির অচল মাটি খড়ের মূর্ত্তির মধ্যে বদ্ধ এবং অবচ্ছিন্ন করিয়া রসানুভূতিকে পাওয়ার সাধনা ইঁহাদের নহে; নিখিল বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ত চঞ্চল গতির মধ্যে সেই অচঞ্চল পরম রহস্যময়কে অনুভব করিবার দিকেই তাঁহাদের সমস্ত চিত্তবৃত্তি উন্মুখ হইয়া উঠে; তাঁহাদের 'পুলক' তাই গাছে গাছে নাচে, 'খুসি' আকাশে ফুটে, আর ক্রন্দন বাতাসে গুমরিয়া উঠিয়া অজানার অভিযানে ছুটিয়া যায়। ভৌতিক ব্যাপারেও স্থূল প্রত্যক্ষ দশের চর্ম্মচক্ষুর দেখার মধ্যে অলোক-রসের সন্ধান করিতে যাওয়া বৃথা, ব্যক্তি বিশেষের মনের সঙ্গে এই মানসচারী অশরীরীদের গোপন লুকোচুরির মধ্যেই তাহাকে খুঁজিতে হয়।

প্রাচীনেরা পথে-ঘাটে হাটে-মাঠে নানা মূর্ত্তিতে ভূতের দেখা পাইতেন। কেহ বা আকাশে মাথা ঠেকাইয়া পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, কেহ বুকে দুইটা জ্বলন্ত চোখ লইয়া মস্তকহীন বিভীষিকার সৃষ্টি করিত, কোনোটা বা উলঙ্গ ঘুট্‌ঘুটে কালো ও চিম্‌সে মূর্ত্তিতে হাটপ্রত্যাগতের মাছের চুপ্‌ড়ির সন্ধানে ফিরিত, কেহ দুই গ্রামের দুই প্রকাণ্ড শাল গাছের মাথা নোয়াইয়া আনিয়া মিলাইয়া দিত, কেহ বৌ সাজিয়া গাছে চড়িয়া থাকিত, কেহ বা বিড়াল সাজিয়া অলক্ষ্য গতিতে পথচারীর চারিদিকে বিচরণ করিত।

কিন্তু এ হইয়াছে চোখের দেখা এবং সমাজের দশজনের দেখা। বর্ত্তমানে ভূতপরীরা আর বাহিরে নাই, তাহারা কখন অলক্ষিতে মনোগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু সেই মনোগৃহও খুব সূক্ষ্ম এবং স্পর্শানুভবক্ষম না হইলে এই বায়ুবিহারীদের অশরীরী চরণপাত ধরা পড়ে না। এইজন্যই সমাজের চর্ম্মচক্ষু হইতে নির্ব্বাসন লাভ করায় তাহারা এখন শুধু ব্যক্তি বিশেষের মনের সামগ্রী হইয়া বাস করিতেছে।

আধুনিক সাহিত্যের ভূতপরীরা কবির কথায় শুধু একটা "blot in the brain" মাত্র, তাহাদের অস্তিত্ব আছে মাত্র মনে, বাহিরে নয়। আজকালকার ভূত দেখা তাই শুধু মনের ছবিকেই বাহিরের কোনো অবলম্বনের আশ্রয়ে ফুটাইয়া দেখা বই আর কিছু নহে। এ শুধু আপন মনের লুকানো আবছায়াকেই বস্তুজগতের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সেই কালো কুৎসিৎ ভীতি-উৎপাদক চেহারায় নিজেই হঠাৎ চমকিয়া যাওয়া এবং ভয়ে বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠা। মনের উপর বাহিরের অপরিচিত বস্তুর ছায়াপাত এ নহে, মনের অপরিচিত অংশের সঙ্গেই আপনার হঠাৎ পরিচয়ের একটা বিস্ময়-চমক। মনের কারাগৃহে অবরুদ্ধ আবছায়াগুলি তাহার শাসন হইতে হঠাৎ ছাড়া পাইয়া অসম্ভব রকমে স্ফীত হইয়া উঠে এবং আকাশে মাথা ঠেকাইবার চেষ্টা করে—ব্যাপারটা ইহা ছাড়া আর কিছু নয়। এই ভিতরকে বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলার রহস্যের মধ্যেই আধুনিক অলৌকিকতার প্রকৃতি লক্ষণ খুঁজিতে হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মিষ্টিসিজ্‌ম্ জিনিষটা সাধারণতঃ সাহিত্যের পরিণত অবস্থার সামগ্রী। এ কথাটা সব দেশের সাহিত্য সম্বন্ধেই অল্পবিস্তর খাটে। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য শৈশবে কথামালা ও আখ্যানমঞ্জরীর গল্প শুনিয়াছে, যৌবনে তিলোত্তমা-মনোরমাদের সহিত প্রেমে পড়িয়াছে এবং প্রৌঢ়ে যৌবনের রঙীন ঝাপসা কুহেলিকার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সাচ্চা প্রাণের আশ্রয়স্থল নিভৃত নিকেতন পল্লীগুলির খাঁটি প্রাণের কথায়, লজ্জা-লালিম খুকী-বধূর চিত্রে, শিশুর ধূলি-খেলায় এবং মায়ের স্নেহোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে বাঙালী হৃদয়ের

আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ পাতাইয়া বসিয়াছে। সাহিত্যের এই অবস্থাটাই জীবন এবং জীবন ব্যাপারের সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয় স্থাপনের সময়; এই সময়েই বাস্তবের চিত্রণ, মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ, সামাজিক সমস্যা-সমাধান সাহিত্য জুড়িয়া বসে; এই সময়েই জড়বিজ্ঞান দর্শন মনস্তত্ত্ব জীববিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের সত্যগুলি ক্ষমতাশালী কবি ও লেখকের হাতে পড়িয়া সাহিত্যের বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে।

কিন্তু সাহিত্য গতিশীল, সে এখানে আসিয়াও চিরকালের মত আটকাইয়া যায় না। মানব-মন জড়ত্বের ভারে পিষ্ট এবং জীবন সমস্যায় ক্লিষ্ট হইয়া দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতা হইতে মুক্তি মাগিয়া আবার সাহিত্যে অজানা রাজ্যের লঘু কল্পনার আবাদ করে,—ইহাই মিষ্টিসিজ্‌ম্।

যদিও দুইটাই কল্পনাপ্রধান তবু যৌবনের রোমান্সের সঙ্গে পরিণত বয়সের এই মিষ্টিসিজ্‌মের বিস্তর পার্থক্য আছে। সমস্ত পার্থিব ব্যাপারের সহিত পরিচয়ের পরে আসিয়াছে বলিয়াই মিষ্টিসিজ্‌ম্ জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল সত্যগুলিকে একেবারে ঝাঁটাইয়া দিয়া শূন্যে আকাশ-কুসুমের আবাদ করে না; বরং মিষ্টিক কল্পনায় এই জড় জগৎই একটা সূক্ষ্ম জগতে রূপান্তরিত হইয়া যায়—সেই রাজ্যের নিয়মের সঙ্গে আমাদের এই পৃথিবীর নিয়মের কোনো বিরোধ নাই—একটা শুধু আর একটার পরিণতি মাত্র। কিন্তু রোমান্সের মধ্যে এই সত্যভিত্তি নাই;—তাহা আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপে উজ্জ্বল হইতে পারে, কিন্তু অন্ধকারের পরপার হইতে আগত অস্ফুট জ্যোতির্লেখার সহিত তাহার তুলনা কোথায়! স্থূল ভৌতিক প্রাসাদের বর্ণনায় তাহা ভীতি-সঞ্চারক হইতে পারে, কিন্তু অস্পষ্ট পরম সত্য এবং মানসচারী অশরীরীদের সম্মুখে অনন্তক্ষুব্ধ নর-আত্মার সাত্ত্বিকা ভীতি ইহাকে কেমন করিয়া বলিব! তবে রোমান্সের ভৌতিক এবং ভীতিউৎপাদক এই আজগুবি দিকটাকে মিষ্টিসিজ্‌মের অবিশোধিত প্রথম অবস্থা বলা যাইতে পারে, এই পর্য্যন্ত!

অলৌকিকতাটা হইয়াছে পরিণত বয়সের রোমান্স। যৌবনারম্ভের রোমান্সের মত ইহাও রঙীন; তবে একটা উদয়াকাশের বর্ণচ্ছটা, অপরটা অস্ত আকাশের বর্ণচ্ছটা; মাঝখানে মাধ্যন্দিন প্রকাশ্য দিবালোকের সরল শুভ্রতা, মোহমুক্ত কুজ্ঝটিকাহীন জগৎপ্রবাহের প্রত্যক্ষ বস্তুলীলা। কিন্তু এই তিনটিই একই জিনিষের বিভিন্ন প্রকাশ।

যৌবনস্বপ্নী মানব-হৃদয় দূরদেশের অপরিচিতা জগৎবধূর চুলের গন্ধ ও বালা-মলের রুণুঝুণু শুনিয়া রক্তাম্বর পরিয়া বরবেশে বাহির হইয়া পড়িল, তাহার কল্পনারাগ আকাশে আগুন ঢালিয়া দিল, তাহার উদ্দাম বাসনা জবায় অশোকে মঞ্জরিত হইল, আর তাহার মনের জাগ্রত কাকলি পক্ষিকুলের কলকণ্ঠে দিকে দিকে মুখরিত হইয়া উঠিল; আপনার স্বপ্ন-মোহের মণিমাণিক্য পরাইয়া সে সেই অপরিচিতাকে রাণীপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল, মন্দারের মালা ও নন্দনের পারিজাত দিয়া তাহার প্রসাধন করিল; তাহার পর এই আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্র, বাসনা-সাগরের এই মথিত ধনকে পাইবার পথে লক্ষ্যভেদ ও ধনুর্ভঙ্গ কিছুই বাদ রাখিল না, আর কল্পনার যত সব সম্ভব অসম্ভব বিপদের হাতে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়া দুর্দ্ধার প্রতিদ্বন্দ্বীদের কবল হইতে বীরত্বের সহিত তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইবার যে নিবিড় সুখ তাহাও সে চক্ষু মুদিয়া লাভ করিল। আর ওদিকে বধূ, সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার হইতে সোণার মুকুট পরিয়া যে রাজপুত্রটি আসিতেছে, তাহার অপেক্ষায় বসিয়া রহিল; আর সমস্ত উৎসব-ব্যাপারের কেন্দ্র, সমস্ত ডাকাডাকি—হাঁকাহাঁকি ও আয়োজন-প্রয়োজনের যে প্রাণ, রক্তচেলি ঢাকা যৌবনোদ্ভিন্ন সেই বক্ষপুট মুহুর্মুহু আশায় আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। বিবাহ-লগ্নের পূর্ব্বে যাত্রাপথের বরের ও স্ফুটযৌবনা বধূর এই যে পূর্ব্বরাগ, তাহা লইয়াই জগৎ-সাহিত্যের সমস্ত রোমান্সগুলি এমন রঞ্জিত রূপ ধারণ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তাহার পর বিবাহ হইল; স্বপ্নে মোহে ব্যাকুলতায়

বিবাহ-রজনী পার হইয়া গেল। বর-বধূর দাম্পত্য-জীবন এবং ক্রমে ঘরকন্না আরম্ভ হইল। হঠাৎ একদিন পরস্পর পরস্পরের দিকে যখন চাহিয়া দেখিল, হায়! কোথায় তখন সেই মন্দারের মালা, কোথায় সেই সোণার মুকুট, কোথায় বা রাজ-পুত্র আর রাজকন্যা! জীবনারম্ভের কল্পলোকী কল্পনারাগ জীবন-মধ্যাহ্নের তীব্র আলোকের ঘায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া কোন্ অদৃশ্যলোকে মিলাইয়া গেল! যাহা পড়িয়া রহিল, তাহা শুধু নিরেট বাস্তব, তাহা স্ত্রীর গর্জ্জনে আর শিশুর ক্রন্দনে মুখর, গহনা এবং পেটরূপ গহনের চিন্তায় পীড়িত, শোকে এবং ব্যাধিতে জর্জ্জর, সংসারের পাকচক্রে আলোড়িত এবং জীবনের নানা সমস্যায় জটিল। মানব-হৃদয়ের সঙ্গে সংসার-জীবনের সেই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ইতিহাস বক্ষে লইয়াই জগতে বস্তুপন্থী সাহিত্যের পত্তন হইয়াছে।

কিন্তু কল্পপন্থী (বা Romantic) সাহিত্যের দোষ যেমন মানব-সংসারের সহিত তাহার অপরিচয়, বস্তুপন্থী (বা Realistic) সাহিত্যের দোষ তেমনি মানব-সংসারের সহিত তাহার অতি-পরিচয়। বস্তুপন্থীরা কল্পপন্থার অবাস্তব কল্পনারাগকে সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ রূপে মুছিয়া ফেলিতে গিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে এমনি বস্তুতন্ত্র করিয়া তুলিলেন যে, সৌন্দর্য্য এবং কবিত্ব বলিতে তাহার মধ্যে কিছুই রহিল না। তাঁহাদের হাতে সাহিত্যে ক্রমে দারিদ্র্যের কঙ্কাল এবং পাপের বীভৎস ছবি এমনি উলঙ্গ হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল যে, একদল সাহিত্যিক এই বীভৎস বস্তুপন্থার প্রতি গোপন বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত হইয়া সাহিত্যে আবার কল্পনা এবং কবিত্ব-সৌন্দর্য্যের আবাদ আরম্ভ করিয়া দিলেন। মিষ্টিসিজ্‌ম্ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের এই কদর্য্য বস্তু-তন্ত্রতা হইতে দূরে সরিবার প্রয়াস বই কিছু আর নহে। এই প্রয়াসকেই আমি পরিণত বয়সের রোমান্স বা সাহিত্যের অলোকপন্থা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

এই যে বস্তু হইতে দূরে সরিবার প্রয়াস, বা বাস্তবাতিরিক্তা, তাহাই সমস্ত সৎসাহিত্যের প্রাণ। সাহিত্যের অতিরিক্ততাকে পাশ্চাত্য সমালোচকেরা প্রধানতঃ তিনটি কথায় প্রকাশ করিয়াছেন—Romanticism, Idealism ও Mysticism. আমরা যথাক্রমে এগুলিকে কল্পপন্থা, শ্রেয়ঃপন্থা ও অলোকপন্থা বলিয়া উল্লেখ করিতে চাহি।

এই বাস্তবাতিরিক্ততার অর্থ বস্তু মাত্রেরই প্রতি বিদ্রোহ সূচিত করে না। কোনো একটা উপযুক্ত বস্তুভিত্তিকে গ্রাহ্য করিয়া লইয়া তাহার উপর যে অতি-রিক্ততা ফলানো হয় তাহাই, অথবা বাস্তবানুগত বাস্তবাতি-রিক্ততাই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্বকালের সাহিত্যের প্রাণ। সেই জন্য Realism জিনিষটা সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-চেষ্টাতেই থাকিতে বাধ্য কিন্তু কোনো স্থানে তাহাকে প্রাধান্য দিলেই সাহিত্য কলার মূলে আঘাত করা হয়। বস্তুভিত্তিহীন নিছক কল্পপন্থা শ্রেয়ঃ-পন্থা কিম্বা অলোকপন্থা যেমন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের জিনিষ হইতে পারে না, সর্ব্বপ্রকার কবিত্ব ও সৌন্দর্য্যের অতিরিক্ততাবর্জ্জিত বাস্তবানুগত্যও তেমনি আবার পারে না। জাতিসংঘর্ষ ও রক্তমিশ্রণের অন্য নামই হইয়াছে সভ্যতা, খাঁটিত্বের নামান্তরই বর্ব্বরতা; সাহিত্য-রাজ্যের সাদাকালো অবাস্তব ও বাস্তবের মিলনের মধ্যেই প্রকৃত সাহিত্যরসের সন্ধান করিতে হয়। তাহারা পরস্পর পরস্পরের দ্বারা অনুবিদ্ধ না হইলে সাহিত্যে শুভফলের আশা করিতে যাওয়া বৃথা।

কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলে হয়ত আমাদের বক্তব্যটি স্পষ্ট হইবে।

নিছক কল্পপন্থার দৃষ্টান্ত দিতে গেলেই বাস্তব-বর্জ্জিত আর্থার সালিম্যানের কাহিনী, আরব্য উপ-ন্যাস ও কাঞ্চনমালা মধুমালার উপাখ্যান আমাদের মনে আসিবে। এগুলিই কথাসাহিত্যের আদিম যুগের পত্তন করিয়াছে। তাহার পর বহুদিন ধরিয়া কথাসাহিত্যে কল্পলোক ও বস্তুলোকের প্রেমলীলা চলিতে আরম্ভ করিল, কাদম্বরী কিম্বা বিলাতের এলিজাবেথীয় যুগের আখ্যায়িকাগুলিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম

ভাগে আসিয়া দূর হইতে-এই-প্রেমলীলার অবসান হইয়াছে। মঙ্ক লিউইস্ ও মিসেস্ র‍্যাড্‌ক্লিফেরা এই উভয়ের মধ্যে মিলন পাতাইয়াছেন,—কিন্তু তাহা সমাজ ও ধর্ম্মানুমোদিত হয় নাই। তাঁহাদের হাতে পড়িয়া বস্তু বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছে, এবং কল্পনার সোণালী রঙকে অতিমাত্রায় চড়াইয়া দিতে গিয়া তাহাকে দুর্য্যোগের বিভীষিকার মত কালো কুৎসিৎ করিয়া তোলা হইয়াছে। এই অবৈধ মিলনের ফলস্বরূপে আমরা যাহা পাইয়াছি তাহার মূল্য বড় বেশী নহে।

এই কল্পপন্থা ও বস্তুপন্থার প্রকৃত পরিণয় স্কট্, ডুমা, বঙ্কিম এবং অসামান্য শক্তি ও সৌন্দর্য্যের সাধক ভিক্টর হিউগোর রচনাবলীতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

সাহিত্যানুমোদিত কল্পনার সহিত পরিচয় জগতে বহুদিন হইতেই হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু কথাসাহিত্যে সাহিত্যানুমোদিত বস্তুর সহিত পরিচয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে Marivaux'র Marianneতে এবং Richardson ও Fieldingএর রচনার মধ্যেই প্রথম হয়। তাঁহাদের পূর্ব্বে Defoe চোর বাটপাড়ের চিত্রের মধ্যে সাহিত্যের প্রকৃত বস্তু আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। এই বস্তু আবিষ্কারের অথবা নভেল সৃষ্টির পরেই শুধু স্কট্, হিউগোর পক্ষে কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে প্রকৃত মিলন পাতানো সম্ভব হইয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাহিত্যের প্রকৃত বস্তু ত আবিষ্কৃত হইল—ইহার ধারা কোন্ দিকে গড়াইয়াছে সে ইতিহাসের উপরেও একবার চোখ বুলাইয়া লওয়া যাক্।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাস্তবের যথাযথ চিত্রণ একটা আর্ট বলিয়া গণ্য হইল। বস্তুতঃ তাহার মধ্যে উপভোগের জিনিষ যথেষ্ট আছে, সন্দেহ নাই। অষ্টেন, গ্যাস্কেল্ এবং শেষ বয়সের রচনায় 'George Sand'কে আমরা খাঁটি বাস্তবচিত্রণের আর্টের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ইহাঁরা তিন জনই রমণী। মেয়েদের কৃতিত্ব এ ক্ষেত্রে অসাধারণ, কেন হইল তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। নয়োয়ের সাহিত্যের জোনাস্ লাই ও আমাদের "স্বর্ণলতা"কারকেও এই শ্রেণীতেই ফেলা যায়। ইহাঁদের রচনায় মানস সৃষ্টির সৌন্দর্য্য না থাক্, অনেক উপভোগের জিনিষ আছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

কিন্তু বস্তুপন্থী সাহিত্য এই স্থানেই আসিয়া থামিয়া যায় নাই। কল্প-পন্থার চরম এবং বিকারের অবস্থা আমরা 'মঙ্ক লিউইসে' দেখিয়াছি; কাব্যে বস্তুপন্থার চরম অবস্থা লিউইসেরই সমসাময়িক Crabbeএ পরিস্ফুট। গদ্য কথা সাহিত্যে এবং নাট্য সাহিত্যে এই বস্তুপন্থা ধীরে ধীরে Blicher এবং Ibsenএ, Turgenieff, Tolstoi, Gorky এবং Shawএ—ও সর্ব্বোপরি Lolaয় আসিয়া চরম অবস্থায় ঠেকিয়াছে। বস্তুপন্থার চরম ক্ষমতা যেমন এই সব লেখকের মধ্যে দেখা দিয়াছে, ইহার বিকারটাও তেমনি যে তাঁহাদের মধ্যে অল্পবিস্তর ফুটিয়া উঠে নাই এমন কথা বলিতে পারি না। শক্তি, সামাজিক সমস্যার সমাধান এবং লোকশিক্ষা ইত্যাদির দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে এই সব লেখকদের কৃতিত্ব অসাধারণ, এবং সেই লইয়াই উচ্চস্বরে গলাবাজী করিয়া তাঁহাদের পক্ষে ওকালতী করাটাও আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, কি সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালের সাহিত্য-কলা কবিত্ব ও সৌন্দর্য্যের তরফ হইতে বলিতে গেলে ইহাঁদের ভবিষ্যৎ কতকটা অন্ধকার বলিয়াই অনুমিত হইবে। ইহাঁরা দূরদেশবাসী হইলেও আমরা ইহাঁদের অতি নিকটেই অবস্থিতি করিতেছি বলিতে পারা যায়। সেইজন্য, বিশেষতঃ সাময়িক পাশ্চাত্য সমালোচনার প্রভাবে, আমাদের মন এখনও ইহাঁদের সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণায় উপস্থিত হইতে পারে না বলিয়াই আমার মনে হয়।

এই বস্তু-পন্থার চরমতা হইতে হৃদয়-মনকে অব্যাহত রাখিবার জন্য, উনবিংশ শতাব্দীর এই জঘন্য বস্তুলীলা হইতে সাহিত্যাদর্শকে উচ্চভূমিতে দাঁড় করাইবার জন্য কথা সাহিত্যে জর্জ্জ এলিয়টের চেষ্টা বহু পরিমাণে সফল হইয়াছে।

এই মন্তব্য অনেকের নিকট একটু অদ্ভুত ঠেকিতে পারে, কারণ জর্জ্জ এলিয়টও তাঁহার কথাগ্রন্থগুলির মধ্যে সংসারের নির্জ্জলা বস্তুব্যাপার লইয়াই কারবার চালাইয়াছেন। স্কট, ডুমা, হিউগো প্রভৃতি অতিরিক্ততা-পন্থীদের কল্পনারাগ জর্জ্জ এলিয়টের সাহিত্য-চেষ্টার কোনো দিকপ্রান্তকেই রাঙিয়া দেয় নাই সত্য; কিন্তু তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব বিশ্লেষণানুগামী সৃষ্টি প্রতিভার বলে ক্ষুদ্র বস্তুচিত্রের অন্তরদেশে যে মনোহর মনো-লোকের সৃজন করিয়াছেন, সেখানে আসিয়া আমাদের বস্তুপীড়িত চিত্ত হাঁফ: ছাড়িয়া বাঁচে। তুচ্ছ বস্তুজীবনের ঘটনা নিচয়ের মধ্যেই তিনি যে মানসতার রস মাখিয়া দিতে পারিয়াছেন এবং দৈনন্দিন জীবনের দীনতার ভিতর দিয়াই তাঁহার শিল্পরীতি যে আদর্শ চরিত্রাঙ্কনের উন্মুখতা পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছে তাহাতেই তাঁহার কথাগ্রন্থগুলি অতিরিক্ততা এবং সৌন্দর্য্যের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু এই অতিরিক্ততা কল্পপন্থার অতিরিক্ততা নহে, শ্রেয়ঃপন্থার অতিরিক্ততা। এ La Esmeralda নহে, এ Dinah Morris কিম্বা Romola। স্কট্, হিউগো যেমন কল্পপন্থা ও বস্তু-পন্থা মিশ্রণের শুভফল, জর্জ্জ এলিয়ট তেমনই বস্তু ও শ্রেয়ঃ-পন্থা মিশ্রণের শুভফল। মেরিডিথ, আনাতোল ফ্রাঁস এবং আমাদের রবীন্দ্রনাথ এই বস্তু-সম্পর্কিত শ্রেয়ঃপন্থারই পথিক। হিউগোতে যেমন বস্তু ও কল্পপন্থার মিলনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল প্রকাশ পাইয়াছে, সব দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের গল্প ও উপন্যাসে তেমনি বস্তু ও শ্রেয়ঃপন্থার মিলনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল প্রকাশ পাইয়াছে।

এই শ্রেয়ঃপন্থার বিকারের দৃষ্টান্ত দিতে হইলে আমাদের 'জর্জ্জ সাঁ'র প্রথম বয়সের রচনাগুলির কথা মনে হয়—তিনি সেগুলিতে পূরাদরের Idealist, একেবারে বস্তুসম্পর্ক বিবর্জ্জিত!

সাহিত্যে এই শান্ত সংযত শ্রেয়ঃপন্থার স্থির নিষ্ঠা ইউরোপে জর্জ্জ এলিয়ট, ব্রাউনিং প্রভৃতি দুইচারিজনের মধ্যে ছাড়া তেমন ভাবে প্রকাশ পায় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামক কবিগুরু গইটের মধ্যেও এই শ্রেয়ঃপন্থার ধ্রুবতার সঙ্গে সঙ্গে অলোক-পন্থাসুলভ অতিরিক্ততা ফলানোর চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু তাঁহার কাব্যের এই দ্বিতীয় প্রকারের অতিরিক্ততা ভূতালৌকিকতাসম্ভূত, পরন্তু বর্ত্তমান য়ুরোপের কাব্য ও নাট্যসাহিত্যের অলৌকিকতা অধ্যাত্ম ও ভূতালৌকিকতার মাঝামাঝি একটা ব্যাপার, যাহা অপরূপ মেটারলিঙ্কী রূপক-নৃত্যে রসিক জনের আসর জমাইয়া তুলিয়াছে; আর ভূতালৌকিকতা কথাসাহিত্যেই নিজ অদ্ভুত অভাবনীয় রীতি খুঁজিয়া লইয়াছে।

এই অলোক-পন্থার মধ্যেই আমরা আধুনিক সাহিত্যের দ্বিতীয় প্রকারের অতিরিক্ততার সন্ধান পাই। তবে এই অলোকপন্থী অতিরিক্ততা যে শ্রেয়ঃপন্থী অতিরিক্ততারই উত্তরাধিকারী এবং পথানুসারী সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এ যেন শ্রেয়ঃপ্রন্থার শুভ্রতাকেই ভাঙাইয়া নানা টুক্‌রা রঙে পরিণত করিয়া তোলা হইয়াছে, এ যেন তাহারই শান্ত সংযত দৃঢ় সুসমঞ্জস ভাবকে নিবিড় ও একমুখী, চঞ্চল ও মাতাল করিয়া তুলিয়া কোন্ অজ্ঞাত রহস্য-যবনিকা উন্মোচনের দিকে প্রেরণ করা হইয়াছে, এ যেন ধ্যানী পরেশের ব্রাহ্মী শান্তিকে আনিয়া ঠাকুরদাদা ধনঞ্জয়ের নৃত্যদোদুল বৈষ্ণবী আনন্দে নাচাইয়া তোলা হইয়াছে!

মর্ত্ত্যজীবনের বহুবিচিত্র অবগুণ্ঠনটি ("painted veil") তুলিয়া ধরিবার চেষ্টার মধ্যেই অলোকপন্থার রহস্য-রসটি ফুটিয়া উঠে। যাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা খুব নিবিড় এবং সূচিতীক্ষ্ণ, তাঁহারা অবগুণ্ঠন তুলিয়া প্রথমেই ভূত-পরীর লীলাখেলা দেখিয়াই আটকাইয়া যান না; তাঁহারা সেই অলোক লোকের চরণপ্রান্ত পর্য্যন্ত চিত্তকে রহস্য প্রয়াণে পাঠাইয়া তবে বিরত হন। তাঁহারা প্রধানতঃ কবি। কথা-সাহিত্যিকেরা ততদূর যান না, যাইবার হয়ত প্রয়োজন বোধ করেন না; রহস্যলোকের এই পার্থিব নিকটতম প্রান্তটিই তাঁহাদের বিচরণভূমি; আলো আঁধারের বিচিত্র মিশ্রণের ফলস্বরূপ সেখানকার

যে বিচিত্র রকমের রঙ, তাহারই মধ্যে তুলি ডুবাইয়া ইঁহারা মর্ত্ত্যবাসীদের জন্য অলৌকিকতার আলেখ্য অঙ্কিত করেন।

ডিকেন্স্ মোটের উপর বস্তু-ঘেঁষা শ্রেয়ঃপন্থার পথিক হইলেও তাঁহার মধ্যেও অলোকপন্থার স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায়। Agnes, Esther, Jarndyce প্রভৃতি বহু চরিত্রে তাঁহার বস্তু-সম্পর্কিত শ্রেয়ঃপন্থারই পরিচয় পাই সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রায় সকল চরিত্রের মধ্যেই এমনই একটা অন্য ধরণের অতিরিক্ততা আছে যে সে গুলিতে মানব জীবনেরই অন্তর্গত অথচ প্রান্তবর্ত্তী একটা রহস্যলোকের আভাস ফুটিয়া উঠে। তাঁহার নিম্নতম শ্রেণীর মানুষগুলির মধ্যেও পাপের বীভৎসতা এবং চিরদিনকার অভ্যাসের কদর্য্যতা ঠেলিয়া ক্ষণিক বিদ্যুৎ-বিভার মত যে মহত্ত্বশিখা ফুটিয়া ওঠে তাহাও একটু অলোকপন্থী রঙ মাখিয়াই আমাদের নয়ন মনে আসিয়া আলোকপাত করে। তাহা ছাড়া প্রকাশ্য ভাবেও তাঁহার কথাগ্রন্থগুলিতে অলোকপন্থীরসের ভিয়ান দিতে তিনি ছাড়েন নাই। "Great Expectations," "A Tale of Two Cities," "Oliver Twist" প্রভৃতিতে এই রস আছে, এবং সর্ব্বোপরি আছে তাঁহার অসমাপ্ত "Edwin Drood"-এ।

ডিকেন্সে যাহা অপরিস্ফুট, তাঁহারই প্রায় সমসাময়িক ফরাসী গ্রন্থকার বালজাকে আসিয়া তাহা অনেকটা পরিস্ফুট হইয়া আসিয়াছে। এই দুইটি বিরাট কথা-সাহিত্যিকের মধ্যে নানা বিষয়ে বিভিন্নতা থাকিলেও নিম্নশ্রেণী মানবের বহুবিচিত্র চরিত্রাঙ্কনে একটা অবিশোধিত জড়তা-প্রিয়তায় এবং এই অলোকরসে যে তাঁহাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা এবং অন্তরঙ্গতা আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। বীভৎস এবং নিম্নশ্রেণীর মানব চিত্রণস্পৃহার সঙ্গে তাহার উল্টটানে একটা অদ্ভুত রকমের অলোক-রহস্য-পন্থিতার মিশ্রণটাই বালজাকের মনোরীতি এবং শিল্পরীতির বিশেষত্ব। কদর্য্য বস্তুবেষ্টনের মধ্য হইতে দূরে সরিবার প্রয়াসে তিনি যে অলোকপন্থার পথিক হইয়াছেন তাহাকেও কতটা কদর্য্য বলিলে অন্যায় হয় না। বালজাক্, অলোকী সুইডেনবার্গের তালকাটা তার ছেঁড়া একটি রুগ্ন মন্ত্রশিষ্য বই কিছু নহেন! 'সম্মোহন' 'সূক্ষ্মদৃষ্টি', 'ফিজিয়োগমি' ইত্যাদি ব্যাপার তাঁহার মন ও শিল্পকলাকে ভূতের মতন পাইয়া বসিয়াছিল; সেগুলির হাত হইতে তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা বৃথাই ছিল,—আর উদ্ধার পাইলেও বাল্‌জাক্ বাল্‌জাক থাকিতেন না। এই উচ্ছৃঙ্খল তারছেঁড়া অলোক-পন্থিতাটা যে জায়গায় কতকটা সংযত হইয়া আসিয়াছে সেখানেই তাহা সুন্দরের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে—যেমন তাঁহার "Passion in the Desert", "Wild Ass' Skin", "The Search for the Absolute" প্রভৃতি গল্পে।

যে অলোকপন্থা বাল্‌জাকের সাহিত্যরীতির একটি মাত্র অঙ্গ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, আমেরিকার হথর্ণ এবং 'পোয়ে'তে তাহা সর্ব্বাঙ্গীন হইয়াই ফুটিয়াছে। তবে বাল্‌জাকে যাহা একটু স্থূল এবং অবিশোধিত, হথর্ণ ও পোয়েতে তাহাই সূক্ষ্ম সুকুমার এবং মনস্তত্ত্বের মিশ্রণে অভিনব শিল্পকলায় মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। পোয়ের রহস্য গল্পগুলি, হথর্ণের "The Scarlet Letter", "The Blithedale Romance" প্রভৃতি কথাগ্রন্থ এবং "Fancy's Show-Box","The Minister's Black Veil" প্রভৃতি আলেখ্যকেই আমরা অলোকপন্থী কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। আর্ভিঙের "রিপ্ ভেন্ উইন্‌কল্" ও "স্লিপী হলো কাহিনী" এই বিভাগেরই অন্তর্গত শ্রেষ্ঠ রচনা। তিনিও আমেরিকা-বাসী। বিজ্ঞান জাগ্রত আমেরিকা কথাসাহিত্যে কি করিয়া এই ঘুমের দেশের কাহিনীতে এমন আশ্চর্য্য কৃতিত্ব লাভ করিল তাহা আমার নিকট দুর্ভেদ্য রহস্যের মত ঠেকে। আমেরিকার আদিম অসভ্য জাতিগণের জীবনযাত্রা উপনিবেশিক-বর্গের কাছে অপরিচিত সুতরাং রহস্যময় ছিল। সেই রহস্যের সহিত প্রথম পরিচয়ই কি তাঁহাদের এই অলোকপন্থী কল্পনার জন্মদান করিয়াছে? না, জাতীয় অতীতের 'ক্লাসিক' শিকড় ও কাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়াতেই বাত্যাতাড়িত

পল্লব পুষ্পের এই জীবন-প্রান্তবর্ত্তী উচ্ছৃঙ্খল বর্ণলীলা এমন ক্ষণিক সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে ? কেহ কেহ আবার বলিবেন—কর্ম্ম জীবনের শুভ্র দিবালোকের উল্টাটানেই সেখানে গোধূলির আলো ছায়া সাহিত্যের আফিমের গোলাপী নেশায় এমন রঙীন মস্‌গুল হইয়া উঠিয়াছে। আমার মনে হয় এই তিনের মধ্যেই এই রহস্যের চাবিটির সন্ধান মিলিবে। কিন্তু বিশেষজ্ঞের মোটা মোটা অঙ্কপাত না হওয়া পর্য্যন্ত কল্পনার আব-ছায়ায় আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে এই ব্যাপারের রহস্যময়তা অটুট থাকিয়াই যাইবে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বয়স বেশী হয় নাই, কিন্তু ইতিমধ্যেই তাহাতে জগৎসাহিত্যের বিভিন্ন যুগলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। বাংলার মাটিতে এবং বাংলার জলে সব জিনিষই শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। সাহিত্যের চারাটিও অল্প বয়সেই ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বঙ্কিম যেন বাংলা সাহিত্যকে হঠাৎ শৈশব হইতে একেবারে পূর্ণযৌবনে উন্নীত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। একা রবীন্দ্রনাথের জীবনে বাংলা সাহিত্য যৌবনের উদ্দামতা ও বিচিত্র বর্ণচ্ছটা হইতে যাত্রা করিয়া প্রৌঢ়ের সরল শুভ্রতা এবং বিরলবর্ণ বিরতির ভিতর দিয়া গিয়া সান্ধ্য আকাশের স্বর্ণমেঘের আড়াল হইতে অজানার ডাক শুনিতে পাইয়াছে। একা রবীন্দ্রনাথ সমস্ত উনবিংশ শতাব্দীর এবং বিংশ শতাব্দীর এই পনেরো বৎসরের জগৎসাহিত্যের বিচিত্র ধারাকে বাংলা সাহিত্যের ধারার সঙ্গে আনিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন, এবং বাংলার ক্ষেত্রকে বিশ্বসাহিত্যের ভক্তজনের নিকট এক পবিত্র সঙ্গমতীর্থে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। গত পচিশ বৎসরে শেলির বায়বীয় আকাশাভিযান ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের শান্ত সরল অন্তর্মুখীনতা, কীট্‌সের প্লস-চল-চল বর্ণ-বিলাস ও গাটে, ব্রার্ডনিঙের মানসতা, শীলরের দৃঢ়নিষ্ঠ বীর্য্যগাথা ও হিউগোর শিশুলীলা, জর্জ্জ এলিয়টের বিশ্লেষণী প্রতিভা ও গোতিয়ে, ফ্লোবেয়ারের সূক্ষ্ম শিল্পকলা, ইব্‌সেনের ব্যঙ্গকৌশল ও টলষ্টয়ের নীতি-নিষ্ঠা, পোয়ে, হথর্নের অপূর্ব্ব রহস্যময়তা ও মেটারলিঙ্কের অলৌকিক রূপক তাল, পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতের ছায়াময় অনিশ্চয়তা ও প্রাচ্য সুফী বৈষ্ণবের স্থির প্রত্যয়, উপনিষদ ঋষির শান্ত সংযত ব্রাহ্মী ধ্যান ও ভাগবতপন্থীর উচ্ছ্বসিত বৈষ্ণবী আনন্দনৃত্য তিনি বাংলা সাহিত্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি কাব্যে কল্পপন্থী এবং শেষে অধ্যাত্মালোক-পন্থী ; কথাসাহিত্যে বস্তুপন্থী, শ্রেয়ঃপন্থী এবং ভূতালোকপন্থী। কাব্যে তিনি বস্তুসম্পর্ক-বিহীনতার অপবাদে শ্রেণীবিশেষের নিকট হইতে গালি খাইয়া থাকেন, আবার কথাসাহিত্যে অতি-বাস্তবতার অপবাদেও তিনি অনেকের নিকট রেহাই পাইতেছেন না। নানা বিরুদ্ধতার সমবায়ে, নানা বৈচিত্র্যের মিশ্রণে রবীন্দ্রসাহিত্য জগৎসাহিত্যে অপূর্ব্ব এবং অতুল্য।

কথা সাহিত্যের কল্পলোক হইতে বঙ্কিম বস্তুলোকের দিকে নামিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার অসামান্য প্রতিভার বলে বস্তুলোকের উপরও অধিকার বিস্তার করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু মোটের উপর তাঁহাকে কল্পপন্থীই বলিতে হইবে। বঙ্কিমের পূর্ব্ববর্ত্তী 'আলালী' বস্তুকে প্রকৃত সাহিত্য-বস্তু বলা যায় না। "স্বর্ণলতা"র মত দুই একটি বিরল বস্তুপন্থী প্রচেষ্টাকে ছাড়িয়া দিলে দেখিতে পাই যে রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে প্রথম বাঙালী খাঁটি বাস্তব জীবনের চিত্র, বাংলার পল্লীর নৈসর্গিক এবং মানবীয় ছবিকে অমর তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন।

কিন্তু তিনি নিছক বস্তুপন্থী নহেন ; তাঁহার বাস্তবানুগত্য যে শ্রেয়ঃপন্থাভিসারী তাহা পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা কথাসাহিত্যে বস্তুপন্থা ও শ্রেয়ঃ-পন্থার প্রধান পথিক, অলোকপন্থায়ও তিনিই প্রথম চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই নিদর্শন আমরা তাঁহার "ক্ষুধিত পাষাণ", "কঙ্কাল" প্রভৃতি গল্পগুলিতে পাই ; এবং এই গল্পগুলিরই সমালোচনায় ভূমিকাস্বরূপ আমি বর্ত্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছি।

কল্পপন্থা, শ্রেয়ঃপন্থা ও অলোকপন্থা এই তিন রকমের

অতিরিক্ততা ছাড়া বিগ্রহপন্থা (বা Symbolism) নামে সাহিত্যের যে চতুর্থ রকমের অতিরিক্ততা আছে, আধুনিক কালে কাব্য ও নাট্যসাহিত্যেই তাহা প্রধানতঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে; কথাসাহিত্যে এই বিগ্রহ-পন্থা অসংলগ্ন লঘুভাবে ছাড়া আগাগোড়া পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ রাখিয়া কোথাও অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া জানি না; আর যেখানে হইয়াছে, সেখানেও কথাসাহিত্যের রক্তমাংস রূপকে রূপান্তরিত হইয়া যাওয়ায় সে আপন বিশিষ্টতা হারাইয়া বসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বর্ত্তমান সবুজপত্রী প্রচেষ্টায় এই বিগ্রহপন্থায় কলম চালাইতেছেন; কিন্তু মাটির উপর কথাসাহিত্যিক রক্তমাংসের স্থূল পাদক্ষেপকে তিনি শূন্যাবলম্বী ছায়ানৃত্যে পর্য্যবসিত করিয়া তুলেন নাই। তিনি শরীরী জীবই আঁকিতে-ছেন, কিন্তু শারীর স্থূলত্বের কূল ছাপাইয়া যে অরূপ রূপের আভা ফুটিয়া উঠে সেই অস্পষ্ট অথচ সত্য অর্থদ্যুতিকেও তিনি জড়ের অঙ্গে জড়াইয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যিক বিগ্রহপন্থা তাঁহার সৃষ্ট ভূলোকচারী দেহধারী জীবের চতুর্দ্দিকে এক অলোকী জ্যোতির্গোলকের মতই প্রতীয়মান হই-তেছে। সাধারণ কথাসাহিত্যের দাবী সম্পূর্ণ চুকাইয়া দিয়াও তিনি তারো বেশী কিছু দিতেছেন—এ যেন তাঁহারই অমর লেখনীর সঞ্চিত শক্তি স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের বিচ্ছুরিত আভা, দেহকূল ছাপা জ্যোতির্ধারা! পাঠক সম্প্রদায় দেহকেই দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাদের পক্ষে এ নেহাৎই উপরি পাওনা। কথাসাহিত্যের প্রকৃত ক্ষেত্র এই যে হৃদয়ের লীলাখেলা, তাহাকে বিগ্রহপন্থার মানস-তার জ্যোতির্ম্মণ্ডলে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিবার এই যে মনোরীতি, তাহা রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নিজস্ব ও নূতন বলিয়াই আমার মনে হয়।

বঙ্কিম ও রবি এই দুইজনকেই মাত্র আমরা জগতের কথাসাহিত্যের আসরে প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইতে পারি। সঞ্জীবচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, তারকনাথ, শ্রীশচন্দ্র ও শিবনাথ শাস্ত্রী কথাসাহিত্যের সমতল গড়িয়া তুলিয়াছেন—সাহিত্যের গতির জন্য জনমণ্ডলীর পথ রচনা করিবার পক্ষে ইঁহাদের সাহায্য প্রয়োজনীয়; কিন্তু সেই সম-তল পথে মাথা উঁচু করিয়া গিরিচূড়ার শোভা ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন মাত্র এই দুইটি!

রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষ ভাবে দীক্ষা লইয়া কয়েকজন কথাসাহিত্যিক বাংলার আধুনিক সাহিত্যে দেখা দিয়াছেন। তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্র-মোহন "ধ্রুবতারা"র ধ্রুব জ্যোতিঃপন্থায় বাঙালীকে পথ দেখাইয়া নিজেই হয়ত এমন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন; নিজের জীবনের অথবা অভিজ্ঞতার উপকরণ দিয়া প্রত্যেকেই অন্ততঃ একটি উৎকৃষ্ট নভেল রচনা করিতে পারেন, ওলিভার ওয়েণ্ডেল হোম্‌সের সেই বাণীরই হয়ত তিনি সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। প্রভাতকুমারের রচনায় হাস্য ও করুণ দুইটি বোনের মত অভিনব বাস্তব রসস্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছে। তিনি বহুদিন হাসির ওস্তাদ বলিয়াই খ্যাত ছিলেন, করুণরসেরও যে ওস্তাদ তিনি ইচ্ছা করিলেই হইতে পারেন, সেই পরিচয় তাঁহার অমর "বাল্যবন্ধু" বহন করিয়া আনিয়াছে। বাংলা কথা-সাহিত্যের বস্তুপন্থায়ই তাঁহার ব্যক্তিত্ব খুলিয়াছে—সেই দিকে তিনি একটা বিশিষ্টতা দেখাইতে পারিতেছেন। সমাজের কালো দিকটাকে হাসির আলোকে পাঠকের সাম্‌নে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ। এদিকে রবীন্দ্রসাহিত্যের যে অভাবটুকু রহিয়াছে, প্রভাতকুমারের রচনায় তাহার অনুপূরণ হইবে ততটুকু দাবী তাঁহার উপর আমরা রাখি। শ্রীযুক্ত শরৎ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মহিলা-ঔপন্যাসিকদ্বয় শ্রীমতী নিরুপমা ও অনুরূপা, রবীন্দ্রীয় কথাসাহিত্যের হৃদয় বিশ্লেষণের পথে মাধুর্য্যের ছবি ফুটাইয়া তুলিতেছেন; ইঁহাদের মধ্যে শরৎচন্দ্র তাঁহার সংকীর্ণ সীমার মধ্যে করুণ রসের নূতন সম্বন্ধাবস্থান (Situation) সৃষ্টি করিয়া আশ্চর্য্য শক্তির লীলা দেখাইতেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমারের পর ছোট গল্প রচনায় শরৎচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ মজুম-দার, চারুচন্দ্র ও মণিলাল এই কয়জনই যাহা কিছু বিশিষ্টতা দেখাইতে পারিতেছেন। তাহার মধ্যে সুরেন্দ্র-নাথ আপন রচনা পদ্ধতির বিকারের দিকেই অগ্রসর

হইতেছেন বলিয়া মনে হয়। চারুচন্দ্র ও মণিলাল ছোট গল্পের অলোকপন্থী কিম্বা বিগ্রহপন্থী কল্পনাঙ্গের সাধনায় কিছু কিছু সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন; সেদিকে তাঁহাদের বিশিষ্টতা আছে; কিন্তু তাঁহাদের শক্তি তরল, এ পর্য্যন্ত কোথাও তাহা হৃদয়লোক অথবা মনোলোক মন্থন করিবার মতন স্থায়ীত্বের প্রগাঢ়তা লাভ করে নাই।

কথাসাহিত্যের বিস্তর প্রচলন সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত এ শাখাটিও যে অপুষ্ট রহিয়াছে সে কথা বলাই বাহুল্য। কল্পপন্থায় বঙ্কিম ছাড়া তেমন ভাবে উল্লেখযোগ্য আর কেহ নাই বলিলেও চলে। বাস্তবানুগত শ্রেয়ঃপন্থায়ও রবীন্দ্রের সমকক্ষ হইবার উপযুক্ত কোনও জ্যোতিষ্ক বাংলার সাহিত্যগগন-প্রান্তে এ পর্য্যন্ত দেখা দিয়াছে বলিয়া জানি না। কথাসাহিত্যের নিছক বস্তুপন্থায় অকুণ্ঠিত চিত্তে বাংলার সর্ব্ববিধ সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হইতে পারেন, বাংলার সমাজ জীবনের সমস্ত লুকানো পাপ ও অন্যায়ের বীজকে নির্ভীক ভাবে লোকচক্ষুর গোচর করিতে পারেন, বাংলা সাহিত্যে সহচর ও শিষ্যগণসহ সেই শক্তিশালী সাহসী বীরের এখনও অপেক্ষা রহিয়াছে। হয়ত সার্ব্বভৌমিক সাহিত্যকলার দিক হইতে তাঁহাদের মধ্যে নানা ত্রুটি পরিলক্ষিত হইবে—কিন্তু আমরা তাঁহাদের চাই, এই জালজঞ্জালের মধ্যে তাঁহাদের নীতির আগুনকে আমরা চাই, এই কুসংস্কারের রঙীন বন্ধনের মধ্যে তাঁহাদের ব্যঙ্গশক্তির শাণিত ক্ষুরধারকে আমরা চাই। তারপর অলোকপন্থায়ও রবীন্দ্রনাথের স্বল্পপরিসর কয়েকটি রচনা ছাড়া বিশেষ শক্তির পরিচয় তেমন কোনও রচনা বাংলা সাহিত্যে নাই বলিলেই চলে।

বাংলা সাহিত্যে আশ্চর্য্য সত্বরতার সহিত জগৎ-সাহিত্যের সমস্ত উপকরণ আমদানী হইয়াছে। এখানে আছে সব, কিন্তু কিছুই তেমন পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে নাই। বাংলার বালিকাবধূগণের মত সাহিত্যের শাখাগুলি প্রকৃত যৌবনে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই অবিশ্রান্ত ফলিতে আরম্ভ করিয়া, এখানে অচিরেই অকাল বার্দ্ধক্যের বিকারে (বা decadence এ) আসিয়া উপনীত হয়। এখানে বঙ্কিমী কিম্বা রবীন্দ্রীয় লীলা না ফুরাইতেই নানা জনের মধ্যে তাঁহাদের শক্তির বিকার পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কল্পলেখা এখানে পলক না ফেলিতেই কতকগুলি বালসুলভ রঙীন আলিম্পনের মধ্যে তাহার লীলা অবসান করে, সুদৃঢ় মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ চক্ষের নিমেষে স্বীয় মানসতার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া প্যানপেনে হৃদয় বিশ্লেষণের একঘেয়ে জলীয়তায় পরিণত হয়; এখানে প্রগাঢ় ভাব-তন্ময়তা, রুগ্ন ভাবাতিশয্যের মধ্যে অপমৃত্যু লাভ করিতে বেশী সময় লয় না; আর অলোক ও বিগ্রহ-পন্থা এখানে দেখিতে দেখিতে সত্যভিত্তিহীন ছায়াবাজীতে পরিণত হইয়া যায়। আমরা এমনই এক যুগে জন্মিয়াছি যখন মানুষ জন্মিয়াই জন্ম দিতে আরম্ভ করে; কথা ফুটিতেই কবি ও দার্শনিক হইয়া অন্যের কথা ফুটাইতে চেষ্টা করে; যখন অতি-কর্ম্ম দেখিতে দেখিতে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া নিশ্চল হইয়া বসে, আর অস্বাভাবিক দ্রুততা নিমেষে শাস্ত্রযুক্তির তর্কজালে আটকাইয়া যায়; যখন শৈশবের লঘু চাপল্য এবং যৌবনের উদ্দামতা তাড়াতাড়ি শেষ হইয়া যায় এবং চিরন্তন বার্দ্ধক্যের ও মৃত্যুর গুরু গাম্ভীর্য্য আসিয়া কাঁধে চাপিয়া বসে। বাঙালীর জীবনে যেমন, বাঙালীর সাহিত্যেও তেমনি এই ইঁচড়ে পাকামীর লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালীর মনের মত বাঙালীর সাহিত্য ফলটিও কৃত্রিমতার তা' লাগিয়া বাহিরে দিব্য রাঙিয়া উঠিয়া বিশ্বজনের প্রশংসাবাণী আদায় করিয়া লইয়াছে, কিন্তু তাহার ভিতরের বীচি ও শাঁস অপুষ্টই রহিয়া গিয়াছে।

কিন্তু ইহাতে নিরাশ হইবার কিছুই নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংঘর্ষজনিত কতকগুলি অস্বাভাবিক সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কারণ মিলিয়া বাঙালী-জীবনের এই অস্বাস্থ্যকর মেদবৃদ্ধি জন্মাইয়াছে। এই কারণগুলি তিরোহিত হইয়া গেলে বাঙালী ও বাংলা-সাহিত্য আবার স্বভাবে ফিরিয়া আসিবে। বাঙালী বহুদিন ঘুমাইয়াছে, এখন ঘুম হইতে জাগিয়া বিশ্বসভ্যতা এবং বিশ্বসাহিত্যের সমান তালে চলিবার জন্য তাহাকে বহু

পথ নিমেষের মধ্যে দৌড়িয়া আসিতে হইয়াছে ;— এই অতি দ্রুততা অস্বাভাবিক হইতে পারে, কিন্তু মৃত্যুপথাভিসারী নহে তাহা নিশ্চিত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে অল্পকালের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি লেখকের স্বল্পপরিসর রচনায় জগৎসাহিত্যের দেড়শত বৎসরের ভাবধারা ও শিল্পরীতিকে আয়ত্ত করিয়া লইতে হইয়াছে। এই অত্যদ্ভুত চেষ্টার ইতিহাস-পৃষ্ঠা বহু চুটকির চটুলতায় ও সফরীর নৃত্যে চঞ্চল হইতে পারে, কিন্তু যে দুই-চারিজন অদ্ভুত কর্ম্মার কীর্ত্তি কাহিনীতে তাহা অলঙ্কৃত, তাঁহাদের নাম বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং বিশ্ববাসীর নিকট হইতে চিরকাল বিস্ময় মিশ্রিত সম্ভ্রমের দাবী করিতে পারিবে, সে সম্বন্ধে আমাদের কোনো সন্দেহ নাই।

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

পৃথিবীর পুরাবৃত্ত।

ভূ-পৃষ্ঠের বিবরণ

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ভূপৃষ্ঠের উৎপত্তি।

পূর্ব্ববর্ত্তী খণ্ডে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে পৃথিবী শীতল উল্কা পিণ্ডের সমষ্টি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

এই সকল উল্কাপিণ্ড যতই পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ততই তাহাদের পরস্পরের সংঘাতের ফলে পৃথিবীতে তাপ উৎপন্ন হইতে লাগিল। তাহার পর যখন তাহারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়া এক হইয়া গেল, তখন পৃথিবীর আকার-গত সঙ্কোচ এই তাপের পরিমাণকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে লাগিল।

কোন বস্তুর শরীরগত আকুঞ্চনের ফলে যে তাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলী সকলেই এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যদি কোন বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তি (Energy) কোন কারণে ব্যয়িত হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই ব্যয়িত শক্তি রূপান্তরে প্রকাশ পায়। উদাহরণ স্বরূপে দেখান যাইতে পারে যে যদি কোন বস্তুকে উচ্চস্থানে রাখিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে উচ্চাবস্থানের জন্য তাহার মধ্যে এক প্রকারের শক্তি সঞ্চিত হইয়া থাকে। উচ্চস্থান হইতে পতিত হইলে তাহার সেই শক্তি ব্যয়িত হইয়া যায়, এবং এই ব্যয়িত শক্তি রূপান্তরে তাপ হইয়া প্রকাশ যায়।

কোন বস্তুর শরীরগত আকুঞ্চনের অর্থ, তাহার অন্তর্গত বস্তু-কণিকাসমূহের কেন্দ্রাভিমুখে পতন ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং এই পতনের ফলে তাপের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী।

প্রসিদ্ধ জার্ম্মান পণ্ডিত হেল্‌মহোল্‌ৎজের (Helmholtz) মতে সূর্য্যতাপের অক্ষুণ্ণতার মূলেও সূর্য্যের এই শরীরগত আকুঞ্চন। বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর মতে সূর্য্যের মত প্রকাণ্ড একটি পাথুরিয়া কয়লার গোলককে যদি অগ্নিসংযোগে প্রজ্জ্বলিত করা যায়, তাহা হইলে মাত্র তিন হাজার বৎসর পরেই তাহার আর সূর্য্যের মত উত্তাপ থাকে না। কিন্তু হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজের গণনা অনুসারে যদি সূর্য্য-শরীরে প্রতিদিন ১৬ ইঞ্চি মাত্র (অর্থাৎ প্রতি ১১ বৎসরে ইহার ব্যাসের ১ মাইল মাত্র) সঙ্কোচন ঘটে তাহা হইলে ইহার আদিম তাপ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে।

সুতরাং শরীরগত আকুঞ্চনের ফলে পৃথিবীতেও যথেষ্ট পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হইতে লাগিল। এই তাপ পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িল, এবং ইহার প্রভাবে পৃথিবীদেহের কতকগুলি উপাদান গলিয়া তরল হইয়া গেল। এইরূপ দ্রবীভবন যাহা কিছু ঘটিল, ভূপৃষ্ঠের নিকটেই ঘটিল। উপরের পদার্থরাশির চাপের জন্য ভিতরের পদার্থ গলিতে পারিল না। কোন কঠিন পদার্থের পক্ষে তরল হইতে গেলে তাহার আকারগত সম্প্রসারণ আবশ্যক। চারিদিক হইতে চাপ পাইলে এইরূপ সম্প্রসারণ ঘটিতে পারে না। সুতরাং এরূপ পদার্থ যথেষ্ট উত্তপ্ত হইলেও তরল হইতে পারে

না। এই কারণে পৃথিবীর উপরিভাগ মাত্র তরল হইল; ইহার অভ্যন্তরভাগ কঠিনই রহিয়া গেল। যে সকল উপাদান গলিয়া তরল হইয়া গেল, তাহারা ভূপৃষ্ঠে ভাসিয়া উঠিল, এবং যাহারা তেমন তরল না হইয়া দ্রব অবস্থায় রহিল, তাহারাও কঠিন ধাতব পদার্থের আকুঞ্চনের চাপে চারিদিকে বাহির হইয়া পড়িল এবং পরে জমিয়া কঠিন হইয়া ভূপৃষ্ঠের প্রস্তরময়-স্তর-নির্ম্মাণ করিল।

কোন ধাতুময় খনিজ পদার্থকে গলাইলে দেখা যায় যে, ইহার ধাতব অংশ কটাহের তলে পড়িয়া যায় এবং ইহার মৃত্তিকাময় অংশ "সরের" মত উপরে ভাসিয়া উঠে।

পৃথিবীর উপাদানভূত উল্কারাশি যখন উত্তাপের প্রভাবে তরল হইয়া গেল, তখন তাহাদেরও এই অবস্থা ঘটিল। তাহাদের ধাতব অংশ কেন্দ্র প্রদেশে স্থাপিত হইল এবং তাহাদের প্রস্তরময় অংশ "সরের" মত ধাতব অংশের উপর জমিয়া গেল।

পৃথিবীর অভ্যন্তর-ভাগ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ পরীক্ষার সুযোগ না থাকিলেও ইহার অভ্যন্তর-ভাগ যে ধাতব পদার্থপূর্ণ এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে:—

(১) ভূপৃষ্ঠ যে পদার্থে নির্ম্মিত, তাহার গুরুত্ব তাহার সমায়তন জলের গুরুত্বের আড়াই গুণ মাত্র। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর গুরুত্ব ইহার সমপরিমাণ জলের গুরুত্বের প্রায় সাড়ে পাচ গুণ। সুতরাং পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ অংশের গুরুত্ব ইহার বহিরংশের গুরুত্বের দ্বিগুণ।

পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ অংশের এই বিষম গুরুত্বের সরলতম ব্যাখ্যা এই হইতে পারে যে, ইহার অভ্যন্তর-ভাগ প্রধানতঃ ধাতব পদার্থে পূর্ণ।

(২) পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগে রেডিয়ম (Radium) ঘটিত যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতেও এই কথাই প্রতিপন্ন হয়।

অধ্যাপক ষ্ট্রুট (Strutt) সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, ভূপৃষ্ঠে যে রেডিয়ম-জনিত শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ভূপৃষ্ঠ হইতে ৪৫ মাইলের মধ্যে অবস্থিত এইরূপ শক্তিসম্পন্ন উপাদান বিশেষ হইতে উৎপন্ন। এই উপাদান যদি ৪৫ মাইলের অধিক নিম্নতর প্রদেশে অবস্থিত হইত, তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠে এই শক্তির প্রভাব আরও অধিক হইত। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, ভূপৃষ্ঠ হইতে ৪৫ মাইলেরও অধিক নিম্নে রেডিয়মের অনুরূপ শক্তিসম্পন্ন কোন পদার্থ বিদ্যমান নাই।

লৌহ-নির্ম্মিত উল্কাপিণ্ডের এইরূপ শক্তির অভাব। সুতরাং ইহা হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ প্রধানতঃ "নিকেল"-লৌহ-গঠিত।

সুতরাং উপাদানের প্রকৃতি অনুসারে পৃথিবী-দেহ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—(১) ধাতুনির্ম্মিত আভ্যন্তরীণ গুরু অংশ এবং (২) প্রস্তর নির্ম্মিত লঘুতর বহিরংশ।

এই বহিরংশ আবার দুই স্তরে বিভক্ত:—(১) এক প্রকারের প্রস্তর-স্তর খনিজ পদার্থ মিশ্রিত। দ্রবীভূত উপাদান বিশেষ হইতে এইরূপ স্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল প্রস্তর-স্তরে বালুকার অংশ অত্যন্ত অল্প থাকায় ইহাদের ধাতব (Basic) স্তর বলা হয়। এই প্রকারের স্তরের অধিকাংশেই যথেষ্ট পরিমাণ লৌহ এবং ম্যাগ্নেসিয়ম (Magnesium) দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানকালে Basalt নামক আগ্নেয় প্রস্তরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের খনিজ পদার্থের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। সুতরাং ইহা হইতে মনে হয় যে, ভূপৃষ্ঠস্থ প্রচীনতম পর্ব্বত-গুলি বেসাল্টের অনুরূপ কোন প্রকার উপাদান গঠিত। (২) দ্বিতীয় প্রকারের স্তর পূর্ব্বোক্ত স্তরের মত সহজে গঠিত হয় না। ইহার নির্ম্মাণের জন্য অত্যুষ্ণ জল, প্রবল চাপ এবং অন্যান্য নানা প্রকারের রাসায়নিক শক্তির প্রয়োজন হয়। এই স্তরে অম্ল (Acid) এবং ক্ষারের (Alkali) প্রাচুর্য্য দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত স্তরের নিম্ন-বর্ত্তী গভীরতর প্রদেশে এই স্তর গঠিত হইয়া থাকে।

সুতরাং উৎপত্তির পরেই পৃথিবীর প্রাচীনতম ইতিহাস ইহার ত্রিবিধ স্তরবিভাগ:—

(১) অভ্যন্তরস্থিত ধাতব গুরুস্তর।

(২) তদূর্দ্ধস্থিত ক্ষার ও অম্লবহুল বালুকাময় প্রস্তর-স্তর।

(৩) ভূপৃষ্ঠ-স্থিত "চূর্ণ" লৌহ এবং ম্যাগ্নেসিয়ম-বহুল ধাতব প্রস্তর-স্তর।

পৃথিবীর উপাদানভূত উল্কারাশির সংঘর্ষজনিত তাপোৎপত্তির ফলে তাহারা দ্রবীভূত হওয়ায় কিরূপে এই প্রকার স্তর বিভাগ হইল, তাহা ইতিপূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং এ স্থলে সে প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অতঃপর এই নবগঠিত স্তররাজি কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমশঃ বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইব আমরা সংক্ষেপে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন ব্যাপার সহজে বুঝিবার জন্য পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থিত পদার্থরাশির প্রকৃতি সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনার প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর কঠোর সাধনা এবং নিরলস পরীক্ষার ফলে এ সম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহাই সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূগর্ভের বিবরণ।

পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থিত উপাদানের প্রকৃতি কিরূপ এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে কিছু আভাস দেওয়া হইয়াছে। ভূমিকম্পের গতি এবং বেগ দেখিয়াও এ সম্বন্ধে অনেক কথা অনুমান করা যায়।

জলাশয়ের জলমধ্যে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে, যে স্থানে উক্ত প্রস্তরখণ্ড পতিত হয়, তাহার চারিদিকে তরঙ্গচক্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভূপৃষ্ঠস্থ কোন স্থান কোন কারণে হঠাৎ চালিত, ভ্রষ্ট বা বিস্ফুরিত হইলে সেইস্থানের চারিদিকেও উক্ত প্রকারের তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাকেই ভূমিকম্প কহে।

এই প্রকারের তরঙ্গকে যে পদার্থের মধ্য দিয়া আসিতে হয়, সেই পদার্থের প্রকৃতি অনুসারে তাহার গতি ও বেগের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। জলের মধ্যে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহা যত বেগে এবং যতদূরে প্রসারিত হয়, পঙ্কের মধ্যে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহার বেগ বা প্রসার কখনই সেরূপ হয় না।

সুতরাং মধ্যবর্ত্তী পদার্থের ঘনতা বা বিরলতা অনুসারে ভূমিকম্পের তরঙ্গেরও গতি এবং বেগের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এই কারণে ভূমিকম্পের তরঙ্গের প্রকৃতি দেখিয়া এই তরঙ্গ কিরূপ পদার্থের মধ্য দিয়া আসিতেছে, তাহার কতকটা নির্ণয় করা যায়। পৃথিবীর আকার গোল বলিয়া ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক অংশই বৃত্তাংশ। সুতরাং ভূপৃষ্ঠের কোন স্থানে তরঙ্গ উৎপন্ন হইলে এই তরঙ্গ দুই পথে প্রবাহিত হইতে পারে:—ইহা বৃত্তাংশের পরিধি দিয়াও যাইতে পারে, আবার সোজাসুজি ইহার জ্যা দিয়াও যাইতে পারে। পরিধি হইয়া যে তরঙ্গ যায়, তাহা ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া যায়। কিন্তু জ্যা হইয়া যে তরঙ্গ প্রবাহিত হয় তাহাকে ভূগর্ভের মধ্য দিয়া যাইতে হয়।

অধ্যাপক মিল্‌ন (Milne) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ভূপৃষ্ঠের একস্থান হইতে আর একস্থানে যাইবার সময় যদি ভূকম্পের তরঙ্গকে ভূগর্ভের গভীর প্রদেশ দিয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে, ভূপৃষ্ঠের স্তরের অনুরূপ কোন স্তরের মধ্য দিয়া আসিতে ইহার যত সময় লাগিত, তাহা অপেক্ষা অনেক কম সময় লাগে। অধ্যাপক মিল্‌নের গণনা অনুসারে ভূগর্ভের কেন্দ্রপ্রদেশ দিয়া যে তরঙ্গ প্রবাহিত হয় তাহার গতিবেগ সেকেণ্ডে ৫·৫৮ মাইল। পক্ষান্তরে ভূপৃষ্ঠের স্তরের মধ্য দিয়া যে তরঙ্গ প্রবাহিত হয় তাহার গতিবেগ সেকেণ্ডে ১·৮৬ মাইল মাত্র। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে ভূগর্ভস্থ উপাদানের ঘনতা ভূপৃষ্ঠস্থ উপাদানের ঘনতা অপেক্ষা অনেক অধিক। অধ্যাপক মিল্‌নের মতে এই ভূগর্ভস্থ উপাদানের ঘনতা লৌহময় উল্কাপিণ্ডের ঘনতার অনুরূপ। সুতরাং ভূগর্ভস্থ উপাদান গুরুভার ধাতব পদার্থ গঠিত। এই গুরুভার ধাতুপিণ্ড ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৪০ মাইল নিম্নে অবস্থিত। সুতরাং ভূপৃষ্ঠের বেধ ৪০ মাইল মাত্র। ইহার নিম্নেই ভূগর্ভস্থিত গুরুভার ধাতুময় স্তর।

সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ওল্‌ডহ্যাম্ সাহেব (R. D. Oldham) ভূকম্পের গতিবেগের সূক্ষ্মতর পরীক্ষা দ্বারা এ সম্বন্ধে আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার গণনা অনুসারে ভূগর্ভস্থিত স্তর আরও দুই ভাগে বিভক্ত:—

পৃথিবীর কেন্দ্রমণ্ডলস্থিত স্তর সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। এই স্তরের বেধ পৃথিবীর ব্যাসের পাঁচ ভাগের দুই অংশ। অধ্যাপক মিলনের আবিষ্কৃত ধাতুময় স্তর এই স্তরের বাহিরে অবস্থিত।

ওল্ডহ্যাম্ সাহেব নিজের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন :—

ভূকম্পজনিত তরঙ্গ ত্রিবিধ। এক প্রকারের তরঙ্গ বড় বড় ঢেউয়ের আকারে ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া বহিয়া যায়। আর দুই প্রকারের তরঙ্গ ভূগর্ভের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। ইহাদের মধ্যে এক প্রকার তরঙ্গকে পার্শ্বপেষক তরঙ্গ (waves of compression) বলা হয়। এই প্রকারের তরঙ্গের প্রভাবে ভূকম্প যে পথ দিয়া প্রবাহিত হয়, সেই পথের উভয় পার্শ্বস্থিত দ্রব্যকণাগুলি অগ্রপশ্চাৎ চালিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রকারের তরঙ্গকে বিকৃতিকারক তরঙ্গ (waves of distortion) বলা হয়। এই প্রকারের তরঙ্গ যে পদার্থের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় তাহাকে মোচ্ড়াইয়া বিকৃত করিয়া দিবার চেষ্টা করে।

ভূপৃষ্ঠস্থ কোন স্থান হইতে যদি সাতশত মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী অপর কোন স্থানে ভূকম্পের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে পার্শ্বপেষক এবং বিকৃতিকারক তরঙ্গমণ্ডলী ভূপৃষ্ঠবাহী তরঙ্গমণ্ডলীর পূর্ব্বেই গম্যস্থানে উপস্থিত হইয়া থাকে। ভূমিকম্পজনিত প্রকৃত আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভূপৃষ্ঠে পুনঃ পুনঃ যে ক্ষীণ স্পন্দন অনুভূত হইয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রকারের তরঙ্গ সঞ্জাত। কিন্তু পার্শ্বপেষক ও বিকৃতি-কারক তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠবাহী তরঙ্গের পূর্ব্বে গম্যস্থানে উপস্থিত হইলেও উভয়ে ঠিক এক সময়ে উপস্থিত হইতে পারে না।

ওল্ডহ্যাম সাহেবের গণনা অনুসারে ভূকম্পের উৎপত্তিস্থান হইতে তাহার গম্যস্থানের ব্যবধান যদি পৃথিবীর পরিধির একচতুর্থাংশ হয়, তাহা হইলে এই পথ অতিক্রম করিতে যদি পার্শ্বপেষক তরঙ্গের (সেকেণ্ডে ৬·২ মাইল হিসাবে) ১৫ মিনিট লাগে, তাহা হইলে বিকৃতিকারক তরঙ্গের ইহাতে (সেকেণ্ডে ৩·৭৩ মাইল হিসাবে) ২৫ মিনিট লাগিয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন ভূগর্ভস্থ যে কোন স্থান দিয়া যাইবার সময়ে পার্শ্বপেষক তরঙ্গের গতির হ্রাসবৃদ্ধি হয় না কিন্তু বিকৃতিকারক তরঙ্গের গতিবেগে সময়ে সময়ে যথেষ্ট তারতম্য দেখা গিয়া থাকে।

যদি ভূকম্পের তরঙ্গ উৎপত্তিস্থান হইতে ভূগর্ভের মধ্য দিয়া সরলরেখা পথে নিরক্ষবৃত্ত হইতে ৬০ ডিগ্রী দূরবর্ত্তী কোন গম্যস্থানে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে ইহার গতিবেগ সেকেণ্ডে ৩·৪৬ মাইল হয়; যদি ইহাকে ভূগর্ভের গভীরতর প্রদেশের মধ্য দিয়া যাইতে হয় তাহা হইলে ইহার গতিবেগ আরও মন্দীভূত হইয়া আসে। নিরক্ষ বৃত্তের অপর পার্শ্বস্থিত ৩০ ডিগ্রী দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে হইলে, ইহার গতি সেকেণ্ডে ২·৮২ মাইল হইয়া পড়ে এবং নিরক্ষবৃত্তের ঠিক অপর দিকে যাইতে হইলে ইহার গতি সেকেণ্ডে ২·৬৩ মাইল মাত্র হইয়া যায়।

ভূগর্ভের ভিন্ন ভিন্ন অংশ দিয়া গমনকালে বিকৃতিকারক তরঙ্গের গতিবেগের এই প্রকার তারতম্য পর্য্যালোচনা করিয়াই ওল্ডহ্যাম সাহেব অনুমান করেন যে, ভূগর্ভের কেন্দ্রমণ্ডলস্থিত স্তর পার্শ্ববর্ত্তী স্তর হইতে বিভিন্ন উপাদানে গঠিত হওয়াতেই তরঙ্গের গতিবেগের এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। যতদূর গভীর প্রদেশে প্রবেশ করিলে উক্ত তরঙ্গের বেগ বাধা-প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে, তাহা হইতে মনে হয় কেন্দ্রমণ্ডলবর্ত্তী এই অজ্ঞাত পদার্থময় স্তরের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের পাঁচ ভাগের দুই অংশ।

সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে পার্শ্বপেষক তরঙ্গের গতি হইতেও অনেকটা এই প্রকারেরই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু এই প্রকার তরঙ্গের গতি অল্পতর পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় ইহার পরিবর্ত্তন তেমন সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষগোচর হয় না।

ওল্ডহ্যাম সাহেবের মত এখনও সর্ব্ববাদীসম্মত হয় নাই। কেহ কেহ তাঁহার মতের সমর্থন করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন।

অধ্যাপক নট্ (Knott) সাহেবের মতে ওল্ড্হ্যাম সাহেবের সিদ্ধান্ত উপযুক্ত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে এবং অধ্যাপক মিল্নের মতের সঙ্গেও ইহার ঐক্য নাই। ওল্ডহ্যাম সাহেবের মতে ভূগর্ভস্থ স্তর দুইভাগে বিভক্ত কিন্তু অধ্যাপক মিল্নের মতে ৪০ মাইল স্থূল ভূপৃষ্ঠের নিম্নবর্ত্তী সমস্ত ভূগর্ভই একই প্রকারের উপাদান-গঠিত। যাহা হউক যদি কোনকালে ওল্ডহ্যাম সাহেবের মতই যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর স্তরবিভাগ এইরূপ দাঁড়াইবে :—

১। অজ্ঞাত-পদার্থ গঠিত কেন্দ্রবর্ত্তী স্তর,
২। ধাতব-পদার্থ গঠিত ভূগর্ভবর্ত্তী স্থূল স্তর এবং
৩। প্রস্তরময়-পদার্থ গঠিত ভূপৃষ্ঠস্থিত সূক্ষ্মস্তর।

ক্রমশঃ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

কলিকাতা অবরোধ

প্রথম পরিচ্ছেদ

উদ্দেশ্য

The Subadar had a wish for a triumph, which he thought might be easily obtained; and he was greedy of riches, with which, in the imagination of the natives, Calcutta was filled.—Mill's History III. 147.

বাঙ্গালার ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়,—১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা অবরুদ্ধ হইয়াছিল। অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সত্য কথা। কিন্তু অবরুদ্ধ হইয়াছিল কেন, তাহার সকল কথা এখনও ইতিহাসে স্থান লাভ করিতে পারে নাই।

যে সকল কাগজ পত্রে তাহার পরিচয় লাভের উপায় ছিল, সকলের পক্ষে তাহার সন্ধানলাভের সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং সেকালের ইতিহাসে অনেক অনুমানের ছড়াছড়ি হইয়াছিল। তখনও ইতিহাস ইতিহাসরূপে লিখিত হইবার জন্য ব্যগ্র হয় নাই। কারণ, তখনও ইতিহাস ইতিহাস নহে; আখ্যায়িকা। সুতরাং সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক জেমস্ মিলও অবলীলাক্রমে লিখিয়াছিলেন,—

"সুবাদারের মনে মনে একটা বিজয়োৎসবের সখ জন্মিয়াছিল; তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাহা সহজেই সুসম্পন্ন হইবে; তিনি বড় অর্থলোলুপ ছিলেন; আর দেশের লোকেরও বিশ্বাস ছিল যে কলিকাতা বহু ধনরত্নে পরিপূর্ণ।"

কলিকাতা আক্রমণের এই উদ্দেশ্যটি মিলের ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছে, এবং সিরাজদ্দৌলার খামখেয়ালীর একটি প্রধান দৃষ্টান্ত বলিয়াও পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। সেকালের ইংরাজ-লেখকগণ সিরাজ-চরিত্র সম্বন্ধে অনেক বিস্ময়কর জনরবে আস্থা স্থাপন করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না; সুতরাং মিলের এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত তাঁহাদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট করিতে পারে নাই।

সিরাজদ্দৌলার শত্রুপক্ষের অভাব ছিল না। মুতাক্ষরীণ-রচয়িতা নবাব গোলাম হোসেন খাঁ তাহার মধ্যে একজন। তিনি সিরাজদ্দৌলার অনেক কুকীর্ত্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতা অবরোধের



পত্র হস্তে সিরাজদ্দৌলা

উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনিও মিলের সিদ্ধান্তের অনুরূপ অলীক সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ না করিয়া, স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন,—

"রাজমহলে সিরাজদ্দৌলার নিকট সংবাদ আসিয়াছিল যে, নওয়াজিস মহম্মদ খাঁর ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে ধরিয়া আনিবার জন্য জাহাঙ্গীরনগর-ঢাকায় যে সকল প্রহরী প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদিগের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া কৃষ্ণবল্লভ কলিকাতায় পলায়ন করিয়াছেন; এবং তথাকার প্রধান পুরুষ ড্রেক সাহেব তাঁহাকে আশ্রয় দান



সেকালের চৌরঙ্গী

করিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সিরাজদ্দৌলা শওকত-জঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযান পরিত্যাগ করিয়া, মুরসিদাবাদে প্রত্যাগমন করেন। তথা হইতে ড্রেক সাহেবের শাসনের জন্য অনেক কড়া চিঠিপত্র লিখিবার পর, পত্রব্যবহার অবশেষে যুদ্ধঘোষণায় পরিণত হয়; এবং সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণের জন্য সেনা-সমাবেশ করেন।" *

ইংরাজ ইতিহাস-লেখকগণের গ্রন্থে মুসলমান ইতিহাস লেখকের এই উক্তি এখনও যথাযোগ্য উল্লেখ প্রাপ্ত হয় নাই; কলিকাতা আক্রমণকে সিরাজদ্দৌলার খামখেয়ালীর নিদর্শনরূপে বর্ণনা করিবার প্রবৃত্তিও সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয় নাই। কেবল ইংরাজ-দপ্তরের উপর নির্ভর করিলেও, প্রকৃত তথ্যের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিত; কলিকাতা অবরোধের প্রকৃত কারণ আবিষ্কৃত হইতে পারিত। কিন্তু তথ্যাবিষ্কার চেষ্টা অপেক্ষা কাহিনী-রচনার চেষ্টাই অধিক উৎসাহলাভ করিয়াছিল; সেকালের ইতিহাস ন্যায়-বিচারের জন্য লালায়িত ছিল না। কারণ, সিরাজদ্দৌলার নামে যাহা কিছু প্রচারিত হইত, সে কালের

* News came to Seradj-ed-dowlah at Rajmahl, that Kishunbohlub, son to Raja Rahdjbullub, heretofore Divan to Nevazish mahmedqhan, had given the slip to the guards that had been sent to Djehangirnugur-Dacca to seize him, and had made his escape to Calcutta, where he was protected by Mr. Drake, the chief man of that town. On hearing this, Seradj-ed-dowlah gave up his design agains Shaocat-djung, and returned to Murshud-abad; where, after writing many sharp letters and reprimands to Mr. Drake, the meesages and literary correspondence ended in a declared war; and Seradj-ed-dowlah assembled an army against Calcutta —Cambray's Reprint of Mustapha's Mutakherin, Vol. II. p. 188.

ইউরোপীয়গণ তাহার সত্যমিথ্যা-নির্ণয়ের প্রয়োজন স্বীকার করিতেন না।

সিরাজদ্দৌলার অজ্ঞতার ও অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদ্ধত্যের অনেক কাহিনী ইউরোপীয় সমাজে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। অজ্ঞতার পরিচয় দিবার জন্য কেহ লিখিয়াছিলেন;—"সিরাজদ্দৌলা মনে করিতেন যে সমগ্র ইউরোপে দশ সহস্রের অধিক অধিবাসী নাই।" * অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিবার জন্য কেহ লিখিয়াছিলেন, যে সিরাজদ্দৌলা স্পষ্টই বলিতেন,—"ইউরোপীয়গণকে শাসন করিবার জন্য আর কিছুরই দরকার নাই;—কেবল—কেবল—এক জোড়া চটি জুতা!" †

সিরাজদ্দৌলার এরূপ অজ্ঞতা এবং এতদূর অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদ্ধত্য বর্ত্তমান থাকিলে, মুতক্ষরীণ-রচয়িতা তাহার উল্লেখ করিতে ত্রুটি করিতেন না। ইংরাজ কিরূপ প্রবল শত্রু হইবে, বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দী তাহা সিরাজকে পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। * সে কথা ইংরাজেরাও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা আক্রমণের পূর্ব্বে সিরাজদ্দৌলা ফরাসী ও ওলন্দাজের নিকট সাহায্য চাহিয়াছিলেন। † সে কথাও ইংরাজদিগের নিকট অপরিচিত ছিল না। এইরূপ আচরণ অজ্ঞতার ও অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদ্ধত্যের সাক্ষ্যদান করিতে পারে না। অর্থলোলুপতাই যে কলিকাতা আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল, তাহা নিতান্ত রচা-কথা বলিয়াই প্রতিভাত হয়।



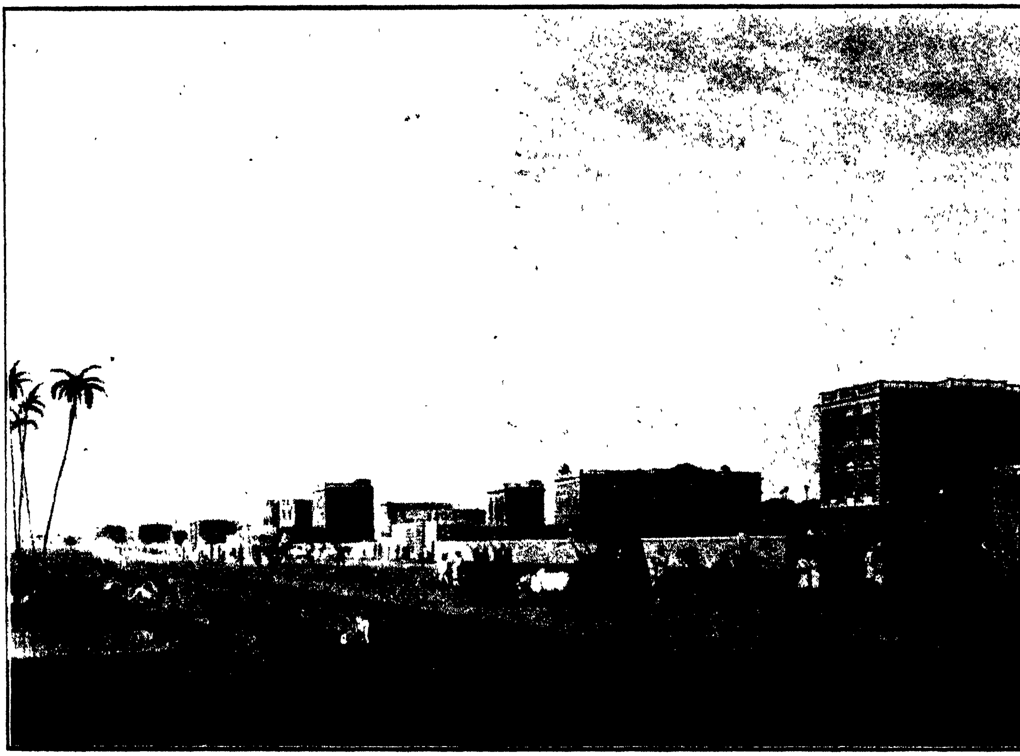
সেকালের চিৎপুর-রোডের দৃশ্য

* Scrafton's Reflections p. 58.

†. Sirajuddowla had the most extravagant contempt for Europeans ; "a pair of slippers," he said, "is all that is needed to govorn them."– M. Law quoted in Hill's Bengal in 1756-57. Vol. III. p. 176.

* The hatmen would posse-s themselves of al the shores of Hindia—Cambray's Reprint of Mustapha's Mutakherin Vol. II. p. 163

† Hill's Bengal in 1756-57, vol. I. p. 5.



সেকালের এস্‌প্লানেডের দৃশ্য

প্রতিদ্বন্দ্বী শওকতজঙ্গের বিরুদ্ধে সৈন্যসামন্তসহ রণ-যাত্রা, রাজমহল হইতে সহসা প্রত্যাবর্ত্তন, ও কলিকাতা আক্রমণের আয়োজন স্পষ্টই বুঝাইয়া দেয়,—কলিকাতা আক্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য যাহাই হউক, তাহা অর্থ-লোলুপতা বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।

কিছু দিনের জন্য ইংরাজ কলিকাতা হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন;—কিছু দিনের জন্য কলিকাতার নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া, "আলিনগর" নাম প্রচলিত হইয়াছিল,—কিছু দিনের জন্য সিরাজ-সেনাপতি মহারাজ মাণিকচাঁদ কলিকাতার শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু কিছু দিন মাত্র। তাহার পরই আবার ইংরাজ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের কোথায় কত ধনরত্ন লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহার তদন্ত করিয়া, তাঁহারাই লিখিয়া গিয়াছেন,—কোম্পানীর মালগুদামে যাহা যেমন ছিল, তাহার প্রায় সমস্তই সেই-রূপই সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল,—মালপত্রের বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় নাই। সিরাজদ্দৌলার অর্থলোলুপতা থাকিলে, তাহা নবাবী অর্থলোলুপতা হইত। সেকালের কলিকাতার পক্ষে সে অর্থলোলুপতা চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত প্রলোভন উপস্থিত করা সম্ভব হইত না। সুতরাং জেমস্ মিল যে আনুমানিক কারণের উল্লেখ করিয়া কলিকাতা-আক্রমণের উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে প্রকৃত উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করা কঠিন।

তবে? তাহাই ত ইতিহাসের সমস্যা। ইংলণ্ডের পার্লেমেণ্ট-মহাসভা এক অনুসন্ধান-সমিতি বসাইয়া, তাহার তথ্যানুসন্ধান করাইয়াছিলেন। যে সকল কাগজপত্রে প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইবার সম্ভাবনা, তাহার মধ্যে সিরাজদ্দৌলার পত্রই প্রধান স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত। সে সকল পত্র এখনও বর্ত্তমান

আছে ; এখন তাহার অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল এখনও তাহা ইতিহাসে উল্লিখিত হয় নাই। যখন উল্লিখিত হইবে, তখন প্রচলিত ইতিহাসের অনেক কথাই রচা-কথা হইয়া দাঁড়াইবে।

"ইংরাজ তাড়াইব। আমার রাজ্য হইতে ইংরাজ তাড়াইবার তিনটি যুক্তিযুক্ত উদ্দেশ্য আছে। (১) প্রথম কারণ এই যে,—উহারা সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে ; সুবৃহৎ পরিখা খনন করিয়াছে ; তাহা বাদশাহী সাম্রাজ্যের চির-প্রচলিত আইন কানুনের সুপ্রতিষ্ঠিত বিধানাবলীর বিপরীত কার্য্য। (২) দ্বিতীয় কারণ,—কোম্পানী বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার জন্য "দস্তক" নামক যে পরোয়ানা পাইবার অধিকারী, উহারা তাহার অপব্যবহার করিয়া, অনধিকারীকে "দস্তকের" ফললাভ করিতে দিয়া বাদশাহী শুল্কের ক্ষতি করিতেছে। (৩) তৃতীয় কারণ,—যে সকল বাদশাহী কর্ম্মচারী কৃতকার্য্যের নিকাশ দিবার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভের মতলব করে, উহারা তাহাদিগকে নিজ অধিকার মধ্যে আশ্রয় দিয়া, ন্যায় বিচারের বাধা প্রদান করিতেছে।" *

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে আরমানী বণিক্ খোজা বাজিদের নামে সিরাজদ্দৌলা উল্লিখিত মর্ম্মে পত্র লিখিয়া, তাঁহার কলিকাতা-আক্রমণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন,—যত স্পষ্ট ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা সম্ভব, তাহাই করিয়াছিলেন। নবাবের পক্ষে এত স্পষ্ট করিয়া উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন ছিল না। খামখেয়ালী নবাবের পক্ষে কোন কথাই ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এই পত্রে খামখেয়ালীর পরিচয় নাই,—নবাবী আত্মাভিমানেরও পরিচয় নাই। অজ্ঞতার পরিচয় নাই ;—অবজ্ঞাপূর্ণ উদ্ধতোরও পরিচয় নাই। যাহা আছে, তাহা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ দৃঢ়সংকল্প ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্ত্তার পরিচয় বলিয়াই উল্লিখিত হইবার যোগ্য। কেবল উদ্দেশ্যগুলি মিথ্যা হইলে,—অন্য কথা। এই পত্রে আরও লিখিত হইয়াছিল—

"এই সকল কারণে, ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিবারই প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। তবে যদি ইহারা এই সকল অন্যায় আচরণ দূর করিবার জন্য অঙ্গীকার করে, এবং নবাব জাফর খাঁর (মুরসিদকুলী খাঁর) আমলে অন্যান্য বণিক্ যে নিয়মে বাণিজ্য করিত, সেই নিয়মে বাণিজ্য করিতে সম্মত হয়, ক্ষমা করিব, দেশেও থাকিতে দিব। অন্যথা শীঘ্রই ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিব।" *

ইহাতে আছে—শাসনের সঙ্গে ক্ষমার কথা, ন্যায়পরায়ণ নরপতির ন্যায়ানুমোদিত প্রশংসার কথা। এই পত্র খোজা বাজিদের নিকট প্রেরিত হইলেও, ইংরাজকে জানাইবার জন্যই প্রেরিত হইয়াছিল। ইহা এখন ইংরাজ-দপ্তর হইতে বাহির হইয়া জানাইয়া দিয়াছে,—ইংরাজেরা ইহা জানিতেন, পত্রখানিও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই পত্র মুন্সীখানায় লিখিত হইয়া, সিরাজদ্দৌলার নিকট দস্তখতের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। অনেকে বলেন,—সিরাজদ্দৌলা ভাল লেখাপড়া জানিতেন না,—তাঁহার নাম দিয়া যে সকল পত্র প্রেরিত হইত,

* I have three substantial motives for extirpating the English out of my country ; one that they have built strong fortifications and dug a large ditch in the King's dominions, contrary to the established laws of the country. The second is, that they have abused the privilege of their DUSTUCKS by granting them to such as were no ways entitled to them, from which practices the King has suffered greatly in the revenue of his Customs. The third motive is, that they give protection to such of the King's subjects as have by their behaviour, in the employs they were entrusted with, made themselves liable to be called to an account, and instead of giving them up on demand they allow such persons to shelter themselves within their bounds from the hands of justice—Hill's Bengal in 1756-57 vol. I p. 4.

* For these reasons it is become requisite to drive them out. If they will promise to remove the foregoing complaints of their conduct, and will agree to trade upon the same terms as other merchants did in the times of the Nabab Jaffier Cawn, I will pardon their fault ; and permit their residence here : otherwise I will shortly expel that nation—IBID.



সেকালের মন্ত্রণাগার

তাহাতে তাঁহার মুন্সীখানার বাহাদুরী আছে,—তাঁহার বাহাদুরী থাকিতে পারে না। কিন্তু অনেক পত্রের ন্যায় এই পত্রের শেষেও সিরাজদ্দৌলা (দস্তখত করিবার সময়ে) কয়েকটি কথা নিজহস্তে লিখিয়া দিয়াছিলেন; যথা—

"ইংরাজদিগকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমার এই সঙ্কল্পের কথা জানাইয়া দিবা। তাহারা যদি এই সকল সর্ত্ত পালন করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহারা থাকিতে পারে। অন্যথা এ দেশ হইতে তাহারা তাড়িত হইবে।" *

ইহাই এতদ্বিষয়ক প্রথম পত্র নহে। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মে তারিখে রাজমহলের শিবির হইতে সিরাজদ্দৌলা আর একখানি পত্রে খোজা বাজিদকে জানাইয়াছিলেন;—

"ইংরাজেরা আমার রাজ্যমধ্যে যে সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহা ভূমিসাৎ করা আমার সংকল্প হইয়া উঠিয়াছে। এই সংকল্প হইতে নিরস্ত রাখিবার উপযুক্ত আর কোনও কার্য্য এক্ষণে উপস্থিত না থাকায়, আমি এই অবসরটি সেই কার্য্যেই নিয়োগ করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি। এই কারণে, আমি রাজমহল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি। আমি যথাসাধ্য সত্বরতার সঙ্গে রণযাত্রা করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব কলিকাতার সম্মুখে উপনীত হইব। যদি ইংরাজগণ আমার রাজ্যে বাস করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাদিগকে অবশ্যই কয়েকটি কার্য্য করিতে হইবে;—তাহাদের দুর্গ ভূমিসাৎ করিতে হইবে,—পরিখা বুঁজাইয়া ফেলিতে হইবে,—নবাব জাফর খাঁর আমলে যে নিয়মে বাণিজ্য করিত, সেই নিয়মে বাণিজ্য করিতে হইবে। অন্যথা আমি যে রাজ্যের সুবাদার, তাহার সীমানা হইতে

* ইংরাজ দপ্তরে এই পত্রের যে ইংরাজী অনুবাদ আছে, তাহাতে এই পুনশ্চ-অংশ সম্বন্ধে লিখিত আছে,—The following paragraph was wrote in the Nabob's own hand at the bottom of the letter.

উহাদিগকে একেবারে তাড়াইয়া দিব। ইহা ঈশ্বরের ও পয়গম্বরগণের নামে শপথ করিয়া জানাইয়া রাখিতেছি।" *

সিরাজদ্দৌলার এই সকল চিঠিপত্র প্রকাশিত হইবার পর, পুরাতন কাহিনীর সংস্কার-সাধনের প্রয়োজন উপস্থিত হইলেও, শ্রীযুক্ত এস্, সি, হিল তাহাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে সম্মত হন নাই। তিনি বরং সিরাজদ্দৌলার পত্রোক্ত এই সকল কারণকে তাঁহার "অজুহাত" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া, † যথার্থ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবার জন্য লিখিয়াছেন,—"তাহা সিরাজদ্দৌলার খামখেয়ালী এবং অর্থ লোলুপতা।" ‡ ইহার কারণ উল্লেখ করিতে গিয়া, হিল সাহেব লিখিয়াছেন,—(১) ইংরাজগণ সিরাজদ্দৌলাকে বাল্যকালে ইংরাজ-কুটীতে প্রবেশ করিতে দিতেন না, কারণ তিনি বড় দৌরাত্ম্য করিতেন,—টেবিল চেয়ার ভাঙ্গিতেন, অথবা ইচ্ছামত উঠাইয়া লইয়া যাইতেন; (২) কলিকাতা ধনরত্নে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সেখানে ইংরাজগণ ধুমধামের সঙ্গে বিলাস ভোগ করিতেন, লোকেও তাহার কথা অতিরঞ্জিত করিয়া প্রচারিত করিত; (৩) সিংহাসনে আরূঢ় হইবার পূর্ব্বে ফরাসীগণ সিরাজদ্দৌলাকে নজরাদি দিয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন,—ইংরাজগণ তাহা করেন নাই।

শ্রীযুক্ত হিল সাহেব এই কৈফিয়তের অবতারণা করিবার সময়ে একটি কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর তারিখের কন্সলটেসনে দেখা যায়,—সিংহাসনারূঢ় হইবার পূর্ব্বে সিরাজদ্দৌলা ইংরাজদিগের নিকট উপহার উপঢৌকন পাইয়াছিলেন;—পান নাই, ইহা সত্য কথা নহে। * একে হিল সাহেবের কৈফিয়ৎ সিরাজদ্দৌলার পত্রগুলির বিপরীত, তাহাতে আবার কৈফিয়ৎটি একটি অসত্য কথার উপর প্রতিষ্ঠিত! সুতরাং এই কৈফিয়ৎকে মানিয়া লইয়া পত্রগুলিকে অগ্রাহ্য করা কঠিন।

সে যাহা হউক, পত্রোক্ত অভিযোগগুলি সত্য হইলে, হিল সাহেবের কৈফিয়ৎ অপেক্ষা সমসাময়িক পত্রের উপরেই ভবিষ্যতের ইতিহাসলেখকগণকে অধিক নির্ভর করিতে হইবে। কৌতুকের বিষয় এই যে, পত্রোক্ত সকল অভিযোগকেই সত্য অভিযোগ বলিয়া স্বয়ং হিল সাহেবকেও প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

১৭৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে কর্ণেল স্পিক কলিকাতার উত্তর প্রান্তে একটি দুর্গ-প্রাকার নির্ম্মাণের নক্সা প্রস্তত করিয়া রাখিয়াছিলেন। নবাবের অনুমতি না লইয়াই, তাঁহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্র খাতেরও সংস্কারকার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল। † যখন এই সকল কার্য্য চলিতেছিল, তখন নবাব আলিবর্দ্দী অন্তিম শয্যায় শয্যাগত,—উত্থানশক্তি রহিত।

কোম্পানীর দোহাই দিয়া বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার কথাও হিল সাহেবকে মানিয়া লইতে হইয়াছে। ইহাতে যে শুল্কের আয় ক্ষতিগ্রস্ত হইত, তাহার আলোচনা না করিলেও চলে। ‡

* It has b en my design to level the English fort fications raised within my jurisdiction on account of their great strength. As I have nothing at present to divert me from the execution of that resolution, I am determined to make use of this opportunity; for which reason I am returning from Rajhmaul, and shall use the utmost expedition in my march that I may arrive before Calcutta as soon as possible If the English are contented to remain in my country, they must submit to have their fort raised, their ditch filled up, and trade upon the same terms they did in the time of the Nabob Jaffier Cawn; otherwise I will expel them entirely out of the provinces of which I am SUBAH, which I swear to do before God and our Prophets.—Hill's Bengal Vol. I. p. 3,

† Lastly we come to the pretexts put forward by the NAWAB for attacking the English.—Hill's Introduction to the Bengal in 1756-57 p. Liii.

‡ As to the particular reasons the most important were his vanity and his avarice.

* সিরাজদ্দৌলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

† As regards the fortifications, it is quite clear that the British had exceeded their rights—Hill's Bengal in 1756-57. Introduction, p. liv.

‡ As regards the abuse of trade privileges, it must be confessed that the British had used the

নবাবের কর্ম্মচারিগণকে কলিকাতায় আশ্রয় দিয়া, ন্যায় বিচারে বাধা প্রদান করা হইত কিনা, সে বিষয়টির আলোচনা করিতে গিয়া, হিল সাহেব তাহাকে একটি "কঠিন এবং দুর্বোধ" কথা বলিয়াও, প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন যে,—কৃষ্ণদাসকে কলিকাতায় আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল। দেশের লোকে বলিত—তাহাই কলিকাতা-আক্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্য। ঢাকার ইংরাজ গোমস্তা ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২২ মার্চ্চের একখানি চিঠিতে তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। *

বাঙ্গালার বাণিজ্য বড় লাভজনক বাণিজ্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। সে বাণিজ্যে কোম্পানী বাহাদুরের লাভ তেমন অধিক না হইলেও, কোম্পানী বাহাদুরের ছোট বড় সকল কর্ম্মচারীর লাভের অঙ্ক বড় অধিক হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা কোম্পানী বাহাদুরের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে আসিয়া, মনিবের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া, গোপনে গোপনে সকলেই পৃথক্ ভাবে কিছু কিছু বাণিজ্য করিতেন,—দেশের লোকের সাহায্যে, নবাব-দরবারের পাত্রমিত্রের গুপ্ত সহকারিতায়, তাঁহাদের এই বাণিজ্যে বিলক্ষণ অর্থাগম হইত। তাহার কারণ এই যে,—কোম্পানী বাহাদুরের পক্ষে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার যে বাদশাহী অধিকারপত্র প্রচলিত ছিল, তাহার দোহাই দিয়া, কোম্পানী বাহাদুরের কর্ম্মচারিগণ নিজের মাল কোম্পানী বাহাদুরের মাল বলিয়া চালান দিয়া, বিনা শুল্কে বাণিজ্য চালাইতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। যে সকল প্রধান প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারী মান্দ্রাজে ছিলেন, বঙ্গদেশে একবারও পদার্পণ করেন নাই, তাঁহারাও তাঁহাদের সহকারিগণের সহায়তায় বাঙ্গালা দেশের এই গুপ্ত বাণিজ্যে যোগদান করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন। ইহাতে রাজকোষের শুল্কের ক্ষতি হইত। সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু পেটের দায় বড় দায়,—কোম্পানী বাহাদুর যে যৎসামান্য বেতনে কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতেন, তাহাতে কাহারও কুলাইবার সম্ভাবনা ছিল না। † সুতরাং জানিয়া শুনিয়াও—পেটের দায়ে—ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণ গুপ্ত বাণিজ্যে অর্থোপার্জ্জন করিতেন। ধরা পড়িলে, অস্বীকার করা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। এই ভাবে গুপ্ত বাণিজ্য চালাইবার জন্য "দস্তক" নামক পরোয়ানা জাল করা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না; কোম্পানী বাহাদুরের মাল বলিয়া নিজের মাল চালাইবার জন্য জুয়াচুরী করা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না।—সুতরাং জাল জুয়াচুরী-মিথ্যাকথা এরূপ গুপ্ত বাণিজ্যের নিত্য সহচর হইয়া উঠিয়াছিল। সিরাজদ্দৌলা ইহার গতিরোধ করিবার জন্য সংকল্প করিয়াছিলেন।

কলিকাতা অবরোধের কারণ যাহাই হউক,—সে কারণ যতই সত্য হউক,—কলিকতা অবরোধই সিরাজদ্দৌলার কাল হইয়াছিল। সেকালের প্রকৃত ইতিহাস বুঝিতে হইলে, কলিকাতা অবরোধের ইতিহাস সংকলন আবশ্যক;—অন্ধকূপ-কাহিনীর রহস্যভেদ করিতে হইলেও, কলিকাতা অবরোধের ইতিহাস সংকলন আবশ্যক। গভর্ণমেণ্টের কৃপায়, ইংরাজ-দপ্তরের কাগজপত্র প্রকাশিত হওয়ায়, এক্ষণে নিরপেক্ষভাবে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে, সত্যানুসন্ধানের জন্য, সে ইতিহাস সংকলন করিবার পক্ষে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

---

destucks or passes for goods free of customs in a way never contemplated by the FARMAN —Ditto. p. lv.

* At the time of the seige of Calcutta the natives of Bengal generally asserted that the protection of Krisna Das was the sole cause of the war

—Hill's Bengal in 1756. vol. iii p. 339.

† ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের কাহার কত মাসিক বেতন ছিল, তাহার একটি তালিকা (Hill's Bengal in 1756-57, vol. III pp 411-413) প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়,- কেবল গভর্ণর ড্রেকের বেতন ছিল দুই শত টাকা, হলওয়েল প্রভৃতি কৌন্সিলের মেম্বরগণের প্রত্যেকের বেতন ছিল চল্লিশ টাকা, প্রবীণ কুঠিয়ালগণের বেতন ছিল চল্লিশ টাকা। নবীনগণের বেতন ছিল ত্রিশ টাকা; ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রভৃতি ফ্যাক্টরগণের প্রত্যেকের বেতন ছিল পনর টাকা, আর রাইটারগণের প্রত্যেকের বেতন ছিল পাঁচ টাকা! সকলেই কোম্পানী বাহাদুরের নিকট বাড়ী ও খোরাকী পাইতেন। রাইটারগণ ১৮ হইতে ২৪ বৎসর বয়স্ক ছিলেন; ফ্যাক্টরগণ ২২ হইতে ২৬ বৎসর বয়স্ক ছিলেন; প্রবীণ কুঠিয়ালগণ ২৬ হইতে ৩৩ বর্ষ বয়স্ক ছিলেন, আর স্বয়ং গভর্ণরের বয়ঃক্রম ছিল ৩৪ বৎসর। তিনি ১৫ বৎসর বয়সে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। কেবল হলওয়েলই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ ছিলেন,—তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। এই সকল অল্প শিক্ষিত বয়স্ক অত্যল্প-বেতনপ্রাপ্ত কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ যাহা করিবার তাহাই করিতেন। তাঁহাদিগের বাল্যশিক্ষার অভাব, দূরদেশের অসংযত জীবনযাত্রা, ও যৎসামান্য বেতন, তাঁহাদিগকে চরিত্ররক্ষায় সমর্থ করিতে পারিত, এরূপ সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহারা স্বকার্য্য-সমর্থনের জন্য যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই ইতিহাসের উপাদান! তাহা কতদূর নিঃসংশয়ে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস এখনও তাহার বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই।

পদ্মাতীরে

পদ্মাতীরে পড়ে’ এল বেলা ;
কলকোলাহলক্লান্ত দিবসের মেলা
সন্ধ্যার মেঘের সাথে
তন্দ্রাস্তব্ধতাতে
মিলাইয়া এল ধীরে
ধরিত্রীর তীরে ;
তটতরুদল
দক্ষিণের পরশনে পুলকবিহ্বল,
দিবসের ক্লান্তিশেষে
স্বপ্নাবেশে
ফিরে’ যেন পেল আপনারে ;
তীরে নীরে নদীপারেপারে
জাগিল মর্ম্মরকথা—
আনন্দ-উচ্ছল গীতি—ভাষাহীন কলমুখরতা ;
তীরাস্তৃত বালুকার রাশি
মৃদুহাসি’
শু’ল পাশ-ফিরে’
ঝিল্লির ঝালর-দেওয়া অন্ধকারে অঙ্গখানি ঘিরে’।

হেরিনু অসংখ্য উর্ম্মি সম্মুখেতে চলিয়াছে ধেয়ে
সারে-সারে সারিগান গেয়ে ;
উদ্দাম উৎসাহমত্ত উদ্বেল-চঞ্চল
পারাবারতীর্থযাত্রীদল
চলিয়াছে চিররাত্রিদিন
সুদূর লক্ষ্যের পানে নেত্র রাখি’ নিমেষবিহীন।
কি জানি কেমনে
সহসা হইল মনে,
আলোছায়াঝিকিমিকি সেদিনের ফাল্গুনের সাঁঝে—
ঐ তরঙ্গের মাঝে নিখিলের ধারাযন্ত্র বাজে !
পরস্পর—
আঁকা-বাকা আলো-কালো উঁচু-নীচু প্রভেদ বিস্তর,
নির্ব্বিবাদে তবু পাশা-পাশি
একস্তরে কোটি সঙ্গী সকৌতুকে চলে কলহাসি’ ;
চেয়ে তারি পানে
উর্দ্ধে চলে মেঘমালা সেই সাথে অজানা উজানে !

মনে হয়—হেরি’ ঐ উর্ম্মিমালা প্রাতঃসূর্য্যাকরে,
আলোকের কলহংস ভেসে’ যায় যেন কলস্বরে
লক্ষ লক্ষ শুভ্র পক্ষ মেলি’,
স্বর্ণাঙ্কিত চেলি
সায়াহ্নের বর্ণভাঙা রাঙা অন্ধকারে
যেন তারা উড়ে’ চলে পারে—
গৈরিক তরঙ্গ আঁকি’
চক্রবাকী
যেন সারে-সারে,
গায়ে-গায়ে হাজারে হাজারে ;
কাজল-তিমিরে রজনী ঘনায় ধীরে—
উর্ম্মিপুঞ্জে অন্ধকার-পানকৌড়ি ডুব দেয় নীরে।
শুধু শোনা যায়
মর্ম্মরিত বারিরাশি—যেন এ মর্ম্মেরি কিনারায় !
অনন্তের কালস্রোত তারি পানে চেয়ে
সেতার মিলায় তার ঐ সুরে গান গেয়ে-গেয়ে ;
চেয়ে তারি পানে
বিশ্বের অবাক্ত বাণী ধ্বনি’ উঠে কথাহীন গানে !

দিনেরাতে
হেরি তারি সাথে
অলক্ষিত লক্ষ উর্ম্মিদল
শব্দে গন্ধে রূপে ছন্দে স্পন্দমান নিয়তচঞ্চল ;
আকাশের তারা
মহাশূন্যে মালা গেঁথে চলিয়াছে চিরশ্রান্তিহারা ;
প্রাণ-পরীবাহ
অনুদিন অক্লান্ত-উৎসাহ

অসংখ্য জীবের মাঝে দেশে-দেশে চলিয়াছে ছুটে';
বীজ রেখে ফল যায় টুটে'—
সেই বীজে ফল ফের ফলে,
জীবনপ্রবাহ এঁকে সৃষ্টিমাঝে শূন্যে স্থলে জলে;
শৈলশৃঙ্গে পৃথ্বীগাত্রে মৃত্তিকার পরে
ঐ তরঙ্গেরি রেখা স্তবকে-স্তবকে স্তরে-স্তরে;
চলে বিশ্বতরঙ্গের শ্রেণী
অস্পষ্ট কোথাও স্পষ্ট—আন্দোলিত অনন্তের বেণী!

ঐ উর্ম্মিহার
অনাদিযুগের লক্ষ অজানিত অক্ষরের সার,
বাক্যে-রসে ভরি' উঠে' ধীরে
শুনায় অখণ্ড গীতি নিতিনিতি অমৃতের তীরে;
ঐ উর্ম্মিমালা
প্রভাতে সন্ধ্যায় নিত্য সাজাইছে ডালা
অসীমের পদে,
ভেসে-যাওয়া অর্ঘ্য রচি' কুমুদে-কহ্লারে-কোকনদে;
ঐ রসতরঙ্গের ধারা
আপনি সর্ব্বস্ব-হারা অপারের খুঁজিছে কিনারা;
লক্ষ্যে স্থির গতিতে চঞ্চল
অনন্ত পথের পান্থ শুধু কহে—চল্ চল্ চল্।

হে নিয়তি, দ্বিধাহীন গতি!
আজি কবি পাঠায় প্রণতি
তোমার লক্ষ্যের পানে
তব মাঝখানে;
তোমার যাত্রার বার্ত্তা কহ আজি সবে
শক্তিমত্ত মোহান্ধ মানবে;
পূর্ব্ব হ'তে পশ্চিমের পানে
শুনাও সকল বর্ণে, জাতি-ধর্ম্মে প্রত্যেকের কাণে
তোমার প্রশান্ত মন্দ্রবাণী—
স্বার্থে নয় দ্বন্দ্বে নয়—ঐক্যে শুধু লক্ষ্য বলি' মানি।
অনন্তের পথে
জলে স্থলে নাহি ভেদ, নাহি বাধা সমুদ্রে পর্ব্বতে;
বিচিত্র ছন্দের মধ্য দিয়া
অসীমের সাম্য-সাম অবিশ্রাম উঠিছে ধ্বনিয়া,
সেতারের তারে-তারে যথা
সুরে-সুরে ঘুরে'-ঘুরে' পুরে' উঠে গানের পূর্ণতা;
তরঙ্গের ভঙ্গীর বিভেদ
সে ধ্রুবযাত্রার পথে নহে বিঘ্ন নহে প্রতিষেধ;
একলক্ষ্য সচঞ্চল তরঙ্গের দল
নিশিদিন কলস্বরে তাই বলে—চল্ চল্ চল্।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

হত্যাকাণ্ডের পর

(Constant Guiroult'র ফরাসী হইতে)

গ্রামের প্রান্তভাগে একটা গৃহের জান্‌লা হঠাৎ খুলিয়া গেল; সেখানে একজন লোক আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ সীসার মত নীলাভ, তাহার চোখ্ কোটরে ঢোকা, তাহার ঠোঁট থর্-থর করিয়া সজোরে কাঁপিতেছে। তাহার হাতে একটা ছুরী; সেই ছুরী হইতে রক্তবিন্দু টপ্-টপ্ করিয়া মাটিতে পড়িতেছে। সেই নিস্তব্ধ মাঠের উপর সে ভাল করিয়া একবার দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল। তাহার পর, মাটির উপর লাফাইয়া পড়িয়া মাঠের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিল।

পোয়াঘণ্টা এই ভাবে চলিয়া, বড় রাস্তার ২০ কদম দূরে, একটা বনের প্রান্তভাগে সে থামিয়া পড়িল। ভয়ানক হাঁপাইয়া পড়িয়াছে। আরও নিবিড় একটা ঝোপ্‌ঝাড়ের জায়গা খুঁজিয়া, শরীরটা কোন রকমে গলাইয়া তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ঝোপ্-ঝাড়ের কাঁটায় শরীর ক্ষতবিক্ষত হইতেছে, কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। তাহার পর সে তাহার ছুরী দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল। যখন একফুট পরিমাণ গর্ত্ত খোঁড়া হইয়াছে, তখন সে তাহার রক্তাক্ত বাহু তাহার মধ্যে

স্থাপন করিল; তাহার পর, মাটি দিয়া গর্ত্তটা ভরিয়া দিল, এবং তাহার উপর ঘাসের চাপ্‌ড়া দিয়া খুব সজোরে পা-দিয়া চাপিয়া দিল; তাহার পর, সেই আর্দ্র তৃণের উপর সে বসিয়া পড়িল।

সমস্ত মাঠ ময়দানের উপর একটা গভীর নিস্তব্ধতা। সে কাণ পাতিয়া কি যেন শুনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এবং মনে হইল, যেন সেই নিস্তব্ধতায় সে ভয় পাইয়াছে।

সেই সময়টা যেন "নরাত্রি নদিবা";—একটা ধূসর বর্ণের আভা তিমির-রাশির স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং সেই আভার মধ্য দিয়া পদার্থ সকল যেন ছায়ার ন্যায় ভাসিতেছে।

তাহার মনে হইতে লাগিল, এই ভীষণ অসীমতার মধ্যে, এই মূক ও অনুজ্জ্বল বাহ্যপ্রকৃতির মধ্যে, সে যেন একা।

হঠাৎ একটা শব্দে সে চমকাইয়া উঠিল; সম্ভবতঃ দেড়ক্রোশ দূরে, রাস্তায় একটা পথ-চল্‌তি গরুর গাড়ীর চাকা হইতে ক্যাঁচ্‌-কোচ্‌ শব্দ হইতেছিল; এই নিস্তব্ধতার মধ্যে এই অদ্ভুত ও বেসুরো শব্দটা আরও যেন স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল।

ক্রমে বাহ্যজগৎ অল্পে অল্পে জাগিয়া উঠিল। জীবন ও সুখের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ একটা আকুল চীৎকারে দিগ্‌বিদিক কাঁপাইয়া পেচক ভূমি হইতে নীল আকাশে সবেগে উত্থান করিল; এক-জাতীয় বিহঙ্গকুল শিশির-সিক্ত বৃক্ষপত্রের মধ্য-হইতে গাহিতে আরম্ভ করিল, পক্ষস্পন্দন করিতে লাগিল। পরিশেষে, "স্বর্ণ কীটের" বিহার-ক্ষেত্র শৈবাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিহঙ্গের আরাম-নিবাস ওক্‌-গাছের উচ্চতম শাখা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই অরুণোদয়ের প্রারম্ভেই—একটা সমবেত সঙ্গীত সমুত্থিত হইল। তাহা কোলাহলের মধ্যেও সুমধুর; তাহা প্রলাপের মধ্যেও মহাশক্তিমান! অকলুষা কুমারীর ন্যায় প্রকৃতি নবযৌবনে বিকশিত হইয়া উঠিল, নবীন কিরণে উদ্ভাসিত হইল। অরণ্যের সর্ব্বাংশেই সৌন্দর্য্য, সরলতা ও কিরণের ঝিকিমিকি; একটা নীলাভ কুয়াসা ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মাঠের যাহা কিছু সমস্তই শান্ত ও সংযত; উহার বৃহৎ রেখাগুলি ঢেউ-খেলাইয়া অসীমে গিয়া মিশিয়াছে; উহার ধূসর আভা নীল আকাশের ঝিকিমিকি-কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

হত্যাকারী উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে, দাঁতে দাঁত লাগিতেছে।

সে তাহার চারিদিকে একটা ভয়বিহ্বল দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল; তাহার পর, খুব সাবধানে গাছের ডালগুলা সরাইয়া, কখন থমকিয়া দাঁড়াইতেছে, কখন চম্‌কাইয়া উঠিতেছে; একটু কিছু শব্দ হইলেই সেইদিকে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতেছে। অবশেষে, যেখানে গাছের ঘন ঝোপের মধ্যে তার ছুরিটা পুঁতিয়া রাখিয়াছিল, সেখান হইতে সে বাহির হইয়া পড়িল।

অরণ্যের আরও গভীর প্রদেশে সে প্রবেশ করিল। পরিষ্কার ফাঁকা জমি, পায়ে-চলা কাঁচা রাস্তা ত্যাগ করিয়া ক্রমাগত অন্ধকেরে স্থান খুঁজিতে লাগিল; বনের শব্দ কাণ পাতিয়া শুনিবার জন্য একএক জায়গায় থামিতে লাগিল।

সমস্ত দিন সে এই ভাবে চলিতে লাগিল; একটুও শ্রান্তি বোধ করিল না—এতই যন্ত্রণার উদ্বেগ তার মনকে অধিকার করিয়াছিল। এইবার একটা "বীচ" বৃক্ষকুঞ্জের প্রবেশ-পথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বীচ-গাছের প্রকাণ্ড গুঁড়িগুলা উর্দ্ধদিকে সোজা উঠিয়াছে;—সাদা ও "তেল-চুক্‌চুকে"—যেন পত্র-পল্লব-শীর্ষ শত শত স্তম্ভ দণ্ডায়মান। দিনটি শান্ত; মধুর নিস্তব্ধতা;—প্রকৃতি-সুন্দরীর মহিমাচ্ছটাকে ও তাহার শান্ত সংযত ভাবটিকে উহা যেন আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছে। নিশ্চল ও শ্যামল পত্রপুঞ্জ হইতে নিঃসৃত ভাস্বর ছায়ার মধ্যে একটা কি সজীব পদার্থ যেন স্পন্দিত হইতেছে বলিয়া মনে হইল। আধো-আঁধারের মধ্যে যেন কোন দেহ-মুক্ত আত্মা মস্তকোপরি ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছে। এবং কতকগুলি রহস্যময় শব্দ গুন্‌গুন-করিয়া উচ্চারণ করিতেছে।

পলাতক, মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি ও অশান্তি

অনুভব করিতেছিল, এবং সরিস্থপের ন্যায় গুড়িগুড়ি চলিয়া একটা খাগ্‌ড়ার ঝাড়ের নীচে গিয়া বসিল; সেই ঘন ঝোপের মধ্যে সে সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন হইল।

যখন দেখিল সে নিরাপদ হইয়াছে, তখন সে প্রথমে মাথায় হাত দিয়া, পরে বুকে হাত দিয়া গুন্‌গুন্‌স্বরে বলিল;—"আমার খিদে পেয়েছে।"

নিজের কণ্ঠস্বরে সে শিহরিয়া উঠিল; হত্যা করিবার পর এই সর্ব্বপ্রথম তাহার নিজের কণ্ঠস্বর শুনিল; তাহার কাণে যেন উহা মৃত্যুর সংকেত-ধ্বনি-রূপে—ভাবী অমঙ্গলসূচক অভিসম্পাৎরূপে প্রতিধ্বনিত হইল।

কিয়ৎ মুহূর্ত্ত সে নিশ্চল হইয়া রহিল; পাছে তার কথা কেহ শুনিয়া থাকে এই ভয়ে সে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া রহিল।

পরে তাহার মন যখন আবার একটু শান্ত হইল,—সে তাহার দুই পকেট্ হাত্‌ড়াইতে লাগিল; পকেটে কয়েকটা পয়সা ছিল।—আস্তে আস্তে বলিল, "এতেই হবে; ৬ ঘণ্টার মধ্যে, আমি প্রান্তসীমা পার হয়ে যাব; তখন আমি লোকালয়ে মুখ দেখাতে পারব, কাজ করতে পারব, রক্ষা পাব।"

এক ঘণ্টার পর. সে অনুভব করিল—তাহার গা-হাত-পা যেন অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, রাত্রে হিম পড়িয়াছিল, এবং তার গায়ে কাপড়ের মধ্যে ছিল শুধু একটা জামা ও শণ-সূতির পেন্টলুন; সে উঠিয়া দাঁড়াইল, খাগ্‌ড়ার ঝোপ্ হইতে সাবধানে বাহির হইয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

ভোর হইলে পর তবে থামিল। সে বনের সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছিল; এখন মাঠের উপর দিয়া চলিতে হইবে, মুক্ত আলোকের ভিতর দিয়া চলিতে হইবে। এই কথাটা মনে হইবামাত্র ভয়ে ভীত হইয়া সে এক-পাও আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না।

একটা ঝোপের মধ্যে যখন সে লুকাইয়া ছিল, সেই সময়ে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইল।

তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল।

মাটীর উপর শুইয়া. সে অস্ফুটস্বরে বলিল;—পাহারা-ওয়ালার দল!

আসল কথা, একজন চাষা লাঙ্গলে এক জোড়া ঘোড়া জুড়িয়া ঐ মাঠে আসিয়াছিল। তার চাবুকের রজ্জুর জট্ ছাড়াইতে ছাড়াইতে তাদের দেশের একটা সুর শিশ্ দিয়া গাহিতেছিল। এমন সময়ে কে যেন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল।

—"জ্যাক্!"

চাষা ফিরিল।

—তুমি "পাচী?" এত সকালে যে আজ?

—আমি ঐ ঝরণার জলে এই কাপড়গুল ধুতে যাচ্চি। ঝরণাটা ত খুব কাছে না।

—আমি যেখানে যাচ্চি সেখান থেকে দু-কদম দূরে। তবে ঐ কাপড়ের বোচ্‌কাটা আমার একটা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দেও না।

—সেই ভাল, তোমার কথা ত ঠেল্‌তে পারি নে। হ্যা গা! তোমার স্ত্রী, ছেলেপুলে, সবাই ভাল আছে ত?

জ্যাক্ "হাঃ হাঃ" করিয়া হাসিয়া বলিল;—

—ওগো! বাড়ীর মধ্যে সব চেয়ে রোগা ছেলেটি আমি। সবাই ভাল আছে, তোফা আছে, সুখে স্বচ্ছন্দে আছে—কাজ কর্ম্মও বেশ চল্‌চে।

সে আবার চাবুকের রজ্জুর জট্ খুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এবং মধ্যে মধ্যে, তাহার চাবুকের আস্ফালন-শব্দে দিগ্‌বিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

হত্যাকারী অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল; তাহার পর একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহার বক্ষ হইতে নিঃসৃত হইল এবং সম্মুখস্থ প্রসারিত মাঠের উপর তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। সে অস্ফুটস্বরে বলিল:—

—যাওয়া যাক্, অনেকটা পথ হাঁট্‌তে হবে; আমি ত এই চব্বিশ ঘণ্টা···সব প্রকাশ হয়ে পড়েছে, আমার খোঁজ হচ্চে; একঘণ্টা দেরী হ'লে আর রক্ষা থাক্‌বে না।

এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া, সে বন হইতে বাহির হইল।

দশমিনিটের পর, একটা গির্জ্জার চূড়া দেখিতে পাইল। তখন একটু আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল; বিরুদ্ধ ভাবের নানা কথা মনোমধ্যে উদয় হইতে লাগিল। ক্ষুধায় মাথা ঘুরিতেছিল; ক্ষুধার জ্বালাতেই সে গ্রামের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। আবার ভয়ের প্ররোচনায় থামিল;—ভাবিল, মানুষের বসতি হইতে দূরে পলায়ন করাই শ্রেয়।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে তরুকুঞ্জের পিছনে ঘুসিয়া গিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ মনের মধ্যে যুঝাযুঝি করিয়া অবশেষে সে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন দেখিল সেখান হইতে ১০০ কদম দূরে কি একটা জিনিস ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

সেটা আর কিছুই নয়—সেটা একটা চাপ্‌রাশের উপর তাঁবার পতর ও মেঠো চৌকিদারের তলোয়ারের হাতল। তাহা দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল এবং অস্ফুট-স্বরে বলিল;—বোধ হয় আমার সঙ্গে পলাতকের বর্ণনার মিল পেয়েছে। এবং থপ্ করিয়া একটু পিছাইয়া গিয়া বাঁ-দিকে প্রসারিত একটা ক্ষুদ্র বনের মধ্যে ছুটিয়া গেল।

ক্ষুধার জ্বালা ভুলিয়া গিয়া, লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। তখন সে কেবল ইহাই ভাবিতেছিল কি করিয়া গ্রাম হইতে পলাইতে পারে, চৌকিদারদের হাত এড়াইতে পারে।

কিন্তু শীঘ্রই সে গ্রামের সীমায় আসিয়া পৌঁছিল। তাহার পরিসর কয়েক বিঘা মাত্র। তাহার পরেই মাঠের আরম্ভ।

স্থানটা চিনিবার উদ্দেশে ডালপালার ভিতর দিয়া মাথা গলাইয়া দেখিতে গিয়া সে দেখিল, একজন লোক তৃণের উপর বসিয়া প্রাতর্ভোজনে ব্যাপৃত। সে আর কেহ নহে সে জ্যাক্—সেই চাষা।

আহারের জন্য সে বেশ একটি সুন্দর কোণ বাছিয়া লইয়াছিল।—একটা ভাঙ্গা-চোরা পাথুরে স্রোত-খাতের মত; তার মধ্য দিয়া, গভীররূপে অঙ্কিত দুইটা রথ্যা গিয়াছে, কিন্তু তার ফাট্‌ধরা ও আব্‌ড়ো-খাব্‌ড়ো জমির উপর ঘাস ও শেওলা যেন গালিচা বিছাইয়া দিয়াছে; এবং তার দুইধারে নানাপ্রকার লতা গাছ জন্মিয়াছে; নিপুণ চিত্রশিল্পী শরৎ লক্ষ্মী যেন নিজের খেয়াল অনুসারে কাহারও পত্রপুঞ্জ সবুজ, কাহারও হলুদে, কাহারও নীলরঙ্গে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছেন।

রথ্যাদুটি নির্ম্মল জলে পূর্ণ; তাহার তলায়, সাদা মসৃণ স্বচ্ছ ছোট ছোট নুড়ি মণির মত জ্বলিতেছে। এই "নীড়" খানি বার্চ-তরু পুঞ্জের ছায়ায় ঢাকা; বার্চ গাছের গুঁড়িগুলা বলি-রেখাঙ্কিত ও রজতাভ, তাহার সরু পত্রপুঞ্জ মুহুর্ম্মুহু কম্পিত হইতেছে।

এই মরু-উদ্যানটির ওধারে চষা ক্ষেতের জমি গড়াইয়া চলিয়াছে, তাহার উপরে সাদা কাশ রজত-জালের মত ভাসিতেছে ও ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। এক খণ্ড কালো রুটি, আর তার সঙ্গে খানিকটা পনির—প্রাতভোজনে ইহাই তাহার আহার। আর পানীয়ের মধ্যে, রথ্যার যে জল জমিয়া গিয়াছে, সেই বরফগলা জল। এই হৃষ্টপুষ্ট বলবান চাষার সাদা দাতগুলা, এক এক কামড়ে ঐ কালো রুটির মধ্যে নিমজ্জিত হইতেছে—এমনি তীব্র ক্ষুধা। এই ক্ষুধা দেখিয়া ধনীলোকেরও এইরূপ সাদা-সিধা আহারে প্রবৃত্তি জন্মে। কিছু দূরে তাহার দুইটা চাষের ঘোড়া ভ্রাতৃভাবে এক বাল্‌তি হইতেই শুকনা কাটাঘাস খাইতেছে। আর চাষা মধ্যে মধ্যে বন্ধুভাবে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া দুই একটা আদরের কথা বলিতেছে।

হত্যাকারী অস্ফুটস্বরে বলিল:—

—"ও বেশ সুখী।" পরে মনে ভাবিল:—

—হাঁ, কাজকর্ম্ম, পারিবারিক ভালবাসা!...শান্তি ও সুখ সবই ওর আছে...

জ্যাককে অভিবাদন করিয়া একটু রুটি চাহিবার জন্য তাহার লোভ হইল; নিজের ছেঁড়া-কুটিকুটি কাপড়ের উপর নজর পড়ায় সে আর তার সামনে যাইতে পারিল না। আরও তার মনে হইল, তার মুখের উপর তার দুষ্কর্ম্মের যেন একটা ছাপ্ পড়িয়াছে—তার চেহারাই তাকে অপরাধী বলিয়া ঘোষণা করিবে।

একটা পায়ের শব্দ শুনিয়া সে ঘাড় ফিরাইল এবং ডালপালার ফাঁকের মধ্য দিয়া দেখিল, ছিন্নবস্ত্র এক বৃদ্ধ নত হইয়া চলিতেছে,—হাতে একটা ছড়ি, কোমর হইতে দড়ি দিয়া বাঁধা একটা ঝুলি ঝুলিতেছে।

সে একজন ভিখারী।

তাহাকে দেখিয়া হত্যাকারীর হিংসা হইল। আর মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিল :—

"আহা! আমি যদি ভিখারী হতাম। ও ভিক্ষা করে বটে, কিন্তু স্বাধীন; মুক্ত বাতাসে সূর্য্যের মুক্ত আলোয় স্বচ্ছন্দে যাওয়া-আসা করচে; মনের মধ্যে কোন অশান্তি নেই; ভিক্ষা-লব্ধ রুটি সে নির্ভয়ে মনের সুখে খাচ্চে। পিছন দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে, কোন শবের মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাবে না, পাশের দিকে তাকালে কোন পাহারাওয়ালা দেখ্‌তে পাবে না, সম্মুখ দিকেও ফাঁসি কাঠের ছায়ামূর্ত্তি দেখ্‌তে পাবে না। হাঁ, ঐ বুড়ো ভিখারীটা সুখী, ওকে দেখে সত্যই হিংসা হয়।"

হঠাৎ তার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এবং মৃগী-রোগীর মুখের মত তার মুখের চাম্‌ড়া কুঁচ্‌কিয়া গেল। রাস্তার একটা বিশেষ স্থানে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল :—"ঐ তারা!"

চোখ্ কোটরে ঢোকা, বিক্ষিপ্তচিত্ত, ভয়ে পাগলের মত—সে চারিধারে ছুটিতে আরম্ভ করিল, কোথায় লুকাইবে সেই জায়গা খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু ভয়ে এরূপ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে সে কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না, কোন প্রকার চিন্তা করিবারও তার শক্তি ছিল না।

এই সময়ে প্রহরীরা সত্বর আসিয়া পৌছিল।

ঘোড়াদের দৌড়ের পদশব্দে ও অস্ত্র-শস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় হঠাৎ তাহার প্রত্যুৎপন্নমতি ফিরিয়া আসিল এবং দুষ্প্রবেশ্য ঘন-পল্লব-যুক্ত এক ছায়াতরু দেখিতে পাইয়া চটুল কাঠবিড়ালীর ন্যায় সেই গাছে উঠিয়া পড়িল।

এই সময়ে কয়েক কদম দূরে, দুইজন প্রহরী রাস্তার উপর থামিল।

নিশ্চল ও ভীতিবিহ্বল হইয়া সে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল। মনের মধ্যে এমন একটা দারুণ উদ্বেগ হইতেছিল যে সে তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন পর্য্যন্ত শুনিতে পাইতেছিল। একজন প্রহরী বলিল :—

—"ঐ বনটা একবার খুঁজলে হয় না?" অপর প্রহরী উত্তর করিল :—

—ও বন্‌টা নিতান্তই ছোট; সে লোকটা ওখানে আশ্রয় নেবে বলে মনে হয় না, কোন অরণ্যের মধ্যে বোধ হয় লুকিয়ে আছে।—"তা হোক, একবার খোঁজ করা ভাল।" অপর প্রহরী বলিল :—"না তাহলে সময় নষ্ট হবে; খুনী লোকটা আমাদের দশ ঘণ্টা আগে বেরিয়েছে।"

তারা দুল্কী চালে ঘোড়া হাঁকাইয়া প্রস্থান করিল।

তখন হত্যাকারী হাঁপ ছাড়িল; ধড়ে যেন তার প্রাণ আসিল। মনের এই দারুণ যন্ত্রণাটা চলিয়া গেলে, মুহূর্ত্তপরে আবার তার কষ্ট হইতে লাগিল। সে বলিয়া উঠিল :—

—"বাবারে! ক্ষুধার জ্বালায় মলাম!"

সে ৪৮ ঘণ্টা কিছুই খায় নাই।

তার পা-দুইটা নুইয়া নুইয়া পড়িতেছিল, চোখে যেন সর্ষেফুল দেখিতেছিল, কানে যেন ভ্রমর-গুঞ্জন শুনিতেছিল।

তথাপি গ্রামে গিয়া ভিক্ষা করিবার কথা তার মনে আর স্থান পাইল না। পাহারাওয়ালা! ফাঁসি কাঠ! এই দুই ছায়ামূর্ত্তি ক্রমাগত তাহার সম্মুখে খাড়া হইয়া উঠিতেছে এবং তার ক্ষুধাকে পর্য্যন্ত দমাইয়া রাখিতেছে।

মাঠের শব্দে সে উদ্বিগ্ন হইতেছিল এবং হঠাৎ মৃত্যু জ্ঞাপক একটা ঘণ্টাধ্বনি হওয়ায় শিহরিয়া উঠিল।

গ্রামের গির্জ্জাঘড়িতে ঐ মৃত্যু-ঘণ্টা বাজিতেছিল; হত্যাকারী পাণ্ডুমুখ হইয়া, উদ্বিগ্ন হইয়া, সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনিতেছিল। ঘণ্টার প্রতি আঘাতে শিহরিয়া উঠিতেছিল, ঘড়ির হাতুড়ীটা যেন তার হৃদয়ের উপর আঘাত করিতেছিল।

তাহার পর, তাহার চোখ্ হইতে মোটা মোটা অশ্রু-

বিন্দু কপোল বাহিয়া ঝরিতে লাগিল। সে তাহা টেরও পায় নাই, মুছিতেও চেষ্টা করে নাই।

এই সমাধিযাত্রার ঘণ্টাধ্বনি তাহার কল্পনাপটে যে ছবি আঁকিয়াছিল তাহা বড়ই ভয়ানক ও হৃদয় বিদারক।

এই একই সময়ে আর এক গ্রামের গির্জ্জা-ঘড়ি হইতে মৃত্যুধ্বনি বাজিয়া উঠিল; একটি দরিদ্রা তরুণ বয়স্কা রমণী; তাহার মুখমণ্ডলে অশ্রুময় জীবন, কষ্টের জীবন, নৈরাশ্যের জীবন যেন মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে একটা শবাধারে স্থাপন করা হইয়াছে; ছুরীর আঘাতে তাহার কণ্ঠ এফোঁড়-ওফোঁড় হইয়া গিয়াছে। প্রথমে তাহাকে গির্জ্জায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাহার পর এখন তাহাকে সমাধিভূমিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

তিনটি সুন্দর শিশুসন্তান শবাধারের পিছনে পিছনে চলিয়াছে; আর মনে মনে ভাবিতেছে, তাহাদের মাকে কেন উহার ভিতর রাখা হইয়াছে, কেন পিতা তাহাদের নিকটে নাই। হত্যাকারী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"হা হতভাগ্য! হতভাগ্য!"

সে আবার সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইল; সেই ধ্বনি তাহার নিকট হতভাগিনীর আর্ত্তনাদ বলিয়া মনে হইল;—সে আস্তে আস্তে অস্পষ্ট স্বরে বলিল ঃ—

—হা! আলস্যই যত অনিষ্টের মূল। এই আলস্যই আমাকে শুঁড়িখানায় নিয়ে গিয়েছিল—আর শুঁড়ীখানায় যাবার ফল ঃ—তিনটি অনাথ শিশু, একটি নিহতা রমণী, আর আমি!...আমি সেই পিশাচ যে সকলেরই ঘৃণার পাত্র; হিংস্র জন্তুর মত যাকে সবাই তাড়া করেছে; আর যতক্ষণ না আমাকে ফাঁসি-কাঠের কাছে নিয়ে যেতে পারে ততক্ষণ তাদের আর বিশ্রাম নেই, বিরাম নেই।...ওঃ! ভয়ানক, ভয়ানক নিয়তি!

নিশাগম পর্য্যন্ত সে সেই বৃক্ষের মধ্যেই রহিল। যখন দেখিল আকাশে তারা ফুটিয়াছে, যখন সেই বিশাল নিস্তব্ধতার মধ্যে নিদ্রিতা ধরণীর নিঃশ্বাসের ন্যায় একটা অস্পষ্ট ও মৃদুমন্দ অনিল প্রবাহের শব্দ শুনিতে পাইল, তখন সে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিল।

গাছের তলায় সটান শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিল; কিন্তু তখনও ভয় যায় নাই, ক্ষুধায় জঠরানল জ্বলিতেছিল, কাজেই ঘুম হইল না; সারাক্ষণ জাগিয়াই রহিল। অরুণের প্রথম আলোকেই সে উঠিয়া পড়িল। তখন একেবারে অভিভূত; উদ্বেগে, ক্লান্তিতে, তিন দিনের উপবাসে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

কয়েক ঘণ্টার পর, বনের ক্ষুধা-উদ্রেককারী হাওয়ার গুণে উহার ক্ষুধা আরও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে; ক্ষুধার যন্ত্রণায় তার সমস্ত ভয় ভাঙ্গিয়া গেল। এবং এইরূপ অনুভব করিল যেন তাহার শূন্যগর্ভ মস্তিষ্কের মধ্যে বুদ্ধিটা টলমল করিতে আরম্ভ করিয়াছে; তখন সে গ্রামে গিয়া খাদ্য ভিক্ষা করিবে বলিয়া স্থির করিল।

তাহার কাপড়ে যে-সব তৃণ লাগিয়াছিল, সে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিল, কাপড় ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া পরিল, এলো-মেলো চুলে একবার হাত বুলাইয়া লইল, তার পর বন হইতে বাহির হইয়া দৃঢ় সংকল্পের সহিত মাঠের উপর দিয়া চলিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট পরে, গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। শ্রান্তি-অভিভূত ব্যক্তির ন্যায় মাটির দিকে মাথা নোয়াইয়া, বামে ও দক্ষিণে আড়-চোখে সতর্কভাবে দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। মৎলবটা—বিপদের প্রথম আবির্ভাবেই পলায়ন করিবে।

গির্জ্জার অদূরে, অর্থাৎ সেই গ্রামের মধ্যস্থানে, একটা শুঁড়ির দোকান দেখিতে পাইল। তার শান্ত বাহ্য-আকার-প্রকার দেখিয়া সে আশ্বস্ত হইল। যখন দেখিল, তাহার ভিতর হইতে কোন গান, বা চীৎকার বা ঝগ্‌ড়া-ঝাঁটির শব্দ বাহির হইতেছে না, উহা প্রায় পরিত্যক্ত ও জনশূন্য, তখন সে প্রবেশ করিবে বলিয়া স্থির করিল। শুঁড়ীখানার কর্ত্তা একজন

নিরেট্ চাষা, চওড়া কাঁধ,—মুখে বেশ একটা তাজা ও প্রফুল্লভাব। সে জিজ্ঞাসা করিল :—"ওগো তোমার কি চাই?" হত্যাকারী উত্তর করিল :—

—"একটু রুটি ও একটু সরাপ।" এই কথা বলিয়া সে একটা টেবিলের সামনে বসিয়া পড়িল। টেবিলটা একটা জান্‌লার ধারে স্থাপিত। সেখান হইতে একটি উদ্যান দেখিতে পাওয়া যায়।

আহার-সামগ্রী তাহার পাত্রে দেওয়া হইল। শুঁড়ীখানার কর্ত্তা তাহাকে বলিল:—

—"এই লও রুটি, এই লও সরাপ, এই লও পনির।" হত্যাকারী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া থপ্ করিয়া বলিল :—

—আমি কেবল একটু রুটি আর সরাপ চেয়েছিলাম।

—সে কি কথা! পনির ও রুটির বিষয়—সে আমি বুঝ্‌ব। গরিবের ছাবাল, তোমার চেহারায় ত পয়সাওয়ালা বলে মনে হয় না। আমার মনে হয় তোমার শরীরে একটু বলের দরকার। আহার কর, সরাপ খাও—তোমার আর কিছু ভাব্‌বার দরকার নেই।

—বড় অনুগ্রহ বড় অনুগ্রহ।

এই সময়ে ঘন-ঘন ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল। হত্যাকারী জিজ্ঞাসা করিল।

—ওকি? ঘণ্টা বাজাচ্ছে কেন?

—গির্জ্জায় "মাস" পূজা শেষ হয়ে গেল।

—"মাস"-পূজা! আজকের বারটা তবে কি?

—"রবিবার; ওহো! তুমি বুঝি খৃষ্টান নও! দেখো, এখনি এখানে তোমার কতকগুলি সঙ্গী জুট্‌বে।

হত্যাকারীর মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। একবার তার মনে হইল, ঘর হইতে এখনি ছুটিয়া বাহির হই, কিন্তু একটু বিবেচনার পর বুঝিল, তাহা হইলে নিশ্চিত বিপদ; সাবধানতার প্ররোচনায় সে ঐখানেই থাকা স্থির করিল।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়াছে এমন সময় মদ্যপায়ীর দল ঝাঁকে ঝাঁকে শুঁড়ীখানায় প্রবেশ করিল। শুঁড়ীখানা লোকে ভরিয়া গেল। হত্যাকারী পানাহারে বিরত হইল না; তবে, জান্‌লার দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল, যতটা পারে মুখ ঢাকিবার চেষ্টা করিল।

এইরূপে পোয়াঘণ্টা কাল কাটিয়া গেল। হত্যাকারীর নিকট এই পোয়াঘণ্টাই যন্ত্রণা ও উদ্বেগপূর্ণ একশতাব্দী বলিলেও হয়। এক-একটা সামান্য তুচ্ছ কথায় তার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া যাইতে লাগিল, সে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে বাহির হইবার জন্য উঠিয়া পড়িল। একজন মদ্যপায়ী বলিয়া উঠিল :—

—এই যে আমাদের জমাদার সাহেব।

হত্যাকারী লাফাইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি কপালের কাছে হাত লইয়া গেল; হৃৎপিণ্ডে রক্ত ছুটিয়া আসিল, হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত মস্তকে উঠিল; মনে হইল যেন মৃগীরোগে আক্রান্ত হইবে।

অল্পে অল্পে আবার প্রকৃতিস্থ হইল; কিন্তু শরীরে আর বল পাইল না। এইরূপ একটা প্রবল ঝাঁকানির পর একটা দৌর্ব্বল্য আসিল, একটা স্নায়ুঘটিত কম্পন আরম্ভ হইল; সে তখন স্বল্পমাত্র চেষ্টা করিতেও অসমর্থ হইল।

জমাদার সাহেবকে আসিতে দেখিয়া, টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া সে নিদ্রার ভাণ করিল।

দেশের লোকে জমাদার সাহেবকে কতটা সম্মান করে, তাহাদের সাদর অভ্যর্থনাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। সকলে সসম্ভ্রমে টেবিলের নিকট তাহার একটা জায়গা করিয়া দিল। জমাদার উত্তর করিল :

—বেশ ভাই, বেশ ভাই। একটু কড়ে-আঙ্গুল-ভোর সরাপ হলেও হয়—তোমরা দিচ্ছ, "না" বল্‌তে ত পারিনে।

তবে কি জান, এখানে বসে আমি আরাম করব; তাতে সরকারী কাজের ক্ষতি হতে পারে।

—সরকারী কাজ! রেখে দিন! আজ রবিবার; রবিবারে চোর-ডাকাতেরও বিশ্রাম করা চাই।

—চোর-ডাকাতের সম্বন্ধে তা হতেও পারে; কিন্তু খুনীদের কথা জুদো।

—খুনী! বলেন কি জমাদার সাহেব?

—তবে কি "স্যাদিদিয়ের" ব্যাপারটা তোমরা জান না?

—কৈ না; ব্যাপারটা কি বলুন-না জমাদার সাহেব।

—তা ইচ্ছে-করেই তোমাদের কাছে আমি বল্‌চি শোনো। কেন না, যে বদমাইসটাকে আমরা পাক্‌ড়াবার চেষ্টা করচি, তার আকৃতির বর্ণনা শুনে যদি তোমরা তার কোন সন্ধান দিতে পার।

এই সময়ে হত্যাকারীর বুক ধড়াস্-ধড়াস্ করিতে লাগিল, মনে হইল বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া যাইবে।

—সে একজন রাজমিস্ত্রী, তার নাম "পিকার"।

—সে কাকে খুন করেছে?

—তার স্ত্রীকে।

—কি সর্ব্বনাশ! সে তার কি করেছিল?

—যখন তার স্ত্রীকে সে প্রহার কর্‌ত, তখন তার স্ত্রী নীরবে কেবলই কাঁদ্‌ত। ছেলেরা না খেতে পেয়ে মারা যাচ্চে, সে তা চোখে দেখ্‌তে পার্‌ত না। কাজেই কখন কখন শুঁড়ির বাড়ী গিয়ে স্বামীর কাছে ছেলেদের জন্য খাবার চাইতে যেত। এই ত তার অপরাধ, বেচারী! এই জন্য সে গত বৃহস্পতিবার রাত্রে তাকে ছুরীর খোঁচা মেরে হত্যা করেছে। ২৫ বৎসর মাত্র তার বয়েস। সে লোকটা ওর স্ত্রীর পায়ের ধুলোরও যোগ্য নয়। স্ত্রীর পায়ের ধুলো তার মাথায় নেওয়া উচিত। সে কাজকর্ম্ম কর্‌ত, স্বামীকে ও ছেলেদের সেবা শুশ্রূষা কর্‌ত; আর তার প্রতিদানে কি না কেবলই প্রহার, আর যার-পর নাই কষ্ট ভোগ।

একজন যুবক টেবিলের উপর সজোরে কিল মারিয়া বলিয়া উঠিল:—

"পাজি সয়তান! তার যে দিন গলা কাটা যাবে, আমি আমোদ করে' সেদিন দেখ্‌তে যাব।" জমাদার বলিল—

—এই জন্যই ত সেই লোকটার আকৃতির বর্ণনা তোমাদের জানা উচিত, তাহলে আবশ্যক হলে তোমরাই তাকে পাকড়াও করতে পারবে। আমরা জানি সে লোকটা এখানকারই আশ্‌পাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে।

এই বলিয়া জমাদার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। হত্যাকারীও কাণ পাতিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিল। যে উদ্বেগের জ্বালায় তার শোণিত তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত হইতেছিল, খুব চেষ্টা করিয়া সে তাহা সামলাইয়া লইল। জমাদার একটা কাগজ সামনে ধরিয়া বলিলেন:—

—এই দেখ পিকারের আকৃতির বর্ণনা-পত্র:—

দেহের উচ্চতা মাঝামাঝি; ঘাড় খাটো; কাঁধ চওড়া; হনু-দেশ বাহির করা; নাক মোটা; চোখ কালো; দাড়ির রং লাল্‌চে; ঠোঁট সরু; কপালে একটা শাম্‌লা দাগ।

পরে কাগজটা আবার ভাঁজ করিয়া রাখিয়া জমাদার বলিলেন:—

—এখন তোমরা তাকে দেখ্‌লেই চিন্‌তে পারবে—পারবে না কি?

—এ রকম বর্ণনা পেলে ভুল করা অসম্ভব।

—আচ্ছা এখন তবে সেলাম। আমি আমার শীকারে চল্লুম।

হত্যাকারীর নিঃশ্বাস রোধ হইয়া আসিয়াছিল; জমাদার খানিকটা দূরে চলিয়া গেলে হত্যাকারী গণনা করিয়া দেখিল, সেখান হইতে গ্রামের প্রান্তসীমা কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান মাত্র। ভাবিল, তাহা হইলে সে পলাইতে পারিবে।

টেবিল হইতে মাথা যেই তুলিল অমনি জমাদারের মোটা বুট্‌জুতার শব্দ দিক্‌-পরিবর্ত্তন করিয়া হঠাৎ তাহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল। টেবিলের যেখানে সে বসিয়াছিল তার দুই কদম দূরে জমাদার সাহেব থামিলেন; হত্যাকারীর মনে হইতে লাগিল, জমাদারের

দৃষ্টি যেন একটা পাথরের মত তাহার উপর চাপিয়া আছে। তার রক্ত চম্‌চম্‌ করিয়া উঠিল। গাত্রের সমস্ত লোমকূপ হইতে শীতল ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতে লাগিল। আর তার মনে হইল যেন তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে। জমাদার বলিয়া উঠিলেন :—

—হাঁ হাঁ! এ লোকটার ঘুম যে আর ভাঙ্গে না। —এবং তার কাঁধের উপর একটা থাপ্পড় মারিয়া বলিলেন :—

—ওহে বন্ধু, মুখটা একটু দেখাও দিকি, এটা ঠিক কৌতূহল নয়;—তবে, তোমার মুখখানি দেখতে আমার বড় ইচ্ছে হচ্চে।

পিকার থপ্‌ করিয়া মাথা তুলিল; মুখে ভয়ের ভাব; একেবারে নীল হইয়া গিয়াছে; মুখের চামড়া কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। তাহার রক্তবর্ণ চোখ হইতে বিদ্যুৎ ছুটিতেছে; এবং তাহার সরু চাপা ঠোঁট থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। দশজন লোকের কণ্ঠ একসঙ্গে বলিয়া উঠিল :—

—"এ সেই রে!"

জমাদার তার গলার কলারটা ধরিবার জন্য হাত বাড়াইলেন কিন্তু হস্তস্পর্শের পূর্ব্বেই হত্যাকারী জমাদারের চোখে এমন জোরে দুই ঘুসি কশাইয়া দিল যে জমাদার অন্ধ হইয়া পড়িলেন; তাহার পর সে জানলা হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া, উদ্যানের মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

এই কাণ্ড দেখিয়া সেই যুবকের দল প্রথমে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল—পরে একটু সামলাইয়া উঠিয়া ঐ ২০ জন হত্যাকারীর পিছনে পিছনে ছুটিল! কিন্তু হত্যাকারী তাদের আধ মিনিট আগে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল; এবং যে লোক খুব বলিষ্ঠ ও আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাহার শক্তিকে শতগুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে তাহার পক্ষে এই আধ মিনিটের ব্যবধানও বড় কম ব্যবধান নহে।

আহারে বল সঞ্চয় করিয়া তাহার পেশীগুলা যেন ইস্পাতের মত শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। একলাফে সে বাগানের বেড়া লঙ্ঘন করিয়া মাঠে গিয়া পড়িল, এবং দশমিমিটের মধ্যেই গ্রাম ছাড়াইয়া প্রায় এক ক্রোশ দূরে চলিয়া গেল।

যখন সে দেখিল, শত্রুদের দৃষ্টি এড়াইয়াছে, তখন সে হাঁফ ছাড়িবার জন্য একটু থামিল; সে এতটা হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল যে, এই রকম আর ২০ মিনিট ছুটিয়া চলিলে সে নিশ্চয়ই অচেতন হইয়া পড়িত।

কিন্তু সবে একটু বসিয়াছে এমন সময় একটা তুমুল চীৎকার তাহার কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল। সে উঠিয়া কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল।

"এ যে তারাই!"

এখন উপায় কি?—এখন সে শ্রান্ত ক্লান্ত; হাঁপাইতেছে; আর দৌড়াইতে পারে না। আর তারাও ঐখানে আসিয়া পড়িয়াছে।

নৈরাশ্যের দৃষ্টিতে সে চারিদিক দেখিতে লাগিল। সর্ব্বত্রই মাঠ ধু ধু করিতেছে; এমন একটি শৈলখণ্ড নাই, খোয়াড় নাই, গাছের ঝোপ নাই যেখানে সে লুকাইতে পারে।

হঠাৎ খাগড়া-ঘেরা একটা জলাভূমি দেখিতে পাইয়া তাহার চোখ জলজল করিয়া উঠিল। "একবার চেষ্টা করে দেখা যাক্‌।" সে কষ্টেসৃষ্টে কোন রকমে জলাভূমি পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া তাহার জলে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইল। কতকগুলা খাগড়া ও জলজ গাছপালা কুড়াইয়া তাহার মাথার উপর স্থাপন করিল; এবং সেইখানে এরূপ নিশ্চল হইয়া রহিল—ঠিক্ যেন একটা টবে গাছের শিকড় নামিয়াছে। যখন সেই ২০ জন চাষা ঐ জলার ধারে আসিয়া পৌঁছিল তখন তাহার জল আর্শির মত আবার শান্ত ও স্থির হইয়া গিয়াছে। জমাদার সবার আগে ছিল। শুঁড়িখানার কর্ত্তার সেবাশুশ্রূষায় জমাদার আঘাত-জনিত ক্ষণিক বিহ্বলতা হইতে শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিয়াছিল। জমাদার তাঁহার অশ্বপৃষ্ঠ হইতে বলিয়া উঠি-

লেন,—"তাই বটে।" তাহার পর চারি দিক অবলোকন করিয়া বলিলেন;—"হতভাগাটা কোথায় না জানি গেল।" একজন চাষা বলিল;—"এ ভারী অদ্ভুত ব্যাপার, এই পাঁচ মিনিট আগে আমি তাকে দেখেছিলাম, আর এখন কেউ কোথাও নেই! অথচ দুইক্রোশ ধরে চারি দিক একেবারে খোলা; এমন একটা মাটির ঢিবি নেই, এমন একটা গর্ত্ত নেই, যেখানে তার নাকের ডগাটি পর্য্যন্ত লুকিয়ে রাখ্‌তে পারে।" জমাদার বলিলেন:—

—সে এখান থেকে দূরে আছে বলে মনে হয় না; এসো আমরা এক-এক দল পৃথক্ হয়ে সমস্ত মাঠটা খুঁজে বেড়াই। একটা আ'লও বাদ দেওয়া হবে না; তারপর এখানে এসে আবার খুঁজব।

খুনী দেখিল, দলের সব লোক এদিকে ওদিকে চলিয়া গিয়াছে।

সে সমস্তক্ষণ জলার মধ্যে নিশ্চলভাবে ছিল। তার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। পাছে তার চারি পাশের জল নাড়া পায়, মাথার উপর যে সব খাগ্‌ড়া ও তৃণ-রাশি ছিল পাছে সে সব বিচলিত হয়, এই ভয়ে সে একটু নড়িতেও সাহস করিল না।

ঘণ্টাখানেক ধরিয়া সে একই জায়গায় স্থিরভাবে রহিল। মাঠদিয়া চলিবার পায়ের শব্দ সে খুব মন-দিয়া শুনিতেছিল; স্বল্পমাত্র প্রতিধ্বনিও তার কাণ এড়াইতে পারে নাই।

অবশেষে আবার সেই চাষার দল সেই জলার চারিদিকে আসিয়া সমবেত হইল। ভয়ানক রুষ্ট হইয়া জমাদার বলিয়া উঠিলেন:—"আঃ! কি আপদেই পড়া গেছে। বদমাইসটা দেখ্‌ছি আমাদের হাত-ছাড়া হয়েছে; কিন্তু, আর কোথায় নাজানি সে যেতে পারে!" একজন চাষা বলিল:—"বোধ হয় সে যাদু জানে।" জমাদার বলিলেন:—

—যাদুকর হোক্ আর যাই হোক্, আমি তাকে ছাড়চিনে। আমার ঘোড়াকে এখানে জল খাইয়ে, আমাদের মধ্যে দুজন চল সীমাপ্রান্তের দিকে যাই; সেইদিকে নিশ্চয় সে গেছে। জমাদার জলার দিকে ঘোড়া লইয়া গিয়া, যেখানে পলাতক তৃণরাশির নীচে লুকাইয়া ছিল ঠিক সেইখানে গিয়া থামিলেন। ঘোড়াটা গলা লম্বা করিয়া দিয়া নিঃশ্বাস টানিয়া খুব জোরে সেই নিঃশ্বাস ছাড়িয়া দিল। তাহার পর পশ্চাতে ঘাড় ফিরাইল, সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইতে রাজি হইল না।

পিকার তার গালের উপর ঘোড়ার নিঃশ্বাসের তাপ অনুভব করিতেছিল।

জমাদার ঘোড়াকে জোর করিয়া জলায় লইয়া যাইবার জন্য ঘোড়ার কাণে একটু চাবুক মারিলেন; কিন্তু ঘোড়া দুই কদম পিছু হটিল; কি প্রহার, কি আদর, কিছুতেই তার প্রভু তাকে বাধ্য করিতে পারিল না। ঘোড়ার এই "আড়ি করায়" জমাদার অভ্যস্ত না থাকায় রোষ সহকারে বলিয়া উঠিলেন।—

—"বাপু হে! আমাদেরও জেদ্ আছে। দেখা যাক্ কার কথা বজায় থাকে।"

এই বলিয়া তিনি বেচারী ঘোড়াকে বিধিমতে শাসন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন—ঘোড়া বিপদ আসন্ন বুঝিতে পারিয়া হঠাৎ বাঁ-দিকে ফিরিয়া একটু দূরে জলার মধ্যে প্রবেশ করিল। জমাদার বলিল:—"এইবার, বাছাধন পথে এসেছে!" ঘোড়া জল পান করিতে লাগিল। জমাদার চাষাদিগকে বলিলেন;—এইবার তোমরা গ্রামে ফিরে যেতে পার। আমার ঘোড়া আর আমি—আমরা এই কাজের ভার নিলুম।

জমাদারের সফলতার জন্য শুভ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া চাষারা প্রস্থান করিল। তাহার পর, জলপানে ঘোড়ার পিপাসা নিবৃত্তি হইলে পর, ঘোড়া জলা হইতে বাহির হইল এবং প্রভুর কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা লাভ করিয়া মাঠ দিয়া ছুটিয়া চলিল।

হত্যাকারী একাকী রহিল।

শীতে শরীর অসাড় হইয়া পড়িতেছে তবু সে সোয়া-ঘণ্টা-কাল সেইখানেই কাটাইল; আশ্রয়স্থান ত্যাগ করিতে সাহস হইতেছিল না।

অবশেষে জলা হইতে সে বাহির হইল। গা হইতে

জলধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। মাথা ও কাঁধ জলজ্ তৃণে আচ্ছন্ন; আর সেই তৃণগুলা তাহার গায়ে ও তাহার কাপড়-চোপড়ে আঁটিয়া ধরিয়াছে। শরীর শীতে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। মুখ মড়ার মত ফ্যাকাসে। সেই শূন্য মাঠের সুদূর পর্য্যন্ত একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবে মনে করিয়া কি কথা গুন্‌গুন্ করিয়া বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু কিছুক্ষণ তাহার দাঁতে দাঁতে এমন জোরে ঠোকাঠুকি হইতে লাগিল যে, কোন কথা তার মুখ দিয়া বাহির হইল না। অবশেষে অস্পষ্টস্বরে শুধু এই কথাটি বলিল :—"বেঁচে গেছি!"

তারপর, আবার একটা গভীর অবসাদ ও নিরুৎসাহের ভাব তাহার মুখে প্রকাশ পাইল।

—হাঁ, বেঁচে গেছি বটে– কিন্তু সে কেবল ঘণ্টাখানেকের জন্য!—জমাদার প্রান্তসীমায় আমার জন্য অপেক্ষা করচে, পাহারাওয়ালারা আগেই এসে বসে আছে; গ্রামের সমস্ত লোক আমার পিছনে ছুটেচে; সাধারণ শত্রুকে,—হিংস্র জন্তুটাকে পাক্‌ড়াবার জন্য আবার এখনই শীকার আরম্ভ হবে। কেবলই ধর-পাকড় ধস্তাধস্তি—ধর-পাকড় ধস্তাধস্তি—একটু বিরাম নেই,—একটু দয়াও নেই। সকল লোকই আমার বিরুদ্ধে; ভগবানও আমার বিরুদ্ধে—ভগবানের নিকটেই ত আমি অপরাধী! আর পারিনে—আর আমার শক্তি নেই।

এইরূপ বলিতে বলিতে, গাত্রলগ্ন তৃণগুলা সে যন্ত্রবৎ ছাড়াইতে লাগিল।

চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। এই নিস্তব্ধতায় যেন সে ভীত হইয়া পড়িল।

সে তাহার অন্তরের মধ্যেও এইরূপ একটা শীতল, বিষাদময় জনশূন্য নিস্তব্ধতা অনুভব করিতে লাগিল।

তারপর, দুই হাতে মাথা ধরিয়া পাঁচ মিনিটকাল চিন্তায় নিমগ্ন হইল। অবশেষে স্থিরপ্রতিজ্ঞার স্বরে বলিয়া উঠিল :—

—"যাওয়া যাক্!"

সে যে গ্রাম হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল, আবার সেই গ্রামের দিকে চলিতে লাগিল।

এক ঘণ্টা পরে,—জমাদার যে শুঁড়ীখানায় তাকে ধৃত করিতে পারে নাই, সে সেই শুঁড়ীখানার মধ্যেই প্রবেশ করিল।

যে সকল চাষা তাহার অনুধাবনে বাহির হইয়াছিল, তাহারা সকলেই আবার এখানে জড় হইয়াছে দেখিল! তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া বলিয়া উঠিল :—

—"সেই খুনী রে!" হত্যাকারী শান্তভাবে উত্তর করিল,—হাঁ, আমি সেই খুনী পিকার, আমি আপন ইচ্ছায় ধরা দিচ্চি। পাহারাওয়ালাদের খবর দেও।

এই কথা বলিয়া সে শুঁড়ীখানার মধ্যস্থলে শান্তভাবে ও নির্ব্বিকার-চিত্তে বসিয়া পড়িল।

শীঘ্র দুইজন পাহারাওয়ালা আসিয়া উপস্থিত হইল। আগের দিন, এল্‌ম্-গাছের নিকটে যাহাদিগকে সে দেখিয়াছিল, ইহারা সেই পাহারাওয়ালার দল।

সে দেখিয়াই তাহাদিগকে চিনিতে পারিল। নিস্তব্ধভাবে তাহাদের নিকট সে হাত বাড়াইয়া দিল; পাহারাওয়ালারা তাহার হাতে হাত-কড়ি লাগাইয়া তাহাকে নিকটস্থ থানায় লইয়া গেল। যতদিন না তাহাকে স্থানান্তরিত করা হয় ততদিন সেইখানেই সে হাজতে রহিল।

সে দেখিল, সে এখন একাকী। জেলখানায় আবদ্ধ। দুইজন প্রহরী দ্বার আগ্‌লাইতে ছিল। হত্যাকারী, একটা কয়েদীর-খাটিয়ার উপর ঝাঁপাইয়া গিয়া পড়িল এবং একটা মুক্তির আরাম অনুভব করিয়া, বলিয়া উঠিল—এইবার আমার বিশ্রাম!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বৈদেশিকী

বেলজিয়াম।

("Belgium and the Belgian People"— Nations of the War Series.)

১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বেলজিয়াম বলিয়া কোনও রাজ্য ছিল না। তথাকথিত বেলজিয়াম তৎপূর্ব্বে ওলন্দাজ রাজ্যের এবং তাহার পূর্ব্বে অষ্ট্রিয়া, স্পেন প্রভৃতি রাজ্যের অংশ-বিশেষ ছিল।

রোমান সেনাপতি জুলিয়াস সীজারের ব্রিটেন অভিযানের সময়, আধুনিক ফ্রান্সের উত্তরাংশ নিবাসী বেল্‌জি (Belgae) নামক যে জাতি তাঁহাকে ঘোরতর বাধা দিয়াছিল, তাহারাই বর্ত্তমান বেলজিয়ানদের পূর্ব্বপুরুষ।

পঞ্চম শতাব্দীতে এঙ্গল্‌স (Angles) নামক এক জার্ম্মান জাতি গ্রেট ব্রিটেনের দক্ষিণাংশ অধিকার করে, তদনুসারে উহার নাম ইংলণ্ড হয়। ৪৮১ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্ক (Frank) নামক এক জার্মান জাতি গল (Gaul) দেশের গথ জাতিকে পর্য্যুদস্ত করে—সেই অবধি গল দেশের নাম ফ্রান্স হইয়াছে। এই সকল দেশ বহুকাল ধরিয়া রোমের অধীন ছিল।

রোমের ক্ষমতা খর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইলে, ফ্রাঙ্ক জাতি বর্ত্তমান বেলজিয়াম দেশের প্রভু হয়। ফ্রাঙ্ক নৃপতি সুপ্রসিদ্ধ শার্লিমেন (Charlemagne) ৭৬৮ হইতে ৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার আমলে গল (ফ্রান্স), ইটালি, জার্ম্মানি ও স্পেনের অধিকাংশ এক রাজার অধীনে ছিল। রোমের পোপ তৃতীয় লিও (Leo III) শার্লিমেনকে পশ্চিম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর (Emperor of the West) বলিয়া স্বীকার করেন। শার্লিমেনের মৃত্যুর পর তাঁহার এক পুত্র ফ্রাঙ্ক রাজ্যের পূর্ব্বাংশ (বর্ত্তমান জার্ম্মানি), এক পুত্র পশ্চিমাংশ (বর্ত্তমান ফ্রান্স) এবং আর এক পুত্র মধ্যমাংশ প্রাপ্ত হয়। এই মধ্যমাংশ উত্তর সাগর হইতে ইটালি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং রাজার নামানুসারে ইহা লোথারিঞ্জিয়া (Lotharingia) নামে অভিহিত হইত।

বেলজিয়ামের সমুদ্রতীরস্থ প্রদেশের নাম ফ্ল্যাণ্ডার্স (Flanders)। ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে বাণিজ্য উপলক্ষে, এখানে বিভিন্ন জাতীয় লোকের সমাগম হইত। বিলাতের পণ্যদ্রব্য ফ্ল্যাণ্ডার্সের ভিতর দিয়া মধ্য য়ুরোপে চালান যাইত বলিয়া, ইংরেজ ও বেলজিয়ানে বহুকাল ধরিয়া "স্বার্থমূলক সখ্য" ছিল। পাছে ফ্রান্স ঘাড়ে চাপিয়া বসে এই ভয়ে বেলজিয়ানরা একবার ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় এড্‌ওয়ার্ডকে ফ্ল্যাণ্ডার্সের মুরুব্বির ("Overlord") পদে বরণ করিয়াছিল।

১৩৩৭ হইতে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে যে আঁচড়া-কামড়া হয়, ঐতিহাসিকেরা তাহার নাম দিয়াছেন শতাব্দী-ব্যাপী আহব ("Hundred years' war")। এই সময় ফ্ল্যাণ্ডার্সের কাউণ্ট (Count) তাহার ভূস্বামী ("feudal chief") ফ্রান্সের নৃপতির পক্ষ অবলম্বন করে বলিয়া, ইংরেজ সৈন্য বেলজিয়াম আক্রমণ করে। ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও বেলজিয়ামে ভাব হইয়া গেলে, ইংলণ্ড-রাজ তৃতীয় এডওয়ার্ড ফরাসী দেশের সিংহাসন দখল করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ফ্ল্যাণ্ডার্সের শেষ কাউণ্টের মৃত্যু হইলে, ঐ প্রদেশ উত্তরাধিকার সূত্রে ফ্রান্সের বার্গাণ্ডি (Burgundy) প্রদেশের ডিউকের অধিকারগত হয়। নবম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, বার্গাণ্ডির ডিউকের স্বাধীন নৃপতির ন্যায় অধিকার ও সম্মান ছিল। বার্গাণ্ডির ডিউক আধুনিক ফ্রান্স ও জার্ম্মানির মধ্যস্থ ভূখণ্ড লইয়া নেদারল্যাণ্ড (Netherlands) নামক রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বার্গাণ্ডির রাজকুমারীর সহিত জার্ম্মানির রাজকুমারের বিবাহ হইলে, নেদারল্যাণ্ডের ভাগ্য জার্ম্মানির সহিত জড়িত হয়। জার্ম্মান সম্রাট পঞ্চম পঞ্চম চার্লস

১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে স্থির করেন যে নেদারল্যাণ্ডের প্রদেশগুলি এক রাজ্য বলিয়া গণিত হইবে ("He constituted them into one nation and declared them for ever inseparable")। নেদারল্যাণ্ডে সর্ব্বশুদ্ধ:সতেরটি প্রদেশ ছিল। তাহার কয়েকটিকে ডাচি (Duchy) বলিত, যথা ব্রাবাণ্ট, লাক্সেম্বার্গ প্রভৃতি; কয়েকটিকে কাউণ্টি (County) বলিত, যথা হলাণ্ড, জীলাণ্ড (Zeeland), জাট্‌ফেন (Zutphen) প্রভৃতি; এবং কয়েকটির নাম ছিল প্রিন্সিপালিটি (Principality) যথা য়ুট্রেক্‌ট, গ্রোনিঞ্জেন ইত্যাদি।

ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ নেদারল্যাণ্ডের ভাগ্য-বিধাতা হন। ইঁহার সহিত ইংলণ্ডের রাণী মেরির বিবাহ হইয়াছিল, এবং ইনিই ইংলণ্ড আক্রমণের জন্য যে দুর্জ্জয় রণতরী পাঠাইয়া আক্কেল-সেলামি পাইয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার নাম "Invincible Spanish Armada"।

গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক দ্বিতীয় ফিলিপ, তাঁহার নেদারল্যাণ্ডবাসী প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় ভুক্ত প্রজাদের উপর ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাহার ফলে প্রজারা বিদ্রোহী হয়। নানা কারণে ফ্রান্স ও স্পেনে যুদ্ধ বাধে। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে য়ুট্রেক্‌টের সন্ধিতে স্থিরীকৃত হয় যে স্পেনরাজ অতঃপর ফ্রান্সের সিংহাসনে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না, ইটালির কিয়দংশ ও নেদারল্যাণ্ড অষ্ট্রিয়ার ভোগে আসিবে, এবং জিব্রাল্টর ইংলণ্ডের করায়ত্ত হইবে।

১৭৫৬ হইতে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত য়ুরোপে যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ ("Seven years' war") হয়, তাহাতে এক পক্ষে ইংলণ্ড ও প্রাসিয়া, অপরপক্ষে ফ্রান্স ও নেদারল্যাণ্ডের প্রভু অষ্ট্রিয়া ছিল।

অষ্ট্রিয়ার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, ১৭৯০ সালে নেদারল্যাণ্ডবাসীরা "Belgian United States" এই নাম দিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। বিদ্রোহ দমনের জন্য অষ্ট্রিয়া যে সৈন্য প্রেরণ করে, ফ্রান্সের সাহায্য পাইয়া নেদারল্যাণ্ডবাসীরা তাহাদিগকে পরাস্ত করে। বেলজিয়াম এইবার অষ্ট্রিয়ার অধীনতাশৃঙ্খল ছেদন করিয়া ফ্রান্সের নাগপাশে আবদ্ধ হইল।

ওয়াটার্লুর যুদ্ধে ফ্রান্সের দর্প চূর্ণ হইবার পর, ১৮১৫ হইতে ১৮৩০ সাল পর্য্যন্ত, হলাণ্ড ও বেলজিয়াম এক রাজার অধীনে ছিল। এই সময়ে বেলজিয়ামের অসন্তোষের মাত্রা প্রতি বৎসরে বাড়িয়া উঠিতেছিল। যুদ্ধ বিভাগের ১০২ জনের মধ্যে মাত্র ৩ জন, স্বরাষ্ট্রবিভাগে ১১৭ জনের মধ্যে মাত্র ১১ জন, এবং ৭ জন সচিবের মধ্যে মাত্র ১ জন—বেলজিয়ান ছিল। বেলজিয়ানদের অধিকাংশ রোমান ক্যাথলিক, কিন্তু তাহাদের হলাণ্ডবাসী রাজা প্রটেষ্টাণ্ট ছিলেন।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ানরা স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে, ওলন্দাজ রাজা বেলজিয়ামে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। কয়েকমাস যুদ্ধের পর, এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বিশেষ সাহায্যের ফলে, বেলজিয়াম হলাণ্ডের দাসত্ব মুক্ত হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার উপদেষ্টা ও পরমাত্মীয় স্যাক্‌সকোবুর্গের প্রিন্স লিওপল্‌ড (Leopold) বেলজিয়ামের সিংহাসন লাভ করেন। ইহার বর্ত্তমান রাজা এলবার্ট ১৯০৯ সালে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। থার্ম্মাপলি ও ম্যারাথনে পুরাতন গ্রীকজাতি যে অতুল শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া পৃথিবীর প্রণম্য হইয়াছিলেন, ১৯১৪ সালে জার্ম্মান অক্ষৌহিণীর সমক্ষে সেই বীরত্ব প্রকাশ করিয়া, বেলজিয়ান জাতি অমর হইয়াছেন।

বেলজিয়ামের আয়তন মাত্র ১১,৩৭৩ বর্গ মাইল অর্থাৎ মেদিনীপুর ও ময়মনসিংহ জেলা একত্র করিলে যাহা হয় তাহারও কম। ইহা আয়র্লণ্ডের অর্দ্ধেক এবং ওয়েল্‌সের প্রায় সমান। বেলজিয়ামের জনসংখ্যা প্রায় ছিয়াত্তর লক্ষ, অর্থাৎ মেদিনীপুর, ময়মনসিংহ ও চব্বিশ পরগণায় সমবেত লোকসংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম। বেলজিয়ামে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা শতকরা দুইজন বেশী এবং ঐ দেশে প্রায় আশী হাজার ফরাসী, ষাট হাজার জার্ম্মান ও ছয় হাজার ইংরেজ বাস করে।

বাঙ্গালী হিন্দুর মত বেলজিয়াম ধ্বংসোন্মুখ জাতি ("dying race") নহে। উহাদের সংখ্যা প্রতি-বৎসরে গড়ে উনপঞ্চাশ হাজার করিয়া বাড়িতেছে। কিয়দূন ছিয়াত্তর লক্ষ লোকের দুই বৎসর অন্তর প্রায় এক লক্ষ হিসাবে বাড়া কম কথা নহে। বেলজিয়ামে প্রতি বর্গ মাইলে ৬৫২ জন বাস করে—য়ুরোপের আর কোথাও প্রতি বর্গ মাইলে এত লোকের বাস নাই। ঐ দেশে জারজ সন্তানের সংখ্যা শতকরা ছয় জনের উপর।

বেলজিয়ান বলিয়া কোনও ভাষা নাই। বেল-জিয়ামে কিয়দধিক বত্রিশ লক্ষ লোকে ফ্লেমিশ (Flemish) ভাষায় ও কিয়দধিক আটাশ লক্ষ লোকে ফরাসী ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করে। প্রায় পৌনে নয় লক্ষ লোকে ফ্লেমিশ ও ফরাসী দুই ভাষাই ব্যবহার করে। প্রায় পঁচাত্তর হাজার লোক ফরাসী ও জার্মান উভয় ভাষায়, এবং প্রায় সাড়ে ছত্রিশ হাজার লোক কেবলমাত্র জার্মান ভাষায় কথা কহে। বেলজিয়ানদের কিয়দংশ কেল্টিক (Celtic) ও কিয়দংশ টিউটনিক (Teutonic) জাতীয়।

বেলজিয়ামে ব্যবস্থা প্রণয়নের ভার রাজা, সেনেট (Senate) এবং প্রতিনিধি সভার (Chamber of Representatives) উপর নিহিত। সেনেটের সভ্য সংখ্যা ১২০। সেনেটের সভ্য হইতে হইলে, অন্যূন চল্লিশ বৎসর বয়স হওয়া ও বাৎসরিক ১২০০ ফ্রাঙ্ক (১ ফ্রাঙ্ক প্রায় সাড়ে নয় আনা) ট্যাক্স দেওয়া প্রয়োজন। বিলাতে লর্ডস্ ও কমান্স সভায় যে সম্পর্ক বেলজিয়ামে সেনেট ও চেম্বারের প্রায় সেইরূপ সম্পর্ক। প্রতিনিধি সভার (Chamber of Representatives) সভ্য সংখ্যা ১৮৬। ইঁহারা চার বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন। ইঁহাদের প্রত্যেকে চারি হাজার ফ্রাঙ্ক বেতন ও রেলওয়ের "পাস" পান।

পঁচিশ বৎসর বয়স হইলেই, বেলজিয়ানের চেম্বারের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য একটি ভোট দিবার ক্ষমতা হয়। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স হইলে এবং সন্তানের সংখ্যা ও আয়ের পরিমাণ বাড়িলে, দুইটি ভোট দিবার ক্ষমতা হয়। উকিল, ডাক্তার প্রভৃতি শিক্ষিত লোকদের তিনটি ভোট দিবার অধিকার।

বেলজিয়ামে বিজ্ঞান, শিল্প ও ব্যবসায়ের অত্যন্ত আদর। তথায় সমর সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব প্রভৃতির ন্যায় এক জন শিল্প-বিজ্ঞান সচিব আছেন। ঐ ক্ষুদ্র দেশে প্রতি বৎসর প্রায় পনের হাজার ছাত্র শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষা করে। বেলজিয়ান গভর্মেণ্ট সাধারণের উপকারার্থই ঋণ করেন; জিগীষা ও জিঘাংসার বশবর্ত্তী হইয়া, কামানের মুখে টাকার স্রব বাহির করা, বেল-জিয়ানের কোষ্ঠীতে লেখে নাই। এ সম্বন্ধে একজন বিলাতী লেখক মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছেন—"Almost the entire public debt has been devoted to works of public utility, and is thus an important contrast with the public debts of Great Britain or France, which are for the most part the burden, posterity has to pay for the quarrels of their ancestors......Dazzled by the magnitude of our own dominions, we are rather apt to make geographical area the sole criterion of national importance, forgetting, the while, that it is really the unit, not the mass, that counts, and that empires exist for man, not man for empires."

ইংলণ্ডের জনকয়েক ডিউক অথবা বঙ্গ-বিহারের জনকয়েক মহারাজার ন্যায়, বেলজিয়ামে প্রকাণ্ড জমিদারীর মালিক একজনও নাই। প্রত্যেক কৃষি-জীবী তথায় জমির অধিকারী হইবার চেষ্টা করে এবং দেশের প্রথা ও আইন এই প্রয়াসে প্রশ্রয় দেয়। ("The labourer having no sooner touched the spade than he seems magically haunted day and night with the dream of possession.")। কৃষকের স্ত্রী কন্যারা তাহাদের কার্য্যে

সাহায্য করে। চাষের কাজে মজুরি করিয়া, বেলজিয়ান পুরুষে গড়ে দৈনিক ১ শিলিং ৮ পেন্স বা পাঁচ সিকা এবং বেলজিয়ান স্ত্রীলোক গড়ে প্রতিদিন ১ শিলিং ২ পেন্স বা চৌদ্দ আনা রোজগার করে।

বেলজিয়ামের খনিতে যথেষ্ট পরিমাণে কয়লা, লৌহ, তাম্র, শীশা ও দস্তা পাওয়া যায়। তক্তার জন্য ঐ দেশের জঙ্গলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের আবাদ করা হয়। ঐ দেশে গম, যব, যই ও রাই প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বেলজিয়ামে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গরু, ঘোড়া, ভেড়া ও শূকর বংশের উন্নতির চেষ্টা করিয়া প্রভূত ফল লব্ধ হইয়াছে।

বেলজিয়ামের ন্যায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র দেশে প্রায় এক শত খানি দৈনিক ও প্রায় এক সহস্র সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। Charles de Coster, Octave Pirmez, Edmond Picard, Georges Eekhoud, Louis Delattre, Hubert Krains, Emile Verhaeren, Maurice Maeterlinck প্রভৃতি মনস্বী গ্রন্থকারের প্রতিভার দীপ্তিতে বেলজিয়াম ভাস্বর হইয়াছে। য়ুরোপীয় সাহিত্য সমাজে, মেটারলিঙ্ক বেলজিয়ামের ইব্‌সেন (Ibsen) এই আখ্যা পাইয়াছেন। টলষ্টয় ও ইব্‌সেনের ন্যায় মেটারলিঙ্কের গ্রন্থাবলী য়ুরোপের প্রায় সমস্ত ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

বেলজিয়ান ঐতিহাসিক Henry Pirenne তাঁহার স্বদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, বেলজিয়ামের মাটী যেমন ফ্রান্স ও জার্ম্মানিতে উদ্ভূত নদীর পলিতে গড়া, বেলজিয়ামের সাহিত্যও সেইরূপ ফরাসী ও জার্ম্মান সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপাদানে নির্ম্মিত। ফরাসী ও জার্ম্মান সভ্যতার যাহা কিছু বরণীয়, বেলজিয়াম তাহা আহরণ করিয়া য়ুরোপকে অর্ঘ্য দিবে। ("Like our soil deposited by the rivers of both France and Germany, our national culture is a kind of synthesis, in which the genius of the one race mingles with and modifies the genius of the other. Open as our frontiers, she gathers into rich harmony the best elements of the Franco-German civilisation. It is in this admirable power of absorption and combination that we find the originality of Belgium and her most signal services to Europe.")।

য়ুরোপে বার-মেসে অশান্তির এক প্রধান কারণ এই যে শ্রমজীবীরা রক্ত জল করিয়া যাহা উপায় করে তাহার অধিকাংশ মূলধনীদের পকেটে যায়। এই বৈষম্য নিরাকরণের জন্য সোশ্যালিষ্ট (Socialist) সম্প্রদায় প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। বেলজিয়ান সোশ্যালিষ্টদের মধ্যে কর্ম্মী ও বিদ্বান লোকের অভাব নাই।

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ এই প্রবচনের সার্থকতা বেলজিয়ামের প্রতি নগরে ও গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যবসাদারের জাতি বলিয়া, বেলজিয়ানের সৌন্দর্য্যবোধ কণামাত্র হ্রাস হয় নাই। ব্রুজেস (Bruges), এণ্টোয়ার্প (Antwerp) লিয়েজ (Liege) প্রভৃতি নগরের বণিক সমাজের গৃহগুলি সৌষ্ঠবে অলকার সমান। এণ্টোয়ার্পের রেলওয়ে ষ্টেশন দেখিলে প্রাসাদ বলিয়া ভ্রম হয়। বেলজিয়ান জাতি লক্ষ্মীকে ব্যাঙ্কের খাতায় ও লোহার সিন্ধুকে কয়েদ করিয়া লক্ষ্মীছাড়া হয় নাই। ("The Belgians not only realise the beauty of utility, but also the utility of beauty.")।

শ্রীগৌরহরি সেন।

পালসাম্রাজ্যের অধঃপতন

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউসে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের বক্তৃতার সারাংশ)

ভীম নিহত হইবার পর, রামপাল তাঁহার জনকভূমি বরেন্দ্রী অধিকার করিয়া, সামন্ত-চক্র সমভিব্যাহারে রাজধানী রামাবতী নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী, এই ঘটনার সহিত রাবণ বধান্তে সীতা সহ রামের অযোধ্যা-প্রবেশের তুলনা করিয়াছেন; এবং দ্ব্যর্থ শ্লোকের দ্বারা এক সঙ্গেই এই দুই ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় যে সীতার সহিত বরেন্দ্রীর এবং অযোধ্যার সহিত রামাবতীর তুলনা করা হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোক হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। যথা,—

"ইতি রাজরাজভোগ্যামলকামিব বিবিধশেবধিভরসমৃদ্ধাং রামাবতীং গৃহীত্বামূমযোধ্যামসৌ পুরীং তামগমৎ"॥"

৩।৪৮॥

রাম-পক্ষে ইহার অর্থ এই যে,—"রামচন্দ্র এইরূপে সীতাকে (অমূম্) গ্রহণ করিয়া, কুবের ভবন অলকার ন্যায় সমৃদ্ধিশালী, স্বীয় বাসস্থান (রামাবতী) অযোধ্যা নগরীতে গমন করিয়াছিলেন।"

রামপাল পক্ষে ইহার অর্থ,—"রামপাল এইরূপে বরেন্দ্রী (অমূম্) করতলগত করিয়া, অপরাজেয় (অযোধ্যাং) এবং কুবের-ভবনের ন্যায় শোভা সমৃদ্ধিশালী রামাবতী নগরে গমন করিয়াছিলেন।"

সীতার সহিত বরেন্দ্রীর তুলনা উপলক্ষে কবি সন্ধ্যাকর নন্দী স্বীয় জন্মভূমি-বর্ণনার উৎকৃষ্ট অবসর পাইয়া, চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথম সাতাইশটি শ্লোকে অতুলনীয় বাক্য-বিন্যাস ও অফুরন্ত কল্পনার সাহায্যে বরেন্দ্রভূমির যে মনোমোহিনী ছবি অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা সহস্র বৎসর পরেও তাঁহার স্বদেশ-প্রীতির কথা পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দেয়!

রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা সীতার শুচিভাব প্রমাণিত হইবার পর, রামচন্দ্র তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে কবি সন্ধ্যাকর নন্দী কয়েকটি বিশেষণ দ্বারা সীতার ও বরেন্দ্রভূমির উভয়েরই পবিত্রতা বর্ণনা করিয়াছেন। বিশেষণ কয়েকটি এই;—

(১) সম্ভাবিতাকলুষভাবাং (২) উপপাদিত-ব্রতোৎকর্ষাং (৩) অপরিমিত-পুণ্যভূমিং (৪) সত্যাচারৈক-কেতনং (৫) ব্রহ্মকুলোদ্ভবাং (৬) গঙ্গা-করতোয়ানর্ঘপ্রবাহপুণ্যতমাং (৭) অপুনর্ভবাহ্বয়-মহাতীর্থবিকলুষোজ্জ্বলাং।

এই কয়টি বিশেষণ দ্বারা কবি সূচিত করিতেছেন যে, বরেন্দ্রভূমির অধিবাসিগণ নানাবিধ সদ্‌গুণের আধার ছিলেন; এইস্থান বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের উদ্ভবস্থান ছিল; এবং ইহার দুই পার্শ্বে গঙ্গা ও করতোয়া এবং মধ্যে অপুনর্ভবা নদী প্রবাহিত থাকায়, ইহা পুণ্যতম বলিয়া গণ্য হইত। এই প্রসঙ্গে কবি বরেন্দ্রভূমির আরও কিছু পরিচয় দিয়াছেন। এই বরেন্দ্রভূমিতে জগদ্দল মহাবিহার, লোকেশ্বর ও মহত্তর-দেবের মূর্ত্তি, এবং স্কন্দনগর শোণিতপুর প্রভৃতি তীর্থস্থান ছিল।

বরেন্দ্রভূমির এই বর্ণনা কবির অতিশয়োক্তি বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু পালরাজগণের মন্ত্রী ভট্ট-গুরবের গুরুড়-স্তম্ভলিপি, বৈদ্যদেবের কমৌলি-তাম্র-শাসন এবং শিলিমপুর-প্রশস্তিতেও বরেন্দ্রভূমির মাহাত্ম্যের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। সুতরাং কবির উক্তি একেবারে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

জগদ্দল মহাবিহার এককালে খুব বিখ্যাত ছিল। তিব্বৎদেশীয় কোন কোন লেখক ইহা বরেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জগদ্দল নামে পরিচিত কয়েকটি স্থান এখনও বরেন্দ্রভূমিতে দেখিতে

পাওয়া যায়। ডাক্তার বুকানান হ্যামিল্টন, বামন-গোলা থানার অন্তর্গত এইরূপ একটি স্থানে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ ও ধম্মসাগর (ধর্ম্মসাগর) নামক একটি দীঘির কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি দিনাজপুর জেলায়, চীরি নদীর পুরাতন খাতের ধারে জগদ্দল নামে আর একটি স্থানের সন্ধান পাইয়াছেন। ইহাতেও অনেক প্রাচীন কালের স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। স্থানীয় জনপ্রবাদ অনুসারে ইহাই জগদ্দল মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ। এই স্থানে কয়েকটি বড় বড় মাটির ঢিবি বর্ত্তমান আছে। একটি ঢিবির মধ্যে একটি প্রস্তর স্তম্ভ, এবং অপর কয়েকটি ঢিবির মধ্যে মন্দিরের ভিত্তি প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

জগদ্দল মহাবিহার কেবল বরেন্দ্রভূমির নহে, সমগ্র বঙ্গদেশের গৌরবের বস্তু ছিল। তজ্জন্য কবি বরেন্দ্র-ভূমিকে "মন্দ্রাণাং স্থিতিমূঢ়াং জাগদ্দল-মহাবিহার চিত-রাগাং দধতীং" (জগদ্দল মহাবিহারে অবিরত শাস্ত্র-পাঠজনিত মন্দ্রধ্বনির আবাসভূমি) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রামচরিতের ভূমি-কায় লিখিয়াছেন যে—জগদ্দল মহাবিহার রামপাল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার 'বাঙ্গালার ইতিহাসে' এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সন্ধ্যাকর নন্দীর কাব্যে এমন কোন কথা নাই যাহাতে এই সিদ্ধান্তটি সমর্থন করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জগদ্দল মহাবিহার ব্যতীত বরেন্দ্রভূমিতে স্কন্দনগর ও শোণিতপুর নামক দুইটি তীর্থস্থান ছিল। বগুড়া জেলার অন্তর্গত মহাস্থানই প্রাচীন স্কন্দনগর বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। স্থানীয় লোকে এখনও স্কন্দদেবের মন্দিরের অবস্থিতি-স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; এবং করতোয়া নদীতে স্নান করিবার নিমিত্ত এখনও নারায়ণী যোগের সময়, তথায় বহুসংখ্যক তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। দিনাজপুর জেলায় গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত বাণগড় নামক স্থানে পুনর্ভবা নদীতীরে প্রাচীন শোণিতপুরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। দিনাজপুর সহর হইতে ১৬ মাইল দূরে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি পুনর্ভবা নদী-তীরে একটি প্রাচীন ঘাটের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ঘাটের কতকগুলি ইষ্টক এখনও দেখিতে পাওয়া যায়;—তাহা ২৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যে ও ১৬ ইঞ্চি পাশে। বাংলাদেশের আর কোনও স্থানে এত বড় ইট দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রভূমির মাহাত্ম্যের ও ইহার অন্তর্গত বিশিষ্ট স্থানগুলির বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বরেন্দ্রভূমির প্রাকৃ-তিক সৌন্দর্য্যও তিনি বর্ণনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। স্বদেশের সৌন্দর্য্য তিনি কিরূপ চক্ষে দেখিয়া-ছিলেন এবং কিরূপ কবিত্বপূর্ণ ভাষায় তিনি হৃদয়ো-চ্ছ্বসিত ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে বুঝা যাইবে।

"দরদলিত-কনক-কেতক কান্তিমপ্যশেষ কুসুমহিতাম।
অরবিন্দেন্দীবরময়-সলিল-সুরভি-শীতল-শ্বসনাং॥"

৩।২২

তৃতীয় পরিচ্ছেদের ২৮শ হইতে ৩২শ শ্লোকে কবি রামপাল কর্ত্তৃক রামাবতী-প্রতিষ্ঠার উল্লেখ করিয়া-ছেন; এবং ৩৩শ হইতে ৪০শ শ্লোকে এই নব প্রতিষ্ঠিত নগরীর বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপরবর্ত্তী তিনটি শ্লোকে এই নগরীতে দীর্ঘিকা খনন, দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত রাম-চরিতের ভূমিকার উপর নির্ভর করিয়া শ্রীযুক্ত রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায় নিম্নলিখিত কয়েকটি সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (Memoirs of the Asiatic Society —The Palas of Bengal)

(১) রামাবতী নগর গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত ছিল।

(২) রামাবতী নগরের স্থান-নিরূপণ বিষয়ে রামপাল শ্রীহেতুরাজ চণ্ডেশ্বর ও ক্ষেমেশ্বরের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৩) রামাবতী নগরে অবলোকিতেশ্বর বোধি-সত্ত্বের মূর্ত্তি ছিল।

(৪) এই নগরীর নিকটে অপুনর্ভবা নামক একটি তীর্থস্থান ছিল।

এই সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থটির সমর্থক কোন প্রমাণই রামচরিত কাব্যে নাই। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটিও একটি শ্লোকের বিকৃত ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্লোকটি এই—

"কুর্ব্বদ্ভিঃ শংদেবেন শ্রীহেত্তীশ্বরেণ দেবেন।
চণ্ডেশ্বরাভিধানেন কিল ক্ষেমেশ্বরেণ চ সনাথৈঃ॥"

৩। ২

ইহার পূর্ব্বের শ্লোকেই বলা হইয়াছে যে, সীতার রাক্ষসগৃহে অবস্থানহেতু রাম তাঁহাকে অগ্নিপরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, এই অগ্নিপরীক্ষা কালে ব্রহ্মাদি দেবতা উপস্থিত ছিলেন। হেত্তীশ্বর, ব্রহ্মার একটি সুপরিচিত নাম। সুতরাং এখানে হেত্তীশ্বর ক্ষেমেশ্বর প্রভৃতিকে ব্রহ্মাদি-দেবগণের নামরূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত। রাম যেমন এই সমুদয় দেবগণের সমাগমে সীতার বিশুদ্ধতা জ্ঞাত হইয়াছিলেন, এই সমুদয় দেবমূর্ত্তির অবস্থিতির জন্য, বরেন্দ্রভূমিও সেইরূপ পবিত্র বলিয়া সুবিজ্ঞাত ছিল। উক্ত শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যাই সমীচীন।

রামপাল রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া, রাজ্য সংরক্ষণে মনোনিবেশ করেন। নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে জানা যায় যে যুদ্ধ বিগ্রহে প্রজাগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত তিনি তাহাদের রাজস্ব কমাইয়া দিয়াছিলেন,—

"ক্রূরকরাপীড়িতাসাবিতি ভর্ত্তুর্মৃদুকরগ্রহাৎ কৃপয়া
কৃষ্টোপচিতাং সপদি স্খলিত প্রতিপক্ষমার দহন শুচম্॥"

৩। ২৭

রামচরিতে পাল সাম্রাজ্যের পুনর্গঠনের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে চারিটি শ্লোকে কয়েকটি মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে।

(১) "স্বপরিত্রাণনিমিত্তং পত্যা যঃ প্রাগ্দিশীয়েন।
বরবারণেন চ নিজস্যন্দনদানেন বর্ম্মণারাধে॥ *

(৩। ৪৪)

রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, ইন্দ্র নিজের রথ ও বর্ম্ম রামচন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত শ্লোকে রামপক্ষে এই সুপরিচিত ঘটনাই সূচিত হইয়াছে। রামপাল পক্ষে ইহার অর্থ এই যে, পূর্ব্বদিগ্বিভাগের বর্ম্মবংশীয় রাজা পুনরায় রামপালের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে গজ ও রথ প্রদান করিয়াছিলেন। নবাবিষ্কৃত বেলাবো-তাম্রশাসনে এই বর্ম্মরাজবংশের কতক কতক বিবরণ পাওয়া যায়।

(২) "ভবভূষণসন্ততিভূব মনুজগ্রাহ জিতমুৎকলত্রং যঃ।
জগদবতিস্ম সমস্তং কলিংগত স্তান্ নিশাচরান্ নিঘ্নন্।"

৩। ৪৫

রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনের পথে কিয়ৎকাল কিষ্কিন্ধ্যায় অপেক্ষা করিয়াছিলেন। উক্ত শ্লোক রাম পক্ষে তাহাই সূচিত করিতেছে। রামপাল পক্ষে এই শ্লোকের অর্থ এই যে,—রামপাল উৎকল দেশের চন্দ্রবংশীয় (ভবভূষণ-সন্ততি) রাজার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এবং কলিঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় দেশ দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, চন্দ্রবংশীয় এই উৎকল-অধিপতি কে? এই দস্যু শব্দেই বা কাহাকে সূচিত করা হইয়াছে?

রামচরিতের টীকা হইতে জানা যায় যে,—উৎকলের অধিপতি কর্ণকেশরী রামপালের সমসাময়িক ছিলেন। (মানসী ও মর্ম্মবাণী, ফাল্গুন ১৩২২, ৮১ পৃঃ)। ব্রহ্মেশ্বর নামক মন্দির-লিপিতে উদ্যোতকেশরীর জননী কর্ত্তৃক মন্দির নির্ম্মাণের বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, উৎকলের কেশরীরাজগণ চন্দ্রবংশীয় ছিলেন।

* 'আরাধে' পদটি ব্যাকরণদুষ্ট। আরাধি বা আরেধে হইতে পারে কি না, বিবেচ্য।

এই কেশরীবংশ সম্ভবতঃ অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিল। কলিঙ্গনগর হইতে প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসনের নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে জানা যায় যে, অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ ৯৯৯ শকে অথবা ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

"শকাব্দে নন্দরন্ধ্র-গ্রহগণ-গণিতে কুম্ভসংস্থে দিনেশে
শুক্লেপক্ষে তৃতীয়া যুজি রবিদিনে রেবতীভে নৃযুগ্মে।
লগ্নে গঙ্গান্বয়াম্বুজবন-দিনকৃৎ বিশ্ব বিশ্বম্ভরায়া-
শ্চক্রং সংরক্ষিতুং সৎগুণনিধিরধিপশ্চোড়গঙ্গোভিষিক্তঃ॥

(Ind. Ant. XVIII pp. 161-165.)

১১১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একখানি লিপিতে অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গের উৎকল জয়ের উল্লেখ আছে। যথা—

"পূর্ব্বস্যাং দিশি পূর্ব্বমুৎকলপতিং রাজ্যে বিধায়চ্যুতং
পশ্চাৎ পশ্চিমদিক্‌তটে বিগলিতং বেঙ্গীশমপ্যোতয়ো
র্লক্ষ্মীং বন্দনমালিকামিব জয়শ্রীতোরণ শুম্ভয়ো-
র্ব্বপ্নাতি স্ম সমৃদ্ধবিত্তবিভবঃ শ্রীগঙ্গচূড়ামণিঃ॥"

সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে,—রামপাল সম্ভবতঃ অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ কর্ত্তৃক উৎকল জয়ের পূর্ব্বে কেশরী রাজগণকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রামচরিতের ভূমিকার উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রামপাল উৎকল জয় করিয়া তাহা নাগবংশীয় রাজগণকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন—কিন্তু এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই।

(৩-৪) যো বাজিনামধিভুবা নাগাবলি সংষতোরিতস্কন্ধঃ।
কৃত সাহায়কবিধিনা দেবঃ প্রিয়কারিণা প্রীণি॥
তস্য জিত কামরূপাদি বিষয়বিনিবৃত্তঃ মানসম্পাণ্ডঃ
মহিমানমায়ন নৃপো যতমানস্য প্রজাভিরক্ষার্থম্॥

(৩।৪৬-৪৭)

রাম অযোধ্যা প্রতিগমনকালে ভরদ্বাজমুনির ঐশ্বরিক শক্তিবলে সৈন্যের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিলেন; উপরোক্ত শ্লোকদ্বয়ে তাহাই সূচিত হইয়াছে। রামপাল-পক্ষে ইহার অর্থ এই যে, কামরূপ প্রভৃতির বিজয় ব্যাপারে রামপাল তাঁহার মাতুল মহনদেবের নিকট বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রামচরিতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, মায়ন নামে এক রাজা কামরূপাদি জয় করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই মতটি সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। 'মহিমানমায়ননৃপো' এই পদটি মহিমান + মায়ন + নৃপো এইরূপ ভাবে ভাগ করা যায় না। কারণ সংস্কৃত ভাষায় কোন রকমেই 'মহিমান' পদ সিদ্ধ করা যায় না। মহিমানং + আয়ন্ এইরূপ পদ বিভাগ করা ব্যতীত উপায় নাই। সুতরাং 'মায়ন' নামে কোন নৃপতির অস্তিত্ব এই শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যায় না—তাহার দিগ্বিজয় তো দূরের কথা। হয়ত অনবধানতাবশতঃ ক্রিয়াপদ 'আয়ন' কামরূপজয়ী মায়ন-নৃপে পরিণত হইয়া, বাঙ্গালার ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

শুঁয়োপোকা

"বীভৎস-রসের উৎস! তোরে হেরি, আতঙ্কে শিহরি,
যাই সরি! বল্ বল্, কি আনন্দে, ভুলিয়া দুর্গতি,
পরীদের ক্ষুদ্ররাজ্যে লীলা-শকটের রূপে মরি,
সজারুর চর্ম্ম সম বর্ম্ম লয়ে, ঘুরিস্ এমতি?
ওই হাসে আঙ্গুরের শতভুজা সবুজ ব্রততী—
তার সেই পত্রে পত্রে, বিচিত্র বিষম বর্ণ ধরি,
কোন্ প্রতীক্ষায় বল্?" কি উদ্দেশে? চিত্তে ধ্যান করি,
কোন্ নব জাগরণ, হেন ভাবে করিস্ বসতি?"

একদিন, আঁখি মুদি, বসিলাম বিভু-পদতলে—
তখন সোণালি উষা হাসিতেছে; কুহরিছে পিক।
অকস্মাৎ প্রজাপতি উড়ে বলে, মোহিয়া চৌদিক্,
"আমি সেই ক্ষুদ্র কীট—হেন রূপ আছে কি ভূতলে?"
তখন হেরিনু আমি কবিনেত্রে—বর্ণধরি নানা,
কোটি কোটি নর, নারী, প্রসারিছে প্রজাপতি-ডানা!



অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম্ এ, পি-আর্-এস্

Photo by Hop Sing & Co

আওরাংজীবের পরিবারবর্গ।

অন্য সকল মুঘল বাদশাহগণের ন্যায়, আওরাংজীবও নিজ পুত্রগণকে লইয়া অসুখী ছিলেন। সর্ব্বদাই তাঁহার মনে মনে আশঙ্কা হইত, বুঝি বা কারারুদ্ধ বৃদ্ধ শাহ্‌জাহানের অভিশাপই ফলিয়া যায়—নিজ পিতার প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, পুত্রগণের হস্তেও ঠিক সেইরূপ আচরণই তিনি প্রাপ্ত হন। এই কর্ম্ম-ফলকে ব্যর্থ করিবার জন্য জীবনের শেষদিন অবধি তিনি সাবহিত ছিলেন। পুত্রগণের দৈনন্দিন কার্য্য-কলাপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তিনি স্বয়ং নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিয়াছিলেন, রাজবেতনভোগী গুপ্তচরবৃন্দ তাহাদের পরিচারকের কর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিত। এবং কোনও পুত্র তাঁহার অনভিমত কার্য্য করিলে, উচ্চা-কাঙ্ক্ষার স্বল্পমাত্রও পরিচয় দিলে অথবা কিঞ্চিৎমাত্রও রাজক্ষমতা অপহরণের আয়োজন করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের লাঞ্ছনাবিধান করিতেন।

আওরাংজীবের জ্যেষ্ঠপুত্র মুহম্মদ সুলতান। শাহ্‌-জাহানের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবার জন্য সুজার সহিত যখন তাঁহার যুদ্ধ হইতেছিল, সেই সময় (৮ই জুন ১৬৫৯) মুহম্মদ সুলতান পিতৃপক্ষ ত্যাগ করিয়া গিয়া সুজার সহিত যোগদান করেন। কিন্তু কয়েকমাস পরে তিনি আবার পৈত্রিক সৈন্যদলে প্রত্যাগমন করিয়া রাজাজ্ঞায় গোয়ালিয়রে কারারুদ্ধ হন। মাঝে মাঝে পুত্রের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কনের জন্য বাদশাহ তথায় চিত্রকর-গণকে প্রেরণ করিতেন—নতুবা পুত্রের স্বাস্থ্যসংবাদ লইবার আর কি উপায় ছিল! দ্বাদশবর্ষ এই ভাবে কারাবাসের পর ভাগ্যদেবী আবার বুঝি এই হতভাগ্যের উপর প্রসন্ন হইলেন! ১৬৭২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহাকে দিল্লী মধ্যস্থ সলিমগড় দুর্গে স্থানান্তরিত করা হইল এবং তিনি বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎলাভের অনুমতি পাইলেন। ইহার গূঢ় কারণটি কি? আমাদের অনুমান হয়, দ্বিতীয় পুত্র মুহম্মদ মুয়াজ্জমকে খর্ব্ব করিবার জন্যই বাদশাহের এই কৌশল। এ'দিন লোকে ভাবিত—মুয়াজ্জমই ভবিষ্যতে পিতৃসিংহাসন লাভ করিবেন, কিন্তু তাঁহার আচরণে আওরাংজীব অসন্তুষ্ট ছিলেন; তাই জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি এ অনুগ্রহ। মুহম্মদ সুলতানের উপর রাজপ্রসাদ অজস্র বর্ষিত হইতে লাগিল; তাঁহার অন্তঃপুর নব নব সুন্দরীগণে পূর্ণ হইয়া উঠিল; ১৬৭২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মুরাদের কন্যা দোস্তদার বানুর সহিত, তিন বৎসর পরে পার্ব্বত্য-রাজ্য কিস্তয়রের রাজকন্যা বাইভূত দেবীর সহিত এবং পরবর্ত্তী অগষ্ট মাসে দৌলতাবাদী মহলের এক ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত—ক্রমান্বয়ে এই তিন কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল।—সকলেই মনে করিল মুহম্মদ সুলতান এইবার স্বাধীনতা পাইবেন এবং সাম্রাজ্যাধি-কারী বলিয়া গণ্য হইবেন। কিন্তু ৩৭ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে অকালমৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল (৩রা ডিসেম্বর ১৬৭৬)।

মুহম্মদ সুলতানের বন্দী হইবার পরে মুহম্মদ মুয়জ্জম তাঁহার পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে সম্মানের স্থান গ্রহণ করিলেন। ইনিই পরে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম বাহাদুর শাহ্‌ নামে তাঁহার পিতার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া-ছিলেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে যখন তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ২০ বৎসর তখন তিনি দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তারূপে প্রেরিত হন। তিনি তথায় ১০ বৎসর কাল অবস্থান করিয়াছিলেন, মধ্যে মধ্যে উত্তর ভারতে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং পারস্য-রাজের ভারতাক্রমণ আশঙ্কায় সম্রাট-সৈন্য পঞ্জাবে প্রেরিত হইলে তিনি অগ্রবর্ত্তী সৈন্যের সেনাপতিরূপে তথায় একবার প্রেরিত হইয়াছিলেন (১৬৬৬ খৃঃ)। কিন্তু ১৬৭০ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে তিনি বাদশাহের সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে পতিত হইলেন। রাজকীয় ইতিহাসে কেবল উল্লিখিত হইয়াছে, "সম্রাট সংবাদ পাইলেন রাজ-কুমার তোষামোদকারীদিগের উত্তেজনায় স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সম্রাটের সদুপদেশ-

পূর্ণ পত্রে কোন ফল হইল না। রাজকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাঁহাকে কর্ত্তব্যের পথে ফিরাইবার জন্য তাঁহার জননী নবাব বাইকে সম্রাট্ দক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার পক্ষ হইতে ভর্ৎসনাপূর্ণ পত্র দিবার জন্য রাজসভা হইতে জনৈক ওম্‌রাহ্‌ও প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল। রাজকুমারের চরিত্র রাজভক্তি-পূর্ণ। রাজকুমার দুঃখ ও অনুতাপ প্রকাশ করিয়া বিনয় সহকারে পত্রের উত্তর প্রদান করিলে সম্রাটের অনুগ্রহ পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন।" কিন্তু তথাপি তাঁহরে বিরুদ্ধে সন্দেহ অপনীত হইল না। যাহা হউক, তিনি শিবাজীকে দমন করিতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ হইলেন এবং তাঁহার অবাধ্য সেনানী দিলির খাঁর সহিত অবিরত বিবাদের জন্য দাক্ষিণাত্যের শাসনকার্য্য অসম্ভব হইয়া উঠিল। সেইজন্য তিনি ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ঐ পদ হইতে অপসারিত হইলেন। ঠিক এই সময়ে মুহম্মদ সুলতানকে পুনরায় অনুগ্রহ প্রদর্শন করায় সম্ভবতঃ আওরাংজীবের এই উদ্দেশ্য ছিল যে, মুয়াজ্জম দেখুন যে, সম্রাটের তাঁহার অবাধ্য পুত্রকে ইচ্ছামত ত্যাগ করিতে পারেন।

তিন বৎসর পরে মুয়াজ্জম শাহ্‌আলম উপাধি পাইয়া (১৫ই অক্টোবর ১৬৭৬ খৃঃ) আফগানিস্থানে প্রধান সেনাপতিরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া (২০শে জানুয়ারি ১৬৭৮ খৃঃ) তিনি কয়েক মাস রাজসভায় প্রভাব ও ক্ষমতা ভোগ করিয়াছিলেন; তৎপরে দেড় বৎসরের জন্য দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন (১৬৭৮ :সেপ্টম্বর —১৬৮০ মার্চ্চ)। কিন্তু তিনি "বৃহৎ সৈন্যদল লইয়াও শিবাজী বা বিজয়পুর রাজের বিরুদ্ধে কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই।" রাজপুত-যুদ্ধে তিনি উত্তর মেবারে একদল সৈন্যের সেনাপতিরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন এবং বিদ্রোহী আকবরের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই! সম্রাট দাক্ষিণাত্যে গমন করিলে শাহ্ আলম তাঁহার অনুগমন করেন এবং কোঙ্কন প্রদেশে একদল সৈন্য লইয়া গিয়া (১৬৮৩ সেপ্টেম্বর—১৬৮৪ মে) অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়েন।

গোলকুণ্ডার অবরোধকালে শত্রুপক্ষের সহিত শাহ্ আলমের পত্র:ব্যবহার পথিমধ্যে বাদশহের হস্তগত হওয়ায় বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি কুৎব্ শাহের লোকজনদিগকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতেন। তাঁহাদিগের প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিতেন এবং অবরোধ কার্য্যে শৈথিল্য করিয়াছেন। এরূপ সন্দেহও হইয়াছিল যে তিনি হায়দারাবাদের লুণ্ঠিত দ্রব্যের সমস্তই রাজভাণ্ডারে প্রদান না করিয়া অধিকাংশ আত্মসাৎ করিয়াছেন। সেই জন্য ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বীয় পুত্রগণের সহিত ধৃত ও বন্দী হন। সম্রাটের আদেশে খোজারা তাঁহার প্রিয়পত্নী নুরুন্নিসাকে অপমানিত করিয়া তাঁহারও স্বাধীনতা হরণ করে। নুরুন্নিসার সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল এবং তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী যাহাতে নিজ প্রভুর রাজ-বিদ্বেষের উদাহরণ ও প্রভুপত্নীর এরূপ কার্য্যের সহিত সম্পর্ক থাকা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেন, তজ্জন্য তাঁহাকে যন্ত্রণা দেওয়া হইতে লাগিল।

শাহ্ আলমের বন্দীত্বের কঠোরতা অল্পে অল্পে হ্রাস করিয়া ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে তারিখে একেবারে মুক্তি প্রদান করা হইল এবং তিনি প্রথমে মুলতান ও পরে আফগানিস্থানে শাসনকর্ত্তারূপে প্রেরিত হইলেন। তিনি কখনই সাহসী বা দৃপ্ত ছিলেন না। এই কারাবাসের ফলে তাঁহার সমস্ত তেজ নষ্ট হইল। তাঁহার দশা নিতান্ত ভীরুর ন্যায় হইল। বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইল। তিনি কপটতা করিয়া পিতাকে প্রতারণা করিতে লাগিলেন এবং অন্তঃপুরের আমোদ প্রমোদে মনের তৃপ্তি অন্বেষণ করিতে আরম্ভ রিলেন। এখন তাঁহার পৌত্রপৌত্রী হইয়াছিল, তথাপি বাদশাহ তাঁহাকে ভীরুতার অপবাদ দিয়া উপহাস করিতে ক্ষান্ত হইতেন না।

শাহ্ আলম অপদস্থ হওয়ায় মুহম্মদ আজমের সুযোগ উপস্থিত হইল। মাতৃকুল হইতে তাঁহার শরীরে পারস্য-রাজশোণিত প্রবাহিত আছে বলিয়া এই রাজকুমার সর্ব্বদা গর্ব্ব অনুভব করিতেন, কারণ তাঁহার মাতা সফভি বংশের এক কনিষ্ঠ শাখা হইতে উদ্ভূত। ইঁহার অহঙ্কার ও অস্থিরতা অত্যন্ত অধিক ছিল। এমন ভয়ানক পিতার সমক্ষেও তাঁহার বাক্যে বা ক্রোধের সময়ে কার্য্যে কোনরূপ সংযম থাকিত না। তিনি ক্রুদ্ধ হইলে কুস্তিগিরের ন্যায় জামার আস্তিন গুটাইতেন। আওরাংজীব তাঁহার প্রতি, তাঁহার পত্নী (দারাশুকোর কন্যা) জাহাজেব বানুর প্রতি এবং ইঁহাদের পুত্র, পিতামহের বৃদ্ধ বয়সের প্রিয়পাত্র, সাহসী ও সুদক্ষ সেনাপতি বিদার বখ্তের প্রতি যে অনুগ্রহ ও স্নেহ প্রদর্শন করিতেন, তাহাতে রাজকুমারের গর্ব্ব অধিকতর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

কথিত আছে যে,১৬৭০ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা মীর খাঁ রাজপুত্র মুহম্মদ আজম শাহের "কার্য্যে সহানুভূতি দেখাইয়া তাঁহাকে স্বাধীনতার জন্য ষড়যন্ত্রে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সম্রাট এই সংবাদে বলিয়া উঠিলেন, 'এই নীচ চড়ুই পাখীটির ঊর্দ্ধে ভ্রমণকারী বাজপক্ষীর শক্তি নাই।' কিন্তু পাছে সামান্য উৎপাতও করে, সম্রাট এই আশঙ্কায় মীর খাঁকে পদচ্যুত করিয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিলেন।" (১৬৭১ খৃঃ আগষ্ট) রাজকীয় বিবরণে এই ঘটনার কোন উল্লেখ নাই। কেবল উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাজপুত্র প্রতিনিধি দ্বারা যে সমস্ত প্রদেশ শাসন করিতেন তাহার ফৌজদারী পদ হইতে তাঁহাকে অপসারিত করা হয় (অক্টোবর (১৬৭০খৃঃ)। কিন্তু দণ্ডপ্রদানের উদ্দেশ্যে এরূপ করা হইয়াছিল অথবা কর্ম্মচারিগণের পদ-পরিবর্ত্তনের জন্য এরূপ হইয়াছিল, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। আজম "বন্দীরূপে প্রাসাদে পূর্ণ একবৎসর আবদ্ধ ছিলেন ও তিনি মদ্যপান করিতে পান নাই"—মানুশীর এই কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য নহে। আর যদিই ইহা সত্য হয় তথাপি এ দণ্ড কোন অভিপ্রেত বিদ্রোহের শাস্তিস্বরূপ হইতে পারে না কারণ ১৬৬৯ খৃঃ জানুয়ারী মাসে দারার কন্যার সহিত বিবাহের পূর্ব্বে এ কারাদণ্ড প্রদত্ত হইয়াছিল, এরূপ মানুশী লিখিয়াছেন।

আওরাংজীবের পুত্রগণের মধ্যে একমাত্র মুহম্মদ আজমই কারাদণ্ড ভোগ করেন নাই। পরন্তু তিনি আজীবন সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে সসৈন্যে অত্যল্প সময়ে বাঙ্গালা হইতে আজমীরে পৌঁছিয়া, পুনরায় ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইয়া, (১৬৮৫ খৃঃ) বিজাপুর অবরোধ কালে দুর্ভিক্ষ ও বিপদ সত্ত্বেও সৈন্যগণকে উত্তেজক বক্তৃতা প্রদান করিয়া তিনি আওরাংজীবের হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ১৬৯৩ খৃঃষ্টাব্দে আজম সাংঘাতিক পীড়িত হইয়া পড়েন। আওরাংজীব স্বয়ং তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের অত্যধিক প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন।

বহু প্রদেশে শাসনকর্ত্তার পদ পূর্ণ করিবার পরে মুহম্মদ আজম "শাহি আলিজা" উপাধিতে ভূষিত হইলেন এবং দাক্ষিণাত্যে শাহ্ আলমের ন্যায় একদল সৈন্যের স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইলেন। শাহ্ আলমের বন্দীত্বকালে প্রকাশ্য উপাসনার স্থানে ও দরবারগৃহে আজম সম্রাটের দক্ষিণ পার্শ্বে উত্তরাধিকারীর স্থান গ্রহণ করিতেন।

১৬৯৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে ইদুলফিতর পর্ব্ব দিবসে শাহ্ আলম মুক্তিলাভ করিলে যখন সম্রাট পুত্রগণ সমভিব্যাহারে বিজাপুরের প্রধান মস্জিদে উপাসনা করিতে গেলেন তখন দুই ভাইয়ের মধ্যে স্থান লইয়া অদ্ভুত বিবাদ আরম্ভ হইল। রাজকীয় ইতিহাসে ইহার এইরূপ বিবরণ লিখিত আছে :—

"জ্যেষ্ঠপুত্র সর্ব্বদাই সম্রাটের দক্ষিণপার্শ্বে উপবেশন করেন, তজ্জন্য শাহ্ আলম অপদস্থ হইলে আজম সেই সম্মানের স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে শাহ্ আলম সম্রাটকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইদের দিনে আমার ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সম্রাটের কি আজ্ঞা হয়?'

আওরাংজীব উত্তর করিলেন, 'আমার অনুচরগণের পূর্ব্বেই তুমি ইদ্‌গায় (ইদের সময় নমাজ পড়িবার স্থানে) গিয়া আমার দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিবে।' শাহ্ আলম তাহাই করিলেন। সম্রাটের অনুচরগণ সোপানে আরোহণ করিবামাত্র শাহ্ আলম অগ্রসর হইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পদচুম্বন করিলেন। সম্রাট তাঁহার সহিত করকম্পন করিয়া তাঁহার বামকর স্বীয় দক্ষিণ হস্তে ধারণ পূর্ব্বক মস্‌জিদে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সম্রাটের দক্ষিণ পার্শ্বে অত্যন্ত নিকটে উপবেশন করিলেন। শাহি আলিজা (অর্থাৎ আজম) পশ্চাতে আসিয়া সম্রাটের সম্মুখে ভূমির উপরে স্বীয় তরবারি স্থাপন করিলেন এবং তিনি স্বয়ং যাহাতে সম্রাটের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিতে পারেন তজ্জন্য স্থানত্যাগ করিবার ইঙ্গিত স্বরূপ জ্যেষ্ঠভ্রাতার বাহুস্পর্শ করিলেন। সম্রাটের দৃষ্টি এই ব্যাপারে পতিত হইলে তিনি দক্ষিণ হস্তে আলিজার পরিচ্ছদপ্রান্ত ধারণ করিয়া তাহাকে নিজের বাম পার্শ্বে আকর্ষণ করিলেন। উপাসনা সাঙ্গ হইলে যখন সম্রাটের উপাধি ঘোষণা করিবার নিমিত্ত খাতিব বেদীর উপর আরোহণ করিল তখন সম্রাট আলিজাকে হস্তে ধারণ করিয়া আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দ্বিতীয় দ্বারপথে বহির্গত হইলেন এবং জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকে নিজ পুত্রগণ সঙ্গে তৃতীয় দ্বার পথে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।" দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতার সশস্ত্র অনুচরগণের মধ্যে বিবাদ নিবারণের জন্যই এই সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছিল।

খাফি খাঁ এ সম্বন্ধে এক কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, ১৬৯২ কিম্বা ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে শাহ্ আলমকে মুক্তি প্রদান করা হইবে সম্রাটের এইরূপ সংকল্পের বিষয় অবগত হইয়া, আজম প্রকাশ্যে ক্রোধ ও নৈরাশ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ রাজশিবিরে জনরব রটিয়া গেল যে রাজকুমার তাঁহার পিতাকে আক্রমণ করিয়া স্বয়ং স্বাধীনতা অবলম্বন করিবেন; আর আজমের সৈন্যদলের মধ্যে কতকগুলি নির্ব্বোধ লোকের বিশ্বাস জন্মিল যে সম্রাটও মনে মনে আজমের বিরুদ্ধে শত্রুভাব পোষণ করিতেছেন। কিন্তু আওরাংজীব এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। আজম ও তাহার পুত্রগণকে নির্জ্জনস্থানে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করিয়া, ভাণ করিতে লাগিলে যেন নিজেকে তিনি আজমের হস্তে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিয়াছেন। পুত্রকে বিদায় দিবার সময় ইঙ্গিতে তাহাকে জানাইলেন, তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার যে শাস্তি হইয়াছিল, আজম যে সে শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইল, ইহাই তাহার পরম সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করা উচিত। ইতিমধ্যে আজমের পত্নী ও অন্তঃপুরিকাগণ ভাবিয়াছিলেন যে নিশ্চয়ই সম্রাট কর্ত্তৃক কৌশলে তিনি কারারুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার আশা ত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে তাই ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল। আজমের পক্ষে এই শিক্ষাই যথেষ্ট। ইহার পর হইতে পিতৃপ্রেরিত যে পত্রের বিষয় তাঁহার রাজসভার প্রতিনিধি পূর্ব্বাহ্নে তাঁহাকে অবগত করায় নাই এরূপ পত্র খুলিবার পূর্ব্বে তিনি ভয়ে ম্লান হইতেন ও তাঁহার হস্ত কম্পিত হইত। তিনি কখনই বিদ্রোহী হন নাই। ঈশ্বরদাস বলেন, তিনি দিলীর খাঁর সহিত আজম রাজবিদ্বেষের ষড়যন্ত্র করিতেছেন সম্রাটের এই মিথ্যা সন্দেহ প্রকাশে ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে আজম যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এমন কি পুত্রের এই মনোবেদনা দূর করিবার জন্য সম্রাট তাহাকে অনেক করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন।

আওরাংজীবের প্রিয়পুত্র মুহম্মদ আকবরই প্রকাশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। এই রাজপুত্র যখন এক মাসের শিশু, তখনই তাঁহার জননী দিলরস্ বানুর মৃত্যু হইয়াছিল; সেই জন্য স্বভাবতঃই রাজকুমার তাঁহার পিতা ও সমস্ত রাজপরিবার কর্ত্তৃক অত্যধিক আদরে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠা সহোদরা জেব্‌উন্নিসা তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং ভবিষ্যতে কখনও উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া সম্রাটের

পুত্রগণের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি আকবরের পক্ষাবলম্বন করিবেন বলিয়া প্রস্তুত ছিলেন।

মুহম্মদ আকবরের পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে দারা শুকোর পৌত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং চারিবৎসর পরে তিনি প্রথমে শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হন। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে রাজপুত যুদ্ধে অগ্রগামী সৈন্যদলের কর্তৃত্ব লইয়া সম্রাটের সহিত তিনি সেই দেশে গমন করিয়াছিলেন এবং পর বৎসরে একটি সম্পূর্ণ সৈন্যদল তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে ছিল। তৎপরে অসৎ পরামর্শদাতাদিগের মন্ত্রণায় আপনাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন, মুসলমান ধর্ম্মলঙ্ঘনকারী বলিয়া পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিবার আদেশ প্রচার করিলেন এবং তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন (জানুয়ারী ১৬৮১ খৃঃ)। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইল এবং এই হতভাগ্য রাজকুমার সিংহাসনের দাবি ছাড়িয়া মারাঠারাজ শম্ভুজীর শরণাপন্ন হইবার জন্য পলায়ন করিলেন। অবশেষে বহু কষ্টভোগ করিবার পর পারস্য রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য পারস্যরাজ সৈন্য ও অর্থ দিতে চাহিলেন কিন্তু তাঁহার পিতা আওরাংজীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। আকবর আর কি করিবেন? তিনি পারস্যরাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থান করিয়া পিতার আশু মরণ কামনা করিতে করিতে নিজের হৃদয় খানিই অবসন্ন করিতে লাগিলেন। আওরাংজীব ইহা শ্রবণ করিয়া ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, "আচ্ছা দেখা যাউক কাহার অগ্রে মরণ হয়।" তৎপরে নিম্নলিখিত চৌপদী আবৃত্তি করিলেন!—

কুম্ভকারের সেই কথা আমি নাহি পারি ভুলিবারে,
গড়ি ভঙ্গুর চীনার পেয়ালা কহিয়াছিল সে তারে—
'নাহি জানি আমি, নিয়তির ছোঁড়া ঢেলা লাগি
তোমার আমার মাঝে কেবা যাবে আগে ভাঙ্গি।'

কার্য্যতঃ নিজ জন্মদাতার পূর্ব্বেই আকবরের মৃত্যু হয়। কিন্তু যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি তাঁহার পিতার ও আফগানিস্থানের শাসনকর্ত্তা তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শাহ্ আলমের ভয়ের কারণ হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া আওরাংজীব বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "আঃ বাঁচিলাম, ভারতবর্ষের প্রধান শান্তিভঙ্গকারী গেল।"

দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির অধঃপতনের পূর্ব্বে আওরাংজীবের কনিষ্ঠপুত্র মুহম্মদ কামবখ্স্ (জন্ম ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৬৬৭ খৃঃ) ভারতের ইতিহাসে কোন কার্য্যই করেন নাই। কিন্তু তিনিও তাঁহার দুর্ব্যবহারের জন্য কিছুকাল আবদ্ধাবস্থায় ছিলেন (ডিসেম্বর ১৬৯৮—জুন ১৬৯৯)।

সম্রাটের জ্যেষ্ঠা কন্যা জেব্উন্নিসা একজন প্রতিভাশালিনী কবি ছিলেন এবং সাহিত্যিকদিগকে উৎসাহ দিতেন। তিনি অন্তঃপুরে পারসীক শিক্ষয়িত্রীগণ কর্ত্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি কোরাণ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন এবং "মখ্ফী" (অর্থাৎ গুপ্তব্যক্তি) এই ছদ্মনামে একখণ্ড কবিতাপুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার রাজসভার জনৈক ওমরাহ্ আকিল খাঁর সহিত তাঁহার অবৈধ প্রণয় ছিল এইরূপ একটা কলঙ্ককর কাহিনী উনবিংশ শতাব্দীর উর্দ্দু লেখকগণের কল্পনাবলে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল লেখকের কাহিনী প্রধান প্রধান বিষয়ে প্রকৃত ইতিহাসের সহিত অসঙ্গত। *

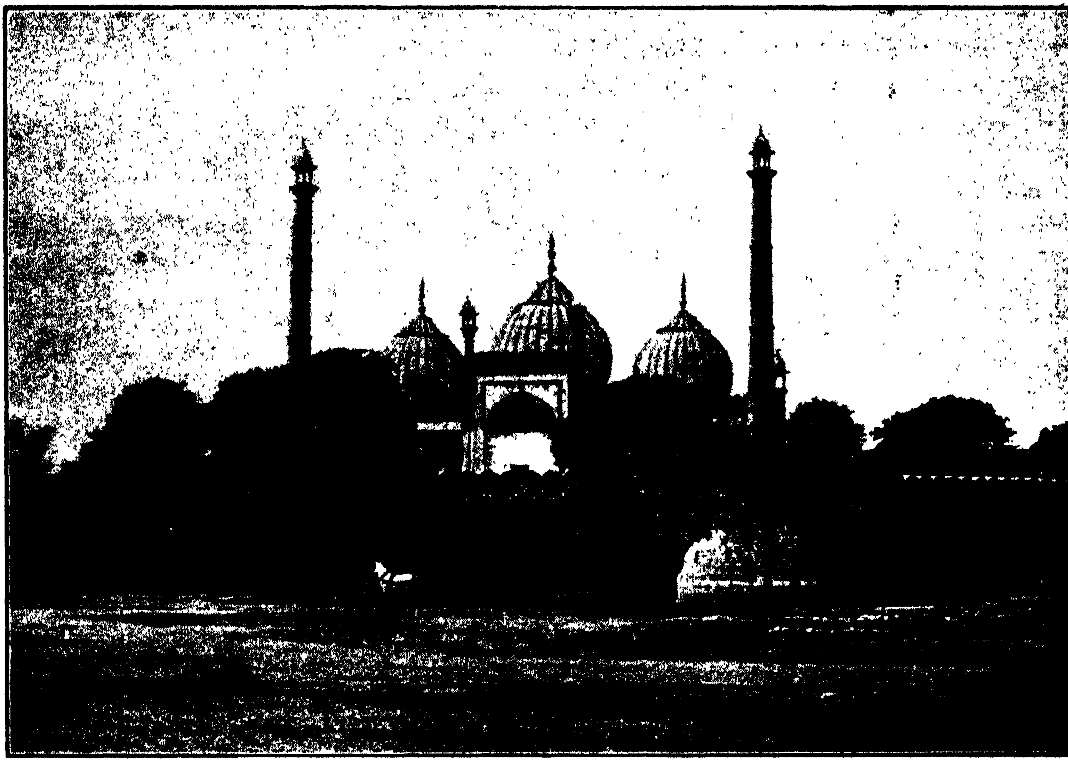
জেব্উন্নিশা তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর মুহম্মদ আকবরের পক্ষাবলম্বিনী ছিলেন এবং তাঁহার বিদ্রোহের পূর্ব্বক্ষণে গোপনে তাঁহার সহিত পত্রব্যবহার করিতেন। বিদ্রোহ বিফল হইলে আকবরের পরিত্যক্ত শিবির যখন সম্রাট সৈন্যের অধিকারে আসিল, জেব্উন্নিসার লিখিত পত্রগুলিও ধরা পড়িল। আকবর পলায়ন করিয়া শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইল বলিয়া পিতার সমস্ত ক্রোধ জেব্উন্নিসার শিরে পতিত হইল। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ও বাৎসরিক ৪ লক্ষ টাকার বৃত্তি বাজেয়াপ্ত হইল এবং

* মডার্ণ রিভিউ, জানুয়ারী ১৯১৬, ৩৩—৩৬ পৃষ্ঠায় এই বিষয় আলোচনা করিয়া সাক্ষ্যদ্বারা আমি ইহার ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছি।—লেখক।

তিনি চিরজীবনের জন্য সলিমগড়ে বন্দিনী হইলেন (১৬৮১—১৭০২ খৃঃ)। সম্রাট স্বয়ং যখন সমাধির প্রান্তে উপস্থিত প্রায় তখন দিল্লীতে কন্যার মৃত্যু সংবাদে অশ্রুপাত করিয়া তাঁহার আত্মার কল্যাণ-কামনায় দরিদ্রদিগকে ভিক্ষাদান করিতে আদেশ দিলেন।

অপেক্ষা অল্প যশস্বিনী হইলেও তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর সুখী ছিলেন।

শাহ্‌জাদীগণ আমরণ কুমারী থাকিবেন, ইহাই মুঘল রাজরীতি ছিল। কোন মুসলমান ফকিরের অনুরোধে এবং মুসলমান ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের দৃষ্টান্তে আওরাংজীব



কুমারী মসজিদ।

আওরাংজীবের আর এক কন্যা শাহ্‌জাদী জিনতুন্নিসা চির-কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি পিতার নিকট যৌতুক চাহিয়া লইয়া সেই টাকা দিয়া দিল্লীতে একটি সুন্দর মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বহুদিন যাবৎ ইহা "কুমারী মসজিদ্" নামে পরিচিত ছিল। তিনি তাঁহার পিতার সেবা-শুশ্রূষা কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত করিলেন। রাজত্বের শেষার্দ্ধে সম্রাট্ যখন দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনিই সে সময়ে রাজান্তঃপুরের কর্ত্রী ছিলেন। তিনি পিতৃসেবায় জাহানারা এ

রীতি পরিহার করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার দুই কন্যা মিহ্‌রুন্নিসা ও জুব্‌দতুন্নিসার বিবাহ দিয়াছিলেন। অপর এক কন্যা (বদ্‌রুন্নিসা) বোধ হয় সুযোগ্য পাত্র পাইবার পূর্ব্বেই, দ্বাবিংশবর্ষ বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সম্রাটের জ্যেষ্ঠা ভগিনী জাহানারা দারাশুকোর পক্ষাবলম্বিনী এবং শাহ্‌জাহানের ন্যায্য অধিকারের সহায়ক ছিলেন। তিনি ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে আওরাংজীব ও মুরাদকে ভ্রাতায় ভ্রাতায় যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বয়ং তাঁহাদের আগ্রার জয়স্কন্ধাবারে সন্ধির প্রস্তাব সহ উপস্থিত হইয়াছিলেন,

এবং এরূপ প্রস্তাব গ্রহণে তাঁহারা অস্বীকৃত হইলে, অস্বাভাবিক ব্যবহারের জন্য তাঁহাদিগকে কঠোর তিরস্কার করিয়াছিলেন। অবশেষে বিজেতার পক্ষাবলম্বন করিয়া স্বাধীনতা ও অর্থলাভ অপেক্ষা পিতার চির-জীবনের বন্দীত্বের অংশভাগী হওয়াই তিনি শ্রেয়স্কর মনে করিলেন। কিন্তু পরে, লোভীর যাহা স্বপ্নেরও অগোচর, স্বীয় সাধুচরিত্রের গুণে তিনি সেই পুরস্কারও লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এই অন্ধকারময় দীর্ঘ কারা-



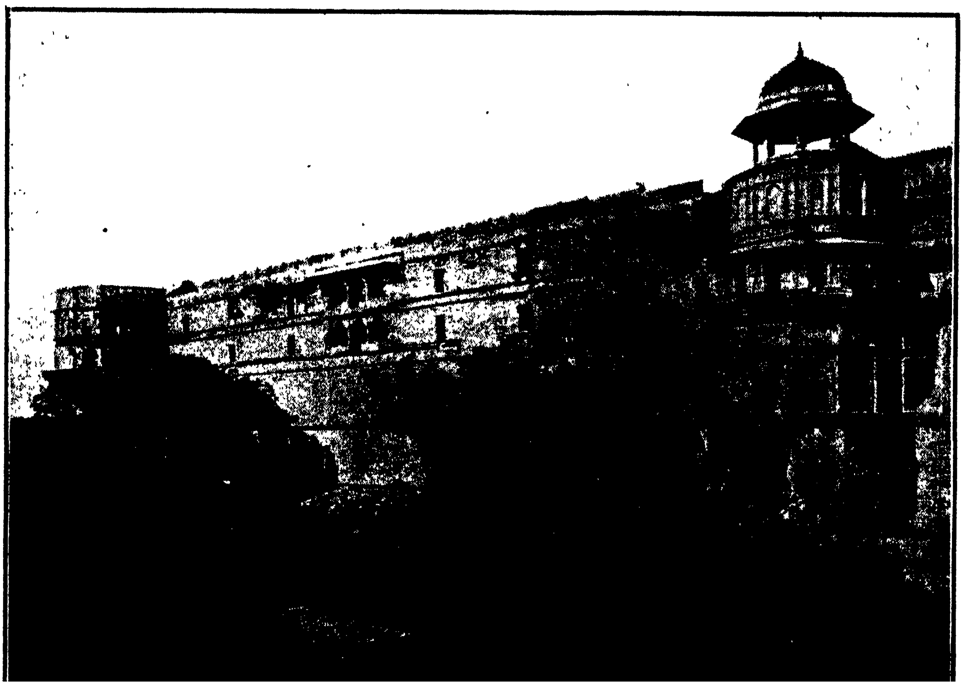
জাহানারা বেগম।

জীবনের মধ্যে আওরাংজীবকে ক্ষমা করিবার জন্য তিন তিনবার শাহ্‌জাহানকে মিনতি করিয়াছিলেন। ক্রুদ্ধ পিতা দুইবার অস্বীকার করেন। কিন্তু অবশেষে জাহানারার দয়ার জয় হইল এবং শাহ্‌জাহান মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আওরাংজীব রাজা ও পিতার প্রতি যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার জন্য তাঁহাকে ক্ষমা পত্র লিখিয়া দেন।

শাহ্‌জাহানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরে (ফেব্রুয়ারি ১৬৬৬ খৃঃ) আওরাংজীব আগ্রায় গমন করিয়া পুনঃ পুনঃ জাহানারার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাঁহার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করেন এবং অবশেষে তাঁহাকে সাম্রাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহিলার গৌরব প্রদান করিয়াছিলেন। সমস্ত ওম্‌রাহ্‌দিগকে আদেশ দেওয়া হইল যে তাঁহারা আগ্রা-দুর্গে তাঁহার মহলে যাইয়া বাহির হইতে তাঁহাকে সালাম্ করিবেন ও নজর দিবেন এবং খোজারা অন্তঃপুরে লুক্কাইত রাজভগিনীর নিকট ঐ অভিবাদন ও নজর উপস্থিত করিবে। পরবর্ত্তী অভিষেকবাসরে (২৭শে মার্চ) জাহানারা এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা (১৪ লক্ষ টাকা) নজর পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার বাৎসরিক বৃত্তি বর্দ্ধিত করিয়া ১৭ লক্ষ টাকা করা হইয়াছিল। এইরূপ সম্মান তাঁহাকে আজীবন প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে গেলে আলি মর্দ্দনের বৃহৎ অট্টালিকা তাঁহার বাসের জন্য দেওয়া হয়। এই স্থানে আওরাং-জীব প্রায় তাঁহার নিকট গিয়া প্রিয় সহোদরের ন্যায় তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল কথোপকথন করিতেন। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে উচ্চ রাজকর্ম্মচারী দানিশমন্দ খাঁকে আদেশ দেন যে তিনি যেন জাহানারার দেউড়িতে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে বলিয়া পাঠান, "আপনি যে আজ্ঞা করিবেন তাহা প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত আমি উপস্থিত আছি।" তাঁহার এই গৃহেই তাঁহার বিশেষ স্নেহভাজন এবং পালিতা কন্যা (দারার পিতৃমাতৃহীন সন্তান) জাহান্‌জেব বানুর সহিত আওরাং-জীবের তৃতীয় পুত্র মুহম্মদ আজমের ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে অত্যন্ত ধূমধামের সহিত বিবাহ হয়। মুরাদের কন্যাগণও এই গৃহে আশ্রয় পাইয়াছিল ও জাহানারাই তাহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। আর হতভাগ্য সুলেমান শুকোর কন্যা সালিমা-বানু, সম্রাটের অপর এক ভগিনী গৌহরারা বেগম কর্ত্তৃক প্রতিপালিতা হন এবং কালক্রমে মুহম্মদ আকবরের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

বস্তুতঃ মুঘলদিগের সময়ে নূরজাহান ও মুমতাজ মহল ব্যতিরেকে অন্য কোন বাদশাহপত্নী রাজ্যমধ্যে প্রধান মহিলারূপে পরিগণিত হইতেন না। বাদশাহ-

দিগের জননী বা ভগিনীই রাজ্যের মহিলাদিগের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিতেন। ভারতীয় রীতিতে পত্নী গৃহিণী না হইয়া বিধবা জননী বা অন্য কোন প্রবীণ আত্মীয়াই গৃহের কর্ত্রী হইয়া থাকেন। অন্তঃপুরের সাধারণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান, পরিবারের বিবাহ ও অন্যান্য পর্ব্বানুষ্ঠান ও রাজধানীর মহিলা-সমাজের উপর প্রভাব-বিস্তার-রূপ কার্য্য হইতে সম্রাজ্ঞী স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃ নিবৃত্ত থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার



আগ্রা দুর্গ।

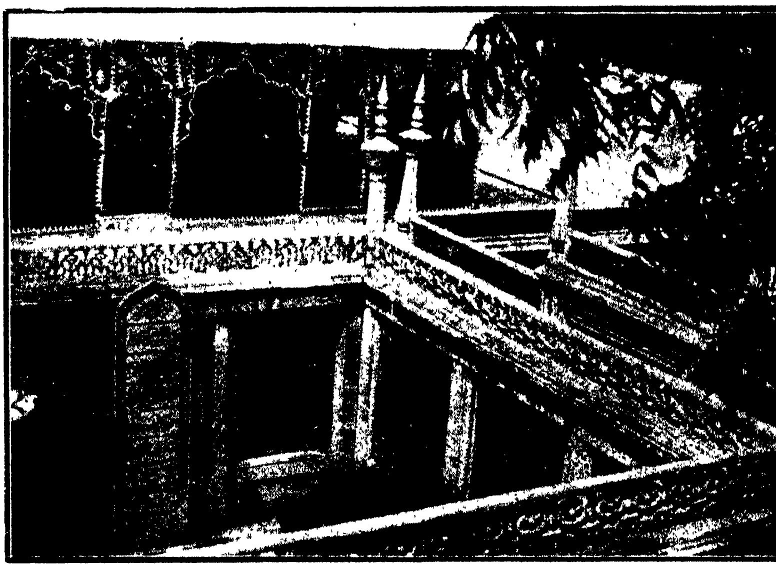
স্বামীর মৃত্যু হইবামাত্র তিনি বিধবার মর্য্যাদা ও রাণী-মাতার প্রভাব প্রাপ্ত হইতেন। কোন অল্পবয়স্কা সুন্দরী প্রতিযোগিনী আসিয়া তাঁহাকে স্বামীর প্রদত্ত মর্য্যাদা কিম্বা সম্মান ও প্রভাবের পদ হইতে বঞ্চিত করিবেন এ ভয় আর তখন থাকিত না। সামাজিক শিষ্টাচার বশতঃ সম্রাটও তাঁহার পত্নীকে, স্বীয় জননী ভগিনী কিম্বা পিতৃস্বসার উপরে সম্মানের স্থান দিতে পারিতেন না। এই জন্য দিল্লীর প্রাসাদের মহিলাসমাজে মৃত বাদশাহের পত্নী কিম্বা প্রবীণা কুমারীগণই কর্ত্রী হইতেন।

শাহ্‌জাহান সিংহাসনারোহণ করিলে তাঁহার পরম শত্রু ও প্রতিযোগী শাহ্‌রিয়ারের সহায়ক বলিয়া নুর-জাহানকে সামান্য অবস্থায় কালযাপন করিতে বাধ্য হইতে হইল। সম্রাটপত্নী মুমতাজ মহল কেবল চারিবৎসরকাল রাজসিংহাসনের অংশভাগিনী হইয়া জীবিত ছিলেন। তৎপরে জ্যেষ্ঠা শাহ্‌জাদী জাহানারা ২৭ বৎসরকাল তাঁহার পিতার গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। তিনি বেগম সাহেব বা পাদশাহ্‌ বেগম নামে অভিহিত হইতেন। শাহজাহানের কারাবাসের সময় তাঁহার শুশ্রূষাকারিণীরূপে তিনি ৮ বৎসরকাল নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু শাহ্‌জাহানের মৃত্যু হইলে তিনি যখন নির্জ্জনতা ত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন তখন আওরাংজীব তাঁহাকে রাজগৃহের প্রধান মহিলার পদ পুনঃপ্রদান করিলেন। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি এই সম্মান ভোগ করিয়াছিলেন। যখন অন্য কেহই সাহস করিত না তখন তিনিই বয়স ও পদমর্য্যাদার গুণে

আওরাংজীবকে অপ্রিয় কিন্তু সৎ উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে সম্রাট তিন দিবসকাল বিলাপ করিয়া আদেশ দিলেন যে, ভবিষ্যতে রাজকীয় বিবরণে তাঁহার নাম "সাহিবৎ উজ্জমানি" (যুগরাণী) বলিয়া উল্লিখিত হইবে।

তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী রোশনারা বেগম সিংহাসন লইয়া যুদ্ধের সময়ে আওরাংজীবের যথার্থই সহায়ক ছিলেন এবং আগ্রার অন্তঃপুরে থাকিয়া আওরাংজীবের প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে পরাভূত করিবার জন্য অব্যর্থ ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। আওরাংজীবের বিজয়ের দিন যথার্থই রোশনারার আনন্দ প্রকাশের দিন হইল। তাঁহার অভিষেক দিবসে (জুন ১৬৫৯) রোশনারা ৫ লক্ষ মুদ্রা উপহার পাইলেন। এত অধিক অর্থ আওরাংজীব তাঁহার কোন কন্যাকেই প্রদান করেন নাই। তাঁহাদের পিতার মৃত্যু হইলে রাজগৃহে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পুনরাগমন পর্য্যন্ত তিনি ভ্রাতার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সন্তান ও পত্নীগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তৎপরে রোশনারা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারি না। সম্ভবতঃ তিনি সামান্য অবস্থায় ১৬৭১ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে ৫৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু মুখে পতিত হন।

আওরাংজীবের পীড়ার সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় (মে ১৬৬২) যাহাতে একদল ওম্‌রাহ্‌কে শিশু রাজকুমার আজমের সিংহাসনারোহণের পক্ষাবলম্বী করিতে পারেন তজ্জন্য তিনি তাঁহার নিকট রক্ষিত রাজকীয় পাঞ্জার (মুদ্রার) অপব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহাতে জনসাধারণও আশঙ্কিত হইয়াছিল। "ইতোমধ্যে দিল্লীনগরীর বিশৃঙ্খল অবস্থা ভয়ানক হইয়া উঠিল। এই সকল গোলমালের মূলকারণ রোশনারা বেগম। স্বীয় দলের এক খোজা ব্যতিরেকে তিনি অন্য কাহাকেও পীড়িত আওরাংজীবকে দেখিতে দিতেন না।" আওরাংজীব



"যুগরাণী" জাহানারা বেগমের সমাধি।

আরোগ্যলাভ করিলে, "সুলতান আজমকে সাহায্য করিবার জন্য স্বপক্ষ অবলম্বন করিতে রাজপ্রতিনিধি, শাসনকর্ত্তা ও সেনাপতিদিগকে রোশনারা পত্র লিখিয়াছিলেন এবং সে সব পত্র রাজকীয় মুদ্রায় মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিলেন জানিতে পারিয়া আওরাংজীব রোশনারার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হন। তিনি তাঁহার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হওয়ায় রোশনারা ভ্রাতৃস্নেহ হারাইলেন।"

"রোশনারার ভ্রষ্টাচারে আওরাংজীব ক্রুদ্ধ হইয়া বিষপ্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু ঘটান এবং তিনি 'পিপার ন্যায় ফুলিয়া' প্রাণত্যাগ করেন,"—প্রাসাদের একজন সঙ্কর জাতীয়া পর্ত্তুগীজ বাঁদীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া মানুশী কর্ত্তৃক বর্ণিত এই কলঙ্ককর জনরবের প্রকৃত ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। ইহা সম্ভবতঃ এই ইটালী-

বাসী যুবকের আশু প্রত্যয়ের উদাহরণ। রৌশনারা রাজকীয় ইতিহাসে সচ্চরিত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, —"তাঁহার মহৎ ও প্রশংসনীয় গুণ ছিল এবং তিনি সম্রাটকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। (তাঁহার মৃত্যুতে) সম্রাট তাঁহার আত্মার সদ্‌গতির নিমিত্ত দরিদ্রের মধ্যে বহু অর্থ বিতরণ করেন এবং তাঁহার দাসদাসীদের সহিত সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন।"

ইতিহাসে আওরাংজীবের অপর ভগিনীদিগের কোন প্রভাব লক্ষিত হয় না। তাঁহারা প্রাসাদে বসিয়া শান্তভাবে বৃত্তিভোগ করিতেন মাত্র।

আওরাংজীব স্বীয় পরিবার ও তাঁহার হতভাগ্য ভ্রাতৃপরিবারের মধ্যে অনেকগুলি বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ সুলতান শুজার কন্যা গুলরুখ্ বানুকে এবং ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে মুরাদ বখ্‌শের কন্যা দস্তদার বানুকে বিবাহ করেন। তাঁহার অপর পুত্রদিগের মধ্যে মুহম্মদ আজম ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে দারার কন্যা জাহাজেব বানুকে এবং মুহম্মদ আকবর ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে সুলেমান শুকোর কন্যা সালিমা বানুকে বিবাহ করেন। সম্রাটের দুই কন্যা মিহ্‌রুন্নিসা ও জুব্‌দতুন্নিসা যথাক্রমে মুরাদের পুত্র ইজাদ বখ্‌শ্ ও দারার পুত্র সিপিহ্‌র্ শুকোর সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন (১৬৭২ ও ১৬৭৩ খৃঃ)। আওরাংজীবের রাজত্বের শেষভাগে পলায়িত আকবরের দুই কন্যা শাহ্ আলমের দুই পুত্রের সহিত বিবাহিত হন (১৬৯৫ খৃঃ)।



আওরাংজীব।

এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় আওরাংজীব হইতে তৃতীয় পুরুষে আওরাংজীবের শোণিত তাঁহার মৃত ভ্রাতৃগণের শোণিতের সহিত জটিলভাবে মিশ্রিত হইয়া গেল।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

কবিভূষণ ও শিবাজী

জাতীয় কবি।

আমাদের জাতীয় কবি আমাদের প্রাণ, আমাদের চক্ষু, আমাদের ভাষা ও আমাদের প্রতিনিধি। কবির বীণাঝঙ্কারে আমাদের জাতীয় জীবনের সাড়া পাওয়া যায়। কবির কাকলীতানে আমাদের মর্ম্মের ব্যথার ও প্রাণের কথার আভাস মিলে। কবির মুরলী ধ্বনিতে ও মুরজ-মন্দ্রে আমাদের জাতীয় জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সপ্তসুর নানা রাগরাগিণী ও মূর্চ্ছনায় খেলিয়া যায়। কবি বর্ত্তমানে অতীত জাগাইয়া ভবিষ্যতের সৌধ রচনা করেন। জাতীয় জীবনে ফল্গুর অন্তঃসলিলা গুপ্ত-ধারাকে স্বচ্ছ-সজীব উৎসে পরিণত করেন। তাই কবির বাণী অপৌরুষের, অনাদি, অনন্ত, দেবতার মুখবিনিঃসৃত আশীর্ব্বচন। কবির কাব্যে আমাদের জাতীয় জীবনের অতীত ইতিহাস গাথা রহিয়াছে। আত্ম-প্রশংসা ও

পরনিন্দা-দ্বারা ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত হইতে পারে, ব্যক্তিগত চাটু, জাতিগত ঘৃণাবিদ্বেষ বা পরাভব পরিতাপ ইতিহাসের সত্যকে বিকৃত করিতে পারে ; কিন্তু কবির কাব্যগর্ভে সঞ্চিত, নানা আভরণে ভূষিত, সমসাময়িক চিত্রগুলি, হয়ত কিয়ৎ পরিমাণে অতি-রঞ্জিত হইলেও, সে গুলি সত্যের উপাদানেই গঠিত। অস্তাচলশায়ী হইবার প্রাক্কালে, এদেশে যে 'মাৎস্যন্যায়' বা অরাজকতার অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে বহুকালের বিজিত ও পরপদানত হিন্দুর প্রাণে আমরা বীর-ভয়ানক-রৌদ্র রসের সঞ্চার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। কাসিমপুত্র মহম্মদ পরিচালিত আরবসেনার গতিরোধ করিতে রাজপুত বাপ্পারাও যে বীররসের



রামদাস + শিবাজী + ভূষণ কবি।

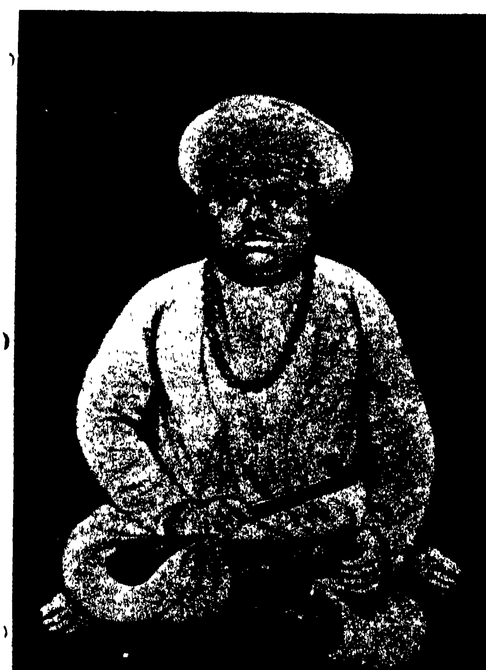
ভূষণকবির কাল।

মানুষের প্রাণে যেমন সময় বিশেষে কোনও বিশেষ রস স্থায়ী ও প্রধান হইয়া জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করে এবং অপর রস সকল অঙ্গী হইয়া তাহারই সহায় হয়, জাতির জীবনেও সেইরূপ ঘটিতে দেখা যায়। তিন শতাব্দীর তিনটি উত্তাল তরঙ্গ কাল-সমুদ্রের বক্ষের উপর নৃত্য করিয়া, বহু পরিবর্ত্তন পশ্চাতে ফেলিয়া, চলিয়া গিয়াছে। বিক্রমশালী ইংরাজরাজের জয়পতাকার ছায়াতলে ভারতের খণ্ডরাজ্যসমূহ মহাসমন্বয়ে মিলিত হইবার পূর্ব্বে, ভারতের তুর্ক-গৌরব-রবি উদ্বোধন করিয়াছিলেন, আফগানবীর সাহাবুদ্দীন মহম্মদ ঘোরীকে পরাভূত করিতে দিল্লীশ্বর চৌহানবীর পৃথ্বীরাজ যে ভুজবলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তুর্কবীর বাবরের বিজয় ব্যর্থ করিতে শিশোদিয়া-রাজ রাণা সংগ্রাম সিংহ যে শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, ততোধিক শৌর্য্যবীর্য্য ও বীরত্বের বোধন করিয়া দাক্ষিণাত্যের দাবানলের লেলিহান রসনা ভারতে মুসলমান শক্তির আধিপত্য ও অত্যাচার সংহার করিতে প্রসারিত হইয়াছিল। তখন দক্ষিণ মালভূমির শৈলশিখরে ও কাননে কন্দরে যে বীররসপূর্ণ চঞ্চলতা ও ক্রিয়াশীল-তার বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা কবির গাথায়



দিল্লীর দুর্গ।

অমর হইয়া রহিয়াছে। মহাকবি চাঁদ বর্দাইর তিরোধানের পর আর কেহ তেমন বীররসের ভেরী-নিনাদ ভারত-ভূমিতে শুনিতে পায় নাই। নবপ্রতিষ্ঠিত মরাঠা রাজসভায় কবির সে হুঙ্কারে দিল্লীশ্বরের রত্ন-সিংহাসনও কম্পিত হইয়াছিল। জয়দেব ও বিদ্যাপতির মধুর রসের বীণাধ্বনি যখন উত্তর ভারতে নীরব হইয়াছিল, ভক্তকবি সুরদাস ও সাধককবি তুলসীদাসের একতন্ত্রী-বিনিসৃত শান্তরসের ঝঙ্কারেও যখন হিন্দুর প্রাণে শান্তি আনয়ন করিতে বৃথা চেষ্টা করিতেছিল, বিঠোবা সেবক তুকারামের বংশীধ্বনি যখন সরল ভাষায় বেদান্ত ব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম্ম-সমন্বয়ের সমসূত্রে গাঁথিয়া মহারাষ্ট্র দেশে জাতীয়তা গঠনের আয়োজন করিতেছিল, তখন কবিভূষণের ডমরুধ্বনি শিবাজীর ধনুষ্টঙ্কার ও করবাল ঝনৎকারের সহিত মিশ্রিত হইয়া অদ্ভুত ও ভয়ানক শুনাইতেছিল।



সাধু তুকারাম

ভূষণকবির বংশপরিচয়।

কবিভূষণ মরাঠা রাজশক্তির প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর শিবাজীর সভাকবি ছিলেন একথা কবি স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থাবলী দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে এবং কিম্বদন্তীতেও প্রচলিত আছে। তাঁহার নাম, গোত্র, বংশ ও জীবন সম্বন্ধে কবিরচিত কাব্য-গ্রন্থের আভ্যন্তরিক প্রমাণ ও লোকমুখে প্রচলিত প্রবাদ ভিন্ন অন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এ পর্য্যন্ত কেহ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু কবি তাঁহার নিজের ইতিহাস যতই অস্পষ্ট ও অপ্রকাশিত রাখিতে চেষ্টা করুন না কেন, তাঁহার অমর তুলিকায় তাঁহার আশ্রয়দাতা শ্রদ্ধার পাত্র কাব্যনায়ক বীর শিবাজীর যে অপূর্ব্ব চিত্র চিত্রিত হইয়াছে, বর্ণ বৈচিত্রে, অঙ্কন কৌশলে, রূপ মাধুর্য্যে ও ভাবগাম্ভীর্য্যে তাহা দর্শকের চিত্ত মুগ্ধ করিয়া কীর্ত্তি-শরীরে শিল্পীর নাম চির-ভাস্বর রাখিবে। কবি তাঁহার "শিবরাজভূষণ" কাব্যের উপোদ্‌ঘাতের শেষাংশে সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন,

"দ্বিজ কনৌজ কুল কশ্যপী, রতনাকর সুত ধীর।
বসত ত্রিবিক্রমপুর সদা, তরণি-তনুজা-তীর॥"
এবং—"কুল সুলঙ্খ চিত্রকূটপতি সাহসসীন সমুদ্র।
কবিভূষণ পদবী দই, হৃদয়রামসুত রুদ্র॥"

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় মহাকবিভূষণ ত্রিপাঠী কশ্যপ গোত্রীয় কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার জন্ম-স্থান যমুনাতীরবর্ত্তী ত্রিবিক্রমপুর। কানপুর জিলার অধীন টিকমাপুরকেই এখন ত্রিবিক্রমপুর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। ভূষণের পিতার নাম রত্নাকর। চিত্রকূট-পতি সুলঙ্ক বংশীয় নরপতি হৃদয়রামপুত্র রুদ্ররাজ ভূষণের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'কবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। কবি কোথাও তাঁহার নিজের নাম উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু নামে কি আসে যায়? "Call the rose by any other name and it would smell as sweet"

ভূষণের এই সামান্য আত্মপরিচয় ও তাঁহার গ্রন্থের স্থানে স্থানে যে সকল সঙ্কেত পাওয়া যায় তাহার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহার জীবনচরিত্র-আলোচনাকারী মনীষী পণ্ডিতগণ (১) যুক্তি ও অনুমান-বলে অনেক কথার অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভূষণের পিতা রত্নাকর তেওয়ারীর চারি পুত্র ছিল যথা,—চিন্তা-মণি বা মণিলাল, কবিভূষণ, মতিরাম ও জটাশঙ্কর বা নীলকণ্ঠ। ইঁহারা সকলেই প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। চিন্তামণি নাগপুরের ভোসলা ও মকরন্দ শাহের সভায় এবং দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজেবের দরবারে সভাকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত 'ছন্দ বিচার,' 'কাব্যবিবেক', 'কবিকুল-কল্পতরু' ও 'রামায়ণ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। মহাকবি মতিরাম—কুমায়ুঁনরেশ উদোতচন্দ, ভাওসিংহ, হাড়া-কোটা, পান্নানরেশ ছত্রশাল ও সোলঙ্কীবংশের রাজা শম্ভু বা সম্ভাজীর নিকট বহুমান লাভ করিয়াছিলেন। কবি ভূষণের স্ফুটকাব্যে স্থানে স্থানে আমরা মতিরামের নাম পাইয়াছি,—

কহৈ মতিরাম জীত হদ্দ মহরট্টন কী।
দেশ দেশ কীরতি বখানে পুনি পুনীমৈ॥

এবং

কহৈ মতিরাম যাকে তেজ মাঁহ মারুতকে।
মারতগুহুকে গুণ রহে হৈ সমোয়সে॥
ইত্যাদি।

সর্ব্ব কনিষ্ঠ জটাশঙ্কর (উপনাম নীলকণ্ঠ) রচিত অনেক স্ফুটকবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। মিশ্রবন্ধু-বিনোদে তাঁহার রচিত 'অমরেশবিলাস' গ্রন্থের উল্লেখ

(১) 'শিবসিংহ সরোজ,' ডাক্তার গ্রিয়াসন প্রণীত The modern Ltierary Histoy of Hindustan, মুম্বই নির্ণয়-সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত পণ্ডিত শ্রীগোপাল ভট্টাত্মজ ত্রিবিক্রম লালাজী সম্পাদিত 'শিবরাজভূষণ' কাব্যের ভূমিকা, কলিকাতা হিন্দী বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত (সং ১৯৫৭) 'ভূষণ গ্রন্থাবলী'র ভূমিকা, পণ্ডিত শ্যামবিহারী মিশ্র এম্‌-এ ও শুকদেব বিহারী মিশ্র বি-এ সম্পাদিত ও কাশী নাগরী প্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত 'ভূষণ-গ্রন্থাবলী'র ভূমিকা, 'হিন্দীনবরত্ন' ও 'মিশ্রবন্ধুবিনোদ' ২য় ভাগ দ্রষ্টব্য।

পাওয়া যায়। উহাতে জটাশঙ্করের জন্মকাল সংবৎ ১৬৭৮ বলিয়া উল্লেখ আছে।

ভূষণ ও কুমায়ুঁনরেশ।

কথিত আছে প্রথম জীবনে কবিভূষণের আদৌ বিদ্যানুরাগ ছিল না। তিনি জ্যেষ্ঠের গলগ্রহ হইয়া গৃহে অলসভাবে জীবন-যাপন করিতেন। কিন্তু এজন্য জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূর অনাদরে ও বাক্যবাণে মর্ম্মাহত হইয়া তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং বিদ্যাভ্যাস করিয়া চিত্রকূটাধিপতি রুদ্ররাম সুলঙ্কীর আশ্রয়ে কিছুদিন বাস করিয়া তাঁহার নিকট উপাধি লাভ করেন। 'শিবছত্রপতি চরিত্র' অনুসারে ভূষণ প্রথমতঃ বিদ্যাভ্যাস করিয়া কুমায়ুঁনরেশের রাজসভায় আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং নিম্নলিখিত স্তুতি কবিতা রচনা করিয়া রাজার নিকট লক্ষমুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,—

উদলত মদ অনুমদ জ্যোঁ জলধিজল,
বলহদ ভীমকদ কাহুকে ন আহকে,
প্রবল প্রচণ্ড গণ্ডমণ্ডিত মধুপবৃন্দ,
বিন্দসেঁ বিলিন্দ, (২) সিন্ধু সাতহুকে যাহকে।
ভূথণ ভনত ঝূলি ঝম্পতি ঝপান ঝুকী,
ঝুকত ঝুকত ঝহরাত রথ হালকে।
মেঘসে ঘমণ্ডিত মজেজদার তেজপুঞ্জ,
গুঞ্জতসো কুঞ্জর কুমাউঁ নরনাহকে॥

ভূষণ বলে অনুক্ষণ সাগর বারির ন্যায় মদস্রাবী, অতুল বলশালী, ভীমাকৃতি, সাহসে অপ্রতিম, মধুকর-বেষ্টিত প্রবল প্রচণ্ড গণ্ডস্থল বিশিষ্ট, বিন্ধ্যাচলের ন্যায় উন্নত, সপ্তসাগরতলস্পর্শী, যাহার পৃষ্ঠাবরণ ঘাত প্রতিঘাতে দোদুল্যমান হইতেছে (এরূপ), মেঘমণ্ডিত উজ্জ্বল তেজঃপুঞ্জের (রবির) ন্যায় কুমায়ুঁ নরনাথের কুঞ্জর ধীর পদক্ষেপে গমন করিতেছে।

কুমায়ুঁনরেশ দাম্ভিক উদোত সিংহ দানের বড়াই করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন,'ঐসে দাতা তুম্‌হেঁ ন মিলেগা' —এমন দাতা তুমি আর পাবে না। তেজস্বী কবির আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল। তিনিও রাজার দান প্রত্যাখ্যান করিয়া সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, 'ঐসে দাতা তো বহুত হোঙ্গে,পর মুঝসা ত্যাগী যাচক ন মিলেগা।' —এমন দাতা অনেক পাওয়া যাবে, কিন্তু এমন ত্যাগী যাচক আর পাবে না। এই জনশ্রুতির মূলে সত্য আছে কি না জানিনা, কিন্তু এমন অভিমানী, তেজস্বী ত্যাগী কবি ছিলেন বলিয়াই ভূষণের কাব্য আজও উত্তর-ভারতের গৃহে গৃহে সমাদৃত।

অনেকের মতে ভূষণ শিবাজীর সভা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কুমায়ুঁনরেশের রাজসভায় শিবাজীর যশঃ কীর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রদত্ত লক্ষ মুদ্রা বিনয়ের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

ভূষণ ও ঔরঙ্গজেব।

'বার্ত্তাবিনোদে' 'ঔরঙ্গজেব ও কবিভূষণ' শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তদনুসারে ভূষণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর চিন্তামণির ন্যায় ঔরঙ্গজেব বাদশাহের দরবারে অন্যতম সভা-কবির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কথিত আছে ঔরঙ্গজেব তাঁহার আশ্রিত কবিগণের স্তুতিবাক্যে বীতশ্রদ্ধ হইয়া একদিন খোস-মেজাজে তাঁহাদিগের মুখে তাঁহার দোষের উল্লেখ শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। "তুম লোগোঁমে কৌন ঐসা হৈ যো হমারী রাস্তগোয়ী কর সকতা হৈ"(৩) "মেরে ঐবকোভী বখানো তব জানূঁ কি তুমলোগ সত্যবাদী হো।" (৪) সভাসদ্ কবিগণ সকলেই নীরব রহিলেন, কিন্তু নির্ভীক যুবক কবিভূষণ ঔরঙ্গজেবের নিকট হইতে সম্রাটের দোষোল্লেখহেতু ভবিষ্যৎ অপরাধের ক্ষমাপত্র (ফর্ম্মান) লিখাইয়া লইয়া যে দুইটী কবিতা পাঠ করিলেন, তাহাতে সম্রাটের মুখ মসীময় হইল, তাঁহার নয়নযুগল অনল উদ্গার করিল।—

কিবলে কে ঠোর বাপ বাদশাহ শাহজহাঁ,
তাকো কৈদ কিয়ো মানো মক্কে আগি লাই হৈ।

(২) 'বিন্ধ্যাসে বিলন্দ'—পাঠান্তর।

(৩) নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত 'শ্রীশিবরাজ ভূষণ।'

(৪) বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত 'ভূষণ-গ্রন্থাবলী'

বড়োভাই দারা বাকোঁ পকরিকৈ কৈদ কিয়ো,
মেহরহু নাহিঁ বাকো জায়ো সগো ভাই হৈঁ।
বন্ধু তৌ মুরাদ বক্‌স বাদ চুক করিবে কো,
বীচ লৈ কুরান খুদাকী কসম খাই হৈ।
কহত ভূখণ ভাট শুনহু নৌরঙ্গজেব,
এতেঁ কাম কীয়ে ফের বাদশাহী পাই হৈ।

ইত্যাদি

পরমপূজ্য পিতা শাহজহাঁ, তাঁহাকে কয়েদ করিয়াছিলে, যেন মক্কায়ই আগুন লাগাইয়া দিয়াছিলে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারা, তাঁহাকে ধরিয়া কয়েদ করিলে এবং সহোদর ভাই বলিয়া কিছুমাত্র দয়া করিলে না। মুরাদ বক্‌স তোমার বন্ধু, তাহার সঙ্গে পরে বিশ্বাসঘাতকতা করিবার উদ্দেশ্যেই কোরাণ মাঝে রাখিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়াছিলে। ভূষণকবি বলে, শোন হে ঔরঙ্গজেব! এই সব কাজ করিয়া সাম্রাজ্যলাভ করিয়াছ। ইত্যাদি

ঔরঙ্গজেব অধীর হইয়া ভূষণের প্রাণসংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু মন্ত্রীদিগের মধ্যস্থতায় অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া ভূষণকে রাজসভা হইতে বিদূরিত করিলেন। ভূষণের প্রাণ যাঁহাকে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দ্বারা অর্চ্চনা করিতেছিল, তিনি তাঁহারই শরণে গমন করিলেন। সে মহাপুরুষ আর কেহ নহেন, দাক্ষিণাত্যের উদীয়মান মরাঠী বীর শিবাজী। মিশ্রপণ্ডিতগণ ঔরঙ্গজেবের সভায় ভূষণের এই আখ্যানটি বিশ্বাস করেন নাই। এল্‌ফিনষ্টোনের ভারতেতিহাসে লিখিত হইয়াছে ঔরঙ্গজেব রাজকবির পদ তুলিয়া দেন এবং অন্যান্য সভা কবিদিগের বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন। (৫) কিম্বদন্তী ইহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। তবে কোন বৎসর হইতে ঔরঙ্গজেব সভাকবিদিগকে তাঁহাদিগের প্রাপ্ত বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন জানিতে পারিলে এ প্রশ্নের অতি সহজেই মীমাংসা হইতে পারিত। ঔরঙ্গজেব যে রাজত্বের প্রথম দশবৎসর হিন্দুদিগের সহিত সদ্‌ব্যবহার করিয়াছিলেন, একথা অনেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করিয়াছেন। বার্ণিয়ে হিন্দুদিগের গ্রহণোৎসব বর্ণনা করিতে যাইয়া মন্তব্য করিয়াছেন,—

The great Mogol, though he be a Mahumetan, suffers these Heathens to go on in these old superstitions, because he will not or dareth not cross them in the exercise of their religion, etc." (৬)

ভূষণ ও শিবাজী

ভূষণের সহিত শিবাজীর প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল রাজধানী রায়গড়ের নগরপ্রান্তে এক দেবমন্দিরে। পথশ্রান্ত, পর্য্যটন-ক্লান্ত আগন্তুক ভূষণ ত্রিপাঠীকে দেখিয়া অশ্বারোহী রাজপুরুষবেশী শিবাজী তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সকল ইতিহাস শুনিয়া পরদিন রাজসভায় শিবাজীর সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। শিবাজী যে আত্মপরিচয় গোপন করিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। মহারাজশিবাজীর সম্ভাষণের জন্য কোন কবিতা প্রস্তুত আছে কি না জানিতে চাহিলে, ভূষণ তাঁহার অনুরোধে ও আগ্রহে 'শিবরাজ-ভূষণে'র বীররসের চরম কবিতা আবৃত্তি করিলেন। সে শব্দের ধ্বনিতে, উপমার সৌন্দর্য্যে, ছন্দের মাধুর্য্যে ও ভাষার ওজস্বিতায় শিবাজী মোহিত হইলেন। তাঁহার বিশাল ললাটে অপূর্ব্ব দীপ্তি প্রকাশ পাইল; তাঁহার লুব্ধকের ন্যায় উজ্জ্বল নয়নদ্বয় উৎসাহে চঞ্চল হইল, তাঁহার শিরায় শিরায় তপ্তশোণিতের দ্রুত-ধারা বহিতে লাগিল। শিবাজী কবির মুখে রৌদ্ররসপূর্ণ কবিতার বীরত্ব ব্যঞ্জক আবৃত্তিতে উত্তেজিত হইয়া সাগ্রহে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন 'আবার পড়!' কবি আবার পড়িলেন,—

ইন্দ্র জিমি জম্ভ পর বাড়ব জ্যোঁ অম্ভ পর,
রাবণ দম্ভ পর রঘুকুলরাজ হৈ।

৫। "He also discountenanced poets who used to be honoured and pensioned and abolished the office and salary of royal poet."— Elphinstone's History of India, Ed. 1889. pp 636-67,

(৬) Bernier, Bangabsi Press (1904) p. 284,

পৌন বারিবাহ পর, শম্ভু রতিনাহ পর,
জেঁ্যা সহস্রবাহ পর রাম দ্বিজরাজ হৈ।
দাবা দ্রুমদণ্ড পর, চীতা মৃগঝুণ্ড পর,
ভূষণ বিতুণ্ড পর জৈসে মৃগরাজ হৈ।
তেজ তম-অংস পর কান্‌হ জিমি কংস পর,
ত্যোঁ মলেচ্ছবংশ পর সের শিবরাজ হৈ॥

—"জম্ভদৈত্যের উপর ইন্দ্রের ন্যায়, সাগর জলরাশির উপর বাড়বানলের ন্যায়, সদম্ভ রাবণের উপর রঘুকুল-রাজের ন্যায়, বারিবাহ মেঘের উপর পবনের ন্যায়, রতি-নাথের শিরে শম্ভুর ন্যায়, সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের উপর পরশুরামের ন্যায়, বনস্পতির উপর দাবানলের ন্যায়, মৃগদলের উপর চিতাব্যাঘ্রের ন্যায়, করিযূথশিরে মৃগপতির ন্যায়, অন্ধকারপুঞ্জের উপর আলোকপাতের ন্যায়, কংসের উপর (কানাই) শ্রীকৃষ্ণের ন্যায়, ম্লেচ্ছ-বংশের উপর ব্যাঘ্রতুল্য শিবরাজ বিরাজ করিতেছেন।"

শিবাজীর সমস্ত প্রাণ উৎসাহে ও উত্তেজনায় অধীর হইয়া শ্রুতিপথে সে রসধারা পান করিয়া তৃপ্ত হইতেছিল না। আবার আবার পড়িতে পড়িতে কবি ৫২ বার কবিতা আবৃত্তি করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। কেহ বলেন ভূষণ "শিববাবনী"র সমস্ত কবিতাটাই বায়ান্নবার পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। "নাগরী-প্রচারিণী সভা"দ্বারা প্রকাশিত গ্রন্থের ভূমিকায় উক্ত কবিতা ১৮ বার পাঠ করা হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। পরদিন শিবাজীর রাজসভায় সমবেত বীরমণ্ডলীর সম্মুখে রণবাদ্যের ন্যায় ভূষণের বীররসপূর্ণ কবিতা পাঠ শ্রবণ করিয়া মরাঠা যোদ্ধৃগণের মধ্যে যে উৎসাহ ও উত্তেজনার ঝটিকা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা তীক্ষ্ণদৃষ্টি শিবাজীর চক্ষু এড়ায় নাই। ভূষণকে পাইয়া শিবাজীর রাজসভার প্রধান অভাব পূর্ণ হইল। তিনি তাঁহাকে ৫২ টী হস্তী, ৫২ খানা গ্রাম এবং ৫২ শিরোপা (খেলাত) পুরস্কার প্রদান করিলেন। মতান্তরে শিবাজী ভূষণকে ১৮ টী সাজসজ্জা সমন্বিত হস্তী, ১৮ খানা গ্রাম, ১৮ লক্ষমুদ্রা ও ১৮ প্রস্ত বহুমূল্য পরিচ্ছদ উপহার দিয়াছিলেন, (৭) কথিত আছে, শিবাজী ভূষণ-কবিকে পুরস্কৃত করিতে চাহিলে তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিয়াছিলেন, "মহারাজ! হস্তী, অশ্ব, বেশভূষা ও ধন সম্পত্তির জন্য আমি এ দরবারে আসি নাই। আমি আপনাকে বিধর্ম্মীর অত্যাচার হইতে সনাতন ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা ভগবদবতার মনে করি। আপনি মনুষ্য নহেন, নব দেহধারী সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম। আপনি স্বধর্ম্ম রক্ষক ও হিন্দুদিগের 'চোটি, বেটি, রোটী ও লঙ্গেটী'র পালক। আপনি দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, গো-ব্রাহ্মণের রক্ষাকর্ত্তা ও স্বদেশের গৌরব। এই জন্যই আমি আপনার স্তুতিগান করিয়া রসনা সার্থক করিতে আসিয়াছি।"

সে যাহা হউক একথা সর্ব্বসম্মত যে, শিবাজী ভূষণকে প্রচুর পরিমাণে সম্মানিত করিয়া রাজকবি পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এবং ঔরঙ্গজেবের কিরীটচ্যুত কোহিনুর মণি আপন উষ্ণীষে সযত্নে ধারণ করিয়া possessor of poet Bhushan বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলেন। (৮)

তদবধি কবি ভূষণ শিবাজীর নিত্য সহচর হইয়া শিবিরে ও রণপ্রাঙ্গণে ঘুরিয়া অবসরকালে ওজস্বিনী ভাষায় বীরত্বব্যঞ্জক শ্লোক আবৃত্তি করিয়া সৈন্যদিগকে প্রোৎসাহিত করিতেন। গুণগ্রাহী বীরকেশরী শিবাজী কবি ভূষণের মূল্য বুঝিয়াছিলেন এবং ভূষণও শিবচরিত্রে তাঁহার আদর্শ খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। কথিত আছে শিবাজী একবার ভূষণের একটীমাত্র কবিতার জন্য

(৭) ভূষণ তাঁহার আশাতীত পুরস্কার ও হস্তী লাভের কথা কবিতার স্থানে স্থানে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন—

"এতে হাথী দিয়ে জলমকরন্দজুকে নন্দ, জেতে গণি সকতি বিরঞ্চিহুকী ন তিয়া।"—উপোদ্ঘাত ৯, "শিবরাজভূষণ"।

"সাহিকে সপূত শিবসাহিদানি তেরো কর,"-'শিবরাজ ভূষণ' ৯

"কো কবিরাজ চঢ়ৈ গজরাজ,শিবাজীকী মৌজ মহীবিন্থ পায়ৈ" ঐ ৬০

"কহা রীঝকর হাথী এক তুমহী তৌ দেত হো।" ঐ ৭২।

৮। "উর আজসেঁ ইস শিবাজীকে রাজকবিকা পদ আপকো দিয়া জাতা হৈ।" নির্ণয়সাগরপ্রেস-'শিবরাজ' ভূষণের প্রস্তাবনা। ১৪ পৃঃ।

তাঁহাকে ৫টী হস্তী ও ২৫ সহস্রমুদ্রা পুরস্কার দিয়াছিলেন। (৯) 'গুণী গুণং বেত্তি।'

জনশ্রুতি, ভোজনে বসিয়া একটু লবণের জন্য ভ্রাতৃজায়ার নিকট লাঞ্ছিত হইয়া ভূষণ গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। শিবাজীর নিকট পুরস্কারলাভ করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথম লক্ষমুদ্রার লবণ ভ্রাতৃজায়াকে প্রেরণ করিয়া পরিহাসে তাঁহার কঠোর ব্যবহারের উত্তর দিয়াছিলেন। সে সকল সদানন্দ, পরিহাস, রসিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্বাধীনতা প্রিয়, সাহসী বীর একালে ক্রমেই দুর্ল্লভ হইয়া পড়িতেছেন।

ভূষণ ও ছত্রশাল

কবিভূষণের কাব্য-নায়ক বস্তুতঃ দুইজন, শিবাজী ও ছত্রশাল। সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দুর জাতীয় কবি ভূষণের শ্রদ্ধা ইঁহারা দুইজনেই আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন এবং ইঁহাদের সদ্‌ব্যবহারে ও অনুগ্রহে কবির চিত্ত বিগলিত হইয়াছিল। ইহাঁদের মধ্যে শিবাজীর মূর্ত্তিই কবির কল্পনার উপর অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যৎকিঞ্চিৎ অবসর অবশিষ্ট ছিল তাহা পান্নানরেশ ছত্রশালের গুণগাথা রচনায় ব্যয়িত হইয়াছিল। কথিত আছে শিবাজীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কবি গৃহে প্রতিগমন পথে পান্নরাজ্যের বিদ্যোৎসাহী ভূপতি ছত্রশাল সিংহের রাজ্যে গমন করেন। ছত্রশাল সংবাদ পাইয়া ভারতবিখ্যাত কবিকে উপযুক্তরূপে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত শিবিকা ও বাহক সমভিব্যাহারে নগরপ্রান্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও আদর আপ্যায়নের পর কবি শিবিকায় আরোহণ করিলেন এবং রাজা ছত্রশাল তাঁহার অজ্ঞাতসারে স্বয়ং সে শিবিকার বাহক হইলেন। অন্যান্য বাহকদিগের সসম্ভ্রম কলরবে ভূষণের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইল। তিনি যান হইতে ভূতলে অবতরণ করিয়া রাজার নিকট বিস্ময়, দুঃখ প্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বিনয়াবতার রাজা, কবির মধুর বচনে তিরস্কৃত হইয়া উত্তর করিলেন, "কবিভূষণকে উপযুক্তরূপে সম্মান করিবার শক্তি ও বৈভব পান্নারাজ্যে নাই, তাই আমি তাঁহাকে স্বয়ং স্কন্ধে বহন করিয়া রাজধানীতে লইয়া যাইতে আসিয়াছি।" পান্নারাজের সৌজন্য কবির চিত্ত অধিকার করিল। তাঁহার মধুময়ী কবিতা পান্নানরেশকে হিন্দীজগতে আজও অমর করিয়া রাখিয়াছে,—

তেরী বরছীনে বর ছীনে হৈঁ খলনকে—
একহাড়া বুন্দী ধনী মরদ মহীবো বাল।
সালত নৌরঙ্গজেবকে য়হ দোনো ছত্রসাল।
য়ে দেখৌ ছত্তাপতা য়ে দেখো ছত্রশাল।
য়ে দিল্লীকী ঢাল য়ে দিল্লী ঢাহনবাল॥

—"তোমার বর্শা খলজনের বল অপহরণ করিয়াছে। একজন বুন্দী-নরাধিপ, অপরে মহবা নরেশ, উভয়ে ঔরঙ্গজেবের বক্ষে শেলসম দুঃখ উৎপাদন করিতেছেন। ইঁহারা উভয়ে প্রতাপশালী রাজছত্রের ন্যায়—একজন সে ছত্রের আবরণ অপরে ছত্রযষ্টি। একজন দিল্লীর রক্ষাকর্ত্তা (দারাবন্ধু), অপরে দিল্লীধ্বংসকারী (ঔরঙ্গজেব শত্রু)।"

ঔর রাজা রাওমল একছু ন ল্যাউ অব,
সাহুকো সরাহৌ কী সরাহো ছত্রশালকোঁ॥

এবং

রৈয়া রাও চম্পতকো চঢ়ো ছত্রসাল সিংহ,
ভূষণ ভনত গজরাজ জোম জমছৈঁ ;
ভাদোকী ঘটাসী উঠী গরদৈঁ গগন ঘেরৈঁ,
সেলৈঁ সমসেরৈঁ দামিনীসী দমকৈঁ॥

* * *

দরবারে দ্বিতীয়বার।

কিম্বদন্তী অনুসারে ভূষণের কোন কোন জীবনচরিত্র লেখক বলিয়াছেন যে, তাঁহার গৃহাগমনবার্ত্তা চরমুখে শ্রবণ করিয়া সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে দিল্লী দরবারে আহ্বান করেন। চিন্তামণির অনুরোধে ও

৯। On one occasion be g.t as much as five elephantsand twenty five thousand rupees for a single poem.– Dr. Grierson.

সম্রাটের নিকট অভয় পাইয়া ভূষণ সাহসে ভর করিয়া দিল্লী গিয়াছিলেন। সেখানে ভূষণের কাব্য ঝঙ্কার শুনিয়া সম্রাটের হৃদয় অপূর্ব্ব বীররসের তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়াছিল। সভাসদগণের প্রাণে তেজঃ, উত্তেজনা ও বীরত্বের বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিয়াছিল। ভূষণ ঔরঙ্গজেবের মুখে শিবাজীর সম্বন্ধে অবজ্ঞাসূচক ইঙ্গিত শ্রবণ করিয়া কৌশলে সম্রাটের প্রশংসার মধ্যে শিবাজীর দুর্দ্ধর্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন,—

রাণা ভো চমেলী ঔর বেলা সব রাজা ভয়ে ;
ঠৌর ঠৌর রসলেত নিত য়হ কাজ হৈ,
সিগরে অমীর আনি কুন্দ হোত ঘরঘর,
ভ্রমত ভ্রমর জৈসে ফূলনকী সাজ হৈ।
ভূথণ ভনত শিবরাজবীর তেহীদেশ,
দেশনিমেঁ রাখী সব দক্ষিণকী লাজ হৈ,
ত্যাগে সদা থট্‌পদ পদ অনুমান জৈসে,
অলি নবরঙ্গজেব চম্পা শিবরাজ হৈ ॥

ইত্যাদি

এই কবিতায় ভূষণ উত্তর-ভারতের আমীর ও রাজাদিগকে চামেলী, বেলা, শেফালিকা, কুন্দ, কমল, কদম্ব, গোলাপ, কেতকী, জুই, মুচকুন্দ প্রভৃতি পুষ্পের সহিত তুলনা করিয়া শিবাজীকে চম্পা ও 'নৌরঙ্গজেব'কে ভ্রমরের সহিত উপমা দিয়াছেন। ষট্‌পদ চম্পাফুলে বসে না, তদ্রূপ ঔরঙ্গজেবও জয়পুর, যোধপুর, গৌর, বুন্দেলা, গুর্জ্জর, বঘেলে প্রভৃতি রাজ্য হইতে কর আদায় করিয়া বুদ্ধিমানের ন্যায় দক্ষিণদেশ বর্জ্জন করিয়াছেন।

শিবাজীর গুপ্তচর, সম্রাটের সহিত ভূষণের মিলন ও দিল্লী-দরবারে তাঁহার বীররসপূর্ণ কবিতার সমাদরের কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলে, শিবাজী চিন্তিত হইয়া ভূষণকে অবিলম্বে রায়গড়ে আহ্বান করিয়া রাখিলেন। (১০)

শেষ জীবন।

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে মরাঠাকেশরী শিবাজী স্বর্গারোহণ করিলে ভূষণ কিছুদিন ছত্রশালের সভায় গতিবিধি করিতেন বলিয়া অনেকেই অনুমান করেন। পূর্ব্বোল্লিখিত দোহা বিশেষেও তাহার ধ্বনি পাওয়া যায়। রাজা সাহু সিংহাসনে আসীন হইলে ভূষণ তথায়ও কিছুদিন বাস করিয়া পূর্ব্ববৎ সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি বুন্দীনরেশ রাও বুদ্ধসিংহের সভায় গমন করিয়া তাঁহার প্রশংসা সূচক দুইএকটী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। রাওরাজার সভায় তাঁহার কনিষ্ঠ মতিরাম কবি অবস্থান করিতেন। কিন্তু বোধ হয় রাওরাজার সভায় উপযুক্ত মর্য্যাদা না পাইয়া ভূষণ বিফল মনোরথ হইয়া বুন্দী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই জন্যই বোধ হয় তিনি সঙ্কেতে বলিয়া গিয়াছেন, রাওরাজার নাম একটীবারও মনে আনিব না। (১১)

জন্ম ও মৃত্যুকাল।

ভূষণের জন্মকাল অনিশ্চিত। কাহারও মতে সংবৎ ১৬২৯, কাহারও মতে ১৬৭০, কাহারও মতে ১৭৩০ এবং কাহারও মতে ১৭৩৮ তাঁহার জন্মাব্দ। মিশ্রপণ্ডিতগণ 'হিন্দী নবরত্নে' তাঁহার জন্ম সংবৎ ১৬৯২ লিখিয়া 'মিশ্রবন্ধুবিনোদে' তাহা ১৬৭০ করিয়াছেন। 'বন্ধুবিনোদ' মতে তাঁহার বৈকুণ্ঠবাস হইয়াছিল আনুমানিক ১৭৭২ সংবতে। বঙ্গবাসী-প্রেসের 'ভূষণগ্রন্থাবলী'র ভূমিকায় (সম্ভবতঃ পণ্ডিত প্রভুদয়াল পাঁড়ে লিখিত) কবিভূষণকে শিবাজীর সমবয়স্ক বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। শিবাজীর জন্ম হইয়াছিল বৈশাখ সুদি ২, শক ১৫৪৯ এবং তাঁহার স্বর্গারোহণ চৈত্র সুদি ১৫, শক ১৬০২। ভূষণ শম্ভুজী এবং সাহুর দরবারেও স্মৃতিস্তম্ভের ন্যায় বিরাজ করিতেন। 'বন্ধু-

---

(১০) মরাঠাদিগের গুপ্তচর প্রথা অতি উৎকৃষ্ট ছিল বলিয়া শুনা যায়। কথিত আছে ট্রাফাল্‌গারের যুদ্ধসংবাদ বোম্বাই গবর্ণরের দপ্তরে যে দিন পৌঁছিয়াছিল; তাহার পূর্ব্বদিন নানা ফর্ণাবিশের ডায়রীতে উহা লিখিত হইয়াছিল এবং কলিকাতা হইতে জনৈক স্থানীয় গুপ্তচর বর্গীর হাঙ্গামার সময় পুনাতে গোপনে সংবাদ প্রেরণ করিত। কিন্তু এই সকল জনশ্রুতির সমর্থন সূচক কোন প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয় নাই।

(১১) ঔর রাজা রাওমল একছ ন ল্যাউ অব।

বিনোদে' তাঁহার দীর্ঘ জীবন প্রায় ১০২ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে।

শক্তিমন্ত্র

ভূষণ শাক্ত তান্ত্রিক, দেবীর উপাসক ছিলেন। তাঁহার রচিত 'শিবরাজভূষণে'র উপোদ্‌ঘাতে নমক্রিয়া উপলক্ষে ছপ্পয়ছন্দে চণ্ডীদেবীর বন্দনা করা হইয়াছে,—

জয় জয়ন্তি জয় আদি শকতি জয় কালী কপর্দ্দিনি।
জয় মধুকৈটভছলনি দেবি, জয় মহিষবিমর্দ্দিনি!
জয় চামুণ্ড জয়, চণ্ড মুণ্ডা ভণ্ডাসুর খণ্ডিনি।
জয় সুরক্ত জয় রক্তবীজ বিড্ডাল বিহণ্ডিনি।
জয় জয় নিশুম্ভ শুম্ভ দলনি ভনি ভূষণ জয় জয় ভননি।
সরজা সমল্য শিবরাজ কহঁ দেহি বিজয় জয় জগজননি॥

"শিবাবাবনী"র আদিতেও এই দেবীস্তুতি পুনরুক্ত হইয়াছে। অহিংসাপরায়ণ বৌদ্ধদিগের প্রভাব দূরীভূত করিয়া হিন্দুর কর্ম্মকাণ্ড জাগাইতে যে কান্যকুব্জ হইতে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত তান্ত্রিক ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, সেই ভারতকেন্দ্র কনৌজ হইতে শক্তি-সেবক দ্বিজভূষণ মহারাষ্ট্র দেশেও জাতীয় জীবন উদ্বোধন যজ্ঞে শক্তিমন্ত্র উচ্চারণ করিতে আহূত হইয়াছিলেন। গঙ্গাযমুনাপ্রবাহপূত আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণ-প্রতিভার উদ্দীপনার প্রতীক্ষায় প্রতীচ্য ঘাটশৈল-শিখরে কর্ম্মযোগী ছত্রপতি শিবাজী রামদাসের জ্ঞানমন্ত্র ও তুকারামের প্রেমমন্ত্র সাধন করিতেছিলেন। রামদাস, শিবাজী ও ভূষণের মিলন, অনল ইন্ধন ও পবনের দৈবসংযোগ স্বরূপ। সে মহামিলনে উৎপন্ন মহাশক্তি দাবানলের ন্যায় দিল্লী সাম্রাজ্যরূপ বিশাল খাণ্ডব অচিরাৎ ভস্মাবশেষে পরিণত করিয়াছিল।

দুই একটী কথা।

বাস্তবিক ভূষণ ঔরঙ্গজেবকে তাঁহার মুখের উপর উচিত কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন কি না, শিবাজীর নিকট দেবালয়ে ৫২বার তাঁহার প্রশংসাসূচক কবিতাটী আবৃত্তি করিয়াছিলেন কিনা এবং পুনরায় ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক আহূত হইয়া দিল্লীদরবারে শিবাজীর স্তুতিগান করিয়াও নিস্তার পাইয়াছিলেন কি না—এ সকল তর্কের বিষয়। হইতে পারে ভূষণ রচিত কবিতাবলীর মধ্যে যে অংশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহার সৌন্দর্য্য ও গৌরব বুঝাইবার জন্য কোন পরবর্ত্তী ভূষণের জীবন কথা বর্ণনাকারী ঐরূপ মনগড়া প্রক্ষিপ্ত কথা কিম্বদন্তীতে জানাইয়া দিয়াছিলেন। আরও হইতে পারে মরাঠা শিবিরে অনেকেরই মনে হইয়াছিল, ভূষণ বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের নিন্দা ও বিদ্রূপ-করিয়া যে সকল তীব্র শ্লেষপূর্ণ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা যদি কেহ সভাসদদিগের সম্মুখে সম্রাটকে শুনাইয়া দিতে পারিত, তাহা হইলে তাহার পরিণাম দেখিবার ও উপভোগের বিষয় হইত। The wish is father to the thought—আমাদের মনের বাসনা অনেক সময় ঘটনার উপর কল্পনার ছাপ দিয়া তাহা নূতন আকারে প্রচার করে। হয়ত ভূষণের জীবনকথা যাহারা মুখে মুখে বর্ণনা করিতেন, তাঁহাদের হাতেও অনেক অংশ ইচ্ছানুরূপ সংযুক্ত বা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সত্য কি তাহা নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে বর্ত্তমান শিক্ষা ও সভ্যতা অনেক পরিমাণে ভুলিয়া, তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় হিন্দুর মানসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় উপনীত হইতে হইবে এবং স্মরণ রাখিতে হইবে, অনেক সময় "Truth is stranger than fiction."—ঘটনা কল্পনাকেও পরাস্ত করে।

আগামী সংখ্যায় আমরা কবি ভূষণের কাব্য পরিচয় ও অন্যান্য প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

শ্রীরসিকলাল রায়।

নব-বর্ষ

ক্ষান্ত হও, শান্ত কর নিমেষের তরে আজি
উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়,
ভুলে' যাও একদিন প্রতিদিবসের যত
বিচার সংশয়।
ক্ষণিক বিরাম দিয়া বিতর্ক বিরোধে তব
চেয়ে দেখ পথে,
বর্ষশেষে আসে ওই নববর্ষ—নববেশে
মহাকাল-রথে !

হে বর্ষ-দেবতা, ওগো চিরনব-চিরন্তন,
প্রণমি তোমায় ;
আদিযুগ হতে তুমি দেখিয়াছ বিবর্ত্তন
কত এ ধরায়।
তোমার প্রসন্ন শান্ত মুখপানে চাহি এই
মহাসন্ধিক্ষণে,
দূরতম অতীতের বিলুপ্ত কাহিনী যত
পড়ে যেন মনে।

দেখিয়াছ, বর্ষ, তুমি শিশু-মানবের চিত্তে
জ্ঞানের উন্মেষ,
দেখেছ তপস্যা তার—সত্যশিবসুন্দরের
লভিতে উদ্দেশ।
কত দুঃখ কত সুখ—কত আশা-নিরাশার
দেখেছ নির্ব্বাণ,
কত ভাঙা কত গড়া—কত রাজ্য সাম্রাজ্যের
পতন উত্থান।

এনেছ মানব তরে প্রতিবর্ষে নব বল—
উৎসাহ নূতন,
আজিও তেমনি লয়ে আশা ও আশ্বাস নব
দিলে দরশন।
শুনাও বারতা তব—'অমৃত লোকের যাত্রি,
হয়েছে সময়,
চির সাধনার পথে হও পুনঃ অগ্রসর—
অকুণ্ঠ-নির্ভয়।'

কোথা এ পথের শেষ—কোন্ দূর-দূরান্তরে—
কেহ নাহি জানে ;
যুগ-যুগান্তর ধরি চলেছে মানব তবু
সেই লক্ষ্য পানে।
অনন্ত এ যাত্রা-পথে মিলিয়াছে আসি যারা
দুদিনের তরে,
ক্ষুদ্র লাভ-ক্ষতি লয়ে তাদের এ হানাহানি
কেন পরস্পরে !

হে বর্ষ, উদাত্ত স্বরে কবে তুমি শান্তিমন্ত্র
করি উচ্চারণ
ব্যথায় বিক্লবা এই ধরণীর শাপ তাপ
করিবে মোচন ?
লুপ্ত করি হিংসা-দ্বেষ স্বার্থের সংঘাত চির-
প্রেমের বিকাশে,
নূতন অধ্যায় কবে আরম্ভিবে—অলিখিত
বিশ্ব-ইতিহাসে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অন্তর মনের যাহার কোনরূপ অবলম্বন বা আশ্রয় নাই তাহার দিন-রাত্রি কেমন করিয়া কাটে বা কাটে না তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। বায়স-রব দ্বারা আগমন সূচনা করিয়া দিন আসে, আবার কুলায় অনুসন্ধিৎসু কাকরবের সহিত সন্ধ্যার সন্ধি-মুহূর্ত্তের মধ্যে আপনাকে বিলীন করিয়া দিয়া যখন রাত্রির অন্ধকার যবনিকার অন্তরালে লুক্কাইত হয় তখন নিশা-যাপন এক মহামারী ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। রজনী যখন তারার হার ও চাঁদের চন্দনটিপ পরিয়া সাজিয়া গুজিয়া আসেন তখন আকাশের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া নানা সম্ভব অসম্ভব কল্পনার মধ্যে নিজকে একান্তভাবে ডুবাইয়া দিয়া কতকটা সময় কাটাইয়া দেওয়া তত কঠিন হয় না কিন্তু জমাট অন্ধকারের মোটা 'বোরকা'য় আপাদ মস্তক ঢাকিয়া যখন তিনি দেখা দেন, সে অন্ধকারে কেবল চোখের নহে, অন্তরের গভীরতম অন্তস্তল পর্য্যন্ত যেখানে যেটুকু আলো লুকাইয়া থাকা সম্ভব, সে সমস্তই তিনি নিবাইয়া দিয়া অন্তরে বাহিরে এক বিরাট অমাবস্যার সৃজন করিয়া তোলেন—সে অন্ধ-অমার মধ্যে ডুবিয়া চক্ষুই শুধু দিশাহারা হয় এমত নহে, জলে ডোবা হতভাগ্যের মত প্রাণধারণের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-টুকুও রুদ্ধ হইয়া যায়—বুকের মধ্যে তখন কি আকুলতা উপস্থিত হয় তাহা কেমন করিয়া বলি, সে কথা বলিয়া বুঝাইবার নহে, উহা সমধর্ম্মী মনের ধ্যানগম্য সামগ্রী। প্রতিদিন আমার চতুর্দ্দিকের লোকারণ্য প্রভাত অরুণো-দয়ের কলবিহঙ্গ-রবের সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত হইয়া নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের পথে একাগ্রমনে অগ্রসর হইতে দেখি-তেছি, প্রতি সন্ধ্যার দিনকৃত্য সমাপন করিয়া তাহাদের নিজ নিজ আনন্দ ভবনের দিকে শ্রান্তপদ দ্রুত ফেলিবার আয়াস প্রতি পাদক্ষেপে সূচিত করিয়া তাহারা আমার সম্মুখ দিয়াই চলিয়াছে—প্রিয়-হস্ত-প্রজ্জালিত দীপরশ্মি বাতায়ন-পথে প্রিয়হস্তের অঙ্গুলি-সঙ্কেতেই যেন কর্ম্মক্লান্ত শ্রান্ত-জনকে স্নেহাশ্রয়ে শান্তি ও বিরাম দিবার জন্য নিকটে ডাকিয়া লইতেছে—সেই ক্ষীণ আলোটুকু কি কেবল ঘরের অন্ধকারই দূর করিয়া তাহার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া ফেলে? বুঝি শুধু তাহা নহে, বাতায়নের ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথ ঠেলিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া সে বলে, "ওগো শ্রান্ত, ওগো আজীবনের দুঃখী, ওগো ক্ষুধাতুর তৃষার্ত্ত প্রিয়তম আমার, এস, তোমার জন্য দিনান্তের অন্ন, পিপাসার জল, নিদ্রার শয্যা সবই প্রস্তুত রহিয়াছে এবং স্নেহ ব্যাকুল দুইখানি হস্ত তোমার এক জীবন-জন্মের নহে, বহু জন্মমরণের ক্ষত ক্ষোভ ক্ষতি শোক দুঃখ লাঞ্ছনা সমস্তই ধুইয়া মুছিয়া দিবার জন্য এজন্মে ব্যাকুল হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে।"

থিয়েটারের Royal box-এ বসিয়া নির্লিপ্ত দর্শক যেমন সুখ দুঃখ সমাকুল নাটকের অভিনয় দেখিয়া যায় আমি আমার খড়ের ছাওয়া আটচালা ঘরখানিতে বসিয়া বসিয়া দিনের পর দিন চতুর্দ্দিকের জীবন প্রবাহ এবং মানব-জীবনের দৈনিক সুখ দুঃখের মর্ম্মস্পর্শী অভিনয় দেখিয়া যাইতাম—মন কি বলিত তাহা এই অকিঞ্চনের অন্তর্য্যামী যিনি তিনিই জানিতেন, সে কথা বলিবার আমার শক্তি ও সাধ্য দু'য়েরই অভাব।

দিনকৃত্য আমার এই ছিল, ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে উঠিয়া একবার স্নান করিতাম, আটচালা ঘরের সম্মুখে খানিকটা স্থান খুঁড়িয়া নিয়াছিলাম, সেখানে পাঞ্জাবী পালোয়ানের নিকট কুস্তির "দাঁওপেঁচ" শিক্ষা করিতাম এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যায়াম করিয়া অসাড় হইয়া পড়িতাম, তারপর বসিয়া বসিয়া সূর্য্যোদয়ের অরুণচ্ছটা দেখিতাম এবং বিহঙ্গ কাকলীর অর্থ বুঝিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিতাম। মধ্যগগনে সূর্য্য আসিবার কিছু পূর্ব্বে পুনরায় পৈত্রিক প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর জলে গিয়া ঝাঁপাইয়া

পড়িতাম, বিস্তীর্ণ জলাশয় দুই চারিবার সাঁতার দিয়া পার হইতাম, শ্রান্ত হইলে উঠিয়া পড়িতাম—তারপর আহারের পালা, মার কাছে বসিয়াই আহার করিবার প্রথা ছিল, তাই করিতাম। এইরূপ মনোভাব লইয়া "ভীমের আহার" সম্ভবপর নহে, মাতা কোন দিন আহারের অল্পতা দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিবার উদ্যোগ করিলে পাচক পাচিকার আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িতাম। তারপরে আবার সেই আটচালার আশ্রয়ে তুলাবিরল তোষকের উপর আমার ব্যায়াম-ক্ষুণ্ণ গাত্র ঢালিয়া দিয়া পুস্তক পাঠে দিনযাপন করিবার চেষ্টা করিতাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সান্ধ্যস্নান সমাপন করিয়া আটচালার রকের উপর একটা মাদুর বা শীতল-পাটি বিছাইয়া শশী-তারকার রত্নহার-সমন্বিতা নীলাম্বরী সমাচ্ছন্না রজনীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া কত কি ভাবিতাম কে জানে? আহারে ডাক পড়িলে সে কার্য্যটা যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত সম্পন্ন করিয়া আমার চিরপরিচিত এবং চিরপুরাতন আটচালার ক্ষুদ্র কক্ষটির মধ্যে আবার আশ্রয় লইতাম, নিদ্রায় চক্ষু বুজিয়া না আসা পর্য্যন্ত প্রদীপ শিওরে লইয়া পুস্তকের মধ্যে আমার সকল ব্যথা বেদনাকে ডুবাইয়া দিবার বিফল প্রযত্নে ত্রিযামার যামদ্বয় প্রায়শঃই কাটিয়া যাইত।

পুস্তক যাহা আমার ছিল তাহা পড়িয়া পড়িয়া বহুবার শেষ করিয়াছিলাম, কলিকাতা হইতে থ্যাকার স্পিঙ্ক এবং নিউম্যানের ক্যাটালগ লইয়া গিয়া যে সমস্ত বই পড়িবার ইচ্ছা ছিল তাহা পাঠাইবার জন্য কোম্পানির ম্যানেজারদিগকে পত্র লিখিলাম; হাতে কিন্তু পয়সা নাই, মূল্য দিবার সময়ে মহামারী কাণ্ড উপস্থিত হইবে জানিতাম কিন্তু আমার ভরসা ছিল আমার পূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীনাথ বাবু সে সময়ে এষ্টেটের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, তাঁহাকে জানাইলে পুস্তক কিনিবার টাকা পাইতে বিশেষ ক্লেশ হইবে না—এ আশাটা আমার বিফল হয় নাই, বইয়ের দাম চাহিবামাত্র পাইয়াছি এবং কোম্পানির সাহেবেরা নামের মর্য্যাদা বাঁধা রাখিয়া বিনা দামে কিছুকালের জন্য জিনিষ পত্র বাকী দেয় এ কথাও আমার জানা ছিল। এই সময়টায় আমি পঁচাত্তর টাকা করিয়া Pocket money পাইতাম, কিন্তু সে টাকার এক কপর্দ্দকও নিজের জন্য আমার ব্যয় করিবার উপায় ছিল না, কারণ দুই একটি দুস্থ পরিবারের ভরণপোষণ এবং কতকগুলি দরিদ্র ছাত্রের স্কুলের বেতন ও পরীক্ষার ফিস্ দিতেই সমস্ত টাকাটাই ব্যয় হইয়া যাইত, বরং কিছু কম পড়িত, সেজন্য আগামী মাসের প্রাপ্য পকেট-খরচা কোন কোন মাসে আগাম লইতে বাধ্য হইতাম—এই কারণে সে দিনে আমার কষ্টেই দিনপাত হইত। আজ সে কষ্ট মনে করি না, কারণ আমার সেই পঁচাত্তর টাকার সাহায্যে কেহ High court এর উকিল, কেহ খ্যাতনামা কবিরাজ, কেহ বা প্রসিদ্ধ ডাক্তার, আবার কেহ ন্যায়-পরায়ণ নির্লোভ জমিদারের প্রধান অমাত্য হইয়া তাঁহারা নিজ নিজ দুস্থ পরিবারবর্গকে, সাধারণতঃ যাহাকে সুখ বলে, সেই অশন বসনের ক্লেশহীনতার মধ্যে রাখিয়াছেন। আমার সাময়িক কষ্টে এতগুলি ভদ্র-সন্তানের সপরিবারে চিরকষ্ট নিবারণ হইয়াছে এই চিন্তা আজ আমার এই জীবনাপরাহ্ণে অন্তরের মধ্যে অপূর্ব্ব আত্ম-প্রসাদের নির্ম্মল আনন্দ আনিয়া দেয়। আজ তাঁহাদের অনেকের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হয়, যখন তাঁহাদিগকে ভদ্র-পরিচ্ছদে গাড়ী ঘোড়া হাঁকাইয়া হাস্যবদনে বিচরণ করিতে দেখি, তখন আমার সেই সামান্য পঁচাত্তরটি টাকাকে ধন্য ধন্য বলিতে ইচ্ছা করে।

অগ্নিদাহের সময়ে চতুর্দ্দিকের বায়ু যেমন দ্রুত আসিয়া দগ্ধস্থানের শূন্যতাকে পূরণ করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করে, বর্ত্তমানের রাজকুমার এবং ভবিষ্যতের মহারাজকে কর্ম্মহীন অলস জীবন যাপন করিতে দেখিলে চতুর্দ্দিকের আমোদপ্রিয় "মাই ডিয়ারের" দলের দলবদ্ধ সমাগমও তেমনি প্রভঞ্জন-গতি লাভ করিয়া থাকে, ইহা সংসারের পরম সত্য ঘটনা। এ ক্ষেত্রেও এই সত্য ঘটনাটি ঘটিবার সূত্রপাত হয় নাই এ কথা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে, তবে ঠিক এই সময়েই অর্থকৃচ্ছ্রতা আমার সমধিক ছিল এবং শ্রীনাথ বাবু

শিক্ষকতা ত্যাগ করিলেও আমার সর্ব্বপ্রকার শুভাশুভের প্রতি তাঁহার অবিচলিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি একাদশ বৃহস্পতির কল্যাণ-দৃষ্টির মত আমাকে সর্ব্বাপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে এবং সর্ব্বোপরি, পঠদ্দশায় পাঠের প্রতি যত অমনোযোগীই আমি থাকি না কেন, সংসারের প্রবেশদ্বারে পঁহুছিয়া নিজের মূর্খতার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় বিদ্যার চর্চ্চায় আমার বহু সময় কাটিত, এই সকল কারণ সমবায় একত্র হওয়ায় আকণ্ঠপঙ্কে নিমজ্জিত হইবার দুরদৃষ্ট হইতে আমি রক্ষা পাইয়া গিয়াছিলাম। তথাকথিত বন্ধুবান্ধবের আপাত-মধুর প্ররোচনা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য পীড়ার ভাণ করিয়া আটচালা ঘরের ক্ষুদ্র শয়ন কক্ষটির মধ্যে অর্গলবদ্ধ করিয়া কখন কখনও আমাকে পুস্তকমাত্র সহায় করিয়া অষ্টপ্রহর কাটাইতে হইয়াছে—অনশনেও দিন কাটাইয়াছি কেন না আহারের অনুষ্ঠান করিলেন পীড়ার কথাটা মিথ্যা হইয়া যাইবে, সে ভয় আমার বড় ভয় ছিল। আজ প্রশ্ন উঠিতে পারে, "এ দুর্ব্বলতা কেন, দুষ্ট বন্ধুর দলকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া নিষ্কাসিত করা হয় নাই কেন?" ইহার উত্তরে এই মাত্র বলিতে পারি, "মানুষ ত দেবতা নহে, যেখানে স্নেহ সেইখানেই মানুষ দুর্ব্বল, যাহাদিগকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম, দোষী হইলেও তাহাদিগের জন্য অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করিতে পারি নাই ইহা আমার দুর্ব্বলতা সন্দেহ নাই, কিন্তু সে দুর্ব্বলতা পরিহার করিবার যত্ন কোনদিন করি নাই, করিতে পারিব না।" ভ্রম-প্রমাদ বিরহিত সর্ব্বত্র সবল কাল্পনিক দেবচরিত্রবিশিষ্ট মানুষ যদি ধরায় থাকে তবে তাহাকে ভক্তি করা চলিতে পারে, কিন্তু আমাদের ধরার সংসার দুর্ব্বল জীবকে লইয়াই করিতে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠাপত্রগুলি আমার অদৃষ্টে নানা কারণে পাওয়া ঘটে নাই তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; যখন সে ইচ্ছাটা কোন ক্রমেই কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলাম না তখন কলেজের প্রিন্সিপাল এবং প্রফেসরদিগকে নানা স্তুতি মিনতি করিয়া Casual student রূপে কলেজের শ্রেষ্ঠতম ক্লাশগুলিতে পড়িয়া লইলাম—ইংরাজি ও সংস্কৃত সাহিত্য এবং দর্শনের শ্রেণীতে নিয়মানুসারে নিত্য উপস্থিত হইতাম এবং সময়ে সময়ে প্রিন্সিপাল সাহেবের বাড়ী গিয়াও পাঠ লইয়া আসিতাম। জ্ঞান-বৃক্ষের বিজ্ঞান শাখাকে দূর হইতে নমস্কার করিতাম এবং শুদকষা মণকষার মসীকলঙ্ক-রেখা আমার মনে একটিও কাল দাগ কাটিতে পারে নাই।

রাজশাহী কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল এডওয়ার্ড সাহেব এবং পরে টেপার সাহেবের আমি প্রিয় ছাত্র ছিলাম। টেপার হয়ত বা আমার খেলা ধূলার পারদর্শিতা দেখিয়া আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, কারণ খেলা ধূলার প্রতি এই সাহিত্যাচার্য্যের প্রীতি বালক জগদিন্দ্রের মতই ছিল, কোন অংশেই কম নহে—খেলিবার মাঠে তাঁহার সহিত তাঁহার ছাত্রবৃন্দের কোন পার্থক্যই তিনি রাখিতেন না। তাঁহার ছাত্রবর্গের দুরদৃষ্ট বশতঃ এই বালকের ন্যায় সরল, উষার ন্যায় নির্ম্মল, মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী এবং বৃহস্পতির ন্যায় পণ্ডিত সাহিত্যাচার্য্য যে দিন ম্যালেরিয়ার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন, তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য জগদিন্দ্র ও সেইদিন পুস্তক বন্ধ করিয়া বিদ্যালয়ের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিল। জীবনসূর্য্য আজ অস্তাশিখরীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, এই বিগতপ্রায় বাসরে বহুপূর্ব্বে স্বর্গগত অধ্যাপকের কথা মনে আসিয়া অশ্রুসম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়িতেছে, ইহা হইতেই বুঝা যাইবে সে দিনে ছাত্র-শিক্ষকে কি মধুময় প্রীতির সম্বন্ধই ছিল। আজকার দিনে যাহা দেখি বা শুনি তাহাতে অন্তরের মধ্যে বিষম ব্যথাই বাজিয়া উঠে; দোষ কাহার, শিক্ষকের, ছাত্রের কালের বা সকলেরই তাহা জানি না। দোষ যাহারই হউক, ব্যাধি নির্ণয় করিয়া তাহার ঔষধের ব্যবস্থা এবং গ্রহ-শান্তির অনুষ্ঠান দুইই বোধ করি করা বাঞ্ছনীয় হইবে। আজ বাঙ্গালীর ঘরে কোন সম্বন্ধই অক্ষুণ্ণ আছে একথা বলিয়া গর্ব্ব করা সাজে কি না বলা কঠিন,তাহার উপরে যদি এই আনন্দকর প্রীতির সম্বন্ধের মধ্যে বেদনার ব্যবধান সৃজিত

হইতে থাকে, সে পরিতাপ রাখিবার স্থান হইবে না, মাধুর্য্যময় সম্বন্ধের মধ্যে বিষমিশ্রিত হইলে শিক্ষক অপেক্ষা ছাত্রের ক্ষতিই সমধিক, এ কথা ছাত্র এবং ছাত্রের অভিভাবকবর্গকে সতত সযত্নে স্মরণ রাখিতে হইবে। বেদনার ক্ষত কালে শুষ্ক হইতে পারে কিন্তু ক্ষতির পূরণ কখনও হয় না, একথা আমরা সর্ব্ববিষয়ে এবং সর্ব্বদা যেন স্মরণ রাখি।

স্কুল কলেজে বিদ্যা যাহা অর্জ্জন করিয়াছিলাম সংসারের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া তাহা যখন পর্য্যাপ্ত মনে হইল না এবং করিবারও যখন আর কিছু নাই তখন প্রাণপণে আবার পাঠ আরম্ভ করিয়া দিলাম—ইংরাজী নিজে নিজে যতটা সম্ভব পড়িতাম, কারণ পল্লীগ্রামে সুযোগ্য অধ্যাপকের একান্ত অভাব তাহা সকলেই জানেন। এক রাত্রিতে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইবার ইচ্ছা যখন আমার মনে একান্ত প্রবল, ঠিক সেই সময়ে নাটোরের সন্নিহিত দিঘা গ্রামনিবাসী ৺পীতাম্বর তর্কালঙ্কার রামধন তর্কপঞ্চানন, রাখালদাস ন্যায়রত্ন এবং শ্রীশিবরাম সার্ব্বভৌম প্রমুখ গৌতম কণাদের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের নিকট হইতে ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন এবং চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপনায় ব্রতী হইবার মানসে আমার পরম পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীর নিকট তদর্থে অর্থ-সাহায্যের কামনায় রাজধানী আসিলেন। এহেন মাহেন্দ্র সুযোগ ছাড়া আমার পক্ষে কঠিন হইল, আমি মাতাকে বলিয়া কহিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়কে রাজধানীতে রাখিবার ব্যবস্থা করাইলাম এবং আমিই তাঁহার সর্ব্ব প্রথম ছাত্র হইয়া কাব্য অলঙ্কার এবং ন্যায়শাস্ত্রের প্রথমগ্রন্থ 'ভাষা-পরিচ্ছেদ-মুক্তাবলী' এবং 'শব্দশক্তি-প্রকাশিকা' প্রভৃতি আরম্ভ করিয়া দিলাম। "কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রং তচ্চ গীতেন হন্যতে" ইত্যাদি শ্লোক যদিও আমার জানা ছিল, তথাপি পরস্পর-বিরোধী শাস্ত্রগুলির পাঠ এক সঙ্গেই আরম্ভ করিলাম, কারণ "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" এ কথাটাও আমার জানা ছিল। কখন কি বাধা উপস্থিত হইয়া পাঠের ব্যাঘাত ঘটায় তাহা বলা যায় না, এই ভাবিয়া "যথালাভ" মনে করিয়া অনেকগুলি গ্রন্থের পাঠ একত্রে লইতে আরম্ভ করিলাম; ফল যেমনটি হইবে ভাবিয়াছিলাম তাহা হয় নাই, সে আমার দুরদৃষ্ট, তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যত্নের ত্রুটি ছিল না, এ কথা স্বীকার না করিলে আমার মহাপাপ হইবে। প্রচলিত কাব্য, নাটক, প্রহসন ইত্যাদির অনেকগুলিই আমার পড়া ছিল, বাকীগুলি অধ্যাপকের নিকট অল্প সময়েই পড়িয়া লইলাম, এবং তাহার পরে শ্রীমদ্ভাগবত এবং ন্যায়শাস্ত্রের 'কুসুমাঞ্জলি' এবং 'গৌতমসূত্র' এক সঙ্গে আরম্ভ করিয়া দিলাম—বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণ'-খানিকেও বিশেষ অবহেলা করি নাই, কিন্তু স্বর্ণ প্রভৃতি কঠিন ধাতুর অলঙ্কারগুলি বঙ্গমহিলারা যত সহজে আয়ত্ত করিয়া লইতে পারেন এবং সর্ব্বদা যেমন করিয়া তাঁহাদের কাছে কাছে রাখিয়া দেন, বিশ্বনাথের অলঙ্কার-গুলি বঙ্গযুবকেরা তত সহজে আয়ত্ত করিতে পারেন কি না আমার সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে এবং কার্য্যকালে সেগুলি সর্ব্বদা নিকটেও থাকে কি না বলা কঠিন। অন্তত পক্ষে নিজের দৃষ্টান্তে আমি এইরূপ ধারণাই করিয়া রাখিয়াছি।

দিনের এবং মনের বিরাট শূন্য গহ্বরটা পাঠের কঠিন শ্রম দিয়া কতকটা ভরাইয়া কোনমতে দিনাতিপাত করিতে লাগিলাম, কিন্তু শরীর আমার খারাপ হইতে আরম্ভ করিল—এবারে জ্বর নহে, আমি বালক-কাল হইতে যে দুরারোগ্য কলিক ব্যথায় ভুগিতেছিলাম উহা কিছুদিন সাম্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ছিল, আবার আসিয়া দেখা দিল এবং এবারে প্রবলবেগেই দেখা দিল। ব্যথার যন্ত্রণায় সমস্ত রাত্রি ছট্ ফট্ করিতে হইত, সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্য্যন্ত এক নিমেষের জন্যও নিদ্রা আসিবার উপায় ছিল না, এমন কি একভাবে বসিয়া বা শুইয়া কিম্বা দাঁড়াইয়া কোন অবস্থাতেই একটুও আরাম পাইতাম না। শৈশবে যখন ব্যথা হইত তখন গরম জলের সেক দিলে, কবিরাজ মহাশয়ের একটা বিশেষ চূর্ণ ঔষধ গরম জল দিয়া সেবন করিলে,

ঘণ্টা দু'য়ের মধ্যে ব্যথা কমিয়া যাইত, একটু আরাম পাইলে ঘুমাইয়া যাইতাম। এখন সে সকল মুষ্টিযোগে কোন ফল হয় না, নিতান্ত যখন হাত পা হিম হইয়া হৃদয়ের ক্রিয়া হীনবল হইবার উপক্রম করিত তখন ডাক্তার আসিয়া Morphia inject করিতেন, আমি অহিফেনের ঘোরের মধ্যে ব্যথার যাতনা এবং নিজের অস্তিত্ব দুইই ভুলিয়া যাইতাম। ব্যথায় শরীর স্বভাবতই কৃশ হইয়া যায়, তাহার উপর পথ্যের ধরাকাটে আমার শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। এবারে সর্ব্বদার জন্য বিছানার আশ্রয় না লইলেও চলা-ফেরা করিবার শক্তি বড় বেশী আর অবশিষ্ট রহিল না। হয়ত বায়ু-পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা ডাক্তারে করিবেন এই আশায় এত যন্ত্রণার মধ্যেও মনের মধ্যে একটু প্রফুল্লতা কোথা হইতে আসিয়া দেখা দিল। আমি পাকে প্রকারে ডাক্তার বাবুকে changeএর কথা জিজ্ঞাসা করিতাম কিন্তু আশানুরূপ উত্তর তাঁহার নিকট হইতে পাইতাম না, অনেক সময়ে সে কথার কোন উত্তর না দিয়া তিনি অন্যান্য অবান্তর কথার অবতারণা করিতেন, আমি হত-বুদ্ধির মত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া নীরব হইয়া যাইতাম। একদিন আমার অধ্যাপক তর্কালঙ্কার মহাশয়কে চাপিয়া ধরিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয় প্রতিদিন ব্যথায় আমার ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়, অথচ ডাক্তার বাবু জানেন যে পরিবর্ত্তন ছাড়া ইহার অন্য ঔষধ নাই, তথাপি তিনি এমন নির্ম্মমভাবে নীরব থাকেন কেমন করিয়া? আপনি বলিতে পারেন ইহার কারণ কি?" তিনি কহিলেন, "ঠিক কি কারণে তিনি নিজের মতামত প্রকাশ করেন না তাহা জানি না, তবে খানিকটা অনুমান করিতে পারি বোধ হয়।" আমি কহিলাম, "আপনার কি অনুমান হয়?" তর্কালঙ্কার ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আমার রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখের উপর তাঁহার জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত কৃষ্ণতার উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি স্থাপন করিলেন, অনেকক্ষণ এই ভাবে চাহিয়া চাহিয়া ধীরে ধীরে নিতান্ত করুণা-জড়িত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন :—"বাবা, ইহ সংসারে নিজের প্রতিই সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে, পরের দুঃখ বুঝিয়া পরকে সুখী করিবা[র] নিমিত্ত সত্য কথাটা বলিবার সাহস পর্য্যন্ত লোকে[র] নাই; স্বার্থে জগৎ অন্ধ, যদি সত্য কহিলে বা সত্যকে আশ্রয় করিলে আমার এতটুকু স্বার্থের ব্যাঘাত হইবা[র] সম্ভাবনা দেখিতে পাই, তাহা হইলে সে সত্যকে দূ[রে] রাখিয়া আমরা অন্য পথে চলিবার উদ্যোগ করি[।] নিজের চেষ্টা নিজেকেই করিতে হইবে, নিজের প[থ] নিজে পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে, অন্ততঃ পক্ষে তাহা[র] চেষ্টার মধ্যে পুরুষকারের পরিচয় দিতে হইবে, তাহাতে সম্পূর্ণ সুখ আমাদের আয়ত্ত হউক বা নাই হউক, দুঃ[খ] কম হইবে; চেষ্টার মধ্যে দুঃখের অনুভূতি অন্ততঃ অনে[ক] পরিমাণে ডুবিয়া থাকিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। আ[মি] বিস্তর যাহা পড়াশুনা করিয়াছি তাহাতে দৈব ও পুরুষ[-] কারের নানা কথাই পাইয়াছি কিন্তু একটু প্রণিধা[ন] করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, সমস্তটাই পুরুষকার ন[া] হইলেও বার আনা তাই এবং সিকি পরিমাণ দৈব[।] যদি সংসারে দীর্ঘজীবি হইয়া আসিয়া থাক বাবা, হয়[ত] একদিন দেখিবে, বিদ্যা বুদ্ধি, দয়া করুণা, মায়া মমত[া] সব থাকিতে, সর্ব্বগুণান্বিত ব্যক্তিও অন্যের নির্দ্ধারি[ত] পথকে দৈব নির্দ্দিষ্ট পথ বলিয়া পুরুষকার পরিত্যা[গ] করিয়া মহাভ্রমে পতিত হয়, নিজে দুঃখ পায় এব[ং] অপরকে দুঃখ দেয়; দৈবের স্কন্ধে সমস্ত চাপাইয়া নিজে[র] দায়িত্ব হইতে নিজকে নিষ্কৃতি দিয়া থাকে। উহা তাহাদে[র] স্বেচ্ছানুষ্ঠিত স্বার্থপরতা বা পর-পীড়নেচ্ছা হয়ত নহে কিন্তু উহা যে চিরদিন পরের প্রতি একান্ত নির্ভর পরায়ণতার দুঃখময় ফল তাহাতে আমার সন্দেহ নাই[।] নিজের সুখ দুঃখ অনেক পরিমাণে নিজের উপরে[ই] নির্ভর করে ইহা নিশ্চয় জানিও। নিজের অনুষ্ঠা[ন] যে দিন নিজে করিবে সেই দিন তোমার দুঃখ ঘুচি[বে] বাবা। বায়ু পরিবর্ত্তনে তোমার অভিভাবকদিগে[র] বিশেষ অমত বলিয়া আমার ধারণা, সেই কার্য্যে ম[ত] দিয়া চিকিৎসক তাঁহার মাসিক বৃত্তির ক্ষতি করিবে[ন] এমন নির্ব্বোধ তিনি নহেন। চিকিৎসকের নীরবতা[র] ইহাই একমাত্র কারণ বলিয়া আমার বিশ্বাস। তুমি

আমার ছাত্র এবং আমার অধ্যাপনার প্রারম্ভে একমাত্র ছাত্র আমার তুমিই, তোমাকে রোগক্লিষ্ট দেখিয়া মনে বড় দুঃখ পাই, তাই এত কথা বলিলাম বাবা, এ কথা প্রকাশ হইলে আমারও ক্ষতির সম্ভাবনা আছে সে কথা তুমি বিস্মৃত হইও না এই আমার অনুরোধ, আশীর্ব্বাদ করি তুমি রোগমুক্ত হও।”

তখনও আমার বয়স বিশ বৎসরের অধিক নহে, সবে উনিশ পার হইয়াছে মাত্র, ছাপার পুস্তকের পাতার মধ্য দিয়া সংসারের দয়া মায়া স্নেহ মমতার যে ইন্দ্রধনুর মুগ্ধকরী বর্ণলীলা দেখিয়াছিলাম, চোখের জলে তাহা একেবারে তখনও ধুইয়া মুছিয়া যায় নাই, আশা করিতে তখনও বড় ইচ্ছাই করে, এবং আশার সফলতা একদিন আসিবেই একথা মনে করিয়া অনেক দুঃখ দিনের বিনিদ্র রাত্রি তখনও কাটান একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠে নাই, অতি সামান্য কথা, অতি তুচ্ছ ঘটনার মধ্য হইতে আশার অনুকূল এতটুকু আশ্বাস পাইলে অবার্থ ও অমোঘ বোধে তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া বুকে চাপিয়া ধরিতে তখনও বড় ভালই লাগে। এমন সময়ে সংসারাভিজ্ঞ শাস্ত্রবিৎ অধ্যাপক মহাশয় সংসারের যে চিত্র আমাকে দেখাইলেন, তাহাতে সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার মত আমার পুস্তকগত সংসারের ইন্দ্রজালের মোহিনীমায়া এক নিমেষে টুটিয়া দিক্‌চক্রবালের কোন্ সীমাতে মিলাইয়া গেল তাহার উদ্দেশ পাইলাম না। ব্যাধির যন্ত্রণা যথেষ্টই ছিল কিন্তু সে কথা আজ ভুলিয়া গেলাম, এত দিনের বইপড়া সংস্কার আজ দারুণ আঘাত খাইয়া আমার তরুণ মনের মধ্যে এক বিষম তোলপাড় উপস্থিত করিল। একমাত্র স্নেহের পাত্র চক্ষুর সম্মুখে অস্খলিত-পদে মৃত্যুর দিকে চলিয়াছে, তথাপি আর একজনের মতের এতটুকু পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা নাই, এই কথা মনে আসিয়া হৃদয়ের উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত বেদনায় কেমন করিয়া ভরিয়া উঠিল তাহা কেবল এক অন্তর্য্যামীই জানিয়াছিলেন; সমস্ত সংসারটা যেন বৈরাগ্যের গেরুয়া-অঞ্চলে আপাদ মস্তক ঢাকিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইল, বিশ বৎসরের তরুণ দেহের মধ্যে অশীতিবর্ষ বৃদ্ধের মন আসিয়া সে দিন আশ্রয় লইল এবং আমার ইহসংসারের দিনগুলি কি পরিমাণে বিরস ও বিস্বাদ করিয়া দিল তাহা কেবল আমিই জানি।

কিছু দিবস পূর্ব্ব হইতেই মাথার চুল কিছু লম্বাই রাখিয়াছিলাম, দৈহিক শ্রী ফিরাইবার জন্য এরূপ করিয়াছিলাম তাহা নহে কারণ বালককালে একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া যাহাকে চিরদিনের জন্য শ্রীহীন করিয়াছে, তাহার পক্ষে লম্বা চুল, আলবার্ট টেড়ি, সাবান, সেণ্ট আর লম্বা কোঁচা দিয়া ভ্রষ্টশ্রীর নষ্টোদ্ধারের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র, এ জ্ঞান আমার বালক বয়সেই জন্মিয়াছিল। যাহা কিছু বাকী ছিল, স্কুলের সমপাঠীদিগের সহিত কলহ উপলক্ষ্যে তাহাদের মুখে মধুর কানা সম্বোধন বারম্বার শুনিতে শুনিতে “খোদার উপর খোদগারির” চেষ্টা মন হইতে একেবারে বিদায় নিয়াছিল। যে কারণে তিন সন্ধ্যা স্নান করিতাম, বালককালেই থানধুতি ও গরদ পরিয়া দিন কাটাইয়া দিতাম, সেই কারণেই লম্বা চুলও রাখিয়াছিলাম। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতাম, বৈদ্যনাথের নামে আছি। কলিকের আধিক্য উপলক্ষ্যে উহা সম্ভব বলিয়াই সকলে ধরিয়া লইয়াছিলেন।

অধ্যাপক তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট যে দিন আমার জলবায়ু পরিবর্ত্তনের অন্তরায়ের সম্ভবপর হেতু শুনিলাম, সেই দিন হইতে মনের ধিক্কারে ঔষধ পত্র সমস্তই বন্ধ করিয়া দিলাম। মাতা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, “ঔষধ পত্রে কোন ফল পাইলাম না, একবার বৈদ্যনাথের নামে থাকিয়া দেখি।” হিন্দুঘরের বিধবা ধর্ম্মের নামে সকলেই নত হইয়া পড়ে। মাতা ঠাকুরাণী বিশেষ করিয়া ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন, পুত্রের এই অকাল নিষ্ঠায় তিনি বোধ করি সমধিক প্রীতিই পাইয়াছিলেন, আমি ঔষধ পত্র ব্যবহার করি না বলিয়া কোন গোল-যোগ উপস্থিত করিলেন না। আমি প্রতি সোমবারে সমস্ত দিন অভুক্ত থাকিয়া সন্ধ্যায় স্বহস্তে হবিষ্যান্ন রাঁধিয়া খাইতাম, শিবপূজার ভারটা পুরোহিতের উপর দিলাম, পরিপূর্ণ দক্ষিণার বলে বিধান দিতে পুরোহিত ঠাকুরের মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না।

শৈশবে যখন চক্ষুরোগে ভুগিতেছিলাম তখন আমার জনক কি কৌশলে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের সাহায্যে আমাকে কলিকাতা পাঠাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন, সে কথা আজ এই দুঃসহ শূল-ব্যাধির তাড়নার দিনে বারম্বার মনে হইতে লাগিল। তিনি বহু পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন; আজ জীবিত থাকিলে হয়ত আমার গতি-মুক্তির একটা বিধান তিনিই করিতেন এই ভাবিয়া তাঁহার বিয়োগ দুঃখ নূতন করিয়া আমার হৃদয় অধিকার করিল এবং রোগশয্যায় শয়ন করিয়া বিনিদ্র রজনীর অন্ধকারের অন্তরালে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া অনেক অশ্রুপাত করিয়াছি, অকিঞ্চনের সে অশ্রু-কাহিনী এক দেবতা জানিয়াছিলেন এবং দেবলোকবাসী পিতাও জানিতে পারিয়াছেন একথা বিশ্বাস করিতে বড় ইচ্ছাই করিত। নয়নের অন্তরালে থাকিয়াও একজনের অন্তর অপরে অন্তর দিয়া জানিতে পায় একথা আমি প্রাণপণে বিশ্বাস করিয়া দুঃখ-দিনের নিদারুণ বেদনার মধ্যে কথঞ্চিৎ শান্তি ও সান্ত্বনা সংগ্রহ করিবার অশেষ চেষ্টা জীবন ভরিয়া করিতেছি। মনের তারহীন তড়িৎ যদি ইহলোকে একের মনের পরম বার্ত্তাটি বহন করিয়া অপরের মনের সম্মুখে ধরিতে পারে তবে তাহার নিকট লোকান্তর কি এতই দূর? জানি না ইহা আমার ভুল কি না, যদি ভুলও হয় তবুও সে ভুল যেন আমার জন্ম জন্ম না ভাঙ্গে।

রোগের বৃদ্ধির সময় কাটিয়া গেল কিম্বা বৈদ্যনাথের কৃপা হইল তাহা বলিতে পারি না, আমার কলিকের ক্লেশ ক্রমে কম হইয়া আসিতে লাগিল; ব্যথা হইলেও আর প্রতিদিন হয় না এবং তাহার বেগও পূর্ব্ববৎ রহিল না। এইরূপে মানসিকের নির্দ্ধারিত কাল কাটিয়া গেলে একদিন সভয়ে মাতাঠাকুরাণীর নিকট বৈদ্যনাথের পূজার কাল সমাগত হইয়াছে এই কথা জানাইলাম। তিনি কহিলেন,"বেশ,পূজা পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছি।" আমি কহিলাম, "পাঠাইলে হইবে না, মানসিক ছিল নিজে গিয়া পূজা দিব।" মা বলিলেন, "তাহাতে কিছু আসে যায় না, মাথার চুল এইখানে নামাইয়া, পূজার অন্যান্য অনুষ্ঠান সদ্ব্রাহ্মণ দিয়া পাণ্ডার নিকট পাঠাইলে কোন ক্ষতি হইবে না। তুমি এ দুর্ব্বল শরীরে পথক্লেশ সহ্য করিতে এবং পূজা দিবার নিয়ম পালন করিতে পারিবে না, হিতে বিপরীত হইবে।"

"হিতে বিপরীত" যাহা হইবার তাহা হইল—আমি চাহিয়াছিলাম যে ঐ উপলক্ষ্য করিয়া একবার বাহির হইয়া পড়ি, বহির্জ্জগতের মুক্তবায়ুতে শ্বাস ফেলিয়া বাঁচি। পুত্রের মনোভাব বোধ করি মাতার অজ্ঞাত ছিল না, তিনি প্রসঙ্গ উত্থাপন হইবামাত্র আমার দুর্ব্বল শরীরের উল্লেখ করিয়া আমার অভিপ্রেত পথে স্নেহের বাধা সৃজন করিলেন, আমি দ্বিতীয় কথা না বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। পর দিবস নাপিত ডাকাইয়া আমার লম্বা চুল প্রায় নির্ম্মূল করিয়া কাটিয়া নিলাম এবং সেগুলি একখানি নূতন তোয়ালিয়ায় বাঁধিয়া লোক দিয়া মাতার নিকট পাঠাইলাম। আমার কৃতকার্য্যে মাতা বুঝিলেন অভিপ্রায় সিদ্ধ না হওয়ায় অভিমানভরে এরূপ করিয়াছি—কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নহে; তিনিও কিছু বলিলেন না, দুই এক দিনের মধ্যে পূজার অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার সহিত বৈদ্যনাথে লোক পাঠাইয়া দিলেন—মাতা-পুত্রের দারুণ অভিমানের মধ্যে নিখিল বিশ্বের সর্ব্বব্যাধিহর মহেশ্বরের মানসিকী পূজা তাঁহার দ্বারে পঁহুছিবার জন্য যাত্রা করিল। কিছু দিবস পরে আমি শুনিতে পাইলাম যথাবিহিত রূপে পূজা দেওয়া হইয়াছে, যিনি পূজা দিতে গিয়াছিলেন তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, বৈদ্যনাথের নির্ম্মাল্য আমার মাথায় ঠেকাইয়া জলে বিসর্জ্জন দেওয়া হইল। সকলে মনে করিলেন বৈদ্যনাথের কৃপায় আমি কঠিন রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি, শিশুকাল হইতে যে দুরারোগ্য শূল রোগে ভুগিতেছিলাম তাহা দৈব-কৃপায় আরোগ্য হইয়াছে। কোন্ দেবতা কোথায় বসিয়া থাকেন, কোন্ আকাশের কোন সুদূরপ্রান্তে বসিয়া কোন্ দেবতা কাহার উপরে কখন কৃপা বা অকৃপা করেন তাহা বোধ করি মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর;

এ কথা বলিতেছি তাহার কারণ এই যে যখন সকলে নিশ্চিন্ত মনে ভাবিতেছিলেন ৺বৈদ্যনাথের কৃপায় আমি রোগমুক্ত হইয়াছি, মানসিকী পূজা পাঠাইয়া লোলুপ দেবতাকে সন্তুষ্ট করা হইয়াছে, তাহারই এক পক্ষের মধ্যে ভীষণ শূল ব্যথা আবার দ্বিগুণিত তেজে দেখা দিল এবং কয় দিবস ব্যাথায় বর্ণনাতীত যন্ত্রণা ভোগ করিবার পর একদিন প্রবল কম্প দিয়া জ্বর আসিল। জ্বরের আগমন মুহূর্ত্ত হইতে দুই তিন ঘণ্টাকাল আমার চৈতন্য ছিল, তাহার পরে চেতনার বিলোপ হইল, কি হইয়াছিল, কোথায়, কি অবস্থায়, কাহার চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার অধীনে আমাকে রাখা হইয়াছিল সে সমস্ত বিষয়ের কোন জ্ঞানই আমার ছিল না। একদিন প্রভাতে জ্ঞান হইলে শুনিলাম সম্পূর্ণরূপে হতচেতন অবস্থায় আমার পরমায়ুর দশদিন দশরাত্রি কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে টেলিগ্রাম করিয়া কলিকাতা হইতে তদানীন্তন মেডিকেল্ কলেজের অধ্যক্ষ সাহেবকে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, রাজশাহী হইতে সিভিল্ সার্জ্জন্ আনান হইয়াছে এবং নাটোরে যতগুলি ডাক্তার কবিরাজ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ছিলেন তাঁহারাও আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছেন। জ্ঞান হইবার পরে চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম, পরিচিত এবং অপরিচিত অনেকগুলি মুখ দেখিতে পাইলাম; ডাক্তার সাহেব নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "How do you feel now?" আমি কহিলাম, "Very weak and very hungry" তখন পথ্য দিবার জন্য একজনকে ডাক্তার সাহেব বলায় সে খানিকটা বেদানার রস চামচে করিয়া আমার মুখে ঢালিয়া দিল, আমি ধীরে ধীরে সেটুকু গলাধঃকরণ করিয়া আরও একটু পাইবার জন্য হাঁ করিলাম, ডাক্তার সাহেবের আদেশ অনুসারে আর দুই তিন চামচ দেওয়া হইল। ডাক্তার বলিল "He is perfectly in his senses now." এ কথাটা আমার কাণে গেল বটে কিন্তু দুর্ব্বলতা এত অধিক পরিমাণে অনুভব করিতেছিলাম যে চক্ষু মেলিতেও আমার কষ্ট বোধ হইতেছিল। দশ দিবসের পরে রোগী চক্ষু মেলিয়াছে এই আনন্দবার্ত্তা আমার মাতাঠাকুরাণীর নিকট অবিলম্বে দেওয়া হইল, তিনি আমাকে দেখিবার জন্য আমার ঘরে আসিলেন, আমার বিছানায় বসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে আমার জ্ঞান হইয়াছে কি না জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্ত আমি কে?" আমি কহিলাম—"মা।" এই একটি মাত্র শব্দ ব'লয়াই দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত আমি নীরব হইলাম। কিছুকাল পরে আবার চক্ষু চাহিলে মা বলিতে লাগিলেন, "আমি তোমাকে বৈদ্যনাথে পূজা দিবার জন্য যাইতে না দিয়া নিতান্ত অন্যায় করিয়াছি, দেবতার ক্রোধে তোমার এই রোগ ভোগ করিতে হইল এবং এ কয়দিনের দিনরাত্রি যে আমার কেমন করিয়া গিয়াছে তাহা একমাত্র দেবতাই জানেন। আমি জানি, যাইতে দিই নাই বলিয়া বাবা, তুমি আমার উপর বড় অভিমান করিয়াছিলে, সে কথা মন হইতে দূর কর, আমি বাবার নিকট আবার মানত করিয়াছি তুমি আরোগ্য হইয়া এবার স্বয়ং পূজা দিতে যাইবে—ভাল হইয়া ওঠ, আমি নিজে উদ্যোগ করিয়া তোমায় পাঠাইয়া দিব। এখন হইতে তোমার যখন যেখানে ইচ্ছা যাইও, আমি কখনও আর কোন বাধা তোমায় দিব না, একবারেই আমার প্রচুর শিক্ষা হইয়াছে।"

বাষ্পবিজড়িত কণ্ঠে মা এই কথাগুলি ধীরে ধীরে কহিয়া গেলেন, কথা শেষ হইলে আমি চক্ষু চাহিয়া দেখি তাঁহার গণ্ড বাহিয়া অবিরল অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। বালক-কাল হইতে বহু দিবস পর্য্যন্ত ইহাঁকেই আমার গর্ভধারিণী বলিয়া ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, অল্প বয়সে আমার দিদিদিগের সহিত কলহ হইলে তাঁহারা আমার মনে দুঃখ দিবার জন্য বলিতেন—"তুমি ত আর এ মার পেটে হও নাই"—তখন এই নির্ম্মম বাক্য-শেলের নিদারুণ আঘাতে আহত মন ও অশ্রুসিক্ত চক্ষু লইয়া ইহাঁরই নিকট "মা মা" বলিয়া নালিশ করিতে গিয়াছি, আজ সেই স্নেহশীলা রাজেন্দ্রাণীকে, নিতান্ত কাঙ্গালের সন্তান আমি, আমার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া আমার

রোগক্লিষ্ট পঞ্জরাস্থির মধ্যে প্রাণ যেন নিদারুণ আঘাতে একান্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল, আমি আমার দুই হাতের মধ্যে তাঁহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া রোগকাতর ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলাম, "মা, অযোগ্য সন্তানের কোন ত্রুটি মনে আনিয়া আজ তোমার মনে কোন ক্ষোভ রাখিও না। যদি এই ব্যাধিই আমার শেষ ব্যাধি হয়, এ রোগশয্যা হইতে যদি আর উঠিবার শক্তি আমার না হয়, আমার অন্তিম মিনতি এই যে, শৈশবে যে স্নেহ তোমার নিকট পাইয়াছি, আমার শেষ নিমেষ-পাতের দিনেও যেন সেই স্নেহের মধ্যেই বিদায় হইতে পারি।" কথাগুলি সে সময়ে ঠিক এই ভাষায় বলি নাই বটে, তবে তাহার সার মর্ম্ম এইরূপই ছিল। মৃত্যুশয্যাশায়ী রুগ্ন সন্তানের মুখে এরূপ ভাবের কথা শুনিয়া, যে নারী মাতৃত্বের গৌরব লাভ করিয়াছেন, তাঁহার স্থির থাকা সম্ভব নহে; মাতা ব্যাকুল ভাবে কাঁদিয়া উঠিয়া আমাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন, কি যেন বলিতে চাহিতেছিলেন, কথা মুখে বাহির হইল না। অতৃপ্ত দুর্নিবার স্নেহের প্রবল বেগে আমাকে সজোরে বুকের মধ্যে জড়াইয়া নিয়া অবিরল স্নেহাশ্রুর সিঞ্চনে আমার মস্তক ও উপাধান সিক্ত করিয়া দিতে লাগিলেন। পরম দুর্লভ মাতৃ-স্নেহের অভিজ্ঞান লাভ আমার জীবনে ঐ শেষ। এখন তিনি বৈকুণ্ঠবাসিনী, আজ অসহ্য দুঃখের দুর্ব্বহভারে অন্তরাত্মা বিকল হইয়া উঠিলে বিনিদ্র রজনীর অবাধ অশ্রুধারে শয্যা সিক্ত হয় বটে, কিন্তু সে দুঃখ জানাইবার স্থান দেবতা আজ আর আমার রাখেন নাই, যেখানে বুকভাঙ্গা বিপুল দুঃখ নিবেদন করিয়া স্নেহ আদ-রের করুণ-বাণী প্রত্যাশা করিতে বড় ইচ্ছা করে, সে স্থান আজ আমার আয়ত্তের বহু—বহু দূরে।

দুর্ব্বল শরীরে অত্যধিক মানসিক উত্তেজনায় শরীর আরও ক্লিষ্ট হইতে পারে, কিম্বা আবার আমার চৈতন্য বিলোপ হইতে পারে, ইহা মনে করিয়া বাটীর প্রাচীনারা মাতাকে জোর করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেলেন, আমিও একান্ত ক্লান্তভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিলাম।

জ্ঞান হইবার পরে ধীরে ধীরে শুনিলাম, দশদিন ধরিয়া জীবন মরণের সন্ধিস্থলে মৃতের মতই পড়িয়া ছিলাম, অচৈতন্য অবস্থায় পথ্য ঔষধ যাহা চিকিৎসকেরা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা কতক উদরস্থ হইয়াছে কতক বা মুখ হইতে বাহির হইয়া গড়াইয়া পড়িয়া গিয়াছে। তুলসী-মঞ্চের পবিত্র ধূলি আমার সর্ব্বাঙ্গে দুই সন্ধ্যা স্পর্শ করান হইয়াছে, গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের নিকট রোগ-মুক্তির কামনায় নিয়ত নাম-সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছে, নারায়ণকে তুলসীদান, বিপদবারণ মধুসূদন মন্ত্রের পুরশ্চরণ, শিব স্বস্ত্যয়ন, জয়দুর্গা মন্ত্রজপ প্রভৃতি দৈবক্রিয়ার কোন ত্রুটিই হয় নাই। দেশ দেশান্তর হইতে সুচিকিৎসক আনাইবার ব্যবস্থারও কোন অঙ্গহানি হইতে পারে নাই। এই অকিঞ্চনের অকিঞ্চিৎকর জীবন রক্ষার্থ দৈব ও পুরুষকারের সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপেই করা হইয়াছিল এবং শুনিয়াছি মাতার নিকট হইতে গোপন করিয়া নিভৃত দুর্গামণ্ডপের প্রাঙ্গণে আমার অন্তিম ভূশয়নের ব্যবস্থাও করাইয়া রাখা হইয়াছিল। দশদিন দশরাত্রি ধরিয়া যাহার চৈতন্য হইল না তাহার প্রাণের আশা কেহ কি করে?

তৎপূর্ব্বে আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল, সে কথা ইতিপূর্ব্বে আমার পাঠক পাঠিকাদিগকে জানাইয়াছি এবং যদিও সে সময়ে আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মিয়া-ছিল, তথাপি বিষয় কর্ম্মে অভিজ্ঞ মন্ত্রীদিগের মন্ত্রণায় আমার স্ত্রীর নামে দত্তক-পুত্র গ্রহণের অনুমতি আমি বহুপূর্ব্বে সুস্থ অবস্থায় স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছিলাম। সুতরাং যখন আমার জীবনের আশা সকলে একরূপ ত্যাগই করিয়াছিলেন তখন চিকিৎসার উদ্যোগ, দৈবানুগ্রহ লাভের আয়োজন এবং বিষয়-কর্ম্মের ব্যবস্থা, কিছুরই কোন দিক দিয়াই ত্রুটি হইয়াছিল না। মাতার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে মানত পূজা দিতে আমাকে বৈদ্য-নাথ-ধামে যাইতে না দেওয়ায় হরকোপানলে আমি মৃত্যুমুখে পড়িয়াছিলাম, সুতরাং তিনি মহেশ্বরের

মনস্তুষ্টির জন্য বৈদ্যনাথ-ধামে সুযোগ্য পুরোহিত প্রেরণ করিয়া আশুতোষের মস্তকে লক্ষ বিল্বপত্র দিবার ব্যবস্থা করাইয়াছিলেন এবং রোগক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত মহেশ্বর-মন্দিরে নিরন্তর ঘৃত-প্রদীপ জ্বালিবার এবং অনাদি-লিঙ্গকে গঙ্গোদকে প্রত্যহ স্নান করাইয়া গন্ধাদি অনুলেপন দ্বারা তাঁহার অপূর্ব্ব 'শিঙ্গারে'র ব্যবস্থাও করাইয়াছিলেন।

দৈবানুগ্রহে লোকে বিপন্মুক্ত হয় কি না জানি না, তবে স্নেহশীল অন্তরের একাগ্র শুভকামনায় যে বিপদ বিদূরিত হয় তাহা আমি আর একবার পরিণত বয়সেও দেখিয়াছি; সে বারেও আমি নিতান্ত পীড়িত হইয়া যমদ্বারের দিকে পা বাড়াইয়াছিলাম এবং একান্ত অন্তরের মানুষটির স্নেহার্দ্র দৃষ্টির শান্তি সলিল যে সে বারেও আমার জ্বরতাপ ধুইয়া দিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ করি না। এই স্নেহাতুর হৃদয়ের একান্ত মঙ্গলেচ্ছাকে দৈবকৃপাই বলিতে হয়, কারণ দৈবানুগ্রহ ব্যতীত এমন স্নেহকে আর কি নামে ডাকিব?

দৈবানুগ্রহে বা পুরুষকারের প্রবল চেষ্টায়, মাতৃ-স্নেহের নিরন্তর মঙ্গল-কামনায় বা উত্তরকালে দুঃখ-ভোগের অখণ্ডনীয় বিধিলিপির প্রভাবে, কি কারণে জানি না, সে যাত্রা মৃত্যুর দ্বার হইতে ফিরিলাম এবং আজও আমার শ্বাস প্রশ্বাস কোন প্রকারে চলিতেছে।

জ্বর সারিল, ডাক্তার বৈদ্য বিদায় হইল, আমি গৃহ চিকিৎসকের অধীন থাকিয়া ঔষধ-পত্র তখনও ব্যবহার করি—কারণ সবল হইয়া চলাফেরা করিতে আমার অনেক সময় লাগিয়াছিল; প্রায় তিন চারি মাস পর যখন আমার শরীর হইতে রোগের লক্ষণ সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইল, তখন মাতা নিজেই আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এবারে বৈদ্যনাথ যাইবার ব্যবস্থা কর, যেমন যেমন করিতে হইবে, যাইবার পূর্ব্বে আমি সমস্ত উপদেশ দিয়া দিব।" আমি ছোট্ট একটি 'আচ্ছা' বলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম মাত্র. মাতা আমার চক্ষুর দর্পণের মধ্য দিয়া মুক্তির আনন্দচিহ্ন দেখিবার প্রয়াস অনেকক্ষণ ধরিয়া করিলেন, বোধ করি পাইলেন না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "একবার তোকে যাইতে দিই নাই সে অভিমান তোর মন হইতে আজও গেল না, তুই যে মেয়েমানুষের অধম রে।" আমি তাঁহার কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিলাম এবং কিছুকাল পরে চাহিয়া দেখিলাম মার অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডলে মাতৃস্নেহের পরমজ্যোতি আনন্দে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। আমার অন্তরে ক্ষোভ অভিমান যাহা কিছু ছিল সমস্তই নিমেষের মধ্যে বিদূরিত হইয়া গেল, আমার স্নেহ-কাঙ্গাল অন্তর এই আদর্শ জননী রাজেন্দ্রা-নীর পাদপদ্মের রেণু-কণার লোভে মকরন্দলোভী মধুকরের মত বারম্বার তাঁহার রাতুল চরণতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

স্নেহের আদান প্রদানের এমন পরম মুহূর্ত্ত মানুষের জীবনে বহুবার আসে না, সুতরাং ইহা বড় দুর্লভ সামগ্রী, বিশেষতঃ আমার পক্ষে—কারণ শিশুকাল হইতে যে মাতৃক্রোড়-বিচ্যুত তাহার অন্তর মরুভূমির আকাশের মত চিরতৃষ্ণাতুরই রহিয়া যায়, সে যেখান হইতে যেটুকুই পায় তাহা তাহার পরম পদার্থ এবং তাহার কণামাত্রও যদি কখনও সে হারাইতে বসে, সে দিন তাহার কি দিন তাহা সেই জানে এবং সে দিনের সে বিরাট হাহাকার রাখিবার মত প্রচুর স্থান বুঝি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আধার এই অন্তবিহীন মহা-শূন্যের সমস্তখানির মধ্যেও হয় না। বিধাতার দত্ত অধিকারের স্বাক্ষরিত লিপি লইয়া শিশু মাতৃক্রোড়ে স্থান পায়, তাহার সেই জন্ম-অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া সংস্কৃতে রচিত দুই একটি যাগ যজ্ঞ হোমাদি সংস্কারের মন্ত্রবলে তাহাকে স্থানান্তরিত করা সমাজের পক্ষে সহজসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু সেই বঞ্চিত শিশুর হৃদয়ের উপর হস্তক্ষেপ করে সে সাধ্য ত কাহারও নাই, তাই বুঝি স্বাধিকার বঞ্চিত সকলেরই মনে চিরতৃষ্ণা জাগিয়াই থাকে, অনাবৃষ্টির দিনে দীর্ণ বিদীর্ণ ধরিত্রীর বুকের মত তাহারও বুক স্নেহের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষায় ফাটিয়া ফাটিয়া সহস্রমুখে হাঁ করিয়া একটি মাত্র বিন্দুর জন্য ব্যাকুল হইয়া তাহার

চিরজন্মটা বিপুল ব্যর্থতার মধ্যে কেমন করিয়া কাটিয়া যায় তাহার সংবাদ কেহ কি সংসারে রাখে? দুই একটি হোমানুষ্ঠানের মন্ত্রবলে সংসার সমস্তই সম্ভব করিয়া তুলিতে চাহে, কিন্তু জানে না যে যাহার যেখানে স্থান, সেইখানে তাহাকে বাঁধিবার জন্য অক্ষয় রাখীবন্ধনের পরম মন্ত্রটি বিধাতা-পুরুষ অদৃশ্যে বসিয়া নিরন্তর উচ্চারণ করিতেছেন। আমরা শুধু হোমের অগ্নি জ্বালাইয়া তাহার লেলিহান জিহ্বায় সংসার দগ্ধ করিয়া ফেলিতে জানি কিন্তু "সুরাস্ত্বামভিসিঞ্চন্তু" বলিয়া শান্তি-সেচনের মন্ত্রোচ্চারণ আমাদের তন্ত্রের পটলে লেখা যে নাই তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবার সময় আমাদের হয় না। নিদাঘ-আকাশের রক্ত-নেত্রের বিদ্যুদ্বর্ষণ উপেক্ষা করিয়া নববর্ষার স্নিগ্ধকান্ত সজল জলদের বিন্দু দানের আশায় চাতকের জীবন উর্দ্ধে চাহিয়াই যে কেন কাটে, জলান্ত-মজ্জিত পঙ্কের প্রসূন আকাশের জ্যোতিষ্কের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া তাহার ক্ষণস্থায়ী পুষ্পজীবন কেন কাটাইয়া দেয়, কি বেদনায় সাগরের হৃদয়রক্ত প্রবাল-কাঠিন্যে পরিণত করিয়া সে তালীবনাঞ্চলা বালুবেলার চরণ রঞ্জিত করিতে বারম্বার আসিয়া আছাড় খাইয়া কেন পড়ে, সে কথা ভাবিবার সময় কাহারও নাই। এই বিধি-নিয়ন্ত্রিত জড় জীব নির্ব্বিশেষে বিশ্বব্যাপী মিলনা-কাঙ্ক্ষাকে নিরর্থক বলিবার সাধ্য আর যাহার থাকে থাকুক, আমার নাই। এ আকাঙ্ক্ষার সার্থকতা কোথাও রহিয়াছে, নতুবা এতদিনে ত্রিলোক উজাড় হইয়া যাইত যে!

শৈশবে যাঁহাকে মা বলিয়াই জানিতাম, তাঁহার নিকট হইতে সেই শৈশবে যে স্নেহ পাইয়াছি তাহা স্বীয় জননীর নিকট প্রাপ্য মাতৃস্নেহ স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছি, উহার মর্য্যাদা তখন বুঝি নাই। যখন জানিলাম আমি শিশুকাল হইতেই মাতৃহারা অনাথ, দাবী করিবার স্থান পুত্রেষ্টি যাগের মুহূর্ত্ত হইতেই আমার নিকট হইতে সুদূরে সরিয়া গিয়াছে, তখন রাজমাতার সামান্য স্নেহের ত্রুটি যেমন শেলসম বুকে বিঁধিত, তেমনই সে দিনের সেই অপ্রত্যাশিত মাতৃস্নেহের স্বচ্ছ শীতল ধারা-সম্পাত অঙ্গারাবশেষ সগর-সন্তানের উপর মন্দাকিনী ধারার ন্যায় আমার চিরদুঃখী মনের দহন-জ্বালা নির্ব্বাপিত করিয়া দিল, আমি যেন শাপাভিহত সগর-সন্তানের মতই উদ্ধার হইয়া গেলাম। এ দিনের স্মৃতি আমার নিকট পরম পদার্থ, পৃথিবীর লক্ষ কোহিনুর একত্র করিয়া হার গাঁথিয়া দিলেও ইহার কাছে তাহা তুচ্ছাদপিতুচ্ছ। সে দিনের এক অঞ্জলি সুধায় আমার বহুদিনের হৃদিসঞ্চিত ক্ষোভ দূর হইয়া গেল; স্নেহের ভিখারী যে সে কুকুরের২ মত "বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্ট" কিন্তু হায়রে, সেই 'স্বল্প' টুকুও যে এ ধরায় কেবল দুষ্প্রাপ্য নহে, স্থল বিশেষে অপ্রাপ্য, এ দুঃখ কোথায় রাখি কেহ যদি বলিয়া দেয় তবে দুঃখীজনে জীবনব্যাপী বিষশল্যের বেদনার হাত হইতে বাঁচিয়া যাইতে পারে!

সেদিনের আনন্দ পুলক সর্ব্বাঙ্গে বহন করিয়া নিয়া বাহিরে গেলাম, আমার নিদ্রা-বিহীন সারা রজনী বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, যাঁহার হৃদয়ে অমূল্য স্নেহের বিস্তার-বারিধি নিয়ত তরঙ্গিত হইতেছে, তাঁহার পাদমূলে স্থান পাইয়াও আমি এমন স্নেহের কাঙ্গাল কেন রহিয়াই গেলাম—এ সুধাম্বাদী ক্ষীরোদ সমুদ্র আমার সহিত বাদ সাধিয়া কে এমন নির্ম্মম ভাবে লবণাক্ত করিয়া দেয়!

এ প্রশ্নের সেদিনে মীমাংসা করিতে পারি নাই, পরে পারিয়াছিলাম। রাজধানী বড় বিষমস্থান, সমস্ত পৃথিবী ভরিয়াই স্বার্থ তাহার লেলিহান ব্যাঘ্র-জিহ্বা বিস্তার করিয়াই আছে জানি, তথাপি আমার বিশ্বাস এ বিষয়ে রাজধানীগুলি কাহারও নিকট হার মানিবে না। সামান্য বিষয় লইয়া কর্ম্মচারিগণের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ত অহরহ লাগিয়াই রহিয়াছে, তাহার মধ্যে রাজপরিবারস্থ-জনের পরস্পরে মনোমালিন্য ঘটাইতে পারিলে লাভের প্রত্যাশা সমধিক, এ কথা রাজধানীর অনুজীবিদিগকে শিখাইবার কোন প্রয়োজন নাই; তাহারা এ বিদ্যায় মহামহোপাধ্যায়। রাজ-পরিবারের ভ্রাতায় ভ্রাতায়, মাতা পুত্রে, খুল্লতাত ভ্রাতু-ষ্পুত্রের মধ্যে যেখানেই বিবাদ দেখা যায়, জানিতে

হইবে অনুজীবিগণের কুচক্রেই তাহা সংঘটিত হইয়াছে। মাতার নিয়ত নির্ব্বন্ধ সত্ত্বেও যখন আমি অপ্রাপ্ত বয়সে জমিদারীর কার্য্য পরিদর্শন করিতে অনিচ্ছুক হইলাম, তখন উর্ব্বর মস্তিষ্ক বিশিষ্ট রাজধানীর অনুজীবিগণের মাথায় মাথায় ভাবনা পড়িয়া গেল, ইহার কারণ কি? কর্ত্তা হইতে পারিলে লোকে বাঁচিয়া যায়—আর এ কি বিচিত্র ব্যাপার? এত অল্প-বয়সে বৈরাগ্য সম্ভবপর নহে, সুতরাং নিগূঢ় কোন হেতু থাকিবারই কথা এবং সে হেতু কি? শুনিয়াছি স্থান বিশেষের উর্ব্বরতা এত অধিক যে নিমেষের মধ্যে তিন চারি হস্ত পরিমিত লম্বা শালবৃক্ষ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া দেখা দেয়, কিন্তু রাজপুরীর অনুচরগণের মনোভূমি তদপেক্ষাও উর্ব্বর, মুহূর্ত্তের মধ্যে নিতান্ত অসম্ভব কথাকেও সম্ভবপর করিয়া গুছাইয়া বলিয়া বিশ্বাস জন্মাইয়া দিবার বিস্ময়কর ক্ষমতা ইহাদের অপরিসীম। ঘটনাক্রমে আমি জানিতে পারিলাম যে, আমার জমিদারী দেখিবার অনিচ্ছা লইয়া ইহারা নানা ঘোঁট করিয়াছে এবং মাতাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া দিয়াছে যে আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জেলার জজ সাহেবের সমক্ষে মাতার কার্য্যকালের ক্ষতি খেসারার হিসাব নিকাশ বুঝিয়া তবে কার্য্যভার গ্রহণ করিব, সেই জন্য তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া বিষয়কার্য্য দেখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছি। আমি চিরদিন মাতার নিতান্ত অনুগত হইয়া চলিয়াছি, তাঁহার কোন ইচ্ছায় কখনও দ্বিরুক্তি করি নাই, তাঁহার ভ্রমের ফলে নিজের বুকভাঙ্গা দুঃখ অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও তাঁহার আদেশ নতশিরে বহন করিয়াছি, সুতরাং মাতা সহসা আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু তাঁহাকে বুঝান হইয়াছে যে তপঃ-সিদ্ধ মহাপুরুষ মহারাজ রামকৃষ্ণ এবং সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা স্বরূপিণী ভবানীরও যখন বিষয় লইয়া বিবাদ হইয়াছে, বৈষ্ণব চূড়ামণি মহারাজ বিশ্বনাথ এবং তাঁহার জননী শঙ্করীর বিবাদ যদি সম্ভব হইয়াছে, মহারাজ গোবিন্দচন্দ্র এবং মহারাণী কৃষ্ণমণির মনোমালিন্য যদি ঘটিয়া থাকিতে পারে, আমার পিতা ৺গোবিন্দনাথ এবং মহারাণী শিবেশ্বরীর বিবাদ যখন পরিহার করা যায় নাই, তখন জগদিন্দ্রনাথ কি এমন বুদ্ধ শঙ্কর চৈতন্য হইয়া আসিয়াছে যে যৌবনের উন্মুখ সময়ে বিষয়-বৈরাগ্যের পরিচয় দিয়া মাতৃভক্তির উদাহরণ দেখাইবে? আরও বলিয়াছে যে, কুমারের (অর্থাৎ আমার) এই গৃহ ছাড়িয়া দেশ দেশান্তর ঘুরিয়া বেড়াইবার ইচ্ছার কারণ আর কিছুই নহে, নানা স্থানের বিষয়-চতুর আইনজ্ঞ লোকের সহিত এবং দেশের হাকিম সাহেবদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া যথাকালে আপনাকে বিপন্ন ও অপদস্থ করিবার উদ্যোগ করিয়া রাখাই তাঁহার উদ্দেশ্য।—এমন করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলে প্রবীণ পুরুষের মনও দ্বিধায় পড়িয়া যায়, অন্তঃপুরচারিণী রমণীর মন অটল রহিবার আশা সে ক্ষেত্রে দুরাশা। আমার মাতৃভক্তির উপর মাতার যে বিশ্বাস যে আস্থা ছিল, তাহা সন্দেহের দোলায় দুলিতে লাগিল। সম্ভবতঃ তাঁহার মনে হইল, সংসার কি অকৃতজ্ঞ, নিঃস্ব উপায়হীন চির-দরিদ্রের সন্তানকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে পালন করিয়া রাজাধিরাজ করিয়া দিতে আনিয়াছি, আর সেই নরাধম আমারই স্বামীর পরিত্যক্ত অর্থে লেখাপড়া শিখিয়া আমাকেই অপদস্থ করিবার উপায় উদ্ভাবনের সঙ্কল্প করিতেছে? এ দিকে মাতৃক্রোড়বিচ্যুত, ভ্রাতা-ভগিনী-গণের সঙ্গ-বিরহিত, স্নেহের ভিখারী আমি মনে মনে ভাবিলাম, স্নেহের অধিকারেই যদি আমার স্থান না দিবে, তবে আমার ভিখারী জনকের কুটীর হইতে আমার ভিখারিণী মাতার স্নেহবক্ষ হইতে আমায় টানিয়া এই রাজসম্পদের রসহীন স্বর্ণস্তূপের উপর বসাইয়া আমার কি পরমার্থ লাভের উপায় করিলে তুমি? সুবর্ণ সম্পদে অশন বসনের সৌকর্য্য সম্পাদন হয় বটে কিন্তু এ সংসারে অশন বসনই কি চরম সম্পদ, সুধাধবলিত সৌধনিবাসই কি অক্ষয় স্বর্গবাস? হৃদয় যদি উপবাসী রহিয়াই গেল, মানব-জীবনের অভিলষিত স্নেহসম্পদ-বিহীন হইয়া আর্ত্ত চিত্তের নিরন্তর হাহাকারে চতুর্দ্দিকের বায়ুস্তর যদি বিষদিগ্ধ

হইয়াই রহিল, তবে স্বর্ণ-রৌপ্য-মণি-মুক্তা-মাণিক্যের পর্ব্বতশিখরে বসিয়া আমার কি সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইল? আমার অন্নপূর্ণা যিনি, তাঁহার স্বহস্তদত্ত দিনান্তের সুধার অধিক দু'টি শাকান্ন গ্রহণ করিয়া নিবিড়ারণ্যের উপকণ্ঠে পর্ণকুটীরের তৃণাস্তীর্ণ ভূমির উপর স্নেহ-বাহুর উপাধানে শ্রান্তশির রাখিয়া আমার স্বপ্নহীন সুষুপ্তির মধ্যে সুখের রাত্রি কাটিয়া যাইতে কি পারিত না? নিত্য প্রভাতের কলবিহঙ্গ-কাকলীর সুধাময় স্বরলহরীর মধ্যে জাগ্রত হইয়া প্রাণপ্রিয় জীবনসঙ্গিনীর নিরবচ্ছিন্ন প্রেমলীলার নিত্য নব অভিনয়ের মধ্যে পুলকাঞ্চিত দেহে আমার পরমায়ুর অবশিষ্ট কয়টা দিন কি দক্ষিণানিল-শিহরিত ফাল্গুনের ফুলময় দিনে পরিণত হইতে পারিত না? যে দুই একটি পরম প্রার্থনীয় জনের প্রীতি পরিবেষ্টনের মধ্যে জীবনের দিন কয়টা নিরুদ্বেগ সুখে কাটিয়া যাইতে পারে বলিয়া এত আইন কানুন বিধিবিধান নীতি পাঁতির সৃজন হইয়াছে, যদি সেই স্নেহের মধ্যেই দিন না কাটিল, তবে জীবনের প্রভাত হইতে এতদিন ধরিয়া জীবন যাপনের এত সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন কি ছিল? আর এই নিতান্ত নিরীহ শিশু-শকুন্তকে তাহার জন্মকুলায় হইতে ধরিয়া আনিয়া তাহাকে এই সুবর্ণ-পিঞ্জরের কঠিন শলাকায় ঘেরিয়া রাখিবারই বা সার্থকতা কি?

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

আলোচনা

ভাষার সংস্কার।

গত পৌষের "ভারতী"তে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের লিখিত কোন প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া "ভাষার সংস্কার" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সেই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

প্রথমে তর্কের কথাটাই বলি। পুস্তকে সাধুভাষা চলিবে কি কথিত ভাষা চলিবে ইহাই লইয়া তর্ক। চৌধুরী মহাশয় 'বীরবলী' ভাষাটা সমস্ত বাঙ্গলাদেশে চালাইতে চাহেন। একাকী 'বীরবলী' প্রবন্ধ লিখিলে সমস্ত দেশের ভাষাপরিবর্ত্তন সহজ নহে বলিয়া তিনি মুষ্টিমেয় লেখক লইয়া "সবুজপত্রে"র কর্ণধার হইলেন। তাহাতেও কুলাইতেছে না দেখিয়া তিনি আবার "ভারতীর" স্কন্ধে ভর করিয়াছেন।

কিন্তু তর্কটা সামান্য কথা লইয়া—ক্রিয়া ও সর্ব্বনামের কয়েকটির রূপ লইয়া। সকলে পুস্তকে লেখে "করিয়া, খাইলাম, যাইব, তাহাকে, যাহার," চৌধুরী মহাশয় লেখেন এবং সকলকে লিখিতে বলেন "ক'রে, খেলুম, যাব, তাকে, যার।" কিন্তু এই সামান্য উচ্চারণ-পার্থক্যে ভাষা যে কিরূপে "সরল" হইয়া উঠিবে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আর এইরূপ পরিবর্ত্তনের অভাবে আমাদের বাঙ্গালা ভাষাটা কিরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া অচল ছিল তাহাও আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য। তবে চৌধুরী মহাশয় যেমন আগে তদ্ শব্দ দিয়া পরে যদ্ শব্দ দিয়াছেন তাহা যদি প্রকৃতই বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলিত হয়, তাহা হইলে একটা যথার্থ পরিবর্ত্তন বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। ইহাতে চিন্তার প্রবাহ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইবে।

তিনি ভাষার-সংস্কারে দুইস্থানে লিখিয়াছেন—

"সুতরাং বাংলা গদ্যে ততদিন Style দেখা দেবে না, যতদিন আমরা লেখায়" ইত্যাদি।

"ভক্তি পরে আসবে তখন, যখন এ ভাষায় জ্ঞানের সাধনা করা যাবে।"

"সাধুপন্থীরা আজ একশ' বৎসর ধরে" যে পুস্তকের ভাষাটা গড়িয়াছেন, চৌধুরী মহাশয়ের মতে তাহা "বাংলা" নহে। হয়ত তাহা "বাঙ্গলা ভাষা" হইতে পারে। উল্লিখিত পংক্তিদুইটি চৌধুরী মহাশয়ের অবশ্য খাঁটি বাংলা। খাঁটি বাংলার আর একটি লক্ষণ দেখিলাম, তাহাতে ইংরাজী কথা অবাধে থাকিতে পারে। "ভাষার সংস্কার" প্রবন্ধে নিম্নলিখিত ইংরাজী শব্দগুলি দেখিলাম—Standard Prose, quote, character, psychology, Logic, Style, vocabulary, structure, sincerity, insincere, slang ও ইভোলিউশন। যিনি খাঁটি বাঙ্গলা লিখিবার জন্য কেবলই লোককে উপদেশ দিতেছেন তিনি খাঁটি বাঙ্গালীর

(বাঙালী লিখিব ?) জন্য লিখিতে চাহেন না কেন ? যে সাধু-পন্থী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা এতকাল ধরিয়া বাঙ্গলা ভাষার উপর যথেচ্ছাচার করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে যাহাতে এই খাঁটি 'বাংলা' বুঝিতে না পারেন তজ্জন্যই কি এত ইংরাজী শব্দের ছড়াছড়ি ?

বীরবলী বাংলার সকল সাকরেদ্ যে এখনও পাকা হয় নাই তাহার দৃষ্টান্ত গতবর্ষের আষাঢ় মাসের "সবুজপত্র" হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। "সবুজপত্রে"র ১৬১ পৃষ্ঠায় আছে "তার চেয়ে বেশী যা তাহা তিনি বুঝিতেনও না তাহাতে হাতও দিতেন না।" পাঠক দেখিবেন "যাহা" স্থানে "যা" হইয়াছে; কিন্তু "তাহা" বা "তাহাতে" স্থানে "তা" বা "তাতে" হয় নাই, "বুঝিতেনও না" স্থানে "বুঝ্‌তেনও না" হয় নাই।

লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষার মধ্যে পার্থক্য সব ভাষাতেই আছে। কথিত ভাষা প্রদেশ ভেদে এমন কি জেলা মহকুমা ভেদে পৃথক্, কিন্তু লিখিত ভাষা এক। এ তর্ক বহু পুরাতন। প্রাকৃতজনকে না হয় ছাড়িয়া দিলাম, বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিতের কথিত ভাষায় এখনও বহু পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্য বজায় রাখিয়া সাধুভাষা করিতে গেলে বঙ্গভাষার এমন একটা বৃহৎ অভিধান প্রয়োজন, যাহা ছাপান ও ক্রয় করা উভয়ই কঠিন হইয়া পড়িবে। বিদেশীর পক্ষে দূরের কথা—সমস্ত বাঙ্গালীর পক্ষেও এরূপ ভাষা আয়ত্ত করা কঠিন হইবে। তবে যদি চৌধুরী মহাশয় কলিকাতার কথিত ভাষা সাধুভাষারূপে চালাইতে চাহেন, তাহা হইলে কাজটা সরল হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু অন্যান্য স্থানের লোকে ইহাতে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। যখন নদীয়া জেলায় শিক্ষিতদিগের প্রভাবে "যাইবা" ও বর্দ্ধমান জেলার শিক্ষিতদিগের প্রভাবে "করিবেক" বাঙ্গলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছিল, তখন দেশে বাঙ্গলা শিক্ষিতদিগের সংখ্যা মুষ্টিমেয় ছিল। শিক্ষিতের সংখ্যা সর্ব্বপ্রদেশে বর্দ্ধিত হওয়ায় এখন "যাইবা" ও "করিবেক" ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া "যাইবে" ও "করিবে" রূপ ধারণ করিয়াছে। অক্ষয় দত্তের "তাহার দিগের" ও "তাহাদিগের" এখন "তাহাদের" আকার ধরিয়াছে; ইহার জন্য কেহ বক্তৃতাও করে নাই প্রবন্ধও লেখে নাই।

মানুষ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলে সে অচল হইতে পারে বটে; কিন্তু মনুষ্য-সমাজে বহুবিধ শৃঙ্খল আছে। ব্রহ্মাণ্ডেও কতকগুলি নিয়ম আছে। প্রত্যেক ভাষারই একটা ব্যাকরণ আছে। এই ব্যাকরণের নিয়মগুলি না মানিয়া চলিলে এক প্রদেশে যতগুলি লোক, ততগুলি ভাষার জন্ম হইত। যে ইংরাজী ভাষা আজ পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকে জানে, সেই ইংরাজী ভাষায় Stripped কথাটা Stript রূপে উচ্চারিত হইলেও Stript রূপে লিখিত হয় নাই। উর্দ্দু লেখা সহজে কেহ পড়িতে পারে না বলিয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট রোম্যান অক্ষরে উর্দ্দু লেখা প্রচলিত করিতে চাহিলে সে প্রদেশের লোক আপত্তি করিয়াছিল, "সিন্, সে, সোয়াদ তিনটি অক্ষরই এক ইংরাজী S অক্ষর দিয়া প্রকাশিত হইলে শব্দের প্রকৃত রূপ, উৎপত্তি ও অর্থ-নির্ণয়ে বিভ্রাট হইবে।" বাঙ্গলায় "যাহার" "তাহার"-এর সংক্ষিপ্ত রূপ "যার" "তার" সাধুভাষায় চালাইলে কতকটা সেইরূপ বিভ্রাট অবশ্যম্ভাবী।

মৌখিকভাষা সাধুভাষা রূপে চালাইতে গেলে ব্যবহৃত-শব্দের সংখ্যাও কমিয়া আসিবে। ভাষার পক্ষে তাহা উন্নতি নহে, একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। সংস্কৃতের পদানুসরণ করিয়া ক্রিয়া বা সর্ব্বনামের প্রচলিত সাধুরূপ হয় নাই। যাঁহারা সংস্কৃতের বোঝা বাঙ্গলার ঘাড়ে চাপাইয়াছিলেন, তাঁহারা কতকগুলি বিশেষ্য, বিশেষণ ও সমাসের প্রয়োগ বাঙ্গলায় চালাইয়া গিয়াছেন। ইহাতে বাঙ্গলাভাষার উন্নতি ছাড়া অবনতি হয় নাই। এখনও আমরা পারিভাষিক শব্দ গঠনে সংস্কৃতের নিকট ভিক্ষার্থী। যেখানে বহু খাঁটি বাঙ্গলা কথা দিয়া আমাদিগকে অর্থপ্রকাশ করিতে হয়, সংস্কৃতের সমস্ত-পদের সাহায্যে তাহা অল্প কথায় প্রকাশ করা যাইতে পারে। বাঙ্গলা শিক্ষিত ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষা যত সহজে আয়ত্ত করিতে পারে, এত সহজে আর কোন প্রদেশের লোকে পারে না। চৌধুরী মহাশয় কিন্তু বলিতে চাহেন এই সাধুপন্থিগণ যথেচ্ছাচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভাষার সংস্কার প্রবন্ধে কতগুলি সমস্তপদ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা গণনা করিয়া দেখিবেন। এই সমস্তপদগুলি তাঁহার খাটি বাঙ্গলা নহে।

মান্যবর স্যর ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ যে সকল কবিতা "সবুজপত্রে" ছাপেন তাহা মৌখিক বাঙ্গলায় লিখিত; আর যেগুলি "প্রবাসী"তে ছাপেন সেগুলি সাধু বাঙ্গলায় লিখিত। ইহার কারণ কি ?

মৌখিক ভাষা বা প্রাদেশিক ভাষা চালাইলে কি বিপদ হয়, তাহা এই পৌষ মাসের ভারতী হইতেই দেখাইতেছি। ইহাতে "প্রত্যাবর্ত্তন" নামে একটি বর্দ্ধমান জেলার গল্পে আছে (৮৩০পৃঃ) "বাড়ী যেতে যোগা ডাকৃবে।" আমি বর্দ্ধমানে ৭ বৎসর ছিলাম তথাপি "যোগা ডাকা"র অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিলাম না।

চৌধুরী মহাশয়ের মতে "সর্ব্বনামের প্রথম পুরুষের দেহ হতে যে 'হা' কালবশে খসে পড়েছে—তাকে কুড়িয়ে নিয়ে জুড়ে দিলে, সে পুরুষের গায়ের জোর বাড়ে না—শুধু গা

ভারি হয়।" "যাহার" কথা "যার" হইলে বেশ বুঝিতে পারি "হা" খসিয়া পড়ায় শব্দটা সংক্ষিপ্ত হইয়াছে; কিন্তু "খাইলাম" স্থানে অন্য প্রদেশে যখন "খেলাম" বা "খেলেম" বলে তখন "খেলুম" বলিয়া চৌধুরী মহাশয় কোন অংশটা খসাইয়া থাকেন?

ক্রিয়ার মৌখিক রূপ ও সাধুরূপের পার্থক্য আর একটি আছে; সে সম্বন্ধে চৌধুরী মহাশয়ের মত ভাল করিয়া জানিতে চাই। তিনি "করিয়া"র সংক্ষিপ্ত রূপের দুইস্থানে দুইমূর্ত্তি দিয়াছেন "করে" ও "ক'রে"। ইহার মধ্যে কোনটা ঠিক? "করিতাম" ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ তিনি কিরূপে লিখিবেন? কর্ত্তুম্, কোত্তম্, ক'ত্তুম্, কোর্ত্তুম ইত্যাদি রূপের মধ্যে কোন রূপটা ঠিক?

যখন ছাপাখানা ছিল না, তখন লোকে স্বদেশের মৌখিক ভাষায় বহু পুঁথি লিখিয়াছিলেন। তখন লেখকের স্বদেশের লোকই সে সকল পুঁথি পড়িত, অনায়াসে বুঝিতেও পারিত। সেই সকল পুঁথির যেগুলি এখন ছাপা হইতেছে, তাহা প্রাদেশিকতার জন্য সর্ব্বত্র বোধগম্য হয় না। টীকা টিপ্পনী করিলেও বুঝা যায় না; কারণ বহু প্রাদেশিক শব্দ এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে যে সকল প্রাদেশিক শব্দের অর্থ টীকাকার বা সম্পাদকগণ বুঝিতে পারেন, তাহা সাধুভাষার প্রতিশব্দ দিয়া বুঝাইতে হয়। চৌধুরী মহাশয় কি মৌখিক ভাষার দোহাই দিয়া আবার প্রাদেশিকতা চালাইবার পক্ষপাতী?

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু "বর্ত্তমান বঙ্গভাষার প্রকৃতি" বা এইরূপ একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার নিজের ও স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষের একটা মত ছিল। তাহার ভাবটা এই "আমরা গৃহে অষ্টপ্রহর যে বস্ত্র পরিধান করি, বাহিরে যাইতে হইলে ঠিক সেই বস্ত্রে যাই না, তখন পোষাক পরিয়া বাহির হই। সেইরূপ সর্ব্বদা আমরা যে ভাষায় কথোপকথন করি, পুস্তক লিখিবার সময় ঠিক সেই ভাষা ব্যবহার করা উচিত নহে।" হয়ত চৌধুরী মহাশয় সাম্প্রদায়িদিগের এরূপ অভিমত হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। তথাপি তাঁহার দৃষ্টি এদিকে পড়িলে ভাল হয় ভাবিয়া কথাটা বলিলাম।

সংস্কৃত নাটকে যেমন এককালে শিক্ষিত লোকের ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃতজনের ভাষা প্রাকৃত ছিল, অধুনা বাঙ্গলা নাটকেও সেইরূপ দুই ভাষার আবির্ভাব কোন কোন নাটকে দেখিয়াছিলাম। কেহ কেহ বা কেবল মৌখিক ভাষাই নাটকে চালাইতেছিলেন। এইরূপ কোন নাটককারকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়াছিলেন "আমাদের নাটক লেখা দর্শক-দিগের জন্য। দর্শকেরা চাহে মাঝে মাঝে দলে দলে নাচগান, আমরা নাটকে তাই দিই। আর আমাদের দর্শকেরা কলিকাতার লোক তাই নাটকে দিই কলিকাতার ভাষা।"

শ্রীরাখালরাজ রায়।

পুরাতন প্রসঙ্গ

নূতন কল্প।

১৬ই ফাল্গুন, ১৩২২

আজ প্রাতে স্বনামধন্য নটরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। তিনি বলিলেন—"আপনার 'পুরাতন প্রসঙ্গ' পুস্তক প্রকাশিত হইবার*পর আমি উহা পাঠ করিয়াছিলাম। ৺মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আপনার নিকটে কলিকাতায় থিয়েটরের বনিয়াদ-পত্তনের যে ইতিহাস দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমার অনেক কথা মনে হইয়াছিল। একটা কথা ধরুন। 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের রচয়িতা বলিয়া পণ্ডিত রামনারায়ণ জনসাধারণে পরিচিত। আমার কিন্তু ছেলেবেলা থেকে শোনা আছে যে উক্ত নাটক-খানি পণ্ডিত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রচনা করিয়া দেন। এ বিষয়ের ভাল করিয়া অনুসন্ধান হওয়া উচিত। বইখানার মধ্যে কয়েকটা লক্ষণ দেখিয়া আমারও সন্দেহ হয় যে বোধ হয় উহা পণ্ডিত মহাশয়ের রচিত নহে। প্রথমতঃ দেখিবেন—বক্তৃতার ভাবাটা গুরুগম্ভীর

সংস্কৃত ধাঁজের ভাষা; তাঁহার অন্যান্য নাটকের ভাষা এতটা সংস্কৃত ঘেঁসা নহে। আবার দেখুন, তাঁহার অন্য কোনও নাটকে

ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি
দু চারি আদার কুচি

এই ধরণের কবিতা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। যিনি ও রকম কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত, তিনি যে একেবারেই আর ওপথ মাড়ালেন না, এ যেন কেমন কেমন ঠেকে। বিশেষতঃ তখনকার দিনে ও ধরণের কবিতা অত্যন্ত আদরনীয় ছিল। আমি জানি ভাল ভাল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বাঙ্গালা ভাষায় ঐ রকম সহজ সরস কবিতা রচনা করিয়া আনন্দবোধ করিতেন, দশের কাছে সমাদরও পাইতেন; বটতলার ছাপাখানায় সেই সকল কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হইত। ইদানীং অনেক জায়গায় আমি সেই সকল বইয়ের সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু কোথাও আর সেগুলি পাই না। আর একটা কথা,—'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকে পট-পরিবর্ত্তন নাই; পণ্ডিত মহাশয়ের অন্যান্য নাটকে কিন্তু ইংরাজি নাটকের পদ্ধতি অনুসারে গর্ভাঙ্কাদি বিভাগ আছে। তাই বলিতেছিলাম যে উক্ত নাটকের রচয়িতা বাস্তবিক পণ্ডিত মহাশয় কি না, সে বিষয়ে আপনারা একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ভাল হয়।"

আমি বলিলাম—"মহেন্দ্রবাবু যেখানে শেষ করিয়াছেন, আপনারা সেইখানে আরম্ভ করিয়াছেন; অর্দ্ধেন্দুশেখরের সঙ্গে যাঁহারা পব্‌লিক থিয়েটর প্রথম দাঁড় করাইলেন, আপনি তাঁহাদের অন্যতম। আপনি যদি আমাদের বাঙ্গালী ষ্টেজের গত চুয়াল্লিশ বৎসরের ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালীর থিয়েটরপর্ব্বের ইতিহাসটা বোধ হয় এক রকম দাঁড় করান যাইতে পারে। আপনার জীবদ্দশায় যদি সেই ইতিহাসের মালমসলা সঞ্চিত না হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীর একটা মস্ত সাহিত্যিক ক্ষতি হইবে। এতাবৎ যে সকল বিবরণ বাহির হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে অনেক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। আপনাকে জজের আসন গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। আপনি নিজের বক্তব্য বলিয়া যাউন; বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকা বিচার করিবেন। আগে আপনি আপনার বাল্য-জীবনের কথা কিছু বলুন।"

মুখ হইতে গুড়গুড়ির নলটি নামাইয়া বসু মহাশয় বলিলেন—"বঙ্গাব্দ ১২৬০এর ৬ই বৈশাখ রামনবমীর দিন আমি জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র বসু। আমাদের আদি বাসস্থান কলিকাতা নহে; আমরা ধল্‌চিতার বসু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। আমার প্রপিতামহ ধল্‌চিতা গ্রাম হইতে আসিয়া কলিকাতায় প্রথম পদার্পণ করেন। শোভাবাজারে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাটীর সম্মুখে আমাদের কলিকাতার পুরাতন বাটী ছিল; তখন গ্রে-ষ্ট্রীট রাস্তা ছিল না।

"ওরিয়েণ্টল্ সেমিনরিতে আমার পিতাঠাকুর বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সতীর্থ বন্ধু শম্ভুনাথ পণ্ডিত পরে হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন। মেট্রোপলিটান কলেজ যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অক্ষয় কীর্ত্তি, ওরিয়েণ্টল্ সেমিনরি তেমনি গৌরমোহন আঢ্য মহাশয়ের অক্ষয় কীর্ত্তি। শিক্ষাপ্রচার করিতে গিয়া যদি কোনও বাঙ্গালীর martyrdom হইয়া থাকে, তাহা গৌরমোহন আঢ্যের। নিম্নতম শ্রেণীতে ইংরাজি ভাষা শিখাইবার জন্য তিনি ফিরিঙ্গি শিক্ষক নিযুক্ত করিতেন। আমার মনে আছে একজন শিক্ষকের নাম ছিল স্মিথ, আর একজনের নাম ছিল ব্যালিস্। মাঝের শ্রেণীগুলিতে ভাল ভাল বাঙ্গালী শিক্ষক নিযুক্ত করা হইত। উপরের দিকে খাঁটি ইংরাজ ও ভাল বাঙ্গালী শিক্ষক রাখা হইত। এক হিসাবে ওরিয়েণ্টল্ সেমিনরি হিন্দু কলেজের বিপরীত দিকে চলিয়াছিল। হিন্দু কলেজ বিলাতী উচ্ছৃঙ্খলতার গৌরব করিত; ওরিয়েণ্টল্ সেমিনরি সামাজিক সংরক্ষণ-নীতির প্রশ্রয় দিয়া প্রাচ্য আদর্শকে তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না বলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া বসিয়াছিল। বাছাই করিয়া ভাল ইংরাজ শিক্ষক নিযুক্ত করিবার জন্য গৌরমোহন শ্রীরামপুরে

গিয়াছিলেন; নৌকাযোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিবার সময়ে জলমগ্ন হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন।



৺রামনারায়ণ তর্করত্ন

ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে কোনও প্রকার অর্থ-সাহায্য না লইয়া যে বাঙ্গালী হিন্দু-সন্তান উচ্ছৃঙ্খলতার দিনে বাঙ্গালীর ছেলেকে সংযত প্রাচ্য আদর্শে দীক্ষিত করিয়া উচ্চ ইংরাজি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনরি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার উন্নতির জন্য একান্তভাবে সচেষ্ট ছিলেন, তাঁহার এই শোকাবহ মৃত্যুকে martyrdom বলিব না ত কি বলিব? অথচ এই করুণ ব্যাপারটির বিষয় কয়জন কলিকাতাবাসী বাঙ্গালী অবগত আছেন? ওরিয়েণ্টল্ সেমিনরির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক কত গভীর তাহা আপনি শুনিলে বিস্মিত হইবেন। আমি ভূমিষ্ঠ হইবার পরে আঁতুড় ঘরে পিতা আমার মুখ দেখিলেন কি দিয়া জানেন? ওরিয়েণ্টাল সেমিনরিতে পঠদ্দশায় তিনি যে স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন, সেই সোনার মেডেল্‌টি সেই সদ্যোজাত শিশুটির চোখের সামনে ক্ষণেকের জন্য ধরিয়া তাহার কচি মুঠার ভিতরে অতি ধীরে তাহা রক্ষা করিলেন। মহাশয়, আজ আমার মাথায় একগাছি চুলও কালো নাই; প্রকৃতি দেবীর শুভ্র আশীর্ব্বাদ আমার শিরে অজস্র বর্ষিত হইয়াছে; এ জীবনে অনেক পুরস্কার দুই মুঠা ভরিয়া অর্জ্জন করিয়াছি; কিন্তু এই বিশ্বপ্রকৃতির সহিত সেই প্রথম পরিচয়ের নিশীথে আমার পিতৃদেবের সেই যে আশীর্ব্বাদ হিরণ্মমণ্ডিত হইয়া আমার অঙ্গ চুম্বন করিয়াছিল, তাহার সহিত বাবার ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনরিতে পঠদ্দশার একটি আনন্দস্মৃতি বিজড়িত হইয়া এই অতিক্ষুদ্র ব্যাপারটিকে আমার নিকটে মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। সমস্ত দেশের নিকট হইতে অনেক পুরস্কার দুই মুঠা ভরিয়া অর্জ্জন করিয়া আবার অকাতরে বর্জ্জন করিয়াছি; দেশের আশীর্ব্বাদ নতমস্তকে গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু সেই যৌবন প্রৌঢ়ত্বের বিজয়োল্লাসের মধ্যে বোধ হয় কি এক অভিশাপ ছিল, একটা অহমিকা ছিল, একটা মত্ততা ছিল, তাই ভোগের দিনে ভাল করিয়া ভোগ করিতে পারি নাই। আজ বার্দ্ধক্যের সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া



৺শম্ভুনাথ পণ্ডিত

প্রহর গণিতেছি, আর ভাবিতেছি—ভোগের চেয়ে ত্যাগ বড়, অর্জ্জনের চেয়ে বর্জ্জন পুণ্যতর। অনেক সুখ

দুঃখের স্মৃতি লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছি। কিন্তু আমার সমস্ত অর্জ্জিত পুরস্কারকে, অজস্রবর্ষিত আশীর্ব্বাদ-



৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ধারাকে, কর্ম্মের বিজয়োল্লাসকে ছাপাইয়া সেই স্বর্ণ-পদক আজ আমার জীবনকে স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

"আরও শুনিবেন? মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে যে গাভীর দুগ্ধ পান করিতাম, তাহা ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনরির পয়সা হইতে ক্রয় করা হইত। বাবা ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনরিতে শিক্ষক ছিলেন। কয়েক বৎসর তিনি হেড্ মাষ্টার হইয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে কয়েক জনের নাম করিতে পারি,—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee), চন্দ্রনাথ বসু, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, কৃষ্ণদাস পাল। কৃষ্ণদাস পাল যে বাবার ছাত্র ছিলেন, তাহা আমি ঘটনাচক্রে একদিন তাঁহারই মুখে শুনিলাম। তখন মলহার রাও গাইকবাড় ও কর্ণেল ফেয়ার ঘটিত ব্যাপার লইয়া দেশময় জল্পনা কল্পনা হইতেছিল; রেসিডেণ্ট্ সাহেবকে হীরকচূর্ণের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া খাওয়ান হইয়াছিল; এই অপরাধে গাইকবাড় অভিযুক্ত। কৃষ্ণদাস পাল 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় লিখিলেন—আমরা একশত গাইকবাড়কে হারাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু একজন নর্থব্রুককে হারাইতে প্রস্তুত নহি।—আমি এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া 'হীরক-চূর্ণ' নামে একখানি নাটক লিখিলাম; দুষ্টুমি করিয়া কিছু হাসি ঠাট্টা করিলাম। নাট্যসাহিত্যে এই নাটক-খানি আমার প্রথম রচনা। অক্রূর দত্তের বাড়ীর দেববাবু আমাকে একদিন কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের নিকটে লইয়া যান, তাঁহার সাহায্য আমার তখন অত্যন্ত আবশ্যক। আমার নাম শুনিয়া তাহার একটি বন্ধু বলিয়া উঠিলেন—'ওঃ ইনিই আপনাকে থিয়েটরের ষ্টেজে বিদ্রূপ করিয়াছেন।' তাকিয়ায় ঈষৎ হেলান দিয়া কৃষ্ণদাস পাল আমায় বলিলেন—'আপনার নাম অমৃতলাল বোস্? বাড়ী কোথায়?' আমি বিনীত ভাবে উত্তর দিলাম—'কম্বলিয়াটোলায়।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কম্বলিয়া-

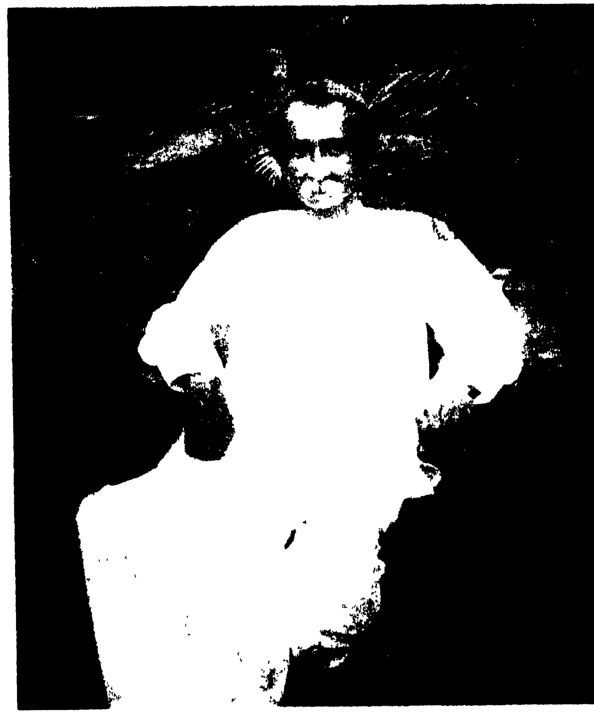


৺চন্দ্রনাথ বসু

টোলার বোস্? কৈলাসচন্দ্র বোস্ আপনার কেউ হতেন?' আমি বলিলাম—'আমি তাঁরই পুত্র।'…'তুমি

তাঁর ছেলে ?’ এই বলিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন—‘তুমি তাঁর ছেলে ? আমিও যে তাঁর ছেলের মত, আমি যে তাঁর ছাত্র ! তুমি ত আমার গুরু-ভাই হলে !’ এই বলিয়া তিনি সস্নেহে আমাকে কাছে বসাইয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ; যে কাজের জন্য আমি তাঁহার সাহায্য প্রার্থী হইয়াছিলাম, তাহা এমনভাবে সুসম্পন্ন করাইয়া দিলেন যে, তেমন কিছুতেই আশা করিতে পারি নাই ।

“খুব ছেলেবেলায় মনে পড়ে, বাবা সেক্ষপীয়র আবৃত্তি করিতেন ; আমি একবর্ণও বুঝিতাম না, কিন্তু মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সেই আবৃত্তি শুনিতাম । অনেকে তাঁহার আবৃত্তি শুনিতে আসিতেন ; ভবানীচরণ দত্ত রোজ আসিতেন । কবিতা আবৃত্তির দিকে এখনও আমার একটা প্রবল ঝোঁক আছে । অল্প বয়সে অনুকূল অবস্থার মধ্যে পতিত হওয়ার



স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়



৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর

দরুণ এই প্রবৃত্তি আমার মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল কি না, কে জানে ? ইংরাজি বা বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিবার অভ্যাস বাবার ছিল কি না আমি ঠিক বলিতে পারি না, তবে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যকে অনেক সময়ে তিনি অর্থসাহায্য করিতেন ; ‘ভাস্কর’ ও ‘রসরাজ’ অনেকদিন পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীতে আসিত । মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে বাবা ওরিয়েণ্টল্ সেমিনরির শিক্ষকের পদত্যাগ করিয়া ম্যাকেঞ্জি লায়াল্ কোম্পানীর এজেন্সি করিয়া কিছু বেশী পয়সা রোজগার করিয়াছিলেন । তখনও তাঁহার পড়াশুনার অভ্যাস খুব ছিল। দ্বিপ্রহরে আপিসের কাজ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি প্রত্যহ মেট্‌কাফ্ হলে গিয়া পড়িতে বসিতেন । আমাদের পাড়ার ছোট ছোট ছেলেদের লেখাপড়ার সুবিধার জন্য তিনি পূর্ব্বেই একটি বিদ্যালয়

স্থাপিত করেন। এই স্কুল হইতে ছেলেরা প্রথম এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেয় ১৮৬৪ সালে। এখানে যেমন সংস্কৃত পড়াইবার ব্যবস্থা ছিল, সংস্কৃত কলেজ ব্যতীত অন্য কোথাও আর সে রকম ছিল না। প্রথম শ্রেণীতে রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব পড়া শেষ হইয়া যাইত। ইদানীং সর্ব্বজনবিদিত অজিত ন্যায়রত্ন মহাশয় তখন এই বিদ্যালয়ের উপরের ক্লাসে পড়াইতেন। আপনাদের রিপন কলেজের ভূতপূর্ব্ব পণ্ডিত রামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পিতা রামগোপাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে এখানে আমি সাহিত্য ও ব্যাকরণ পড়িয়াছি। শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায়ের পিতা এখানে অনেক দিন অধ্যাপনা করিয়াছেন। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়ে আমাদের পাড়ার বিশ্বম্ভর মৈত্র মহাশয় যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনরির কয়েক জন ভাল ভাল শিক্ষককে সপ্তাহে দু' এক ঘণ্টা করিয়া এখানে আনাইয়া এখানকার ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; আমার মনে আছে সেমিনরির শিক্ষক থার্লো সাহেব আমাদিগকে মাঝে মাঝে অঙ্ক কসাইতেন। ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন—হেন্‌রি হাইড্। তিনি প্রত্যহ দমদমা হইতে জুড়িগাড়ি হাঁকাইয়া ইস্কুলে আসিতেন। তাঁহার মাসিক বেতন ছিল চল্লিশ টাকা মাত্র!



৺কৃষ্ণদাস পাল

"ওরিয়েণ্টাল সেমিনরি হইতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। আমার পরীক্ষা দিবার কথা ১৮৬৬ সালে, কিন্তু তখন আমার বয়স ১৩ বৎসর মাত্র; সুতরাং দুই বৎসর অপেক্ষা করিয়া তবে আমি পরীক্ষা দিতে পাইলাম। আমাদের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী; ইতিহাস পড়াইতেন চন্দ্রনাথ বসু; অঙ্ক কসাইতেন বেণীমাধব দে; ইংরাজি সাহিত্য পড়াইতেন ফ্রেড্রিক্ পেনি। দুইটি পণ্ডিত ছিলেন, খাঁটি সেকেলে টুলো পণ্ডিত,—একজনের নাম গণেশ, অপরটির নাম সরস্বতী। সরস্বতী পণ্ডিত মহাশয় আমাদের বাড়ীতে বসিয়া এক খোরা ফলারের সঙ্গে একশত আম অবলীলাক্রমে খাইয়া ফেলিতেন। কিন্তু ছেলেরা তাঁহাদের নামে তখন ছড়া তৈয়ার করে নাই। কিছু পূর্ব্বে হিন্দুস্কুলের ছেলেরা তাহাদের শিক্ষকদের নামে যে ছড়া করিয়াছিল তাহা আমাদের মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল—

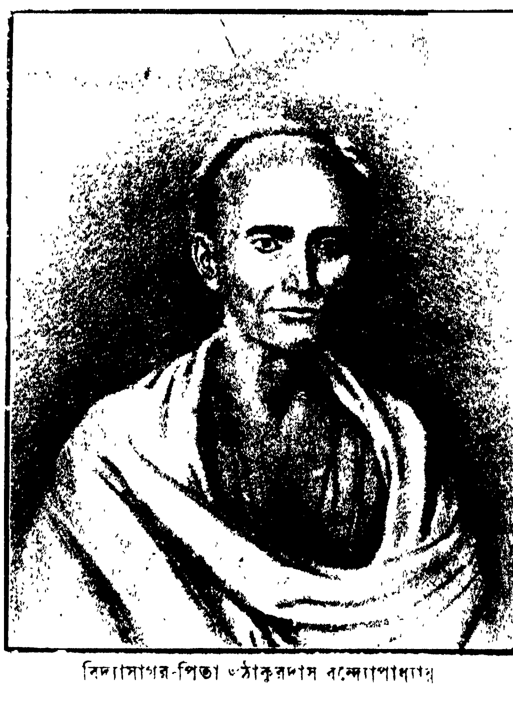
"গুড্‌ সাহেবের লম্বা ঠ্যাং,
তার নীচে ঈশ্বর ব্যাং।
ঈশ্বর ব্যাং বড় দানা,
তার নীচে গুপে কানা।—" ইত্যাদি।

"এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। তখন যত বাঙ্গালা বই প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই আমি পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। মদনমোহন, তারাশঙ্কর, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, মাইকেল ত সব ছেলেই পড়িত। বটতলার বিখ্যাত



৺লোকনাথ মৈত্র

পুস্তকবিক্রেতা বেণীমাধব দের পুত্র লালবিহারী আমার সহপাঠী ছিল। তাহাদের দোকানে যত উপন্যাস নাটক ছিল, এক এক খানি করিয়া বোধ হয় সবগুলিই পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। নাটকের প্রতি আমার বিশেষ টান ছিল। লালবিহারী একদিন দোকান হইতে আমাকে একখানি নাটক পাঠাইয়া দিল,—তাহার নাম 'আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক।' ভাবিলাম না জানি কি রহস্যই ইহার মধ্যে আছে। Preparatory class-এর মার্শমান পাঠ করিয়া কখন যে ওখানা পড়িতে পাইব, তাহার জন্য অস্থির হইয়া রহিলাম! পড়িয়া দেখিলাম,—কথোপকথনচ্ছলে সমস্ত পিনাল্ কোড্খানা নাটকে পরিণত করিবার চেষ্টা! বুঝিতে পারিলাম ডাক্তার যদুগোপালের 'ধাত্রীশিক্ষা'র ধরণটুকুর অনুকরণের ব্যর্থ প্রয়াসের ফলে লেখকের এই বিষম বিড়ম্বনা। Dialogueএ কিছু লেখা হইলেই তাহা নাটক হইল, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া উকিল-গ্রন্থকার এই নাটক লিখিয়া ফেলিয়াছেন। এক এক খানি নাটক খুব উৎরাইয়া যাইত। "ফলারে নাটক" নামক একখানি প্রহসন পাইয়াছিলাম; রচনাটি অতি সুন্দর। আর কিন্তু কোথাও সে বই দেখিতে পাই না। বিবাহের দিন উপবাস করিয়া থাকিতে হয়; লালবিহারীর দোকান হইতে নাটক চাহিয়া পাঠাইলাম। দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' সেই প্রথম আমার হাতে পড়িল। তখনকার দিনে দীনবন্ধুর নাটকের জন্য আমরা সকলে উদ্গ্রীব হইয়া থাকিতাম; বঙ্কিমের পুস্তকের জন্য তখনও জন-সাধারণের সে রকম উৎকণ্ঠা হইত না। যখন বঙ্গদর্শনে 'বিষবৃক্ষ' ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতে লাগিল তখন হইতে বঙ্কিম সকলের হৃদয় জুড়িয়া বসিলেন; তাহার পূর্ব্বে সকলে



বিদ্যাসাগর-পিতা ৺ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

খোঁজ করিত,—দীনবন্ধুর কোনও নূতন নাটক বাহির হইল কি না। বিবাহের দিন লীলাবতী আগাগোড়া পাঠ করিয়া ভাবিলাম,—'তাই ত, পত্নীটি



নবীনচন্দ্র সেন

আমার কি রকম হবেন! সারদাসুন্দরীর মত হলেই ভাল হয়; আমার ত ঝোঁক লীলাবতীর চেয়ে সারদাসুন্দরীর দিকে। নিশ্চয়ই সারদাসুন্দরীর মত হবে। যদি না হয়! লীলাবতীও মন্দ নয়, কিন্তু……।' বিবাহ হইয়া গেল। দেখিলাম আমার পত্নীটি সারদাসুন্দরীও নন, লীলাবতীও নন,…একটি চেলির পুঁটুলি! (Chronicler মহাশয় এইখানে একটু সাবধান না হইলে আমার বিপদের সম্ভাবনা! আমি একথাগুলি কিছু ভয়ে ভয়ে বলি!)

"পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারি পড়িবার জন্য মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিলাম। ছেলেবেলা থেকেই আমি ডাক্তারির ভাণ করিয়া খেলা করিতাম; কলাগাছ কাটিয়া amputation-এর সথ মিটাইতাম; বেলের আটা পচিয়া পোকা হইলে জোঁক বসান'র অভিনয় করিতাম; বেলের আটা সেবন করাইয়া বাস্তবিকই কোনও কোনও রোগীকে আরাম করিতাম! আবার ম্যুনিসিপ্যালিটির রাস্তার পরিদর্শক সাহেব সাজিয়া হ্যাট পরিতাম। ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনরিতে পড়িবার সময়েই ব্লাণ্ডফোর্ড সাহেবের রসায়ন সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিতে যাইতাম। মেডিক্যাল কলেজে আমার সহাধ্যায়িগণের মধ্যে ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর, তারিণীচরণ বসু, ৺ মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। ম্যাক্‌নামারা সাহেব যখন রসায়ন পড়াইতেন, স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর এইচ উড্রো মধ্যে মধ্যে সেই বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন; ঘটনাচক্রে প্রায়ই তিনি আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিতেন। তাঁহাকে দেখিয়াই আমার মনে পড়িত আমাদের শ্যামবাজারের ইস্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া তিনি যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'ছেটা মোমাছি কেটা পা (ছটা মোমাছির

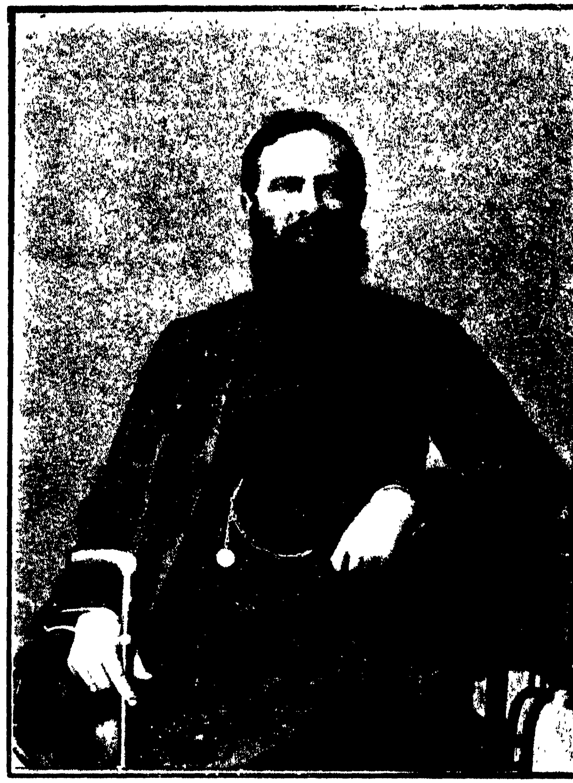


৺বলদেব পালিত

কটা পা)?' তাঁহার নাম H. Woodrow ছিল; ছেলেরা বলিত—উড্রো। তিনি লম্বাসুর করিয়া

বলিতেন,—'আমি হুড্রো নই, এইচ, উড্রো' ; —শেষ ওকারের সুরটা অনেকদূর টানিয়া লইতেন।

"মোটের উপর দুই বৎসর কলেজে অধ্যয়ন করিলাম। মধ্যে মধ্যে কাশীতে ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া থাকিতাম ; তিনি আমাকে তাঁহার নিজের ছেলের মত স্নেহ করিতেন। তখন তাঁহার নিজের সন্তান হয় নাই। শেষে একেবারে অ্যালোপ্যাথির পন্থা পরিত্যাগ করিয়া হোমিওপ্যাথি চর্চ্চা করিবার জন্য কাশীতে লোকনাথ বাবুর বাটীতে রহিলাম। হোমিওপ্যাথির সঙ্গে আমার সম্পর্ক বাল্যকাল হইতেই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। এগার বৎসর বয়সের সময় আমাদের বাটীর সন্নিকটস্থ একটি বৃক্ষ হইতে পড়িয়া যাওয়ায় আমার একটি হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। লোকনাথ বাবু আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া



৺গুরুপ্রসাদ সেন



৺কেশবচন্দ্র সেন

দেখিলেন যে হাড় fracture হইয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ আমার বাবার অনুমতি লইয়া তিনি প্রসিদ্ধ হোমিও-প্যাথিক ডাক্তার বেরিণিকে লইয়া আসেন। আমার ভাঙ্গা হাত লইয়া বোধ হয় কলিকাতায় হোমিওপ্যাথির প্রথম Surgical case হয়। যেদিন প্রথম বন্ধন মোচন করিয়া একটা পাৎলা bandage বাঁধিয়া দেওয়া হইল, সেদিন সেই ব্যাণ্ডেজ খোলা দেখিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ও ডাক্তার রাজেন দত্ত আসিয়াছিলেন। একটা হাসির কথা আমার মনে আছে। খোঁজ হইতেছিল, পাৎলা paste board কোথায় পাওয়া যায়! একজন বলিলেন, 'সেক্ষপীয়রের মলাট ছিঁড়িয়া লইলে হয় না?' ডাক্তার সাহেব হাসিয়া বলিলেন—'Or the cover of the Bible may do!' খৃষ্টীয় ধর্ম্মে বেরিণি সাহেবের শ্রদ্ধা ছিল না। তখন জানিতাম না যে, যে ভাঙ্গা হাত হোমিওপ্যাথিক Surgery তে জোড়া লাগিল, সেই হাত ভবিষ্যতে হোমিওপ্যাথির সেবায় নিযুক্ত হইবে। লোকনাথ বাবু জজ ব্যাক্স্ আয়রণসাইডের স্ত্রীকে বিষম আমাশয় রোগ

হইতে মুক্ত করিয়া কাশীতে হোমিওপ্যাথিকে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে পারিয়াছিলেন। জজ সাহেব নিজে হোমিও-প্যাথ্ হইলেন। লোকনাথ বাবু তৃতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইলেন। তাঁহার একটি ছেলে সুরেন্দ্র সম্প্রতি বিলাত হইতে ডিগ্রী লইয়া আসিয়াছে; আর একটি ছেলে দ্বিজেন্দ্র মেও হাঁসপাতালের Resident Surgeon। ডাক্তার লোকনাথ বাবুর সাধ্বী স্ত্রী কচি ছেলেগুলিকে লইয়া বিধবা হইলেন; কত কষ্টে যে তাহাদিগকে মানুষ করিলেন, তাহা ভগবান জানেন। আমার জীবনপ্রবাহ বক্রগতিতে এতাবৎ চলিয়া আসিয়াছে; যে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ধারাটি বারাণসী তীর্থে লোকনাথ মৈত্র মহাশয়ের চরণতল ধৌত করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহার সার্থকতায় আমার জীবন ধন্য হইয়া গিয়াছে। অনেক দিন পরে তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া আমি লিখিয়াছিলাম—

"কোথা তাত লোকনাথ, দেবপদে প্রণিপাত,
কত কথা ওঠে মনে তোমার স্মরণে।
কত স্নেহ ভালবাসা, কত সুখ কত আশা,
পেয়েছি পায়ের পাশে কিশোর জীবনে॥

* * * *

এমনি নিদাঘ নিশি, ছাদেতে সকলে মিশি
পাশাপাশি পালঙ্কেতে করি জাগরণ।
কত গল্প বহুতর, মিথ্যা দ্বন্দ্ব মনোহর,
গ্রহগতি হেরি, করি তারকাগণন॥
তোমার ইঙ্গিতে রাতে, সেই পাচিকার সাথে,
রন্ধন বলিয়া মন্দ কলহরোপণ।
পিসীমারে মনসাধে, কৃপণতা অপবাদে
কাঁদায়ে, সেধেছি পরে ধরিয়ে চরণ॥

* * * *

ইংরাজ জজের জায়া, ছাড়িতে ছাড়িতে কায়া,
তব চিকিৎসায় পায় প্রাণ পুনরায়।
পুরস্কার দিতে এর, আয়রণ্-সাইডের,
কোমল কৃতজ্ঞ মন পুলকেতে চায়॥
মহাপ্রাণ লোকনাথ, নিজে না পাতিয়া হাত,
দীন দুঃখী তরে চায় চিকিৎসা-আলয়।
হানিমান্ জয় জয়, ভারতে কাশীতে হয়,
হোমোপ্যাথি হস্পিটাল্ প্রথমে উদয়॥



৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

(কেশবসেনের গৃহে সংকীর্ত্তন)

কাশীতে অবস্থানকালে ডিউক্ অভ্ এডিনবরার দর্শনলাভ আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। তখনও আমি কলিকাতা মেডিক্যাল্ কলেজের সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন করি নাই। একটি বিশালকায় হস্তীপৃষ্ঠে লর্ড মেয়ো ও ডিউক অভ্ এডিনবরা পাশাপাশি বসিয়াছিলেন। সেই শালপ্রাংশু মহাভুজ লর্ড মেয়োর করুণ পরিণাম স্মরণ করিলে এখনও মনে বেদনা বোধ করি।

"বিদ্যাসাগর তাঁহার পিতৃদেবকে কাশীতে রাখিতে গিয়াছিলেন। লোকনাথ বাবুর বাসাতেই তিনি উঠিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই লোকনাথ বাবুকে হোমিওপ্যাথি শিখিতে বলেন। লোকনাথ বাবু যথা-সাধ্য তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তখন গঙ্গার উপরে সেতু নির্ম্মিত হয় নাই। ভোর রাত্রে নৌকাযোগে নদী

পার করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে রাজঘাট ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। সে কার্য্যের ভার আমারই উপর পড়িল। ঘুমাইয়া পড়িলে চলিবে না; যদি ভোর রাত্রে জাগিতে না পারি? স্থির করিলাম,—ঘুমাইব না; সতীর্থ বন্ধু মধুসূদন লাহিড়ীর ইঙ্গিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ধরিয়া বসিলাম—গল্প বলিতে হইবে। তিনি বলিলেন,—'গল্প শুন্‌বি? কি রকম গল্প বল্‌ব,—দু-মিনিটের মত, না আধ ঘণ্টার মত?' ছোট বড় বিচিত্র রূপকথায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত নিশাযাপন করিলাম। গভীর নিশীথে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—'ওরে চুড়ী কিন্‌তে হবে।' এত রাত্রে দোকানদারকে পাওয়া যাবে কেমন করিয়া? তিনি বলিলেন—'পেতেই হবে। কাশীতে এসে চুড়ী না নিয়ে ফিরে যাব কি করে?' সেই রাত্রিতে চুড়ী কিনিয়া আনা হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় আবার গল্প বলিতে লাগিলেন। শেষ রাত্রে তাঁহাকে রেল ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিলাম। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সে রাত্রি ভুলিব না।

"কবি নবীনচন্দ্র সেনের সহিত এই সময়ে কাশীতে আমার প্রথম আলাপ হয়। নবীন তখনও কোনও বই লিখিয়া মুদ্রিত করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই। ছোট ছোট কবিতা লিখিয়া বন্ধুবান্ধবকে শুনাইত। লোকনাথ বাবু জানিতেন নবীন একজন ভাল কবি। তখন কাশীতে 'বুড়্‌য়ামঙ্গল'-এর খুব ধুম; হোলির পরে মঙ্গলবারে হইত। নদীর উপরে নাচ, গান, যাত্রা; কাশী-নরেশের সহিত বিজিয়ানাগ্রামের রাজার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইত। লোকনাথ বাবু বলিলেন,—'নবীন, বুড়্‌য়ামঙ্গল দেখ্‌তে যাচ্ছ, পদ্যে বর্ণনা কর্‌তে হবে।' কালী কলম কাগজ ও একটি বোতল মদ লইয়া: নবীন ও আমি নৌকায় উঠিলাম। বিশ্বনাথের চরণতলে আমি মদ খাইতে শিখিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পরে নবীনকে বলিলাম,—'লিখ্‌বে ত লেখ, নইলে মদ দোব না।' নবীন এক নিশ্বাসে বুড়্‌য়ামঙ্গল লিখিয়া ফেলিল।… অনেক দিন পরে নবীন যখন Personal Assistant to the Commisioner of Chittagong (কমিশনার ছিলেন গ্রীন সাহেব) আমি তাহার একটি পত্রের উত্তরে কাশীর কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম—

"কতদিন সেই দিন হয় কি স্মরণ।
কাশীতে নিশিতে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ॥
বুড়্‌য়ামঙ্গল মেলা মহা ধূমধাম।
বসন্ত-বাহারে সাজে বারাণসী ধাম॥
জলেতে দোকানপাট জলেতে বাগান।
দুলে দুলে চলে জলে শত জলযান॥
তীরে দীপ, নীরে দীপ, দীপ তরী' পরে।
লক্ষ দীপ দেখে চক্ষু সলিল ভিতরে॥
তরণী তরুণী-রূপে উজল বিমল।
যামিনী কামিনী দীপে আমোদে বিহ্বল॥
নাচে রম্ভা মেনকার অনুজা সকল।
তরঙ্গে উছলে জলে লাবণ্য তরল॥
কি স্বর-লহর তোলে ভাসায়ে গগন।
অঙ্গ টলে তরী টলে সঙ্গে টলে মন॥
আমি ধরে' বসিলাম তোমারে নৌকায়।
হইবে বর্ণিতে মেলা কমকবিতায়॥
নন্দনে রচিলে বসি মকরকেতন।
হ'ত কি না হ'ত গীত তোমার মতন॥

"নবীনচন্দ্র বেশী দিন কাশীতে থাকিতে পারিলেন না, কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া গেলেন। বাগ্‌বাজারের অভয়চন্দ্র মল্লিক কাশীতে আমাদের বাড়ীতে উঠিলেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানির কর্ড্‌ লাইন তখন খোলা হইয়াছে; তিনি সেই রেলের জন্য জমি আগাগোড়া ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন,—তিনি Land Acquisition Deputy Collector ছিলেন। লোকনাথ বাবুর সঙ্গে তাঁহার শ্বশুর-জামাই সম্পর্ক পাতান ছিল; লোকনাথ বাবুকে বরাবর জামাই ষষ্ঠীর তত্ত্ব করিতেন। কাশীতে আমার প্রতি তিনি যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করিলেন। কিছুকাল পরে কলিকাতায় তিনি আমার সন্ধান পাইয়া আমাকে তাঁহার বাড়ীতে ডাকাইয়া লইয়া আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ডেপুটি করিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অদৃষ্টে হাকিমি

না থাকিলে মল্লিক মহাশয় কি করিতে পারেন? গভর্মেণ্টের কাছে তাঁহার প্রতিপত্তি খুব বেশী; তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানির বড় সাহেবেরা জমি সংক্রান্ত গোলমাল উঠিলেই তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ করিত। আমি কিন্তু তখন ভুবন নিয়োগীর বাড়ীতে নূতন থিয়েটরে আথ্ড়াই দিতে যাইতাম। ভুবন নিয়োগীর বাড়ী যাইতে হইলে অভয় বাবুর বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা দিয়া গেলেই শীঘ্র যাওয়া যায়; কিন্তু পাছে তিনি আমাকে ধরিয়া ডেপুটি করিয়া দেন, এই ভয়ে একটা পাশের সরু গলি দিয়া লুকাইয়া থিয়েটর করিতে যাইতাম।…অভয়বাবুর পৌত্র ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক এখন লোকসমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

এই সময়ে সর্ব্বত্রই ডেঙ্গুজ্বরের আবির্ভাব হইল। কাশীতে আমাদের বাসায় চাকর বামুন সকলেই জ্বরে পড়িল। কোনও রকম করিয়া একটু জলসাবু তৈয়ার করিয়া রোগীদিগের পথ্য ও আমার নিজের আহার সারিয়া লইতে হইত। ১৮৭২ সালের গোড়ায় লোকনাথ বাবুর চিঠি লইয়া কাশী পরিত্যাগ করিয়া বাঁকিপুরে ডাক্তারি করিতে গেলাম। বলদেব পালিত মহাশয়ের বাসায় উঠিলাম। বাঁকিপুরেও তখন অনেকে ডেঙ্গুজ্বরে পীড়িত; উকিল গুরুপ্রসাদ সেনকে আমি চিকিৎসা করিয়াছিলাম। দুইদিনে আমার চারটি টাকা রোজগার হইল। ডাক্তার বসন্ত দত্ত আমার মুরুব্বি হইলেন। বলদেব বাবুর বাসায় কিছুদিন অবস্থানের পর একটা স্বতন্ত্র বাড়ীতে বসন্ত বাবুর সঙ্গে আমি থাকিবার ব্যবস্থা করিলাম। তিনি আমাকে হাতে ধরিয়া কার্য্যে ব্রতী করিয়া দিলেন; যাহাতে আমার উন্নতি হয় কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কেশবচন্দ্র সেন বিলাত হইতে আসিয়া বাঁকিপুরে ছয় সাত দিন আমাদের বাসায় ছিলেন। সহর খুব সরগরম হইয়া উঠিল। একটা প্রকাণ্ড সভায় কেশব বাবু বক্তৃতা করিলেন। আমি বক্তার কাছে বসিয়া সমস্তটা লিখিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম। কলেজের একজন ইংরাজ অধ্যাপক সভাপতি হইয়াছিলেন। অনেক বাগ্মীর বক্তৃতায় এ জীবনে মুগ্ধ হইয়াছি; কেশব বাবুর বক্তৃতা grand, divine, inspired;—আর কাহারও সম্বন্ধে আমি এমন কথা বলিতে প্রস্তুত নই। পহেলা জানুয়ারিতে তিনি যখন কলিকাতা টাউন হলে প্রতি বৎসর বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইতেন, দেশী বিদেশী সকল শ্রোতাই বিস্ময়ে ও পুলকে অভিভূত হইত; বক্তৃতার মধ্যে তিনি যখন দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী হেলাইয়া There, my God বলিয়া উঠিতেন, তখন সেই তর্জ্জনী সঙ্কেতাভিমুখে আমাদের মুখ ফিরাইতে হইত, সহসা মনে হইত যেন ঐ খানে তাকাইলেই ঈশ্বরকে আমরাও দেখিতে পাইব। দেখুন, পরমহংস ঠাকুর একদিন একজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বক্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আচ্ছা, তুমি যে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াও, তোমার চাপ্রাস্ আছে? ব্রাহ্মণ বলিলেন—'ঠাকুর, চাপ্রাস বুঝ্তে পারলুম না; চাপ্রাস কি? আমার চাপ্রাস্ নেই।' ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিলেন,—'তোমার চাপ্রাস্ নেই? তা' হ'লে লোকে তোমার কথা মান্বে কেন? দেখ, একটা গাঁয়ে একটা পুকুর ছিল; গাঁয়ের সকলেই সেই পুকুরের জল খেতো; কিন্তু সেই পুকুরের পাড়টা দুষ্টু লোকেরা ময়লা কর্ত, কারও বারণ শুন্ত না। একদিন গাঁয়ের সকলে মিলে হাকিমের কাছে দর্খাস্ত করলে। কিছুদিন পরে একটা চাপ্রাশ-পরা লোক এসে পুকুরের পাড়ের ওপর একটা গাছে হাকিমের আদেশ লট্‌কে দিয়ে গেল। তার পরে আর কেউ পুকুরের পাড় ময়লা করে নি। তা'র চাপ্রাস ছিল, তাই তা'র কথা মান্লে। তোমার চাপ্রাস্ না থাক্‌লে তোমার কথা লোকে মান্বে কেন?'…আমার মনে হয় কেশব সেনের চাপ্রাস ছিল।

"কেশব বাবু তখনকার যুবকদিগের আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার দেখা দেখি অনেক ছোক্‌রা চস্‌মা পরিতে আরম্ভ করিল। কেশব বাবু চসমা নাকে দিয়া

ঘুমাইতেন। একদিন আমি তাঁকে বলিলাম—চস্‌মা চোখে না থাক্‌লে কি আপনি স্বপ্নও দেখ্‌তে পান না? তিনি হাসিয়া উঠিলেন। একদিন বসন্তবাবু ও কেশব বাবু বাসা হইতে বাহির হইয়া যাইবার কিছু পরে আমি বলদেব বাবুর বাড়ীতে চলিয়া গেলাম। যাইবার সময় চাকরকে বলিয়া গেলাম আজ আর বাসায় ফিরিব না।' সন্ধ্যার পর তাঁরা দুজনে আসিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। কেশববাবু বলিলেন—'আজ ফূর্ত্তি করে এত খাবার কিনে এনে চাকরের কাছে শুনি যে তুমি আজ আর বাসায় ফির্‌বে না। আমরা ভাব্‌লুম তাও কি হয়? এ খাবার খাবে কে?'—এখনও যখনই আমার মনে হয় যে আমাকে ছাড়া কেশববাবুর জীবনের একটি দিনের আনন্দ অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছিল, তখনই আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

"বলদেব বাবু সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিলেন। সংস্কৃত ছন্দে তিনি সুন্দর শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। একটি শ্লোক আমার মনে পড়িতেছে,—

"সমাচ্ছন্নাকাশে জীমূতজালে।
জ্বলে স্বর্ণলেখা তড়িন্মাল্যভালে॥
হৃদে তেমতি শ্রীমতী রাধিকার
প্রিয়প্রাপনাশা হরে অন্ধকার॥"

"এই ছন্দে তিনি ভর্তৃহরি রচনা করিয়া ফেলিলেন। তিনি সাহিত্যরসিক ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সঙ্গলাভ আমার বেশী দিন ঘটিল না।

"১৮৭২ সালের শেষাশেষি বাঁকিপুর পরিত্যাগ করিলাম।

"এইবারে আমার থিয়েটর জীবনের কথা আসিয়া পড়িবে। কাশীতে অবস্থানকালে দুইটি ভদ্রলোকের সংশ্রবে আসিয়াছিলাম, উপেন্দ্রনাথ দাস তাঁহাদের অন্যতম। নানা কারণে তিনি তখন তাঁহার পিতা শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের কোপ দৃষ্টিতে নিপতিত হইয়া লোকনাথ বাবুর বাসায় আসিলেন। আজ তাঁহার নামটুকু উল্লেখ করিলাম মাত্র। আমার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে আবার আপনি তাঁহার দেখা পাইবেন। আর একজনের নাম আমি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে স্মরণ করিতেছি,—রাজচন্দ্র সান্যাল। তিনি তখন কুইন্‌স্ কলেজের লাইব্রেরিয়ান্। প্রিন্সিপ্যাল গ্রিফিৎস্ সাহেবের স্বরচিত বেণুবনের কুঞ্জবীথিকায় সন্ধ্যায় একাকী তাঁহার পাদচারণা আমার মানসপটে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যহ সেই বেণুকুঞ্জের মধ্যে উপবেশন করিয়া গ্রিফিৎস্ সাহেব রামায়ণ ইংরাজি পদ্যে অনুবাদ করিতেন। রাজচন্দ্রবাবু লাইব্রেরি হইতে ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের ইতিহাস, নাটক উপন্যাস ইত্যাদি অনেক বিষয় পড়িবার সুযোগ করিয়া আমাকে দিয়াছিলেন। ইংরাজি পড়ার নেশা আমার খুব জমিয়া উঠিল। আজ শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে সন্যাল মহাশয়ের কথা স্মরণ করিতেছি। জীবনে যদি আমি কিছুমাত্র কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকি, তজ্জন্য সান্যাল মহাশয়ের নিকটে আমি অনেক অংশে ঋণী। আজ তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া আমি বিদায় লইলাম।"

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

শিবের গাজন

পাগ্‌লা শিবের বছুরে গাজনে
বেজেছে ঢাক,
কাল হ'বে দেনা-পাওনার কথা
আজ্‌কে থাক্।
আগুন জালিয়ে সন্ন্যাসী সবে
ঐ 'ফুল খেলে' বোম্ বোম্ রবে ;
পিঠ-মোড়া বাঁধা দেয় ওরা বুঝি
চড়কে পাক।
থেকে-থেকে-থেকে বাজে ঝেঁকে-ঝেঁকে
গাজুনে ঢাক।

বোম্ বোম্ বোমে লেগেছে রে ঐ
চড়ক পাক ;
বন্ বন্ ঘুরে অনন্ত জুড়ে'
কালের চাক!
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারাদল
লুটিয়া লুটিয়া ঘুরে নভ-তল,
আগুন ফুল্কি উল্কা উড়ায়ে
লাখের লাখ।
রশি ছিঁড়ে ছুটে' ধূমকেতু দেয়
পাগুলে পাক্।

মাঝখানে তার রুদ্র পুরুষ
কে নাচে ওই!
মরা বছরের বুকের উপর
তাথৈয়া-থৈ!
চরণে ধ্বনিছে প্রলয় ছন্দ,
নিমীল নয়নে সৃজনানন্দ ;
ধবল অঙ্গে বিভল ভঙ্গী
মরণজয়ী—
ডম্বরু-ডিমি মিশায়ে বিষাণে
কে নাচে ওই!

মহাসম্ভ্রমে ইন্দ্র রয়েছে
জুড়িয়া হাত।
দিক্‌পালগণ করিছে সভয়ে
নয়নপাত।
আলোক-ছায়ার বাঘছাল, ওরে,
খসিয়া লুটায় বনে-প্রান্তরে ;
সিন্ধু-ফণায় মরণ ফেনায়
জীবন সাথ—
নাচে শিব—নাচে রুদ্র, নাচে রে
বিশ্বনাথ!

নাচে শিব—নাচে সুন্দর, নাচে
রুদ্র কাল ;
জটায় গঙ্গা, ভালে শশী, গলে
অস্থিমাল।
সাথে নেচে ফিরে আদি ও অন্ত,
ঘোরে দিক্ ওরে ঘোরে দিগন্ত,
সুখে দুখে ঠুকে' ঘুরপাকে বাজে
রুদ্রতাল—
উছলে গঙ্গা, হাসে শশী—দোলে
অস্থিমাল।

জড়-জীব তাঁর চড়কে ঘুরিয়া
হ'ল 'বিভুল' ;
তথাপি পড়েনা পাগল শিবের
মাথার ফুল।
বল্ সন্ন্যাসী মুখ-ফুটে' বল্—
কে কোথা ডুবিয়া খেয়েছিস্ জল ?
রক্ত নয়ন ডুবিছে তপন
না পেয়ে কূল।
দিন যায়—কেন পড়েনা শিবের—
মাথার ফুল ?

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

নববধূ

(গল্প)

(১)

কাত্যায়নী পিতামাতার একমাত্র কন্যা,—অত্যন্ত আদরিণী। কিন্তু সে আট বৎসরে পড়িতে না পড়িতে বিশ্বজননী তাহার পিতা রামগোবিন্দকে কোলে টানিয়া লইলেন।

ক্ষুদ্র পুরন্দরপুর গ্রামখানি নদীবর্জ্জিত স্থান; গ্রামের নিকটেও কোন বিল খাল ছিল না, গ্রামের মধ্যে পুষ্করিণীর আকার বিশিষ্ট একটা নরককুণ্ড ছিল, পীতবর্ণ তাহার জল, গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে সেই জলে গ্রাম্য মহিষগুলা সর্ব্বাঙ্গ ডুবাইয়া বসিয়া থাকিত, এবং মহা-সমারোহে কাদা মাখিত। প্রত্যহ মধ্যাহ্নে ক্ষারসিক্ত ময়লা কাপড় কাচিবার শব্দে তাহার চারিপাড় প্রতি-ধ্বনিত হইত। এবং সেই জলে গ্রামবাসীদের সকল প্রয়োজন নির্ব্বিচারে সম্পন্ন হইত। সেই জলে না কাচিলে গ্রামের শুচি-বাতিক-গ্রস্তা রমণীগণের লেপ কাঁথা পবিত্র হইত না।—একবার বসন্তের প্রারম্ভে এই গ্রামে বিসূচিকা দেখা দিল, ; গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জল নাই, লোকনাথ ডাক্তারের ডিস্পেন্সারী বিতাড়িত কম্পাউণ্ডার বিপিন দত্ত ভিন্ন অন্য ডাক্তার নাই! সুতরাং কয়েকদিনের মধ্যেই রোগ সংক্রামক হইয়া উঠিল, এবং বঙ্গের অধিকাংশ পল্লীতে এই অবস্থায় যাহা ঘটে, পুরন্দরপুরেও-তাহাই ঘটিল। গ্রামবাসীরা বিনা শুশ্রূষায়--অচিকিৎসায় দলে দলে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। রামগোবিন্দও এই রোগে মারা গেল। নারায়ণীর হাতের নোয়া ঘুচিল, সীঁথির সিন্দূর মুছিল; কিন্তু পৃথিবীর কাজকর্ম্ম যে ভাবে চলিতেছিল, সেই ভাবে চলিতে লাগিল।

মেয়ে লইয়া নারায়ণী বড় বিপদে পড়িল। আজকাল ব্রাহ্মণ কায়স্থের মধ্যে বরপণ প্রথা যেরূপ উগ্রমূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে, নিম্নতর সমাজেও তাহার বিলক্ষণ প্রভাব অনুভূত হইতেছে। সু-পুত্রবতীরা সকলেই বলেন, "আমার পাশ করা ছেলে, গা-ভরা গহনা ছাড়া বৌ ঘরে তুলবো ?"--একথা শুনিয়া নারায়ণী বড় ভয় পাইল। পুরোহিত বরদা ঠাকুর একদিন তাহাদের গৃহে পদধূলি দান করিয়া বলিলেন, "অষ্টমে গৌরীদানই প্রশস্ত, কিন্তু কালাশৌচের প্রতিবন্ধক আছে, ন'বছরে কাতির বিবাহ না দিলেই নয়।"—সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর একটা শাস্ত্রীয় শ্লোক আওড়াইয়া তাঁহার উক্তির সমর্থন করিলেন।

কাত্যায়নীর এক কাকা ছিল, নাম রামযাদু।—সে মুড়ী মুড়কীর দোকান করিত; যাহা কিছু উপার্জ্জন হইত, তাহাতেই কষ্টেস্‌ষ্টে সংসার চালাইত। লোকটা পল্লীবাসী, মূর্খ ও কাণ্ডজ্ঞান বর্জ্জিত। দাদার স্ত্রী ও দাদার মেয়ে তাহার চোখের উপর অনাহারে শুকাইয়া মরিবে—আর সে দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইয়া হুঁকা হাতে করিয়া হরি স্বর্ণকারের দোকানে গিয়া রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত পরকালের কাজ করিবে, অর্থাৎ রামায়ণ শুনিবে, ইহা সে অত্যন্ত অস্বাভাবিক মনে করিল। সুতরাং রামযাদু পরামাণিক ভাইজায়া ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্রতিপালন ভার গ্রহণ করিল। রামযাদুর শ্যালক নিধিরাম এ সংবাদ শুনিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে বলিল, "আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে! এবার রামযাদুর ভিঁটেয় ঘুঘু চরবে।"

কিন্তু শ্যালকের এই মন্তব্য শুনিয়াও রামযাদুর সঙ্কল্প টলিল না। কিঞ্চিৎ অধিক বিক্রয়ের আশায় সে সন্ধ্যার পরও দোকানে বসিতে লাগিল। তাহার প্রতি-বেশী তারণ ঘরামী একদিন সন্ধ্যাকালে তাহার দোকানে আসিয়া বলিল, "কি গো পরামাণিকের পো, রামায়ণ শুন্‌তে যাও নি ?'—রামযাদু ব্যাজার হইয়া বলিল, "দুত্তোর রামায়ণ, আমার ভাজ ভাইঝি যদি না খেয়েই মরে, তবে পুণির ছালা পিঠে বেঁধে আমার লাভটা কি হবে ?"

সুতরাং রামযাদুর ভবিষ্যৎ দৃষ্টির প্রশংসা করা যায় না। বিশেষতঃ তাহার আর একটা মহদ্দোষ ছিল; সে কাত্যায়নীর বিবাহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন. নারায়ণী ব্যস্ত হইয়া একদিন বলিল, "ঠাকুর পো! কাতির যে বিয়ের বয়স পার হ'য়ে গেল।" রামযাদু লোহিত দন্তরুচি বিকাশ করিয়া বলিল, "তোমার হান্‌ফানানি দেখে আমার গায়ে জর আসে! ঐ টুকু মেয়ে শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে থাক্‌তে পারবে? মেয়ে মানুষগুলো যেন কি! মেয়ের বিয়ে দিবার জন্তে অস্থির; আবার বিয়ে দিয়ে মেয়ে বিদেয় করবার সময় কেঁদেই সারা হয়! ছুত্তোর মেয়েমানুষের দয়ামায়া!"

কাত্যায়নীর মুখখানি বড় সুন্দর, সে যেন লক্ষ্মী-প্রতিমা।– বড় ধীর শান্ত মেয়ে। পিতার মৃত্যুর পর বিষাদের কালো ছায়া তাহার মুখের উপর স্থায়ীভাবে বসিয়া গিয়াছিল। মানুষ মরিয়া কোথায় যায় তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিত না। এক একদিন সন্ধ্যাকালে সে ঘরের দুয়ারে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিত, আর তাহার চোখের জল গাল বহিয়া টস্ টস্ করিয়া আঁচলে পড়িত। তাহার পর তাহার মা তাহাকে ডাকিলে সে নিঃশব্দে রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া মায়ের রন্ধনকার্য্যে সহায়তা করিত।

কাত্যায়নী মায়ের সঙ্গে দু'বেলাই হেঁসেলে যাইত। কুটনো-কোটা বাঁটনা-বাঁটা রন্ধনের জল তুলিয়া আনা, প্রভৃতি কার্য্যের ভার তাহার উপরেই ন্যস্ত ছিল। রাঁধিবার কৌশলটাও সে মায়ের নিকট এক একদিন শিখিয়া লইত। মা বলিত, "তুই ছেলে মানুষ! রাঁধ্‌তে গিয়ে শেষে হাত পা পুড়িয়ে ফেল্‌বি?"

রামযাদু এ কথা শুনিয়া একদিন বলিল, "হাঁ, রাঁধ্‌তে শিখ্‌বে বই কি! দেখিস্ কাতি, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে রান্নায় যশ নেওয়া চাই। কেউ না বলে, কেমন-তর মা! মেয়েকে রাঁধ্‌তে শিখোয় নি?"

কাত্যায়নীর কাকী 'সৈরভী' রান্নাঘরে স্বামীর আহারের স্থান করিতে আসিয়া নারায়ণীকে বলিল, "তোমার মেয়ে রাঁধ্‌তে যাবে কোন্ দুঃখে দিদি! এমন ঘরে ওর বিয়ে হবে যে, পাঁচটা রাঁধুনি ওর সংসারেই ভাত রাঁধ্‌বে, চাক্‌রাণীতে আঁচিয়ে দেবে। আমাদের আচায্যি ঠাকুর ত গুণে বলেছে, আমাদের কাতি জমিদারের ঘরে পড়বে।"

কাত্যায়নীর মা দেবরের জন্য ভাত বাড়িতে বাড়িতে বলিল, "তেমন কপাল আমাদের নয়, বোন্! জমিদার চাইনে, ও যেন পাঁচজনকে রেঁধে বেড়ে খাওয়াতে পারে, আর ওকে অতিথ ফকিরদের যেন খালি হাতে দুয়োর থেকে না ফিরোতে হয়। গেরস্তর মেয়ের আর এর চাইতে কি বেশী সুখ বল দেখি? হাতের নো বজায় রেখে, পাকা চুলে সিঁদুর পরে যে ডঙ্কা মেরে চলে যেতে পারে,—তার বাড়া 'ভাগ্যিমানী' কে আছে?"

কিন্তু তখন কাত্যায়নীর বিবাহের কোনও সম্ভাবনা দেখা গেল না। পুরন্দরপুরের হরিতারণ বিশ্বাসের পুত্র রামতারণ কলিকাতার মেসে থাকিয়া রিপন কলেজে বি, এ, পড়িত। প্রকাণ্ড তেতালা মেসের কুঠুরীতে সাতসিকা মূল্যের জারুল কাঠের তক্তপোষে শয়ন করিয়া তাহার মেজাজ কিছু গরম হইয়া উঠিয়াছিল। একবার সে গ্রীষ্মের ছুটীতে গ্রামে আসিয়া শুনিয়াছিল, কাত্যায়নীর জন্য একটি পাত্রের আবশ্যক। মেসে অনেক ছেলে থাকে শুনিয়া নারায়ণী তাহাকে ধরিয়া বসিল। ঘটকালী করিতে হইবে শুনিয়া রামতারণ হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল,এবং চোখ হইতে চসমা খুলিয়া খানিকক্ষণ রুমাল দিয়া মনোযোগের সহিত তাহা মুছিয়া—চসমা জোড়াটা নাকের ডগায় আঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাত্যায়নী কতদূর ইংরাজী পড়েছে? 'লেস্'-বুন্‌তে শিখেছে ত? হারমোনিয়ম বাজাতে পারে কি না?—প্রশ্ন শুনিয়াই নারায়ণীর চক্ষু স্থির! এ সকল ভিন্ন কি মেয়ের বিয়ে হয় না? উচ্চ শিক্ষিত রাম-তারণ ভুলিয়া গিয়াছিল এইরূপ অশিক্ষিতা মায়ের গর্ভেই তাহার জন্ম! কলিকাতার কলের জল খাইয়া ও বেথুন কলেজের গাড়ীতে মেয়েদের স্কুলে কলেজে যাইতে দেখিয়া রামতারণের ধারণা হইয়াছিল, "দেখ লো সজনি চাঁদিনী রজনী,—সে যদি শুধু আসিত!"

হারমোনিয়ম যোগে এ সকল গান যে মেয়ে গাইতে না শিখিয়াছে, তাহার জীবনই বৃথা! সুতরাং সে চসমার ভিতর হইতে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া জবাব দিল, "নাঃ, ও চল্‌বে না! আমাদের কলেজের ছেলেদের মধ্যে এমন অচল মেয়ে কেউ গছ্‌বে না। পাড়া-গেঁয়ে মেয়েদের কি আর ভাল বিয়ে হয়? তাতে আবার দিতে থুতে পারবে না। কি লোভে বর জুট্‌বে?"

এই সকল উচ্চ অঙ্গের কথা শুনিয়া কাত্যায়নীর মা বড়ই কাতরা হইল, তাহার মন আরও দমিয়া গেল। ছেলে পাওয়া যায় না, যদি বা পাওয়া যায়, রসরাজ অমৃতলালের 'বিবাহ বিভ্রাটে'র নন্দলালের বাপের মত সোনার ল্যাজ শুদ্ধ চাহিয়া বসে। এরূপ লাঙ্গুল-লুব্ধ বৈবাহিকের দিকে ঘেঁসিতে তাহার সাহস হইল না। কেবল টাকার অভাবে এমন রূপবতী গুণবতী মেয়ে সমাজের হাটে বিকায় না, এ দুথ রাখিবার সে ঠাঁই পাইল না।

(২)

গোপালপুরের নেপাল পালের পুত্র বৃন্দাবন পাল কৃতী যুবক। গোপালপুরে তাহার 'পসর হাট্টা'র দোকান আছে। ঝুম্‌ঝুমি চুষিকাঠি হইতে শ্রাদ্ধের উপকরণ পর্য্যন্ত বিশ্বসংসারে এমন দ্রব্য অল্পই আছে, যাহা তাহার দোকানে না মিলিত।

দোকানে খরিদ বিক্রয়ের অধিকাংশ কার্য্যই বৃন্দাবনের ভাই মথুরা করিত। মথুরানাথের বয়স বাইশ বৎসর, অল্প বয়সে মাতৃহীন হওয়ায় সে পিতার কিছু অতিরিক্ত আদর লাভ করিয়াছিল, কিন্তু বৃন্দাবনের সতর্কতায় সে 'বহিয়া যাইতে' পারে নাই। চৌদ্দ বৎসরের পর হইতে বৃন্দাবন তাহাতে কড়া পাহারায় রাখিয়াছিল; তাহাকে প্রায়ই দোকানের বাহিরে যাইতে দিত না।

কিন্তু তথাপি সে মধ্যে মধ্যে বাঁধন ছিঁড়িত। পদ্মার তীরে এই গোপালপুর গ্রামখানি অবস্থিত।—গ্রীষ্মকালে পদ্মা অনেক অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন; অপরাহ্নের লোহিত রবিকর-সম্পাতে পদ্মাবক্ষ ঝল্‌মল্‌ করিতেছে; হাজার-মণে মহাজনী নৌকা খরস্রোতে পালের জোরে লক্ষ্য পথে ছুটিতেছে; ছোট ছোট নৌকায় চড়িয়া জেলেরা দূরে দূরে ইলিশ মাছ ধরিতেছে। পল্লী যুবতীরা কাঁকে কলসী লইয়া প্রান্তর পথে সারি বাঁধিয়া পদ্মায় জল আনিতে যাইতেছে, আর নদী তীরস্থ আকন্দ বনে বসিয়া একটা ঘুঘু ক্রমাগত ডাকিতেছে, 'ঘু-ঘু—ঘু', ঘু-ঘু—ঘু'; এ সকল দেখিবার জন্য এক একদিন মথুরা ছুটিয়া বাহির হইত, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নদীতীরে দাঁড়াইয়া নদীর অপর পারস্থিত দিক্‌চক্রবাল সীমায় বনানী-শ্যামল প্রান্তরের ধূসর সৌম্যমূর্ত্তি নির্ণিমেষনেত্রে নিরীক্ষণ করিত।

ক্রমে সন্ধ্যা অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিত। সে নদীতীরবর্ত্তী প্রান্তরের উপর দিয়া একাকী গ্রামে ফিরিত; সন্ধ্যার বাতাস হু হু করিয়া মাঠের উপর দিয়া বহিয়া যাইত; এক ঝাঁক বক তাহার মাথার উপর দিয়া সন্ সন্ করিয়া উড়িয়া যাইত; কোনও দিকে অন্য কোনও শব্দ নাই। গ্রামের পথ সন্ধ্যার পর জনসমাগমশূন্য। মথুরার মনে হইত, সংসারে সে বড়ই একা!—পাঁচ বৎসর বয়সের সময় সে মাকে হারাইয়াছে। মায়ের স্নেহ, আদর ও যত্ন এখনও তাহার মনে পড়ে। কি ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যার পর সে দোকানে আসিয়া বসিত। কিন্তু তখন তাহার কোন জিনিস বিক্রয় করিতে ইচ্ছা হইত না।—আনন্দ কুটীরের মৃদঙ্গ-ধ্বনি ক্রমাগত তাহার মনকে সেই দিকে আকর্ষণ করিত।

মথুরের এই ভাব দেখিয়া তাহার দাদা একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে মোথ্‌রো! তোর হ'ল কি? তুই কি শেষে 'ভেক্‌' নিবি নাকি?"

মথুরা চটিয়া বলিল, "হাঁ—এঁ্যা, তোমার যেমন কথা!—ভেক্‌ আবার মানুষে নেয়?" বৃন্দাবন ভাবিল ভায়াকে সংসারী করা দরকার।

বৃন্দাবন তাহার সংকল্পের কথা পিতার গোচর করিল। নেপাল সংসারের বড় কিছু দেখিত না;

আফিং খাইত, সুতরাং সের খানেক দুধ, কৌটা ভরা আফিং আর তার 'শ্রীভাগবত'খানি ভিন্ন সংসারের অন্য কোনও দ্রব্যে তাহার আস্থা ছিল না। বৃন্দাবন বলিল, "মোথ্‌রোর একটা বিয়ে দেওয়া যাক্‌।" নেপাল বলিল, "তা একটা মেয়ে টেয়ে দেখ্‌। আমি তোর বিয়ে থাওয়া দিয়ে দিয়েছি, তুই 'নায়েক' হয়েছিস্‌; ছোঁড়াটার একটা গতি করে দে। আমি আর কি বল্‌বো? আমার ত এখন গঙ্গা পানে ঠ্যাং।"

বৃন্দাবনের স্ত্রী কালিদাসী সংসারের কর্ত্রী। কালিদাসী সওয়া এক গণ্ডাছেলে মেয়ে লইয়া বিব্রত, তাহার উপর সমস্ত সংসারটা তাহার ঘাড়ে এই বোঝার উপর সংপ্রতি একটি "শাকের আঁটি" তাহার ঘাড়ে চাপিয়াছিল। তাহার চারি মাসের মেয়েটি একদণ্ড শুইতে চাহিত না; এবং মায়ের কোল ভিন্ন থুকীর নিদ্রা হইত না। কালিদাসী ক্রমাগত বলিয়া আসিতেছে, "একটা 'নুড়কুত' নইলে আমি সংসার চালাতে পারি নে।"

কালিদাসী দেবরের বিবাহের জন্য মেয়ে খুঁজিতেছিল। বৃন্দাবনের অবস্থা পল্লী-গৃহস্থের হিসাবে বেশ সচ্ছল। তাহার ভাই মথুরাও 'খরিদ বিক্রী'তে ভাল, এরূপ সুপাত্রের কনে জুটিতে বিলম্ব হয় না। কালিদাসীর কাছে অনেক উমেদারনীর সমাগম হইত; কিন্তু গ্রামের একটি মেয়েও তাহার মনে ধরে নাই। বৃন্দাবনচন্দ্র তাহার স্ত্রীকে ভ্রাতার বিবাহের কথা বলিলে, কালিদাসী বলিল, "আগে মেয়ে খোঁজ কর। কালো মেয়ের সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ে দেওয়া হবে না। কালো বউ ঘরে আন্‌লে পাঁচ জনে গঞ্জনা দেবে; বল্‌বে—মা নেই কি না, ভাজে আবার ভাল মেয়ে আন্‌বে?"

বৃন্দাবন বলিল, "ও পাড়ার হারান সা'র মেয়েটি মন্দ নয়। বাপের ঐ একটি একটি মেয়ে; দু'তোলা দেবে থোবে। আর চাই কি, মেয়েকে কিছু দিয়ে যেতেও পারে।"

কালিদাসী বলিল, "দু'তোলা নিয়ে ত আমরা রাজা হয়ে যাব!—ও কাজ কথ্‌খন করো না। ঠাকুরপো শেষে শ্বশুরের দিকে গড়ে পড়বে, ঘর জামাই হবে, তোমার আমও যাবে, ছালাও যাবে! হারাণ সার মেয়ে আস্‌বে আমার নুড়কুতি করতে!—কাজ নেই আমার এমন 'নুড়কুতে'।"

গ্রামে ও আশেপাশের কোনও গ্রামে মনের মত মেয়ে পাওয়া গেল না শুনিয়া জ্ঞাতি সম্পর্কে ঠাকুরদাদা নফর পাল বলিলেন, "শালা, তুমি কি ডানাকাটা পরী চাও? বৌকে হাটে বিক্রী করতে হবে? কানা খোঁড়া না হ'লেই হ'লো।—কলিকালে আরও কত দেখ্‌বো! সাধে কি আর গরুর বাঁটে দুধ নেই?"

যাহা হউক অবশেষে বৃন্দাবনের শ্যালক অঘোর হালদার সংবাদ দিল, সে তাহার মাসীর বাড়ী গিয়া পুরন্দরপুরে একটি মেয়ে দেখিয়া আসিয়াছে, মেয়েটি যেন পরী, কি যে তার নাক মুখের গড়ন, আর ভুরু দুটী যেন তুলি দিয়ে আঁকা, দশ বছরের মেয়ে, একটা যজ্ঞি রাঁধতে পারে।

কালিদাসী মেয়েটিকে না দেখিলেও তৎক্ষণাৎ তাহাকে পছন্দ করিয়া বসিল। একে তাহার দাদার প্রশংসাপত্র, তাহার উপর মেয়ে সুন্দরী, এবং 'যজ্ঞি রাঁধতে পারে;'—সে বৃন্দাবনকে এই মেয়েই ঠিক করিতে বলিল।

বৃন্দাবন তাহার কুটুম্ব-শ্রেষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিল, "কার মেয়ে হে!"

অঘোর বলিল, "আরে আমাদের নুটবিহারীর শালা রামযাদু পরামাণিকের ভাইঝি। মেয়ের বাপ নেই। রামযাদু মুড়ী মুড়কীর দোকান করে। দেখ, যদি মেয়ে পছন্দ হয়, কিন্তু কিছু দিতে থুতে পারবে না।—'অবস্থা' ভাল নয়।"

কালিদাসী বলিল, "মেয়েটি ভাল হ'লেই হলো, আমরা কিছু পাওয়া থোয়ার পিত্যেশ করিনে। পরের নিয়ে আর কে কবে বড় মানুষ হয়েছে?"

কলিকাতা অঞ্চলের ব্রাহ্মণ কায়স্থের ঘরের তিন পাসগ্রস্ত ছেলের মা এই অশিক্ষিতা, বুদ্ধিহীনা, পল্লী-

নারীর নির্লোভিতা দেখিয়া তাহাকে ধিক্কার দান করুন। এবং ছেলের বাপেরা হতভাগ্য বৃন্দাবনকে 'পিটি' করিতে থাকুন।

(৩)

কাত্যায়নীর কাকা রামযাদু দেখিল, সম্বন্ধটা মন্দ নহে। নেপাল পালের ঘরে খাবার আছে, এবং তাহার পুত্রের সহিত ভাইঝির বিবাহ দিতে তাহার মুড়িমুড়কীর দোকান সহ বাস্তুভিটাটুকু বিক্রয় করিবার আশঙ্কা নাই। বৃন্দাবন পাঁচ ক্রোশ গরুর গাড়ী আঠারো ক্রোশ ষ্টীমার এবং তাহার পর আড়াই ক্রোশ পদব্রজে আসিয়া রামযাদুর গৃহে উপস্থিত হইল, এবং কাত্যায়নীকে দেখিবামাত্র তাহার পছন্দ হইল। বৃন্দাবন তাহার সম্বন্ধীকে সঙ্গে আনিয়াছিল; সে পূর্ণমাত্রায় ঘটকালী করিল, বৃন্দাবনকে বলিল, "এমন মেয়ে ভূ-ভারতে পাবে না, হে!—মোথ্‌রোর কপাল ভাল। সম্বন্ধটা চট্‌ করে ঠিক করে ফেল।—রঘুনাথপুরের দুকড়ি বিশ্বাস তার ছেলের বিয়ের জন্য দেশ বিদেশে মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছে; 'ভাগিবান' লোক কিনা, ক-বছর দুনোদামে পাট বিক্রী করে একেবারে ফেঁপে উঠেছে; সাড়ে দশগণ্ডা মেয়ে দেখে একটাকেও তার পছন্দ হয় নি, কিন্তু কাত্যায়নীকে তার মনে ধরেছে। তবে সে কি না অনেক দূর, গর জেলা; তাই সেখানে বিয়ে দিতে মেয়ের মায়ের মন সরচে না।"

রামযাদু মাথা নাড়িয়া বলিল, "হুঁ, সেখানে বিয়ে দিলে ত মেয়েটা ঘিয়ে খেত, দুধে আঁচাতো, তা বৌঠাকরুণ ঐ এক রকমের মানুষ; বলে 'সে বাঙ্গাল দেশে মেয়ের বিয়ে দেব না।'—তবে আমার বাপু সোজা কথা; ওরে ও ফোজো, এক কল্‌কে তামাক সেজে আন্‌, কুটুম্ব এলো বাড়ীতে, বেটা বুঝি ঘুড়ি লাটাই নিয়ে মেতেছে।—যাক্‌, কি বল্‌ছিলাম; হাঁ, আমার সোজা কথা। আমার ত বাবু সন্দেশ মুড়কীর দোকান, তার উপর এই দুর্ব্বৎসর, কিছু দিতে থুতে পারবো না; তখন যে বিয়ে দিতে এসে ছান্‌লা তলায় বামন কায়েতদের মত দাঁড়ি-পাঁচসেরা, দূর ছাই, কি বলে নিক্তি ফিক্তি বের করবে, সে হবে না; আমি শুধু মেয়েটি সম্প্রদান করবো।—তোমরা গা ভরা গহনা দেবে।"

বৃন্দাবন বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিল, "আমরা কি কি দেব না দেব সে কথা বল্‌তে চাইনে, আমাদের বৌ, যে দু'তোলা পারি, দেব।—তবে বামন কায়েতরা আমাদের ছোট জাত বলে, আমরা তাদের মত কশাই হতে পারিনি। আমি মশায় দু'ভরি পাবার প্রত্যাশায় একাজ করছি নে; মেয়েটি ভাল, শুনেছি গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মও বেশ শিখেছে, এই জন্যই আমার এত 'আগ্র' আপনারা কিছু দেন না দেন তাতে কিছু যায় আসে না।"

রামযাদু পুলকিত হইয়া বলিল, "হাঁ, এ মানুসের মত কথা বটে, বামন কায়েতরা এ কথা মুখেই আনতে পারতো না—ছেলের বিয়ে দিতে এসে তারা কেবলই 'লুষে' নিয়ে যায়; ছেলের বিয়ে দিতে হ'লে কন্যা-কর্ত্তার বাড়ী গিয়ে দশটাকা খরচ করতে হয়, এ তারা জানে না! নাপিত পুরুতকে দু'টাকা দিতে হইলেই মাথায় বজ্রাঘাত! ওরে ফোজো, তামুক দিলি? তা মশায় বিয়ে দিতে আস্‌বেন, এখানে পাঠশালা আছে, বারোয়ারী আছে, মা রক্ষাকালী আছেন, পাঁচজন ব্রাহ্মণের এখানে বাস, 'ছায়া-মণ্ডপি' আছে, তা ছাড়া এখানে একটা 'আগুন সাবধানের দল' আছে,—সকল-কেই কিছু কিছু দিয়ে যেতে হবে।"

বৃন্দাবন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আগুন সাব-ধানের দলটি কি জিনিস?"

রামযাদু এতক্ষণ পরে ফজো প্রদত্ত গেঁটে কল্‌কের আগুনে ফুঁ দিতে দিতে বলিল, "কোনও বাড়ীতে লঙ্কাকাণ্ড হ'লে তারা আগুন নিবুতে বাল্‌তি হাতে নিয়ে ছোটে, বাল্‌তি কিন্‌তে তারা বরকর্ত্তার কাছে কিছু কিছু চাঁদা পায়; আপনাকেও কিছু দিতে হবে।"

বৃন্দাবন বলিল, "সকলেই কি চাঁদা দিয়ে যায়?"

রামযাদু বলিল, "হাঁ দেয় বই কি; সবাই টাকাটা

শিকেটা দিয়ে যায়। ও মাসে ও পাড়ার রামজয় মিত্তিরের মেয়ের বিয়ে হলো ; হাটুগাছির জমিদার ঘোষের বাড়ী বিয়ে, বরকর্ত্তার কাছে চাঁদা চাইতেই তিনি বুকের সোণার শেকল দুলিয়ে ঝাঁপিয়ে উঠলেন, বল্লেন, "আগুন লেগে তোমাদের গাঁ লঙ্কাকাণ্ড হয়ে যাক্ ; আমি তোমাদের চাঁদা দেব কেন ? চলা যাও হিঁয়াসে, কুছ্ নেহি মিলেঙ্গা।"

বৃন্দাবন সহাস্যে বলিল, "তারপর ?"

রামযাদু বলিল, "তারপর আর কি ?—ছেলেরা ফলারের সময় ঘোষজার টিকিটা কস্ করে কেটে নিলে !—পরদিন সকাল বেলা একখান সাদা কাগজে লিখ্‌লে 'লঙ্কাকাণ্ডে হনুমানজিকা লাঙ্গুল'—সেই কাগজখানায় টিকিটা বেশ করে আটা দিয়ে এঁটে রামজয়-মিত্তিরের সদর দরজায় নিশেন উড়িয়ে দিলে। ঘোষ বুড়ো সেই থেকে ছমাস বেয়াই বাড়ী বৌ পাঠায় নি। —তামাক ইচ্ছে করুন।"

রামযাদু ধূম উদ্গিরণ পূর্ব্বক হুঁকাটি দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া এবং বামহস্তদ্বারা দক্ষিণহস্তের কনুই স্পর্শ করিয়া বৃন্দাবনকে হুঁকাটি দিতে গেলে, বৃন্দাবন তাহা গ্রহণ করিল না ; তখন বৃন্দাবন-শ্যালক রামযাদুর হস্ত হইতে হুঁকাটি কস্ করিয়া টানিয়া লইয়া তাহাতে দুই উৎকট দম কষিল, তাহার পর মুখব্যাদান পূর্ব্বক ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, "কল্‌কেয় কিছু নেই। গুলে আগুন ধরে গিয়েছে ! তোমার আগুন সাবধানের দলকে ডাক, নিবিয়ে যাক্।"

ইহার পর রামযাদু নেপাল পালের বাড়ী গিয়া মথুরানাথকে দেখিয়া আসিল। বাড়ী ফিরিয়া কাত্যায়নীকে বলিল, "বউ, ছেলে দেখে এলাম ; হাঁ ছেলে বটে। খরিদ বিক্রীতে ভারি লায়েক, আমাদের একহাটে কিনে আর একহাটে বেচ্‌তে পারে, খাওয়া দাওয়ার কোন কষ্ট নেই, গহনাও অনেকগুলি দেবে শুনেছি। এ ছেলে হাতছাড়া করা নয়। আঃ—সেদিন রাত্তিরে এমন 'তিলজাউ' খাইয়েছে, তার কাছে পোলোয়া কোথায় লাগে ? ঘরে সাড়ে পাঁচসের দুধ হয়, তিনটে গাই দোয়া যায়। আর তাদের একটা পুকুর আছে,—তাতে যে এক একটা কই মাছ ধরেছিল, যেন ঠিক এক একটা খেজুর গাছ !"

কাত্যায়নী হাসিয়া বলিল, "খেয়েই ভুলে গিয়েছ ঠাকুরপো !"

রামযাদু গর্ব্বিত ভাবে বলিল, "ও রকম কুচ্‌কি কণ্ঠা ভরাট ক'রে খাঁাট দিলে সবাই ভোলে, বড় বৌ !—ভশ্চাযি্যি ঠাকুরকে দিয়ে বিয়ের দিনটা দেখিয়ে নিতে হচ্ছে।"

রামযাদু বন্ধু সহ ভট্টাচার্য্য ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কুটীরের বারান্দায় বসিল ; ভট্টাচার্য্য তখন স্নান করিয়া আসিয়া কাপড় ছাড়িতেছিলেন ; রামযাদুকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পরামাণিকের পো ! খবর কি ?"

রামযাদু বলিল, "আজ্ঞে,আপনার চরণ ধোয়া হোক্, বল্‌ছি ; তাড়াতাড়ি কি ?"

ইতিমধ্যে ভট্টাচার্য্যের একমাত্র কন্যা মনোরমা পিতার জন্য একগাড়ু জল লইয়া আসিল।

রামযাদু, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে কোনদিন আসে নাই ; মেয়েটিকে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "দা ঠাকুর, মেয়েটি কে ?"

মনোরমা জল রাখিয়াই বাড়ীর ভিতর চলিয়া গিয়াছিল। 'দা ঠাকুর' চরণ ধৌত করিতে করিতে বলিলেন, "ওটি আমার ছোট মেয়ে। আহা দুখের মেয়ে সাধ আহ্লাদ করে সনাতনপুরের গোঁসাই বাড়ী গতবৎসর বিয়ে দিয়েছিলাম ; জামাইটি 'কাব্যতীর্থ' উপাধি পেয়েছিল। চেহারায় যেন কার্ত্তিক ; কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতে জামাইটি ওলাউঠায় গত হয়েছেন।" ভট্টাচার্য্যের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল।

রামযাদু তাহার সঙ্গীকে বলিল, "ওঠ হে, আর দিন ক্ষ্যাণে দরকার নেই।"

ভট্টাচার্য্য বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তোমরা উঠ্‌চো যে ? কি জন্যে এলে—তা না বলেই—"

রামযাদু সবিনয়ে বলিল, "আজ্ঞে প্রেণাম দা ঠাকুর !

আমার ভাইঝির বিয়ের দিন দেখাতে এসেছিলাম।—আপনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ, দিন ক্ষ্যাণ দেখে খুব ভালদিনেই আপনার মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু দেখ্‌ছি তার ঠ্যালায় বছরও ঘুরলো না। আর দিন ক্ষ্যাণে দরকার নেই, চল হে ফড়ং সরকার, হাটের পরদিন মেয়েটার বিয়ে দেব।"

(৪)

কিন্তু শুভদিনেই কত্যায়নীর বিবাহ হইল। বিবাহের পরদিন আহারান্তে বৃন্দাবন বরকনে লইয়া বাড়ী রওনা হইল। যাত্রার পূর্ব্বে বিধবা নারায়ণী ঘরে বসিয়া চোখের জলে আঁচল ভিজাইয়া ফেলিল;—বিধবা সে, ছালনা তলায় গেল না। রামযাদুর স্ত্রী 'সৈরভী' বরকনে বরণ করিল। রামযাদু ধানদুর্ব্বা দিয়া কাত্যায়নীকে আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বাস্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "মা, তুই ঘরের লক্ষী, আজ তোকে বিদেয় দিচ্ছি; সুখে শ্বশুর ঘর কর্; কিন্তু তোকে ছেড়ে কেমন করে থাক্‌বো মা!"—বালিকা তাহার লাল চেলির মধ্যে কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখদুটি লাল করিয়াছিল। কাকার কথা শুনিয়া তাহার চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া অবগুণ্ঠন ভিজাইয়া দিল। দ্বারের নিকট মলিনবসনা অশ্রুমুখী নারায়ণী দাঁড়াইয়া ছিল; কাত্যায়নী মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া পাল্কিতে উঠিবে, এমন সময় নারায়ণী উভয় হস্তে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কোলে তুলিয়া লইল; কাত্যায়ণী মায়ের কাঁধে মাথা রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।—নারায়ণী কোন রকমে অশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিল, "কাঁদিস নে মা, অষ্টমঙ্গলায় তোকে নিয়ে আস্‌বো, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কাঁদাকাটা করিস্‌নে; যেন তোর নিন্দে শুন্‌তে না হয়।"

অশ্রুমুখী কাত্যায়নী বলিল, "তোকে ছেড়ে কেমন করে থাক্‌বো মা! আমার বড় মন কেমন করবে।"

বেহারারা বলিল, "আর দেরী করলে ইষ্টিমার পাওয়া যাবে না।" কাত্যায়নী কন্যার মুখ চুম্বন করিয়া তাহাকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিল।

বেহারারা অদৃশ্য হইলে সে ঘরে গিয়া মেঝেয় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল, আজ তাহার হৃদয় শূন্য!

কাত্যায়নী যথাসময়ে শ্বশুর বাড়ী আসিয়া যে আদর যত্ন পাইল, তাহাতে তাহার বেদনা অনেকটা নিবৃত্ত হইল। কালিদাসী ছোট যাটিকে কোলে লইয়া নাচিতে লাগিল। ভ্রাতৃবৎসল বৃন্দাবন দোকান করিয়া এক বৎসরে যাহা কিছু জমাইয়াছিল, সমস্তই ভ্রাতার বিবাহে ব্যয় করিল। ভ্রাতৃ-বধূর জন্য সে গিনি সোণার কয়েকখানি অলঙ্কারও প্রস্তুত করাইয়া দিল। কালিদাসী তাহা সযত্নে কাত্যায়নীকে পরাইয়া দিল। বৃন্দাবনের বিধবা ভগিনী কৃষ্ণকামিনী ভ্রাতৃবধূকে কোলে টানিয়া লইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "মা গো! আজ তুমি কোথায়! দাদার বিয়ের সময় বৌকে একখানিও গহনা দিতে পার নি ব'লে কত কান্নাই কেঁদেছিলে, আর আজ দাদা তোমার কোল-পোছা ধন মথুরার বিয়ে দিয়ে বৌকে মনের মত গহনা দিয়ে সাজিয়েছে! আজ তুমি বেঁচে থাক্‌লে এ সব সার্থক হতো।"

বার বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ আর একটি আনন্দের দিনে প্রাণাধিকা জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূকে নিরলঙ্কারা দেখিয়া শাশুড়ী তাহাকে কোলে লইয়া কতই কাঁদিয়াছিলেন; তাহা মনে করিয়া কালিদাসীর চক্ষুতেও জল আসিল। এত দিনেও সে শাশুড়ীর স্নেহ যত্ন ভুলিতে পারে নাই।

বৃন্দাবনের পিসি তাঁহার পুত্রবধূকে লইয়া এই বিবাহোপলক্ষে ভ্রাতৃগৃহে আসিয়াছিলেন;—পিসিমার পুত্রবধূ বিধুমুখী শিক্ষিতা, মধুরহাসিনী, রূপবতী রমণী।—তাঁহার যৌবন অতীত হইয়াছিল; কিন্তু যৌবনের রূপরাশি তখনও ম্লান হয় নাই। কিন্তু তাঁহার সে রূপ দেখিয়া কাহারও মনে মোহের সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা ছিল না; তাঁহার সে মূর্ত্তি, মাতৃমূর্ত্তি। তিনি আজ দুইমাস তাঁহার ছোট মেয়েটিকে শ্বশুর বাড়ী

পাঠাইয়াছিলেন। তাহার বিরহে তাঁহার সুকোমল মাতৃহৃদয় নিরন্তর হাহাকার করিতেছিল; সেই স্নেহ-ময়ী রমণীর হৃদয়-নিহিত ক্ষুধিত মাতৃস্নেহ স্নেহাস্পদার অদর্শনে নিরাশ্রয় ভাবে আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল; এমন সময় সেই সুদূর পল্লীতে উৎসব-মুখর গৃহদ্বারে লাল চেলিপরা কাত্যায়নীকে দেখিয়া বিধুমুখীর মনে হইল তাঁহার প্রাণের ধন চারুশীলা তাঁহারই ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছে; তিনি কাত্যায়নীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিলেন, আদর করিয়া বলিলেন, "দিদি, আমার মুখের দিকে তাকাও ত? আহা, আমার চারুর মতই তোমার মুখ!"

সে স্বরে এমন কোমলতা, এত স্নেহ ও আদর মিশ্রিত ছিল যে, লজ্জা আসিয়া বাধা দিলেও কাত্যায়নী বিধুমুখীর মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে না চাহিয়া থাকিতে পারিল না। যে মুহূর্ত্তে সে বিধুমুখীর মুখের দিকে চাহিল, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার লজ্জা সঙ্কোচ ভয় দূরে গেল; সে বিধুমুখীর কাঁধে মুখ লুকাইয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "আপনি কে?"

বিধুমুখী বলিলেন, "আমি তোমার বৌদিদি হই।"

কাত্যায়নী তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আপনি যে আমার মায়ের মতন। মা আমাকে খুব ভালবাসেন, আপনি ভালবাস্‌বেন?"

বিধুমুখী বলিলেন, "আমি যে কদিন এখানে থাকি, তুমি আমার কাছেই থেকো। তোমার মত আমার একটি মেয়ে আছে; আজ দু'মাস শ্বশুরবাড়ী গিয়েছে।"

কাত্যায়নী বলিল,"আমাকে আপনার বাড়ীতে নিয়ে যাবেন।"

বিধুমুখী বলিলেন, "যাব, আর এক সময়। এখন ত আমার সঙ্গে তোমার যাওয়া হবে না, তুমি বিয়ের কনে কি না।"

বিধুমুখী বৌভাতের দিন পর্য্যন্ত মামা শ্বশুরের বাড়ীতে ছিলেন। যে দিন তিনি বাড়ী চলিয়া যান, সে দিন তাঁহার কোলে উঠিয়া কাত্যায়নী যেমন কাঁদিল, মায়ের নিকট বিদায় লইবার সময় ভিন্ন সে তেমন করিয়া আর কোন দিন কাঁদে নাই। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বিধুমুখীকে বলিল,"মা আমাকে ছেড়ে আছেন, আপনিও ছেড়ে চল্‌লেন! আমি কার কাছে থাক্‌বো?"

কালিদাসী কাত্যায়নীকে কোলে লইয়া বলিল, "কেন দিদি, তুমি আমার কাছে থাক্‌বে। ঘরের লক্ষ্মী, তোমার 'পয়ে' আমাদের সোণার সংসার হবে। আমরা দুটি বোনে সংসার করবো। আমার খুকীর তুমি যে ছোট মা!"

সে আবার খুকীর মা! চোখে জল, কিন্তু দিদির কথা শুনিয়া তাহার ওষ্ঠে হাসি ফুটিল। যেন এক পশলা বৃষ্টির মধ্যে রোদ উঠিল।

কালিদাসী বলিল, "দিদির আমার চোখের জলও যেমন মিষ্টি, হাসিও তেমনই মিষ্টি; আহা মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে, চল, কিছু খাবে।"

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

গ্রন্থ সমালোচনা

বেদান্ত-পরিভাষা। মূল সংস্কৃত, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্-এ, বি-এল্, বেদান্তরত্ন-রচিত ভূমিকা ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম্-এ, বি,-এল্,সরস্বতী, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাভূষণ কৃত বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা টীকা টীপ্পনী সংবলিত। আকার ডবল ক্রাউন ষোল পেজী, ২৲+২৯৬+৮ পৃষ্ঠা। প্রকাশক, হোয়াইট লোটাস পাব্‌লিসিং কোং, ৪।৩এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ২৲

সম্প্রতি বাঙ্গালাদেশে কয়েকটি মাত্র কৃতবিদ্য ব্যক্তি বেদান্ত-দর্শনের আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই আলোচনার ফলে বেদান্ত-শাস্ত্র-সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থের বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ এবং কোথাও কোথাও বিস্তৃত ব্যাখ্যার সহিত অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সমালোচ্য গ্রন্থখানি শেষোক্ত শ্রেণীর।

ভারতের দর্শন-শাস্ত্র বড় কঠিন। তন্মধ্যে বেদান্ত-শাস্ত্রের মতবাদ ও তাহার প্রমাণগুলি দুর্ব্বোধ ও জটিল বলিয়া পরিচিত। এই বেদান্তমতের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থান অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়া আছে। এই সকল বিভিন্ন প্রস্থানের মধ্যে শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদই সমধিক প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছে। অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য্য কেবল বেদান্ত-দর্শনের শারীরক ভাষ্য, প্রসিদ্ধ উপনিষদ্‌গুলির ভাষ্য ও গীতা ভাষ্য রচনা করিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই, তাঁহার রচিত ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু 'প্রকরণ'-গ্রন্থেও এই অদ্বৈতমতের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। 'বেদান্ত-পরিভাষা' গ্রন্থখানিও এইরূপ একখানি 'প্রকরণ' গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত, এবং ইহার প্রণেতা ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র শঙ্করাচার্য্যের একজন পদানুগত শিষ্য। শঙ্করাচার্য্য যে অধ্যাসবাদের ব্যাখ্যা তাঁহার বেদান্তভাষ্যে প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং তিনি যে বিবর্ত্তবাদের তত্ত্ব বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এই 'বেদান্ত-পরিভাষা' গ্রন্থেও সেই বিবর্ত্তবাদ ও অধ্যাসের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া দেখান হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন এই গ্রন্থে বৈদান্তিকেরা প্রত্যক্ষাদি যে কয়েকটি প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ, সৃষ্টির বিবরণ ও 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদার্থের ঐক্য প্রতিপাদন বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

'বেদান্ত-পরিভাষা' গ্রন্থখানি বৈদান্তিকগণের পরম আদরের বস্তু। সংক্ষেপে অথচ অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সহিত বেদান্ত-প্রতিপাদ্য মূল তত্ত্বগুলি সমস্তই এই গ্রন্থে আলোচিত হওয়াতে, ইহা পণ্ডিত-মণ্ডলীর বড়ই প্রিয়। কিন্তু ইহাতে বেদান্ত-পরিগৃহীত প্রমাণগুলির আলোচনায় অধিক স্থান ব্যয়িত হওয়াতে এই গ্রন্থখানির কাঠিন্য ও জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্রন্থকার সংস্কৃত গদ্য লিখিতে যে প্রচুর শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার গ্রন্থ পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গ্রন্থখানি বড় কঠিন। গ্রন্থকারের পুত্ররচিত যে টীকা আছে, তদ্দ্বারাও গ্রন্থের জটিলতা কমে নাই। মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন এই গ্রন্থের এক টীকা করিয়াছিলেন তাহাতে গ্রন্থের মর্ম্ম অনেক সহজ ও সরল হইয়াছিল। এ টীকা সংস্কৃতে রচিত।

বঙ্গভাষার মধ্য দিয়া দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বগুলিকে প্রকাশ করিতে হইলে অনুবাদের ভাষা ও বলিবার প্রণালীটি যাহাতে অত্যন্ত সহজ ও সরল হয় সর্ব্বাগ্রে অনুবাদকের সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। 'বেদান্ত-পরিভাষা'র মত দুরূহ বৈদান্তিক গ্রন্থের যিনি অনুবাদ করিতে যাইতেছেন, তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে, তাঁহার অনুবাদ যেমন মূলের অনুগত হইল, তদ্রূপ অনুবাদের ভাষাটি সরল হইল কি না। ইহা ব্যতীত তিনি যে সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতে যাইতেছেন সেই সকল ব্যাখ্যা এরূপ হওয়া আবশ্যক যে তাহা পড়িবামাত্র তৎক্ষণাৎ হৃদয়ঙ্গম হইয়া যায়।

বর্ত্তমান গ্রন্থের অনুবাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল মহাশয় পাণ্ডিত্যে ও উৎসাহে অনুবাদকের যোগ্য ব্যক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। ইনি এই নবীন বয়সেই যে সকল দুরূহ কার্য্যে সোৎসাহে হস্তক্ষেপণ করিয়াছেন, তাহাতে ইঁহার একনিষ্ঠা, উদ্যম এবং স্বদেশের দর্শন-শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি। 'বেদান্ত-পরিভাষা' 'প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাবলী' নামক গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ। অন্যান্য গ্রন্থ পরে প্রকাশিত হইবে। ইঁহার এই অনুরাগ ও উৎসাহের ফলে কালে বাঙ্গালা সাহিত্য যে বিবিধ দার্শনিক সম্পদে বিভূষিত হইতে পারিবে সেই আশা আমরা পোষণ করিতেছি।

আলোচ্য গ্রন্থের সকল স্থল আশানুরূপ সরল হয় নাই। দুই এক স্থল অতি দুর্ব্বোধ হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ 'অধ্যাস' তত্ত্বের ব্যাখ্যাটি উদ্ধৃত হইতে পারে। আমাদের অনুরোধ ভবিষ্যতে অনুবাদক যেন এই সকল স্থলে এরূপ অনুবাদ না করেন। এই দুরূহ কার্য্যে অনুবাদক নূতন যাত্রী। সুতরাং যদিও সকল স্থলে ইনি সমান সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই তথাপি আমরা আশা করি যে ক্রমে অনুবাদকের হস্ত পরিপক্ক হইবে, যে দোষ, যে কাঠিন্য আছে তাহা দূরীভূত হইবে। কালে এই অনুবাদক যে ভাষার ভাণ্ডারে মহামূল্য রত্ন সংগ্রহ করিতে

পারিবেন, তদ্বিষয়ে আমাদের অন্তঃকরণে দৃঢ় বিশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছে।

'বেদান্ত-পরিভাষা' যে গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ, তাহার এ দেশে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। অধুনা দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত যে সকল ছাত্র প্রত্যেক বৎসর বিবিধ বিষয়ে উপাধি লইয়া বহির্গত হইতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই সকল বঙ্গানুবাদ যথেষ্ট উপকার সাধনে সমর্থ। যে সকল ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তি সংস্কৃতে তাদৃশ যত্ন করেন নাই অথচ যাঁহারা স্বদেশের দর্শন-শাস্ত্রের জ্ঞানার্জ্জন করিতে অভিলাষী, তাঁহাদের পক্ষে এই সকল অনুবাদ সমন্বিত গ্রন্থ অনায়াসে দর্শন-শাস্ত্রের জ্ঞান আনয়ন করিয়া দিবে। এতদ্ভিন্ন সাধারণ বঙ্গভাষাভিজ্ঞ ভদ্র-মণ্ডলীর পক্ষে এরূপ অনুবাদের গ্রন্থগুলি মহোপকার সাধন করিতে সমর্থ হইবে। আরও একটি কথা আছে। আমাদের দেশের সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মণ্ডলী, ইংরাজী-দর্শন ও ইংরাজী-বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ বিবরণ না হউক, প্রধান প্রধান মৌলিক তত্ত্বগুলিও জানিবার অন্য কোন প্রকার সুবিধা পান না। ইহাতে দেশের বড় ক্ষতি হইতেছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তাই আমাদের মনে হয় যে আমাদের দর্শন-গ্রন্থগুলি যদি শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের ন্যায় ইংরাজী শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্য-দর্শনাভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা যথোপযুক্তরূপে অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণের মধ্যেও সহজে ও অনায়াসে ধীরে ধীরে আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অবশ্য জ্ঞাতব্য মূল তত্ত্বগুলি প্রবেশলাভ করিতে পারিবে।

পরিশেষে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। শরৎবাবু আর একটি কার্য্যেও সঙ্গে সঙ্গে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইঁহার অবিলম্বিত সেই অপর কার্য্য - জৈনগ্রন্থাবলীর ইংরাজী অনুবাদ। পাঠক পাঠিকারা অবগত আছেন যে একদিন জৈন গ্রন্থে ও জৈন সাহিত্যে ভারতবর্ষ কিরূপ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। দর্শন, বিজ্ঞান, ন্যায়, চিকিৎসা, কাব্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে অমূল্য রত্নরাজি এই জৈন ভাণ্ডারে অশেষ যত্নে ও বহু দিবসব্যাপী শ্রমের ও নিষ্ঠার ফলে সঞ্চিত রহিয়াছে। এ দেশে এই রত্নভাণ্ডারের দ্বারোদ্ঘাটনে এখনও তাদৃশ যত্ন অবলম্বিত হয় নাই। আমার সর্ব্বান্তঃকরণ আশা করিতেছি যে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের যত্নে বঙ্গদেশ অচিরে সেই গুপ্তধনের কিছু পরিচয় লাভ করিতে পারিবে। তবে এই জৈন-গ্রন্থ-প্রচার কার্য্যটিও ইংরাজীতে না হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় আরম্ভ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইংরাজী সাহিত্যভাণ্ডার বাঙ্গলার ন্যায় দরিদ্র নহে। তদ্দেশীয় বহু পণ্ডিত ইংরাজী-সাহিত্য পরিপুষ্টিতে নিরত হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থ প্রচারে বাঙ্গলা-সাহিত্য বড়ই দরিদ্র। আজ পর্য্যন্ত শারীরক ভাষ্যের একখানি সর্ব্বজনবোধ্য সরল অনুবাদ প্রকাশিত হইল না। আমরা পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র ঘোষালের ন্যায় উৎসাহী কর্ম্মিগণের দৃষ্টি এই দীন সাহিত্যের দিকে আকর্ষণ করি।

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী।

দরিদ্রের ক্রন্দন। শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত। কাশীমবাজার সত্যরত্ন প্রেসে মুদ্রিত ও বহরমপুর শাখা সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত—১৩২২। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ২৬০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৸০

আলোচ্য পুস্তকখানি বার্ত্তা (economics) বিষয়ক গ্রন্থ। এই পুস্তকখানিতে বর্ত্তমান দারিদ্র্য-সমস্যা সম্যক্‌রূপে আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকখানিতে বৈষয়িক উন্নতির উপায়গুলিও সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

পুস্তকখানি কোন ইংরাজী বার্ত্তাশাস্ত্র অবলম্বনে লিখিত নহে। দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে প্রতিনিয়ত ঘুরিয়া রাধাকমলবাবু যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, পুস্তকখানি তাহারই সমাবেশ।

আমাদিগের দেশ দারিদ্র্যের কোন সীমায় উপস্থিত হইয়াছে, গ্রন্থকার তাহা দেখাইয়াছেন। কি উপায়ে এই দারিদ্র্য-রাক্ষসীর করাল কবল হইতে এই হতভাগ্য দেশ মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহার প্রকৃষ্ট পন্থাও নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, দেশের দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে প্রথমতঃ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা কর্ত্তব্য; দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য আদর্শের অন্ধ অনুকরণ করিয়া আমরা দিন দিন যে বিলাসিতায় মগ্ন হইয়া পড়িতেছি তাহাও পরিবর্জ্জন করা আবশ্যক।

গ্রন্থকার আরও বলেন, আধুনিক হিন্দু-সমাজ পরের অনুকরণ করিয়া দিন দিন সমাজের নৈতিক অবনতি ঘটাইতেছে।

রাধাকমলবাবু যে সকল সিদ্ধান্ত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেগুলি সম্যকরূপে মীমাংসা করেন নাই। তিনি যে বিষয় যখন বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ভাবের উচ্ছ্বাসে তাহা লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু আমরা তাঁহার সিদ্ধান্তগুলির সম্যক মীমাংসা প্রত্যাশা করি।

সমবায় আন্দোলন বা কৃষিকার্য্যে যৌথ কারবার প্রচলন,—'যৌথ ঋণদান মণ্ডলী' স্থাপন, 'যৌথ বিক্রয় মণ্ডলী' ও 'যৌথ শস্যভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠার দ্বারা পাশ্চাত্য জগতে কৃষকদিগের দারিদ্র্য দূর করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলি আমাদিগের

দেশে প্রচলিত হইলে কৃষকগণ যে কতক পরিমাণে দারিদ্র্য হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃষকদিগের অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করিবার লোক বঙ্গদেশে বিরল।

পল্লীরক্ষা ও তাহার উন্নতি বিধানের জন্য রাধাকমল বাবুর নির্দ্দিষ্ট যুক্তিগুলির বশবর্ত্তী হইয়া চলা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য, কারণ সমাজের বল পল্লীতেই অবস্থিত। অতএব পল্লীস্বাস্থ্য ভাল না রাখিলে সমাজের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

রাধাকমলবাবু বলিয়াছেন যে, দেশ হইতে দারিদ্র্যকে দূর করিতে হইলে দেশে কেবল বড় বড় কল কারখানা করিলে চলিবে না—কুটীর-শিল্প ও ক্ষুদ্র কারখানা প্রতিষ্ঠা করা একান্ত কর্ত্তব্য। বড় বড় কল কারখানা চালাইতে হইলে যেরূপ শিক্ষা ও অর্থের প্রয়োজন তাহা ত আমাদের নাই।

অন্যস্থলে তিনি বলিয়াছেন যে বাণিজ্য রক্ষা করিতে না পারিলে দেশের দারিদ্র্য দূর হইতে পারে না।

পরিশেষে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, দেশের দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে প্রথমে বিলাসিতা ত্যাগ করা, পল্লীসমাজ রক্ষা করা, বাণিজ্য রক্ষা করা ও কৃষককুলের অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করা একান্ত আবশ্যক। দরিদ্রের জন্য প্রাণ কাঁদে, এমন লোক আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেশে যে সকল ধনশীল ব্যক্তি আছেন—তন্মধ্যে কেহই দরিদ্রের অভাব মোচন করিতে প্রস্তুত নহেন কারণ তাঁহাদিগের মধ্যে 'প্রাণ'-বস্তুটির অভাব পরিলক্ষিত হয়। যাঁহার অর্থ আছে, তাঁহার হৃদয় নাই আবার যাঁহার হৃদয় আছে তাঁহার অর্থ নাই। এই জন্য আজ এই স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমি দরিদ্রের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে।

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছি। ইহার বহুল প্রচার আবশ্যক। আমরা আশা করি যে দেশবাসী পুস্তকখানি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিবেন।

"দেবদত্ত।"

শুভদৃষ্টি—শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ডবল-ক্রাউন ১৬ পেজি ১৫২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲

ইহা একখানি তিন অঙ্কে সমাপ্ত নাটক, লর্ড লিটনের Lady of Lyons নামক নাটক অবলম্বনে লিখিত। লেখক গ্রন্থখানিকে সামাজিক নাটক বলিয়াছেন—'দো-আঁশলা ইঙ্গবঙ্গের উচ্ছৃঙ্খল সমাজের' চিত্র ইহাতে আঁকিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ভাবানুবাদ ভালই হইয়াছে; কিন্তু তথাপি লেখকের উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, প্রথমতঃ, বর্ত্তমান কালে আমরা এইরূপ দো-আঁশলা ইঙ্গবঙ্গ সমাজের অস্তিত্বই স্বীকার করি না। এককালে হয়ত অনেকে সাহেবিয়ানার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু দেশে এখন নূতন হাওয়া বহিয়াছে। ধনী কিম্বা বিলাতফেরৎ বাঙ্গালীদের মধ্যে স্যর স্তাভারামের মত জাতীয়-সম্মান-জ্ঞানহীন কেহ এখন আছেন বলিয়া বিশ্বাস করি না। সুতরাং, এইরূপ উৎকট সমাজই যখন নাই, তখন এ রকম সামাজিক নাটকের সার্থকতা কি? দ্বিতীয়তঃ সামাজিক নাটকের ঘটনাগুলি সমস্তই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হওয়া চাই। কিন্তু এই নাটকের অধিকাংশ ঘটনাই এমন অসম্ভব এবং অস্বাভাবিক যে লেখকের কল্পিত উচ্ছৃঙ্খল সমাজ মানিয়া লইলেও বাস্তবের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ অত্যন্ত ক্ষীণ বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্য সমাজে যাহা স্বভাবিক আমাদের দেশে সামাজিক প্রথার শত বিপর্য্যয়েও তাহা স্বাভাবিক না হইতে পারে। জাল জালন্ধর যুবরাজের সহিত ডোরা নলিনীর বিবাহ ব্যাপারটা আমাদের নিকট সর্ব্বপেক্ষা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইয়াছে। পাশ্চাত্য সমাজেও যে এরূপ বিবাহ-কল্পনার একটা অসম্ভব এবং অত্যন্ত হাস্যকর দিক আছে,তাহা বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার মোলিয়রের The Shop keeper turned Gentleman (Gentilhomme) নামক নাটক পাঠে বুঝিতে পারা যায়। এই নাটকেও দেখি যে, একজন ব্যবসাদার প্রভূত ধনশালী হইয়া প্রতিজ্ঞা করে যে তাহার কন্যার একজন লর্ড কিম্বা রাজপুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিবে। মেয়েটির একটি মধ্যবিত্ত প্রণয়ী ছিল। সে বেচারা যখন কন্যার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হইল, তখন সে নিরুপায় হইয়া তাহার এক বন্ধুর সাহায্যে তুর্কী যুবরাজ সাজিল। তখন আর বিবাহে কোন বাধা রহিল না; এবং অবিলম্বে মহা আড়ম্বরে তুর্কী ফ্যাসানে বিবাহ হইয়া গেল। এই দৃশ্যগুলি সমস্তই হাস্যরসাত্মক; সুতরাং নাট্যকারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। মোলিয়র যে ব্যাপার লইয়া হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন 'শুভদৃষ্টি'র গ্রন্থকার তাহাই আমাদের দেশে স্বাভাবিক বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন দেখিয়া এত কথা বলিতে হইল।

কিন্তু এই সকল দোষ সত্ত্বেও নাটকখানি উপভোগ্য হইয়াছে। জমীদার ঘনবরণ, তস্য বন্ধু প্যারীচাঁদ, দালাল শ্যামলাল এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শিরোমণি—এই সকল চরিত্র সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। ভাষাটি ভাল এবং কথোপকথনে স্বাভাবিকতা আছে। ছাপা ও কাগজ অনিন্দ্য।

প্রবাস-প্রসূন—শ্রীঅতুলচন্দ্র মিত্র প্রণীত। পুরুলিয়া হইতে গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত। ডিমাই দ্বাদশাংশিত ১০০ পৃষ্ঠা। মূল্য ৸৹

বইখানির নামের নিম্নে লেখা রহিয়াছে 'কতিপয় পৌরাণিক স্থানের ইতিহাস'; কিন্তু দেখিতেছি ইহা একটি ভ্রমণ-কাহিনী। ভ্রমণ-কাহিনী ও ইতিহাস যে এক নহে তাহাও কি লেখক জানেন না? তবে যদি এই সকল ভ্রমণ-বৃত্তান্ত উপলক্ষ্য করিয়া তিনি আমাদিগকে বর্ণিত স্থানসমূহের ইতিহাস উপহার দিতেন তাহা হইলেও তাঁহাকে দোষ দিবার কারণ থাকিত না। কিন্তু কেবল পুণা-সহরের বিবরণ প্রসঙ্গে চাঁদবিবির উল্লেখ ব্যতীত তিনি কোথাও ইতিহাসের ধার দিয়া যান নাই। অথচ পুণার সহিত বিজাপুর-রাণী চাঁদবিবির সম্পর্ক কি তাহাও ত এ পর্য্যন্ত কোন ইতিহাসেই পাওয়া যায় নাই। মোটকথা, গ্রন্থখানিতে জব্বলপুর, বোম্বাই, পুণা, নাসিক প্রভৃতি কয়েকটি স্থানের অত্যন্ত সাধারণ বিবরণের সহিত লেখকের নিজের কথাই পাঁচকাহন দেখিতে পাই। এরূপ অসার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আর পড়িয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। লেখকের ভাষাজ্ঞানও অপূর্ব্ব। ভূমিকাতেই নমুনা—'এরূপ ইতিহাস-প্রণয়নে যেরূপ বিস্তৃত জ্ঞান ও বিদ্যার আবশ্যক, আমার সে বিষয়ে যথেষ্ট অভাব।' পুস্তকের সর্ব্বত্র এইরূপ ব্যাকরণের শ্রাদ্ধ। আর বর্ণাশুদ্ধির ত কথাই নাই। অন্ততঃ ডজন খানেক করিয়া ভুল প্রতি পৃষ্ঠায় চোখে পড়িবে। কবিবর হেমচন্দ্র 'বাঙ্গালীর মেয়ে'র উপর বড় অবিচার করিয়াছেন। কারণ দেখা যাইতেছে, সমালোচ্য গ্রন্থের লেখকের ন্যায় বঙ্গ-পুরুষেরও 'কলাপাতে না এগুতে গ্রন্থলেখা সাধ' হয়।

"শ্যামচাঁদ।"

কয়েকটি কবিতা। শ্রীশচীন্দ্রলাল দাসবর্ম্মা, বি-এ প্রণীত। কলিকাতা "কান্তিক প্রেসে" শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত—১৩২২। ডবলক্রাউন ১৬ পেজি ৫১ পৃষ্ঠা, কাগজের মলাট, মূল্য ।৵০

এ গ্রন্থে কি আছে, নামেই তাহা প্রকাশ। একটা জিনিষ নাই—তজ্জন্য গ্রন্থকার আমাদের ধন্যবাদার্হ—হাল ফেসান অনুসারে, "লব্ধপ্রতিষ্ঠ" কোনও সাহিত্যিক কর্ত্তৃক লিখিত ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যাকথাপূর্ণ "ভূমিকা" ইহাতে নাই। এই ভূমিকা-ব্যাধি নবীন গ্রন্থকারগণের মধ্যে এপিডেমিক আকারে প্রবেশ করিয়াছে।

শচীন্দ্রবাবু বোধ হয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই নূতন প্রবেশ করিলেন। সুতরাং স্থানে স্থানে যে কাঁচা হাতের চিহ্ন প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে, তাহা অনিবার্য্য। স্থানে স্থানে ছন্দ পতন আছে, ভাষার দোষ আছে, ভাবেও ত্রুটি আছে—কিন্তু সে সকলের ফিরিস্তি দিয়া কোনও লাভ নাই। তবে মাঝে মাঝে দুই একটি কবিতা আমাদের ভালই লাগিয়াছে, এবং পরে তিনি আরও ভাল লিখিতে পারিবেন, বর্ত্তমান গ্রন্থপাঠে এ আশা করিতে পারা যায়।

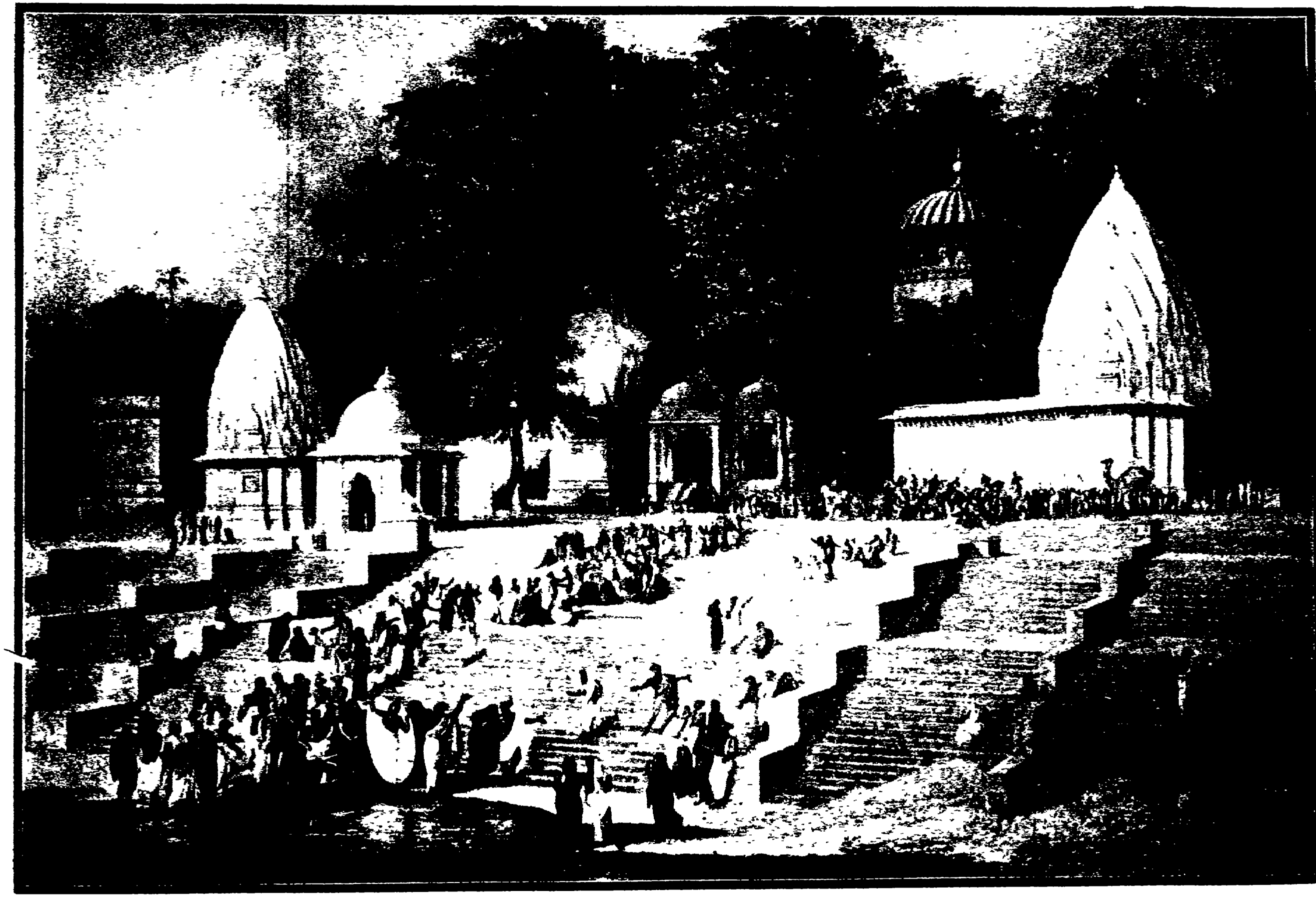
শেষ মিনতি

(গান)

এই যদি হয় বিচার তোমার—
তাই হবে গো তাই হবে,
নখের মাথা ক্ষয় করে আর
গুণ্‌বোনা 'সে দিন কবে';
রইল পায়ে এই মিনতি
ওগো আমার চরম গতি,
পাই যেন গো শেষের দেখা
শেষ বিদায়ের দিন যবে;
এই যদি হয় বিচার তোমার—
তাই হবে গো তাই হবে।

বারাকপুর, বিজনালয়
১৮ই পৌষ, ১৩২২

শ্রীজ[illegible]েন্দ্রনাথ রায়।



MANASI PRESS.

সতী দাহ।

(সত্য ঘটনা)

[ক্যাপ্টেন্ গ্রিগুলে নামক একব্যক্তি,বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভ-ভাগে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কর্ম্ম করিতেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার নাম্ "Scenery, Costumes and Architecture Chiefly on the Western side of India." এই দুষ্প্রাপ্যগ্রন্থখানি হইতে একটি প্রবন্ধের অনুবাদ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। "সতীদাহের আয়োজন" নামক এ মাসের ত্রিবর্ণ চিত্রটি এই গ্রন্থ হইতে গৃহীত। ভূমিকায় গ্রন্থকার অঙ্গীকার করিয়াছেন, সমস্ত চিত্রগুলি বাস্তব, কোন খানি কল্পিত নহে।]

হিন্দু-ধর্ম্মবিহিত বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে, মৃত স্বামীর চিতায় বিধবার স্বেচ্ছাকৃত আত্মবিসর্জ্জনই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়।

এই ভয়ঙ্কর প্রথাটি যে অতি প্রাচীন, তাহা ডাইওডোরস্ সাইকিউলস্ লিখিত গ্রন্থপাঠেই জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

"অ্যান্টিগোনস্ ও ইউমিনিস্ যখন পরস্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তখন একদিন ইউমিনিস্, অ্যান্টিগোনসের নিকট নিজ সৈন্যের মৃতদেহগুলি সংকার করিবার জন্য অনুমতি গ্রহণ করেন। এই সময়ে একটি অদ্ভুত কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। মৃতের মধ্যে একজন ভারতীয় সৈনিক ছিল, তাহার দুই স্ত্রী ;—উভয়েই স্বামীর সহিত আসিয়াছিল। এক স্ত্রীকে সে অল্পদিন পূর্ব্বেই বিবাহ করিয়াছিল। বিধবার বাঁচিয়া থাকা ভারতীয় শাস্ত্রানুমোদিত নহে। স্বামীর চিতায় পুড়িয়া মরিতে অসম্মত হইলে আমরণ তাহাকে নিন্দিত ও অপমানিত জীবন যাপন করিতে হয়। সে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে না, কোনও প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদানও তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। কিন্তু শাস্ত্রে এক স্ত্রী পুড়িয়া মরিবার কথাই আছে, এ ক্ষেত্রে দুই স্ত্রী বর্ত্তমান, উভয়েই সে সম্মান দাবী করিতে লাগিল। এই উপলক্ষে উভয়ের মধ্যে তুমুল কলহ বাধিয়া গেল। জ্যেষ্ঠা বলিল—"আমি জ্যেষ্ঠা, আমিই এ গৌরবের ন্যায্য অধিকারিণী।" কনিষ্ঠা কহিল—"তুমি অন্তঃসত্ত্বা, শাস্ত্রানুসারে তোমার পুড়িয়া মরা নিষিদ্ধ।" অবশেষে কনিষ্ঠারই জয় হইল। জ্যেষ্ঠা তখন নিজ পরিধেয় বসন ও মস্তকের কেশ ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে, বিলাপ করিতে করিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল—যেন তাহার কতই না দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে। কনিষ্ঠা সানন্দে বিবাহোচিত বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া, হাসিতে হাসিতে সগর্ব্বে দাহস্থানে উপনীত হইল। নিজ বসনভূষণ সখিগণকে বিতরণ করিয়া, সকলের নিকট শেষ বিদায় লইয়া অবিচলিত পদক্ষেপে জ্যেষ্ঠভ্রাতার সাহায্যে স্বামীর চিতায় আরোহণ করিল। সমবেত দর্শকমণ্ডলী হর্ষসূচক চীৎকার ও হরিধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল।"

যে পরিবারে কেহ "সতী" হয়, সমাজ মধ্যে সে পরিবারের যশের সীমা থাকে না। যে ব্রাহ্মণ এ ব্যাপারে পৌরহিত্য করেন তাঁহার মান ও দক্ষিণা দুই-ই বাড়িয়া যায়। এমন কি দেশীয় রাজপুরুষগণ জাঁক জমকের সহিত সতীদাহ স্থানে আসিয়া দর্শকরূপে দণ্ডায়মান হন।

বিধবারা শুধু সাময়িক কৃত্রিম উত্তেজনার বশেই এরূপ অস্বাভাবিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় সন্দেহ নাই। তবে সব সময়ে একথা খাটে না। মেজর কার্ণাক বরোদারাজ্যে রেসিডেণ্ট থাকার সময় নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটিয়াছিল।

বরোদা-নিবাসী একজন দক্ষিণী ব্রাহ্মণ, গোয়ালিয়র-রাজ দৌলৎরাও সিন্ধিয়ার অধীনে কারকুণের কর্ম্ম করিতেন। ১৮১৫ সালে তাঁহার পত্নী (বরোদায়) এক রজনীতে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। এই স্বপ্ন দর্শন করিয়া কয়েকদিন অবধি তাঁহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া রহিল।

একদিন কূপ হইতে জলের কলসী মাথায় করিয়া তিনি গৃহে ফিরিতেছিলেন। গলার হারই সে দেশে সধবার চিহ্ন, সেটি তিনি কলসীর গলায় রাখিয়া আনিতেছিলেন। হঠাৎ একটা কাক পড়িয়া কলসীর গলা হইতে সেই হার মুখে লইয়া উড়িয়া পলাইল। এইরূপ দুর্নিমিত্ত ঘটায় ভয়ে ও চিন্তায় ব্রাহ্মণকন্যা অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। কলসী সেখানেই আছাড়িয়া ফেলিয়া গৃহে আসিয়া বলিলেন—"আমি সতী হইব।"

রেসিডেণ্ট সাহেব এই সংবাদ পাইবামাত্র সেই ব্রাহ্মণগৃহে গিয়া স্ত্রীলোকটিকে অনেক বুঝাইলেন, এ কার্য্য হইতে তাঁহাকে বিরত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না। সাহেব তখন বরোদা মহারাজের নিকট গিয়া সমুদয় বিবরণ কহিলেন। তাঁহার অনুরোধক্রমে মহারাজও স্বয়ং সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গিয়া স্ত্রীলোকটিকে অনেক প্রকার বুঝাইলেন। বলিলেন, "তোমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে এমন সংবাদ কিছুই পাওয়া যায় নাই, কেন তুমি অকারণ আত্মহত্যা করিতে যাইতেছ? যদি সত্য সত্যই তোমার স্বামী মরিয়া থাকেন, তুমি যাবজ্জীবন রাজসরকার হইতে খোরপোস পাইবে, তোমার স্বামীর উপার্জ্জনের উপর আর যাহার যাহার অশন বসন নির্ভর করিত, সকলকেই আমি প্রতিপালন করিব, তুমি এ সংকল্প পরিত্যাগ কর।" কিন্তু তথাপি তিনি অটল রহিলেন। মহারাজ তখন নিজ সিপাহীগণকে আদেশ দিয়া আসিলেন—"তোমরা এ বাড়ীর চারিদিকে অষ্টপ্রহর পাহারা দাও, সাবধান যেন কোনও ক্রমে স্ত্রীলোকটি বাহিরে না যাইতে পারে।"

মহারাজ প্রস্থান করিলে, সিপাহীগণকে তিনি অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন—"কেন তোমরা আমায় আট্‌কাইয়া রাখিয়াছ, ছাড়িয়া দাও।" কিন্তু সিপাহীরা রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সাহস করিল না। অবশেষে স্ত্রীলোকটি একখানা ছোরা আনিয়া সিপাহীদিগকে বলিলেন—"তোমরা যদি আমায় ছাড়িয়া না দাও, এই ছোরা আমি নিজের বুকে মারিব। ব্রহ্মরক্তপাতে তোমাদের রাজ্য ছারখার হইয়া যাইবে।"—ইহা দেখিয়া ভয়ে সিপাহীরা পথ ছাড়িয়া দিল।

রমণী তখন প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া ধীরে ধীরে নদীতীরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি আত্মীয় বন্ধুগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সকলে আসিয়া পৌঁছিল। চিতা রচিত হইল। স্বামীর একটি অন্নগঠিত মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সেটি চিতায় স্থাপন করিয়া রমণী স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করিলেন। তাহার পর অবিকম্পিত পদে, চিতায় উঠিয়া অন্নমূর্ত্তি স্বামীর পদতলে উপবেশন করিলেন। তাহার পর, চিতা জ্বলিয়া উঠিল।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ঘটনার তিন সপ্তাহ পরে, স্ত্রীলোকটির স্বামীর মৃত্যু সংবাদ আসিল। লোকে হিসাব করিয়া দেখিল, ব্রাহ্মণের মৃত্যুর সময়টি, তাঁহার সাধ্বী স্ত্রীর স্বপ্নদর্শন-সময়ের সহিত মিলিয়া গিয়াছে।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

জাতীয় সাহিত্য *

"নানান্ দেশের নানান্ ভাষা,
বিনা স্বদেশের ভাষা—পূরে কি আশা !"

বঙ্গভাষা আজ আর উপেক্ষিত নহে, বাঙ্গালী বলিয়া যাঁহারা গর্ব্ব করেন, তাঁহাদের নিকট বঙ্গভাষা বরং অপেক্ষিত। যখন বাঙ্গালীর ছেলে, বঙ্গভূমির বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া বাঙ্গালা ভাষায় কথা বলা, বা বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ অধ্যয়ন করাকে লজ্জাজনক, কতকটা বা প্রত্যবায়জনক মনে করিতেন, সে দুর্দ্দিন কাটিয়া গিয়াছে, সে মোহ ভাঙ্গিয়াছে।

মহাকবি কৃত্তিবাস হইতে কবিবর ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বহু মনস্বী বঙ্গসন্তান, বঙ্গবাণীর স্বর্ণমন্দির রচনায় সাহায্য করিয়াছেন, রাজা রামমোহন, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, অমর বঙ্কিমচন্দ্র, চিন্তাশীল অক্ষয়কুমার প্রভৃতি বহু প্রতিভাশালী সারস্বতগণ সেই মন্দির গাত্র নানাবিধ শিল্পসৌন্দর্য্যে খচিত করিয়াছেন। বঙ্গভাষা এখন বাঙ্গালীর একটা প্রকৃত স্পর্দ্ধার পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে জাতির নিজের পরিচয়যোগ্য ভাষা নাই, বা নিজের জাতীয় সাহিত্য নাই, সে জাতি বড়ই দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালী ভারতের যে প্রাচীন মহাবংশের ভগ্নাংশ, সেই প্রাচীন আর্য্যজাতির ভাষা এবং সাহিত্য-ভাণ্ডার অনন্ত ও অমূল্য রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ। সুতরাং বাঙ্গালীকে নিজের জাতীয় সাহিত্য-গঠনে সম্পূর্ণরূপে পরের প্রত্যাশী হইতে হয় নাই। জগতের অপর অপর শিক্ষিত ও সমুন্নত জাতির সমক্ষে, নিজের জাতীয় সাহিত্য লইয়া দাঁড়াইবার যোগ্যতায় বাঙ্গালী এখন বঞ্চিত নহে, একথা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমানে বঙ্গভাষার যতটা শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, ইহাই যে বর্দ্ধিষ্ণু বঙ্গবাসীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত, একথা আমি কদাচ স্বীকার করিতে পারি না।

ক্ষেত্র-কর্ষণ পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্য হইলেও সেই কর্ষিত ক্ষেত্রে বীজবপন ও উপযুক্ত সেচনাদির দ্বারা অঙ্কুরিত বীজের রক্ষণ এবং পরিবর্দ্ধন, অধিকতর পরিশ্রমসাধ্য ও বিবেচনা-সাপেক্ষ। অঙ্কুরিত শস্যের আপদ্ অনেক। সেই সমস্ত আপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া শস্যকে ফলোন্মুখ করিয়া তোলা বড়ই দক্ষতা-সাপেক্ষ। যে সময়ে জলসেচনের প্রয়োজন তখন জল, যখন আতপ নিবারণের প্রয়োজন তখন ছায়ার ব্যবস্থা আবশ্যক। এই সমুদয়ের কোন একটির অভাবেই কর্ষিত ভূমি শস্য-শালিনী হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের বঙ্গভাষার সম্বন্ধেও ঐ রীতির অনুসরণ বিধেয়। বহুকাল, বহুশত বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কৃত্তিবাস প্রভৃতি সাধকগণ তাঁহাদের আরাধ্য বঙ্গভাষার ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী অনেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি, সেই কর্ষিত ভূমির উর্ব্বরতা বর্দ্ধনের নিমিত্ত নানা আয়াস করিয়াছেন। দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের এখন, সেই ভূমির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে; সকলেই সুফলের আশায় সেই ভূমির দিকে লোলুপনয়নে চাহিতেছেন। কত উচ্চ আশায় উৎফুল্ল হইয়া নিজের মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি ও আদর সহকারে দৃষ্টিপাত করিতেছেন; এমন সময়ে, দেশবাসীর এই আকাঙ্ক্ষা-পূর্ণ, উৎকণ্ঠাপূর্ণ সময়ে ঐ কর্ষিত ভূমিতে বীজ বপন করিতে হইবে। সুতরাং তাহাতে যে কত সতর্কতার প্রয়োজন, কত পূর্ব্বাপর বিবেচনার প্রয়োজন, তাহা বঙ্গবাসিমাত্রেরই বিশেষ বিবেচ্য। এতদিনের চেষ্টায় যে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্র পরিপাটীরূপে প্রস্তুত হইয়াছে, আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যদ্ বংশধরগণের অবিবেচনার ফলে, তাহা যেন নষ্ট না হয়, তাহার উর্ব্বরতা যেন কতগুলি আবর্জ্জনাজনিত ক্ষারদাহে দগ্ধীভূত না হয়, ইহাই আমার অভিলাষ।

* উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের নবম অধিবেশনে রঙ্গপুরে সভাপতি কর্ত্তৃক বিগত ১৯শে চৈত্র তারিখে পঠিত।

"বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ" কেন বলিলাম, তাহাই বিবৃত করিতেছি।

এতকাল অর্থাৎ প্রায় গত সার্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গ-ভাষা যে ভাবে, যে গতিতে বঙ্গীয় জনসমাজে প্রসার লাভ করিতেছিল, এখন বঙ্গভাষার সেই গতির ক্ষিপ্রতা ক্রমেই বাড়িতেছে। পূর্ব্বে ছিল, যাঁহারা শিক্ষিত, কি প্রতীচ্য কি প্রাচ্য, উভয়বিধ শিক্ষার কোন একটিতে যাঁহারা সম্পন্ন, বঙ্গভাষার কতিপয় কমনীয় গ্রন্থ সেই অল্প সংখ্যক ব্যক্তির অবসরবিনোদনের উপাদান মাত্র হইত। কার্য্যান্তরব্যাবৃত্ত চিত্তকে কদাচিৎ প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহারা বঙ্গভাষার গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেন। প্রকৃত-পক্ষে যাহাদের লইয়া বঙ্গদেশ, যাহাদিগকে বাদ দিলে বাঙ্গালা দেশের প্রায় সমস্তই বাদ পড়ে, সেই বঙ্গের আপামর সাধারণের মধ্যে বঙ্গভাষার আদর কতটা ছিল? এক প্রকার ছিলই না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কৃত্তিবাস কাশীদাস ব্যতীত অপর কয়জন বঙ্গসাহিত্য-রথীর নাম বঙ্গের জন সাধারণের মধ্যে সুপরিচিত? শিক্ষিত-জনসঙ্ঘের সংখ্যা সাত কোটি বঙ্গবাসীর তুলনায় মুষ্টিমেয় বলিলেও অতিরঞ্জন হয় না। এই মুষ্টিমেয় সমাজে যে বঙ্গভাষা এত দিন আবদ্ধ ছিল, এখন সেই বঙ্গভাষা অতি ক্ষিপ্রগতিতে বাঙ্গালার সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসার লাভ করিতেছে। সুতরাং এই সময়ে ভাষা যাহাতে সংযত-চরণে চলে, যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল না হয়, সে পক্ষে বঙ্গের জাতীয় জীবনের উদ্বোধন-কর্ত্তাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আর সেই সঙ্গেই, আমাদের সুন্দরী মাতৃভাষা কি উপায়ে সুন্দরীতমা হইতে পারে, তাহাও ভাবিতে হইবে। কেবল গীতিকাব্য, মহাকাব্য বা গল্পগুচ্ছে জাতীয় সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। জাতীয় সাহিত্যের বিরাট্ সৌধের চত্বরে শিল্প, বিজ্ঞান, বার্ত্তাশাস্ত্র, সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্ম-নীতি,—সর্ব্ব প্রকার রত্নের সমাবেশ আবশ্যক। সর্ব্ববিধ কলার বিলাসে জাতীয় সাহিত্য-মন্দির বিলসিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথা তাহাকে অসঙ্কোচে "জাতীয় সাহিত্য" বলিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান কালে, যখন, বঙ্গভাষার প্রতি জন-সাধারণের দৃষ্টি অল্পবিস্তর ভাবে নিপতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন, বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ ভাষার গতিকে, বঙ্গবাসীর ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের অনুকূলভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতে হইবে। জাতীয়তা গঠন করিতে হইলে জাতীয় সাহিত্য গঠন সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। সেই জাতীয় সাহিত্য কিরূপভাবে গঠিত হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে, কি প্রকারে, কোন্ দিকে জাতীয় সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে ভবিষ্যতে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে, সেই সম্বন্ধেই আমি দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

আমাদের দেশে "শিক্ষিত" বলিতে আমরা কি বুঝি? সর্ব্বসাধারণে কোন্ সম্প্রদায়কে "শিক্ষিত" বলিয়া স্বীকার করে? বর্ত্তমান কালে, আমাদের দেশে শিক্ষার কেন্দ্র মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-প্রাপ্ত হন, দেশবাসিগণ অসঙ্কোচে তাঁহাদিগকেই শিক্ষিত আখ্যা এবং শিক্ষিতের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করেন। ভারতবর্ষের নানা বিপ্লবের মধ্যেও যাঁহারা পরম যত্নে বুকে বুকে রাখিয়া, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্ররাজি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সেই সংস্কৃত-ব্যবসায়ী অধ্যাপক-বর্গের আসন দেশবাসী এখনও অনেক উচ্চে প্রদান করিয়া থাকেন; যদি অধ্যাপকবৃন্দ আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন, তবে উত্তরকালেও সে উচ্চাসনে তাঁহারা অধিকারী থাকিবেন, সত্য, কিন্তু সংখ্যাগত হিসাব ধরিলে, বঙ্গের প্রতি পল্লীতেই প্রায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সদ্ভাব পরিদৃষ্ট হয়। যেখানে হয়ত পূর্ব্বে পাশ্চাত্য শিক্ষার আদৌ প্রচার ছিল না, বর্ত্তমানে, সেস্থানেও উক্ত শিক্ষার প্রতি লোকের আদর দেখা যাইতেছে। যেরূপ ভাবে, গত কতিপয় বৎসরের মধ্যে, ইংরাজী শিক্ষার ভূয়ঃপ্রচার ঘটিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, অদূরবর্ত্তী সময়ে বঙ্গে, যথায় ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব এমন পল্লী থাকিবে না। সুতরাং বঙ্গের ভবিষ্যৎ জন-মত পরিচালনের এবং জন-সাধারণের মত-গঠনের ভার উক্ত শিক্ষিতগণের হস্তেই ক্রমে ন্যস্ত হইবে। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ

শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব জন্মভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, যদি অকপট ভাবে ইচ্ছা করেন, তবে, তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিবেশীদিগের, চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবেন। তাঁহাদের পল্লীবাসিগণ তাঁহাদিগের নিকটে অনেক আশা করেন। যে যে পল্লীতে তাঁহাদের বাস, সেই পল্লীর এবং তৎ তৎ সমাজের সর্ব্ববিধ উৎকর্ষাপকর্ষের জন্য তাঁহারাই অনেকটা দায়ী। আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক এবং স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় অনেকটা দায়ী, কেন না লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বাদ দিলে মানুষের আর কিছুই থাকে না, সেই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণপূর্ব্বক, যদি তাঁহারা বিবেচনা সহকারে লোকমত পরিচালনা করিতে পারেন, তাঁহাদের প্রতিবেশীরা অম্লানমনে, তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিবে। যে যে গুণ থাকিলে, মানুষের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাজন হওয়া যায়, শিক্ষিতগণের শিক্ষা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই গুণে সম্পন্ন হইতে হইবে। দয়া, সমবেদনা, পরদুঃখকাতরতা, সত্যপ্রিয়তা, বিনীতভাব প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে হৃদয়কে সম্পন্ন করিতে পারিলেই প্রকৃত পক্ষে শিক্ষার ফল ফলিয়াছে, বলা যাইতে পারে। অন্যথা কেবল পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতাকেই শিক্ষার চরমফলপ্রাপ্তি বলিতে পারি না। স্বজাতিকে আত্মমতের অনুকূল করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে স্বজাতির শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ আবশ্যক, একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেবল সামাজিক, বা কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনে সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধন হয় না। প্রাত্যহিক কার্য্যের যেমন একটা তালিকা অন্ততঃ মনে মনে থাকিলেও কার্য্যের শৃঙ্খলা হয়, সময়ের সদ্ব্যবহার হয়, তদ্রূপ জাতীয় সাহিত্য যদি সুগঠিত হয়, তবে সেই সাহিত্যের দ্বারা জাতীয়তা গঠনের পক্ষেও বিশেষ সহায়তা ঘটে। এই জাতীয় সাহিত্য গঠনের প্রকৃত ভার এখন ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের হস্তেই ন্যস্ত হইতেছে। অবকাশ মত, কোন ভাবুক, ভাবের স্রোতে ভাসিয়া দু'একটি কবিতা রচনা করিলেন, বা চিন্তাপূর্ণ দু'একটা প্রবন্ধ পাঠ করিলেন. তাহাতে জাতীয় সাহিত্যের প্রকৃত গঠন হইবে না। তপস্যার ন্যায় একাগ্রতা-পূর্ণ চেষ্টায় ঐ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায়ও বঙ্গভাষার অধ্যাপনা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাঁহারা শিক্ষালাভ করিতেছেন, তাঁহারা উভয়বিধ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছেন। বঙ্গভাষায়ও তাঁহারা পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন হইতেছেন। এই ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের হস্তে বঙ্গভাষার ভবিষ্যদ্ উন্নতির ভার নিহিত। সুতরাং তাঁহাদের এ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে দু'একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এই ইংরাজী শিক্ষিতগণ যদি, একটু আদরের সহিত স্ব স্ব মাতৃভাষার আলোচনা করেন, মাতৃভাষারই হিতকল্পে মাতৃভাষার আলোচনা করেন, তবে তাহাতে সুফলের আশা অনেক। দেশের যাঁহারা উচ্চশিক্ষাবর্জ্জিত, সেই জনসাধারণকে তাঁহারা অতি অল্প আয়াসেই মাতৃভাষার প্রতি অধিকতর আগ্রহ-সম্পন্ন করিতে পারিবেন। কেন না,—তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মত গঠনের ও সাধারণ সদনুষ্ঠানের প্রধান উপকরণ বা এক হিসাবে কর্ত্তা হইবেন। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে, ঐ মাতৃভাষাকে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বরেণ্য করিয়া তোলা ইংরাজী শিক্ষিতগণের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। কেননা, তাঁহারা প্রতীচ্য ভাষায় পারদর্শী হইয়া, সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। লোকসমাজের স্পৃহণীয় আসনে উপবেশন করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেছেন,—তাঁহাদের কথার, তাঁহাদের আচার ব্যবহারের, তাঁহাদের আচরিত রীতিনীতির উপর জনসাধারণের মঙ্গলামঙ্গল নিহিত। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অতি সহজেই সাধারণকে স্বমতের বশবর্ত্তী করিতে পারিবেন। সুতরাং তাঁহাদের কর্ত্তব্য বড়ই গুরুতর। তাঁহাদের সামান্য স্খলনে, সামান্য উপেক্ষায়, একটি মহতী জাতির —উদীয়মান জাতিরও স্খলন বা অধঃপতন হইতে পারে।

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ"

এই মহাবাক্য স্মরণপূর্ব্বক, তাঁহাদিগকে পাদক্ষেপ করিতে হইবে। তরণীর কর্ণধারের অনেক সতর্কতা আবশ্যক। অন্যথা নিমজ্জনের আশঙ্কা বলবতী।

যাহারা বঙ্গের অশিক্ষিত, বা অল্পশিক্ষাপ্রাপ্ত, তাহারা যে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া, পরে আবার বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবে, এরূপ আশা কদাচ করা যায় না। তাহাদিগকে, সেই mass অর্থাৎ সাধারণ জনসঙ্ঘকে,সৎপথে পরিচালিত করিতে যেমন দেশের শিক্ষিতগণই একমাত্র সমর্থ, সেইরূপ, তাহাদিগকে অসৎপথে—উৎসন্নের পথে অধঃপতিত করিবার ক্ষমতাও তাঁহাদেরই হস্তে। সরলবিশ্বাস-সম্পন্ন, জনসঙ্ঘের চিত্ত, শিক্ষিতগণ শিক্ষার চাক্‌চিক্যে বশীভূত করিয়া, যে দিকে ইচ্ছা প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন। সুতরাং শিক্ষিতগণের হস্তে দেশের প্রকৃত সম্পদ্ এবং বিপদ্ এই দুইএরই হেতু নিহিত রহিয়াছে। এক হিসাবে ইহাও এক মহা আতঙ্কের কথা, চিন্তার কথা! যাঁহাদের উপর দেশের সম্পদ্ বিপদ্—উভয়ই নির্ভর করিতেছে,—তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে কত গুরুতর, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

দেশের জন-সঙ্ঘকে যদি সৎপথেই লইয়া যাইতে হয়,—মানুষ করিয়া তুলিতে হয়,—বাঙ্গালী জাতিকে একটা মহাজাতিতে পরিণত করিতে হয়, তাহা হইলে, তাহাদিগের মনের সম্পদ্ যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য ভাষায় অনিপুণ থাকিয়াও, যাহাতে বঙ্গের ইতর-সাধারণ, পাশ্চাত্য প্রদেশের যাহা উত্তম, যাহা উদার এবং নির্ম্মল, তাহা শিখিতে পারে, এবং শিখিয়া আত্মজীবনের ও আত্ম-সমাজের কল্যাণ-সাধন করিতে পারে,—তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে যাহা নির্দ্দোষ,—আমাদের পক্ষে যাহা পরম উপকারক, যে সমুদয় গুণগ্রাম অর্জ্জন করিতে পারিলে, আমাদের সুন্দর সমাজদেহ ও দেশাত্মবোধ, আরও সুন্দরতর, সুন্দরতম হইবে, সেই সকল বিষয়, আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে বঙ্গের সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত করিতে হইবে। ক্রমেই যে ভয়ঙ্কর কাল আসিতেছে, সেই কালের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশবাসীদিগকে জয়ী করিতে হইলে, কেবল এ দেশীয় নহে, পাশ্চাত্য আয়ুধেও সম্পন্ন হইতে হইবে। দু'একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

প্রথমতঃ ইউরোপের ইতিহাস। ইতিহাস অল্প-বিস্তর প্রায় সকল জাতিরই কিছু না কিছু আছে। বর্ত্তমান কালে, ইউরোপ জগতের অভ্যুদিত দেশ-সমূহের শীর্ষস্থানীয়। সুতরাং ইউরোপের ইতিহাস আলোচনা-পূর্ব্বক দেখিতে হইবে, যে, কেমন করিয়া, কোন্ শক্তির বলে, বা কোন্ গূঢ় কারণে ইউরোপের কোন্ জাতির অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, কোন্ পথে পরিচালিত হওয়ায়, কোন্ জাতির কি উন্নতি হইয়াছে, সেই উন্নতির কারণ এবং পথ, আমাদের এদেশীয়গণের পক্ষে প্রযোজ্য কি না, তাহার প্রয়োগে আমাদের এদেশে কতটা মঙ্গলের সম্ভাবনা,—ইত্যাদি বিষয় বিশেষ বিবেচনার সহিত আলোচনা করিয়া, যদি সঙ্গত মনে হয়, এ দেশের পক্ষে হানিজনক না হয়, তবে, সেই পথে, আমাদের জাতিকে ধীরে ধীরে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। সেই প্রবর্ত্তনের একমাত্র সহজ পথ,—ঐ সকল কারণ, ঐ সকল উপায়, প্রণালী, অতি বিশদরূপে আমাদের মাতৃভাষার দ্বারা, সাধারণের মধ্যে প্রচার করা; এই প্রচারের একমাত্র কর্ত্তা, যাহারা ইংরাজী ভাষায় দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষায়ও যাহাদের বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছে, মাত্র তাঁহারাই, অন্যে নহে।

দেশের কল্যাণ কামনায় এবং স্ব মাতৃভাষার পরিপুষ্টি বাসনায় যাঁহারা এই মহাব্রতে দীক্ষিত হইবেন, তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য ইউরোপীয় ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা। মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রচারকর্ত্তাদের সামান্য ত্রুটিতে আমাদের অভ্যুদয়োন্মুখ জাতির মহা অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং দেশের শিক্ষিতগণের প্রতি পদবিক্ষেপেই বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

যেমন এই অভ্যুদয়ের কথা বলিলাম, তেমনই এই

সঙ্গে দেখিতে হইবে, কোন্ পথে যাওয়ায়, কোন্ দুর্নীতির আশ্রয়বশতঃ, ইউরোপীয় জাতির অধঃপাত ঘটিয়াছে, বা ঘটিতেছে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কোন্ জাতি উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরূঢ় হইয়াও কোন্ কর্ম্মের দোষে অধঃপাতের অতলতলে নিপতিত হইয়াছে, —পতনের সেই সেই কারণনিচয় অতি সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়া, সেই সেই সর্ব্বনাশের হেতুগুলি পরিহার করিতে হইবে। আমাদের মাতৃভাষার স্বচ্ছদর্পণে এই ভাবে দোষগুণের প্রতিবিম্বন পূর্ব্বক দোষের পরিহার ও গুণের গ্রহণের প্রতি দেশবাসীর আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য জন্মাইতে হইবে।

ইহকালই জীবনের সর্ব্বস্ব নহে। এই ইহকালকেই একমাত্র সার ভাবিয়া কার্য্য করার ফলে, ঐহিকবাদী ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ধর্ম্মভাব আদৌ নাই বলিলেই হয়, ধর্ম্মভাবের অত্যন্ত অভাবের ফলেই বর্ত্তমান শোণিত-তরঙ্গিণী রণভূমিতে ইউরোপ বিপর্য্যস্ত। ইউরোপের ঐ অসদ্ভাবের অর্থাৎ ঐহিকবাদিতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, বরং যতটা সম্ভব, উহার দূরে সরিয়া যাইয়া আমাদিগের জাতীয়তা ও চিরস্পৃহণীয় ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত রাখিতে হইবে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি, ধর্ম্মভাবের উপর স্থাপিত করিয়া, উহাতে পশ্চিমের গ্রহণযোগ্য বিষয়ের সমাবেশ পূর্ব্বক, সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করিতে হইবে। যাহা আছে, মাত্র তাহা লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এ দুর্দ্দিনে জাতীয়-সম্পদের যাহাতে বৃদ্ধি হয়, সর্ব্বতঃপ্রকারে, তাহা করিতে হইবে।

তার'পর ইউরোপের সাধারণ সাহিত্য অর্থাৎ কাব্য-নাটকাদি। আমার বোধ হয়, পাশ্চাত্য সাহিত্যের এই অংশে বিশেষ মনোনিবেশের প্রয়োজন। দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, গণিত প্রভৃতি জটিল বিষয় সমূহের আলোচনা অপেক্ষা, এই সমুদয় আপাতরম্য কাব্য নাটকাদির আলোচনায় ইংরাজী শিক্ষিতগণের অনেকেই কালক্ষেপ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তাহাদের অরুণ আভায় এই সকল বিদেশীয় চিত্র প্রথমতঃ বড়ই সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়। হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। আমাদের বিশেষ প্রণিধান সহকারে দেখা দরকার যে, পাশ্চাত্য সমাজের চিত্র তদীয় জাতীয় কাব্য নাটকাদিতে কি ভাবে প্রতিফলিত। ইউরোপের সামাজিক চিত্রাবলীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, হাবভাব, বিন্যাসকৌশল প্রভৃতি আমাদের সাহিত্যে এবং সমাজে গ্রহণযোগ্য কি না,—ঐ ঐ চিত্রাবলীর আদর্শে যদি আমরা স্বকীয় সমাজ-চিত্রের ছায়াপাত করি, তবে তাহাতে আমাদের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকিবে কি না, অথবা ঐ বিদেশীয় চিত্র আমাদের সাহিত্যে এবং সমাজে সম্পূর্ণরূপে পরিহার্য্য কি না,—এই চিন্তা হৃদয়ে বদ্ধমূল রাখিয়া ইউরোপীয় কাব্য নাটকাদি পাঠ করিয়া, উহার যে সকল অংশ উৎকৃষ্ট, অনুকরণীয় এবং কল্যাণ-জনক, তাহা আমাদের মাতৃভাষার সাহায্যে সাধারণের গোচর করিতে হইবে। সাধারণের মানস-সম্পদের উৎকর্ষ বিধান করিতে হইবে। এইরূপ করিতে পারিলে, আমার মাতৃভাষারও লাবণ্য বর্দ্ধিত হইবে। যাহা সৎ, যাহা সাধু, নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ, তাহা যে জাতির বা যে সমাজেরই হউক না কেন, সাগ্রহে গ্রহণ করিতে হইবে।

"গুণাঃ পূজাস্থানং
গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ"

এইভাবে জাতীয় সাহিত্য যদি গঠিত হয়, তবে সেই সাহিত্যের সাহায্যেই, আমাদের নব-জাত জাতীয়তা সুগঠিত হইবে, এবং জগতের অন্যান্য সভ্য জাতির সহিত আমরা সমকক্ষতা করিতে পারিব। অন্যথা সে সম্ভাবনা অতি অল্প। ইতিহাস এবং কাব্য-নাটক-উপন্যাসাদি সম্বন্ধে যে কথা বলিলাম, ইউরোপীয় দর্শন এবং অপরাপর কলা (art) প্রভৃতি সম্বন্ধেও ঐ কথাই প্রযোজ্য। যাহা কিছু বিদেশীয়, তাহাই উত্তম, সুতরাং আমাদের গ্রাহ্য, বা যাহা কিছু বিদেশীয়,তাহাই অস্পৃশ্য, সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য,—এইরূপ কথা বলিতে আমি সাহস করি না। বিদেশীয় বা স্বদেশীয় বুঝি না, যাহা উত্তম, তাহা যে দেশীয়ই হউক না কেন, সর্ব্বথা গ্রাহ্য, আর যাহা সর্ব্বথা দোষমুক্ত নহে, তাহা, আত্ম-পরজ্ঞান বর্জ্জনপূর্ব্বক, পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই সোজা

পথ ছাড়া, ইহার অন্য কোন সমাধান জাতীয় সাহিত্যের বা সমাজের অনুকূল হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। এমন অনেক প্রথা থাকিতে পারে, অথবা আছেও, যাহা, ইউরোপীয় সমাজের কতকটা অনুকূল হইলেও আমাদের সমাজের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। সেরূপ প্রথার প্রচলনে প্রয়াস করা যে কেবল পণ্ডশ্রম, তাহাই নহে; তাহাতে, আমাদের স্মরণাতীত কাল হইতে সুসংবদ্ধ সমাজেরও বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা। যেমন ইউরোপীয় বিবাহপদ্ধতি। পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে উহা যতই সুন্দর ও আপাতরম্য মনে হউক না কেন,—এ দেশের অস্থিমজ্জার সহিত যে সংস্কার অবিভাজ্যরূপে বিজড়িত, ঐ বিবাহপদ্ধতি সেই সংস্কারের এবং সেই সংস্কার-পরিচালিত ও পরিবর্দ্ধিত সমাজের পক্ষে কদাচ হিতকরী হইতে পারে না। সুতরাং তাদৃশী পদ্ধতির ঐন্দ্রজালিক চিত্রে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গ উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করা অনুচিত। যাহা তোমাদের সমাজের বা জাতীয়তার পরিপন্থী, তাহাকে আড়ম্বর-পূর্ণ সাজ-সজ্জায় সাজাইয়া, সৌন্দর্য্যের প্রলোভনে তোমার স্বজাতির আপামর সাধারণকে মজাইও না। মনে রাখিও, তুমি যে পথ আজ নির্ম্মিত করিয়া যাইতেছ, উত্তরকালে তোমারই দেশের শত সহস্র যাত্রী সেই পথে গমনাগমন করিবে। সুতরাং আপাত-প্রশংসার ও যশের প্রতি উদাসীন থাকিয়া, যাহা তোমার স্বজাতির এবং স্বসমাজের হিতকর, তাদৃশ চিত্র অঙ্কিত কর, তাদৃশ আদর্শ তোমার সাহিত্যের মন্দিরে স্থাপিত কর, যাহার অনুকরণে, তোমার ভবিষ্যৎ জাতি সমুন্নত হইবে। তোমার যে বিবাহপদ্ধতি আছে, পৃথিবীর অন্য কোন জাতির পদ্ধতি অপেক্ষা উহা নিকৃষ্ট নহে, প্রত্যুত অনেকাংশে উৎকৃষ্ট, সুতরাং ঐ উৎকৃষ্ট পদ্ধতির যে যে অংশ অশিক্ষিত, সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধারণ জন-সমাজে এখনও সম্পূর্ণরূপে অনুবোধিত হয় নাই, তাহা তোমার বঙ্গসাহিত্যের সাহায্যে ইতর-ভদ্র-নির্ব্বিশেষে, সর্ব্বসাধারণে প্রচারিত কর। এবং পার ত তোমার সেই উৎকৃষ্ট চিত্রের সম্মুখে, বিদেশীয় চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া তুলিয়া ধর, তুলনায় তোমার স্বজাতিকে বুঝাইয়া দাও, যে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা তোমার পক্ষে গ্রাহ্য ও তোমার সমাজের অনুকূল। মোহের ঘোরে যাহার মস্তিষ্ক বিকৃত, তাহার যাহাতে মস্তক শীতল হয়, সেইরূপ ভৈষজ্যের বিধান কর। যাহাতে রোগ বৃদ্ধি হয়, তোমার জাতীয়-চিকিৎসা-গ্রন্থে তাদৃশ ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া সমাজকে উৎসন্ন করিও না। তোমার প্রাচীন শাস্ত্রভাণ্ডারে যে সকল অমূল্য রত্নরাজি স্তূপীকৃত রহিয়াছে, এখনও যাহাদের আবরণ সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয় নাই, মাত্র কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণে এখনও যে সমুদয় রত্নের অতুল কান্তি নিরীক্ষণ করে নাই, তোমার জাতীয় সাহিত্যের সাহায্যে, সেই সেই রত্নের মালা গাঁথিয়া তোমায় স্বজাতির কণ্ঠে পরাইয়া দাও, তাহাদিগকে বুঝিতে দাও, শিখিতে দাও, দেখিতে দাও, এবং দেখিয়া, তুলনা করিয়া ভাল মন্দ বাছিয়া লইতে দাও; দেখিবে, তাহারা, এদেশের অপরাজিতা বা শেফালিকা ফেলিয়া, অন্যদেশের ভায়লেট্ মাথায় করিবে না। নিজেদের কি আছে, কি ছিল, ইহা যাহারা না জানে, তাহারাই পরের দ্বারে উপস্থিত হয়। তোমার স্বদেশবাসীদিগকে, তোমার প্রাচীন সম্পদের পরিচয় দাও, বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দাও, তাহাদের মনে আত্ম-সম্মান উদ্বুদ্ধ করিয়া তোল। তবেই ত তোমার জাতীয়তা গঠিত হইবে। সর্ব্বাগ্রে জাতীয় সাহিত্য গঠন কর, তবে ত জাতির গঠন হইবে। নতুবা সমস্তই আকাশ-কুসুম।

মনে কর, বিলাতের ব্যবস্থাপক সভা, (বা পার্লিয়ামেণ্ট) তোমার দেশের পক্ষে, বর্ত্তমান সময়ে, ঐরূপ সভার উপযোগিতা কতদূর তাহা বিশেষ বিবেচ্য। কিন্তু বিলাতের লোকতন্ত্র যেরূপ ভাবে গঠিত, তাহার পক্ষে, ঐ সভার উপযোগিতা প্রচুর। যে দেশের পক্ষে যাহা আবশ্যক, তাহাই যে এ দেশেরও আবশ্যক, ইহা বলা বড়ই দুষ্কর। দেশভেদে, দেশবাসিভেদে, দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাভেদে, এবং দেশের শিক্ষা-দীক্ষার ভেদে, দেশের পরিচালন-সভাসমিতিরও ভেদ অবশ্য-



মাননীয় বিচারপতি স্তর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, শাস্ত্রবাচস্পতি, নাইট,
এম-এ, ডি-এল, ডি-এস্-সি, সি-এস-আই, এফ-আর-এ-এস,
এফ-আর-এস-ই, এফ-এ-এস-বি।

MANASI PRESS.

স্থায়ী। সুতরাং তোমার দেশের পক্ষে তোমার প্রাচীন পদ্ধতিই অনুকূল, না বিদেশীয় পদ্ধতি অনুকূল, তাহা বিশেষ বিচার করিয়া, তোমার জাতীয় সাহিত্যের দর্পণে, ঐ উভয় ছবিরই দোষগুণের আলোচনা কর, এবং দেশ-বাসীদিগকেও বুঝিয়া লইতে দাও যে, কোন্‌টা তাহাদের গ্রাহ্য। মুক্ত পুরুষের ন্যায়, আর্ষ প্রকৃতির ন্যায়, নিরপেক্ষ হইয়া, লোকের হিতকামনায় সাহিত্য গঠন কর, দেশের ও জাতির মঙ্গল হইবে। ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের আদর্শে যদি তোমার স্বদেশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে চাও, মনে রাখিও, বর্ত্তমান সময়ে তোমার বিফলাশ হওয়াই সম্ভব। হৈমন্তিক শস্যের জন্য যে ক্ষেত্র প্রস্তুত, তাহাতে আশুধান্যের বীজ বপনে, মাত্র কৃষকের মনস্তাপের বৃদ্ধি হয়, আর সেই সঙ্গে বীজ ধ্বংস ও ক্ষেত্রের উর্ব্বরতাও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যে দেশের শাস্ত্রে, শিক্ষায় দীক্ষায় ও রাজনীতিতে রাজা মানব নহে, দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত, সেই ভারতবর্ষে, পাশ্চাত্য রাজনীতির ছায়াপাতে, সেই দেবতাকে আবার মানবের আসনে অধঃপাতিত করিও না। তোমার প্রাচীন রাজনীতির উজ্জ্বলচিত্র উত্তমরূপে নিজে নিরীক্ষণপূর্ব্বক, প্রতিভার সাহায্যে তাহা তোমার মাতৃভাষায় আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য রাজনীতির সহিত তুলনায় সর্ব্ব-সাধারণকে বুঝিতে দাও, যে, তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের, রাজনৈতিক ধারণা কত উচ্চ ছিল। গুপ্তহত্যা, রাজবিদ্বেষ এবং রাজদ্রোহ, কেবল ঐহিক নহে, পারত্রিক অকল্যাণেরও আকর, একথা তোমার ধর্ম্মশাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছে। যদি এই সকল কঠিন সমস্যা, মাতৃভাষার সাহায্যে সমাধান করিতে পার, তবেই, প্রকৃতপক্ষে, তোমার মাতৃভাষার সেবা সার্থক হইবে, তোমার জ্ঞানার্জ্জন সার্থক হইবে, আর সেই সঙ্গে, বঙ্গভাষার সেবা করিয়া তোমার জন্মও সার্থক হইবে। অবশ্য এই কঠিন কার্য্য এক সময়ে, বা একের দ্বারা কদাচ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু এই পথে যদি একবার তোমার জাতীয় সাহিত্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পার, তবে দেখিবে, আরও কত পথিক, তোমার প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিবে। পথ যদি, উত্তম, সুগম এবং সুশীতল ছায়া-সম্পন্ন হয়, তবে তাহাতে কোন দিনই যাত্রীর অভাব হয় না। যাহা ভাল, নিষ্পাপ এবং নির্দ্দোষ তাহার সেবা কে না করিতে চায়? সেই সেবায় সেবিতের লাভালাভ কিছুই নাই, কিন্তু সেবকের আত্মতৃপ্তি অপরিসীম। এই গুরুতর কার্য্যের প্রথম অনুষ্ঠাতৃগণের মনে রাখিতে হইবে, যে, কেবল অন্ধভাবে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদে বা মাত্র তাহার উজ্জ্বল অংশের প্রদর্শনেই, আমাদের ঐ মহৎ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে না; প্রত্যুত, তাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক। পাশ্চাত্য সাহিত্যের নিরপেক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনাপূর্ব্বক, তাহার অসদংশের বর্জ্জন করিয়া সদংশ, যাহা এদেশের অনুকূল, ঐ ঐ অংশ, যদি তাহাতে কোনরূপ দোষলেশ না থাকে, তবে, তাহাই আমাদের মাতৃভাষার কমনীয় আভরণে অলঙ্কৃত করিয়া, জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গনিবিষ্ট করিতে হইবে। এই ভাবে ইউরোপীয় সাহিত্যের গ্রাহ্য অংশগুলি যদি আমরা গ্রহণ করিতে পারি, তবেই—ক্রমে আমাদের বঙ্গভাষা আশাতীত ভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিবে। ইউরোপীয় ভাষায় [illegible] থাকিয়াও এদেশবাসীরা ইউরোপ[illegible] ফলে বঞ্চিত থাকিবে না। প্রত্যুত, ক্র[illegible] ফলে সম্পন্ন হইবে। প্রাচীন জাপান এই উপায় [illegible] অধুনাতন নবীন জাপানে উন্নীত হইতে পারিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই একটা বিষয় সর্ব্বদা আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। [illegible] উপরে নর্ত্তনাদি করিয়া [illegible] উৎপাদন করে, তাহারা যেমন, প্রধানতঃ [illegible] রাখে, যে, "অশ্বপৃষ্ঠ হইতে স্খলিত না হই",—তদ্রূপ, আমাদিগকেও সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা এই কার্য্য করিতে যাইয়া স্খলিত না হই। অর্থাৎ আমাদের যাহা মজ্জাগত সংস্কার, সেই পবিত্র ধর্ম্মভাব হইতে যেন বিচ্যুত না হই। আমাদের রাজনীতি, সমাজনীতি, প্রভৃতির কোনটিই ধর্ম্মভাবশূন্য নহে। ভারতবর্ষের মৃত্তিকায়

এমনই একটা গুণ আছে যে, এখানে ধর্ম্মভাববর্জ্জিত কোন বস্তুই স্থায়ী হইতে পারে না, এ পর্য্যন্ত পারে নাই। যাহাদের আহারে বিহারে, আচারে ব্যবহারে, সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান, তাহাদের জাতীয় সাহিত্যের কোনও চিত্র যদি ধর্ম্মভাব-ব্যঞ্জক না হয়, তবে তাহা কদাচ বাণীর পাদপদ্মে অর্পণ করা যাইবে না। সে চিত্র, গোধূলি গগনের লোহিত মেঘখণ্ডের মত,অতি অল্পকালের মধ্যেই বিলুপ্ত হইবে। সীতা সাবিত্রী, দময়ন্তী, লোপামুদ্রা, অরুন্ধতী প্রভৃতি যাহাদের জাতীয় সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী , রাম, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দধীচি, কর্ণ যাহাদের সাহিত্যের আদর্শপুরুষ, কবিগুরু রত্নাকর, মহর্ষি দ্বৈপায়ন, কবিকুলরবি কালিদাস, ভবভূতি যাহাদের জাতীয়-সাহিত্য-সঙ্গীতের গায়ক, আর সর্ব্বোপরি, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা যাহাদের শ্রৌতসঙ্গীতরূপ অমৃতের নির্ঝর, তাহাদের নবীন জাতীয় বঙ্গসাহিত্যে কোনরূপ অপবিত্র ভাব বা আচার যেন প্রবেশ না করে, তৎপক্ষে, সর্ব্বদাই প্রখর দৃষ্টির প্রয়োজন। সকল জাতিরই এক একটা লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। আছেও। লক্ষ্যহীন জাতি কদাচ অভ্যুদয়শালী ও কালজয়ী হইতে পারে না। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যে যে জাতি অভ্যুদিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই একটা না একটা স্থির লক্ষ্য ছিল। এবং সেই লক্ষ্য ধরিয়াই, তাহারা ক্রমে তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিতে পারিয়াছে। লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারিলে, কিছুই অসম্ভব নহে। অতি দুষ্কর এবং দুঃসাধ্য কার্য্যও সুসম্পন্ন করা যাইতে পারে। এই যে ইউরোপ এত অতুল ঐহিক শ্রীবৃদ্ধিতে সম্পন্ন, ইহার কারণ কি? অর্থ বা অর্থকর বাণিজ্য উহাদের একমাত্র লক্ষ্য। আজ যে জাপান এত উন্নত, ঐ অর্থকর বাণিজ্য উহার একমাত্র লক্ষ্য। ঐ লক্ষ্যের প্রতি স্থিরদৃষ্টি আছে বলিয়াই, অন্য কোন বাধাবিপত্তিতে উহাদিগকে ব্যাহত করিতে পারে না। লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইবার জন্য, প্রাণকেও উহারা অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে। লক্ষ্য স্থির ছিল বলিয়াই, ধর্ম্মপ্রাণ অগ্নি-উপাসকগণ অম্লানবদনে, ইরাণ ছাড়িয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আসিয়াছিলেন,—আমেরিকার পিউরিটানেরা মাতৃভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক, গহনবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। যে যে জাতি যে যে বৃহৎ কার্য্যই করুক না কেন, তাহার মূলে কিন্তু একটা স্থির লক্ষ্য থাকা চাই। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের এই জাতীয় সাহিত্যের মন্দির নির্ম্মাণেও একটা স্থির লক্ষ্য আবশ্যক। অন্যথা আমরা সফলকাম হইতে পারিব না। আমাদের সেই লক্ষ্য কি হওয়া উচিত? কোন্ লক্ষ্যে স্থিরচিত্ত থাকিয়া, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি হইতে পারিয়াছিলেন? কোন্ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হওয়া নিবন্ধনই আমরা ক্রমে অধঃপতিত হইতেছি? ইহাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে দ্রষ্টব্য ও বিবেচ্য।

ভারতবর্ষ যে এত উন্নত হইয়াছিল, সে একমাত্র ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া। যদি ভারতকে আবার বড় করিতে চাও, যদি আবার তোমাদের লুপ্ত সম্পদের, বিনষ্ট সম্মানের পুনরধিকার চাও, তবে সেই পিতৃপিতামহের লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির কর। একাগ্রচিত্ত হও, অবাধে তোমার অভিপ্রেত মৎস্যচক্র ভেদ করিতে পারিবে। ধর্ম্মভাব হিন্দু জাতির প্রধান লক্ষ্য ছিল, ধর্ম্মভাবকেই তোমার বর্ত্তমান জাতীয়তারও প্রধান লক্ষ্য কর। তোমার সাহিত্য, তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, আচার, ব্যবহার, সর্ব্বত্রই সেই ভারতস্পৃহণীয় ধর্ম্মভাবের স্ফুরণ কর। দয়া, সমবেদনা, পরার্থপরতা, সত্য, তিতিক্ষা, প্রেম প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে তোমার সাহিত্য-কানন যদি সম্পন্ন করিতে পার, তবেই তোমার জাতীয় অভ্যুদয় হইবে। অন্যথা যাত্রার দলের প্রহ্লাদের ন্যায়, তুমি ভক্তের ভাণ করিবে মাত্র, প্রকৃত পক্ষে তোমার কোনই শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। অন্তরের সমস্ত আবেগ, উৎসাহ ও নির্ভর একত্র করিয়া, যদি জাতীয় সাহিত্য গঠন করিতে পার, দেশের ও জাতির মঙ্গল হইবে।

এইভাবে অন্যের সুচারু ও সদ্ভাবপূর্ণ পদার্থ লইয়া নিজের জাতীয় সাহিত্যের নির্ম্মাণ ও জাতীয় আদর্শের গঠন ইতঃপূর্ব্বেও হইয়াছে। বরঞ্চ ইতঃপূর্ব্বে, অতি প্রবলরূপেই এই কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল বলিয়া

সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন রোমের নিজের জাতীয় সম্পদ্ আমাদের প্রাচীন সম্পদের ন্যায় এত অধিক পরিমাণে ছিল না; আমাদের সহিত তুলনা করিলে, রোমের প্রাচীন সম্পদ্ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। রোমে যখন জাতীয়জীবনের প্রথম উন্মেষ হইল, তদানীন্তন প্রধান জাতির অভ্যুদয় দর্শনে, রোমবাসীদের হৃদয়েও যখন জাতীয়তাগঠনের স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল, জগতে বরণীয় হইবার আকাঙ্ক্ষায় রোমবাসিগণের অন্তঃকরণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তখন তাহারা মাত্র নিজের পরিমিত প্রাচীন সম্পদেই আর পরিতুষ্ট থাকিতে পারিল না। পিপাসার্ত্ত হইয়াই যেন, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তখন গ্রীসের চরম উন্নতির সময়। সর্ব্বপ্রকারে ও সর্ব্বাংশে গ্রীস তখন, জগতের একটা আদর্শ জাতি। বীরত্বে ধীরত্বে, জ্ঞানে সম্মানে, গ্রীস তখন সকলের শ্রেষ্ঠ। গ্রীসের সেই চরম অভ্যুদয়ের সময়ে, রোমের লোলুপ দৃষ্টি গ্রীসের প্রতি পতিত হইল। গ্রীসের শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, গ্রীসের কলাবিদ্যা, গ্রীসের শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি সমস্তই রোম ক্রমে স্বীয় জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইতে লাগিল। গ্রীসের যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সুন্দর, সে সমস্তই রোম নিজের জাতীয়তা গঠনের প্রধান উপাদানরূপে গ্রহণ করিল। দেখিতে দেখিতে, রোম গ্রীসের সমকক্ষ, এমন কি, অনেকাংশে গ্রীস অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল। গ্রীসের অনুকরণ করিতে যাইয়া কিন্তু রোম স্বীয় জাতীয়তার বিসর্জ্জন করে নাই। গ্রীসের যাহা কিছু উত্তম পরিচ্ছদ, যাহা কিছু সুন্দর অলঙ্কার, তাহা রোমের জাতীয় ছাঁটে ছাঁটিয়া, জাতীয় ছাঁচে ঢালাই করিয়া রোম পরিধান করিল, এবং নবীন সাজে সাজিয়া, রোম যখন মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইল, তখন রোমের সেই নানা রত্নখচিত কিরীটের প্রভায়, প্রাচীন গ্রীস যেন কতকটা হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। প্রাচীন গ্রীসের অঙ্গে, বহু শতাব্দী ধরিয়া যে সমুদয় জরাজনিত পলিতভাব জন্মিয়াছিল, যাহা কিছু অসুন্দর ছিল, তাহার পরিবর্জ্জন করিয়া, রোম গ্রীসকে যেন একেবারে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল। রোমের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রীসের মস্তক হেঁট হইল।

কিন্তু এই গ্রীস রোমের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে না। রোমীয়দিগের নিজের প্রাচীন দ্রব্যসম্ভার তত অধিক ছিল না, তাহাদের গৃহ একপ্রকার শূন্য ছিল, হয়ত গৃহের কোন এক কোণে, দু'একটি প্রাচীন পদার্থের কঙ্কাল মাত্র পড়িয়া ছিল, তাই রোমীয়গণ, দু'হাতে গ্রীসের যতটা পারিয়াছে, দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া নিজের শূন্যপ্রায় গৃহ পরিপূর্ণ করিয়াছে। তত সতর্কতার সহিত সংগ্রহ করিতে হয় নাই।

আমাদের কথা ইহা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। আমাদের প্রাচীন সম্পদ্ প্রচুর। তাহার ভাণ্ডার অক্ষয়। সুতরাং আমাদের বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। আমাদের যাহা আছে,—তাহার কোন একটিরও মর্য্যাদার হানি হইতে পারে, এমন কোন পরস্ব আমরা কদাচ গ্রহণ করিব না। অথচ আমাদের যাহা নাই, অন্যের প্রচুর আছে, সেইরূপ পদার্থ, যদি আমাদের জাতীয়তার পরিপন্থী না হয়, তবে গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিব না। রোমের ন্যায় আমাদের গৃহ শূন্য নহে যে, যে ভাবে পারি, গৃহ পূর্ণ করিব; আমাদের ঘর পরিপূর্ণ, সেই পরিপূর্ণ গৃহের শোভা বৃদ্ধির পক্ষে যাহা অনুকূল, সেই পরিপূর্ণ গৃহের অনুরূপ যে সাজ সরঞ্জাম, তাহা যদি, অন্য কোন জাতির নিকটে পাই, তবে, অম্লান-হৃদয়ে গ্রহণ করিব। যাহা আমার জাতীয়তার অনুকূল নহে, তাহা কদাচ স্পর্শ করিব না। আমার নিজের জাতীয়তায় কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ হইতে পারে, এরূপ আবর্জ্জনা কদাচ আমার জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গে জন্মিতে দিব না। এই ভাবে যদি আমরা চলিতে পারি, বিবেচনার সহিত পাদক্ষেপ করিতে পারি, কিংশুক পরিহারপূর্ব্বক, কমল চয়ন করিতে পারি, তবেই আমাদের জাতীয়তা অক্ষুন্ন থাকিবে, এবং সেই সঙ্গে আমাদের জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় সম্পদ্, এই দুইই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, বিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিবে।

আমাদের যাহা নিজস্ব, যাহা লইয়া আমরা গৌরব করি, আমাদের সেই জাতীয় গৌরবের বস্তু, প্রাচীন শিক্ষা দীক্ষা, শিল্পকলা, দর্শন ইতিহাস প্রভৃতির যাহাতে কোনরূপে অঙ্গহানি ঘটে, এরূপ কার্য্য যেন আমরা কদাচ না করি, কদাচ যেন জাতীয়তার বিসর্জ্জন না দিই। অথচ যে ভাবে হউক, যদি ঐ ঐ বস্তুর কোন-ক্রমে কোনরূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারি, তবে তাহাতে যেন বদ্ধ-পরিকর হই। নিজের যাহা আছে, তাহা ত আছেই, কেহ তাহা অপহরণ করিতেছে না, সুতরাং সে পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকিয়া, যাহা অন্যের আছে, অন্যে যাহার বলে বলীয়ান্, অথচ আমার নাই, তাহা পাইবার জন্য যদি আমার আন্তরিক আগ্রহ না জন্মে, তবে [illegible] ঐ বলবানের সমক্ষে দাঁড়াইতে পারিব [illegible]গৌরব স্মরণ করিয়া, পূর্ব্বের অতীত সম্প[illegible] আলোচনা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলে কোনই ফলোদয় হয় না। নিজের জাতীয় জীবনের শক্তি যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, তাহার প্রয়াস স্বতঃপরতঃ করিতে হইবে। শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। আমার এই ছিল, আমি এই ছিলাম, এইরূপ ব্যর্থ ও অলস চিন্তায় কোনই লাভ নাই, বরং ক্ষতিই অধিক। এই ভাবে, লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যদি আমরা আমাদের মাতৃ-ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারি, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গ পুষ্ট করিতে পারি, তবেই আমাদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, আমরা এই ঘোর দুর্য্যোগেও আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিতে পারিব। অন্যথা সে সম্ভাবনা অতি অল্প। যাহা কিছু নীচ, যাহা কিছু সঙ্কীর্ণ, যাহা কিছু অসৎ, ধর্ম্মভাব-বর্জ্জিত, তাহা উরগক্ষত অঙ্গুলির ন্যায় পরিহার করিয়া, যাহা সুন্দর, নির্ম্মল, নিষ্পাপ, মনোহর, যাহাতে দানব মানব হয়, মানব দেবতা হয়, তাদৃশ সদ্ভাবপুষ্প চয়ন করিব, এবং সেই সদ্ভাব-কুসুমে আমার জননী অনাদৃতা, উপেক্ষিতা বঙ্গবাণীকে অলঙ্কৃতা করিব, মায়ের সন্তান আমরা, মাতৃপূজা করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব। যে বায়ু মধুকণা বহন করে না, তাহা আমরা আঘ্রাণ করিব না, যে নদী মধুমতী নহে, তাহার আমরা সেবা করিব না, যে লতা মধুময় কুসুমে কুসুমিত নহে, তাহার প্রতি আমরা চাহিব না। এইভাবে যদি আমরা চলিতে পারি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমাদের অনুকূল হইবে, সহায় হইবে। নিঃসপত্নভাবে আমরা পূর্ব্বোদিত চন্দ্রমার ন্যায় শ্রীসম্পন্ন হইতে পারিব। হিমাচল যে দেশের পর্ব্বত, জাহ্নবী যমুনা যে দেশের প্রবাহিণী, সাম যে দেশের সঙ্গীত, রামায়ণ মহাভারত যে দেশের ইতিহাস, আমরা সেই দেশের অধিবাসীর যোগ্যতা লাভ করিতে পারিব। আপ-নারা আজ আমাকে যে উচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছেন,—বঙ্গবাণীর চরণপ্রান্তে বসিবার সুযোগ দান করিয়াছেন, তজ্জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-প্রকাশপূর্ব্বক আমি আবার বলি, আপনাদের ভাষা, আপনাদের ভাব, আপনাদের চিন্তা—এ সমস্তই সুন্দর হউক, অন্যের অনুপ্রেরক হউক, যাহারা আপনাদের সন্নিকর্ষে আসিবে, তাহাদিগকেও উন্নতির পথে লইয়া, আপনারা নিজে ভাগীরথীর প্রবাহের ন্যায়, অবাধিত গতিতে, উন্নতির অমৃতময় পারাবারে মিশিয়া যাউন। নিজের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জগতের বরেণ্য হউন। বিধাতার কৃপায়ঃ—

মধু ক্ষরতু তে বিত্তং মধু ক্ষরতু তে মুখম্।
মধু ক্ষরতু তে শীলং লোকো মধুময়োঽস্তু তে॥

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

নিষ্ফল

চাহিনা তোমার অশোক চাহিনা,
চাহিনা বকুল মালা,
চাহিনা মধুপমধুঝঙ্কৃত
কুসুমকুঞ্জশালা ;
চাহিনা মালতীবল্লীবিতানে
পত্রের শেজ পাতা,
পিকরবাকুল ফাগুন যামিনী
জ্যোৎস্নামদির মাতা।
একবার শুধু দেখিবার আশে
পথে শত আনাগোনা,
চাহিনাক আর কাণ পেতে তার
নূপুরের ধ্বনি শোনা ;
চাহিনাক আর চক্ষে আশার
ইন্দ্রধনুক আঁকা,—
শেষ হয়ে যাক্ বক্ষ আড়ালে
বেদনা ঢাকিয়া রাখা।

হে নববরষ, রুদ্র পরশ
এবার দাওগো ঢালি,
বেণুবীণা সব করিয়া নীরব
তোল কালাগ্নি জ্বালি।

মুগ্ধ মনের মোহ করিবার
বিফল মন্ত্র যত—
জীর্ণ দীর্ণ চূর্ণ হউক
ভস্মেতে পরিণত।
গগনের নীল নিছিয়া মুছিয়া
দাও গো অনল জ্বালি—
কালবৈশাখী করুক নৃত্য
বাজায়ে বজ্রতালি।
চঞ্চল তার চরণ আঘাতে
টুটিয়া হউক লয়
সারা জীবনের বক্ষে লুকান
নিস্ফল সঞ্চয়।
বরষে বরষে যত আশা আর
দুরাশা নিরাশা যত
বক্ষ আঘাতে হউক দীর্ণ
দগ্ধ ভস্ম হত।
সাধের কুলায় ভাঙিল এবার,—
বিহঙ্গ পাক্ ছুটি,
কালের বক্ষে মিলাক তাহার
আর্ত্ত রোদন লুটি।

বারাকপুর, বিজনালয়
১৮ই পৌষ ১৩২২

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী *

ব্যোমকেশ নাই, সাহিত্য-পরিষৎ বর্ত্তমান ; বেশ কথা। আমরা কেহই একদিন থাকিব না,সাহিত্য পরিষৎ বর্ত্তমান থাকিবে ; ইহা আমি প্রার্থনা করি ; আপনারাও প্রার্থনা করেন। কিন্তু ব্যোমকেশহীন সাহিত্য-পরিষৎকে আমি দাঁড়াইয়া দেখিব, পরিষৎ মন্দিরে দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশের মরণ সংবাদ আমাকে ঘোষণা করিতে হইবে, ইহা আমি মনে করি নাই। চারি বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি পীড়িত হইয়া পরিষদের কর্ম্মভার ত্যাগ করিয়াছিলাম, তখন বরং ইহার বিপরীতই আমার মনে ছিল। যাহা মনে করি-নাই, তাহা কাজে করিতে হইল, ইহা নিয়তি। নিয়তির জয় হউক।

* বিগত ২৬শে চৈত্র, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে ৺ব্যোমকেশ মুস্তফীর শোক সভায় পঠিত।

সাহিত্য-পরিষৎ আর ব্যোমকেশ যে অভিন্ন ছিল, তাহা আপনাদিগকে জানাইয়া দিতে হইবে না। যাহা অভিন্ন থাকে, তাহাও ভিন্ন হয়। সর্ব্বশক্তিমানের ইহা খেলা, ইহার উদ্দেশ্য আমরা বুঝি না।

সাহিত্য পরিষদে ব্যোমকেশ আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছিল, সাহিত্য পরিষদে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিল,—আপনাকে অর্পণ করিয়াছিল। জীবন-অর্পণের কথা, জীবন-উৎসর্গের কথা পুঁথিতে পড়িয়াছি, বক্তৃতা মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু কার্য্যতঃ অধিক দেখি নাই। ব্যোমকেশ তাহা দেখাইয়া গিয়াছে। আমিও দেখিয়াছি, আপনারাও দেখিয়াছেন—ইহার প্রমাণ প্রয়োগ অনাবশ্যক।

সূতিকাগৃহে যাঁহারা পরিষদের ধাত্রীর কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ আজ উপস্থিত আছেন। ব্যোমকেশ তাঁহাদের মধ্যে ছিল না। প্রথম দুই বৎসর ব্যোমকেশকে পরিষদে দেখিয়াছিলাম কি না, তাহা আমার মনে নাই। পরিষৎ সেই শৈশবকালে হামাগুড়ি দিতেছিলেন, তখনও পরিষদের মুখ ফোটে নাই, পরিষৎ তখন আধ আধ ভাষায় কথা কহিতেছিলেন মাত্র। কি বলিবেন, কি করিবেন, তাহাও স্থির ছিল না। ব্যোমকেশ তখন পরিষদে প্রবেশ করিয়া থাকিলেও আমার সহিত তাহার পরিচয় ছিল না।

পরিষদের তৃতীয় বর্ষে একদিন 'কৃষ্ণরামের রায়-মঙ্গল' নামে একটি প্রবন্ধ পঠিত হইল। প্রবন্ধ-পাঠক ছিলেন ব্যোমকেশ মুস্তফী। প্রবন্ধটি আমি অবহিত হইয়া শুনিয়াছিলাম—প্রবন্ধ শুনিয়াই আমার বোধ হইল, পরিষদের এইবার কথা ফুটিয়াছে; পরিষদের এইবার কাজ জুটিয়াছে। বাঙ্গালার প্রাচীন লুপ্ত সাহিত্যের উদ্ধার করিতে হইবে,—ইহা পরিষদের একটা প্রধান কাজ। কাহারও কাহারও মনে এই কথাটা অস্পষ্টভাবে জাগিতেছিল; ব্যোমকেশ মুস্তফীর প্রবন্ধ তাহা স্পষ্ট করিয়া জাগাইয়া দিল। আমি বুঝিলাম, পরিষদের কাজ জুটিয়াছে, একজন কর্ম্মীও জুটিয়াছে।

পরিষদের ষষ্ঠ বৎসরে ব্যোমকেশ সহকারী সম্পাদকের কর্ম্মে নিযুক্ত হন; সেই বৎসরই 'পরিষৎ পত্রিকা' সম্পাদনের ভার আমার উপর পড়ে। সেই অবধি তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ঘনীভূত হয়। পাঁচ বৎসর কাল পত্রিকা সম্পাদনের পর আমি পরিষদের সম্পাদকের কর্ম্মভার পাইয়াছিলাম; সেইসূত্রে ব্যোমকেশের চরিত্রের অন্তস্তলটা পর্য্যন্ত আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমার যতটা সুযোগ ঘটিয়াছিল, এতটা বোধ করি আর কাহারও ঘটে নাই। ব্যোমকেশের সমস্ত ভিতরটা আমি দেখিয়াছিলাম, দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, স্তব্ধ হইয়াছিলাম।

একটি লোকের আমি সন্ধান পাইলাম, যে সাহিত্য পরিষদকে ইষ্টদেবতা স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছে। যে ব্যক্তি, দিন নাই, রাত্রি নাই, সময় নাই, অসময় নাই,—শয়নে স্বপনে জাগরণে অপবিত্রঃ পবিত্রো বা, সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা, সাহিত্য পরিষদের ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করে; বাস্তবিকই এই ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে—সর্ব্বতোভাবে—ইষ্টদেবতায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে,—ইহার তুলনা নাই।

আত্মসমর্পণের বড় বড় দৃষ্টান্ত পুঁথিতে পড়িয়াছিলাম, ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম—জীবনে অধিক দেখি নাই। ব্যোমকেশ মুস্তফী সামান্য ব্যক্তি, নগণ্য ব্যক্তি, অতি দরিদ্র গৃহস্থ; ব্যোমকেশে যে দৃষ্টান্ত দেখিলাম, তাহা জীবনে অধিক দেখি নাই।

পরিষৎকে আপনারা ভালবাসেন,আমিও ভালবাসি। আমরা অধিকাংশই 'অবসর মত' ভালবাসি। জীবনে অন্যান্য কাজ সমাপন করিয়া অবসর মত ভালবাসি। তাহাতে আমাদের দোষ নাই। আমাদের অনেককেই সংসার চিন্তা করিতে হয়। অন্নচিন্তা করিতে হয়, সংসারের সহিত লড়াই করিতে হয়। সেগুলাও আমাদের কর্ত্তব্য মধ্যে। সেই কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া যখন অবসর পাই, তখন পরিষৎকে আমরা ভালবাসি। ব্যোমকেশের ভালবাসার বিশিষ্টতা এই যে, ব্যোমকেশ পরিষৎকে অবসর মত ভালবাসিত না। ব্যোমকেশকেও সংসারের সহিত

লড়াই করিতে হইত; সে বড় নিদারুণ লড়াই—একতরফা লড়াই। সংসার তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল—তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিল, কিন্তু সে আত্মরক্ষায় অবসর পায় নাই। তাহার সমস্ত জীবনটা পরিষদের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল; পরিষদের কাজ করিতেই,—পরিষৎকে ভালবাসিতেই, তাহার সমস্ত জীবনটা কাটিয়া গেল; অন্য চিন্তার সে অবসর পাইল না—জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষার তাহার অবসর ঘটিল না।

কতবার তাহাকে বলিয়াছি, নিজের জন্য একটু চিন্তা কর—আপনার পোষ্যবর্গের জন্য একটু চিন্তা কর—বলিয়াছি, এমন কি, সাধ্যসাধনা করিয়াছি। জোর করিয়া প্রতিশ্রুতি লইয়াছি—এইবার নিজের জন্য কিছু করিব—অবসর পাইলেই করিব। কিন্তু সেই অবসর ঘটিল না। আমার অভিজ্ঞতা সঙ্কীর্ণ; কিন্তু সেই অভিজ্ঞতার সীমানামধ্যে এমন আর আমি দেখি নাই। অথচ জীবন যুদ্ধে ব্যোমকেশের ক্ষমতার অভাব ছিল না। দারিদ্র্য ছিল, কিন্তু অন্য দিকে বিশেষ অভাব ছিল না; সামাজিক প্রতিপত্তির অভাব ছিল না—আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিল না। সে বিষয়ে অভাব হইবার উপায়ই ছিল না;—সেই সদাপ্রফুল্ল মুখ, সেই অকপট হৃদয়, লইয়া ব্যোমকেশ একবার যাহার নিকট গিয়াছে,তিনিই তাহার প্রীতির বন্ধনে পড়িয়াছেন। ব্যোমকেশ মুস্তফী,—কলিকাতার শিক্ষিতসমাজে ও ভদ্রসমাজে সর্ব্বত্রচারী, সর্ব্বত্রবিহারী, সর্ব্বত্র অবারিত দ্বার,—ব্যোমকেশ মুস্তফীকে শ্রদ্ধা প্রীতি সম্মান না করিলে কাহারও উপায় ছিল না। তাহার উপরে ব্যোমকেশের সাহিত্য-সাধনা ছিল; ব্যোমকেশ সাহিত্যরসে রসজ্ঞ ছিলেন। নিজে রস অনুভব করিতেন—সরস রচনাদ্বারা অন্যকে সে রসের আস্বাদন দিতে পারিতেন। এমন কি, "রোগাতুর শর্ম্মা"র প্রলাপবাক্যেও সেই রসজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পরিচয় কেবল রসজ্ঞতায় কেন, ব্যোমকেশের চিন্তাশীলতা ছিল, গভীরতা ছিল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সকলের উপরে বৈজ্ঞানিকতা ছিল—পরিষৎ পত্রিকায় বাঙ্গালা ব্যাকরণের আলোচনায় তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। ফলে সাহিত্যব্যবসায়ী রূপে সাহিত্য চর্চ্চা করিলে, জীবনযুদ্ধে তাহার সফলতা হইতে পারিত; সাহিত্যসেবীরূপে সাহিত্য-চর্চ্চা করিলে সাহিত্যের ইতিহাসে প্রচুর যশ থাকিতে পারিত; কিন্তু কিছুই ঘটিল না। কোন কাজেই ব্যোমকেশের অবসর ঘটিল না। কেননা, ব্যোমকেশ অন্য দেবতার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

এই আত্মসমর্পণই যজ্ঞ। ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লেখ আছে, ঘোর আঙ্গিরস ঋষি দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে বলিতেছেন, মানুষের সমস্ত জীবনটাই যজ্ঞ। ব্যোমকেশ সেই যজ্ঞে যজমান হইতে পারে নাই; যজ্ঞীয় পশুর মত আত্মদান করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যজ্ঞার্থে সে স্বয়ম্ভূ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল; যজ্ঞেই সে নিহত হইল; আপনারা প্রার্থনা করুন; সাহিত্য পরিষদের সভ্যগণ, আপনারা প্রার্থনা করুন, তাহার রক্তপাতে সাহিত্য পরিষদের বৃদ্ধি হইবে, তাহার আলম্বনে সাহিত্য-পরিষদের নবজীবন লাভ হইবে। মনুষ্য থাকে না; তাহার কর্ম্ম থাকিয়া যায়। ব্যোমকেশের কর্ম্ম অক্ষয় হইয়া সাহিত্য পরিষদে বর্ত্তমান থাকিবে।

সাহিত্য পরিষৎ খাঁটি স্বদেশী জিনিষ নয়—ইহা বিলাতী জিনিষের অনুকরণে গঠিত। সাহিত্য-পরিষৎ একটা যন্ত্র; সর্ব্ববিধ সাহিত্যের উপকরণ ঘানিতে পীড়িয়া রস নিষ্কাশনের জন্য ইহার নির্ম্মাণ হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের সমুদয় ধুরন্ধরদিগকে ইহার যুগ বহনে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের লোক যন্ত্র চালাইতে অনভ্যস্ত; যন্ত্র চালনা আমাদের ধাতুর সহিত মেলে না। ভারতবর্ষের লোক স্বচ্ছন্দ বনজাত শাকান্নে পরিতৃপ্ত হইতে চায়;—বসুন্ধরা আপনা হইতে যাহা দেন, তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিতে চায়। ভারতবর্ষে আপনা হইতে যাহা জন্মে, তাহাই থাকিয়া যায়, টিকিয়া যায়। ভারতবর্ষের সমাজে

আপনা হইতে যাহার উৎপত্তি হয় ও বৃদ্ধি হয়, সামাজিকেরা তাহাই গ্রহণ করে; তাহাই তাহাদের রক্তমাংসমজ্জার সহিত সম্পর্কযুক্ত হয়। অন্য দেশে বসুন্ধরা এমন উর্ব্বরা নহেন; মানুষ সেখানে যন্ত্র প্রয়োগে বসুন্ধরার নিকট আদায় করিতে বাধ্য হয়। অন্য দেশের অনুকরণে আমরা সাহিত্য পরিষদের যন্ত্র গড়িয়াছি—যন্ত্র দ্বারা কাজও পাইতেছি—কিন্তু যন্ত্র প্রয়োগে অভ্যাস না থাকায় চাকায় মরিচা ধরিতেছে, সময় মত আমরা তেল যোগাইতে পারিতেছি না; চাকার ঘরঘরানিতে কাজের অপেক্ষা কর্ণপীড়া অধিক হইতেছে। যন্ত্রের কাজ করিবার ক্ষমতা খুব বেশী; পঞ্চাশটা ঘোড়ায় যে কাজ করে, একটা ছোট যন্ত্রে তাহার চেয়ে অধিক কাজ করিতে পারে। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর যানবাহী ঘোড়ার ভিতরে এমন একটা পদার্থ আছে, যাহা কোন যন্ত্রের ভিতরে নাই, সেই পদার্থটার নাম প্রাণ। যন্ত্র সম্পূর্ণভাবে আমাদের বশে চলে; চালক যখন যেদিকে চালাইতে ইচ্ছা করেন, যন্ত্র তখনই সেই দিকে চলে। কিন্তু নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ টাট্টু ঘোড়াকেও সর্ব্বদা ইচ্ছামত চালাইতে পারা যায় না:—সে সর্ব্বদা বাগ মানে না—সময়ে সময়ে বিদ্রোহী হয়। পরিষদ্‌-যন্ত্রের যানবাহী ব্যোমকেশ মুস্তফীর ভিতর এইরূপ একটা প্রাণ ছিল। ব্যোমকেশের সহিত যাঁহারা একত্র কাজ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা জানেন। ব্যোমকেশ সর্ব্বদা যন্ত্রমধ্যে ধরা দিতে চাহিত না। আপনারা হৃদয় নামে একটা অবয়বের কথা শুনিয়াছেন। অভিধানে এই শব্দটি না থাকিলে আজকালকার বাঙ্গালা সাহিত্য বোধ করি অচল হইত। ব্যোমকেশের ভিতরে এই হৃদয়টা অত্যন্ত জীবন্ত অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল। ব্যোমকেশের ক্ষয়রোগশীর্ণ বক্ষের ভিতরে একটা বৃহৎ হৃৎপিণ্ড ছিল—সেই হৃৎপিণ্ডের মধ্যে উষ্ণ রক্ত বিদ্যমান ছিল; মাঝে মাঝে তাহা টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিত। বাহিরে তাহার কোন উপদ্রব, কোন উৎপাত, দেখা যাইত না; কিন্তু যাঁহারা ব্যোমকেশের সহিত অন্তরঙ্গভাবে মিশিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, সেই উষ্ণ রক্তধারা সময়ে সময়ে কিরূপ বেগে প্রবাহিত হইত। এই কারণে ব্যোমকেশকে যন্ত্র মধ্যে আটকাইতে পারা যাইত না। সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, সকলেই ইহার সাক্ষী। সাহিত্য-পরিষদের কমিটি, সব কমিটি, আইনকানুন, নিয়মাবলী, বিধি নিষেধ, কিছুতেই ব্যোমকেশকে শাসনে আনিতে পারে নাই। ব্যোমকেশের একটা গোঁ ছিল,—পরিষদের হিতার্থ নিজে যাহা ভাল বুঝিবে, ব্যোমকেশ তাহা করিবেই—আইনকানুনে বিধিনিষেধে ব্যোমকেশকে কিছুতেই বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। ব্যোমকেশের কল্পনা শক্তি অসাধারণ ছিল—কিসে সাহিত্য-পরিষৎ বড় হইবে, কিসে ইহার কাজের প্রসার হইবে, কিসে ইহার প্রতিপত্তি বাড়িবে, ব্যোমকেশের মগজের মধ্যে দিবানিশি তদ্বিষয়ে কল্পনার খেলা চলিত। অধিকাংশ কল্পনাই খেলামাত্র; সেই খেলা কাজে পরিণত করিতে হইলে কত বিঘ্নবিপত্তি আছে, ব্যোমকেশ সেদিকে দৃষ্টিপাতই করিত না। কেজো লোকে সে বিষয়ে আপত্তি করিতে গেলে ব্যোমকেশকে আঘাত লাগিত,—ব্যোমকেশের হৃদয়ে বেদনা লাগিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কোন কাজে কেন যে অক্ষম হইবে, ব্যোমকেশ তাহা মনে করিতেই পারিত না। এই জন্য ব্যোমকেশের সহিত পরিষদের যন্ত্রচালক অন্যান্য সহকারীদের সর্ব্বদা ঠোকাঠুকি ঘটিত, বাদ বিসংবাদের অভাব থাকিত না। তাঁহারা পরিষদের যন্ত্র সুষ্ঠুভাবে চালাইতে চাহিতেন, ব্যোমকেশের সহিত তাঁহাদের সর্ব্বদা বনিত না—আমার সহিতও সর্ব্বদা বনিত না। আকাশবিহারী পাখীর মত ব্যোমকেশের কল্পনা সর্ব্বদাই উধাও হইয়া উর্দ্ধে উড়িতে চাহিত;—আমরা স্থলচর জীব, তাহাকে কখনও খাঁচার মধ্যে পুরিয়া রাখিতে পারি নাই। ব্যোমকেশকে খাঁচায় পুরিতে পারি নাই; কিন্তু বুঝিয়াছি, যে ব্যোমকেশের মত হৃদয়বান্ পুরুষকে যন্ত্রাঙ্গরূপে গণ্য করিলে চলিবে না। বুঝিয়াছি, এবং তাহার মহাপ্রাণতার সম্মুখে প্রণত হইয়াছি।

ব্যোমকেশ যন্ত্রমধ্যে আপনাকে ধরা দেয় নাই বটে,



স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী

Manasi Press.

কিন্তু যন্ত্রে যেখানে কুলায় না, যেখানে প্রাণের আবশ্যকতা, সেখানে ব্যোমকেশ নহিলে পরিষদের চলিত না। যেখানে রাত্রি জাগিতে হইবে, সেখানে ব্যোমকেশ; যেখানে দেশ ভ্রমণ করিতে হইবে, সেখানে ব্যোমকেশ; যেখানে ধনীর দরজায় দ্বারবানকে অতিক্রম করিয়া ভিক্ষার জন্য চীৎকার করিতে হইবে, সেখানে ব্যোমকেশ; যেখানে আপিস কামাই করিয়া আপিসের অধ্যক্ষের বিরক্তিভাজন হইতে হইবে, সেখানে ব্যোমকেশ; যেখানে অসাধ্য সাধন করিতে হইবে, সেখানে ব্যোমকেশ। ব্যাধিক্লিষ্ট, অনশনক্লিষ্ট, শীর্ণ দেহ লইয়া, সদাপ্রফুল্ল, হাস্যপূর্ণ মুখ লইয়া, ব্যোমকেশ মুস্তফী সর্ব্বদা অসাধ্য সাধনে প্রস্তুত—সর্ব্বদা অসাধ্য সাধনে সমর্থ। ইহা যন্ত্রে কুলায় না, ইহার জন্য প্রাণের টান চাই; ইহার জন্য বুকের রক্ত ঢালিতে হয়।

পরিষদের সেরেস্তায় দুইখানি খাতা ছিল। একখানি আমার, একখানি ব্যোমকেশের। এই খাতা দুইখানি আশ্রয় করিয়া ব্যোমকেশের সহিত আমার কথাবার্ত্তা, তর্কবিতর্ক, বাদানুবাদ চলিত। উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে যে ভাষার ব্যবহার হইত, তাহা ছোট বড় কোন পার্লেমেণ্টে, এমন কি কোন ভদ্রসমাজে, উপস্থাপিত করিবার যোগ্য নহে। ব্যোমকেশের প্রতি আমি যেরূপ তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিতাম, তাহা অন্য কেহ হয় সহিত না—এক রামকমল ভিন্ন অন্য কেহ বোধ করি এখনও সহিবেনা। ব্যোমকেশ তাহা অব লীলাক্রমে সহিয়া যাইত; সে এত সহজে সহিয়া যাইত যে, আমার পক্ষে ঐ ভাষা প্রয়োগ একরূপ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। আমি ঐ ভাষা প্রয়োগে কখনও সঙ্কুচিত বা লজ্জিত হই নাই। ইহা বোধ হয় আমার কাপুরুষতা—কিন্তু আমার এই কাপুরুষতার জন্য ব্যোমকেশ আমাকে কখনও দৈন্য অনুভব করিতে দেয় নাই বা লজ্জা অনুভব করিতে দেয় নাই। আমার তিরস্কারের উপহার ব্যোমকেশের নিকট জয়মাল্য হইত, ব্যোমকেশ তাহা সাদরে ধারণ করিত। খাতা দুইখানি এখনও বোধ করি কার্য্যালয় খুঁজিলে মিলিতে পারে;—উহা রাখিয়া দাও বা পোড়াইয়া ফেল, এখন তাহাতে ক্ষতি নাই; আমাদের দত্ত তিরস্কারের জয়মাল্য সে সাদরে গ্রহণ করিত; সে আমাদিগকে যাহা দিয়া গিয়াছে, তাহা রাখা আমাদের ইচ্ছাধীন।

"দিয়ে গেল যত যাহা, রাখ তাহা ফেল তাহা,
যা ইচ্ছা তোমার।
সে ত নহে বেচা-কেনা, ফিরিবেনা ফেরাবেনা,
জন্ম-উপহার।"

কেন আমার সঙ্কোচ বোধ হইত না? ব্যোমকেশের সহিত আমার সম্পর্ক আপিসের সম্পর্ক ছিল না—আপিসের সম্পর্কে ভদ্রলোকের মধ্যে ওরূপ ব্যবহার চলে না। ব্যোমকেশ আমাকে অগ্রজের মত দেখিতে শিখিয়াছিল;—আমার গুণে নয়, নিজের গুণে। ব্যোমকেশ আমাকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। [illegible] ব্যোমকেশের বিশিষ্টতা। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা ব্যোমকেশের সম্পর্কে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই জানেন, ব্যোমকেশের নিকট কিরূপ একটা পরশ পাথর ছিল,—তাহার স্পর্শমাত্রে আপিসের সম্পর্ক আত্মীয় সম্পর্কে দাঁড়াইত।

আজি ব্যোমকেশ নাই কিন্তু ব্যোমকেশের সাহিত্য-পরিষৎ আছে। ব্যোমকেশের সাহিত্যপরিষৎ ব্যোমকেশের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবেন—হয়ত একখানি চিত্রপট বা আর কিছু স্থাপন করিবেন। সাহিত্য-পরিষৎ তাহা করুন; আমি তজ্জন্য বিশেষ ব্যাকুল নহি। সাহিত্য-পরিষদের প্রত্যেক ইষ্টকে, প্রত্যেক নথিতে, প্রত্যেক লালফিতায়, ব্যোমকেশের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। সাহিত্য-পরিষদে ব্যোমকেশ যে প্রাণের ধারা ঢালিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহাই সঞ্জীবনীসুধারূপে সাহিত্য-পরিষৎকে সঞ্জীবিত রাখিবে ও সাহিত্য পরিষৎকে জীবিত রাখিয়া ব্যোমকেশের স্মৃতি রক্ষা করিবে। আমি ব্যোমকেশকে পরিষদের সহকারী সম্পাদকরূপে দেখিতে চাহি না। আমি তাহাকে আপনার স্বজনরূপে দেখিতে চাহি। আপনাদিগকেও ব্যোমকেশকে স্বজন রূপে দেখিবার জন্য আজ আমি অনুরোধ করিতেছি।

আপনাদের স্বজন বিয়োগ হইয়াছে। পরিষদের প্রত্যেক সভ্যকে যে আপনার লোক মনে করিত, সেই প্রিয়বন্ধু চলিয়া গিয়াছে।

"আর পরিচিত মুখে, তোমাদের দুখে সুখে,
আসিবেনা ফিরে।
তবে তার কথা থাক্, যে গেছে সে চলে যাক্,
বিস্মৃতির তীরে।"

ব্যোমকেশ গিয়াছে; কিন্তু তাহার বৃদ্ধা জননীকে, অনাথা পত্নীকে, নিঃসহায় পুত্রগণকে আপনাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছে। সাহিত্য পরিষদের সভ্যগণ, স্বজনগণ, বন্ধুগণ, ব্যোমকেশ জীবিত থাকিতে তাহার সাংসারিক দুঃখের লাঘবার্থ আমরা কিছুই করি নাই;—আমরা কিছুই করি নাই। এখন আমাদের সময় উপস্থিত। সাহিত্য-পরিষৎ আজ তাহার দুঃস্থ পরিজনবর্গের জন্য ভিক্ষার্থী হইয়া আপনাদের দ্বারস্থ। সেই ভিক্ষাপাত্রে মুষ্টিভিক্ষা দিবার জন্য আপনাদিগকে আমি সানুনয়ে আহ্বান করিতেছি; ইহাতে সঙ্কুচিত হইবেন না, তর্ক বিতর্ক করিবেন না; সমস্ত সঙ্কীর্ণ বিষয় ত্যাগ করিয়া সেই ভিক্ষা পাত্রে মুষ্টিভিক্ষা দান করুন। পরকে ভাল বাসিতে গিয়া ব্যোমকেশ আপনা পরিজনকে ভালবাসিবার অবসর পায় নাই। তাহার কর্ত্তব্যসাধনে ক্রটী রহিয়া গিয়াছে। আমি চোখের উপর দেখিতে পাইতেছি তাহার প্রেত আত্মা লোকান্তরে শান্তি পাইতেছে, না। আপনারা তাহার প্রেত আত্মার কথঞ্চিৎ শান্তি বিধান করুন!

"সব তর্ক হোক্ শেষ, সব রাগ সব দ্বেষ
সকল বালাই।
বল শান্তি, বল শান্তি, দেহ সাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হোক্ ছাই॥"

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

"ভারতী"

'ভারতী' পত্রিকার বর্ত্তমান সম্পাদকদ্বয়ের পত্রে আমরা অবগত হইয়াছি যে 'ভারতী' এই বৈশাখে চল্লিশবর্ষে পদার্পণ করিল। এ সংবাদ কেবল পত্রিকার সংস্পৃষ্টগণের পক্ষেই যে শুভ সংবাদ তাহা নহে—ইহা বাঙ্গালী মাত্রেরই পক্ষে বড় আনন্দের সংবাদ। বহুদিবস হইতে বাঙ্গলার যে ধনী গৃহে বাণী ও কমলার রত্নাসন স্থাপিত হইয়াছে সেই অভিজাত ঠাকুর বংশধরগণের নিবাস ভবন যোড়াসাঁকোর প্রাসাদে 'ভারতী'র জন্ম হয়। জীবন্মুক্ত, জনক-সদৃশ-পূজার্হ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঋষিকল্প শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ইহার জন্মদাতা। জন্ম-মুহূর্ত্তে সকলগুলি মঙ্গল গ্রহই বোধ করি নবজাত বালিকার কল্যাণ স্থলে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। নানা সুখ দুঃখময় ধরণীতে জন্মলাভ করিয়া গন্তব্যপথে বাধা বিঘ্ন পায় নাই এমন কেহ বা কিছুই বোধ করি ইহ সংসারে নাই—'ভারতী'রও চল্লিশ বৎসরের জীবনকাল নিরবচ্ছিন্ন সুখে না যাইবারই কথা। কিন্তু দুঃখের দিনে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া, সুখের উন্মাদনার মধ্যে অবিচলিত থাকিয়া কালের বিনাশ-বাহুর ধ্বংশকর আলিঙ্গন এড়াইয়া ধীরে ধীরে 'ভারতী' তাহার কল্যাণময় পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে,—এ দৃশ্য কেবল বাঙ্গালায় নহে, ভারতেও অধিক মিলিবে কিনা আমরা সন্দেহ করি।

জন্মের পরে 'ভারতী' কিছুকাল পিতৃস্নেহে বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহার পরে ইহার লালন-ভার পিতৃস্বসা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর উপর অর্পিত হয়—এই বিদুষী মহিলা অপার স্নেহে, অবিচলিত ধৈর্য্যে, অসীম কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সহিত এই ভ্রাতুষ্কন্যাকে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া পালিত, বর্দ্ধিত, শোভান্বিত করিয়া তুলিয়া জীবনের শান্ত প্রৌঢ়ে শান্তি উপভোগ করিবার জন্য ইহাকে গতবর্ষ হইতে তাঁহার স্নেহাস্পদ আত্মীয় শ্রীমান্ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও তদীয় বন্ধু স্বনামখ্যাত সুযোগ্য সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের স্নেহহস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী'র সম্পাদন

ভার বহন করিয়া আসিয়াছেন, এই সুদীর্ঘ সময়ে নানা সুখ দুঃখ উত্থান পতন সংঘটিত হইয়াই থাকিবে তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই—সেই সকল সুদিনে দুর্দ্দিনে দেবী স্বর্ণকুমারীর বিদুষী কন্যাদ্বয় (শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীমতী সরলা দেবী) 'ভারতী'র প্রতি মাতার অক্লান্ত স্নেহপরিচর্য্যায় গুরুশ্রম লাঘব করিবার জন্য অনেক সাহায্য করিয়াছেন। বর্ত্তমান ভারতের কবিসম্রাট, বাঙ্গালার রবি রবীন্দ্রনাথও তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর শ্রম লাঘব করিবার জন্য 'ভারতী'কে তাঁহার স্নেহপুটের মধ্যে বৎসর যাপন করাইয়াছেন।

যে চল্লিশ বৎসর ভারতী জীবিত রহিয়াছে, এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বহু পত্রিকার জন্ম, জীবন, ও মৃত্যু ঘটিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের গুরু বঙ্কিম সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'ও দীর্ঘ পরমায়ু লইয়া আসিতে পারে নাই, রবীন্দ্রের সাধনার সময় গত হইলেই 'সাধনা' তাহার ঐহিক জীবন শেষ করিল, নব-পর্য্যায় 'বঙ্গদর্শন'ও কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহার সুদিন দুর্দ্দিন দেখিয়া লইল এবং ইতিমধ্যে বঙ্গসাহিত্য-সাগরে মাসিক পাক্ষিক সাপ্তাহিকের যে কত জলবুদ্বুদই উঠিয়া পড়িয়া বিলয় পাইয়া গেল তাহা বলিয়া আজ লাভ নাই। এহেন মহা-মড়কের মধ্যে 'ভারতী'র জীবন রক্ষা কল্পে যে বিদুষী মহিলা তাঁহার দেহের রক্ত অকাতরে দান করিয়াছেন সেই স্বর্ণকুমারীর নিকট বঙ্গদেশ যে কি পরিমাণে ঋণী তাহা বঙ্গের মনীষিবৃন্দ অবগত আছেন, আমার বলা নিষ্প্রয়োজন। গৃহধর্ম্মচারিণী বঙ্গরমণীর, গৃহস্থালীর পারিপাট্য বজায় রাখিয়া পত্রিকার পরিচালনা কি কঠিন ব্যাপার তাহা যিনি করিয়াছেন তিনিই জানেন, অপরের পক্ষে সম্যক উপলব্ধি করা সহজ নহে। গৃহধর্ম্ম-নিরতার এই একনিষ্ঠা সরস্বতী-সেবার, তাঁহার অপরাজিতা-শক্তির এবং অপরিম্লান মনীষার যথাযোগ্য অভিনন্দন বঙ্গদেশ করিয়াছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে—সে কথার আলোচনা প্রবন্ধান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

আজ 'ভারতী'র চত্বারিংশত্তম জন্মদিনে স্নেহপালিতা কন্যার শোভা সম্পদে পরিপূর্ণাঙ্গ দেখিয়া যাঁহার হৃদয় বিমল আনন্দধারায় অভিসিঞ্চিত হইতেছে, সেই বিদুষী বঙ্গমহিলার, শ্রেষ্ঠ- ও জ্যেষ্ঠতমার পাদপদ্মে আমার সভক্তি প্রণতি বারম্বার জানাইতেছি এবং স্নেহাস্পদ মণিলাল ও বন্ধু শ্রীসৌরীন্দ্রমোহনকে নববর্ষের নমস্কারের সঙ্গে সঙ্গে 'ভারতী'র কল্যাণকল্পে শুভ কামনা জ্ঞাপন করিয়া আজিকার মত আমাদের বক্তব্য শেষ করিলাম।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

কৃত্তিবাস *

ব্যাস বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস। সামান্য প্রণিধান সহকারে দৃষ্টি করিলেই যেমন উপলব্ধ হয় যে, সংস্কৃত অনার্য্য কাব্যাবলীর অধিকাংশের উপরেই ব্যাস বা বাল্মীকির প্রভাব সুপরিস্ফুট, কেহ মহর্ষি ব্যাস-বিরচিত কবিতা-কুঞ্জের পথিক, কেহ বা রত্নাকরের নানারত্নসমুদ্ভাসিত কবিতা-মন্দিরের যাত্রী; এক-ভাবে না এক-ভাবে যেমন ব্যাসবাল্মীকি এই উভয়ের এক-তরের কার্য্যের আদর্শ, পরবর্ত্তী অনার্য্য কবিকুলের কাব্যাবলীর উপজীব্য, তদ্রূপ, বাঙ্গালার মহাকবি কৃত্তিবাসের প্রভাব,—তাঁহার ভাষার প্রভাব, ভাবের প্রভাব, রচনাভঙ্গির প্রভাব, তৎপরবর্ত্তী বঙ্গীয় কবিকুলের উপর সম্যকরূপে সুপরিস্ফুট। কৃত্তি-বাসের পরবর্ত্তী কবিবৃন্দ, যে সমুদয় সুরভিকুসুমে বীণাপাণির পাদপূজা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই

* বিগত ২৭এ চৈত্র ফুলিয়া গ্রামে কৃত্তিবাস স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন সভায় সভাপতি কর্ত্তৃক পঠিত।

তদীয় কবিতারূপী কল্পনা কানন হইতে সংগৃহীত। এই হিসাবে, সংস্কৃত কাব্যাবলীর সহিত ব্যাসবাল্মীকির যে সম্বন্ধ, বঙ্গভাষার কাব্যাবলীর সহিত কৃত্তিবাসেরও সেই-ই সম্বন্ধ।

কালিদাস ও কৃত্তিবাস।—আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণের পর কালিদাস আবার সেই রামচরিতেরই পুনর্ব্বর্ণন করিলেন। রামায়ণ শ্লোকবদ্ধ মহাকাব্য, কালিদাসের রঘুবংশও শ্লোকবদ্ধ মহাকাব্য। কালিদাসের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্ব হইতে রামায়ণ ভারতের সকল সমাজে কীর্ত্তিত, গীত, অধীত ও ভক্তি-[illegible] শ্রুত হইত। তথাপি কালিদাসের রঘুবংশ [illegible] বিপুল আদরে গ্রহণ করিলেন। ইহার [illegible] একান্ত সুপরিচিত, সর্ব্বদা শ্রুত বৃত্তান্তের পুনঃ পঠন পাঠনে এই যে আগ্রহ, এত যে আদর, তাহার একমাত্র কারণ কালিদাসের প্রাঞ্জল ভাষা ও ভাবের সুস্পষ্টতা। যদি ভাষা এত সুন্দরী এবং সম্পাত্তি-শালিনী না হইত, তাহা হইলে, কেবল ভাবের তরঙ্গলীলায় বা কল্পনার ক্রীড়ায় কালিদাসের কাব্য সুধী-সমাজের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিত না। কল্পনা বিষয়ে বাল্মীকির সহিত কালিদাসের তুলনা করিতে প্রয়াস পাওয়া বৃথা। তবুও যে, কালিদাস এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহার প্রধান কারণ তাঁহার সুমধুর ভাষা। কালিদাস ব্যতীত আরও অনেকে রামায়ণ উপজীব্য করিয়া কাব্যাদি বিরচন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ জন-সমাজে রঘুবংশাদির ন্যায় আদৃত হয় নাই। এই আদর-অনাদরের একমাত্র নিদান, ভাষাগত প্রাঞ্জলতার উৎকর্ষাপকর্ষ এবং ভাবের সুস্পষ্টতা। কালিদাস এমন মনোহারিণী ভাষায় তদীয় কাব্যাবলী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে, যে কোন সময়ে, যে কোন সমাজের লোকেই তাহা পাঠ করুক না কেন, বিমুগ্ধ হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যে এই ভাষাগত উৎকর্ষের জন্য যেমন কালিদাসের শ্রেষ্ঠতা, বঙ্গীয় সাহিত্যেও তেমনই ভাষাগত উৎকর্ষের নিমিত্ত কৃত্তিবাসের শ্রেষ্ঠতা। যে ভাষা সম্প্রদায়বিশেষের জন্য উপনিবদ্ধ, অর্থাৎ কেবল শিক্ষিত বা কেবল অশিক্ষিতদিগের জন্য যে ভাষা ব্যবহৃত, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, ইহার একতরের উদ্দেশ্যে যে ভাষা গ্রথিত, তাহা কদাচ স্থায়ী বা সকলজনসম্মত উৎকৃষ্ট ভাষা হইতে পারে না। তাদৃশী ভাষায় নিবদ্ধ গ্রন্থাদি কখনও কালজয়ী হইতে পারে না। তাহাকে প্রকৃত ভাষা বলা যায় না। তাদৃশী ভাষায় বিরচিত গ্রন্থাদি কালের তরঙ্গে দেখিতে দেখিতে ভাসিয়া যায়। অল্পকাল মধ্যেই তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

যে ভাষা কোনও সম্প্রদায় বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে, সকল সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে, সমাজ-দেহের প্রত্যেক শিরা ধমনী কৈশিকায় যে ভাষা প্রবেশ করিতে পারে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকে যে ভাষাকে "আমার" বলিয়া গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত অপণ্ডিত, সকলে সমানভাবে যে ভাষাকে আদর করিয়া লয়েন, তাহাই যথার্থ ভাষা। কালিদাস যেমন তাদৃশী সর্ব্বতোগামিনী সর্ব্বতোব্যাপিনী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তদীয় কাব্য, সকল সম্প্রদায়ে, সকল সময়ে সকলের প্রিয় পদার্থ, মহাকবি কৃত্তিবাসও তদীয় অনাস্থ রামায়ণ কাব্য সেইরূপ সর্ব্বকালানুযায়িনী সর্ব্বতোগামিনী ও সর্ব্বতোব্যাপিনী ভাষায় রচনা করিয়াছেন বলিয়া, তদীয় রামায়ণ, এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে সমুদয় কাব্যের ভাষা প্রাঞ্জল নহে, বা ভাবও সুস্পষ্ট নহে, সেই কাব্যাদির প্রভাব সমাজে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। ভাষা ও ভাব উভয় সম্পদে সম্পন্ন বলিয়াই কৃত্তিবাসের রামায়ণ কালজয়ী হইয়া রহিয়াছে। সংস্কৃতে কালিদাস এবং বঙ্গভাষায় কৃত্তিবাস এই দুই জন একই কারণে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

কৃত্তিবাস ও অন্যান্য রামায়ণকারগণ।—কৃত্তিবাসের পর আরও অনেক কবিযশঃপ্রার্থী ব্যক্তি রামায়ণ রচনাপূর্ব্বক বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গ পরিপুষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকলের দ্বারাই যে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা কঠিন।

এপর্য্যন্ত যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে কৃত্তিবাসই সর্ব্বপ্রথম বঙ্গভাষায় রাম-চরিত নিবদ্ধ করেন। তাহার পরে আরও চতুর্দ্দশ ব্যক্তি রামায়ণী কথায় পুস্তক রচনা করিয়াছেন বলিয়া নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। কালে হয়ত, আরও অনেক নাম পাওয়া যাইবে। এ প্রসঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আর সেই সঙ্গে বঙ্গভাষার ইতিহাস-লেখক অক্লান্তকর্ম্মা শ্রীযুক্ত দীনেশ-চন্দ্র সেন মহাশয়ও সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। এতদুভয়ের সমবেত চেষ্টার ফলেই আমরা আজ কৃত্তিবাসকে প্রকৃত ভাবে চিনিবার অবসর পাইয়াছি। কৃত্তিবাসের রামায়ণে যে প্রকার পাঠ-বৈষম্য ঘটিয়াছে, তাহাতে প্রকৃত-কৃত্তিবাসের সম্পূর্ণ পরিচয় এখনও দুর্লভ। তবুও যতটা পাওয়া যাইতেছে, তজ্জন্য, সাহিত্যপরিষদ্ এবং দীনেশ বাবু বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কৃত্তিবাস এবং তৎপরবর্ত্তী অনেকে একই রামায়ণ অবলম্বনে কাব্য নির্ম্মাণ করিলেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের কাব্য আবাল বৃদ্ধ বনিতার প্রিয়, সকল সমাজের আদরণীয় হইল, ইহার প্রকৃত কারণ কি ?

কৃত্তিবাস মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ মাত্র অবলম্বন করিয়াই কাব্য লিখেন নাই। আমাদের দেশে কথকতায়, যাত্রায়, গোষ্ঠীবন্ধনে, সর্ব্বত্রই নানা ভাবে ও নানা আকারে রামবিষয়ক বৃত্তান্ত বহুকাল হইতে, কৃত্তিবাসের বহু পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল। ফলতঃ লোক-মুখে স্ত্রীপুরুষ সমাজে রামসীতার কথা কীর্ত্তিত হইত, এখনও হইতেছে। কৃত্তিবাস তদীয় গ্রন্থরচনায় এই লোকপরম্পরাগত গাথার অনেকটা অনুসরণ করিয়াছিলেন। কেবল অনুবাদে মহর্ষি-চিত্রিত আলেখ্যাবলীর পুনশ্চিত্রণেই যদি কৃত্তিবাস রত থাকিতেন, তাহা হইলে, তদীয় কাব্য এত প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত না। তাঁহার পরবর্ত্তী রামায়ণ-লেখকগণের অনেকের গ্রন্থে কৃত্তিবাসোচিত মৌলিকতা নাই। অধিকাংশ স্থানেই অনুবাদ মাত্রে পর্য্যবসিত। কোনও রামায়ণকার স্বকীয় কল্পনার চঞ্চল বৈদ্যুতী প্রভায় গ্রন্থের কচিৎ ভাস্বর করিয়াছেন, সত্য, কিন্তু পরক্ষণেই আবার কল্পনামান্দ্য দোষে গ্রন্থের শ্রীহানি ঘটিয়াছে। এই স্থলে কবিচন্দ্রের নাম উল্লেখ্য। কবিচন্দ্র স্বীয় রামায়ণে অঙ্গদ রায়বার নামে যে অধ্যায় লিখিয়াছিলেন, যাহা আজ কৃত্তিবাসের বলিয়া বঙ্গের অধিকাংশ গৃহে আদৃত, সেই অধ্যায়টি বাস্তবিকই অনেকটা কবিত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই অনুপাতে কবিচন্দ্রের গ্রন্থের অপরাংশ সমূহ গ্রহণ করা যায় না। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত অনেকে যেমন দু'একটি মনোহারিণী কবিতা রচনা করিয়া থাকেন, প্রাচীন কালেও করিতেন ; যে কবিতাগুলি "উদ্ভট" আখ্যায় জন-সমাজে প্রচারিত, কিন্তু ঐ উদ্ভট-কর্ত্তাদের কোনও বিশিষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য কবিতাগ্রন্থ পাওয়া যায় না, চঞ্চল কল্পনার ক্ষণিক অনুগ্রহে মাত্র দু'চারিটি হৃদয়াকর্ষিণী কবিতাতেই তাঁহাদের কবিত্ব পরিসমাপ্ত, তদ্রূপ অন্যান্য রামায়ণকার-গণের অনেকেরই দুই একটি, বা কাহারও দু'চারিটি রসভাবপূর্ণ অধ্যায় রচনার পরই কবিত্বের পর্য্যবসান ঘটিয়াছে। সমগ্র গ্রন্থে কবিতার উচ্ছলিত তরঙ্গলীলা একমাত্র কৃত্তিবাসেই পরিদৃষ্ট হয়।

কৃত্তিবাস জানিতেন যে, যাঁহাদের জন্য তিনি কাব্য লিখিয়াছেন, তাঁহারা কি চান্, কতটুকু বা কতটা তাঁহাদের অভিলষিত ? কিরূপ আলেখ্যে তাঁহাদের নয়ন রঞ্জন হইবে ? কবিত্বের সার্থকতার এই মূলমন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হইয়া তবে কাব্য লিখিতে বসিয়াছিলেন, সর্ব্বদা এই মন্ত্রের স্মরণ করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন, তাই তাঁহার কাব্য এত জমিয়াছে। এই জন্যই কেবল বাল্মীকির আদর্শই তাঁহার উপজীব্য ছিল না, তিনি প্রয়োজনমত, অন্যান্য পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতিরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। কালিকাপুরাণ, অধ্যাত্মরামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণ প্রভৃতি হইতেও তিনি আদর্শ সঙ্কলন করিয়াছেন।

অনেক কাব্য কবির সমসাময়িক সমাজের রুচি এবং ছায়ার অনুসরণে নির্ম্মিত হওয়ায়, সেই নিয়মিত সমাজে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই কাব্য আদৃত হইয়া থাকে, কিন্তু পরবর্ত্তী ও পরিবর্ত্তিত সমাজে তাহার আদর ক্রমেই কমিয়া যায়। যে কবির কাব্য, যত অধিক পরিমাণে এইরূপ সাময়িক ভাবে পরিপূর্ণ, সে

কবির কাব্য, ততই অল্পকালস্থায়ী। অন্যান্য অনুবাদকগণের রামায়ণগ্রন্থের অপ্রসিদ্ধির ইহাও অন্যতম কারণ। তাঁহাদের রামায়ণের যে যে অধ্যায়গুলি এই প্রকার কোন বিশেষভাবে লিখিত নহে, অর্থাৎ সাধারণ ভাবে, সকল সময়ের অনুগত করিয়া লিখিত, সেই সেই অধ্যায়গুলির মর্য্যাদা এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। দৃষ্টান্তরূপে কবিচন্দ্রের "অঙ্গদ রায়বার" ও রঘুনন্দন গোস্বামীর "রামরাবণের" অশোকবনবর্ণন প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ সরল ভাষা এবং সুস্পষ্ট ভাব,—এই দুই দুর্লভ সম্পদে কৃত্তিবাসের কাব্য বঙ্গসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অতি সরল কথায়, সকলের বোধগম্য ভাষায় তিনি তাঁহার হৃদয়ের ভাব অতি স্পষ্টরূপে, সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারিতেন। ভাষার দীনতায় বা ভাবের জড়তায় তাঁহার কাব্য কুত্রাপি দুষ্ট হয় নাই। তিনি যখন যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা রাখেন নাই। যে কবি, যত অধিক পরিমাণে প্রাঞ্জলভাষায় মনের ভাবরাশি, তদীয় সমাজের সমক্ষে অতি সুস্পষ্টরূপে তুলিয়া ধরিতে পারিবেন, সেই কবি তত অধিক আদৃত হইবেন। কৃত্তিবাস সেইটি অতি উত্তমরূপে পারিতেন বলিয়াই, তাঁহারা "রামায়ণ" অপরাপর "রমায়ণ" অপেক্ষা ভাবুকসাজে, অথবা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল সমাজেই এত প্রিয় হইয়াছে।

দয়া, দাক্ষিণ্য, সমবেদনা, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে মানব দেবতা হয়, আবার এইগুলির অভাবে মানব দানব হইয়া থাকে। কৃত্তিবাস এই মহনীয় গুণাবলীর এমন সুস্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন যে, পাঠকালে, হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়। মহাকবি ভবভূতি যেমন তাঁহার উত্তরচরিতের নিরবদ্য ও নয়নরঞ্জন চিত্রগুলির আদর্শ কালিদাসের কাব্যাবলী হইতে গ্রহণ করিয়া, পরে, সেই আদর্শের উপর নৈপুণ্য সহকারে বর্ণসংযোগ করিয়া আনন্দময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে মূর্ত্তির গরিমায় সংস্কৃত সাহিত্য গৌরবিত হইয়াছে, কৃত্তিবাসও সেইরূপ মহর্ষিকৃত আদর্শের উপর সতর্ক হস্তে বর্ণসংযোগপূর্ব্বক, তৎ তৎ চিত্রাবলী বঙ্গীয় সমাজের অনুগত ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, অলঙ্কারের গুরু ভারে, বা ভাষার আড়ম্বরে তদীয় কবিতাসুন্দরী ক্লিষ্ট হন নাই। তাঁহার কবিতা সর্ব্বত্র একভাবে, ভাগীরথীর প্রবাহের ন্যায় তর তর করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আবিলতায় সে কবিতার প্রবাহ দুষ্ট হয় নাই, বা ভাবের জড়তায় সে কবিতার অমর্য্যাদা ঘটে নাই। অন্যান্য কবি অপেক্ষা তদীয় প্রাধান্যের এইটিই মুখ্য কারণ। ভাষার প্রাঞ্জলতা এবং ভাবের সুস্পষ্টতার সহিত তাঁহার আশ্চর্য্যচিত্রনৈপুণ্যের সম্মিলনে তদীয় কাব্য ত্রিবেণীসঙ্গমের ন্যায় পবিত্র ও সর্ব্বজনসেব্য হইয়াছে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে প্রক্ষেপ—কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার প্রায় এক শত বৎসর পরে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হন। চৈতন্যের আবিভাবের এবং তদীয় প্রেম-বন্যায় বঙ্গদেশ প্লাবিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের হস্তলিখিত কোন কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুস্তক এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যদি কখনও পাওয়া যায়, তবে তখন কৃত্তিবাসের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলির সমাধানের উপায় অনেকটা সহজ হইবে। চৈতন্যের আবিভাবের পর বঙ্গদেশে যে ভক্তির স্রোত, প্রেমের "বান" বহিয়াছিল, পরবর্ত্তী কালের রামায়ণ-সমূহে তাহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। যে সময়ে যে ভাব দেশের মধ্যে মাথা তুলিয়া দেশটাকে বিভোর করিয়া ফেলে, সেই সময়ের জাতীয় সাহিত্যাদিতেও সেই ভাবের প্রভাব প্রবিষ্ট হইয়া, তাবৎ সাহিত্যকে 'তদ্ভাবভাবিত' করিয়া তোলে। তাই পরবর্ত্তী কালের কৃত্তিবাসে আমরা কি বীর কি করুণ, সকল রসেই নদীয়ার ভক্তির তরঙ্গের উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই। লিপিকারগণ সুবিধা পাইলেই রামের স্থলে শ্যাম করিয়াছেন। পরিবর্ত্তিত কৃত্তিবাসের অনেক অনাবশ্যক স্থলে অতর্কিত বৈষ্ণবী দীনতার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। কৃত্তিবাসের স্বকপোলকল্পিত বীরবাহু, পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব লিপিকারগণের কৃপায়, দীনাতিদীন বৈষ্ণব

সেবকগণের ন্যায়, করযুগল জুড়িয়া ধরণীতে লুটায়। তুলসীতলার মৃত্তিকায় অঙ্গরাগ করিয়া বৈষ্ণব যেমন "শ্রীবাসের আঙ্গনায়" মহাপ্রভুর ভক্তগণকে প্রণাম করেন, সেইরূপ রাক্ষসগণও কপিগণকে গল-লগ্নবাসে প্রণাম করে। এইরূপ অনেক স্থলেই বৈষ্ণবীয় কোমলতার ও দীনতার চরম দেখিতে পাই। এ সমস্তই চৈতন্যের পূর্ণ প্রকটের পর, কৃত্তিবাসে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এইরূপ সংক্রামক রোগের পরিচয় আমরা অন্যত্রও দেখিতে পাই। অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থের দুই একটি স্থলের ঈষৎ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক, কোথাও বা প্রমাণসূত্রটিকে বদলাইয়া, সমগ্র গ্রন্থখানিকে "হিন্দু" করিয়া তোলা হইয়াছে। কৃত্তিবাসে পাঠবৈষম্যের ইহাই একমাত্র কারণ নহে। বহুকাল পূর্ব্বের হস্তলিখিত যে সকল পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সহিত বর্ত্তমান কৃত্তিবাসের ত মিল নাই-ই, এমন কি ১৮০৩ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণের দ্বারা প্রথম যে "কৃত্তিবাস" মুদ্রিত হয়, তাহার সহিতও বর্ত্তমান কৃত্তিবাসের অনেক স্থলে আদৌ মিল নাই। মিশনারিদের পুস্তকে যেথানে আছে

"পাকল চক্ষে রামের পানে চাহিলেক বালি।
দন্ত কড়মড়ায় বীর রামেরে পাড়ে গালি॥"

সেই স্থানে—পরবর্ত্তী কালের সংশোধিত বটতলার সংস্করণে আছে,

রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহে বালি।
দন্ত কড়মড় করে, দেয় গালাগালি॥

পরবর্ত্তী কালে ভাষার পরিমার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার আদিকবি কৃত্তিবাসও "পরিমার্জ্জিত" হইয়াছেন!! কবির কাব্য পরিষ্কৃত করিতে যাইয়া, সংশোধকগণ আবর্জ্জনারাশির দ্বারা কৃত্তিবাসকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন! এই ব্যাপারের মূলে আর একটি সত্যও নিহিত আছে। আমাদের দেশে, যখন যে কোনও নূতন জিনিষের আবির্ভাব হইয়াছে, আমরা তাহাকে, ধীরে ধীরে পুরাতনের সহিত মিশাইয়া নিজেদের ছাঁচে ঢালাই করিয়া "আপন" করিয়া লইয়াছি। আমাদের এই adaptability আছে বলিয়াই আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সাহিত্য এখনও টিকিয়া আছে। নবীন নানাবিধ ভঙ্গিরাগবিভূষিতা, শ্রুতিমোহনী বঙ্গভাষার যেমন আবির্ভাব হইল, অমনি আমরা আমাদের প্রাচীন, দুর্ব্বোধ্য শব্দসঙ্কুল ভাষাকে তাহার অনুগত করিয়া লইলাম, তাই আমার প্রাচীন

"অমিয় সায়ারে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল"

ইহার স্থলে

"অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল হলো"

করিয়া ফেলিলাম। প্রতিমার মূল পঞ্জরের কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন করিলাম না বটে, কিন্তু একটু নূতন ভঙ্গিতে বর্ণযোজনা করিয়া, প্রাচীনাকে নবীনা করিয়া তুলিলাম। ইহাতে প্রাচীনার অঙ্গহানি ঘটিল। এইরূপে মূল কৃত্তিবাসের অর্দ্ধসংস্কৃত, অর্দ্ধ-হিন্দি অনেক শব্দ পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে ক্রমে বর্ত্তমান বাঙ্গালায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাই প্রাচীন কৃত্তিবাসের

"মুক্রি" "ভিলস্ত" "কর্যা" "থুয়্যা" "পাকল"

প্রভৃতি অধুনা অপ্রচলিত শত শত শব্দের পরিত্যাগ সাধিত হইল। ইহা কালের নিরঙ্কুশ বিধান। ইহার উপর মানুষের কর্ত্তৃত্ব তত অধিক নাই। যাহা গ্রাহ্য, কাল তাহার গ্রহণ করিবে। যাহা বর্জ্জনীয়, কাল তাহার বর্জ্জন করিবে।

শাক্ত এবং বৈষ্ণব—এই দুই সম্প্রদায়ের লিপিকারগণের কল্যাণে কৃত্তিবাসের অনেক স্থলে যেমন শাক্তপ্রভাব পরিদৃষ্ট হয়, তেমনই বৈষ্ণবপ্রভাবও পরিদৃষ্ট হয়। ইহা ছাড়া, অন্যান্য পুরাণ উপপুরাণ প্রভৃতি হইতে অনেক মনোরম অংশও লিপিকারগণ বাছিয়া আনিয়া কৃত্তিবাসে জুড়িয়া দিয়াছেন। অনেকে অনেক নূতন কবিতার প্রণয়ন করিয়া কৃত্তিবাসের গ্রন্থে পুরিয়া দিয়া, স্ব স্ব আত্মাভিমানের পূজা করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কৃত্তিবাস হইতে শত শত স্থল উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, ঐতিহাসিকের সে কার্য্য হইতে আমি বিরত হওয়াই সঙ্গত মনে করি।

কৃত্তিবাসের কল্পনা তাহার গন্তব্য পথ—

রামায়ণী কথার আশ্রয়ে কালিদাস ভবভূতি রঘুবংশ

উত্তরচরিত প্রভৃতির রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু যেস্থানে যেরূপ প্রয়োজন, তাঁহারা নূতন মূর্ত্তিও গঠন করিয়াছেন। কবিরা কল্পনার বৈদ্যুতিক শক্তিতে শক্তিমান্। সেই সতত চঞ্চলা শক্তি কদাচ কোন নির্দ্দিষ্ট পথে, কোন পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট রেখা বাহিয়া চলিতে পারে না, জানেও না। তাই কবিকৃত সৃষ্টিতে, অনেক স্থলে মূল আদর্শেরও পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণ তাই মহর্ষি-ক্ষুণ্ণপথ কল্পনার দৌত্যে অল্পবিস্তর ছাড়িয়া, অন্য পথেও গিয়াছেন। কৃত্তিবাসও সেইরূপ অনেক স্বকল্পিত আলেখ্যের অঙ্কনপূর্ব্বক, তদীয় গ্রন্থ সুচারুতর করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই বাল্মীকির অনুসরণ করেন নাই। বীরবাহু তরণীসেন প্রভৃতির সৃষ্টি তাঁহার আত্মকল্পনার চরম উৎকর্ষ খ্যাপন করিতেছে। কবিগণ কাহারও অঙ্গুলিসঙ্কেতে চলেন না। কল্পনা কাহারও দাসীত্ব করিতে জানে না। কল্পনা কখনও কবিকে মেঘের উপর লইয়া গিয়া সৌদামিনীর বিলাসচঞ্চলা মূর্ত্তি প্রদর্শন করে, কখনও আবার তুষারমণ্ডিত কমলের কেশরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া কবিকে কত নিভৃত সৌন্দর্য্য দেখায়। উন্মাদিনী চঞ্চলার ন্যায় কবির উন্মাদিনী কল্পনা কাহারও অঙ্গুলিসঙ্কেতে পরিচালিত বা ভ্রূকম্পনে বিকম্পিত হয় না। সে আপনার ভাবেই আপনি বিভোর হইয়া ছুটে, পরের ভাবে ভুলে না। কৃত্তিবাসের স্বৈরচারিণী কল্পনা কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহে নাই। কোথাও প্রাচীন পথে, কোথাও বা নূতন পথে যেখানে যেমন ইচ্ছা, সে কল্পনা চলিয়া গিয়াছে। তরণীসেন বীরবাহু প্রভৃতির সৃষ্টি এই নূতন পথে যাত্রারই ফল।

কবির পরিচয়।—আনুমানিক ১৩০৬ শক ১৩৮৫ খৃঃ অব্দের মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গের প্রতিগৃহে যে দিন বীণাপাণির চরণকমল অর্চ্চিত হইতেছিল, "সকল-বিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ" বলিয়া যেদিন ভক্তি-গদ্‌গদকণ্ঠে স্তব করিতে করিতে হিন্দু তাহার চিরপ্রার্থিত দেবতার চরণে মস্তক স্থাপন করিতেছিল, সেই শুভক্ষণেই যাঁহার জন্ম, তাঁহার জীবন যে সেই বাগ্‌দেবতার অনুগ্রহে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইবে তাহাতে আর কথা কি?

৭৩২ খৃঃ অব্দে আদিশূর কনোজ হইতে যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে এ দেশে আনয়ন করেন, তাঁহাদের অন্যতম ভরদ্বাজ-গোত্রীয় শ্রীহর্ষ হইতে সপ্তদশ পুরুষ অধস্তন নরসিংহ ওঝা বেদানুজ রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। এই বেদানুজ সম্ভবতঃ পূর্ব্ববঙ্গের স্বর্ণগ্রামের রাজা ছিলেন। আন্দাজ ১২৪৮ অব্দে এই নরসিংহ অরাজক স্বর্ণগ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে বাস করিবার সঙ্কল্পে ফুলিয়ায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ফুলিয়ার তখন বড় স্পর্দ্ধার দিন। কৃত্তিবাস নিজেই স্বীয় বংশ পরিচয়ের সময়ে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে এখানে "মালঞ্চ" ছিল, নানাবিধ ফুলের বাগান ছিল, তাই ইহার নাম হয় "ফুলিয়া"। এই ফুলিয়ার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে বীচিমালিনী ভাগীরথী রজত-ধারায় প্রবাহিত ছিলেন। প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য্যের ইহা লীলা-নিকেতন ছিল। মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ নরসিংহ তাঁহার তদানীন্তন পদোচিত বিভবাদির সহিত এই মনোহর স্থানে আসিয়া একেবারে জুড়িয়া বসিলেন। কৃত্তিবাসের ভাষায়

> "ফুলিয়া চাপিয়া হইল তাঁহার বসতি।
> ধন ধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়য় সন্ততি॥"

ফুলিয়া "চাপিয়া" তাঁহার বসতি হইল। এই নরসিংহের পরমদয়ালু পুত্র গর্ভেশ্বর কৃত্তিবাসের প্রপিতামহ। গর্ভেশ্বরের পুত্র মুরারি ওঝা, কৃত্তিবাসের পিতামহ এক অতি প্রধান কবি ছিলেন। তাঁহার কোন গ্রন্থাদির পরিচয় পাই না সত্য, কিন্তু কবি কৃত্তিবাস স্বয়ং তাঁহাকে ব্যাস মার্কণ্ডেয়াদির সহিত তুলনা করিয়াছেন।

এই মুরারি ওঝার পৌত্র কৃত্তিবাসের নিজের উক্তিতেই দেখিতে পাই, বাল্যে প্রথমতঃ চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাভ্যাস করেন। এই চতুষ্পাঠীর শিক্ষাই তদীয়

সংস্কৃত রামায়ণ পাঠের সোপান। পাঠ সমাপ্তির পর, প্রথা অনুসারে তিনি গৌড়েশ্বরের সভায় আত্ম-পরিচয়ার্থ উপস্থিত হন। রাজা তাঁহার গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করেন। "তথাস্তু" বলিয়া কৃত্তিবাস যখন সগর্ব্বে বাহির হইলেন, তখন সকলে "ধন্য ধন্য" বলিয়া কবির অভ্যর্থনা করিলেন।

সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত।
মুনিমধ্যে বাখানি' বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী"

বলিয়া সহস্র মুখে কৃত্তিবাসের প্রশস্তি সঙ্গীত উচ্চারিত হইল। কৃত্তিবাস স্বয়ং এই প্রসঙ্গে অনেক কথা বলিয়াছেন, আত্মবংশের বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি যে কত বড় বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় আমি আর বিশেষ কি বলিব! এখনও "ফুলিয়ার মুখটি" বলিয়া আমরা তাঁহারই বংশের স্পর্দ্ধা করি। রাঢ়ীয় শ্রেণীর প্রধান এবং মুখ্য বংশ "ফুলিয়ার মুখটি"—কৃত্তিবাসেরই অনুস্মৃতি মাত্র।

মাহেন্দ্রক্ষণে রাজা কৃত্তিবাসকে রামায়ণ রচনার আদেশ করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষার অরুণ-রাগরঞ্জিতা উষার প্রথম আলোকচ্ছটা কৃত্তিবাসের মস্তকে প্রথম স্বর্ণকিরীট পরাইয়া দিয়াছিল,—বঙ্গভূমি, বঙ্গভাষা ও সেই সঙ্গে বাঙ্গালী জাতি ধন্য হইয়াছে। পল্লী-প্রান্তরের স্নিগ্ধ বটচ্ছায়ায়, জন-পদ-বধূর গোষ্ঠীবন্ধনে, বর্ষীয়সী ললনাদিগের বিশ্রামকক্ষে, কৃত্তিবাসের বিরচিত গাথা গীত ও ভক্তিপূর্ব্বক শ্রুত হইতেছে। ভাষায় যাহার সম্যক অধিকার নাই, সেই প্রাকৃত ব্যক্তিও প্রেমভরে রামায়ণ গান করিয়া আত্মহারা হইতেছে, আর সেই সঙ্গে, নিরক্ষর সরল কৃষক সাশ্রুনয়নে ও তন্ময়-হৃদয়ে সে গান শুনিয়া আপনাকে ভুলিয়া যাইতেছে। এখনও একাদশীর অপরাহ্ণে ধূসরবসনা বিধবারা সমবেত হইয়া কোন ললিতকণ্ঠ বালকের দ্বারা রামায়ণ পড়াইয়া শুনিতেছেন, তাঁহাদের উপবাস-ক্লিষ্ট হৃদয়ের ভক্তির রস উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে। মনোহর কল্পনা, মধুরভাব, অনুপম সৃষ্টিকৌশলে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, বঙ্গ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌রূপে পরিগণিত। কৃত্তিবাসের পর, আজ পর্য্যন্ত যত ব্যক্তি বঙ্গবাণীর পদ পূজা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই পূজার উপকরণ—ফুল, ফল, পল্লব,—কৃত্তিবাসের ঐ রামায়ণরূপী কল্পকানন হইতে চয়িত ও সংগৃহীত। কৃত্তিবাস ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার পর পাঁচশত বৎসরেরও অধিক কাল অতীত হইয়াছে বটে, কিন্তু আজও প্রতিক্ষণে তাঁহার নাম বঙ্গের গৃহে গৃহে বিপণির পণ্যকুটীরে, চাষার আশার কৃষিক্ষেত্রে সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইতেছে। আজ আর

"দক্ষিণে পশ্চিমে যা'র গঙ্গা তরঙ্গিণী"

সে "ফুলিয়া" নাই, সে "ফুলিয়ায়" কৃত্তিবাসের সেই "চাপিয়া বসতি"র চিহ্নও নাই, কিন্তু সেই "ফুলিয়া পণ্ডিতের" মোহন বাঁশরীর ঝঙ্কার এখনও বাঙ্গালীর "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করিতেছে, বাঙ্গালীকে উন্মত্ত করিয়া, বিভোর করিয়া রাখিয়াছে।

কৃত্তিবাসের এই সার্ব্বভৌম প্রসিদ্ধির অপর কতিপয় কারণও পরিদৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষের মৃত্তিকা বড়ই কোমল, বড়ই উর্ব্বর। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, কর্ণ, ভীষ্ম, দধীচি, শিবি, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অরুন্ধতী লোপামুদ্রা, ঔশীনরী প্রভৃতি এই ভারতবর্ষেরই চিত্র। যাহার প্রাণে প্রেম, নয়নে ভক্তির অশ্রু, ভারতবাসীরা তাহাকে হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ করে, প্রাণ দিয়া পূজা করে। কৃত্তিবাস এ রহস্য বুঝিতেন। তিনি আরও বুঝিতেন যে, নিশীথে নিস্তব্ধ রজনীর সৌম্যমূর্ত্তি যাহার চিত্তকে অভিভূত, বা অনুভূতির বিমলকর ধৌত করিতে না পারে, সে কদাচ ঐ নৈশ নীরবতার মাধুর্য্য অপরকে বুঝাইতে পারে না; সায়ংকালের শ্যামায়মানা বনভূমির প্রাঞ্জল মূর্ত্তি যাহার প্রাণে আকুলতা জন্মাইতে অসমর্থ, সে কখনও সান্ধ্য-সুষমার পবিত্র আলেখ্য অঙ্কন করিতে পারে না। সকল পদার্থেরই অনুভূতি চাই। সমস্ত বিষয়েই মগ্ন হওয়া চাই, প্রাণ অকৃপণভাবে ঢালিয়া দেওয়া চাই, অন্যথা সিদ্ধিলাভ সুদূর পরাহত। কৃত্তিবাস অকৃপণভাবে, আত্মপ্রাণ কবিতাদেবীর পাদপদ্মে

ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে আর কিছুই ছিল না, সমস্তই ঐ চরণে অঞ্জলি দিয়াছিলেন তাই তদীয় কবিতার কুত্রাপি কোনরূপ বাধা দেখিতে পাই না। সর্ব্বত্রই সমান এবং অপ্রতিহত গতি। অসম্ভব হইলেও মনে হয়, যেন, এক সময়ে, এক স্থানে বসিয়া, অন্য-চিন্তা- বিযুক্ত হইয়া, মহাকবি, তাঁহার সাধের রামায়ণ গান গাহিয়াছেন। তিনি নিজে সে গানে মজিতে পারিয়াছিলেন, তাই তাঁহার শ্রোতৃবর্গও মজিয়াছে, আত্মবিস্মৃত হইয়া, তাঁহার সেবা করিয়াছে, আচন্দ্র-দিবাকর করিবেও।

তুমি যখন অভ্রভেদী, শুভ্রতুষারশীর্ষ, হিমাচলের পাদদেশে বসিবে, বিধাতার কৃপায়, তখন যদি তোমার হৃদয়ে, কোন প্রশান্ত ছবির ছায়াপাত হয়, কোন বিরাট শক্তির স্পন্দন অনুভূত হয়, তবেই তুমি ঐ বিরাট হিমাচলের প্রশান্ত ভাবের, প্রশান্ত মূর্ত্তির কিয়দংশ হয়ত, তোমার কল্পনা দর্পণের সাহায্যে অন্যকে প্রদর্শন করিতে পার। অন্যথা, তোমার সাধ্য কি যে তুমি হিমাচলের ঐ গম্ভীর-মাধুর্য্যের বর্ণন করিবে। তুমি যে স্থানে, যে সময়ে, যে অবস্থায় বর্ত্তমান, যদি সেই স্থানের, সেই সময়ের, সেই অবস্থার সহিত, নিজেকে মিশাইতে না পার, "তদ্ভাব-ভাবিত" করিতে না পার, তবে কদাচ, তদ্দেশীয় ও তৎকালীন ভাবের স্ফুরণ তোমার দ্বারা সম্ভব হইবে না। তোমার দ্বারা তদ্দেশবাসিগণের হৃদয় কদাচ বিমোহিত হইতে পারে না। দীপকরাগের সময়ে, তুমি বেহাগ পূরবীতে আলাপ করিলে, তাহা কখনও জমিতে পারে না। সে আলাপে শ্রুতির সুখ হয় না, বরং পীড়াই জন্মে। ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের ধর্ম্মপ্রাণ অধিবাসীরা কি চায়, কি ভালবাসে, এ তত্ত্ব মহাকবি কৃত্তিবাস বুঝিতেন। এদেশের লোকের হৃদয় কি উপাদানে গঠিত, কোন্ উপকরণ তাহাতে অধিক, তাহা কৃত্তিবাস জানিতেন, তাই তাঁহার দেশ-বাসিগণের হৃদয়ের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, তিনি তদীয় কল্পনার মোহন বীণায় ঝঙ্কার করিয়াছিলেন। তাই সে ঝঙ্কার বসন্তের পিকঝঙ্কারের ন্যায় বঙ্গবাসীদিগকে বিমুগ্ধ একেবারে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। এই হিসাবেও সংস্কৃতে কালিদাস ও বাঙ্গালায় কৃত্তিবাস একই মন্ত্রে দীক্ষিত, একই পথের যাত্রী। তোমার পাঠকগণ কি চান্, কতটুকু চান্, তোমার বীণার কোন্ তার স্পর্শ করিলে, তাহার ধ্বনি তোমার পাঠকের হৃদয়ে অনুরণিত হইবে, তাহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিবে,—এ জ্ঞান যদি তোমার না থাকে, তবে তুমি যত বড় শক্তিশালী লেখকই হও না কেন, যত বড় কাব্য-বিদ্যাবিশারদই হও না কেন, তোমার লেখায় বা তোমার অঙ্কিত আলেখ্যে, তোমার সামাজিকবর্গের বা তোমার দর্শকবৃন্দের পরিতৃপ্তি হইবে না। তোমার সে লেখায় বা সে চিত্রে, ত্বদীয় দেশবাসী সহৃদয়বর্গের হৃদয় আকৃষ্ট ও বিমোহিত হইবে না। যে সমুদয় লেখকের এই জ্ঞান আছে, তাঁহাদের লেখাই কালজয়ী হয়, থাকিয়া যায়; আর যাঁহাদের এই জ্ঞান নাই, তাঁহাদের লেখা ছিন্ন তুষারের ন্যায় অতি অল্পকাল মধ্যেই কোথায় মিলাইয়া যায়। আর্ষ রামায়ণ অবলম্বন পূর্ব্বক অন্য অনেক কবি বঙ্গভাষায় রামায়ণ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণ তন্মধ্যে যে এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, প্রায় পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কাল সমানভাবে বা উত্তরোত্তর ক্রমেই অধিকতরভাবে, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, স্ত্রী-পুরুষ, ইতর ভদ্র সকল সমাজেই পূজিত হইতেছে, ইহার কারণ হইল, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান। কৃত্তিবাসের ঐ জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে ছিল। যে দেশে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই দেশের অধিবাসীরা কি ভালবাসে, কি চায়, তাহা তিনি জানিতেন এবং তিনিও তাহাই চাহিতেন ও ভাল বাসিতেন। তাই, তিনি যদি কখনও সামান্য একটু গুণ্ গুণ্ করিয়া স্বরবিলাস করিয়াছেন, অমনি সেই গুণ্ গুণ্ ধ্বনি শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াই যেন, তদীয় দেশবাসীদিগের হৃদয় বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছে। দিবাবসানে সাগরগামিনী তটিনীর প্রাণের আকুল গীতিকা, কুলকুল ধ্বনিতে যেমন শ্রান্ত পথিকের চিত্তে একটা জড়তা, একটা তন্দ্রা আনিয়া দেয়, পথিক

একপদে তাঁহার কর্ম্মবহুল দীর্ঘ দিবসের সমস্ত ক্লেশ ভুলিয়া যান, কেমন একটা ঘুমের ঘোরে তাঁহার নয়ন নিমীলিত হইয়া আসে, সেইরূপ, প্রেমিক কবি কৃত্তিবাসের মোহিনী বীণার ঝঙ্কারেও বঙ্গবাসীর হৃদয় বিমোহিত আনন্দালস হইয়া রহিয়াছে। কবে কোন্ দিন্, কত শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, তমসার তীরে "মা নিষাদ" বলিয়া বাল্মীকি গান ধরিয়াছিলেন, আর আজও যেন সেই গানের ধ্বনির বিরাম হয় নাই। সে স্বর লহরী যেন বাতাসে এখনও ভাসিয়া বেড়াইয়া, ভারত বাসীদের প্রাণে কেমন একটা তন্দ্রা জন্মাইয়া দিতেছে, সেইরূপ কবে কোন্ দিন, কোন্ শুভমুহূর্ত্তে পতিতোদ্ধারিণীর তীরে বসিয়া, তাঁহারই কুল কুল গীতির সুরে সুর মিশাইয়া ফুলিয়ার পণ্ডিত তান ধরিয়াছিলেন, আজ সে ফুলিয়া নাই, সে ভাগীরথীও দূরে সরিয়া গিয়াছেন,—কিন্তু সেই স্বপ্নময়, আবেশময় তানের এখনও যেন লয় হয় নাই। সে রাম, সে অযোধ্যা, কিছুই নাই, তবুও সেই রামের কথা, রামের স্মৃতি যেমন ভারতের নরনারীর প্রাণে প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে, আজীবন থাকিবেও, তদ্রূপ আজ সে ফুলিয়া নাই, সে জাহ্নবী নাই, সে কৃত্তিবাস নাই, কিন্তু কৃত্তিবাসের কথা, কৃত্তিবাসের স্মৃতি বঙ্গবাসী কদাচ বিস্মৃত হইবে না। রামসীতার পাদস্পর্শে অযোধ্যা চিরকালের মত তীর্থ হইয়া রাহয়াছে, কৃত্তিবাসের পাদস্পর্শে ফুলিয়া বঙ্গের সাহিত্য-সম্রাজ্যের প্রধান তীর্থ হইয়াছে। ফুলিয়ার মুখটী, শুধু ফুলিয়ার নহে, বাঙ্গালার গৌরব স্থান, পরম স্পর্দ্ধার ভাজন হইয়াছেন। জন্ম জন্মান্তরে কৃত্তিবাস কত তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহার সে তপস্যার ফলে তিনি ত অমর হইয়াছেনই, তাঁহার মাতৃভাষাকেও অমরী করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যের স্বর্ণ মন্দিরের তিনিই ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। যে দেশে এবং যে জাতিতে কৃত্তিবাসের ন্যায় কবি আবির্ভূত হন, সে দেশ ধন্য, সে জাতি বরেণ্য। কৃত্তিবাস বাঙ্গালী জাতিকে বড় করিয়া দিয়াছেন ; তিনি যে সঙ্গীত ধরিয়াছিলেন, আজ এই পাঁচশত বৎসর ধরিয়া যিনি যতটুকু পারেন,সেই সঙ্গীতের "তান প্রদান" করিতেছেন। তাঁহার সাধনার ফলে, তাঁহার স্বজাতির জাতীয় সাহিত্য ধীরে ধীরে পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। বাঙ্গালীর যতই চক্ষু ফুটিতেছে, ততই তাহারা তাঁহার আদর করিতে শিখিতেছে।

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী এবং বন্ধুবর সতীশচন্দ্র, আপনারা মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থানে অদ্য এই যে মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছেন,—পূজ্য মহাপুরুষের পূজার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এজন্য সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন্। যে সমুন্নত বংশের কৃত্তিবাস অলঙ্কার ছিলেন, সেই ফুলিয়ার মুখটীর একজন কবিতারসবঞ্চিত অভাজনকে আপনাদের অদ্যকার উৎসবে আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া আমি আপনাদিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যে কুলে আমার জন্ম, সেই কুলের একজন প্রধান পুরুষের এবং বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান মহাকবির স্মৃতিবাসরে আমি উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইয়াছি বলিয়া নিজেকেও ধন্য ও কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছি।

এস কৃত্তিবাস, তোমার বড় সাধের ফুলিয়ায় একবার ফিরিয়া এস, এই দেখ, তোমার উদ্দেশে, কত শত ভক্ত আজ সজলনেত্রে ফুলিয়ায় উপস্থিত, তুমি তাহাদিগের সারস্বতভাণ্ডারে যে অমূল্য রত্ন দিয়া গিয়াছ, সেই রত্নের গৌরবে তাহারা আজ গৌরবিত, কৃত্তিবাসের স্বজাতি বলিয়া আদৃত। এস কবি, আবার আসিয়া

"পবন নন্দন হনূ, লঙ্ঘি ভীমবলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কাণে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত লহরী ;
তেমতি, যশস্বি, তুমি সুবঙ্গ মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে,
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি।"

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা

প্রবাসী, চৈত্র —

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "খোলা জানালায়" কবিতাটি আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রাচুর্য্য আছে, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তিনি অনেক আধ্যাত্মিক কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার ভাব আমরা স্পষ্টরূপেই বুঝিয়াছি।

"বিবিধ প্রসঙ্গে" সম্পাদক মহাশয় প্রেসিডেন্সি কলেজের গুরুশিষ্য সংগ্রামের কথার প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে সত্য নাই একথা বলিতে পারি না। তবে লেখক প্রবীণ সম্পাদক, গুরুগিরিও তাঁহাকে বহুদিন করিতে হইয়াছে। সেই জন্য মনে হয় সব কথায় তিনি দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দেন নাই। লেখক বলিতেছেন—"গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ কৃত্রিম সম্বন্ধ। পিতামাতা ও সন্তানের সম্বন্ধ স্বাভাবিক; তথাপি কোন কোন সভ্য দেশে শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণের জন্য সভা ও আইন করিতে হইয়াছে। কেননা, এরূপ স্নেহপূর্ণ স্বাভাবিক সম্পর্ক সত্ত্বেও পিতামাতা কখন কখন নিষ্ঠুর হয়। গুরুপদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিও যে কখন কখন নিষ্ঠুর, অভদ্র, অপমানকারী হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।"

গুরুর নিষ্ঠুরতা বা অভদ্রতা বিচিত্র নয় কারণ গুরুশিষ্য সম্পর্ক কৃত্রিম। আমরা বলি এ সম্পর্কটা কৃত্রিম হইলেও পিতা-পুত্রের সম্পর্ক অপেক্ষা শিথিল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যে সম্পর্কটাকে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় বলিতে চাই সেই দাম্পত্য সম্বন্ধটাও কি কৃত্রিম নয়? গুরুশিষ্য সম্পর্ক বড় উচ্চ বড় পবিত্র। আজ যদি সে সম্পর্ক একস্থলে শিথিল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার অগ্রাহ্য কৃত্রিমতাটুকু লোক-চক্ষুর সমক্ষে একটা কারণ বলিয়া উপস্থাপিত করিলে কাজটা হাস্যকর হইয়া পড়িবে। বিশেষতঃ এই পবিত্র সম্পর্কের শুধু মন্দ দিকটারই একটা জ্বলন্ত চিত্র দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট প্রকাশ করিলে সুফল ফলিবে না।

বিশিষ্ট কলেজে বিশিষ্ট ছাত্র ও অধ্যাপকে বিশিষ্ট অবস্থায় যে বিবাদ ঘনাইয়া উঠিয়াছে, তাহার জন্য গুরু শিষ্য সম্বন্ধ বলিতে আমাদের দেশ যাহা বোঝে তাহা উলটাইয়া বিলাতী গুরুশিষ্য সম্বন্ধ প্রচার করিবার অথবা গুরুশিষ্যকে বাদি-প্রতিবাদীরূপে মুখোমুখি দাঁড় করাইয়া বিচার করিবার দিন এখনও আসে নাই এবং সে দিনটা অন্য দেশে আসিয়াছে বলিয়া আমাদের দেশেও যে ডাকিয়া আনিতে হইবে তাহারও কোন সুযুক্তি দেখিতে পাই না।

ছেলেদের আত্মসম্মান, তাহাদের তেজ, বুদ্ধি ও কার্য্য-ক্ষমতা দিন দিন বাড়িয়া উঠুক। দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি তাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে। তাহাদের উন্নতি-পথে উৎসাহ দেওয়া উচিত এবং তাহাদের সামান্য ত্রুটিটুকুও লক্ষ্য করিবার জিনিস।

সেই জন্য যে বিবাদে গুরু আহত হয় সে বিবাদের কথায় শুধু ছাত্রদের পক্ষ অবলম্বন করিলে তাহারাই সম্পাদকের উক্তিটা উপহাসাস্পদ মনে করিবে, কেননা তাহারা শিক্ষিত।

এক সময়ে ছাত্রদের প্রিয় হইবার জন্য অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তৃতায় কত ছেলে অকালে নষ্ট হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা সহজ নয়।

এখন লেখার ভিতর ছাত্রদের প্রিয় হইবার চেষ্টাটা বেশ ফুটিয়া উঠিতেছে। লেখক এমন অনেক একথা বলিয়াছেন যাহা বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। গুরু ও শিষ্যকে প্রভু ও দাসের মত ভাবিবার অবকাশ দিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়কে শক্তের ভক্ত ও নরমের যম বলিয়া অনেক কোমলমতি বালকের চিত্তে একটা অশান্তি আনিয়া দিবার উদ্দেশ্য কি তাহাও বুঝিতে পারি না।

লেখক বলিতেছেন, "আমরাও মনে করি ছাত্রদের নিয়মাধীন হওয়া খুবই উচিত এবং তাহাদের কোন দুঃখকষ্ট অভিযোগ থাকিলে তাহা কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করা উচিত। কিন্তু প্রতিকার না পাইলে, কারখানার মজুর এবং গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদের ধর্ম্মঘটরূপ যে আইন সঙ্গত উপায় আছে, তাহা হইতে তাহারা কেন বঞ্চিত হইবে?" আমরা মনে করি ছাত্ররা কারখানার মজুর বা গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান নয়, তাহাদের ছাত্রোপযোগী আইন সঙ্গত উপায় যথেষ্ট আছে। ধীর স্থির ভাবে চলিলে অনেক অত্যাচারের প্রতিকার করা যায়। "প্রবাসী" সম্পাদক ছাত্রদের যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা আমরা কোন মতেই উচিত বলিয়া মানিয়া লইতে পারিলাম না। আমরা বলি, ছাত্রদের মধ্যে আত্মসম্মান একটু একটু করিয়া জাগিয়া উঠিতেছে; তাহা পূর্ণ মাত্রায় বাড়িয়া উঠুক; কিন্তু যে কাজে আত্মসম্মান নষ্ট করিতে হয় তাহাতে নিযুক্ত হওয়া কোনমতেই উচিত নয়। ধর্ম্মঘট করিলে আত্মসম্মান প্রকাশ প্রকাশ পায় না, শিক্ষককে প্রহার করায় পৌরুষ নাই এবং অনেকে মিলিয়া হঠাৎ একজনকে পিছনদিক হইতে আক্রমণ করিলে সাহস দূরে কথা, ভীরুতারই পরিচয় দেওয়া হয়।

এই প্রবন্ধের ভাষার একটু নমুনা দিই—"শিক্ষাবিভাগের উচ্চতম স্তরে জাতি অনুসারে নিয়োগ না হইয়া কেবল গুণ অনুসারে নিয়োগ না হইলে এইরূপ ধারণার কারণ দূর হইবে না।"

সম্পাদক বাংলাভাষার বানান-পদ্ধতিও উল্‌টাইতে চান্‌। আমরা লিখি "হওয়া" তিনি লেখেন "হওা"। আমরা কিন্তু তাঁহার লেখাটা উচ্চারণ করিতে পারি না, ব্যাকরণশাস্ত্রও আমাদের পক্ষে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকারের "বংশ ও জাতি" সুন্দর রচনা। কোথাও বাজে কথা একটিও নাই। প্রবন্ধটি নানা জ্ঞাতব্য তথ্য ও গবেষণায় পরিপূর্ণ। কয়েক টি কথা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম —"ভারতবাসীরা নিজেদের সমস্যা স্বাধীনভাবে আলোচনা ত করেই না—বিদেশীয় ধুরন্ধরগণের সিদ্ধান্ত সমূহের যথার্থ মূল্যও বুঝিতে অসমর্থ। আজ একজন আমেরিকার পণ্ডিত প্রচার করিলেন—নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গের বিবাহ হইলে সুফল লাভ হয়। অমনি একদল ভারতীয় সমাজ-সেবক সুর ধরিলেন—'ভারতবর্ষেও এইরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়।' অথবা হয়ত একজন ইংরেজ পণ্ডিত প্রচার করিলেন—'পণ্ডিতের সন্তানেরাই পণ্ডিত হন, বদমায়েসের সন্তানেরা বদমায়েস হয়। সুতরাং বংশগত জাতিভেদই প্রশস্ত।' অমনি ভারতীয় ধুরন্ধর বলিতে লাগিলেন,—'এই জন্যই ভারতবর্ষের ঋষিগণ ব্রাহ্মণের সন্তানকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।' * * পরাধীন জাতির অশেষ দোষ—কোন বিষয়েই তাহার স্বাধীন চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকে না। * * * আজকাল তুলনা-মূলক মনের বিজ্ঞান আলোচিত হইয়া থাকে। মনস্তত্ত্ববিদেরা পাগলের চিত্ত, প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তির চিত্ত, শিশুর চিত্ত, মূর্খের চিত্ত, ইত্যাদি নানাবিধ চিত্ত-বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহারা গোলামের চিত্ত ও মনিবের চিত্ত, দাসের চিত্ত, এবং প্রভুর চিত্ত, পরাধীনের চিত্ত এবং স্বাধীনের চিত্ত, আলোচনা করেন না। প্রকৃত প্রস্তাবে Comparative Psychology বিদ্যায় Normal and Abnormal Psychology বিভাগের এক শাখায় এই দুই ধরণের চিত্ত বিশ্লেষিত হওয়া উচিত। তাহার নাম হইবে The Psychology of the slave and the Psychology of the master * * * * * বর্ত্তমান ভারতীয় পণ্ডিতগণের সমাজ-তত্ত্ব-আলোচনায় Slave Psychologyর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।"

কথা গুলি ভাবিবার, শুধু পড়িবার নয়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি" কবিতায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়াছি, লেখকের শব্দ-সম্পদও আছে কেননা তিনি শব্দ রচনায় স্বাধীন, কোন বিধিনিয়ম মানেন না। 'স্বর্গ-সিঁড়ি,' 'ফুল্লকদম-সঙ্গিনী' প্রভৃতি কথাগুলি তাহার প্রমাণ। লেখক পুরাণ, ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কিন্তু কবিতার মধ্যে কতটা পাণ্ডিত্য প্রকাশ উচিত সে বিষয়ে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন নাই। লেখকের আর একটি কবিতা এ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার নাম "জাতির পাঁতি"। লেখক মহামানবের জয়গান করিয়াছেন। কবিতাটি বড়ই দীর্ঘ; লেখক যেন কতকগুলি মুখস্তবুলি আওড়াইতেছেন-কবিতায় প্রাণ নাই।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা" আরম্ভ হইয়াছে। লেখক বিজ্ঞ পণ্ডিত। উপযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত বিষয়ের আলোচনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। রচনায় পাণ্ডিত্য ও বিচার-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীবিনয়কুমার সরকারের "চীনের প্রাচীনতম বৌদ্ধজনপদ" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

"সমগ্র ইউরোপকে কোন এক রাষ্ট্রের অন্তর্গত করিবার জন্য কোনদিন আন্দোলন উপস্থিত হয় না। বিরাট চীনাসমাজেও একটা তথাকথিত ঐক্যের নামে আন্দোলন উপস্থিত হইবে কেন? চল্লিশ কোটি নরনারীর সমাজে আদর্শগত ঐক্য,সভ্যতাগত ঐক্য, ধর্ম্মগত ঐক্য, ইত্যাদি নানা ধরণের ঐক্য থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া রাষ্ট্রীয় ঐক্যও স্থাপিত হইবে কে বলিল? Europe এর বিভিন্ন দেশের মধ্যেও কি মোটের উপর একটা Fundamental unity মূলগত ঐক্য নাই? ফ্রান্সে, জার্ম্মানিতে, রুশিয়ায় ও ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য দেশে আদর্শগত, সভ্যতাগত,ধর্ম্মগত ঐক্য ইত্যাদি কম আছে কি? তথাপি ইউরোপের লোকেরা 'ঐক্য ঐক্য' করিয়া মরে না। তাহারা জানে ঐক্য একটা উপায় মাত্র, কোন নরসমাজের চরম উদ্দেশ্য নয়। * * * চীনাদের ভবিষ্যৎ ঐক্যবদ্ধ মহাচীন গঠনে নয়—বহুসংখ্যক।ছোট বড় মাঝারি স্বাধীন ও শক্তিশালী চীন গঠনে।"

প্রবন্ধে জানিবার কথা অনেক আছে। লেখক পণ্ডিত, অনুসন্ধিৎসু ও সূক্ষ্মদর্শী।

সবুজপত্র,।মাঘ—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ঘরে-বাইরে"র প্রতিপাদ্য বস্তুটি ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া আসিল। নিম্নের উদ্ধৃত অংশে কবিত্ব, দার্শনিকতার মধ্য দিয়া প্রগাঢ় ধার্ম্মিকতায় বিলীন হইয়াছে:—

"থেকে থেকে বাদ্‌লা রাতের দম্‌কা হাওয়ার মত চোখের জলে ভরা এক একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস শুন্‌তে পাচ্চি। আমার মনে হল, আমার এই ঘরটার বুকের ভিতরকার কান্না।

"আমার ঘরে আর কেউ নেই। বিমলা কিছুদিন থেকে কোনো একটা পাশের ঘরে শোয়। আমি বিছানা থেকে উঠে পড়লুম। বাইরের বারান্দায় গিয়ে দেখি বিমলা মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েচে।

"এ সব কথা লিখ্‌তে পারা যায় না। এ যে কী, তা কেবল তিনিই জানেন যিনি বিশ্বের মর্ম্মের মধ্যে বসে জগতের সমস্ত বেদনাকে গ্রহণ করচেন। আকাশ মূক, তারাগুলি নীরব, রাত্রি নিস্তব্ধ—তারি মাঝখানে ঐ একটি নিদ্রাহীন কান্না?

"আমরা এই সব সুখ দুঃখকে সংসারের সঙ্গে, শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ভালোমন্দ একটা কিছু নাম দিয়ে চুকিয়ে ফেলে দিই। কিন্তু অন্ধকারের বক্ষ ভাসিয়ে দিয়ে এই যে ব্যথার উৎস উঠ্‌চে, এর কি কোনো নাম আছে? সেই নিশীথ রাত্রে, সেই লক্ষকোটি তারার নিঃশব্দতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি যখন ওর দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, তখন আমার মন সভয়ে বলে উঠ্‌ল, আমি একে বিচার করবার কে? হে প্রাণ, হে মৃত্যু, হে অসীম বিশ্ব, হে অসীম বিশ্বের ঈশ্বর, তোমাদের মধ্যে যে রহস্য রয়েছে, আমি জোড়-হাতে তাকে প্রণাম করি।"

রবীন্দ্রনাথের "বৈরাগ্য-সাধন" একখানি নাট্য। ভাব ও ধরণ অনেকটা "ফাল্গুনী" নাটকেরই মত। মহারাজ বৈরাগ্য-সাধন করিতে চান্—রাজকোষে ধনাভাব, প্রজাদের দুর্ভিক্ষ, বিপক্ষের আক্রমণ—তবুও তিনি শ্রুতিভূষণের "বৈরাগ্যবারিধি" শ্রবণে তন্ময়! কবিশেখর অন্য ধরণের লোক। মহারাজের মাথায় পাকা চুল দেখিয়া শ্রুতিভূষণ বৈরাগ্যের ব্যবস্থা দেন। কবিশেখর কিন্তু বলেন, "ঐ শাদা ভূমিকার উপরে আবার নূতন রং লাগ্‌বে, শাদার প্রাণের মধ্যে সব রঙেরই বাসা।" কথাটা নব্যদর্শন ও বিজ্ঞানের অনুমোদিত।

কবিশেখরও বৈরাগী। তাঁহার মতে "সংসারে যে কেবলি সরা, কেবলি চলা; তারই সঙ্গেসঙ্গে যে লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলি সরে, কেবলি চলে, সেই ত বৈরাগী।" শান্তি বা ধ্রুবসম্পদে তাহার আসক্তি নাই, সে অধ্রুব-মন্ত্রের বৈরাগী—সংসারে কেবলই চলা, কেবলি ছাড়িতে ছাড়িতে অগ্রসর হওয়া—সেই জন্য ধ্রুব জিনিসকে সে জানিতে চায় না। সে নদীর মত আনন্দে বহিয়া চলিয়াছে। এই চলার লীলার মধ্যে সে সব সুখ দুঃখকে ভাসাইয়া লইতে চায়। গতিশীল নদী ভারি জিনিসও আনন্দে ভাসাইয়া লইতে পারে, মাটীর পাকা রাস্তাই ভারকে ভারী করিয়া তোলে। সংসারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য গতি, একথা মানিয়া লইলে সুখদুঃখভার লঘু হইয়া পড়ে। শ্রুতিভূষণ একথা মানিতে চান্ না—তিনি সংসারের একটা ধ্রুব লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া পৃথিবীর জঞ্জালজালকে পরিহার করিতে চান্—তাঁহার নিকট সংসার জ্বালাযন্ত্রণায় ভরা, এখানে শান্তি বা আনন্দের কিছুই নাই। শ্রুতিভূষণের কথা খুবই স্পষ্ট, কিন্তু শ্রোতার প্রাণের সহিত তাহার মিল নাই। কবিশেখরের কথা অস্পষ্ট হইতে পারে, কিন্তু শ্রোতা তাহা প্রাণ দিয়া অনুভব করে। কবিশেখর খুব জোর গলায় বলিয়াছেন—"যারা বৈরাগ্য-বারিধির তলায় ডুব মেরেচে তারা নয়, যারা কাজের কৌশলে হাত পাকিয়েচে তারাও নয়, যারা কর্ত্তব্যের শুষ্ক রুদ্রাক্ষের মালা জপ্‌চে তারাও নয়, যারা অপর্য্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েচে বলেই জগতের কিছুতে যাদের উপেক্ষা নেই, যাদের সাধনা কেবলই কর্ম্মের সাধনা নয়, প্রাণের সাধনা, জয় করে তারা, ত্যাগ করেও তারাই, বাঁচতে জানে তারা, মরতেও জানে তারা, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ পায়, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ দূর করে,—সৃষ্টি করে তারাই কেননা তাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র, সবচেয়ে বড় বৈরাগ্যের মন্ত্র।"

কবি, কবিশেখরকেই জয়ী করিয়াছেন।

রচনাটি দার্শনিক, নাট্যের আকারে সরস করিয়া রচিত। লেখক একটা দার্শনিক মত খাড়া করিতে চান। আমাদের মনে হয় এরূপ প্রবন্ধে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হওয়া কঠিন। কবিশেখর বলিতে চান্—সংসারের সুখ দুঃখ পরিহার না করিয়াও বৈরাগী হওয়া যায়, এই বৈরাগ্যই সব চেয়ে বড় বৈরাগ্য।—কবি ও কাব্য কি তাহাও প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হইয়াছে। আলোচনাটি সরস। প্রবন্ধটি পাঠ করা কঠিন, বিস্মৃত হওয়াও ততোধিক কঠিন।

তাহার পর শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ। তিনি প্রবন্ধে শ্রীবিধু-শেখর শাস্ত্রীর সহিত একটা কলহের সূত্রপাত করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য কি তাহা আলোচনার প্রয়োজন নাই, কেননা সেটা শাস্ত্রী মহাশয়ের কাজ। আমরা প্রমথবাবুর ভাষার দু-একটি নমুনা দিব। ভাষার খুঁটিনাটি লইয়া বিচার-বিতর্ক করা সমালোচনার কাজ নয়। কিন্তু বাংলা দেশে বর্ত্তমানে যখন গ্রন্থ ও মাসিক পত্র ছাপাইবার জন্য মুদ্রাযন্ত্রের কাজ দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, তখনও সমালোচনার মধ্যে ভাষার অশুদ্ধি প্রদর্শন করা প্রয়োজনীয়। আমরা প্রমথবাবুর ভাষার দুএকটি বিশেষত্ব দেখাইতে চাই—

(১) "Ethnologistদের হাত এখন আমাদের মাথা থেকে নেমে নাকের উপর এসে পড়েছে, সম্ভবতঃ পরে দাঁতে গিয়ে ঠেকবে। যাঁরা মস্তকের পরিমাণ থেকে মানবের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব এবং হীনত্ব নির্ণয় করতেন, তাঁহাদের মস্তিষ্কের পরিমাণ যে স্বল্প ছিল—

এ সত্য Ethnologistরাই প্রমাণ করেছেন। এখন এঁদের বিজ্ঞানের প্রাণ নাসিকাগত হয়েচে। কিন্তু সে প্রাণ যতদিন না ওষ্ঠাগত হয়, ততদিন এঁরা শাক্যসিংহের জাতি নির্ণয় করতে পারেন না। কেননা বুদ্ধদেবের দন্ত রক্ষিত হয়েছে, নাসিকা হয়নি।"

এখানে 'ওষ্ঠাগত' কথাটির দুটি অর্থ পরিস্ফুট করিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া লেখক আপনার রক্তবাটি দীর্ঘ ও অস্পষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতে বোঝা যায় লেখক শব্দনির্ব্বাচনের জন্য বিশেষ পরিশ্রম করেন—তাহার জন্য তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে রাজী, এমন কি নিজের কথার অর্থটিও।

(২) "বিশ্বমানবের সেবাধর্ম্ম এবং অনুশীলনের ধর্ম্ম প্রভৃতি আঁতুড়ে মারা যেত না।"

এখানে বোঝা যায় লেখক সংস্কৃত ও লৌকিক শব্দ দুয়েরই পক্ষপাতী—কিন্তু দুটি মিশাইয়া কিছু লিখিতে গেলে যে কৌশলের প্রয়োজন, এখানে তাহার একান্ত অভাব। অন্যত্রও এরূপ উদাহরণ অনেক আছে।

(৩) "মূল শব্দ দ্ব্যর্থবাচক। মূল ধর্ম্মের কোথায় এ প্রশ্ন ঐতিহাসিকও জিজ্ঞাসা করেন, দার্শনিকও জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু এ উভয়ের জিজ্ঞাস্য বিষয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঐতিহাসিক ধর্ম্মের মূল অনুসন্ধান করেন দেশে ও কালে; দার্শনিক সে মূল অনুসন্ধান করেন দেশকালের অতিরিক্ত কোনও পদার্থে।"

এখানে জিজ্ঞাস্য বিষয় দুইটি, তাহা বুঝিলাম, কিন্তু মূল শব্দ দ্ব্যর্থবাচক কেন তাহা হৃদয়ঙ্গম হইল না। জিজ্ঞাস্য বিষয় দুইটি বলিয়া যদি মূলশব্দকে দ্ব্যর্থবাচক বলা হয়, তাহা হইলে লেখকের কথায় যে ভুল আছে, তাহা প্রমাণ করিতে আমাদের একটুও কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না; কেননা 'মূল' বলিলে জিজ্ঞাস্য বিষয় শুধু দুইটি কেন, তাহার অধিকও যে সে বাহির করিতে পারে। ইহা হইতে বোঝা যায় লেখক অর্থ না বুঝিয়াও শব্দপ্রয়োগ করিতে অনুমাত্রও কুণ্ঠিত নন। তাঁহার অনেক গুণ আছে, তাহার মধ্যে সাহসও একটা বিশেষ গুণ।

উপরে অপভাষারই উদাহরণ দিয়াছি। এরূপ ভাষার প্রচলন কোনমতেই সম্ভব নয়। তবুও প্রমথবাবু যখন এই ভাষাই 'সবুজপত্রে' চালাইতেছেন, তখন মনে হয় তিনি অসাধ্যসাধন করিতে বসিয়াছেন; অথবা এই ভাষাই তাঁহার মজ্জাগত এবং ইহা পরিত্যাগ করিতে হইলে বাংলা প্রবন্ধ রচনা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

সাহিত্য-সমাচার

বিগত ১৯শে ও ২০শে চৈত্র তারিখে রঙ্গপুর টাউনহলগৃহে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের নবম বার্ষিক-অধিবেশন হইয়াছিল। মাননীয় বিচারপতি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী শাস্ত্রবাচস্পতি মহাশয় অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন।

———

বিগত ২৭শে চৈত্র অপরাহ্ণ আড়াই ঘটিকার সময় মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি ফুলিয়া গ্রামে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন উপলক্ষ্যে এক উৎসব হইয়া গিয়াছে। মাননীয় বিচারপতি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী শাস্ত্রবাচস্পতি মহাশয় এখানেও সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কলিকাতা ও বিভিন্ন স্থানের দুই সহস্রাধিক লোক এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। রঙ্গপুর ও ফুলিয়ায় পঠিত অভিভাষণ দুইটি মাননীয় লেখক মহাশয়ের অনুমতি ক্রমে আমরা বর্ত্তমান সংখ্যা "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে মুদ্রিত করিলাম।

———

আমরা গভীর শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে বিগত ১৯শে চৈত্র শনিবার ভোর ৫॥০ ঘটিকার সময় ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় আমাদিগকে ও বঙ্গদেশকে কাঁদাইয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। "মানসী"র জন্মাবধি তিনি এই পত্রিকার অকৃত্রিম সুহৃদ্ ছিলেন এবং নানা প্রবন্ধের দ্বারায় ইহার কলেবরকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। রোগশয্যায় শয়ন করিয়াও তিনি "মানসী"র জন্য প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। বিগতবর্ষের "মানসী"তে প্রকাশিত "শ্রীরোগাতুর শর্ম্মা" স্বাক্ষরিত "রোগশয্যার প্রলাপ" প্রবন্ধগুলি

তাঁহারই অক্লান্ত লেখনী-প্রসূত। এখনও আমাদের নিকট তাঁহার "রোগশয্যার প্রলাপ" শীর্ষক দুইটি প্রবন্ধ রহিয়াছে—তাহা ক্রমে আমরা "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে প্রকাশ করিব।

———

উদীয়মান ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "নূরজহান" প্রকাশিত হইল। মূল্য ৸০

———

বর্দ্ধমানে "বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন অষ্টম অধিবেশনের" বিবরণ পুস্তক প্রকাশিত হইল। রয়েল আট-পেজী আকারের এই হাজারপৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থে, উক্ত অধিবেশনের সম্পূর্ণ কার্য্যবিবরণ, পঠিত ও গৃহীত প্রবন্ধাদি সহ মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য ২৲ ডাকমাসুল ৷৹ প্রকাশক "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ- বর্দ্ধমান শাখা।"

———

আগামী ৮ই ও ৯ই বৈশাখে যশোহরে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের নবম অধিবেশন হইবে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌-এ, পি-এইচ-ডি মহাশয় ঐ সম্মিলনের সাধারণ সভাপতি, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় দর্শন শাখা-সভার সভাপতি, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় ইতিহাস-শাখা সভার সভাপতি ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি-এস্‌-সি, এফ-জি-এস্‌ মহাশয় বিজ্ঞান-শাখা-সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছেন।

———

ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন রায় এম-এ প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "স্নেহের ঋণ" যন্ত্রস্থ। সত্য বাবুর নূতন উপন্যাস "বেণী রায়"ও ছাপা হইতেছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয়ের ঊনবিংশ খণ্ড "সমসাময়িক ভারত" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ৩৲। ইহাতে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয়ের বহু টীকা, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক জে, এন্‌, দাশ গুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকা ছাড়া খোদাবক্‌শ লাইব্রেরীর দুইখানি প্রাচীন চিত্র, অন্যান্য অনেকগুলি চিত্র ও জেসুইটগণ লিখিত মূল ল্যাটিন হইতে অনূদিত আকবরের দরবারের বর্ণনা আছে। ল্যাটিন ব্যতীত কোন ভাষায় ইতঃপূর্ব্বে আর এই বর্ণনা প্রকাশিত হয় নাই।

———

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত "রত্নদীপ" উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ এবং "দেশী ও বিলাতী" গল্প-গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। এ দুইখানি বহি বাহির হইয়া গেলেই তাঁহার একখানি নূতন গল্পগ্রন্থ প্রেসে যাইবে।

———

বিগত ২৪শে মার্চ্চ রজনীতে কলিকাতা হিষ্টরিক্যাল সোসাইটিতে অন্ধকূপহত্যা কাহিনীর আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ঐ বিচার সভার বিবরণ ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের বক্তৃতার সারাংশ চিত্রাদি-সহ জ্যৈষ্ঠের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে প্রকাশিত করিবার আয়োজন হইতেছে।

———

সুকবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ প্রণীত "বীথি" নামক একখানি নূতন কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য কত তাহা কোথাও লেখা নাই।



পারস্য দেশের ফল ও সব্জীর দোকান।

Manasi Press.

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

৮ম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ সাল | ১ম খণ্ড
১ম খণ্ড | | ৪র্থ সংখ্যা

জন্মভূমি। *

পরম স্নেহশালিনী ধৈর্য্যরাণী ধরণীর সহিত আমাদের পরিচয় হয়—জন্মের অন্তে; কিন্তু যে ভূমিতে জীব জন্মলাভ করে, সেই পরম পবিত্র তীর্থাধিক পুণ্যভূমির সহিত জন্মের পূর্ব্ব হইতেই তাহার পরিচয় আরম্ভ হয়। যে অপূর্ব্ব কৌশলীর অপার কৌশলে মাতৃকুক্ষিস্থ অজ্ঞাত শিশু মাতার আহারে খাদ্য,—মাতার পানে পেয়,—মাতার শ্বাসে জীবন পাইয়া, নিজের তুষ্টি পুষ্টি সমস্তেরই বিধান করিয়া লয়, সে খাদ্য সেই মাতৃভূমির স্বচ্ছন্দ-বনজাত ফল-শস্য-শাক,—সে পানীয় সেই মাতৃভূমির বিদারিতবক্ষোদ্ভবা ভোগবতীর নির্ম্মল ধারা,—সে জীবনশ্বাস সেই মাতৃভূমির উপরিস্থ অন্তরীক্ষচারী চির-চন্দন-দিগ্ধ মলয়-নিন্দী সুশীতল আনন্দ-সমীরণ। এই মাতৃভূমির বিমানচারী মার্ত্তণ্ডের কবোষ্ণ করস্পর্শ গর্ভভারজর্জ্জরিতা মাতার কুক্ষিস্থ শীতার্ত্ত শিশুর শীত নিবারণ করে, দুঃসহ গ্রীষ্মতাপের দিনে এই পুণ্যভূমির বহুদূরদিগন্তাগত দক্ষিণ মারুত মাতৃশরীরের মধ্য দিয়া ভ্রূণের দেহ শীতল করিয়া দেয়, শুক্লা যামিনীর পরিপূর্ণচন্দ্রকরোজ্জ্বলা নদীনূপুরা শ্যামাঞ্চলা সুফলা এই জন্মদাত্রীর অপূর্ব্ব শ্রী-সম্পদ-হৃত-মানসা-মাতার আনন্দ-পুলকের মধ্য দিয়া গর্ভস্থের অপরিণত দেহে অকালে পুলকোদ্গমের সহায়তা করে;—শান্ত শরতের শ্যামায়মানা সন্ধ্যার সীমন্তে দিনান্তের অস্তমান সূর্য্যের সিন্দূর-শোভা জননীর স্নেহানন্দিত মনের মধ্য দিয়া অজাতের অন্তরে আনন্দ আনিবার অকাতর আয়োজন করে;—নিশীথিনীর নয়নাম্বুনিষেক নীহাররূপে মঞ্জরীর পুষ্প পরিণতি আনিয়া, সমাসন্ন-মাতৃগৌরবা জননীর আকুলিত ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া সে উচ্ছ্বসিত পরিমল ঘ্রাণের তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া দেয়। শুধু আজ নহে,—এক জনের জন্য নহে,—জন্মজন্মান্তর ভরিয়া, যুগ-যুগান্ত ধরিয়া, বহুলক্ষ পুরুষের অনুক্রমে, সৃষ্টির আদি মাহেন্দ্র মুহূর্ত্ত হইতে, বিশ্ববিধাতার এই অপরিবর্ত্তিত, অবিকৃত, অখণ্ডনীয় কল্পকল্পান্তস্থায়ী অপূর্ব্ব নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। ইহার বিরাম নাই, বিরতি নাই, বিকৃতি নাই। অনন্ত ক্ষীরোদার্ণবে শেষতল্পশায়ী মহাবিষ্ণুর নাভিকমলোদ্ভব প্রজাপতির মুহূর্ত্ত হইতে এই বিধান চলিয়াছে,—মহাপ্রলয়ের মহান্ধকারের দিনেও ইহার ব্যতিক্রম হইবে কি না, তাহা তিনিই জানেন,—যে বিধাতার প্রবর্ত্তিত এই অপরিবর্ত্তনীয় বিধান। এই বিধান অসংখ্য পুরুষাগত, চিরপ্রচলিত ও দুর্লঙ্ঘ্য বলিয়া, যে ভূমির রত্নরেণুকার সুখস্পর্শে আমাদের স্তিমিত নয়ন প্রথম উন্মীলিত হয়,

* বিগত ৯ই বৈশাখ নাটোরবাসী কর্ত্তৃক আহূত অভিনন্দন সভায় পঠিত।

সে ভূমিকে কেহ মাতৃভূমি কেহ বা জনকভূমির পরম স্নেহসূচক অভিধানে একান্ত আগ্রহভরে প্রাণ ভরিয়া হৃদয় পূরিয়া সমস্ত দেহমন দিয়া ডাকে। জন্ম সূচনার পরম মুহূর্ত্তের পূর্ব্ব হইতে পরোক্ষভাবে এই স্নেহময়ী জন্মদাত্রী ধরিত্রীর স্নেহের আভাস না পাইলে, জীবসৃষ্টি সম্ভবই হইত কিনা, তাহা কে বলিবে? জন্মের পরে, অপরোক্ষভাবে জীবধাত্রী জন্মভূমির অপার করুণা ও অফুরন্ত স্নেহের নিযুত নিদর্শন না পাইলে, জাতকের জীবন যাত্রা যে সম্ভব হইত না,—তাহা সকল দেশের সকল লোকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারে। অপরিগ্রহ-জন্ম মানব-শিশুর জীবনরক্ষার্থ মাতৃবক্ষে ক্ষীর সঞ্চয়ের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, ধাত্রীমাতা-জন্মভূমির অনন্ত স্নেহের নিরলস হিতৈষণা আমাদের জীবনকালের সমস্ত দণ্ড পল মুহূর্ত্তগুলি পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে; তাই আমরা শত দুঃখের অভিঘাতেও বাঁচিয়া থাকি। কবি বলিয়াছেন, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—একথা কি অলীক কৈতব-বাদ? স্বর্গ দেখি নাই, কোন জন্মে দেখিবার আশা করিতেও সাহস হয় না,—জন্মপল্লী দেখিয়াছি; ইন্দ্রোদ্যানের গন্ধামোদিত নন্দনতরু দেখি নাই, পারিজাত বা হরিচন্দনের মঞ্জরিত বল্লরীর অমরশোভায় নয়ন সার্থক হয় নাই, কিন্তু পল্লীপুরন্ধ্রীর স্বহস্তরোপিত সহকারাশ্রিতা মাধবীলতা দেখিয়াছি, এবং তাহার পুষ্পমঞ্জরীর উচ্ছ্বসিত সুবাসে কেমন করিয়া মন প্রাণ মুগ্ধ হয় ও সর্ব্বেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি লাভ করে তাহা জানি; কল্পবৃক্ষের দেববাঞ্ছিত অমৃতফল কেমন, সংসার-লাঞ্ছিতের পক্ষে তাহা দেখিবার বা তাহার আস্বাদ লইবার সৌভাগ্য হয় নাই, হইবারও সম্ভাবনা নাই,—স্নেহময়ী জননীর স্বহস্তরোপিত অম্ল আম্রের স্বাদ যে কত মধুর, তাহা কেবল রসনা দ্বারা নহে, সমস্ত ইন্দ্রিয়-গ্রাম এবং সমগ্র মন প্রাণ দিয়া জানিয়াছি; মহেশ্বর-শিরোবিহারিণী সুরতরঙ্গিণী মন্দাকিনীর পতিতপাবনী ধারা স্বর্গে কেমন করিয়া বহিয়া যায় তাহা জানিনা,—গ্রাম-প্রান্তচারিণী বর্ষাতরঙ্গ-তটপ্লাবিনী পারাবার-বিহারিণীর রজতধারা নৃত্যলীলায় বহিয়া যাইতে দেখিয়াছি—এবং তাহার নির্ম্মল সুধাসলিলের শীতল ধারায় স্নানাবগাহন করিয়া পবিত্র হইয়াছি; অপ্সরীর কলকণ্ঠে দেবতার মন কেমন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছে বা নারদ-কীর্ত্তনে হরিপাদাম্ভ কেমন করিয়া ব্রহ্মার কমণ্ডলু মধ্যে গলিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছিল, তাহা দেখি নাই;—পল্লী-প্রান্তের বালকণ্ঠ-কাকলিমুখর পর্ণকুটীরে শান্তি আনিবার অভিপ্রায়ে জননীর সুধাকণ্ঠনিঃসৃত স্নেহমধুর 'ঘুম পাড়ানীর' গুঞ্জন গীতি শুনিয়া বালকের পুষ্পপেলব দেহ কেমন করিয়া গলিয়া নিদ্রার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়ে, তাহা দেখিয়াছি। এ সকলের নিকট কি স্বর্গ! তাই কবির "গরীয়সী" শব্দ নিরর্থক বলিতে পারি না। হিন্দুর পরম দেবতা বিশ্বনাথের পাদাব্জরেণুপূত চরমতীর্থ বারাণসী মুক্তিপ্রদায়িনী বলিয়া শাস্ত্র চিরদিন ঘোষণা করিতেছে; কিন্তু সে মুক্তির অধিকারী হইতে হইলে, জীবনান্তের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়;—তটান্তাভিঘাতিনী ভাগীরথীর তীর্থশিলা মণিকর্ণিকার পবিত্র প্রস্তর-সোপানে ইহজীবনের সুখদুঃখের আনন্দ নিরানন্দ দূরে সরাইয়া যখন অন্তিম শয়নে শায়িত হইব, কেবল তখনই বিশ্বনাথ মরণাভিহত বধিরপ্রায় কর্ণমূলে মুক্তিপ্রদ তারকব্রহ্মনাম শ্রবণ করাইয়া আমার রোগ শোক, ক্ষোভ-ক্ষতি, আশা-নিরাশা, জন্ম-জীবন, জরা-মরণের সকল অতৃপ্তির সকল হতাশ্বাসের, সমস্ত অশান্তির মর্ম্মঘাতী বেদনা ও আকুল ক্রন্দন চিরদিনের জন্য মিটাইয়া দিবেন, কিন্তু তাহাতে হইল কি? জন্ম ভরিয়া যদি বাসনার সান্নিপাত তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়াই গেল, জীবন ভরিয়া যদি একান্ত প্রার্থিত স্নিগ্ধকান্ত নবীন জলধরের বিন্দু প্রত্যাশায় শুষ্ককণ্ঠ চাতকের দিন ঊর্দ্ধে চাহিয়া চাহিয়া পুঞ্জীভূত ব্যর্থতার মধ্যেই অতিবাহিত হইল, কিম্বা উপল-কঠিন নির্দ্দয়তার শিলাঘাতে তৃষাতুর চাতকের পঞ্জরাস্থি চূর্ণ বিচূর্ণই হইল, তবে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য মোক্ষের সুদূরপরাহত আশার বাসা বুকে বাঁধিয়া, চাতকের ইহজীবনের আনন্দ কোথায়? কিন্তু পিতৃপুরুষের লীলাক্ষেত্র, জননীর জন্মনিকেতন, গঙ্গোত্রি

অপেক্ষাও পবিত্রতর; তীর্থের তীর্থ জন্মভূমি ইহজীবনেই শ্রান্ত শির কোলে তুলিয়া নেয়,—স্নেহহস্তের সুধালেপে নিরাশ জীবনের সমস্ত হাহাকার মিটাইয়া দিবার সকরুণ উদ্যম করে। এ হেন পুণ্যভূমির রেণুকণায় ললাটের তিলক অঙ্কিত করিলে, সে তিলক বৈরাগীর বৃন্দাবনরজে শ্রীরাধার রাতুলচরণাঙ্কিত মোক্ষপ্রদ বৈষ্ণবী তিলকলেখা-অপেক্ষা লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ।

জীবন-বসন্তে শিখণ্ডের বর্ণবৈচিত্র্যকে পরাভব করিয়া, যখন আশার অপূর্ব্ব মোহন ইন্দ্রধনু আমাদের নয়নসম্মুখে উদিত হয়, সে দিনে জন্মপল্লীর পরিণতফল-শ্যামা নয়নমনোমুগ্ধকরী বনশ্রী, বহুবিস্তৃত বটচ্ছায়া, গ্রাম-প্রান্তবিহারিণী বিমলতরঙ্গিণীর স্নেহধারা ও স্বচ্ছন্দ-বনজাত সুধাস্বাদি শাক, আমাদের মনকে পুণ্য জন্মভূমির ধূলিতলে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে না; তখন নদী তড়াগ কান্তার সরিৎ সাগর ভূধর উল্লঙ্ঘন করিয়া,আশার উন্মাদকর মোহে আমরা অশ্বমেধের অশ্বের মতই ছুটিয়া চলি; তার পরে পরিণত দিবসে, জীবনের গোধূলি লগ্নে, কাল-পারাবার-বক্ষে সমাসন্ন-ঝটিকায়, সন্ত্রস্তচিত্ত হইয়া, যে দিন দেখি জীবন-প্রভাতের আশা, দুরাশা বলিয়া নিজেকে প্রতিপন্ন করিয়াছে, প্রভাতাকাশের অরুণিমা সন্ধ্যার প্রাক্কালে ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছে, জীবনের প্রথমানুভূতির দিন হইতে যে পরম সার্থকতার পশ্চাতে জীবনকাল ধরিয়া প্রাণপণে ছুটিয়াছিলাম, তাহা আমারই জন্মান্তরীণ কর্ম্মবিড়ম্বনার ফলে মৃগতৃষ্ণিকায় পরিণত হইয়াছে; সে দুঃসহ বেদনাময় হতাশ্বাসের দুর্দ্দিনে পরিত্যক্তা পল্লীজননী জন্মভূমির চরণতলে শির নোয়াইয়া, শেষ নিমেষপাত করিয়া দিতে বড় ইচ্ছাই করে। ইচ্ছা করে, জননীর চরণতলে এই নিরাশ ব্যর্থ জীবনের সকল ব্যথা বেদনা নিবেদন করিয়া, পিতৃ-পুরুষের চিতাভস্মের সহিত এ নশ্বর দেহের ভস্মাবশেষ মিলিত করিয়া, ইহজীবনের অবিরাম অশ্রুজলের অবসান করিয়া চলিয়া যাই।

যে স্থানের ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম আমার পরম গর্ব্বের পঞ্চভূতাত্মক দেহ সৃজন করিয়াছে, যে ভূমির ধূলিতলে প্রথম নয়ন-উন্মীলনপূর্ব্বক দিন-দেবতা দিবা-করের প্রাণসঞ্চারিণী আলোকধারার সহিত প্রথম পরিচয় হইয়াছে, যে ভূমির তরুপল্লবে বসন্তলক্ষ্মীর অপরূপ শ্রীসম্পদ্ আমার তরুণ নয়নে প্রথম মোহাঞ্জন পরাইয়া দিয়াছে, কোজাগর পূর্ণিমার নির্ম্মল রজতধারায় অভিসিঞ্চিতা বর্ষাবিধৌতা মেদিনীর অপূর্ব্ব লাবণ্য যে ভূমিতে দাঁড়াইয়া প্রথম দেখিয়াছি, যে ভূমির ফলশস্য-সলিলে পুষ্টপ্রাণ কিশোরের পেলব বক্ষতলে অভিনব জাগরণের অভূতপূর্ব্ব নবীন পুলকের আনন্দ-বেদনা প্রথম বাজিয়া উঠিয়াছে,—জীবনশেষের শেষ শয়ন বিছাইবার সেই আকাঙ্ক্ষিত পরম পবিত্র ভূমির নিকট কেহ অভিনন্দন চাহে না। এই চিরদুঃখাভিহত জীবন-শেষে চাহে তাহার নিকট চিরশান্তির আশীর্ব্বচন,—স্বদেশবাসী সোদরপ্রতিমগণের নিকট সুখের দিনে চাহে সমানন্দিত-জনের উল্লাস, দুঃখের দিনে চাহে সমদুঃখীর সহানুভূতি, শোকের দিনে চাহে সমব্যথিতের সান্ত্বনা, রোগের সময়ে চাহে আরোগ্যকামী আপনজনের আগ্রহাকুল শুশ্রূষা। আজ যাঁহারা আমাকে অভি-নন্দিত করিবার মানসে এথানে সহস্রলোকচক্ষুর সম্মুখে ডাকিয়া আনিয়াছেন, তাঁহাদের অভিনন্দন শূন্যগর্ভ সৌজন্যবিজ্ঞাপক অলীক আড়ম্বরপূর্ণ বাক্যাবলী নহে, ইহা বেদনাতুরজনকে বক্ষে টানিয়া লইবার অকৃত্রিম এবং একান্ত আগ্রহপূর্ণ আয়োজন। যাঁহারা আমার জীবনের ফল্গুলীলার দিনে আমার আনন্দে যোগ দিয়া-ছেন, আবার যাঁহারা জীবনের ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাত শিলাঘাতের দিনে পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মাভৈঃ রবে আমাকে সান্ত্বনা ও সাহস দিয়াছেন, সেই সহোদরাধিক বান্ধব-জনের হৃদিস্থিত প্রীতির অভ্রান্ত পরিচায়ক এই অভিনন্দন-আয়োজন। তাই বন্ধুজনের কল্যাণকামনাস্বরূপ, বয়োবৃদ্ধজনের স্নেহাশীর্ব্বাদস্বরূপ, উহাকে আমার শ্রান্তশির পাতিয়া লইবার জন্য স্বীকার করিয়াছি, নতুবা আমার মত অকিঞ্চন কি অভিনন্দনের যোগ্যপাত্র? যাঁহাদিগকে আজ চতুর্দ্দিকে দেখিতেছি, তাঁহাদের অনেকে আমার শৈশব-সহচর, ক্রীড়ার সঙ্গী, অনেকে

সহপাঠী সতীর্থ, দুই চারিজন আছেন যাঁহারা বয়স্ক পড়ুয়ার স্বেচ্ছাচারিতার বলে অল্পবয়স্কের উপরে অবলীলায় হুকুম চালাইয়া মনের সুখ অবাধে ভোগ করিয়া লইয়াছেন এবং এমন অনেক আছেন যাঁহাদের সঙ্গে জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইতে বহুবিষয়ে বহু-শিক্ষা লাভ করিয়াছি,—এই সকল চিরপরিচিত বান্ধব-জনের প্রীতিপরিবেষ্টনের মধ্যে দাঁড়াইবার ক্ষণিক সৌভাগ্যটুকু আমারও জীবনশেষের ললাট-লিপিতে বিধাতা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহা আমার মত অভাজনের বড় আনন্দের কথা। অভিনন্দনের যোগ্য আমি নই; কিন্তু এই অকারণ স্নেহটুকু অন্তরের মধ্যে সঞ্চিত রাখিয়া, আজ এই জীবন-মরণের সন্ধি-মুহূর্ত্তে, বড় প্রয়োজনের দিনে, সংসারের সুদীর্ঘ মরুপথ-যাত্রীর শ্রান্ত ললাটে কুসুমিত-মালঞ্চবাস-বাহী বসন্ত সমীরণের তাপহারী-স্পর্শ যাঁহারা আনিয়া দিলেন, তাঁহাদিগকে এই মুহূর্ত্তের হৃদয়ভাব জানাইবার মত ভাষা আমার ভাণ্ডারে নাই,—কি বলিয়া মনের কথা প্রকাশ করিব তাহা ত জানি না।

চিরধন্যা মাতৃভূমির জন্য যেটুকু করিবার শক্তি আমার হইয়াছে, সে অতি সামান্য—অতিশয় তুচ্ছ; তাহার জন্য আমার মনে আত্মশ্লাঘা জন্মিবার কোন কারণ নাই; আপনাদেরও কৃতজ্ঞ হইবার কোন হেতু আমি দেখিতে পাইতেছি না। যেটুকু দিতে পারিয়াছি, তাহা দানরূপে দিই নাই, মাতৃভূমি ও সেই ভূমির অধিবাসীদিগের জন্য অন্তরে যে অক্ষম সেবাবৃত্তি চির-জাগরুক ছিল, তাহারই ইহা অসম্পূর্ণ ও অকিঞ্চিৎকর পরিচয় মাত্র। যাহা করিতে পারিয়াছি, তাহা নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবার একাদশী-ব্রতোপবাসের মত; করণে প্রশংসা নাই, অকরণে প্রত্যবায় রহিয়াছে। সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া, জীবন-বসন্তের দক্ষিণানিলে যখন দেহ মন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পুলকাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল, তখন সংসারের নিকট হইতে পাইবার ও সংসারকে দিবার অনেক আশা আকাঙ্ক্ষাই হৃদয়ের মধ্যে নিয়ত উল্লসিত হইয়া অননুভূতপূর্ব্ব এক আনন্দরসে আমার চিত্ততলকে অভিসিঞ্চিত করিয়া রাখিত। ভাবিতাম, শোভা-সৌন্দর্য্য ও আনন্দের আধার বিধাতার এই সংসার আমার সকল শূন্য সমস্ত দৈন্য তাহার অকাতর দান-সম্ভারে ভরিয়া দিবে; আমিও বিশ্বজিৎ যজ্ঞের যজমান হইয়া, দানার্থ উন্মুখী আমার এই আকুল আত্মার সার্থকতা সম্পাদন করিয়া, পরিতৃপ্ত মনে এবারের মত বিদায় গ্রহণ করিব। তখন কি জানি যে, জীবন যাত্রা পুষ্পিত উদ্যানপথের আনন্দকর পরিভ্রমণ নহে; ইহা অজস্র শোণিতস্রাবি কুরুক্ষেত্রের সর্ব্বনাশা খণ্ডপ্রলয়; তখন কি জানি যে যাচকের আশা ও আকাঙ্ক্ষা এবং দাতার বরাভয় ও আশ্বাস, এ দুইই পরিণতির প্রাপ্তকালে বিপুল ব্যর্থতার মরুবালুকোত্থিত হাহাকারের উত্তপ্ত প্রবল ঝঞ্ঝার মধ্যে মুষ্টিমেয় ভস্মে পরিণত হইয়া, বিলুপ্ত হইয়া যায়! ইহাই বুঝি দুর্ব্বল মানব জীবনের ব্যর্থ আয়াসের অসম্পূর্ণ পরিণাম! যাহা দিবার ইচ্ছা ছিল, দিতে পারি নাই; তাহার জন্য ক্ষোভের ক্ষত-বেদনা কতখানি, সে কথা বলিয়া আজ লাভ নাই; যাহা পাইবই বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, তাহা না পাইয়া জীবনের কতখানি শূন্য রহিয়া গিয়াছে, সে কথা আমার অন্তর্য্যামী যিনি, তিনিই জানেন।

মাতৃভূমির অধিবাসিজনের কল্যাণকল্পে যৎসামান্য যাহা করিতে পারিয়াছি, তাহার জন্য আপনাদের কৃতজ্ঞ হইবার কোন কারণই নাই; বরং কৃতজ্ঞ হইব আমি; কারণ যেটুকু আমার সাধ্য হইয়াছে, তাহা আপনাদের সমবেত চেষ্টার ফল;—আমার একার শক্তি ও সাধ্যে কিছুই হইতে পারিত না। আপনাদের মধ্যে অনেকে স্বার্থত্যাগ করিয়া, অকাতর শ্রম করিয়া, স্বীয় চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তিদ্বারা আমার সহায়তা করিয়া এই সামান্য টুকুকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন।

দুই একটি লোক-হিতকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান বুকে করিয়া, নাটোর আজ যদি একটু মাত্র গর্ব্ব করিবার অবসর পাইয়া থাকে, তাহা কোনও দানশীলের অর্থ সাহায্যের একমাত্র ফল নহে;—যাঁহারা এ স্থানের অধিবাসী, যাঁহারা কার্য্যাবাপদেশে এস্থানে বাস করিতে

বাধ্য হইয়াছেন, যাঁহারা ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে এস্থানেরই একরূপ 'বাসন্দা' হইয়া গিয়াছেন, এবং রাজকার্য্য উপলক্ষে যে সকল রাজপুরুষ নাটোরে সময়ে সময়ে বাস করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টা না হইলে, এ স্থানের কোন কিছুই সম্ভব হইতে পারিত বলিয়া আমার মনে হয় না। অনেকের আন্তরিকতা, অনেকের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, বহুলোকের ত্যাগ-স্বীকার ও অগণিতের শারীরিক শ্রম না হইলে, এ সংসারে কোন-কিছুই গড়িয়া তোলা যায় না, কিছুই সম্ভব হইতে পারে না ;—নাটোরের এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ জননায়কগণ শ্রম দিয়া, সময় দিয়া, বুদ্ধি বিদ্যা দিয়া, লোকহিতকর যাহা কিছু এখানে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহার গৌরব তাঁহাদেরই প্রধান প্রাপ্য ;—যে অর্থ সাহায্য করিয়াছে, তাহাকে সাধারণের তহবিলদার বা খাজাঞ্চি বলিলেও হয়। অর্থ যাহার নিকটে থাকে, উহা যে তাহারই, একথা প্রমাণ করা বোধ করি কঠিন হয় ; অন্ততঃ পক্ষে কোন দেশের কোন কালের সমাজই তাহা স্বীকার করে নাই। দেশান্তরে এই লইয়া একদিন মহাপ্রলয় হইয়া গিয়াছে, Commonwealth সৃষ্টি করিতে Cromwellএর সৃজন প্রয়োজন হইয়াছিল,—সৌভাগ্যক্রমে এদেশে জটালশির-ঋষি বা মুণ্ডিতমস্তক পণ্ডিতের ছন্দোবদ্ধ একটি বাক্যই শিরোধার্য্য করিয়া ধনী তাহার ধনকে এবং বলী তাহার বলকে জনহিতকর অনুষ্ঠানে নিয়োজিত করিয়া, বল ও বলী এবং ধন ও ধনী সকলেই ধন্য হইয়া গিয়াছে। কেবল মাত্র দানে কোন যজ্ঞই সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই ; দাতা কুশবারিসংযুক্ত হইয়া থাকেন উপযুক্ত গ্রহীতার জন্য; যে দিন সে গ্রহীতা আসিয়া উপস্থিত হয়, দাতার দান গ্রহণ করিয়া উহা উপযুক্ত কার্য্যে বিনিযুক্ত করে, সেই সময়েই যজ্ঞ সমাপন হয় ;—নতুবা যজ্ঞাগ্নির জ্বালায় দেহই শুধু উত্তপ্ত হইতে থাকে, হোমধূমের তাড়নায় অশ্রুজলে পথ দেখা দুষ্কর হইয়া পড়ে! তাই বলিতেছি, আমার কোন দান যদি সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে, তাহা দাতার গুণে নহে, গ্রহীতা তাহাকে সংসারহিতে নিযুক্ত করিয়া দাতাকে ধন্য করিয়া দিয়াছেন ;—সুতরাং হিতানুষ্ঠানের আত্মপ্রসাদ আপনাদের এবং যশের ভাগীও আপনারাই, আমি নিমিত্ত মাত্র।

আজ এই সভাস্থলে অশেষ গুণালঙ্কৃত বিদ্যোৎসাহী বদান্যবর আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ হিতৈষী রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুরের পুত্র বন্ধুবরাগ্রগণ্য সোদরপ্রতিম রাজা প্রমদানাথ ও তাঁহার ভ্রাতা শরৎকুমারকে দেখিতেছি। ইঁহাদের সহিত আমার যে সম্বন্ধ, তাহা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নাই। ইঁহারা আমার সহোদর নহেন, যদি হইতেন তবে কেবল মাত্র সহোদর বলিলে ইঁহারা আমার কি, তাহা প্রকাশ হইত না ;—বন্ধু বলিলে যাহা বুঝি, সে বান্ধবতার কত ঊর্দ্ধে যে ইঁহাদের স্নেহের স্থান, তাহা সংসারে একমাত্র আমিই বুঝি, কিন্তু তাহা আজ প্রকাশ করিবার ভাষা পাইতেছি না বলিয়া বুকের মধ্যে যে অব্যক্ত বেদনা অনুভব করিতেছি, তাহাও কেবল আমিই বুঝিতেছি।

বাল্যে পিতৃহীন আমরা উভয়েই, প্রায় একই বয়সে শৈশবে আমরা একত্র বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য একই বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছিলাম ;—একই রাস্তার এপারে ওপারে আমাদের বাসস্থান ছিল, নিত্য নিয়মিত স্কুল কালেজের সময়ে সাক্ষাৎ ত ছিলই ; প্রতিনিয়ত সান্নিধ্যে এবং সাহচর্য্যে যে অপূর্ব্ব স্নেহ-ডোরের দৃঢ় বন্ধনটি বাঁধিয়া উঠে, আমাদের মধ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। সর্ব্বোপরি আমরা সমান অবস্থাপন্ন ছিলাম, অর্থাৎ আমরা সমান ভাবে মাষ্টার পণ্ডিত এবং অভিভাবকবর্গের কঠিন নিষ্পেষণের নীচে মানুষ হইয়া উঠিতেছিলাম ; সুতরাং সমব্যথায় ব্যথিতের মধ্যে যে সমবেদনা বান্ধবতা ও স্নেহ জন্মিয়া ওঠা সম্ভব হয়, আমাদের মধ্যে তাহাই হইয়াছিল ; এবং সে বন্ধন যে কি মধুর এবং কত চিরস্থায়ী তাহা কেবল আমরাই জানি, অপরকে বলিয়া বুঝানো কঠিন। আজ এই আনন্দ-মিলনের দিনে সেই অকৃত্রিম বাল্যসুহৃদ, স্নেহময় সখা, হিতৈষী বন্ধু, সুখদুঃখের সহচরদিগকে আমার পার্শ্বে দেখিয়া কি আনন্দ-রসে

আমার সমগ্র হৃদয় অভিসিঞ্চিত হইয়া যাইতেছে, এ সভায় কেহ আমার সমাবস্থাসম্পন্ন থাকিলে, তাহা তিনিই বুঝিবেন, অপরে নহে। জীবনের ঝড়ঝঞ্ঝা শোক-ক্ষোভ-ক্ষতি মনস্তাপ কবে কাহাকে কোথায় কোন্ দেশান্তরের রণক্ষেত্রে যুঝিবার নিমিত্ত লইয়া যায়, অথবা কোন নিষ্ঠুর নীরবতার মধ্যে নির্ব্বাসিত করিয়া দেয় তাহা বলা কঠিন, আজ তাঁহাদের এই পরিণত জীবনের এবং আমার হয়ত বা জীবনশেষের আনন্দ-মিলনের মধ্যে যে মাধুর্য্যময় স্মৃতিটি গড়িয়া উঠিল, তাহাকে কত যত্নে আমার বক্ষতলে লালন করিব, তাহা আমিই জানিতেছি।

দুঃখ যেমন একাকী আসে না, তেমনি বিধাতা সদয় হইয়া, যখন যাহার জন্য আনন্দের আয়োজন করেন, তাহাও অপূর্ণ রাখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন না; যথাসম্ভব তাহাকে সম্পূর্ণতা দিয়া, সে অনুষ্ঠানকে পরিপূর্ণতার মধ্যে নিবৃত্তি দিয়া থাকেন। আজ তাহাই ঘটিয়াছে। নাটোরের অধিবাসী নহেন, অথচ আমার সঙ্গে বান্ধবতার পুষ্পডোরে যাঁহারা অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, সেইরূপ কয়জন অকৃত্রিম সুহৃদের আজ এ সভায় সমাগম হইয়াছে; ইহা আমার পরমভাগ্য। জীবনারম্ভের দিনে যে বন্ধুতা তরুণযুগলের মধ্যে অকস্মাৎ সতেজে সজীব হইয়া ওঠে, বান্ধবতার সে সুকুমার বল্লরী অনেক সময়ে মঞ্জরীসমাগমের পূর্ব্বেই সামান্য বাতাসেই ভূমিশায়ী হইয়া যাইতে দেখা যায়; তাহার কারণ—“সর্ব্বথা সুকরং মিত্রং দুষ্করং পরি-পালনম্” এই মহাবাক্য তরুণ মনের পিচ্ছিল ভূমিতে পা রাখিবার অবসর পায় না; কিন্তু পরিণত বয়সে, কঠিন জীবন-সংগ্রামের মধ্যে প্রতি পাদক্ষেপ প্রতি বাক্য ও ব্যবহার ওজন করিয়া যাচাই করিয়া যে প্রীতির রাখীবন্ধন হয়, তাহা চিরস্থায়ী হইবে এ আশা দুরাশা নাও হইতে পারে;—সব সময়ে একথা সত্য হয় কিনা, তাহা দেবতাই জানেন। আমার সেই পরিণত বয়সের মরুযাত্রার মধ্যে যে কয়টি পান্থপাদপের ছায়ায় বসিয়া তাপদগ্ধ দেহ জুড়াইয়াছি, যাঁহাদের গোপন বক্ষতলের স্নেহ-উৎসে আঘাত করিয়া, বন্ধুত্বের অমৃতোপম স্বাদু-বারি দারুণ তৃষ্ণার সময়ে পান করিয়া, প্রাণ বাঁচাইতে পারিয়াছি, সেই কয়টি দুঃখদিনের সখাকে আজ এখানে সমবেত হইতে দেখিয়া, কি আনন্দে কি কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে এবং কি চেষ্টায় আনন্দাশ্রুর বেগ আজ সম্বরণ করিতে হইতেছে, তাহা বলিবার মত উপযুক্ত ভাষা আমি খুঁজিয়া পাইলাম না, —কোন পণ্ডিতেও পাইবেন না, কারণ শ্বেতাব্জনিষণ্ণা সরস্বতীর অফুরন্ত ভাণ্ডারও এখানে হার মানিতে লজ্জিত হয় না।

বিজয়-বল্লাল রাম-লক্ষ্মণ প্রভৃতি একচ্ছত্র আদর্শ নরপতির কীর্ত্তিকলিত এই ভূমির অতীত গৌরব ও বিগত সমৃদ্ধির দিনে নাম ছিল “বরেন্দ্রী”। কবিবর “সন্ধ্যাকর” দশকণ্ঠ-অপহৃতা অশোকবনবাসিনী জানকীর সহিত কৈবর্ত্তাধিকৃতা বরেন্দ্রীর উপমা উপলক্ষে যে অমূল্য গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায়,—এ ‘বরেন্দ্রী’ কি বরেন্দ্রী ছিল,—যে কবিবর্ণিত বরেন্দ্রাধিশ্বর-রাম-মহিমা পাঠ করিয়া সীতামনঃকুমুদ-চন্দ্রমা শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণনাকে কবিগুরুর কল্পনা বলিয়া আর মনে হয় না,—সে বরেন্দ্রী আজ নাই। যেখানে মদনান্তকের স্বর্ণমন্দিরচূড়া দিনদেবতার মধ্যাহ্ন বিশ্রাম স্থান বলিয়া উমাপতি বর্ণনা করিয়া, চিরপ্রোষিত অগস্ত্যকে দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিতে অনুরোধ করিয়া-ছেন, সে বিজয়গর্ব্বিতা বরেন্দ্রী আজ নাই,—যে মহিমময় সুবর্ণছত্রের ছায়াতলে বসিয়া রাগানুগা ভক্তির প্রবাহে জয়দেব একদিন বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন, যে স্বর্ণসিংহাসন-পাদপীঠতলে বসিয়া অনুরাগ পূর্ব্বরাগ বিরহমিলন রাসের সুধাসঙ্গীতের তুমুল তরঙ্গে জয়দেব একদিন বৈষ্ণবের সর্ব্বস্ব ভাসাইয়া দিয়াছেন, সে বরেন্দ্রী আজ নাই; ধীমানের অপূর্ব্ব ধীশক্তির প্রভাবে যে ‘বরেন্দ্রী’ একদিন মাহেন্দ্রনগরীর প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়া উঠিয়াছিল, সে বরেন্দ্রী আজ নাই; —আছে তাহার চিতাভস্মধূসর বিক্ষিপ্তকঙ্কাল মহা-শ্মশান, আর আছে সেই শ্মশানভস্মভূষিতাঙ্গ ক্ষুদ্র সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ যাঁহাদের দীর্ঘ তপশ্চর্য্যার প্রভাবে সময়ে

সময়ে সেই অতীত সমৃদ্ধির অস্তমানসূর্য্যকিরণানুরঞ্জিত রাগবতী সন্ধ্যার চকিত দর্শনে দুই চারিটি দর্শক আজও তাহাদের অশ্রুসিক্ত নয়ন উত্তরীয়াঞ্চলে মার্জ্জনা করে। তাহার পর দীর্ঘ দুঃখরাত্রির অবসানে যে রাজবংশের নামানুকরণে এ ভূমির নাম হইয়াছিল 'রাজসাহী' সে রাজবংশের পূর্ব্বমহিমা আজ বিলুপ্ত, সে বংশের প্রতিষ্ঠাতা আজ নাই; যে রাজকুলবধূর অপূর্ব্ব দানযজ্ঞে নির্ধন বারেন্দ্রের নাম বিলুপ্ত হইয়াছিল, সে পুণ্যশ্লোকা অন্নপূর্ণার তিরোভাব হইয়াছে—যে রাজর্ষির প্রতিষ্ঠিতা 'জয়কালী' আজ নাটোরের জয়-মঙ্গল কল্যাণ সমস্তই নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, সে রাজ-ঋষি আজ ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হইয়া, লোকলোচনের অন্তরালে। যে যুগাবতার বৈকুণ্ঠবিহারীর মধুর লীলার মাধ্বীক রসে সমগ্র ভারত আজও বিহ্বল হইয়া রহিয়াছে, সেই লীলামকরন্দাস্বাদনে চতুর-চিত্ত বিশ্বনাথ আজ বৈকুণ্ঠনাথের সামীপ্যমুক্তির অধিকারী, সে রাজবংশ আজ নামমাত্রাবশিষ্ট। যে রাজপুরীর তোরণদ্বারের বিচিত্র শিল্প ও স্থাপত্য-নৈপুণ্যের প্রভাবে তাহার নাম হইয়াছিল 'বঙ্গোজ্জ্বল', কালবশে সে সিংহদ্বারের রেণুকণাও আজ দেখিবার উপায় নাই! কালের কঠিন হস্তের লৌহ-নিষ্পেষণে ধূলার ধরণীর কিছুই চিরস্থায়ী নহে, সে জন্য দুঃখ নিতান্তই নিষ্ফল। দুঃখ এই যে, ত্যাগে এবং ভোগে অর্দ্ধবঙ্গের অধীশ্বরগণ যে সকল অনন্যসাধারণ কীর্ত্তিদ্বারা তাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পরে সেই বংশের প্রতিনিধি ও পিণ্ডাধিকারী হইয়া আসিয়া, সেই সকল কীর্ত্তিকথা স্মরণ করিয়া, কেবল স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়; অফুরন্ত সম্পদের অধিকারী অর্দ্ধবঙ্গাধিপের সে দিনে যাহা সাধ্য ছিল, আজ সে সাধ্য কাহারও কি আছে? আজ জন-হিতকর কোন অনুষ্ঠানই সিদ্ধ হইবে না, যদি সকলের সমবেত সহায়তা তাঁহার সিদ্ধার্থ যত্ন না করে। আমার ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা যদি কিছু সম্ভব হইয়া থাকে, তবে সে শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন আপনারা,—যাঁহারা এই ভূমির অধিবাসী। আজ বঙ্গের সে দিন নাই, যে দিনে সমাজপতি গোষ্ঠিপতির এক ইঙ্গিতে সমগ্র সমাজ এক-জনের পতাকাতলে সমবেত হইত;—ইহা কাহারও দোষ বা গুণ নহে, ইহা যুগধর্ম্মের মহিমা। আজ ভারতবর্ষে শান্ত তপোবনের অনুশাসন নাই; আজ তপোভূমির সন্নিহিত হইয়া, একচ্ছত্র রাজাধিরাজ স্বেচ্ছায় রাজমুকুট খুলিয়া, দীনবেশে তাপস দর্শনের পুণ্যার্জ্জনে ধীরপদে অগ্রসর হয় না; আজ আর ত্রিলোকবিজয়ী গাণ্ডীবধন্বা ব্রাহ্মণের গোধন রক্ষার্থ ত্রস্তপদে অগ্রজের কেলিভবনে অসময়ে অনধিকার-প্রবেশ করিয়া, প্রতিজ্ঞানুযায়ী নির্ব্বাসনদণ্ড হাস্যমুখে বহন করিয়া, নিজকে ধন্য মনে করে না; উপবাসী ব্রাহ্মণের পারণার্থ বীর চম্পাপতি আজ স্বীয় সন্তানের মস্তকচ্ছেদন করিয়া দিতে অকাতর-হাস্যমুখে অসি উদ্যত করেনা;—দণ্ডীর আশ্রয়দাত্রী সুভদ্রার ন্যায় শরণাগত পরিপালনে তৎপরা ভারতনারী হয়ত আজ পুরাণবর্ণিত পুরাতন কাহিনীতেই পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে; একান্ত চরণাশ্রিতের রক্ষাকল্পে দৃপ্তা ভারতরমণীর তেজো-মূর্ত্তি-দর্শনের সৌভাগ্য আর হয়ত হইবে না। দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত-প্রাচীর-রক্ষিত, সমুদ্রপরিখা-পরিবেষ্টিত ভারত-বর্ষ একদিন আত্মনিমগ্ন অবস্থায় যে পথে অগ্রসর হইতে-ছিল, সে দিন আজ নাই, সে পথ আজ পরিত্যক্ত হইয়াছে,—ইহাও যুগধর্ম্ম।

বহির্জ্জগতের কর্ম্ম পারাবারের উত্তাল তরঙ্গ ভারতের দ্বারে আসিয়া বারম্বার করাঘাত করিতেছে, সে আহ্বানে সাড়া না দিয়া, সে অনিমন্ত্রিত অতিথিকে দ্বার খুলিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা অর্চ্চনা ও অভ্যর্থনার আয়োজন না করিয়া আজ উপায় নাই। একদিন ছিল, যখন বনস্পতি-মূলের ছায়াশীতল প্রস্তর-বেদিকায় উপবিষ্ট তপোধন-কণ্ঠে যে শান্ত উদাত্ত স্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিত, তাহারই প্রতিবর্ণ অবনত মস্তকে পালন করিয়া ধন্য হইবার জন্য সমগ্র ভারত উৎকর্ণ ও উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিত। আজ সে দিন গিয়াছে। কিন্তু বিহঙ্গ-কলকাকলি-মুখর প্রভাতে গগনের প্রাচীসীমান্ত উদ্ভাসিত করিয়া, অরুণোদয়ের শোভা-সুষমা একদিন নয়ন মন মুগ্ধ করিয়াছে বলিয়া,

সূর্য্যাস্তের বর্ণ-বৈচিত্র্যে অনুরঞ্জিত পশ্চিমাকাশের সৌন্দর্য্যে আজ উদাসীন থাকিলে দিন চলিবে না। এক সময় ছিল, যখন ভগীরথের ন্যায় একের তপস্যার ফলে তাপতপ্ত ভস্মাবশেষ অযুত জনের মুক্তির ধারা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসা অসম্ভব ছিল না; আজ এই মেঘদুর্দ্দিন আষাঢ়ের রথযাত্রার দিনে জগবন্ধুর রথরজ্জু সকলকেই ধরিতে হইবে, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে স্ত্রী পুরুষ অভেদে এই রথ টানিয়া, তাহার গন্তব্যস্থানে তাহাকে পঁহুছাইতে হইবে; তবেই সকলের কর্ম্ম-জীবনের ছুটীর দিনে আমরা কর্ত্তব্য পরিপালনের আত্ম-প্রসাদের মধ্যে শেষ-বিদায় লইতে পারিব। এই সমবেত উদ্যমের শিক্ষা আমরা বহির্জগৎ হইতে পাইতেছি; এবং এই শিক্ষাই আজ কালোপযোগী। যদিও পুঞ্জ পুঞ্জ কর্ত্তব্যের অভ্রভেদী পর্ব্বত আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে, সকলগুলি সমাধা করিয়া যাইবার সাধও আমাদের সকলের মনেই হয়ত আছে, কিন্তু সাধ্য কয়জনের থাকে? যে যতটুকু করিয়া যাইতে পারে, এ জীবনসংগ্রামের কঠিন দিনে তাহাই প্রচুর মনে করিতে হয়। এই রাজসাহীভূমির পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করিলে, তাহার নষ্টোদ্ধারের আশা দুরাশা বলিয়া মনে হয়। তথাপি যে কয়জন কর্ম্মবীর আজ ধূলিশায়ী মুমূর্ষু রাজসাহীকে পুনর্জ্জীবিত করিবার কল্পে ক্লান্তিহীন শ্রমের মধ্যে দিনযাপন করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট রাজসাহী যে কত ঋণী, সে কথা বলিয়া শেষ করা কঠিন; রাজসাহীকে যাঁহারা জ্ঞানকেন্দ্র করিয়া, বিদ্বজ্জনসমাজে তাহার মুখ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সোদরোপম শ্রীমান্ শরৎকুমার রাজসাহীর সন্তান; কিন্তু তাঁহার সহকারী সকলগুলিই প্রায় ভিন্ন স্থানের অধিবাসী। শরৎকুমারকে গর্ভে ধরিয়া রাজসাহী ধন্য হইয়াছে; এবং যে কয়টি পরের সন্তানকে স্তন্য দিয়া রাজসাহী মানুষ করিয়া তুলিয়াছে, তাহারা ধন্য মানুষ। অক্ষয়কুমার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসন্তান; পিতৃপুরুষের লীলাভূমি রাজসাহী অক্ষয়কুমারকে শৈশবে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছে; সুতরাং তাঁহার উপর কিছু দাবী চলিতেও পারে। কিন্তু যে সকল অক্লান্তকর্ম্মিগণ জীবিকা অর্জ্জনের স্থানকে মাতৃভূমির অধিক করিয়া সেবা করিতেছেন, সেই পূজ্যপাদ আচার্য্য রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরকে, পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থকে, সত্যতথ্যানুসন্ধিৎসু রমাপ্রসাদ ও রাধাগোবিন্দকে, অধ্যাপক পঞ্চাননকে কেমন করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইলে যথেষ্ট হয়, তাহা ত জানিনা; যে সকল হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান ইঁহাদের দ্বারা সাধিত হইতেছে, অরণ্য-কান্তারে ভূধরে ভূগর্ভে ভূয়োভূয়ঃ অনুসন্ধান করিয়া, পূর্ব্বগৌরবের শ্মশানভস্ম লোকচক্ষুর সমক্ষে ধরিয়া, এ ভূমির অধিবাসিবৃন্দকে ইঁহারা যে অচ্ছেদ্য ঋণজালে জড়াইতেছেন, এ দেশবাসী সে ঋণ কোন দিন পরিশোধ করিতে পারিবে না;—তাহা নাই পারুক, হে নিঃস্বার্থ পরোপকারী কর্ম্মবীরগণ! তোমরা অক্ষয় অমর হইয়া উত্তরোত্তর আরও অধিক ঋণে আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া ফেল; সে ঋণবন্ধনকে আমরা পুষ্প-ডোরের পেলববন্ধন মনে করিয়া, চিরদিন তোমা-দিগকে বড় আদরেই রাখিব।

রাজসাহীর কলকণ্ঠ "কান্ত"-কোকিল রজনীকান্ত তাহার দেশ ও দেশবাসীকে কাঁদাইয়া, অকালে লোকান্তরিত হইয়াছে; সে শোক আমরা আজও বিস্মৃত হইতে পারি নাই; তাহার উপর বর্ত্তমান রাজসাহীর একমাত্র জ্ঞানভাণ্ডার সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ অশেষ শাস্ত্রদর্শী সর্ব্বদর্শনদ্রষ্টা আমার পরম পূজ্যপাদ অধ্যাপক পীতাম্বর তর্কালঙ্কারের অকস্মাৎ অকালমৃত্যু সরস্বতীকে শোকাভিভূতা করিয়াছে।

জীবের অবশ্যম্ভাবি পরিণাম যাহা, তাহাতে শোক বৃথা; কিন্তু যাহার একটি মাত্রই চক্ষু, সে চক্ষু নষ্ট হইয়া গেলে, জীবনযাত্রা যে অচল হয়,—সে নিদারুণ বেদনাকে অসহ্য বেদনা বলিলে কিছুই বলা হইল না। বিশ্ববিধাতার আনন্দবিধানের মধ্যে সর্ব্বস্ব অপহরণের বজ্রবিধান কেন হইয়াছে, তাহা তিনিই জানেন;—তাঁহার জগৎ জন্ম ভরিয়া এমন অসহায় অশ্রুর মধ্যে নিয়ত ভাসিয়া কেন বেড়ায়, একথার উত্তর তিনি ভিন্ন আর কে দিবে?

সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গুণের আদরকারী কূট-নীতিপরায়ণ চাণক্য উচ্চকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন,—"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা—বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।" ভারতবর্ষ সে বচন একদিন ঋষিবচন বলিয়া মাথায় নিয়াছিল, প্রতি শিশুর নামশ্লোকের সঙ্গে এই মহাবাক্য তাহাকে শিক্ষা দিয়া, বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি ভক্তির বীজ সেই সুকুমার শিশুর মনোভূমিতে বপন করিয়া দেওয়া হইত। একদিন এমন ছিল, যে দিনে ধরাবিজয়দর্পী বীর সেকেন্দর ভারতীয় দণ্ডীর পাদপীঠতলে শুশ্রূষুর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশের ও দেশান্তরের বর্ত্তমান মনীষি-

গণও আজ বলিতেছেন অন্ধকার বিনাশের একমাত্র উপায় প্রজ্জ্বলিত জ্ঞানবর্ত্তিকার প্রসন্ন আলোক; রাজসাহীর দুর্দ্দিনে সে প্রসন্ননাথ, খাঁ বাহাদুর রসিদ, হরনাথ, প্রমথনাথ, হেমন্তকুমারী প্রভৃতি মহানুভবগণ ও মহীয়সী মহিলাবর্গ জ্ঞানবিস্তারকল্পে অকাতর অকুণ্ঠিতদানের দক্ষিণ হস্ত মুক্ত করিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন; সেই সকল লোকোত্তরচরিত্র কেবল রাজসাহীর নহে, সমগ্র বাঙ্গালার নমস্য।

কোন্ কল্প-কল্পান্ত পূর্ব্বে, কোন্ দীর্ঘ তমসাবৃত তিমির-রজনীর অবসানে, কোন্ সত্যযুগের আদি প্রারম্ভে অজ্ঞানতিমিরান্ধকার বিদূরিত করিয়া জ্ঞানারুণের নবোন্মেষে কর্ম্মভূমি আর্য্যাবর্ত্তের নবজাগরণ সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা জানি না; সে গৌরবের দিনে আমাদের শুভ্র-শিশির-মণিমণ্ডিত-শীর্ষা নীলসাগর-চেলাঞ্চলা ভারত-জননীর ললাট-বিচ্ছুরিত রশ্মিরেখায় সেদিনের জগৎ উদ্ভাসিত হইত; তাহার পর হইতে বহুকাল ধরিয়া ভারতবর্ষ সে গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল—কালবশে যখন অজ্ঞানের জলদজাল ভারতাকাশের তমোহারী জ্ঞান-সূর্য্যকে সমাচ্ছাদিত করিবার জন্য চারিদিক হইতে ঘেরিয়া আসিতেছিল, সে দুর্দ্দিনে শতাধিকবর্ষ পূর্ব্বে যে প্রাতঃস্মরণীয়া রাজবধূ ভবানী "নগদবৃত্তি"স্থাপন করিয়া তাঁহার জন্মভূমিকে চিরতিমির-গ্রাস হইতে রক্ষাকল্পে সে দিনের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, আজ তাঁহার সেই দূরদর্শিতা ও স্বদেশপ্রেম দেখিয়া আনন্দে রুদ্ধবাক্ হইয়া যাইতে হয়! দেশের পরবর্ত্তিগণ তাঁহার সেই শিক্ষানীতির উদার ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে নিজ নিজ ক্ষমতার উপযোগী কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহাকেই প্রচুর বলিয়া আজ নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না—সে কেবল বীজবপনমাত্র হইয়াছে, আজ এবং ভবিষ্যতে বর্ত্তমান ও উত্তর পুরুষগণকে সেই রোপিত বীজের অঙ্কুরোদ্গমমানসে, তাহার শাখা কাণ্ড বিস্তারকল্পে তাহার মূলে নিয়ত জলসেচন করিতে হইবে; তাহাতে ফলচ্ছায়াসমন্বিত যে মহান্ মহীরুহ গগনভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিবে তাহার অপরূপ শোভা সুষমা কল্পনা করিলে আনন্দ-শিহরণ-জাত রোমাঞ্চে নয়ন আজ মুদ্রিত হইয়া আইসে।

জীবনবসন্তের প্রথম প্রভাতে আশার "আশাবরী" আলাপনের মধুর তানের মধ্যে যেমন করিয়া জীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম, আজ জীবনসন্ধ্যার পূরবী রাগিণীর মধ্যে সে আরম্ভের পরম অভিলষিত পরিণতিকে দূর হইতে নমস্কার জানাইয়া বিদায় লইবার সময় প্রায় সমাগত হইয়াছে। আজ এই জীবনমরণের সীমান্তে দাঁড়াইয়া, জীবন-গোধূলির অস্পষ্টালোকে, পরপারের বিসর্জ্জনের বাদ্যোদ্যমের মধ্যে কত অকৃত কার্য্য কত অকথিত বাণী কত অদত্ত সেবার কত অনাদৃত স্নেহের বিপুল বেদনায় নয়ন আজ আকুল-অশ্রুর ভারে অন্ধ হইয়া আসিতেছে তাহা বলিয়া কি শেষ করিতে পারি! যে নিষ্ঠুর কালের নির্ম্মম তাড়নায় দেশত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তাহা দেশবাসীর অজ্ঞাত না থাকিবারই কথা—পলাতকের অক্ষমতার ত্রুটি গ্রহণ না করিয়া তাহাকে আপনারা আজ যে সম্মান দান করিলেন তাহার উপযুক্ত প্রতিদান জগতে নাই। আবহমান কাল ধরিয়া জীব স্নেহের কাঙ্গালই থাকিয়া যায়; আমার এই জন্মগত মহাদৈন্য বুঝিয়া আজ স্নেহের যে মহাদানে আমার দুই হস্ত আপনারা ভরিয়া দিলেন, জগতে ইহার বাড়া দান আমি আর কিছু জানি না। অকিঞ্চনের শুভাদৃষ্টবশে আজ সে ধন্য হইয়া গেল। যেখানে যে অবস্থায় যত দিনই বাঁচিয়া থাকি, পথে বা প্রান্তরে, রাজহর্ম্ম্যে বা পর্ণকুটীরে যেখানে যে ভাবেই আমার এই পার্থিব নয়নের শেষতম নিমেষপাত হইয়া যাক, আপনাদের অহেতুকী প্রীতির রাগরঞ্জিত এই সন্ধ্যার আনন্দ-মিলনস্মৃতি আমার হৃদয়তলে চির সজীব হইয়াই রহিবে।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

কৃত্তিবাস-প্রশস্তি

যে অসাধ্য সাধনায়, যে অপূর্ব্ব তপস্যার বলে
স্বর্গের অমৃতধারা আহরিয়া আর্ত্ত ধরাতলে,
অযুত সগরবংশচিতাভস্মপরিশিষ্ট দেহে
যে সাধক সঞ্চারিল সঞ্জীবনী ভাগীরথী-স্নেহে—
তারে ত চিনেছে লোকে ; পুরাণের সে ধন্য কাহিনী
কে না জানে আর্য্যাবর্ত্তে—কে না মানে সে পুণ্যবাহিনী ?
কিন্তু হায় ! যে মনীষী, বাল্মীকির কল্পলোক হ'তে
আহরি' অমৃত বাণী, বহাইয়া নবছন্দস্রোতে,
সপ্তকোটি অভিশপ্ত অঙ্গে ঢালি' অপূর্ব্ব চেতনা
উদ্বুদ্ধ করিয়া দিল অপরূপ প্রাণ-উন্মাদনা—
তারে কি চিনেছি মোরা ? জাগাইয়া সাহিত্যের ক্ষুধা
কে সে কবি সঞ্চারিল মৃতপ্রাণে সঞ্জীবনীসুধা
অনন্ত আগ্রহভরা—বক্ষরক্তে সৃজি স্তন্যধারা
কে মিটাল তৃষ্ণা তার—আনন্দের অপূর্ব্ব ফোয়ারা !
জানিনা দোঁহার মাঝে কে যে শ্রেষ্ঠ কে যে মহনীয়,

গঙ্গা আর রামায়ণ—কোন্ কীর্ত্তি বঙ্গে বরণীয় !
আকাশের চন্দ্র সূর্য্য, কারে রাখি' কারে দিব ছাড়ি'—
উভয়েরই করে গড়া সাতকোটি বাঙালীর নাড়ী !
তোমারে চিনিনি মোরা কীর্ত্তিভূষা ওগো কৃত্তিবাস !
দিনের অভয়মন্ত্র—রজনীর উদার আশ্বাস
যেমন চিনেনা লোকে, সে যে বিশ্বে কত বড় দান,
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে—নাহি অন্ত নাহি পরিমাণ।
বিধাতার কৃপাসিন্ধু উদ্বেলিত আঁখির সম্মুখে
অহোরাত্রি অকুণ্ঠিত ; আলো আসি পড়িতেছে মুখে
প্রত্যহ উষার সাথে, শ্বাসরূপে বহে সমীরণ,
অফুরন্ত রসধারাসঞ্চালিত জীবের জীবন,
যোগাইয়া ফলশস্য পড়ে' আছে বিপুল ধরণী
চিরমৌন মহামূক—এ সব কি দান বলে' গণি ?
তারা যে সহজপ্রাপ্য ! তুচ্ছ বিত্তে হস্ত উঠে ভরি' ;
সুমহান নিত্যদান চিত্ত সদা রয়েছে পাসরি'।
মানি কিম্বা নাহি মানি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই মহাদান,
দিনে দিনে দিনু বলে' করে না যা' আত্ম অপমান।

জানি কিম্বা নাহি জানি, তোমারি সে অকুণ্ঠিত প্রেম
স্পর্শমণিপরশনে লোহারে করেছে সে যে হেম !
অক্ষুণ্ণ তোমার জয় হে কবি, হে গুরু বাঙালীর,
চিনিনি—কি তুমি রত্ন, তবু চিত্ত অবনত শির।

তোমার কাব্যের মন্ত্রে অলক্ষিতে লক্ষ নারীনর
মাতৃস্তন্য ধারা সাথে ভরি' লয় আপন অন্তর ;
তোমারি প্রসাদপুষ্ট শিশু চিনে আপনার মায়,
সতী শিখে পতিনিষ্ঠা, ভ্রাতৃস্নেহে বিগলিত ভাই,
পিতার সম্মানকল্পে সন্তান সে সহে বনবাস,
অরণ্যের হিংস্র পশু প্রীতি লভি সাজে ক্রীতদাস,
ক্ষত্রিয়ে চণ্ডাল-অন্ন ভাগ করি ভোগ করে হাসি,
প্রবল দুর্ব্বল-স্নেহে একতায় মিলে পাশাপাশি।
সহজ সরল শুদ্ধ সর্ব্বজনবোধ্য ভাষা দিয়া
সমগ্র দেশের চিত্ত কাব্যজালে তুলেছ গাঁথিয়া।
আজি যা' সংস্কারমাত্র শিক্ষা তাহা ছিল একদিন,
তাহার শিক্ষক তুমি, তোমারি সে কীর্ত্তি অমলিন ;
তপনের দীপ্তি যথা নিঃশব্দে আঁখিরে দেয় আলো,
স্বীকার করি না করি, বলি আর নাই বলি ভালো।
আজি যে পবিত্র দীক্ষা মজ্জাগত বাঙালীর প্রাণে—
সে তোমারি কাব্য কবি, সে তোমারি প্রতিভার দানে।
না চিনেও চিনিয়াছি, না মেনেও মানিয়াছি তাই,
অন্তরের অন্তরালে শিক্ষা তব ব্যর্থ হয় নাই।

কে বলে বা চিনি নাই ? তব কীর্ত্তিধ্বজা স্তম্ভহীন
কাঁপিতেছে লক্ষবক্ষে মর্ম্মরিয়া চিরনিশিদিন,
বাল্মীকির পুণ্যকথা বিশ্বে ব্যাপ্ত গন্ধবহ সম,
বিশ্বের বরেণ্য ঋষি—চরণে তাঁহার নমোনমঃ।
তাঁর স্থান উচ্চ শিরে, পণ্ডিতের কাব্যপাঠাগারে,
তুমি আছ বাঙালীর ঘরে ঘরে হৃদয়ভাণ্ডারে,
ভাঙা বাক্সে কুলুঙ্গিতে শয্যাপ্রান্তে উপাধান তলে,
মসীমাখা তৈললিপ্ত চিহ্ন-আঁকা নয়নের জলে,
কোণভাঙা মলাটের আচ্ছাদনে, ছিন্ন শিশুহাতে—
মায়ের ব্যথায় ভরা, গৃহিণীর গোপন লজ্জাতে ;

তরুণীর কেশগন্ধী বন্দী-সীতা সরমার পাতা,
কাঁচপোকাটিপ আঁকা,—বধূ কবে লিখেছিল খাতা।
ক্ষুদ্র অবকাশক্ষণে বিশ্রামের স্বল্প অবসরে
তোমার হৃদয়যাত্রা জয়যুক্ত প্রতি ঘরে ঘরে।
গদগদ প্রৌঢ়কণ্ঠে, প্রবীণের দন্তহীন মুখে,
কিশোরীর সুধাস্বরে—হাসি অশ্রু করুণায় দুখে
তোমার বিজয়বার্ত্তা কোটিকণ্ঠে শব্দহীন ফিরে—
ধনীর প্রাসাদ হ'তে দীনতম দরিদ্র কুটীরে।
তন্তুবায় তন্তু তুলি' দিনান্তের দীপটি জ্বালিয়া
করে তব আরাধনা; তেজপাতা-চিহ্নটি খুলিয়া
দিনের বেসাতিশেষে মুদী তার ভাঙা কণ্ঠস্বরে
লঙ্কাকাণ্ড শেষ করি' বিশ্রামের আয়োজন করে।
আপামরসাধারণ তব পদে যোগায় নিয়ত
তোমার স্মৃতির পূজা—সে পূজা কি নহে মনোমত?

হোক্ তাহা মনোমত—তবু সাধ, সবাকারে ডাকি'
প্রত্যহের কর্ম্ম হ'তে নিখিলের ফিরাইয়া আঁখি
বলি উচ্চে বলি গর্ব্বে, এই দেখ আমার দেবতা—
গগন বিদীর্ণ করি চীৎকারিয়া বলি সে বারতা।
এই সে ফুলিয়া গ্রাম, পুণ্যশ্লোক এই সে নদীয়া—
চৈতন্য পবিত্র যারে করিয়াছে পদস্পর্শ দিয়া;
এই সে ফুলিয়া গ্রাম, এই খানে এরি তপ্ত কোলে
মহাকবি কৃত্তিবাস কীর্ত্তি তার রেখে গেছে চলে'
অমর বৈকুণ্ঠলোকে। মোরা তারি জ্ঞাতিগোষ্ঠীভাই
মিলেছি তাহারি নামে দূর-দূরান্তর হ'তে তাই।
এই তার কীর্ত্তিস্তম্ভ—কীর্ত্তি যার সারা বঙ্গ ভরি',
কৃতার্থ আমরা সবে আজি সেই পুণ্যকথা স্মরি'
ধন্য বাণীপূজাদিনে এইখানে জনমিলা কবি,
সার্থক সে বাণী পূজা, সার্থক সে সাধনার ছবি
আপনি যাহার কণ্ঠে বরমাল্য সঁপিলা ভারতী
বঙ্গভাষা বঙ্গবাসী নিত্য যারে করিছে আরতি।
পবিত্র এ মহাতীর্থ—পুণ্যপূত প্রতি ধূলিকণা
অযুত সাহিত্যভক্ত সাথে কবি রচিল অর্চ্চনা।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

রোগশয্যার প্রলাপ।

(১৫)

একদিন মনে হইল,—"বিদেশ হইতে যাঁহারা আইন ও চিকিৎসা শিখিয়া আসেন, এখনও দেশে তাঁহাদের উপার্জ্জন ও বিদ্যাপ্রচারের অবসর ও স্থান আছে, কিন্তু যাঁহারা কৃষি বা অন্যান্য ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের কি সুবিধা হইতে পারে? দেশের সমস্ত ব্যবসায় পরহস্তগত, তাহারা স্বজাতি-প্রতিপালক, এদেশীয় শিক্ষিত লোককে অল্প বেতনে পাইবার সুযোগ থাকিলেও কেবল স্বজাতি-বাৎসল্যের বশে তাহারা ব্যবসায়ীর উপযুক্ত ব্যয়হ্রাস-নীতিও পরিত্যাগ করিয়া স্বজাতীয় ব্যক্তিকেই অধিক বেতনে নিযুক্ত করিয়া থাকে। দেশের লোকের এমন কোন কারবার বা এমন কোন কারখানা নাই যে, সেখানে এই সকল শিক্ষিত দেশীয় যুবকবৃন্দের অন্নসংস্থান হয় বা ইঁহারা শিক্ষালব্ধ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন। এখন এই সকল যুবককে প্রতিপালন করিতে হইলে, দেশের লোকের কলকারখানা কি বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক, নতুবা, এই শিক্ষিত-সম্প্রদায় দেশের পক্ষে 'ভার-বোঝা' হইয়া উঠিবেন; কিন্তু দেশের লোকের

সেরূপ উপায় কিছু অবলম্বনের শক্তি আছে কি না, তাহাও ভাবিবার বা পরামর্শের বিষয়।”

ভাবিতে ভাবিতে দেখিলাম,—দেশের অবস্থা এ বিষয়ে বড়ই সঙ্কীর্ণ। যাঁহারা কৃষি-বিদ্যা শিখিয়া আসিতেছেন, জমিদার শ্রেণী মনে করিলে, ইঁহাদের প্রতিপালন করিতে পারেন। জমিই যখন জমিদারের এবং প্রজার সর্ব্বস্ব, তখন জমির উর্ব্বরতা, ফসলের নবীনতা ও পুষ্টি-সাধনার্থ এই সকল যুবকের সাহায্য গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। দেবমাতৃক দেশে অনাবৃষ্টি বা অল্পবৃষ্টির প্রতিবিধান করিয়া রাখা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক; তাহাও এই সকল যুবকের সাহায্যেই সম্পন্ন হইতে পারে। নদীমাতৃক দেশে বন্যা নিবারণ, লোণা জলের প্রবেশ-রোধ, খাল কাটিয়া বড় নদী বা বিলের জল নিকাশের বা সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইলেও এই সকল যুবকের সাহায্যই প্রার্থনীয়। জমির উর্ব্বরতা বর্দ্ধন, জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন, ফসলের পুষ্টি সাধন, অল্পব্যয় অল্প পরিশ্রমে বহুশস্য উৎপাদন এবং নূতন নূতন আয়কর ফসলের উৎপাদন ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইলেও এই যুবকগণের সাহায্য আবশ্যক। জমিদারেরা এখন কেবল খাজানা আদায়ের জন্য নায়েব, গোমস্তা, কারকুন, মোহারের, পাইক, বরকন্দাজ ইত্যাদি নিযুক্ত করেন, প্রজাপালনের জন্য কোন ব্যবস্থা করেন না। অবশ্য, অনেক জমিদার যে গ্রামে গ্রামে স্কুল ও চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রজার হিতার্থই করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রজাপালনের বহু সদুপায়ের মধ্যে এই দুইটি প্রকৃষ্ট উপায় হইলেও পর্য্যাপ্ত নহে। প্রজার অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন জমিদারেরও আয় বর্দ্ধিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, তখন প্রজার অবস্থার উন্নতি-সাধনার্থ জমিদারের এই কৃষির উন্নতি-সাধনে সাহায্য করা প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করা উচিত। এজন্য আজকালকার দিনে প্রতি নায়েবের বা গোমস্তার কাছারীতে তদধীন সমস্ত গ্রামের প্রজাকে বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য এক একজন কৃষি-বিদ্যা-পারদর্শী যুবককে নিযুক্ত করা উচিত। সেকালের জমিদারেরা পূর্ত্তকার্য্যে অধিক অর্থ ব্যয় করিতেন। এখন দেশের রাজা সে ভার গ্রহণ করিয়াছেন। রাজা এখন পথকর গ্রহণ করিয়া সে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, সুতরাং সে দিকে এখন জমিদারের দৃষ্টি না দিলেও চলে। রাজা পথকরের টাকা কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন না করিতেছেন, তাহা রাজ্যের হিতৈষী মন্ত্রিবর্গের ও পরামর্শদাতৃবর্গের দর্শনীয়। প্রতিবৎসর প্রত্যেক জমিদার যে পরিমাণ টাকা পথকর দেন, প্রতিবৎসর তাঁহার জমিদারীতে পূর্ত্তকার্য্যে সে পরিমাণ টাকা রাজব্যবস্থায় খরচ হয় কিনা, জমিদারেরা তাহা রাজ্য-পালনকর্ত্তৃগণকে জিজ্ঞাসা করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী বলিয়া মনে করিলে কোন প্রত্যবায় হয় না। সুতরাং জমিদারেরা স্বীয় স্বীয় জমিদারীতে পূর্ত্তকার্য্যের জন্য রাজার সহিত বুঝা পড়া করিয়া, যে কার্য্য নিজেরা না করিলে চলিবে না, সেই কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য যদি কিছু খরচপত্র করেন, তবে প্রজারক্ষা দ্বারা আত্মরক্ষাও হয়।

তার পর যে সকল যুবক চিনি, সাবান, দেশালাই, কাচ, লৌহ, খনি, প্রভৃতির কাজ শিখিয়া আসেন, তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র দেশে এখন নাই। কে যে করিয়া দিবেন, তাহাও জানিনা। আমাদের দেশে বিদেশের ধনার্জ্জনকারী স্বদেশী বণিক্ সম্প্রদায় নাই। ইচ্ছা করিলেই, দেশ-ব্যবস্থায় তাহা এখনই জন্মিতে পারে না। আমাদের দেশীয় ব্যবসাদার যাঁহারা আছেন, তাঁহারা বড় বড় দোকানদার, আড়তদার মাত্র। বিদেশী মালের আমদানী করিবার স্বাধীনতা তাঁহাদের আছে, কিন্তু স্বদেশী মালের রপ্তানীতে তাঁহাদের স্বাধীনতা নাই সুতরাং ঘরের টাকা দিয়া পরের লাভ ঘটাইতে তাঁহারা পারেন; কিন্তু ঘরের মাল বেচিয়া বিদেশের টাকা ঘরে আনিতে তাঁহারা পারেন না। অবশ্য দেশের মাল বিদেশী বণিকের গোমস্তাকে বিক্রয় করিয়া তাঁহারা বিদেশীর অর্থ একবারেই যে কিছু পান না, তাহা নহে, তবে দেশের দ্রব্য বিদেশে নিজে লইয়া

গিয়া বিদেশীয় প্রয়োজনমত চড়া দরে বিক্রয় করিয়া যে বিপুল অর্থ লাভ করা যায়, সে লাভ তাঁহাদের হয় না; কাজেই ঠিক বিদেশের অর্থ এদেশে আসে না। অতএব বাণিজ্যক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ ঐ সকল বিদ্যায় শিক্ষিত যুবকগণের কার্য্যক্ষেত্র এখন দেশে বর্ত্তমান নাই, সুতরাং উহাদের ভবিষ্যৎ বড় গণ্ডগোলে পড়িয়া আছে। আরও একটা দিক ভাবিবার আছে।—এই সকল বিদ্যা যাঁহারা শিখিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা যে দেশে শিক্ষা পাইয়া আসিতেছেন, সে দেশের বর্ত্তমান উন্নত-অবস্থা-সুলভ অতি উন্নত প্রণালীর বহুব্যয়সাধ্য যন্ত্রাদির সাহায্যমূলক কার্য্যপ্রণালীই শিখিয়া আসিতেছেন। তত অর্থব্যয় করিয়া সেরূপ যন্ত্র এদেশে কেহ আনাইতে পারেন না, কাজেই বিদ্যা শিখিয়া আসিয়াও ঐ সকল যুবকেরা উপযুক্ত কল-কারখানার অভাবে ঠুঁটা জগন্নাথ হইয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হন।

এইখানে যৌথ-কারবারের কথা মনে আসিল। এখানে যদি একাদ্বারা বহুমূল্য কল-কারখানা করা সম্ভব না হয়, তবে যৌথ মূলধনে তাহা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু এদেশে এরূপ যৌথ-কারবারের অভিজ্ঞতা নাই, এরূপ কারবার পরিচালনের শক্তিও এদেশে নাই। সত্য বটে মাড়বারী দোকানদারের ও পূর্ব্ববঙ্গের মহাজনী কারবারে আমরা দুই তিনজন ধনীর নাম একত্র গ্রথিত দেখিতে পাই, কিন্তু তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ঐ দোকানের এবং আড়তদারীর কারবারে। কল-কারখানার কারবারে অভিজ্ঞতা কাহারও নাই। যৌথ-কারবারের চেষ্টা আমাদের দেশে যে হয় না এমন নহে, কিন্তু যাঁহারা তাহার পরিচালক হইয়া বসেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও অভিজ্ঞতা আইনে, কাহারও অভিজ্ঞতা জমিদারী পরিচালনে, কাহারও অভিজ্ঞতা দোকানদারীতে, কাহারও অভিজ্ঞতা তেজারতীতে। আসল কাজে অভিজ্ঞতা কাহারওই থাকে না বলিয়া, আমাদের দেশে এ সকলের যৌথ-কারবার স্থায়ী হইতে পারিতেছে না।

আমার মনে হয়, আজকাল যেমন কল-কারখানায় কার্য্য (Mechanical Engineering) শিখাইবার চেষ্টা হইতেছে, তেমনি কল-কারখানার ব্যবসায় চালাইবার কার্য্য-প্রণালী শিখাইবার চেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে না করাটা ভুল হইতেছে। বিজ্ঞান শিক্ষার সাহায্য করিবার জন্য যে সমিতি খরচ-পত্র দিয়া এদেশের যুবকদের বিদেশে পাঠাইতেছেন, তাঁহারা যে যাহা শিখিতে চাহিতেছে, তাহাই শিখিবার জন্য পাঠাইতেছেন। এরূপ ব্যবস্থায় একটু বিশৃঙ্খলা আছে বলিয়া বুঝিতেছি। একটা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইব,—একজন যুবক চিনির কাজ শিখিতে গেলেন, তিনি চিনির কৃষিমাত্র শিখিয়াই আসিলেন, সুতরাং যে চিনির কারবার চালাইবে, সে তাঁহার একার সাহায্যে কি করিবে? চিনির কল চালাইবার অভিজ্ঞ লোক একজন চাই। চিনির কাট্‌তি কিসে হইবে, চিনির কারখানার লোকজন কেমন করিয়া খাটাইবে, চিনির কারখানার আয়-ব্যয়ের হিসাব কেমন করিয়া রাখিবে, চিনির চাষের সহিত কারখানার কিরূপ সম্বন্ধ রাখিলে সুবিধা হইবে ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকেরও প্রয়োজন, অতএব চিনির কৃষি শিক্ষার্থী যুবকের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতালাভের জন্য বিভিন্ন যুবককে শিক্ষার্থী স্বরূপ পাঠান আবশ্যক। এক একটা কারবারের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষায় শিক্ষিত এক এক সেট লোক এক সঙ্গে প্রস্তুত করিয়া না আনিলে, কি হইবে?

আরও এক কথা। উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরূঢ় দেশের কারবারের প্রণালী উন্নতির পথে নবীন যাত্রী দেশের পক্ষে কখনই সুপ্রযুক্ত হইতে পারে না। কথায় বলে "হেলে ধরিতে পারে না, কেউটে ধরিতে যায়"—সুতরাং এদেশের পক্ষে সকল প্রকার ব্যবসায়ের ও কারখানা পরিচালনের উন্নত প্রণালীই একবারে চালাইতে চেষ্টা করা অপেক্ষা, উহাদের প্রাথমিক পরিচালন প্রণালী অবলম্বন করা উচিত আর তাহাই শিক্ষা করিয়া আসা উচিত।—তাহা না হইলে, উন্নত-প্রণালীর কারখানা বা ব্যবসায় চালাইবার বিপুল

আয়োজনের বিপুল ব্যয়ভার সঙ্কুলান করা এদেশের অশিক্ষিত আরম্ভকারীদের পক্ষে যেমন কঠিন হইয়া পড়ে, তেমনি তাহাই আবার অতি অল্পেই তাঁহাদের অবসন্ন করিয়া ফেলে। এরূপ নিষ্ফলতা বা বিফলতার দৃষ্টান্ত দেশে যথেষ্ট বর্ত্তমান। "ছিল না লক্ষ্মীপুজো একবারে দশভুজো"—করিতে গেলে চলিবে কেন? এ বিষয়ে আমাদের বর্ণপরিচয় হইতে শিখিয়া আসিতে হইবে এবং বর্ণপরিচয় হইতেই শিখাইতে হইবে। ক্ষুধা বেশী বলিয়া ছাল সমেত নারিকেল কামড়াইলে দাঁতই ভাঙিয়া যাইবে, পেট ভরিবে না। কেবল যুবকদের শিক্ষিত করিয়া আনিলেই এখন চলিবে না। সেই শিক্ষিত যুবকদের যাঁহারা প্রতিপালন করিতে পারিবেন, যাঁহারা তাঁহাদের সাহায্যে কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি করিতে পারিবেন, সে সকল লোককেও শিক্ষা দিয়া শিক্ষিত যুবকগণের কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে, তাহা না পারিলে ঐ শিক্ষিত যুবকদেরই অধিক ক্ষতি করা হইবে।

এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে শ্রদ্ধাভাজন কৃষিবিদ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের কথা মনে পড়িল। তাঁহাকে দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ ছেলে পড়াইয়া খাইতে হইতেছে। তাহাও কি, তিনি যে বিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছেন, সেই বিদ্যায় ছাত্রদের পণ্ডিত করিতে পারিতেছেন! তাহা নহে। গতানুগতিক প্রথায় বঙ্গবাসী কলেজ করিয়া তাঁহাকে সাহিত্যের সামান্যাংশ ও বিজ্ঞানের সামান্যাংশ পড়াইয়া দিনপাত করিতে হইতেছে। অতএব এ বিষয়ে শিক্ষার্থী ও কৃতবিদ্যের শিক্ষা ও কর্ম্মক্ষেত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ব্যবস্থা না করিলে, বিশেষ কোন ফললাভের আশা নাই। তাহার পর মনে হইল,—এত শিক্ষা দিবার লোক কৈ? তাহার উপযুক্ত লোকই বা কৈ? উপদেশ শুনিলেই বা উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া তদনুসারে কার্য্য করিবে, এমন লোকই বা কৈ? যাঁহারা এবিষয়ে খাটিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের প্রতিপালন করে কে?—কাজেই এদিকে আর ভাবনা চলিল না।—তবে মনে হইল,—দেশের ধাতু এখন বদ্‌লাইতেছে। যে ধ্যান ধারণায় যে লক্ষ্যে দেশ এতদিন কাজ করিয়া আসিয়াছে, এখন অন্য দেশের ধ্যান ধারণা লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় দেশ তাহাতে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে; কাজেই দেশের এখনও গতি স্থির হয় নাই। এই দোলায়মান অবস্থা হইতে দেশে কত দিনে কর্ত্তব্যপ্রণালী সুশৃঙ্খল হইবে, তাহা কে জানে? শিক্ষাহীনতা, অর্থহীনতা বা জড়ত্ব যে এই শৃঙ্খলা সাধনে একমাত্র বাদী হইতেছে, তাহা নহে। অনুকরণ দ্বারা দেশ যাহা চাহিতেছে, তাহার উপকারিতা, কৃতকারিতা দেখিয়া বুঝিয়া সে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে আর দেশের যাহা আছে, যাহা হারাইয়াছে বা এখন অপরের অনুকরণ করিতে গিয়া যাহা হারাইতেছে, তাহাই তাহার নিজস্ব চিরপ্রিয়, তাহাই তাহার নিজত্ব, স্বাতন্ত্র্য এবং এতদিনের মানমর্য্যাদা রক্ষায় সাহায্য করিয়া আসিয়াছে, কাজেই তাহা ছাড়িতেও সে কষ্ট বোধ করিতেছে, কাজেই এখনও তাহার লক্ষ্যই বিধিমত নির্দ্ধারিত হয় নাই বলিতে হইবে। এরূপ স্থলে লক্ষ্যস্থির করাও লোক বিশেষের চেষ্টায় হয় না, কাল ইহার নিয়ামক। কালে ইহা স্থিরীকৃত হইবে। যতদিন কাল সেই কার্য্য করিয়া উঠিতে না পারিতেছে অর্থাৎ দেশটা সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্যরূপে গঠিত হইবে, কি ইহারা প্রাচ্যত্ব রক্ষা করিতে পারিবে অথবা উভয়ের মিশ্রণে একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করিবে,—ইহা ঠিক করিতে না পারিতেছে, ততদিন ইহাকে এই অস্থিত পঙ্কের অবস্থা-সুলভ ক্ষতি বাধ্য হইয়াই সহ্য করিতে হইবে।

তবে কি ততদিন দেশ নিশ্চিন্ত থাকিবে? না, তা থাকিবে না, কালই তাহা থাকিতে দিবে না। কত শত চেষ্টায় সে সফলতা ও বিফলতার মধ্য দিয়া নিজের শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া অগ্রসর হইবে। এই সফলতা ও বিফলতার জন্য যে লাভ ক্ষতি ঘটিবে, তাহাতেও এই দেশকেই সুস্থ ও উৎপীড়িত হইতে হইতে অগ্রসর করিবে। ইহার প্রতিবিধান যদি কেহ

আশা করেন বা কার্য্যটা কিছু আগাইয়া আনিয়া শীঘ্র শীঘ্র শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে উর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে নিরাহারে পঞ্চতপা করিয়া ভগবানের অবতার প্রার্থনা করিতে হইবে। আতিমানুষিক শক্তি, ঐশী শক্তি ব্যতীত কালজয় করিবার ক্ষমতা কাহারওই নাই। আবার দেখিতে গেলে তাহাও সেই কাল-সাপেক্ষ,—তপস্যায় সিদ্ধি সঙ্কল্প মাত্রই লাভ হয় না,—সাধনার পর সাধনায় যথাকালে তাহা হইয়া থাকে; সুতরাং ইহাও নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না যে কেহ তপস্যাদ্বারা নিয়মিত কাল সংক্ষেপ করিয়া লইতে পারে? সগরবংশ উদ্ধারের উপায় গঙ্গাবতারণ জানা থাকিলেও অসমভঙ্গ দীলিপাদি রাজগণ তপস্যা করিয়াও কাল সংক্ষেপ করিতে পারেন নাই,—সেই যথাকাল-নিয়মিত ভগীরথের তপস্যার পর মহাকাল সেই গঙ্গাবতারণ-তপস্যায় সিদ্ধি দান করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চগ্রাম ভিক্ষাতেও যুধিষ্ঠিরাদির হৃতরাজ্য উদ্ধার হয় নাই,—যথাকাল-নিয়মিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে মহাকাল সেই উদ্দেশ্য সফল করিয়াছিলেন; অতএব এই মীমাংসার উপর মন আর ভাবিতে পারিল না, কাজেই পাশ ফিরিয়া শুইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বলিলাম—'এবমস্তু।'

শ্রীরোগাতুর শর্ম্মা।

(৺ব্যোমকেশ মুস্তফী)

কবি ভূষণ ও শিবাজী

কাব্য-পরিচয়

আমরা এ পর্য্যন্ত ভূষণপ্রণীত যে সকল কাব্য ও কবিতার উল্লেখ পাইয়াছি, তাহাদের নাম ১। শিবরাজ ভূষণ, ২। সিবাবাবনী ৩। ছত্রসালদশক, ৪। ফুটকল (ফুট কাব্য), ৫। কবি চিরঞ্জীব, ৬। শিবরাজ দৃষ্টিপঞ্চক ৭। ভূষণ উল্লাস, ৮। দূষণ উল্লাস। ৯। ভূষণ হজারা। কুমায়ুঁ নরেশ সম্বন্ধে একটি কবিতা পাওয়া গিয়াছে, তাহা কেহ কেহ ফুট কাব্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার রচিত আরও যে কত কবিতা লোকমুখে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবসন্ন হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে, তাহার সংখ্যা কে জানে? মিশ্রপণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, "সম্ভব হৈ কি ইন বীচোঁ ইন্‌হোনে শিবাজী পর দো এক ঔর গ্রন্থভী বনা ডালে হোঁ, জিন্‌কা অব পতা নহী চলতা।" (১২)

(১২) নাগরী প্রচারিণী সভাদ্বারা প্রকাশিত ভূষণ গ্রন্থাবলীর ভূমিকা; পৃঃ ১৭।

১। শিবরাজভূষণ—ইহা কবিভূষণ বিরচিত সকল গ্রন্থের সেরা। এই • কাব্যভূষণরচিত, কাব্যভূষণ (অলঙ্কার শাস্ত্র) অবলম্বনে লিখিত এবং শিবাজীর যশোগানে ভূষিত। অতএব ভূষণ ইহার সার্থক নাম,—

'ভাঁতি ভাঁতি ভূষনিসোঁ ভূষিত করৌঁ কবিত্ত।'

এবং 'ভূষন ভূষনময় করত, সিবভূষনময় গ্রন্থ।' শিবরাজ-ভূষণ ১৭৩০ সংবৎ সম্পূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু কি মাসে তাহার উল্লেখ নাই,—

সম সত্রহসৈতীস (১৭৩০) পর,সুচি বদি তেরস ভান।
ভূষণ সিবভূষন কিয়ৌ পঢ়িয়ো সুনৌ সুজান॥ (১৩)

(১৩) পাঠান্তর—

সুভ সত্রহসৈ তীসপর বুধ সুদি তেরসি মান।
ভূষণ সিবভূষণ কিয়ো পঢ়িয়ো সুনৌ সুজান॥

—নাগরী প্রচারিণী সভার ভূষণ গ্রন্থাবলী।

ইহার একবৎসর পর শিবাজীর যথারীতি অভিষেক অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

গ্রন্থে অলঙ্কার শাস্ত্রের স্বরূপ দোহাসূত্রে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং শিবাজীর চরিত্রগাথা রচনা করিয়া তাহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। সাহিত্যসংসারে আর কোন কবি বা চরিত্রলেখক এরূপভাবে আপনার কাব্য নায়কের মর্য্যাদা বাড়াইতে পারেন নাই। কর্ম্মবীর শিবাজীর চরিত্র ভূষণ কবির চক্ষুতে সকল ভাষা, তুলনা, উপমা ও অলঙ্কারের সীমার অতীত ছিল। উপমা ও তুলনা দ্বারা, প্রশংসা ও স্তুতিবাক্য দ্বারা তাঁহার চরিত্র ভূষিত করিতে চেষ্টা করিতে গেলে পাছে তাঁহাকে খর্ব্ব করা হয়, এই ভয়ে কবি শিবাজীর চরিত্র দৃষ্টান্তদ্বারাই ভাষা সাহিত্যের অলঙ্কার অলঙ্কৃত করিয়া তাহার গৌরব ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। এ প্রণালীও অভিনব এবং এই নূতন প্রণালীতে শিল্পীর কৃতিত্বও অসাধারণ। গ্রন্থের উপোদ্ঘাতে ২৯ কবিতা; তাহাতে আদ্যাশক্তির স্তব আছে, কবির আত্মপরিচয় আছে, কাব্যের বস্তু নির্দ্দেশ আছে, শিবাজীর শৌর্য্যবীর্য্যের মৃদু ঝঙ্কার আছে এবং ছত্রপতির রাজধানী রাজগড় বর্ণনা আছে। সমালোচক দিগের মতে কবির রাজগড় ঐতিহাসিকের 'রায়গড়।' কিন্তু শিবরাজ ভূষণের ১২৫ নং উদাহরণ কবিতায় আমরা 'রাইগড়ে'রও নাম পাইয়াছি—"ভূষণ য়োঁ সাজ্যো রাইগড় শিবরাজ রহৈ" ইত্যাদি। মূল গ্রন্থে ১০৭ দোহায় ১০৫ টি প্রধান প্রধান অলঙ্কারের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং ১৭১ কবিতায় তাহার উদাহরণচ্ছলে শিবাজীর বীরত্ব, দানশক্তি প্রভৃতি বর্ণনা করা হইয়াছে। সর্ব্বশেষে ১৮ দোহায় গ্রন্থসূচী. ১টি দোহায় গ্রন্থরচনাকাল এবং এক কবিতায় কাব্য উপসংহার লিখিত হইয়াছে। অতএব কাব্যের কবিতা-সমষ্টি সর্ব্বসাকল্যে ৩২৭।

কাব্যপ্রকাশ প্রণেতা মম্মট একাদশ শতাব্দীতে আভির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে শব্দালঙ্কার ৬ ভাগে (বক্রোক্তি, অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, চিত্র ও পুনরুক্তবদাভাস) এবং অর্থালঙ্কার ৬১ ভাগে বিভক্ত। নবম শতাব্দীতে আবির্ভূত আলঙ্কারিক পণ্ডিত রুদ্রটের মতে শব্দালঙ্কার ৫ প্রকার [পুনরুক্তবদাভাস বর্জ্জন করিয়া] এবং অর্থালঙ্কার ৬৬ প্রকার। বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্যদর্পণে ৭ প্রকার শব্দালঙ্কার (ভাষাসম যোগ করিয়া) এবং ৭০ প্রকার অর্থালঙ্কারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। অষ্টম শতাব্দীতে আলঙ্কারিক বামনের জন্ম হইয়াছিল। তিনি যমক ও অনুপ্রাস এই দুই শব্দালঙ্কার এবং ২৫ টি অর্থালঙ্কারের নাম করিয়াছেন। ভূষণ বিরচিত শিবাজী ভূষণে ৫ শব্দালঙ্কার (ছেক, পুনরুক্তবদাভাস, যমক, লাটানুপ্রাস ও বক্রোক্তি) এবং একশত অর্থালঙ্কারের সমাবেশ আছে।

কামধেনু চিত্রালঙ্কারের উদাহরণ নমুনাস্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

ধ্রুবজো গুরুতা তিনিকো সরুভূষণ
দানিবড়ো গিরিজা পিবহৈ।
হুবজো হবিতা রিনকো তরুভূষণ
দানিবড়ো সিরজা সিবহৈ।
ভুবজো ভরতা দিনকো নরুভূষণ
দানিবড়ো সরজা সিবহৈ।
তুবজো করত ইনকো অরুভূষণ
দানিবড়ো বরজা নিবহৈ॥

শিবরাজভূষণ গ্রন্থে ভূষণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা চিন্তামণি কৃত ছন্দ বিচার পিঙ্গল নামক গ্রন্থানুসারে ছয় প্রকার ছন্দ (বৃত্ত) ব্যবহৃত হইয়াছে যথা,—দোহা, মন্দিরাদি সঐয়া, হরিগীত, ছপ্পয়,ঘনাক্ষরী:কবিতা ও চঞ্চরীক। মিশ্র পণ্ডিত দিগের মতে ভূষণ ১০ প্রকার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যথা, মনহরণ, ছপ্পয়, দোহা, মালতীসবৈয়া হরিগীতিকা, লীলাবতী, কিরীটী সবৈয়া, অমৃতধ্বনি, মাধবী সবৈয়া ও গীতি। কালিদাস প্রণীত শ্রুতবোধে ৩৬ প্রকার সংস্কৃত ছন্দের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।

২। শিবাবাবনী ইহাতে আমরা সর্ব্বশুদ্ধ ৫২ কবিতা পাইয়াছি। তাহার মুখবন্ধের স্তব শিবরাজভূষণ হইতে গৃহীত। আরও দুই একটী শিবরাজভূষণের ও স্ফুটকাব্যের কবিতা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শিব-

বাবনীর প্রথম ৪ টী কবিতা উপোদ্‌ঘাত স্বরূপ। ইহারই অংশবিশেষ আবৃত্তি করিয়া ঔরঙ্গজেবকে কবি উচিত কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন, ইহারই অংশবিশেষ ৫২ বার আবৃত্তি করিয়া কবি শিবাজীর নিকট ৫২টী গজ ও ৫২ গ্রামের জমীদারী পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন, ইহারই অংশবিশেষ আবৃত্তি করিয়া দ্বিতীয় বার ঔরঙ্গজেবের বাদশাহী দরবারে কবি অতুলনীয় যশোভাজন হইয়াছিলেন। শিবাজী ব্যতীত ইহাতে সুলঙ্কী, অবধূতসিংহ, সাহু ও সম্ভাজীরও প্রশংসাগানের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। এই জন্য মিশ্রপণ্ডিতগণ ইহাকে স্বতন্ত্রগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন—

"য়হ কোই স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহীঁ" (১৪)

শিবা-বাবনীতে শিবাজীর সহিত দিল্লীশ্বরের বিরোধবর্ণনার প্রতিই অধিক মনোযোগ প্রদত্ত হইয়াছে, কেননা তথন সম্ভবতঃ শিবাজীর অপর শত্রুগণ পরাভূত ও হীনবীর্য্য হইয়া অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। এই কাব্যে শিবাজী-জীবনের ১৬৫৮ হইতে ১৬৮০ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান ঘটনার রেখাচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে কবি শিবাজীর শত্রুপক্ষের দুর্গতি বর্ণনা করিয়া যে ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর, সরস ও হৃদয়গ্রাহী। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে শিবা-বাবনী অতিশয় মূল্যবান গ্রন্থ।

৩। ছত্রশাল-দশক—ইহারও প্রথম দুইটী দোহায় সূচনা দিয়া ১০টী কবিতা পান্নাপতি ছত্রশালের যশোগীতিতে মুখরিত হইয়াছে।

৪। স্ফুটকাব্য—ইহাতে আমরা সর্ব্বশুদ্ধ ১২টী কবিতা পাইয়াছি। কুমায়ুঁ নরেশের উদ্দেশে লিখিত কবিতা যোগ করিলে ১৩ হইবে। সেই এক কবিতা পাঠ করিয়া কবি একলক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক লাভ ও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। স্ফুটকাব্যের দুই একটী কবিতা সারল্যে, লালিত্যে, মাধুর্য্যে ও শব্দবিন্যাসে অতি চমৎকার।

৫। কবি-চিরজীব—ঘনাক্ষরী কবিতা। ইহাতে ১৭ টী কবিতায় শিবাজীর বিজয় ও মোগল পরাজয় সংক্ষেপে সাধারণ ভাবে বর্ণনা করিয়া ভারতে আর্য্যধর্ম্মের ও আর্য্য বিক্রমের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় কবি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। কবিতার তালে তালে তাঁহার অন্তর্নিহিত আনন্দ উৎস শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া শ্রোতৃবর্গের ও পাঠকের চিত্তে সুধা বর্ষণ করিয়াছে :—

"কবি চিরজীব শিবরাজ আজ তেরে রাজ
ফের তুরকাননিকী তেজতা ডটে লগী।
ভালপর ফের লাগে চন্দন চমক দেনে
ফের শিখাসূত্রনকী মহিমা বঢ়ে লগী॥"

৬। শিবরাজ-দৃষ্টিপঞ্চক—ইহাতে ৫টী সুন্দর কবিতায় শিবাজীর প্রতাপ বর্ণিত হইয়াছে। ভূষণের অন্য গ্রন্থ বা কবিতা সকল এ পর্য্যন্ত আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। শিবাজীর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা ও পরাক্রম বর্ণনা, তাঁহার দানশক্তির প্রশংসা, তাঁহার বিজয় ঘোষণা, তাঁহার শত্রুপক্ষের বলহীনতা ও অপদার্থতার বর্ণনা এবং তাঁহার মুখ্য অরি ঔরঙ্গজেবের কপটতা, ধর্ম্মান্ধতা, অত্যাচার ও দোষ-ত্রুটীর উল্লেখ ও তদুপরি বিদ্রূপবর্ষণ প্রভৃতি ভূষণগ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। অতএব ইহার ছত্রে ছত্রে ঐতিহাসিক তথ্য প্রকট ও অপ্রকট রহিয়াছে। ভূষণকবির প্রধান গুণ, তিনি তাঁহার নায়কের অনুরক্ত ভক্ত হইয়াও নিরপেক্ষ ও অতিরঞ্জন দোষশূন্য।—

"ইস মহাকবিকী কবিতাসে প্রগট হোতা হৈ কি য়ে বড়ে হী সত্যপ্রিয় ঔর যথার্থভাষী থে য়হাঁতক কি ইন্‌হোঁনে শিবাজীকী পরাজয়কা ভী বর্ণন কিসী ন কিসী রীতিসে কর হী দিয়া হৈ ঔর জহাঁ শিবাজীনে কোই বেজা কাম কিয়া হৈ উসে ভী কহ দিয়া হৈ।" (১৫)

মরাঠাবীর-কেশরী ছত্রপতি শিবাজীর জীবন সম্বন্ধে এরূপ চাক্ষুস প্রমাণ ও সমসাময়িক বর্ণনা বোধ হয় আর দ্বিতীয় নাই। ঔরঙ্গজেবের রাজনীতি ও রাজমত সম্বন্ধে

(১৪) ভূষণ গ্রন্থাবলী; নাগরী প্রচারিণী সভা, ভূমিকা ১৪ পৃঃ

(১৫) ভূষণ গ্রন্থাবলী, নাগরীপ্রচারিণী সভা, ভূমিকা ২১ পৃঃ।

বার্ণিয়ে'র উক্তি কবিভূষণের ঘটনামূলক কাব্য বর্ণনার নিকট মলিন ও হীনপ্রভ।

রচনা

ভূষণের কাব্য-কমল নবরস-মধুপূর্ণ হইলেও উহাতে রৌদ্র বীর, ভয়ানক ও অদ্ভুত রসেরই প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। (১৬) বর্ষাঋতু বর্ণনায় কালিদাসের করে আদিরসের সহস্রধারা বহিয়াছিল ; কিন্তু ভূষণ তাহাতেও বীররসের অবতারণা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে তিনি যুদ্ধবর্ণনায় স্থানে স্থানে বীররসের সহিত সুরুচিসঙ্গত সুসংযত কৌতুক,রসিকতা ও আদিরসের সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন। রাজগড়ের নিসর্গচিত্র বর্ণনায় লালিত্য ও প্রসাদগুণের অবতারণা করিয়া তিনি যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠকের মনে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময় উৎপাদন করে।

ভূষণের রচনা সম্বন্ধে মিশ্রপণ্ডিতগণ মন্তব্য করিয়াছেন —"ইন মহাশয়কী কবিতামেঁ কোই কহনে যোগ্য দোষ নহীঁ হৈ। ভাষা-কবিয়োঁ মেঁ ইনকা স্থান বহুত উঁচা হৈ ঔর ইনকে ভাতি সম্মান কিসীকা নহীঁ হুয়া। বাস্তবমেঁ যুদ্ধ কাব্য করনে মেঁ ইনহোঁনে বড়ী হি কৃত-কার্য্যতা পাই হৈ। ঐসা উত্তম যুদ্ধকা বর্ণন কিসী কবিনে নহীঁ কিয়া।"

অন্যত্র—"ভূষণ মহারাজকী কবিতা বাস্তবমেঁ হিন্দী সহিত্যকী ভূষণ হৈ।" পুষ্পদ্রুম-বিহঙ্গম-সমন্বিত রাজ-গড়ের উপবন বর্ণনায়, শিবাবাবনীতে 'তীনবের খাতীথী সো বীনবের খাতী হৈঁ, নাসপাতী খাতী তে বনাসপাতী খাতী হৈঁ', 'মিটগই ঠসক তমাম তুরকানেকী' প্রভৃতি অন্ত্যাচরণ বিশিষ্ট কবিতা রচনায়, শিবরাজভূষণের "কামিনী কান্ত সোঁ জামিনি চন্দসোঁ দামিনি পাভসমেঘ ঘটাসোঁ কীরতি দানসোঁ সুরতি জ্ঞান সোঁ প্রীতবড়ী সনমান গ্রেহা সোঁ" ও "হিন্দুনি সোঁ তুরকিনি কহে তুমকো সদাসন্তোষু নহিন তিহারে পতিনপর শিব-সরোজাকী রোষু" ইত্যাদি দোহায় এবং ফুটকল কবিতায়

'উড়িজাত নএ জাত ফুটি ফুটি ফাটি জাত,
মিটি জাত মুরি জাত সুখি জাত গোয়সো'

প্রভৃতি পদ্যরচনায় কবি যে মাধুর্য্য, সারল্য, লালিত্য ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আমাদিগের নিকট অত্যন্ত উপভোগের বিষয় হইয়াছে। কবির রচনা সম্বন্ধে আমরা পত্রান্তরে যে কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি এ স্থানে তাহার পুনরুক্তি করা বোধ হয় অপ্রীতিকর বা বা অনাবশ্যক হইবে না :—

"ভূষণের রচনা প্রাঞ্জল, ভাষা বিশুদ্ধ—প্রধানতঃ ব্রজভাষা, মধ্যে মধ্যে প্রাকৃত, পারসী, আরবী ও বুন্দেল-খণ্ডী শব্দের মিশণ আছে। ভূষণের ছন্দ অতি সুললিত ও শ্রুতিমধুর, তাঁহার শব্দ-সম্ভার, মাত্রা ও যতি বিচার অনুপ্রাস প্রয়োগ ও উপমায় ধ্বনি বিশিষ্ট রচনা-চাতুর্য্যের পরিচয় প্রদান করে। * * কবিভূষণ যুদ্ধ ও যুদ্ধযাত্রা বর্ণনায় যেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় আর কিছুতেই নয়। তাঁহার কবিতায় প্রসাদ ও ওজো-গুণের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ওজোগুণ বীররসের অঙ্গী, সমাস-বহুল সুখপাঠ্য ওজোগুণের কবিতা ভূষণ কাব্যের যথাতথা হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। তাঁহার উপমার বাহারও অতি মনোহর। তাঁহার ন্যায় আর কেহ অল্পকথায় এত অধিক অর্থ বুঝাইতে পারেন কি না সন্দেহ। Brevity is the soul of wit, ভূষণের উপমাই এ কথার সজীব প্রমাণ। ভূষণের কবিতার পৃষ্ঠায়, মধুর ও বীর রসের অপূর্ব্ব মিলন। এই জন্যই কেহ কেহ বলিয়াছেন ভূষণের কবিতায় নবরসের সমাবেশ রহিয়াছে, কিন্তু তাহাতে বীর ও ভয়ানক রসই প্রধান। (১৭) রস কাহার প্রাণে নাই? আমাদের চিত্তে নবরসের ধারা সেতারের তারের ন্যায় একতালে একসুরে সমতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে। যাহার প্রাণে

(১৬) 'He exceled in the tragic, heroic and terrible subjects'—Dr. Grierson.

"রৌদ্র বীর ভয়ানক যে তীনোঁ রস জৈসে ইনকে কাব্যমে হৈঁ ঐসে ঔর কবি লোগোঁ কী কবিতামে নহী পায়ে জাবে"—সিবাসিংহ সেঙ্গর।

(১৭) ভূষণ-গ্রন্থাবলী, বঙ্গবাসী প্রেস, ভূমিকা, ৮৶ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সে সাম্য ভঙ্গ হইয়া ভাববিশেষের আবেগে চিত্ত বিভোর হইয়াছে, সে ভাবোন্মাদে মত্ত হইয়া আমাদের মর্ম্ম-মজ্জাগত যে রসের যে তার সঙ্গীত-বাদ্য-কবিতা-রচনা বক্তৃতা দ্বারা বা শুধু চাহনি-কটাক্ষ দ্বারা স্পর্শ করে, তাহাতে তখন সদ্য সদ্য সেই রসের গানই বাজিয়া উঠে। তখন সেও প্রসন্ন হয়, আমরাও ধন্য হই।" (১৮)

ভূষণ কাব্যে বীর-ভয়ানক-রৌদ্র রসের ভীষণ বজ্র-নির্ঘোষ ও ঝঞ্ঝাবাতের ভিতর শব্দাড়ম্বর ভেদ করিয়া কলাকৌশলজাল ছিন্ন করিয়া, কবির স্বাভাবিকী, ওজস্বিনী, মনোমোহিনী রসধারা পাঠকের প্রাণ আকুল করে। সে কবিতাই বা কি আর সে বনিতাই বা কি, যে পদবিন্যাস মাত্রেই পাঠকের বা দর্শকের প্রাণ হরণ করে না?

জাতীয়তা

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে কবিভূষণ তাঁহার কৃত গ্রন্থে নাম, বংশ, পুত্র পরিবার প্রভৃতি আত্মকথা কিছুই উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার কবিতাবলী আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে আমরা তাহার বর্ণে বর্ণে ছত্রে ছত্রে কবির সাক্ষাৎ পাই। কবিতা রসাত্মিকা আত্মগত কথা। কবির ব্যক্তিত্ব আমরা তাঁহার বীররসাত্মক বাক্যের ভিতর দর্পণে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাই। তাঁহার নির্ভীকতা, তাঁহার স্পষ্টবাদিতা, তাঁহার সাহস ও তেজস্বিতা, তাঁহার জাতীয়তা ও স্বদেশ প্রেম, তাঁহার স্বধর্ম্মানুরাগ ও স্বাধীনতা-স্পৃহা, তাঁহার সৌর্য্য বীর্য্য ও দৃঢ়তা তাঁহার ভাষা ও ছন্দের ভিতর ফুটিয়া উঠিয়াছে। কার্য্যে ও বাক্যে পুনঃ পুনঃ উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়া ন্যায়ের পরিবর্ত্তে পক্ষপাত, সহানুভূতির পরিবর্ত্তে বিদ্রূপ এবং ক্ষমার পরিবর্ত্তে কঠোরতা দ্বারা জর্জ্জরিত হইয়া উত্তর-পশ্চিম ভারতের হিন্দুর প্রাণে অল্প বিস্তর একটা প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে মিশ্র-কুটিল ভাব ভাষায় ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা ও সাহস কাহারও ছিল না। কবিভূষণ সেই ভাবের চরমোৎকর্ষ আপন প্রাণে অনুভূত ও আয়ত্ত করিয়া তাঁহার অলৌকিক কণ্ঠস্বরে ও স্বর্গীয় বাণীতে তাহার আকার দিয়া জনসমাজের ব্যবহারিক জীবনে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য তিনি তাৎকালিক হিন্দু সমাজের প্রাণ ও অনুভবশক্তি, চক্ষু ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, ভাষা ও কণ্ঠধ্বনি এবং যুগ প্রতিনিধি বা representative (১৯) স্বরূপ।

আদর্শ

কবিভূষণ তাঁহার হৃদয়ের আবেগ ও ভাবের উচ্ছ্বাস বক্ষপঞ্জরের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বলপূর্ব্বক আবদ্ধ করিয়া রাখিতে অসমর্থ হইয়া যখন অন্তরের ধ্বনির ও আদর্শের প্রতিধ্বনি ও প্রতিমূর্ত্তির নিমিত্ত আকুল হইয়া বাহিরে ইতস্ততঃ নয়ন সঞ্চালন করিয়াছিলেন, তখন সৌভাগ্যবশে সুখস্পর্শ মলয় মারুত এক জনের যশোগাথা বহন করিয়া বিন্ধ্যশৈল লঙ্ঘন করিয়া কবির প্রাণে দীর্ঘ শিশির শেষে নববসন্ত সমাগমে নবজীবনের বার্ত্তা কুহরিয়া কহিয়া গিয়াছিল। তিনিও মহাপুরুষ, যুগপ্রতিনিধি, কর্ম্মবীর, জাতীয় জীবনের ভাগ্য বিধাতা। কবির উৎসুক প্রাণ আদর্শ অন্বেষণে সফল হইয়া উৎফুল্ল-চিত্তে তাঁহার পার্শ্বে ছুটিয়া গিয়াছিল এবং আনন্দে বিহ্বল হইয়া সমস্ত দেহ মন প্রাণ ভাষার ধ্বনিতে নিঃশেষ ও ব্যক্ত করিয়া নটবর শিবের তাণ্ডব নৃত্যের তালে তালে ডমরুবাদ্য করিয়াছিল। (২০) স্থান-কাল-পাত্রের তেমন সামঞ্জস্য থাকিলে,তেমন সঙ্গীতের ঝঙ্কার মহাপ্রলয়েও লয় পায় না। কবি তাঁহার আদর্শের যে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সচন্দন ভক্তি শ্রদ্ধার কুসুমাঞ্জলিতে সাজাইয়া তাঁহার গ্রন্থের ঐতিহাসিক উপাদানের বিল্বদলে আবৃত করিয়া স্বদেশবাসীর স্মৃতির মন্দিরে প্রতিষ্ঠা

(১৮) বিজয়া অগ্রহায়ণ, ১৩২০।

(১৯) "ভূষণজী পুরে জাতীয় কবি থে ঔর টেনিসনকী ভাঁতি ইন্‌হেঁ ভী প্রতিনিধি কবি কহনা চাহিয়ে।"—ভূষণ গ্রন্থাবলীর ভূমিকা, নাঃ প্রঃ সঃ সংস্করণ, ৭১ পৃঃ।

(২০) মেরো পরম ধর্ম্ম এক তেরে গুণ গাইবেকো
তেরো পরম ধর্ম্ম ম্লেচ্ছহীন মহি কীবেকো॥
—কবিচিরজীব কবিতা ১৫।

করিয়া গিয়াছেন, তাহা সন্দেহবাদীর নির্ম্মম উপেক্ষা ও অনাদর উপহাস করিয়া অক্ষত, অনবদ্য ও চিরপবিত্র থাকিবে।

চরিত্র ও বিশেষত্ব

কবি ভূষণের চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিতে যাইয়া আমরা একবার যাহা বলিয়াছি, এবারও তাহার প্রতি· ধ্বনি করিতেছি। মহাকবি ভূষণ ত্রিপাঠী অসাধারণ স্বদেশ প্রেমিক, স্বাধীনতা প্রিয়, আত্মনিভরশীল, নির্ভীক বীরপুরুষ ছিলেন। সার্ব্বভৌম সম্রাট অদ্বিতীয় প্রতাপশালী ঔরঙ্গজেবের মুখের সম্মুখে প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া উচিত কথা বলিতে যদি তিনি সাহসী হইয়া থাকেন, আত্মসম্মান ও অভিমানের জিদ বজায় রাখিতে অভাব-গ্রস্ত হইয়াও যদি তিনি লক্ষ মুদ্রায় পদাঘাত করিয়া থাকেন, দিল্লীর প্রাচীর তলে 'কেশর' অশ্বপৃষ্ঠে যুবক ভূষণ যদি দিল্লীশ্বরকে অভিবাদন না করিয়া বীরদর্পে উত্তর প্রত্যুত্তর করিয়া থাকেন, (২১) আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ ছাড়িয়া দিল্লী-দরবারের ধন মান যশের মায়া পরিহার করিয়া সংসার সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া যদি তাঁহার কবিপ্রতিভা সুদূর পার্ব্বত্য দক্ষিণ দেশে নিঃস্বার্থভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র অন্বেষণ করিতে গিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার প্রাণের কথা যে জগতের মর্ম্ম স্পর্শ করিবে তাহা আর বিচিত্র কি? নয়নের অশ্রু, হৃদয়ের শোণিত, প্রাণের অনুভূতি দ্বারা যে কবিতা রচিত, তাহা শ্রবণ করিলে কাহার না চিত্ত বিগলিত হইবে? ভূষণের প্রতিভা অকপট সরল, স্বচ্ছ, স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল। তিনি কখনও আত্ম-গোপনের চেষ্টা করেন নাই, অন্তরের ভাব গোপন করিয়া বাহিরে বহুরূপী সাজেন নাই, কবিতা লিখিবার জন্য হস্ত মক্শ করিয়া কষ্ট কল্পনা করেন নাই কক্ষান্তর অমান্তর দেশান্তর হইতে স্বদেশানুরাগ উদ্ধার করিয়া আনেন নাই, আপন স্বার্থ সুরক্ষিত করিয়া অবসর মত জন্মভূমিকে ভালবাসেন নাই। তিনি গান গাহিতেন যেহেতু গান আসিত, তাই ভূষণ মহাকবি—স্বভাব কবি। তাঁহার কাব্য ও ছন্দ সমালোচনা করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই, অতি অল্প লোকেরই আছে। তাঁহার রচনা বুঝিতে হইলে, কেবল পড়িতে হইবে এবং মোহিত হইতে হইবে এবং বিস্ময়-বিহ্বল চিত্তে বলিতে হইবে—

"তোমারি তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে।"

ভূষণের জীবনের আদর্শ, কবিত্বের উৎস প্রতিভার পুরোহিত, মরাঠা-বীর-কেশরী শিবাজীর চিত্র তাঁহার নিপুণ তুলিকায় কিরূপভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর চিত্রিত হইয়াছে, সে কথার আলোচনা আমরা ভবিষ্যতের অবসরের অপেক্ষায় রাখিয়া আজ ভক্তি-শ্রদ্ধা বিস্ময়ভরে নীরবে তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতির চরণে মস্তক অবনত করিতেছি। *

শ্রীরসিকলাল রায়।

(২১) ভূষণ গ্রন্থাবলী ভূমিকা বঙ্গবাসী প্রেস ||/• পৃঃ দ্রষ্টব্য।

* গত ৬ই বৈশাখ বুধবার "মানসী ও মর্ম্মবাণী" সম্পাদক মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের সভাপতিত্বে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে পঠিত।—লেখক।

বৈদেশিকী

রুসিয়া।

কয়েক মাস হইল এল্. জি. রেডমণ্ড-হাউয়ার্ড নামক একজন ইংরেজ রুসিয়া সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যদি বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মানি ভূমিসাৎ হয়, তাহাতে ইংলণ্ডের ষোল আনা আনন্দের কারণ নাই, কেননা জার্ম্মান জুজু একেবারে কুঁপোকাৎ হইলে, ইংলণ্ড ও রুসিয়া এই দুই সতীনে আবার চুলোচুলি বাধিবে। কৃষ্ণ-সাগর হইতে ভূমধ্য সাগরের পথে, এবং পারস্য ভেদ করিয়া ভারতবর্ষের দিকে, রুস প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা হইলেই, ইংলণ্ড ও রুসিয়ার "প্রেম তরঙ্গে রঙ্গ নানা" দেখা দিবে। ("What the breaking of French power might be to England, the breaking of German power might also be, leaving Russia and England to continue the rivalry on the Near East at no far distant date—an eventuality which has not escaped General Bernhardi.")

বল্টিক সাগরের প্রভুত্বকল্পে রুসিয়া সুইডেনের নিকট হইতে ফিনলাণ্ড আদায় করিয়াছে এবং কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলের লোভে তুর্কির সহিত রাবণের চুল্লী জ্বালাইয়াছে। ভারতবর্ষের গন্ধে রুস-ভল্লুক তাতার দেশ কুক্ষিগত করিয়া হিমালয়ের আসে পাশে উঁকি মারিতেছে, এবং চীন ও জাপানের মুণ্ডপাত করিবার জন্য তাহার কোনও অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয় নাই। শ্বেত মানবের ভার ("White man's burden") বাড়াইবার জন্য রুসিয়ানের কোনও কালে ছল বল ও কৌশলের অভাব হয় নাই। ফিনলাণ্ড, পোলাণ্ড, তুরুস্ক, তাতার ও পারস্যে রুসিয়ার অভিলাষ চরিতার্থ হইয়াছে। জাপানের শক্ত ঘানির চোটে তাহার সহিত "ভাই-ব্রাদার" পাতাইতে বাধ্য হইয়াছে।

রুসিয়া সাম্রাজ্য ভূপৃষ্ঠের স্থলভাগের প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ অধিকার করিয়া আছে। ইহার আয়তন প্রায় নব্বুই লক্ষ বর্গ মাইল—অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রায় সাত গুণ, জার্ম্মানির প্রায় একচল্লিশ গুণ, জাপানের প্রায় পঞ্চাশ গুণ এবং গ্রেট্ ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের প্রায় বাহাত্তর গুণ। রুসিয়া সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা সাড়ে ষোল কোটির উপর—অর্থাৎ জার্ম্মানির কিয়দধিক আড়াই গুণ, জাপানের কিয়দধিক তিন গুণ, অষ্ট্রিয়ার প্রায় সওয়া তিন গুণ, গ্রেট্ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের প্রায় পৌনে চার গুণ, এবং ফ্রান্সের কিয়দধিক চার গুণ। রুসিয়ার রাজধানী পেট্রোগ্রাডে প্রায় কুড়ি লক্ষ, ভূতপূর্ব্ব রাজধানী মস্কোতে প্রায় পৌনে বার লক্ষ, ওয়ার্সায় কিয়দধিক সাড়ে সাত লক্ষ, এবং অডেসায় প্রায় সাড়ে চার লক্ষ লোকের বাস।

রুসিয়া দেশে রুসিয়ান ভিন্ন পোল, ইহুদী, ফিন, তাতার, লিথুনিয়ান প্রভৃতি অনেক জাতির বাস। Witte-এর ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী উদার-প্রকৃতি মন্ত্রীরা ঐ সকল জাতির জাতীয়তা ও ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া রাজ্য শাসন করিতে চাহেন। আবার Plehve-এর ন্যায় উদ্ধত ও সঙ্কীর্ণচেতা মন্ত্রীরা বিভিন্ন জাতির মধ্যে অবিশ্বাস-বীজ বপন করিয়া তাহাদের ঐক্যপথে বাধা দিয়াছেন। এই কূটনীতির অবশ্যম্ভাবী ফল অশান্তি ও বিদ্রোহ। অনেকের ধারণা যে অন্তর্বিপ্লবের স্রোত ভিন্ন পথে চালিত করিবার মানসে, রুসিয়ার অনেকে জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। ("It was partly to turn the attention outward, so it was said, that Russia in 1904 declared war upon Japan.")।

অন্তর্বিপ্লব নিবারণের জন্য গত কয়েক বৎসরে রুসিয়ার শাসন-প্রণালী প্রজাতন্ত্র করা হইয়াছে। রুস-

জাপান যুদ্ধের পূর্ব্বে রুসিয়ার স্বেচ্ছাচারী সম্রাটেরা, প্রজার হস্তে নিহত হইবার ভয়ে, মধ্যে মধ্যে একটু নরম সুর ধরিতেন। রুসিয়ান লেখকেরা ইহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিত autocracy tempered by assassination অর্থাৎ "গুতার চোটে বাবা বলা"।

রুসিয়া সাম্রাজ্যে সাড়ে-আট কোটি গ্রীক অর্থোডক্স চার্চ সম্প্রদায়ের খৃষ্টান, এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ মুসলমান, এক কোটি পনের লক্ষ রোমান ক্যাথলিক, পঞ্চাশ লক্ষ ইহুদী ও পাঁচ লক্ষ বৌদ্ধ বাস করে। "Dissidents," "Armenian Gregorians" ও "Lutherans" সম্প্রদায়ের খৃষ্টানের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ পঁয়ষট্টি লক্ষ। রুসিয়ার অর্থোডক্স চার্চের অনেক বিষয়ে রোমান ক্যাথলিকদের সহিত মিল আছে, কিন্তু তাঁহারা রোমের পোপকে অভ্রান্ত মনে করেন না। একাদশ শতাব্দীতে রোমান ক্যাথলিকদের এক দল গ্রীক অর্থোডক্স চার্চ স্থাপন করে। ১২৭৪ খৃষ্টাব্দে লায়ন্সের এবং ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে ফ্লরেন্সের ধর্ম্মসংসদে দুই পক্ষের একীকরণের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। ধর্ম্মের নামে রুসিয়ায় অনেক অধর্ম্মাচরণ হইয়াছে—খৃষ্টানরা ইহুদীদিগকে ধনে প্রাণে মারিয়াছে।

যে রুসিয়ার দাপটে এখন তাতার পর্য্যুদস্ত ও চীন ব্যতিব্যস্ত, সেই রুসিয়াই ১২৩৮ হইতে ১৪৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মঙ্গোলিয়ানদের অধীনে ছিল। ১৬০৯ সালে পোল জাতি রুসিয়ানদিগকে পরাজিত করে এবং পোলাণ্ডের রাজকুমার রুসিয়ার সিংহাসন লাভ করেন।

১৬৮৯ হইতে ১৭২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পিটার দি গ্রেট রুসিয়ার সম্রাট ছিলেন। সুইডেন, পোলাণ্ড ও তুর্কিকে পরাজয় করিয়া তিনি রুস-সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তার করেন। তিনিই রাজধানী সেণ্ট্ পিটার্সবার্গের (বর্ত্তমান পেট্রোগ্রাড) প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার উপপত্নী (ভবিষ্যতে পত্নী) ক্যাথেরিন তাঁহার মৃত্যুর পর রুসিয়ার রাণী হন। প্রথম ক্যাথেরিনের পর দ্বিতীয় ক্যাথেরিন, স্বামীকে হত্যা করিয়া, রুস রাজ্যের অধীশ্বরী হন। চরিত্র হিসাবে শূকরীর অধম হইলেও, রাজ্যশাসনে ইঁহাদের দক্ষতা অতুলনীয়া ছিল।

১৮০১ সালে প্রথম পল নিহত হইলে, প্রথম আলেক্জণ্ডর রুসিয়ার সম্রাট হন। তিনি ১৮০৯ সালে সুইডেনের নিকট হইতে ফিনলাণ্ড প্রদেশ ও এলাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ আত্মসাৎ করেন, ১৮১২ সালে তুর্কির কবল হইতে নিষ্টার ও প্রাথ নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশগুলি উদ্ধার করেন, এবং ১৮১৩ সালে পারস্যের নিকট হইতে ডাগেষ্টান, বাকু ও শার্ভানি প্রদেশত্রয় জয় করেন। তিনি অষ্ট্রিয়া-রাজের সহিত মিলিত হইয়া ফ্রান্সের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে, নেপোলিয়ান ১৮১২ সালে রুসিয়া আক্রমণ করেন।

নেপোলিয়ানের অধঃপতনের পরে, ১৮১৫ সালে, ভিয়েনা নগরে এক রাষ্ট্রনৈতিক বৈঠক বসে। তাহার ফলে রুস-সম্রাট পোলাণ্ডের রাজা এই উপাধি প্রাপ্ত হন।

রুসিয়া ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে আর্মিনিয়া এবং ১৮২৯ সালে ককেশস্ প্রদেশ অধিকার করে। ১৮৪৮-৪৯ সালে, হাঙ্গেরির স্বদেশ-বৎসলদিগের অভ্যুত্থান দমনে, রুসিয়া অষ্ট্রিয়াকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। ১৮৫৩ সালে কৃষ্ণসাগরের তীরস্থ ক্রীমিয়ায়, রুসিয়ার সহিত ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও তুরুস্কের যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

১৮৬১ সাল রুসিয়ার একটি স্মরণীয় বৎসর। ঐ বৎসরে সম্রাট দ্বিতীয় আলেক্জণ্ডর রুসিয়ার দাস (Serf) দিগকে স্বাধীনতা দেন। বহুকাল ধরিয়া রুসিয়ার কৃষকেরা জমিদারদিগের আসবাব পত্রের মতন ছিল। ঐ বৎসর ৩৫০,০০০,০০০ একার (এক একার = তিন বিঘা আধ কাঠা) ভূমি, রাজাজ্ঞায় জমিদারের হস্ত হইতে দাসদিগের অধিকারে আসে।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে পোলজাতি বিদ্রোহী হইলে, রুসিয়া ক্রমে ক্রমে পোলাণ্ডের চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দেয়। ১৮৬৪ সালে পোলাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উহার জাতীয় ভাষা নির্ব্বাসিত হয়। অদ্যাপিও পোল-রুসিয়ানের আহি-নকুল সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

১৮৬৪ সাল হইতে জাপান সাগরের তীরে বন্দর স্থাপনের জন্য রুসিয়া বদ্ধ-পরিকর হয়। য়ুরোপবাসী অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে জাপানকে নগণ্য মনে করিত; চীন তখন জড়ভরত; কাজেকাজে জাপানের নাকের উপর ভ্লাডাইভষ্টক (Vladivostok) বন্দর পত্তন করিতে রুসিয়াকে বেগ পাইতে হয় নাই।

১৮৭৭ সালে রুসিয়া ও তুরস্কে যুদ্ধ বাধিলে, ১৮৭৮ সালের প্রারম্ভে রুসিয়ান সৈন্য কনষ্টাণ্টিনোপলের অনতিদূরে উপস্থিত হয়। ঐ নগর রুসের হস্তে যাইলে তাহার প্রভাব অপ্রতিহত হইবে, এই ভয়ে য়ুরোপের বড় পাণ্ডারা ("Great Powers") হঠাৎ তুর্কির প্রেমে অন্ধ হইয়া রুসিয়াকে বলিলেন, খবরদার, কনষ্টাণ্টিনোপল তোমার ভ্রাতৃবধূ। এইবার রুসিয়ার বাড়া ভাতে ছাই পড়িল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে য়ুনাইটেড ষ্টেট্‌সের সঙ্গে আলাস্কা প্রদেশ লইয়া বোঝাপড়া হইয়া, যেমন আমেরিকান-রুস যুদ্ধের সম্ভাবনা লুপ্ত হইয়াছে, ১৮৭৮ সালে কনষ্টাণ্টিনোপলের ভ্রাতৃবধূত্ব না ঘটিলে, বোধ হয় ভবিষ্যতের বল্কান যুদ্ধের অঙ্কুরোৎপাটন হইত। ("The pivot around which Russian policy rotates at the present moment is Pan-Slavism—which is far nearer realisation and possibly far more dangerous than Pan-Germanism to the other nations of Europe.")

কয়েক বৎসর হইতে রুসিয়ায় বিপ্লববাদীদের সংখ্যা বাড়িতেছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বোমার আঘাতে সম্রাট দ্বিতীয় আলেক্‌জণ্ডর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

১৮৮৪ সালে রুসিয়া মার্ভ প্রদেশ অধিকার পূর্ব্বক আফগানিস্থানের দিকে অগ্রসর হইলে, বৃটিশ সিংহ ও রুস ভল্লুকে নখানখি দন্তাদন্তি হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

বলকান লইয়া জার্ম্মানি ও অষ্ট্রিয়ার সহিত এবং ভারতবর্ষ লইয়া ইংলণ্ডের সহিত মনান্তর ঘটিলে, রুসিয়া একটি প্রবল মিত্র জুটাইবার জন্য ব্যস্ত হয়। ১৮৭০ সাল হইতে, জার্ম্মানির ভয়ে আড়ষ্ট ফ্রান্সের, একজন সহকারীর প্রয়োজন হইয়াছিল। পারিস প্রদর্শনী উপলক্ষে রুস-সম্রাট ফ্রান্সে উপস্থিত হইয়া উহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। ১৮৮৭ সালে জার্ম্মানি, অষ্ট্রিয়া ও ইটালি দলবদ্ধ হওয়াতে, ফ্রান্স ও রুসিয়ার কুটুম্বিতা অত্যাবশ্যক হইতেছিল।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান সম্রাট নিকলাস রুসিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে য়ুরোপীয় রুসিয়া হইতে সাইবিরিয়ার ভিতর দিয়া জাপান সাগর পর্য্যন্ত রেল পাতা হইয়াছিল। জাপানের সহিত যুদ্ধে চীন দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, রুসিয়া বলে ও কৌশলে মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ হস্তগত করে, এবং সুবিখ্যাত পোর্ট আর্থার বন্দরে আধুনিক প্রণালীতে দুর্গ নির্ম্মাণ করে।

রুসিয়ার কাণ্ডে জাপানের প্লীহা চমকাইল। আবেদন ও নিবেদন ব্যর্থ হইলে, ১৯০৪ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৯০৫ সালে রুসিয়া জাপানের নিকট সম্পূর্ণভাবে পরাজয় স্বীকার করে।

১৯০৭ সালে রুসিয়া ও ইংলণ্ডের সন্ধির ফলে, পারস্য ও আফগানিস্থানে পরস্পরের প্রভাব বিস্তারের সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়। য়ুরোপে ১৯০৭ হইতে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত দুইটি প্রধান দল ছিল—ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুসিয়া ("Triple Entente") এবং জার্ম্মানি, অষ্ট্রিয়া ও ইটালি (Triple Alliance)। ১৯১৫ সাল হইতে ইটালি ভিন্ন গোত্র অবলম্বন করিয়াছে।

উত্তর মহাসাগরে বরফের স্তূপ, প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানি, পারস্য উপসাগরে ইংরেজ, এবং ভূমধ্য-সাগরে ইংরেজ ও ফরাসী, ঘাটি আগলাইয়া আছে। এই সকল সমুদ্র-পথে রুসিয়ার হাত-পা বাঁধা। সুবিধা হইলেই রুসিয়া সুইডেন ভেদ করিয়া আটলাণ্টিকের দিকে পথ খুঁজিতে পারে, য়ুরোপের এ আশঙ্কা ভিত্তিহীন নহে।

রুসিয়ার বন্দর চারি দিকে—জাপান-সাগরের তীরে ভ্লাডাইভষ্টক, কাস্পিয়ান হ্রদের তীরে বাকু ও অষ্ট্রাকান, কৃষ্ণ-সাগরের তীরে অডেসা, উত্তর মহাসাগরের তীরে আর্কেঞ্জেল, এবং বল্টিকের আসপাশে

ক্রনষ্টাট্, রেভল্ ও হাঙ্গো। রুসিয়া সাম্রাজ্যের দুই পঞ্চমাংশে জঙ্গল ও এক পঞ্চমাংশ অনুর্ব্বর; কিন্তু বাকি দুই-পঞ্চমাংশ জমিতে এত অধিক পরিমাণে গম, যব, যই প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হয়, যে দৈনিক উদর-পূর্ত্তির জন্য, রুসিয়া ইংলণ্ডের ন্যায় পরমুখাপেক্ষী নহে। ভলগা, ডন, নীপার প্রভৃতি নদীর কল্যাণে, রুসিয়ার একস্থান হইতে স্থানান্তরে মাল চালান দিবার অত্যন্ত সুবিধা। ("With every kind of raw material within her boundaries, she is always independent of hostile tariffs; with great centres of population and well-distributed waterways, she can dump dowr her produce upon any coast, without the expense of continued handling.")

রুসিয়ার খনিতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ ও কয়লা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কেরোসিন প্রভৃতি জ্বালানি তৈলের ব্যবসায়ে রুসিয়ার প্রভূত অর্থাগম হয়। যুদ্ধের পূর্ব্বে এক বৎসরে প্রায় বার কোটী ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের (এক পাউণ্ড=পনের টাকা) মাল আমদানি, এবং প্রায় ষোল কোটী পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছিল। Vodka নামক মদ্য রুসিয়ানদের অত্যন্ত প্রিয়। ঐ দেশে প্রায় তিন সহস্র খোলাভাটি আছে, তথায় বৎসরে ১২৫,০০০,০০০ গ্যালন মদ তৈয়ারি হয়। যুদ্ধ বাধিবার পর রুস-সম্রাট সুরার প্রচলন এক প্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

লক্ষ লক্ষ রুসিয়ান তাহাদের সম্রাটকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করে। আবার নাইহিলিষ্ট (Nihilist) সম্প্রদায়ভুক্ত শত শত রুসিয়ান, জার ও তাঁহার সন্তান-দিগের প্রাণবিনাশের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। রুসিয়ার বর্ত্তমান অবস্থায় সহসা সম্রাটবংশের তিরোভাবে কল্যাণ অপেক্ষা অমঙ্গলের সম্ভাবনাই অধিক। অসংখ্য লোকের মুড়ুলিতে যে অরাজকতা উপস্থিত হয়,তাহা জারের দোষ-সঙ্কুল শাসনের অপেক্ষা বিপজ্জনক। এ সম্বন্ধে"Fall of Tsardom" প্রণেতা Carl Joubert লিখিয়াছেন :—

"By making an end of the Romanovs at the present time, they would be playing into the hands of the secret societies and terrorists, who are today endeavouring to produce chaos in Russia. For the despotism of autocracy would be substituted the anarchy of the mob.")

রুসিয়ায় শিক্ষা বিস্তার ইংলণ্ড অপেক্ষা অনেক অধিক। বিলাতী সাহিত্যে সুপণ্ডিত রুসিয়ানের সংখ্যা, রুসিয়ান সাহিত্যে অভিজ্ঞ ইংরেজের দশ গুণ। রুসিয়ার তুলনায়, বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ে, খেলা ধূলায় ও বিশেষজ্ঞ হইবার প্রয়াসে, প্রচুর সময় ব্যয়িত হয়। রুসিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বর্ত্তমানকে অগ্রাহ্য করিয়া অতীত-সর্ব্বস্ব হয় না—আধুনিক জীবনের সমস্যা বিধানে তাহারা একান্ত মনোযোগী। ("For ten Russian university students who could quote Mill and Spencer, not one English under-graduate could do more than say he had read *Anna Karenina* and *Resurrection*—let alone display a knowledge of European politics and diplomacy. ... ... In England the 'varsity days are spent in a sort of backwater of life, with an eternal round of meaningless specialist studies, and often still more meaningless exercise of body. In Russia, ... the Universities are the very centre of active thought, ... they are the advance guard of all reform.")।

রুসিয়ার অভিজাত সম্প্রদায়ের সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ। ঐ দেশের বনিয়াদি বংশের অনেকেরই কোনও উপাধি বা জমিদারি নাই। বিলাতের অভিজাত সম্প্রদায় মোটের উপর রক্ষণশীল, কিন্তু রুসিয়ার সম্ভ্রান্ত বংশীয়েরা সর্ব্ববিধ সংস্কারের নেতা। ("Their position does

not, as with us, depend upon a title. ... Nobility does not depend upon property, some having very little. ... ... In Russia the noble is almost every tenth man in the street.")

টলষ্টয় (Tolstoy), টুর্গেনিয়েফ্ (Turgueniev), ডাষ্টায়িয়েফ্স্কি (Dostoievsky) এবং গোর্কি (Gorky) এই চারিজন লোকবিশ্রুত গ্রন্থকার যে মধুচক্র রচনা করিয়াছেন, তাহাতে রুসিয়ান "আনন্দে করিছে পান সুধা নিরবধি"। টলষ্টয়ের "Anna Karenina," "Kreutzer Sonata," "Resurrection," টুর্গেনিয়েফের "Dream Tales," Fathers and Children," "The Jew," ডাষ্টায়িয়েফ্স্কির "Crime and Punishment," "The Brothers Karamazoff," "The Idiot," গোর্কির "The Outacst," "Creatures that once were Men" প্রভৃতি গ্রন্থ, য়ুরোপের লক্ষ লক্ষ নরনারীকে এক অভিনব সম্পদের অধিকারী করিয়াছে।

রুসিয়ান কথা-সাহিত্য সম্বন্ধে এক জন পাশ্চাত্য সমালোচক বলিয়াছেন:—"In one and all of these we see as it were the soul of Russia, prostrate in her grief, but ever soaring in her ambitions, a country terrible yet lovable, capable of any heroism and any crime—in a word the melting pot of Europe". অর্থাৎ টলষ্টয়াদির গ্রন্থপাঠে প্রতীয়মান হয় যে নিদারুণ যন্ত্রণায় মর্দ্দিত হইয়াও রুসিয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পিষ্ট হয় নাই; ঐ দেশ ভীষণ হইলেও মনোজ্ঞ; উহার মনোরাজ্যে ক্রোধলোভাদি যেমন দুর্দ্দম, ভক্তি করুণাও তেমনি বলবতী। রুসিয়া য়ুরোপের মুষা—তথায় য়ুরোপীয় চিন্তা ও ভাবের সর্ব্বপ্রকার ধাতু দ্রবীভূত হইয়া একত্র হইতেছে।

শ্রীগৌরহরি সেন।

তীর্থভ্রমণ

মথুরা।

আজমীর হইতে রাত্রি দশটার সময় আমরা ডাকগাড়ীতে উঠিলাম। রাজপুতানা-মালবা রেলওয়ের গাড়ীগুলি ছোট ছোট—তাহার উপর গাড়ীর সংখ্যা কম থাকাতে ও ইণ্টার ক্লাস না থাকাতে ভীড় অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। সুতরাং ঘুমাইবার স্থান আমরা মোটেই পাইলাম না। কষ্টে স্বষ্টে মার জন্য একটু শয়নের জায়গা ঠিক করিয়া দিয়া আমরা তিনজন বসিয়া বসিয়া গল্প করিয়া রাত কাটাইয়া দিবার অভিপ্রায় করিলাম। করুণা বাবু বসিয়া বসিয়া সিগারেটের ধূমে নিদ্রাদেবীকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। আমাদের পাশেই একটি পশ্চিম দেশবাসী লোক বসিয়াছিল। হঠাৎ তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম সে করুণাবাবুর মুখের পানে ঘন ঘন দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছে। কিছুক্ষণ মনোনিবেশ করিয়া দেখিলাম, সে করুণাবাবুর সিগারেটের দিকে লুব্ধনেত্রে তাকাইতেছে। বোধ হয় লোকটা ধূমপায়ী, সঙ্গে যন্ত্রপাতি নাই। করুণাবাবুকে বলিলাম, বোধ হয় ও লোকটি সিগারেট চায়। করুণাবাবু পকেট হইতে সিগারেটের বাক্স বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে ধরিলেন। সে অমনি ব্যস্ত হইয়া বলিল—"নেহি নেহি, আপ পীজীয়ে।" করুণাবাবুর হিন্দী ভাষাজ্ঞান তথৈবচ—তিনি উত্তর করিলেন—"আরে আরে, আপ পীজীয়ে—হাম তো হরদম্ পীজীয়ে।" তাঁহার

এই অদ্ভুত হিন্দী শুনিয়া গাড়ী শুদ্ধ লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। একে একে ক্রমশঃ আসিয়া করুণাবাবুর সহিত আলাপ করিতে লাগিল।

সমস্ত রাত্রি বসিয়া কাটাইয়া দিয়া, পরদিন বেলা ৮ টার সময় আচনেরা ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিয়া আমরা মথুরাগামী গাড়ীতে চড়িলাম। মথুরার গবর্ণমেণ্ট হাঁসপাতালের ডাক্তার শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের নামে করুণাবাবু পরিচয় পত্র আনিয়াছিলেন। মথুরা ষ্টেশনে নামিয়া পাণ্ডার হাত হইতে পলাইয়া আমরা একেবারে ডাক্তার বাবুর বাড়ী উপস্থিত হইলাম। ডাক্তার বাবু তখন হাঁসপাতালে ছিলেন—তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সান্যাল আমাদের আদর অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র অজয়কুমারও তখন এই খানেই অবস্থিতি করিতেছিলেন।



যমুনা-ব্রিজ হইতে মথুরার দৃশ্য।

মথুরার কূপের জল লবণাক্ত, মুখে দেওয়া যায় না। যমুনার তীরে মথুরা নগরী—যমুনার জল নির্ম্মল—অথচ সহরের ভিতরে কূপের জল কেন লবণাক্ত তাহা বুঝিলাম না।

মথুরা অতি প্রাচীন সহর। বৌদ্ধধর্ম্মের উত্থান আরম্ভ হইলে ইহা ঐ ধর্ম্মাবলম্বিগণের একটি কেন্দ্র ছিল। সুদূর চীন হইতে পরিব্রাজকগণ আসিয়া ভারতের যে ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন—তাহাতে মথুরার উল্লেখ আছে। ফা-হিয়ান ৪০০ খৃষ্টাব্দে ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, তখন মথুরা নগরী ও উপকণ্ঠে কুড়িটি মঠ (Monastery) ছিল—তাহাতে তিন সহস্র সাধুসন্ন্যাসী বাস করিতেন। ছয়টি স্তূপও তখন নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার প্রায় দুইশত বৎসর পরে হিউএন সাং যখন এদেশে আসেন—তখন মথুরা নগরীর পরিক্রমা ছিল দুই ক্রোশ। তখন এখানে দুই সহস্র বৌদ্ধসন্ন্যাসী বাস করিতেন ও পাঁচটি হিন্দু দেবমন্দির ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের তখন অবনতি আরম্ভ হইয়াছে।

ইহার পর একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মথুরার কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না। ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর মামুদ নবম বার ভারত আক্রমণ করিবার সময় মথুরা ধ্বংস করেন। কুড়িদিন ধরিয়া এই ধ্বংসকার্য্য চলিয়াছিল।

ইহার পর আবার আকবরের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত কোন সম্পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যায় না।

মথুরা নগরীর এমনই দুর্ভাগ্য যে, যখনই ইহা কোনও মুসলমান রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তখনই ইহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সিকান্দার লোদী মথুরা হইতে হিন্দুধর্ম্মের চিহ্ন লোপ করিয়া দেন। বড় বড় মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহার উপর সরাই নির্ম্মাণ করেন। প্রস্তর-নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি, গোমাংস

বিক্রয়ের বাটখারা স্বরূপ ব্যবহার করিবার জন্য কসাই-দিগকে দান করিয়াছিলেন। সমস্ত হিন্দুর মস্তক ও শ্মশ্রু মুণ্ডন নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

ঔরঙ্গজেবের সহিত মথুরার ইতিহাস দুই-স্থানে সংশ্লিষ্ট। ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ সুলতান এখানে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দারার বিরুদ্ধে মোরাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিবার পর মোরাদকে সুরাপান করাইয়া উন্মত্ত করাইয়া দিয়া ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বন্দী করেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে উচ্চি নিবাসী বীরসিংহ-দেব বুন্দেলা তেত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইহা হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী ঔরঙ্গজেবের সহ্য হইল না। তিনি ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরের বিরুদ্ধে এক সমরাভিযান করিয়া নিজে মথুরা আসিলেন। এই দেবমন্দির ধ্বংস করিয়া মহামূল্য মণিমাণিক্যখচিত ছোটবড় মূর্ত্তি আগ্রায় লইয়া গিয়া নবাব কুদশিয়া বেগমের মসজিদের সোপানাবলীর তলে নিহিত করিয়া রাখিলেন—উদ্দেশ্য যাহাতে প্রতিদিন এই পবিত্র হিন্দু-মূর্ত্তির উপর মুসলমানের পদধূলি পড়ে। শুধু ইহাতে ঔরঙ্গজেব ক্ষান্ত না হইয়া মথুরার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিবার চেষ্টায় ছিলেন। তিনি ইহার ইসলামাবাদ নামকরণ করিয়াছিলেন - কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। হিন্দুস্থানের হিন্দুর পবিত্র তীর্থস্থানকে লোকে পুরাণোক্ত সেই মথুরা বলিয়াই জানে।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর পঞ্চাশ বৎসর মথুরা বিশ্রামলাভ করিয়াছিল। তাহার পর আবার আহমদ সা দুরাণী মথুরা ধ্বংস করিলেন।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে মথুরা বৃটিশ্ রাজত্বাধীন হয়। তাহার পর বিদ্রোহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মথুরার ভাগ্যে আর কোনও নিগ্রহ ঘটে নাই। মিউটিনির সিপাহীরা মীরাট হইতে দিল্লী যাইবার পথে এখানে দুইদিন ছিল। দিল্লী হইতে ফিরিবার পরে সপ্তাহখানেক ছিল—কিন্তু তাহারা মথুরার বিশেষ কিছু অনিষ্ট করে নাই।

হিন্দু তীর্থস্থানগুলির মধ্যে বিধর্ম্মী-হস্তে মথুরার যতবার ও যতদূর অনিষ্ট হইয়াছে আর কোনও তীর্থের বোধ হয় সেরূপ হয় নাই। এই কারণে মথুরার কোনও দেবমন্দিরই দেড়শত বৎসরের অধিক পুরাতন নহে। মথুরার বর্ত্তমান সুন্দর সুন্দর মন্দিরগুলি এখানকার ও অন্যান্য স্থানের ধনবান শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

এই ত গেল মথুরার ইতিহাস। দ্রষ্টব্য স্থান এখানে অনেক আছে।

যমুনার দক্ষিণ তীরভাগে দেড় মাইল ব্যাপিয়া মথুরা নগরী। যমুনাবক্ষ হইতে নগরী শোভা পরম রমণীয়। যমুনা হইতে মথুরার সারি সারি স্নানের ঘাটের ও মন্দিরের দৃশ্য দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা করে—

তব জলনীলে ধবল সৌধছবি
অনুকারিছে নভ অঙ্গন ও।

দক্ষিণ দিক হইতে মথুরা প্রবেশ পথে প্রকাণ্ড হোলি-ফটক বা হার্ডিঞ্জ গেট।

এই সিংহদ্বার ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ব্র্যাডফোড হার্ডিঞ্জ সাহেব তখন এখাকার কলেক্টর ছিলেন—তাঁহারই নামে এই সিংহদ্বারের নামকরণ।

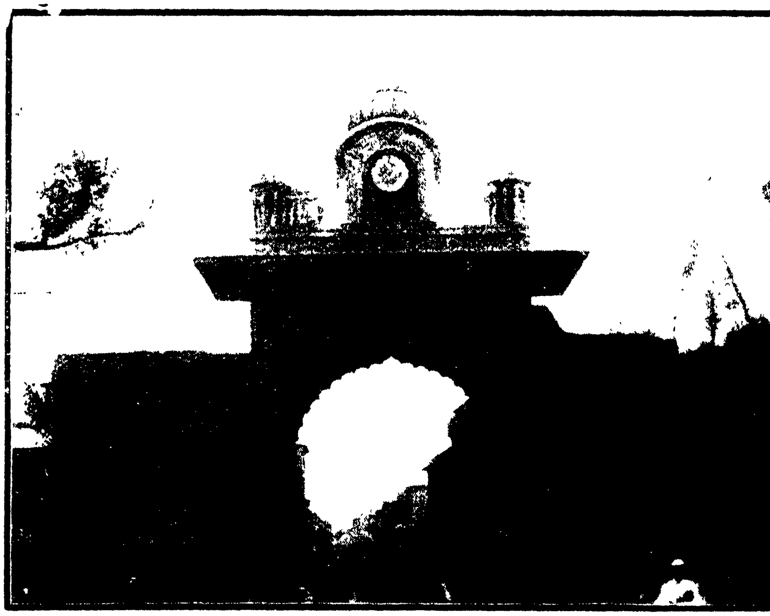
হার্ডিঞ্জ গেটের বাহিরে খানিকটা স্থানকে লোকে কংসটিলা বলে। এইখানে শ্রীকৃষ্ণ কংসকে পরাজিত করেন। ইহা প্রকৃত পক্ষে জয়পুরের রাজা মান-সিংহের দুর্গ ছিল। জ্যোতির্ব্বিদ রাজা সওয়াই জয়-সিংহ এখানে মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন। এই দুর্গের উপর পূর্ব্বে জয়সিংহ নির্ম্মিত মানমন্দির ছিল। এখন তাহার কিছুই নাই।

মথুরার ঠিক মধ্যস্থলে একটি মসজিদ। পূর্ব্বে এখানে কেশবদেবের মন্দির ছিল। ঔরঙ্গজেব তাহা ধ্বংস করিয়া সেইস্থানে এই মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মসজিদের চারিদিকের স্থানের নাম কাটরা। কানিংহাম সাহেব এই স্থান খনন করিয়া বিস্তর বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রভৃতি পাইয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে এইখানে উপগুপ্ত-নির্ম্মিত বৌদ্ধ মঠ ছিল।

এইস্থান হইতে প্রাপ্ত বৌদ্ধ-মূর্ত্তি সকল মথুরার যাদুঘর বা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

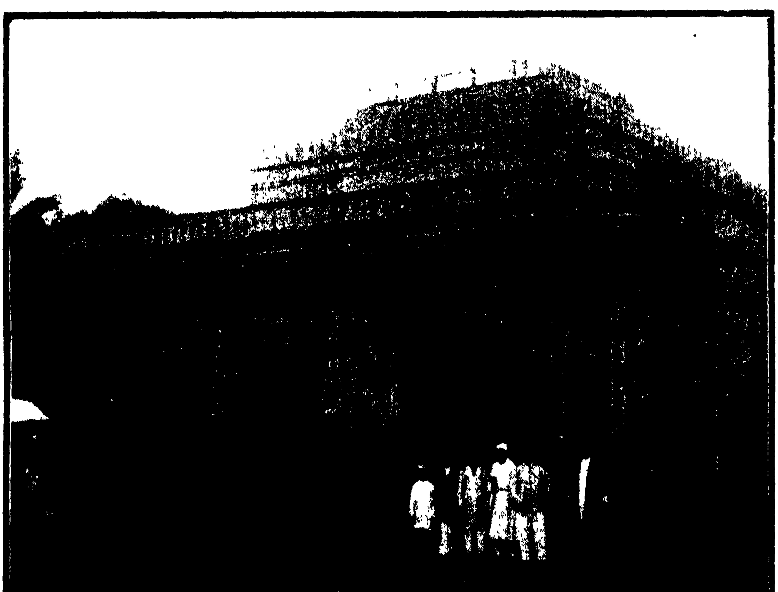
কেশবদেবের মন্দির ধ্বংস করিয়া ঔরঙ্গজেব যে মসজিদ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন—তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই মসজিদের দুই একখানি প্রস্তরে সম্বৎ ১৭১৩ ও ১৭২০ সালে নাগরী অক্ষরে খোদিত শিলা-লিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

বিখ্যাত ফরাসী পর্য্যটক তাভার্নিয়ে ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে যখন এখানে আসেন, তখনও এ মন্দির বিদ্যমান ছিল। তিনি বলিয়াছেন—"মন্দিরটি আয়তনে এত বৃহৎ যে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূর হইতেও দৃষ্টি গোচর হয়। অষ্টকোণাকৃতি চত্বর ব্যাপিয়া রক্তপ্রস্তরে নিৰ্ম্মিত;



মথুরা—হার্ডিঞ্জ গেট।

মন্দির—তাহার গাত্রে দুই সারি জীবজন্তুর মূর্ত্তি খোদিত আছে, মন্দিরটির আকৃতি ক্রুসের মত—মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ গম্বুজ—তাহার দুইদিকে অপেক্ষাকৃত ছোট দুইটি গম্বুজ।"



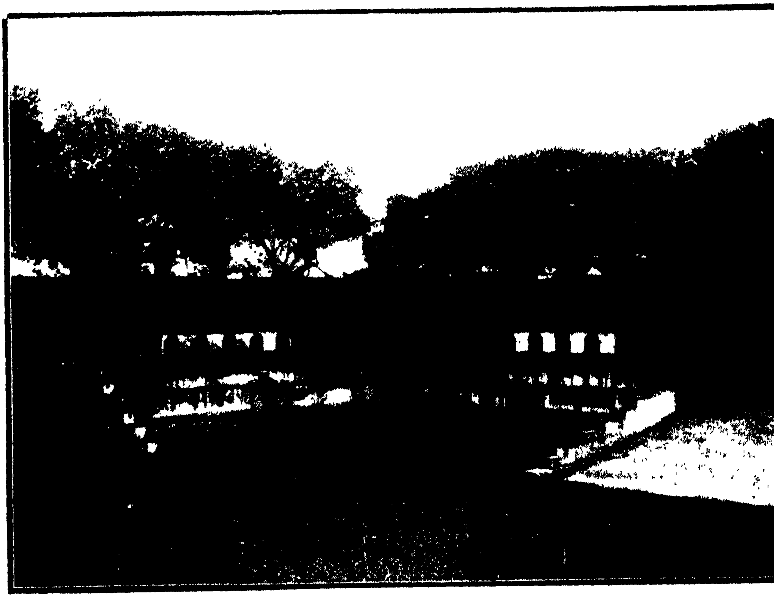
মথুরা—যাদুঘর।

ঔরঙ্গজেব যে এই মন্দির ধ্বংস করিবেন, তাহা জানিতে পারিয়া মেবারের রাণা রাজ-সিংহ মন্দিরের প্রাচীন বিগ্রহ-টিকে এখান হইতে উঠাইয়া লইয়া গিয়া উদয়পুর হইতে বাইশ মাইল দূরে সিয়ার নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পর হইতে সিয়ার গ্রামের নাম বিলুপ্ত হইয়া নাথদোয়ারা নাম প্রচলিত হয়।

কাটরার পশ্চাৎদিকে কেশব-

দেবের আধুনিক মন্দির। ইহার অতি নিকটেই প্রস্তর নির্ম্মিত পোতরাকুণ্ড।

প্রবাদ এই, শ্রীকৃষ্ণ প্রসূত হইলে মা যশোদার আঁতুড়ের বস্ত্রাদি এই কুণ্ডে ধৌত করা হইয়াছিল। পোতরাকুণ্ড চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত। প্রাচীরের বাহিরে বহু পুরাতন বড় বড় বৃক্ষ। শুনিলাম, বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে এ কুণ্ডে জল থাকে না।



মথুরা—পোতরাকুণ্ড।

পোতরাকুণ্ডের তীরে একটি ছোট কক্ষ আছে, শুনিলাম সেটি কারাগার বা জন্মভূমি। অর্থাৎ এই স্থানে বসুদেব ও দেবকী কারাবদ্ধ ছিলেন এবং এইখানে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন।

পোতরাকুণ্ডের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের নাম মল্লপুর। কংসরাজের "পালোয়ান চানুর ও মুষ্টিকের বাসস্থান বোধ হয় এইখানে ছিল।

বলভদ্রকুণ্ডের ধারে ভূতেশ্বর মহাদেবের মন্দির। এই মন্দির ছাড়া এখানে আরও তিনটি মন্দির রহিয়াছে—বলরাম, গণেশ ও নরসিংহ মন্দির। কাটরা হইতে বাহির হইয়া দিল্লী-রোডের ধারে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত কূপ — এইখানে শ্রীকৃষ্ণ কুব্জাকে বরপ্রদান করিয়াছিলেন।

শিবতাল—এই বৃহৎ পুষ্করিণীটি চতুষ্কোণাকৃতি ও অতিশয় গভীর। এখানে সকল সময়েই জল থাকে। ইহার চারিদিকে উচ্চ-প্রাচীর, চারিকোণে গম্বুজাকৃতি মন্দির। তিনদিকে



মথুরা—শিবতাল।

তিনটি দরজা—আর চতুর্থ দিক ঢালু করা—ইহার নাম গো-ঘাট। এখানে দুইটি শিলালিপি আছে—একটি সংস্কৃত এবং অন্যটি পারস্য ভাষায় খোদিত। ইহা হইতে জানা যায় যে এই জলাশয় ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীর রাজা পাটনী-মলের আদেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানে প্রতিদিন প্রাতে বহু স্নানার্থীর সমাগম হয় ও প্রতিবৎসর ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা একাদশীর দিন এখানে একটি মেলা বসে। পুষ্করিণীর বাহিরে অচলেশ্বর দেবের একটি ক্ষুদ্র মন্দির।



মথুরা—যমুনাবাগ।

মথুরার মনোহরপুর মহল্লায় দীর্ঘ-বিষ্ণুর মন্দির। বালক কৃষ্ণ, চানুর ও মুষ্টিকের সহিত মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার সময় যে বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন—ইহা সেই মূর্ত্তি।

যমুনানদীর তীরে শ্রেষ্ঠী নির্ম্মিত একটি বিস্তৃত বাগান আছে—তাহার নাম যমুনাবাগ।

মথুরা শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি। সুতরাং এখানকার পনের আনা মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার বিগ্রহ-মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। তবে নাম ভিন্ন ভিন্ন। যথা মদনমোহন, গোবর্দ্ধননাথ, বিহারীজী, গোবিন্দদেব, গোপীনাথ, মোহনজী প্রভৃতি।

মথুরার ঘাটগুলির মধ্যে বিশ্রামঘাটই প্রধান। এইস্থানে কংসবিনাশের পর শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন। যমুনা বক্ষ হইতে না দেখিলে বিশ্রামঘাটের শোভা সম্যক উপলব্ধি হয় না। যে দেখিয়াছে, সেই চিত্তহারিণী শোভা কখনও সে ভুলিতে পারিবে না। আমরা যখন বিশ্রামঘাটে পৌঁছিলাম তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বিশ্রামঘাটে আরতির ঘণ্টা বাজিতেছে। দলে দলে ব্রজরমণীগণ যমুনা বক্ষে দীপ ভাসাইতে আসিতেছে। কলার 'পেটো' দিয়া তৈয়ারী একটি ছোট ভেলার মত, তাহারই উপর তৈলভরা ছোট একটি প্রজ্জ্বলিত দীপ ও চারিটি ফুল। ঘাটের ধারে সেই দীপাধার বিক্রয় হইতেছে। এক পয়সা দিয়া একটি দীপ কিনিয়া সকলেই ভাসাইতেছে। যাহার দীপ তরতর করিয়া চলিয়া যাইতেছে—তাহার আনন্দ আর ধরে না—যাহার দীপ নিবিয়া যাইতেছে বা ডুবিয়া যাইতেছে—সে ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী ফিরিতেছে। সমস্তদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সন্ধ্যাবেলা যমুনার পবিত্রজল স্পর্শ করিয়া আমরা যখন বিশ্রামঘাটে বসিলাম, তখন সত্য সত্যই আমাদের সারাদিনের ক্লান্তি নিমেষমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। বিশ্রামঘাটের নিকটেই একটি পয়ঃপ্রণালী রহিয়াছে—উহার নাম কংসখাড়। প্রবাদ, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংস নিহত হইলে কংসের দেহ যমুনাতীরে টানিয়া লইয়া যাওয়াতে এই খাদের সৃষ্টি হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে আছে—

গৌরবেনাতিমহতা পরিখা তেন কৃষ্যতা।
কৃতা কংসস্য দেহেন বেগেনেব মহাম্ভসঃ॥

এই পরিখা এখন সহরের পয়ঃপ্রণালী রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। বিশ্রামঘাট সম্বন্ধে পুরাণে নিম্নলিখিত গল্পটি আছে—

উজ্জয়িনীতে ঘোরতর পাপাচারী এক ব্রাহ্মণ বাস করিত, স্নানপূজা দেবদর্শন প্রভৃতি পুণ্য ও অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য কখনও সে করিত না। একরাত্রে একদল চোরের সহিত সে চুরি করিতে যাইতেছিল—পথিমধ্যে নগরপাল তাড়া করিল। সকলে প্রাণ-ভয়ে ছুটিতে লাগিল, দৈবযোগে ব্রাহ্মণ এক শুষ্ক কূপে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হইল। অপঘাত মৃত্যু হওয়ার জন্য তাহার আত্মার মোক্ষলাভ হইল না, প্রেতরূপে সেই কূপেই সে বাস করিতে লাগিল। নিকটে যে আসিত সে তাহারই প্রাণবধ করিত। কিছু-দিন পরে একদল পথিক সেই কূপের নিকট আসিয়া তাঁবু ফেলিল। তাহাদের মধ্যে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন—তিনি অতিশয় পণ্ডিত। তিনি সমস্ত ঘটনা শুনিয়া, মন্ত্রবলে ঐ প্রেতকে নিজের সম্মুখে আসিতে বাধ্য করিলেন। সেই প্রেতযোনির কষ্ট দেখিয়া মহানুভব ব্রাহ্মণের প্রাণ গলিল। ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণো গতিঃ, কিসে তাহার উদ্ধার হয় তাহারই তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রেত বলিল—"আমি জীবনে একবার এক বিষ্ণুমন্দিরে গিয়া বিশ্রামঘাটের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আসিয়াছি। আপনি মথুরাতে গিয়া বিশ্রামঘাটে আমার নামে সংকল্প করিয়া স্নান করুন—তাহা হইলে আমি উদ্ধার হইতে পারিব।" এই ব্রাহ্মণ বহুবার বিশ্রামঘাটে স্নান করিয়াছিলেন। সেই স্নানজাত পুণ্যরাশি প্রেতকে দিবার জন্য মনে মনে সংকল্প করিয়া, যাই বিশ্রামঘাটে গিয়া ডুব দিলেন, অমনি ব্রাহ্মণ প্রেতযোনি পরিত্যাগ করিয়া মুক্ত হইয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন। বরাহপুরাণে "মথুরামাহাত্ম্যে" এই গল্পটি আছে।

মথুরাতে সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশটি ঘাট আছে। উত্তর দিকের বারটি ঘাটকে উত্তরকোট ও দক্ষিণের বারটি ঘাটকে দক্ষিণকোট বলে; উত্তরের ঘাট কয়টির নাম যথাক্রমে গণেশঘাট, মানসঘাট, দশাশ্বমেধ ঘাট, চক্রতীর্থ ঘাট, কৃষ্ণগঙ্গাঘাট, (ইহার নিকট কলিঙ্গরেশ্বর মন্দির) সোমতীর্থ বা বসুদেব ঘাট, ব্রহ্মলোক ঘাট, ঘণ্টাভরণ ঘাট, ধারাপতন ঘাট, সঙ্গমতীর্থ বা বৈকুণ্ঠ ঘাট, নবতীর্থ ঘাট ও অসিকুণ্ড ঘাট। দক্ষিণের ঘাট-গুলির নাম অভিমুক্ত ঘাট, বিশ্রাম ঘাট, প্রয়াগ ঘাট, কনখল ঘাট, তিন্দুক ঘাট, সূর্য্যঘাট, ধ্রুবঘাট, ঋষিঘাট, মোক্ষঘাট, কোটিঘাট ও বুদ্ধঘাট।

বলভদ্র ঘাটের নিকট সাতঘরা—এখানে শ্রীকৃষ্ণের সাতটি নামের সাতটি মন্দির আছে।

বিশ্রামঘাটের অনতিদূরে গতশ্রম-মন্দির। এইখানে কংস, নন্দ ও যশোদার কন্যা "যোগনিদ্রা"কে পাথরে আছাড় মারিয়া নিহত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দুর্গার অংশরূপিণী যোগনিদ্রা মায়াবলে কংসের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শূন্যে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। বঙ্গদেশের "পিতামহী-পুরাণ" অনুসারে, যোগনিদ্রা সে সময় নিম্নলিখিত ছড়াটি অবৃত্তি করিয়াছিলেন, যথা—

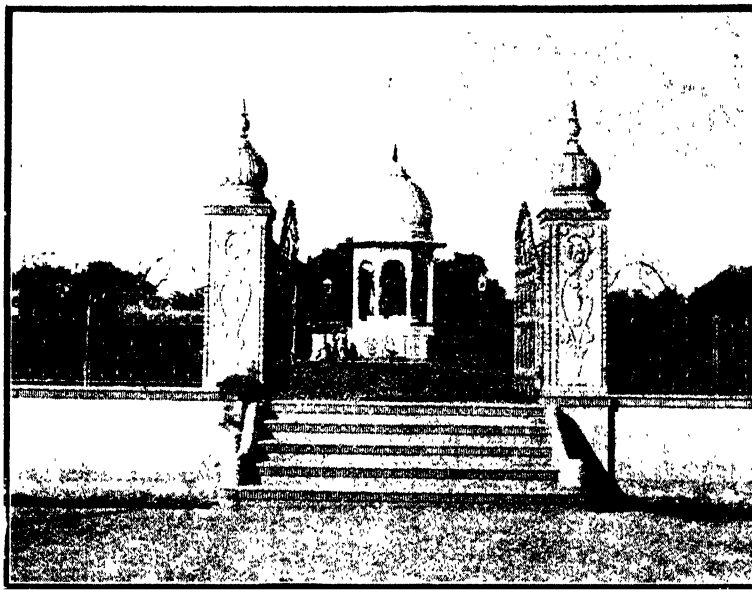
তোমারে মারিবে যে
গোকুলে বাড়িছে সে।

প্রয়াগঘাটের নিকটে আর একটি ঘাট আছে—তাহার নাম শ্রীনগর ঘাট। ঘাটের উপর পিপলেশ্বর মহাদেব ও বটুকনাথের মন্দির—ঘাটের অনতিদূরে রামেশ্বর মহাদেবের মন্দির।

গণেশ ঘাট হইতে কিছুদূরে, জয়সিংহপুর মহল্লার দিকে, গার্গী শার্গী মন্দির। গার্গী ও শার্গী উভয়ে গোকর্ণের স্ত্রী ছিলেন—স্ত্রীদ্বয়ের পুণ্যফলে গোকর্ণ সশরীরে স্বর্গে গিয়াছিলেন।

শার্গীদেবিং নমস্তভ্যমৃষিপত্নিমনোরমে।
সুভগে বরদে গৌরি সর্ব্বদা সিদ্ধিদায়িনী॥

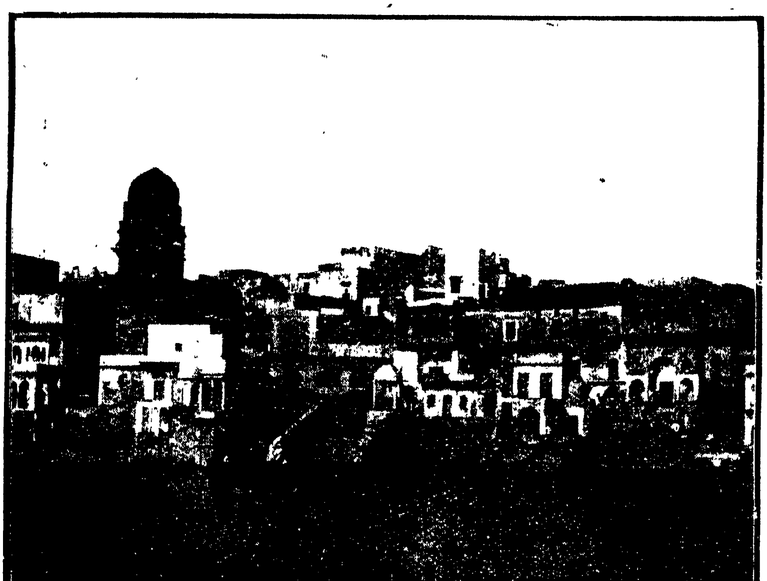
একটি ঘাটের নাম ঘণ্টাভরণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ব্রজভক্তিবিলাসে "ঘণ্টাভন" এই নামটি আছে। এই ঘাটের ঘণ্টার শব্দে কার্ত্তিকী একাদশী তিথিতে ভগবান বিষ্ণু চারিমাস ব্যাপী নিদ্রা হইতে উত্থান করেন।



মথুরা—ভিক্টোরিয়া পার্ক।

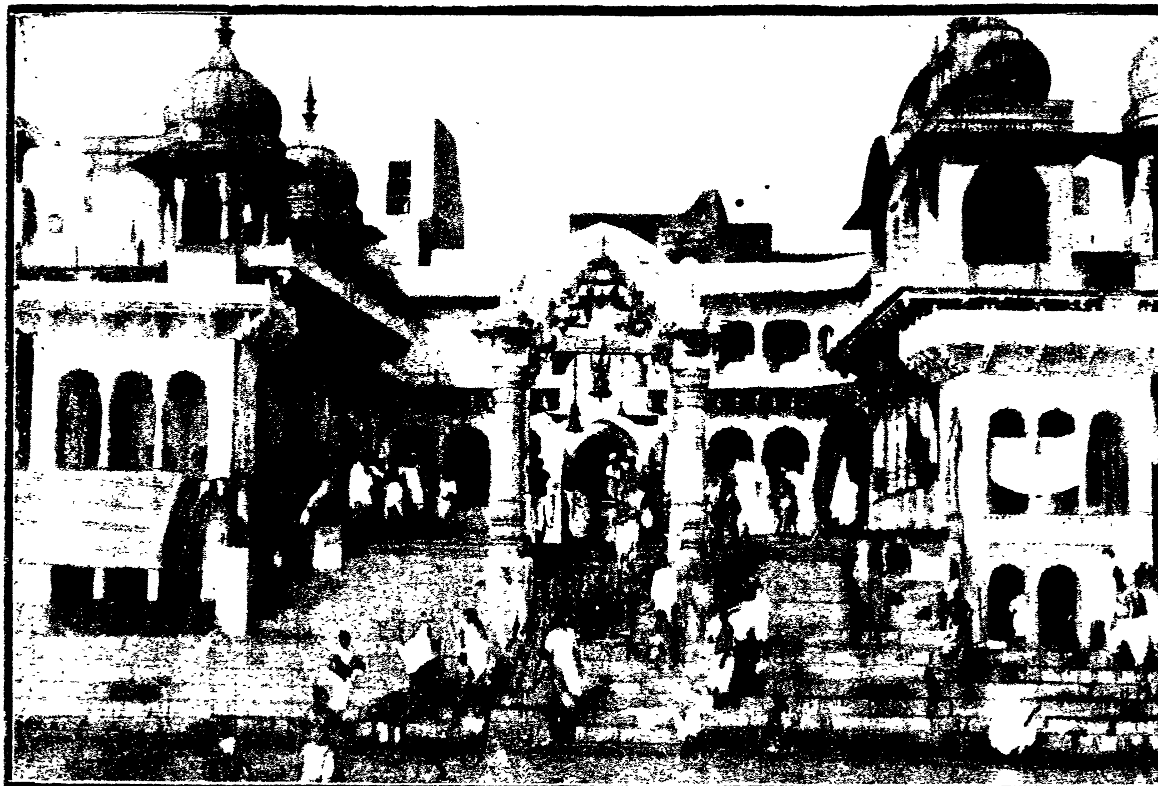
ধারাপতন ঘাট সম্বন্ধে মথুরা-মাহাত্ম্যে এই গল্পটি আছে—

গঙ্গাতীর নিবাসিনী কোন স্ত্রীলোক একদা মথুরাতে তীর্থ করিতে আসিয়াছিলেন। এখন যেখানে ধারাপতন ঘাট, সেইখানে সে স্ত্রীলোকটি নৌকায় উঠিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ পদস্খলন হওয়াতে যমুনাগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যান। সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষপ্রাপ্তি। এই পুণ্যবলে পরজন্মে তিনি বারাণসী-রাজের কন্যা রাণী পীবরী নামে জন্মগ্রহণ করেন। যথাসময়ে সুরাষ্ট্ররাজ ক্ষত্রধনুর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। এই রাজদম্পতীর সাতটি পুত্র ও পাঁচটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। একদিন দম্পতী বসিয়া নিজেদের পূর্ব্ব কথা আলোচনা করিতেছেন—এমন সময়ে দিব্যজ্ঞানবলে তাঁহাদের নয়নপথ হইতে পূর্ব্বজন্মের যবনিকা অপসৃত হইয়া গেল। রাণীর পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত প্রকাশ হইল। তাঁহারা আরও দেখিতে পাইলেন, রাজাও পূর্ব্বজন্মে নৈমিষারণ্যে ব্যাধ ছিলেন, মথুরাতে আসিয়া একদিন পাদুকা মস্তকে লইয়া যমুনা পার হইবার সময় পাদুকা জলে পতিত হয়। সেই পাদুকা অন্বেষণ করিতে গিয়া যমুনাজলে পড়িয়া ব্যাধের প্রাণ বিয়োগ হয়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কলুষনাশ—এই রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ।



মথুরা—সতী বুরুজ।

তিন্দুকঘাট— পাঞ্চালরাজ দেবদত্তের রাজত্বের সময়,



মথুরা—বিশ্রাম ঘাট

রাজধানী কাম্পিল্য নগরে এক নাপিত বাস করিত। অল্পদিনের মধ্যে তাহার আত্মীয়বর্গ সকলেই মরিয়া গেল। শোকে গৃহত্যাগ করিয়া সে মথুরায় আসিয়া কঠোর তপস্যায় রত হইল। সে প্রতিদিন বহুবার যমুনা সলিলে স্নান করিত। তাহার নাম হইতেই এই ঘাটের নামকরণ।

অসিকুণ্ড ঘাটের নামোৎপত্তি কেমন করিয়া হইল, সেই কাহিনী বর্ণনা করিয়া আমরা মথুরার ঘাটের কথা শেষ করিব। পূর্ব্বকালে সুমতি নামে এক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি তীর্থদর্শন করিতে বাহির হইয়া পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার পুত্র বিমতি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে সকল অনিষ্টের মূল সেই নারদ ঠাকুরটি একদিন রাজসভায় বেড়াইতে আসিয়া ফিরিবার সময় বলিয়া গেলেন—"উপযুক্ত পুত্র পিতার ঋণশোধ করে।" নারদ চলিয়া গেলে বিমতি ভাবিতে লাগিলেন—পিতার কি ঋণ তিনি শোধ করিবেন। মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইল—পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইলেই ঋণ শোধ করা হইবে। তীর্থদর্শনের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তিনি মৃত্যু যাত্রা করিয়াছিলেন। অতএব সমস্ত তীর্থকে জব্দ করিতে হইবে। বর্ষাকালে ভারতের সমস্ত তীর্থদেবতা মথুরায় একত্র হন—এক ঢিলে সব পাখী মারিবার সংকল্প করিয়া বিমতি বর্ষাকালে সসৈন্যে মথুরার প্রতি ধাবমান হইলেন। তীর্থদেবতাগণ আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া কল্পগ্রামে ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। অনেক স্তুতি মিনতির পর বিষ্ণু তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন। বিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া যমুনা নদীর তীরে রাজা বিমতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বিমতি নিহত হইলেন। এই যুদ্ধে বিষ্ণুর অসির অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া যমুনাতীরে পড়িয়া যায়—তাহা হইতে অসিকুণ্ড ঘাটের নামোৎপত্তি। এই ঘাটের সন্নিহিত স্থানের নাম বরাহক্ষেত্র।

মথুরার অন্য দ্রষ্টব্যস্থান ভিক্টোরিয়া পার্ক ও সতীবুরুজ। সতীবুরুজ সম্বন্ধে নানারকম গল্প শুনা যায়। তন্মধ্যে যেটিকে অনেকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন সেটি এই—জয়পুরের রাজা ভারমলের রাণী এখানে স্বামীর সহিত চিতারোহণ করেন। তাঁহার পুত্র রাজা ভগবান দাস কর্ত্তৃক অনুমান ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে এই স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হয়।—চারিতলা মন্দিরটি চতুষ্কোণাকৃতি লাল প্রস্তরে নির্ম্মিত ও উচ্চতায় ৫৫ ফুট। সর্ব্বোপরি একটি ছোট গম্বুজ। একতলাটি কক্ষশূন্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় জানালা আছে ও উপরে উঠিবার সিঁড়ি আছে। মন্দিরগাত্রে, হস্তী প্রভৃতি জীবজন্তুর মূর্ত্তি খোদাই করা আছে।

মথুরার ঠিক কেন্দ্রস্থলে আকাশচুম্বী জুমা-মসজিদ। ইহা ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে আবদুল নবি খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এই কেন্দ্র হইতে চারিদিকে অর্থাৎ বৃন্দাবন, দীগ, ভরতপুর ও সিভিল ষ্টেশনের দিকে চারিটি বড় বড় রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। এখানকার রাস্তাগুলি ভরতপুরের প্রস্তরে গঠিত।

মথুরাতে আর একটি দেখিবার জিনিষ আছে—তাহা দ্বারকাধীশ বা শেঠের মন্দির। গোয়ালিয়রের কোষাধ্যক্ষ পারিখজী কর্ত্তৃক ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে এই সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের চারিদিকে অনতিউচ্চ দেওয়াল, তাহাতে এক সুন্দর ফটক। রাস্তা হইতে কয়েকটি সোপান আরোহণ করিয়া একটি চতুষ্কোণাকৃতি অঙ্গন, অঙ্গনের চারিদিকে সন্ন্যাসীদের থাকিবার জন্য ছোট ছোট কক্ষ। অঙ্গনের মধ্যস্থলে তিন সারি স্তম্ভের উপর চতুষ্কোণাকৃতি মন্দির—তাহার বর্ণ ও কারুকার্য্য বড় সুন্দর।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশপ হীবার এই মন্দির দেখিয়া অনেক সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার চারি বৎসর পরেই Jacquemont নামে এক বিদেশী পর্য্যটক আসিয়া এই সুন্দর মন্দিরকে barrack or cotton factory'র মত বলিয়া নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ! এই মন্দির এখন বল্লভাচার্য্যগণের হস্তে আছে।

এই মন্দিরের সম্মুখে রাস্তার ওপারে ভরতপুরের

রাজাগণের প্রাসাদ ও তাহার নিকটেই লক্ষটাকা খরচ করিয়া নির্ম্মিত শেঠ লক্ষ্মীচাঁদের আবাস বাটী।

মথুরায় যাহা কিছু দ্রষ্টব্য ছিল, কয়েকদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্তই আমরা দর্শন করিলাম। বিশ্রামঘাটের যে শোভা দেখিয়া আসিয়াছি—তাহা কখনও স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্ত হইবে না।

মথুরা হইতে বৃন্দাবন তিনক্রোশ মাত্র ব্যবধান। আমরা জিনিষপত্র মথুরাতে ডাক্তার বাবুর বাটীতে রাখিয়া একদিন বৃন্দাবন দর্শন করিতে যাত্রা করিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

পৃথিবীর পুরাবৃত্ত

তৃতীয় অধ্যায়।

ভূপৃষ্ঠের পরিবর্ত্তন।

কি জড় জগতে কি জীব জগতে—সর্ব্বত্রই সম-প্রকৃতির পদার্থের একত্র মিলিত হইবার পক্ষে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়। সৃষ্টির আদিযুগে নীহারিকার পুঞ্জীভবন হইতে বর্ত্তমানযুগে নগরে বহু-লোকের ঘনবসতি—সমস্তই পূর্ব্বোক্ত প্রবণতার উদাহরণ।

পৃথিবীকে জীবজন্তু এবং মনুষ্যের বাসযোগ্য করিবার পক্ষে এই পুঞ্জীকারিণী শক্তি ক্রমাগত কাজ করিয়া আসিয়াছে। এই শক্তির প্রভাবেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নীহারিকারাশি জমাট বাঁধিয়া গ্রহে পরিণত হইয়াছে এবং ইহারই প্রভাবে গ্রহ-শরীরস্থ ধাতু ও প্রস্তররাশি ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভক্ত হইয়াছে। এইখানেই যদি এই শক্তির কার্য্য শেষ হইয়া যাইত, তাহা হইলে কোন-কালেই জীবধাত্রী বসুন্ধরা মনুষ্যের বাসযোগ্য হইত না। এই শক্তির কার্য্য অপ্রতিহতভাবে না চলিলে যন্ত্রাদি নির্ম্মাণের উপযোগী ধাতুসকল পৃথিবীর অতলগহ্বরে লুক্কায়িত থাকিত, ক্ষেত্রের উর্ব্বরতাসাধনের জন্য আবশ্যক ফস্ফরস প্রভৃতি আগ্নেয় প্রস্তর-রাজির মধ্যে এমন ভাবে মিলাইয়া থাকিত যে তাহাদের দ্বারা ক্ষেত্রের কোনই কাজ হইত না, যে বালুকাপ্রস্তর অট্টালিকাদির জন্য এত প্রয়োজনীয়, তাহারা ভূগর্ভস্থিত পর্ব্বতশ্রেণীর অঙ্গীভূত হইয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া থাকিত, তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া যাইত না; যে সূক্ষ্ম আঁশবিশিষ্ট মৃত্তিকাস্তর বৃষ্টির জলকে অধিক নিম্নে নামিতে না দিয়া জলাশয় এবং উৎস-সৃষ্টির সহায়তা করে, তাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকায় কোনই কাজে লাগিত না এবং যে নাইট্রোজেন (Nitrogen) জীবদেহগঠনের প্রধান সাধন, তাহা অনন্ত আকাশে ছড়াইয়া থাকিত, তাহাকে জীব-জন্তুর খাদ্যরূপে পাইবার কোনই সম্ভাবনা থাকিত না। মনুষ্যের জীবনধারণ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যাহা কিছুর প্রয়োজন,সমস্তই পর্ব্বতশ্রেণী এবং মহাসাগর মধ্যে রক্ষিত ছিল, কিন্তু যতক্ষণ না এই সকল উপকরণ পুঞ্জীকারিণী শক্তির সাহায্যে একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল ততক্ষণ তাহাদের দ্বারা কোন উপকার-লাভের সম্ভাবনা ছিল না।

সৌভাগ্যবশতঃ এই শক্তি পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আবহমানকাল সমভাবে কাজ করিয়া আসিতেছে। ত্রিবিধ উপায়ে এই শক্তির কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে:— (১) ক্ষয় সাধন (২) সংবাহন এবং (৩) পুনঃস্থাপন।

(১) ক্ষয় সাধন:—পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে

যে, পৃথিবী দেহস্থিত গলিত উপাদানরাশি শীতল হইয়াই ভূপৃষ্ঠের কঠিন প্রস্তরাবরণ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এই প্রস্তরাবরণের অঙ্গীভূত কঠিন পর্ব্বতশ্রেণীই পৃথিবীর আদিম পর্ব্বতশ্রেণী নামে অভিহিত। এই পর্ব্বতশ্রেণী যেদিন ধরাপৃষ্ঠে প্রথম আবির্ভূত হইল, সেই দিন হইতেই তাহাদের নিরাবরণ দেহের উপর ধ্বংসকারিণী শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইল। বায়ুমণ্ডলে অম্লজান (oxygen), অঙ্গারক (carbon dioxide) এবং জলীয় বাষ্প বিরাজমান। ইহারা প্রত্যেকেই ধ্বংসকারিণী শক্তির এক এক অস্ত্র স্বরূপ। অম্লজান আদিম গিরিশ্রেণীর কোন কোন উপাদানের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাহাদের আয়তনবৃদ্ধি করিতে লাগিল। তাহাদের এই আয়তনবৃদ্ধির ফলে তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী পদার্থগুলি ধাক্কা খাইয়া পর্ব্বত গাত্র হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল। এমনি করিয়া আদিম পর্ব্বতের উপর অম্লজানের ধ্বংসকারিণী শক্তির লীলা আরম্ভ হইল।

অঙ্গারক গ্যাস বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিলিত হইয়া পর্ব্বতদেহে প্রবেশ করিল এবং পর্ব্বতের কোন কোন উপাদানকে অঙ্গার-মিশ্রিত যৌগিক পদার্থে পরিণত করিয়া তাহাদের ভঙ্গুর ও কোমল করিয়া তুলিল। এইরূপে পর্ব্বতের কঠিন দেহ অঙ্গারক-গ্যাসের প্রভাবে ধ্বংসশীল অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

এই ধ্বংসসাধন ব্যাপারে জলীয় বাষ্পও অল্প সাহায্য করিল না। বৃষ্টির জল ছিদ্র ও ফাটালের মধ্য দিয়া পর্ব্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। রাত্রে শীতের প্রকোপে যখন এই জল জমিয়া বরফ হইল, তখন ইহার সম্প্রসারণের বেগে পর্ব্বতগাত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। এতদ্ভিন্ন জলের সঙ্গে যে অঙ্গারাম্ল মিলিত রহিল তাহা পূর্ব্বপরিবর্ত্তিত অঙ্গারমিশ্রিত যৌগিক পদার্থগুলিকে দ্রবীভূত করিয়া তাহাদের জলের সঙ্গে বাহিরে বহিয়া যাইবার সুবিধা করিয়া দিল। এমনি করিয়া আদিম পর্ব্বত-দেহের এক স্তরের পর আর এক স্তরের উপর ধ্বংসকারিণী শক্তির ক্রিয়া চলিতে লাগিল।

এই ক্রিয়ার ফলে আদিম গিরিশ্রেণীর স্খলিত অংশের সাহায্যে নূতন গিরিরাজি উৎপন্ন হইতে লাগিল। এই সকল গিরিরাজিকে গৌণগিরি বা উপগিরি (Secondary rocks) বলে। এই উপগিরিগুলি উপাদান হিসাবে পৃথিবীর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ স্থানই ইহাদের দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং পৃথিবীর যে সকল প্রদেশ ধনে, জনে, এবং সভ্যতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহারা তাহাদেরই ভিত্তিস্বরূপ। সুতরাং এস্থলে ইহাদের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

পর্ব্বতরাজির মধ্যে কোন্‌গুলি আদিম এবং কোন্‌গুলি গৌণ তাহা নিম্নলিখিত চারিটি প্রধান লক্ষণ দেখিয়া সহজেই নির্ণয় করা যায় :—

(১) আদিম পর্ব্বতগুলি দানাদার পদার্থ অথবা স্বভাবজাত কাচ ও দানাদার পদার্থের মিশ্রণ-গঠিত। এই সকল উপাদান পর্ব্বতের উৎপত্তিকালেই জমিয়া কঠিন হইয়া গিয়াছিল। উপগিরিগুলি আদিমগিরির ভগ্নাংশ দ্বারা গঠিত। এই কারণে ইহাদের কেহ কেহ খণ্ডগিরিও বলিয়া থাকেন।

(২) আদিম পর্ব্বতগুলি প্রচণ্ড উত্তাপের দ্বারা দ্রবীভূত পদার্থ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সেইজন্য ইহাদের "আগ্নেয়" পর্ব্বত বলা হইয়া থাকে।

উপগিরিগুলির অধিকাংশই জলের ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন। এইজন্য ইহাদের সাধারণতঃ "জলীয় পর্ব্বত" বলা হয়। যেগুলি বায়ুর ক্রিয়া দ্বারা গঠিত, সেগুলিকে "বায়বীয় পর্ব্বত" বলে।

(৩) উপগিরিগুলি জল ও বায়ুর সাহায্যে গঠিত হওয়ায় তাহাদের দেহে প্রশস্ত এবং ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল(Horizontal) স্তররাজি পরিদৃষ্ট হয়। এইজন্য ইহাদের "স্তরময়" পর্ব্বত বলা হয়। পক্ষান্তরে আদিম গিরিরাজি গলিত পদার্থ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তাহাদের দেহে স্তরবিন্যাসের কোনই লক্ষণ দেখা যায় না। এইজন্য ইহাদের "স্তরহীন" পর্ব্বত বলে।

(৪) আদিম পর্ব্বতগুলি যে প্রদেশ হইতে উৎপন্ন, তথায় জীব বা উদ্ভিদের অস্তিত্ব না থাকায় এই সকল

পর্ব্বতে জীব বা উদ্ভিদদেহের কোন ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে উপগিরি সমূহের উৎপত্তিকালে নানা প্রকারের জীব ও উদ্ভিদ বর্ত্তমান থাকায় ইহাদের স্তরে স্তরে নানা প্রকারের জীব ও উদ্ভিদের প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ (Fossil) দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল দেহাবশেষ পরীক্ষা করিয়া উক্ত পর্ব্বতরাজি—জল, স্থল, সাগর, হ্রদ বা নদীগর্ভ—কিরূপ প্রদেশে উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

যে সকল উপগিরিতে এরূপ দেহাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না, উপাদানের প্রকৃতি এবং স্তরবিন্যাসের প্রণালী দেখিয়া তাহাদেরও উৎপত্তির ইতিহাস সহজেই নির্ণয় করা যায়।

উপগিরিগুলি চারি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) বালুকাপ্রস্তরময়, (Sandstone) (২) মৃত্তিকাময় (Clays) (৩) চূর্ণপ্রস্তরময় (Limestones) এবং (৪) অঙ্গারময় (coal)।

(১) বালুকাপ্রস্তরময় :—এই শ্রেণীর উপগিরি বালুকাকণার সাহায্যে গঠিত। বালুকারাশি প্রথম প্রথম পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। ক্রমে ইহারা স্থানে স্থানে একত্র মিলিত হইয়া বালুকাশৈল (sandrock) উৎপন্ন করে। আরও ঘনসন্নিবিষ্ট হইলে ইহাদের সাহায্যে বালুকাপ্রস্তর (sandstone) উৎপন্ন হয়। অট্টালিকা নির্ম্মাণের জন্য এই সকল প্রস্তর বিশেষ কাজে লাগিয়া থাকে।

কঙ্করময় প্রস্তর (conglomerates) বালুকা প্রস্তরেরই রূপান্তর মাত্র।

(২) মৃত্তিকাময় :—মৃৎকণিকা বালুকাকণা অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর। মৃত্তিকা ও বালুকায় এই মাত্র প্রভেদ। বালুকাকণার ব্যাস এক ইঞ্চের ৫০০০ ভাগের একভাগ মাত্র। ইহা অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর কণিকা গঠিত উপাদানের নাম মৃত্তিকা। মৃত্তিকাময় পর্ব্বতগুলি কোমলতাবশতঃ সহজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ইহা হইতেই উর্ব্বর মৃত্তিকা উৎপন্ন হইয়া থাকে। জল বায়ুর আক্রমণে এই সকল পর্ব্বত সহজেই সমতল হইয়া পড়ায় ইহাদের সাহায্যেই মূল্যবান কৃষিক্ষেত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্য দিয়া জল সহজে গমন করিতে না পারায়, বৃষ্টির জল মৃত্তিকাস্তরের উপর আসিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই জল উৎসরূপে নির্গত হইয়া ভূপৃষ্ঠে নদী প্রভৃতির সৃষ্টি করে, এবং কূপাদির সাহায্যে মনুষ্যের আয়ত্তাধীন হইয়া তাহাদের অশেষ উপকার সাধন করে।

স্লেট প্রস্তর (slate) মৃত্তিকারই রূপান্তর।

(৩) চূর্ণ প্রস্তরময় :—এই সকল পর্ব্বত হইতেই "চূর্ণ" পাওয়া গিয়া থাকে। এই চূর্ণ জলের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে প্রবেশ করিয়া প্রাণীদেহে খোলা ও কঙ্কাল এবং উদ্ভিদ দেহে তাহার কঠিনাংশ নির্ম্মাণ করে। অট্টালিকাদির নির্ম্মাণ ব্যাপারে এই চূর্ণ যথেষ্ট কাজে লাগিয়া থাকে। ইহা হইতেই বিলাতী মাটি (cement) প্রস্তুত হয় এবং কৃষিক্ষেত্রের উর্ব্বরতা সাধন করিয়া ইহাই শস্যবৃদ্ধির সাহায্য করিয়া থাকে।

(৪) অঙ্গারময় :—গলিত উদ্ভিদদেহ হইতেই অঙ্গারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। গলিত উদ্ভিজ্জস্তরের উপর মাটিচাপা দিয়া যদি তাহাকে বহুকাল গুরুভার প্রস্তরের নীচে চাপিয়া রাখা যায় তাহা হইলে এই স্তর ক্রমশঃ অঙ্গার স্তরে পরিণত হয়। জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত বিশাল অরণ্য হইতেই কালে এই প্রকারের অঙ্গার-স্তর উৎপন্ন হইয়াছে।

অঙ্গার হইতে আমরা নানা প্রকারের তৈল ও ইন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

অঙ্গার বা পাথুরিয়া কয়লা পঞ্চবিধ :—

(ক) বাদামি কয়লা—এই কয়লা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে উৎপন্ন। ইহার বর্ণ বাদামি এবং ইহা সাধারণতঃ কোমল।

(খ) সাধারণ কয়লা :—এই কয়লা কৃষ্ণবর্ণ, ভঙ্গুর এবং কঠিন। ইহাই আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য ইন্ধন।

(গ) গ্যাসকয়লা :—এই কয়লা হইতে আলোকের উপযোগী গ্যাস উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(ঘ) তৈলপূর্ণ কয়লা :—ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করিলে এই কয়লা হইতে তৈল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(ঙ) ধূমহীন কয়লা :—এই কয়লা দগ্ধ করিলে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্বলিবার সময় ইহা হইতে ধূম বা শিখা নির্গত হয় না।

(২) সংবাহন। উপরে দেখান হইয়াছে যে ধ্বংসকারিণী শক্তির প্রভাবে আদিম গিরিশ্রেণী ভগ্ন ও চূর্ণ হওয়ায় উপগিরিসমূহ উৎপন্ন হইতে পারিয়াছে। কিন্তু একমাত্র ধ্বংসকারিণী শক্তির প্রভাবে উপগিরি উৎপন্ন হইতে পারে না। ধ্বংশকারিণী শক্তির প্রভাবে আদিম গিরিগাত্র হইতে যে সকল উপাদানকণা বিচ্ছিন্ন ও স্খলিত হইয়া পড়ে, নূতন উপগিরি নির্ম্মাণের জন্য তাহাদের সংবাহন ও পুনঃ স্থাপনের প্রয়োজন।

যে প্রাকৃতিক শক্তি এই বাহন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে তাহাকে সংবাহনী শক্তি বলা হয়।

বায়ু, নদীস্রোত এবং সাগরতরঙ্গ এই শক্তির প্রধান সাধন।

ধ্বংসকারিণী শক্তির প্রভাবে আদিম পর্ব্বতপৃষ্ঠে যে সকল লঘুতর উপাদান খণ্ড সঞ্চিত হয়, বায়ু তাহাদের বহন করিয়া দূরে লইয়া যায়। ইহারাই ক্ষেত্রে সঞ্চিত হইয়া বালুকামিশ্রিত মৃত্তিকা বা মৃত্তিকায় পরিণত হয়।

পর্ব্বতগাত্রে যে সকল বৃহত্তর প্রস্তরখণ্ড থাকে, বালুকাকণাবাহী ঝটিকার আঘাতে তাহারাও ক্রমশ ক্ষয়িত হইরা দূরে বাহিত হয়। কঠিন গ্রানিট প্রস্তর (granite) হইতে যে সকল বালুকাকণা উৎপন্ন হয় তাহারাও বায়ুকর্ত্তৃক বাহিত হইয়া কোথাও আশ্রয় পাইলে ক্রমশঃ সৈকতস্তূপে পরিণত হয়।

নদীস্রোতের সাহায্যেও আদিম পর্ব্বতের অনেক উপাদান দূরে প্রবাহিত হইয়া থাকে। স্রোতের বেগে প্রস্তরখণ্ডসকল পর্ব্বত গাত্র হইতে দূরে গড়াইয়া যায়। ছোট ছোট কঙ্করগুলি নদীগর্ভে ঘুরিতে ঘুরিতে অচিরেই চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া বালুকায় পরিণত হয়। এই বালুকারাশি, নদীস্রোত যেখানে অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত, সেইখানে গিয়া সঞ্চিত হয় এবং তাহাদের সূক্ষ্মতম কণিকাগুলি আরও দূরে গিয়া ক্ষীণস্রোত নদীগর্ভে মৃত্তিকা-স্তর উৎপাদন করে।

সমুদ্রতরঙ্গ সংবাহন ব্যাপারে অল্প সাহায্য করে না। সাগরতরঙ্গ স্থলভাগকে আক্রমণ করিয়া ক্রমাগত তাহাকে ভগ্ন-দীর্ণ করিয়া দিতে থাকে। তরঙ্গের আঘাতে তীরবর্ত্তী পর্ব্বতসমূহ ক্রমশঃ শিথিলমূল হইয়া পড়ে এবং ইহাদের শিখরদেশ ভগ্ন হইয়া সাগরজলে নিপতিত হয়। তরঙ্গের তাড়নে গিরিচূড়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া কঙ্করে পরিণত হয় এবং জোয়ারের বেগে এই কঙ্কর রাশি সমুদ্রের উপকূলে পুনঃস্থাপিত হয়। যেখানে সমুদ্রতীর সম্পূর্ণ অরক্ষিত সেখানে জলোচ্ছ্বাস-চালিত উপাদানরাশি কঙ্করবেলায় পরিণত হয়; যেখানে সমুদ্রতীর অপেক্ষাকৃত রক্ষিত সেখানে ইহা বালুকাস্তরে পরিণত হয় এবং যেখানে উপকূলভাগ সম্পূর্ণ সুরক্ষিত সেখানে ইহা মৃত্তিকাস্তরে রূপান্তরিত হয়। এই সকল ন্যস্ত পদার্থ অবস্থাবিশেষে পুনরায় প্রস্তরখণ্ডে পরিণত হয়।

মৃত্তিকাস্তর চাপের প্রভাবে কঠিন হইয়া শ্লেটে পরিণত হয়, বালুকাস্তর সংহত হইয়া সৈকতশৈল উৎপন্ন করে এবং কঙ্কররাশি একীভূত হইয়া কঙ্করশৈলের সৃষ্টিসাধন করে।

এইরূপে বায়ু, নদীস্রোত এবং সাগরতরঙ্গ ভগ্নীকৃত আদিম শৈলখণ্ডের সংবাহন কার্য্য সাধন করিয়া থাকে।

৩। পুনঃস্থাপন :—

এই শক্তির প্রভাবে অন্যত্র চালিত প্রাচীন উপাদান নূতন আকারে পুনঃস্থাপিত হইয়া থাকে। এই কারণেই প্রাচীন পদার্থ হইতে নূতন পদার্থের উদ্ভব সম্ভব হয়।

জল ও বায়ুর সাহায্যে আদিম পর্ব্বতের উপাদান সামগ্রী কিরূপে একস্থান হইতে স্থানান্তরে সংবাহিত হইয়া থাকে তাহা উপরে বিবৃত হইয়াছে। এই দুই

প্রকারের সরল সংবাহন ক্রিয়া ব্যতীত প্রকৃতিতে আর এক প্রকারের জটিল সংবাহন ক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ক্রিয়ার প্রভাবে একস্থানের উপাদান সামগ্রী জটিলতর ও সূক্ষ্মতর উপায়ে একস্থান হইতে স্থানান্তরে নীত এবং পুনঃ স্থাপিত হইয়া থাকে।

আদিম পর্ব্বতের উপাদানরাশি জলের সঙ্গে মিশ্রিত থাকিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে জীব বা উদ্ভিদের দ্বারা অথবা রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রভাবে ক্রমশঃ জল হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। অনেক জীব জন্তুর 'খোলা' চূর্ণাঙ্গার (Carbonate of lime) নির্ম্মিত। এই সকল জীব, জল মিশ্রিত চূর্ণ হইতেই নিজ নিজ শরীরের এই কঠিন উপাদান সংগ্রহ করে। ইহাদের মৃত্যুর পর এই উপাদান সমুদ্র বা হ্রদের তলে সঞ্চিত হয় এবং তাহা হইতে আবার চূর্ণ প্রস্তর উৎপন্ন হয়।

এইরূপে স্পঞ্জ (Sponge) এবং অন্যান্য অনুবীক্ষণ-দৃশ্য কীটাণুর দেহাবশেষ হইতে কোন কোন সৈকতশৈল উৎপন্ন হইয়া থাকে। জীবাস্থি হইতে যে ফস্ফেট ও চূর্ণ ঘটিত যৌগিক পদার্থ (Phosphate of lime) পাওয়া যায় অথবা চূর্ণাঙ্গারের (Carbonate of lime) উপর ফস্ফেটমিশ্রিত সমুদ্রজলের রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা যে ফস্ফরস ও চূর্ণঘটিত যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা ফস্ফেটস্তর নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

উদ্ভিদের কার্য্যদ্বারাও কতকগুলি পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অধিকাংশ উদ্ভিদই বায়ুমণ্ডল হইতে অঙ্গা-রক বাষ্প আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই বাষ্পস্থিত অঙ্গার তাহাদের দেহনির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়। এই উদ্ভিদদেহ মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত হইয়া কালক্রমে পাথুরিয়া কয়লায় পরিণত হয়।

রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারাও কোন কোন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। নদী বা উৎসের জলে যে চূর্ণাঙ্গার থাকে, রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রভাবে তাহা হইতে চূর্ণ প্রস্তর উৎপন্ন হয়; সমুদ্রের শাখা বা সমুদ্রসংযুক্ত জলাভূমি শুষ্ক হইয়া গেলে তাহাতে সাধারণ লবণের স্থানে সামুদ্রিক লবণের স্তর বিন্যস্ত হয়।

এইরূপ নানা প্রকারের যান্ত্রিক (Mechanical), জৈবিক (Organic) এবং রাসায়নিক শক্তির প্রভাবে ভূপৃষ্ঠ, জল এবং বায়ুস্থিত পদার্থরাজি একত্রীভূত এবং স্তরবদ্ধ হইয়া বালুকা, মৃত্তিকা, চূর্ণপ্রস্তর এবং অঙ্গার প্রভৃতিতে পরিণত হয়।

এইরূপে ধ্বংসকারিণী সংবাহনী এবং সংস্থাপনী শক্তির অপ্রতিহত প্রভাবে পৃথিবীর আবরণহীন আদিম পর্ব্বত ভগ্ন চূর্ণ ও স্থানান্তরিত হইয়া উপগিরিতে পরিণত হয়।

কিন্তু এইরূপে ক্রমে ক্রমে আদিম গিরিশ্রেণী ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেও আজিও তাহারা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

এখনও পৃথিবীর নানাস্থানে এই সকল পর্ব্বতের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

পৃথিবীর আকুঞ্চন এখনও একেবারে বন্ধ না হওয়ায় এখনো আকুঞ্চনের চাপে মধ্যে মধ্যে ধরাপৃষ্ঠে নূতন নূতন আদিম শ্রেণীর গিরির উৎপত্তিও হইয়া থাকে। ভূগর্ভের স্থানে স্থানে অবস্থিত গলিতদেহ বা স্থিতিস্থাপক আদিগিরি পৃথিবীদেহের আকুঞ্চনের চাপে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত হয় এবং ভূপৃষ্ঠের নিকটে আসিয়া ভূপৃষ্ঠস্থ স্তরের চাপে জমিয়া কঠিন হইয়া যায়।

কতকগুলি পর্ব্বত ভূগর্ভের গভীর প্রদেশে উৎপন্ন হয়। এই সকল পর্ব্বতকে কেহ কেহ যমপুরীর পর্ব্বত (Plutonic rock) বলিয়া থাকেন। এই সকল পর্ব্বত সময়ে সময়ে ভূপৃষ্ঠস্থ উপাদান রাশিকে ঠেলিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় এবং সময়ে সময়ে ইহাদের শিখরদেশ হইতে এক একটী জিহ্বা নির্গত হইয়া উপর দিকে উঠে। যদি এই জিহ্বা ভূপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত পৌছিতে পারে তাহা হইলে ইহার মধ্য দিয়া গলিত প্রস্তররাশি অগ্ন্যুৎ-পাত রূপে বেগে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই গলিত প্রস্তর স্রোতরূপে প্রবাহিত হইয়া গলিত প্রস্তরের স্তরনির্ম্মাণ করে। এই সকল পর্ব্বত মধ্যে যে বাষ্প সঞ্চিত থাকে তাহা বেগে বহির্গত হইবার সময় পর্ব্বতের উপাদান রাশিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার মুখের চারিদিকে

ছড়াইয়া দেয়। এই সকল উপাদানাংশ সঞ্চিত হইয়া মুখের চারিদিকে গোলাকৃতি শৈলস্তূপ উৎপাদন করে। এইরূপে উৎপন্ন পর্ব্বতকে আগ্নেয় পর্ব্বত এবং ইহার মুখকে আগ্নেয় গিরির গহ্বর কহে।

আগ্নেয় গিরির গর্ভমধ্যে প্রচুর পরিমাণে জল এবং জলীয় বাষ্প সঞ্চিত থাকে। কালক্রমে যখন ইহারা শীতল হইয়া যায় তখন এই জলরাশি বেগে ঊর্দ্ধদিকে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই জল অত্যন্ত উষ্ণ বলিয়া যে সকল ধাতুকণা ইহার সংস্রবে আসে তাহারাও গলিয়া ইহার অঙ্গে মিশিয়া যায় এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভূপৃষ্ঠে উত্থিত হয়। উষ্ণজল শীতল হইলে দ্রবীভূত ধাতুকণা ভূপৃষ্ঠের নিকটে ধাতুস্তর রূপে জমিয়া যায়।

এইরূপে ভূগর্ভমধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধাতুকণিকা একত্রীভূত হইয়া মানুষের আয়ত্তগম্য হয় এবং তাহার নানা প্রয়োজন সাধনে ব্যবহৃত হয়।

এইরূপে পুঞ্জীকারিণীশক্তির অপ্রতিহত প্রভাবে ধাতু-প্রস্তরময়ী আদিম পৃথিবী ক্রমশঃ জীবধাত্রী জননী মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করেন।

ক্রমশঃ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

আলোচনা

"তীর্থ ভ্রমণ—জয়পুর" সম্বন্ধে দু-চারিটী কথা।

বিগত ফাল্গুন মাসের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে শ্রীযুক্ত অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত "তীর্থ ভ্রমণ—জয়পুর" শীর্ষক একটী বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় উহাতে দুই একটী ভুল সংবাদ স্থান পাইয়াছে।

লেখক জয়পুর মহারাজার ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান পরলোকগত রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সংসারচন্দ্র সেন মহাশয়ের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন এবং এই পরিবারের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, "জয়পুর সহরে ইঁহারাই একমাত্র বাঙ্গালী সুতরাং বাঙ্গালী তীর্থ ভ্রমণকারিগণ জয়পুর আসিলেই ইঁহাদের আতিথ্য স্বীকার করেন কারণ, নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" সংসার বাবুর পরিবারবর্গের ও তাঁহার ভ্রাতা দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পরলোকগত হেমচন্দ্র সেন মহাশয়দিগের অতিথেয়তার কথা বহুজন বিদিত এবং দেশ পর্য্যটনে আসিয়া অনেকেই যে তাঁহাদের আতিথ্যে মুগ্ধ হইয়াছেন ইহা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু উক্ত পরিচয়ে ভিন্ন জয়পুর সহরে আর বাঙ্গালী নাই এবং লোকে অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাদের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে ইহা কখনই যথার্থ নহে এবং একথা বলিলে জয়পুর-প্রবাসী অন্যান্য বাঙ্গালীদের, বিশেষ ভাবে জয়পুরের বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ জয়পুর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী পরলোকগত রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের পরিবারের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়। আমরা জানি কান্তি বাবুর পুত্রদের কেহ কেহ এখনও জয়পুর রাজ্যে কর্ম্ম করিতেছেন এবং এখনও কান্তি বাবুর গৃহে অতিথিদের জন্য স্বতন্ত্র গৃহাদির ব্যবস্থা আছে। কান্তি বাবু যখন জীবিত ছিলেন তখন স্বদেশবাসীর প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল এবং পূজার সময়ে তিন দিন তাঁহার গৃহে বাঙ্গালী মাত্রেরই নিমন্ত্রণ হইত, এমন কি রেলওয়ে ষ্টেশনে কোন বাঙ্গালী পদাপণ করিলে তাঁহাকে সাদরে কান্তি বাবুর গৃহে আহ্বান করিয়া লইয়া যাওয়া হইত।

প্রবন্ধান্তর্গত একটী প্রতিমূর্ত্তির নিম্নে "৺সংসারচন্দ্র সেন" এই নাম লিখিত আছে। কিন্তু উহা সংসার বাবুর প্রতিকৃতি নহে। প্রতিমূর্ত্তিটী কান্তিবাবুর পুত্র ঈশান বাবুর; যদিও যাঁহারা ঈশান বাবুকে দেখেন নাই তাঁহাদের এবং অন্যান্য অনেকের নিকট উহা অতিশয় সাদৃশ্য হেতু কান্তি বাবুর মূর্ত্তি বলিয়া বিবেচিত হইবে। সংসার বাবুর পরিবারবর্গ ব্যতীত বর্ত্তমানে জয়পুরে আরও অন্ততঃ ১৪।১৫ ঘর বাঙ্গালী কর্ম্মোপলক্ষ্যে বাস করিতেছেন।

বাঙ্গালীর সম্পর্কে জয়পুরের একটী বিশেষত্ব আছে যাহা আমি এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। উহা গোবিন্দজীর পৌরহিত্য। বঙ্গের বাহিরে বিদেশী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেব মন্দিরে বাঙ্গালী পুরোহিতের বিদ্যমানতা বোধ হয়

আর কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে না। এখনো উক্ত মন্দিরে প্রত্যহ সায়ংকালে আরতির পর বাঙ্গালা ভাষায় হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রবাসী বাঙ্গালীর কর্ণে সুধা-ধারা বর্ষণ করিয়া থাকে; ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম শ্লাঘার কথা নহে।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মল্লিক।
দিল্লী।

লিচ্ছবি অধিকার।

লিচ্ছবি জাতি ও তাহাদের সম্বৎ লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের অবগতির জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটী সংবাদ প্রদান করিলাম।

নেপালে যে জাতিকে "জিমদার" বলে, তাহারা আপনাদিগকে "কিরান্তি" বা "কিরাত" কহে। ইহাদিগের মধ্যে দুইটি গোত্র প্রচলিত—কাশী গোত্র এবং লাশা গোত্র; একদল কিরাত বারাণসী ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ হইতে এবং অপর দল তিব্বত হইতে নেপালরাজ্যে প্রবেশ করিয়া পরস্পর আদান-প্রদান সূত্রে বর্ত্তমান জিমদার জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। নেপালের সাধারণ ভাষা "খসকুরা" অর্থাৎ খস্ জাতির ভাষা। কিন্তু ইহা ভিন্ন অনেক জাতির মধ্যে (যথা নেয়ার, জিমদার প্রভৃতি) পৃথক পৃথক ভাষা আছে। জিমদারের ভাষা আনুনাসিকতা বহুল।

জিমদারগণ এককালে নেপালে রাজত্ব করিয়াছে। তাহাদের সংক্ষিপ্তাকারে একটা ইতিহাস আছে। আমি এই ইতিহাস একবার সংগ্রহ করিয়াছিলাম। সে আজ প্রায় চৌদ্দ বৎসর হইল। কিন্তু আমারই অনবধানতায় অনেক বাজে কাগজের সহিত একদিন কালিমপং নামক স্থানে তাহাও পোড়াইয়া দিয়াছি। তাহার পর পুনরায় ঐ ইতিহাস সংগ্রহ করিবার আর সুযোগ ঘটে নাই। যাঁহারা নেপালে থাকেন অথবা প্রতিবারই নেপালে যাইয়া এক একটা আশ্চর্য্য পুঁথি আবিষ্কার করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই জিমদারের ইতিহাস একখানা নকল করিয়া আনিতে পারিবেন। এই ইতিহাসে লেখা আছে যে একজন রাজা (নাম মনে নাই) পট্টন অর্থাৎ পাটনা অধিকার করিয়া তথায় দেউল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

এখন যাহাকে আমরা বেহার বলি, তাহার উত্তরাংশের অনেকটা স্থানই ত এখনো নেপালের অধীন; সুতরাং নেপাল। এই স্থানটাকে মুসলমানদিগের আমল হইতে মোরং কহে। মোরং ও বিহারের সীমাচিহ্ন কোথাও সদা পরিবর্ত্তনশীল ক্ষুদ্র নদী, কোথাও বা কেবল খাল খান্দা। নেপালীরা কতবার এই সীমা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, কতবার বাধা পাইয়া হটিয়া গিয়াছে। এই অঞ্চলে নেপালাধিকৃত নিম্নভূমিকে যেমন মোরং বলে, সেইরূপ তৎসংলগ্ন ইংরাজাধিকৃত স্থানকে "মোগলান" কহে। মোগলের পর ইংরাজ সমগ্র ভারতবর্ষের সহিত বেহারের উত্তরাংশের রাজা হইলেও ভাষার স্থিতিশীলতা শক্তি "মোগলান" কথাটিকে ত্যাগ করিতে পারে নাই। পূর্ণিয়া প্রভৃতি জেলার অনেক স্থান এখনও "সরকার মোরঙ্গের" অন্তর্গত।

নেপালের কথা ছাড়িয়া যদি সিকিমের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে, তথাকার অধিবাসিগণও এক সময় গঙ্গার উত্তর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। আমার সংগৃহীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সিকিমের একটি ইতিহাস আছে।

শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস।

"ভারতবর্ষে প্রচলিত ওজন ও মাপ প্রণালী।"

এই নামে গত চৈত্রের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহা অতি সুন্দর প্রবন্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুই একস্থানে সামান্য অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে, সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ভরসা করি প্রবন্ধ লেখক তজ্জন্য আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

তিনি লিখিয়াছেন, "ভারতবাসীদের দোষ দেওয়া হয় যে তাহাদের ওজন ও মাপ দুইগুণ ও চারিগুণ করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের ওজন প্রণালী কোন নিয়মের ধার ধারে না।" (মানসী ১৫২ পৃঃ ২য় স্তম্ভ।) ভাবিয়া দেখিলে এ দোষ অমূলক নহে। আমাদের টাকা মণ ক্রোশকে তিন ভাগ করিতে গেলেই এ কথার স্বার্থকতা বুঝিতে পারা যায়। আমাদের মণ ক্রোশ ও বিঘাকে তো তিন ভাগ করাই যায় না, পরন্তু টাকাকে তিন ভাগ করিতে গেলে ক্রান্তিতে গিয়া ঠেকে। অথচ কড়া ক্রান্তি নামে কোন মুদ্রা নাই। সুতরাং হিসাবেও লম্বা হইয়া পড়ে, আর এরূপ হিসাব মত টাকা আদায় করাও কষ্টকর। তাই জমীদার ।/৬॥= স্থলে ।/১০ আদায় করেন, নতুবা দয়া দেখাইলে ।/৭॥ পর্য্যন্ত লইতে পারেন। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ইংরেজ ১২ পাইয়ে আনা করিয়া পাই মুদ্রার প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রবন্ধ লেখক "মিটার" বুঝাইতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কিঞ্চিৎ ভুল আছে। ফরাসীরা যখন প্রথম মিটার প্রচলিত করে তখন তাহারা মনে করিয়াছিল ইহা মেরু হইতে বিষুব-রেখার দূরত্বের কোটিভাগের এক ভাগ। কিন্তু পরে

প্রমাণিত হয় যে ইহা ভুল। এখন "পার্লামেণ্টগৃহে সুরক্ষিত প্লাটিনামের তৈয়ারী মাপকাঠি" যেমন ইয়ার্ড বা ইংরাজী গজ, মিটারও তেমনি প্যারিসে রক্ষিত প্লাটিনামের মাপকাঠি। সুতরাং মিটারও "সার্ব্বজনীন মাপ" নহে।

"ইংলণ্ডে হরেক রকম ওজন চলিত আছে" বলিয়া প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন যে,"ইংরাজদের নিজেদের ঘর এ বিষয়ে দুরস্ত নহে।" কথাটা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। ইংলণ্ডে প্রকৃতপক্ষে দুই প্রকারের ওজন আছে সত্য (কারণ চিকিৎসকদিগের পাউণ্ড, গ্রেণ ও ট্রয় ওজনের পাউণ্ড হইতে পৃথক নহে) আর আমাদের দেশেও ঠিক সেইরূপ দুই প্রকারের ওজন আছে। কিন্তু ইহার প্রয়োজনীতাও আছে। যে দোকানদার ২।৪ পয়সার জিনিষ বিক্রয় করে তাহার পক্ষে একমণ আধমণ বাটখারা না রাখিলেও চলে; আর স্বর্ণ রৌপ্যের দোকানদার সের আধসের পাঁচসের লইয়া কি করিবে? তাহার তোলা মাষা রত্তি চাই। তুলাদণ্ড সম্বন্ধেও সেই কথা। বড় দোকানদারের সর্ব্বদা কাঁটা বা লৌহের তুলাদণ্ড, ছোট দোকানদারের সাধারণ কাঠের দাঁড়িপাল্লা বা তারাজু, আর স্বর্ণরৌপ্যের দোকানদারের জন্য নিক্তি চাই।

"গ্রাম" ওজনের একক হইলে বৃহত্তম একক মিরিয়াগ্রামেও বড় দোকানদারের সুবিধা হইবে না। কারণ মিরিয়াগ্রাম প্রায় ১০ সেরের সমান। সুতরাং দোকানদারকে এক বস্তা চাউল ওজন করিতে ১০টি মিরিয়াগ্রাম কিম্বা ১০০টা কিলোগ্রাম বাটখারা রাখিতে হইবে। আর ১০০ কিলোগ্রামের একটা বাটখারা রাখিলে বড় বড় সংখ্যা লইয়া কারবার করিতে হইবে। এই বড় সংখ্যার হাত এড়াইবার জন্যই বিবিধ প্রকারের ওজনের বিভিন্ন নামকরণ হইয়াছে। নতুবা একটি মাত্র বাটখারা, সের বা পাউণ্ড রাখিলেই চলিত। সুতরাং বড় বড় ব্যবসায়ীর পক্ষে কিলোগ্রাম ওজনে তেমন সুবিধা নাই।

"গ্রাম" ওজন বুঝাইতে গিয়া প্রবন্ধ লেখক একটি বিষয় বাদ দিয়াছেন। সর্ব্বাবস্থায় এক ঘন-সেণ্টিমিটার জলের ওজন কি এক গ্রাম? শতাংশিকের ৪ ডিগ্রী উত্তাপের জলই লইতে হইবে, এই প্রকার বলা উচিত ছিল।

আর যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে মিটার পৃথিবীর পরিধির ৪ কোটি ভাগের এক ভাগ আর কিলোগ্রাম ৪ ডিগ্রী উত্তাপের এক ঘন-সেণ্টমিটারের ওজনের নাম, তাহা হইলেই কি সাধারণ লোকের পক্ষে দৈর্ঘ্য ও ওজনের সত্যাসত্য পরীক্ষা করা সম্ভব? কেহ ছোট গজ ব্যবহার করিতেছে কি না জানিতে হইলে এখন আমরা সাহেবের দোকানের বিলাতী গজের মাপের সহিত মিলাইয়া দেখি। সের ঠিক কি না জানিতে হইলে ৮০ টাকার ওজনের সহিত তুলনা করি। মেট্রিক সিষ্টেম চলিলে সন্দেহ দূর করিতে তখনও সাধারণ লোককে তাহাই করিতে হইবে। সে পৃথিবীর পরিসরও মাপিতে যাইবে না, ৪ ডিগ্রী উত্তাপের জলও ওজন করিয়া "গ্রাম" ঠিক করিবে না।

তবে বৈজ্ঞানিকের কথা স্বতন্ত্র। তিনি পৃথিবীর পরিধিও মাপিতে পারেন, আবার ৪ ডিগ্রী উত্তাপের জল ওজন করাও তাঁহার পক্ষে কঠিন নহে। বৈজ্ঞানিকগণ যে মেট্রিক মাপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কারণ দুইটি। প্রথম, দৈর্ঘ্যের ক্ষুদ্রতম ইংরাজী মান ইঞ্চি এবং ওজনের ক্ষুদ্রতম ইংরাজী মান গ্রেণ অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর মান মেট্রিক প্রথায় আছে। দ্বিতীয় কারণ—মেট্রিক মাপ ও ওজন চালাইলে পাটিগণিত হইতে মিশ্র যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, উঠিয়া যাইবে। এখন টাকা আনা পাই কতকগুলি যোগ করিতে হইলে, শুধু যোগ করিলেই নিস্তার নাই, ভাগও দিতে হয়, কিন্তু মেট্রিক প্রথায় শুধু যোগ-করিলেই হইল। যোগে ভাগের প্রয়োজন নাই।

শ্রীরাখালরাজ রায়।

নিয়তি

(গল্প)

তাহাকে আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। তাহার আকৃতিতে একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাহার তপ্ত-কাঞ্চন গৌরবর্ণ, কমনীয় মুখমণ্ডল, প্রশস্ত ললাট, ভ্রমর-কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশরাজি, দীর্ঘায়ত ভাব-চঞ্চল নয়নযুগল এবং উন্নত ঋজুদেহ আমার চিত্তে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ সৌন্দর্য্যে সকলেই মুগ্ধ হয়; কিন্তু সত্য বলিতে কি, তাহার বিনয়-নম্র মিষ্ট ব্যবহারেই আমি তাহার অত্যন্ত অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাহার সহিত পরিচয় অধিক দিনের নহে; কিন্তু অত্যল্প কালের মধ্যেই তাহার সহিত আমার বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। উভয়ের মধ্যে বয়সের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল বটে; কিন্তু তজ্জন্য বান্ধবতার প্রভাব খর্ব্ব হইবার অবকাশ পায় নাই। প্রত্যহ সে নিয়মিত সময়ে আমাদের আপিসে আসিত। প্রতি সপ্তাহে কাগজের অর্ডার দিবার দিনও সে অনুপস্থিত থাকিত না। সেদিন যদিও আমাদের কাজ খুবই বেশী থাকিত, কাহারও সহিত বেশীক্ষণ আলাপ করিবার অবসর থাকিত না বটে, কিন্তু আমার এই নবীন বন্ধুটি সম্বন্ধে সে নিয়ম খাটিত না। সাহিত্য চর্চ্চায় তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। বিশেষতঃ আমার লেখার প্রতি তাহার অখণ্ড শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। এজন্য তাহার সম্বন্ধে আমার পক্ষপাতিত্বদোষ যদি কেহ অনুমান করিয়া লন, তাহাতে আমার প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। অন্ধ ভক্তের প্রতি আকর্ষণটা খুবই স্বাভাবিক। উহা মানব মনের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক হইতে পারে; কিন্তু উহার প্রভাব অতিক্রম করিবার সামর্থ্য যে আমার ছিল না তাহা অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিতেছি। সত্য বলিতে কি, যে দিন আমার নবীন বন্ধু নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইতে বিলম্ব করিত, সে দিন আমি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িতাম। কম্পোজিটর্-দিগের ঘোরতর তাগাদা সত্ত্বেও সেদিন আমার বিংশতি-বর্ষের অভ্যস্ত দ্রুত লেখনীও প্রবন্ধ প্রসব করিতে বিলম্ব করিত।

সে যে বাড়ীতে বিবাহ করিয়াছিল, তাঁহারা বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ও লক্ষ্মীমন্ত বলিয়া সমাজে পরিচিত ছিলেন। আমার সঙ্গে সে বাড়ীর কাহারও তেমন পরিচয় ছিল না বটে; কিন্তু তাঁহাদিগের নাম আমার জানা ছিল। সে বনিয়াদী জমিদারের গৃহ-জামাতা, সুতরাং বেশ-ভূষায় আড়ম্বর ত তাহার থাকিবেই। বাড়ীর গাড়ীতেই সে আমাদের আপিসে আসিত। প্রত্যহ নবসাজে সে সজ্জিত হইত। কোনও দিন সোনার বোতাম, কোনও দিন হীরক বা চুনি পান্না খচিত বহুমূল্যের বোতাম তাহার জামায় দেখিতাম। অঙ্গুলিতে মূল্যবান অঙ্গুরীয়, সোনার ঘড়ী, গার্ডচেন—এ সকল প্রত্যহই তাহাকে ব্যবহার করিতে দেখিতাম। বেশভূষার এত আড়ম্বর সত্ত্বেও কিন্তু তাহার ব্যবহারে দাম্ভিকতা বা ধনগর্ব্বের কোনও লক্ষণ প্রকাশ পাইত না। সে যেন মাটীর মানুষ। আপিসের সকলেরই সহিত সে সমান ভাবে আলাপ পরিচয় করিত, মিশিত। কম্পোজিটর, প্রেস্‌ম্যান, ম্যানেজার সকলেরই সহিত তাহার সদ্ভাব ছিল।

পূজার কাগজ কাল বাহির হইবে। তাহার পরই পনের দিনের অবকাশ। চারিদিকেই ব্যস্ততা। এই অবকাশে একবার দার্জ্জিলিং যাইব স্থির করিয়াছিলাম। আমার কোনও বাল্যবন্ধু সেখানে বেড়াইতে গিয়াছেন; অনেক দিন হইতেই তিনি আমাকে সেখানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। সহকারীদিগের উপর কার্য্যভার দিয়া আমি অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারিতাম; কিন্তু আমার জনৈক অংশীর সহিত পূজার পূর্ব্বে ব্যবসায়ের হিসাব নিকাশ ও আয়ব্যয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি কাজ বাকী ছিল বলিয়া এতদিন যাইতে পারি নাই। পূজার কাগজে চটক্‌দার প্রবন্ধ, গল্প,

ছড়া প্রভৃতি লিখিবার তাড়া খুবই ছিল, সুতরাং আজ আর কাহারও নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না। সহকারীদিগকে খুব তাড়া দিতেছিলাম।

অপরাহ্ণ ঘনাইয়া আসিল। আকাশটা কয়দিন ধরিয়াই মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আছে। আজ মৃদু বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। বেশ কায়দা করিয়া, দেশের কোন কোনও বড়লোককে লক্ষ্য করিয়া একটি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিয়াছিলাম। কম্পোজিটর প্রুফ আনিয়া দিল। লেখাটা নিজের মন্দ লাগে নাই; কিন্তু প্রকৃত সমজদার কোনও শ্রোতাকে না শুনাইতে পারিলে মনে তৃপ্তি পাইতেছিলাম না। সহকারিগণকে অবশ্য শুনাইয়া দিয়াছি। তাঁহারা ভালই বলিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে মন উঠিতেছে না। আজ আমার নবীন বন্ধুটি এখনও আসিল না কেন? প্রত্যহ এমন সময় হাজিরা দিতে কখনও সে ত ভুলেনা। আকাশে মেঘের সঞ্চার দেখিয়া এবং বারি-পাতের আশঙ্কায় সে কি আসিল না? তাহাই বা বলি কি প্রকারে? শ্রাবণের ঘনবর্ষণ এবং পচা ভাদ্রের দুর্য্যোগের মধ্যেও সে প্রত্যহ যথাসময়ে হাজিরা দিয়া গিয়াছে। তবে আজ সে আসিল না কেন? মনটা বড়ই অপ্রসন্ন হইয়া রহিল।

প্রথমবার প্রুফ দেখা শেষ হইয়া গেল। সহকারী-দিগকে বাড়ী যাইবার জন্য আদেশ দিলাম। অর্ডার প্রুফের এখনও যথেষ্ট বিলম্ব আছে, তাঁহাদিগকে অকারণ কষ্ট দিয়া কোনও লাভ নাই।

আলবোলার নলটি তুলিয়া লইয়া একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। বাস্তবিক, সাপ্তাহিকের সম্পাদকী করা কি ঝকমারী! নিজের কাগজ বলিয়া কাজটা ততটা বিরক্তিকর নহে; কিন্তু বাঙ্গালা সাপ্তাহিকের বেতনভুক্ সম্পাদকগণের দুর্দ্দশা ত চোখে দেখিয়াছি। জন্মান্তরের নিতান্ত দুর্ভোগ না থাকিলে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের এডিটরী করিতে হয় না।

একটু নিবিষ্ট মনে ধূমপানে ব্যস্ত, এমন সময় সহসা দরজা খুলিয়া গেল। ম্যানেজার উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ব্যাপার শুনিয়াছেন?"

আমি বিস্মিত ভাবে বলিলাম, "কি?"

উত্তেজনা কিয়ৎ পরিমাণে সংযত করিয়া ম্যানেজার বলিলেন, "কলিকালে কাহাকেও বিশ্বাস করিবার যো নাই। বাহিরের চেহারা দেখিয়া বিশ্বাস করিলে প্রায়ই ঠকিতে হয়। আমার গোড়া থেকেই কেমন সন্দেহ হইয়াছিল যে, ছোকরার অভিসন্ধি ভাল নয়।"

আমি অধীরভাবে বলিলাম, "আপনার কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। হেঁয়ালি রাখিয়া, আসল কথাটা খুলিয়া বলুন। বেশী ভনিতা করিবেন না।"

ম্যানেজার হরেন্দ্র বাবু নম্রস্বরে বলিলেন, "আজ্ঞে, সেই ছোকরা; * * বাড়ীর জামাই না কি হয়, সেই ছোকরার কথা বলিতেছিলাম। তার এমন ছোট নজর যে, শেষে সামান্য উপহারের বই পর্য্যন্ত চুরি—"

আলবোলার নল ফেলিয়া দিয়া আমি ম্যানেজারের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিলাম। তিনি সহসা থামিয়া গেলেন।

আমি বলিলাম, "সংক্ষেপে আসল ঘটনাটা বলুন। ফেনাইয়া বা বিশেষণ দিয়া বলিবার কোন প্রয়োজন নাই।"

সম্ভবতঃ ম্যানেজার বাবু আমার এরূপ রূঢ় আচরণে কিছু বিস্মিত অথবা অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কারণ এরূপ ভাবে এ যাবৎ আমি কখনও তাঁহার সহিত কথা কহি নাই। সত্য বলিতে কি তাঁহার ভনিতা তখন আমার অসহ্য বোধ হইতেছিল।

ঘটনাটি সম্বন্ধে তিনি অতঃপর সংক্ষেপে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝিলাম, আজ পূজার উপহার "সুরেন্দ্র গ্রন্থাবলী" ভিঃ পিতে পাঠান হইতেছিল। জনৈক কর্ম্ম-চারী কতিপয় উপহার গ্রন্থ আনিয়া ম্যানেজার বাবুকে দেখাইয়া ভি পি ফারমগুলিতে তাঁহার স্বাক্ষর করাইয়া লইতে আসিয়াছিলেন। ম্যানেজার বাবু সে সময়ে কোনও বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া তখন সহি করান হয় নাই। কাজেই কর্ম্মচারী মহাশয় উপহার গ্রন্থগুলি এবং ফারম ম্যানেজার বাবুর টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া যান। সেই সময় আমার যুবক-ভক্তটি সেখানে বসিয়া ম্যানেজার বাবুর সহিত গল্প করিতে-

ছিল। তৃতীয় কোনও ব্যক্তি সেখানে ছিল না। ম্যানেজার বাবু হঠাৎ একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজে কয়েক মিনিটের জন্য কক্ষান্তরে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া উপহার পাঠাইবার ভি পি ফারমগুলি স্বাক্ষর করিয়া দেন। কর্ম্মচারী পুস্তকের সংখ্যা মিলাইয়া লইবার সময় দেখিলেন যে, একপ্রস্ত উপহার পাওয়া যাইতেছে না। কর্ম্মচারী শপথ করিয়া বলিলেন যে, তিনি প্রত্যেক বই গণিয়া সেখানে রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার গণনার ভুল নাই; নিশ্চয়ই কেহ না কেহ পুস্তক সরাইয়া রাখিয়াছে। কে লইবে? অন্য কেহ সেখানে আসে নাই। ব্যাপারটি অতি তুচ্ছ, ম্যানেজার বাবু উপেক্ষা করিতে পারিতেন। হাজার হাজার পুস্তকের মধ্যে একখানা পুস্তক পাওয়া না গেলে কোনও ক্ষতি হইত না; কিন্তু ইদানীং উপহার গ্রন্থের অধিকাংশ পুনঃ পুনঃ অপহৃত হওয়ায় আমরা কঠোর আদেশ দিয়াছিলাম, পুস্তক হারাইয়া গেলে কর্ম্মচারীদিগের মাহিনা হইতে উহার দাম কাটিয়া লওয়া হইবে। সুতরাং বহিচোর ধরিবার নিমিত্ত সকলেরই আগ্রহ বাড়িয়াছিল। চারিদিকে অনুসন্ধান হইতে লাগিল। যুবক তখন সেখান হইতে উঠিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছিল। তাহার উপর কাহারও অকস্মাৎ সন্দেহ জন্মিবার কোনও কারণ ছিল না। কিন্তু সহসা কোনও গুরুভার দ্রব্য ভূমতলে পড়িয়া যাওয়ায় সকলেরই দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়। ম্যানেজার বাবু দেখিতে পাইলেন, যুবকের পদতলে অপহৃত গ্রন্থ পড়িয়া আছে।

বর্ণনা শেষে ম্যানেজার বাবু বলিলেন, "এখন এ ব্যক্তি সম্বন্ধে কি করা যায়? সকলেরই ইচ্ছা পুলিশ ডাকিয়া চোরকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করা হউক। বাস্তবিক, ভদ্র সন্তানের পক্ষে এরূপ গর্হিত কার্য্য আর নাই। এরূপ করিলে ভবিষ্যতে আর কিছু চুরি যাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।"

গম্ভীর ভাবে আমি বলিলাম, "তাহাকে একবার আমার কাছে পাঠাইয়া দিন। তারপর যাহা ব্যবস্থা করিবার তাহা আমিই করিতেছি।"

মনের মধ্যে যেন একটা ওলট পালট্ হইয়া গেল। হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে একটা যন্ত্রণা অনুভূত হইতেছিল। কে সে? তার জন্য আমার এ চিত্তবিকার কেন? তাহার এ চৌর্য্যবৃত্তির কথা জানিতে পারিয়াও মন কেন এখনও তাহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল না?

আকাশে মেঘের উপর কালো মেঘ আরও জমিতেছিল। মাঝে মাঝে দীপ্ত দামিনীর চকিত হাস্য দেখা যাইতেছিল। আমি পুনঃ পুনঃ দ্বারপথে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম।

ম্যানেজার বাবু ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পশ্চাতে অবনত মুখে আমার নবীন বন্ধু। এখনও তাহাকে বন্ধু বলা চলে কি? তাহার প্রসন্ন আননে আজ হাসির রেখা একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। যে সুগৌর মুখমণ্ডলে সর্ব্বদা গোলাপের বর্ণরাগ দেখিতে পাইতাম, আজ সেই আনন মৃতের মুখের ন্যায় বিবর্ণ।

ম্যানেজার তাহাকে আমার কাছে দিয়া চলিয়া গেলেন।

আমি উঠিয়া দ্বার বন্ধ করিলাম।

যুবক তখনও তদবস্থায় দাঁড়াইয়া। মাঝে মাঝে তাহার দেহ যেন তাড়িত-স্পৃষ্টের ন্যায় শিহরিয়া উঠিতেছিল। আমি তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে একখানি চেয়ারে বসিতে বলিলাম।

যুবক শিহরিয়া একবার আমার মুখের পানে চাহিল। আবার তখনই দৃষ্টি নত করিল।

আমি বলিলাম, "দাঁড়াইয়া কেন, বসুন।"

সম্ভবতঃ আমার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক রূপে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। হয়ত সমবেদনার করুণ রাগিণী কণ্ঠস্বরে দুই একটা ঝঙ্কার দিয়াছিল। যুবক আবার শিহরিয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া কি যেন বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

তাহার মনের অবস্থা কতকটা বুঝিয়াছিলাম।

বেহারাকে দুই পেয়ালা চা আনিতে বলিলাম। যুবক আবার চমকিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, "আপনি অত কুণ্ঠিত হইতেছেন

কেন? সঙ্কোচ এবং আশঙ্কার কোন কারণ নাই। আমি ত বরাবরই আপনাকে কনিষ্ঠের স্থায় স্নেহ”—

এবার যুবক আর নীরব থাকিতে পারিল না। সে সলম্ফে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে বলিল, “আপনি বোধ হয় মানুষ নন! এখনও এই চোরের সহিত ভদ্রব্যবহার করিতেছেন? ভদ্রসন্তানের পক্ষে যার চেয়ে ঘৃণিত কাজ নাই, আমি সেই অপরাধ করিয়াছি, তবু আপনি নিজের সম্মুখে তাহাকে বসাইয়া, তাহাকে ‘আপনি’ বলিতেছেন, চা-র পাত্র মুখে তুলিয়া দিতেও কুণ্ঠিত নহেন!”

অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিলাম, “আজিকার ব্যাপারে বাস্তবিক আমি বড় লজ্জিত হইয়াছি। আমাদের কর্ম্মচারীরা আপনার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে তাহাতে সত্যই আমি দুঃখিত। এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই কিছু রহস্য আছে। লোকে আপনাকে যাহাই বলুক না কেন, আমি তাহা বিশ্বাস করি না। আপনি ইচ্ছা পূর্ব্বক কখনই—”

কথাটা শেষ করিতে প্রবৃত্তি হইতে ছিল না।

যুবক অত্যন্ত বিস্মিতভাবে আমার দিকে চাহিল। আমি সত্য বলিতেছি কি বিদ্রূপ করিতেছি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু আমার বাক্যে বা ব্যবহারে বিদ্রূপের কোনও লক্ষণ ছিল না। সে বলিল, “আপনি অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। সত্যই আমি বই চুরি করিয়াছিলাম। আপনি স্নেহের অনুরোধে আমার এই অমার্জ্জনীয় আপরাধটাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহা সত্য নয়। প্রকৃতই আমি চোর; দশের কাছে, সমাজের নিকট ভদ্রসন্তানের প্রাপ্য সম্মান আমি হারাইয়াছি। ভাবিতেছেন, যাহার গায় সিল্কের পাঞ্জাবী, হীরা পান্নার বহুমূল্য বোতাম, সোনার ঘড়ী চেইন্‌, অঙ্গুলিতে হীরকাঙ্গুরীয়, সে কেন সামান্য বই চুরি করিবে? যাহার পরণের কাপড়খানা পুরাতন দরে বেচিলেও অমন তিন প্রস্থ উপহার গ্রন্থাবলী কিনিতে পারা যায়, সে কেন এমন কাজ করিবে? কিন্তু তা’ নয়, সম্পাদক মহাশয়। আমার এ বেশ শুধু অভিনয়ের জন্য। আমার ইতিহাস শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন, প্রকৃতই আমি চোর!”

উত্তেজনার আতিশয্যে যুবক হাঁপাইতে লাগিল।

বেহারা চা লইয়া আসিল। এক পেয়ালা তাহাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলাম।

উদ্‌ভ্রান্তভাবে আবার আমার দিকে চাহিয়া যুবক বলিল, “এখনও আপনার মনে সেই বিশ্বাস আছে? এখনও আপনি আমায় ঘৃণার চোখে দেখিতেছেন না? চোরকে এখনও পুলিশের হাতে দিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন? এত বড় সত্যটাকে আপনি বিশ্বাস করিতে চাহেন না? কিন্তু জানিয়া রাখুন, প্রকৃতই আমি চুরি করিয়াছি। লক্ষপতির জামাতা, বিপুল সম্পত্তির ভাবী উত্তরাধিকারী হইয়াও অবস্থা গতিকে আজ আমাকে দুই তিন টাকা মূল্যের বই চুরি করিতে হইয়াছে। সব কথা আপনাকে খুলিয়া বলিলেই তখন আপনার বিশ্বাস হইবে, আমি সত্যই চোর।”

চেয়ারে অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িয়া যুবক কিয়ৎকাল উভয় হস্তে মুখমণ্ডল আবৃত করিল। তাহার ঘন ঘন শ্বাস পড়িতেছিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার হৃদয় যেন চূর্ণ হইয়া যাইতেছিল।

বৃষ্টিধারা প্রবলবেগে নামিয়া আসিল।

আমি বলিলাম, “আপনার কোন কথা বলিয়া কাজ নাই। চা ঠাণ্ডা হইয়া গেল, আগে উহা পান করিয়া ফেলুন।”

আমার কথা যেন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। সে একবার মেঘমেদুর আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া আপন মনে বলিয়া চলিল, “ছেলেবেলা বেশ ছিলাম। দরিদ্রের সন্তান বটে, দুই বেলা পর্য্যাপ্ত আহার দূরে থাকুক সব সময়ে একমুষ্টি অন্নও যুটিত না; কিন্তু তথাপি তখন বেশ ছিলাম। পিতার চারিটি সন্তানের মধ্যে আমিই জ্যেষ্ঠ। গ্রামের ইংরাজী স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়িতাম। বাবা স্কুলের মাহিনা যোগাইয়া উঠিতে পারিতেন না। অনেক সহি-সুপারিসের বলে বিনা বেতনে স্কুলে পড়িতেছিলাম। লেখাপড়ায়

মনোযোগ ছিল বলিয়া প্রতি বৎসরেই প্রশংসার সহিত উপরের শ্রেণীতে প্রোমোশন পাইতাম। পাঠ্য পুস্তক কিনিবার অর্থ জুটিত না। অন্যের বহি দেখিয়া হাতে লিখিয়া নকল করিয়া লইতাম। দুই সন্ধ্যা আহার ত সব সময়ে জুটিতই না, কোনও দিন চারিটি মুড়ি, কোনও দিন শুধু শাকের ডাল্না খাইয়া স্কুলে যাইতাম। ছোট একখানি গোলপাতার ঘরে আমরা থাকিতাম। দাওয়ার উপর মা রন্ধনাদি করিতেন। বাবা সামান্য বেতনে গ্রামের জমীদারের বাড়ী মুহুরী ছিলেন। অতি কষ্টেই আমাদের সংসার চলিত। এক এক দিন এমন অবস্থা ঘটিত যে, আর বুঝি চলে না; কিন্তু সচল সংসারে অচল কিছুই থাকে না, একরকমে দিন চলিয়া যাইতই। কি করিয়া চলিত তাহা বিধাতাই জানেন। মা আমার পুণ্যবতী, লক্ষ্মীরূপিণী ছিলেন। কত কষ্টে যে তিনি আমাদিগকে লালন পালন করিতেন, কত দুঃখে যে তিনি দিনযাপন করিতেন, তাহা দয়াল ঠাকুরই জানিতেন। দরিদ্রের সন্তান অল্পবয়সেই নিজের অবস্থা বুঝিতে পারে; সুতরাং আমিও কিছু কিছু বুঝিতাম। ছোট ছোট দুটি ভাই ও ভগিনী অতটা বুঝিত না। মার দুঃখে অনেক সময় নির্জ্জনে অশ্রুপাত করিতাম। মনে মনে সংকল্প ছিল, লেখা পড়া শিখিয়া, মানুষ হইয়া মার চোখের জল মুছাইয়া দিব। সেজন্য অখণ্ড মনোযোগের সহিত লেখাপড়া করিতাম। রাত্রে প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িবার সামর্থ্য ছিল না। অন্য সহপাঠীর বাড়ীতে গিয়া তাহাদের সহিত বসিয়া পাঠাভ্যাস করিয়া আসিতাম।

"এত যে দুঃখ, দারিদ্র্য, তবুও তখন বেশ ছিলাম। মুক্ত প্রান্তরে প্রাণ ভরিয়া দৌড়িতাম, নদীর বুকে সাঁতার দিতাম, গাছের মাথায় চড়িয়া ফল পাড়িতাম। মাকে আনিয়া দিতাম। পল্লীলক্ষ্মীর শ্যাম অঞ্চল-ছায়ায় তখন যে সুখ যে শান্তি পাইয়াছি, সছিদ্র কুটীরে বাস করিয়া যে তৃপ্তি লাভ করিয়াছি, ধূলা কাদা মাখিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি, জন-কোলাহল-মুখরিত মহানগরীর প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বাস করিয়া, গাড়ী ঘোড়া চড়িয়া এবং আতর গোলাপ মাখিয়া এখন ত সেরূপ তৃপ্তি বা শান্তি পাই না! মার সেই ছিন্নবাস-পরিহিত শ্রমখিন্ন দেহের স্মৃতি, স্নেহ প্রেম মণ্ডিত কোমল মুখচ্ছবি এখন মনে পড়িতেছে। কিন্তু হতভাগ্য আমি, এখন তাঁহার স্নেহক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়াছি।"

আকাশের গুরু গর্জ্জনে আমাদের বাড়ীটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি পড়িতেছিল। আশ্বিন মাসে এমন শ্রাবণের ঘনঘটা প্রায় দেখা যায় না। বেহারা কলিকা বদ্‌লাইয়া দিয়া গেল। অর্ডার প্রুফের এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

যুবক বলিতে লাগিল—"মার দুঃখ দূর করিব বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার বহুপূর্ব্বে বিধাতার অলক্ষ্য ইঙ্গিতে সব ওলট-পালট হইয়া গেল। ভাগ্যলক্ষ্মী একদিন তাঁহার সোনার ঝাঁপি খুলিয়া সুখসম্পদের আশীষ-ধারা আমার শিরে মুক্ত হস্তে বর্ষণ করিলেন। আমরা দরিদ্র হইলেও কুলগরিমায় শ্রেষ্ঠ ছিলাম। রূপবান বলিয়া আমার খ্যাতিও ছিল। একদিন শুনিলাম, আমার বিবাহ হইতেছে। কোনও ধনবান জমীদার, টাকার তোড়ার বিনিময়ে আমায় গৃহ-জামতারূপে কিনিয়া লইতেছেন। সেখানে পরম সমাদরে ভোগসুখে থাকিতে পারিব। পরিণামে বহু সহস্র মুদ্রা আয়ের জমীদারীর মালিক হইতে পারিব। আপাতত আহার বিহার, বসন ভূষণ, আমোদ প্রমোদ, গাড়ী জুড়ি কিছুরই অভাব হইবে না। পিতা মাতার অন্নকষ্টও দূরীভূত হইবে।

"দারিদ্র্যপিষ্ট পিতামাতা এ শুভ-সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। সন্তান শ্বশুরালয়ে থাকিবে তাহাতে দোষ কি? অমন ত অনেকেই থাকে। পরম সুখে ভোগ বিলাসে সে থাকিতে পাইবে, সেটা ত বহু ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। জমীদারের পক্ষ হইতে যাঁহারা আমায় দেখিতে আসিয়াছিলেন, কয়েকদিন ধরিয়া বাবার সহিত তাঁহাদের গোপনে পরামর্শ চলিতে লাগিল। গ্রামের লোক আমার ভাবী সৌভাগ্যের

সম্ভাবনায় নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। অনেকের ঈর্ষ্যার পাত্রও যে না হইয়াছিলাম তাহা নহে। স্কুলের মাষ্টার মহাশয়গণ পর্য্যন্ত আমার কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। সব কথাই আমি কিছু কিছু শুনিতে পাইলাম।

"তখন সবে কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। আশা, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা—সোনার পাখা মেলিয়া হৃদয়াকাশের চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইত। দরিদ্রের সন্তান হইলেই যে তাহার কল্পনাও দরিদ্র হইবে ইহার কোন অর্থ নাই। সুতরাং নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও জীবনে সুখস্বপ্নের ঘোর সর্ব্বদাই লাগিয়া ছিল। অতুল ঐশ্বর্য্যবান্ শ্বশুরের জামাতা হইব, নানা সুখ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারিব, এই মধুর চিন্তায় আমার মনও বিশেষরূপে আলোড়িত হইয়াছিল। নগর ত কেবল ভূগোল ও ইতিহাসেই পড়িয়া আসিয়াছি, চোখে দেখিবার সৌভাগ্য কখনও ঘটে নাই। এখন সেই রাজধানীর বক্ষে সর্ব্বদা বাস করিতে পাইব, এ চিন্তা আমাকে অধীর করিয়া তুলিল।

"কথা পাকা হইয়া গেল। বাবা তাঁহার প্রাপ্য গণ্ডা বুঝিয়া লইলেন। তিনি কি পাইয়াছেন তাহা আমি জানিতাম না। তবে তাঁহার প্রসন্ন মুখমণ্ডল এবং ব্যস্ততাপূর্ণ ভাব দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, দারিদ্র্য সহসা তাঁহাকে আর কাবু করিয়া ফেলিতে পারিবে না, এমন ভাবেই গুছাইয়া লইয়াছেন। শুধু মার মুখখানি তেমন প্রসন্নতার আলোকে সমুজ্জ্বল দেখিলাম না। অবশ্য দারিদ্র্য দুঃখ হইতে উদ্ধার লাভের সম্ভাবনা হইল বটে; কিন্তু পুত্র আজীবন শ্বশুরালয়ে থাকিবে এ চিন্তাটা বোধ হয় তাঁহার কাছে ততটা প্রীতিকর হয় নাই। তবে উপায়ান্তর নাই দেখিয়া অগত্যা তিনি চেষ্টা করিয়া মনের ব্যথা মনে লুকাইয়া রাখিলেন। তখন তাহা বুঝি নাই, এতদিন পরে আত্মচিন্তা দ্বারা আমি মার তখনকার মনের ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

"একদা শুভ-সন্ধ্যায়—তখন শুভ বলিয়াই মনে হইয়াছিল—বরবেশে সাজিয়া মাতৃপদ বন্দনায় পর প্রকাণ্ড সুসজ্জিত বজরায় চড়িলাম। আমাদের গ্রামে রেল যায় নাই, নদীপথেই আসিতে হইত। খানিকটা মাত্র রেলপথে আসা যাইত। পুনঃ পুনঃ যান পরিবর্ত্তনে কষ্ট হইবার সম্ভাবনা এবং শীতকালে ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কাও ছিল না। তাই শ্বশুর মহাশয় তাঁহার বজরা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ নিজের ধন গরিমার পরিচয় দেওয়াও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য হইতে পারে।

"সেদিনের স্মৃতি আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। আমার জীবন-নাট্যের পরিবর্ত্তন সেইদিন ঘটিয়াছিল, সুতরাং সে দিনের কথা চিরকাল মনে থাকিবে। আজন্মের পরিচিত নদীতট, প্রান্তর, ঘোষেদের আমবাগান, রামের মার কুলতলা, সবই পড়িয়া রহিল; আর কখনও এখানে ফিরিয়া আসিব কি না কে বলিবে? এ যেন আমার চিরনির্ব্বাসন হইতেছে! বিবাহের সর্ত্তানুসারে পিতাঠাকুর মহাশয়কে শপথ করিতে হইয়াছিল যে, তিনি কোনও দিন আমাকে এই গ্রামে অথবা তাঁহার নিকটে আনিবার চেষ্টা করিবেন না। বাবা আমাকে সে কথা জানাইয়া রাখিয়াছিলেন।

"সন্ধ্যার পর বজরা নদীর ঘাট ত্যাগ করিল। বহুলোক বজরা দেখিবার জন্য ঘাটে জটলা করিতেছিল। তন্মধ্যে আমার বাল্যসঙ্গী, খেলার সাথীও অনেকে ছিল। তাহাদিগকে ছাড়িয়া কোন্ অনির্দ্দিষ্ট রাজ্যে, অপরিচিত স্থলে চলিয়াছি! সর্ত্তানুসারে, ইচ্ছা থাকিলেও আর ফিরিয়া আসিতে পারিব না। অন্ততঃ কিছু কালের জন্য ত নহেই। মন এক একবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু পিতা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আমি সন্তান হইয়া তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট করিব কিরূপে?

"সেদিন পঞ্চমী তিথি। মৃদু জ্যোৎস্নালোকে নদীর জল শিহরিয়া উঠিতেছিল। গাছের পাতায় ক্ষীণ রশ্মিরেখা নাচিতেছিল। আমি আনমনে বসিয়া তাহাই দেখিতেছিলাম। দেখিতেছিলাম, ক্রমে বজরা আমাদের গ্রামখানি পশ্চাতে ফেলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। বজরায় নহবৎ রসোনচৌকীর বন্দোবস্ত ছিল। বাদকেরা সুরে লয়ে রাগিণী আলাপ করিতেছিল। নদীর বুকে

নহবতের রাগিণী কত মিষ্ট কত মধুর তাহা যে না শুনিয়াছে সে বুঝিবে না। সানাই সুধাধারা বর্ষণ করিতেছিল; কিন্তু আমার প্রাণে সুর তেমন জমিতে-ছিল না। আমি একান্তে বসিয়া দূরে বিলীন-প্রায় গ্রাম-খানির দিকে চাহিয়া ছিলাম। অস্পষ্ট আলোকে গ্রামের রেখা আরও অস্পষ্ট দেখাইতে লাগিল, শেষে একটা বাঁকের অন্তরালে আমার জন্মভূমির শেষ দৃশ্য মিলাইয়া গেল। অসহ্য বেদনায় তখন আমার বুকের পঞ্জরগুলি যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।"

দেখিলাম, যুবকের নয়ন-প্রান্তে মুক্তা-বিন্দু ঢলিতেছে। তাহার আরক্ত নাসারন্ধ্র স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। সে প্রাণপণ যত্নে আত্মসংবরণের চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইলাম।

সে আবার বলিতে লাগিল—"বিবাহের পর মৌরসী পাট্টা লইয়া শ্বশুর ভবনে স্থিত হইলাম। পাছে বাড়ীর জন্য আমার মনে চাঞ্চল্য জন্মে এ নিমিত্ত শ্বশুর মহাশয় আমাকে ভুলাইয়া রাখিবার নানা-রূপ উপায় করিয়া রাখিয়াছিলেন। নানাবিধ নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে সর্ব্বদাই আমি ডুবিয়া থাকিতাম। থিয়েটার, বায়স্কোপ, দেশভ্রমণ, কোনও বিষয়েই ত্রুটী ছিল না। ভৃত্য আমার দেহে তৈল মর্দ্দন করিত, স্নান করাইয়া দিত, জুতাজোড়াটা পর্য্যন্ত হাত দিয়া নিজেকে সরাইয়া লইতে হইত না। বেশভূষারই বা কি বৈচিত্র্য! প্রত্যহ নূতন নূতন বেশ, প্রত্যেক অঙ্গুলিতে বিভিন্ন প্রকার অঙ্গুরীয়। এক পা হাঁটিবার প্রয়োজন নাই, সর্ব্বদাই বাড়ীর গাড়ী আমার হুকুম তামিল করিতে ব্যস্ত। দরিদ্রের সন্তান,—এত ভোগ বিলাস, আদর যত্নে শীঘ্রই মন বসিয়া গেল। জীবন সংগ্রামের জন্য কোন ব্যস্ততা নাই, চিন্তাও ছিল না। এখন শুধু স্বপ্ন, শুধু গান, কেবলই আনন্দ!

"লেখা পড়া কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। তবে পূর্ব্ববৎ নহে। স্কুল কলেজের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিল না। আমার শ্বশুর মহাশয় স্কুল কলেজের পড়ার উপর হাড়ে চটা ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, স্কুল বা কলেজে গেলে ছেলে বিগড়াইয়া যায়। আমার শিক্ষার জন্য তিনি তিনজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

"বিবাহের পর আমার নাম পরিবর্ত্তিত হইল। বাবা নাম রাখিয়াছিলেন, হরিচরণ। নামটি অত্যন্ত বিকট এবং সেকেলে ধরণের। শ্বশুর মহাশয় আমার নাম রাখিলেন, প্রভাতকুসুম। নামটি মোলায়েম বটে; কিন্তু প্রথমতঃ আমার এই নাম পরিবর্ত্তনে মনটা কিছু দমিয়া গেল। শেষে অভ্যাস বশে মনের সে বিরুদ্ধ ভাব আর রহিল না। হরিচরণ অপেক্ষা প্রভাতকুসুম নাম আমার পদমর্য্যাদার উপযুক্ত বলিয়াই ধারণা জন্মিল।

"বড় সুখেই দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। কোনও চিন্তা নাই, অভাব নাই, মুড়ী বা শাকের ডালনার কথা যেন দুঃস্বপ্নের মত অলীক মনে হইত। পিতা-মাতার অদর্শন জনিত মানসিক অশান্তি কয়েক দিন পরে অন্তর্হিত হইয়া গেল। বিবাহের একবৎসর পরে বাবা একদিন দেখিতে আসিয়াছিলেন। তার পর আর আসেন নাই। মাঝে মাঝে তাঁহাদের সংবাদ পাইতাম, তাঁহারা ভালই ছিলেন। সেখানে যাইবার জন্য মনে আর তেমন ব্যাকুলতা অনুভব করিতাম না। নগরের কর্ম্ম কোলাহল, আনন্দ ও ভোগবিলাস ছাড়িয়া গ্রামের দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে যাইবার প্রবৃত্তি ক্রমেই লুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল।

"শ্বশুর মহাশয় কোনও বিষয়ে আমায় অভাব বোধ করিতে দিতেন না বটে, কিন্তু টাকা পয়সা কখনও আমার হাতে পড়িত না। অর্থের অভাব-বোধ ঘটিবার সম্ভাবনাও ছিল না। যখন যে দ্রব্যের প্রয়োজন, ভাণ্ডারী তৎক্ষণাৎ তাহা আমায় সরবরাহ করিত। কিন্তু নগদ টাকা কড়ি আমার হস্তে আসিত না। পাছে হাতে অর্থ পড়িলে আমার চরিত্র দোষ জন্মে এই জন্য এইরূপ সাবধানতা।

"চিঠি লিখিবার প্রয়োজন হইলে খাম টিকিট পোষ্ট-কার্ড আমার টেবিলের উপরই পাইতাম। কোথাও বেড়াইতে যাইবার অভিলাষ হইলে, সঙ্গে সরকার দ্বারবান ভৃত্য যাইত। তাহারাই ট্রেণের বা ষ্টীমারের টিকিট কিনিয়া আনিত। কোনও জিনিস দেখিয়া কিনিবার ইচ্ছা হইলে, সরকার অমনই তাহা স্বয়ং কিনিয়া আনিয়া সসম্ভ্রমে আমার কাছে দিয়া যাইত। আমার নিজ হস্তে একটি পয়সা ব্যয় করিবার অবকাশ ঘটিতে দিত না। ক্রমে আমি এ সকল বিষয়েও অভ্যস্ত হইয়া উঠিলাম, শ্বশুর মহাশয়ের উদ্দেশ্য বুঝিলাম, তত্ত্বেরও আভাস পাইলাম।"

প্রিন্টার প্রকাণ্ড কাগজখানি হাতে দিয়া বলিল, "এইবার ছাপিবার অর্ডার দিবেন কি ?"

আমি বলিলাম, "দ্বিতীয় প্রুফে যে সকল ভ্রম সংশোধন করিয়াছিলাম তাহা মিলাইয়া ছাপিয়া ফেল। আমি আর দেখিব না।"

বেহারা আবার কলিকা বদলাইয়া দিয়া গেল। নল মুখে রাখিয়াই বলিলাম, "তারপর ?"

যুবক অন্যমনস্ক ভাবে কি চিন্তা করিতেছিল। আমার প্রশ্নে একটু চমকিত ভাবে সে বলিল, "হ্যাঁ, এইবার আমার জীবন নাটকের পঞ্চমাঙ্কের দৃশ্যটা আপনাকে দেখাইব। আমাদের দাম্পত্য জীবন মন্দ ছিল না। আমি যে দীন দরিদ্রের সন্তান, ধনীর আদরের দুলালী হইয়াও সে আমাকে সে কথা কখনও বুঝিবার অবকাশ দেয় নাই। সে বিষয়ে তাহার পিতা মাতার শিক্ষার কোনও ত্রুটী ছিল না। এরূপ ক্ষেত্রে প্রায়ই স্ত্রী স্বামীকে উপেক্ষা ও অনাদর করিয়া থাকে, কিন্তু আমার স্ত্রী কখনও সেরূপ প্রকৃতির পরিচয় দেয় নাই। অভাবে না পড়িলে মানুষের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। তাহার কোনও বিষয়ে অভাব ছিল না বলিয়াই আমার সঙ্গে তাহার কখনও কোন বিষয়ে বিরোধ ঘটে নাই। এইরূপে জীবনের পাঁচ বৎসর চলিয়া গেল।

সে দিন পূর্ণিমা। ঘরের সমস্ত জানালা দরজা খোলা ছিল। জ্যোৎস্নালোক মর্ম্মর মণ্ডিত কক্ষতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া ছিল। দুজনে জানালার ধারে বসিয়া নানা বিষয়ের আলোচনা হইতেছিল। সে সব স্বপ্নরাজ্যের আজগুবী কথা। প্রথর যৌবনের তীব্র মাদকতায় যখন মন ভরপুর থাকে, মানুষ তখনই সে সব অসম্ভব বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকে। তাহার বিস্তৃত ইতিহাস আপনাকে জানাইয়া কোনও ফল নাই।

"কথা প্রসঙ্গে পত্নী বলিল, 'একটা কথা বলিব, কিছু মনে করিবে না ?"

"হাসিয়া আমি তাহাকে আশ্বাস দিলাম।

"সে বলিল, 'দেখ, সকলেরই স্বামী তাহাদের স্ত্রীকে কত কি জিনিষ আনিয়া দেয়; কিন্তু এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে তুমি আমাকে কিছুই দাও নাই।'

"কথাটা আমি রঙ্গের হিসাবেই গ্রহণ করিলাম। কারণ তখনও স্বপ্নলোকে বেড়াইতেছিলাম। হাসিয়া বলিলাম, 'এই কথা! তা তোমার অভাব কিসের বল ? সবই ত তোমার প্রচুর পরিমাণে আছে!'

"মধুর হাস্যে সে বলিল, 'সবই আছে বটে; কিন্তু সে সব ত বাবার দেওয়া। তুমি যে আমার স্বামী, তোমার নিকট হইতে কিছুই ত পাই নাই! স্বামীর দেওয়া অতি তুচ্ছ জিনিসও যে স্ত্রীর কাছে কত আদরের, কত গৌরবের তা তোমরা পুরুষ মানুষ বুঝিবে না। যে নেহাৎ গরীব সেও স্ত্রীকে কিছু না কিছু দেয়। তুমি কি ইচ্ছা করিলে পূজার সময় স্ত্রীকে একখানা বই কিনিয়াও দিতে পার না ? জান ত আমি বই পড়িতে ভালবাসি। ভালবাসার পাত্রকে ভালবাসিয়া যা দেওয়া যায় তাই তাহার কাছে অমূল্য।'

"আমি বলিলাম, 'তোমার বাবার এত বড় লাইব্রেরী, সব বই ত সেখানে আছে। নূতন বই আর কি পড়িবে বল ?'

"সে ত বাবার। তাতে আমার অধিকার কিসের ? রাগ করোনা; তুমি কি ইচ্ছা করিলে দুই এক টাকা

দিয়া একখানা উপহারের বইও কিনিয়া দিতে পারো না? সংবাদপত্রের উপহারের বইগুলি কত সস্তায় পাওয়া যায়। দেওয়ার ইচ্ছা থাকা চাই। প্রকৃত ভালবাসা না থাক্‌লে এ সব হয় না।'

"আলোচনাটা রঙ্গের হিসাবেই আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু পত্নীর এই ক্ষোভ যে রঙ্গ-জনিত নহে, তাহা তখন বুঝিলাম। কথাটা শেলের মত বুকে বাজিল। বাস্তবিক এ ভাবে কখনও কথাটা ভাবিয়া দেখি নাই। স্বামীর উপর পত্নীর এরূপ অভিমান খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার যে দুই পয়সা উপার্জ্জনেরও ক্ষমতা নাই, আমি এত ভোগ-সুখের মধ্যে থাকিয়া একটি পয়সার জন্য পরমুখাপেক্ষী তাহা সেই দিন বিশেষ করিয়া বুঝিলাম।

"মনে মনে একটু আলোচনার পর বুঝিলাম, স্ত্রীর ইহাতে কোনও অপরাধ নাই। লম্বে ও দৈর্ঘ্যে আমি এত বড় পুরুষ, আমার যে সামান্য দুই এক-টাকা দিয়া একখানি বই কিনিবার সামর্থ্য নাই তাহা অন্যে অনুমান করিবে কিরূপে? আমি যে মনুষ্য মধ্যে অধম, সামান্য ভিক্ষুক অপেক্ষাও হীন, তাহা সেই দিন হইতে বুঝিতে পারিলাম। এ অনুভূতি অতি তীব্র এবং ভীষণ। ভিক্ষুক দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু আমি অতুল ঐশ্বর্য্যবান শ্বশুরের গৃহ-জামাতা, আমার ত কাহারও নিকট হাত পাতিবারও অধিকার নাই। ইচ্ছা করিলে সামান্য বেতনের চাকরী কোথাও করিতে পারি, সে সম্ভাবনা হইতেও আমি বিচ্যুত। তাহাতে শ্বশুরের উচ্চমুণ্ড হেঁট হইবে। বিলাস ভোগে অভ্যস্ত হইয়া এমন অপদার্থ হইয়া গিয়াছিলাম যে, সামান্য চাকুরীর জন্যও কাহারও নিকট মুখ ফুটিয়া বলিবার সৎ সাহস এবং প্রবৃত্তিও লুপ্ত হইয়াছিল।

"নিজের নিঃসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া মনে ধিক্কার জন্মিল। কিন্তু কোনও উপায় অবলম্বন করিতে পারিলাম না। অভ্যাস দোষ ত্যাগ করিবার মত পুরুষকার এই কয় বৎসরে হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। পাছে লোকে কিছু মনে করে, এই দুর্ব্বলতা আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। অথচ পত্নী মুখ ফুটিয়া একখানি বই চাহিয়াছে তাহাও দিবার সামর্থ্য আমার নাই, এই চিন্তা মনে উদিত হইবামাত্র হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণার উদয় হইত। আমি হাত পাতিয়া কাহারও নিকট কিছু চাহিলে তখনই পাইতে পারিতাম, কিন্তু সেরূপ ভাবে কাহারও নিকট হইতে টাকা ধার লইবার প্রবৃত্তি হইল না, যদি কেহ ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে আমি শ্রীযুক্ত অমুকচন্দ্রের জামাতা টাকা ধার লইতেছি, তখনই লোকে কানাকানি করিবে; শ্বশুর মহাশয়ের কানেও কথাটা ক্রমশঃ উঠিবে, তখন যে লজ্জায় মরিয়া যাইব! না তাহা হইতে পারে না!

"আমার ব্যবহারার্থ হীরা মুক্তার অঙ্গুরীয়, বোতাম ঘড়ী চেন ছিল। কোনও একটা জিনিস বিক্রয় করিয়া বা বন্ধক রাখিয়া টাকা লইব, সে সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত। কারণ প্রত্যহ ভ্রমণশেষে আমার রাজবেশ ভাণ্ডারীর কাছে জমা থাকিত। সে প্রত্যেক দ্রব্য দেখিয়া শুনিয়া তুলিয়া রাখিত। যদি বলি, হারাইয়া গিয়াছে, সে কথাটা সহসা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত নাও হইতে পারে। হয়ত শ্বশুর মহাশয়ও কথাটা শুনিতে পারেন। আমার হস্তে অর্থ দেওয়া সম্বন্ধে যখন তিনি এতদূর সাবধান, তখন নিশ্চয়ই এবিষয় লইয়া গোপনে সন্ধান চলিবার সম্ভাবনা। অতএব সে ইচ্ছাও অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়া গেল।

"ক্রমশই মনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। যখন দরিদ্র ছিলাম তখনও এত অশান্তি ছিল না। নিজেকে এমন উপায়হীন বলিয়া মনে করি নাই। তখন একটা সাহস, একটা উত্তেজনা, একটা আশাও ছিল; এখন মনের সে অবস্থা কোথায় গেল? রাজার ভূমিকা শুধু অভিনয় করিয়া চলিয়াছি। কোনও দ্রব্যে আমার এতটুকু অধিকার নাই! এক এক সময় মনে হইত, এ অভিনয় এখানেই সমাপ্ত করিয়া ফেলি; একবার নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করি। আমিও ত মানুষ, লোকে যাহা পারে,

আমিও তাহা কেন পারিব না ? কিন্তু পাঁচ বৎসরের অভ্যাস, আরাম-প্রিয়তা প্রতিপদে আমাকে বাধা দিত। মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম।

"আপনাদের এখানে যতটুকু থাকিতাম, সাহিত্য-চর্চ্চায় অথবা অন্যবিধ আলোচনায় ততক্ষণ বেশ কাটিয়া যাইত, সেই সময়টুকু আমি নিজের অবস্থা কতকটা বিস্মৃত হইতাম।

"তার পর দেখিলাম আপনাদের এখানে অজস্র উপহার গ্রন্থ বিক্রীত হইতেছে। যদি একবার মুখ ফুটিয়া আপনার কাছে একখানি বহি চাহিতাম, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে দিতেন; কিন্তু অভিজাত্য গর্ব্ব আমার মুখ সে সম্বন্ধে একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিল। লজ্জায় সে কথা বলিতে পারিলাম না।

"আজ ম্যানেজার বাবুর টেবিলের উপর স্তূপীকৃত পুস্তক দেখিয়া মনে হইল, কেহ এখানে নাই, এই সময় একখানা বই সরাইয়া রাখিলে কে সন্দেহ করিবে, বা জানিতে পারিবে ? অত পুস্তকের মধ্য হইতে একখানি গেলেও কেহ তাহার খোঁজ করিবে না। আর যদি বা খোঁজ করে, আমি লইয়াছি তাহা কেহ বুঝিতে পারিবে না। শয়তান আমার কানে কানে বলিল, 'এই চমৎকার সুযোগ,হেলায় ইহা হারাইও না। ভগবান তোমার দুঃখ বুঝিয়া তোমাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য এই সুযোগ দিয়াছেন। লও, শীঘ্র তুলিয়া লও। এই পূজার সময় প্রণয়িনীকে এই গ্রন্থাবলী উপহার দিতে পারিলে তোমার মনের ক্ষোভ ও তাহার অভিলাষ চরিতার্থ হইবে, এ সুযোগ ছাড়িও না।'

"শয়তানের প্রলোভন দমন করিতে পারিলাম না। ত্বরিত হস্তে একখানি বই তুলিয়া বস্ত্রান্তরালে লুকাইলাম। তখন যেন যন্ত্রচালিতবৎ কাজটা করিয়া ফেলিলাম। বাস্তবিক নিজের প্রবৃত্তির উপর তখন আমার কোনও প্রভাব ছিল না।

"তারপর! তারপর!—'স্বর্গ হতে ধরাতলে দারুণ পতন!' যখন অনুশোচনা জন্মিল তখন উহা যথাস্থানে রাখিবার আর অবকাশ ছিল না। এখন সব শুনিলেন ত ? চোরের সঙ্গে আর আপনার ভদ্র ব্যবহার করিবার ইচ্ছা আছে কি ?"

উভয় হস্তে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া যুবক অসহনীয় যন্ত্রণাসূচক একটা শব্দ করিল।

বৃষ্টিপাত বন্ধ হইয়াছিল। আমি তাড়াতাড়ি একখানি পত্র লিখিয়া বেহারাকে দিয়া ম্যানেজারের কাছে পাঠাইয়া দিলাম।

যুবক, তখনও নিশ্চলভাবে আসনের উপর বসিয়াছিল। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যুবকের হাত ধরিয়া বলিলাম, "সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, বাড়ী যাইবেন চলুন।"

যন্ত্রচালিতবৎ যুবক আমার সহিত নীচে নামিয়া আসিল।

তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। বাহিরে রাজপথের একপার্শে যুবকের বাড়ীর গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল।

কোচম্যান গাড়ী সম্মুখে লইয়া আসিল।

বেহারা একটা পুলিন্দা আনিয়া আমার হাতে দিল।

প্রভাতকুসুম গাড়ীতে আরোহণ করিলে পুলিন্দাটি তাহার হস্তে দিয়া বলিলাম, "এই বইগুলি বাড়ী লইয়া যান।"

যুবক বজ্রাহতের নত নির্ব্বাক থাকিয়া পরে বলিল, "মাপ করিবেন, সম্পাদক মহাশয়। যদি কখনও উপার্জ্জন করিতে পারি তবেই স্ত্রীকে বই উপহার দিব, নহিলে ভিক্ষা বা চৌর্য্যবৃত্তির দ্বারা নিজের খেয়াল চরিতার্থ কখনও করিব না। গরীবের ছেলে যাহাতে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে তাহারই চেষ্টা করিব। সেই আশীর্ব্বাদ করুন।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ইহা আমার দান নহে। এ বইগুলি আপনার পরিশ্রম জনিত অর্থের দ্বারা কেনা হইয়াছে বলিয়া মনে করিবেন। আমাদের গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগে ইংরাজী উপন্যাস তর্জ্জমা করিবার লোকাভাব হইয়াছে। এ কার্য্যে আপনার অনুরাগ আছে সুতরাং আপনি অনায়াসে গৃহে বসিয়া আমাদের জন্য বই

অনুবাদ করিয়া দিতে পারিবেন। তজ্জন্য পারিশ্রমিক স্বরূপ মাসিক আপনাকে একশত মুদ্রা দেওয়া যাইবে। সম্ভবতঃ এ কার্য্য লক্ষপতির পক্ষেও অগৌরবের নহে। বীণাপাণির আরাধনাদ্বারা কোটিপতিও অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন, তাহাতে অভিজাত্য গর্ব্ব খর্ব্ব হয় না। আশা করি, জানিতে পারিলেও আপনার শ্বশুর মহাশয় ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন না। এই বইগুলির দাম পরে আপনার পারিশ্রমিকের প্রাপ্য অর্থ হইতে বাদ দিয়া দিব। নমস্কার।"

আমি কোচম্যানকে গাড়ী চালাইতে ইঙ্গিত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। তাহার উত্তরের প্রতীক্ষা করিলাম না।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

বিদায়

"দুনিয়াকে তমাশে হর্‌গিজ না কম্ হোগে,
চর্‌চে ইয়েহি রহেঙ্গে, মগর হাম্ না হোগে।"

শ্রান্ত তপন গগনের কোণে
অস্তগামী,
সন্ধ্যা-তিমির মন্দ চরণে
আসিছে নামি,
ক্লান্ত জীবনে এসেছে এবার
বিদায়-বেলা,
অজ্ঞাত পথে যেতে হবে, ছাড়ি
মিলন-মেলা।

মুক্ত আকাশে ভাতিবে দীপ্ত
অযুত তারা,
পূর্ণিমাশশী ঢালিবে ধরায়
জ্যোৎস্নাধারা,
অমা-নিশীথের অন্তে, ঊষার
স্বর্ণ আলো
এমনি মুগ্ধ নয়নে, মানব
বাসিবে ভাল।

আমি যাব, তবু রহিবে এমনি
শোভনা ধরা,
প্রতি বসন্তে ফুটিবে কুসুম
গন্ধ ভরা,
কুঞ্জভবন হবে মুখরিত
পাখীর গানে,
কল্লোল তুলি ছুটিবে সরিৎ
সিন্ধুপানে।

উৎসবে হবে সঙ্গীত শত
ধ্বনিত নিতি,
রহিবেনা শুধু আমারি ক্ষুদ্র
বীণার গীতি!
এত যে আকুল বাসন বেদনা
নীরব প্রীতি—
বিশাল ধরায় রহিবে না তার
ক্ষণিক স্মৃতি!

তবু হে ধরণি, মনে পড়ে
বিদায় ক্ষণে
চিরজনমের স্নেহ-বন্ধন
তোমার সনে।
কত সুখ দুঃখ দিয়েছ, লয়েছি
বক্ষ ভরি,
মুছি আঁখিজল অকূলে এবার
ভাসাই তরী।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

পালসাম্রাজ্যের অধঃপতন

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের বক্তৃতার সারাংশ]

রাজা রামপাল সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথের মতে তাঁহার রাজ্যকালের পরিমাণ ৪৬ বৎসর। চণ্ডীমৌ-গ্রামে আবিষ্কৃত মূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে, রামপাল অন্ততঃ ৪২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মদনপালের মনহলি-তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালেই রামপাল বহুযুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, ৪২ বৎসর রাজত্ব করিবার পরে, রামপাল বার্দ্ধক্যের সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। বোধ হয় এই কারণেই পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, তিনি বার্দ্ধক্যোচিত অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামচরিত কাব্যের চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথম শ্লোকের "সূনু-সমর্পিত-রাজ্যঃ" এই বিশেষণটি হইতে এইরূপ অনুমান হয়। রাম পক্ষে ইহার অর্থ (সূনুনা ভ্রাত্রা ভরতেন সমর্পিতং রাজ্যং যস্মৈ) "ভ্রাতা ভরত কর্ত্তৃক সমর্পিত রাজ্য"; রামপাল পক্ষে ইহার অর্থ ("সূনবে পুত্রায় সমর্পিতং রাজ্যং যেন") যিনি পুত্রকে রাজ্য সমর্পণ করিয়াছেন। রামপালের এই পুত্রের নাম রাজ্যপাল।

রামচরিত-কাব্যের যে পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লেখক ভ্রমক্রমে কয়েকটি শ্লোক বাদ দেওয়ায়, রাজ্যপাল সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই। কেবল "বিগ্রহ-নির্জ্জিত-কামরূপভূৎ" এই বিশেষণটি হইতে জানা যায় যে, তিনি কামরূপ রাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। রামপালকর্ত্তৃক কামরূপ জয়ের কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে; সুতরাং মনে হয়, কামরূপ-রাজ বিদ্রোহী হওয়ায়, রাজ্যপাল পুনরায় তাঁহাকে পরাভূত করিয়াছিলেন। বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসনেও এই অনুমানের সমর্থক প্রমাণাবলী দেখিতে পাওয়া যায়।

রামচরিত কাব্য হইতে জানা যায় যে,রামপাল মাতুল মহনদেবের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া, স্বেচ্ছায় নদীগর্ভে তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। (৪।১০) এইরূপ একটি প্রবাদ বহুদিন উত্তরবঙ্গে প্রচলিত ছিল। মালদহের অন্তর্গত পাণ্ডুয়া নামক স্থানে এক মসজিদে রক্ষিত 'সেখ শুভোদয়া' নামক হস্তলিখিত গ্রন্থে এই জনপ্রবাদ লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়।

সন্ধ্যাকর নন্দী রামপালের পরবর্ত্তী রাজাকে কুমার নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু পিতার জীবদ্দশায়ই রাজ্যপালের মৃত্যু হইয়াছিল, রামচরিত কাব্যে এরূপ কোনও উল্লেখ নাই। ইহা হইতে অনুমান হয় যে. কুমারপাল রাজ্যপালেরই নামান্তর। কমৌলি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে কুমারপালের রাজত্বকালে তদীয় মন্ত্রী বৈদ্যদেব "অনুত্তরবঙ্গে" এক নৌযুদ্ধে জয়লাভ করেন, এবং তিঙ্গ্যদেবকে পরাভূত করিয়া, তাঁহার স্থলে কামরূপের রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গই উক্ত নৌযুদ্ধে রামপালের প্রতিপক্ষ ছিলেন। কিন্তু "অনুত্তরবঙ্গ" এরূপ অনুমানের পক্ষ সমর্থন করে না।

কুমারপালের রাজত্বকালে এই সকল যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইতে দেখিয়া অনুমান হয় যে, রাজা রামপাল নবপ্রতিষ্ঠিত পালরাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই; এবং মথনদেবের ও তাঁহার মৃত্যুর পরেই চতুর্দ্দিক হইতে পালরাজের সামন্তগণ আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। পালরাজ্যের এই দুর্দ্দিনে যে সকল নূতন নূতন শত্রুদলের আবির্ভাব হইতে আরম্ভ করে, তন্মধ্যে রাঢ়দেশবাসী সেনরাজগণ অন্যতম। পূর্ব্বোল্লিখিত 'সেখ শুভোদয়া' নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাজা রামপালের মৃত্যুর পরে কয়েকজন রাজ-অমাত্য মিলিয়া বিজয়-

সেনকে রাজপদে নির্ব্বাচিত করেন। এই জনপ্রবাদের মূলে কতটুকু সত্য নিহিত আছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু রামপালের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যে পাল- ও সেনরাজগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ঘনীভূত হইয়া উঠে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রাজসাহী জেলার মান্দা থানার অন্তর্গত নিমদীঘি নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি শিলালিপি আমি "কলিকাতা মিউজিয়মে" উপহার প্রদান করিয়াছি। এই শিলালিপিতে বহু লিপিকর-প্রমাদ বর্ত্তমান থাকিলেও, ইহা হইতে জানা যায় যে, পালরাজ তৃতীয় গোপালদেবের মৃত্যুর পর, তাঁহার অনুচরগণের সহিত পুরসেন নামক কোন ব্যক্তির ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। রামচরিত কাব্যে একটি মাত্র শ্লোকে তৃতীয় গোপালদেবের বিবরণ পাওয়া যায়। এই শ্লোকের গূঢ়ার্থ এ পর্য্যন্ত কেহই লক্ষ্য করেন নাই। শ্লোকটি এই —

"অপি শত্রুঘ্নোপাযাগেদা (ঙ্গো) পালঃ স্বর্জগাম
তৎসূনুঃ।
হন্তু [ঃ] কুম্ভীনস্যা স্তনয়স্যৈতস্য সাময়িকমেতৎ ॥
(৪।১২)

রামপক্ষে এই শ্লোকে শত্রুঘ্নের মৃত্যুকাহিনী (রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—৬৯ অধ্যায়) সূচিত করিতেছে। কুম্ভীনসী-তনয় লবণের হত্যাকারী রাজা (গো-পাল) শত্রুঘ্নের অকাল মৃত্যু 'সাময়িক' অর্থাৎ বিধিনির্দ্দিষ্ট কালেই হইয়াছিল।

অপর পক্ষে এই শ্লোকের অর্থ—শত্রুদলের নিধন কারী (শত্রুঘ্ন) গোপালদেব কুম্ভীনসীর পুত্রকে হত্যা করিবার পরেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। টীকা না থাকায়, এই শ্লোকোক্ত 'কুম্ভীনসীর পুত্র' কাহাকে সূচিত করিতেছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত মান্দা-লিপির তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে "স্বেচ্ছয়া ত্যক্তকায়ঃ" এইরূপ পাঠ গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, গোপালদেব স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

গোপালদেবের মৃত্যুর পর, রামপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মদনপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেন (Memoirs, p. 102 বাঙ্গালার ইতিহাস পৃঃ ২৮৩) যে মদনপাল অপ্রাপ্তবয়স্ক গোপালদেবকে নিহত করিয়া, সিংহাসনের পথ মুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ অনুমান করিবার কোনই কারণ নাই। সন্ধ্যাকর নন্দী নিম্নলিখিত শ্লোকে মদনপালের সিংহাসন লাভের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

কুশলী কুশোকশল্যং রামবিরামবিভ্রবং নিরাকুর্ব্বন্।
অম্ভোধি মেখলায়া ভুবঃ প্রভুরভূদভিয়া মদনঃ ॥
(৪।১৫)

রামপক্ষে ইহার অন্বয়,—"অমদনঃ কুশলী কুশো রামবিরামবিভ্রবং অক-শল্যং নিরাকুর্ব্বন্ অম্ভোধি-মেখলায়া ভুবঃ প্রভুরভূৎ"—অর্থাৎ "কুশ রাজত্ব পদলাভ করায়, রামের বিয়োগ জনিত দুঃখ দূর হইয়াছিল।"

রামপাল পক্ষে এই শ্লোকের অন্বয়,—"কুশলী মদনঃ রামবিরামবিভ্রবং কুশোকশল্যং নিরাকুর্ব্বন্ অম্ভোধিমেখলায়াভুবঃ প্রভুরভূৎ";—অর্থাৎ "মদনপাল রাজত্ব লাভ করাতে রামপালের মৃত্যুজনিত দুঃখ দূরীভূত হইয়াছিল।"

অতঃপর ছয়টি "কুলক" শ্লোকে (১৬।২১ শ্লোক) কবি মদনপালের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। হস্ত-লিখিত পুঁথিতে ২১ শ্লোকের শেষে, 'কু' এই অক্ষরটি দ্বারা সূচিত করা হইয়াছে যে, এই শ্লোকে একটি "কুলক" শেষ হইয়াছে। কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত পুঁথিতে এই 'কু' অক্ষরটি পরিত্যক্ত হওয়ায় অর্থগ্রহণে বিশেষ গোলযোগ ঘটিয়াছে।

শ্লোক কয়েকটি এই

"অভিষেক সম্ভার-বিতানৈর্বিশ্বাশা পূরণ পুরা।
দিশতাত্যর্থমনাথাবনাৎ জনয়তা জনানন্দং ॥ ১৬
হেলা বিলূন বলবৎ পদ্মা (দ্মা) বলিবলদ মিত্র চক্রেণ।
রাজাবত [ং] সলক্ষ্মীভারৈকধুরীণতাং দধানেন ॥ ১৭
দোষা স্পর্শাৎকর্ষিত মমহিমাতিশয়ং প্রকাশমানেন।
দ্বিজপরিকর পরিপালনরুচিনোচ্চৈ-
র্মণ্ডলাধিপতিনা চ ॥ ১৮

সখ্যা চ শস্ত্রভালক্ষ্মাশাভূতেন চারুবৃত্তেন।
সুহিত পরম শ্রমেণ চ সুবর্ণজাতেন বিধিবদর্ঘ্যেণ ॥ ১৯
সিংহীসুত বিক্রান্তেনার্জ্জুনধাম্না ভুবঃ প্রদীপেন।
কমলা বিকাশ ভেষজ ভিষজা চন্দ্রেণ বন্ধুনোপেতম্ ॥ ২০
চণ্ডীচরণ সরোজ প্রসাদ সম্পন্ন বিগ্রহ শ্রীকং।
ন খলু মদনং সাঙ্গেশ মীশ মগাদ্ জগদ্বিজয়ে লক্ষ্মীঃ ॥ ২১*

উল্লিখিত শ্লোকগুলির মধ্যে বিংশ শ্লোকের 'চন্দ্রেণ' এই বাক্যটি হইতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মদনপাল, কান্যকুব্জের গাহড়বাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রদেবের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুকরণে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে "Modern Review" পত্রিকায় ইহা লইয়া তাঁহার সহিত আমার তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়; তৎসমুদয়ের পুনরুল্লেখের আবশ্যক নাই। একটু ধীরভাবে আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, উল্লিখিত শ্লোকগুলি মদনপালের সহিত গাহড়বালরাজ চন্দ্রদেবের সমসাময়িকত্ব সূচিত করিতে পারে এমন কোনও কথাই নাই।

উল্লিখিত শ্লোকগুলিতে রতিপতি মদন, রাজা মদনপাল ও রামচন্দ্রের পুত্র কুশের রাজ্যাভিষেক বর্ণিত হইয়াছে। এ সকলেরই অভিষেক কালে তাঁহাদের একজন বন্ধু উপস্থিত ছিলেন, এই বন্ধুর নাম চন্দ্র। রতিপতি মদনের বন্ধু ওষধিপতি চন্দ্র, ও কুশের বন্ধু খুল্লতাতপুত্র চন্দ্রকেতু ইহা সহজেই বোধগম্য হয়। প্রশ্ন এই যে রাজা মদনপালের বন্ধু 'চন্দ্র' কে? মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুর মতে ইনিই গাহড়বাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্যকুব্জাধিপতি চন্দ্রদেব, কিন্তু ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ চন্দ্র 'মণ্ডলাধিপতি' ও বন্ধু বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এখানে মণ্ডলাধিপতি শব্দের অর্থ মদনপালের অধীনস্থ কোনও সামন্ত রাজা। 'বন্ধু' এই শব্দটিও 'জ্ঞাতি' বা কুটুম্ব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কারণ অন্যত্র 'সখ্যা' এই বিশেষণটি থাকায় বন্ধু শব্দের সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিলে পুনরুক্তি দোষ ঘটে। গাহড়বালরাজ চন্দ্রদেব কখনই পালরাজগণের সামন্তচক্রের অন্তর্গত ছিলেন না; এবং পালরাজগণের সহিত তাঁহার কোন কুটুম্বিতা ছিল এরূপ প্রমাণও অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং মদনপালের অভিষেক কালে যে মণ্ডলাধিপতি 'বন্ধু' চন্দ্রদেব উপস্থিত ছিলেন, তিনি কখনও গাহড়বালরাজ চন্দ্রদেব হইতে পারেন না।

মদনপালের রাজ্যাভিষেক কালে বর্ত্তমান চন্দ্রদেবের সহিত কান্যকুব্জাধিপতি চন্দ্রদেবের অভিন্নতা প্রতিপাদন করার পক্ষে আরও অন্তরায় আছে। গাহড়বাল রাজ চন্দ্রদেব ১১০৪ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। কারণ, উক্ত বর্ষে উৎকীর্ণ 'বশাহি'-লিপিতে তদীয় পৌত্র গোবিন্দচন্দ্র 'মহারাজপুত্র' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। মদনপালকে চন্দ্রদেবের সমসাময়িক বলিয়া ধরিয়া লইলে বলিতে হইবে যে, মদনপাল ১১০৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। কিন্তু এই অনুমান সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের বিরোধী। ১০২৬ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ সারনাথ-লিপি হইতে জানা যায় যে ঐ সময়ে রাজা মহীপাল জীবিত ছিলেন। মহীপাল ১০২৬ খৃষ্টাব্দে জীবিত থাকিলে, মদনপাল কখনই ১১০৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে সিংহাসন লাভ করিতে পারেন না। এই অসঙ্গতি ব্যাখ্যা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু অনুমান করিয়াছেন যে, মহীপালের সারনাথ-লিপি তাঁহার মৃত্যুর পরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল! বলা বাহুল্য এরূপ অনুমান করিবার কোনই কারণ নাই।

মদনপাল কতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। দেবপাড়া-প্রশস্তি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বিজয় সেন "গৌড়াধিপতিকে" বিতাড়িত করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে মদনপালকেই এই "গৌড়াধিপতি" বলিয়া স্থির করিয়াছেন। মদনপালের রাজত্বের ঊনবিংশ (মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে 'চতুর্দ্দশ') বর্ষে উৎকীর্ণ

* অধোরেখাগুলি আমার নিজস্ব।—লেখক।

লিপি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং বিজয়সেন কর্তৃক পরাজিত হইবার পূর্ব্বে তিনি অন্ততঃ উনবিংশ বর্ষকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করিয়াছেন যে, বিজয় সেন মিথিলা জয় করিবার পূর্ব্বেই বরেন্দ্রভূমি করতলগত করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবপাড়া প্রশস্তির নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে স্পষ্ট জানিতে পারা যায় যে, মিথিলা জয়ের পরে (পূর্ব্বে নহে) বিজয়সেন বরেন্দ্রভূমি অধিকার করিয়াছিলেন।

"ত্বং নান্যবীর বিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং
শ্রুত্বান্যথা মননরূঢ় নিগূঢ়রোষঃ।
গৌড়েন্দ্র মদ্রবদপাকৃত কামরূপ-
ভূপম্ কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়॥

সন্ধ্যাকর নন্দী যখন তাঁহার কাব্য লিখিয়াছিলেন, তখনও পালরাজ্যের এই ধ্বংসের দিন সমাগত হয় নাই। তখন রাজা মদনপাল অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন ও শত্রুদমন করিতেছিলেন। কবি তাঁহাকে বিষ্ণুর সহিত তুলনা করিয়াছেন। কারণ, তিনিও গোবর্দ্ধন উৎপাটিত করিয়াছিলেন, এবং কলিঙ্গরাজরূপী কালীয়কে দমন করিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা কবি মদনপালের দিগ্বিজয় সূচিত করিয়াছেন। এই দিগ্বিজয়ী পরাক্রান্ত রাজা সুদীর্ঘকাল রাজ্যসুখ ভোগ করুন (চিরায় রাজ্যং কুরুতাৎ) এই প্রার্থনা বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে কবি যখন তাঁহার রামচরিত কাব্য শেষ করিয়াছিলেন, তখনও বিজয় সেনের বিজয়োদ্ধত সেনানীবৃন্দ মার্জ্জিত বর্ষাফলক উন্নত করিয়া সুচিরপ্রতিষ্ঠিত পালরাজ্যের জীর্ণদ্বার ভগ্ন করিবার মানসে রাঢ়দেশের অরণ্যানী হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় নাই। 'অরবিন্দেন্দীবর' শোভিত বরেন্দ্রী পরহস্তে বন্দী হইবার পূর্ব্বেই বাঙ্গালার শেষ স্বদেশ-প্রেমিক কবি 'নন্দিকুল-কুমুদ-কানন-পূর্ণেন্দু' সন্ধ্যাকর নন্দী পালরাজ্যের ইতিহাস বর্ণনাচ্ছলে, উচ্ছ্বসিত প্রাণে জননী-জন্মভূমির স্তুতি-গান করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা কাব্য হিসাবে অতুলনীয় হইলেও, ইতিহাস পদমর্য্যাদা লাভেরও সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

"স্তোকৈস্তোষিতলোকৈঃ শ্লোকৈরক্লেশনশ্লেষৈঃ।
ঘটনাপরিস্ফুটরসৈঃ গম্ভীরোদার ভারতীসারৈঃ॥

এই এক শ্লোকে কবি নিজেই তাঁহার কাব্যের যথার্থ সমালোচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ কবিত্ব-রসপূর্ণ হইলেও; তাঁহার কাব্য যে 'ঘটনা পরিস্ফুট-রসে'ও পরিপূর্ণ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তিনি যে সমুদয় ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা একপ্রকার তাঁহার জীবিতকালেই সংঘটিত হইয়াছিল। তিনি পালরাজ্যের সান্ধিবিগ্রাহিকের পুত্র ছিলেন; সুতরাং ঐ সমুদয় ঘটনা যথাযথরূপে জানিবার তাহার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। তিনি যে এই সুযোগের সমুচিত সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কাব্যে বর্ণিত কতকগুলি ঘটনা সমসাময়িক উৎকীর্ণ লিপিদ্বারা সমর্থিত হওয়াতেই স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইয়াছে। সুতরাং সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত এই রামচরিত কাব্য একাধারে কাব্য ও ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই অমূল্য গ্রন্থখানি আবিষ্কার করিয়া, সমগ্র বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। এক্ষণে এই পুঁথির একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ মুদ্রিত করা আবশ্যক। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যে সকল তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার সারাংশ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবৃত করিয়াছি।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।



সমুদ্র-বক্ষে প্রহ্লাদ

শ্রী[illegible]

Manasi Press.

বেহার চিত্র

(নক্সা)

মান্যবর।

১

বাবু রমেশ্বর প্রসাদের জমিদারির আয় বার্ষিক লক্ষাধিক টাকা হইলেও, ইংরাজি জানা না থাকায় তাঁহার সাহেব সুবাদের সঙ্গে মিশিবার বিশেষ অসুবিধা হইত। চতুর হাস্য এবং দুই একটা ইংরাজি "বুকনির" জোরে কোন প্রকারে কাজ চালাইয়া লইলেও ইংরাজি না জানার বেদনা যখন তখন তাঁহার যশোলিপ্সু হৃদয়কে পীড়িত করিত। সেই জন্য তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র গণেশ-প্রসাদকে ইংরাজি শিখাইবার জন্য দৃঢ় সংকল্প হইয়াছিলেন। গণেশপ্রসাদেরও এ বিষয়ে আগ্রহের অভাব ছিল না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গহীন নিয়মাবলী তাঁহাকে অধিক দূর অগ্রসর হইতে দিল না।

শুনা যায় শ্রীমান গণেশপ্রসাদ ছাত্ররূপে ইংরাজিতে সাহেব অধ্যাপকগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু কেবল নীরস অঙ্কশাস্ত্রের জন্যই: তাঁহাকে তিনবারই কলেজের প্রবেশ পথ হইতে কঠোর ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়।

পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হইয়া বিরক্ত গণেশপ্রসাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের জঘন্য ব্যবস্থার প্রতি ধিক্কার দিয়া সপ্ত-বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমে সরস্বতীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। পাস করিতে না পারিলেও 'বাবুয়াজি'র বিদ্যার খ্যাতি ইতোমধ্যেই নগর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তিনি গৃহে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুদিন পর হইতেই দলে দলে লোক ইংরাজিতে দরখাস্ত :লিখাইয়া লইবার জন্য তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল।

নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের জমিদারের মৃত্যু হওয়ায় তাহার বিধবা পত্নী বিষয় "কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের" তত্বাবধানে রাখিবার জন্য কালেক্টর সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। আবেদন-পত্র জেলা আদালতের কোন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী উকীল কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল।

তথাপি বৃদ্ধ দেওয়ানজি মনে করিলেন যে এরূপ প্রয়োজনীয় দরখাস্তের ইংরাজিটা একবার বাবুসাহেবকে দিয়া দেখাইয়া লওয়া ভাল। তদনুসারে দরখাস্ত যথা-সময়ে বাবু গণেশপ্রসাদের সম্মুখে নীত হইল। বাবু গণেশপ্রসাদ চুরুটের ধূমোদ্গার করিতে করিতে তন্ময় হইয়া দরখাস্তখানি পড়িতে লাগিলেন।

দরখাস্তের একেবারে শেষভাগে আসিতেই সহসা বাবুসাহেবের গম্ভীর মুখে তীব্র কৌতুক-হাস্য ফুটিয়া উঠিল। হাসিয়া বাবুসাহেব দেওয়ানজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ দরখাস্ত লিখিয়াছেন কে?" উদ্বিগ্ন হইয়া দেওানজি বলিলেন, "দীনবন্ধু বাবু। কেন, কিছু ভুল আছে কি:?

বিস্মিত গণেশপ্রসাদ বলিলেন, "দীনবন্ধু বাবু! দীনবন্ধু বাবুর ইংরাজি বিদ্যার খ্যাতি বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি! চাঁদকে দূর হইতেই মনোরম দেখায়; নিকটে কেবল কুৎসিৎ প্রস্তর ও অন্ধকার গহ্বর!"

দেওয়ানজি কম্পিত হৃদয়ে বলিলেন, "কোন গুরুতর ভুল হইয়াছে কি?"

উত্তেজিত-স্বরে গণেশপ্রসাদ বলিলেন, "গুরুতর নয়? যে কথা 6th class-এর ছেলেতেও জানে, সে কথা একজন এম্-এ, বি এল পাস করা উকীলে জানে না ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়? উকীল বাবু দরখাস্ত লিখিয়াছেন, অথচ দরখাস্তকারিণী যে স্ত্রীলোক সে কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছেন! বুঝুন একবার তামাসা!"

কৃতজ্ঞ দেওয়ানজি করযোড়ে বলিলেন, "ভাগ্যে

দরখাস্তখানি হুজুরকে দেখাইতে আসিয়াছি! যাহা হউক, এখন ভুলগুলি দয়া করিয়া সংশোধন করিয়া দেওয়া হউক।"

প্রসন্নমুখে গণেশপ্রসাদ বলিলেন, "অন্যান্য লেখা নিতান্ত মন্দ হয় নাই। কিন্তু শেষের একটা কথাতেই সমস্ত মাটি হইয়া গিয়াছে। Servant-এর feminine যে Maid-servant, এটা উকীল বাবুর বিদ্যাতে কুলায় নাই!"

এই বলিয়া বাবু গণেশপ্রসাদ, দরখাস্তের শেষে যেখানে লেখা ছিল :—

I have the honour to be,

Sir,

Your most obedient Servant

সেইখানে Servant কাটিয়া খুব স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিলেন Maid-servant. কৃতজ্ঞ দেওয়ানজি অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিতে দিতে এবং বাঙ্গালীর বিদ্যা যে কেবল শূন্যগর্ভ আড়ম্বর মাত্র, মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে দরখাস্ত লইয়া চলিয়া গেলেন।

যথা সময়ে দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের হাতে পড়িল। কালেক্টর সাহেব দরখাস্তের শেষভাগ দেখিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিয়া দেওয়ানজিকে আপনার খাস কামরায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। দেওয়ানজি উপস্থিত হইলে সাহেব গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই Maid-servantটী কাহার লেখা?"

দেওয়ানজি বলিলেন, "বাবু রমেশ্বর প্রসাদের পুত্র বাবু গণেশপ্রসাদ অনুগ্রহ করিয়া এইটুক সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।"

নিতান্ত গম্ভীর হইয়া কালেক্টর বলিলেন, "বটে! বাবু রমেশ্বর প্রসাদের পুত্র! বাবু সাহেবের ত অসাধারণ ব্যাকরণ-জ্ঞান!"

দেওয়ানজি সেলাম করিয়া চলিয়া গেলেন। কথাটা অল্পদিনের মধ্যেই বাবু রমেশ্বর ও বাবু গণেশপ্রসাদের কাণে উঠিল।

বাবু রমেশ্বর প্রকাণ্ড তাকিয়ার উপর দেহের বিপুল ভার রক্ষা করিয়া মুদিত চক্ষে ধূমপান করিতে করিতে ভাবিলেন যে পুত্রের সুশিক্ষার জন্য তাঁহার রাশি রাশি অর্থব্যয় সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। সোণার চসমা সিল্কের রুমালে যত্ন করিয়া মুছিতে মুছিতে বাবু গণেশপ্রসাদ ভাবিলেন, গুণের আদর কখনই চাপা থাকে না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাই গুণ পরীক্ষার একমাত্র "কষ্টিপাথর" নহে!

বিচক্ষণ রমেশ্বরপ্রসাদ স্থির করিলেন, এরূপ উপযুক্ত পুত্রকে একদিন কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

শুভদিনে পিতাপুত্র সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।

বাবু রমেশ্বর আভূমিনত হইয়া সাহেবকে সেলাম করিলেন এবং বাবু গণেশপ্রসাদ, "Good morning to your most honoured and respected worship বলিয়া তাহাকে অভিবাদন করিলেন।

কালেক্টর সাহেব পরম সমাদর করিয়া উভয়কেই সম্মুখে বসাইলেন।

কথায় কথায় বাবু গণেশপ্রসাদের বিদ্যাশিক্ষার কথা উঠিল। কালেক্টর সেদিনকার দরখাস্তের কথা স্মরণ করিয়া গম্ভীর ভাবে গণেশপ্রসাদকে বলিলেন, "সেদিন আপনার ইংরাজি জ্ঞানের একটু পরিচয় পাইয়াছি। এরূপ অসাধারণ Grammar-জ্ঞান সচরাচর দেখা যায় না।"

স্ফীতবক্ষ গণেশপ্রসাদ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "হুজুর যথার্থই বলিয়াছেন। Grammarটাই ভাষা জ্ঞানের মূল। Grammarটা একটু ভাল জানা না থাকিলে ভাষায় অধিকার লাভ অসম্ভব। কিন্তু এ সহজ কথাটা অনেকেই ভুলিয়া যান।"

বাবু রমেশ্বর গভীর আত্মপ্রসাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ইঁহার শিক্ষার জন্য আমার বরাবর মাসে দুইশত টাকা করিয়া খরচ করিতে হইয়াছে।"

হাসিয়া কালেক্টর বলিলেন, "তা আপনার টাকা খরচ সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে বাবু সাহেব।"

কিছুক্ষণ অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর কালেক্টর রমেশ্বরকে বলিলেন, "বাবু গণেশপ্রসাদের লেখা পড়া ত শেষ হইয়াছে। এইবার ইঁহাকে সাধারণের কাজে ঢুকাইয়া দিন না! এই সকল সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত যুবাদের দ্বারাই দেশের প্রকৃত কাজ হওয়া সম্ভব।"

ভক্তিবিহ্বল রমেশ্বর করযোড়ে বলিলেন, "আমি ইহাকে আপনার হাতেই সমর্পণ করিলাম। আপনি ইহাকে দিয়া যে কাজ ইচ্ছা করাইয়া লউন।"

চেয়ার হইতে উঠিয়া ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া গণেশ-প্রসাদ বলিলেন, "I am infernally at your honour's kind disposal."

কালেক্টার একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "What? Infernally!"

গণেশপ্রসাদ বলিলেন, "I—I—beg your pardon, Sir. I mean eternally."

সাহেব চাপা হাসির সহিত বলিলেন, "Oh, I see. All right. I shall not forget you."

উভয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে তখন সাহেবের নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

২

ছয়মাস না যাইতেই বাবু গণেশপ্রসাদ স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনর মনোনীত হইলেন। কমিশনর হইয়াই গণেশপ্রসাদ বিপুল উৎসাহে লোক-হিতে রত হইলেন। গীতাশাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞান থাকায় বাবু সাহেব সহজেই "আত্মনি সর্ব্বভূতং" দর্শন করিতে সক্ষম হইলেন। সুতরাং তাঁহার নিকট লোকহিত ও আত্মহিতে কিছুমাত্র পার্থক্য রহিল না। যাহাতে তাঁহার নিজের বাটীর সম্মুখে আলোকস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁহার নিজের বাটীর সম্মুখস্থ রাজপথে দুইবেলা জল-সেচন হয়, যাহাতে মিউনিসিপ্যালিটির কুলিরা তাঁহার উদ্যান সংস্কারে নিয়োজিত থাকে, যাহাতে তাঁহার নিজের বাড়ীর ট্যাক্স যথাসম্ভব কম করিয়া ধরা হয়—এজন্য তাঁহার যত্ন ও উৎসাহের ক্রটি রহিল না। তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়েরাও তাঁহার উদার করুণা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইল না। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল যে এরূপ উদ্যোগী ও কর্ম্মিষ্ঠ কমিশনর বহুকাল সহরে দেখা যায় নাই।

কিন্তু "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।" কোন কোন সংকীর্ণ-চেতা কমিশনর এই উদীয়মান নবীন সহযোগীর তীব্র যশোরশ্মি সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিলেন এবং তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এইরূপ ষড়যন্ত্রের ফলে কালেক্টর-সহায় গণেশপ্রসাদকেও একদিন কঠোর পরীক্ষায় পড়িতে হইল। কিন্তু বিশুদ্ধ কাঞ্চন গণেশপ্রসাদ, এই অগ্নিপরীক্ষার পর দীপ্ততর মহিমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেন।

মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স বাড়াইবার জন্য নূতন করিয়া বসতবাটীর মূল্য নির্দ্ধারিত হইতেছিল। এজন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল এবং বাবু গণেশ প্রসাদ সেই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যে পল্লীর বাড়ীর মূল্য নির্দ্ধারিত হইতেছিল, বাবুয়াজির কোন অনুগত ব্যক্তি সেই পল্লীতে বাস করিত। কমিটি এই বাড়ীর যে মূল্য স্থির করিয়া-ছিলেন, বাবু গণেশপ্রসাদ রিপোর্ট দিবার সময়ে কমিটির সভ্যগণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সেই মূল্য অর্দ্ধেকেরও অধিক কমাইয়া দিয়াছিলেন। ছিদ্রান্বেষী বিরুদ্ধ পক্ষের নিকট কেমন করিয়া কথাটা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তাহারা কথাটা কালেক্টর সাহেবের কাণে তুলিয়া দিল। তাহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সাহেব স্বয়ং তদন্ত করিতে স্বীকৃত হইলেন।

তদন্তের ফলে প্রকৃত কথা আর গোপন রহিল না। বিরুদ্ধ পক্ষ জেদ ধরিল সভার আগামী অধিবেশনে এই কার্য্যের জন্য গণেশপ্রসাদকে প্রকাশ্য ভাবে নিন্দা (censure) করিতে হইবে।

কালেক্টর সাহেবও এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। গণেশপ্রসাদের বন্ধুরা প্রমাদ গণিল। কিন্তু ধীরবুদ্ধি গণেশপ্রসাদ ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

যথাসময়ে সভার অধিবেশন হইল। সকলেই মনে

করিয়াছিলেন, গণেশপ্রসাদ এ সভায় কিছুতেই উপস্থিত থাকিবেন না। কিন্তু সভা বসিবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই গণেশপ্রসাদ সম্পূর্ণ সপ্রতিভভাবে সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিলেন।

সমবেত কমিশনরগণের সকলেরই চক্ষে গভীর বিস্ময় ও কৌতুক প্রতিবিম্বিত হইল। সভায় প্রস্তাব উত্থাপিত হইল, "বাবু গণেশপ্রসাদ এরূপ কাজ করিয়া অতি অন্যায় করিয়াছেন। এজন্য সভা একবাক্যে তাঁহার নিন্দা করিতেছেন।"

সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে বাবু গণেশপ্রসাদ যথাসাধ্য নিজের পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তিনি বাঙ্‌নিষ্পত্তি মাত্র করিলেন না।

মন্তব্য ভোটে ফেলা হইল। গণেশপ্রসাদের দুই চারি জন বন্ধু ব্যতীত সকলেই মন্তব্যের স্বপক্ষে হাত উঠাইলেন। কিন্তু সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, বাবু গণেশ-প্রসাদ স্বয়ং মন্তব্যের স্বপক্ষে হাত উঠাইয়া আছেন!

একটা অস্ফুট বিস্ময় ধ্বনি সভার সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইল।

গণেশপ্রসাদ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "Majority must be granted."

গণেশপ্রসাদের নির্ভীক সরলতা দেখিয়া কালেক্টর সাহেব বিমুগ্ধ হইলেন। সভার শেষে সাহেব প্রকাশ্য ভাবে বলিলেন, "ভুল সবাই করিয়া থাকে। কিন্তু বীরের মত সেই ভুল স্বীকার করাতেই প্রকৃত মহত্ব। আমি বাবু গণেশপ্রসাদের মহত্ত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। ভারতবাসীর মধ্যে এরূপ মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত আমি দেখিবার আশা করিনাই!"

বাবু গণেশপ্রসাদ উজ্জ্বলতর মহিমায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। বিরুদ্ধ পক্ষীয়েরা অবনতমুখে সভা হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

৩

বাবু গণেশপ্রসাদের প্রতিপত্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

পরবৎসর কালেক্টর সাহেবের বিশেষ চেষ্টায় বাবু গণেশপ্রসাদ মিউনিসিপালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইলেন। বিরুদ্ধ পক্ষ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও এ ব্যাপারে কিছুতেই বাধা দিতে পারিল না।

সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হইয়া বাবু গণেশপ্রসাদ একাগ্র নিষ্ঠার সহিত সাহেব-সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে তাঁহার জীবনে তিনি দুইটি মাত্র কর্ত্তব্যকে বরণ করিয়া লইয়াছেন— একটি Loyalty; দ্বিতীয়টী public duty.

Loyalty বলিতে তিনি একমাত্র সাহেব সেবাই বুঝিতেন এবং অন্য প্রকারের Loyaltyকে mock loyalty বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। সুতরাং বাবু গণেশপ্রসাদ অবিলম্বে রাজভক্তির অনুশীলনে মনোনিবেশ করিলেন।

সাহেবদের গাড়ীর ট্যাক্স উঠাইয়া দিলেন, স্বাস্থ্য পরিদর্শককে প্রত্যহ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ ভাবে সাহেবদের বাটী পরিষ্কার করাইতে বলিয়া দিলেন। ওভারসিয়ারকে প্রত্যহ তাঁহাদের বাসায় গিয়া তাঁহাদের কোন কাজের জন্য Municipalityর কুলির আবশ্যক আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিতে আদেশ দিলেন।

সাহেবদের প্রত্যেকের বাটীর সম্মুখে নূতন করিয়া জলের কল ও আলোকস্তম্ভ বসিল। স্বল্পমূল্যে তাঁহাদের প্রয়োজনমত উৎকৃষ্ট মাংস যোগাইবার জন্য বাজার-পরিদর্শকের প্রতি আদেশ দেওয়া হইল।

সাহেব ঠিকাদারদের জন্য মজুরির দর দ্বিগুণ করিয়া দেওয়া হইল এবং সহরের অন্যান্য স্থানে জলসেচন বন্ধ করিয়া দিয়া সাহেব পাড়ায় প্রচুর পরিমাণে জলসেচনের ব্যবস্থা করা হইল।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই গণেশপ্রসাদের কীর্ত্তি-কাহিনী সাহেবদের ক্লাবে মুখরিত হইয়া উঠিল। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন যে এরূপ দক্ষ Vice-chairman তাঁহারা বহুদিন দেখেন নাই।

শুনিয়া আশ্রিত-বৎসল কলেক্টর সাহেব গভীর আত্মপ্রসাদের হাসি হাসিলেন।

এইরূপে Loyaltyর প্রাপ্য সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিয়া বাবু গণেশপ্রসাদ public dutyর পরিপালনে মনোনিবেশ করিলেন।

প্রথমতঃ "ভোটার"দিগকে যথাসম্ভব ঋণদানে তিনি বাধ্য করিয়া ফেলিলেন। ভংস্থ কমিশনরগণও এই কৌশলে তাঁহার দলবৃদ্ধি করিলেন। হাকিমেরা অনেকেই উপযুক্ত "ডালি" লাভে তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন।

বিদ্রোহী বিপক্ষগণের বাটীর সম্মুখে বা পার্শ্বেই সাধারণ পাইখানা বা প্রস্রাবগৃহ স্থাপিত হইল। তাঁহাদের বাড়ীর নক্সা এক বৎসরের পূর্ব্বে মঞ্জুর হইবে না, ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানকে এইরূপ গোপন আদেশ দেওয়া হইল। এবং কোন সুযোগ পাইলেই তাঁহাদের উপর মোকদ্দমা চালাইবার জন্য সকল কর্ম্মচারীকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল।

শিক্ষিত জনসাধারণের সকলের সঙ্গেই তিনি হাসিয়া কথা কহিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগের প্রার্থনা পূরণ ব্যাপারে, বাক্যে "কল্পতরু" হইয়া উঠিলেন।

এইরূপে সাম দান ভেদ ও দণ্ডের সাহায্যে বাবুয়াজি অল্পদিনের মধ্যেই আপনার উচ্চাসন সম্পূর্ণ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লইলেন।

সাধারণ কার্য্যে বাবুয়াজির এরূপ প্রবল অনুরাগ ও উৎসাহ সত্ত্বেও তাঁহার সমদর্শিতার অভাব ছিল না। তিনি স্বদেশ-বৎসলতার সহিত আত্মবৎসলতার অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়া "মণিকাঞ্চন" যোগের আদর্শস্থল হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কমিশনর অবস্থায় যে প্রশংসার্হ আত্মবৎসলতা তাঁহার কর্ম্মপটুতার চালকশক্তিরূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার এই উন্নত অবস্থাতেও সেটা তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করে নাই।

ঠিকাগাড়ী যে স্থলে অন্য লোকের নিকট আট আনা ভাড়া দাবি করিত, বাবু গণেশ প্রসাদের নিকট সে স্থলে তাহাকে দুই আনা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। নহিলে তাহার লাইসেন্স যাইত।

যে রাস্তায় আলোক দিবার ঠিকা পাইত তাহাকেই নিজের তৈলে বাবুয়াজির গৃহে সমস্ত লেম্পগুলি ভরিয়া দিয়া যাইতে হইত।

যে সৌভাগ্যবান রাস্তা মেরামত করিবার ঠিকা পাইত, বৎসর বৎসর বাবুয়াজির বাড়ী মেরামতের ভারও তাহা-কেই লইতে হইত, নহিলে দুই বৎসরের মধ্যেও তাহার বিল্ পাস্ হইবার সম্ভাবনা থাকিত না।

এইরূপে অসাধারণ শাসন ক্ষমতার পরিচয় দিয়া বাবু গণেশ প্রসাদ সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন। সরকারী বার্ষিক বিবরণীতে প্রতিবৎসরেই তাঁহার কার্য্য-কুশলতা সগৌরবে কীর্ত্তিত হইতে লাগিল।

এইরূপে বাবু গণেশ প্রসাদ অপ্রতিহত প্রভাবে দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ কাল অবিচ্ছেদে মিউনিসিপ্যাল-রাজ্য শাসন ও পালন করিলেন।

ইহার মধ্যে কেবল একবার বিপক্ষ পক্ষীয়েরা তাঁহার নির্ব্বাচনে বাধা দিবার জন্য প্রবল ষড়যন্ত্র উপস্থিত করিয়াছিল কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাবুয়াজির অপূর্ব্ব কৌশলে তাহারা যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের এই দুর্ব্বুদ্ধি চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অতি গোপনে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। নির্ব্বাসনের দুইদিন মাত্র পূর্ব্বে বাবুয়াজি গোপনে সংবাদ পাইলেন যে বিরুদ্ধপক্ষের ঐকান্তিক চেষ্টায় সেবার ১২ জনের মধ্যে ৭ জন কমিশনার তাঁহার বিরুদ্ধে ভোট দিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে। শুনিয়া বাবু গণেশপ্রসাদ মুহূর্ত্তের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ক্ষণমধ্যেই তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধি সজাগ হইয়া উঠিল। বাবুয়াজি তিনটি এক এক হাজার টাকার থলি লইয়া বেগে জুড়ি হাঁকাইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

থলি লইয়া তিনি একে একে তিনজন কমিশনরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। "অর্থ"-যুক্ত প্রবল যুক্তির প্রভাবে তিনজনেই বাবুয়াজির স্বপক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। বাবুয়াজি তিনজনের নিকট হইতে এক একখানি হাতচিঠা লিখাইয়া লইলেন। স্থির হইল ভোট দেওয়ার পরেই হাতচিঠাগুলি তাঁহাদেরই সম্মুখে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলা হইবে।

যথা সময়ে ভোট দেওয়া হইয়া গেল। বিরুদ্ধ পক্ষীয়েরা নিজের স্বপক্ষীয় তিনজনকে সহসা গণেশ প্রসাদের পক্ষ অবলম্বন করিতে দেখিয়া ক্ষোভে রোষে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল। নির্ব্বাচিত গণেশপ্রসাদ বিনীত ভাবে প্রত্যেককে অভিবাদন করিয়া গৃহে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার সময় সেই নবসংগৃহীত বন্ধুরা তাঁহার নিকট হাতচিঠা ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিলেন। শুনিয়া গণেশপ্রসাদ উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "আপনারা কি ভাবিতেছেন সে কার্য্য এখনো বাকি আছে? আমি আফিস হইতে আসিয়াই স্বয়ং স্বহস্তে সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি। কি বল রামজয় সিং?"

ভৃত্য রামজয় আভূমি মস্তক নত করিয়া প্রভুর কথার সমর্থন করিল। বন্ধুবর্গ আতর, পান ও গোলাপ-জলের দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া পরম উল্লাসে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সকলেরই মনে মনে ধারণা জন্মিল যে গণেশপ্রসাদের মত মুর্খ জগতে অল্পই দেখা যায়। এক এক হাজার টাকার থলি! ভাইস্‌চেয়ারম্যান হইয়া কি স্বর্গ লাভ হইবে?

দ্বিতীয়বার সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় বাবু গণেশ-প্রসাদ ও বিরুদ্ধপক্ষের সমবেত চেষ্টায় তাঁহারা আর কমিশনর নির্ব্বাচিত হইতে পারিলেন না। সুযোগ পাইয়া গণেশপ্রসাদ তিনজন আত্মীয় ও বন্ধুকে তাঁহাদের স্থানে নির্ব্বাচিত করাইয়া দিলেন। তাঁহার ভাইস্‌চেয়ারম্যান হইবার পথ এতদিনে নিষ্কণ্টক হইল।

এইরূপে সম্পূর্ণ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বাবু গণেশপ্রসাদ বিশ্বাসঘাতকগণকে সুশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলেন। তিনমাসের মধ্যে পরাজিত কমিশনরগণের নামে সুদে আসলে দুই দুই হাজার টাকার নালিশ রুজু হইল।

"আরজি দাবির" সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ স্বাক্ষরযুক্ত হাতচিঠি দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বিপন্ন বন্ধুবর্গ গণেশপ্রসাদের নিকট ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "একি ব্যাপার!" সপ্রতিভ গণেশপ্রসাদ মৃদু হাসিয়া বলিলেন "কি করি বলুন; বাবা যে কিছুতেই ছাড়িলেন না। নহিলে আপনারা যে উপকার করিয়াছেন—!"

অগত্যা বিনাবাক্যব্যয়ে বন্ধুবর্গকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। বাবু গণেশপ্রসাদ ভৃত্যকে দিয়া তাঁহাদের সম্মানের জন্য পান ও আতর আনাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের গাড়ীতে উঠাইয়া দিলেন।

যথা সময়ে এক হাজারের স্থলে দুই হাজার টাকা গণিয়া দিয়া বন্ধুবর্গ সুস্পষ্ট প্রণিধান করিলেন জগতে প্রকৃত বুদ্ধিমান্ কে! ইহার পর গণেশ প্রসাদের অদৃষ্টে আর কখনো পরাজয়ের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত ঘটে নাই।

৪

বিকাশ ও অভিব্যক্তিই জগতের নিয়ম। বাবু গণেশ প্রসাদের পরহিতেচ্ছাও ক্রমশঃ বিকাশলাভ করিতে লাগিল। তিনি আর কেবলমাত্র একটি সহরের উপকার করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। সমস্ত প্রদেশের উপকার করিবার জন্য তাঁহার উদার হৃদয় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

গণেশপ্রসাদ বিহারের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। এ ব্যাপারেও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা তাঁহাকে জয়যুক্ত করিল।

সর্ব্বপ্রথমেই বাবু গণেশপ্রসাদ সাহেবদের নিকট হইতে অনুরোধপত্র লইয়া অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটির সাহেব কমিশনরদের হস্তগত করিয়া ফেলিলেন।

কুলোকে বলে একার্য্যের জন্য তাঁহাকে অনুরোধপত্র ব্যতীত আরও কিছু "স্পর্শযোগ্য" কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কেহই পায় নাই। লোকে কেবল দেখিয়াছিল যে গণেশপ্রসাদ যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানেই সাহেব বিবিদের নাচ ও ভোজের ধুম পড়িয়া গিয়াছিল, এবং প্রধান প্রধান মেম্

সাহেবেরা নূতন নূতন বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা "কাকতালীয়" মাত্র কিনা কে বলিতে পারে?

সাহেবদের হস্তগত করিয়া বাবু গণেশপ্রসাদ সর্ব্বত্র সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করিলেন এবং প্রত্যেক স্থলেই প্রচুর অর্থসাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাঁহার প্রতিনিধিরা, গোপনে অন্যান্য দেশীয় কমিশনরগণের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তাঁহাদেরও বশীভূত করিয়া ফেলিল।

ইহাতেও যেখানে সন্দেহের ক্ষীণান্ধকার অবশিষ্ট রহিল, সেখানে বাবু গণেশপ্রসাদের সুলিখিত বক্তৃতার তীব্র কিরণ রেখা "খরথজ্যো"র মত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এই স্মরণীয় বক্তৃতার সমস্ত উদ্ধৃত করিতে পারি এরূপ স্থান ও ক্ষমতা আমাদের নাই। সুতরাং পাঠকবর্গকে ইহার নিতান্ত সংক্ষিপ্তসার মাত্রেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে সঙ্গীতের সুরে বাবু গণেশপ্রসাদ তাঁহার "টাইপ রাইট" করা কাগজ হইতে পড়িয়া গেলেন—

"আমরা হিন্দু। আমরা প্রত্যক্ষ দেবতা মানি, নিরাকার মানি না।

"যদি পৃথিবীতে কোন প্রত্যক্ষ দেবতা থাকেন ত তাঁহারা কে? রাজা এবং রাজপুরুষ। আমি আবার বলি, রাজা এবং রাজপুরুষ! আমি সহস্রবার বলি, রাজা এবং রাজপুরুষ! যদি কেহ বলে ইহাঁরা ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য দেবতা আছেন, তাহা হইলে সে ভণ্ড, সে নাস্তিক, সে মিথ্যাবাদী! এই Sturdy Loyaltyর উপরেই বেহার প্রতিষ্ঠিত। এই রাজভক্তি যেদিন ক্ষুণ্ণ হইবে, সেদিন বেহারের আর কোন আশা ভরসা থাকিবে না।

"কোন কোন নির্ব্বোধ বক্তাকে বলিতে শুনিয়াছি একান্ত চিত্তে দেশের সেবা কর তাহা হইলেই তোমার জীবন সার্থক হইবে!'

"কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, দেশ কোথায়? দেশ রাজা ও রাজপুরুষের চরণতলে। তাঁহাদের শ্রীচরণে অর্ঘ্য দাও, দেশের সেবা আপনি হইবে!"

বাবু গণেশপ্রসাদের ইংরাজি জ্ঞানের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং ভাব ও ভাষা মিলিয়া যে অপূর্ব্ব বক্তৃতাপদ্ম তাঁহার মুখবিবর হইতে বিনির্গত হইল তাহার সুরভি ও সৌন্দর্য্য সহজেই অনুমেয়। এ বক্তৃতা যে শুনিল সেই মুগ্ধ হইল।

বিরুদ্ধ পক্ষও নিশ্চিন্ত ছিল না। তাহারা নিকটবর্ত্তী জেলার প্রসিদ্ধ উকীল বাবু ভান্ প্রকাশকে বাবুয়াজির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড় করাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু বাবুয়াজির বক্তৃতাঝটিকা তাহাদের আশাতরুকে সমূলে উন্মূলিত করিয়া ফেলিল। অধিকাংশ "ডেলিগেট" যথা সময়ে কমিশনর সাহেবের আফিসে উপস্থিত হইয়া বাবু গণেশ প্রসাদের পক্ষে ভোট দিয়া গেলেন।

গণেশ বাবুর স্বপক্ষীয়েরা বলিল, বাবু গণেশ প্রসাদের অসাধারণ ইংরাজি জ্ঞানই এই অসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিরুদ্ধপক্ষ বলিল "বাক্য" অপেক্ষা "অর্থ"ই বলবান। ভোট দিবার দিনে ডেলিগেটগণের পকেটে হাত দিলেই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইত।

যথা সময়ে বাবু গণেশপ্রসাদ "মান্যবর" উপাধিতে বিভূষিত হইলেন। সাহেবদের ক্লাবে পান ভোজনের উৎসব পড়িয়া গেল। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন, "এতদিনে প্রকৃত যোগ্যতা সম্মানিত হইল।"

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

নর-নারায়ণ

১

মানব হতে অনেক দূরে তোমার বাসভূমি,
ভাব্‌তে পরাণ গুমরে উঠে প্রভু!
করুণাময়, এমন নিঠুর কঠোর হবে তুমি
আন্‌তে মনে পারিনা ত কভু।
হাটের শেষে ফিরবো যবে নদীর তট 'পরে
মাঠের ধূলি-মলিনতায় অঙ্গখানি ভরে',
ডাকি যদি সন্ধ্যাকালে পার করগো নেয়ে—
নৌকা যদি নাহি ভিড়াও তবু,
ভবের মেলায় সারা বেলায় কোন ভরসায় চেয়ে
কেমন করে' রইবো বেঁচে প্রভু?

২

ওগো—মা যশোদার স্তন্যধারা বিফল কিগো হবে?
বসন তিতে' রইবে যে সে প্রভু!
গিরিরাজের গৃহ কিগো আঁধার হয়ে রবে,
সানাই তথা বাজবেনাক কভু?
কে হরিবে জীব-জগতের পরাণভরা ক্ষুধা
অন্নপূর্ণা হয়ে যদি না দাও মুখে সুধা?
জীবন-কুরুক্ষেত্রে যবে ধর্ম্ম টলমল,
রথের আগে নাহি বসো তবু,
দুঃখ শোকের রক্তপাথার করলে কলকল
কেমন করে' তরবো তবে প্রভু?

৩

হায় —তোমার ভবব্রজের মাঠে চরবেনাক ধেনু,
পাঁচন যদি নাহি ধরো প্রভু,
কদমতলে নাহি যদি বাজে তোমার বেণু,
স্পন্দিবে কি ব্রজের হিয়া কভু?
ঘরকে যদি বা'র না করাও, বা'রকে যদি ঘর,
পরকে নাহি আপন কর, আপনাকে গো পর,—
এই জীবনের মাখন দধি পড়বে পশুর মুখে,
আঁধার রাতে হরবেনাক তবু?
তরুণ হিয়ার সকল সুধা গরল হবে দুখে
পিয়া যদি নাহি বেড়াও প্রভু।

৪

যদি—ভিক্ষু হয়ে না চাও তুমি, বিভব-বিত্তভার—
বিশ্ব 'বলি'র নুইবে মাথা প্রভু,
দাতা হয়ে না দাও যদি, একতারাটির তার
ঐ দুয়ারে বাজবে কিগো কভু?
ফুটবে কি ফুল মালঞ্চে ও গাইবে কি গো পাখী?
বইবে কি আর প্রেমের নদী ফলবে কি আর শাখী?
জ্বলবে না সাঁঝ বাজবে না শাঁখ তোমার আঙিনায়,
দেখতে তুমি পারবে তাহা তবু?
তোমার সাধের প্রমোদ ভবন শ্মশান হবে হায়
অবহেলায়, তাই কি হবে প্রভু?

৫

যদি —দুঃখ হয়ে দুঃখী হয়ে নাহি কাঁদাও, কাঁদো,—
অশ্রুবিনা মরুই হবে প্রভু;
ধরারাণীর বক্ষখানি শ্যাম হয়ে না বাঁধো,
শ্যামলতা জাগবে কিগো কভু?
কণ্ঠে যদি আনন্দহার না দাও আঁখি চুমি,
মোদের যাহা করতে হবে, না করো তা তুমি,
তোমার খেলায় রইব কত তোমার আশে আশে
দিবা শেষেও আসবেনাক তবু?
চলবেনাক তোমার লীলা, মোদের বাহু পাশে
বাঁধা যদি না রও তুমি প্রভু।

শ্রীকালিদাস রায়।

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে "মা"

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে যে ভাবতরঙ্গ বঙ্গের আদি কবি চণ্ডীদাস অবতারণা করিয়াছিলেন তাহা যদি অবাধে বহিয়া যাইত তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্য এতদিনে কান্ত ভাবেই ডুবিয়া যাইত। বাঙ্গালী না হইলেও বিদ্যাপতির প্রভাবও বঙ্গসাহিত্যের উপর সামান্য নহে। এই দুইজন কবির প্রভাবে বৈষ্ণব-কাব্য-সাহিত্যের উৎপত্তি। তাই বৈষ্ণব-সাহিত্যে মধুর রসেরই প্রাবল্য। কিন্তু বৈষ্ণবী সাধনায় মধুর রসের স্থান যতই উচ্চে হউক, উহা পাইতে হইলে স্তরে স্তরে উঠিয়া যাইতে হয়, ক্রমাভিব্যক্তি এ সাধনারও মূল ভিত্তি—এই তত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য নদীয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন যে বাৎসল্যরসের সাধনা কত উপাদেয়। এই জন্য চৈতন্য-পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদের কাছে আমরা বাৎসল্য রসের ছবি পাইয়াছি। তাঁহারা প্রেমার্দ্রচিত্তে মা যশোদার মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছেন—শচীমার অমর চিত্র আঁকিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহার পর বঙ্গসাহিত্যে যে কয়খানি প্রসিদ্ধ কাব্য গ্রন্থ দেখিতে পাই, সেগুলির মধ্যেও মাতৃমূর্ত্তি উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত। শৈব কাব্যগুলিতে গিরিরাণী ও গিরিনন্দিনীকে উপলক্ষ করিয়া যে মাতৃস্নেহের বাৎসল্যরসের প্রস্রবণ সৃষ্ট হইয়াছে তাহা চিরকাল বাঙ্গালীর হৃদয় স্নিগ্ধ করিবে। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যেও এই চিত্র বেশ মনোরমভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তারপর বাঙ্গালী চরিত্রে যেমন যেমন পরিবর্ত্তন হইতে গিয়াছে, তেমনি মাতৃচিত্রগুলিও পরিবর্ত্তিত, বিকৃত হইতে গিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের যেখানে শেষ বলিয়া ধরা যাইতে পারে, সেখান পর্য্যন্ত মাতৃচিত্র সুপরিস্ফুট। কারণ, আমাদের চরিত্রে যতই অবনতি ঘটিয়া থাকুক, আমরা মায়ের আসন টলাইতে তখনও শিখি নাই। আমাদের গার্হস্থ্যের মূলে মা, আমাদের সমাজের মূলে মা। বহুদিন পূর্ব্বে, জানি না, কোন্ যুগে ভগবান্ রামচন্দ্র শ্রীমুখে বলিয়া গিয়াছেন,"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। —আমরা সেই দেববাণী শুধু কথায় কথায় পর্য্যবসিত করিয়া রাখি নাই, জননীর সম্বন্ধে তাহা হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিয়াই আসিয়াছিলাম। ভারতীয় সাহিত্যে তাই মার আদর চিরকাল অক্ষুণ্ণই ছিল। আদি কবি বাল্মীকি, কবিগুরু বেদব্যাস, এত উজ্জ্বল ভাবে মাতৃচিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন যে সে চিত্রের অপলাপ এখনও আমরা করিতে পারি নাই।

বঙ্গের প্রাচীন কবিকুল তাঁহাদের কাব্যে দেবচরিত্র ব্যপদেশেও গৃহচিত্র, সমাজচিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। অতএব গৃহে ও সমাজে মার যে স্থান ছিল, তাহা আমরা তাঁহাদের কাব্য হইতে জানিতে ও বুঝিতে পারি। আরও বুঝিতে পারি যে বাঙ্গালীর অবস্থান্তর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী যে রসপানে পরিপুষ্ট, তাহারও কেমন অবস্থান্তর হইয়া পড়িতেছিল। বাঙ্গালীর জীবন তাহার জননী-জীবনের সহিত অচ্ছেদ্য, অপরিহার্য্যভাবে জড়িত ছিল। ভারতে, এবং বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, মার যে পরিমাণে ও যে ভাবে আদর ছিল, ততটা অন্য কোনও দেশে থাকিতে পারে নাই, তাহার কারণ আমাদের গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী "মা"। অন্যান্য পরিবারবর্গ সকলেই মার আজ্ঞাধীন অনুগ্রহজীবী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখনও বাঙ্গালী যখন বিবাহ করিতে যায়, তখন মাকে বলিয়া যায় যে তাঁহার দাসী আনিতে যাইতেছে। একান্নবর্ত্তী পরিবারে মার প্রভাব ভারতবাসী যতটা বুঝিতে পারে, ততটা অন্য দেশের লোকের বুঝিবার উপায় নাই। ভারতের সাহিত্যে সার কল্পনা মাতৃমূর্ত্তি—এই কল্পনার বলেই ভারতবাসী ভগবানে মাতৃত্বের আরোপ করিয়া নিজেকে ও জগৎকে ধন্য করিতে পারিয়াছে। এ কল্পনা জগতে আর কোথাও দেখা যায় না। বিশ্বমাতাকে লইয়া ভারতের ধর্ম্মে যে নূতন নূতন ভাবুকতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দ্বারা ভারতের পুরাণ ও সাহিত্য চিরকালের জন্য সমৃদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ

বঙ্গদেশে ভগবানের মাতৃভাবের বড়ই আদর, ভক্তের মাতৃনাম গানে বঙ্গসাহিত্য তাহার এক অংশ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি মাতৃভক্ত সন্তানেরা তাঁহাদের পারমার্থিক সঙ্গীতে যে তান তুলিয়াছেন, তাহাতে কেবল ধর্ম্মসাহিত্যই যে পুষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, ঐ সকলে যে স্নেহ, যে আবদার ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে ঐ গুলিতে বঙ্গসমাজে মা ও ছেলের মধ্যে কি নিবিড় সম্পর্কই ছিল। মা যে কি বস্তু তাহা আমরা তখন বুঝিতাম, কাজেই তখনকার গানে, ভাবে, কাব্যে মার যথেষ্ট প্রভাব।

কিন্তু যখন ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল, তখন পূর্ব্বভাব অল্পে অল্পে সরিয়া দাঁড়াইল; সমাজে একটা বিপ্লব সূচিত হইল। ইংরাজী শিক্ষিত নব্যসমাজ উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচারকে ধর্ম্ম বলিয়া বরণ করিলেন; তখন তাঁহাদের মানসিক অবস্থা যে কি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার "একাল ও সেকালে" প্রকাশ করিয়াছেন। এই দলের প্রায় সকলেই কালাপাহাড়ের মত দেশের সকল বস্তুর মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। দেশের যা কিছু বরেণ্য বা আদরণীয় ছিল তাহা উপেক্ষিত হইতে লাগিল—ধর্ম্ম গেল, ভাব গেল, সাহিত্য গেল, আদর্শ গেল, স্বয়ং ভগবান্ উড়িয়া গেলেন। ইতিহাসে দেখা যায়, যখন একটা দেশে বিপ্লবের সূত্রপাত হয়, তখন সেই দেশে কতকগুলি শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাব হয়, তাঁহারাই এই বিপ্লবের কর্ণধার স্বরূপ হইয়া যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন সূত্রে ঐ জীবন-সংগ্রাম প্রবর্ত্তিত করেন। ভারতের মধ্যে ঐ সংগ্রাম আরম্ভ হয় বঙ্গদেশে—তাই বঙ্গদেশে সে সময় কতকগুলি শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যে এই শক্তিশালী পুরুষগণের অগ্রণী মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইনিই প্রথমে ইউরোপীয় আদর্শে বঙ্গসাহিত্য রচনার সূত্রপাত করেন, কালিদাসকে ছাড়িয়া হোমরকে অনুকরণ করেন,দেশের পণ্ডিত মণ্ডলীকে "Barren rascals" নামে অভিহিত করিয়া, Dr. বিশ্বনাথকে বর্জ্জন করিয়া, বিলাতী আদর্শে নাটক প্রণয়ন করেন, গ্রীকপুরাণ হইতে বিষয় সংগ্রহ করেন, এবং মিল্টনের অনুকরণ করিতে গিয়া পাপী ও অসংযতচরিত্র রাবণকে কাব্যের নায়ক করিয়া দেশের মহান্ স্বার্থত্যাগের আদর্শ ভগবান্ রামচন্দ্রকে খর্ব্ব করিয়া ফেলেন। তাঁহার শক্তি চলিয়াছিল বিদ্রোহের পথে—আর সে শক্তি বড় সহজ শক্তি নয়। প্রাকৃতিক নিয়মই এই যে, ঝঞ্ঝাবায়ু বহিলে আকাশে দূষিত বায়ু পরিষ্কৃত হয়—মাইকেলের দ্বারাও বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশ তাহার দূষিত বায়ু পরিত্যাগ করিয়া সংশোধিত হইয়াছিল সে কথা সকলেই জানেন। যে ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ হইতে পারিবেন না বলিয়া রাজা রামমোহন রায় কবিতা লিখিতে বিরত হইয়াছিলেন, সেই ভারতচন্দ্রের প্রভাব এই শক্তির মুখে তৃণবৎ উড়িয়া গিয়াছিল এবং বঙ্গসাহিত্যে একটা নূতন তেজের সৃষ্টি করিয়াছিল।

কিন্তু যেমন একদিকে আকাশ পরিষ্কৃত হইল, তেমনি আর একদিকে মেঘ দেখা দিল। সাহিত্যে এক অনাচারের স্থানে অপর অনাচার প্রবেশ লাভ করিল। আমাদের সমাজ যতই অবনত হউক, তখনও সেখানে ত্যাগের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহার পরিবর্ত্তে স্ব স্ব প্রধানত্বের আদর্শ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। এই আদর্শ বঙ্গের একান্নবর্ত্তী পরিবারের মন্দির চূর্ণ না করিলেও, যেখানে তাহার মহত্বটুকু দেবতার সম্মানে পূজিত হইত, সেই মন্দির-বেদীতে দারুণ আঘাত করিল। সমাজে যে পরিবর্ত্তন সূচিত হইল, তাহার মূলমন্ত্র আত্মসম্প্রসারণ। আগে আত্মীয় স্বজন পরিবারের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইত, এখন হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল; পূর্ব্বে মা ছিলেন দেবী, এখন খুব জোর গৃহিণী; তাহার অধিক সম্মান আর তাঁহার রহিল না। এ সম্মানটুকুও যেন অনুগ্রহদত্ত। যে দাবীর জোরে তিনি সে সম্মান আদায় করিয়া লইতেন এখন আর সেই জোরটুকু যেন রহিল না। ইউরোপে লোকে তো মা লইয়া সংসার শোভিত করে না, তাহারা পত্নী লইয়া

গৃহরূপ উদ্যান ভূষিত করে; তাহাদের কাছে পিতার পরিবারের চেয়ে নিজের পরিবারের আদর অনেক বেশী; অতএব সেই নব্য আদর্শের কাছে দেশীয় ত্যাগের আদর্শটা—মাতৃদেবীত্বের আদর্শটা—ম্লান হইয়া গেল। "বাবু"দের "গৃহিণী" রোগে ধরিল।

এ রোগের লক্ষণ শুধু যে গৃহেই প্রকাশিত হইয়া ক্ষান্ত হইল তাহা নহে, সাহিত্যেও ইহার প্রভাব দেখা দিতে আরম্ভ করিল। সাহিত্যে মাতৃচিত্র বিরল হইতে লাগিল। যেখানে বা সে চিত্র রহিল, সেখানেও তাহা অপ্রধান চরিত্র হিসাবে। 'মেঘনাদ বধে' মন্দোদরীর স্থান প্রমীলার অনেক নীচে। এই হইল অনর্থের সূত্রপাত। তখন একটা নূতন সাহিত্য-গঠনের যুগ—সে যুগ অনুপ্রাণিত হইল পাশ্চাত্য ভাবে। ঈশ্বর গুপ্তের মিঠেকড়া চাবুক বড় কিছু করিতে পারিয়াছিল এমন মনে হয় না। ফলে বাঙ্গালীর নূতন সাহিত্যে মার আদর কমিতেই লাগিল। এ সাহিত্য মাতৃস্নেহরসে সিক্ত হইয়া পবিত্র হইল না, ইহা পত্নীপ্রেম বা ভাবী পত্নীর আকাঙ্ক্ষা লইয়া রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু পত্নীপ্রেমের আদর্শও টলিয়াছিল, তাই এ প্রেমেও বিলাতী ছাপ পড়িল। তাই স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভা লইয়া আসরে নামিলেন—"এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর" এমনি বিলাতী কায়দা লইয়া। 'দুর্গেশনন্দিনী' বাঙ্গালায় একটা নবযুগ আনয়ন করিল সত্য, কিন্তু ইহাতে মাতৃত্বের চিহ্নমাত্র নাই। আয়েষা ও তিলোত্তমা দুইটি চরিত্রই বিলাতী ছাঁচে ঢালা। বঙ্কিমের এক একটি পুস্তক সৌন্দর্য্যের খনি, কলার আধার, সাহিত্য-শিল্পের সুনিপুণ অভিব্যক্তি—সে কথা একশতবার বলিব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে হইবে যে প্রথম প্রথম তাঁহার প্রতিভা পাশ্চাত্য আদর্শেই বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। তিনি সেক্ষপীয়রেরই মত সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিত ভালবাসা ও রূপ-লালসার চিত্র আঁকিয়াছেন, কালিদাসের মত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন, অন্যান্য অনেক মহান্ ভাবের লীলাও দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট এই অপূর্ব্ব সাহিত্য মাতৃচিত্র-হীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর',—অমর কাব্য হইলেও এ অংশে বিকলাঙ্গ। 'কৃষ্ণকান্ত' বা 'বিষবৃক্ষে' যে মাতৃ-চিত্র আছে, তাহা যেন ফুটিতে সাহস করে নাই—এত সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে যে আমরা ইহার রস উপভোগ করিতে পারি না, উপভোগ করিবার সময়ই পাই না। এই চিত্রগুলি মাতৃস্নেহের পূর্ণানুভূতিতে আমাদের হৃদয় ভরিয়া দিতে পারে না। 'দেবীচৌধুরাণী'তে ও পরিবর্দ্ধিত ইন্দিরায় কবি মাতৃহৃদয়ের চিত্র আঁকিয়াছেন। প্রথমটি অতি সংক্ষিপ্ত এবং দ্বিতীয়টি সুভাষিণীর চরিত্রের পাশে যেন নিষ্প্রভ। তবু এ সময়ে বঙ্কিম বিদেশীয় প্রভাবের হাত হইতে প্রায় সম্পূর্ণ মাত্রায় নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন।

তবে বঙ্কিমচন্দ্র কি মাতৃহৃদয় বুঝিতেন না? মনুষ্য হৃদয় যাঁহার প্রতিভার কাছে উন্মুক্ত ছিল, বিশেষতঃ যিনি স্ত্রীহৃদয়কেই বিশেষ ভাবে বুঝিতেন, তিনি কি মা চিনিতেন না? যে কয়েকটি স্থলে তিনি মাতৃহৃদয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন, সেইখানেই আমরা বুঝিয়াছি যে কবি মাতৃস্নেহের মহিমা জানিতেন। তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থেই মাতৃচিত্র একেবারে নাই, এমন কি শেষ বয়সে তিনি যে কয়েকটি পুস্তক প্রণয়ন ও পরিবর্ত্তন করেন, তাহাতে দেশীয় ভাবের প্রাবল্য থাকিলেও মাতৃচিত্র নাই বা ফুটে নাই। যে কয়খানি গ্রন্থে মার কথা আছে তাহাও গৌণভাবে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' গোবিন্দলালের মাতা আছেন যেন কাশী যাইবার জন্যই—অর্থাৎ গোবিন্দলাল কর্ত্তৃক ভ্রমর ত্যাগের উপলক্ষমাত্র হইয়া। সংসারে মা রহিয়াছেন, অথচ গোবিন্দলাল সব বিষয়ে পরামর্শ করে ভ্রমরের সঙ্গে, মার কথা ভাবেনও না। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নায়িকা প্রধান কাব্য, মাতৃপ্রধান নহে। তারপর 'রজনী'। 'রজনী'তে গ্রন্থনায়কের একটি মা আছেন কবি একথা বলিয়াছেন, কিন্তু সেই মা-টিকে কবি একেবারে লুকাইয়া ফেলিয়াছেন; তিনি রহিলেন লোকলোচনান্তরালে, রোগ-

শয্যায়—তাঁহার স্থান দখল করিলেন "লবঙ্গলতা," যুবতী বিমাতা। 'রজনী'কে যদি একমুহূর্ত্তের জন্যও সামাজিক উপন্যাস বলিয়া ভাবিতাম তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতাম যে ইহা একটা অনাসৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু 'রজনী'তে কবি অপূর্ব্ব কৌশলের ও সৌন্দর্য্যের সাহায্যে কতকগুলি মনস্তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র; তাই সেকথা বলিতে পারিলাম না। তাহা না বলিতে পারিলেও, একথা বলিবার বাধা নাই যে রজনীতে মাতৃচিত্র খর্ব্ব হইয়াছে। 'বিষবৃক্ষে' কমলমণি খোকাকে লইয়া মাতৃস্নেহ একটু-খানি করিয়াছে, কিন্তু সে নিতান্তই বিন্দুমাত্র। 'দেবীচৌধুরাণী'তে প্রফুল্ল ও প্রফুল্লের মাতাকে লইয়া পুস্তক আরম্ভ এবং আরম্ভেই মাতা শেষ হইয়া গেলেন। বলিয়াছি যে 'ইন্দিরা'য় কবি মার গৃহিণীপনার অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু সে চিত্রও যেন অবান্তর ভাবে চিত্রিত। এমন কেন হইল? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র যে সময় ও যে অবস্থায় বঙ্গের নবসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে।

যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি,সে সময়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত দেশের জনসাধারণের বিশ্লেষ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। তখনকার সাহিত্যিকগণ জনসাধারণকে লক্ষ্যান্তর্গত করিয়া সাহিত্য রচনা করিতেন না; করিবার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেন নাই। বিলাতী সমাজে মায়ের প্রতিপত্তি নাই,কাজেই বিলাতী উপন্যাসে,কাব্যে, নাটকে কোথাও মার তেমন আদর নাই। সেখানে দম্পতীকে অথবা প্রেমিক প্রেমিকাকে অবলম্বন করিয়া সাংসারিক লীলা—তাই বিলাতী সাহিত্য নায়ক নায়িকা প্রধান। বঙ্গের নবযুগের নবসাহিত্য যে এই ভাববর্জ্জিত হইবে তাহা আশা করা অন্যায়, কারণ কোনও কালের কোনও সাহিত্যই কালের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যদিও নব্যসাহিত্যিকদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে এই প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি উহা যে তাঁহার হৃদয়ে বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার প্রমাণের কিছুমাত্র অভাব নাই—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, আমরা এতাবৎ যাহা বলিতেছি, তাঁহার কাব্যে মাতৃগৌরবের হানি। সে সময়ের সাহিত্যে এ দোষ রহিয়া গিয়াছে।

এ তো গেল বঙ্কিমযুগের কথা। এখনকার কাব্য সাহিত্যের কথা বলিতে গেলেও এ বিষয়ে আমরা এক প্রকার হতাশই হই। এখনকার যুগের কবি রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার কাব্যসমুদ্রেও মাতৃস্নেহের চিত্ররূপ রত্ন বড় বিরল; নাই এ কথা বলিতে পারি না;—তবে তিনি যতদিন সংসারের কথা কহিয়াছেন ততদিন প্রেমের কথাই বেশী কহিয়াছেন। এখন আর সংসারের কথা কহেন না, যে কথা কহেন তাহাতে সাংসারিক সকল স্নেহ ডুবিয়া গিয়াছে। মহাভারতের অমৃত-রাশি হইতে তিনি যখন সুধা আহরণ করিয়া দুই এক বিন্দু আমাদের দান করিতেছিলেন, তখন আমাদের মনে আশা হইয়াছিল যে তাঁহার কাছ হইতে আমরা মাতৃমহিমা আরও বিস্তৃতভাবে শুনিতে পাইব, কিন্তু আমাদের আশা মনেই রহিয়া গেল, পূর্ণ হইল না।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান সেই সময়েই বঙ্গদেশে ভাবের অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। এবং তাহা ঘটাইয়া-ছিল বহুল পরিমাণে বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রতিভা। দেশীয় ভাবের অভাবে দেশের যে ক্ষতি হইতেছে তাহা বঙ্কিম বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই তিনি তাঁহার উপন্যাসে, কমলাকান্তে, লোকরহস্যে—নানা উপায়ে দেশীয় ভাব জাগ্রত করিবার প্রয়াস করিতেছিলেন। আজকাল দেশে যে মাতৃত্বের ভাব জাগিয়াছে, তাহা তাঁহারই সেই প্রয়াসের ফল। দেশের নিত্য আদর্শ "ত্যাগ", দেশের লোককে তিনিই শিখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনিই শিখাইয়াছেন যে সুখ, সংযমে ও ত্যাগে। সে শিক্ষা পূর্ণ-মাত্রায় ফলবতী হইবার সময় এখনও আসে নাই এবং তাহার আশাও সুদূরপরাহত; কিন্তু তাহার কিছু ফল যে না ফলিয়াছিল তাহা বলা যায় না। ইহার প্রথম ফল উপন্যাসের আদর্শের পরিবর্ত্তন,এ পরিবর্ত্তনের পথ তিনিই দেখাইয়া গিয়াছেন! এবং দ্বিতীয় ফল, মাতৃমূর্ত্তির প্রতি

সাহিত্যিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ। এ সম্বন্ধে হাস্যরসিক "বাঙ্গালী চরিত" প্রণেতাও যে কতক সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন সকল প্রাকৃতিক ঘটনারই মূলে যেমন কার্য্য করে, ভাবজগতেও সেইরূপ করে। সাহিত্য ভিন্ন অন্য যে সকল ঘটনাবলী এই উদ্বর্ত্তন ব্যাপারের হেতুস্বরূপ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে আদর্শ দর্শন ও মহাত্মাগণের শিক্ষাই প্রধান। সমাজে সে সময় মাতৃভক্তির একটি বিরাট আদর্শ বর্ত্তমান ছিলেন—তাঁহাকে বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানিতেন ও মানিতেন—তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দেশের শিক্ষিত সমাজকে বিদেশীয় প্রভাব হইতে রক্ষা করিয়া, দেশে ত্যাগের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সেই সময় আর এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। সেই মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংস। তাঁহার শিক্ষায় ও আকর্ষণে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই নিজ নিজ জীবনের গতি ফিরাইয়া ঠিক পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই সকল নানাবিধ কারণে সমাজেও অসাড় চৈতন্য আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল।

এই লুপ্ত চেতনার পুনঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই যেন সাহিত্যিকগণের হৃদয়ে সাহিত্যে মাতৃচিত্রের অভাববোধ জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই যুগের দুইজন মহাকবি, দুই দলের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া অবতীর্ণ হইলেন। প্রথম নবীনচন্দ্র সেন—তিনি হইলেন নব্যতন্ত্রের মুখপাত্র; তিনি মহাভারতকে উল্টাইয়া তাঁহার মত-পোষক তিনখানি কাব্য রচনা করিলেন। 'মেঘনাদ বধে' দোষ থাকায় তাহা নিন্দনীয় হইয়াছে, ইঁহারও কাব্যে সেই দোষ আরও একটু অতিরিক্তমাত্রায়। এ তিনখানি কাব্যও বঙ্গের জাতীয় কাব্য হইতে পারে নাই, কিন্তু এখানে সে কথার বিচার নিষ্প্রয়োজন। সে যাহাই হউক, নবীনবাবুর আত্মজীবনী হইতে আমরা জানিতে পারি যে মহাকবি বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে মাতৃচিত্র ভালরূপে চিত্রিত না হওয়ার অভাব তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি এই কাব্য-ত্রিতয়ে অর্থাৎ "রৈবতক, প্রভাস ও কুরুক্ষেত্রে" সুভদ্রা-চিত্র অঙ্কিত করিলেন, কতকটা ঐ অভাব পূর্ণ করিবার জন্য, কতকটা মাতৃত্বের একটা আদর্শ সৃষ্টি করিবার জন্যও বটে। কিন্তু সে চিত্র, বিদেশী আদর্শে গঠিত হওয়ায় এবং মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক চিত্র না হওয়ায় পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিল না। এ কথা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং আবার বলিতেও কুণ্ঠিত নহি। একটা বড় রকমের আদর্শ সৃষ্টি করিব বলিয়া গ্রন্থ লিখিতে বসিলে যেমন কৃত্রিমতা দোষ আপনি আসিয়া পড়ে, এ কাব্যগুলিতে সেই দোষ স্পষ্ট। তা যাহাই হউক, সাহিত্যে মাতৃগৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রশংসা তাঁহার নিশ্চয়ই প্রাপ্য। কবি নবীনচন্দ্র যদি বেদব্যাসকে অতিক্রম না করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ মত চলিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ভালই হইত। তাহা না করায় তাঁহার ক্ষমতা ও উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে ব্যর্থ হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও সর্ব্বান্তঃকরণে বাঙ্গালীকে তাঁহার প্রদত্ত ঋণ স্বীকার করিতেই হইবে।

দ্বিতীয় মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁহার জীবন ও কর্ম্ম বুঝিবার সময় এখনও আসিয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার নাট্যাবলীতে মাতৃমূর্ত্তি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত, মাতৃমহিমা বিশেষ ভাবে ঘোষিত। গিরিশচন্দ্রের মাতৃভক্তি তাঁহার গ্রন্থাবলীতে ফুটিয়াছে; মার স্নেহ যে কি অপূর্ব্ব পদার্থ তাহা তিনি জীবনে যেমন দেখিয়াছিলেন ও বুঝিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার প্রসিদ্ধ নাটকগুলিতে দেখাইয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন। যাঁহারা কোনও একটা অন্ধসংস্কারের বশবর্ত্তী না হইয়া গিরিশচন্দ্রের নাটক চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সাক্ষ্য দিবেন যে গিরিশচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যকে যে অমূল্য উপহার দিয়াছেন—যে মহতী শিক্ষায় বাঙ্গালীকে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—যদি বাঙ্গালী তাহা হৃদয়ের সহিত ধারণা করিবার যত্ন করে, তাহা হইলে বঙ্গবাসীর চরিত্র উন্নত হইবে। সে কথার পরিচয় ভবিষ্যতে কোনও দিন দিবার আশা রহিল; এখন এইটুকু মাত্র বলিবার বিষয়

যে গিরিশচন্দ্র কি গার্হস্থ্য, কি পৌরাণিক, কি ঐতিহাসিক, তাঁহার সর্ব্ববিধ নাটকেই নিপুণ হস্তে মার মূর্ত্তি গঠিত করিয়া বঙ্গবাসীকে উপহার দিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের নবযুগে চারি বিভাগে চারিজন মহাকবির উদয় হইয়াছে,—যাঁহারা সাহিত্যের এই চারি বিভাগ সুসম্পন্ন করিয়া সাহিত্যকে পূর্ণতার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন—কাব্য বিভাগে মধুসূদন, উপন্যাস বিভাগে বঙ্কিমচন্দ্র, নাটকবিভাগে গিরিশচন্দ্র, খণ্ড কাব্য বা গীতিকাব্য বিভাগে রবীন্দ্রনাথ। ইঁহাদের মধ্যে মাতৃচিত্র অঙ্কণে গিরিশচন্দ্রেরই প্রাধান্য, সে বিষয় সূক্ষ্মদর্শী পাঠকদিগের ভিতর মতদ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা নাই। গিরিশচন্দ্রের মনুষ্য-হৃদয়জ্ঞতা তাঁহার প্রায় সকল চিত্রেই সুব্যক্ত. তাঁহার মাতৃচিত্রগুলিও তাই অস্বাভাবিকতার দোষে দুষ্ট হয় নাই, ইহাই তাঁহার মাতৃচিত্রের বিশেষত্ব। তাঁহার একটা সমগ্র নাটক এই মাতৃগৌরবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই নাট্যকাব্য তাঁহার পৌরাণিক নাটক "জনা।"

"জনা" নাটকখানির সমালোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, অন্য কোনও সময়ে তাহা করিবার ইচ্ছা রহিল, কিন্তু এ কথাটুকু বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, এই নাটকে কবিবরের যে শক্তি ব্যক্ত হইয়াছে তাহা তাঁহার অন্যান্য শক্তি-ব্যঞ্জক নাটকগুলির মধ্যেও দুষ্প্রাপ্য। যে কার্য্য নবীনবাবুর আদর্শ রমণী ও মাতা সুভদ্রা সাধিত করিতে পারেন নাই, জনা তাহা সাধিত করিয়াছে। বঙ্গের রঙ্গালয়সমূহে "জনার" গৌরব এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ও বোধ হয় চিরদিন থাকিবে। ইহার ফলে কত সহস্র লোকের মনে লুপ্তপ্রায় মাতৃমহিমায় ছবি জাগিয়া উঠিয়াছে ও জাগাইয়া তুলিবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কারণ নাটকখানি প্রধানতঃ মাতৃগৌরবের উপর প্রতিষ্ঠিত; কবি উজ্জ্বল অক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, জগতে মাতৃ-আশীর্ব্বাদই সন্তানের অক্ষয় কবচ; মাতৃসেবাই প্রধান ধর্ম্ম ও পুণ্য; মার মনে কষ্ট দেওয়াই সকল বিপদের মূল। তিনি যে পথে চলিয়া এই শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই হিন্দুদের চিরদিনের পথ, তাই তাঁহার শিক্ষায় যে কাজ হইয়াছে তাহা স্থায়ী-ফলপ্রসূ বলিয়া মনে হয়। অথচ এই মাতৃত্ব তিনি কোথাও কোমলতার আবরণে দুর্ব্বল করিয়া ফেলেন নাই। পাঠক ও দর্শক বীররমণীর অপূর্ব্ব প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়াছে, পুত্র-বাৎসল্যের প্রখরতা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছে, আবার মাতৃস্নেহের অমৃতস্পর্শে স্নিগ্ধ ও পবিত্র হইয়াছে। নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের শিক্ষা এস্থলে নিস্ফল হয় নাই। বঙ্গসাহিত্যিকগণের হৃদয়ে আবার মাতৃমহিমা জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই জনার কথা একটু বিস্তৃতভাবেই বলিলাম।

বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে গিরিশচন্দ্রের পরেই কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্থান। ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি অন্যান্য নাট্যকারগণও গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত। কবিবর ডি, এল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে ও 'পর পারে' নামক সামাজিক নাটকে মাতৃহৃদয়ের মহিমা প্রখ্যাত হইয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদের "উলুপী" নাটকেও মাতৃমহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে—পুত্র বলিদানে। ফলতঃ এখন সাহিত্যের আব্‌হাওয়া বদলাইয়াছে—বুঝি আমরাও একটু বদলাইয়াছি। কিন্তু এখনও আমাদের সমাজ-মন্দিরে মাতৃদেবীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হইয়াছে এমন মনে হয় না,—আমাদের স্বপ্রধানত্ব এখনও প্রবল, তাই এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের অবতারণা করিলাম। রমণীর পূর্ণতা মাতৃত্বে—মাতৃত্বের পূর্ণাভিষেকে আমাদের মঙ্গল। তাই বঙ্গসাহিত্যে মার আদর যত বাড়িবে ততই উহা পবিত্র হইবে এবং আমাদেরও পবিত্র করিবে।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

পুরাতন প্রসঙ্গ

(নূতন কল্প)

(২)

২২শে ফাল্গুন, ১৩২২

আজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন,—"গোড়াতেই আপনাকে আমার ছেলেবেলাকার আরও দু'একটা কথা বলিয়া লই। এখন পর্য্যন্ত আমি এমন কিছু বলি নাই যাহাতে আপনি আমার বাঙ্গালা রচনার—বিশেষতঃ parody রচনার—গোড়ার সূত্র ধরিতে পারেন। আজ প্রথমেই সেই কথা আপনাকে কিছু বলিব।

"আমার একজন খুব দূর সম্পর্কীয় কাকা ছিলেন; তাঁহার নাম প্যারীমোহন বসু। তাঁহার দুই খুড়া খৃষ্টান হইয়া যান;—একজনের কন্যাদ্বয়, বিধুমুখী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু, যশ অর্জ্জন করিয়াছেন; তাঁহার বংশের আর একজন কেশব বাবুর সমাজের ব্রাহ্ম হইলেন। প্যারীকাকার সতীর্থ সুহৃদ ছিলেন নবকৃষ্ণ ঘোষ; নবকৃষ্ণবাবু জ্যোতিষশাস্ত্র বেশ আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি রামশর্ম্মা নামে সাময়িক সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। তখনকার খৃষ্টান পাদরীর স্কুলে বিদ্যালাভ করিয়া তাঁহারা পঠদ্দশায় বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করিবার বড় একটা অবসর পান নাই, কিন্তু ল্যাটিন গ্রীক পড়িয়াছিলেন। একটু বেশী বয়সে প্যারী কাকা বেঙ্গল থিয়েটরের তখনকার নামজাদা নট 'ন্যাদাড়ু' গিরীশ ঘোষের ভগিনীকে বিবাহ করেন। আমার পিতার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

"তিনি আমাকে একটু একটু ল্যাটিন গ্রীক পড়াইতেন, আমি তাঁহাকে বাঙ্গালা বই পড়িয়া শুনাইতাম; 'ভাস্কর' কাগজখানা প্রায়ই তাঁহাকে শুনাইতে হইত। ক্রমশঃ তাঁহার বাঙ্গালা রচনার দিকে একটা প্রবল ঝোঁক হইল। তিনি শ্লেষ-রচনায় সিদ্ধহস্ত হইলেন; 'ভাস্করে' তাঁহার সেই সকল parody প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। মাইকেলকে লইয়া তিনি parody করিতেন। মাইকেল লিখিয়াছেন—

আহা,
শৈবালের দলে শোভে যেই রত্নরাজি,

প্যারীকাকা লিখিলেন,—

আহা,
বৃষভের ল্যাজে শোভে যেই পুচ্ছরাজি, ...

পুনশ্চ, মাইকেলকে অনুকরণ করিয়া তিনি লিখিলেন—

আমি হনু, এ বিপুল বিশ্বে কে না ডরে
দেখি মোর লাফ!

তাঁহার এই সকল শ্লেষ-রচনায় ক্রমে আমি তাঁহার সাক্রেদ্ হইয়া উঠিলাম; অনেক সময়ে তিনি আমাকে পাদপূরণের জন্য আহ্বান করিতেন। আমার রচনায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিলে আমি কৃতার্থ হইতাম। ইহার পূর্ব্বে কবিতা রচনায় আমার হাতে খড়ি দিয়াছিলেন আমাদের এই শ্যামবাজার স্কুলের পণ্ডিত ব্রহ্মানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তখনকার দিনে অক্ষক্রীড়ায় ওস্তাদ তাঁহার মত আর কোনও বাঙ্গালী ছিলেন কি না সন্দেহ। তিনি একখানা বই লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন—'অক্ষবল চরিত।' পণ্ডিত মহাশয় 'ছন্দপ্রকাশ' 'ছন্দবোধ' প্রভৃতি কয়খানি অতি সুন্দর পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন। বাবা তখন স্কুলের সেক্রেটরি। বাবার অনুমতি লইয়া ঐ পুস্তকগুলি স্কুলপাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইল। আমরা বিদ্যালয়ে নানা ছন্দে কবিতা রচনা করিতে অভ্যাস করিলাম। পরে

প্যারীকাকার নিকটে অভয় পাইয়া ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে আমার প্রথম চিত্রকাব্য রচিত হয়। আমার সেই প্রথম রচনাটী মোটেই রসাত্মক নহে; কয়েকটী ছন্দোবদ্ধ শব্দমাত্র। আগুক্ষরগুলি একত্র জুড়িলে আমার নামটী বানান করা হয়। এখনও আমার সেটী মুখস্থ আছে—

শ্রীশ্রীহরিপদ যে বা করয়ে স্মরণ।
অবনী ভিতরে সেই আদরের ধন॥
মৃত্যুভয় নাহি থাকে সদা আনন্দিত।
তপ জপ করে সদা মনের সহিত॥
লালসা নাহিক ধনে মোক্ষ প্রয়োজন।
লভিতে লালসা মাত্র ঈশ্বর চরণ॥
বন্দি ঈশ্বর চরণ খোঁজে মোক্ষপথ।
সুজন স্বজন তার শত্রু হয় হত॥

"এ কবিতাটী লিখিয়া আমার মোটেই আনন্দ হয় নাই। কোনও রকম করিয়া মিল চাই; এ ত হইল শব্দের গোঁজামিল মাত্র। প্যারীকাকা বলিলেন—'একটা ভাল করে পদ্য লেখ না!' তখন সবেমাত্র স্যর রাধাকান্ত দেবের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বলিলেন,—'স্যর রাধাকান্ত দেবের উদ্দেশে একটা কবিতা লেখ না!' আমি তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মাইকেলের 'রেখো মা দাসেরে মনে' কবিতাটির ছন্দে একটী পদ্যরচনা করিলাম। প্যারীকাকার তাহা এত ভাল লাগিল যে তিনি তাহা 'ভাস্করে' প্রকাশিত করিয়া দিলেন। এই আমি প্রথম আমার লেখা ছাপার অক্ষরে দেখি। কবিতাটী আমার নিজেরও বেশ পছন্দসই হইয়াছিল। কিন্তু শ্লেষ-রচনার দিকেই আমার প্রবণতা বেশী রহিয়া গেল। আমার মধ্যে হয়ত কিছু সহজ সরসতা, native wit, ছিল; তিনি তাহা ফুটাইয়া তুলিলেন।

"আমার যে একটু native wit ছিল, অল্পবয়সেই তাহার কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছিলাম। আমাদের ছেলেবেলায় কলিকাতার নাট্য সমাজে কালিদাস সান্ন্যাল খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি একাধারে গাইয়ে, বাজিয়ে, নাচিয়ে এবং Organiser। বর্দ্ধমান রাজবাটীতে তাঁহার খুব আদর প্রতিপত্তি ছিল। তিনি ইচ্ছা করিলে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিতেন; কিন্তু সেদিকে আদৌ তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তাঁহার রচিত 'নলদময়ন্তী' নাটক কয়েকবার অভিনীত হইয়াছিল। তিনি ফটোগ্রাফি বড় ভালবাসিতেন। তখনকার দিনে বিলাত হইতে রীতিমত তৈয়ারি প্লেট আমদানি হইত না; কলোডিয়মের সাহায্যে আলোকচিত্র তুলিতে হইত। সময়ে সময়ে তাঁহার খুব ভাল সোরা আবশ্যক হইত। আমাদের সোরার কল ছিল। একদিন তিনি আমাকে বলিলেন—'ওহে, খুব ভাল সোরা কিছু আমাকে দিতে পার?' আমি বলিলাম, 'তা কেন পারব না?' কিছু দিন পরে আন্দাজ তিন সের সোরা কালীদাদাকে দিলাম। তিনি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'খুব ভাল ত? নুন নেই ত?' আমি দু একবার 'না, না' বলিয়া শেষটা বলিলাম—'আজ্ঞে, একটু আছে বৈ কি, তা নইলে যে শুধু পীটর হোতো!' তিনি বলিলেন,—'অ্যাঁ, কি হোতো?' আমি উত্তর দিলাম,—'শুধু পীটর্ হোতো। নুন না থাক্‌লে কি সল্ট্-পীটর্ হয়?' কালীদাদা হাসিয়া উঠিলেন। আমাদের উৎকৃষ্ট সোরা ইংরাজ রাসায়নিক কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া বাজারে বিক্রয় হইত।

"প্যারীদাদার মৃত্যুর পরে আমার বাঙ্গালা রচনা দিন কতক বন্ধ ছিল। ঘটনাচক্রে আমি একখানা প্রহসন নাটক লিখিয়া ফেলিলাম। আমাদের পাড়ায় একটা সখের যাত্রার দল ছিল। একদিন তাহারা আমাকে ধরিয়া বসিল—'আপনি একটা আমাদের পালা লিখে দিন।' আমি বলিলাম, 'আমি কি লিখে দোব?' তাহারা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল; একখণ্ড দাশুরায়ের পাঁচালী আমার কাছে রাখিয়া গেল। আমি তখন সবেমাত্র পড়িয়াছি 'একেই কি বলে সভ্যতা?' তাহারই অনুকরণে আমি একখানা Farce রচনা করিলাম; নামটা বড় ছোট-খাটো হইল না—'একেই কি বলে তোদের বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি করা?' এই রচনাটি এখন একেবারে লুপ্ত। রচনায় যে বিশেষ কিছু

কৃতিত্ব ছিল তাহা নহে ; তবে এইটুকু বলিতে পারি—আমি অনুকরণ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু চুরি করি নাই। এ কথাটা বিশেষ করিয়া বলিতেছি, কারণ ইদানীং বাঙ্গালা সাহিত্যে চোরাই মাল সর্ব্বত্রই নজরে পড়িতেছে।



শিশিরকুমার ঘোষ।

"রস-সাহিত্য-রচনার জন্য আমি আর একজনের নিকট অত্যন্ত ঋণী। তিনি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শিশির ঘোষ। কাশীতে যখন লোকনাথ বাবুর বাসায় ছিলাম, 'অমৃতবাজার পত্রিকা' পাঠ করিতাম। তখন কাগজখানি বাঙ্গালা ভাষায় পরিচালিত হইত। যশোর হইতে নিয়মিতভাবে কাগজ বাহির হইত ; কলিকাতা সহরে তখনও বড় একটা জাহির হয় নাই। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় হাস্যোদ্দীপক প্রসঙ্গ 'বিবিধ' নামে প্রায়ই প্রকাশিত হইত। তেমন সরস Comic titbits আমাদের সাহিত্যে অত্যন্ত দুর্লভ। পঞ্চানন্দের প্রথম আমলে অনেকটা ইন্দ্রনাথে সেই খাঁটি রস উপভোগ করা যাইত। আমি পত্রিকার সেই অংশটার রসপ্রাচুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। শিশির বাবুর প্রতিভা যে কতদিকে বিকশিত হইয়াছিল, তাহা আর আপনাকে বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। তিনি গান বাজনার বিচক্ষণ সমজদার ছিলেন, কুস্তি করিতে জানিতেন, কবি ছিলেন, সুরসিক ছিলেন, পত্রিকার নির্ভীক সম্পাদক ছিলেন। প্রবল ঝটিকায় অনেক গুলা গ্রাম উৎসন্ন হইয়া গেল ; তিনি সেই সমস্ত গ্রাম পর্য্যটন করিয়া সেই সাইক্লোনের গতি নিরূপণ করিলেন। তাঁহার স্বদেশপ্রীতি academic ধরণের পোষাকী ব্যাপার ছিল না। নীলকরের প্রপীড়িত প্রজাদিগের দুর্গতি তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন ; দেশবাসীর বেদনায় তাঁহার হৃৎপিণ্ড চঞ্চল হইয়া উঠিত।

"দেখুন, আপনাকে এই সকল স্মৃতিকথা বলিতে বসিয়া ভাবিতেছি যে, মানুষ যখন বিচিত্র কর্ম্মপ্রবাহের উপর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে একটা কোথাও গিয়া ঠেকে, তখন কিসে কি হইল তাহার হিসাব নিকাশ করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন উঠিয়া উঠে। বহির্জগতের এবং অন্তর্জগতের ঘাতপ্রতিঘাতে যে মানুষটী গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার পক্ষে তৌলদণ্ড লইয়া সেই বিচিত্র শক্তি-তরঙ্গের voltage ওজন করিতে বসা

বাতুলতা মাত্র। কেহ আমাকে প্রশ্ন না করিলে আমার বাল্যজীবনের এতগুলা কথা একত্র সাজাইয়া বলিতে পারিতাম না; তবুও অনেকটা বোধ হয় এলোমেলো হইয়া যাইতেছে। যে কথাটা আগে বলা উচিত ছিল, যে ব্যক্তির নাম আগে করিলে ইতিহাস হিসাবে নিখুঁত হইত, সে কথাটা অথবা সে নামটা পরে মনে পড়িতেছে। কি করিব; যখন যেমন মনে পড়িতেছে, আমার স্মৃতিকথা সেই রকম লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

"ছেলেবেলায় আমাদের জিমন্যাষ্টিকের খুব ধুমধাম ছিল। শোভাবাজারের রাজবাটীতে একজন ফিরিঙ্গি (তাহার নাম ছিল পীটর) জিমন্যাষ্টিক খেলা দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিল। বাঙ্গালীদের মধ্যে ঝোঁক হইল, ঐ রকম খেলোয়াড় হইতে হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উদ্যোগী হইলেন দুর্গাদাস কর, নবগোপাল মিত্র ও শ্যামাচরণ ঘোষ। অল্পদিনের মধ্যেই ভাল জিম্‌ন্যাষ্টিক্ আখড়া স্থাপিত হইল। আমাদের ওস্তাদ হইলেন পীটর। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শিখিল অখিলচন্দ্র চন্দ্র। পরে তিনি Ward's Institution এ (রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রতিষ্ঠিত) শিক্ষক হইলেন। শ্যাম ঘোষ ব্যায়াম শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক গুলি বই রচনা করিয়া গিয়াছেন। স্বনামধন্য দুর্গাদাস কর শ্যাম ঘোষকে উৎসাহ দিতেন। আর নবগোপাল মিত্র? আজ আমরা পত্রিকার স্তম্ভে কিম্বা বক্তৃতার আসরে তাঁহার নাম ভুলেও মুখে আনি না; কিন্তু একদিন তিনি কলিকাতার বাঙ্গালী যুবকদিগের নেতৃস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার ন্যাশনাল পেপার সর্ব্বত্র আদরণীয় ছিল। এই ন্যাশনাল শব্দটা বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই প্রথমে ভাল করিয়া জনসমাজে চালাইয়া যান। শঙ্কর ঘোষের লেনে তাহার বাড়ী ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সমাজে 'ন্যাশনাল' শব্দটা বড় unlucky; কোনও 'ন্যাশনাল' অনুষ্ঠান আজ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া দাঁড়াইল না। নবগোপাল বাবুর উদ্যোগে চৈত্র মাসে একটী মেলা বসিত। এই আমাদের প্রথম 'ন্যাশনাল' মেলা। যোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ী হইতে তিনি যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছিলেন। আমার মনে আছে, এই মেলায় মহেন্দ্র ভট্টাচার্য্য একটা রাসায়নিক বিভাগ খুলিয়াছিলেন। আমরা নবগোপাল বাবুর চেলা হইলাম।

"আমাদের দেখাদেখি চারিদিকে জিমন্যাষ্টিক্ আখড়া স্থাপিত হইল। স্যর জর্জ্জ ক্যাম্পবেল ছইবার আমাদের আখড়ায় আসিয়া মেডাল দিলেন। বিদ্যালয় গুলাতে ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। শ্যাম ঘোষ হুগলি কলেজে ব্যায়াম শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। আমাদের পাড়ায় নটবর চৌধুরীর বাড়ীতে আমরা একটা আখ্‌ড়া করিলাম।

"ছেলেবেলায় আমাদের এই কম্বলিয়াটোলার স্কুলে যখন অধ্যয়ন করিতাম, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি আমার সতীর্থ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার নাম ছাড়া আর যে কিছু বৈশিষ্ট ছিল মনে পড়ে না। বরং বোধ হইত তাঁহার মধ্যে রসকস কিছুই ছিল না। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বাড়ীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমরা শুনিলাম যে তিনি ও বাবু (পরে মহারাজা স্যর) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মামাত 'পিসতুত' ভাই ছিলেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরের চাল চলনও যেন আভিজাত্যসূচক বলিয়া বোধ হইত। স্কুলের শিক্ষক হাইড্ সাহেব ছেলেদের নামের শেষ অংশটা ডাকিতেন; যথা,—অমৃতলাল বসু না ডাকিয়া ডাকিতেন—লাল বসু; অর্দ্ধেন্দুর নাম তিনি কখনও ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই; মুস্তফি না বলিয়া সাহেব বলিতেন,—ম্যাষ্টিফ্। অর্দ্ধেন্দুকে ছেলেরা বড় জ্বালাতন করিত; আমিও অনেক সময়ে তাহাদের সহিত যোগ দিতাম; কিন্তু যখন তাহারা একটু বাড়াবাড়ি করিত, আমি তাঁহার পক্ষ লইতাম। আমাদের সহিত দুই বৎসর কম্বলিয়াটোলার স্কুলে লেখাপড়া করিয়া অর্দ্ধেন্দু পাইকপাড়ার স্কুলে চলিয়া গেলেন।

"ইহার পরে প্রায় চার বৎসর কাটিয়া গেল। অর্দ্ধেন্দুর সহিত আমার দেখাশুনা হয় নাই; তাঁহার

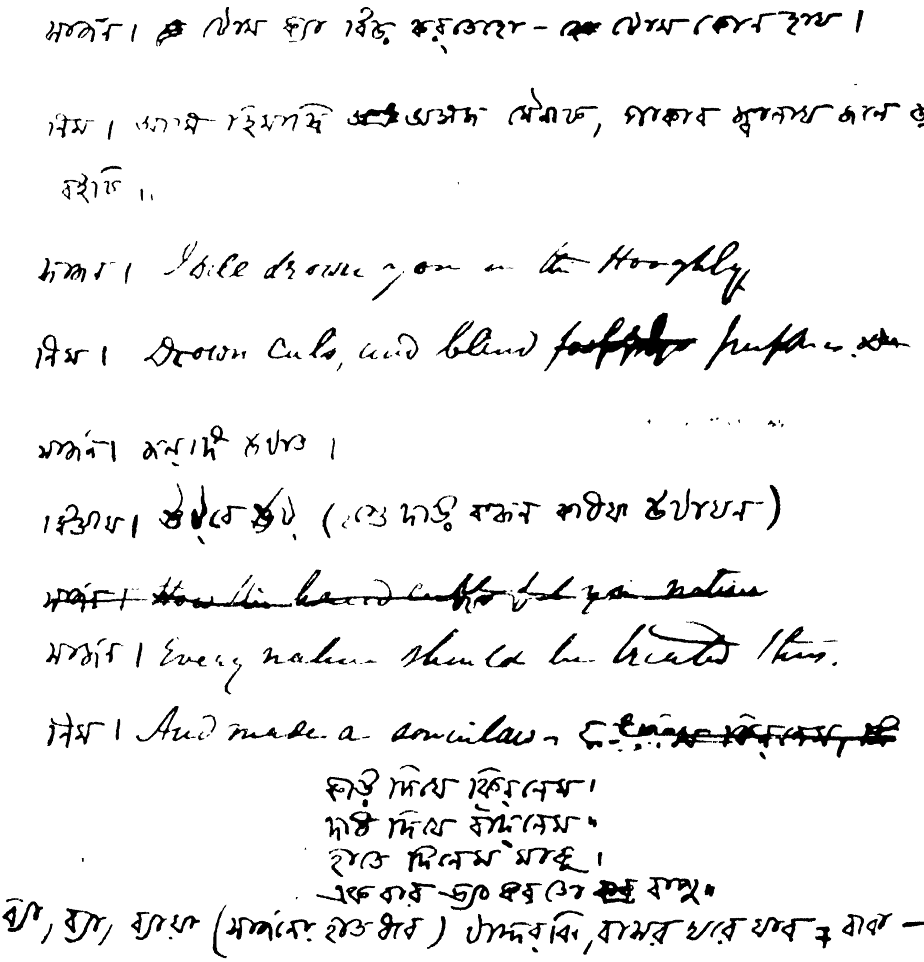


পরলোকগত মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

নাম পর্য্যন্ত আমি বিস্মৃত হইয়া গেলাম। আমি ওরিয়েণ্টাল সেমিনরিতে তখন অধ্যয়ন করি। আমি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই প্রাইভেট্ থিয়েটর সম্বন্ধে আলোচনা ছেলেমহলে খুব হইত। কোথায় কোন নাটক অভিনীত হইল, কে কি ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন, নাটকে কলিকাতা সমাজে কোন ব্যক্তির উপর কটাক্ষ করা হইয়াছে, এই সমস্ত বিষয় লইয়া ছেলেরা জল্পনা কল্পনা করিত। এইখানে আপনাকে বলিয়া রাখি যে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' রচনার পর হইতে নাটক বা উপন্যাস সাহিত্যে কে কার জবাব দিল ইহাই সকলে জানিতে চেষ্টা করিত। আমি অনেক নাটক পড়িয়াছিলাম, কিন্তু কখনও থিয়েটর দেখিতে যাই নাই; সন্ধ্যার পরে বাড়ীর বাহিরে বেশীক্ষণ থাকা আমাদের নিষেধ ছিল। শুনিলাম যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'বুঝলে কি না'র জবাব ভুলু মুখুর্য্যে (আহিরিটোলার ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়) খুব দিয়াছে; তাহার জবাবের নাম, 'কিছু কিছু বুঝি'। ছেলেমহলে খুব হৈচৈ পড়িয়া গেল। আমরা শুনিলাম জোড়াসাঁকোর কয়লা ঘাটায় উহা অভিনীত হইবে। বন্ধুরা আসিয়া আমাকে ধরিয়া বসিলেন—'চল, থিয়েটর দেখতে হবে।' আমি বলিলাম, 'আমার যাওয়া হবে না; সন্ধ্যার পরে কখনও বাড়ীর বাহিরে থাকি নাই।' তাঁহারা বলিলেন,—'তবে না হয় দিনের বেলায় চল, ষ্টেজ দেখে আসবে।' আমি সম্মত হইলাম। সেখানে আমার প্রথম থিয়েটরের ষ্টেজ দর্শন হইল। সীন্ বড় বেশী ছিল না; দেয়ালের গায়ে একখানা 'সীন্' অঙ্কিত দেখিলাম। কৌতূহলবশবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কে কে অভিনয় করিবে? শুনিলাম,—ধর্ম্মদাস আছেন, আর আছেন—অর্দ্ধেন্দু! নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। 'অর্দ্ধেন্দু! কোন অর্দ্ধেন্দু?' কে একজন বলিল—'অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি। চমৎকার যে করে।' এ নাম ত আর কাহারও হইতে পারে না; ইনি নিশ্চয়ই আমার সেই কম্বুলিয়াটোলা স্কুলের সহপাঠী! কিন্তু তখন ত সে অত্যন্ত অরসিক ছিল; এখন চমৎকার অ্যাক্ট্ করে! জিজ্ঞাসা করিলাম—'একবার তাঁর সঙ্গে দেখার সুবিধা হয় না। সে কোথায়?' দেখা হইল না; ফিরিয়া আসিলাম।

"কিছু দিন পরে হঠাৎ একদিন অর্দ্ধেন্দুর দেখা পাইলাম। আমাদের বাড়ীর দরজায় বসিয়া আছি (বাড়ীর সম্মুখে খোলা ড্রেণ ছিল; সেই ড্রেণের উপর সাঁকো ছিল; দরজার সামনে বাঁধান সাঁকোর উপরে বসাটাই দরজায় বসা বলা হইত) এমন সময়ে অর্দ্ধেন্দু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাকে দেখিয়া তাহার ভারি আনন্দ হইল; আমি কি করিতেছি, থিয়েটর দেখিতে ভালবাসি কি না, ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া

সে বলিল—'তুমি একদিন আমাদের থিয়েটর দেখ্‌তে যাবে? টিকিট এনে দোব।' আপনারা এখন বুঝিতে পারিবেন না, কিন্তু তখন থিয়েটরের টিকিট পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল; অনেক খোসামোদ করিয়া তবে টিকিট যোগাড় করা হইত। আমি বলিলাম, —'না ভাই, আমার যাওয়া হবে না, রাত্তিরে বাইরে থাকা আমার নিষেধ, আর এ বছরে আমি এণ্ট্রান্স একজামিন দোব।' আমার যাওয়া হইল না। দেখুন, নিজে থিয়েটর করিবার আগে আমি ঝামাপুকুরে দুই বার মাত্র শকুন্তলার অভিনয় দেখিয়াছিলাম; অভিনয়



৺দীনবন্ধু মিত্রের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি
('সধবার একাদশী'র মূল পাণ্ডুলিপি হইতে)

আমার পিসীমার বাড়ীতে হইয়াছিল বলিয়া আমার দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল।

"১৮৬৯ সালে "সধবার একাদশী" অভিনীত হইল। তৎপূর্ব্বে আমি ঐ নাটকখানি পাঠ করিয়াছিলাম। কেবলই মনে হইত, আমি ছাড়া জগতে এমন মানুষ নাই যে নিমে দত্তের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। রামচন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে অভিনয় হইল; চারিদিকে খুব সুখ্যাতি শোনা গেল। আপনাকে এই খানে আমি একটী কথা বলিতে পারি—That play was the unconscious germ of the public stage.

"আমি তখন মেডিক্যাল, কলেজে আনাগোনা করি। একদিন অর্দ্ধেন্দুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল; সে বলিল—'সধবার একাদশী' দেখ্‌তে গেলে না?' আমি বলিলাম,—'কি করে যাই?' পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করিলাম—'আচ্ছা, তোমাদের নিমে দত্ত কে সাজে?' অর্দ্ধেন্দুর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল—'গিরীশ ঘোষ।' আমি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলাম—



স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ

'গিরীশ ঘোষ? কোন্ গিরীশ ঘোষ?' সে বলিল 'বোস্ পাড়ার নীলকমল ঘোষের ছেলে; চমৎকার অ্যাক্টর্।' আমি বলিলাম—'ওঃ, নবীন সরকার মহাশয়ের জামাই?* সে ত কেরাণিগিরি করে! সেক্ষপীয়র আওড়াবে কি করে? কলাপাতার প্রকাণ্ড ঠোঙ্গায় মুড়ে সাজা পান নিয়ে তা'কে রোজ আপিস যেতে দেখি। দিগম্বর দে'র কাছে Book-keeping শিখে, সে-আপিসে খুব ভাল Book-keeper হয়েছে জানি; কিন্তু সেক্ষপীয়রের সে কি বোঝে? ব্রজ (গিরীশ বাবুর বড় সম্বন্ধী, চুনীলালের পিতা) কিছু বোঝে; সে বরং চেষ্টা করলে পারতে পারে; কিন্তু ......গিরীশ ঘোষ!' হায় রে মূঢ় আত্মাভিমান! ঘরে বসিয়া 'সধবার একাদশী' পড়িয়া যে স্বপ্নের জাল চারিদিকে বুনিয়াছিলাম, আজ কোথা হইতে অর্দ্ধেন্দুশেখর একটা দম্‌কা ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া আমার সেই স্বপ্নজাল ছিন্ন করিয়া দিল? আমি ছাড়া জগতে অন্ততঃ আরও একজন মানুষকে পাওয়া গিয়াছে, যে নিমে দত্তের ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া দশজনের নিকট হইতে বাহবা লইয়াছে! অর্দ্ধেন্দুশেখর হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'তা নয় হে, তা নয়। নিমের পার্ট সে বেশ প্লে করে; তুমি একদিন চল না, দেখ্‌বে।' আমি আস্তে আস্তে বলিলাম—'তা হ'তে পারে।' অভিনয় দেখিতে গেলাম না।

"দেখুন, সোজা কথায় আপনার নিকটে আমার এই পুরাতন কাহিনী বিবৃত করিতেছি; psychological analysis করিতে বসি নাই। দুই দণ্ড স্থির হইয়া বসিয়া আত্ম-বিশ্লেষণ করিব এমন সময় বা সামর্থ্য আমার নাই। বলিতে পারেন,—যে তরুণ যুবক কখনও রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া কোনও নাটক পূর্ব্বে অভিনয় করে নাই, তাহার এমন চিত্তবিকার হয় কেন? এ ঈর্ষার কারণ কি? অল্প দিন পরে যাঁহার নিকটে আমাকে নত-মস্তকে শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে দীক্ষাগ্রহণ করিতে হইবে, যাঁহার প্রথম মধুর সম্ভাষণে আমাকে মুগ্ধ ও অভিভূত হইতে হইবে, তাঁহার প্রথম সুখ্যাতি পরের মুখে শ্রবণ করিয়া আমার মেজাজ খারাপ হইয়া গেল কেন?

"কিন্তু সে সকল কথা পরে বলিতেছি। নটবর চৌধুরীর বাড়ীতে আমাদের সেই জিম্‌ন্যাষ্টিক্ দল খেলাধূলা করিত। সেই সময়ে একটা লোক সেখানে

---

* গিরীশ বাবুর অনুজ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকীল শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া অবগত হইলাম যে গিরিশবাবু ১২৫০ বঙ্গাব্দে ১৫ই ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন; ১২৬৭ বঙ্গাব্দে (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে) বৈশাখ মাসে তিনি প্রথম দারপরিগ্রহ করেন, একটি পুত্র (দানী বাবু) ও একটি কন্যা রাখিয়া ১৮৭৫ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তাঁহার পত্নী ইহলোক পরিত্যাগ করেন।—লেখক।

আনাগোনা করিতে লাগিল; তাহার নাম গিরীশচন্দ্র মিত্র। লোকটি বাস্তবিকই একটা genius। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভদ্রলোকের ছেলের মত ভাল করিয়া তিনি লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। কিন্তু মহেন্দ্র চাটুয্যের বহু পূর্ব্বে তিনি ক্লারিয়নেট বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে শিখিয়াছিলেন, একটা সুন্দর মডেল এঞ্জিন তৈয়ার করিয়া ফেলিলেন; ঢাকার শুক্‌লালের প্রসিদ্ধ সেতারের অনুকরণে একটী সেতার আগাগোড়া নিজের হাতে গড়িয়া তুলিলেন। তাঁহার কাছে বসিয়া তাঁহার কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতাম। তিনি কাহারও সাহায্য লইতেন না; কাঠ চেরা হইতে আরম্ভ করিয়া হস্তিদন্তের বিচিত্র কারুকার্য্য পর্য্যন্ত বাদ্যযন্ত্রের আগাগোড়া তিনি নিজে করিতেন; খুব ভাল ছাঁটকাট সেলাইয়ের কাজে উত্তম দর্জ্জীকে হার মানাইয়া দিতেন। তিনি বলিলেন,—লোহার দাণ্ডার উপর খেলা করার দরকার নাই, মাটীতে নানাপ্রকার ব্যায়াম করা যাউক। নূতন ধরণে ব্যায়াম শিক্ষা চলিতে চলিতে লাগিল।—মাঝে মাঝে অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়া ব্যায়াম-নৈপুণ্য দেখাইতাম। সেই দিন আমাদের উৎসব। প্রহসনের ব্যবস্থাও করা হইত। উহা আমাদের উৎসবের অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। সেই সূত্রে গিরীশচন্দ্র ঘোষের সহিত আমার প্রথম আলাপ পরিচয় হয়।

"নটবরের—(আমরা তাঁহাকে চিরকাল নাটুদাদা বলিয়া ডাকিতেছি, নটবর বলিতে যেন কেমন বাধ বাধ ঠেকে)—নটবরের বাড়ীতে অর্দ্ধেন্দুশেখর ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন; হাস্য পরিহাসের তুফান উঠিত। অর্দ্ধেন্দু ছিলেন আমাদের সভার মধ্যমণি; বিদ্রূপাত্মক কথাবার্ত্তার ও অঙ্গভঙ্গির বৈচিত্র্যে তিনি আমাদের ওস্তাদ হইয়া দাঁড়াইলেন। একদিন তিনি সাজিলেন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন; আমরা সব রোগী সাজিলাম, —ফিরিঙ্গি, উড়ে, হিন্দুস্থানী ইত্যাদি; Caricatureএর চূড়ান্ত করা হইত। ক্রমশঃ এই রকমই যেন অভ্যাস দাঁড়াইয়া গেল। আমাদের মনে একটা অভিমান ছিল, যা'তা' সাজ্‌তে আমরা রাজি হইতাম না; অর্দ্ধেন্দুশেখরের সে রকম কোনও অভিমান ছিল না। এমনি করিয়া Caricature করিতে শিখিলাম; কিন্তু farce রচনা করিয়া নিমন্ত্রিত ভদ্রমণ্ডলীর সম্মুখে অভিনয় করা কিছু শক্ত ব্যাপার। রচনা করিতাম বটে; কিন্তু এখন ইচ্ছা হইল, একজন পাকা ওস্তাদের কাছ থেকে একটা ফার্স লিখিয়া লইতে হইবে। সখের যাত্রার দলের জন্য গিরীশ ঘোষ পালা রচনা করিয়া দিতেন, গান বাঁধিয়া দিতেন; একবার তাঁহাকে ধরিলে হয় না? এক রবিবারে আমি একাকী গিরীশ বাবুর বাড়ী গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। গিরীশ বাবু বলিলেন—'তুমি কে গা! তোমার নাম কি?' উত্তর হইল—'আজ্ঞে, আমার নাম অমৃতলাল বসু; আমি কৈলাশচন্দ্র বসুর ছেলে।' 'ওঃ, বুঝেছি, বোসো; তুমি কি করছ?' 'সম্প্রতি আমি এণ্ট্রান্স দিয়েছি; আপনার কাছে এসেছি একটু কাজে, আমরা acrobatic performance করচি; একটি farce যদি আপনি লিখে দেন তা' হ'লে বড়ই ভাল হয়।' 'তোমাদের কি রকম ফার্স দরকার তা' ত আমি জানি না। আগে কোনও ফার্স তোমরা যদি করে থাক, আর একদিন সেই খানা নিয়ে আমার কাছে এস।' ... কিছু দিন পরে একখানা বই লইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলাম; তিনি বইখানা ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—'এখানা কে করেছে?' আমি বলিলাম, 'আজ্ঞে, আমি।' 'তুমি ত মন্দ করনি; তুমিই লেখ না,—আমি দেখে দোব।' সেই দিন থেকে তাঁহার বাড়ীতে আমার যাওয়া আসা আরম্ভ হইল। তাঁহার মুখে সেক্সপীয়র-আবৃত্তি শুনিতাম;—তাঁহার সে Grand voice আপনারা শুনিতে পান নাই; 'সধবার একাদশী'ও তিনি আবৃত্তি করিতেন।

"তাহার পরে আমি কাশী চলিয়া গেলাম। কাশীর কথা পূর্ব্বে আপনাকে বলিয়াছি। কাশী হইতে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতাম। এখানে অবস্থান কালে আমাদের এই কম্বলিয়াটোলার স্কুলে শিক্ষকতা করিতাম;



কাশী দশাশ্বমেধ ঘাট।

বেতন লইতাম না। ভূপেন্দ্রনাথ বসু, চুণীলাল বসু, প্রিয়নাথ সেন আমার ছাত্র। অর্দ্ধেন্দুশেখর ও ধর্ম্মদাস সুর তখন এই স্কুলে মাষ্টারি করিত। আমার বাবা কাকা, মামা, সকলেই ইস্কুল মাষ্টারি করিয়াছিলেন; আমিও মাষ্টারি করিতাম। অর্দ্ধেন্দু বলিলেন—'তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে; লীলাবতী'র অভিনয় করতে হবে।' নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত ব্যবস্থা করিবার ভার লইলেন। এই নগেন্দ্রনাথই অর্দ্ধেন্দুশেখর ও গিরীশচন্দ্রের মিলন সংঘটিত করিয়াছিলেন। কথা হইল, এবার আমরা টিকিট বিক্রয় করিব; বিক্রয়লব্ধ পয়সায় আমরা নিজেদের ষ্টেজ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে পারিব। তখন গড়ের মাঠে লিউইস্ থিয়েটরের বাড়ী ছিল; কাণে মাকড়ী-পরা সুলতানা-নামধারী একটা লোক ঐ কাঠের বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিল। ভবিষ্যতে ঠিক সেই বাড়ীর প্ল্যানে ভুবন নিয়োগীর থিয়েটর-বাড়ী তৈয়ার করিয়াছিলাম, কেবল দৈর্ঘ্যে দশ ফুটের তফাৎ হইয়াছিল মাত্র। সে কথা পরে বলিব।

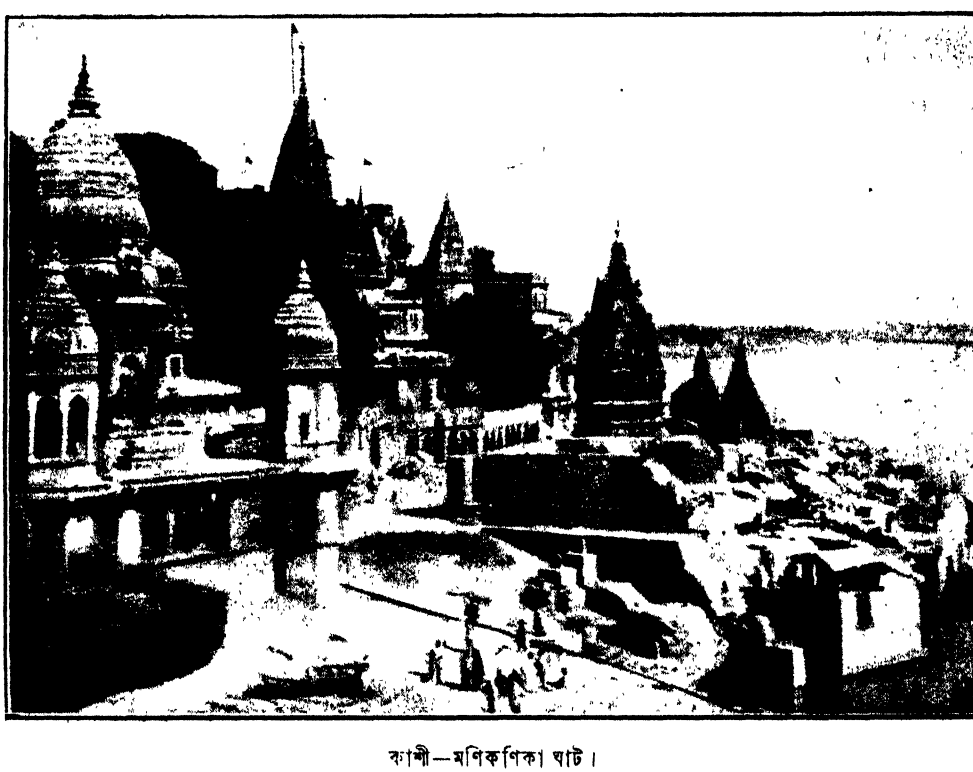
"লীলাবতীর রিহার্সাল চলিতে লাগিল। অর্দ্ধেন্দু আমায় বলিল—'দেখ, সব পাওয়া গেছে, উড়েটা পাচ্চি না, কি করা যায়?' আমি বলিলাম—'তোমাদের আমি একটা ভাল উড়ে দিতে পারি।' এই বলিয়া শশীকে লইয়া গেলাম। তা'র পরে অনেক দিন শশীর নাম 'বিসাড়ি' হইয়া গিয়াছিল। অর্দ্ধেন্দু আমাকে জোর করিয়া যোগজীবনের ভূমিকা লওয়াইলেন। তালিম দেওয়া যখন শেষ হইয়া আসিল, কাশী হইতে লোকনাথ বাবু কলিকাতায় আসিয়া আমাকে কাশীতে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। বন্ধুরা কত কাকুতি মিনতি করিলেন; তিনি কাহারও কথায় বিচলিত হইলেন না। আমার আর ষ্টেজে দাঁড়ান হইল না।

"আমাদের রিহার্সাল হইত গোবিন্দ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে; গাঙ্গুলী হাইকোর্টের কর্ম্মচারী ছিলেন। বেশ সৎলোক; কিন্তু তাঁহাকে লইয়া আমরা কিছু কিছু হাসিঠাট্টা করিতাম। একদিন আমাদের পুরা মজ্‌লিস্ বসিয়াছে, গোবিন্দ হাইকোর্ট হইতে প্রত্যাগমন করিয়া

অত্যন্ত গম্ভীরস্বরে আমাদিগকে বলিলেন,—'দেখ, হাইকোর্টে শুনে এলাম, সত্য মিথ্যা বল্‌তে পারি না, লর্ড্ মেয়োকে না কি আণ্ডামান দ্বীপে খুন করেছে।' সে দিন মজ্‌লিস বন্ধ হইয়া গেল। অনতিবিলম্বেই সহরময় কথাটা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সরস্বতী পূজার ধুমধামের আয়োজন সর্ব্বত্রই আপনা আপনি বন্ধ হইয়া গেল। দেশময় বিষাদের কালিমা লক্ষিত হইল।

"লোকনাথ বাবুর সঙ্গে কাশী চলিয়া গেলাম। ১৮৭২ সালের গোড়ায় কাশী পরিত্যাগ করিয়া বাঁকিপুরে আসিলাম। ঐ বৎসরের নবেম্বর মাসে বাঁকিপুর হইতে কলিকাতায় আসিলাম। বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজার উপলক্ষে এই যে বাঁকিপুর ছাড়িলাম, আর সেখানে ডাক্তারি করিবার জন্য ফিরিয়া যাইতে হইল না।

"কলিকাতায় আসিয়া যে দিন প্রথম আমি আমাদের স্কুল দর্শন করিতে যাই, অর্দ্ধেন্দু আমাকে দেখিয়া ক্লাস হইতে বাহির হইয়া আসিল। তখনই হেড্ মাষ্টারের নিকট হইতে ছুটী লইয়া, আমাকে সঙ্গে করিয়া ভুবন নিয়োগীর বাগ্‌বাজারের গঙ্গাতীরস্থ বৈঠকখানায় গেল। গঙ্গাতীরে সেই সুন্দর অট্টালিকার কোনও:চিহ্ন এখন নাই; পোর্টট্রষ্টের কল্যাণে সেটী লুপ্ত হইয়াছে। পথে যাইতে যাইতে অর্দ্ধেন্দু আমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। গিরীশ বাবুর সঙ্গে মনোমালিন্য হইয়াছে। অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে টিকিট বিক্রয় করিবার কথা শুনিয়া তিনি আপত্তি করিয়াছিলেন; তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না যে টিকিট বিক্রয় করিয়া পয়সা লওয়া হয়; কিন্তু যখন তিনি বুঝিলেন টিকিট বেচা সকলের ইচ্ছা, তিনি থিয়েটরের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। গিরীশ বাবু বলিয়াছিলেন, 'থিয়েটরের জন্য একখানা ভাল বাড়ী না করিয়া টিকিট বেচিবার ব্যবস্থা করিলে কিছুই হইবে না; আগে ভাল বাড়ী, ভাল ষ্টেজ কর, তারপরে টিকিট বিক্রয় কর; নইলে লোকে টিকিট



কাশী—মণিকর্ণিকা ঘাট।

কিনিবে কেন ? অর্দ্ধেন্দু ও নগেন্দ্র বন্দ্যো বলিলেন—'আমরা ছোট বাড়ীতেই আরম্ভ করি, ছোট খাটো ষ্টেজ্ করি; একেবারে বড় বাড়ি বড় ষ্টেজ কোথায় পাওয়া যাবে ?' এই কথা লইয়া দলাদলির সূত্রপাৎ হইয়াছিল। এ সকল বিষয় আমি কিছুই জানিতাম না; আমি তখন কলিকাতায় ছিলাম না। যখন গঙ্গার তীরে ভুবন নিয়োগীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম, তখন বুঝিলাম গিরীশ বাবুকে বাদ দিয়াই থিয়েটর করিতে হইবে। বাড়ীর দোতালায় আমাদের রিহার্সালের বন্দোবস্ত। ভুবন আলোর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে, একটি হার্ম্মোনিয়মও কিনিয়া দিয়াছে। তাহার চাকর হুঁকো টিকে তামাক রাখিয়া যাইত, আমরা নিজে নিজে তামাক সাজিতাম।

"রসিক নিয়োগীর ঘাটের উপরে ভুবন নিয়োগীর সেই বাড়ীটি এখন আর নাই; তাহার সোপানাবলী কলবাহিনী ভাগীরথীর জলে ধৌত হইয়া যাইত। দ্বিতলের প্রকাণ্ড হলে আমরা নীলদর্পণের রিহার্সাল চালাইতাম। আমার কোনও পার্ট লইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু সকলে মিলিয়া চাপাচাপি করিয়া ধরিল; বলিল—'তুমি সৈরিন্ধ্রীর পার্ট টা নাও; বেশী নয়, দু এক রাত্রি তুমি পে কর; তা'র পর না হয় আমরা অন্য ব্যবস্থা করে নোবো।' সেই দু এক রাত্রি করিতে করিতে আজ চুয়াল্লিশ বছর কাটিয়া গেল।"

ক্রমশঃ

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

চিত্র দর্শনে

(১)

দেয়ালে দুলিছে　　　চিত্র তোমার,
চাহিনু তাহার পানে,
ভরিয়া উঠিল　　　হৃদয় আমার
বর্ণে, গন্ধে, গানে।
ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী লইয়া
অতীত আবার আসিল ফিরিয়া;
নিমেষে কখন্ গেনু যে ডুবিয়া
স্বপ্নের মাঝ খানে—
দেয়ালে দুলিছে　　　চিত্র তোমার,
চাহিনু তাহার পানে।

(২)

বিশ্ব প্রবাহ　　　চলিতে লাগিল
আমার অন্তরালে;
সত্ত্বা আমার　　　ডুবিয়া যে গেল
তুলিকার রেখা জালে।
কর্ণ আমার হইল বধির,
লুপ্ত হইল দৃষ্টি আঁখির,
হৃদয় যন্ত্রে নাচিল রুধির
স্পন্দন তালে তালে—
বিশ্ব প্রবাহ　　　চলিতে লাগিল
আমার অন্তরালে।

(৩)

কত প্রভাতের,　　　কত সন্ধ্যার,
কত দিবসের কাজে,
নিভৃত আলাপ　　　তোমার আমার
মধু-মিলনের মাঝে,
কত ইতিহাস, দীপ্ত হইয়া
চিত্রের মাঝে উঠিল ফুটিয়া—
কে যেন ফলকে দিল ফুটাইয়া
সেই মুখ রাঙা লাজে
কত যাওয়া আসা　　　কত কাঁদা হাসা
ব্যথা হয়ে যেন বাজে!

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

জীবনের মূল্য

(উপন্যাস)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

নানা কথা।

জগদীশ যখন যুবক রাজকুমারের সহিত নিজ কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ দিতে সম্মত হইয়াছিলেন, তখন ইহা অবশ্যই বুঝিয়াছিলেন যে কাযটা ভাল হইতেছে না, কথা দিয়া কথার খেলাপ করা হইতেছে, গিরিশ মুখোপাধ্যায় ইহাতে বিরক্ত হইবেন। কিন্তু গিরিশ যে বিবাহ-ভঙ্গটা এরূপ মর্ম্মান্তিক ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহা জগদীশ স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি মনে করিতেন, বিবাহের পর আবার যখন গিরিশের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে তখন তাঁহাকে তিনি বলিবেন —"কি করি, বাড়ীর কারও মত হল না, বিশেষ উপযুক্ত ছেলে—তার কথা ত ঠেলতে পারি নে; তা হোক, প্রভা রূপে গুণে কোনও অংশেই তোমার যোগ্য ছিল না—তোমার পাত্রীর ভাবনা কি? প্রভার চেয়েও বেশ ডাগর একটি মেয়ে তোমার জন্যে আমি সন্ধান করে দিচ্ছি দাঁড়াও।"

—ভাবিয়াছিলেন, এইরূপ কিঞ্চিৎ সবিনয় ভনিতা করিলেই মিটমাট হইয়া যাইবে। উভয় পক্ষের আশীর্ব্বাদ প্রভৃতি হইয়া গিয়াও ত কত লোকের বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়, কে আর বিবাহ সভায় আসিয়া পৈতা ছিঁড়িয়া অভিশাপ দিয়া দড়াম্ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে!

ঘটনাটা যখন এইরূপই ঘটিয়া গেল, তখন জগদীশের বিলক্ষণ দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ—ঐ ব্রহ্মশাপ; অবশ্য কলির ব্রাহ্মণের আর সে তেজ নাই,—আশীর্ব্বাদেও কেহ রাজা হয় না, অভিশাপেও কেহ উচ্ছন্ন যায় না, তথাপি—একটা বীভৎস কাণ্ড —নিতান্তই অপ্রীতিকর। তাঁহার মনের মধ্যে অপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কার ছায়াও যে না পড়িল এমন নহে। দ্বিতীয়তঃ—জগদীশ খাতক, গিরিশ মহাজন। অনেক গুলি টাকা দেনা, সুদে আসলে যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহার জন্য গিরিশ যদি আদালত করেন, জগদীশের ভিটা-মাটী বিক্রয় হইয়া যাইবে। ব্রহ্মশাপের অপেক্ষা এই ভাবনাটাই তাঁহার মনে প্রবলতর হইয়া দাঁড়াইল।

সে রাত্রে বিবাহের অনুষ্ঠান গুলি ত কোনও ক্রমে সম্পন্ন হইয়া গেল। রাত্রি দুইটার সংবাদ আসিল, গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের জ্ঞান হইয়াছে, সতীশ দত্তের বাড়ী হইতে পাল্কী করিয়া তাঁহাকে নিজবাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

পরদিন কুশণ্ডিকা এবং তৎপরদিন ফুলশয্যা হইয়া গেল। শুনা গেল গিরিশ মুখোপাধ্যায় এখনও শয্যাশায়ী, ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা করিতেছে।

রাজকুমার ও হরিপদ কলিকাতা চলিয়া গেল। ইহার দুই একদিন পরেই শুনা গেল, ডাক্তার বলিয়াছে ঠাণ্ডা দেশে গিয়া গিরিশের বায়ু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। তাঁহাকে দার্জ্জিলিঙে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

গিরিশ মুখোপাধ্যায় দার্জ্জিলিঙ চলিয়া গেলে জগদীশের দুর্ভাবনা কতকটা দূর হইল। শুনিলেন সেখানে তাঁহার মাস খানেক থাকিবার কথা, সতীশ দত্ত সঙ্গে গিয়াছে, পাচক ব্রাহ্মণ ও ভৃত্য গিয়াছে, বাড়ীতে কেবল গিরিশের পিসিমা ও চাকর চাকরাণীরা আছে। গিরিশ কি বাস্তবিকই একমাস পরেই ফিরিয়া আসিবে? যদি স্থানটা ভাল লাগে, স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়—হইবেই ত, —একমাসের স্থানে দুইমাস হইয়া যাওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। ততদিন রাগটা আর সেরূপ তীব্র থাকিবে না; কথায় বলে ব্রাহ্মণের রাগ খড়ের আগুন—দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, দেখিতে দেখিতে নিবিয়া যায়। জগদীশ নিজ বহির্ব্বাটীতে ভাঙ্গা তক্তপোষ খানির উপর বসিয়া হুঁকা হাতে করিয়া এইরূপ চিন্তা করেন, চিন্তা করিতে

করিতে কলিকার আগুন নিবিয়া যায়, তখন তিনি আগুনের জন্য বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া রান্নাঘরের বাহিরে বসিয়া গৃহিণীর কাছে উমেদার হন।

সপ্তাহ খানেক পরে হরিপদ কলিকাতা হইতে পত্র লিখিল—"বাবা, আগামী শনিবারে কলেজ হইয়া আমাদের গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হইবে। ঐ দিন অপরাহ্ণের গাড়ীতে আমি বাটী যাইব। রাজকুমার ভায়াকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব কি ? আমার নিকট উভয়ের গাড়ী ভাড়ার মত টাকা আছে।"

পত্র পাইয়া জগদীশ গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিলেন। গৃহিণী বলিলেন—"প্রথমবার জামাইকে সঙ্গে করেই ত আনতে হয়। হরি এবার নিয়ে আসুক।"

পর শনিবারে হরিপদ, রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিল। নূতন জামাইকে লইয়া যে পরিমাণ আনন্দোৎসব বাঙ্গালী গৃহস্থ ঘরে সচরাচর হইয়া থাকে, এক্ষেত্রে সেরূপ কিছুই হইল না। গরীব শ্বশুর—ধুমধাম করিবার সাধ্য নাই। রবিবার দিন বিকালে পাড়ার যুবকেরা আসিয়া খাওয়াইবার জন্য রাজকুমারকে ধরিয়াছিল ; কিন্তু রাজকুমার সে বিষয়ে বড় একটা উচ্চবাচ্য করিল না। গরীব জামাই, কোথায় পাইবে ?

সোমবার দিন প্রাতে উঠিয়া মুখহাত ধুইয়া, জলযোগ করিয়া নূতন জামাই পদব্রজে মগরা ষ্টেশনে গিয়া কলিকাতার ট্রেণ ধরিল। হরিপদ বলিয়া দিল —"ভাই, এ দেড়মাস ছুটিতে, পাড়াগাঁয়ে বসে বসে প্রাণে হাঁফিয়ে উঠবে। শনিবার দিন বিকালের গাড়ীতে আবার এস—আমি ষ্টেশনে তোমায় নিতে আসব।"— অধিক পীড়াপীড়ি করিতে হইল না, রাজকুমার সম্মত হইল।

প্রতি শনিবারেই বিকালের গাড়ীতে রাজকুমার আসে—সোমবার প্রাতে ফিরিয়া যায়। পাড়ার দিদিমা ঠাকুমাগণ, "বর" লইয়া প্রভাকে নানাবিধ হাসি তামাসা করেন, সে সব শুনিয়া প্রভার চক্ষু দুইটি অবনত হয়, তাহার গণ্ডস্থল লজ্জায় রক্তিমাভা ধারণ করে। সখিগণের সহিত নির্জ্জনে তাহার সাক্ষাৎ হইলে চাপা হাসি এবং চুপি চুপি কথার সুখস্রোত বহিতে থাকে। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

রাজকুমারের সমস্যা।

শ্রাবণ মাস। রাত্রি আট্‌টা বাজিয়া গিয়াছে। বাহিরে অনবরত টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিতেছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। পটলডাঙ্গায় একটি ছাত্রাবাসের দ্বিতলের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে, কাঠের দেড়্‌কোর উপর মাটীর প্রদীপ মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে—খোলা জানালা দিয়া হাওয়া আসিয়া মাঝে মাঝে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষীণ শিখাটিকে কাঁপাইয়া দিতেছে।

এই কক্ষের মেঝের উপর দুইদিকে দুইটি সীট,— মাদুর পাতা রহিয়াছে, তোষক বালিশ প্রভৃতি শিরোভাগে গুটানো। একটি সীটে আমাদের নব-বিবাহিত রাজকুমার গালে হাত দিয়া, ঊর্দ্ধমুখে বসিয়া ভাবিতেছে। মাদুরের উপর দুই তিনখানি পুস্তক ছড়ান রহিয়াছে, কিন্তু পড়ে কে ? তাহার শ্যালক হরিপদ অপর সীটের অধিকারী, কিন্তু সে এখন বাসায় নাই, ছেলে পড়াইতে গিয়াছে। সুতরাং রাজকুমার একা। এই মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায়, এই নবীন বয়সে, কিসের এত ভাবনা তাহার ?

ঘরের কুলুঙ্গীতে একটি বম্মা টাইপীস্ টিক্ টিক্ করিতেছিল। রাজকুমার মাঝে মাঝে সেই ঘড়িটির পানে চাহিতেছে—আর মাঝে মাঝে শয্যাতল হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া, প্রদীপের আলোকে ধরিয়া নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিতেছে।

না, তাহা নয়। এই চিঠিখানি রঙীন কাগজে লেখা নয়—"যাও পাখী" অথবা "শিশিরে কি ফুটে ফুল"-জাতীয় কোনও সচিত্র কবিতা ইহার শিরোভাগে মুদ্রিত নাই। পত্রখানি ইংরাজিতে লেখা—আকার প্রকার সরকারী চিঠির মত।

সন্ধ্যা সাতটা হইতে সাড়ে আট্‌টা অবধি হরিপদকে

ছেলে পড়াইতে হয়। পৌনে নয়টার সময় সে বাসায় ফিরিয়া আসে। নয়টার সময় আহার করিয়া রাত্রি বারোটা অবধি পড়ে। আবার ভোরে উঠিয়া, ছয়টা হইতে সাতটা অবধি নিজ. পাঠ্য পড়িয়া, দুই ঘণ্টার জন্য প্রাইবেট্ টিউশন করিতে বাহির হয়। এইরূপে হরিপদ'র দিন কাটে।

ঘড়িতে ক্রমে সাড়ে আট্‌টা বাজিল। এইবার হরিপদ আসিবে, আর বিলম্ব নাই।

যথাসময়ে সিঁড়ির উপর দিয়া তাহার শ্রান্ত পদশব্দ উপরে উঠিতে লাগিল। ভিজা ছাতা ও কাদামাখা জুতাজোড়াটি খুলিয়া দরজার বাহিরে রাখিয়া, কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সে বলিল—"কি হে, একলাটি বসে যে!" —বলিয়া নিজ চাদর ও কামিজ খুলিয়া দড়ির আলনায় রাখিল। চটিজুতা পায়ে দিয়া বাহির হইয়া, "ঝি, ও ঝি, একঘটি জল নিয়ে এস ত"—বলিয়া একটি বৃহৎ ভোঁতা ছুরি বাহির করিয়া জুতার কাদা চাঁচিতে বসিয়া গেল। এই একটি জোড়া মাত্র সম্বল, ইহাই পায়ে দিয়া কল্য প্রাতে আবার ছেলে পড়াইতে যাইতে হইবে।

জুতার কাদা ছাড়াইতে ছাড়াইতে হরিপদ ভগ্নীপতির পানে চাহিতে লাগিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বলিল—"রাজু, অমন করে বসে রয়েছ কেন? কি হয়েছে?"

রাজকুমার বলিল,—"এস, বলছি। একটা মহা সমস্যায় পড়ে গেছি ভাই।"

কি সমস্যা হরিপদ কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

জুতা সাফ মুলতবি রাখিয়া, হাত ধুইয়া, ভগ্নীপতির কাছে আসিয়া বলিল—"কি ভাই?"

রাজকুমার বলিল—"গোড়া থেকেই বলি তা হলে। মাস দুই হল, অর্থাৎ বিয়ের দিন পনের পরেই, কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম যে চন্দ্রগড় রাজার এষ্টেটে ইংরেজি সেরেস্তার জন্যে একজন হেডক্লার্ক আবশ্যক। সেই বিজ্ঞাপন দেখে, কাউকে কিছু না বলে কয়ে, এক দরখাস্ত ঝেড়ে দিয়েছিলাম। তারপর—"

হরিপদ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"দরখাস্ত মঞ্জুর?"

রাজকুমার বলিল—"হঁ্যা। শোননা বলি।"

হরিপদ অধীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"মাইনে কত?"

"ত্রিশ টাকা।"

"হেডক্লার্কের মাইনে ত্রিশ টাকা? ঈস্—মস্ত আপিস যে!"—বলিয়া হরিপদ তাহার ওষ্ঠযুগল ব্যঙ্গভরে কয়েক মুহূর্ত্ত আকুঞ্চিত করিয়া রহিল।

রাজকুমার বলিল—"মাইনেতে কি যায় আসে? অনেক সুবিধে আছে।"

হরিপদ বলিল—"কি রকম? টু পাইস্ হ্যাব্ নাকি? শেষে তুমিও—"

রাজকুমার বলিল—"না হে না—'উপরি পাওনা' নয়। বাঙ্গলো দেবে থাকতে—বাসা ভাড়া লাগবে না। তা ছাড়া রোজ রাজবাড়ী থেকে সিধে আস্‌বে;—খাই খরচাও লাগবে না।"

হরিপদ বলিল—"সত্যি নাকি? কৈ, চিঠি কৈ, দেখি?"

তোষকের নিম্ন হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া রাজকুমার শ্যালকের হস্তে দিল। তাহাতে লেখা আছে বটে, বেতন ৩০৲, বাঙ্গলো এবং সিধা রাজসরকার হইতে দেওয়া হইবে। পড়িয়া হরিপদ জিজ্ঞাসা করিল —"আচ্ছা, কি সিধা দেয় ভাই? জান?"

রাজকুমার বলিল—"ওরা কি দেয় তা জানিনে। আমাদের আপিসে একজন আছে তার খুড়ো অন্য একটা রাজ এষ্টেটে চাকরি করতেন। সেখানেও সিধার নিয়ম ছিল। রোজ সকালবেলা রাজবাড়ী থেকে চাল, ডাল, ঘি, নুন, তেল, মশলাপাতি, তরী তরকারী, হপ্তায় একটা করে পাঁটা, মাঝে মাঝে মস্ত মস্ত রুই মাছ, —এই সব আসত। তারা সপরিবারে, মায় চাকর বাকর, খেয়ে ফুরিয়ে উঠতে পারত না—শেষে বিলিয়ে দিত।"

মাদুর চাপড়াইয়া হরিপদ বলিয়া উঠিল—"নাও—এ চাকরি তুমি নাও।"

রাজকুমার কিন্তু সে প্রকার উৎসাহ দেখাইল না। ধীরে ধীরে বলিল—"তোমার মত আছে?"

"খুব আছে। তোমার মত হচ্ছে না নাকি? বলছ যে বিষম সমস্যায় পড়েছি! সমস্যা কিসের? ভাল কথা—কোথা, চন্দ্রগড়?"

"চন্দ্রগড় হচ্ছে আরা জেলার বক্সার সাবডিভিজনে। বক্সারে নেমে পঁচিশ মাইল গোরুর গাড়ীতে যেতে হয়।"

হরিপদ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল—"একটু—কি বলে গিয়ে—ইয়ে বটে।"

রাজকুমার বলিল—"দূর বটে—কিন্তু তার জন্যেও আমি তত চিন্তিত নই।" (কথাগুলা যেন মেকি আওয়াজের মত শুনাইল)

হরিপদ বলিল—"তবে?"

রাজকুমার বলিল—"যা আমরা মৎলব করেছিলাম, তা যে সব উলট পালট হয়ে যায়। সেখানে চাকরি নিলে বি-এ এগ্জামিনও দিতে পারব না, আইনও পাস করতে পারব না,—কেরাণীগিরি করেই চিরজীবন কেটে যাবে।"

হরিপদ একটু ভাবিল। শেষে বলিল—"হাঁ—সে একটা কথা বটে।"

রাজকুমার যেন একটু উৎসাহ পাইয়া বলিতে লাগিল—"আপাততঃ অবিশ্যি লাভজনকই মনে হচ্ছে!—এই মেসের বাসায় আধখানা ঘরে ছেঁড়া মাদুরে পড়ে আছি,—সেখানে একটা বাঙ্গলো পাব তার জন্যে সিকি পয়সা ভাড়া দিতে হবে না—খাই খরচ লাগবে না, উপরন্তু মাসে মাসে ত্রিশটে করে টাকা! কিন্তু আখেরটা ত ভাবতে হবে ভাই! কেরাণীগিরি করে আর কে কবে বড় মানুষ হয়েছে?"

হরিপদ বলিল—"কিন্তু, চিরদিনই যে তুমি সেখানে কেরাণী হয়ে থেকে যাবে এমন ত কিছু কথা নেই। নেটিব এষ্টেটে অল্প মাইনের ঢকে কত বাঙ্গালী শেষে বড় বড় পদ পেয়ে গেছে—"দেওয়ান, মন্ত্রী—এ সব হয়েছে।"

রাজকুমার বলিল—"সে কি আর সকলের ভাগ্যে হয়? উন্নতি ত চুলোয় যাক্, রীতিমত খোসামোদ না করতে পারলে চাকরি টেঁকাই দায়। রাজার নাপিত বেটাকে পর্য্যন্ত খোসামোদ করতে হয়—নইলে তিনি রাজাকে কামাতে গিয়ে তাঁর কাণে ফিস্ ফিস্ করে রোজ তোমার পাঁচটা নিন্দে বান্দা করে আস্বেন। ভয়ানক ক্লিক্ হে ও সব দেশে—মাইকেলের সেই ব্যাপার শুনেছ:ত?"

হরিপদ জিজ্ঞাসা করিল—"মাইকেলের কি ব্যাপার?"

রাজকুমার বলিল—"মাইকেল মধুসূদন দত্ত কিছুদিন পঞ্চকোটের রাজার ম্যানেজার হয়েছিলেন জান ত? সেই যে 'পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রী' বলে কবিতা টবিতা লিখেছিলেন। তাঁর ম্যানেজারি চাকরি কেন গেল তা জান?"

"না, তা ত জানিনে।"

"কোত্থেকে জানবে? কোনও জীবন-চরিতে এ কথা নেই। সে ভারি মজার কথা। মাইকেল ত সেখানে গিয়ে ম্যানেজার হলেন। গিয়ে দেখ্লেন, আমলাদের মধ্যে ঘুষ টুস খুব চলে, যে যত পারে, দুহাতে চুরি করে, ইত্যাদি—যেমন হয়ে থাকে। তিনি গিয়ে সব বন্ধ করে দিলেন। আমলারা দেখ্লে, এ ত ভারি মুস্কিল—কোথা থেকে এ আপদ এসে জুটলো! তারা ষড়যন্ত্র করতে লাগলো—কিসে মাইকেলকে তাড়াতে পারে। পরামর্শ করে তারা স্থির করলে, রাজা মাইকেলকে ভালবাসেন—এমন উপায় করতে হবে যে মাইকেল রাজার বিষ-নয়নে পড়ে যায়। কিছু দিন গেল, তারা খালি সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে। একদিন রাজা একজন বড় আমলাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি হে, তোমাদের নতুন ম্যানেজার সাহেবকে কেমন দেখ্ছ?'—সে ব্যক্তি মুখটি কাঁচু মাচু করে বল্লে—'হুজুর, আর ত সব বিষয়ে ভালই দেখি—কেবল ওঁর

একটা বিষয়ের জন্যে আমাদের ভারি আশ্চর্য্য বোধ হয়। শুধু আশ্চর্য্য নয়, রাগও হয়, দুঃখও হয়।'—রাজা শুনে বল্লেন—'কি রকম ?'—আমলা বল্লে—'হুজুর, বল্ব কি দুঃখের কথা, ম্যানেজার সাহেব বলেন যে হুজুরের গায়ে নাকি ভারি দুর্গন্ধ।' রাজা বল্লেন—'দুর্গন্ধ!—আমার গায়ে দুর্গন্ধ!—কিসের গন্ধ ?'—আমলা বল্লে—'তা ত জানিনে হুজুর, সে ম্যানেজার সাহেবই বল্‌তে পারেন। আমরা ত যখনই হুজুরের কাছে আসি, তখন, দুর্গন্ধ ত দূরের কথা, একটা রীতিমত খোসবয় পাই—প্রায় অনেকটা পদ্মফুলের গন্ধের মত। রাজ-শরীর, হবে না ?—ম্যানেজার সাহেব যে কোথা থেকে দুর্গন্ধ পান তা উনিই জানেন।' —রাজা বল্লেন—'সত্যি ম্যানেজার বলেছে এ কথা ?' আমলা বল্লে—'হুজুর যে কর্ম্মচারীকে খুসী ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা করুন। উনি সবাইকের কাছে বলেছেন। আর, এত সাক্ষী সাবুদেরই বা দরকার কি ? ম্যানেজার সাহেব যখন হুজুরের কাছে আসবেন তখন দেখ্‌বেন, তিনি যতক্ষণ হুজুরের সামনে থাকেন, নিজের নাক রুমাল দিয়ে বন্ধ করে রাখেন।'—এখন আসল কথাটা এই—মাইকেল বড্ড মদ খেতেন কিনা—পাছে রাজা তাঁর মুখ থেকে মদের গন্ধ পান, তাই রাজার সঙ্গে কথা কইবার সময় মুখ মোছবার ছলে রুমাল খানা নিয়ে মুখের উপর, নাকের উপর ধরে থাক্‌তেন। আমলারা এটা লক্ষ্য করেছিল,—এই সুযোগ কাযে লাগিয়ে দিলে। পারর বার মাইকেল যখন রাজার সাম্‌নে এলেন, রাজা দেখ্‌লেন সত্যিই ত।—আমলা যা বলেছিল, সবই বিশ্বাস করে নিলেন। তখন থেকেই রাজার সঙ্গে মাইকেলের খিটিমিটি বাধলো। ক্রমে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন।"*

এমন সময় ঝি আসিয়া সংবাদ দিল, আহারের স্থান হইয়াছে।

আহারান্তে দুই বন্ধু আসিয়া আবার এই প্রসঙ্গের আলোচনা আরম্ভ করিল—কিন্তু কোন মীমাংসাই হইল না। চাকরি গ্রহণ করিতে ভগ্নীপতির অনিচ্ছা দেখিয়া অবশেষে হরিপদ বলিল—"কাল ত শনিবার, চল বাড়ী যাওয়া যাক, বাবার সঙ্গে পরামর্শ করা যাক্, দেখি তিনি কি বলেন।"

"সেই বেশ কথা"—বলিয়া রাজকুমার শয়নের উদ্যোগ করিল, হরিপদ নিজ সীটে গিয়া প্রদীপটি জ্বালিয়া পড়িবার বহি খুলিয়া বসিল।

রাজকুমার শয়ন করিল বটে কিন্তু কিছুতেই তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। চক্ষু বুজিয়া এক পাশে ফিরিয়া সে পড়িয়া রহিল। বাহিরে মাঝে মাঝে বৃষ্টি চাপিয়া আসিতেছে, আবার ছাড়িয়া যাইতেছে। কালিদাস বলিয়াছেন এমন দিনে

ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িণিজনে কিং পুনর্দূরসংস্থে।

—রাজকুমারের কেবলই মনে হইতে লাগিল—"এ চাকরি নিয়ে যদি দূরদেশে চলে যাই, তবে এখন অন্ততঃ একবৎসরকাল তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবে না। এক বৎসর পরে যদিও বা ছুটি নিয়ে আসি,—আবার দিন কতক পরে সেখানে চলে যেতে হবে। প্রভাকে সেখানে কোনও দিন যে নিয়ে গিয়ে কাছে রাখ্‌ব, সে উপায়ও দেখ্‌ছিনে। মা নেই, মাসী নেই, পিসী নেই—বিনা অভিভাবকে সেই দূরদেশে কি করে তাকে একা রাখ্‌ব ? এখন তবু প্রতি শনিবার না হোক, এক শনিবার অন্তর শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি—দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে। না না—কলিকাতা ছেড়ে যাওয়াতে কোনই সুবিধে নেই আমার।"

পরদিন প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই রাজকুমার হৃদয়ে একটা আনন্দ-চাঞ্চল্য অনুভব করিল,—মনে হইল, আজ দেখা হইবে। বিছানায় পড়িয়া অর্দ্ধমুদিত নেত্রে সে এই মানসাঙ্কটি কষিয়া ফেলিল—"এখন প্রায় ছয়টা। ছয়টা হইতে ছয়টা বারো ঘণ্টা; রাত্রি দশটা—আর চারি ঘণ্টা; বারো আর চারে ষোল ঘণ্টা;

---

* উপরে লিখিত কাহিনীটি আমি এক বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছিলাম। যথার্থই এইরূপ ঘটিয়াছিল কিনা, তাহা অঙ্গীকার করিতে আমি অসমর্থ।—লেখক।

ষোল ইন্টু ষাট—ছ-ষোলং ছেয়ানব্বই—নয়শো ষাট মিনিট।"—সাধারণতঃ লোকের একটা ধারণা আছে যে নব-প্রণয়ীরা কবিত্বশক্তি সম্পন্ন হইয়া উঠে;—তাহা সত্য বটে, কিন্তু মানসাঙ্কেও তাহারা যথেষ্ট উন্নতিলাভ করে।

আহারান্তে রাজকুমার অপিসে গেল। কিন্তু মনিবের কায সেদিন বড় অগ্রসর হইল না! ঘড়ির পানে চাহিতে চাহিতে, মানসাঙ্ক কষিতে কষিতে ক্রমে দুইটা বাজিল। শনিবারে আপিসগুলি দুইটার সময়ই বন্ধ হইবার কথা বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ কোন অপিসেই প্রায় তাহা হয় না। সাহেব উঠিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত, কেরাণীদের আটক থাকিতে হয়। আজ দুইটা বাজিবা মাত্র রাজকুমার তাই হেডক্লার্ক বাবুর নিকট গিয়া, শঙ্কিত কম্পিত স্বরে বলিল "আজ আমার একটু দরকার আছে, একটু সকালে সকালে যেতে চাই।"—কথাগুলি বলিতে, রাজকুমারের মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল।

হেডক্লার্ক বাবু জানিতেন রাজকুমার নব-বিবাহিত এবং মাঝে মাঝে শনিবারে শ্বশুরবাড়ী গিয়া থাকে। তিনি প্রৌঢ়বয়স্ক হইলেও অল্প বয়স্কগণের সহিত হাস্য পরিহাস করিয়া থাকেন, তাঁহার স্বভাবই এইরূপ। রাজকুমারের মুখের পানে চাহিয়া, কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত তিনি বলিলেন—"কেন? দরকারটা কি?"

রাজকুমার আরও রাঙা হইয়া উঠিল। গলা ঝাড়িয়া বলিল—"আজ্ঞে, সাড়ে তিনটের গাড়ীতে"—বলিয়া থামিয়া গেল, আর কথা বাহির হইল না।

হেডক্লার্ক বাবু বলিলেন—"সাড়ে তিনটের গাড়ীতে কোথাও যাবে বুঝি?—তা এখন ত মোটে দুটো। এখান থেকে তিনটের সময় বেরুলেই অনায়াসে হাওড়ায় গিয়ে ট্রেণ ধরতে পারবে।"

নিকটে একজন বসিয়া কায করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন—"কি বলছেন বড়বাবু আপনি!—বেচারি এখন বাসায় যাবে—মুখে সাবান ঘষবে পনেরো মিনিট, চুল ফিরোবে দশ মিনিট, কাপড় ছাড়বে—তবে ত যাবে। সেই কোন্ মান্ধাতার আমলে আপনারা বিয়ে করেছিলেন—আপনার এ সবের কি বুঝবেন বলুন! তখন বোধ হয় এ সব রেওয়াজই হয়নি!"

হেডক্লার্ক বাবু বলিলেন—"রাজকুমার—তুমি শ্বশুরবাড়ী যাবে বুঝি?—তাই বল!"—সেই বাবুটির প্রতি ফিরিয়া বলিলেন—"কেন, মান্ধাতার আমলে কি লোকে শ্বশুরবাড়ী যেত না? প্রাণে তাদের সখ্ ছিল না? খুব ছিল হে, খুব ছিল। আমরাও শনিবারে শ্বশুরবাড়ী যেতাম। তখন যে গানই ছিল ও সম্বন্ধে। তোমাদের আমলে সে গান তোমরা বোধ হয় শোন নি?"

বাবুটি বলিলেন—"কি গান বড়বাবু? বলুন না শুনি।"

বড়বাবু সহাস্যে গুণ গুণ করিয়া ধরিলেন—

"কবে হবে হুঁহুঁহুঁহুঁ'র সুখ শনিবার,
বহু দিনে হুঁহুঁহুঁহুঁ আসিবেন আবার!"

বাবুটি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হুঁহুঁ-হুঁহুঁ কি বড়বাবু?"

বড়বাবু বলিলেন—"পয়ে রফলা আকার, মূর্দ্ধণ্য ণ, দন্ত্য ন'য়ে আকার, থ। সেকালে ঐ বলত কিনা—আজকালই ওটা অশ্লীল হয়ে গেছে।"—বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন। আশে পাশে যাহারা বসিয়াছিল, সকলেই সে হাস্যে যোগ দিল।

রাজকুমার ছুটি পাইল।

ট্রেণে উঠিয়া হরিপদ জানালার কাছে বসিয়াছিল, রাজকুমার তাহার পাশে। হুগলি ষ্টেশনে গাড়ী পৌছিলে হরিপদ বলিয়া উঠিল—"ওহে-ওহে—ওস্মান।"

রাজকুমার, গিরিশ মুখোপাধ্যায় ঘটিত সমস্ত কথাই শুনিয়াছিল—পরিহাস ছলে সেই তাঁহার "ওসমান" ও নিজের "জগৎসিংহ" নামকরণ করিয়াছিল। সেও জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, গিরিশ মুখোপাধ্যায় খালি গাড়ী খুঁজিয়া খুঁজিয়া হন্ হন্ করিয়া প্লাটফর্ম্মের উপর দিয়া চলিয়াছেন। বলিল—"ওস্মান দার্জ্জিলিঙ থেকে ফিরেছে দেখ্‌ছি।"

মগরা ষ্টেশনে পৌছিয়া উভয়ে দেখিল, সতীশ দত্ত প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। গিরিশ মুখোপাধ্যায় নামিতেই সে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

জীবন-তরী

কালো জলে ঢেউ উঠেছে,
গোটা আকাশ বাদল ছাওয়া,
মেঘের বুকে ঝিলিক্ জ্বলে,
ক্ষান্ত দে রে নৌকা বাওয়া।
ঘিরে আসে আঁধার নিশি,
অন্ধকারে দিশি দিশি
স্পর্শ-শীতল, বন্ধ-বিহীন,
ছুটে বেড়ায় পাগ্‌লা হাওয়া।
একাকী তুই, নাই যে সাথী,
গভীর হয়ে আসে রাতি;
ঝিল্লী-মুখর পল্লী-পথে
নাইকো লোকের আসা যাওয়া;
রঙ্গীন্ নিশান উড়ে গেছে,
অধীর বাঁশীর সুর থেমেছে,
আজ এ রাতে কূলে যেতে,
ব্যর্থ যে তোর প্রয়াস পাওয়া;
ক্ষান্ত দেরে তরী বাওয়া।

শ্রীঅমিয়াময়ী দেবী।

প্রাচীন ভারত

(২) বণিকগণের সমুদ্রযাত্রা।

"ণায়া ধম্ম কহা" (১) নামক জৈন ষষ্ঠ অঙ্গ (২) হইতে আমরা কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে সে কালের বণিকগণ কিরূপে সমুদ্র-যাত্রা করিতেন, তদ্‌বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ জৈন শেষ তীর্থঙ্কর শ্রীমহাবীর স্বামীর শিষ্য সুধর্ম্ম গণধর কর্তৃক খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দে বিরচিত।

"সে কালে ও সে সময়ে অঙ্গ নামক জনপদ ছিল। তাহাতে চম্পা নামক নগরী ও তথায় চন্দ্রচ্ছায় নামক অঙ্গরাজা রাজত্ব করিতেন। সেই চম্পা নগরীতে "অরহন্নক" প্রমুখ বহু সাংযাত্রিক নৌবণিক বাস করিত, তাহারা সমৃদ্ধ ও অন্য কর্তৃক অপরাভবনীয় ছিল।

"অরহন্নক বণিক শ্রমণোপাসক (৩) ও জীবাজীবাদিক (৪) নবতত্ত্বের সম্য বেত্তা ছিল। একদা "অরহন্নক" প্রমুখ সাংযাত্রিক নৌবণিকগণ একত্র মিলিত হইলে পরস্পরের মধ্যে এইরূপ কথার সংলাপ উৎপন্ন হইল যে "আমাদের নিশ্চয় গণিম (৫), ধরিম, মেয় ও পরিচ্ছেদ্য এই চারি প্রকার পণ্যদ্রব্য লইয়া পোতবাহনে লবণসমুদ্র অতিক্রম করা উচিত।" এইরূপ বলিয়া এ বিষয়ে পরস্পরে প্রতিশ্রুত হইলে গণিমাদি চারি প্রকার পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিল ও গো-যানাদি সজ্জিত করিয়া তাহাতে ঐ সমস্ত পণ্যদ্রব্য বোঝাই করিয়া শোভন তিথি-করণ-নক্ষত্র-মুহূর্ত্তে বিপুল অশন, (৬) পান, খাদিম, স্বাদিম এই চারি প্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করাইয়া ভোজন সময়ে মিত্র জ্ঞাতিগণকে ভোজন

(১) জ্ঞাতা ধর্ম্ম কথা।

(২) আয়ারাঙ্গ, সূয়গড়াঙ্গ, ঠাণাঙ্গ, সমবায়াঙ্গ, বিবাহপণ্ণত্তি বা ভগবঈ, ণায়াধম্মকহা, উবাসগদসাও, অন্তগড়দসাও, অনুত্তরোবাইয়দসাও, পণ্হাবাগরণং ও বিবাগসুয়ং এই একাদশ অঙ্গ।

(৩) জৈন শ্রাবক।

(৪) জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আস্রব, সংবর, নির্জ্জরা, বন্ধ ও মোক্ষ—এই নবতত্ত্ব। বিস্তৃত বিবরণের জন্য "নবতত্ত্বা" দিক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

(৫) গণিম—যাহা গণনা করিয়া বিক্রীত হয়; ধরিম—যাহা তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া বিক্রীত হয়; মেয়—যাহা পাত্রাদিদ্বারা মাপিয়া বিক্রীত হয়; পরিচ্ছেদ্য—যাহা পরীক্ষা করিয়া বিক্রীত হয় যথা—মণি, বস্ত্র ইত্যাদি।

(৬) ভাত, ডাল ইত্যাদি—অশন; কাঞ্জি, জল প্রভৃতি—পান, ফলাদি—খাদিম; শুণ্ঠি, জীরক, মধু, গুড়, তাম্বুলাদি—স্বাদিম।



লেডি শ্যালট।

Manasi Press.

করাইয়া ও তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া সেই গোযান সকল লইয়া চম্পানগরীর মধ্যস্থল দিয়া নির্গত হইল ও যে স্থলে গম্ভীর পোত-পত্তন (৭) ছিল তথায় উপস্থিত হইয়া গো-যান সমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পোত-বাহন সজ্জিত করিয়া তাহাতে গণিমাদি চারিপ্রকার পণ্যদ্রব্য ও তণ্ডুল, আটা, তৈল, ঘৃত, গুড়, গো-রস (৮), জল, ভাজন, ঔষধ, ভেষজ, তৃণ, কাষ্ঠ, আবরণ (৯), প্রহরণ, ও পোতবাহনে স্থাপন করিবার উপযুক্ত অন্যান্য অনেক দ্রব্য পরিপূর্ণ করিয়া শোভন-তিথি-করণ-নক্ষত্র-মুহূর্ত্তে বিপুল অশনাদি চারিপ্রকার খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করতঃ মিত্র জ্ঞাতিগণকে ভোজন করাইয়া ও তাহাদের আজ্ঞা লইয়া পোতবাহনের সমীপে উপস্থিত হইল।

তৎপরে "অরহন্নক" প্রমুখ বণিকগণকে তাহাদের পরিজনগণ, ইষ্ট কান্ত মনোজ্ঞ বাণীদ্বারা অভিনন্দন অভিসংস্তবন করিয়া বলিল—"হে আর্য্য, হে তাত, হে ভ্রাতঃ, হে মাতুল, হে ভাগিনেয় তোমরা ভগবান সমুদ্র-দ্বারা সংরক্ষিত হইয়া চিরজীবী হও, তোমাদের মঙ্গল হউক; পুনরপি লব্ধার্থ, কৃতকার্য্য, অনঘ, সমস্ত ধন-পরিবার-যুক্ত হইয়া নিজগৃহে শীঘ্র আগত তোমাদিগকে আমরা দেখি।" এইরূপ বলিয়া সৌম্য,স্নিগ্ধ,দীর্ঘ পিপাসিত অশ্রুপ্লুত দৃষ্টিদ্বারা নিরীক্ষণ করিয়া মুহূর্ত্তমাত্র স্থিত হইল। তৎপরে (সমস্ত পোতে) পুষ্পপূজা সমাপ্ত হইলে, সরস রক্তচন্দন দ্বারা পঞ্চাঙ্গুলি হস্ততলের ছাপ প্রদত্ত, ধূপ অনুক্ষিপ্ত, সমুদ্রবাত পূজিত, বলয়-বাহা (১০) যথা-স্থানে নিবেশিত, শ্বেতধ্বজাগ্র উর্দ্ধীকৃত, নিপুণ ব্যক্তি কর্ত্তৃক তূর (১১) প্রবাদিত সর্ব্বশকুনজয়াবহ ও রাজার আদেশপট্ট [১২] গৃহীত হইলে মহৎ উৎকৃষ্ট সিংহনাদাদি শব্দ দ্বারা মেদিনীকে প্রক্ষোভিত-মহাসমুদ্র-রব-সদৃশ শব্দে শব্দায়মান করিয়া বণিকগণ পোতে আরূঢ় হইল। তৎপরে বন্দিজন মঙ্গলশব্দোচ্চারণ করিতে লাগিল—"আপনাদের সকলের অর্থসিদ্ধি হউক, আপনাদের কল্যাণ উপস্থিত, সর্ব্বপাপ প্রতিহত হইয়াছে, (চন্দ্রের সহিত) পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত হইয়া বিজয়-মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে—ইহাই যাত্রার উপযুক্ত সময় বলিয়া দেশ-কালে প্রসিদ্ধ।" তৎপরে বন্দিজন কর্ত্তৃক এইরূপ বাক্য ও উদাহরণ পূর্ব্বক হৃষ্ট-তুষ্ট হইয়া কর্ণধার,কুক্ষিধার (১৩) গর্ভজ্জা (১৪) সহিত স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত নৌবণিকগণ পূর্ণোৎ-সঙ্গা, পূর্ণমুখী নৌসকলকে বন্ধনমুক্ত করিল। তৎপরে সেই বিমুক্তবন্ধন, নৌসকল বায়ুবল দ্বারা সমাহতা হইয়া বিতত-পক্ষ গরুড়যুবতীর ন্যায় শ্বেতবস্ত্রের পাইল তুলিয়া গঙ্গাসলিল-তীক্ষ্ণ স্রোতোবেগদ্বারা প্রেরিত হইয়া সহস্র সহস্র তরঙ্গমালা সমতিক্রম করিতে করিতে কতিপয় অহোরাত্রে লবণসমুদ্রে অনেক যোজনশত প্রবিষ্ট হইল। তৎপরে সেই অরহন্নক প্রমুখ বণিকগণ লবণ-সমুদ্রে অনেকশত যোজন অতিক্রম করিলে বহুশত উৎ-পাত প্রাদুর্ভূত হইল যথা:—অকালে গর্জ্জন, অকালে বিদ্যুৎ, অকালে স্তনিৎ শব্দ ইত্যাদি।

শ্রীপূরণচাঁদ সামসুখা।

(৭) বন্দর।

(৮) দুগ্ধ।

(৯) বস্ত্রাদি।

(১০) বলয়বাহা—দীর্ঘকাষ্ঠ লক্ষণ বাহু-ইতি টীকা।—(দাঁড় ?)

(১১) বাদ্য যন্ত্র বিশেষ।

(১২) Passport.

(১৩) কুক্ষিধার=নৌপার্শ্বনিযুক্তকাঃ আবেল্লক বাহকাদয়ঃ-ইতি টীকা।

(১৪) গর্ভজ্জা=গর্ভে ভবা গর্ভজ্জাঃ, নৌমধ্যে উচ্চাবচ কর্ম্ম-কারিণঃ—ইতি টীকা।

শুভ-লগ্ন

পথে যেতে যেতে যা কিছু গিয়েছে পড়ে,
সে সব কুড়ায়ে ফিরে যাস্‌নেকো আর,
জমা যা রয়েছে হিয়ার গোপন ঘরে,
আজ বসে থাক আগুলিয়া তার দ্বার।
ব্যথা ও বেদনা যে দাগ দিয়েছে বুকে,
নব বরষের পরশে তা যাক্ চুকে,
অতীতের স্মৃতি সজোরে আঁকড়ি বুকে,
ফেলিস্‌নে আর ব্যর্থ আঁখির ধার!

উদয়-শিখরে অরুণ উঠেছে হেসে,
তিমির-অন্ধ রজনী হয়েছে ভোর;
আলোর জোয়ারে ধরণী গিয়েছে ভেসে;—
এখনো কি হায় ভাঙ্গেনি তন্দ্রা ঘোর?
অমিয়-সাগরে ধরণী করেছে স্নান,
নিরাকুল সুখে পাখীরা ধরেছে গান;—
প্রলয় রাতির হয়নি কি অবসান—
মোহের আবেশ এখনো টুটেনি তোর!

সমুখের পানে ওই দেখা যায় আলো,
ও নয় আলেয়া, ও নয় মায়ার খেলা;
দূর করে আজ প্রাণের নিকষ কালো,
ওরি তীরে ত্বরা নিয়ে চল্ তোর ভেলা।
নদীর তীরের বধির ও কোলাহল
তোরি প্রাণে আজ ধেয়ে আসে চঞ্চল,
সুপ্ত নয়ন মেলিয়াছে শতদল;—
অন্ধ, এ শুভ লগ্ন করোনা হেলা!

নিশার শেষের হিরণ কিরণ খানি
আঁখির সমুখে ধরেছে কি নব লেখা,
সারা আকাশের নীলিমার তুলি টানি
হিয়ার পাতায় আঁকেনি রঙিন রেখা?
অতীতের পানে তাকাস্‌নে মিছে ফিরে,
কেন শুধু আর মগ্ন আঁখির নীরে?—
তরী আজ তোর ভিড়েছে নদীর তীরে;
শ্যামল হাস্যে নিখিল দিয়েছে দেখা!

শ্রীপরমেশ নাগ-চৌধুরী।

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অতি শৈশবে রোগক্লিষ্ট শরীর লইয়া যাঁহার স্নেহ-বক্ষে সন্তানের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিলাম, সেই মুহূর্ত্ত হইতে দ্বাদশবর্ষ বয়ক্রম পর্য্যন্ত যাঁহাকে গর্ভধারিণী জননী বলিয়াই আমার অবিচলিত সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছিল, যাঁহার সুদুর্লভ মাতৃস্নেহ ভগিনীগণের সহিত ভাগ করিয়া লইতে নিত্যকলহে রাজধানী মুখরিত এবং রাজেন্দ্রাণীর ইন্দীবর-নেত্র স্নেহাশ্রু-পরিপ্লুত করিয়া দিয়াছি, যিনি মাতা নহেন নিশ্চিত জানিয়াও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় নাই এবং সে দুঃখ নিজ হৃদয়ে সহ্য করিতে অনেক নিদ্রাবিহীন নিশায় অনেক গোপন অশ্রু-পাত করিতে হইয়াছে, জ্ঞানোদয় হইতে যে রাজ-তপস্বিনীকে আমার ধরণীর প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞানে অন্তরের ভক্তি-পারিজাত-পুষ্পে মনে মনে নিত্য পূজা না করিয়া আমার দিনকে সার্থক মনে করিতে পারি নাই, দূরদেশে রুগ্নশয্যায় শয়ন করিয়া যাঁহার স্নেহ-করুণ শুশ্রূষার জন্য আমার সমস্ত প্রাণ একান্ত লালায়িত হইয়া

উঠিয়াছে, বিদ্যালয়ের বিদায়ের অবসরে গৃহে আসিয়া যাহার প্রসাদ অন্নের অংশ লইয়া ভগিনীর সহিত মনোমালিন্য ঘটাইতে নিমেষের জন্যও দ্বিধা বোধ করি নাই, যাঁহার ইচ্ছাকে প্রচুরতম সম্মান দিবার জন্য আমার অনেক বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত স্বীয় জীবনের ভাল মন্দ সমস্তই যাঁহার পাদপদ্মের উপর নিক্ষেপ করিয়া নিজে নীরবে কেবল আদেশ পালন করিয়াই গিয়াছি, জীবন-ব্যাপী সুখ দুঃখ কিম্বা জীবন মরণের ব্যাপার উপস্থিত হইলেও যাঁহার অভিপ্রায়কে অগ্রে করিয়া নিজকে একান্ত ভাবে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছি, দরিদ্রের সন্তানকে রাজাধিরাজ করিয়াছেন বলিয়া যাহার প্রতি অপার কৃতজ্ঞতা হৃদয়ের মধ্যে নিয়তই উচ্ছ্বসিত হইয়া রহিয়াছে—সেই মা আমার ; পরের কথায় তাঁহার একান্ত ভক্ত সন্তানের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করিয়া নির্ম্মম অবিচার করিতেছেন বুঝিয়া অভিমানভরে অন্তর আমার বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। ভাবিলাম, নিজের সংসার হইতে শৈশবেই কেন্দ্রভ্রষ্ট গ্রহের মত দূরে সরিয়া পড়িয়াছি, যেখানে আশ্রয় পাইয়াছিলাম সেখানে যখন স্নেহের স্থান অবিশ্বাস আসিয়া অধিকার করিতে চাহিতেছে, তখন বিদ্বেষ আসিতে অধিক বিলম্ব নাও হইতে পারে ; এমন স্থলে বাস করিয়া সুখ নাই বরং নিয়ত অন্তর-বেদনায় মহাদুঃখে কাল কাটাইতে হইবে ; স্থির করিলাম এবার কোন উপলক্ষ্য করিয়া বাহির হইলে আর এখানে ফিরিব না—এ বিস্তীর্ণ বসুধার মধ্যে একজনের মত স্থান প্রচুর আছে। সঙ্গে সঙ্গে জীবনোপায়ের কথাটাও মনে আসিল, বাঁচিয়া থাকিলে ক্ষুধার সময় পেটে কিছু দিতে হয়, এ জ্ঞান হইবার মত বয়স তখন হইয়াছে, কিন্তু সে বিভীষিকা আমায় ভয় দেখাইতে পারিল না। এই রাজধানীতেই বহুলোককে দেখিতেছি, বিশেষ কোনও বিদ্যাবুদ্ধির উপরে দাবী দাওয়া না রাখিয়াও বেশ স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়া যাইতেছে, দুই সন্ধ্যায় আহারও করে এবং বস্ত্র দ্বারা অঙ্গ ঢাকিয়াও বেড়ায়—তাহাদের তুলনায় নিজকে হীন বলিয়া মনে কোন দিনও করি নাই, সুতরাং নিজের শাকান্নের ভাবনা আমায় কাতর করিল না—বিশেষ রাজকুমার হইয়াও শৈশব কৈশোর এবং যৌবনের প্রারম্ভে যে ভাবে কাটাইতে হইয়াছে, তাহাতে রাজভোগ না হইলেও দিন চলিয়া যাইবে—এ সাহস অন্তরে ছিল। সময় সময় কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছি বটে, কিন্তু পঠদ্দশায় ব্যায়ামচর্চ্চায় শরীর সবল ও সুদৃঢ় করিয়াছিলাম, সে পরিচয় পাঠক পাঠিকাদিগকে পূর্ব্বেই দিয়াছি ; সুতরাং আমার গৃহত্যাগের সঙ্কল্পের বিরোধী কোন যুক্তি বা বিভীষিকা মনে স্থান পাইল না,—আমি অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কেবল একটি মাত্র কথা বারম্বার মনে আসিতে লাগিল—সেও আমার সেই মায়েরই কথা। যদিও তাঁহারই অবিশ্বাসের বেদনায় ব্যথিত হইয়াই গৃহত্যাগ করিব ভাবিতেছি, তথাপি আশৈশব আমার সকল স্মৃতি যাহার সঙ্গে বিজড়িত, পৌষের তুহিনাচ্ছন্ন প্রভাতে প্রথম জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে শীতবস্ত্রের জন্য 'মা' বলিয়া যাহাকে প্রতিদিন নিদ্রা হইতে জাগাইয়াছি, বৈশাখের অগ্নিবর্ষী মধ্যাহ্নে কাকশাবককে কুলায়হীন করিবার জন্য যাঁহার নিদ্রালস নয়নের প্রতীক্ষায় মহা অধৈর্য্যে আমার সময় কাটিয়াছে, শৈশবের রোগাকুল দিনে যাঁহার আলস্যহীন শুশ্রূষার বলে বারংবার জীবন পাইয়াছি, শতলক্ষ আবদারে যাঁহার অফুরন্ত স্নেহের উপর অগণিত অত্যাচার করিয়াছি—আমি নিরুদ্দেশ হইয়া গেলে তাঁহার অন্তরে নিদারুণ ব্যথা লাগিবেই তাহা আমি নিশ্চিতই জানিতাম এবং সেই ব্যথায় তাঁহার প্রতি অশ্রুবিন্দুপাতের প্রায়শ্চিত্ত-বিহীন পাপ আমায় লক্ষফেরে ঘেরিয়া ধরিবে, যাহা কোটি জন্মেও হয়ত ক্ষালন হইবে না—এই চিন্তা আমার বিনিদ্র রজনীর স্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে আমাকে পাগল করিয়া তুলিত। যাহাকে একদিন নয়নের মণি অপেক্ষাও প্রিয়তর জ্ঞান করিয়াছেন, যাহার আগমনের নির্দ্ধারিত সময়ের ক্ষণমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলে তাঁহার নয়ন দু'টি দ্বার-প্রান্তেই পড়িয়া থাকিত, সকলের কণ্ঠস্বরই একমাত্র যাহার স্বর মনে করিয়া মুহুর্মুহু চকিতনেত্রে চতুর্দ্দিকে চাহিতেন—সেই তাঁহার স্নেহের নন্দদুলাল

নিরুদ্দিষ্ট অজ্ঞাত-বাসে চলিয়া গেলে সে বিয়োগব্যথা তাঁহার প্রাণে বিষম বাজিবেই ; অপরের কথায় আজ যে অন্ধকার তাঁহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছিল, স্নেহাস্পদ গৃহহীন হইয়া চলিয়া গেলে সে অন্ধকার থাকিবে না ঐ কথা নিশ্চয়রূপে জানিয়া দণ্ডে দশবার আমার সঙ্কল্প ভ্রষ্ট হইতে লাগিল—কর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত আমার দিন বড় যন্ত্রণায় কাটিতেছিল। এই পৃথিবীতে স্নেহ অপেক্ষা বড় সম্পদ আর কিছুই নাই এ ধারণা আমার চিরন্তন ধারণা এবং সে সম্পদের অধিকার পাইতে রাজ্য ঐশ্বর্য্য সমস্তই তৃণবৎ ত্যাগ করিতে মানুষের তিলার্দ্ধও বিলম্ব হয় না, এ বিশ্বাস বহুকাল হইতে আমি অন্তরের মধ্যে পরমযত্নে পোষণ করিয়া আসিয়াছি, সেই নিতান্ত অভিলষিত মহামূল্য সামগ্রী সর্ব্ব প্রথমে আমি যেথান হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাইয়াছি, সেই স্নেহশীলার ক্ষণিক বিরাগের সন্দেহে চিরজীবনের জন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার স্নেহকরুণ হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত করিব, এ ভাবনা আমাকে নিয়ত অস্থির করিতে লাগিল। কিন্তু যেখানে স্নেহ অধিক, সেখানে অবিশ্বাস অনাদরের মানাভিমানও সমধিক—ইহা মানবের হৃদয়-জগতের পরম সত্য কথা, তাই আমার গৃহত্যাগে মাতা অন্তরে নিদারুণ বেদনা পাইবেন জানিয়াও সে সঙ্কল্প আমার মন হইতে গেল না, কারণ আমিও যে অন্তরে বড় ব্যথাই পাইয়াছিলাম। বসন্ত কালের মধুচক্র যেমন মধুর ভারে বিদীর্ণ হইয়া যাইতে চাহে, তেমনই সমাসন্ন যৌবনে মানবের অন্তর কি এক অপূর্ব্ব স্নেহরসে নিয়ত উচ্ছ্বসিত হইয়াই থাকে, সে সময় আমাদের অন্তরের সেই রসোচ্ছ্বাসে সকলকেই অভিসিঞ্চিত তৃপ্ত সুখী করিয়া দিতে ইচ্ছা করে এবং সকলের নিকট হইতে পাইয়া হৃদয়ের সেই মধুভাণ্ডার আবার পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবার ইচ্ছা মানব-মনের বড় স্বাভাবিক ইচ্ছা। সে দিনে আকাশ বড় নির্ম্মল হইয়া উঠে, চন্দ্র সূর্য্যের কিরণে অফুরান অমৃতধারা রক্ষিত হইতে থাকে, পাখীর ডাকে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী নিয়ত ঝঙ্কৃত হয়, কুঞ্জবনের কুসুম সে দিন পরিমলকে দূত করিয়া ভ্রমরের উদ্দেশে দশদিকে তাহাকে যেন অধিক করিয়া ছুটাছুটি করায়—আর আমাদের সমগ্র অন্তরাত্মা কোন এক অনাগত অপরিজ্ঞাত অনির্ব্বচনীয়ের অভিসারের বেদনাময় সুখে নিয়ত পুলকাঞ্চিত দেহে চক্ষু মুদিয়া অপেক্ষা করে। অনাগত আকাঙ্ক্ষিতের সুখস্পর্শ-শিহরণের অনিশ্চিত আশায় যখন সমগ্র মন মাতাল হইয়া বসিয়া আছে, তখন যদি চির-পরীক্ষিত চিরস্থির ধ্রুব-নিশ্চল মাতৃস্নেহের অটল ভূমি অদৃষ্ট বিড়ম্বনায় আর আশ্রয় দিতে না চাহে, তবে সে বেদনার আঘাত যে কত বড় তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কি কেহ জানে?

রাজধানীর জ্যোতির্ব্বিদ্ গুরুচরণ জ্যোতির্ব্বিদ্যা-ভূষণের সহিত আমার বিশেষ সদ্ভাব ছিল। তাঁহার নিকট ফলিত জ্যোতিষ শিখিবার প্রয়াস আমি কিছুদিন করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ নিতান্ত সরল ও নিয়ত শুদ্ধাচারী ছিলেন ; তাঁহারই নিকট শুনিয়াছিলাম, এক স্থানে দীর্ঘকাল থাকা আমার কোষ্ঠীর ফল নহে—যৌবন সমাগমের সময় হইতেই আমাকে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে এবং সে ভ্রমণের কবে কোথায় নিবৃত্তি তাহা আমার কোষ্ঠী দেখিয়া নাকি ভাল করিয়া স্থির করা কঠিন। ভাবিলাম কোষ্ঠীর ফল, চতুর্দ্দিকের ঘটনাবলী এবং মনের ভাব যখন এক হইয়া আসিতেছে, তখন গৃহত্যাগ করিতেই হইবে—যাহা করিতেই হইবে তাহার জন্য বৃথা চিন্তা ও কালক্ষেপ করিয়া কোন ফল নাই। স্থির করিলাম, মাতা স্বয়ং আমার বৈদ্যনাথ যাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন, সেই উপলক্ষে বাহির হইয়া পড়িয়া আর ফিরিব না—যেখানে হয় যেমন করিয়া হয় দিন কটাইবার একটা ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিবই। তবে ইঙ্গিতে আভাসে মাতাকে কোনও রূপে সে কথা জানাইতে হইবে, ইহা মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলাম—এদিকে বৈদ্যনাথ যাইবার উদ্যোগ অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল।

আমার সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সময়ে মাতা যেমন যেমন মানসিক করিয়াছিলেন, সে সকলের আয়োজন হইতে লাগিল—স্বাভাবিক বিল্বপত্রের পরিমাণে সোণায় সহস্র বিল্বপত্র প্রস্তুত হইল। মদনমোহনের মৌলী বেষ্টন করিয়া

দিবার জন্য সুবর্ণের মালতী মালা গড়িয়া আসিল, বৈদ্য-নাথের মন্দিরাভ্যন্তরে জ্বলিবার জন্য মৃৎপ্রদীপের অনুকরণে সুবর্ণ দেউটি প্রস্তুত করান হইল, আরও ছোট বড় নানাবিধ আয়োজনে মাতার কক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তীর্থ প্রাপ্তি শ্রাদ্ধ এবং ষোড়শ প্রভৃতি যাহা করিতে হইবে তাহার তৈজস কতক এখানে সংগৃহীত হইল, কতক সেস্থানে সংগ্রহ করিবার আদেশ ও উপদেশ আমাকে দিলেন। আমার সঙ্গে এক জ্ঞাতি খুড়া (তাঁহার নাম মহিমচন্দ্র রায়) যাইবেন, সে ব্যবস্থাও মাতা করিলেন এবং দৈবকার্য্য যাহাতে সুচারু নির্ব্বাহ হয় তাহার সহস্র উপদেশ মহিম খুড়াকেও দেওয়া হইল। আমি দেখি-লাম খুড়া গেলে আমার অভিলষিত গৃহ-ত্যাগের পন্থা সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে, তাই নানা ভাবে তাঁহার যাওয়া রহিত করিবার অশেষ চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মা সে সব কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। অধিক করিয়া বলিবার সাহস হইল না কারণ অন্যের যাওয়া প্রতিবন্ধক হইলে আমার কিছু দুরভিসন্ধি আছে ইহা মাতা ভাবিতে পারেন এবং হয়ত আমারও যাওয়া না ঘটিতে পারে। সেই জন্য কাহারও সন্দেহ উদ্রেক না করিয়া যতদূর বলা যায় তাহাই বলিলাম, কিন্তু তাহাতে খুড়ার যাওয়া বন্ধ হইল না। নিতান্তই খুড়া মহাশয়কে যখন সঙ্গে লইতেই: হইবে, তখন তাঁহার সহিত ভাব করিবার চেষ্টা সুরু করিয়া দিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, পথে একবার বাহির ত হইয়া পড়ি—তারপর "কার খুড়া কে?" দার্জ্জিলিং গৌহাটী প্রভৃতি স্থানে যখন গিয়াছিলাম, তখন খুড়া খুড়ীর কোনও ধার ধারি নাই, এবারে অকস্মাৎ খুড়া মহা-শয়কে সঙ্গে দিবার কারণ কি জানিবার জন্য মন বড় উৎসুক হইয়া উঠিল; চিন্তাও হইল, তবে কি মা আমার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছেন? যাইবার পূর্ব্বে আভাসে ইঙ্গিতে তাঁহাকে জানাইয়া যাইব, এ ইচ্ছা ত আমার মনে ছিলই, তবে যদি আগে থাকিতেই তিনি অনুমান করিতে পারেন, তবে যাওয়ায় বিঘ্ন ঘটাও বিচিত্র নহে,—এ চিন্তা আমার বড় চিন্তা হইয়া দাঁড়াইল। একদিন মা স্নানান্তে চুল শুকাইতেছিলেন, আমি সেখানে আহারে বসিয়াছি, আমার খাওয়া শেষ হইলে তিনি আহ্নিকে যাইবেন ইহাই তাঁহার সেকালের প্রথা ছিল।—আমি আহার করিতে করিতে নানা কথা পাড়িলাম, কত তীর্থ ধর্ম্মের কথা, কত দেশ বিদেশের অভিজ্ঞতার কথা, কত পাহাড় পর্ব্বতে সাধু সন্ন্যাসীর বাস করিবার কথা, তাহাদের অলৌকিক ক্ষমতার গুণে এবং দয়ায় মানুষের আশাতিরিক্ত শুভাদৃষ্টের কথা, আমার মাথা মুণ্ড বকিয়া যাইতে লাগিলাম,—মা কোন কথারই ভাল মন্দ উত্তর করিলেন না। কেবল দেখিলাম, তাঁহার আকর্ণ-বিশ্রান্ত কৃষ্ণতার নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া আছেন! দেখিলাম তাঁহার ইন্দীবরতুল্য নীল নয়নের ঘনকৃষ্ণ পক্ষ্ম অশ্রুভারে অবনমিত হইয়া পড়িতেছে। হঠাৎ এক সময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া, তাঁহাকে অশ্রুমুখী দেখিয়া, আমি নীরব হইয়া গেলাম,—আমার মুখে আর বাক্যস্ফুরণ হইল না। এবং মাতা যে আমার মনোভাব কতক পরিমাণ অনুমান করিয়া নিয়াছেন, সে বিষয় আমার কোন সন্দেহও রহিল না। যে আহারটুকু বাকী ছিল তাহা শেষ করিবার জন্যই শেষ করিলাম, হাত ধুইয়া ধীরে ধীরে নীরবে বাহির হইয়া আমার নির্জ্জন নিঃসঙ্গ কক্ষটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম।

সমস্ত দিন বড় ভাবনায় কাটিল। ভাবিতে লাগিলাম, কি করিয়াছি, কোন্ কথা কখন বিবেচনা না করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছি, কোন্ আচরণ এমন হইয়াছে যাহার জন্য মার মনে এত ব্যথা লাগিল! মনের দৃষ্টি যত দূর যায়, তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, আমার কৃত কার্য্য ও কথিত বাক্যের মধ্যে এমন কিছু পাইলাম না যাহা মার মনোব্যথার কারণরূপে নির্দ্দেশ করা যায়; আষাঢ়ের মেঘভারক্লিষ্ট রোদনো-ন্মুখী দিনটার মতই আমার সারা অন্তরটাও সমস্ত দিন ধরিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া রহিল। বিকালের দিকে

মনের অপ্রসন্নতা আরও বাড়িয়া উঠিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঘোড়া তৈয়ারি করিয়া একবার ভ্রমণে বাহির হইলাম। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছিল, সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া অনেক দূর ঘুরিয়া, সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিবার অনেক পরে বাড়ী ফিরিলাম এবং হাত মুখ ধুইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া অন্দরের দিকে গিয়া দ্বারপ্রান্ত হইতে বড় গলায় হাঁকিয়া কহিলাম, "মা, কিছুই মিঠাই মিষ্টি থাকে ত দাও।" মা ডাকিলেন, "আয়"। সেই একটি মাত্র "আয়"-এর মধ্যে কি অনির্ব্বিন্ন গভীর বিহ্বল স্নেহ ভরা ছিল তাহা সেদিন আমার সমস্ত অন্তরাত্মা জানিতে পারিয়াছিল; তেমন প্রগাঢ় স্নেহের পরিপূর্ণ করুণায় অতুলনীয় "আয়" ডাক আমি আর এক জনের মুখে মাত্র শুনিয়াছি, যে মধুর সোহাগভরা ডাক আজও আমার কাণে বিশ্বের সমস্ত রাগ-রাগিণীর সুধা সঞ্জীবনী নিঙ্ড়াইয়া ঢালিয়া দিতেছে। মাতা একখানি ছোট রেকাবীর উপরে ঘরের তৈয়ারি কিছু মিষ্টান্ন লইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং আবার ডাকিলেন, "আয়"। আমি নিকটে গেলে তাঁহার বাম বাহু দিয়া আমার কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বুকের মধ্যে আমাকে টানিয়া নিলেন, তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্ত দিয়া আমার সারা দিনের চিন্তাক্লিষ্ট ললাট স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "ক্ষিদের অপরাধ কি বল্, ওবেলা ভাল করে খাস্‌নি, তার উপর আবার ঘোড়া দৌড়ালি, আর এই মিষ্টিটুকু খেয়ে জল খা, রাত্রের খাবার আজ একটু সকাল সকাল দিতে বলব—কেমন?" এই বলিয়া রেকাব খানি আমার সম্মুখে রাখিলেন এবং মিষ্টান্নের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া আমার মুখের নিকট ধরিলেন। আমি বুঝিলাম, আমার ক্ষুধায় মিষ্টান্নটুকু তিনি স্বহস্তে আমাকে খাওয়াইয়া দেন ইহাই তাঁহার পরম স্নেহময় মাতৃ-হৃদয়ের সেই মুহূর্ত্তের ইচ্ছা। এই খাওয়া ও খাওয়ানর মধ্যে যে কি সুখ কি গভীর তৃপ্তি নিহিত আছে তাহা সেই জানে, যাহার অদৃষ্টে এমন করিয়া খাওয়ার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে।

যখন কলেজ ক্লাসে পড়ি, তখন বয়স আমার যথেষ্টই হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি বিদ্যালয়ের অবকাশে যখন বাড়ী আসিতাম, মা দুই সন্ধ্যায় নিজ হাতে আমায় এমনই করিয়া খাওয়াইয়া দিতেন এবং উচ্ছলিত স্নেহের আবেগে হাসিয়া কাঁদিয়া বলিতেন, "ওরে সেখানে তোর একদিনও খাওয়া হয় না, বিদেশে কে তোকে খাইয়ে দেবে, নিজের হাতে তোর খাওয়া অভ্যাস ত আজও হয়নি; তুই যে আজও মাছের কাঁটা বাছতে শিখিসনি রে।" মাছের কাঁটা ছাড়াইতে শিখিয়াছি কি না সে কথার সত্যাসত্য এখানে বিচার্য্য নহে, এখানে চক্ষু ভরিয়া দেখিবার এবং প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিবার সমগ্রী, এই মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-রসে কাঙ্গাল প্রাণের অমৃত-তর্পণ। অপার স্নেহের অসীম আবেগে স্নেহময়ী যখন স্নেহাস্পদের পরিচর্য্যার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন, সেই ব্যাকুলতার সম্মুখে সর্ব্ব প্রকারে নিজকে নিতান্ত অক্ষম সাজাইয়া স্নেহ হস্তের সকল প্রকার সেবা গ্রহণের মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রহিয়াছে, তাহা সেই জানে যে সে আনন্দ সমস্ত মন প্রাণ অন্তর দিয়া একদিনও অনুভব করিয়াছে। এই দুঃখ দৈন্য শোক সন্তাপ ক্ষোভ ক্ষতি পরিপূর্ণ ধূলার ধরায় এমন সুখময় মুহূর্ত্ত জীবনে বহুবার আসে না, যখন আসে তখন এক নিমেষে বহু দিনের সঞ্চিত অনাদরের বেদনা বিলুপ্ত করিয়া দেয় এবং ভবিষ্যৎ দুঃখ-দিনের বিষশল্যের ব্যথার মধ্যে এই আনন্দের স্মৃতি—দুর্ব্বৎসরে দুর্গোৎসবের মত হৃদয়তলে চির-জাগরূক রহিয়া যায়।

মায়ের হাতে মিষ্টিটুকু সব নিঃশেষে খাইয়া ফেলিলাম। তিনি জলের গ্লাটসাও মুখের কাছে ধরিলেন এবং নিজ হাতে মুখ ধোয়াইয়া তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলে আমার মুখ মুছাইয়া দিলেন।

কলেজ ছাড়িয়া যখন হইতে গৃহে আসিয়া বসিয়াছি তদবধি এ সৌভাগ্য আমার কপালে ঘটে নাই। আজ বহুদিন পরে মায়ের কোলে আবার শিশু সাজিয়া আমার চিন্তাক্লিষ্ট মন এবং দুঃখ পীড়িত হৃদয় কি আরাম

অনুভব করিল তাহা কি একমুখে বলিয়া শেষ করিতে পারি? ঠিক আমার মনে হইতে লাগিল যেন পুরাতন শৈশব আবার ফিরিয়াছে, বিষকুম্ভ পয়োমুখ কুচক্রিগণের বিষোদ্গিরণে ভাবিয়াছিলাম, নিরপরাধে তাঁহার মন বুঝি আমার উপর নিতান্তই বিরূপ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার স্নেহাশ্রিত এই অকিঞ্চন বুঝি জীবনে আর তাঁহার স্নেহ-বিটপীর শীতল ছায়ায় বসিয়া তাহার তাপতপ্ত জীবন জুড়াইবার অবসর ও সুযোগ পাইবে না। আজ সন্ধ্যায় বুঝিলাম ইহা আমার ভ্রান্ত ধারণা—সরীসৃপ প্রকৃতির জঘন্য জনে যতই কুমন্ত্র তাঁহার কাণে দিকনা কেন, তাঁহার হৃদয়ের অফুরন্ত স্নেহ-ভাণ্ডার হইতে এ অকিঞ্চনের প্রাপ্য অংশ কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না। আমার মনঃকল্পিত অস্নেহের সন্দেহে কিছুদিন ধরিয়া আমি বড় দুঃখই পাইতেছিলাম। স্বীয় জননীর স্নেহ ক্রোড়-বিচ্যুত আমি, এখানকার সেহনীড় টুকুও বুঝি জন্মশোধ হারাইলাম ভাবিয়া হৃদয়ের মধ্যে বড় যাতনাই অনুভব করিতেছিলাম; কিন্তু আজ সন্ধ্যায় তাঁহার স্নেহ বিগলিত মাতৃকণ্ঠের এই একটা মাত্র "আয়" ডাকে দীর্ঘ অনাদরের দারুণ দুঃখ, বিষম ব্যথা, নিবিড় বেদনা—সমস্তই এক মুহূর্ত্তেই দূর হইয়া গেল।

মার আদেশমত দাসী গিয়া দেখিয়া আসিয়া জানাইল, রান্না হইতে অধিক বিলম্ব নাই। মা কহিলেন, "তবে আর এখন বাহিরে গিয়া কাজ নাই, এখানেই একটু বস, একেবারে খেয়ে যাস্ এখন।" আমি সেইখানে বসিয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিলাম। সেখানে অপরাপর আত্মীয়া-কুটুম্বিনীর দল যাঁহারা ছিলেন, একে একে প্রায় সকলে উঠিয়া কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেলে আমি ধীরে ধীরে মাকে বলিলাম—"মা, তোমাকে দুঃখ দিবার একটি পাপ সঙ্কল্প কিছুদিন যাবৎ আমার মনে আসিয়াছিল, আজ তাহা দূর হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সে কথা তোমাকে ভাঙিয়া না বলিলে আমার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। যদি আদেশ কর তবে বলি।" মা কহিলেন, "এমন কি কথা রে, আচ্ছা বল্‌না শুনি।" আমি ধীরে ধীরে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সব কথা তাঁহাকে বলিলাম—রাজধানীর বৃদ্ধ মন্ত্রীবর্গের মধ্যে কেহ কেহ যে, আমার বিষয়-কার্য্যে অমনোযোগের দুষ্ট কারণ দেখাইয়া, আমার উপরে মাতার মন বিরূপ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, সেই হইতে আরম্ভ করিয়া আমার গৃহত্যাগের সঙ্কল্প পর্য্যন্ত সমস্ত কথা তাঁহার নিকট একে একে প্রকাশ করিলাম।—তিনি নীরবে ধৈর্য্যের সহিত সমস্ত কথা শুনিয়া গেলেন, আমার কথা শেষ হইয়া গেলে যখন আমার মুখের দিকে চাহিলেন, দুঃসহ অন্তর বেদনার চিহ্ন তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রীর মধ্যে আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম,—আরও দেখিলাম, তাঁহার স্নেহবিগলিত করুণ নয়ন অশ্রুজলে ভরিয়া উঠিয়াছে। তিনি মনোবেগ যথাসম্ভব সম্বরণ করিয়া গিয়া, আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি চৌদ্দমাস বয়সে আমার কোলে আসিয়াছ, আমার বুকের মধ্যে থাকিয়াই আজ বিশ বৎসর দেহে মনে বাড়িয়া উঠিতেছ, তোমার মনোভাব আমি সম্পূর্ণ না বুঝিলেও কতক পরিমাণে অনুমান করিতে পারিব, ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে;—স্থির বুঝিতে পারি আর নাই পারি, কিছুদিন যাবৎ তোমার প্রতি কার্য্যে, প্রতি পাদক্ষেপে তুমি যে মনের মধ্যে এক প্রকার বেদনা পোষণ করিয়া দিন কাটাইতেছ, তাহা বুঝিতে আমার বাকী নাই;—ভাল করিয়া আহার কর না—ইহা আমার চক্ষু এড়াইয়া যায় নাই; দাসদাসীর নিকট সংবাদ লইয়া জানিয়াছি, সকল দিন রাত্রে ভাল করিয়া নিদ্রা যাও না, এই সকল অনিয়মে কয়বার সঙ্কট পীড়ায় তোমার প্রাণ লইয়া যমের সহিত টানাটানি করিতে হইয়াছে; সবই আমি জানিতাম, কিন্তু কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া আমায় নিদারুণ বেদনা দেওয়া তোমার প্রকৃতিতে সম্ভব! বালক স্বভাবের দোষে বন্দুকের গুলির আঘাতে ক্ষুদ্র একটি পাখী মারিয়া নিজে কত অশ্রুপাত করিয়াছ একবার ভাবিয়া দেখ, সেই

হইতে শীকার ত্যাগ করিয়াছ, আর মাতৃহত্যার ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিতে হৃদয়ে কি তোমার ব্যথা বাজিল না বাবা? এই কি রাজ-বিচার! তুমি আমার কত স্নেহের সামগ্রী তাহা মুখে বলিয়া আর কি জানাইব! তুমি আমার কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছ, নিদারুণ দুঃখের দিনে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া কত আশ্বাসে বুক বাঁধিয়াছি, আমার নাম-মাত্রাবশিষ্ট. সংসারের ভবিষ্য সুখের কত উজ্জ্বল কল্পনা চক্ষুর সম্মুখে আঁকিয়া কত ধৈর্য্যে দিন কাটাইয়াছি তাহা আর কি বলিব? যেখানে স্নেহ আছে, সেখানে অভিমান থাকিবেই বাবা, উহা কিছু বিচিত্র নহে; তবে কোন কারণেই স্নেহের উপর নিদারুণ আঘাত করিয়া, উহাকে হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া স্নেহশীলকে নিরুপায়-ভাবে যমের হাতে সঁপিয়া দেওয়া কি স্নেহের ধর্ম্ম, না ন্যায়-বিচার? বাবা, তুমি লেখাপড়া শিখিয়াছ, জগতের সব কথাই বুঝিবার মত বয়স ঈশ্বরেচ্ছায় তোমার হইয়াছে, যাহাই কর—বিচার করিয়া করিও। স্বার্থপর লোকে সংসারে নানা কথাই কহিয়া থাকে সত্য, কিন্তু ভিতরের কথা, অন্তরের পরম বার্ত্তাটি কেহই জানে না। স্বার্থের কথায় বিচলিত হইয়া কিম্বা প্রবলের রক্তনয়ন বা তাড়ন-পীড়নে স্নেহ-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা, স্নেহশীলের পরোক্ষে মৃত্যুর ব্যবস্থা করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইতে পারে না, ইহা নিশ্চিত জানিও। লোকের কথায় যথার্থ স্নেহের স্বরূপ বিরূপ হইয়া যায় না ইহা বিশ্বাস করিও এবং যথার্থ স্নেহ যেখান হইতেই আসুক, উহা উপেক্ষার বস্তু নহে, এ ধারণা তোমার যেন চিরদিন থাকে।—আর আমার কিছুই বলিবার নাই।" কথা শেষ করিয়া মা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; আমি কি করিব, কি বলিব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না;—এমন অকৃত্রিম স্নেহকে সন্দেহ করিয়া অপমানিত করিয়াছি ভাবিয়া, নিজের উপর কি ধিক্কার জন্মিল সে কথা বলিবার ভাষা নাই। আমিও নিঃশব্দে মাতার আরও নিকটে সরিয়া গিয়া তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া নীরব হইয়া রহিলাম। এই নীরবতার মধ্যে মাতা পুত্রের অশ্রুজলে উভয়ের হৃদাকাশের অন্ধকার-কালিমা ধৌত হইয়া গেল, প্রসন্নতার পূর্ণচন্দ্রোদয়ে হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল;—গৃহত্যাগের সঙ্কল্প মন হইতে দূর করিয়া দিলাম।

জননী দেবী আমার শীকার পরিত্যাগের উল্লেখে যাহা কহিলেন, সে সম্বন্ধে একটু টীকা আবশ্যক। আগেকার দিনে পল্লীগ্রামের ভদ্রসন্তানকে বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক ঘোড়ায় চড়া বন্দুক ছোঁড়া প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত, বিশেষ রাজা মহারাজার পক্ষে ঐ সকল বিদ্যা শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনই ছিল। প্রথানুসারে অমাকেও সে সকল শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। বন্দুক ছোঁড়া এবং অশ্বারোহণে আমি বিশেষ পটুই হইয়া উঠিয়াছিলাম। বন্দুকের লক্ষ্য স্থির করিতে অনেক গুলি ও বারুদ ধ্বংস করিয়াছি। দক্ষিণস্কন্ধের নিম্নভাগে বন্দুকের কুঁদা চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ চক্ষু দিয়া শীকারের প্রতি লক্ষ্য করিতে হয় ইহাই সনাতন প্রথা। আমি প্রথমে তাহাই আরম্ভ করি; কিন্তু বিধি বিড়ম্বনায় বাল্যেই আমার দক্ষিণ চক্ষু দৃষ্টিহীন হয় সুতরাং সনাতন প্রথায় আমি অভ্রান্ত লক্ষ্য গোলন্দাজ বা বন্দুক-বাজ হইয়া উঠিতে পারি নাই। আমার সঙ্গে যাহারা বন্দুক ছোঁড়া শিক্ষা আরম্ভ করিল তাহারা তাহাতে দক্ষ হইয়া উঠিল; আমার দশটার মধ্যে চারিটা গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বিপথে যায় দেখিয়া আমি নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিতাম। রাত্রে অনেক সময়ে চিন্তা করিতাম কিসে এই ত্রুটী সংশোধন হইবে। এক-দিন রাত্রে মনে হইল, বামহস্তে বন্দুক ধরিয়া বাম চক্ষুদ্বারা লক্ষ্য স্থির হয় কিনা পরীক্ষা করিব। পর দিবস প্রাতে পরীক্ষা আরম্ভ হইল। দেখিলাম পূর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য অনেক স্থির হইয়া আসিতে লাগিল। কিছুদিন ঐরূপ করিবার পরে আমি অভ্রান্তলক্ষ্য শীকারী হইয়া দাঁড়াইলাম। ডান হাত দিয়া গুলি ছোঁড়া পূর্ব্বেই একরূপ অভ্যাস হইয়াছিল, বামহাতে অভ্যাস করিবার

পর হইতে আমি সঙ্গীদিগের দ্বারা সব্যসাচী নামে অভিহিত হইলাম। সেদিনে বন্দুক প্রায় সর্ব্বদাই হাতে থাকিত এবং সময়ে অসময়ে তাহার বিশাল শব্দে পল্লীর শান্তিদেবী সেথান হইতে কাঁদিয়া বিদায় লইলেন। একদিন আমার এক সঙ্গী বলিল, "মহাশয়, একটি 'ছর্‌রা' 'কার্‌তুসে' ভরিয়া তদ্বারা খঞ্জন মারিতে পারেন ?" আমি গর্ব্বভরে কহিলাম "পারি।" অনুষ্ঠান প্রস্তুত হইতে ক্ষণবিলম্ব হইল না। পূজার অব্যবহিত পরে আমাদের দেশে খঞ্জনও প্রচুর পাওয়া যায়। প্রভাতের সুস্নিগ্ধ সমীরণে পুলকিত-প্রাণ ক্ষুদ্র খঞ্জন চারিদিকে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে, গর্ব্বান্ধ আমি হস্তস্থিত বন্দুক উঠাইয়া সেই ক্ষুদ্রকায় নৃত্যপর শকুন্তের উপর বজ্রবাণ নিক্ষেপ করিলাম ; শতভাগে বিভক্ত হইয়া ক্ষীণ পক্ষীশাবকের প্রাণ পঞ্চভূতে মিশাইয়া গেল। নিজেকে ধরাব সৌন্দর্য্য অপহারী দস্যু বলিয়া সেদিন মনে হইল। আর একদিন আর একটি ব্যাধবৃত্ত সঙ্গীর প্ররোচনায় ছায়াশীতল আম্রকুঞ্জের ঘন-পল্লবাচ্ছন্নকায় কোকিলকে লক্ষ্য করিয়া শব্দভেদী গুলি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। অনতিবিলম্বে আম্রমঞ্জরীর রসকষায়-কণ্ঠ প্রিয়া-সমাগম-সমুৎসুক সুধাসঙ্গীতপর পরভৃৎ আমার পাদমূলে আসিয়া লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। আমি সেই দিন হইতে শপথ করিয়া এই ব্যাধবৃত্তি ত্যাগ করিলাম। প্রতিজ্ঞা করিলাম যে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তু বা তদ্রূপ কোন মানবপশুর হস্ত হইতে আত্ম-রক্ষার্থ ব্যতীত আর বন্দুক ধরিব না। হংস ময়ূর কোকিল সমূহে হিংসা এবং কাকে বহু আদর সংস্কৃত কবি নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। সেই দুষ্কার্য্য আমাদ্বারা সাধিত হইল দেখিয়া সেদিন মনে কি ধিক্কার জন্মিয়াছিল, এবং নিজকে সেজন্য কত লাঞ্ছিত করিয়াছি তাহা আমিই জানি।

জ্যোতির্ব্বিদের গণনানুযায়ী বৈদ্যনাথের পূজা দিবার জন্য যাওয়ার নির্দ্ধারিত দিন আসিল। পূজার দ্রব্যসম্ভার সাজাইয়া মাতা কখন কি করিতে হইবে, সে সমস্ত কথা বারম্বার করিয়া আমায় বুঝাইয়া দিলেন, কোথাও কোন ত্রুটি না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য আমাকে পুনঃ পুনঃ আদেশ ও উপদেশ দিতে লাগিলেন। যাত্রার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আমাকে নিভৃতে ডাকিয়া নিয়া দুই হাতে আমাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন, নীরবে তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া মুক্তা-ফলের ন্যায় নির্ম্মল স্নেহের পবিত্র অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।—আমি বুঝিলাম এ নীরব রোদনের কারণ কোথায় ; আমি অবনত মস্তকে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে প্রণাম করিলাম ; তাঁহার চরণ-কমলের রেণুকণা মাথায় স্পর্শ করিয়া অশ্রুরুদ্ধ বিনম্রকণ্ঠে বলিলাম,—"মা, তুমি নিশ্চিন্ত থাক—শুধু গৃহত্যাগ কেন, আমি স্বেচ্ছায় জীবনে এমন কোন কাজই করিব না যাহাতে কোন দিন তোমার মনে আঘাত লাগিতে পারে। স্বার্থান্ধের দল যাহাই কেন বলুক না, আমি বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, শঙ্কর নহি সত্য, কিন্তু আমি মানুষ, তোমার শ্বশুর এবং স্বামীর রাজকোষস্থিত অর্থে যেটুকু লেখাপড়াই আমি শিখিয়াছি তাহাতে এ জ্ঞানটুকু হইয়াছে যে, অকৃত্রিম স্নেহকে কাঁদাইবার মত পাপ জগতে আর কিছুই নাই ; সে পাপ আমি জীবনসত্ত্বে পারত পক্ষে করিব না মা, ইহা তুমি নিশ্চিতরূপে জানিও এবং আজ তোমার সম্মুখে গর্ব্ব করিয়া বলিতেছি যে, যে বিষয় সম্পদ লইয়া 'রাজর্ষি' রামকৃষ্ণ, 'ভবানীর' সহিত বিরোধ করিয়াছেন, বৈষ্ণবচূড়ামণি 'বিশ্বনাথ' যে বিবাদ পরিহার করিতে পারেন নাই, এই রাজবংশে যে কলহ পূর্ব্ববর্ত্তী কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, তোমার আশীর্ব্বাদে এবং ভগবানের কৃপায় তোমার স্নেহ-পালিত পুত্র জগদিন্দ্র সে কলঙ্কে লিপ্ত হইবে না,—জীবন গেলেও না—স্বর্গের সকল দেবতাকে স্মরণ করিয়া এবং আমার প্রত্যক্ষ দেবতা তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই কথা বলিলাম—মা আশীর্ব্বাদ করিও, পুত্রের এ গর্ব্ব যেন ক্ষুণ্ণ না হয়।" তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন এবং আমার গর্ব্বোন্নত মস্তক আজও অবনত হয় নাই—মাতৃসন্নিধানে আমার সেই প্রতিজ্ঞা আমি প্রতিবর্ণে

পালন করিয়াছি। দীনদরিদ্রের সন্তানকে যে স্নেহময়ী বুকে টানিয়া লইয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করেন, ভিখারীর মাথায় যিনি রাজমুকুট পরাইয়া রাজাধিরাজের সমস্ত সম্পদে, সমস্ত গৌরবে মণ্ডিত করিয়া তোলেন, সেই পরম করুণাময়ী দেবীরূপার সহিত সামন্য বিষয়ের চুলচেরা হিসাব নিকাশ লইয়া বিবাদ করা সম্ভব হইতে পারে ইহা আমার কল্পনারও অতীত।

যাত্রার শুভক্ষণ আসিল। জ্ঞাতি খুড়া মহিমচন্দ্র সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন মানুষ; সেইজন্য মাতা আমার সঙ্গে তাঁহাকেই বৈদ্যনাথে পাঠানো সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ীর সমস্ত দৈবকার্য্য, শ্রাদ্ধ শান্তি, ব্রত নিয়ম প্রভৃতি যাবতীয় অনুষ্ঠানের পরিদর্শক তিনিই ছিলেন এবং আজও আছেন।—মা খুড়াকে ডাকিয়া ও বারবার করিয়া সমস্ত উপদেশ দিয়া দিলেন, বলিলেন, "একবার বাবার ওখানে স্বয়ং পূজা দিতে যাইতে দিই নাই, সেজন্য আমার খোকাকে পায় হারাইতে বসিয়াছিলাম, দেখিও এবার পূজায় কোন বিঘ্ন যেন না হয়, বাবার চরণে সেবাপরাধের জন্য যেন বাছাকে আমার আর কোন কষ্ট পাইতে না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিও।"

খুড়া সাধ্যানুসারে কোন ক্রুটী হইবে না এই কথা জানাইয়া মাকে প্রণাম করিল, আমিও পুনরায় মাতার পাদ-বন্দনা করিয়া, গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরকে উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে যাইবার জন্য গাড়ীতে গিয়া বসিলাম। আগে গৃহত্যাগের সঙ্কল্প মনে ছিল, তাই মহিম খুড়ার সঙ্গে যাওয়াটা আমার মোটেই পছন্দ হয় নাই; এখন সে সঙ্কল্প মনে নাই, সুতরাং মহিমেরও আমার বিষ-নয়নে পড়িবার কোন হেতু নাই—বরং পূজা অর্চ্চনায় যাহা কিছু করিতে হইবে, সব দায়িত্ব মহিমের স্কন্ধে পড়িল দেখিয়া আমি নিশ্চিন্ত মনে হাঁপ ছাড়িলাম; টাকাকড়ি যাহা লাগিবে সে সব হিসাব পত্র করিয়া মহিমের হাতেই দেওয়া হইয়াছে; কার্য্যান্তে ফিরিয়া হিসাব নিকাশ জমা খরচের জন্যও সেই দায়ী হইবে, আমাকে কিছুই করিতে হইবে না ভাবিয়া, আমার আনন্দের আর সীমা রহিল না। স্কুল কলেজে পড়িবার সময়ে অঙ্ক দেখিলে আমার জ্বর আসিত, যাহার মধ্যে গণিত শাস্ত্রের 'গ' পর্য্যন্ত আছে তাহা আমার দুই চক্ষের বিষ, জমা খরচ রাখা আমার এক মহামারী ব্যাপার। সে কার্য্য মহিমচন্দ্র করিবেন, টাকা খরচ করিবার সুখভোগ করিব আমি, এমন আনন্দ জগতে দুর্লভ সামগ্রী—আজ সেই দুর্লভ আনন্দে আমার সমস্ত বুক ভরিয়া গিয়াছে। একে নূতন দেশ দেখিব তাহার উপর অঙ্ক কষিয়া জমা ও খরচের হিসাব ঠিক রাখিতে হইবে না—আঃ কি আরাম! আরাম "চির পুরাতন ভৃত্য" নবীন আমার সঙ্গে ছিল একথা বলাই বাহুল্য। পাবনা জেল'র কাশীনাথপুরের শ্রীযুক্ত অভয়নাথ রায় সম্পর্কে আমার মাতুল (খুড়ীমার ভাই); আমরা রাজসাহীতে বালককাল হইতে একসঙ্গে এক স্কুলে পড়াশুনা করিয়াছি এবং খেলা ধূলা ব্যায়াম কুস্তি জিমন্যাষ্টিক্ প্রভৃতিতে আমরা দুইজনেই সমান পারদর্শী ছিলাম, সুতরাং সম্পর্কের অতিরিক্ত বান্ধবতাও আমাদের উভয়ের মধ্যে পরিপুষ্ট লাভ করিয়াছিল; বৈদ্যনাথে যাইবার সময় তিনিও আমার সঙ্গে ছিলেন। ব্যায়াম চর্চ্চার ফলে মাতুল অভয়নাথের দেহ সুন্দর সুঠাম ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল—শরীরের যেখানকার যে পেশী মাংস স্নায়ু যেরূপভাবে বর্দ্ধিত হওয়া উচিত ইহাঁর তাহাই হইয়াছিল—অনাবৃত দেহে ইহাঁকে দেখিলে গ্রীসের ভাস্কর্য্য কবি-কল্পনা মনে হইত না। মনে আছে রাজসাহী কলেজের জিমন্যাষ্টিক্ পরীক্ষায় এক-বৎসর ব্যায়াম এবং "বারবাজী"র পারিতোষিকের অতিরিক্ত একটি সুবর্ণ পদক মাতুল অভয়নাথ তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথোপযুক্ত পরিবর্দ্ধনের বলে পাইয়াছিলেন। হরিদাস এবং নিত্যানন্দ জিম্‌ন্যাষ্টিকের "বারবাজী"তে আমাদের অপেক্ষা অধিক পারদর্শী ছিল, কিন্তু ব্যায়াম-জনিত দেহের গঠনের উন্নতিতে এই "মামা ভাগিনেয়"কে পরাস্ত করা সেদিন কাহারও পক্ষে সহজ ছিল না। কেবল মাত্র আকারের গৌরব নহে, এ যে দিনের

কথা সেদিনে আমাদের উভয়েরই শরীরে অসম্ভব রকম সামর্থ্য ছিল; তৎকালে আমি উপর্য্যুপরি দুই তিনবার কঠিন পীড়ায় পড়িয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিলাম।

অভয়নাথ সঙ্গে যাইবেন শুনিয়া মা যেন একটু খুসীই হইলেন মনে হইল; কারণ তাঁহার পুত্রকে তিনি কোনদিনই নিতান্ত নিরীহ প্রাণী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না এবং গৌহাটী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে কাউনিয়া ঘাটের খালাসীর সহিত তাঁহার পুত্রের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের কথা নবীনের নিকট হইতে অবগত হইয়া অবধি 'রাস্তায় পথে' তাঁহার পুত্র কখন কি করিয়া বসে ভাবিয়া তিনি কিছু উদ্বিগ্ন থাকিতেন। সঙ্কট-জনক পীড়ায় এবার মরণাপন্ন হইবার পরে শরীরের রোগ আরাম হইয়া গেলেও শরীর পূর্ব্ববৎ তখনও বলিষ্ঠ হয় নাই, রেলপথে সাহেব সুবা, গোরা কাবুলি প্রভৃতির সহিত বিবাদ বিসম্বাদ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে—মাতা ইহা বিলক্ষণ জানিতেন, সুতরাং বলিষ্ঠ অভয়নাথ সঙ্গে থাকিবে শুনিয়া মাতার একটা বিষম ভাবনা যেন কাটিয়া গেল।

একটানা বৈদ্যনাথে না গিয়া যাইবার পথে বর্দ্ধমানে নামিয়া রাজধানী ও 'গোলাপবাগ' দেখিয়া যাইব মনস্থ করিয়াছিলাম এবং সে কথা মাতাকে জানাইয়া তাঁহার আদেশও লইয়াছিলাম। নাটোর হইতে ডাকগাড়ীতে (Darjeeling Mail) রওনা হইয়া নৈহাটী ষ্টেশনে আমরা নামিলাম, সেখানে গঙ্গায় স্নান এবং মুদীর দোকানে আহার করিয়া অপরাহ্নের Passenger trainএ আমরা বর্দ্ধমানে রওনা হইলাম। এবারে সুপকারের কর্ম্ম আমাকে করিতে হয় নাই; খুড়া মহিমচন্দ্র ত সঙ্গে ছিলেনই, তদুপরি "তিন পুরুষে' পুরাতন পাচক ঈশান-চন্দ্র হাজরা ওরফে আমাদের 'ঈশানদা'কে মা সঙ্গে দিয়াছিলেন। বুদ্ধি বাড়িয়া অবধি আমি এই ঈশান-দাকে দেখিতেছি এবং এই প্রাচীন সুপকারের হস্ত-পক্ক অন্নব্যঞ্জনে ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট বালক জগদিন্দ্র বলিষ্ঠ যুবা জগদিন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। এই পাচকপুঙ্গব রন্ধনে দ্রৌপদী এবং আকারে বিরাটের বিরাটবপু 'বল্লভ' সুপকারের প্রতিদ্বন্দ্বী। শুনিয়াছি বিষ্ণুপুরে বর দেখিতে আসিলে যে বরের সম্বন্ধে "চাঁপাইছেঁ কি নামঁাইছে" বলা যায় সে পাত্র অতি সুপাত্র—আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে,আমাদের এই 'ঈশানদা'র সম্বন্ধে সে কথা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলা যাইতে পারে। অর্দ্ধঘণ্টা সময়ের মধ্যে যদি যজ্ঞের ভোজ রাঁধা কাহারও পক্ষে সম্ভব হয়, তবে একমাত্র ঈশানের পক্ষেই তাহা সম্ভব। এই ঈশানচন্দ্রের আর একটি গুণ ছিল, বালকবালিকার পিতামাতাতেও যে আদর যে যত্ন নিজ নিজ সন্তান সন্ততির জন্য করিতে বিরক্ত বোধ করে, ঈশানচন্দ্র সেই আদর সেই যত্ন করিয়া সকলকে ভোজন করাইত—নিদ্রিত বালকবালিকাকে মায়ের মত কোলে বসাইয়া আহার করাইয়া তবে সে নিজে একমুষ্টি অন্নগ্রহণ করিত—বাড়ীতে একজনও অভুক্ত থাকিতে ঈশান আহার করিত না। এহেন ঈশান এবার আমার সঙ্গে; সুতরাং রন্ধন এবং ভোজনের কোন ভাবনাই আমাকে ভাবিতে হয় নাই।

রাত্রি নয় দশটার সময়ে বর্দ্ধমান ষ্টেশনে গাড়ী পঁহুছিল—সেখানে জনমানব আমাদের কাহারও পরিচিত ছিল না; Dak Bungalow আছে কিনা জানা নাই, থাকিলেও সাত্ত্বিক মহিম খুড়া সেখানে যাইবেন না, ভাড়ার বাসা মিলে কিনা জানি না; তত রাত্রে বাসা খুঁজিয়া বেড়ানও সহজ নহে। সেদিন এ বয়সের অগ্নি-মান্দ্য জন্মে নাই, দ্বিপ্রহরের সামান্য আহার কোন্‌কালে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, জঠরাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে; বুদ্ধি করিলাম ভাড়াগাড়ীর গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়া বাসা ভাড়া পাওয়া যায় কিনা জানিয়া লইব, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমরা দুই মাতুল ভাগিনেয় বর্দ্ধমানের ভারত-বিখ্যাত মিহিদানা ও সীতাভোগের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ষ্টেসনের প্লাটফরমে যেমন "সীতাভো-ও-ও-গ" বলিয়া হাঁকিল, আমরাও উভয়ে সমস্বরে হাঁকিলাম 'এদিকে'। ফেরিওয়ালা কালবিলম্ব করে নাই—সে কথা বলাই বাহুল্য এবং আমরাও কাল

বিলম্ব করি নাই—এ কথা যিনি এতক্ষণও বুঝেন নাই তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির উপর আমার আস্থা কোন দিনই জন্মিবে না।

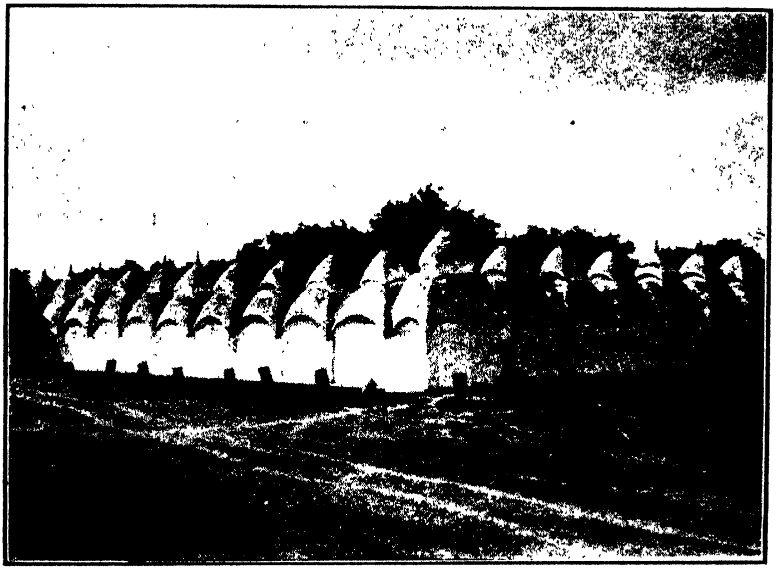
সীতাভোগের দ্বারা জঠরাগ্নির 'ভোগ' দিয়া আমি ও মাতুল এক ঠিকা গাড়ীর গাড়োয়ানকে পাকৃড়া করিলাম এবং ভাড়ার বাড়ী দেখাইয়া দিবার জন্য তাহার গাড়ী ভাড়া করিলাম। ষ্টেশনের waiting roomএ জিনিষপত্রসহ নবীন ও খুল্লতাত মহিমকে রাখিয়া আমরা গাড়োয়ানের সঙ্গে চলিলাম। রাত্রের অন্ধকারে সে কোন্ পথ দিয়া কোথায় লইয়া গেল বুঝিতে পারিলাম না। তখনকার দিনে রাস্তায় আলোর ভাল বন্দোবস্ত হয় নাই। দুই চারিটা বাড়ীও দেখিলাম, বাড়ী যদিও বা পছন্দ হয় কিন্তু মহল্লা (পল্লী) এবং মালিক পছন্দ করা কিছু কঠিন—আমরা ঘণ্টা দুই এরাস্তা ওরাস্তা ঘুরিয়া ষ্টেশনে ফিরিলাম। যে স্থানে যে মালিকের যেমন বাড়ী পাওয়া যাইতে পারে খুল্লতাত মহিমচন্দ্রকে সমস্ত কথা খোলসা বলিলাম—শুভ্র-উপবীতধারী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ মহিমচন্দ্র সে সকল বাসা "ভালবাসা নহে"—এই মত প্রকাশ করিলেন। Waiting Roomএ রাত্রি কাটানো যাইতে পারে, বাসার মত সংসার পাতিয়া বসা কঠিন হইবে জানিয়া গাড়োয়ানের পরামর্শে সে রাত্রে ষ্টেশনের নিকটস্থ এক মুদীর দোকানে ভোজন এবং শয়নের ব্যবস্থা করাই আমরা স্থির করিলাম। জিনিষপত্র সহ নবীন ঈশান এবং মহিমকে সঙ্গে লইয়া মুদীর শরণাপন্ন হইলাম। চাল ডাল নুন্ মশ্‌লা কৃত্তিবাস এবং কাশীদাস পরিবৃত মুদী আমাদিগকে ব্রাহ্মণ জানিয়া ভক্তিভরে প্রণত হইল, চারি আনার মাল একটাকায় বিক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণ-সেবার পুণ্য অর্জ্জন করিল, এবং যে ঘরখানি আমাদিগকে রন্ধন উপবেশন এবং শয়নের জন্য ভাড়া দিয়াছিল, তাহার প্রান্তস্থিত বাঁশের মাচা দেখাইয়া তাহাতে বিছানা পাতিয়া বিশ্রামের উপদেশ বিনা মূল্যেই দিল। পুরাতন ভৃত্য নবীনচন্দ্র বাঁশের মাচায় বিছানা পাতিয়া দিল, মাতুল এবং আমি সেই শব্দায়মান জীর্ণ মাচায় অঙ্গ ঢালিয়া দিলাম, খুল্লতাত মহিম দিনের খরচ লিখিয়া রাখিতে মনোনিবেশ করিলেন, ঈশানচন্দ্র চাল ডাল একত্র এক হাঁড়ীতে এবং আলুর তরকারী আর এক হাঁড়ীতে "চাঁপাইয়া" বিষ্ণুপুরের মুখ উজ্জ্বল করিবার মানসে অত্যল্প সময়ের মাধ্য "নামাইবার" চেষ্টা দেখিতে লাগিল। যে অবস্থায় লোকে বাঁশের মাচায় আরোহণ করে সে অবস্থায় এ মাচায় শয়ন করিলে ক্ষতি ছিল না; কিন্তু জীবন্তের চতুর্দ্দশ পুরুষের সাধ্য নাই যে, বর্দ্ধমানের সেই মুদীর মাচায় তিলার্দ্ধ তিষ্ঠিতে পারে। রাজা পরীক্ষিত সেদিনে জীবিত থাকিলে এবং ঐ মাচায় শয়ন করিলে তাঁহাকে বলিতে হইত বর্দ্ধমানের ছারপোকা ও মশকের নিকট তক্ষক দংশনকেও হার মানিতে হয়।

ক্ষুধা মশক ও ছারপোকার জ্বালায় উঠিয়া পড়িলাম। ঈশানচন্দ্রকে তাগাদা করিয়া কাঁচা খিচুড়িই নামাইয়া জঠরাগ্নিতে আহুতি দেওয়া গেল এবং ভাবিলাম মুদীর দোকানের মাচার আশ্রয় সে রাত্রের মত ত্যাগ করিয়া নিজের বিছানা মেজেতে পাতিয়া রাত্রি যাপন করিব। মহিমখুড়ো সে আশায় বাদ সাধিলেন, বলিলেন, "তক্ষক-প্রতিম মশকের জ্বালায় মাটীতে শয়ন করিলে স্বয়ং তক্ষকের আগমনও অসম্ভব না হইতে পারে," তখন waiting roomএ যাওয়াই স্থির করিলাম। একবার খুড়াকে বলিলাম, "জানেন তো যে 'মাটি কাটি' দংশে সর্প আয়ুহীন জনে'।" তিনি বলিলেন, যেখানে উপায় আছে সেখানে বিপদকে আগুবাড়িয়া নিবার দরকার দেখি না।" আর তর্ক বিতর্ক না করিয়া মাতুল এবং আমি নবীন সহকারে বিছানা লইয়া ষ্টেশনে গেলাম; বহু ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়া waiting roomএর বেহারাকে হাজির করিলাম; সে ক্রোধপূর্ণ বক্রদৃষ্টিদ্বারা আমরা waiting roomএর উপযুক্ত কিনা তাহাই যেন যাচাই করিতে লাগিল। আমি পকেটে হাত দিয়া গোটা দুই তিন টাকা ঝন্-ঝন্ করিয়া বাজাইয়া তাহার দরটা যাচাই করিতে লাগিলাম। দেখিলাম ধীরে ধীরে তাহার মুখের

কঠিন রেখা মোলায়েম হইয়া আসিল, তাহার স্থূল ওষ্ঠের অভ্যন্তর হইতে দীর্ঘ দুইটি দন্তপংক্তি বিকশিত হইল, হাতের চাবি দরজার তালায় শীঘ্র শীঘ্র ঘুরিয়া গেল এবং উদ্‌ঘাটিত দ্বারপথে সে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "আইয়ে বাবু আইয়ে।" আমরা ঘরে গেলাম, সে বহু কষ্টে প্রদীপ জ্বালিল। আমরা দুইজনে দুইখানি বেতের ছাওয়া কৌচের উপর বিছানা বিছাইয়া অবিলম্বে নিদ্রার আয়োজন করিলাম। নবীনকে কহিলাম, "তুমি দোকানে গিয়া অন্যান্য জিনিষপত্রের খবরদারি করগে।" বলা বাহুল্য বেহারাটি বখ্‌শিশ্ না লইয়া সেখান হইতে নড়িল না—টাকাটি হস্তগত করিয়া কহিল, "বাবু কওন গাড়ীমে আপ্‌লোক কাঁহা যাইয়েগা ?" আমি বলিলাম, "হাম্ লোগ্ যায়েগা নাই, ইঁহাই রহেগা।" সে বলিল, "দিন রাত ইহা রহেনেকা হুকুম নেহি হ্যায় বাবুসাহেব।" আমি কহিলাম—"দিনকো হাম লোক ইধর উধর রহেঙ্গে ফের রাত দশ এগার বাজে ইহা আয়কে শোয়েঙ্গে।" সে উত্তর দিল "আজ কা মাফিক ? উওত বড়ে মজেসে হো সেক্‌তা।" এই মজেসে হো সেকতার অর্থ কি ? মজাটা কোন স্থানে ? অর্দ্ধ রজনীতে মশকদংশনে অতিষ্ঠ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ষ্টেশনের নীরবতা ভঙ্গ করার মধ্যে মজাটি রহিয়াছে, না সমস্ত মজা এই বেহারার হস্তগত রজতখণ্ডটির মধ্যে নিহিত ? মনের মধ্য হইতেই তাহার উত্তর পাইলাম। কহিলাম, "আচ্ছা মজেসে হো সেক্‌তা তো মজেসে হোগা, কাল্‌ভি সব কাম আজকা মাফিক্ হোগা।" এই "সব কাম" শব্দের উপর আমি একটু জোর দিয়াছিলাম এবং বুঝিলাম শব্দের উপর accent এর প্রভাব এই নিরক্ষর বহুদর্শী আরা বা মুজফ্‌ফরপুর জেলার লোকটির বেশ জানা আছে।—সে দীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিল, "বহুত আচ্ছা হুজুর"—ভাবিলাম এবারে হুজুর পর্য্যন্ত উঠিয়াছি, আগমী কল্য তক্ জনাব, বাদশা, শাহানশা হওয়া কিছুই কঠিন হইবে না।

প্রভাতে উঠিয়া সহর দর্শনে বাহির হইলাম, এবারে গাড়ী নহে পদব্রজে—দেখিলাম সহরের রাস্তা ঘাট বেশ প্রশান্ত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তার মধ্যে একটি রাস্তা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, সেইটিই সহরের প্রধান সড়ক, দোকান পসার অনেক আছে, মানুষের সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় যাহা কিছু, দেখিলাম সে সমস্তই বর্দ্ধমানে পাওয়া যায়। লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ও সর্ব্বমঙ্গলা সেখানকার প্রসিদ্ধ দেবতা ; সর্ব্বপ্রথমে দেবদর্শনে গেলাম। সর্ব্বমঙ্গলার বাড়ীটি ছোট হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুরক্ষিত। দেবীমন্দিরের বারান্দায় উঠিতেই ব্রাহ্মণ আসিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করায় এবং যেখানে যেমনটি হওয়া দরকার সেখানে তাহাই রহিয়াছে—কোথাও কোন ত্রুটী দেখিলাম না।

লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরদ্বারে আসিতেই, চন্দনচর্চ্চিত ললাট ত্রিবেদী বা চতুর্ব্বেদী কিম্বা পাণ্ডে—কহিলেন "বাবুজি, জোড়া উতার কর ভিতর যানে হোগা।" আমি কহিলাম—"আমিও ব্রাহ্মণ, দেবমন্দিরে জুতা লইয়া যাইবার দুর্ম্মতি আমার হইবে কেন বাপু ?" সে আমার উত্তর শুনিয়া সন্তুষ্ট হইল তাহা তাহার মুখ চোখ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম। আমরা দরজা দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ, সারি সারি প্রকাণ্ড স্তম্ভ সুবৃহৎ নাটমন্দিরের ছাদ মাথায় ধরিয়া আছে —শুনিলাম এইখানে সরস্বতীপূজাও হইয়া থাকে। দেববিগ্রহ, মন্দিরের কারুকার্য্য, সেবা পূজার সুব্যবস্থা প্রভৃতি দেখিয়া দর্শক ইতিহাস প্রসিদ্ধ বর্দ্ধমান রাজের বিপুল ঐশ্বর্য্য, প্রবল প্রতাপ এবং আন্তরিক ধর্ম্মনিষ্ঠার সুপ্রচুর প্রমাণ পাইয়া যায়। আর এক স্থানে দেখিলাম সারি সারি শিবমন্দির, গায়ে গায়ে সংলগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে কালের লোকোত্তর মহানুভবগণের ঐশ্বর্য্য সম্পদ ক্ষমতা কেবল ইহকালের ভোগবিলাসের পথই পরিষ্কার করিত তাহা নহে, পরকালের পথের বাধা যথাসম্ভব দূর করিবার চেষ্টাও তাঁহাদের যথেষ্ট ছিল। আষাঢ় মাসের মেঘান্তরিত রৌদ্র জ্ঞাতির দুর্ব্বাক্য অপেক্ষাও প্রবল, একথার প্রমাণ আমরা পাইতে লাগিলাম। তখন সে বেলার মত বর্দ্ধমান দর্শনে ক্ষান্ত দিয়া ষ্টেসন সন্নিহিত মুদীর দোকানের



বর্দ্ধমান—অষ্টোত্তর শত মন্দিরের একাংশ।

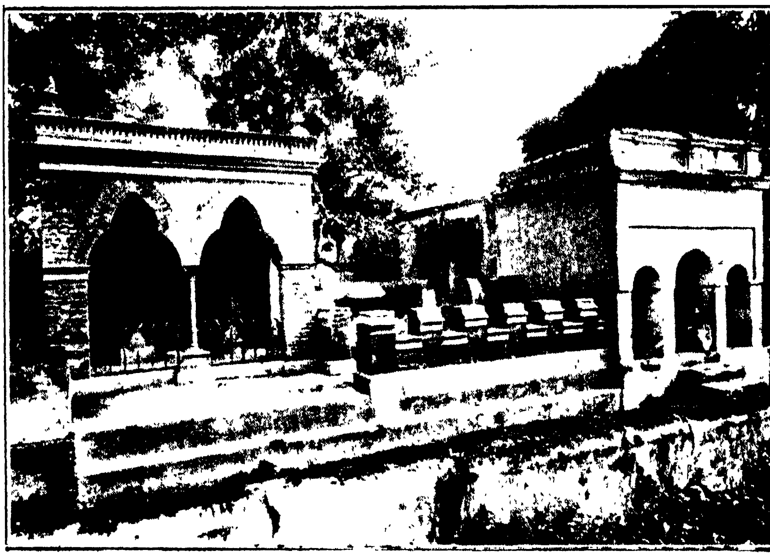
বাঞ্ছনীয় এ উদ্যানটি ঠিক তেমনই সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। বাগানের মধ্যে একটি নাতিক্ষুদ্র জলাশয় আছে যাহার চারি পাহাড় ঘেরিয়া সোপানাবলী জলের মধ্যে পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে, এদৃশ্য তৎপূর্ব্বে কোথাও দেখি নাই—নূতন দেখিয়া বড় আনন্দ পাইলাম। মেঁদি বা তাহারই মত এক প্রকার গাছের একটি "গোলক ধাঁধাঁ" দেখিলাম, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। নিজের চেষ্টায় তাহা হইতে যখন বাহির হইয়া আসা কঠিন হইল, উদ্যানপালকে ডাকিয়া পথ দেখাইয়া লইলাম। মনে ভাবিলাম নির্গমনের পথ না জানিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ভাল করি নাই। ভাগ্যক্রমে ব্যূহদ্বারে জয়দ্রথ ছিল না, থাকিলে এই অনভিজ্ঞ

চলিলাম ; স্নানাহার শেষ করিলাম। গতরাত্রির বাঁশের মাচার নিকট ঘেঁসিতে আর সাহস হইল না ; মেজের উপরে একটি মাদুর বিছাইয়া বসিয়া আমার একটি ছোট্ট এস্‌রাজ বাহির করিলাম এবং স্বর্ণলতার নীলকমলের অনুকরণে তাহার বুকে ছড়ি ঘষিয়া ঘষিয়া নিরীহ যন্ত্রের বক্ষপঞ্জরের অভ্যন্তর হইতে গোপন দুঃখের রোদনগীতি ধ্বনিত করিয়া তুলিতে লাগিলাম। বৈকালে কথা ছিল 'গোলাপ বাগ' দেখিতে যাওয়া হইবে ; এবেলা একখানা গাড়ী ভাড়া করা গেল এবং আমি, মাতুল ও মহিম খুড়া তিনজনে রাজোদ্যানের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। গোলাপবাগ আকারে নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে এবং রাজোদ্যানে গাছ পালা রাস্তা ঘাট যেমন সুন্দর সুসজ্জিত থাকা



বর্দ্ধমান—গোলাপবাগ (দিলখুসা)

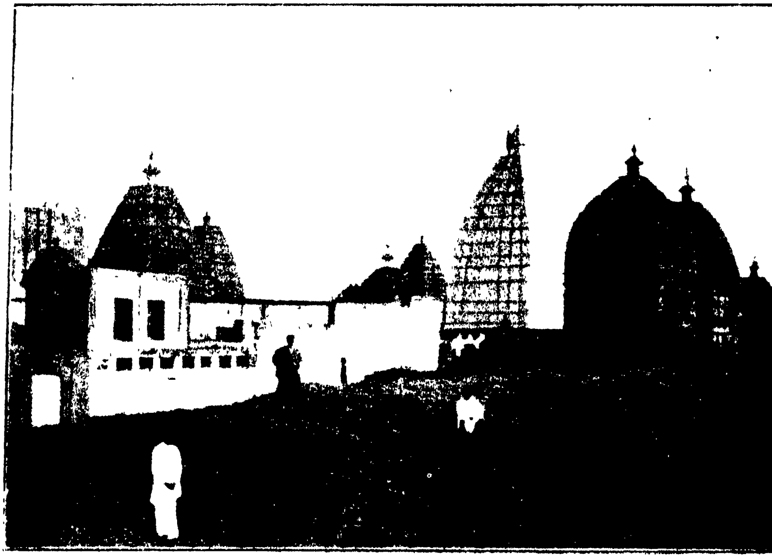
অভিমন্যুর দশা আজ সঙ্কটাপন্ন হইত। শ্রান্তদেহে পুষ্করিণীর সোপানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি এমন সময় হঠাৎ দেখি এক ব্যক্তি মুড়ি মুড়কী এবং আটার গুলি লইয়া "আয় আয়" রবে কাহাকে ডাকিতেছে; হঠাৎ বুঝিলাম না ব্যাপার কি, তারপরে জলে শব্দ শুনিয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখি সহস্র সহস্র বৃহৎকায় মৎস্য সোপানের সন্নিহিত হইয়া সমস্ত জলতল আস্ফালিত করিতেছে। এ অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য! জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম বহুদিবস হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে, মাছ ধরিবার আদেশ কেহই পাইত না। উদ্যান মধ্যস্থিত প্রাসাদ সুরক্ষিত এবং সুসজ্জিতই থাকিত। মহারাজাধিরাজ আফ্‌তাব চাঁদ বাহাদুর অনেক দিন হইল স্বর্গগত হইয়াছেন, তথাপি সমগ্র রাজপুরী এমন সুসজ্জিত দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম, কিন্তু অনুসন্ধানে জানিলাম রাজা বনবিহারী কর্পূরের তত্ত্বাধীনে সমস্তই সুশৃঙ্খলায় চলিতেছে এবং আরও জানিলাম তাঁহার মত বিজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ, দূরদর্শী, দয়ালু, বুদ্ধিমান এবং লোকপ্রিয় শাসনকর্ত্তা বর্দ্ধমানে



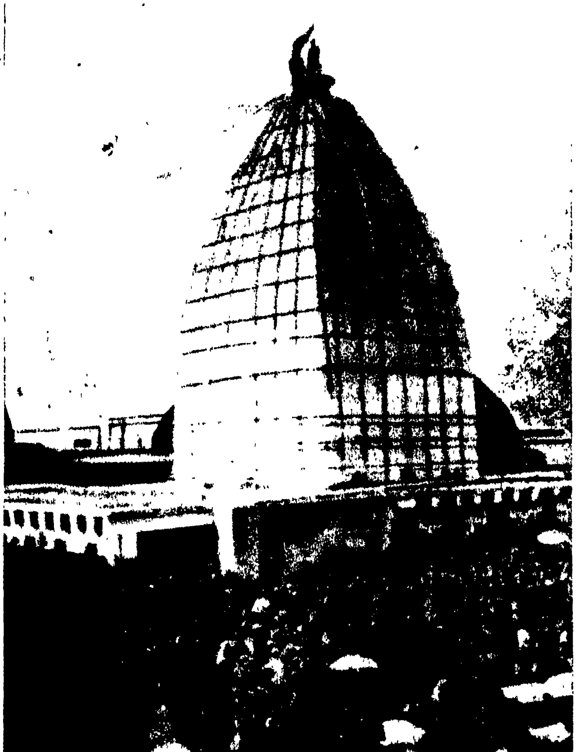
বর্দ্ধমান—শের আফগানের সমাধি।

নির্দ্ধারিত সময়ে প্রতিদিন মুড়ি মুড়কি দেওয়া হয়, সেই লোভে অসংখ্য মৎস্য প্রতিদিন আসিয়া তাহাদের নিজ নিজ ভাগ বুঝিয়া লইয়া যায়। ইহার অনেক পরে যখন হরিদ্বারে গিয়াছিলাম তখন ব্রহ্মকুণ্ডে এবং কুশাবর্ত্তে এই দৃশ্য দেখিয়াছি। তীর্থযাত্রীগণ আটার গুলি প্রস্তুত করিয়া জলে ফেলিয়া দেয় এবং অসংখ্য মহাশৈল (?) মৎস্য সমস্ত দিন ধরিয়া গন্ধর্ব্বামরসিদ্ধ-কিন্নর বধূর স্তনাস্ফালিত গঙ্গার নীরে এবং তীরে সেই আহার অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। সেখানে মৎস্য ধরিবার যেমন প্রথা নাই, বর্দ্ধমানের গোলাপ বাগেও বহুদিন হয় নাই। সে দিন সন্ধার সময়ে শ্রান্তদেহে ষ্টেসন সন্নিহিত মুদীর দোকানে ঈশানচন্দ্রের উদ্দেশে গেলাম এবং আহারান্তে waiting roomএ গিয়া দেখি পূর্ব্বে রাত্রির বেহারা চাবি হস্তে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমাদিগকে স্মিতমুখে অভ্যর্থনা করিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, বলা বাহুল্য রজত খণ্ডটিও তাহার হস্তগত হইল।

বর্দ্ধমানের 'শ্যামসায়র' 'কৃষ্ণসায়র' 'রাণীসায়রের' নাম বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিয়াছি; পরদিন প্রভাতে সেই সব সায়র দর্শনে গেলাম। উহাদের



বৈদ্যনাথ—সমস্ত মন্দিরগুলির দৃশ্য।



বৈদ্যনাথদেবের মন্দির।

মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যেটি বড় তাহার চারি পাহাড় ঢালু করিয়া আনিয়া একেবারে জল পর্য্যন্ত নব দূর্ব্বাদল লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে; দেখিতে মনে হয় যেন সবুজ ফ্রেমে বৃহদায়তন একখানি আয়না বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সায়রের পাড়ের স্থানে স্থানে বৃহৎকায় কামান সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। ফলতঃ এই জলাশয়গুলির দৃশ্য অতি মনোহর এবং ওরূপ বৃহদায়তন অথচ নির্ম্মল জলাশয় সচরাচর চক্ষুগোচর হওয়া কঠিন। পর দিবস প্রত্যূষে প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছি, ইচ্ছা রাজবাড়ীর "মহাতাব মঞ্জিল" নামক প্রাসাদ দেখিয়া বর্দ্ধমানের নিকট বিদায় লইব। রাজপ্রাসাদের সন্নিহিত হইতেই দেখিলাম চারিদিকে সিপাহী শান্ত্রী সমস্ত সন্ত্রস্ত হইয়া যে যাহার স্থানে

দাঁড়াইয়া আছে, দেখিয়াই মনে হয় যেন সভয়ে কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। লাট সাহেব কলিকাতা সহরে বাহির হইলে রাস্তার পুলিশ পাহারা সার্জ্জন প্রভৃতি যেমন সর্ব্বাঙ্গে জাগরিত হইয়া উঠে, এখানেও ভাবটা তেমনই বোধ হইল। আমি রাস্তার একধারে দাঁড়াইয়া এই চকিত সহরের অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম কয়েকজন সিপাহী অগ্রে অগ্রে যাইতেছে, তাহার পশ্চাতে মধ্যবয়স্ক একটি ভদ্রলোক, তাঁহার পরিধানে শুভ্র রাজোচিত পোষাক এবং মাথায় পাগড়ী, সঙ্গে মূল্যবান পরিচ্ছদভূষিতাঙ্গ একটি সুকুমার প্রিয়দর্শন বালক, তাঁহার বয়স তখন দশ বারো বৎসর হইবে। বালকটিকে দেখিলেই বোধ হয় শ্রীমন্ত ঘরের সন্তান, জিজ্ঞাসায় জানিলাম বালক বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ্র মহাতাব বাহাদুর। সঙ্গে পরিণতবয়স্ক যিনি ছিলেন, জানিলাম তিনিই রাজা বনবিহারী কপূর। বর্দ্ধমানাধিপতিকে সেই প্রথম দেখিলাম। আজ তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহার সহিত বান্ধবতা সূত্রে আবদ্ধ হইবার ভাগ্যও আমার ঘটিয়াছে। যে মহাতাব মঞ্জিল দেখিবার জন্য সেদিনে রাজপুরুষবর্গ এবং সিপাহী শান্ত্রীর অনেক স্তবস্তুতি করিতে হইয়াছিল, সেই প্রাসাদে মহারাজাধিরাজের অতিথিরূপে বাস করিবার সুযোগও গত বৎসর আমার ঘটিয়াছিল। সেদিন যে বালককে নিজ জনক ও অভিভাবকের সহিত প্রাতর্ভ্রমণের পর গৃহে ফিরিতে দেখিয়াছিলাম, আজ তাঁহার সহিত প্রায়ই আমার সাক্ষাৎ হয়, তিনি আজ সাহিত্যমণ্ডপে, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে, সামাজিক সভায়, সর্ব্বত্র সুপরিচিত। বহু পুরাতন অভিজাত বংশের এই সুযোগ্য বংশধর দীর্ঘায়ু হইয়া দেশের এবং দশের মঙ্গল বিধান করুন ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

সেদিন প্রাসাদ দেখিয়া যখন ষ্টেশনাভিমুখে ফিরিতেছিলাম, মাতুল অভয়নাথ বলিলেন, "বাবাজি, হাতে রাখিবার ছড়ি লাঠি কিছুই সঙ্গে নাই, দুই একখানা এখানে কিনিলে হয় না?" আমি কহিলাম, "মন্দ কি, দোকানে দেখি ভাল লাঠি পাওয়া যায় কি না।" উভয়ে একটি 'মণিহারী' দোকানে প্রবেশ করিয়া, ছড়ি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম আছে, কিন্তু তেমন ভাল নহে। যাহা হউক তাহারা কয়খানা ছড়ি দেখাইল, আমরা তাহার মধ্য হইতে দুইজনে দুইখানা বাছিয়া নিলাম। ছড়ি দুইখানি দেখিতে ভাল নহে, তদুপরি তাহাদের স্থূলতা এবং ওজন ভোজপুরী দ্বারবানের বংশযষ্টি অপেক্ষা কম নহে—আমার তেমন পছন্দসই মনে হইল না; কিন্তু মাতুল কহিলেন, "বাবা, বিদেশ বিভুঁই স্থান, হাতে কিছু থাকা ভাল, কি জানি কখন্ কি দরকার পড়ে বলাও যায় না।" আমি ভাবিলাম মন্দ কথা নহে। দুইজনে দুইখানি ছড়ি ওরফে যমদণ্ড হস্তে মুদীর দোকানে প্রবেশ করিলাম। আমাদের রণমূর্ত্তি দেখিয়া খুল্লতাত মহিমচন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, "একি হে, কোথাও দরওয়ানী করিতে যাইবে নাকি?" মাতুল কহিল, "বিনা সম্বলে পথ চলিও না, কথা আছে জানেন ত?" তিনি কহিলেন, "জানি কিন্তু তোমাদের হাতে লাঠি দেখিলে ভালুকের হাতে খন্তা কথাটা মনে আসে; তোমাদের দুইজনের হাতের গুলি দেখিলেই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, তার উপর লাঠির দরকার আছে কি?" আমি নীরবে রহিলাম। মাতুল কহিলেন, "কখন্ কোন জিনিষের আবশ্যক হয় কে জানে বলুন।"

সেদিন সন্ধ্যার গাড়ীতে বৈদ্যনাথ যাইবার ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করা হইয়াছিল। আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া মহিম খুড়া মুদির হিসাব নিকাশ চুকাইয়া দিলেন। জল তুলিবার জন্য একজন লোক রাখা হইয়াছিল, তাহার দৈনিক হিসাবে পাওনা মিটাইয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে কুলি ডাকিয়া জিনিষপত্র সহ নবীনকে লইয়া ষ্টেসনে গেলাম। মামা এবং আমি গ্রীষ্মের সান্ধ্যসমীরণ সেবন করিতে করিতে গজেন্দ্রমন্থর গতিতে ষ্টেসনের দিকে চলিলাম। পথের মধ্যে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। বর্দ্ধমান ষ্টেসনের নিকট Railway officerদিগের Instituteএর মত একটা কি ব্যাপার ছিল; সেখানে

অনেকগুলি ইংরাজ এবং ফিরিঙ্গী থাকিত, তাহাদের অবকাশ সময়ে চিত্তবিনোদনের জন্য খেলা ধূলার বন্দোবস্তও ছিল। আমরা যখন ষ্টেসনে যাইতেছিলাম, রাস্তা হইতে দেখিলাম সেই বাড়ীটির একটি কক্ষে ৩।৪ জন ইংরাজ ফিরিঙ্গী মিলিয়া Billiard খেলিতেছে। আমরা যখন ঐ বাড়ীর নিকট দিয়া যাই, হঠাৎ সেই বাড়ীর বারান্দা হইতে একটা কুকুর বিশাল চীৎকার করিয়া আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিল। তাহার আসিবার রকম দেখিয়াই আমি বুঝিলাম এ কুকুর না কামড়াইয়া ফিরিবে না। প্রথম হইতেই দেখিলাম মাতুলের প্রতি ইহার বিদ্বেষ কিছু অধিক। আমি তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়া হাতের লাঠি বাগাইয়া ধরিলাম; কুকুরটা ছুটিয়া গিয়া মাতুলের পায়ে প্রায় দংশন করে, এমন সময়ে আমার লাঠি তাহার অঙ্গে গিয়া পড়িল। পোষা কুকুর জানি, তাই অধিক জোরে আঘাত করি নাই; মাতুলকে বাঁচাইবার জন্য সামান্য আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য ছিল, তবে যষ্টিখানির ওজন নিতান্ত কম ছিল না, ক্ষুদ্রকায় কুকুর সেই সামান্য আঘাতেই সশব্দে রক্ষকের কামরার দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দেড় হাত লম্বা দাড়ী লইয়া সাহেবের সর্দ্দার চাকর খাস উর্দ্দু ভাষায় অভদ্রোচিত বাক্যাবলী উচ্চারণ করিতে করিতে আমাদের দিকে দৌড়াইয়া আসিল। আমরা দুইজন বিবাদ অনিবার্য্য দেখিয়া ঢিলা পাঞ্জাবীর আস্তিন গুটাইয়া সেখানে দাঁড়াইলাম এবং ধীরে অনুচ্চকণ্ঠে খানসামাকে জানাইয়া দিলাম যে অভদ্রভাষা পুনরায় উচ্চারণ করিলে তাহার মুখশ্রী ঠিক সেইভাবেই থাকিবে না। খানসামা এই দুইটি কুস্তিগীরের সুদৃঢ় শরীর এবং হস্তস্থিত স্থূল যষ্টি দেখিয়া তাহার মুনিব সঙ্ঘের নিকট নালিস করিতে চলিয়া গেল। আমরা অতি ধীর পাদক্ষেপে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম—যাইবার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কেহ না বলে আমরা বিবাদ করিবার জন্যই সেখানে দাঁড়াইয়াছি, এবং ধীরে যাইবার মতলব এই যে, সাহেবগণ না ভাবেন বঙ্গবীরেরা 'ভগ্নাদ্রণাদুপরত' হইয়াছে। খানসামা গিয়া কি বলিয়াছে জানি না—তিনজন ইংরাজ Billiard এর Cue হস্তে দৌড়াইয়া আমাদিগের দিকে আসিতেছে দেখিয়া আমরা উভয়ে ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। প্রস্তুত রহিলাম যেন যুদ্ধ আরম্ভ হইলে নিমেষমাত্র কালও অপব্যয়িত না হয়। ইংরাজগণ এ দৃশ্য তাঁহাদের জীবনে দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ—বাঙ্গালী ছোকরা দুইজন তিনটি সাহেবের সহিত যুদ্ধার্থ দাঁড়াইবে ইহা সে দিন বোধ করি ইংরাজ বাঙ্গালী সকলেরই কল্পনার অতীত ছিল। ইংরাজগণের গতি কি জানি কেন মন্দ হইয়া আসিল, এবং আস্ফালনের ভাব পরিত্যাগ করিয়া, অপেক্ষাকৃত সৌম্যমূর্ত্তিতে আমাদের নিকটে দাঁড়াইয়া, তাহাদের মধ্যে একজন হিন্দীভাষায় কহিল, "কাহে কুত্তা মারা টোম্।" আমি কহিলাম, "কাহে কুত্তা নাহি বাঁধা টোম্?" এই উত্তরে সাহেবের হৃদিস্থিত প্রচ্ছন্ন বহ্নি ঘৃতাহুতিপ্রাপ্ত অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিল। সে ইতরভাষায় একটি গালি দিয়া হস্তস্থিত Cue আমাকে প্রহার করিবার জন্য উদ্যত করিল। আমি একপদ পিছে হটিয়া আমাদের লাঠিখানিও বাগাইয়া ধরিলাম এবং কহিলাম, "তোমাদের মধ্যে যে কেহ একপদও অগ্রসর হইবে, তাহার মৃতদেহ এই রাস্তার ধূলায় গড়াইবে ইহা নিশ্চয় জানিও।" কথাগুলি সুস্পষ্ট ইংরাজী ভাষায় বলিয়াছিলাম, সুতরাং আমার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে তাহাদের কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নাই; আমার উদ্যত যষ্টি, ক্রোধান্ধ রক্তনয়ন এবং ব্যায়ামখিন্ন বলব্যঞ্জক দেহ দেখিয়া, আমার কথা মিথ্যা নাও হইতে পারে, সাহেব মহাশয় হয়ত ইহাই ভাবিলেন এবং এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া যাহা বলিলেন তাহার ভাবার্থ এই:—"পরের কুকুর মারা অন্যায় ইহা কি জান না?" আমি কহিলাম; "পরের কুকুর রাস্তায় বাহির হইয়া লোক কামড়াইতে গেলে তাহাকে মারা কিছু মাত্র অন্যায় নহে ইহা জানি, তোমার দুষ্ট কুকুরকে তুমি বাঁধিয়া রাখ না কেন?" সে পুনরায় কহিল, "আগে কুকুরে কামড়াক্ তারপরে মারিও, কামড়াইবার পূর্ব্বেই

কেন মারিলে?" আমি এই অদ্ভুত যুক্তি শুনিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। কুকুর কামড়াইবার পরে তাহাকে মারা না মারা সমান কথা, কুকুরের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে তাহাকে পূর্ব্বেই মারিতে হয় এ যুক্তি সাহেবের বুদ্ধির মধ্যে প্রবেশ করে নাই এমন হইতেই পারে না, তবে সংসার এমনই স্থান যে, নিজের স্বার্থের নিকট ন্যায়, ধর্ম্ম যুক্তি তর্ক এবং অপরের ভাল মন্দ সুখ দুঃখ সব ধুইয়া মুছিয়া যায়। এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে সেই Institute-এর গৃহ হইতে আর একটি অর্দ্ধপ্রাচীন ইংরাজ আসিয়া ইহাদিগকে ঘরের দিকে লইয়া গেল—আমরা ষ্টেশনের দিকে গেলাম। এই খানেই শেষ নহে—ষ্টেসনে গিয়া দেখি আমাদের বিলম্ব দেখিয়া মহিমখুড়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তখনও গাড়ী ছাড়িবার অনেক বিলম্ব আছে, তথাপি তাঁহাকে ব্যস্ত দেখিয়া বলিলাম, "সময় ঢের আছে কাকা, এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন?" তিনি কহিলেন, "আরে বাপু, তুমি ও অভয় দুইজনে লাঠি হাতে বাহির হইয়াছ, ব্যস্ত না হয় কে বল।" কথা শুনিয়া মাতুল ও আমি উভয়েই হাসিলাম এবং তাঁহার নিকট ব্যাপার সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে দেখি সেই তিনটি ইংরাজ এবং আরও দুইজন হাতে মোটা ছড়ি লইয়া ষ্টেসনের প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া পায়চারি সুরু করিয়া দিল। রকম দেখিয়া বুঝিলাম কোন ছলছুতা করিয়া আবার বিবাদ বাধানো তাঁহাদের ইচ্ছা। রাস্তার উপরে আমার উগ্রমূর্ত্তিতে যে বিভীষিকা দেখিয়াছিল তাহা ইংরাজের পক্ষে হয়ত বড় গ্লানিকর মনে হইয়াছে, তখনকার ভ্রম এখন সংশোধন করিবার ইচ্ছায় তাঁহারা রণবেশে রঙ্গভূমিতে আসিয়াছেন। এখানে আমরাও মাত্র দুইজন নহি, মহিমখুড়া নবীন ঈশানচন্দ্র এবং রামজীবন সিং নামক আমাদের একজন দ্বারবান, আমরা এই ছয় জন ছিলাম। কাহারও নিকট হইতে কি সাহায্য পাওয়া যাইত তাহা বলা কঠিন, না পাইলেও সেদিনে মাতুল অভয়নাথ এবং তাঁহার এই অকিঞ্চন ভাগিনেয় এই দুইজনে দশজনের সহিত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইত না। জগৎসংসারে প্রায় সকল কার্য্যই হস্তপদের শক্তির উপর নির্ভর করে না, হৃদয়ের মধ্য হইতে যে শক্তি অভয় দেয় সেই শক্তিই যথার্থ শক্তি, নতুবা সমস্ত থাকিতেও হৃদয়দৌর্ব্বল্যে লোক নিজে মরে এবং অপরকে মারে, জগতের ইতিহাসে ইহার প্রমাণ প্রচুর রহিয়াছে। আমরা দুইজনে প্রস্তুত হইয়া ষ্টেসনে পাদচারণ করিতে লাগিলাম, মহিমখুড়া তখন দুর্গানাম জপ করিতেছিলেন, কেন না সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব তাঁহারই উপরে, কোন অঘটন ঘটিলে মাতার নিকট কি উত্তর দিবেন তাঁহার সেই ভাবনাই হয়ত সমধিক হইতেছিল। আমাদের গাড়ীখানির নিকট দিয়া একবার যখন সেই ক্ষুদ্র ইংরাজ পল্টন্‌টি ঘুরিয়া যাইতেছিল, Reserve labelটার উপর একজনের চক্ষু পড়িল; সে দেখিল লেখা রহিয়াছে Maharaja of Natore. এই লেখাটি একজন অপরকে দেখাইল, সবাই মিলিয়া একস্থানে দাঁড়াইয়া কি পরামর্শ করিল, তাহার পরে একত্র সকলে ষ্টেসনের বাহিরে চলিয়া গেল।—এই সময়েই প্রথম ঘণ্টা পড়িল, আমরা গাড়ীতে চড়িয়া বসিলাম। যখন ধূম উদ্গিরণ করিতে করিতে গাড়ী Platform ছাড়িয়া গেল—বোধ করি মহিম খুড়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন—বাবা বৈদ্যনাথের নামে তিনি অতিরিক্ত পূজাও হয়ত মানত করিয়াছিলেন।

পরদিন প্রাতে যথা সময়ে গাড়ী বৈদ্যনাথে পঁহুছিলে, দূর হইতে মহাদেবের মন্দির চূড়া দেখিয়া দেবাদিদেবের উদ্দেশে প্রণতি জানাইলাম। তীর্থের দ্বারী পাণ্ডা পার্ব্বতী-চরণ পূর্ব্বেই খবর পাইয়াছিল, তাহার সহিত আমরা তাহারই বাড়ীর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

বাঁশীওয়ালা

ওগো বাঁশীও'লা, এই বাড়ী এস—আধেক জানালাফাঁকে
কোমল-মধুর কণ্ঠে ষোড়শী ডাকিল ফেরিও'লাকে ;
অঙ্কে তাহার ফুটফুটে মেয়ে তা'রি পানে বাহু মেলি'—
তৃতীয়ার শশী আসিবে যেন সে আকাশের কোল ফেলি' !

বৈশাখী দিবা—দ্বিপ্রহরের আলোক-পাপ্‌ড়িগুলি
একে-একে যেন হেলায় ফাটিয়া এলায়ে পড়িছে খুলি' ;
নিথর নিঝুম—তন্দ্রা-আহত নীলের বক্ষ চিরে'
ক্লান্ত-করুণ চিলের কণ্ঠ আকাশে ধ্বনিয়া ফিরে।

হেনকালে পথে তীব্র-মধুর বাঁশীর আর্ত্তনাদ
মধ্যদিনের সমাধি-স্বপ্নে সহসা সাধিল বাদ ;
ঘরে-ঘরে-ঘরে শিশু-গোপীদলে অমনি পড়িল সাড়া—
কালা নাই—তবু বাঁশরীর রবে তোলপাড় সারা পাড়া !

শিরে বহি' বোঝা, বাঁশীটি ধরিয়া শীর্ণ দু'খানি হাতে,
ফুৎকারে দু'টি ফুলাইয়া গাল সুবিপুল চেষ্টাতে—
পথ দিয়া বুড়া বাজায়ে চলেছে—আঁখি রাখি' চারিভিতে,
ওগো, এই বাড়ী—ডাকিল তরুণী সুমধুর ভঙ্গীতে।

দুই হাত দিয়ে পসরা নামায়ে পসারী ঢুকিল দ্বারে,
অন্ধের মত ক্ষণেক সহসা দাঁড়া'ল অন্ধকারে ;
বক্ষ ভেদিয়া উঠিল যে ভাষা দীর্ঘশ্বাসের মত—
লক্ষ্য করিলে বুঝিবে নিমেষে—ক্লান্তি যে তার কত !

ভাল বাঁশী আছে—শুধা'ল তরুণী—শিশু মুখে হাসি ফুটে,
বা'র কর দেখি—কচি মুখে যাহা আপনি বাজিয়া উঠে ;
টুক্‌টুকে ঐ ঠোঁটের মতন টুক্‌টুকে হওয়া চাই—
মূল্যের লাগি ভাবিওনা কিছু—যা চাহিবে দিব তাই।

পণ্যের ভার নামাইতে বুড়া আপনি পড়িল নুয়ে,
শুষ্ক কণ্ঠে 'মা' বলিয়া ডাকি' বসিয়া পড়িল ভুঁয়ে ;
একটু জল কি পাই মা জননী—তৃষ্ণায় ফাটে ছাতি
তরুণীর পানে চাহিল বৃদ্ধ ঊর্দ্ধ নয়ন পাতি'।

'মা' বলে' ডাকিতে বাকী ছিল যাহা মায়ের নিভৃত প্রাণে—
উছলি' উঠিল অমৃত-সিন্ধু চাহিতে মুখের পানে ;
মেয়েরে নামায়ে তাড়াতাড়ি উঠে' ছুটে' গিয়ে ঘর থেকে
সুশীতল জল, সাথে কিছু তার—সম্মুখে দিয়া রেখে,

মধু নিঙাড়িয়া কহিল—আহাহা ! রোদটা লেগেছে ভারি !
খেয়ে ফেল বাছা—জননীকণ্ঠে ঝরিল অমৃত-ঝারি !
অমনি সঙ্গে ইঙ্গিত করি' মোহন ভঙ্গিমাতে—
'খেয়ে ফ্যাল' বলি' প্রতিধ্বনিটি জাগিল যেন রে সাথে !

স্নেহের সে দানে লভিয়া জীবন—বালিকার পানে চাহি'
মুগ্ধ যেন সে রহিল বৃদ্ধ—নয়নে নিমেষ নাহি ;
মুখে নাই বাণী—সঙ্কোচে টানি' লইল তাহারে বুকে—
সিন্ধুর কোলে ধরা দিল শশী আনন্দ-কৌতুকে !

কোথায় পসরা কোথা বেচাকেনা—কিছু নাই, নাহি কেউ,
অকূলের কূলে আছাড়িয়া মরে দুকূল-হারাণ' ঢেউ ;
কোন্ সুদূরের কোন্ ছবিখানি কবেকার কেবা জানে—
অতলের তলে কোন্ ছলে আজি বাড়ব-অগ্নি হানে !

সূর্য্য তখনো রুদ্র প্রদীপ ঘুরায়ে গগন-থালে
বিশ্বনাথের মন্দিরতলে দীপ্তির ধারা ঢালে,
বাজে অমূর্ত্ত প্রহর-ঘণ্টা ডিণ্ডিমে তাল রাখি'—
মুখর মেদিনী ভয়নির্ব্বাক মেলি' বিস্মিত আঁখি।

বয়ে যায় বেলা, কাজ আছে মেলা—রমণী ডাকিল তারে—
স্বপ্নাবিষ্ট চকিতে উঠিয়া বসিল অন্ধকারে !
তাড়াতাড়ি খুলি' বৃহৎ পুঁটুলি—হাতাড়িয়া তলদেশে
টক্‌টকে রাঙা অপূর্ব্ব বাঁশী বাহির করিলা শেষে।

তিরি-রিরি-রিরি—বাজিল বাঁশরী কচিমুখে চুমো খেয়ে ;
বিস্মিত বুড়া—কাঙাল যেন সে মাণিক কুড়ায়ে পেয়ে !
মহা আনন্দে হাততালি দিয়া হাসি-মুকুলিত মুখে
সিন্ধুর শশী ঝাঁপায়ে পড়িল আকাশের শ্যাম বুকে।

কত দাম হবে—শুধাল জননী, হরষিত আঁখি তুলি'—
বৃদ্ধ তথনো বালিকার পানে চেয়ে আছে সব ভুলি' !
দাম কত এর—শুধাইল ফিরে'—পসরা বাঁধিতে তার,
বৃদ্ধের বাহু উঠিল কাঁপিয়া—নয়নে অশ্রুধার !

মাপ কর মোরে—টিনের বাঁশীর কত বা হইবে দাম !
'সেলামী' বলিয়া মায়েরে আমার আজি উহা স'পিলাম।
হিয়ার মাঝারে কি যে আজি করে—কেমনে বুঝাব বলে'—
দশগুণ দাম পেয়েছি যখন মায়েরে করেছি কোলে !

ওমা—সে কি কথা—গরিব মানুষ, দুঃখের কড়ি তব—
মুখের অন্ন অমন করিয়া কেমনে কাড়িয়া লব ?
এস-যেয়ো পথে দেখে-শুনে যেয়ো-এমনি সে চিরদিন,
ঋণদায়ে আর জড়িওনা মোরে—সে যে বড় সুকঠিন !

ছাড়িয়া মায়েরে খুকী আজি দূরে—বাঁশী যে তাহার সাথী—
বুলবুল যেন শিস্ দিয়ে ফিরে সুরের নেশায় মাতি !
তিরি-রিরি-রিরি—বলিছে বাঁশরী—অমনি হাসিটি মুখে—
আনন্দ যেন উছসি' উঠিছে উৎসাহে-কৌতুকে !

প্রাণ তুমি মোরে দিলে যে আজিকে—সে কি নহে মোর ঋণ,
প্রাণের বদলে ছোট বাঁশীটাও দিতে কি পারে না দীন ?
দরিদ্র বটে, তবু যে আমার ছিল, মা—অমনি মেয়ে—
সেই মুখ আজ মনে পড়ে' গেছে ঐ মুখখানি চেয়ে !

থামিল বৃদ্ধ—কণ্ঠ তাহার গদ্‌গদ করুণায়,
অশ্রুবাষ্প ফিরিয়া-ফিরিয়া নেত্র ভরিয়া যায় !
জননীর স্নেহ-অশ্রুসাগরে—সেথাও ডেকেছে বান—
পসারীর শিরে ঝরি' কহে—আজ তুই মোর সন্তান !

রুধির যেদিন ক্ষীর হয়ে আসে—রমণী যেদিন মাতা,
নয়ন-বহ্নি মেঘ হয়ে যবে আবরে আঁখির পাতা ;
তরঙ্গ যবে রঙ্গ ছাড়িয়া হয়ে উঠে রসধারা—
বিশ্বে সেদিন সুন্দর হয় শিবের মাঝারে হারা !

মেয়ে মনে ভাবে—একি হ'ল আজ, বুড়া কেন নাহি যায়—
তাই—ধীরে-ধীরে মার পানে আর তার পানে ফিরে' চায় !
পাওনা যা'—তাহা পাওয়া কি হইল, দেনা কি রহিল দেনা—
খেলার পসরা বিনিময়ে আজ মমতার বেচা-কেনা !

সন্ধ্যা ঘনায়ে আসিছে তখন, রাঙা রবি গেছে পাটে,
কি পসরা আজ বেচিলে পসারী, হারাণ'-হিয়ার হাটে ?
হারায় যা'—তাহা যায় কি-রে পাওয়া—ও শুধু বাড়ান' দুখ—
বার-বার হায় ! সেই ব্যথা পেতে তবু মন উৎসুক !

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

ধারা।—কবিতা-গ্রন্থ। শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীঅনাথবন্ধু সেন, বরিশাল। ১১২ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা।

"ধারা" কাব্যের কবি দেবকুমার যখন সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার "অরুণ," "প্রভাতী" প্রভৃতি কাব্য পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আশান্বিত হইয়াছিলাম। তাঁহার লেখনী-প্রসূত অপরাপর কাব্যের জন্য আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে-ছিলাম, কিন্তু এ দীর্ঘকালের মধ্যে 'মাধুরী' ও 'দেবদূত' ভিন্ন তিনি আমাদিগকে আর কিছুই দেন নাই। বহুদিন পরে তাঁহার এই নব কাব্যগ্রন্থ 'ধারা' প্রকাশিত হইল।

এই কাব্যখানিতে অনেকগুলি খণ্ড-কবিতা আছে। উপেক্ষিতা প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা নিতান্ত অল্প বয়সের লেখা বলিয়া কবি সসঙ্কোচে সেগুলিকে ইহাতে স্থান দিয়াছেন। কিন্তু 'উপেক্ষিতা' ও 'অনাথা' নামক কবিতাদ্বয়ে কবির স্বভাব-কোমল হৃদয়ের কারুণ্য ও সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'অনাথা'র অসহায় শিশু-ক্রোড়ে ভিখারিণীর মূর্ত্তি ও 'উপেক্ষিতা'য় সরলা বালিকা বিভার বাক্য—

"মেয়ে হওয়া ভাল দাদা ? দেখ, মেয়ে হওয়া বড় কষ্ট !'

প্রভৃতি আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। বাল্য-রচনা বলিয়া কবি যে এগুলিকে বর্জ্জন করেন নাই, সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

'ধারা' কাব্যের একটি বিশেষত্ব আমাদের মনে লাগিয়াছে।

কবি ভয়ঙ্করের মধ্যে সুন্দরের, অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রসঙ্গে কবি যে গাহিয়াছেন—

"হে সত্য-সুন্দর শিব, হে অনাদি সৃষ্টির কারণ,
হে চির-নির্ভর, প্রভু, হে বিধাতঃ পতিত-পাবন,
সর্ব্বগ্রাসী স্বার্থ আসি সর্ব্বনাশী দুরন্ত ক্ষুধায়
যবে তব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—মনুজেরে গ্রাসিবারে চায়,
সত্য প্রেম পবিত্রতা, ভক্তি কিংবা বিশ্বাসে যখন
পার্থিব প্রতিষ্ঠামোহ ক্রমে ক্রমে করে আচ্ছাদন,
আত্মপর ভেদ যবে জীবনের বেদ হয়ে ওঠে,
এ ভবমন্দিরে যবে চিহ্ন তব নাহি রহে মোটে,
প্রলোভন প্রবঞ্চনা মিথ্যাচার বিদ্বেষ হিংসায়,
দুর্লভ জীবন যবে ভরে ওঠে কাণায় কাণায়
তখন—তখন তুমি হে শঙ্কর, সংহারের রূপে
মরণের মাঝে ধীরে মঙ্গলে ফুটাও চুপে চুপে।"

তাহা আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে। এ যুদ্ধ যে নিয়তির অলঙ্ঘনীয় বিধানেই ঘটিয়াছে, তাহাও কবি এইরূপে দেখাইয়াছেন—

"সঙ্কীর্ণ স্বার্থের সনে সুখে যারা বেঁধেছিল ঘর,
চেয়েছিল দলিবারে যারা এই বিশ্বচরাচর,
কাঞ্চন-রজত-চক্রে চালাইয়া মাৎসর্য্য-শকট,
ভেবেছিল যারা যাবে উল্লঙ্ঘিয়া এ ভব-সঙ্কট,
আজি সেই ভ্রান্তজনে ভুলাইয়া সোণার স্বপনে
স্বার্থ সহচর এবে বক্ষরক্ত শোষে প্রতিক্ষণে।
দুর্নিবার হাহাকার ওঠে নিত্য আলোড়ি অম্বর,
সংক্ষুব্ধ শোণিত-সিন্ধু শিহরিয়া বহে ভয়ঙ্কর।"

বর্ত্তমান যুগের কবি বর্ত্তমানের গান গাহিলে আমাদের আনন্দ হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যে এখনও কাব্যে গতানুগতিক ভাবই চলিয়াছে। এক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ব্যতীত সাময়িক ঘটনা আর কাহাকেও কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ করিতে দেখি না। অথচ জগতে বর্ত্তমান সময়ে কত অতুলনীয় সাহস, কত আত্মত্যাগ, কত ধৈর্য্য অধ্যবসায়ের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতিদিন ঘটিয়া যাইতেছে। আমরা বর্ত্ত[illegible] ভুলিয়া প্রকৃতির বর্ণনায় বা অতীত প্রেম-কাহিনীতে [illegible]য়া থাকিতে চাহি না। এ শ্রেণীর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি বঙ্গ-সাহিত্যের জন্ম হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু তখন পল্লী-ক্রোড়লালিত কবিদিগের জীবনে ও এখনকার কবিদিগের জীবনে বহু প্রভেদ। এই যে নব আশা আকাঙ্ক্ষায় উত্তেজিত নব আদর্শে অনুপ্রাণিত বাঙ্গালী, ইহারা কি কাব্যে নাটকে উপন্যাসে কেবল প্রেমের কাহিনীই শুনিবে? ইহাদের জাগাইবার জন্য, মাতাইবার জন্য কি কেহই উদ্যম করিবেন না? সম্মুখের দিকে কি কেহই চাহিবেন না? কেবল অতীতের কল্পনা-কানন হইতেই কি আমরা চিরকাল কুসুম চয়ন করিব? কখনই নহে। তাই "অশ্বাস" নামক কবিতাটি এ হিসাবে সমীচীন হইলেও আমরা ইহাকে সাগ্রহে পাঠ করিয়াছি ও এই শ্রেণীর আরও কবিতার প্রতীক্ষা করিয়াছি।

'ধারা' কাব্যখানির অন্যান্য কবিতাগুলিতে ছন্দের প্রবাহ আছে। ভাষা কোথাও কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয় না। এক 'এহি' শব্দের প্রয়োগ ব্যতীত অন্য কোনও Mannerism আমাদের চোখে পড়িল না। 'ধারা' কাব্যখনি বঙ্গীয় পাঠকগণের আদরণীয় হইবে এ বিশ্বাস আমাদের সম্পূর্ণ আছে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

মুক্তধারা—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র পোদ্দার প্রণীত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ৮০+।৵০+১২৫ পৃষ্ঠা। সুদৃশ্য কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১৲

পুস্তকখানি সর্ব্বজনবিদিত উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের অনুকরণে লিখিত। পত্নীবিয়োগে বিধুর গ্রন্থকার ইহাতে প্রেমাপ্লুত শোকাশ্রুর 'মুক্তধারা' দিয়া প্রিয়াস্মৃতির তপণ করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে আত্মজীবনের এক অতি করুণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাব, ভাষা ও ভঙ্গীর জন্য লেখক চন্দ্রশেখর বাবুর নিকট পূর্ণমাত্রায় ঋণী হইলেও তিনি নিজের একটু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মৃত্যু শুধু বিয়োগ মূর্ত্তিতেই তাঁহার নিকট প্রকট হয় নাই। ইহা তাঁহার প্রিয়ার সহিত নিবিড়তর মিলনের সুখ আনিয়া দিয়াছে। লেখকের উচ্ছ্বাসে আন্তরিকতা আছে। ভাষা অনুকরণদোষদুষ্ট হইলেও একেবারে বিশেষত্বহীন নহে। দুই এক স্থলে যথা 'সদাজাত' 'তপোসক্তি', 'অন্তঃস্থলে' প্রভৃতি শব্দে এবং 'ভাবি নাই' স্থলে 'ভাবিয়াছিলাম না' লিখিয়া লেখক অনবধানতার পরিচয় দিয়াছেন। যে দুইখানি চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে তন্মধ্যে 'অর্দ্ধনারীশ্বর' মূর্ত্তির পরিকল্পনা অত্যন্ত হাস্যকর হইয়াছে।

এ সকল ত্রুটি লেখক সহজেই সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন। সাহিত্য-সাধনায় তিনি অবহিত হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। ভূমিকালেখক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভাষায় আমরাও বলি, মাতৃমন্দিরে পূজার দ্বারে যে নবীন লেখক অর্ঘ্য লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান, তাঁহার আশা ফলবতী হউক।'

হজরত মহাম্মদ—শ্রীমোজাম্মেল হক্‌ প্রণীত। ডবল-ক্রাউন ১৬ পেজী, ১৯০ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲

যিনি অর্দ্ধসভ্য, কুপ্রথা-পীড়িত, ধর্ম্মহীন আরবদেশ-বাসীদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিয়া এক সুসভ্য ও মহাপ্রতাপশালী জাতিতে পরিণত করেন এবং যাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম আজ জগতে কোটি কোটি লোকে ভজনা করিতেছে সেই মহাপুরুষ মহাম্মদের চরিতকথা অবলম্বন করিয়া যে একখানি কাব্য রচিত হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। আলোচ্য পুস্তকখানি পদ্যে লিখিত হইলেও ইহাকে ঠিক কাব্য বলা যাইতে পারে কি না তাহা বিবেচ্য। কারণ কাব্যের যাহা প্রাণ সেই কল্পনাই লেখক একেবারে বর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি এই মহাপুরুষের জীবনচরিত সম্বন্ধে যাহা জানেন এবং যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন তাহাই বোধ হয় বিবৃত করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে কাব্যের রস ও সৌন্দর্য্য আশা করা বৃথা। তথাপি আমরা গ্রন্থখানি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। কবিত্বের বিশেষ পরিচয় না থাকিলেও লেখকের পদ্য রচনায় লালিত্য এবং ভাষায় মাধুর্য্য আছে। এক 'নিকলানো' শব্দ ব্যতীত কোন শ্রুতিকটু উর্দ্দু বা ফার্সি শব্দের ব্যবহার দেখিলাম না। এই শব্দটির প্রতিও অনাবশ্যক পক্ষপাতিতা না

দেখাইলে ভাল হইত। মোটের উপর, পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি এবং মুসলমান গ্রন্থকার যে এইরূপ নির্দ্দোষ বাংলা পদ্যে তাঁহার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের জীবন-কাহিনী আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

"শ্যামচাঁদ।"

প্রাচীন মুদ্রা ১ম ভাগ শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ প্রণীত। ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ২২০+১/+১/ পৃঃ। এতদ্ভিন্ন ফুলপেজ ২০খানি হাফটোন ছবিতে ১৯৪টি মুদ্রার প্রতিকৃতি আছে। বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। স্বর্ণাক্ষরে কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ২৲

যে সকল বাঙ্গালী জ্ঞানানুশীলনে ব্যাপৃত থাকিয়া বঙ্গজননীর মুখোজ্জ্বল করিতেছেন রাখালবাবু তাঁহাদিগের অন্যতম। ইঁহাদিগের অনেকেই ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া থাকেন নতুবা জগতে তাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী নদীর তীরে বাস করিয়াও পিপাসার্ত্ত হইয়া বসিয়া থাকে। সৌভাগ্য হইলে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধরূপ জ্ঞানবারি-বিন্দু পানে পিপাসার নিবৃত্তি করিতে হয়। দেখিয়া সুখী হইলাম রাখালবাবু তাঁহার বহু পরিশ্রমলব্ধ বস্তু ভাষাজননীর শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য এই প্রাচীনমুদ্রা বাঙ্গালীর জন্যই লিখিয়াছেন। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে তিনি বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে লিখিত 'বাঙ্গালার ইতিহাস' ১ম ভাগও বাঙ্গালীর জন্যই লিখিয়াছেন। হয় তো উপন্যাসপ্রিয় বাঙ্গালী পাঠকের নিকট এসকল পুস্তকের যথেষ্ট সমাদর হইবে না। কিন্তু জ্ঞানপিপাসু বাঙ্গালী "প্রাচীনমুদ্রা" পাঠ করিয়া উপকৃত হইব।

রাখাল বাবু 'বাঙ্গালার ইতিহাসে' কতগুলি গ্রীক ভাষায় লিখিত নামের ভারতীয় উচ্চারণ দিয়াছিলেন। যথা বাবিরুষ আসুর, পারদ যথাক্রমে Babylon, Assyria, Parthia। ইহাতেও সেইরূপ কতকগুলি নাম আছে যথা খুরুষ (Cyrus), দরিয়াবুষ (Darius), হখামানিষীয় (Achoemenian) সুভূতি (Sophytes), তুরময় (Ptolemy) ইত্যাদি। ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী যেরূপে এই সকল গ্রীকনাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন তাহাতে কেবল ভারতীয় নাম শুনিলে তিনি কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। একটা পরিশিষ্টে এরূপ বিভিন্ন উচ্চারণ সম্বন্ধে নিয়মগুলি বুঝাইয়া দিলে ভাল হইত। তিনি স্বয়ং Alexander এই গ্রীকনামের ৩ প্রকার ভাষায় উচ্চারণ দিয়াছেন যথা (১) আলেকজন্দর বা সেকেন্দর (বাঙ্গালার ইতিহাস ২৯ পৃঃ) (২) আলেকজাণ্ডার (প্রাচীন মুদ্রা ২৪ পৃঃ) আলিকসুন্দর (ঐ ২৫ পৃঃ)

তবে অধিকাংশ ভারতীয় উচ্চারণের পার্শ্বে বন্ধনী মধ্যে ইংরাজী অক্ষরে গ্রীকনাম দিয়া ভাল কাজই করিয়াছেন। ভারতে যাহাদের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, গ্রীক উচ্চারণের সহিত ভারতীয় উচ্চারণ দিয়া ৩৬ ও ৩৭ পৃষ্ঠার সেই সকল গ্রীকরাজগণের যেরূপ একটি তালিকা দিয়াছেন বর্ণানুক্রমিক নাম সূচীতে নামের পার্শ্বে বন্ধনী মধ্যে গ্রীকনাম ইংরাজী অক্ষরে দিলে সেইরূপ তালিকাই হইয়া পড়িত। পাঠক প্রয়োজন হইলেও দেখিয়া লইতে পারিতেন।

পুস্তক মধ্যে যেখানে যে মুদ্রার বিবরণ আছে তাহার চিত্র যদি চিত্রতালিকায় থাকে তবে চিত্রের সংখ্যা জ্ঞাপক "ধ" "খ" প্রভৃতি অক্ষর বন্ধনী মধ্যে সেখানে থাকিলে পাঠক সহজেই চিত্রের সহিত মুদ্রার বিবরণ মিলাইয়া দেখিতে পারেন। যেখানে মুদ্রার দুই পৃষ্ঠার চিত্রের দীর্ঘ বিবরণ আছে সেখানে মধ্যে মধ্যে চিত্রের সহিত মিলাইতে পারিলে মুদ্রার বিবরণগুলি স্থানে স্থানে "একঘেয়ে" হইয়া উঠিত না। সেই জন্য চিত্রসূচীও চিত্রের নিকট থাকিলেই ভাল হইত। সর্ব্বত্রই ইংরাজী পুস্তকের গতানুগতিকতা করিতে হইবে এমন কোন কথাই নাই। যে সকল পুস্তকাবলম্বনে 'প্রাচীন মুদ্রা' লিখিত তাহার একটি পৃথক তালিকা মুদ্রিত করিতে পারিলে ভাল হইত।

রাখালবাবু যেমন "প্রাচীন মুদ্রা" দ্বারা বঙ্গীয় পাঠকের একটি অভাব দূর করিলেন তেমনই প্রত্নলিপিতত্ত্ব লিখিয়া অপর অভাব শীঘ্রই বিদূরিত করিবেন আমরা তাঁহার নিকট এ ভরসা করিতে পারি। এ বিষয়ে তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তি বাঙ্গালায় বিরল বলিয়াই আমরা জানি।

"ব্রজরাজ।"

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ—(জীবনী) -শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্-এ, ইত্যাদি প্রণীত। কলিকাতা ফাইন্ আর্ট প্রিন্টিং সিণ্ডিকেটে শ্রীপ্রিয়নাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ৩২+১২৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲

"হুতোম প্যাঁচার নক্সা" প্রণেতা এবং মহাভারতের অনুবাদকারী ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম আবালবৃদ্ধবনিতা বাঙ্গালীর নিকটেই পরিচিত। বাঙ্গালা সাহিত্যকে তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহা চিরস্থায়ী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই মহাত্মার একখানি বিস্তৃত জীবনচরিত ইতিপূর্ব্বে যে বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই, ইহা আমাদের লজ্জার কথা। সুখের বিষয় সমালোচ্য গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া মন্মথ বাবু বাঙ্গালীকে সেই লজ্জা হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

গ্রন্থারম্ভে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ রচিত ২৮ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ভূমিকা আছে। ইহাতে লেখক বঙ্গসাহিত্যের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটি দিয়াছেন তাহা সুপাঠ্য। এই নিবন্ধে তিনি Renaissance শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন "প্রতিভাপুনঃপ্রদীপ্তি"; অর্থানুবাদ ঠিকই হইয়াছে বটে কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এটি চলিবে না—শব্দটি বড় "কটমট" হইয়াছে। একস্থানে সমাস করিয়া তিনি লিখিয়াছেন "প্রতিভাপুনঃপ্রদীপ্তিপ্রোজ্জ্বল।'

গ্রন্থনায়ক ছাড়া আরও অনেকগুলি সমসাময়িক মনীষীর, পূর্ণপৃষ্ঠা আর্টপেপারে ছাপা প্রতিমূর্ত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। চিত্র সংখ্যা মোট ১৫ খানি—অধিকাংশই সুমুদ্রিত। ইহার মধ্যে এমন কয়েকখানি প্রতিমূর্ত্তি আছে যাহা পূর্ব্বে আমরা কোথাও ছাপা নাই।

মূল গ্রন্থখানি পাঠ করিলে বুঝি যায়, ইহা প্রণয়ন করিবার জন্য পুরাতন কাগজপত্র ঘাঁটিয়া লেখককে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাঁহার অনুসন্ধিৎসা, সত্যপ্রিয়তা ও শ্রমসহিষ্ণুতা বিশেষ প্রশংসনীয়। গ্রন্থের ভাষা মার্জ্জিত, রচনাটিও সুখপাঠ্য। মৃত মহাত্মার হৃদয়ের কোমলতা, স্বভাবের মধুরতা এবং আদর্শের উচ্চতা উত্তমরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাতে এমন অনেক তথ্য আছে যাহা বাঙ্গালী পাঠকের নিকট নূতন। গ্রন্থপাঠে জানিলাম ৺কালীপ্রসন্ন ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে "বিক্রমোর্ব্বশী" ও দুই বৎসর পরে "মালতীমাধবে"র বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন এবং পুস্তক দুইখানি সে সময়ে জনসমাজে বিলক্ষণ আদর লাভ করিয়াছিল। তাহা ছাড়া "সাবিত্রী সত্যবান" নামক আরও একখানি নাটক তিনি প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। এই বহি তিনখানি এখন দুষ্প্রাপ্য। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ যদি এই পুস্তক তিনখানি পুনর্মুদ্রিত করেন তবে ভাল হয়।

আশাহত

১

যেহমী তে মুকুলোদ্‌গমাদনুদিনং ত্বামাশ্রিতাঃ ষট্‌পদাঃ
তে ভ্রাম্যন্তি ফলাদ্‌বহির্ব্বহিরহো দৃষ্ট্বা ন সম্ভাষসে।
যে কীটাঃ তবদৃক্‌পথঞ্চ ন গতাঃ তে ত্বৎফলাভ্যন্তরে
ধিক্‌ ত্বাং চূততরো পরাপরপরিজ্ঞানেনাভিজ্ঞো ভবান্‌॥

চিরনিশিদিন তোমারে ঘেরিয়া
আশ্রিত অলিকুল
মধু ঝঙ্কারে জানাত সবারে
ফুটিলে তোমার ফুল;
সুধার আধার ফল সমাগমে
আশা তার পড়ে টুটি,
নয়ন পথেও পড়ে না যে কীট
সেই নেয় রস লুটি!
লজ্জার কথা হে চুত-লতিকা
কাহারে বিলালি মধু?
কেঁদে ফিরে যায় আপনার জন—
পর হল তোর বঁধু!

২

বেলাবনালী যদি বারিদানা-
মপেক্ষতে নীরনিসেচনানি।
তরঙ্গতা বা বন্যনীরতা বা
গভীরতা বা জলধের্বৃথৈব॥

বেলাবন যাচে যদি
শ্রাবণের বরিষণ ধার;
কি ফল বারিধি তব
বন্যনীর তরঙ্গ অপার?

৩

ধিক্‌ সর্ব্বর্ত্তুফলোদয়ং ধিগমৃতং স্বাদুঃসুপেয়ং জলং
ধিক্‌ শস্যং ঘৃতপূরসারসদৃশং ধিক্‌ তে চ বৃক্ষোন্নতিম্‌।
তদ্‌বল্লীষু বসন্তি যে চ বিহগাস্তে বৈ ক্ষুধাপীড়িতা
যান্ত্যান্যত্র ফলার্থিনস্তব ফলৈঃ কিং নারিকেল দ্রুমঃ॥

ওহে নারিকেল কি ফল তোমার
গগন ভেদিয়া যাওয়া,
কি ফল তোমার সর্ব্বঋতুতে
প্রচুর সুফল পাওয়া,
কি ফল তোমার ঘৃতপূর সার
শস্যে হৃদয় ভরা,
কি ফল তোমার বল্লীবিতানে
বিহগের বাস করা?
চির জীবনের আশা যে তাহার
টুটিয়া লুটিয়া যায়
ক্ষুধার সময় ফলে জলে যদি
তৃপ্ত না কর তায়!

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

সাহিত্য-সমাচার

বিগত ২৪শে বৈশাখ লুসিটানিয়া জাহাজডুবিতে ৺ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুঘটনার একবৎসর পূর্ণ হইয়াছে। ঐ দিবস কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয়ের সভাপতিত্বে তদুপলক্ষ্যে এক শোকসভার অধিবেশন হইয়াছিল। ইন্দুবাবুর বৃদ্ধ পিতা শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভায় পুত্রসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। "মানসী"র শৈশবে ইন্দুবাবু ইহার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। "মানসী" তাঁহার অচ্ছেদ্য স্নেহঋণে আবদ্ধ।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের "নবীন সন্ন্যাসী" উপন্যাসের হিন্দি অনুবাদ সত্ব, এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস ক্রয় করিয়া লইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিকের একখানি নূতন কবিতা গ্রন্থ যন্ত্রস্থ। সে খানির নাম হইবে "বনমল্লিকা।"

মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়ের নূতন কবিতা গ্রন্থ "সন্ধ্যাতারা" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ২৲



মৌলভি সাহেব ও তাঁহার ছাত্রগণ

MANASI PRESS, CALCUTTA.

মানসী ও মর্ম্মবাণী

৮ম বর্ষ | ১ম খণ্ড — আষাঢ় ১৩২৩ সাল — ১ম খণ্ড | ৫ম সংখ্যা

জৈনধর্ম্ম ও দর্শন *

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন এই তিনটি প্রধান ধর্ম্মমতের অভ্যুত্থান হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের নানা সম্প্রদায় ও নানারূপ আচার ব্যবহারের মধ্যে নিজের ছাপ রাখিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু তাহার জন্মভূমি ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া সিংহল, ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান আছে। আজকাল আমাদের দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হইতেছে কিন্তু জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতিশয় সীমাবদ্ধ। স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে একটি বা দুইটি প্যারাগ্রাফে মহাবীর কর্ত্তৃক প্রচারিত জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধে যে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাধারণতঃ দেওয়া হইয়া থাকে, তদরিক্ত অন্য কোন সংবাদ আমরা রাখি না। জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও এতদিন সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবার বিশেষ কোন সুবিধা ছিল না কারণ কয়েকখানি মাত্র গ্রন্থব্যতীত জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যাবতীয় গ্রন্থরাজি এতদিন অপ্রকাশিত ছিল; ভিন্ন ভিন্ন মঠের মোহান্তগণ লোকচক্ষুর অন্তরালে মঠের নিভৃত কন্দরে জৈন গ্রন্থ সকল রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা পাঠ বা আলোচনা করিবার অধিকার সহজে কাহাকেও দেওয়া হইত না।

বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় জৈনধর্ম্মের আলোচনা কেন হয় নাই, উপরোক্ত কারণ ব্যতীত তাহার আরও কতকগুলি কারণ আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোকের ধর্ম্ম, কিন্তু ভারতবর্ষের ত্রিংশ কোটি অধিবাসীর মধ্যে কেবলমাত্র ১৪ লক্ষ জৈনধর্ম্মাবলম্বী। এই কারণে বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় জৈনধর্ম্মের গুরুত্ব কেহ উপলব্ধি করেন নাই। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের বৌদ্ধ প্রভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট বলিয়া ভারত-ইতিহাসের আলোচনায় বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রসঙ্গ স্বতঃই উত্থাপিত

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মানভূম শাখায় পঠিত।

হয়। অশোকস্তম্ভ, হিয়েনসাঙ্গের ভারতভ্রমণ প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের যে কয়েকটি নির্ব্বিবাদ ঘটনাস্থল (Landmarks) আছে তাহাদের অধিকাংশই বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত। ভারতের প্রথিতযশাঃ রাজচক্রবর্ত্তিগণ বৌদ্ধধর্ম্ম রাষ্ট্রীয়ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করায় একদিন হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত-ভূমি পীতবসনে উপরঞ্জিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসে জৈনধর্ম্ম কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা এখনও জানা যায় নাই। ভারতের নানাস্থানে যে সকল জৈনকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বিগুমান আছে, সে সম্বন্ধে সম্যক্ অনুসন্ধান করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কারের কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা এতদিন পর্য্যন্ত হয় নাই। কয়েক বৎসর হইতে সেই চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। মহীশূররাজ্যে স্রবর্ণবেন গোলা নামক স্থানে চন্দ্রগিরি পর্ব্বতে যে কয়েকটি শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে তদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত জৈনমতাবলম্বী ছিলেন। এই কথা মিঃ ভিন্-সেণ্ট স্মিথের ভারত-ইতিহাসের তৃতীয় সংস্করণে (১৯১৪) উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু এখনও ইহা সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয় নাই। জৈনশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ষষ্ঠ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর দ্বারা জৈন-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং মহারাজ অশোকও প্রথমে পিতামহ গৃহীত জৈনধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন, পরে জৈনধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় চিন্তার উপর জৈনধর্ম্ম ও জৈনদর্শন কি প্রকার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার ইতিহাস লিখিবার সমগ্র উপকরণ এখনও সংগৃহীত হয় নাই। তবে একথা স্থনিশ্চিত যে, জৈনগণ ন্যায়শাস্ত্রে সমধিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ও বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণের সংসর্গে ও সংঘর্ষে প্রাচীন ন্যায়ের কতকাংশ পরিবর্জ্জিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া নব্যন্যায় প্রণয়নের আবশ্যকতা হইয়াছিল। শাকটায়ন প্রমুখ বৈয়াকরণিক, উমাস্বাতী স্বামী, সিদ্ধদেব দিবাকর, ভট্ট অলকঙ্কদেব প্রভৃতি নৈয়ায়িক, টীকাকৃৎকুলরবি মল্লিনাথ, কোষকার অমরসিংহ, অভিধানকার হেমচন্দ্র, গণিতজ্ঞ মহাবীর আচার্য্য প্রভৃতি মনীষিগণ জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ভারতীয় চিন্তাজগৎ তাঁহাদের নিকট বহুপরিমাণে ঋণী।

সম্যক আলোচনার অভাবে এতদিন জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধে নানারূপ ভ্রান্তধারণা প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। কেহ বলিতেন ইহা বৌদ্ধধর্ম্মেরই শাখামাত্র। কেহ বলিতেন হিন্দুধর্ম্মের নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে মহাবীর-স্বামী প্রবর্ত্তিত ইহা একটি সম্প্রদায় মাত্র। কেহ বা বলিতেন জৈনেরা আদৌ আর্য্যই নহেন কারণ তাঁহারা নগ্নমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। জৈনধর্ম্ম ভারতের আদিম আর্য্যগণের কোন একটী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের রূপান্তর মাত্র। এইরূপ নানামুনির নানাপ্রকার কল্পনাপ্রসূত অভিমত প্রচলিত ছিল। তাহাদের অসারতা ক্রমে ক্রমেই ধরা পড়িতেছে।

কয়েক বৎসর হইতে জৈনধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। কয়েকজন ইয়োরোপীয় মনীষীর আগ্রহে ও কয়েকজন সত্যানুরাগী স্বধর্ম্ম-প্রেমিক জৈন ধনাঢ্যব্যক্তির আন্তরিক চেষ্টায় ও যত্নে এতদিন অপ্রকাশিত জৈনশাস্ত্ররাজি এবং জৈনাচার্য্যগণ প্রণীত কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, অভিধান, দর্শন পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ সকল ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। জৈনগ্রন্থসমূহ কতক সংস্কৃত এবং কতক গুলি অর্দ্ধমাগধী নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত। বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনার ফলে মাগধী প্রাকৃত বা পালিভাষা আমাদের দেশে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। জৈনগ্রন্থ নিহিত অমূল্য রত্নরাজি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে অধুনা-অজ্ঞাত অর্দ্ধমাগধী বা জৈনপ্রাকৃতও সবিশেষ আলোচিত হইবে সন্দেহ নাই।

ইহা একরূপ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা নহে। মহাবীর-স্বামী জৈনধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা নহেন, তিনি প্রাচীনধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন মাত্র। মহাবীর বা বর্দ্ধমান স্বামী বুদ্ধ-দেবের সমসাময়িক ছিলেন। বুদ্ধদেব বুদ্ধত্বলাভ করিয়া

ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়া যে সময় ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন, তখন মহাবীর-স্বামী একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশিক্ষক। বৌদ্ধ ত্রিপিটকে নাতপুত্ত ("ঞাতপুত্ত") নামক যে নিগ্রন্থ ধর্ম্মপ্রচারকের উল্লেখ আছে সেই নাতপুত্তই মহাবীর স্বামী। তিনি জ্ঞাত-নামক ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে জ্ঞাতপুত্র (পালি-ভাষায় ঞাতপুত্ত) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। জৈনমতে মহাবীর-স্বামী চতুর্ব্বিংশতিতম বা শেষ তীর্থঙ্কর। তাঁহার প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে ত্রয়ো-বিংশতিতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ-স্বামী আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন। এতদিন পার্শ্বনাথ আদৌ ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না তৎসম্বন্ধে সন্দেহ ছিল কিন্তু ডাঃ হারমান জাকোবি প্রমাণ করিয়াছেন যে পার্শ্বনাথ খৃষ্টপূর্ব্ব ৮ম শতাব্দীতে জৈনধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। পার্শ্বনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী অপর ২২ জন তীর্থঙ্কর সম্বন্ধে এখনও কোনরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

জৈনদের আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেব। জৈনশাস্ত্র মতে তিনি বর্ত্তমান কল্পের প্রারম্ভে নাভির ঔরসে ও মেরুদেবীর গর্ভে অযোধ্যার ক্ষত্রিয় রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। রাজকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া তিনি প্রৌঢ়বয়সে সংসারে বৈরাগ্যবশতঃ যতিধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সাধনার দ্বারা অর্হত্বলাভ করিয়া জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার পুত্র ভরত। তাঁহার নাম হইতেই ভারতভূমি ভারতবর্ষ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। ঋষভদেব শ্রীমদ্ভাগ-বতে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। ভাগবতে ২৩টি অবতারের মধ্যে ঋষভ অষ্টম অবতার।

অষ্টমে মেরুদেব্যাস্তু নাভের্জাত উরুক্রমঃ।
দর্শয়ন্ বর্ত্ম ধীরাণাং সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃতম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত। ১ম স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়।

"অষ্টম অবতারে নাভির ঔরসে মেরুদেবীর গর্ভে জাত হইয়া ধীরব্যক্তিগণের সেব্য সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃত পন্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।"

ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে ঋষভ অবতারের আখ্যায়িকা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভে মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত প্রথম রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র আগ্নীধ্র, তাঁহার পুত্র নাভি। নাভিরাজার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ তাঁহার পুত্ররূপে ঋষভ নামে জন্মগ্রহণ করেন। ঋষভ রাজকার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র ভরতের উপর রাজ্যভার প্রদান করিয়া যতিধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ঋষভের অপর নয়জন পুত্র ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে নবযোগীন্দ্র নামে বিখ্যাত। ঋষভদেব সন্ন্যাসাশ্র[illegible] নানারূপ কদাচার রত [illegible] সংহারে ভাগবতকার [illegible]

"ভগবান্ ঋষভদেব অবধূতবেশে ভ্রমণ করিতে করিতে যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন তাহা অবগত হইয়া কলিযুগে কোঙ্ক, বেঙ্কট ও কুটক প্রভৃতি দেশের অর্হৎ নামা নৃপতি স্বয়ং ঐরূপ শিক্ষা করিবেন এবং অকুতোভয়ে বেদমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয়বুদ্ধি দ্বারা পাষণ্ডধর্ম্মরূপ কুপথ প্রবৃত্ত করাইবেন।"

শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধঃ। ৬ অধ্যায় ৯ শ্লোক।

ঐসকল দেশে অর্হৎ নামে কোন রাজা ছিলেন কি না তাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে জৈনতীর্থঙ্করদিগের অপর নাম অর্হৎ। মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে জৈনদর্শন আর্হতদর্শন নামে বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতের অবতার ঋষভদেব যে জৈন-ধর্ম্মস্থাপয়িতা আদি তীর্থঙ্কর তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ঋষভদেবের নাম বেদেও উল্লিখিত হইয়াছে;—সেখানেও তাঁহার নামের সহিত অর্হৎ শব্দ সংযুক্ত—

ওম্ নমো অর্হন্তো ঋষভঃ। (যজুর্ব্বেদঃ)

এই সকল কারণে প্রতীয়মান হয় যে জৈনধর্ম্ম অতি প্রাচীন। জৈনশাস্ত্রকারগণ বলেন,

জৈনধর্ম্ম অনাদিজ্ঞানোৎপন্নঃ কৃতযুগেঽপ্যবস্থিতঃ।
ইদানীমপ্যস্তি। ভাবিকালেঽপি স্থাস্যতি।

জৈনশব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থ "যাঁহারা জিনের উপাসনা করেন।" আনন্দগিরি শঙ্কর বিজয় গ্রন্থে জৈনশব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "জীতিপদবাচ্যস্য নেতিপদেন ন পুন-

র্ভবন্তস্মাজ্জন্মশূন্যা জৈনাঃ।" নাগানন্দ নাটকের মঙ্গলাচরণে বুদ্ধদেবকে জিননামে অভিহিত করা হইয়াছে যথা,

বুদ্ধো জিনঃ পাতু বঃ।

জিনশব্দের টীকায় বৌদ্ধটীকাকার অর্থ করিয়াছেন, "সংসারং জয়তীতি জিনঃ।" জৈনশাস্ত্রে জিনশব্দের এই প্রকার অর্থ দৃষ্ট হয়—"রাগদ্বেষাদিদোষান্ বা কর্ম্মশত্রূন্ জয়তীতি জিনঃ।" আনন্দগিরি জন্মার্থক ধাতু হইতে এবং অপরে জয়ার্থক ধাতু হইতে জিন শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করিলেও হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈনাচার্য্যগণের মধ্যে অর্থ সম্বন্ধে মুখ্যতঃ কোন মতদ্বৈধ নাই। যিনি নানারূপ তপস্যার দ্বারা কর্ম্মশত্রু নাশ করিয়া জন্মমরণাত্মক সংসার জয় করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনিই জিন। জৈনেরা চব্বিশজন জিন বা তীর্থঙ্করের পূজা করেন। তীর্থঙ্করের উপাসক বলিয়া তাঁহাদের আর এক নাম তৈর্থিক। আমাদের শাস্ত্রে এবং বৌদ্ধগ্রন্থে তৈর্থিক শব্দের বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বুদ্ধদেবের প্রচারিত নবীনধর্ম্মের প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া যে কয়টি প্রাচীন সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারে নানারূপ বাধাপ্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া বৌদ্ধজাতকগ্রন্থে বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে তৈর্থিক সম্প্রদায়ই প্রধান ছিল এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। জৈনদের আর এক নাম নির্গ্রন্থ। মহাবীর এই নির্গ্রন্থ মত প্রচার করিতেন বলিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। জৈনদের প্রধান ও প্রাচীনতম দিগম্বর সম্প্রদায় হইতে তাঁহাদের আর এক নাম নগ্ন। মেগাস্থিনীস তাঁহাদিগকে Gymnosophists বা নগ্ন দার্শনিক বলিয়া উল্লিখিত করিয়া গিয়াছেন।

জৈনধর্ম্মের দর্শন অংশ অনেকান্তবাদ বা স্যাদ্বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুপ্রসিদ্ধ অন্ধহস্তিন্যায়ের সাহায্যে স্যাদ্বাদ কি তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। অন্ধগণ হস্তীর বিভিন্ন অবয়ব স্পর্শ করিয়া হস্তীর আকার সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে বিতর্ক আরম্ভ করিয়াছিল। যে ব্যক্তি হস্তীর পদমাত্র স্পর্শ করিয়াছিল সে বলিল 'হস্তী স্তম্ভের মত', যে ব্যক্তি কর্ণ স্পর্শ করিয়া আসিয়াছিল সে বলিল 'হস্তী সূর্পের মত'; কেহ বা বলিল 'হস্তী রজ্জুর মত', কেহ বা বলিল 'হস্তী সর্পের মত'। এইরূপে প্রত্যেকে নিজ নিজ মত ঔদ্ধত্য ও উষ্ণতার সহিত সমর্থন করিতে লাগিল। বিতণ্ডা শেষে কলহে পরিণত হইল। তখন একজন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি আসিয়া বলিলেন যে তাহাদের প্রত্যেকেই সমভাবে ভ্রান্ত এবং অভ্রান্ত। তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে অন্ধগণ কেহই সমগ্রভাবে হস্তী স্পর্শ করিবার সুযোগ পায় নাই, অংশমাত্রের জ্ঞান হইতে সমগ্র হস্তীর সম্বন্ধে সেই জ্ঞান আরোপ করায় ঐরূপ মতভিন্নতা সম্ভবপর হইয়াছে। প্রত্যেকের জ্ঞান আপেক্ষিক সত্য হইলেও, হস্তি-শরীরের অংশ সম্বন্ধে সত্য হইলেও সমগ্র হস্তী-কলেবরের অপেক্ষায় তাহা সত্য নহে কোন বস্তুর কোন বিশেষ গুণ, অবস্থা বা সম্বন্ধ অপেক্ষা করিয়া যাহা সত্য তাহা সেই বস্তুর অন্য কোন গুণ, অবস্থা বা সম্বন্ধ বিষয়ে আরোপ করিলে জৈনগণ সেই মতকে একান্তবাদ বলিয়া অভিহিত করেন। কোন এক সত্যই কোন বস্তুর সম্বন্ধে একান্তভাবে সত্য নহে, তাহা বক্ষ্যমান বস্তুর কোন বিশেষ গুণ অবস্থা বা সম্পর্কের দিক দিয়া সত্য। জৈনদর্শন অনেকান্তবাদী। অনেকান্তবাদে কোন বস্তুর সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে সেই বস্তুর কি বিশেষ অবস্থা, গুণ বা সম্পর্কের অপেক্ষা করিয়া তাহা সত্য, তাহা বলিয়া দিতে হয়, যেন সেই আপেক্ষিক সত্যকে সেই বস্তু সম্বন্ধে ঐকান্তিক সত্য বলিয়া মনে করিয়া কেহ ভ্রমে পতিত না হন। প্রত্যেক দার্শনিকমত উক্তরূপ একান্তবাদ বা একদেশদর্শিতা দোষে দূষিত। তজ্জন্য দার্শনিক জগতে এত কলহ, এত মতবিভিন্নতা। জৈনগণ বলেন যে অনেকান্তবাদ তাঁহাদিগকে কুতর্কের অরণ্য হইতে উদ্ধার করে। অনেকান্তবাদী জৈন ন্যায়ে সাতটি "নয়" বা প্রতিজ্ঞা প্রকরণ (Predicables) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

১। স্যাদস্তি

২। স্যান্নাস্তি

৩। স্যাদস্তি চ নাস্তি চ

৪। স্যাদবাক্তব্য

৫। স্যাদস্তি চ অব্যক্তব্য
৬। স্যান্নাস্তি চ অব্যক্তব্য
৭। স্যাদস্তি চ নাস্তি চ অব্যক্তব্য

এই সাতটি প্রতিজ্ঞা প্রকরণ জৈন দর্শনের প্রসিদ্ধ "সপ্ত ভঙ্গি নয়" নামে বিখ্যাত। কোন বস্তুর বিধান বা স্থাপনা ইচ্ছা করিলে 'স্যাদস্তি' এবং নিষেধ বা অভাব বুঝাইতে হইলে 'স্যান্নাস্তি' বলিতে হইবে। বিধান ও নিষেধ এই উভয়েই ক্রমে ক্রমে ইচ্ছা করিলে অর্থাৎ প্রথমে স্থাপনা এবং পরে অস্থাপনা ইচ্ছা করিলে 'স্যাদস্তি এবং নাস্তি' এই তৃতীয় ভঙ্গের প্রয়োগ করিতে হইবে। বিধান ও নিষেধ উভয়েই যুগপৎ ইচ্ছা করিলে, 'স্যাদবাক্তব্য' বলিতে হইবে। এইরূপে চতুর্থ ভঙ্গ স্যাদবাক্তব্যের সহিত প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভঙ্গের একত্র ব্যবহারে যথাক্রমে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ভঙ্গের আবশ্যকতা হয়।* বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই সাত প্রকার Predicables বা প্রতিজ্ঞা জৈন ন্যায়ে স্বীকৃত হয়। প্রত্যেক নয়ের পূর্ব্বে ব্যবহৃত 'স্যাৎ' শব্দ হইতে জৈনদর্শন 'সাদ্বাদ' বলিয়া বিখ্যাত। এই 'স্যাৎ' শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা এখানে একটি অনিশ্চয়তাদ্যোতক অব্যয় পদ। ইহার অর্থ "কথঞ্চিৎ", "কতক পরিমাণে", "কোন এক প্রকারে"। 'স্যাদস্তি' বাক্যের অর্থ লক্ষ্যমান বস্তু এক প্রকারে আছে অর্থাৎ অন্য কোন প্রকারে তাহা নাই। যেমন 'স্যাৎ ঘটোঽস্তি' বলিলে বুঝিতে হইবে যে বস্তুটি ঘটরূপে আছে পরন্তু বস্ত্ররূপে নাই। অর্থাৎ তাহার মধ্যে 'আছে' এবং 'নাই' এই দুই ক্রিয়াপদেরই স্থান আছে সুতরাং থাকা এবং না থাকা কোনটাই তাহার পক্ষে একান্ত নহে। ঘট যে ঘটমাত্র, তাহা বস্ত্র নহে, এরূপ বাহুল্য উক্তির কারণ এই যে বেদান্তবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে সকল দ্রব্যের মধ্যেই একই সত্তা বিদ্যমান, অন্য কিছুই নাই। সেই জন্য জৈনদর্শনে বস্তুমাত্রেরই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ-সম্বন্ধবিশিষ্ট লক্ষণ স্বীকার করা হয়—'অস্তি' এবং 'নাস্তি'। তাহার আর একটি তৃতীয় লক্ষণ আছে তাহা অব্যক্তব্য। যেহেতু সৎ ও অসৎ একই কালে একই দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া আছে এবং যেহেতু এরূপ পরস্পরবিরোধী গুণের একত্র সমাবেশ ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে না, এই জন্য সকল বস্তু সম্বন্ধেই অব্যক্তব্য এই বিশেষণটিও প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। এই তিন লক্ষণের বিচিত্র যোগাযোগ দ্বারাই স্যাদ্বাদের সাতটি প্রতিজ্ঞা প্রণীত হইয়াছে।

গ্রীসদেশের ইলিয়াটিক সম্প্রদায় এক নিত্য পরিবর্ত্তনরহিত অদ্বৈত সত্তামাত্র স্বীকার করিয়া জগতের যাবতীয় পরিবর্ত্তন, গতি ও ক্রিয়ার সম্ভাবনা অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মতের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে হিরাক্লীটিয়ান সম্প্রদায় আবির্ভূত হন। তাঁহারা বিশ্বতত্ত্বের নিত্যতা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে জগৎ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, জগৎস্রোত অবারিতগতিতে বহিয়া চলিয়াছে ; এক মুহূর্ত্তও কোন বস্তু একভাবে স্থিতিশীল হইয়া থাকিতে পারে না। ইলিয়াটিক সম্প্রদায় প্রচারিত নিত্যবাদ এবং হিরাক্লীটিয়ান সম্প্রদায় প্রচারিত পরিবর্ত্তনবাদ পাশ্চাত্যদর্শনে বিভিন্ন সময়ে নানারূপে নানা সমস্যার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অনেকবার এই মতদ্বৈধের সমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছে কিন্তু কোন বারেই সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক বার্গসোঁর (Bergson) দর্শনে হিরাক্লীটীয়ান মতবাদের রূপান্তর মাত্র দেখিতে পাই। ভারতীয় দর্শনে বেদান্তের নিত্যবাদ এবং বৌদ্ধদর্শনের ক্ষণিকবাদের মধ্যেও উক্ত চিরন্তন দার্শনিক দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট রহিয়াছে। বেদান্তমতে জগদ্বস্তু নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য-স্বভাব চৈতন্যই কেবলমাত্র সৎ, বাকী যাহা কিছু

---

* তদ্বিধানবিবক্ষায়াং স্যাদস্তীতিগতির্ভবেৎ।
স্যান্নাস্তীতি প্রয়োগঃ স্যাত্তন্নিষেধে বিবক্ষিতে॥
ক্রমেণোভয়বাঞ্ছায়াং প্রয়োগঃ সমুদায়ভাক্।
যুগপত্তদ্বিবক্ষায়াং স্যাদবাচ্যমশক্তিতঃ॥
আদ্যাবাচ্যবিবক্ষায়াং পঞ্চমো ভঙ্গ ইষ্যতে।
অন্ত্যাবাচ্যবিবক্ষায়াং ষষ্ঠভঙ্গসমুদ্ভবঃ॥
সমুচ্চয়েন যুক্তশ্চ সপ্তমো ভঙ্গ উচ্যতে॥
সর্ব্বদর্শনসংগ্রহধৃতঃ অনন্তবীর্য্যঃ।

তাহা নামরূপের বিকার মাত্র, মায়াপ্রপঞ্চ—অসৎ। শঙ্করাচার্য্য সৎ-শব্দের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তদনুসারে পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চের কোন বস্তুই সৎ হইতে পারে না। "যদ্বিষয়া বুদ্ধির্ণ ব্যভিচরতি তৎ সৎ, যদ্বিষয়া বুদ্ধির্ব্যভিচরতি তদসৎ" *। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিনকালে যে বস্তু সম্বন্ধে বুদ্ধির ব্যভিচার হয় না তাহাই সৎ, যাহার সম্বন্ধে বুদ্ধির ব্যভিচার হয় তাহা অসৎ। যাহা বর্ত্তমান সময়ে আছে তাহা যদি অনাদি অতীতের কোন সময়ে ছিল না এবং অনন্ত ভবিষ্যতের কোন সময়ে থাকিবে না বলিয়া উপলব্ধি হয় তাহা হইলে তাহা সৎ হইতে পারে না—তাহা অসৎ। সৎ-শব্দ পরিবর্ত্তনের প্রতিযোগী। যাহাতে পরিবর্ত্তন হয়, হইয়াছে বা হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা অসৎ। পরিবর্ত্তনশীল অসৎবস্তুর সহিত বেদান্তের কোন সম্পর্ক নাই। বেদান্তদর্শন কেবলমাত্র অদ্বৈত সদ্‌ব্রহ্মের তত্ত্বানুসন্ধান করেন, বেদান্তের এই প্রথম কথা "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এবং ইহাই তাহার শেষ কথা কেন না—

'তস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।

বেদান্তের ন্যায় বৌদ্ধদর্শনে কোনরূপ ত্রিকাল অব্যভিচারী নিত্যবস্তু স্বীকৃত হয় নাই। বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদমতে "সর্ব্বংক্ষণং ক্ষণম্।" জগৎস্রোত অপ্রতিহতগতিতে নিয়ত ধাবমান—মুহূর্ত্তমাত্রেরও জন্য কোন বস্তু একই ভাবে একই অবস্থায় স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। পরিবর্ত্তনই জগতের মূলমন্ত্র। যাহা এই মুহূর্ত্তে বিদ্যমান আছে তাহা পরমুহূর্ত্তেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া রূপান্তরে পরিণত হইতেছে। এইরূপে অনন্ত মরণ ও অনন্ত জীবনের অনন্ত ক্রীড়া এই বিশ্বনাট্যে অবিরত অভিনীত হইতেছে। স্থিতি, স্থৈর্য্য, নিত্যতা এখানে অসম্ভব।

স্যাদ্বাদী জৈন দর্শন বেদান্ত ও বৌদ্ধমতের আংশিক সত্যতা স্বীকার করিয়া বলেন যে বিশ্বতত্ত্ব—জৈনদর্শনে যাহার পারিভাষিক নাম দ্রব্য—নিত্যও বটে, অনিত্যও বটে। দ্রব্য উৎপত্তি, ধ্রুবতা ও বিনাশ এই ত্রিবিধ পরস্পর বিরুদ্ধ অবস্থাযুক্ত। * বেদান্তদর্শনে যেরূপ স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণের কথা আছে, জৈনদর্শনে প্রত্যেক বস্তু বুঝাইবার নিমিত্ত সেইরূপ দুই প্রকারে তাহা নির্দ্দেশ করিবার ব্যবস্থা আছে। সেই দুই প্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশের নাম—নিশ্চয় নয় ও ব্যবহারিক নয়। স্বরূপলক্ষণ বলিলে যাহা বুঝায়, নিশ্চয়-নয় ঠিক তাহাই—বস্তুর নিজভাব বা স্বারূপ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহা বলা হয়। ব্যবহারিক নয় তটস্থ লক্ষণের অনুরূপ—তাহাতে বক্ষ্যমান বস্তু অপর কোন বস্তুর অপেক্ষায় বর্ণিত হয়। দ্রব্য নিশ্চয় নয়ে ধ্রুব কিন্তু ব্যবহারিক নয়ে তাহা উৎপত্তি ও বিনাশশীল, অর্থাৎ দ্রব্যের স্বরূপের বা স্বভাবের দিক দিয়া দেখিলে তাহা নিত্য পদার্থ কিন্তু নিয়ত পরিদৃশ্যমান ব্যবহারিক জগতের দিক দিয়া দেখিলে তাহা অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল। নিত্যতা ও পরিবর্ত্তন দ্রব্যসম্বন্ধে আংশিক বা আপেক্ষিকভাবে সত্য—ঐকান্তিক সত্য নহে। বেদান্ত দ্রব্যের নিত্যতার উপরই দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ভিতরের বস্তুর সন্ধান পাইয়া বাহিরের পরিবর্ত্তনময় জগৎপ্রপঞ্চকে তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন ; বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদ বাহিরের পরিবর্ত্তন প্রাচুর্য্যের প্রভাবে রূপরসশব্দস্পর্শাদির বৈচিত্র্যে মোহিত হইয়া তাহাদের অন্তঃস্থলনিহিত বহির্বৈচিত্র্যের কারণীভূত নিত্য-সূত্রটি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। স্যাদ্বাদী জৈনদর্শন ভিতর ও বাহির, আধার ও আধেয়, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী, কারণ ও কার্য্য, অদ্বৈত ও বিচিত্র, উভয়কেই যথাস্থানে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

এইরূপে স্যাদ্বাদ বিরুদ্ধ মতবাদের মীমাংসাপূর্ব্বক তাহাদের অন্তর্নিহিত আপেক্ষিক সত্যকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাকে পূর্ণতা প্রদান করে। William James প্রচারিত Pragmatism মতবাদের সহিত এই স্যাদ্বাদের অনেকাংশে তুলনা হইতে পারে। স্যাদ্বাদের মূলসূত্র বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রে বিভিন্ন আকারে স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। এমন কি শঙ্করাচার্য্য পারমার্থিক সত্যতা হইতে ব্যবহারিক সত্যতা যে কারণে বিশেষ

*গীতা, শঙ্করভাষ্য। ২।১৬

* উৎপাদব্যধ্রৌব্যযুক্তং সৎ।

করিয়াছেন, তাহা এই স্যাদ্বাদের মূলসূত্রের সহিত বিভিন্ন। শঙ্করাচার্য্য পরিদৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই—তিনি ইহার পারমার্থিক সত্তা অস্বীকার করিয়াছেন মাত্র। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি জগতের ব্যবহারিক সত্তা অতিশয় দৃঢ়তার সহিত প্রমাণিত করিয়াছেন। সমতলভূমিতে পরিভ্রমণ করিলে একতল, দ্বিতল ত্রিতল প্রভৃতি উচ্চতার নানারূপ ভেদ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু অভ্রভেদী তুঙ্গশৃঙ্গ হইতে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলে সপ্ততল প্রাসাদ ও একতল কুটীরে কোনরূপ ভেদ দৃষ্ট হয় না; সেইরূপ ব্রহ্মবুদ্ধিতে দেখিলে জগৎ মায়ার বিজৃম্ভনা, ঐন্দ্রজালিক স্বপ্নমাত্র —অনিত্য; কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে দেখিলে জগতের সত্তা অস্বীকার করা চলে না। দুই প্রকার সত্য দুই প্রকার points of view হইতে উৎপন্ন। বেদান্ত-সারে মায়ার যে প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা* দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও এইরূপ ভিন্ন দৃষ্টিজাত ভিন্ন সত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। বৌদ্ধদৃশ্যবাদে শূন্যের যে ব্যতিরেকীমুখী লক্ষণ দেওয়া থাকে তাহাতেও স্যাদ্বাদের ছায়া প্রকাশ পায়। "সদসদুভয়ানুভয়—চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং শূন্যত্বম্"—অস্তি, নাস্তি, অস্তি-নাস্তি উভয়ই, এবং অস্তি-নাস্তির-কোনটিও না, এই চারিপ্রকার ভাবনার যাহা বহির্ভূত তাহা শূন্যত্ব। এইরূপে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের বিভিন্ন স্থানে স্যাদ্বাদের মূলসূত্র স্বীকৃত হইলেও স্যাদ্বাদকে স্বতন্ত্র দার্শনিক মতবাদের উচ্চাসন দিবার গৌরব কেবলমাত্র জৈন দর্শনেরই প্রাপ্য।

জৈন দর্শনের বিশ্বতত্ত্ব দ্রব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে জৈন দর্শন সাময়িক সৃষ্টি (Creation in Time) স্বীকার করেন না। এমন এক সময় ছিল যখন সৃষ্টি ছিল না, সর্ব্ব শূন্যময় ছিল, কেবল সেই মহাশূন্যের মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তা একক বিরাজমান ছিলেন এবং সেই শূন্য হইতে কোন এক সময়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিলেন—এইরূপ মতবাদ দার্শনিক হিসাবে অতিশয় ভ্রমসঙ্কুল। শূন্য হইতে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতেই পারে না। সৎকার্য্যবাদিগণের মতানুসারে একমাত্র সৎ হইতেই সতের উৎপত্তি সম্ভব। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"†—সৎকার্য্য-বাদের এই মূল-সূত্রটি সংক্ষেপে ভগবদ্গীতায় সূত্রিত হইয়াছে। সাংখ্য ও বেদান্তের ন্যায় জৈনদর্শনও সৎকার্য্যবাদী।

জৈন দর্শন মতে দ্রব্য দুই প্রকার—জীব ও অজীব। "চেতনালক্ষণো জীবঃ।" যাহা চেতনাযুক্ত তাহাই জীব, তদতিরিক্ত অজীব।

জীব।

জীব সংসারী ও মুক্ত ভেদে দুই প্রকার। যাঁহারা কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া নিঃশ্রেয়স প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা মুক্তজীব বা পরমাত্মা। জন্মমরণাত্মক সংসারে পরিভ্রাম্যমান জীব সকল সংসারী। সংসারী জীব আবার স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে দুই প্রকার। জঙ্গম জীবের জৈনদর্শনে পারিভাষিক নাম ত্রস। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, বৃক্ষ, ইহারা স্থাবর জীব; ইহাদের কেবল মাত্র স্পর্শেন্দ্রিয় আছে, তজ্জন্য ইহারা একেন্দ্রিয়। দ্বীন্দ্রিয়, ত্রীন্দ্রিয়, চতুরিন্দ্রিয় ও পঞ্চেন্দ্রিয় জীবগণ জঙ্গম।

জৈনদর্শনে জীবতত্ত্বের যেরূপ বিস্তৃত আলোচনা আছে সেরূপ আর অন্য কোন দর্শনে নাই। এরূপ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে জৈনদর্শনের জীবতত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা সম্ভবপর নহে। জৈনদর্শনে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, ও বৃক্ষ ইহারা জীব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং জীবের সংজ্ঞানুসারে জীব চেতনালক্ষণ। জৈনমতে

---

* সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধিভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ।" মায়া সৎও নহে, অসৎও নহে। সৎ নহে, কেন না ব্রহ্মই একমাত্র সৎ, অসৎ নহে কেননা জগৎ মায়া হইতে জাত। ব্রহ্মবুদ্ধিতে মায়া সৎ নহে; জগদ্বুদ্ধিতে মায়া অসৎ নহে।—লেখক।

† গীতা ২।১৬

বিশ্বজগৎ সর্ব্বত্র জীবন ও চৈতন্যের পরিস্পন্দনে নিত্য অনুপ্রাণিত। প্রাণীদিগকে ইন্দ্রিয়ানুসারে শ্রেণীবিভক্ত করায় তীর্য্যক প্রাণীদের কোন প্রাণীর কয়টি ইন্দ্রিয় আছে জৈনদর্শনে তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পৃথিবী প্রভৃতিকে জীবশ্রেণীভুক্ত করিবার হেতুবাদও জৈন-দর্শনে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সকল কল্পনার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না তাহা নির্দ্ধারিত করিবার সময় আসিয়াছে। কৌতূহলনিবারণার্থ পৃথিবী প্রভৃতি একেন্দ্রিয় জীবের কয়েকটি উদাহরণ এস্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

পৃথিবীজীব—করতজ (quartz), হীরক, প্রবাল, সিন্দূর, হরিতাল, পারদ, দস্তা, চক এবং কয়েক-প্রকার প্রাকৃতিক লবণ ও খনিজ পদার্থ।

জলজীব—কূপার জল, ঝরণার জল, হ্রদের জল, বৃষ্টির জল, শিশির, বরফ, তুষার, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি। ইহারা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জীব।

অগ্নিজীব—জ্বলন্ত কয়লা, দীপশিখা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি। বৃক্ষ যে জীব পর্য্যায়ভুক্ত ও চেতনাযুক্ত তাহা আমাদের শাস্ত্রেও অনেক স্থলে আছে। মনুসংহিতার

অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ

আজকাল অনেকেরই নিকট সুপরিজ্ঞাত। মহা-ভারতে শান্তিপর্ব্বে বৃক্ষের জীবত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত হেতুবাদ আছে। তদ্ভিন্ন ছান্দোগ্য উপনিষদেও বৃক্ষের জীবত্ব উক্ত হইয়াছে। তাহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"বৃক্ষস্য রস-স্রবন-শোষণাদি-লিঙ্গাৎ জীববত্বং। দৃষ্টান্তশ্রুতেশ্চ চেতনাবন্তঃ স্থাবরা ইতি। বৌদ্ধ কানাদমতমচেতনাঃ স্থাবরা ইত্যেতদসারমিতি দর্শিতং ভবতি।"

শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে শ্রুতিতে অপর স্থলে বৃক্ষের চেতনত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং বৌদ্ধ ও বৈশেষিক দর্শন মতে বৃক্ষ অচেতন। উক্ত ভাষ্যের উপর আনন্দগিরি টীকা করিয়াছেন—

"বৈশেষিক-বৈনায়িকাভ্যাং স্থাবরাণাং নির্জ্জীবত্বেন অচেতনত্বমুক্তম্।"

বৌদ্ধ ও বৈশেষিক মতে বৃক্ষ শুধু অচেতন নহে, তাহারা নির্জীব। আজকাল আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করিয়াছেন যে বৃক্ষ জীবপর্য্যায়ভুক্ত। জরা ব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা অন্যান্য জীব যেরূপ ভাবে আক্রান্ত হয়, বৃক্ষও সেরূপ হয়। মাদক দ্রব্যের প্রভাবও বৃক্ষের উপর লক্ষিত হয়। বৃক্ষের ব্যাধিগ্রস্ততা এবং তাহার চিকিৎসা আমাদের দেশে প্রাচীনকালে পরিজ্ঞাত ছিল। শুধু দার্শনিক কল্পনাতে তাহা পর্য্যবসিত ছিল না—চতুঃষষ্টি কলার মধ্যে বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ অন্যতম। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ-অধ্যায়ে ব্যবহারিক উপদেশই দৃষ্ট হয়। আচার্য্য বসুর যুগান্তরকারী আবিষ্কারের ফলে আমাদের লুপ্ত বিজ্ঞান নবীন গৌরবে পুনঃস্থাপিত হইতেছে।

সংসারী জীব কর্ম্ম জড়িত হইয়া জন্মজন্মান্তর নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিতেছে। সাধনা দ্বারা কর্ম্মক্ষয় হইলে জীব নিজ শুদ্ধ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হইবে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, "জীব কর্ম্মের সহিত কখন এবং কেন সংযুক্ত হইল? পরজন্ম পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফল; কিন্তু প্রথম জন্মে জীব কর্ম্মবন্ধে আবদ্ধ হইল কেন?" জন্মান্তরবাদের বিরুদ্ধে এই তর্ক সচরাচর উত্থাপিত হয়। দৈব, অদৃষ্ট, পুরুষকার প্রভৃতি যে সকল কঠিন সমস্যা জন্মান্তরবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট, এই প্রশ্নের মীমাংসার উপর সে সকল সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান নির্ভর করে। এই প্রশ্নের উত্তরে জৈনেরা বলেন যে, "প্রথম জন্মের কল্পনাই অসম্ভব—কারণ সংসার অনাদি। যে জীব একবার মুক্ত হইয়াছে কর্ম্মের সহিত পুনরায় যে কদাচ জড়ীভূত হইতে পারে না। সংসারী জীবগণ চিরদিনই সংসারী —তাহারা কখনও বিশুদ্ধ জীব স্বভাবে ছিল না, অনন্ত কাল ধরিয়া কর্ম্মের সহিত বিজড়িত হইয়া অশুদ্ধভাবে জন্মের পর জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আসিতেছে। এই

কর্ম্ম-বিজড়িত জীবভাবের নাম বিভাব। বিভাব অনাদি।" ইহা প্রশ্নের মীমাংসা হইল না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এরূপ প্রশ্নের এতদ্ভিন্ন অন্য কোন সদুত্তর হইতে পারে কি না তাহা সন্দেহের বিষয়। জৈনদর্শন এই চিরন্তন প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন তাহা পুরাতন উত্তর এবং তাহা জৈন দর্শনের বিশেষত্ব নহে। বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রেও এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিয়াছেন।*

জৈনমতে জীব বা আত্মা স্বভাবতঃই লঘু। কর্ম্মদ্বারা বিজড়িত হইয়া গুরুভাব প্রাপ্ত হওয়ায় এই লৌকিক জগতে বিচরণ করে। স্বভাব প্রাপ্ত হইলে স্বীয় লঘুতা নিমিত্ত উর্দ্ধগামী হইয়া স্বীয় স্থান আলোকাকাশে চলিয়া যায়। জৈনমতে আর একটি নূতন কথা এই যে জীবের (অর্থাৎ আত্মচৈতন্যের) প্রদেশ বা কায় আছে। প্রদেশ একরূপ সূক্ষ্ম আকাশ। চৈতন্যকে এইরূপ গতিযুক্ত ও প্রদেশযুক্ত রূপে কল্পনা অন্য কোন দর্শনে দৃষ্ট হয় না। পাশ্চাত্য দর্শনের সংজ্ঞানুসারে যাহা সাবয়বী দেশব্যাপ্ত তাহাই জড়, যাহা তদ্রূপ নহে তাহা চৈতন্য। আত্ম-চৈতন্যে গতি ও আকাররূপ জড়ধর্ম্মের আরোপ হেতু জৈন দর্শনে যে সকল দার্শনিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহার সম্যক্ আলোচনা এখানে সম্ভবপর নহে।

জৈন দর্শনে জীব সংখ্যা পুরুষের ন্যায় অনন্ত। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ নিষ্ক্রিয় সাক্ষী চৈতন্য মাত্র—জৈন-জীবের ন্যায় উর্দ্ধগামী ও প্রদেশী নহে। সাংখ্য পুরুষ তত্ত্বতঃ প্রকৃতির সহিত কখনও একীভূত হয় না; ভ্রমবশতঃ নিজেকে প্রকৃতির সহিত জড়ীভূত কল্পনা করে। সেই ভ্রম তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অপনোদিত হইলে পুরুষ কৈবল্য প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জৈনমতে জীবকায়ে কর্ম্মরাশি প্রকৃত প্রস্তাবেই সংযুক্ত হয়। তপঃ সাধনাদির দ্বারা সেই সংযুক্ত কর্ম্মরাশি নষ্ট হইলে এবং নূতন কর্ম্মাগম বন্ধ হইলে জীব স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। সেই সময়ে জীব অনন্তজ্ঞান প্রভৃতি আট প্রকার গুণের অধিকারী হয়; সাংখ্য পুরুষ কিন্তু নির্গুণ।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীঅম্বুজাক্ষ সরকার।

প্রার্থনা

জীবন প্রভাতে মোর
না ভাঙ্গিতে ঘুমঘোর—
দেখা দিয়েছিলে, স্বামি,
অন্ধ, জ্ঞানহীনে ছলি,
কখন গিয়েছ চলি,—
তাহা ত জানিনে আমি।
জাগিয়া উঠিয়া ভবে,
নয়ন মেলিনু যবে—
খুঁজিনু ব্যাকুল হয়ে
তুমি নাই—তুমি নাই—
বাঁচিয়া রহিনু তাই
ক্ষণিক স্মৃতিটি লয়ে।

তোমারে কামনা করি
কোন মতে ধৈর্য্য ধরি,
তোমার আশায় আছি।
কতনা লাঞ্ছনা সহি,
দুর্ভর জীবন বহি,
—কেবল মরণ যাচি।
জীবনের বেলাভূমে
আধ জাগা আধ ঘুমে,
ফেলিয়া গিয়াছ যারে—
হে সখা, যেওনা ভুলে,—
নিও তারে বুকে তুলে
মরণ সাগর পারে।

শ্রীঅমিয়াময়ী দেবী।

* ন কর্ম্মবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ। ২য় অধ্যায় ১ম পাদ ৩৫ সূত্র।

রোগশয্যার প্রলাপ

[১৬]

একদিন মনে করিলাম,—এদেশে ৭২ কোটি লোকই হউক আর ৮২ কোটি লোকই হউক, এই দেশের উৎপন্ন শস্যেই গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিয়া চলিত, এখন তাহা আর পারিতেছে না কেন?—ভাবিয়া দেখিলাম,—অন্নাভাবের কারণ হইয়াছে বিদেশে শস্য রপ্তানী এবং বস্ত্রাভাবের কারণ হইয়াছে বিদেশী বণিকের মস্তিষ্কপ্রসূত কলকারখানায় প্রস্তুত সুলভ ও সূক্ষ্ম বস্ত্রের আমদানী; আর এই দুইয়ের উৎপাতে দেশে সুখস্বাচ্ছন্দ্য লোপ হইতে বসিয়াছে। ইহার প্রতীকার কি নাই? মন আরও ভাবিতে লাগিল, এই শস্য রপ্তানীতে ত দেশের কৃষক সম্প্রদায় অর্থশালী হইতেছে; সেই অর্থের সাহায্যে অন্ন ক্রয় করা যাইতে পারে সুতরাং ইহাতে ক্ষতি কি?—ক্ষতি আছে। কৃষক শস্য দেশে বিক্রয় করিলে দেশের লোকও তাহাকে অর্থ দিয়া আপনাদের অন্ন ক্রয় করিতে পারে, কিন্তু বিদেশে শস্য বিক্রয় করিলে বিদেশী অর্থ কেবল কৃষকের হস্তগত হয়, দেশের লোক তৎক্ষণাৎ সে অর্থ পায় না। তাহাদের নিজের অর্থ দিয়াই তখন বিদেশে অন্ন ক্রয় করিতে হয় তাহাতে ক্রমশঃ দেশের অর্থও (দেশের শস্যের ন্যায়) বিদেশীর করগত হইয়া পড়ে এবং কালে দেশই শস্য ও অর্থ উভয়েই বঞ্চিত হইয়া পড়ে এবং দরিদ্র ও অন্নহীন হইয়া মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত হইতে থাকে। আমাদের দুর্দ্দশা এইরূপেই সাধিত হইতেছে। ইহার প্রতীকার করা অসম্ভব। বিদেশী বণিকেরা অন্ন চেষ্টায় আসিয়া শস্যশালী ভারতীয় কৃষককে দাদন দিয়া অর্থলোভে মুগ্ধ করে। তাহারা শস্য সংগ্রহের জন্য যে পরিমাণে অর্থব্যয় করিতে সমর্থ, আমাদের দেশে সে পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়া দেশের শস্য দেশে রাখিতে পারে না। এইজন্য আমাদের দেশে নিয়ম ছিল, উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ রাজকররূপে গৃহীত হইত। রাজায় প্রজায় অর্থ সম্বন্ধ ছিল না। এ নিয়মে প্রজা রাজকরের দায়ে নিগৃহীত হইতে পারিত না। যে বৎসর যেমন উৎপন্ন হইত সে বৎসর তদনুপাতে ষষ্ঠাংশ দিয়া রাজকর শোধ দিতে পারিত। একবারে অজন্মা হইলে রাজাও প্রজার ন্যায় কিছু পাইতেন না। এই-রূপে প্রজাপালন ও শস্যরক্ষার ব্যবস্থা দেশে ছিল। অর্থ সম্বন্ধ হওয়া অবধি সে নিয়ম উল্‌টাইয়া গিয়াছে। ইহাতে কৃষকশ্রেণীর ধনাগম ও রাজকরের হ্রাস বৃদ্ধি বা অপ্রাপ্তি-দোষ দূরীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু উভয়েই ধনলাভ করিলেও দেশের কৃষককুলও ধনী হইতেছে না, জমীদারকুলও ধনী হইতে পারিতেছে না, তাহার প্রধান কারণ সেই অন্নবস্ত্রহীনতা। কৃষক বিদেশে শস্য বিক্রয়ে ধনলাভ করিয়া নিজেকে এবং সমস্ত দেশকে বিদেশে অন্নবস্ত্র ক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছে। তাহারা একের নিকট যাহা লাভ করিতেছে, অপর দুই ব্যক্তিকে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের ব্যপদেশে তাহাই আবার সলাভ ধরিয়া দিতেছে। কাজেই দেশের অন্নাভাবের প্রতি-ষেধক কোন উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারিতেছে না।

এখন এমন কোন জমীদার আমাদের দেশে বর্ত্তমান নাই যে, তিনি নিজ জমীদারীর উৎপন্ন শস্য বিদেশী বণিকের ব্যাপার হইতে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারেন। বিদেশী বণিক যৌথ ধনে ধনী হইয়া অন্নহীন স্বদেশের জন্য অন্ন সংগ্রহ করিতে আসিয়া অকাতরে অথচ সুকৌশলে অর্থব্যয় করে, সে ক্ষেত্রে আমাদের জমীদার বা মহাজন স্ব স্ব স্বতন্ত্র চেষ্টায় সেই যৌথ অর্থের প্রতি-যোগিতায় শস্যরক্ষা করিতে পারিয়া উঠেন না। তদ্ভিন্ন এভাবে যে দেশের অন্ন রক্ষা করা যায়, বা স্বদেশের অন্ন রক্ষা করাই যে শস্যবাণিজ্যের আর একটা মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহাও এদেশের জমীদার বা মহাজনের শিক্ষাবহির্ভূত, জ্ঞানবহির্ভূত। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এদেশের লোকের

এরূপ প্রয়োজন, এরূপ অভাব এমন কি এরূপ আশঙ্কারও কারণ ছিল না। যদি দেশের অবস্থা এমনই হয়, তবে কি উপায় হইবে? অন্য বুভুক্ষিত দেশের লোকেরা প্রচুর অর্থ-হস্তে যখন আমাদের দেশের অন্নহরণ করিতে আসিয়াছে, আর তাহাতে অর্থের প্রতিযোগিতায় যখন আমাদের বাধা দিবার শক্তি নাই, তখন আমাদের জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিবার অন্য পন্থা আবিষ্কার করিতেই হইবে। সে উপায় আর কিছুই নয়,—আমাদেরও অপর দেশে গিয়া আমাদের দেশের অন্য পণ্য বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া অন্য অন্নশালী দেশ হইতে অন্ন ক্রয় করিয়া আনিতে হইবে।

এই যে কয়টা শব্দে অতি সহজে এই উপায় আবিষ্কার করা গেল, তত সহজে ইহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব নহে তাহাও বুঝি, আর এ উপায় কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, তাহার পূর্ব্বে কত শিক্ষা কত আয়োজন এবং কত অর্থের প্রয়োজন তাহাও বুঝি। এই সকল ভাবিলে এ দরিদ্রদেশে বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ উপায় অবলম্বন চেষ্টা একান্ত অসম্ভব বলিয়াই প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া আর নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিবার সময় বা অবসর আমাদের নাই। বিদেশী বণিকের শস্য সংগ্রহে আগ্রহ ও অর্থব্যয় দেখিয়া আমরা বুঝিয়াছি যে আমরা শস্য বিক্রয় না করিয়া যখন আর এ যুগে নিস্তার পাইব না, তখন বিদেশী বণিক্‌কে শস্যের জন্য আমাদের এদেশে যাহাতে না আসিতে হয়, আমরাই আমাদের শস্য সম্ভার লইয়া তাহাদের গৃহদ্বারে পঁহুছাইয়া দিতে পারি, তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। তাহাতে লাভালাভের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা আমাদের দেশের অন্নের উপযুক্ত পরিমাণ শস্য দেশে রক্ষা করিবার যে সুবিধা পাইব এবং উদ্বৃত্তাংশ লইয়াই যে অন্য দেশে গিয়া বিক্রয় কার্য্য চালাইতে পারিব, তাহার কতকটা সম্ভাবনা আছে। এখন স্বদেশে অন্ন নাই বলিয়া স্বদেশের অর্থ লইয়া ভিন্ন দেশে অন্ন ক্রয় করিতে বিদেশী বণিক্‌কে যে বিপুল আয়োজন করিতে হইয়াছে, আয়োজনের ব্যয়-ভারে যে তাহাদের অর্থ অনেক নষ্ট হইতেছে, তাহার কতকটা প্রতীকার যদি এ ব্যবস্থায় আমরা করিয়া দিতে পারি অর্থাৎ আমাদের ব্যয়ে আমাদের উদ্বৃত্ত শস্য লইয়া তাহাদেরই অন্নসংস্থান জন্য তাহাদের গৃহদ্বারে পঁহুছাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে, তাহারা কতকটা সুবিধা বোধও করিতে পারে; সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও রক্ষার উপায় হয়। তাহারা আমাদের শস্য লইতে যেমন নিজেরা আসিতেছে, তেমনি আমরাও বাহির হইয়া অন্যদেশে আমাদের জন্য অর্থ বা শস্য সংগ্রহ করিতে না গেলে, আমাদিগকে দিন দিন আরও দুর্দ্দশায় পড়িতে হইবে। বস্ত্র সম্বন্ধে যেমন আমরা পরের মুখ চাহিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছি, ঘরের অন্ন পরের হাতে বিক্রয় করিয়া, কালে আবার অন্নের জন্যও তেমনি পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িব। অর্থ বা অন্ন সংগ্রহার্থ আমরা বিদেশে বাহির হই না বলিয়া, অপরে দয়া করিয়া এদেশে শস্য বিক্রয় করিতে না আসিলে আমরা এখনই শস্যাভাব অনুভব করিতেছি। এ প্রথা বেশী দিন চলিলে, আমাদের বিদেশী শস্য-ক্রেতার প্রদত্ত অর্থও যে লাভে মূলে বাহির করিয়া লইয়া যাইবে, ইহা নিশ্চয়। গত দুর্ভিক্ষের সময় কালিফর্ণিয়ার শস্য বিক্রেতারা এইরূপেই আমাদের উপর দয়া করিয়া গ্রেহাম, রেলি, জার্ডিন স্কিনার প্রভৃতি বিদেশী বণিক্ প্রদত্ত অর্থ লাভে মূলে লইয়া গিয়া, আমাদের প্রাণরক্ষা অথচ ধন হরণ করিয়া মহানুভবতা দেখাইয়া গিয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে চাউলের দর ৪॥০ টাকা হইতে ৫॥০ টাকায় স্থায়িভাবে দাঁড় করাইয়া দিয়া গিয়াছে।

মন এই পর্য্যন্ত ভাবিয়া, কার্য্য-কারণ প্রতীকার চিন্তায় এতদূর মীমাংসা করিল বটে, কিন্তু যতটা অর্থ পাইলে, আমাদের দেশের লোক বহির্ব্বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে পারে, তাহা কোথা হইতে আসিবে, তাহার ভাবনায় অস্থির হইয়া পড়িল; বহির্ব্বাণিজ্য চালাইতে পারে এমন সুনিপুণ লোকেরও ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন হইয়া উঠিল। তাহার পর মনে হইল, দক্ষিণ আমেরিকায় বৃটিশ গায়নায় যদি লক্ষাধিক হিন্দুস্থানী বণিক্ বসবাস করিয়া বিদেশী

বাণিজ্য চালাইয়া তাহাতে সম্যক্ সাফল্য ও কৃতিত্ব লাভ করিয়া থাকিতে পারে, তবে আমাদের দেশের এই অসম্ভব সম্ভব হইতেই বা বিচিত্রতা কি ? ইহার জন্য প্রাথমিক চেষ্টা কিরূপে করিতে হইবে, কিরূপ লোক লইয়া কার্য্যের সূত্রপাত করিতে হইবে, ইহার জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যে শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের প্রয়োজন হইলে, সেরূপ শিক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষাসাহায্য-সমিতির সাহায্যে কোন কোন দেশে শিক্ষার্থী পাঠান আবশ্যক কিনা,—ইত্যাদি বিষয়ে দেশের ধুরন্ধরগণের ভাবিবার ও কর্ত্তব্য নির্ণয়ের যে সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সকল ভাবনায় মন আরও অবসন্ন হইয়া সায় দিল—তথাস্তু।

শাস্ত্রবচনে "চান্তিমে কলৌ" কল্কি অবতার হইবার পূর্ণ ভরসা পাইয়া থাকিলেও আমাদের নিজের হাতে তাঁহার কার্য্য লইতে ছুটিতেছি কেন ? অবশ্য কলিকালেও পোয়াটাক ধর্ম্ম আছে, আর সেই ধর্ম্মটুকু দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা 'সংস্কার' 'সংস্কার' করিয়া ক্ষেপিতেছি, কিন্তু সংস্কারটা কোনও অবতারই কোনও-দিন আমাদের হাতে ছাড়িয়া দেন নাই, নিজের কাজ নিজেই করিয়া গিয়াছেন। এই সত্যযুগাচার ভ্রষ্ট হইলে, ত্রেতার লোকের কথাটা ভুলিয়া যাইতেছি কেন ? ধ্রুব-সত্য শাস্ত্রবাণী পুরাণেতিহাস নিবদ্ধ অবতার সাহায্য-প্রাপ্তির আশা থাকিলেও বিশেষ কোন আশার কথা ছিল না, কারণ তাঁহারা জানিতেন, সত্যযুগের আর ফিরিবার সম্ভাবনা নাই এবং তাঁহাদের যে তিন পোয়া ধর্ম্ম ছিল, ভৃগু-রাম ও দাশরথী-রাম এই দুই অবতারের কৃত একুশবার নিঃক্ষত্রিয় ও রাক্ষসাদি বধ সত্ত্বেও তাহাও রক্ষা হইবে না, কারণ দ্বাপর আসিলে দ্বাপরের লোককে আর এক পোয়া হারাইতে হইবে। আবার, দ্বাপরে বলরাম ও কৃষ্ণ নানা উপায়ে কুরুক্ষেত্র-প্রভাস বাধাইয়াও দ্বাপরের দুই পোয়া ধর্ম্মও রক্ষা করিয়া যাইতে পারেন নাই। পারিবেন কেন ?—শাস্ত্রের ব্যবহার যে তাঁহারাই স্বীয় উক্তিতে পূর্ব্বে আচারগত শৃঙ্খলার যে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা উল্টাইয়া নিজেরাই মিথ্যাবাদী হইবেন কি ? কাজেই কলিকাল প্রবেশ করিতে না করিতে দ্বাপরের দুইপোয়া ধর্ম্মও ক্ষয়িত হইয়া কলিকালে আসিয়া এক পোয়ায় দাঁড়াইয়াছে। ভগবান একালের জন্য ধর্ম্মের এই এতটুকুই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, কাজেই আমাদের একদল এতটুকুই লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, বেশী চাহিলে পাইব কোথা ?—দিবেই বা কে ? মালিকেরই যে এই ব্যবস্থা ! যে অনন্ত শক্তি হইতে অনন্ত কাল-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহার ফলে যে পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহার তুলনায় সমাজ শক্তি এত ক্ষুদ্র যে তাহার বিরুদ্ধে কি করিতে পারিবে ?

তবে আমাদের একটা বড় ভরসা আছে।—সেটা কি জান ? সেটা কিন্তু সত্য ত্রেতা দ্বাপরের লোকগুলার অপেক্ষা আশ্বাস-জনক এবং লাভকর। সত্যযুগের অবতার মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, ত্রেতাযুগের অবতার ভৃগুরাম ও দাশরথী রাম এবং দ্বাপরাবতার বলরামযুক্ত কৃষ্ণ, কেহ ম্লেচ্ছাচার ক্ষয় করিয়া সত্যযুগ ফিরাইয়া আনিয়া দিতে পারেন নাই, চেষ্টাও করেন নাই। আমাদের পূর্ব্ব কলিরই অবতারগণের (বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতির) কীর্ত্তিও পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের অবতারগণের কীর্ত্তির অনুসরণ করিয়াছে বটে কিন্তু আমাদের শেষাবতার ভগবান কল্কি তেমন করিয়া নিরাশ করিবার জন্য আসিবেন না, তাঁহার আগমনের পর যে কলিকালের এই এক পোয়া ধর্ম্মও সঙ্কুচিত করিয়া "পাপং পূর্ণং পুণ্যং নাস্তি" রূপ ভীষণ একটা কালের প্রবৃত্তি হইবে আর তাহার মধ্যে যে তিনি এই পৃথিবীটাকে ফেলিয়া দিয়া হাবুডুবু খাওয়াইবেন, তাহা নহে। তেমন ভীষণ কালের কল্পনা শাস্ত্রকারেরা করেন নাই, করিতে পারেন নাই, কারণ ধর্ম্মই পৃথিবীকে ধরিয়া আছেন। ধর্ম্ম থাকিবে না অথচ পৃথিবী থাকিবে এরূপ হয় না, তাই কোন শাস্ত্রে ভগবদুক্তির মধ্যে জাগতিক ব্যবস্থার সেরূপ কালের অস্তিত্ব নাই। অতএব ভগবান কল্কির আসিবার পরেই "পুণ্যং পূর্ণং পাপং নাস্তি"—সত্যযুগ আমরা ফিরিয়া পাইব। যখন চার পোয়া ধর্ম্মই

ছিল, তখনই ত্রেতার পতন (এক পোয়া ধর্ম্মহীনতা) সত্যযুগের লোকেরা আপনাদের পূর্ণ পুণ্যাবরণ বলেও নিবারণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, আর এখন এই পোয়াটাক ধর্ম্মের বলে, আমরা ভগবানের অবতারের কোন তোয়াক্কা না রাখিয়া সমাজ সংস্কার করিয়া পৃথিবীতে কেবল পুণ্যাত্মক সমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব, এ কথা কি সম্ভব? তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, পুণ্য প্রবৃত্তি যাহা আছে, তাহার দম্ভ করিও না, তাহার বলে ভগবানের উক্তিতে অবিশ্বাস করিতে কালস্রোতে বাধা দিতে বা অবতারের কার্য্য নিজহস্তে লইতে যাইও না! এখানেও সেই স্বদেশী আন্দোলনের নিরাপত্তি সহিষ্ণুতা (Passive Resistance) দেখাইয়া যাও।

কিয়ৎ পরে মনে হইল, এই ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ চেষ্টাটাই হয়ত ধর্ম্মপ্রবৃত্তিমূলক নহে। দম্ভে ইহার উৎপত্তি, যশোলাভের আকাঙ্ক্ষাই ইহার পরিণাম, কাজেই ইহাও বিধিনির্দ্দিষ্ট কালোচিত ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের নিগূঢ় বন্ধনে কর্ম্মসূত্রে একালের ধার্ম্মিক ও ভ্রষ্টাচারী উভয়েই সমান ভাবে বাঁধা আছে। ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল, তবে কি ধার্ম্মিকের দল নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে?—বাপরে! তাও কি হয়!—নিশ্চেষ্ট থাকিলে কলির মাত্রা পূর্ণ হইবে কিসে? পাপের ভরা ভরিবে কেন? অকর্ম্মা বা নিষ্কর্ম্মা তোমায় থাকিতে দিবে কে? কালস্রোতে তোমার কর্ম্মস্রোতের পথ দিয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। প্রবৃত্তির দমন হইতে পারে, প্রবৃত্তির ধ্বংস হয় না। প্রবৃত্তিই তোমায় দিবারাত্র কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবে। কর্ম্মভূমিতে নিষ্ক্রিয়তার স্বপ্ন দেখা চলিতে পারে না, আর কর্ম্মশূন্য জাগ্রতাবস্থার কথা ভাবিতে পারা যায় কি?

তবে কি হইবে?—যেমন চলিতেছে তেমনই চলিবে কি? না চলিবে কেন? কালের উপর তোমার ক্ষমতা কোথা?—আর তোমরা এমন সব কাজ না করিলে কল্কি আসিবেন কেন?—বটেইত!—তথাস্তু।

সমাপ্ত।

শ্রীরোগাতুর শর্ম্মা।

(৺ব্যোমকেশ মুস্তফী

নারী-সম্মান

স্বভাবসুকোমল দুর্ব্বল নারীজাতির প্রতি সহজশক্তি-সম্পন্ন বলবান পুরুষজাতির সম্মানরীতি বহুদিন হইতেই জগতে প্রচলিত আছে। যে দিন হইতে পুরুষ পৌরুষ-কেই আপনার আদর্শ বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, ঠিক সেইদিন হইতেই সে রমণীর প্রতি তাহার অন্তরের পূজার অর্ঘ্য যোগাইয়া আসিতেছে। স্বভাবকোমলের প্রতি সবলের এই শ্রদ্ধাসম্পর্কটি একান্ত মধুর বলিয়াই রমণীর আশ্রয়পরতাকে আপনার অঙ্গের ভূষণ করিয়া লইতে পুরুষের এত আনন্দ। যে আনত, তাহার কাছে অবনত হইয়া, যে ধরিতে চায় তাহার নিকট ধরা দিয়া, যে আশ্রয়প্রার্থী তাহাকে আশ্রয়দান করিয়া প্রবলের যে বিপুল সার্থকতা, তাহাই পুরুষকে এই নারীমর্য্যাদায় প্রণোদিত করিয়াছে। ফলে, যে কেবলমাত্র মহৎ ছিল, সে মধুরতায় মণ্ডিত হইয়াছে, যেখানে শুধু রুক্ষতা ও কাঠিন্য ছিল, সরসতা সেখানে সজীব হইয়া উঠিয়াছে, ব্যবধান-গর্ব্বের রিক্ততায় যাহা বিবিক্ত ছিল, উদারতায় তাহা স্নেহসিক্ত হইয়া দেখা দিয়াছে। প্রকৃতির এই স্বভাবনম্রতার মধ্যে একটি সুন্দর তাৎপর্য্য আছে। ইহা কঠিনকে কোমল করে, প্রচণ্ডকে প্রশান্ত করে এবং বিরাটকে মহিমান্বিত করিয়া তুলে। ইহা বীরের চক্ষে অশ্রু বহায়, উদ্ধতকে অকস্মাৎ চরণে লুটাইয়া দেয়, তপস্বীকে বেদনাকাতরতায় করুণ করিয়া তুলে। শ্মশানবাসী দেবাদিদেব মহাদেব তাই অন্নপূর্ণার দ্বারে ভিখারী। পালিত কন্যা শকুন্তলার বিদায়ে তাপস কণ্ব তাই "কণ্ঠস্তম্ভিত বাষ্পবৃত্তিকলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনং" হইয়া উৎকণ্ঠাসংপৃষ্টহৃদয় ও বেদনাবিক্লব। ত্রিভুবনবিজয়ী

বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন তাই চিত্রাঙ্গদার পদতলে আপনার গাণ্ডীব রাখিয়া অশ্রুকাতর নেত্রে প্রণয়ভিক্ষাতৎপর।

সৌন্দর্য্য যাহার শক্তি, কোমলতা যাহার কান্তি, সজ্জা যাহার সম্পদ, মনোহরণ যাহার মনোবৃত্তি এবং অশ্রু যাহার আয়ুধ, সেই নারীদেবতার চরণে কম্বুকঠিন শক্তিভূয়িষ্ঠ পুরুষের আত্মনিবেদন বস্তুতই যেমন শোভন তেমনই সঙ্গত। জগদ্ধাত্রীর রক্তচরণতলেই পশুরাজ সিংহের স্থান। সৌন্দর্য্য যেখানে অধিষ্ঠাত্রী, বীর্য্য সেখানে আপনি আসিয়া পায়ে লুটাইয়া পড়ে। যাহার রূপে চক্ষু মুগ্ধ, যাহার স্নিগ্ধতায় মন সমাকৃষ্ট, অথচ অবশ্য-প্রয়োজনীয় সাংসারিক কৃচ্ছ্র সাধনে যে অপারগ, নিতান্ত আবশ্যকক্ষেত্রেও যে আপনাকে রক্ষা করিতে অক্ষম, শক্তি স্বতই তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া ধন্য হয়, সামর্থ্য নিজে হইতে তাহাকে নির্ভরদান করিয়া সার্থক হইয়া উঠে। তাই রমণীর লজ্জা দূর করিতে না পারিলে, পুরুষ আপনার লজ্জা লুকাইতে পারে না, তাহার দুঃখ দূর করিতে সে নিখিল দুঃখকে বরণ করিয়া লয় এবং তাহার দৈন্যনিবারণের জন্য কোন দৈন্যকেই সে অস্বীকার করেনা। মনুষ্যজগৎ দূরের কথা, প্রাণীতত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বহুতর পশুপক্ষী স্ত্রীজাতির আশ্রয় ও রক্ষাকল্পে নানাবিধ পরিশ্রমক্লেশ সাগ্রহে স্বীকার করিয়া লয়। অবলম্বনসম্বলা বল্লরীকে কণ্ঠালিঙ্গনসাহায্যে সর্ব্বোচ্চ শাখায় মঞ্জরিত করিয়া তুলিতে বনস্পতিও তাহার শাখাবাহু বিস্তার করিয়া দেয়।

জগতের যাবতীয় জালজঞ্জাল হইতে নারীকে অব্যাহতি দিয়া, সংসারের দুঃখদৈন্য হইতে তাহাকে দূরে সরাইয়া, কেবলমাত্র সজ্জা ও সম্ভ্রমের আসনে বসাইয়া তাহাকে চক্ষু ভরিয়া দেখিতে ও প্রাণ ভরিয়া পাইতে তাই পুরুষের এই স্বাভাবিক আকর্ষণ। অবলার কাছে এই আত্মসমর্পণে প্রবলের বিপুল গৌরব, সবলের বিরাট আনন্দ। ঐ গৌরবই নারীসম্মানরীতির মূলমন্ত্র, ঐ আনন্দই জগতে রমণীমর্য্যাদার দৈবপ্রেরণা। সংস্কারে উহার জন্ম, শিক্ষায় উহার বিকাশ এবং সভ্যতায় উহার বিস্তার।

কাহারো কাহারো বিশ্বাস, এই ভাব ষোলআনা পশ্চিমের আমদানী, এদেশে উহার অস্তিত্ব ছিল না। ইউরোপীয় সভ্যতায় জন্ম গ্রহণ করিয়া তথাকার মধ্যযুগের Chivalry ও Knight Errantryতে পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়া কালক্রমে এদেশ পর্য্যন্ত উহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং ব্রিটিশশাসনাধীন শিক্ষাদীক্ষার অনুবর্ত্তিতায় ক্রমশঃ এখানে প্রসার লাভ করিয়াছে। এ ধারণা সম্ভবতঃ ভ্রান্তিমূলক। বহুকাল হইতেই এই রীতি যে এদেশে বর্ত্তমান আছে, ভূরিভূরি সংস্কৃত শ্লোক তাহার প্রমাণ বহন করিবে। 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা' বড় জোর কথা; 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' নারীমর্য্যাদার চরমমন্ত্র। এদেশে নানা শাস্ত্রে ঐ প্রকার অনুশাসনের অভাব নাই। ভারতের দেশ দেশান্তরে প্রচলিত নানারূপ আচারব্যবহারে এবং সুচিরাগত রীতি প্রথার মধ্যে উহার অস্তিত্ব অশেষপ্রকারে বিদ্যমান। বস্তুতঃ একদিন যে দেশে সুবিপুল আর্য্যসভ্যতা জন্ম ও বিস্তারলাভ করিয়া বিশ্বভুবনের বিস্ময়ের বিষয় হইয়া রহিয়াছে, সে দেশে নারীসম্মানও যে তাহারি অঙ্গীভূত, একথা অস্বীকার করিবার অবসর নাই।

চিরপ্রচলিত উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয় একটি প্রথার পরিচয় অদ্য আমাদের পাঠকপাঠিকাসমীপে উপস্থিত করিব। সাধারণের কৌতূহলবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন ভিন্ন উহা উল্লিখিত তত্ত্বের সত্যাসত্য নিরূপণেও যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারিবে, এইরূপ বিশ্বাস।

যে ব্রজভূমি ভারতের কাব্যকাননে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার অলকনন্দা বহাইয়া বিংশতি কোটি নরনারী-হৃদয়ে অপূর্ব্ব প্রেমের অমৃতরসধারা নিত্য সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, ভারতীয় সাহিত্যাকাশ যাহার চিরন্তন প্রেম-লীলালোকমালা ধ্রুবনক্ষত্রপুঞ্জের মত বক্ষে ধারণ করিয়া যুগযুগান্তকল্প সমুদ্ভাসিত রহিয়াছে, যাহার জয়গাথা কোটিভক্তকণ্ঠে নিত্য উৎসারিত হইয়া তাহাদের দৈনন্দিন দৈন্যকে সুধাসিঞ্চিত করিয়া তুলিতেছে, সেই ভাগবৎ-কীর্ত্তিত পুণ্যশ্লোক ব্রজভূমি সম্বন্ধে তুচ্ছতম কথাটি

লিখিতে বসিয়াও আজ লেখনী অগ্রসর হইতে চাহিতেছে না।

ব্রজচৌরাশিক্রোশমে চারগাঁও নিজধাম,
বৃন্দাবন ঔর মধুপুরী বরষাণা নন্দ্‌গাঁও।

চৌরাশিক্রোশব্যাপী ব্রজভূমি যে চারিখানি পল্লী লইয়া বিস্তারলাভ করিয়াছিল, তাহাদের নাম বৃন্দাবন, মধুপুরী, বরষাণা ও নন্দ্‌গাঁও। শেষোক্ত গ্রামদ্বয় বরষাণা ও নন্দগাঁও—বৃষভানু ও নন্দগ্রাম, শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মাবাস। উক্ত গ্রামদ্বয়ের উপকণ্ঠে দোল-পূর্ণিমাপর্ব্বে 'লাঠ্‌মার হোলী' নামে যে হোলিলীলাপ্রথা প্রচলিত আছে, তাহার ইতিহাস অতি অপূর্ব্ব—পূর্ব্ব-কথিত নারীমর্য্যাদারীতির পূর্ণপরিচায়ক। ঐ গ্রামদ্বয়ের ব্যবধান বারক্রোশের কম হইবেনা। বরষাণার—রমণীবর্গ —রাধিকার দল এবং নন্দগ্রামের পুরুষগণ শ্রীকৃষ্ণের দল, রাধাকৃষ্ণের দোললীলার অনুকরণে হোলি খেলিতে গ্রামদ্বয়ের সীমান্তদেশে সমবেত হয়। ৫।৬ ক্রোশ হাঁটিয়া আসিতে তাহারা আদৌ অসুবিধা অনুভব করেনা, এমনই তাহাদের অনুরাগ! পৃথিবীর চিরন্তন নর ও চিরন্তন নারীর অনন্ত যৌবনের এই সুমধুর বসন্তবিলাস, এই সরস রঙ্গপ্রিয়তা আনন্দের অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি। ব্রজভূমির নরনারী কেন, সমগ্র হিন্দুজাতি রাধাকৃষ্ণের এই অনুরাগলীলার রক্তফাগে যুগযুগান্ত ধরিয়া অনুরঞ্জিত হইয়া আসিতেছে। তাই মধুঋতুর অফুরন্ত শোভা সৌষ্ঠবের মধ্যে এই আনন্দ-উৎসবের অনুষ্ঠান। যে রসমাধুর্য্যে নিখিল হিন্দু নরনারী মাতোয়ারা, ব্রজবাসী যে তাহাতে পাগল হইয়া উঠিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? কিন্তু এই অনুষ্ঠানে, আনন্দের এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে, আনন্দময়ীর পক্ষই চিরজয়ী, রমণীর মর্য্যাদা বিশেষ করিয়াই অক্ষুণ্ণ—তাই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে দুর্ব্বল পক্ষকেই জয়ের যাবতীয় সুবিধা সুযোগ প্রদত্ত হইয়া থাকে। তাই এই হোলিযুদ্ধে, 'ফাগুয়া কি থারি' কুঙ্কুম পিচিকারী, বড় জোর 'রস-গারি' ভিন্ন পুরুষদিগের সঙ্গে আর কিছুই থাকে না কিন্তু অমোঘ অস্ত্র যে রমণী সৌন্দর্য্য ও বসন্তবিলাসসজ্জা, তাহার উপর আবার তাহাদের একখানি করিয়া বংশযষ্টি প্রত্যেকের হাতের হাতিয়ার। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, "সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র। তার উপরে আবার সেই সুন্দর মুখের অধিকারিণী যদি যুবতী স্ত্রী হন, তাহা হইলে সে ত অমোঘ অস্ত্র।" এক্ষেত্রে স্বাভাবিক অমোঘাস্ত্রশোভিনী রমণী আবার প্রহরণধারিণী সুতরাং জয় যে সে পক্ষকে অবলম্বন করিবে, সে আর বেশী কথা কি? কবির ভাষায় এ যেন কালো চোখে কাজলপরা কিম্বা সুতীক্ষ্ণ শায়কে প্রাণহর বিষের অনুলেপন হইল!

রমণীদিগের হাতে এই লাঠি এবং পুরুষদিগের প্রতি তাহার প্রয়োগ—এই লাঠিমারা হইতেই 'লাঠ্‌মার' আখ্যার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। এক পক্ষ—বিশ্বের চিরলীলাময় রসিকবর পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের, অপরপক্ষ চির-লীলাময়ী রসিকাপ্রধানা রমণীশিরোমণি শ্রীরাধিকার, এই উভয়পক্ষ যমুনাশীকরসিক্ত, বসন্তবনশ্রীশোভিত, কোটিবিহঙ্গমুখরিত নিত্যলীলানিকেতন নন্দনকল্প বৃন্দাবনের প্রান্তদেশে বসন্তপূর্ণিমা রজনীতে রসরঙ্গময়ী হোলিলীলায় মাতিয়া উঠিয়াছে—এ দৃশ্যের কাব্যাংশ বাস্তবিকই ইহজগতে এক অপূর্ব্ব উপভোগসামগ্রী। পুরুষেরা কেহ বা কোন রমণীর অঙ্গে ফাগ দিতেছে, অমনি সে কল্পিত ক্রোধে অপাঙ্গভঙ্গি সহকারে তাহাকে গালি দিতেছে, কেহবা কোন তন্বঙ্গীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বসন্তলীলারসমধুর গ্রাম্য গীতাংশ গাহিয়া কুঙ্কুম ছুঁড়িয়া মারিতেছে, অমনি সে কোপিনী ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বিদ্রূপ রোগের সুকঠিন 'লাঠ্যৌষধের' ব্যবস্থা করিতেছে। কচিৎ কাহাকেও রসোন্মাদে উন্মদ দেখিয়া প্রতীকার ব্যবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বী রমণীও রসসীমা অতিক্রম করিয়া তৎপ্রতি সজোরে যষ্টি চালনা করিতেছে—ক্রমে তাহার সঙ্গিনীরাও অপমানিতার পক্ষ অবলম্বন করিয়া কাব্যবহির্ভূত প্রহারব্যাপারে সমুৎসাহে যোগদান করিতেছে। নর্ম্মসীমা ছাড়াইয়া কখনও বা কল্পিত ক্রোধ প্রকৃত কলহে পরিণত হইতেছে—একপক্ষ অপর পক্ষকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিতেছে—তথাপি সবল পক্ষের অস্ত্রগ্রহণের উপায় নাই; নিঃশব্দে নির্য্যাতন

সহ্য করিতে হইবে। যষ্টি প্রহারে কাহারো হাড় ভাঙিতেছে, কাহারো মাথা ফাটিয়া রক্তস্রোত ছুটিতেছে, কাহারো পৃষ্ঠ ভগ্ন, তবু বড়জোর পৃষ্ঠভঙ্গ ভিন্ন প্রতিশোধার্থী পুরুষের গত্যন্তর নাই—নিরস্ত্র পুরুষ অবলার গায়ে কদাপি হাত তুলিতে পারিবেনা—চেষ্টাও করেনা। হাত পা ভাঙিয়া হাঁসপাতালের আশ্রয় করিতে হইতেছে তথাপি আপনার হাতে অবীরোচিত প্রতিবিধান লইতে অসমর্থ। সময়ে সময়ে মত্ততা এরূপ দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিতেছে যে, রমণীহস্তে পুরুষের প্রাণবিয়োগও ঘটিতেছে, তথাপি চিরপ্রথাগত নারীমর্য্যাদারীতির অমর্য্যাদা ঘটিতেছে না,—বৎসরের পর বৎসর বহুদিন ধরিয়া এই দুরন্ত বসন্তলীলারক্তরাগ সমবেত নরনারী চিত্তকে তাতাইয়া মাতাইয়া উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। ফাগের রং লাগিয়া রাঙা সন্ধ্যাকাশ আরো রাঙা হইয়া উঠিতেছে; কুঙ্কুম ভাঙিয়া আবির উড়িয়া আকাশে অপূর্ব্ব রক্ত কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি হইতেছে, আকাশ-বাতাস, তরুরাজি, শস্যক্ষেত্র, দিগ্‌দিগন্ত, পথ ঘাট মাঠ লালে লাল হইয়া উঠিতেছে; আবরণে বা অঙ্গে দূরের কথা, দেহরক্তপাতেরও অভাব নাই। প্রবাদ আছে, এই অপূর্ব্ব বৃন্দাবনী দোললীলা দেখিতে আকাশাঙ্গন ভরিয়া নিখিল স্বর্গ দেবতারা কাতার দিয়া দাঁড়ান। ঐরাবত-বাহনে ইন্দ্র, বৃষভবাহনে মহাদেব, গরুড়বাহনে বিষ্ণু, হংসবাহনে ব্রহ্মা, ময়ূরাসনে কার্ত্তিকেয়, মূষিকপৃষ্ঠে গণপতি প্রভৃতি সবাহন দেবগণ, পেচকাসনে লক্ষ্মী, হংসপৃষ্ঠে সরস্বতী, সিংহবাহনে জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি অখিল দেবীগণ সকলেই রাধাকৃষ্ণের এই অপূর্ব্ব হোলিলীলা দেখিতে গগনাঙ্গনে সমাগত হইয়া থাকেন। অরুণসারথি দিনদেবতা সূর্য্যদেব স্বীয় নির্দ্ধারিত অস্তকাল স্থগিত করিয়া চারিদণ্ড কাল দিগন্তসীমায় অধিষ্ঠান করেন, তাই বৃন্দাবনে সেদিন চারিদণ্ড বিলম্বে সূর্য্যাস্ত হয়। দেবদেবীরা আসেন কিনা, মর্ত্ত্যের চক্ষু লইয়া আমরা সে কথার মীমাংসা করিতে পারিনা; কিন্তু ভারতভাগ্যদেবতা শ্বেতাঙ্গ ইংরাজ কমিশনার, ম্যাজিষ্ট্রেট, তিন চারিশত ফৌজ ও আশপাশের পুলিশ যে সেখানে সমাগত হন, সে সংবাদ পাইয়াছি। সম্ভবত তাঁহারা এই হোলিমত্ততা-জনিত দাঙ্গা হাঙ্গামা নিরস্ত করিতে ও বাড়াবাড়ি থামাইতে উপস্থিত হইয়া থাকেন। চিরদিনই এই ভীষণ রঙ্গ চলিয়াছে, খেলা মাতিয়াছে, কিন্তু পুরুষ হইয়া কেহ কোনদিন অস্ত্রধারণ করিয়া এই লীলার অসম্মান বা রমণীর অমর্য্যাদা করিয়াছে একথা শুনি নাই। এই chivalry, chivalrous ইউরোপেও দুর্লভ, এই নারী-সম্মান বিশ্বেও দুষ্প্রাপ্য।

আজ যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা বলি, এই নারী-সম্মান এদেশের রীতি বা এদেশের শিক্ষা সংস্কার নহে, ইহা পশ্চিমের আমদানী বা পশ্চিমের ধারকরা ভাব, তবে বুঝিতে হইবে যে, আমরা আমাদের দেশের খবর রাখি না, আমরা ঘরের কথা জানি না। তবু যদি আমরা বলিতে চাই যে, না—আমরা নারীসম্মান জানি না, আমরা রমণীর মর্য্যাদা রক্ষা করি না, তবে আমরা দুঃখেরই সহিত বলিব যে, সে আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য! এবং সে দুর্ভাগ্য যদি হইয়া থাকে, সে দুর্দ্দিন যদি সত্যই আসিয়া থাকে, তবে তাহার এক প্রতীকার আছে, এবং সে উপায় আমাদের আপনারই হাতে। তাহা এই যে, আমরা যেন পুনরায় সেই মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট হই; আমরা যেন যথাশক্তি পুনরায় নারীসম্মান শিক্ষা করি; কারণ, যে পরিমাণে আমরা আমাদের কুললক্ষ্মীগণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিখিব, সেই পরিমাণেই আমরা আত্ম-মর্য্যাদার অধিকার লাভ করিব; আমাদের আত্ম-সম্মান এই রমণীসম্মানের উপর সেই পরিমাণেই নির্ভর করিবে। স্বভাব দুর্ব্বলের প্রতি যদি শ্রদ্ধা করিতে না শিখি, তবে আমাদের নিজের দুর্ব্বলতাই তাহাতে প্রতীয়মান হইবে এবং যেদিন তাহা করিতে শিখিব, সেদিন বুঝিব যে, আমরা নিজে আর দুর্ব্বল নহি। পরন্তু নারীসম্মানদানের যোগ্যতা লাভ আপনা হইতে আমাদিগকে সুযোগ্য ও সবল করিয়া তুলিবে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

কলেজ ফেরৎ

(গল্প)

(১)

'দীনু মিত্তির' মহেশ্বরপুরের একজন বর্দ্ধিষ্ণু প্রজা। মহেশ্বরপুর, রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে। এক সময় শ্রীসম্পন্ন ছিল। ক্রমে ম্যালেরিয়া বাড়িয়া উঠাতে গ্রামের জমিদার হরিহর বসু প্রথমে কলিকাতায় এবং তৎপরে মধুপুরে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া কালযাপন করিতেন। কিছুদিন, মধ্যে মধ্যে মহেশ্বরপুরে গিয়া, আষাঢ় কিংবা শ্রাবণ মাসে হয়ত একবার পুরাতন ভদ্রাসনের খবরটা লইয়া আসিতেন, এবং সেই সময় জমিদারীর অবস্থা, ফসলের অবস্থা, আমকাঁঠাল এবং গরু বাছুরের অবস্থা, এই রকম নানাবিধ অবস্থারও তদন্ত করিতেন। কিন্তু কালক্রমে সে তদন্তটুকুও রহিত করিয়া দীননাথ মিত্রের হস্তে তহশীল এবং রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। এখন দীনু কেবল প্রজা নয়, জমিদারের তহশীলদার এবং নায়েব, এবং যাহা কিছু শাসনের ভার সম্ভব, সবই দীনুর হস্তে। এই ভার গ্রহণের পুরস্কার-স্বরূপ দীনু মাসে কুড়িটাকা বেতন পাইত।

প্রথমে সকলে ভাবিয়াছিলেন যে দীনু অল্পদিনের মধ্যে অনায়াসে অনেক টাকাকড়ি উপার্জ্জন করিয়া বসিবে; কিন্তু টাকাকড়ি উপার্জ্জন অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। জমিদারী বিষয়ে অসাধারণ বুদ্ধি থাকিলেও, দীনু নিজের সম্পর্কে একটা গোমূর্খ। চুরি এবং নানাবিধ উপায়ে টাকাকড়ি আত্মসাৎ করার যে সকল সাধু এবং অসাধু উপায় আছে তাহার কোনটাই সে শিখিতে পারে নাই। প্রাণপণে খাজনাগুলি আদায় করিয়া, দীনু বৎসরের শেষে মনিবের নিকট তাহা হিসাব সমেত পাঠাইয়া দিত, এবং একটা ধন্যবাদের সহিত তাহার রসিদ আসিলে সে আহ্লাদ সহকারে কাঁঠালতলায় বসিয়া ঘন ঘন তামাকু সেবন করিত। সকল প্রজাই দীনুকে ভালবাসে। দীনু মাথার উপর থাকায় কেহ কখন তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে পারে নাই। যখন আশ্বিন এবং কার্ত্তিক মাসে ঘরে ঘরে জ্বর, তখন দীনু জ্বর গায়ে 'পঞ্চতিক্ত বটিকা', এবং 'ডি গুপ্ত' কাঁধে করিয়া বাটীতে বাটীতে বাঁটিয়া দিয়া আসিত। জ্বর ছাড়িয়া গেলেও, সকলের পক্ষে দীনুর 'চণ্ডীমণ্ডপ' একটা সাবুদানা এবং মিছরির আড়ৎ ছিল।

দীনুর একটিমাত্র ছেলে, তাহার নাম বিজয়। মহেশ্বরপুর হইতে তিন ক্রোশ দূরে একটি বিদ্যালয়ে সে প্রবেশিকা শ্রেণীতে পড়ে। কখনো হাঁটিয়া এবং কখনো গরুর গাড়ী করিয়া সে স্কুলে যায়, এবং সমস্ত দিন যেটুকু পড়িয়া আসে, তাহা সন্ধ্যাকালে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া 'খাঁদি'কে শুনায়, বিজয়ের ছোট ভগ্নী, দীনুর একমাত্র দশ বৎসরের মেয়ের নাম খাঁদি। খাঁদির হাতে সাবুদানা এবং মিছরির ভাণ্ডার। খাঁদি খুব রাঙ্গা টুকটুকে মেয়ে এবং তার নাক খুবই 'টিকোলো'। পাছে খাঁদিকে সুন্দরী বলিলে তার অহঙ্কার হয়, তাই দীনু এবং দীনুর স্ত্রী একমত হইয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন 'খাঁদি'। বিজয়ও নিজে এইরূপ অন্যায় নামকরণের প্রতিবাদ করে নাই। খাঁদির স্থির বিশ্বাস যে তাহার মত কদাকার মেয়ে গ্রামে কেহ ছিল না, এবং সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে যখন খাঁদির মা কন্যার দীর্ঘ কেশ বাঁধিয়া দিত, কখন সে ভয়ে নিজের মুখ দর্পণে দেখিত না। এইটুকু দুঃখ ছাড়া খাঁদির জীবনে অন্য কোন দুঃখ ছিল না।

বিজয়ের বরাবরই ইচ্ছা যে 'প্রবেশিকা' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সে তাহার স্কুলেই একটা 'মাষ্টারি' করিবে। এই রকম দুর্দ্দম্য কল্পনা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হওয়াতে, বিজয় তাহার মাষ্টারির কসরৎ খাঁদির উপর দিয়াই চালাইয়া লইত। প্রত্যহ স্কুল হইতে যাহা পড়িয়া আসিত, বিজয় খাঁদির নিকট তাহার রীতিমত ব্যাখ্যা করিয়া তার পরদিন সেগুলির পড়া লইত। এই রকম শিক্ষাপ্রণালীর চক্রে পড়িয়া খাঁদি অল্পদিনের মধ্যে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত এবং বাঙ্গলা সাহিত্য একরকম

দখল করিয়া বসিয়াছিল। ইহাতে একটা উপকার হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। 'চণ্ডীমণ্ডপের' হিসাব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দীনুর জমাখরচ এখন খাঁদিই রাখে। জমা ওয়াশীল বাকি কসিতে এবং প্রত্যেক প্রজার হিসাব তন্ন তন্ন করিয়া বাঁধিতে খাঁদির অসামান্য ব্যুৎপত্তি দেখিয়া দীনু একদিন গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিল, 'দেখ গিন্নী! এই রকম সুশিক্ষিত মেয়ে যদি কোন জমিদারের ঘরে পড়ে তবে কত আহ্লাদের কথা।'

বিজয়ের মা দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে তাহা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়াও কহিল, 'কিন্তু আজকাল সহরের মেয়ে না হইলে জমিদারের ছেলেরা ঘরে নিতে চাহে না।'

দীনু। সহরের মেয়ের এমন কি বিশেষ গুণ আছে?

বিজয়ের মা। সেটা তুমি বুঝিবে না। সহরের মেয়ে চালাক চতুর হয়, ধরা দেয় না। তাদের পেটে এক কথা, এবং মুখে অন্য। ঘর ভাঙ্গার কৌশল যাহারা জানে না তাহাদের জমিদারের ঘরে স্থান নাই।

(২)

বিজয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হইয়া ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছে। সে আহ্লাদে খাঁদির সঙ্গে পরামর্শ করিতে বসিল।

দীনুর ইচ্ছা যে বিজয় যেন কলেজে না যায়। গ্রামে মাষ্টারি করিয়া জমির তত্ত্বাবধানে দিন কাটাইলেই সংসার সুখে চলিয়া যাইবে। বেশী লেখাপড়া শিখিয়াই কি মনুষ্যত্ব বাড়ে? কলেজে পড়িতে গেলেই সহরের ছেলেদের সঙ্গে মিশিতে হইবে। কাহার চরিত্র কবে কি রকম দাঁড়ায় এবং তাহার সঙ্গে কোন্ বিপদ কবে হয় তাহা কে বলিতে পারে? দীনুর মোটেই ইচ্ছা নাই।

দীনুর গৃহিণীর কিন্তু ঠিক সে রকম মত নয়। ছেলে ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছে, তাহা বড় গৌরবের কথা। ছাত্রবৃত্তি ছাড়িয়া দিয়া গ্রামে ভবিষ্যৎ জীবন পতন করা নিতান্ত কুবুদ্ধির কথা। তবে বিপদ আপদ যদি হয়, সেই আশঙ্কায় দীনুর গৃহিণী কোন কথা কহিল না।

উভয়ের মনের ভাব জানিতে পারিয়া খাঁদি মধ্যস্থ হইয়া দাঁড়াইল। 'দাদা নিশ্চয় কলিকাতায় যাবে। সামান্য একটু লেখা পড়া শিখিয়া মাষ্টারি করিয়া লাভ কি?'

দীনু গম্ভীরভাবে বলিল 'মা! বিজয় যে খুব বিদ্যা উপার্জ্জন করিবে এমন কথা তাহার কুষ্টিতে লেখা নাই। উপরন্তু একটা ফাঁড়া অছে।'

সে 'ফাঁড়া' যে কি রকম তাহা কুষ্টিতে লেখা ছিল না। জলে ডুবিবার ভয়, কিংবা অগ্নি ভয়, কিংবা দোতালা হইতে পড়িয়া যাইবার ভয় একটা কিছু।

খাঁদি। ওরকম অনির্দ্দিষ্ট ফাঁড়া অনেকের থাকে, কিন্তু তাহা শীঘ্র কাটিয়া যায়।

বিজয় নিজে আসিয়া বুঝাইতে বসিল। যদি অদৃষ্টে বিপদ থাকে তবে বাটীতে বসিয়া থাকিলেও হইবে, দূরদেশে গেলেও হইবে। সেটা আটকানো কখনই সম্ভব নহে।

বিজয়ের মা যত নজীর জানিত, এবং দীনুরও নিজে যত জানা ছিল তাহার মধ্যে ফাঁড়ার জন্য কেহ কখন কর্ম্ম-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া না যাওয়াতে, অবশেষে কলিকাতা যাওয়াই স্থির হইল।

কলিকাতায় যদি যাইতেই হয় তবে একজনের আশ্রয় অবলম্বন করা আবশ্যক। দীনুর আশ্রয় তাহার মনিব হরিহর বসু। কিন্তু তিনি সপরিবারে মধুপুরেই কালযাপন করিতেন, এবং ছেলেপুলে কয়টি, এ পর্য্যন্ত সে খবরও দীনু জানিত না। হরিহরবাবু নিজের কোন সংবাদ দিতে নারাজ। তাঁহার গতিবিধি সচরাচর সকলেরই অজ্ঞাত।

তথাপি দীনু বসুজামহাশয়কে একখানা চিঠি লিখিল।

'ধর্ম্মাবতার, আমার ছেলে বিজয় মিত্তির প্রবেশিকা পাশ হইয়া ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছে, ইহা কেবল আপনারই

অনুগ্রহে এবং আশীর্ব্বাদে। এখন কলিকাতায় কলেজে পড়িবে। আপনার কলিকাতার বাসায় যদি স্থান দেন, তবে অধীনের সাধ পূর্ণ হয়। আপনিই গরিবের অবলম্বন। সোমবার প্রাতঃকালের গাড়ীতে বিজয় শিয়ালদহে পৌঁছিবে। এখানকার সব মঙ্গল। প্রজাদের খাজনা যৎকিঞ্চিৎ বাকি আছে মাত্র, আষাঢ় মাসেই শোধ হইয়া যাইবে।

'পুনশ্চঃ আমিও একবার বিজয়ের সঙ্গে গিয়া শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আসিব।'

দীনু বসুজা মহাশয়ের ভাবভঙ্গী জানিত। বসুজা মহাশয়ের পত্রের উত্তর টেলিগ্রাফে আসিল 'বিজয় আসুক। আপনার আসিবার দরকার নাই। মনোযোগপূর্ব্বক ভদ্রাসনের তত্ত্বাবধান করিবেন।'

সোমবারে প্রাতঃকালে শিয়ালদহে যখন ট্রেন উপস্থিত হইল, তখন একজন যুবা প্লাটফর্ম্মে পায়চারি করিতেছিল। বিজয় গাড়ী হইতে নামিলে সে জিজ্ঞাসা করিল।

"আপনার নাম বিজয় বাবু?"

বিজয়। আজ্ঞা হাঁ। আমি দীনু মিত্তিরের ছেলে।

যুবা। সেটা আমি জানিতাম না, কারণ জমিদারের নামে একখানা চিঠি এসেছে তাহাতে কোন নাম দস্তখত নাই। ইহা বলিয়া যুবক পকেট হইতে দীনুর চিঠি লইয়া বিজয়কে দেখাইল।

বিজয় সলজ্জে বলিল, 'এটাতে মস্ত ভুল হয়েছে। আমি জিনিষপত্র বাঁধিতেছিলাম। আমার ছোট ভগ্নী খাঁদি এই পত্রখানি লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিয়াছিল।

যুবক। কিন্তু হাতের লেখা আশ্চর্য্য। একটা বাণান ভুল হয় নাই। রচনাও বেশ।

বিজয় বিদ্রূপ মনে করিয়া বলিল 'দশ বৎসরের মেয়ে আর কত ভাল লিখিবে। আপনার নাম?'

যুবক। 'মোহন লাল। আমি একটি গরিবের ছেলে। জমিদার হরিহর বসু আমাকে পালন করেন। আমি এবার আই, এস, সি পরীক্ষা দিব। মেসে থাকি। জমিদারের বাটীতে এখন কেহই নাই, তাই আমাকে আপনার ভার লইতে হইবে।"

(৩)

গরিবের ছেলে হইলেও মোহনলালের মুখখানি এত সুন্দর এবং কথা এত মিষ্ট ও মধুর যে বিজয়ের মনে আর কোন ভাবনা থাকিল না। মেসে থাকাই বিজয় পূর্ব্বে মনে মনে কল্পনা করিয়াছিল এবং সে আশা পূর্ণ হইয়া গেল।

সে নিজের আর্সি ও চিরুণীখানি, পড়িবার বহিগুলি, মাখিবার সাবানটুকু, কাপড়ের বাক্স, তক্তপোশের উপর ছোট একটা বিছানা ও মশারি, এবং নগদ তিন টাকা দশ আনা খাজনা লইয়া সুচারুরূপে মেসের দোতালায় বসতি করিল। মোহনলালের ঘর একটু জংলা রকম। রাশীকৃত কাগজ এবং বিজ্ঞান ও রসায়নসূত্র ও গণিতের কেতাব। মেজের উপর বিছানা, খালি তক্তপোশের উপর খবরের কাগজ, 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা' এবং অধৌত চার পেয়ালা। মশারির একদিকের দড়ি ছেঁড়া, দুই দিক দেয়ালের পেরেকে সংলগ্ন এবং শেষদিক কপাটের অর্গলে বাঁধা। যখন সকলে খাইতে বসে তখন মোহনকে পাওয়া যায় না, এবং সকলে যখন ঘুমাইয়া পড়ে, তখন মোহন পড়িতে বসে।

অথচ মোহন মেসের ম্যানেজার।

এত শৃঙ্খলাশূন্য হইয়াও মোহন কি রকম করিয়া ম্যানেজারি করিত, তাহা কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। অথচ সকলেই তাহার ম্যানেজারিতে সন্তুষ্ট। এ পর্য্যন্ত মোহনের হাতে কাহারও হিসাবের গোলমাল হয় নাই। কখন কাহারও দুগ্ধ কিংবা জলখাবারের অকুলানের জন্য আপত্তি করিতে হয় নাই।

মোহনের সঙ্গে বিজয়ের খুব ভাব হইয়া গিয়াছে। বিজয় কিন্তু বিজ্ঞান না লইয়া আর্টকোর্স লইয়াছে। মোহন তাহাতে বাধা দেয় নাই।

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বিজয় মধ্যে মধ্যে ছুটীতে বাটীতে যাইত। মোহন হয়ত দেওঘর কিংবা

মধুপুরে যাইত, তাহা কেহ কখন জিজ্ঞাসা করিত না। মোহনের যত্নের কথা শুনিয়া দীনু এবং বিজয়ের মাতা খুব আশীর্ব্বাদ করিত।

খাঁদি বিজয়কে যত চিঠি লিখিত এবং বাটীর হিসাব পত্র দিত, মোহন তাহা একটা অপূর্ব্ব সাহিত্য মনে করিয়া নথি করিয়া রাখিত।

যে বৎসর বিজয় আর্টস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, সেই-বার মোহনও বি, এস্ সি পরীক্ষায় খুব সম্মানের সহিত পাশ হইল।

একদিন বিজয় মোহনকে ডাকিয়া বলিল 'মোহন দা! একদিন তোমাকে মহেশ্বরপুরে যাইতে হইবে।'

মোহনের মুখ লাল হইয়া গেল।

'দেখ! আমি পাড়াগাঁয়ে যাইতে বড় ভয় করি। বিশেষতঃ মহেশ্বরপুর যাইতে হইলে গরুর গাড়ীর উপর চড়িতে হয়। ম্যালেরিয়ার যায়গায় গরুর গাড়ীতে চড়িলে বোধ হয় জ্বর আসে।'

বিজয় তাহাকে অনেক বুঝাইল। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে কোন রকম জ্বর হইবার সম্ভাবনা নাই। সে সময় তাহাদের দেশে সকলে আম কাঁটাল খাইয়া হৃষ্টপুষ্ট হয়।

অনেক সাধনার পর মোহন বলিল, 'আচ্ছা তবে শনিবারে চল। তবে, আমার কাপড় বড় ময়লা, আর সেখানে গেলে যদি জ্বরজ্বালা হয়, তবে তুমি তার জন্য দায়ী।'

গরুর গাড়ী করিয়া সূর্য্যাস্তের সময় মহেশ্বরপুরে উভয় বন্ধু যাইতেছিল। গ্রামের মধ্যে পঁহুছিয়া প্রথমেই জমিদারদের পাকা দালান। সেটার বাহির ও ভিতর মোহনলাল তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল। নিজের বাড়ীও তেমন করিয়া কেহ দেখে না। বিজয় জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন বাড়ী'?

মোহন। মন্দ নয়। এমন বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে যাহারা থাকে, তাহাদের মায়া মমতা নাই। একটু খাল কাটিয়া দিলে এই ডোবার জল সম্পূর্ণ বাহির হইয়া যায়, এবং দোতালায় গোটা দুই ঘর করিলে বোধ হয় শীতকালেও সুস্থ হইয়া থাকা যায়।

বিজয়। আমাদের জমিদারও আশ্চর্য্য লোক। তাঁহার ছেলেপুলেরাও কখন দেশে আসে না।

মোহন। তাহারা এক· একটা জানোয়ার। মোটে একটা ছেলে সে গর্দ্দভ, আর একটা মেয়ে সে গোমূর্খ। আমি অনেকবার বলিয়া দেখিয়াছি কিন্তু আমার কথা কেহ শুনে না।

বিজয়। তোমার যদি খড়ের ঘরে শুইতে কষ্ট হয় তবে এখানে রাত্রিতে আসিয়া আমরা শুইয়া থাকিব।

মোহন। প্রথমে খড়ের ঘর দেখা যাউক্। শুনিয়াছি যখন বর্ষার ঘন মেঘ আকাশে ডাকিতে থাকে, এবং খানিক পরে যখন বৃষ্টি ভাঙ্গিয়া পড়ে, তখন খড়ের ঘরে বড় আনন্দ হয়। বোধ হয় আকাশে খুব মেঘ হইবে। অন্ততঃ আশা করা যাউক।

(৪)

দীনু মিত্তিরের চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। উভয় বন্ধু গরুর গাড়ী হইতে লাফ্ দিয়া দ্রুতপদে ছুটিল।

দীনু পদশব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'কে'ও।'

বিজয়। আমি ও মোহন বাবু। আমরা চণ্ডীমণ্ডপে যাচ্ছি। খাঁদিকে দিয়ে একটা আলো পাঠিয়ে দিন্।

তখন ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি। আলো আনা অসম্ভব। অন্ধকারের মধ্যে বিজয় ও মোহন চণ্ডীমণ্ডপের দালানে কতকগুলি হাঁড়ির পার্শ্বে বসিয়া রহিল।

মোহনের নিশ্চয় খুব ভাল লাগিয়াছিল; সে হাঁড়ির মধ্যে হাত দিয়া দেখিল যে অপর্য্যাপ্ত মুড়ি ও মিছরি পরিপূর্ণ। বিনা বাক্যব্যয়ে পথশ্রান্ত মোহনলাল একহাতে মুড়ি ও অন্যহাতে মিছরি লইয়া খাইতে বসিয়া গেল।

একটা হাঁড়ি অর্দ্ধসমাপ্ত হইতে না হইতে

প্রদীপ হস্তে খাঁদি সেখানে উপস্থিত। বিজয় খট্টাঙ্গে অর্দ্ধ-নিদ্রিত। একজন অপরিচিতকে বড় বড় দুইটা হাঁড়ি কোলে করিয়া উপবিষ্ট দেখিয়া খাঁদির বড় ভয় হইল। সে ডাকিয়া বলিল 'দাদা তুমি কোথায় ?'

মোহনলাল মুড়িপূর্ণ মুখে বলিল 'ভয় নাই, আমি হনুমান নহি। আমার নাম বিশ্বম্ভর। তোমার দাদার বন্ধু। তোমার দাদাকে নিদ্রাপরায়ণ দেখিয়া আমি হাঁড়ি লইয়া আহারের চেষ্টায় আছি। এটা খুব স্বাভাবিক। তোমারই নাম বোধ হয় খাঁদি ?'

খাঁদি। আমার ভাল নাম সরলা।

মোহন। আমার ভাল নাম মোহনলাল। প্রথমে বলিয়াছিলাম আমার নাম বিশ্বম্ভর, সেটা তোমাকে না জানিয়া। এখন তুমি যখন ঠিক নাম বলিয়াছ তখন সভ্যতার খাতিরে আমিও বলিতে বাধ্য।

বোধ হয় সরলা একটু হাসিয়াছিল, কিন্তু মোহনলাল সেটা দেখিয়াছিল কি না বলা যায় না। বিজয় নিদ্রোত্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যাপারটা কি ?'

আমি একটু বাঁদরামি করিয়া সরলাকে খুসি করিতেছিলাম।

তখন বিজয় খাঁদিকে ডাকিয়া তাঁহাদের রাস্তার কষ্ট, বৃষ্টির দৌরাত্ম্য, এবং মোহনলালের জমিদারদের বাটী পরিদর্শন, যত গল্প পাড়িয়া বসিল। খাঁদি বাটীর কথা, গ্রামের প্রজাদের কথা, ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কথা, আম কাঁটালের কথা একাদিক্রমে বর্ণনা করিল। মোহনলাল ইত্যবসরে জলযোগ সমাধা করিয়া বলিল, 'তোমার যদি আপত্তি না থাকে তবে আমিও দুটো গল্প বলি।'

তাহার পর মোহনলাল কলেজের কথা পাড়িল, বিজয়ের অধ্যবসায়, ফুটবল খেলায় বিজয়ের জয়লাভ, এবং একদিন দুই কলেজের ছেলেদের মারামারি, এবং অবশেষে মহেশ্বরপুর হইতে আম কাঁটাল গেলে উভয় পক্ষের সন্ধিস্থাপনা, এবং মেসের দৈনিক জীবনের মধুর সাহিত্য নানা রকম কথায় আসর জমকাইয়া দিল।

বিজয় আশ্চর্য্য হইয়া তাহা শুনিতেছিল।

খাঁদি। দাদা! এসব কথা ত তুমি আমাকে লেখ নাই।

মোহনলাল। এই রকম অনেক গল্প আছে। তোমার দাদার লিখিবার অবসর ছিল না, কিন্তু আমি 'ডাইরিতে' রোজ লিখিয়া রাখিতাম।

খাঁদি অতিশয় উৎসাহের সঙ্গে বলিল, 'আমি সেগুলি পড়িব।'

কিন্তু কথা বলিয়াই সরলার মনে হইল 'আমার বলা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। আমার অন্য লোকের লেখা পড়িবার অধিকার কি ?' সে সলজ্জে আবার বলিল 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে।'

মোহনলাল। বিশেষ আপত্তি নাই। খানিকটা, অর্থাৎ যেটুকু তোমার ভাল লাগিবে না, সেইটুকু বাদ দিয়া আমি বাকিটুকু ছাপাইব মনে করিয়াছি।

খাঁদি। আমার সবটুকু ভাল লাগিবে।

মোহনলাল। তার কোন নিশ্চয়তা নাই। মনে কর যদি কেহ লেখে 'সরলা বড় সুন্দর মেয়ে, সরলা দেখিতে আমি বড় ভালবাসি—ইত্যাদি'—তোমার কি সেগুলি পড়িতে ভাল লাগিবে।

সরলা। না।

মোহন। মনে কর সেই রকম যদি অনেক কথা, কাহার সম্বন্ধে থাকে, আমার সেগুলি ছাপানো উচিত না। বাকিটুকু তোমাকে পাঠাইয়া দিব। এখানে নাই। সরলা ভাবিল 'সবটুকু পাঠাইলেও হইত।'

(৫)

সে দিন রাত্রিকালে দীনু মিত্তিরের "খড়ের ঘরে" সকলের আনন্দে কাটিয়াছিল। খাঁদির রান্না, খাঁদির পরিবেশন, এবং খাঁদির পান সাজা, এবং খাঁদির হিসাব পত্রের কাগজ সকলই দেখিয়া মোহনলাল বিজয়ের মাতার নিকট খুব প্রশংসা করিয়াছেন।

দীনু তাহাতে আহ্লাদে আটখানা। সহরের ছেলে, তাহাতে বি-এ পাশ, সে যদি কোন কথা বলে তাহা শিরোধার্য্য।

'বাবা, মেয়েটির বিবাহের বয়স হয়েছে। কলিকাতায় যদি ভাল 'পাত্তর' পাওত একটা দেখিও।'

মোহনলাল বলিল, আচ্ছা।

বিজয়ের মা বলিল 'আমরা বড় গরিব মানুষ, কিছুই দিতে পারিব না, তবে মেয়েটি দেখিতে মন্দ নহে, লিখিতে পড়িতে পারে এই মাত্র ভরসা'।

মোহনলাল। যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আচ্ছা আপনাদের ছেলেপুলের সঙ্গে জমিদারদের ছেলেপুলের বিবাহ হয় না?

দীনু শিহরিয়া উঠিল। বাবা, তুমি পাগল? 'গোত্তরে' বাধে না বটে, কিন্তু এটা তোমার মনে হওয়াই আশ্চর্য্য। জমিদার গরিব প্রজার মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের সম্বন্ধ করিবেন? গিন্নী, তুমি কি বল? আমাদের মোহনবাবু পাগল।

আহারের পর বিজয়ের সঙ্গে মোহনলাল অনেকক্ষণ গল্প করিয়াছিল। চতুর্দ্দিকে পুনর্ব্বার মেঘ হওয়াতে মোহনলালের বড় আনন্দ। এ আনন্দটুকু সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করিবার জন্য মোহনলাল দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ঘুমায় নাই। নানা কথা পাড়িয়া বিজয়কে বিরক্ত করিতেছিল।

বিজয়ের মতলব কিন্তু ঘুমানো। অনেক দিনের পর অপর্য্যাপ্ত আম খাইয়া রাত্রি জাগরণ নিতান্ত কষ্টের কথা। বিজয় খানিকক্ষণ পরে বলিল 'তোমার কি ঘুমাইবার মতলব কি?'

মোহন। বৃষ্টি আসিলে ঘুমাইব। যতক্ষণ মেঘ ছাইয়া থাকে ততক্ষণ ঘুম হয় না। প্রকৃতির এটা একটা বিধান। তুমি যদি বিজ্ঞান পড়িতে তবে বুঝিতে পারিতে।

বিজয় বিজ্ঞান অবহেলা করিয়া নাসিকাধ্বনি আশ্রয় করিল। মোহনলাল মেঘ গর্জ্জনের সঙ্গে চিন্তায় মগ্ন হইল, এবং খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেলে তাহার ছোট টিনের বাক্স হইতে 'ডাইরি' বাহির করিয়া মনের কথা গুলি লিখিয়া ফেলিল।

নীরব অন্ধকারের মধ্যে বৃক্ষপল্লব বহিয়া যখন বর্ষা-বারিবিন্দু মহেশ্বরপুরের ধরণী সিক্ত করিতেছিল, তখন প্রায় শেষরাত্রি। তখনও মোহনলালের ডাইরি শেষ হয় নাই।

তার পরদিন রবিবার।

চণ্ডীমণ্ডপে অনেক দরিদ্র প্রজার পুত্রকন্যা দলে দলে জুটিয়াছে। সরলা তাহাদের লইয়া গম্ভীর ভাবে বসিয়া গিয়াছে। এবার গ্রামে জ্বর হয় নাই। সাবুদানার পরিবর্ত্তে মুড়ি ও মুড়কী দিয়া সরলা তাহাদের আনন্দ বিধান করিতেছে।

মোহনলাল বিজয়কে লইয়া গ্রাম দেখিতে বাহির হইল। মোহনলালের মলিন বস্ত্র, পায় জুতা নাই। গ্রাম কর্দ্দমে পরিপূর্ণ। যে দিকটা খুব নীচু, সেই দিকেই সকলের জ্বর বেশী হয়। মোহনলাল সে জায়গাটি পেন্সিল দিয়া স্কেচ করিয়া লইল। তারপর, প্রজাগণের অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া বিজয়কে বলিল 'আমি যতদূর ভয় পাইয়াছিলাম, তাহার কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সরলার বন্দোবস্ত খুব চমৎকার! তুমি বোধ হয় ভাল করিয়া এ সব বুঝিতে পার না?'

বিজয়। আমি কেবল মাষ্টারিটুকু বুঝি।

মোহনলাল। তাহাও ভাল; কিন্তু তাহা হইতেও এই দরিদ্র প্রজাদের সম্বন্ধে তোমাদের একটা মহৎ দায়িত্ব আছে। কেবল তোমাদের নয়, জমিদারেরও আছে। সেই দায়িত্বটুকু তোমার পিতা বুঝিয়াছেন, এবং তাঁহার কন্যা স্বভাবের বশে বুঝিয়াছে। এখন কেবল একটু বিজ্ঞানের দরকার। যদি জমিদার আমাকে গ্রাম সংস্কারের ভার দেন, তবে আমি এক-বৎসরের মধ্যে এ জায়গাটাকে রম্যস্থান করিয়া দিতে পারি।

এই কথা বলিয়া মোহনলাল সগর্ব্বে গ্রামের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। যেন গ্রামখানি তাহারই এবং তাহার সংস্কার তাহার আয়ত্তের মধ্যে। যেন সেই গ্রামের এবং

জমিদারীর ভবিষ্যতের সঙ্গে তাহার অদৃষ্ট দৃঢ়ভাবে জড়িত। যেন সংসারে প্রত্যেক মানবের কর্ম্মস্থল নির্দ্দিষ্ট এবং সময় হইলেই সেখানে ঘুরিয়া ফিরিয়া উপস্থিত হয়। যেন সেখানে না আসিলে তাহার আনন্দের বিকাশ হয় না, এবং মরিয়া গেলেও সে আনন্দ থাকিয়া যায়।

বিজয়। মোহন! তুমি কি ভাবছ?

মোহন। এ গ্রামের শ্মশানটা কোন্ দিকে তা বুঝতে পাচ্ছি না। যদি মরিয়া যাই, তবে আমাকে কোন্ দিকে লইয়া যাইবে?

(৬)

যাইবার দিন মোহনলালের বড় ইচ্ছা একবার সরলার সঙ্গে দেখা হয়। যখন বিজয় পুষ্করিণীর দিকে স্নান করিতে গেল, তখন সরলা আমবাগানের মধ্যে একটা গাছের নীচে কাঠবিড়ালী দেখিতেছিল। মোহনলাল সেই সুযোগ পাইয়া সরলার নিকট গেল।

সরলা যে মোহনলালকে দেখিয়া ঠিক লজ্জা করে তাহা নয়, কিন্তু প্রথমে কথা কহিতে সাহস পায় না। মোহনলালের সে সাহস বিলক্ষণ। তাই মোহনলাল বলিল, 'আজ আমরা যাচ্ছি। যদি আবার আসি তবে দেখা হবে।'

সরলা ইহার কি উত্তর দিবে? কাঠবিড়ালী মোহনলালকে দেখিয়া পলাইয়া গিয়াছে। সরলার বোধ হইল সে বড় একাকী, কোন আশ্রয় অবলম্বন নাই, একটা অকুল পাথার সম্মুখে!

মোহনলাল উত্তর না পাইয়া আবার বলিল 'আমি 'ডাইরি' খানা শীঘ্রই পাঠাইয়া দিব। এখন আমি যাই।'

সরলা এবার উত্তর দিবার সুযোগ পাইয়া বলিল 'সবটুকু পাঠাবেন। পাতা ছিঁড়িয়া নষ্ট করিবেন না। যদি পাতা ছিঁড়িতে হয়, তবে পাঠানোর দরকার নাই।'

সরলা জীবনে কখনো অভিমান আবদার করে নাই। আজ এ আবদারটুকু তার মনের মধ্যে কোথা হইতে উঠিয়াছিল তাহা কে জানে? এ রকম আবদার কি সকলের নিকট করিবার তাহার অধিকার আছে?

মোহনলাল কি ভাবিতেছিল? এই আবদারটুকুর মধ্যে এবং অভিমানের মধ্যে সরলার জীবন-ইতিহাসের প্রথম পাতা সুবর্ণাক্ষরে জ্বলিতেছিল। যদি আমার জীবনের এমন কোন কথা থাকে যাহা সরলার জানা উচিত নয়, তবে সে পাতা ছিঁড়িবার দরকার নাই। সরলা সে 'ডাইরি' লইবে না।

পাছে বেলা হইয়া যায় তাহা ভাবিয়া মোহনলাল বলিল 'বিজয়, ঘাটে আমার জন্যে বসিয়া আছে। সরলা! আমার সমস্ত ডাইরিখানা তোমাকে পাঠাইয়া দিব।'

মোহনলাল চলিয়া গেল। সরলা অনিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিল। অনেক দূরে গিয়া মোহন আবার বলিল 'সরলা! সমস্ত 'ডাইরি'খানা পাঠাইব—সমস্ত।'

কাননে প্রতিধ্বনি হইল 'সমস্ত'।

(৭)

বিজয় মোহনলালের সঙ্গে চলিয়া যাইবার পর গ্রামে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। যে লোকটি এসেছিল সে বিজ্ঞানে মহাপণ্ডিত এবং অল্পদিনের মধ্যে গ্রাম ম্যালেরিয়া শূন্য হইয়া যাইবে তাহা নিশ্চয়।

আর একটা কথা রটিয়া গেল। সে লোকটা জমিদারের ছেলের সঙ্গে সরলার বিবাহ ঠিক করিতে গিয়াছে। তার কথা হরিহর বসু নিশ্চয় শুনিবেন। সে একজন মস্ত লোক, সে যাহা বলে তাহা জমিদার শুনিতে বাধ্য।

বোধ হয় এ সব কথা মোহনলাল প্রজাদের নিকট বলিয়াছিল। একজন বলিল 'মোহনবাবুর মত যে, যদি এই গ্রামে কেহ জমিদারের ঘর আলো করিবার উপযুক্ত হয় তবে তোমাদের সরলা'।

দীনু সগর্ব্বে গৃহিণীর দিকে তাকাইয়া বলিল 'তুমি কি বল'।

বিজয়ের মাতা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসত্যাগ করিয়া কহিল, এ সব কথা বলা ঠিক নয়, তবে যদি ঐ ছেলেটির সঙ্গে সরলার বিবাহ হয় তবে জমিদারের ঘর খুঁজিবার

দরকার নাই। দীনু মোটে সে কথা ভাবে নাই। সে বলিল 'বাঃ! মোহনবাবুওত আমাদের জাতি এবং কুল, কথাটা মন্দ নয়। কিন্তু উহার মত হইবে কেন?'

বিজয়ের মা স্ত্রীস্বভাবসুলভ হাসি হাসিয়া অঞ্চলে একবার চক্ষু মুছিল।

দীনু। কথাটা কি?

বিজয়ের মা। কথাটা এমন কিছু নয়, তবে তোমরা ত মানুষের মন বুঝ না, যদি বুঝিতে পারিতে তবে বলিতাম যে সরলা আর কাহাকেও চাহে না।

কিন্তু দীনু বলিল 'সেটা অসম্ভব। যখন তিনি নিজেই ঘটকালী করিতেছেন, তখন এ সম্বন্ধে বাধা দেওয়া মূর্খের কাজ। মনে করিয়া দেখ সরলা জমিদারের ঘরে গেলে আমাদের চিরজীবনের দুঃখ কাটিয়া যাইবে। গরিবের হাতে দিয়া দূরদেশে সরলাকে পাঠানো আমার মত নয়।

বিজয়ের মা কোন দ্বিরুক্তি করিল না। মনে মনে ভাবিল 'বিধাতা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে।'

(৮)

পত্রের উপর পত্র আসিয়াছে। বিজয়ের পত্র, মোহনলালের পত্র। সকলই ঠিক। হরিহর বসু দীনু মিত্তিরের কন্যার রূপগুণের কথা শুনিয়া তাহাকে অচিরাৎ পুত্রবধূ করিয়া লইবেন স্থির করিয়াছেন। ছেলেটির নাম বনমালী।

আজ গ্রামে সকলের মহা আনন্দ। জমিদার হরিহর বসু এই সম্বন্ধ করিয়া তাঁহার মহত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ঘরে ঘরে উৎসব।

আর সরলা? সে মোহনের 'ডাইরি' পাইয়াছে। 'ডাইরি'তে যত কথা ছিল, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছে। সরলা মেসে বিজয়ের নিকট যে সকল চিঠি পাঠাইত তাহার কথা, মোহনের নথি, তাহার হৃদয়ের অন্তরের কথা, তাহার জীবনের যত আশা, সবই সেই 'ডাইরি'র মধ্যে।

সরলার বোধ হয় সেগুলি না পড়িলে ভাল হইত। প্রত্যেক লাইনে সরলার হৃদয়কোরক ফুটিয়া উঠিয়াছে, সরলা মোহনকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

সরলা আর সে সরলা নাই। সে এখন শীর্ণা, মলিনা।

সরলার মাতা একদিন তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'সরলা, তুই এমন হলি কেন? তোর যে বিয়ে?'

সরলা মাতার বক্ষে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে বসিল। তাহার বিশ্বাস হয় না যে মোহনলাল এত নিষ্ঠুর।

ইহাতে আমার নিষ্ঠুরতা কি? মোহনের ইচ্ছা সরলা ভাল ঘরে পড়ে। সুখে থাকে। রাজরাণীর মত হইয়া সেই ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রজাগুলিকে পালন করে।

কিন্তু সরলার মাতা বুঝিতে পারিল যে ব্যাপারটা মোটেই ভাল হয় নাই। তাহার মনের মধ্যে একটা ঘোর নিরানন্দ আসিয়া পড়িল। সরলার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া মাতা বলিল, 'সরলা, এ সব বিধাতার হাত, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।'

সরলার মা দীনুকে ডাকিয়া বলিল, 'এ বিবাহ হইলে তোমার মেয়ে বাঁচিবে না।'

দীনু হাস্য করিয়া বলিল, 'অমন ধারা সকলেই বলিয়া থাকে, কিন্তু পরে সব সহিয়া যায়।

বিবাহের দিন খুব সন্নিকট। সরলা বিজয়কে লিখিল 'দাদা, তুমি একবার এস। আমার একটা মনের কথা আছে। আমি বিবাহ করিব না, আর যদি তোমরা আমাকে বিবাহ দেও তবে এ জন্মে আর দেখা হইবে না।'

বিজয় সেই পত্র মোহনলালকে দেখাইল। মোহন গম্ভীরভাবে বলিল, "আচ্ছা! এতদূর যদি হয় তবে ইহার একটা কিনারা করা উচিত।'

সেই দিনই বিজয় ও মোহন মহেশ্বরপুরে গিয়া উপস্থিত।

সরলার খুব জ্বর।

দীনু ও বিজয়ের মা অত্যন্ত কাতর।

দীনু। বাবা তোরা এয়েছিস! সরলাকে একবার দেখ!

সরলার যখন খুব জ্বর তখন মোহন বিজয়কে বলিল তুমি ডাক্তারখানা হইতে এই ঔষধটুকু আনিতে যাও, আমি ততক্ষণ সরলাকে দেখি।

আকাশ খুব পরিষ্কার। দীনু বৃক্ষের নীচে বসিয়া মালা জপ করিতেছে। বিজয়ের মাতা রন্ধনে ব্যস্ত।

মোহন সরলার কেশ এলাইয়া দিয়া ধীরস্বরে ডাকিল—'সরলা'।

সরলা বলিল, 'মোহন! তুমি কি নিষ্ঠুর। যাও, আমার মরণের সময় আসিবার দরকার নাই।'

মোহনলাল সরলার কাণের কাছে মুখ লইয়া চুপি চুপি বলিল, 'সরলা! আমার অপরাধ হইয়াছে। আসল কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমিই ঘটক এবং বর। তোমাকে রত্ন বলিয়া জানি, তাই ভয়ে সে কথা আগে বলি নাই। তোমার নিকট আমার এ পার্থিব জমিদারী তুচ্ছ। তুমি শীঘ্র সারিয়া উঠ।'

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সিন্ধুতীরে

হে আমার চির-চিত-বাঞ্ছিত চঞ্চল পারাবার!
আজিকে প্রথম উষার আলোকে তোমারে নমস্কার।
হেরি' তব অই বিরাট বিপুল অনন্ত জলরাশি,
শুনিয়া তোমার ভীমগম্ভীর মেঘ নির্ঘোষ হাসি,
হেরি' অভিনব কনকবিম্ব ঝলমল নীল অঙ্গে,
পুলকোচ্ছল বিভল নৃত্য তাণ্ডব লীলাভঙ্গে—
বিস্ময় নত অন্তর মোর, গর্ব্ব নাহিক আর;
হে বিরামহীন, ভয়াল-মোহন! তোমারে নমস্কার।

তব আহ্বান পশেছিল মোর মর্ম্মের মাঝখানে
নৃত্য-দোদুল গভীর ছন্দে কলকল্লোল গানে,—
স্নেহ-সিঞ্চিত ভৈরবরবে মত্ত মধুর বোলে
আবেগ-অধীর পুলকাঞ্চিত চিত্ত আমার দোলে;
আসিয়াছে ছুটি' চরণোপান্তে উতলা পরাণ মম
ধরা-জননীর অঙ্ক-লালিত ক্ষুদ্র শিশুর সম;
আজো ধরণীর অঙ্গে তোমার স্তন্য পীযূষ ধার;
অয়ি নিখিলের জননী সিন্ধু! তোমারে নমস্কার।

একি হেরি তব অঙ্গে অঙ্গে নবজলধর ছায়া!—
আজি যশোদার নীলমণি বুঝি রচেছে গো হেথা মায়া!
কনককিরীট-দীপ্ত বিভায় দিগন্ত আলো করি'
আজি সে ব্রজের দুরন্ত শিশু একি সাজে মরি মরি!
নন্দভবন-অঙ্গনতল-নৃত্যধূসর অঙ্গে
নিখিলের মহা অঙ্গনে একি নর্ত্তন নবরঙ্গে!
অনন্তনীল দেহ-লাবণ্য ঢল ঢল অনিবার,
হে আমার চির অন্তরচোর! তোমারে নমস্কার।

এই রূপে বুঝি ভুলেছিল গোরা—চক্ষে পলক নাহি,
ঝর ঝর ঝর বহেছিল ধারা অঝোরে নয়ন বাহি;—
'হে নিঠুর! তবে ফুরালো ছলনা? হে সুদূর এলে কাছে?'
কাঁদি কহে গোরা-'দীন ভক্তের কাম্য কি আর আছে?
—হেরি' আঁখি ভরি' শ্যামসুন্দরে বক্ষে পড়িল ছুটি,—
অতল সিন্ধু-নীলিমার মাঝে চন্দ্র উঠিল ফুটি;
আজো উচ্ছল ঊর্ম্মি-ফেনিল মর্ম্মহরষ ভার,
হে নিমাই-দেহ-পরশ-তৃপ্ত! তোমারে নমস্কার।

একি নটেশের বিপুল ছন্দে অধীর প্রলয়-নৃত্য!
নীলকণ্ঠের কণ্ঠনিলীন গৌরীর দেহ দীপ্ত!
গুরু গম্ভীর গরজে বিষাণ, ডম্বরু ঘন বোলে,
বিভল ভোলার দোদুল নৃত্যে বিশ্বনিখিল দোলে;—
শুভ্র ফেনায় উড়ে জটাজাল ললাট-ইন্দু ভাতি
দিক্ বালিকার গণ্ডবিভায় দিগন্তে ওঠে মাতি;
মহামরণের অনাদি ছন্দঃ-কল্লোল অনিবার,
হে বিরাটরূপ ভয়াল রুদ্র! তোমারে নমস্কার।

হেরি সম্মুখে প্রসারিত মোর অপার সলিল রাশি,
ঊর্দ্ধে অসীম অবিকম্পিত নীল নয়নের হাসি,—
আজি ধরণীর সীমার প্রান্তে অসীমের পানে চাহি'
পলক-বিহীন রয়েছি দাঁড়ায়ে বিস্ময়ে অবগাহি' ;
বুঝি নন্দন কুসুমগন্ধ ভেসে আসে মোর প্রাণে,
বুঝি অমরার জয়দুন্দুভি বাজে কল্লোল গানে !
উদয়-অচলে মুক্ত সুদূর স্বর্ণ তোরণদ্বার,
অসীমের চিরসংবাদবাহি ! তোমারে নমস্কার ।

নামি' আসে ওই সুরবালিকারা কক্ষে কনক ঝারি
উষার হিরণকিরণ বর্ণে ভরিয়া লইতে বারি ;
মেলি অগণিত তরঙ্গ-বাহু শান্ত নীলিমা পানে
পরশপিপাসী সিন্ধু মুখর বিহ্বল প্রেম গানে ;
দূর দিগন্তে মহামিলনের জয় সঙ্গীত তুলি'
নভোনীলিমায় সলিল সীমায় অনন্ত কোলাকুলি ;
কোন্ দূরাগত বেণুসঙ্কেতে উন্মাদ অভিসার ?
হে লীলাচপল প্রেমিক সিন্ধু ! তোমারে নমস্কার ।

তোমারি অঙ্গে শত-তরঙ্গে সৃষ্টি উঠিল ভাসি,'
তব কল্লোলে মূক নভতলে ছন্দঃ উঠিল হাসি,'
দিলে তুমি দিলে বিশ্বনিখিলে সুধা আর হলাহল,—
আনন্দ-বশে অশ্রু সলিলে সিঞ্চিত ধরাতল ;
হে অসীম ! একি সীমাবন্ধনে আপনারে দিলে ধরা !—
তব করুণার গৌরবে আজি অন্তর মম ভরা ;
বিস্ময়-নত হৃদয় আমার, গর্ব্ব নাহিক আর,
হে আমার চির-চিত-বাঞ্ছিত ! তোমারে নমস্কার ।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ ।

পৃথিবীর পুরাবৃত্ত

চতুর্থ অধ্যায়

স্থলভাগের উন্নয়ন ।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে ধ্বংসকারিণী শক্তির যে ক্রিয়ার কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে সহজেই মনে হইতে পারে যে, পৃথিবীতে যদি কেবল এই শক্তিরই একাধিপত্য থাকিত, তাহা হইলে সমস্ত ভূপৃষ্ঠ ক্রমশঃ সমুদ্র পৃষ্ঠের সঙ্গে সমতল হইয়া যাইত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভূপৃষ্ঠের আজিও সে অবস্থা ঘটে নাই—ধ্বংসকারিণী শক্তির লক্ষ লক্ষ বৎসরের চেষ্টাও ভূপৃষ্ঠকে মোটের উপর নিম্নতর করিতে পারে নাই। ভূপৃষ্ঠের উর্দ্ধচালনাই ইহার কারণ। এই উর্দ্ধচালনা কিরূপে সম্পাদিত হয় আমরা বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ স্থলেই এমন স্বাভাবিক ব্যবস্থা আছে যে, কোন স্থানের ভূপৃষ্ঠ ধ্বংসকারিণী শক্তির কার্য্যপ্রভাবে যে পরিমাণে নিম্নগামী হয়, ঠিক সেই পরিমাণেই ইহা উত্তোলনী শক্তির দ্বারা উর্দ্ধে উত্তোলিত হইয়া থাকে।

এই স্বাভাবিক শক্তির প্রভাববশতঃই স্কাণ্ডিনেভিয়া আজিও ধ্বংসকারিণী শক্তির আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া সমুদ্রের উপরে অবস্থিত আছে। যদি তথায় এই স্বাভাবিক শক্তির ক্রিয়া না থাকিত তাহা হইলে ইহা এতদিন নিম্নভূমিতে পরিণত হইত অথবা সাগরজলে নিমগ্ন হইয়া যাইত। স্কটল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে যে কয়লার খনি দেখা যায়, তাহার স্তর বিন্যাসের ইতিহাস এই দুই বিরোধী শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতের প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। এই খনিস্থ স্তররাজির বেধ প্রায় ৪০০০ ফীট। ইহার কয়লার স্তরের মধ্যে মধ্যে চূর্ণ প্রস্তরের এবং কঙ্করের স্তর। প্রথমে উদ্ভিজ্জস্তর, তাহার উপর বালুকা ও চূর্ণ প্রস্তরের স্তর, আবার

তাহার উপর উদ্ভিজ্জস্তর এমনি করিয়াই এই ৪০০০ ফীট স্থূল অঙ্গার-স্তর গঠিত। যে ভূমিখণ্ডের উপর এই স্তররাজি সন্নিবেশিত, যদি তাহার উচ্চতা চিরদিন সমান থাকিত, তাহা হইলে সহজেই অনুমান করিতে হইত যে এই অঙ্গার খনির প্রথম স্তর ৪০০০ ফীট গভীর সমুদ্র জলমধ্যে গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল স্তরের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহাদের প্রত্যেকটিই সমুদ্রতীরে বা অগভীর সমুদ্র জলমধ্যেই গঠিত হইয়াছে।

সুতরাং ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, একটিও করিয়া স্তর গঠিত হইবার পরেই সমুদ্রতল কিছুদূরে নামিয়া গিয়াছে এবং তাহার উপর আবার নূতন স্তরের গঠন আরব্ধ হইয়াছে। এইরূপে সমুদ্রতল নিম্নগামী হইবার সমান অনুপাতে—ইহার উপর নূতন নূতন স্তর গঠিত হওয়ায় ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা সমানই রহিয়া গিয়াছে।

ভূপৃষ্ঠের এই উন্নতি অবনতি অনুপাতের সমস্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে অনুপাতের এই সমস্ত আকস্মিক ঘটনা মাত্র নহে। ইহার মূলে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম বর্ত্তমান। তাঁহাদের মতে নূতন নূতন স্তরের চাপে ভূপৃষ্ঠের কোন অংশ যে পরিমাণে নিম্নগামী হয়, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অংশ ঠিক সেই পরিমাণে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত হয়।

ধ্বংসকারিণী শক্তির প্রভাবে পৃথিবীর উন্নত অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ক্ষয়িত অংশ পুনঃ সঞ্চিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে নূতন স্তরের উৎপত্তি সাধন করে। এই সকল স্তর ক্রমশঃ যখন গুরুভার হইয়া উঠে, তখন ইহাদের চাপে ইহাদের নিম্নবর্ত্তী ভূভাগ অবনত হইয়া পড়ে এবং ইহাদের পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ড সমানুপাতে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত হয়। এমনি করিয়া ক্রমাগত ক্ষয় ও পূরণ চলিতে থাকায়, মোটের উপর ভূপৃষ্ঠের উচ্চতার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না।

ভূপৃষ্ঠের কোন অংশ চাপের প্রভাবে অবনত হইলে যে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অংশ সেই কারণেই ঊর্দ্ধে উঠিয়া পড়ে—এ সম্বন্ধে ভৌগোলিকগণের মধ্যে বহুদিন মতভেদ ছিল। কিন্তু অধ্যাপক হেকার সাহেবের (E. O. Hecker) গবেষণার ফলে এক্ষণে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে পৃথিবীপৃষ্ঠের ভৌগোলিক পরিমাণ হইতে যাহা জানা যায় তাহার সহিত এ সিদ্ধান্তের কিছুমাত্র বিরোধ নাই। যদি কোন পর্ব্বতের এক অংশ অবনত হইয়া পড়ে এবং তাহার চাপে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অংশ ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে এই উন্নত এবং অবনত অংশের সন্ধিস্থলে সময়ে সময়ে কতকটা অংশ ভগ্ন হইয়া যায়। ইহাকে ভূতত্ত্বের ভাষায় স্তর ভঙ্গ (fault) কহে। ভূপৃষ্ঠের এরূপ স্তরভঙ্গের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। উন্নতি অবনতির প্রকৃতি অনুসারে এই স্তরভঙ্গ নানা প্রকারের হইয়া থাকে।

সরল স্তরভঙ্গের একদিক স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়া যায় এবং অপর দিক নিম্ন হইয়া পড়ে। ইহার বিপরীত প্রকারের স্তরভঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়। কোন স্থানের দুই পার্শই অবনত হইয়া পড়িলে মধ্য-স্থলকে উন্নত দেখায় ইহাকে উন্নত-মধ্য স্তরভঙ্গ (Hirst) কহে। কোন স্থানের ভূমিভাগ পরে পরে ক্রমশঃ নিম্নতর হইয়া গেলে সেস্থানের স্তরভঙ্গ সোপানের আকার ধারণ করে। এরূপ স্তরভঙ্গকে সোপানাকৃতি স্তরভঙ্গ (Step faults) কহে।

ভূমিখণ্ডের ঊর্দ্ধাধঃচালনা ব্যতীত তাহাদের পার্শ্ব চালনাদ্বারাও নানা প্রকারের স্তরভঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

একটী টেবিলের উপর একখানি কাপড় বিছাইয়া যদি কাপড়খানিতে উভয় দিক হইতে ঠেলা দেওয়া যায়, তাহা হইলে কাপড়খানিতে নানা প্রকারের ভাঁজ পড়িয়া যায়। ভূপৃষ্ঠেরও স্থানে স্থানে দুই দিক হইতে চাপ পড়ায় ইহা স্থানে স্থানে কুঞ্চিত হইয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ঊর্দ্ধাধঃচালনা এবং উভয়পার্শ্বস্থিত চাপের জন্য আকুঞ্চন—এই উভয় কারণে ভূপৃষ্ঠে নানা প্রকারের নূতন শ্রেণীর পর্ব্বতমালা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই সকল পর্ব্বতকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যায় :—(১) খণ্ডগিরি (Block mountains) (২) কুঞ্চন গিরি (Fold mountains) ( ) শেষ গিরি Residual mountains) এবং (৪) আগ্নেয় গিরি।

খণ্ডগিরি :—ভূপৃষ্ঠের কোন অংশের চারি পার্শ্ব যদি বসিয়া যায়, তাহা হইলে যে অংশ পূর্ব্বাবস্থায় থাকিয়া যায় তাহাকে পর্ব্বতের মতই দেখায়। খণ্ডগিরি সাধারণতঃ এই প্রকারেই উৎপন্ন হয়।

যদি কোন স্তরভঙ্গের এক পার্শ্ব উন্নত হইয়া উঠে অথবা তাহার অপর পার্শ্ব অবনত হইয়া যায় তাহা হইলেও এইরূপ পর্ব্বত উৎপন্ন হইতে পারে। ভূপৃষ্ঠের অংশ বিশেষ যদি সমভাবে উন্নত হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলেও এইরূপ পর্ব্বত উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের অংশ বিশেষের এরূপ অকারণ উন্নতি সম্ভব কিনা এ সম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

কুঞ্চন গিরি :—ভূপৃষ্ঠের কোন অংশের উপর দুই পার্শ্ব হইতে চাপ পড়িলে ভূপৃষ্ঠ টিনের চাদরের মত (Corrugated sheet) কোঁকড়াইয়া যায়। এইরূপে আর এক প্রকারের পর্ব্বতমালা উৎপন্ন হয়। যদি পূর্ব্বোক্ত চাপের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক না হয় তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠের এই কুঞ্চন সমপার্শ্ব গিরিশ্রেণীরূপে আবির্ভূত হয়।

পার্শ্বচাপ অপেক্ষাকৃত অধিক হইলে গিরিশ্রেণী অত্যন্ত কাছাকাছি আসিয়া পড়ে এবং ইহাদের দুই পার্শ্বই সমানাকার হয় না। সময়ে সময়ে ইহাদের দুই পার্শ্বই একই দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। পার্শ্বচাপ আরও অধিক হইলে একটি পর্ব্বতের উর্দ্ধভাগ পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতের উপরে ঝুঁকিয়া পড়ে। এইরূপ চাপের আধিক্যে সময়ে সময়ে প্রাচীন পর্ব্বত পরবর্ত্তী পর্ব্বতের উপর হেলিয়া পড়িয়া তৎপ্রদেশের স্বাভাবিক স্তর-বিন্যাস প্রণালীর ব্যতিক্রম ঘটায়।

আল্পস্ পর্ব্বত শ্রেণীতে এইরূপ ঘটনার সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

শেষ গিরি :—শীতাতপ এবং জল-বায়ুর প্রভাবে প্রাচীন পর্ব্বতের উন্নত দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে সময়ে সময়ে তাহাদের পূর্ব্বদেহের কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ রহিয়া যায়। এই ভগ্নাবশেষ হইতে আর এক শ্রেণীর পর্ব্বতরাজি উৎপন্ন হয়। ইহাদের শেষ-গিরি বলা হয়।

আগ্নেয়গিরি :—ভূগর্ভস্থিত আগ্নেয় পর্ব্বতের শিখরদেশে অবস্থিত আগ্নেয় গহ্বরের চারিপার্শ্বে অগ্ন্যুৎপাত জনিত যে সকল দ্রবীভূত ধাতু ও প্রস্তর সঞ্চিত হয় তাহা হইতেও একপ্রকারের পর্ব্বতশ্রেণী উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল পর্ব্বতের অগ্রভাগ অনেকটা মন্দির চূড়ার মত হইয়া থাকে এবং তাহার মধ্যস্থলে এক একটি গহ্বর থাকে। এই সকল পর্ব্বতকে অগ্নেয়গিরি কহে।

এই সকল আগ্নেয়গিরির কোনটি হইতে রাশি রাশি গলিত ধাতু ও প্রস্তর নির্গত হয়। সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আগ্নেয়গিরি হইতে নিঃসৃত গলিত স্রাব পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়া বিশাল স্তর রচনা করে। ইহার তরল অংশ সমভূমি এবং ঘন অংশ মালভূমিরূপে আবির্ভূত হয়।

এইরূপে ভূপৃষ্ঠের অংশ বিশেষের চাপের দ্বারা অংশান্তরের উন্নতি পৃথিবী পৃষ্ঠের অকুঞ্চল বশতঃ নব নব গিরিশ্রেণীর উদ্ভব, আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাবজনিত নব নব স্তরের উৎপত্তি—প্রভৃতি নানা কারণে ধ্বংসকারিণী শক্তির প্রবল প্রভাব সত্ত্বেও মোটের উপর ভূপৃষ্ঠের অবনতি ঘটে না।

ক্রমশঃ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

ফুল

হে কুসুম, হে নিখিল সৌন্দর্য্যের, সারভূতা উদ্ভিদ্‌-রাজ্যের রাজকন্যা, হে পত্রান্তরালচারিণি সঙ্কোচনতা সলজ্জমধুরা সুন্দরি, তোমার সহিত তুলনা দিবার জগতে কিছুই নাই। পৃথিবীর রমণী ও আকাশের তারাও তোমার নিকট পরাস্ত। তারকায় জ্যোতি আছে কিন্তু মধু নাই গন্ধ নাই, রমণীতে জ্যোতিও আছে মধুও আছে কিন্তু পদ্মিনী ভিন্ন আর কাহারো দেহে গন্ধ নাই এবং সে পদ্মিনীও বুঝি কবিকল্পনা-প্রসূত।

তোমার জন্য সকলেই পাগল। পতঙ্গ তোমার রূপের প্রভায় পাগল, মধুকর মধুর লোভে পাগল, পবন সুবাসের জন্য পাগল। মনুষ্য তোমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তোমাকে নিঃশেষে উপভোগ করিবার জন্য পাগল আর অন্ধকীট মাৎসর্য্য-বিষে জ্বলিয়া তোমাকে বিষজর্জ্জর করিবার জন্য পাগল। তুমি কাহারো বুকে জাগাও লালসা কাহারো বুকে জাগাও হিংসা। হায়, কেন তুমি এত সুন্দর হইয়াছিলে?

প্রার্থী তোমার অনেক কিন্তু দাতা তোমার কেহই নাই; কারণ তোমার ভাণ্ডারে যাহা নাই তাহা কাহার ভাণ্ডারে আছে? তুমি অকাতরে আপনাকে বিতরণ করিয়া আপনি নিঃস্ব হইয়া যাও কিন্তু প্রতিদানের কামনা করনা। তোমার আত্মত্যাগ কি মহিমময়!

ক্ষিতির গুণ যে গন্ধ এই দার্শনিক তত্ত্বের সারবত্তা প্রথম তোমার নিকট হইতেই বুঝি। মৃত্তিকা গন্ধের আকর না হইলে মৃত্তিকাজাত তোমার অঙ্গে এত সুগন্ধ আসিবে কোথা হইতে?

তোমার প্রাণ বোধ হয় বর্ণ। সকল বস্তুরই বর্ণ আছে সত্য কিন্তু তোমাকে দেখিলেই মনে হয় যেন বর্ণই তোমার উপাদান, যেন জড়বস্তু তোমাতে কিছু নাই। ইহার উপপত্তি বিজ্ঞান দ্বারাও করা যাইতে পারে। কৃষ্ণবর্ণ সকল বর্ণের অভাব। কিন্তু জীবন্ত পুষ্প সকল বর্ণের হইলেও সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণের হয় না; অর্থাৎ সকল বর্ণের অভাবে পুষ্প জীবন্ত থাকিতে পারে না।

তোমার জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তারই মধ্যে তুমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কর, সকলের মন মুগ্ধ কর। জীবনের মূল্য কেবল দৈর্ঘ্যের উপর যে নির্ভর করেনা তাহা তোমাকে দেখিলেই বুঝা যায়।

কিন্তু এতটা সৌন্দর্য্য ও এতটুকু জীবন লইয়া তুমি পৃথিবীতে আইস কি জন্য? তোমার জীবনের সার্থকতা কি? সাধু বলিবেন—দেবতার পূজায় লাগা; বিলাসী বলিবেন—রমণীর কবরী শোভা করা, বৈজ্ঞানিক বলিবেন—ফলপ্রসব করা; এবং কবি বলিবেন—হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করা; কিন্তু তুমি হয় ত বলিবে—পরের উপকারে লাগা।

তোমাদের কথা যদি শুনিতে পাইতাম, তাহা হইলে না জানি তাহা কত মিষ্ট লাগিত! কথা তোমরা নিশ্চয়ই বল কিন্তু সে কথা শুনিবার কান আমাদের নাই। বোধ হয় ভ্রমর তাহা শুনিতে পায় এবং তাহারই সুরটুকু দিবারাত্র গুন্ গুন্ করিয়া ভাঁজিয়া বেড়ায়।

তোমরা বড় লাজুক, অনেকটা বঙ্গ-বধূদের মত। তোমরা লুকাইয়া থাকিয়া মানুষকে গন্ধের গুণে মুগ্ধ করিতে চাও। তোমরা দেখা দিতে চাওনা এবং যে তোমাদের দেখাইতে চায়, তাহাকেও তোমরা দেখিতে পার না। তাই দিনকে দেখিয়া তোমরা হয় মাটিতে মুখ লুকাও, না হয় চোখ বুজিয়া পাতার আড়ালে বসিয়া থাক—কিন্তু সন্ধ্যা আসিলেই কুঞ্জে কুঞ্জে লাখে লাখে ফুটিয়া উঠ আর দিনের নির্লজ্জতার কথা মনে করিয়া এ উহার গায় হাসিয়া ঢলিয়া পড়।

যেমন দুধের বিকার ক্ষীর, স্বর্ণের বিকার অলঙ্কার, সেইরূপ পত্রের বিকার নাকি তোমরা। হায়, এমন বিকার যদি মানুষের হইত, তাহা হইলে তাহারা মরিয়া ভূত হইত না, দেবতা হইত।

পত্রের বর্ণ সবুজ কিন্তু কোন পত্র বিকারগ্রস্ত হইয়া লোহিত, কোন পত্র পীত কোন পত্র নীল হয় কেন? উদ্ভিদ্ চিকিৎসকেরা ইহার কারণ অনুসন্ধান করুন।

তাঁহাদের অনুসন্ধানের জন্য আমি আরো দু-একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। বৃহদাকার ও বিচিত্র বর্ণের পুষ্পে গন্ধ থাকে না কেন? একটি ছোট সাদাসিদে যুঁইফুলে যে গন্ধ, একটা প্রকাণ্ড স্থলপদ্মে বা একরাশ পাঁচরঙ্গা ফুলে তাহা নাই কেন? কেনই বা কাহারো বক্ষে মধু থাকে কাহারো বক্ষে থাকে না? আর কেনই বা যাহার বর্ণ গন্ধ মধু (রূপ গুণ ধন) তিনই আছে, তাহার দেহ গোলাপের ন্যায় কাঁটা ও কীটের ব্যাধিতে পরিপূর্ণ?

জগতে কিছুই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয় একথা বলিলে চলিবে না। যদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতেই না পারিবেন তবে তাঁহারা ফুলের ফসলে হাত দিলেন কেন? প্রকৃতি যাহা দশহাজার বৎসরে করিবেন তাঁহারা ত তাহাই দশ বৎসরে করিবার জন্য কৃতসংকল্প। তাঁহারা ত প্রকৃতির ধীর পদক্ষেপে বিরক্ত হইয়া তাহার আগে আগেই দৌড়াইতে চান। তবে তাঁহারা দশবৎসর না হউক একশত বৎসর চেষ্টা করিলে কেন এরূপ বৃক্ষ উৎপন্ন করিতে পারিবেন না যাহার পত্রে পুষ্পে কণ্টকহীন গোলাপ, ফলে অষ্ঠিশূন্য রসাল কাষ্ঠে চন্দন। তাঁহারা প্রকৃতির বরপুত্র, চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই পারিবেন।

তাঁহারা বলেন ফলহীন বৃক্ষ থাকিলেও পুষ্পহীন বৃক্ষ নাই। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি ডুম্বুর বৃক্ষটি কি? আমরা ত চিরদিন উহাকে অপুষ্পক বলিয়াই জানি—তবে তাঁহাদের সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রতিবাদ করিতে সাহস করি না—কাজে কাজেই স্বীকার করিব যে ডুম্বুরের পুষ্প আছে এবং এই বলিয়া উহার সমর্থন করিব যে ঐ অতীন্দ্রিয় পুষ্পকেই দার্শনিকেরা আকাশকুসুম নামে অভিহিত করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণ যেমন পুষ্পের আমূল সংস্কার করিয়া তাহাদের জাতিগত স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিতে চান, আর একদল পণ্ডিত সেইরূপ অপ্রয়োজনীয় বলিয়া পুষ্পকে সংসার হইতে উচ্ছেদ করিতে চান। তাঁহারা বলেন পুষ্পেরও প্রাণ আছে সুতরাং রাশি রাশি পুষ্পকে হত্যা করিয়া তাহাদের অঙ্গ হইতে গন্ধটুকু চুরি করিয়া লওয়া একেবারেই অন্যায়। পুষ্প নির্ব্বিরোধে বনে বাস করুক অথবা আপনা আপনি মরিয়া যাক্ কিন্তু সে খোঁজে মানুষের প্রয়োজন নাই। তাঁহারা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পুষ্পের স্বাভাবিক গন্ধটুকু প্রস্তুত করিয়া দিবেন, অর্থাৎ একটি শিশির ভিতর একটি ফুলের বাগান বসাইবেন। তবে একটি শিশির মূল্য একটি ফুলের বাগানের মূল্য অপেক্ষা কিছু অধিক হইতে পারে। তা মানুষ প্রকৃতিদেবীর সহিত প্রতিযোগিতা একদিনেই পারিয়া উঠিবে কেন?

কিন্তু ফুলের হাসিটুকু তাঁহারা ধরিবেন কি করিয়া? তাঁহারা না হয় ফুলকে তন্ন তন্ন করিয়া কেশর পরাগ দণ্ডে বিভক্ত করিতে পারেন কিন্তু তাহার সমষ্টিটুকুকে ধরিতে পারিবেন কি? তাহারা হয়ত উত্তর দিবেন—আর্ট রহিয়াছে কি জন্য? চিত্র-শিল্পই ফুলের চেহারা বেমালুম অনুকরণ করিবে। কাপড়ের ফুল কাটিয়া তাহাতে এসেন্স মাখাইয়া দিলে তাহা ফুলের চেয়ে নিতান্ত মন্দ হইবে না—বরং ভাল হইবে, কারণ তাহার অস্তিত্ব চিরস্থায়ী হইবে।” কিন্তু ফুলের স্পর্শ? কুসুম শয়নের মাধুর্য্যটুকু কোথায় থাকিবে? অনেক কবিতার সৌন্দর্য্য যে একেবারে মাটি হইয়া যাইবে। তাঁহারা কি উত্তর দিবেন জানিন, তবে বোধ হয় বলিবেন, “সকল ইন্দ্রিয়ের যুগপৎ পরিতৃপ্তি অসম্ভব, আর কবিতায় সৌন্দর্য্যের ক্ষতিপূরণ নানা উপায়ে হইতে পারে। না হয় আজকাল বিরহিণীরা কমল পলাশ বক্ষে স্থাপন করিয়া বিরহের জ্বালা নাই নিবৃত্ত করিলেন! না হয় অভিসারিকারা ফুলশয্যা রচনা নাই করিলেন! আজকাল বরফ আছে, পালকের বিছানা আছে, ভাবনা কি?”

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ফুলের প্রতিপত্তি। সেইজন্য আমরা ভালবাসি যুথী জাতী মল্লিকা, পারসিকরা

ভালবাসে বস্‌রা ইরাণ-গুল্‌, ইংরাজেরা ভালবাসে ভায়োলেট্‌ আর ল্যাভেণ্ডার। এইরূপ ফরাসীরা ভালবাসে লিলি, জাপানীরা ভালবাসে হাস্‌নাহানা এবং চীনেরা ভালবাসে চন্দ্রমল্লিকা।

আবার একই দেশে এক এক ঋতুতে এক এক ফুলের বেশী আদর। বসন্ত বলিলেই আমাদের মনে আসে আম্রমুকুল, গ্রীষ্ম বলিলেই মনে আসে বেল, বর্ষা বলিলেই মনে আসে কদম্ব এবং শরৎ বলিলেই মনে আসে শেফালি। আর ঋতুর গুণগুলি ফুলেতে সংক্ষিপ্ত হয় বলিয়া বসন্তের ফুল দেখিলেই মনে আসে প্রীতি ও অনুরাগ, গ্রীষ্মের ফুল দেখলেই মনে আসে আকাঙ্ক্ষা ও উত্তেজনা, বর্ষার ফুল দেখিলেই মনে আসে নৈরাশ্য ও বিরহ এবং শরতের ফুল দেখলেই মনে আসে পবিত্রতা ও শান্তি।

শীতকে ফুলেরা বড়ই ভয় করে, তাই শীতের দেশে আর শীতের কালে বড় ফুটিতে চায় না। তবে যারা গরম দেশে বড় আমল পায় না, যাদের রংটা ফিকে, গন্ধটা নাই বলিলেই হয়, তারাই নিম্নকোর্টের ব্যারিষ্টারদের মত, দার্জ্জিলিঙেও ফোটে, বিলাতেও ফোটে।

ফুলকে আমরা এত বেশী ভালবাসি যে তাহাকে আমাদের মত ভাবিয়া আমাদের দলে টানিয়া আনিতে চাই। আমরা ফুলের রং, গন্ধ প্রভৃতি অনুসারে এক এক ফুলে এক এক মনোভাবের আরোপ করি। ফুলের উপর চরিত্র না চাপাইলে আমাদের মন সন্তুষ্ট হয় না। আমরা জবা গাঁদা স্থলপদ্মকে করিয়াছি রাগী, গোলাপ বেল গন্ধরাজকে করিয়াছি প্রেমিক, চামেলি যুঁই রজনীগন্ধাকে করিয়াছি লজ্জাশীলা এবং কুন্দ শেফালিকে করিয়াছি সরল। এই রকম পদ্মকে করিয়াছি পবিত্র, সূর্য্যমুখীকে করিয়াছি পতিব্রতা, পলাসকে করিয়াছি নির্গুণ, অশোককে করিয়ছি ধনী এবং শিরীষকে করিয়াছি বাবু।

ফুলের আধ্যাত্মিক জাতিভেদ আমি একটা বাহির করিয়াছি। আমার মতে ফুল প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত—সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এবং অপ্রধানতঃ আরো তিন ভাগে বিভক্ত—সত্বরাজসিক, সত্বতামসিক এবং রজঃতামসিক।

যাহাতে প্রসাদ গুণ বিদ্যমান তাহাই সাত্বিক, যাহাতে উদ্দীপনা বিদ্যমান তাহাই রাজসিক এবং যাহাতে মাদকতা বিদ্যমান তাহাই তামসিক। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বুঝিতে পারিবেন। সাত্বিক ফুল যথা—পদ্ম, কদম্ব, শেফালি; রাজসিক ফুল যথা—গোলাপ, বেল, মল্লিকা; তামসিক ফুল যথা—চাঁপা, বকুল, ধুস্তুর। সত্ব-রাজসিক যথা—চামেলী, যুঁই, গন্ধরাজ; সত্ব-তামসিক যথা—কামিনী, লেবু, রজনীগন্ধা; রজঃতামসিক যথা—আম্রমুকুল, কেতকী, কর্ণিকার। পদ্মের প্রসাদ গুণ আছে নতুবা মহাদেবের উত্তানপাণিদ্বয়কে “প্রফুল্লরাজীবে”র সহিত তুলনা দেওয়া হইত না। গোলাপে উদ্দীপনা আছে নতুবা রমণীর লাজরক্ত গণ্ডস্থলে কবি তাহার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইতেন না, আর চাঁপা ও বকুলে যে মাদকতা আছে তাহা ত স্পষ্টই অনুভব করা যায়। যোষিৎগণের আস্যমদ্যেই ত বকুলের জন্ম আর “ফুলের বিবাহ” প্রবন্ধে বঙ্কিমবাবুই বলিয়া গিয়াছেন, “চাঁপা বেটা বোধ হয় ব্রাণ্ডি টানিয়া আসিয়াছিল”। ধুস্তুর ফুল মহাদেবের কর্ণাবতংশ; আর মহাদেবের উপভোগ্য যা কিছু, সবই হয় বিষ না হয় মাদকদ্রব্য। সুতরাং ধুস্তুরও যে তামসিক তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আমাদের রমণীরা খুবই সুন্দর কিন্তু আমাদের সমাজের বাহিরে থাকিয়াও পুষ্প সেই রমণী-সৌন্দর্য্যকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। তাই বুঝিয়াই কখনো ফুলের সহিত রমণীর অভেদ কল্পনা করি, কখনো রমণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত ফুলের উপমা দিই। কিন্তু ঈর্ষা-কাতর রমণী তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ফুলকে দেহের দাসীরূপে নিজ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করেন—যেন তাঁহারা বুঝাইতে চান, তাঁহারা পুষ্পের অপেক্ষা সুন্দর, নতুবা সে তাঁহাদের দাসী হইবে কেন?

আমরা যে অনেক সময় ফুলের সহিত রমণীর অভেদ

কল্পনা করি তাহা কবি হেমেন্দ্রের নিম্নোদ্ধৃত কবিতা হইতেই প্রতিপন্ন হইবে—

কে খোঁজে সরসমধু বিনা বঙ্গকুসুমে ?
কোথা হেন শতদল
হৃদে পূরি পরিমল
থাকে প্রিয়মুখ চেয়ে মধুমাখা সরমে ?

* * *

কোথা ফিকে ভায়োলেট্ গন্ধ নাই তাহাতে !
কি দিয়ে তুলনা দিব এই দেশী চাঁপাতে।

* * *

কিবা সে অপরাজিতা নীলিমার লহরী,
কে খোঁজেরে প্রজাপতি পেলে হেন ভ্রমরী !

নারী-অঙ্গের সহিত ফুলের তুলনা ত সাহিত্যে ঝুড়ি ঝুড়ি আছে, মাত্র কয়েকটি সুন্দর শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম :—

(১) গড়িয়া অপরাজিতা থরে কৈল চুল,
মুখানি গড়িল দিয়া কমলের ফুল।
তিলফুলে কৈল নাসা, অধর বান্ধুলী,
চাঁপার পাপড়ী দিয়া গড়িল অঙ্গুলি।
নয়ন সুন্দর কৈল ইন্দীবর দিয়া,
মৃণালে গড়িল ভুজ কাঁটা ফেলাইয়া।
কনক চম্পকে তনু সকল গড়িয়া,
গড়িল চরণপদ্ম স্থলপদ্ম দিয়া।

—ভারতচন্দ্র।

(২) নাসা তিল ফুল পরে অঙ্গুলি চম্পক ধরে
নয়ন কমল কামে টালিয়ারে
দশন কুন্দের দাপে অধর বান্ধুলি চাপে
ভারত ভুলিল ভাল ভালিয়ারে।

—ভারতচন্দ্র।

(৩) কিবা মনোহর কর মৃণালের গর্ব্বহর
অঙ্গুলি চম্পক চারুদল !

—ভারতচন্দ্র।

(৪) মুখরুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ,
ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ।

—বিদ্যাপতি।

(৫) স্থল পঙ্কজ পদ পাণি।

—বিদ্যাপতি।

(৬) অধর বান্ধুলি সুন্দর উপমা
দশন দাড়িম বীজে।

—চণ্ডীদাস।

(৭) তিলফুল জিনি সুন্দর নাসা,
নাগরীজনার মনের বাসা।

—চণ্ডীদাস।

নারী যে ফুল দিয়া দেহ অলঙ্কৃত করেন, তাহাত স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন, তবে কোন্ অঙ্গে কোন্ ফুলের অলঙ্কার আমাদের দেশে প্রশস্ত তাহা নিম্নলিখিত শ্লোক-গুলি হইতেই বুঝিতে পারিবেন :—

(১) হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধম
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারুকর্ণে শিরীষম্
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥

—কালিদাস।

(২) কানাড়া ছাঁদে কবরী বাঁধে
নবমল্লিকার মালে।

—চণ্ডীদাস।

(৩) কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।

—জয়দেব।

(৪) ফুয়ল কবরী বান্ধয়ে অনুপাম
তাহে বেড়ি দেয়ল চম্পকদাম।

—বিদ্যাপতি।

এমন সুন্দর, এমন মনোমুগ্ধকর যে ফুল, যাহার নিকট রমণীরাও সৌন্দর্য্য ভিক্ষা করেন, তাহার তেমন আদর আমাদের দেশে কৈ ? আমরা প্রিয়জনকে পূজার বাজারে উপহার দিই—নূতন অলঙ্কার, নূতন

উপন্যাস, কিন্তু ফুলের উপহার দিতে জানি না। আমরা বাগান করি তরীতরকারীর কিন্তু ফুলের বাগান করাকে অনর্থক অর্থব্যয় বলিয়া মনে করি।

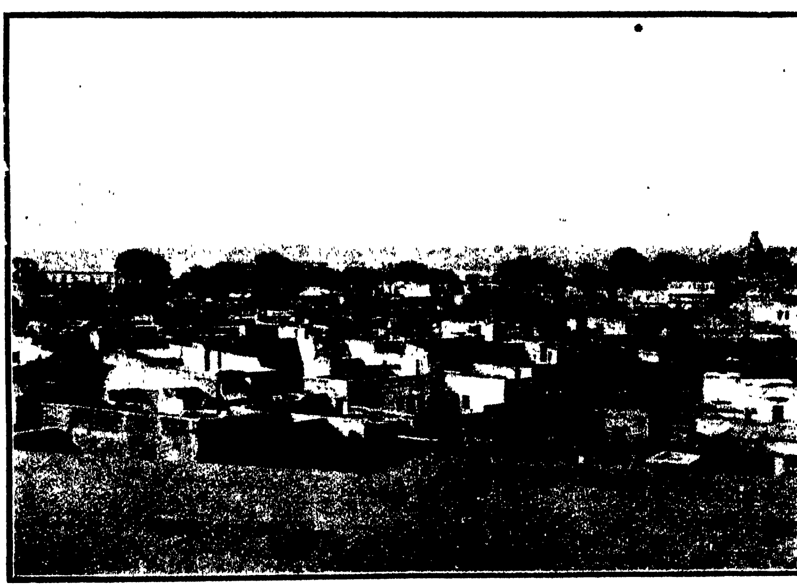
শুধু আমরা কেন, জগতের কোন জাতিই এ পর্য্যন্ত ফুলের আদর করিতে শেখে নাই। সৌন্দর্য্যে ও দেবত্বে যে কোন প্রভেদ নাই এ সত্যটুকু হৃদয়ঙ্গম করিলে নারীকে তার ন্যায্য অধিকারের জন্য লড়াই করিতে হইত না, পুষ্পকে উৎসব-গৃহের মর্ম্মর-পাষাণে পদদলিত হইয়া মরিতে হইত না। তা ছাড়া জগতে এ পর্য্যন্ত কত প্রকারের সুন্দর ফুলই না জন্মিয়াছে কিন্তু আত্মরক্ষায় অক্ষম বলিয়া একে একে বিলুপ্ত হইয়াছে। আজ যদি আমরা তাহাদের বাঁচাইয়া রাখিতে পারিতাম, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পাঁচযুগ মিশাইয়া একটা মিশ্রযুগ উৎপন্ন করা অপেক্ষা অধিক উপকার হইত। কোথায় সে সোমলতা, কোথায় সে মুক্তালতা, বা তাদের পুষ্প? জাফরাণ এখন শুধু কাশ্মীরে আছেন কাশ্মীর-সুন্দরীগণের নখরঞ্জনের নিমিত্ত, কিন্তু আর কিছুদিন পরে তিনিও বোধ হয় ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন। আমরা পারিজাত, যোজনগন্ধা ও গোলেবকায়লি বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি কিন্তু তাঁহারা বোধ হয় আমাদের উপেক্ষা সহ্য করিতে না পারিয়া অদৃশ্য হইয়াছেন।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

তীর্থভ্রমণ

বৃন্দাবন।

মথুরা হইতে ভোরবেলা রওয়ানা হইয়া আমরা বেলা আটটা নয়টার সময় বৃন্দাবন পৌছিলাম। বৃন্দাবনে করুণাবাবুর কোনও ছাত্রের পিতার এক বাড়ী আছে, সেই খানেই আমরা উঠিব। এখানে লোকের বাড়ীমাত্রই "কুঞ্জ" নামে অভিহিত। আমাদের গন্তব্য স্থান ছিল ক্ষেত্রমোহন দের কুঞ্জ।

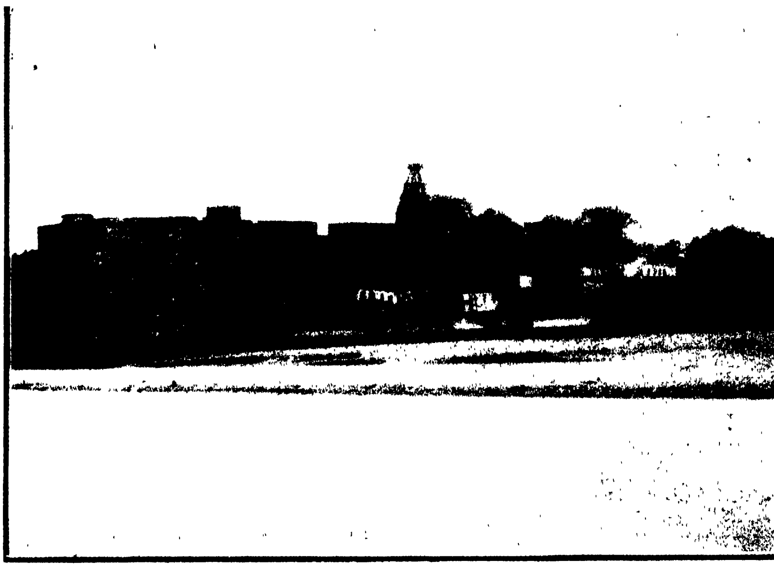


৺বৃন্দাবন দৃশ্য

ষ্টেশনে পাণ্ডাদের ভীড় যথেষ্টই ছিল, কিন্তু আমরা গাড়ী হইতে নামিয়াই কোন দিকে দৃকপাত না করিয়া তুই কুলীর মাথায় জিনিষপত্র বোঝাই দিয়া তাহাদের বলিলাম—ক্ষেত্রমোহন দের কুঞ্জে লইয়া চল্।

জিনিষপত্র রাখিয়া, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া আমরা কেশীঘাটে যমুনা স্নান করিতে গেলাম। দূর হইতে যমুনা দেখিয়া মনে পড়িল—

"যমুনে এই কি তুমি, সেই যমুনা প্রবাহিনী?"



বৃন্দাবন—কেশীঘাট

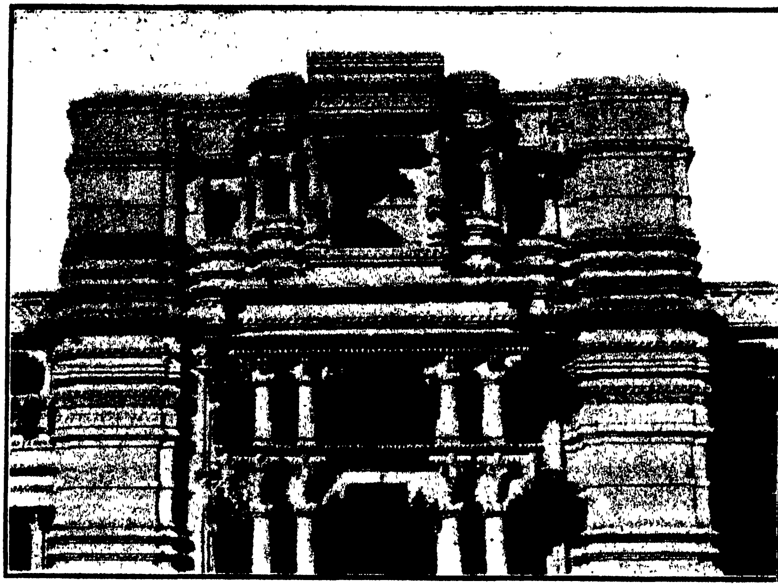
উক্ত কুঞ্জটি ষ্টেশন হইতে মাইল দুই হইবে। রাস্তা অতি জঘন্য এবং অপরিষ্কার—রাস্তার উপর আবর্জ্জনা জঞ্জাল ও মলমূত্রাদি যেখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ভারতবর্ষে হিন্দুর এই প্রাচীন তীর্থের রাজপথের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া মনে বড় দুঃখ হইল।

যথা সময়ে আমরা "কুঞ্জে" উপনীত হইলাম। এই কুঞ্জ-রক্ষার ভার এদেশীয় একজন পাণ্ডার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। পাণ্ডাঠাকুর ভাঙা ভাঙা বাংলা জানেন—করুণা বাবুকে 'মাষ্টার মশাই' নামে সম্বোধন করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। আমাদের আগমন বার্ত্তা ইঁহাকে পূর্ব্বে হইতেই জানান হইয়াছিল সুতরাং আমাদের কোনও অসুবিধায় পড়িতে হইল না। দুই-খানি ঘর ও একখানি রান্নাঘর আমাদের জন্য প্রস্তুত ছিল।

বিশাল-কলেবরা যমুনা নদী ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীর আকার ধারণ করিয়াছেন। বহুদূর চড়া ভাঙ্গিয়া আমরা জলের ধারে গিয়া পবিত্র জলে অবগাহন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। যমুনা কচ্ছপে পরিপূর্ণ—দেখিলে মনে হয় তাহাদের বুঝি ওখানে আর বাসস্থান কুলাইতেছে না, এখনি ডাঙায় উঠিয়া আসিবে।

স্নান-পূজা সারিয়া আমরা দেবদর্শনে বাহির হইলাম। বৃন্দাবনের মন্দিরগুলির সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

গোস্বামিগণ বৃন্দাবনে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে বৃন্দা-দেবীর নামে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরের এখন চিহ্নমাত্রও নাই। রাসমণ্ডলের নিকট সেবাকুঞ্জে একটি দীর্ঘিকা সম্বলিত বৃহৎ বাগান আছে—পূর্ব্বে নাকি এইখানে সেই মন্দিরটি অবস্থিত ছিল। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবর একবার এই মন্দির

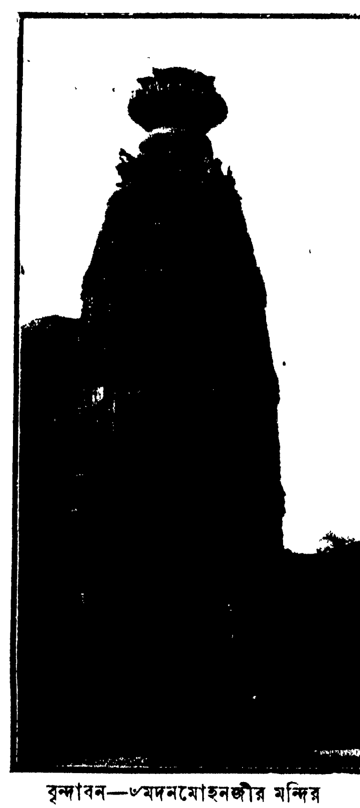


বৃন্দাবন—৺গোবিন্দজীর পুরাতন মন্দি

দেখিতে আসেন—গোসাইগণ তাঁহার চক্ষু বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া নিধুবনে লইয়া যান। নিধুবনের স্বর্গীয় শোভা দেখিয়া সম্রাট এতদূর প্রীত ও বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন যে তিনি ফিরিয়া আসিয়াই এই পরম পবিত্র স্থানে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিবার আদেশ দেন।



৺গোবিন্দজী



বৃন্দাবন—৺মদনমোহনজীর মন্দির

সেই সময় চারিটি মন্দির তৈয়ারী হইয়াছিল, যথা—৺গোবিন্দজীর মন্দির, ৺গোপীনাথজীর মন্দির, ৺যুগলকিশোরের মন্দির ও ৺মদনমোহনজীর মন্দির।

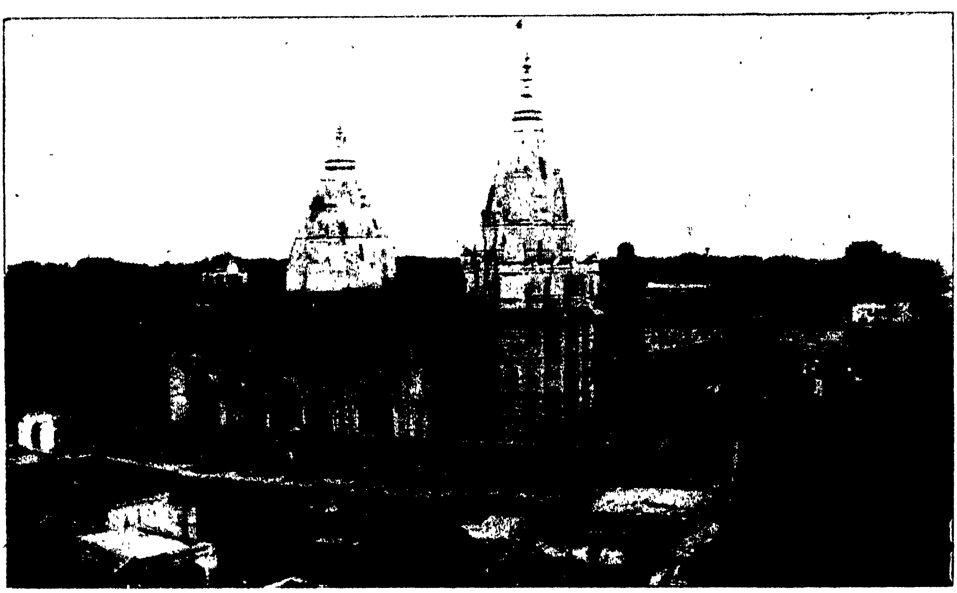


৺মদনমোহনজী

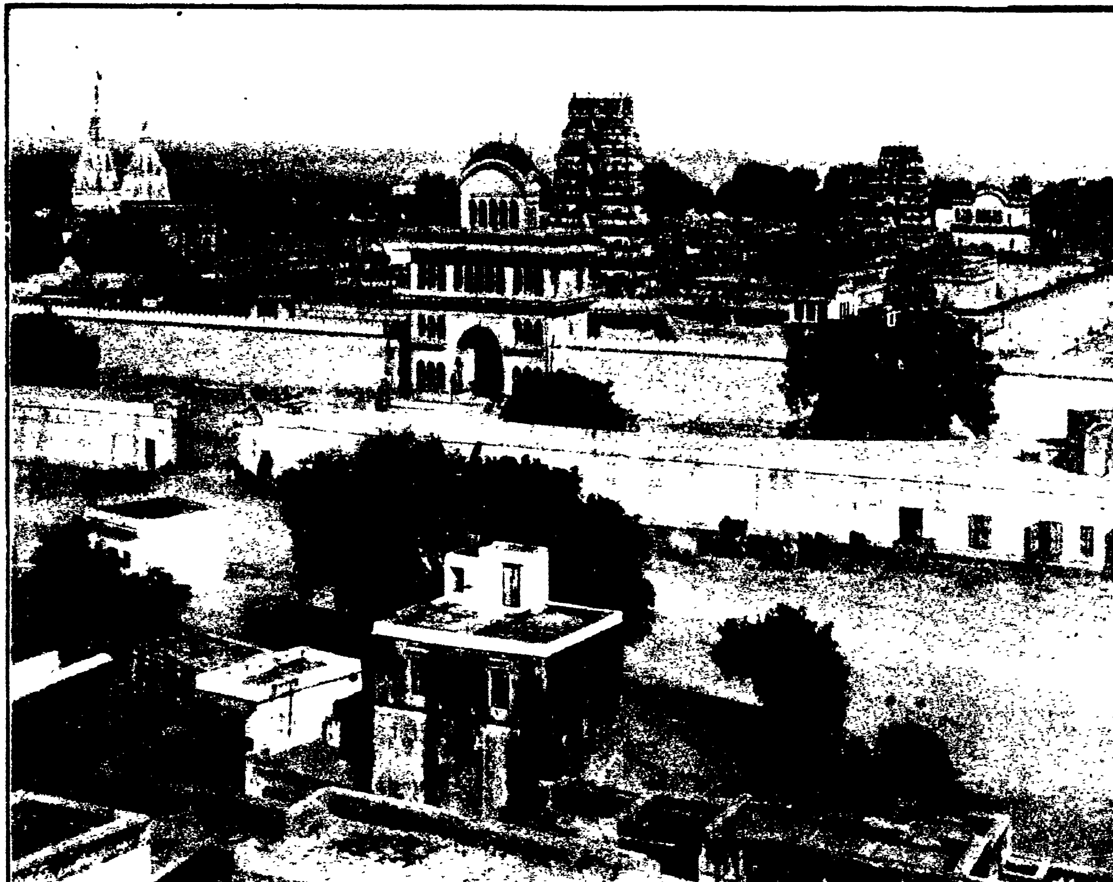


৺গোপীনাথজী

গোবিন্দজীর মন্দির—উত্তর ভারতবর্ষে এরূপ সুন্দর মন্দির নাকি আর নাই। মন্দিরের আকৃতি গ্রীক ক্রসের মত। মধ্যস্থলের কক্ষটির উপর একটি অতি সুন্দর গম্বুজ আছে। শুনা যায় যে পূর্ব্বে প্রতি-রাত্রে এই মন্দির-চূড়ায় এক বৃহৎ প্রদীপ জ্বলিত। মন্দিরটি এত উচ্চ ছিল যে এই আলোক নাকি দিল্লী পর্য্যন্ত পৌছিত। একদিন ঔরঙ্গজেব দিল্লীর প্রাসাদ হইতে এই আলোক দেখিয়া জিজ্ঞাসায় পার্শ্বচরের নিকট শুনিলেন যে ইহা বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর মন্দিরের প্রদীপালোক। ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি মন্দিরের বিরুদ্ধে অভি-যান করিলেন এবং পৌছিয়া মন্দিরটি ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিলেন।



বৃন্দাবন—লালাবাবুর মন্দির



বৃন্দাবন—শেঠ লক্ষ্মীচাঁদের মন্দির

মন্দিরের ভিতরে গিরিধারী কৃষ্ণের বিগ্রহ আছে—শ্রীকৃষ্ণের দুই দিকে আরও দুইটি মূর্ত্তি আছে—একটি চৈতন্যদেবের ও একটি নিত্যানন্দের। মন্দিরের পশ্চিম-ভাগে একটি কোণে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত একটি বৃহৎ শিলালিপি আছে—তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে ১৬৪৭ সম্বতে রূপ ও সনাতন নামক গুরুদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম ভাগে দেবনাগর অক্ষরে এই লিপি দেখা যায়—

৩৪ শকে মহারাজ পৃথ্বিরাজের বংশসম্ভূত মহারাজ ভগবানদাসের পুত্র মহারাজ শ্রীমানসিংহদেব বৃন্দাবন তীর্থে এই গোবিন্দদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। কল্যাণদাস প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ, সহকারী তত্ত্বাবধায়ক মাণিকচাঁদ চোপাড়, শিল্পী দিল্লী-নিবাসী গোবিন্দদাস ও মিস্ত্রী গোরখদাস।

ঔরঙ্গজেব মন্দির ধ্বংস করিতে আসিতেছেন এই সংবাদ পাইয়া মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিগ্রহকে জয়পুরে পাঠাইয়া দিলেন। ঔরঙ্গজেবের সময় হইতে বিগত



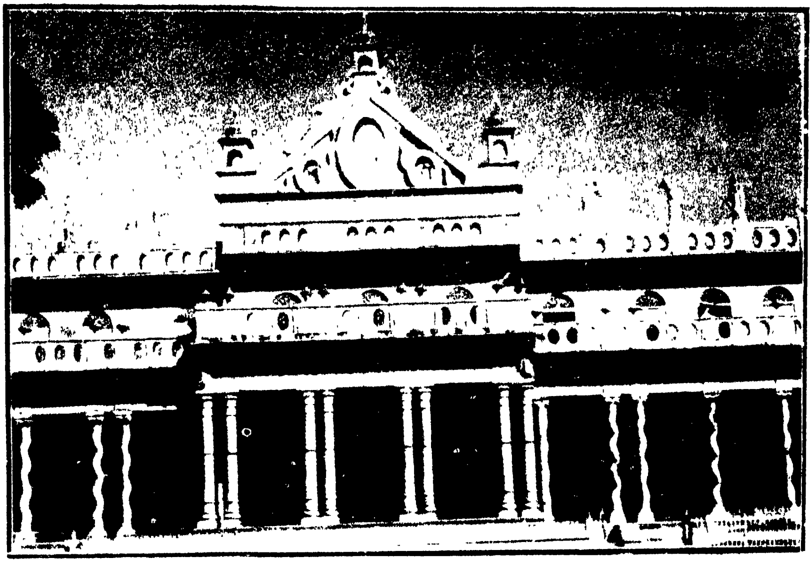
বৃন্দাবন—শেঠজীর মন্দির ও সোণার তালগাছ

সংবৎ ৩৪ শ্রী শকবন্ধ অকবর শাহরাজ শ্রীকর্ম্মকুল শ্রী পৃথিরাজাধিরাজ বংশ মহারাজ শ্রীভগবন্ত দাস সুস শ্রীমহারাজাধিরাজ শ্রীমান সিংহদেব শ্রীবৃন্দাবন জোগ পীঠস্থান মন্দির করাজৌ শ্রীগোবিন্দদেব কো কাম উপরি শ্রীকল্যাণদাস, আজ্ঞাকারো মাণিকচন্দ চোপাড় শিল্পদারি গোবিন্দদাস দোলবলি কারিগরুঃ দঃ। গোরষ দস্যুবোস্তবল্।

ইহার ভাবার্থ এই—সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক প্রচলিত

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত মন্দির ক্রমশঃই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল। দেওয়ালের ফাটলে বড় বড় বৃক্ষ জন্মিয়াছিল। আশে পাশের লোকেরা বাড়ী প্রভৃতি নির্ম্মাণ কার্য্যে মালমশলার প্রয়োজন হইলে এই মন্দির হইতে তাহা উঠাইয়া লইয়া যাইত। নিষেধ করিবার কেহ ছিলনা। অবশেষে ১৮৭৩ সালে গ্রাউস্ সাহেব জয়পুরের মহারাজার সাহায্য লইয়া এই মন্দিরের জীর্ণসংস্কার আরম্ভ করেন।

এই মন্দিরের বার্ষিক আয় সাড়ে সতের হাজার টাকা। আলোয়ারে একটি, ও জয়পুরে একটি



বৃন্দাবন—সাহাজীর মন্দির

দেবোত্তর গ্রাম আছে, ঐ গ্রামদ্বয়ের আয় হইতে মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

মদনমোহনজীর মন্দির—বৃন্দাবনে কালীদহ ঘাটের নিকটবর্ত্তী এক উচ্চ ভূমির উপর এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত কিরূপে হইল, তাহার গল্প লছমন দাস প্রণীত "ভক্তসিন্ধু" নামক গ্রন্থে আছে।—রূপ ও সনাতন গোস্বামিদ্বয় প্রতিদিন মথুরাতে ভিক্ষা করিতে যাইতেন। একদা একব্যক্তি সনাতনকে একটি মদনমোহনের মূর্ত্তি দিল। সনাতন সেটিকে সযত্নে লইয়া আসিয়া কালীদহ ঘাটের নিকটে দুঃশাসন-টিলার উপর প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই স্থানের অতি নিকটেই একটি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সনাতন



বৃন্দাবন—বস্ত্রহরণ ঘাট

বাস করিতে লাগিলেন। একদিবস রামদাস নামক এক ব্যবসায়ী মুলতান হইতে নৌকা বোঝাই করিয়া বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া নদীপথে আগ্রা যাইতেছিল। পথে কালীদহের নিকট এক বালুকাতটে তাহার নৌকা আট্‌কাইয়া যায়। নৌকা ছাড়াইতে তিনদিন বৃথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে রামদাস স্থানীয় দেবতার পূজা করিয়া দৈবসাহায্য লইবার সংকল্প করিল। তীরে আসিয়া টিলার উপর উঠিয়া সনাতন গোস্বামীর সহিত তাহার দেখা হইল। সনাতনকে রামদাস নিজের বিপদের কথা বলিল। সনাতন বলিলেন—যাও, মদনমোহনজীর নিকট গিয়া তোমার নিবেদন জানাও। বণিক সেইরূপ করিল—ও তাহার নৌকাও দেবতার আশীর্ব্বাদে আবার চলিতে লাগিল। আগ্রায় পৌছিয়া সমস্ত জিনিষ পত্র বিক্রয় করিয়া সে যে টাকা পাইল তাহা দ্বারা এই মন্দির ও একটি ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দিল।—মন্দির ও ঘাট উভয়ই রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত। মন্দিরের পূর্ব্বদ্বারের উপর নিম্নলিখিত লিপি খোদিত আছে—

হর ইব গুরুবংশো যৎপিতা রামচন্দ্রো
গুণি মণিরিব পুত্রো যস্য রাধা বসন্তঃ।
সকৃত সুকৃতরাশিঃ শ্রীগুণানন্দ নামা
ব্যধিত বিধব দেম্মন্দিরং নন্দসূনোঃ।

মন্দিরের বার্ষিক আয়, অনুমান দশহাজার টাকা।

মদনমোহনজীর আসল মূর্ত্তি এখন কেরৌলিতে রহিয়াছে। রাজা গোপাল সিংহ, জয়পুরের রাজার নিকট হইতে এই মূর্ত্তি পাইয়া কেরৌলিতে লইয়া গিয়া এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। যে গোস্বামীকে তিনি মন্দিরের পূজার ভার দিয়াছিলেন—তিনি মুর্শিদাবাদ নিবাসী এক বাঙ্গালী, নাম রামকিশোর। রামকিশোর মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ, বার্ষিক সাতাইস হাজার টাকা আয়ের দেবোত্তর সম্পত্তি পাইয়াছিলেন।

দিনে সাতবার বিগ্রহের ভোগ দেওয়া হয়। তন্মধ্যে দুইটিই প্রধান—দ্বিপ্রহরে "রাজভোগ" ও রাত্রে "শয়ান"। ইহা ছাড়া আরও পাঁচবার ভোগ দেওয়া হয়, যথা—

প্রত্যূষে—মঙ্গল আরতি
বেলা ৯টায়—ধুপ
১১টায়—শিঙ্গার
বিকাল ৩টায়—ধুপ
গোধূলিতে—সন্ধ্যারতি।

এই মন্দির সম্বন্ধে সুরদাস প্রণীত "ভক্তমাল" গ্রন্থে একটি গল্প আছে। সুরদাস আকবরের রাজত্বকালে শাণ্ডিলের আমিন ছিলেন। এক সময়ে তিনি জেলার সমস্ত খাজনা, এই মন্দিরের পুরোহিত ও তীর্থযাত্রিগণকে ভোজ দিয়া খরচ করিয়া ফেলেন। খাজনার বাক্স যথাসময়ে দিল্লীতে প্রেরিত হইল। যখন বাক্স খোলা হইল, তখন সকলে দেখিল মুদ্রার পরিবর্ত্তে কেবল প্রস্তরখণ্ড রহিয়াছে। রাজা তোডরমল্ল তখন রাজস্বসচিব। তিনি এই "অতিভক্তি"র কথা শ্রবণ করিয়া সুরদাসকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। মদনমোহনজী ভক্তের ক্লেশ দেখিয়া সম্রাট্ আকবরকে রাত্রে স্বপ্ন দিলেন—সুরদাসকে এখনি মুক্তি প্রদান করা হউক। হিন্দুদেবদেবীর উপর আকবরের শ্রদ্ধা ছিল, তিনি সুরদাসকে মুক্তি দিলেন।

গোপীনাথজীর মন্দির।

কথিত আছে যে এই মন্দির কুশাবহ ঠাকুরদের শিখাবতী শাখার প্রবর্ত্তনকারীর পৌত্র রায়শীলজী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই মন্দিরের আকার ও কারুকার্য্য অনেকটা মদনমোহনজীর মন্দিরের মত। ইহার উত্তর দিকে ১৮২১ সালে নন্দকুমার ঘোষ নির্ম্মিত একটি আধুনিক মন্দির আছে। পুরাতন মদনমোহনজীর মন্দিরের সম্মুখে রাস্তার অপর পারে মদনমোহনজীর আর একটি নূতন মন্দির আছে, তাহাও এই নন্দকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

যুগলকিশোরের মন্দির—কেশীঘাটের নিকট অবস্থিত। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে অনুমান ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠাতার নাম শুনা যায়—চৌহান ঠাকুর ননকরণ। লোকে বলে ইনি রায়শীলের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন। মন্দিরের প্রধান

দ্বারটি পূর্ব্বদিকে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে হস্তীর আকারে খোদিত আটটি ব্র্যাকেট। তাহার নীচে দুইটি ছোট ছোট প্রবেশদ্বার।

রাধাবল্লভের মন্দির—পূর্ব্বের পুরাতন মন্দিরটি সম্রাট ঔরঙ্গজেব ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। যে স্থানে মন্দিরটি ছিল, তাহারই দক্ষিণে একটি আধুনিক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

রাধাদামোদরের মন্দির—এখানে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা জীবগোস্বামী ও তাঁহার দুই আত্মীয় রূপ ও সনাতনের ভস্মাবশেষে রক্ষিত আছে। শ্রাবণ মাসে এখানে বার্ষিক মেলা বসিয়া থাকে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক মন্দির গুলির মধ্যে কয়েকটি মন্দির বিখ্যাত—

লালাবাবুর মন্দির। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ বা লালাবাবু এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মধ্যস্থলে মন্দির—চারিদিকে বিস্তীর্ণ বাগান—বাগান ঘিরিয়া প্রশস্ত প্রাচীর। মন্দির-প্রবেশ পথে দুইটি সিংহদ্বার।

লালাবাবুর পূর্ব্বপুরুষ মুরলীমোহন সিংহ—একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। মুর্শিদাবাদ কান্দিতে তাঁহার জমিদারীও ছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারী বিহারীলালের তিনপুত্র ছিল—রাধাগোবিন্দ, গঙ্গাগোবিন্দ ও রাধাচরণ। রাধাগোবিন্দ, আলীবৰ্দ্দিখাঁ ও সিরাজদৌলার অধীনে চাকুরি করিতেন। তিনি পথিকদের নিমিত্ত এক বিশ্রাম স্থান ও বৃন্দাবনে রাধাবল্লভের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার কোন পুত্রাদি না থাকায়, নিজ সম্পত্তি তিনি গঙ্গাগোবিন্দকে দিয়া যান। গঙ্গাগোবিন্দও কয়েকটি ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ ও নদীয়ায় রমচন্দ্রপুরে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। দুর্ভাগ্যক্রমে নিকটবর্ত্তী নদীতে একবার বন্যা আসিলে তাঁহার কীর্ত্তি-চিহ্নগুলি ভাসিয়া যায়। তাহার পর তিনি পুনরায় তাঁহাদের আদি বাসস্থান কাঁদিতে মন্দির নির্ম্মাণ করেন। গঙ্গাগোবিন্দের পুত্র পিতার সম্পত্তির আরও উন্নতি করেন ও তাহার পর সেই অগাধ সম্পত্তি গঙ্গাগোবিন্দের পৌত্র লালাবাবুর হস্তে গিয়া পড়ে।

লালাবাবুর বয়ক্রম যখন ত্রিশ বৎসর তখন তিনি ব্রজভূমিতে বাস করিবার জন্য দেশ ছাড়িয়া আসেন। বৃন্দাবনে তাঁহার নির্ম্মিত বিখ্যাত মন্দির ছাড়া একটি পান্থশালাও তিনি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেখানে প্রতিদিন যাত্রিগণকে আহার করান হইত—ইহাতে বার্ষিক প্রায় বাইশ হাজার টাকা খরচ পড়িত। তাঁহার আরও কীর্ত্তি আছে। রাধাকুণ্ডের ধারে তিনি লক্ষ টাকা ব্যয়ে সুন্দর সুন্দর ঘাট ও চত্বর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন চল্লিশ, তখন তিনি বৈরাগী হইয়া সংসার ত্যাগ করেন। দুই বৎসর কাল তিনি বনে বনে ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান। অবশেষে এক ঘোড়ার লাথিতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার এই শোচনীয় পরিণাম ও পারিখজী নামক আর এক জন ক্রোরপতির মৃত্যু উপলক্ষ্য করিয়া এক ছড়া এখনও এদেশে শুনিতে পাওয়া যায়—

লালা বাবু মর্ গিয়া ঘোড়া দোষ লাগায়ে
পারিখ কা কিরা পড়া বিধি সোঁ কো বাঁচায়ে।

লালাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে শেঠ লছমীচাঁদের পিতা মণিরামও বনে বনে ভ্রমণ করিতেন।

শেঠজীর মন্দির—শেঠ লক্ষীচাঁদের ভ্রাতৃদ্বয় শেঠ গোবিন্দদাস ও রাধাকিষণ দ্বারা নির্ম্মিত। এই মন্দির শ্রীরঙ্গনাথ দেবের নামে উৎসর্গীকৃত। শেঠদের গুরু রঙ্গাচার্য্য এই মন্দিরের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। মন্দিরটি দেখিতে অনেকটা দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরগুলির ন্যায়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

মন্দির প্রাঙ্গণ ঘিরিয়া বাগান,—বাগানে স্বচ্ছ শীতল জলপূর্ণ দীর্ঘিকা—সবটা ঘিরিয়া এক উচ্চ প্রাচীর। মন্দিরের ঠিক সম্মুখে সেই বিখ্যাত **সোণার তালগাছ**—আসলে ইহা গিল্টি করা তাম্র নির্ম্মিত ধ্বজস্তম্ভ। উচ্চে ষাট ফুট—মাটির নীচে নাকি আরও

২৪ ফুট প্রোথিত আছে। শুধু এই স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতেই দশ হাজার টাকা খরচ হইয়াছিল। প্রধান দ্বার পশ্চিম দিকে—দ্বারের উপর নহবৎ খানার মত। প্রবেশ পথের এক পার্শ্বে একটি ছোট কক্ষ—সেখানে দেবতার রথ থাকে। চৈত্র মাসের ব্রহ্মোৎসব মেলায় দশদিন এখানে খুব ধুমধাম হইয়া থাকে। প্রতিদিন বিগ্রহকে রথে চড়াইয়া শোভযাত্রা করিয়া নিকটবর্ত্তী এক বাগানে লইয়া যাওয়া হয়। অষ্টধাতু নির্ম্মিত বিগ্রহকে রথের মধ্যস্থলে বসাইয়া তাঁহার দুই দিকে ব্রাহ্মণগণ দাঁড়াইয়া চামর-ব্যজন করিতে থাকেন। এই অবস্থায় রথ চালান হয়।

প্রতিদিন এই মন্দিরে পাঁচশত বৈষ্ণব ভোজন করান হয় এবং প্রতিদিন সকালে বেলা দশটা পর্য্যন্ত যে চায় তাহাকে এক বালতি ময়দা দেওয়া হয়।

আধুনিক মন্দিরগুলির মধ্যে এই শেঠের মন্দিরই বিখ্যাত। আরও কয়েকটির নাম এখানে দেওয়া যাইতে পারে—

রাধারমণের মন্দির—লক্ষ্ণৌ নিবাসী সাহ কুন্দনলাল কর্ত্তৃক বৃন্দাবনের আধুনিক অট্টালিকা গুলির আদর্শে নির্ম্মিত। এখানে একটি দেখিবার জিনিষ আছে—তাহা পাকান শ্বেত পাথরের থাম—প্রত্যেক থাম একখানি প্রস্তর হইতে খোদাই করিয়া নির্ম্মিত।

গয়া জেলার টিকারীর জমিদার হেতকাম ব্রহ্মের বিধবা পত্নী রাণী ইন্দ্রজিৎ কুঁয়র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি মন্দির আছে—তাহার নাম রাধা ইন্দ্রকিশোরের মন্দির। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দির শিখরে একটি স্বর্ণময় তাম্র কলস আছে—ইহাতেই নাকি পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। সমস্ত মন্দিরের নির্ম্মাণ ব্যয় তিন লক্ষ টাকা।

রাধাগোপালের মন্দির—গোয়ালিয়রের মহারাজা তাঁহার গুরু গিরিধারী দাসের আদেশানুসারে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। যদিও এই মন্দিরের নির্ম্মাণ ব্যয় চারি লক্ষ টাকা, দুঃখের বিষয় ইহার বাহ্য দৃশ্যে কোনও সৌন্দর্য্য নাই।

বৃন্দাবনের ঘাট—যমুনার তীরে অল্প অল্প দূর ব্যবধানে বিস্তর ঘাট আছে—তন্মধ্যে এই কয়েকটি উল্লেখযোগ্য—কালীয়মর্দ্দন ঘাট, কেশী ঘাট, বস্ত্রহরণ ঘাট প্রভৃতি। কেশী ঘাটের নিকট ভরতপুরের রাজদ্বয় রণজিৎ সিংহ ও রণধীর সিংহের পত্নীদ্বয় কিশোরী দেবী ও লক্ষ্মীদেবী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত দুইখানি সুন্দর অট্টালিকা আছে।

একটি বানর-বহুল কুঞ্জে পাণ্ডাঠাকুর তমালবৃক্ষে একটি চিহ্ন দেখাইয়া কহিলেন—এইখানে শ্রীকৃষ্ণ ননী খাইয়া হাত মুছিয়াছিলেন।

আমাদের সময় না থাকাতে বৃন্দাবনের বেশী কিছুই দেখিতে পাই নাই। অল্প সময়ে যেটুকু দেখিয়া আসিয়াছিলাম তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

বৃন্দাবনে খাদ্যদ্রব্য অতি সুলভ। সেখানে যেরূপ রাবড়ী খাইয়াছিলাম, আমাদের দেশে সেইরূপ খাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

বাড়ীর আত্মীয়াদের জন্য বৃন্দাবনী শাড়ী ও কিছু ছোলাভাজা, পেয়ারা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ও একটু কাগজে কিঞ্চিৎ ব্রজরজঃ মুড়িয়া লইয়া আমরা পরদিন প্রাতে বৃন্দাবন ত্যাগ করিলাম। মথুরা হইতে জিনিষপত্র লইয়া সেই দিনই আমরা আগ্রার পথে অগ্রসর হইলাম।

বৃন্দাবনে মা যখন রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহার অনতিদূরে বসিয়া করুণাবাবু এক কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। ট্রেণ ছাড়িলেই করুণাবাবু সেই অসমাপ্ত কবিতাটি পকেট হইতে বাহির করিয়া, লিখিতে বসিয়া গেলেন। কবিতাটির নাম "শ্রীবৃন্দাবনে"—সে বৎসর "মানসী"তেই উহা ছাপা হইয়াছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

সতীনাথ

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

প্রজাপতির দূত ।

হুগলী-ঘাট ষ্টেশনের অনতিদূরে গঙ্গার ধারে একখানি একতলা বাড়ী। বাড়ীখানি পাকা ইঁটের গাঁথুনি, বহুকাল মেরামত হয় নাই, অনেকগুলি বর্ষার ধারা তাহার মান্ধাতার আমলের চূণের কাজকরা দেওয়ালে কালো কালো রেখা আঁকিয়া আঁকিয়া সবটুকুকেই এখন একরঙ্গা করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে। সদর দরজার উপর বড় বড় অক্ষরে "হরের্নামৈব কেবলম্‌" এবং তাহার নীচে "সত্যং শিবং সুন্দরম্‌" লেখা। বাড়ীখানি যে কোন নিষ্ঠাবান হিন্দুর তাহা প্রথম দৃষ্টিপাতেই বুঝা যায়।

বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে খিড়কীর পুকুর ; চারিধারে আম, জাম, ডুমুর, সজিনা প্রভৃতি বড় বড় গাছগুলা পুকুরটিকে রৌদ্রালোক হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আশপাশের গাছের ঝরা পাতায় পুষ্করিণীর জল অনেক সময় আচ্ছন্ন থাকিলেও, বাতাস বহিলে জলের গায়ে একটা শিহরণ উঠিয়া ভাসমান পাতাগুলিকে এক পাশে জড় করিয়া দেয় এবং ভিতরের স্বচ্ছতা যেন কাঁচের মত ঝকঝক্ করিয়া উঠে। গঙ্গা কাছেই তাই স্নান ও পানের জন্য এজল ব্যবহার হয় না ; গৃহস্থের অন্য সকল কাজ এই জলেই চলিয়া থাকে। পুষ্করিণীর ডান দিকে অনেকখানি জমিকে ফণিমনসা ও রাংচিতার বেড়া দিয়া ঘিরিয়া বাগান করা হইয়াছে। বাগানে দেশী বিলাতী অনেক জাতীয় ফুলের গাছ—জুঁই, বেল, টগর, মল্লিকা, স্থলপদ্ম, সূর্য্যমণির সহিত হাস্না-হানা, মোরগ, জিনিয়া এবং কয়েকটি অজ্ঞাতনামা বিলাতী ফুল ও পাতাবাহার ক্রোটন গাছ মিশিয়া বাগানখানির শোভাবৰ্দ্ধন ও উদ্যানস্বামীর সুরুচির পরিচয় দিতেছে।

যে দিনের কথা বলিতেছি সেদিন বৈকালের দিকে মেঘ ও বিদ্যুতের অবিশ্রাম কৌতুকদ্বন্দ্ব চলিতেছিল। খানিক আগে পেঁজাতুলার মত যে হাল্কা মেঘ রৌদ্রহীন নীল আকাশের বুক জুড়িয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, এখন সে গুলা অদৃশ্য,—বাতাসের জোরে সন্‌সন্ করিয়া ভাসিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের স্থানে কয়েকটা বড় বড় কালো মেঘের টুক্‌রা সারা আকাশ জুড়িয়া ছুটাছুটি সুরু করিয়া দিয়াছে। গঙ্গা-বক্ষে মাঝিমাল্লারা সাবধানে নিজ নিজ নৌকা তীরের দিকে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। গৃহস্থ বাড়ীর মেয়েরা শুকান কাপড় প্রভৃতি তুলিবার জন্য ছাদে উঠিয়াছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা ঝড়ের আভাস মাত্রেই অভিভাবকদের মানা না মানিয়া মহানন্দে বাহিরে ছুটাছুটি খেলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

সেই আসন্ন বৃষ্টির প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া এগারো কিম্বা বারো বছরের একটি বালিকা, একটি বিচিত্রবর্ণ প্রজাপতির অনুসরণে পূর্ব্ববর্ণিত বাগানে চক্র দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার ঘন কেশপাশ সেই প্রবল বাতাসে দুলিতেছিল ; ধূলা উড়িয়া তাহার সুন্দর সুডোল মুখখানি ও খোলাচুলে যেন পিঙ্গলবর্ণের আবির মাখাইয়া দিতেছিল। ঝড়ের মধ্যে লঘুপক্ষ প্রজাপতিটা কখন যে কেমন করিয়া দৃষ্টিপথ এড়াইয়া কোন নিরাপদ আশ্রয়ে আত্মগোপন করিয়াছে, বালিকা তাহাকে আর খুঁজিয়া পাইল না। ক্ষুণ্ণচিত্তে সে বাড়ী ফিরিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় বৃষ্টি নামিল। রৌদ্রদগ্ধ ধরণীর বক্ষতাপ জুড়াইবার জন্যই যেন বড় বড় ফোঁটা পড়িতে লাগিল।

ভিতর হইতে ঘন ঘন ডাক আসিল, "উমা—উমা—জলে ভিজ্‌ছিস্ বুঝি ?" সঙ্গে সঙ্গেই এক অল্পবয়স্কা বিধবা ভিতরের দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল।

বালিকা ছুটিয়া তাহার কাছে আসিয়া ক্ষুণ্ণমনে কহিল, "দিদি, একটা এমন চমৎকার প্রজাপতি উড়্‌ছিল ভাই, এমন সুন্দর রং—সে কি বল্‌ব! কোথায় যে লুকিয়ে গেল খুঁজে পেলাম না।"

বালিকাকে স্নেহভরে কাছে টানিয়া তরুণী মৃদু হাসিয়া কহিল, "প্রজাপতির পিছনে আর ছুটোছুটি কেন ভাই, প্রজাপতি মঞ্জু বাবুকে তাঁর দূত করে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তিনি বাইরে এসে বসে রয়েছেন। মাগো—চুলগুলোর কি দুরবস্থা করেছিস্ বল্ দেখি! তোর জন্যে সত্যি উমা আমার যেন কান্না পায়। যত বড় হচ্ছিস্ ততই—"

উমা তাহার সুকোমল বাহুবেষ্টনে দিদিকে জড়াইয়া ধরিয়া আদরের স্বরে কহিল, "কই বড় হচ্ছি দিদি? এই দেখ না, তোমার কাঁধ পর্য্যন্তও হইনি।"

সত্যই বালিকাকে বয়সের অপেক্ষা অনেক ছোট দেখাইত। সম্ভবতঃ স্বাস্থ্যের অভাবই তাহার বাড়ের মুখ বন্ধ রাখিয়াছিল।

দিদি আঁচল দিয়া তাহার মাথা মুছাইতে মুছাইতে হাসিয়া কহিল, "আর ছোট নেই রে, বিয়ের ফুল ফুটেছে—এইবার ঘোমটা দিয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে বৌ হতে হবে।"

"ইস্, হলাম ত! আমার বয়ে গেছে!"—বলিয়া বালিকা দিদিকে অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। দিদিও তাহার অনুসরণ করিল।

এই ভগিনীদ্বয় বিদ্যানাথ বাচস্পতি মহাশয়ের পৌত্রী। বাচস্পতি মহাশয় হুগলি নর্ম্মাল স্কুলের হেড্-পণ্ডিত। বিদ্যা বুদ্ধির যথেষ্ট খ্যাতি সত্ত্বেও সাংসারিক হিসাবে ইহার অধিক উন্নতি তাঁহার হইল না। প্রথম জীবনে তিনি নিজগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপনা করিয়া অনেকগুলি ছাত্রকে বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। সকলের অবস্থাই যে ভাল ছিল এমন নয়, কয়েকটি তাঁহার প্রতিপাল্যেরই সামিল ছিল। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ও প্রিয়দর্শন ছিল অনাথ। আত্মীয়হীন অনাথ বালকের নামকরণ বিদ্যানাথের ৺জননীদেবী করিয়া গিয়াছিলেন। যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রভৃতি ব্রাহ্মণের নিত্য কার্য্যকেই বিদ্যানাথ নিজের কর্ত্তব্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহে অর্থ-স্বাচ্ছল্য না থাক, অভাব-বোধও সেই অনুপাতে কম ছিল। দেশ দেশান্তর হইতে নিমন্ত্রণ আসিত। সমাজেও বাচস্পতি মহাশয় একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। আড়ম্বরহীন গৃহস্থালীতে বিদ্যানাথগৃহিণীর অনলস সেবাপরায়ণতা ও হাসিমুখ, অভাবের দুঃখকে যেন নিকটেও আসিতে দিত না। বিদ্যানাথের পুত্র চণ্ডীচরণ সংস্কৃত শিক্ষার সহিত রাজবিদ্যাও শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার বিদ্যার খ্যাতিও দেশে বিদেশে প্রচারিত হইতেছিল। তখনকার দিনে তাঁহার মত নৈয়ায়িক পণ্ডিত কেহ ছিলেন না বলিলেও হয়। চণ্ডীচরণের দুই-কন্যা—অন্নপূর্ণা ও উমাসুন্দরী। বড় মেয়েটিকে বিদ্যানাথ সাত বৎসরে পাত্রস্থা করিয়াছিলেন। এত অল্প বয়সে মেয়ের বিবাহ দেওয়া চণ্ডীচরণের ইচ্ছা ছিল না কিন্তু পিতার একান্ত আগ্রহ দেখিয়া তিনি কোন আপত্তি প্রকাশ করেন নাই। সাধ্যাতিরিক্ত সমারোহে বিদ্যানাথ সপ্তম বৎসরে কন্যাদানে পৃথিবীদানের পুণ্য-সঞ্চয় করিলেন। কিন্তু সে আনন্দ বেশীদিন ভোগ করিতে পাইলেন না। সেই সমারোহের পরিশ্রমে চণ্ডীচরণের নিমোনিয়া জ্বর হইল। তিনদিনের জ্বরে তিনি তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতা, প্রেমময়ী পত্নী ও শিশুকন্যার ভবিষ্যৎ-চিন্তা অসম্পূর্ণ রাখিয়া, কোন অজানা নূতন রাজ্যের ডাক শুনিয়া চলিয়া গেলেন। চণ্ডীচরণের অকাল মৃত্যু বিদ্যানাথের মনের উপর দিয়া একটা প্রলয়ের ঝড় বহাইয়া দিয়া গেল। শোক, শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিতকেও অভিভূত করিয়া দিল। পুত্র শোকাতুর বিদ্যানাথ-গৃহিণী অল্পদিনের মধ্যেই পুত্রের অনুসরণ করিয়া সকল জ্বালা এড়াইয়া গেলেন, এবং দুঃখের চরম দৃশ্য দেখাইবার জন্যই বোধ হয় নবমবর্ষীয়া অন্নপূর্ণাও বিবাহের দুই বৎসর পরে শাঁখা সিঁদুর ফেলিয়া জননীর সহিত হবিষ্যান্নের ভাগ লইল।

এক সঙ্গে এতগুলা বড় বড় শোকে বিদ্যানাথের

শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুঃখের সংসারে সমদুঃখী হইয়া কাল যাপন করা ছাত্রদের পক্ষে ক্রমেই কষ্টকর হইয়া উঠিতে লাগিল। বিদ্যানাথের শারীরিক অসুস্থতার অছিলা পাইয়া তাহারা একে একে রূপরাম বেদান্ত-তীর্থের নূতন টোলে চলিয়া গেল। সকলেই ছাড়িয়া গেল, গেল না কেবল অনাথ—সে-ই কেবল আত্মীয়ের মত স্নেহে যত্নে সেবায় এই বিধ্বস্ত পরিবারের সাহায্যে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া রাখিল। যাইবার স্থানও তাহার ছিল না।

একটা চলিত কথা আছে, 'অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর'। এ ক্ষেত্রেও অনেকটা তাহাই ঘটিয়াছিল। দুঃখের বেগ ক্রমে সহনীয় সীমায় আসিলে বিদ্যানাথ দেখিলেন, অর্থ ভিন্ন সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া সম্ভব নয়। যাহারা গেল তাহারা ত জুড়াইয়া গেল, যাহারা পড়িয়া রহিল তাহাদের অসীম দুঃখের ভিতর এও আবার একটা বিশেষ চিন্তার বিষয়। বিদ্যানাথের একজন বন্ধু চেষ্টা করিয়া তাঁহার জন্য নর্ম্মাল স্কুলের হেডপণ্ডিতী যোগাড় করিয়া দিলেন। বিদ্যানাথ তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। এ ভাঙ্গা মন লইয়া কোথায় আবার ছাত্র সংগ্রহ করিয়া বেড়াইবেন!

অন্নপূর্ণার বিবাহে নিজ মনের কাছে তিনি যে অপরাধ করিয়াছিলেন, তাহারই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ উমার বিবাহে তিনি যেন অত্যধিক বিলম্ব করিতে চাহিতেছিলেন। উমার মা রাজলক্ষ্মী একদিন শ্বশুরকে এ সম্বন্ধে সজাগ করিয়া দিবার প্রয়াস পাইলেন। বিদ্যানাথ, অদূরোপবিষ্টা পাঠনিরতা পৌত্রী উমার পানে সস্নেহ নেত্রে চাহিয়া কহিলেন, "তাই নাকি উমা, তুই তবে বড় হয়ে গেছিস্? এইবার তোর জন্যে পাগলা ভোলাকে তলব পাঠাতে হবে? তোর কিন্তু বুড়ো বর হবে বাপু, তা আমি এখন থেকে বলে থালাস।"—বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চোখের পাতা যেন ভারি হইয়া আসিল।

পিতামহের কথার প্রতিবাদে উমা প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি কল্লে ত!"

বিদ্যানাথ সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কল্লেরে? বুড়ো বরকে বিয়ে?"

"না, কাক্কেও না"—বলিয়া উমা সে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।

বধূর প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যানাথ শুধু বলিলেন, "তাড়াতাড়ি কেন মা? যে কটা দিন হেসে খেলে কাটিয়ে দিতে পারে দিক্। বিবাহ ত দিতেই হবে—বড় কি এত হয়েছে!"

কিন্তু তবু হিন্দু—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে যতদিন সম্ভব কাটাইয়া একদিন বিদ্যানাথকেও স্বীকার করিতে হইল—আর উপেক্ষা করা চলে না, এইবার একটা স্থির করিয়া ফেলা উচিত। স্থির করাটাও তাঁহার নিজের কাছে খুব বেশী অস্থির ছিল না। একদিন রাজলক্ষ্মীকে সেকথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "অনাথের সঙ্গে উমার বিয়ে দিলে হয় না?"

শ্বশুরের গোপন ইচ্ছা রাজলক্ষ্মীর মনেও কিছু দিন হইতে অস্ফুটরূপে প্রকাশ পাইতেছিল। বধূ বোধ হয় এই কথাটাই প্রত্যাশা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাই বিস্মিত না হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

বধূকে নিরুত্তর দেখিয়া বিদ্যানাথ বিস্মিত হইলেন, তবে মত নাই না কি? একবার পুত্রের অমতে একজনের বিবাহ দিয়া তাহার জীবনটা বৃথা করিয়া দিয়াছেন—আবার কি তাহাই হইবে? কিন্তু অনাথকে মন হইতে সরাইয়া দেওয়া—তাহাও যে এখন বড় কঠিন সমস্যা। তাহাকে এতদিন হাতে করিয়া ঠিক নিজের মনের মত করিয়াই যে গড়িয়া তুলিয়াছেন। সে যে এখন অস্থি মজ্জায় তাঁহার নিজেরই হইয়া গিয়াছে। প্রলোভন বড় অধিক।

বিদ্যানাথ সংশয়পূর্ণ কণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "কেন চুপ করে রইলে মা, তোমার কি এতে মত নেই তবে?"

বধূ লজ্জাকুণ্ঠিত মৃদুস্বরে কহিল, "ছেলেটি বড় গরীব, আপন জন কেউ কোথাও নেই, চিরটা জীবন উমারও কি তবে এমনি করে দুঃখের ভিতর কেটে যাবে?"

বিশ্বানাথ চমকিয়া উঠিলেন। সংসারের এদিকটা তিনি কখনও তলাইয়া দেখেন নাই—দেখিতে শিখেনও নাই। ভাবিতে লাগিলেন—এই জগদ্ব্যাপী বিরাট দুঃখের হ'ত হইতে মুক্তি পাইবারও স্থান আছে না কি? অহং-মত্ত মানব নিজের শক্তিকেই বড় দেখে,মনে করে—আমি করি। কে করে—কে করায়? "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।" যদি তাই মানি, তবে উমার ভাগ্যলিপি কি আমার হাতে বদল হইয়া যাইবে? শিব শম্ভো! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্, আমি কেন নিমিত্ত হইতে চাই।—প্রকাশ্যে বলিলেন, "তেমন জানা শোনা ভাল ছেলে কৈ? আবার ওদিকটা ত দেখ্‌তে হবে—জান ত মা আজকাল মেয়ের বিয়ের পণ দেওয়া এক বিষম দায়। ঘরের খবর ত তোমার অজানিত নয়। অনাথের চেয়ে অন্য কিছুতে বড় না হোক্, ধনে বড় খুঁজতে গেলে তার দামও ত তেমনি লাগবে!"

বধূ সঙ্কোচ-জড়িত স্বরে কহিলেন, "ও পাড়ার কাকার জামাই মঞ্জুভূষণ আজই অনাথের কাছে বলেছেন, তাঁর এক বড় মানুষের ছেলে বন্ধু পণ না নিয়ে বিয়ে কর্‌তে রাজী আছেন। ছেলে নিজে মেয়ে দেখ্‌তে চান। ছেলেটি বি-এ পাশ, আবার ডাক্তারী পাশ, দেখ্‌তেও নাকি খুব ভাল। তা উমাকে একবার দেখালে হয় না বাবা?"

ধনী সন্তান, তাহার উপর আবার বাগ্‌দেবীর বর-পুত্র, সে যে দরিদ্র স্কুল-পণ্ডিতের পৌত্রীকে গ্রহণ করিবে এমন দুরাশা বিশ্বানাথের মনে কন্যাস্নেহান্ধ জননীর মত এত সহজে স্থান না পাইলেও, তিনি সুমার্জ্জিত পিতলের ডিবা খুলিয়া নস্য লইয়া কহিলেন, "বেশ ত অনুকূলকে বলা যাক্, তাঁর জামাই যদি পাত্র-টিকে একদিন আনিয়ে উমাকে দেখাতে পারেন, তাতে আর বিশেষ ক্ষতি কি? কুমারী কন্যা, পাঁচ জায়গা থেকে দেখ্‌তে আসা ত পদ্ধতি আছে।" বধূর ধনী গৃহে কুটুম্বিতার সাধ বুঝিয়া অনাথের কথা দ্বিতীয় বার উত্থাপনে ইচ্ছা আর তাঁহার হইল না।

বিদ্যানাথকে কোন অনুরোধের জন্য অনুকূল ভট্টা-চার্য্যের শরণ লইতে হইল না। মঞ্জুভূষণ উপযাচক হইয়া অদ্য অপরাহ্ণে নিজে আসিয়াছে। রাজলক্ষ্মী দত্ত আসনে বসিয়া তাঁহার স্বহস্তে প্রস্তুত ক্ষীরের ছাঁচ ও নারিকেলের ছাপায় মিষ্টমুখ করিয়া, পানের খিলি লইয়া, বরকে কল্য বৈকালে লইয়া আসিবে আশ্বাস দিয়া সে চলিয়া গেল।

পরদিন বিকালে মঞ্জুভূষণের সহিত বর নিজেই পাত্রী দেখিতে আসিল। অন্নপূর্ণা উমাকে যথাসাধ্য মাজিয়া ঘষিয়া, একখানা চাঁদের আলো কাপড় পরাইয়া, কপালে সিন্দূরের ফোঁটা দিয়া, যথাযোগ্য উপদেশান্তর বিশ্বানাথের সহিত বৈঠকখানা ঘরে পাঠাইয়া দিল। মার সহিত পাশের ঘরে কবাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া কম্পিত বক্ষে অপেক্ষা করিয়া রহিল।

দাদামণির আদেশে উমা নত হইয়া সম্মুখোপ-বিষ্ট ভদ্রলোক দুইটিকে প্রণাম করিয়া, বিনা আদেশেই দাদামহাশয়কে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলি মাথায় দিল। বিশ্বানাথ গভীর স্নেহে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মঞ্জুভূষণ অত্যন্ত প্রশংসমাননেত্রে উমার লজ্জাবনত মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "তোমার নাম কি?"

দাদামহাশয়ের আদেশে সে উত্তর দিল, "শ্রীমতী উমাসুন্দরী দেবী।"

"লেখা পড়া জান ত? কি পড়?"

উমার বিপন্ন ভাব দর্শন করিয়া বিশ্বানাথ নিজেই তাহার হইয়া উত্তর দিলেন, "কিছু বাংলা কিছু সংস্কৃত, এমনি স্ত্রীলোকের কাজ চলা মত শিখেছে।"

বিদুষী নারীদের খবর মঞ্জুভূষণের খুব বেশী জানা ছিল না, বড়জোর দাতাকর্ণ অথবা রামায়ণ পাঠ পর্য্যন্তই তাহার আদর্শের দৌড়। সে খুসী হইয়া বলিল, "তা হলেই ঢের হলো, আর বেশী দরকার কি? একবার মুখ তুলে চাও ত!"

মঞ্জুভূষণের অনুরোধে উমা তাহার লজ্জানত চোখ তুলিতেই সম্মুখোপবিষ্ট অপর এক ব্যক্তির চোখের সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিত হইল।

অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য তখন তাঁহার সবটুকুরশ্মি গুটাইয়া লইয়াছেন। খোলা জানালা দিয়া যে অল্প অল্প আলো ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল, সেই ম্লান আলোকে তাহার সম্মুখোপবিষ্ট যুবকের মুখখানাও ম্লানায়মান, তবু উমার বিস্ময়-মুগ্ধ নয়ন-যুগল কিছুক্ষণের জন্য সে মুখ হইতে অপসৃত হইতে পারিল না।

মঞ্জুভূষণ চারিখানা সুবর্ণমুদ্রা উমার কুণ্ঠিত হস্তে গুঁজিয়া দিয়া যখন সম্বন্ধ স্বীকারসূচক আশীর্ব্বাদ করিল, তখন গৃহান্তরালে রাজলক্ষ্মীর চক্ষু আনন্দের অশ্রুতে পরিপ্লাবিত হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

মেয়ে পছন্দ হওয়ায় মঞ্জুভূষণই কর্ত্তা হইয়া কথা কহিল। রাজলক্ষ্মীকে সে স্ত্রীর সম্পর্কে ধরিয়া "পিসিমা" বলিত। রাজলক্ষ্মী লজ্জাত্যাগ করিয়া মঞ্জুকে ভিতরে ডাকাইয়া আনিয়া পাত্রের সংবাদ সব খুঁটাইয়া জানিয়া লইলেন।

মঞ্জুভূষণের কথায় জানা গেল ছেলেটির বাপ মা নাই, বৈমাত্রেয় জ্যেঠা আছেন, তিনি ক্রোরপতি, বিস্তর জমীদারী—বাড়ীঘর—রাজার ঐশ্বর্য্য। ছেলেরা দুটি ভাই, এইটিই বড়। ছেলে ডাক্তারীতে এম্-বি পাশ করিয়াছে, স্বভাব চরিত্র নির্ম্মল। জ্যেঠা মহাশয় বিবাহ করেন নাই, ইহারাই বিষয়ের উত্তরাধিকারী। তবে, বুড়ার মেজাজটা খুব ঠাণ্ডা নয়,—বয়সে এমন হইয়াই থাকে। হয়ত এ বিবাহ তাঁহার মনোমত নাও হইতে পারে কিন্তু সে জন্য আটকাইবে না। তিনি ছেলের অত্যন্ত বাধ্য, ছেলে স্বীকার করিয়াছে শুনিলে না বলিতে পারিবেন না।—মঞ্জুভূষণ সকল কথাই খুলিয়া বলিল, পেশাদার ঘটকদের মত তিনদিক ঢাকা দিয়া একদিক দেখাইল না।

বিদ্যানাথ এসকল শুনিয়া একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন,কর্ত্তার অমতে কার্য্য,শেষ মেয়েটার খোয়ার না হয়। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "বিয়ের সময় অমন কত হয়, হয়ে গেলে আর রাগ থাকে না। ছেলে পছন্দ করে বিয়ে করবেন—সুখেরই হবে। যদি ওর কপালে এতেও সুখ না হয়, আমাদের দুঃখ করবার কিছু থাকল না।"

মায়ের মন প্রবোধ মানিলেও পিতামহের মানিতেছিল না। কেবলই তাঁহার মনে হইতে লাগিল—ইহাকে কি পছন্দ করা বলে! অমন যে স্বর্ণপ্রতিমা, পাত্র একবার ভাল করিয়া চোখ চাহিয়াও ত দেখিল না। সে যে বড় লাজুক এমনও ত মনে হইল না; মাথা ত কোথাও নত হয় না!

উমাকে দেখিয়া বিদ্যানাথ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "দিদি একলাই শুভদৃষ্টি করে নিলি ভাই? বরের জন্য অপেক্ষার কল্লি না রে?"

উমা সলজ্জ হাসি হাসিয়া পিতামহের কোলে মুখ লুকাইয়া বলিল, "যান্, তাই বই কি!"

বিদ্যানাথ কহিলেন, "২৮শে শ্রাবণ বিয়ের দিন স্থির করে গেল, হয়ে উঠবে? মধ্যে ত দুটো দিন।"

অন্নপূর্ণা হাসিল। বলিল, "কি হবে না দাদামশাই? গড়ের বাদ্যির বায়নাও হবে না কিছুই হবে না। পিঁড়ে আল্পনা আর শ্রীবরণডালা সে খুব হয়ে যাবে।"

এই ২৮শে তারিখটা কোনমতে কাটাইয়া দিতে পারিলে মধ্যে পাঁচমাস বিবাহে বাধা, বিদ্যানাথ যেন সবটা তলাইয়া বুঝিবার জন্য সময় লইতে চাহিতেছিলেন। নতুবা বিনা পণে বিনা অলঙ্কারে শাঁখা হাতে দিয়া মেয়ে পার করিবার এমন সুযোগ কেহ কখন হেলায় ছাড়িতে চায়! তাঁহার কেমন মনে হইতেছিল, বিবাহের বর যেন অপ্রকৃতিস্থ, অব্যবস্থিত চিত্ত,—তাহার চোখে মুখে এমন একটা অবসন্ন অবসাদের ছায়া যে মনেই হয় না, সে নিজের ইচ্ছায় চিরদিনের দায়িত্বপূর্ণ এত বড় একটা বন্ধনের ব্যাপার স্বীকার করিতেছে। মঞ্জুভূষণই যেন তাহাকে দম দিয়া চালাইয়া লইতেছিল। কিন্তু তাহাই বা কেন হইবে? এ তাঁহার মনের ভ্রম—আশাতীত কিছুই মানুষ সহ্য করিতে পারে না, তাই এই আশাতীত আনন্দও বুঝি তিনি পূর্ণরূপে ভোগ করিতে পারিতেছিলেন না।

বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী, মধ্যে দুই দিনের ব্যবধান।



রোমিও ও জুলিয়েটের বিবাহ

MANASI PRESS, CALCUTTA.

অনাথকে লইয়া বিশ্বনাথ উদ্যোগের দিকে মন দিলেন। অনাথের পানে চাহিয়া তাঁহার মনে হইল—এই যে মনের খুঁতখুঁতানি, এ বুঝি মনের কাছে ছলনা! অনাথকে যে ছাড়িতে হইল, এই ক্ষোভে এমন দুর্লভ পাত্রেও বুঝি মন উঠিতে চাহিতেছে না।

পরদিন এক সময় অন্নপূর্ণা তাঁহাকে নির্জ্জনে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বর কি আপনার পছন্দ হয় নি দাদামশাই ?"

বিশ্বনাথ চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "একথা জিজ্ঞেস কর্চ্ছ কেন ?"

অন্নপূর্ণা মুখ নত করিয়া কহিল, "কেমন যেন আপনাকে বড়ই উন্মনা দেখছি! ছেলেটিকে কি এমন কিছু দেখলেন"—

বিশ্বনাথ বাধা দিলেন, "না না, ছেলে দিব্যি ছেলে, কিন্তু কেমন যেন মন-মরা।"

অন্নপূর্ণা হাসিয়া কহিল, "জ্যেঠার সঙ্গে যুদ্ধ দেবার ভয় ত এখনও কেটে যায় নি। মঞ্জু বাবু বলছিলেন জ্যেঠা ত এখনও বিয়ের কথা জানেনই না। আশীর্ব্বাদ করে গেল—এইবার খবর দেবে।"

বিশ্বনাথ স্বীয় কেশ-বিরহিত মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন, "ঐখানেই ত গোল! আজকাল কর্ত্তা একজন না থাকায় কর্ত্তৃত্ব অনেক বেড়ে গেছে। রাজায় রাজায় যুদ্ধে আমার উলুখড়টি না ছিঁড়ে যায়!"

মঞ্জুভূষণ বরপক্ষীয়ের হইয়া জানাইল ধুমধাম কিছুই হইবে না, বরযাত্রও নিতান্ত দুই চারিজন মাত্র আসিবে, উদ্যোগ আয়োজনের বাহুল্য প্রয়োজন নাই।—কন্যাপক্ষের অবস্থা বুঝিয়াই সম্ভবতঃ এ ব্যবস্থা, তবু রাজলক্ষ্মীর মনটা একটু খুঁৎখুৎ করিল; পাড়া পড়শীরা ক্ষুন্ন হইল, একটা বড় রকম জাঁকজমক দেখিবার আশায় তাহারা উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে না উঠিতেই নিরাশ হইল।

মঞ্জুভূষণ পাড়ার জামাই, তাহার সামনে বাহির হইতে অনেকেই কুণ্ঠিত হয়েন না। শ্যালী শালাজ ঠান্‌দি সম্পর্কীয়ারা চাপিয়া ধরিলেন, "সে হবে না একটু ধুমধাম করে বর আস্‌বে বই কি—নৈলে কি মানায়!"

মঞ্জুভূষণ কর্ত্তৃপক্ষে দরখাস্ত করিয়া মঞ্জুর না হওয়ায় হতাশ হইয়া জানাইলেন, "ও সব লেখাপড়া জানা ছেলে কি আর আলো বাজনা করে বিয়ে কর্‌তে আসে? বলে, একি ছুতোরের বিয়ে যে বাজনা আলো হবে!"

আবেদনকারিণীরা তর্কে হারিবার পাত্র নহেন। কহিলেন, "বেশ ত বাজনা আলো নাই হোল, বরের রূপেই না হয় আসর আলো হবে; তবু ধুমধাম—খ্যেন—এ সব হতে ত মানা নেই।"

মঞ্জু জানিত সেখানকার রায় অটল, সে হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে হবার নয়।" মেয়েরা বরকে না পাইয়া বরের বন্ধুর উপর ঝাল ঝাড়িতে লাগিল, "ভারী ত মুরদ! উনি আবার বড়াই করেন ওঁর ঘটকালীতে বিয়ে হচ্ছে! বিয়েতে খরচ করবে না, ওরা আবার বড়মানুষ! সমস্ত চালাকি।"

মঞ্জুভূষণ অগত্যা অপবাদ স্বীকার করিয়া লইল।

সে দিন বিশ্বনাথ, অনাথ ও রামরূপ পণ্ডিতকে লইয়া পাত্র আশীর্ব্বাদ করিয়া কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। পাত্রের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিশ্বনাথ যেটুকু সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন, বরকর্ত্তা রুদ্রকান্তের ধরণ ধারণ ও বচন শুনিয়া সেটুকু লোপ পাইয়াছিল। বিশ্বনাথের পৌত্রী গ্রহণ করা তাঁহার ধনবত্তা ও মহত্ত্বেরই অকাট্য প্রমাণ—এইটুকুই যেন লোকের কাছে বিশেষভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সতীনাথ আশীর্ব্বাদের গিনিখানি তাঁহারই পায়ের কাছে রাখিয়া একটা দায় ঠেকা গোছের অর্দ্ধ প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িয়াছিল। কর্ত্তা ভাল করিয়া একটা কথাও কহেন নাই। বাড়ীর দাসদাসীগুলা পর্য্যন্ত যেন বড়মানুষীর বাতাস লাগিয়া কেমন একরকম চালচলনে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। উমার ভবিষ্যজীবনের ঘরকন্না এবং ঘরের প্রধান প্রধান লোকগুলিকে দেখিয়া বিশ্বনাথ খুব বেশী খুসী হইয়া আসিতে পারেন নাই।

পাত্র আশীর্ব্বাদ করিয়া বিশ্বনাথ মনের সব দ্বিধা

দ্বন্দ্ব মিটাইয়া আশাতরুর মূলোচ্ছেদ করিয়া অনাথের উপর হইতে মন সরাইয়া লইলেন। মনে করিলেন, পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্ম এবং প্রাক্তনের ফলই বলবৎ; বৃথা দ্বন্দ্বের চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া, "জন্ম মৃত্যু বিবাহে বিধাতার নিয়ম" মানিয়া চলাই ভাল; কি জানি নিজের উপর ত আর বিশ্বাস নাই!

"শেষ কাজ" মনে করিয়া বিদ্যানাথ এ বিবাহে একটু বিশেষ ভাবেই উদ্যোগ আয়োজন করিতে ইচ্ছা করিলেন। অনাথ একাই "একশত" হইয়া কোমরে গামছা বাঁধিয়া লাগিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী অনবরত অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া চোক মুখ ফুলাইয়া ফেলিলেও কাজে তাঁহার শৈথিল্য ছিল না। ক্রমে বিদ্যানাথেরও প্রসন্নমুখে বর্ষণমুক্ত নীল-আকাশের শান্ত জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল।

কেবল অন্নপূর্ণা কোন কাজেই হাত দিবার অবসর পাইতেছিল না। সে উমাকে দিন রাত্রি নিজের কাছে নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াও যেন পর্য্যাপ্তরূপে তাহাকে পাইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিতেছিল না। বোন্‌টিকে যেন সে আজ এই প্রথম দেখিল—তাহার দেখিবার তৃষ্ণা আর কিছুই মিটিতেছ না—এমনি ভাবে সে যখন তখন তাহার পানে চাহিয়া থাকে। বুকের ভিতর টানিয়াও মনে হয় বুঝি এখনও অনেক দূরে রহিল, আরও কাছে যদি পাওয়া যাইত! সে যে বুকের ভিতর রাখিয়াই তাহাকে সংসারের সকল দুঃখ ব্যথার অতীত করিয়া এতদিন বড় যত্নে বড় করিয়া তুলিয়াছে। মা তাঁহার শোক-দুঃখপূর্ণ সংসার লইয়া যখন ব্যস্ত থাকিয়াছেন, সে যে তখন ইহাকে লইয়াই অবলম্বনহীন জীবনের অবলম্বন পাইয়াছে—আশা ও স্নেহের অঞ্জলি দানে স্বহস্তে বর্দ্ধিত তরুটির সুখ ফলের আশাপথ চাহিয়া কাটাইয়া দিয়াছে। সেই উমা আজ পর হইয়া যাইবে! পরের ঘরে কে তাহাকে এমনি করিয়া বুঝিবে, কে তাহার অভাব ব্যথা ঘুচাইতে এমন সজাগ চোখে দিন রাত্রি প্রহরা দিয়া চাহিয়া থাকিবে? সেখানে অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু স্নেহ মমতা দিবার লোক কেহ আছে কি না, এই প্রশ্নটাই আজ কেবলই তাহার মনে উঠিতেছিল।

এ দুইদিন সে দিনের মধ্যে পাঁচবার উমার চুল খুলিয়া নূতন নূতন ফ্যাসানে তাহার চুল বাঁধিয়া, টিপ মুছিয়া নূতন টিপ পরাইয়া,তাহাকে নিজের হাতে খাওয়াইয়া, তৃপ্তি পাইতেছিল না। কেবলই বুকের ভিতর একটা দুরু দুরু কম্পনের সহিত ধ্বনিত হইতেছিল, 'আজ তোমার উমা পর হইয়া গেল।' অন্নপূর্ণা চোখের জল মুছিয়া মুখে হাসি আনিয়া মনে মনে বলিল, 'তাই যাক্। সেই ঘরই উমার আপন ঘর হোক্। এ ঘরকে যেন তার অবলম্বন করতে না হয়। ঠাকুর, আর যা দাও না দাও, শাঁখা সিঁদুরের অধিকার তার বজায় রেখ।' স্বামীর স্নেহে অনভিজ্ঞা বালবিধবা অন্নপূর্ণা আজ চিরাগত সংস্কারের হাত এড়াইতে পারিল না। নিজের শূন্য মনের অসহনীয়তা স্মরণ করিয়া মনে মনে সে প্রার্থনা করিতে লাগিল, 'হে ঠাকুর, উমার মনে যেন কোন অভাব ক্ষোভের হাহাকার না বাজে; উমা সুখী হোক্, ভাল থাক্—তার সুখই আমাদের সকলের সুখ।'

রাত্রে নির্দ্দিষ্ট লগ্নে বিদ্যানাথ সতীনাথের হাতে উমার হাত রাখিয়া, দেব দ্বিজ অগ্নি সাক্ষ্য করিয়া, তাহাদের চিরজীবনের গ্রন্থি বাঁধিয়া দিলেন। বরও পুরোহিত-আদিষ্ট মন্ত্রাবলীর উচ্চারণে সে বন্ধন স্বীকার করিয়া লইল। সাক্ষীরূপে বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীর দল উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য সুসম্পন্ন করাইলেন।

শুভদৃষ্টির সময় বিদ্যানাথ কর্ত্তৃক আদিষ্ট উমা তাহার নত নেত্রযুগল ঈষৎ উন্নমিত করিয়াই অর্দ্ধপথে নামাইয়া লইল। সেই প্রথম দেখা ও আশীর্ব্বাদের দিনের পিতামহের পরিহাস মনে পড়িয়া,তাহার সূক্ষ্ম ওষ্ঠে সলজ্জ মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। দাদামশাই তামাসা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'একাই শুভদৃষ্টি করিলিরে?' আজিও হয়ত তেমনি কোন বিভ্রাট বাধিয়া আবার তাহাকে লোকের আছে হাস্যাস্পদ করিয়া দিবে!

বিবাহদর্শনার্থিনী নারীর দল অচিরেই তাহার প্রমাণ দিলেন। "ওমা একি বরগো! শুভদৃষ্টি কর।

বরের যে দেখি মেয়ে মানুষের বাড়া লজ্জা। চাও, চাও—ভাল করে চাও। উমা, চেয়ে দেখ্।"—এবার আর উমা চোখ তুলিল না।

বিবাহের পর বাসরঘরে যাঁহারা বাসর জাগিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আপন মনে বকিয়া শ্রান্ত হইয়া, কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িলেন। যাঁহাদের সখ বেশী, তাঁহারা নিজেরাই গান গাহিয়া, কথা কহিয়া, সখ মিটাইলেন। নিদ্রাতুরা উমাকে অন্নপূর্ণা শয়ন করাইয়া দিল। বিদ্যানাথও সতীনাথকে ঘুমাইতে দিবার জন্য বাড়ীর ভিতর আদেশ পাঠাইলেন। "গোমড়ামুখো বরের" উপর মেয়ের দল খুসী না থাকায়, তাহার বোল ফুটিবার জন্য 'ওল' মানসিক করিয়া তাঁহারা বরকে ঘুমের জন্য ছুটি দিলেন। সতীনাথ ঘুমের জন্য যত না হউক, উঁহাদের হাতে ছাড়া পাইয়া, পাশ ফিরিয়া ঘুমের ভানে পড়িয়া অব্যাহতি লাভ করিল।

ক্রমশঃ

শ্রীইন্দিরা দেবী।

তাজ-স্বপ্ন

দেখেছিলে কোন্ সাঁঝে তাজের স্বপন
হে সম্রাট্ শাজাহান! হিয়ার বেদন
অলস রঙীন মেঘে উঠেছিল ভাসি,'—
প্রাণের শোণিত-রাঙা মৌন ব্যথারাশি।
দিগন্তের অন্ধকারে লুপ্ত তরু-রেখা,
শাঙণ মেঘের কোলে অস্ত-রবিলেখা
ম্লান হয়ে আসে ধীরে; সুদূর আকাশে
তখন কি রাজহংস গিয়াছিল ভেসে
তোমার অন্তর মাঝে ফেলি' স্নিগ্ধ ছায়া,
বিরচিয়া ইন্দ্রজালে শুভ্রতার মায়া?
আকাশে হাসিল চাঁদ, স্তব্ধ চারিধার,
বাতাসে বহিয়া গেল রুদ্ধ হাহাকার
দূর তট-রেখা পানে; ধীরে ধীরে ধীরে
স্বপন উঠিল ফুটি' যমুনার তীরে।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

বৈদেশিকী

অষ্ট্রিয়া।

"AUSTRIA AND THE AUSTRIAN PEOPLE."

("Nations of the War Series")

অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে একটি বোঁটায় দুটি ফুল—অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরি। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ও হাঙ্গেরির রাজা অভিন্ন ব্যক্তি হইলেও, দুই দেশের পার্লামেণ্ট ও শাসন-প্রণালী স্বতন্ত্র এবং একই নৃপতিকে দুই দেশে দুই মূর্ত্তি ধারণ করিতে হয়। ("Though the Emperor of Austria and the King of Hungary happen to be the same physical person, he is juridically two persons. ...... It is treason for a subject of the King of Hungary to appeal to the Emperor of Austria.")

অষ্ট্রিয়া Oesterreich হইতে উৎপন্ন; ইহার অর্থ প্রাচ্য রাজত্ব। হান্ (Hun) জাতি চতুর্থ শতাব্দীতে অষ্ট্রিয়ার পূর্ব্বাংশ অধিকার করিলে, উহার নাম হাঙ্গেরি (Hungary) হয়। তাতার জাতীয় আভার (Avar) জাতি ষষ্ঠ শতাব্দীতে অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরিতে প্রভুত্ব বিস্তার করে। প্রায় আড়াই শত বৎসর পরে তাহারা ফ্রাঙ্ক জাতি কর্ত্তৃক পরাজিত হয়। নবম শতাব্দীতে মজিয়র (Magyar) জাতি ফ্রাঙ্কদিগকে পরাভূত করে। দশম শতাব্দীতে জার্মানির রাজা প্রথম অটো (Otto I) অষ্ট্রিয়ার অধীশ্বর হন। বহু শতাব্দী ধরিয়া একই ব্যক্তি অষ্ট্রিয়া ও জার্মানির রাজ-সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মান সম্রাট পঞ্চম চার্লসের সময় স্পেন, বেলজিয়াম, হলাণ্ড, জার্মানি, অষ্ট্রিয়া ও ইটালি একই ভূপতির অধীনে ছিল। পঞ্চম চার্লসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় ফিলিপের উপর স্পেনের শাসন-ভার ন্যস্ত হয়। তাঁহার ভ্রাতা ফার্ডিনাণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির প্রভু হন।

১৬১৮ হইতে ১৬৪৮ সালের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্টে দলাদলি বাধিয়া মধ্য য়ুরোপে রক্তনদী প্রবাহিত হইয়াছিল। ইতিহাসে ইহার নাম Thirty Years' War অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ। সুইডেনের প্রটেষ্টাণ্ট রাজা গাষ্টেভাস এডল্‌ফাসের (Gustavus Adolphus) ভয়ে অষ্ট্রিয়ার রোমান ক্যাথলিকদের ত্রাহি ত্রাহি করিতে হইয়াছিল।

১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে তুর্কিরা হাঙ্গেরি আক্রমণ করে। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে রাজধানী ভিয়েনা নগর মুসলমানদের হস্তগত হইলে, অষ্ট্রিয়ানরা পোলাণ্ড-রাজের সাহায্য প্রাপ্ত হয়। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ান সেনাপতি প্রিন্স য়ুজিন (Eugene) তুর্কির কবল হইতে হাঙ্গেরি, ট্রান্সিলভেনিয়া ও সার্বিয়া প্রদেশত্রয় উদ্ধার করেন।

সম্রাট ষষ্ঠ চার্লসের পুত্র ছিল না। মৃত্যুর পর যাহাতে তাঁহার কন্যা মেরায়া টেরেসা (Maria Theresa) অষ্ট্রিয়ার রাণী হন, তজ্জন্য তিনি য়ুরোপের নৃপতিগণের নিকট এক অঙ্গীকার-পত্র আদায় করিয়াছিলেন। ইংরেজী ইতিহাসে এই এই ব্যাপারের নাম Pragmatic Sanction of 1713 অর্থাৎ ১৭১৩ সালের অনুজ্ঞা। ১৭৪০ সালে ষষ্ঠ চার্লসের মৃত্যু হইলে, অষ্ট্রিয়ার রাজসিংহাসন লইয়া ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। বাভেরিয়ার সামন্ত (Elector)—ভবিষ্যতের সম্রাট সপ্তম চার্লস— মেরায়া টেরেসার বিপক্ষে সৈন্য প্রেরণ করেন। প্রাসিয়ার রাজা ফ্রেডরিক দি গ্রেট এই অবসরে সাইলিসিয়া প্রদেশ দখল করেন। ইংলণ্ড ও হলাণ্ড অষ্ট্রিয়ার পক্ষে, এবং ফ্রান্স, স্পেন ও নেপল্‌স রাজ্যত্রয় অষ্ট্রিয়ার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করে। হাঙ্গেরিয়ানদের সাহায্যে মেরায়া টেরেসা বাভেরিয়া অধিকার

করেন। তাঁহার স্বামী, প্রথম ফ্রান্সিস নাম গ্রহণ করিয়া, জার্মান সম্রাটের পদে অভিষিক্ত হন।

১৭৫৬ হইতে ১৭৬৩ সালের মধ্যে অষ্ট্রিয়া ও ও ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ড ও প্রাসিয়ার যুদ্ধ হয়। রুসিয়া এই যুদ্ধের প্রারম্ভে অষ্ট্রিয়ার পক্ষে ও শেষ-কালে বিপক্ষে ছিল।

কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রাসিয়া ও রুসিয়ার সহিত অষ্ট্রিয়ার বিরোধ চলিতেছিল। কিন্তু ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে পোলাণ্ড ভাগাভাগির প্রস্তাবে তিনদলের ক্ষণিক প্রেম হয়। অষ্ট্রিয়া এই সুযোগে গ্যালিসিয়া প্রদেশ আত্মসাৎ করে। ১৭৭৭ সালে বাভেরিয়ার অপুত্রক সামন্তের (Elector) মৃত্যু হইলে, ঐ রাজ্যের জন্য মেরায়া টেরেসা ও ফ্রেড্রিক্ দি গ্রেটে কলহ বাধে, কিন্তু রুসিয়া প্রাসিয়ার পক্ষ অবলম্বন করাতে, ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হয়।

১৭৮০ সালে মেরায়া টেরেসার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র জোসেফ অষ্ট্রিয়ার রাজা হন। রুসিয়াকে দলে টানিয়া তিনি তুরুস্কের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়, অষ্ট্রিয়া ও প্রাসিয়া সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়। ১৭৯৬ সালের যুদ্ধে অষ্ট্রিয়া ফ্রান্সের নিকট পরাজিত হয়। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের সন্ধির ফলে, বেলজিয়াম ও ইটালির অন্তর্গত লম্বার্ডি প্রদেশ ফ্রান্সের ভাগে, এবং ইটালির অন্তর্গত ভেনিস প্রদেশ অষ্ট্রিয়ার ভাগে পড়ে। দুই বৎসর পরে অষ্ট্রিয়া, রুসিয়া ও ইংলণ্ড একত্র হইয়া ফ্রান্সের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৮০৫ সালে অষ্ট্রিয়া, ইংলণ্ড, রুসিয়া, হলাণ্ড ও সুইডেন মিলিত হইয়া ফ্রান্সকে কোণ-ঠেসা করিতে চেষ্টা করে। অষ্টার্লিজের (Austerlitz) যুদ্ধে ফরাসী সেনাপতি নেপোলিয়ান বোনাপার্টের নিকট অষ্ট্রিয়া সম্পূর্ণ-ভাবে পর্য্যুদস্ত হয়।

১৮০৬ সালের আগষ্ট মাস হইতে, অষ্ট্রিয়ার নৃপতিকে 'জার্মানির সম্রাট' এই পদবী ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। ইহার প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শার্লিমেনের আমলে যে "Holy Roman Empire" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এখন তাহা লুপ্ত হইল।

১৮০৯ সালে অষ্ট্রিয়া পুনরায় ফ্রান্সের নিকট পরাজিত হয়। ১৮১০ সালে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট অষ্ট্রিয়ার রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। ১৮১৪ সালে প্যারিসের সন্ধি অনুসারে, ইটালির কিয়দংশ অষ্ট্রিয়ার ভাগে পড়ে। ১৮১৫ সালে অষ্ট্রিয়ানরা নেপ্‌লসের রাজাকে পরাস্ত করে। ঐ সালে ভিয়েনার বৈঠকের ফলে, অষ্ট্রিয়ার সম্রাট মধ্য-য়ুরোপের বড় কর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হন।

১৮৩১ হইতে ১৮৪৮ সালের মধ্যে, ইটালিয়ানরা অষ্ট্রিয়ার অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার জন্য ক্রমাগত বিদ্রোহী হয়। অষ্ট্রিয়ার চাণক্য মেটারনিক (Metternich) প্রাণভয়ে ইংলণ্ডে পলাইয়া যান এবং তখন-কার অষ্ট্রিয়ান সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান সম্রাট ফ্রান্সিস জোসেফ অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আটষট্টি বৎসর রাজত্ব করিতেছেন।

হাঙ্গেরিতে বিদ্রোহ দমনের জন্য, রুস-সম্রাট অষ্ট্রিয়া-রাজের সাহায্যার্থ দেড় লক্ষ সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের সময়, যখন রুসিয়ার সহিত ইংরেজ, ফরাসী ও তুর্কির বিবাদ ঘটে, তখন বিপন্ন রুসিয়ানরা অষ্ট্রিয়ানদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহারা রম্ভা প্রদর্শন করে।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ইটালিয়ানরা কাভুর (Cavour) ও গ্যারিবল্ডির নেতৃত্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই সময়ে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন, কিছুদিনের জন্য ইটালির পক্ষ অবলম্বন করিয়া, পরে অষ্ট্রিয়ার স্কন্ধে ঢলিয়া পড়েন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ডেনমার্কের রাজার মৃত্যু হইলে, অষ্ট্রিয়া ও প্রাসিয়া দল বাঁধিয়া, শ্লেজ্‌ভিক্ (Schleswig), হোল্‌শ্‌টাইন (Holstein) এবং লাউয়েনবুর্ক (Lauenburg) প্রদেশত্রয়, ডেনদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়। কিছুদিন পরে অষ্ট্রিয়া ও প্রাসিয়ায় মনান্তর ঘটে

এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে সাডোভার (Sadowa) রণক্ষেত্রে অষ্ট্রিয়ান সৈন্য প্রাসিয়ান বাহিনীর নিকট: বিধ্বস্ত হয়। ইটালিয়ানরা এই সুযোগে অষ্ট্রিয়ার উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সফল হয় নাই। ১৮৬৬ সালে মধ্য-য়ুরোপে অষ্ট্রিয়ার প্রভাব খর্ব্ব হইয়া প্রাসিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্ট্রিয়া, প্রাসিয়ার হুকুমে, ইটালিয়ানদের ভেনিস প্রদেশটি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল।

অনেক রক্তারক্তির পর, ১৮৬৭ সালে, অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির মধ্যে একটা মিটমাট হয়। সেই অবধি অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি নামক যুগ্ম-রাজত্বে (Dual Monarchy) মোটের উপর শান্তি বিরাজ করিতেছে

১৮৭০ সালে জার্ম্মান ও প্রাসিয়ান সৈন্য প্যারিস অবরোধ করিলে, জার্ম্মানি ও প্রাসিয়া য়ুরোপের 'জুজু' হইয়া উঠিল। ১৮৭১ সালে প্রাসিয়ার রাজা 'জার্ম্মান সম্রাট' এই উপাধি গ্রহণ করিলেন। সেই অবধি অষ্ট্রিয়া অনন্যোপায় হইয়া জার্ম্মানিকে বলিতেছে, দেহি মে পদপল্লবমুদারম্।

এড্রিয়াটিক সাগরের তীরস্থ বজ্‌নিয়া (Bosnia) ও হের্টসেগভিনা (Herzegovina) এই দুই প্রদেশ বহু-কাল তুরুষ্কের সুলতানের অধীনে ছিল। ১৮৭৫ সালে এই দুই দেশের খৃষ্টান প্রজারা সুলতানের বিপক্ষে বিদ্রোহী হইলে, রুসিয়ানরা বিদ্রোহীদের পক্ষ অবলম্বন করে। ১৮৭৮ সালে বার্লিন নগরে, প্রিন্স বিসমার্কের সভাপতিত্বে যে বৈঠক বসে, তাহাতে অষ্ট্রিয়া উক্ত প্রদেশদ্বয়ে 'মুড়ুলি' করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়।

বজ্‌নিয়া ও হের্টসেগভিনার মুরুব্বি রুসিয়া যখন জাপানের সহিত যুদ্ধে আধমরা হইয়া পড়িল, তখন অষ্ট্রিয়া ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিল। ১৯০৮ সালে অষ্ট্রিয়া বুক ফুলাইয়া ঘোষণা করিল, ঐ দুই প্রদেশ আমার। য়ুরোপের সংবাদপত্রে হৈ চৈ পড়িয়া গেল, কিন্তু অষ্ট্রিয়ার উৎসাহ-দাতা জার্ম্মান সম্রাটের দাপটে, ফ্রান্স ও রুসিয়ার কলমের আগুন, কামানে গিয়া পৌছিল না।

১৯১১ সালে আফ্রিকার ট্রিপলি দেশটি ইটালির উদরস্থ হইলে, অষ্ট্রিয়ানরা দিনকতক হিংসার জ্বালায় অস্থির হইল। অষ্ট্রিয়া ও ইটালি দুই পক্ষের রাশ টানিয়া জার্ম্মানি যুদ্ধ বাধিতে দেয় নাই। ১৯১৫ সালের মধ্যভাগে ইটালি অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করে, কিন্তু তাহার জার্ম্মানির সহিত বন্ধুত্ব আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের আয়তন প্রায় দুইলক্ষ একষট্টি হাজার বর্গ মাইল। য়ুরোপীয় রাজ্যগুলির মধ্যে আয়তন হিসাবে, রুস সাম্রাজ্যের পরেই অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির স্থান। সুইট্‌জর্ল্যাণ্ড ভিন্ন য়ুরোপে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির ন্যায় পর্ব্বতময় দেশ আর নাই। ঐ সাম্রাজ্যের প্রায় চার পঞ্চমাংশ, সমুদ্র-পৃষ্ঠের প্রায় ছয় শত ফুট উচ্চে অবস্থিত। ঐ দেশের সৌভাগ্যক্রমে, সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে সাড়ে চার-হাজার ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ স্থানে, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়। সাড়ে ছয় হাজার ফুট পর্য্যন্ত জঙ্গলে পরিপূর্ণ। আট হাজার ফুট উঠিলে, বরফের বার-মেসে আড্ডায় পৌছান যায়।

অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি পনের লক্ষ। ষষ্ঠীদেবীর কৃপা অধিক হওয়াতে, অষ্ট্রিয়ানরা দলে দলে ভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে। ১৯১২ সালে একলক্ষ আটাত্তর হাজার লোক য়ুনাইটেড ষ্টেটসে, পঁচিশ হাজার কানাডায় ও সাড়ে নয় হাজার দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়াছিল। অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরির অধিকাংশ লোক রোমান ক্যাথলিক। ঐ দেশে প্রায় পঁচিশ লক্ষ ইহুদী বাস করে।

অষ্ট্রিয়ান বলিয়া কোন ভাষা নাই। অষ্ট্রিয়ার রাজ দরবারে, আফিসে ও আদালতে জার্ম্মান ভাষা ব্যবহৃত হয়। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিতে জার্ম্মান-ভাষী লোকের সংখ্যা এক কোটি কুড়ি লক্ষ। হাঙ্গেরিতে মজিয়র (Magyar) ভাষা, বোহিমিয়া ও মরেভিয়ায় চেক্ (Czech) ভাষা, গ্যালিসিয়ায় পোলিশ্ ভাষা, ইলিরিয়া ও বজ্‌নিয়ায় সার্বিয়ান ভাষা, ট্রিয়েষ্টে (Trieste) ও ড্যালমেশিয়ায় ইটালিয়ান ভাষা প্রচলিত।

অষ্ট্রিয়ার পার্লামেণ্টের নাম Reichsrath। বিলাতের লর্ডস্ সভা ও কমন্স্ সভার ন্যায় অষ্ট্রিয়ায় Herrenhaus ও Abgeordnetenhaus আছে। অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিতে রাজনৈতিক দলাদলির ফলে অনেক কাজ পণ্ড হয়। দলগুলির নাম এই :—ন্যাশানল পার্টি অফ্ ওয়ার্ক, জার্মান ন্যাশানেলিষ্টস্, কৃশ্চান ন্যাশানেলিষ্টস্, জার্মান সোশ্যাল ডেমক্র্যাট্স্ পোলিশ্ সোশ্যাল ডেমক্র্যাট্স্, ক্রয়েশিয়া শ্লাভোনিয়ান্স্, রুথিনিয়ান্স্, কস্থাথাইট্স্, জাস্থাইট্স্, ড্যালমেশিয়ান্স্ প্রভৃতি। দলাদলির বাড়াবাড়িতে কোনও সম্প্রদায়ই প্রবল হইতে পারে না। সম্রাট ও তাঁহার মন্ত্রীরা দলাদলির মনসাকে ধূনার গন্ধ দিয়া, নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখেন। ("The setting off of one against the other becomes a matter of very little skill in the hands of the central authorities at Vienna and consequently the power of autocracy becomes strengthened instead of weakened.")

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমানেরা যখন দক্ষিণ-পূর্ব য়ুরোপ গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল, তখন খৃষ্টানদের ধন প্রাণ রক্ষা করিবার ভার অনেকটা হাঙ্গেরিয়ানদের উপর পড়ে। তুর্কির ভয়ে এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের কড়া বাঁধনের ফলে, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির দলাদলির আগুনে অনেকবার ছাই চাপা পড়িয়াছিল বলিয়াই মহম্মদীয় বন্যা প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল। ("We owe it to Austria-Hungary, more than to any other country, that Europe is today Christian instead of Mahometan.")

অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিতে তেরটি বিশ্ব-বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে ভিয়েনা ও বুডাপেষ্টই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। বিলাতের অক্সফর্ড কেম্ব্রিজে যেমন ছাত্রেরা অধ্যাপকদিগের সহিত কলেজে বাস করে, অষ্ট্রিয়ায় সেরূপ নহে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি বহুকাল ধরিয়া পাদরী-পরিচালিত ছিল; ১৮৬৯ সাল হইতে গোঁড়ামির মাত্রা কমিয়াছে। ঐ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক—সকল বালককেই আইনানুসারে স্কুলে যাইতে হয়। অষ্ট্রিয়ান গভর্মেণ্ট প্রজার শিক্ষার জন্য অজস্র অর্থ-ব্যয় করেন।

দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য অষ্ট্রিয়ায় বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। থিয়েটার, পোষা কুকুর প্রভৃতির উপর ট্যাক্স বসাইয়া দরিদ্র-সেবার টাকা তোলা হয়। সময়ে সময়ে নিঃস্বদিগকে পালা করিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে রাখা হয়। ("Billeted in turn on resident house-holders")।

অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির জাতীয় ঋণ লোক পিছু সাড়ে পনের পাউণ্ড (এক পাউণ্ড = পনের টাকা); বেলজিয়ামের একুশ পাউণ্ড; ফ্রান্সের চব্বিশ পাউণ্ড।

য়ুরোপীয় জাতিদের যাহা কিছু ভাল তাহা একাধারে দেখিতে হইলে, অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় যাওয়া প্রয়োজন। ("The man who has lived in Vienna has tasted of all that is best in the different nations to such an extent as to become a practical cosmopolitan.")। ভিয়েনার চার থাক গাছের সার বসান Ringstrasse রাজপথ, প্যারিসের রাজপথের (boulevard) অপেক্ষা সুন্দর।—ভিয়েনার পরীক্ষণাগার (laboratory) জগদ্বিখ্যাত।

হাঙ্গেরি ও বোহিমিয়ার খনিতে কয়লা ও লৌহ, ক্রেকোতে দস্তা, ক্যারিনথিয়াতে সীসা এবং অনেক স্থলে মার্বল পাথর পাওয়া যায়। সুতি ও পশমী কাপড়ের ব্যবসায়ে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির প্রচুর অর্থাগম হয়। পার্ব্বত্যদেশ বলিয়া, ঐ রাজ্যের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে মাল পাঠান, সময় ও অর্থসাধ্য হইয়া পড়ে।

অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির লোকেরা খুব থিয়েটার-প্রিয়। তাঁহাদের মধ্যে কবি ও দার্শনিকের অভাব নাই। Grillparzer এর "Ancestress" ও "Sappho", Lenan এর "Reed Songs", Suttner এর "Disarmament", Sienkiewiez এর "Quo Vadis", Maurice Jokaiএর "A Magyar Nabob."

Mikszath এর "St. Peter's Umbrella", Hirczeq এর "The Gyorkovics Girls", Madach এর "Tragedy of Man" প্রভৃতি গ্রন্থ য়ুরোপের অনেক ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

রুসিয়া যেমন ক্রমাগত নিজের পরিধি বাড়াইয়াছে, অষ্ট্রিয়ার সেরূপ সুবিধা ঘটে নাই। তাহার উত্তরে ও পূর্ব্বে জার্ম্মানি ও রুসিয়া—তথায় দন্তস্ফুট করিবার জো নাই। পশ্চিমে ইটালি দিক্‌পাল ("Great Power") হইয়া উঠিয়াছে—সুতরাং এড্রিয়াটিক সমুদ্রে মুড়্‌লি করিতে অসুবিধা। অষ্ট্রিয়ার একমাত্র আশা দক্ষিণে। বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, গ্রীস, মণ্টেনিগ্রো, আলবেনিয়া প্রভৃতি বল্কান রাজ্যগুলির মধ্যে রেষারেষির শেষ নাই। কিন্তু ইহাদের একদলকে হস্তগত করিয়া অন্য দলের মুণ্ডপাত করিবার জন্য অষ্ট্রিয়া যতবার চেষ্টা করিয়াছে, রুসিয়া ততবার বাধা দিয়াছে। ১৯১৪ সালে কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে ফোঁস করিয়া সাপ বাহির হইয়াছে। "Imperialism","Peaceful penetration" প্রভৃতির ধুয়া ধরিয়া কোটি কোটি লোকের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সেই কর্ম্মঋণ য়ুরোপকে কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিতে হইবে। ("Europe is now settling the main problem not only of Austro-Hungarian politics, but of the politics of civilisation. If economics are to rule at the expense of democracy, then democracy has every right to revolt at the cost of economics.")

শ্রীগৌরহরি সেন।

সাহিত্যে সমালোচনা

সমালোচনা যে সাহিত্যপুষ্টির পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। একথা অবশ্য সত্য যে সাহিত্যসৃষ্টি প্রথমতঃ সমালোচনাকে অপেক্ষা না করিয়াই সর্ব্বত্র হইয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া তাহার পরিবর্ত্তীকালের পরিণতি বিষয়ে সমালোচনা যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে ইহাও মানিতে হইবে। সাহিত্যসৃষ্টি ও সমালোচনা মানসিক দুইটি অপেক্ষাকৃত ভিন্নধর্ম্মী বৃত্তি হইতে উৎপন্ন।

সাহিত্য মানুষের প্রাণের প্রাচুর্য্য ও স্ফূর্ত্তির বিকাশ শ্রেষ্ঠ যে art—তাহা reflective নহে প্রধানতঃ intuitive। কিন্তু সমালোচনা মনের বিশ্লেষণকারিণী বৃত্তি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। মানুষের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই জাতির মধ্যে এই দুইটী বৃত্তির স্ফুরণ তুল্যরূপে একই সময়ে হয় না। Comte বলিয়াছেন, "A creative age is followed by a critical age. এক যুগে দেশে শিল্প সাহিত্য প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, তাহার পরবর্ত্তী যুগে জাতির প্রাণে এই উদ্ভাবিনী শক্তির হ্রাস হইয়া গিয়া বিশ্লেষণকারিণী শক্তি অধিক মাত্রায় দেখা দেয়। তখন নূতনের সৃষ্টি অপেক্ষা পুরাতনের আলোচনা ও মূল্য নির্ণয় লইয়াই দেশবাসী অধিকতর ব্যাকুল হয়।

সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতির জন্য এই দুই বৃত্তিরই বিকাশ হইবার প্রয়োজন।

'নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ' ইহা এক হিসাবে সত্য, কারণ প্রাণের আনন্দ হইতেই কবিতার জন্ম। কিন্তু সকল প্রকার আনন্দ-সৃষ্টিই সকলের উপভোগ্য নহে এবং সকল বিষয়ে আনন্দলাভও মনুষ্যত্বের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে। সমালোচক এই আনন্দের মূল্য নিরূপণ করিয়া সাহিত্যের উদ্দামতাকে বাধা দিয়া থাকেন। সমালোচনার অভাবে সাহিত্য-উপবন শীঘ্রই নানা কণ্টকবৃক্ষে পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে।

এক কথায় বলিতে গেলে, সাহিত্যের গুণ বিচার ও মূল্য নিরূপণই হইতেছে সমালোচনার কার্য্য। শিল্পী আপনার প্রাণের আনন্দ ও উপলব্ধি হইতেই শিল্প-সৃষ্টি করেন—কবি আপন জীবনের অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতেই

প্রাণের প্রেরণায় গাহিয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ লোক অনেক সময়েই আপনাদের দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামে নিরত থাকায় চতুষ্পার্শ্বের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ পায় না। তাই পত্রান্তরালস্থিত পুষ্পের মত অনেক শিল্পই তাহাদের অগোচর ও অনাদৃত থাকিয়া যায়। ইহা ভিন্ন হৃদয়ের প্রসার ও শিক্ষার অভাবেও সাধারণ লোকের প্রকৃত রসানুভূতিশক্তি অনেক সময় অপরিণত থাকে। প্রাকৃত-জন সাহিত্যের যে স্থলে সাহিত্যক্ষেত্রে রত্ন আবিষ্কার করিয়া সাধারণের রসে বঞ্চিত, সমালোচক মধুকরের মত তাহার রসাস্বাদন করেন এবং পাঠকে সেই মধুর অম্লান কুসুমের সন্ধান বলিয়া দেন।

অতএব সমালোচক এক হিসাবে পাঠকের জ্যেষ্ঠ সহোদর। সাধারণ পাঠক যাহা সময় অথবা শিক্ষা অভাবে নিজে করিতে পারে না, সমালোচক পাঠকের হইয়া তাহাই করিয়া দেন। সাহিত্য-উদ্যানে তিনি পুষ্প, পত্র ও কণ্টক শ্রেণীবিভাগ করিয়া, কাহার কি মূল্য তাহাই নিরূপণ করিয়া দেন এবং কোথায় কি মধুলাভের সম্ভাবনা তাহা নির্দ্দেশ করেন।

কিন্তু সমালোচক শুধু পাঠকেরই পথ নির্দ্দেশক নহেন। তিনি লেখকেরও অন্তরঙ্গ। শিল্পী আপনার প্রাণের ভাবকেই বাহিরে প্রকাশ করিয়া থাকেন। কবি-হৃদয়ে এই সৌন্দর্য্যময় বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের সংস্পর্শে প্রতিনিয়তই নানা ভাব জাগিয়া উঠিতেছে। এই ভাবকে ভাষা দিবার জন্য একটি আন্তরিক ব্যাকুলতা তাঁহার মধ্যেই সর্ব্বদাই বিদ্যমান।

কিন্তু ইহাকে কিছুতেই তিনি পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারেন না। মানুষের ভাষার এমনই দীনতা যে সে প্রাণের সকল প্রকার Shades of feeling বাহিরে ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হয় না। প্রকাশের বেদনায় তাই কবি লিখিয়াছেন—

মর্ম্মবেদনা আপন আবেগে
ফুল হয়ে কেন ফোটে না ?
দীর্ণ হৃদয় আপনি কেন রে
বাঁশী হয়ে বেজে ওঠে না ?

সমালোচক আপন গভীর সহানুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির ফলে লেখকের হৃদয়ের এই ভাবকে উপলব্ধি করিয়া পাঠকের সমক্ষে ধরিবার চেষ্টা করেন। ইহা ভিন্ন লেখকের প্রাণের অনেক কথা, যাহা হয়তো লেখকেরও অলক্ষ্যে তাঁহার রচনার প্রকাশ পাইয়াছে, সমালোচক তাহাকেও ব্যক্ত করেন। আমার বিশ্বাস, শ্রেষ্ঠ art —শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, অনেকাংশেই শিল্পীর হৃদয় হইতে স্বতঃ উৎসারিত হয়। রস যেখানে গভীরভাবে জমিয়া উঠে, লেখকের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া রচনায় সেখানে অনেক সময়েই জীবনের নানা তত্ত্বকথা আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে। তাহা লেখকের সজ্ঞান-চেষ্টা-প্রসূত নহে। সমালোচক ইহাকেও বাহিরে ব্যক্ত করেন।

অতএব দেখা যাইতেছে সমালোচকের কার্য্য অতি দুরূহ। সমালোচনাকে যাঁহারা কেবলমাত্র সমালোচকেরই আপনার ভাল লাগা বা মন্দ লাগা বলিয়া মনে করেন, আমার মনে হয় তাঁহারা মস্ত ভুল করেন। কারণ তাহা হইলে সকলের সমালোচনার মূল্যই একরূপ হইত এবং যাঁহার যাহা ভাল লাগে তাহাকেই তিনি প্রধান সাহিত্য বলিতে পারিতেন।

কিন্তু প্রকৃত সমালোচনা তাহা নহে। প্রকৃত গুণগ্রাহী সমালোচক সমালোচনা করিবার সময় যথাসম্ভব আপনার সঙ্কীর্ণ ভাল লাগা মন্দ লাগার গণ্ডী হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া রসজ্ঞ পাঠকদের দিক হইতে দেখিয়া থাকেন।

মল্লিনাথ কালিদাসকে ভাল বা মন্দ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সমস্ত রসজ্ঞ কাব্যামোদী পাঠকদের তরফ হইতেই বলিতে চাহিয়াছেন।

এই জন্যই যাঁহারা ধীর ও বুদ্ধিমান সমালোচক তাঁহারা কেবলমাত্র আপনাদের ক্ষণস্থায়ী অনুভূতির উপর নির্ভর না করিয়া, কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্মের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য রচনাকে বিচার করেন।

বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালা সাহিত্যে বিচার সঙ্গত সমালোচনার যে বিলক্ষণ অভাব, তাহা বোধ হয়

কেহই অস্বীকার করিবেন না। সমালোচক মহাশয়েরা সমালোচনার লক্ষ্য ও বিষয়ের কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া যান, এবং মনে করেন সমালোচনার অর্থ দোষ প্রদর্শন। য়ুরোপের Romantic criticismএ ঠিক ইহার বিপরীত দোষ দেখা গিয়াছিল। কোল্‌রিজ্‌ প্রমুখ রসজ্ঞ সমালোচকেরা শেক্সপিয়র পাঠ করিয়া এমনই তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহারা প্রতি ছত্রেই শেক্সপিয়রের অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির বিকাশ দেখিতে আরম্ভ করিলেন—এবং যাহা স্বভাবতঃই সরল ও বিশিষ্টতা বর্জ্জিত সাধারণ ভাবের, তাহার মধ্য হইতেও একটা বড় রকমের সৌন্দর্য্য বা তত্ত্ব টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যেও যে ঈদৃশ সমালোচনার অভাব আছে তাহা নহে। স্বর্গীয় গিরিজাবাবুর 'বঙ্কিমচন্দ্র' যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা একথার সাক্ষ্য দিবেন। প্রকৃত সমালোচক এই দুই প্রকার দোষই পরিহার করিতে চেষ্টা করিবেন।

মানুষ যে অপর মানুষ অথবা অপর জিনিষকে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে বিচার করিতে পারে না, তাহার প্রধান কারণ তাহার সঙ্কীর্ণতা। যিনি শ্রেষ্ঠ সমালোচক হইতে চাহেন তাঁহাকে প্রথম এই সঙ্কীর্ণতা সর্ব্বপ্রকারে বর্জ্জন করিতে হইবে। সমালোচনা ক্ষেত্রে এই সঙ্কীর্ণতা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যথা—

(ক) আত্মম্ভরিতা—যাহা আমার ভাল লাগিল তাহাই শ্রেষ্ঠ, তদ্ভিন্ন আর সকল সাহিত্য অকিঞ্চিৎকর। অথবা যাহা আমি বুঝিলাম তাহাই সারবান এবং যাহা আমার বোধাতীত তাহা অর্থহীন।

কাব্যের অস্পষ্টতা দোষ বলিয়া যাঁহারা চীৎকার করেন অধিকাংশক্ষেত্রেই তাঁহারা এই দোষে দোষী।

(খ) সংস্কারানুবর্ত্তিতা—পূর্ব্ব হইতেই একটী set idea অথবা সংস্কার লইয়া সাহিত্য আলোচনা করা এবং সাহিত্যে তাহাই খুঁজিতে থাকা। এক্ষেত্রে সমালোচক এই সংস্কার বা idea তাহাতে কতদূর প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা দেখিয়াই বিচার করেন। যাঁহারা সর্ব্বদা সাহিত্যের গুণাগুণ ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় খুঁজিয়া থাকেন, তাঁহারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

(গ) নৈতিকতা—সাহিত্যকে Ethical standard অর্থাৎ নৈতিক তুলাদণ্ডে বিচার করিয়া গুণ দোষ নির্ণয় করা। সাহিত্যে কুরুচি বলিয়া যে সকল রুচিবাগীশ মহাশয়েরা সর্ব্বদা নাসিকা কুঞ্চন করিয়া আছেন তাহারাই "নৈতিক" সমালোচক।

(ঘ) সমসাময়িকতা—অর্থাৎ সাহিত্যকে কেবলমাত্র সাময়িক ভাব প্রকাশের উপায় মাত্র মনে করিয়া সাহিত্যের সার্ব্বজনীনতার প্রতি অবহেলা করা। যাঁহারা সাহিত্যকে শুধু জাতীয়তার অথবা যুগধর্ম্মের মাপকাটি দিয়া বিচার করিতে যান, আমার বিশ্বাস তাঁহারা এই শ্রেণীর সংকীর্ণ সমালোচক।

(ঙ) ব্যবচ্ছেদ প্রিয়তা—অর্থাৎ কোন কাব্য বা সাহিত্যকে সমগ্রভাবে না দেখিয়া কেবলমাত্র অনাবশ্যক ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া অংশ বিশেষের বিচার করা।—শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয় সরকার মহাশয় ইহাকেই বাঙ্গালা সাহিত্যে 'কণাধারী' সমালোচনা বলিয়াছেন। ইংরাজিতে Shakespeare সমালোচনায় ইহার বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রকৃত সমালোচনার মধ্যে এই সকল দোষ কিছুই থাকিবে না। প্রথম দোষ হইতে মুক্ত হইতে গেলে সমালোচককে সহানুভূতি লইয়া লেখকের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। লেখক আপনার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার দিক হইতেই Reality অথবা সত্যকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহাকে বুঝিতে হইলে সমালোচককেও লেখকের স্থানে আসিয়া সত্যকে দেখিতে হইবে। অনেক সময়ে পাঠক ও লেখকের মধ্যে যে মতের অনৈক্য দেখা যায়, তাহার কারণ উভয়ে দুই বিভিন্নদিক হইতে সত্যকে দর্শন করিয়াছেন।

লেখক কি বলিতে চাহেন, প্রথমে সমালোচককে তাহা ধীরভাবে বুঝিতে হইবে, তাহার পর তাহা কতদূর তাঁহার রচনায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া উহার স্পষ্টতা বা অস্পষ্টতা বিচার করিতে হইবে।

এই কথা স্মরণ রাখিলে সমালোচক সমালোচনার দ্বিতীয় দোষ হইতেও মুক্ত থাকিতে পারিবেন। লেখকের রচনার বিষয়, চিত্রকরের চিত্রের নাম, শুনিয়াই অনেক সমালোচক পূর্ব্বাংশে তাহাদের কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে একটী ধারণা করিয়া থাকেন এবং তৎপরে রচনায় বা চিত্রে এই ধারণা কতদূর স্পষ্টীকৃত হইয়াছে তাহা দেখিয়া উহাদের গুণাগুণবিচার করেন। এরূপ করা অতিশয় অন্যায়। কারণ, আমার বিশ্বাস, বাহির হইতে নামানুসারে এইরূপ বিষয়ের শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে না। লেখক বা চিত্রকর যাহা রচনা অথবা চিত্র করিয়াছেন তাহাই তাঁহাদের বিষয়; নামতঃ যাহা এক, তাহাও রচয়িতাভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে এবং রচয়িতার মনের ভাব ও রচনাপ্রণালী প্রভৃতি লইয়া তাহা একটি স্বতন্ত্র বিষয় হয়। শেলির Skylark এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Skylark নামতঃ এক হইলেও, গভীরভাবে দেখিলে দুইটির বিষয় দুইরূপ।

একথা অবশ্য সত্য যে, এমন অনেক বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে একটী সংস্কার ও ধারণা স্বভাবতঃই অথবা লোকপরম্পরায় সাধারণ লোকের মনে এরূপ ভাবে বদ্ধমূল হইয়া গিয়েছে যে, তাহার বিপরীত কিছু দেখিলে তাহার মনে অত্যন্ত আঘাত লাগে। যেমন দেবাসুর যুদ্ধে দেবতাদেরই চিরকাল জয় হইবে এই সংস্কার; রাম ও রাক্ষসদের যুদ্ধে রামের সর্ব্ববিষয়ে মহানুভবতা এবং রাক্ষসদের হীনতা প্রভৃতি। কিন্তু যিনি বিচক্ষণ সমালোচক, তিনি এ দিক হইতেই লেখককে বিচার করিবেন না। লক্ষ্মণকে অপেক্ষাকৃত হীন করিয়াছেন বলিয়াই 'মেঘনাদবধ কাব্য' নিম্নশ্রেণীর, একথা অতি ক্ষুদ্রচেতা সমালোচকই বলিয়া থাকেন। এমন কি, মনে হয়,কবি বা ঔপন্যাসিক কোনো ঐতিহাসিক-সত্যকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন কিনা দেখিয়াও তাঁহাকে বিচার করা উচিত নহে—কেননা সাহিত্য সাহিত্য, তাহা ইতিহাস নহে। 'পলাসীর যুদ্ধে' সিরাজের চরিত্র অনৈতিহাসিক হইয়াছে বলিয়াই উহা কবিত্বহীন ইহা আমি মনে করি না।

কবি অথবা লেখক যে সকল অবস্থা ও সরঞ্জাম লইয়া রচনা আরম্ভ করিয়াছেন, প্রথমে সে-গুলিকে স্বীকার করিয়া লইয়া, পরে তিনি সে-গুলি কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাহার সাহায্যে কি ভাবে প্রতিপাদ্য বিষয়কে পরিস্ফুট করিয়াছেন, তাহার বিচার করা কর্ত্তব্য। যেমন, যদি কোনো ঋষিদুহিতা আবাল্য লোকালয়ের বাহিরে এক নির্জ্জন তপোবনে পালিত হইয়া থাকে এবং যদি সে সহসা একদিন সৌম্যদর্শন সংসারজ্ঞ প্রেমিক রাজার সাক্ষাৎ লাভ করে, পরে তাহা হইলে কি ঘটিতে পারে ইহা দেখিয়াই শকুন্তলার বিচার করিতে হইবে। অথবা যদি কোনো যক্ষ 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে' প্রিয়াবিরহিত হইয়া—প্রেমোন্মাদক চিহ্ন-পূর্ণ গিরিশিরে একাকী থাকিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে তাহার মনে যে ভাব হয়, তাহা 'মেঘদূতে' কতদূর প্রতিফলিত হইয়াছে, ইহা দেখিয়া মেঘদূতের কবিত্ব নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। শিব গড়িতে গিয়া বাঁদর গড়া অবশ্য দোষের, কিন্তু বাঁদর গড়াই যাঁহার উদ্দেশ্য, তিনি শিব কেন গড়েন নাই ইহা লইয়া কলহ করা বৃথা সময়ক্ষেপ মাত্র।

সাহিত্য যে সাহিত্য, ইহা দর্শন অথবা ইতিহাস নহে, এই কথা মনে রাখিলে সমালোচক আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা অথবা সমসাময়িকতা প্রভৃতি যে সকল দোষের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতেও নির্ম্মুক্ত থাকিতে পারেন।

অনেক সমালোচক আছেন, তাঁহারা সাহিত্যের মধ্যে কেবলই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব খুঁজিয়া থাকেন। একথা আমি পূর্ব্বেও স্বীকার করিয়াছি যে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকদের কাব্য, নাটক, উপন্যাসাদির মধ্যে জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান থাকিতে পারে—কিন্তু তাই বলিয়া তাহা যে একটী তত্ত্ব বিশেষকে প্রতিপাদিত করিবার জন্য সজ্ঞান চেষ্টা হইতে উদ্ভূত, তাহা আমি মনে করি না। শেক্সপিয়রের Hamlet, King Lear, গয়টের Faust, ডান্টের Divine

Comedy, মিল্টনের Paradise Lost প্রভৃতি পুস্তকে রচয়িতাগণ যে একটা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ideaর চারিদিকে রং ফলাইয়াছেন অথবা একটা তত্ত্বকথা প্রচার করিতে চাহিয়াছেন, ইহা আমার কিছুতেই মনে হয় না।

কোনো একটা বিশিষ্ট ভাবের উত্তেজনায় কবি যখন রচনা করিতে যান, তখন আগ্নেয় গিরির অগ্নিস্রাবের মত তাঁহার এই সকল ভাল লাগা, মন্দ লাগা, এই সকল বিশ্বাস ও ধারণা যাহা লুপ্ত ছিল তাহারা রচনায় বাহির হইয়া পড়ে এবং রচনার সমগ্রতার মধ্যে একটা তত্ত্ব অনেক সময়ে অন্তর্নিহিত হইয়া যায়। Hamlet হইতে অথবা Faust হইতে আমরা যে তত্ত্ব পাই, তাহা এইরূপেই পাওয়া যায়। সমালোচক ইহাঁদের রচনার মধ্য হইতে যে দার্শনিক তত্ত্বটি বাহির করেন, রচনার সময় ইহা যে তাঁহাদের মনের সম্মুখে সেই ভাবে ছিল, তাহা নহে। যেখানে তাহা থাকে, সাহিত্যের সৌন্দর্য্য সেখানেই হীন হইয়া পড়ে। Faust এর প্রথম অংশ অপেক্ষা দ্বিতীয় অংশে এই তত্ত্ব অনেকটা সুস্পষ্ট থাকায়—কাব্যাংশে উহা অপেক্ষাকৃত মন্দ হইয়াছে। মিল্টন যেখানেই তত্ত্ব প্রচার করিতে গিয়াছেন, Paradise Lostএর সেখানেই কাব্যের ক্ষতি হইয়াছে। রচনার প্রাক্কালে কবির সম্মুখে একটা অস্ফুষ্ট, অনির্দ্দিষ্ট ভাবের ক্ষীণ চিত্র উপস্থিত থাকে—কি বিষয় লইয়া কি লিখিতে হইবে তাহার একটা স্থূল খসড়া (draft image) লেখক সম্মুখে রাখেন—কাব্যের আবেগে, কল্পনার উত্তেজনায় ইহা আপনা-আপনিই ফুটিয়া উঠিতে থাকে এবং অবশেষে যখন চিত্রটী সম্পূর্ণ হয় তখন কবি আপনিই আপনার সৃষ্টি দেখিয়া অবাক্ হইয়া যান। এই যে খসড়া কবির সম্মুখে থাকে, তাহা হয়তো সময়ে সময়ে কোনো নৈতিক তত্ত্বও হইতে পারে—কিন্তু একথা সত্য যে, পরিপূর্ণ রচনা হইতে আমরা যেটা পাই, ইহার সহিত তাহার প্রভেদ আছে। শকুন্তলা হইতে চন্দ্রনাথ বাবু অথবা মেঘদূত হইতে রবি বাবু যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ঠিক সেই ভাবে বলিবার জন্যই কালিদাস যে লেখনী ধারণ করেন নাই, ইহা তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করেন। অতএব অতিরিক্ত মাত্রায় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কবিতায় খুঁজিতে যাওয়া শ্রেষ্ঠ সমালোচনার লক্ষণ নহে।

সাহিত্য সমালোচনায় অতিমাত্রায় রুচিবাগীশতা এবং নৈতিকতাও এই দোষের অন্তর্গত। রুচি এবং moral idea অথবা নৈতিক ধারণা, দেশ ও কাল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। সুতরাং সাহিত্য ও শিল্পকে কেবল মাত্র এই সকল তুলাদণ্ডে ওজন করা উচিত নহে। আর্টের প্রধান লক্ষ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি এবং মুখ্যতঃ এই সৌন্দর্য্যের দিক্ দিয়াই তাহার উৎকর্ষ বা অপকর্ষের বিচার করিতে হইবে। এই খানেই সাহিত্যের সহিত দর্শনের প্রভেদ। Ethical Judgment অথবা নৈতিক বিচার এবং art-criticism অথবা সমালোচনা এক নহে। যদি তাহা হইত তাহা হইলে শিশুবোধক অপেক্ষা মেঘনাদবধ হীন হইত এবং হিতোপদেশ, কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতির কাব্য ছাড়াইয়া উঠিত। আর্টের মূল্য শুধু moraltyর দিক্ দিয়াই বিচার্য্য নহে। যাঁহারা ইহাতে আপত্তি করেন, আমার বিশ্বাস তাঁহারা হয়তো ভাবেন যে আমরা আর্টকেই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু বলিতেছি। কিন্তু তাহা নহে—আর্টের মূল্য জীবনে যাহাই হউক আমরা তাহার বিচার করিতেছি না—আমরা শুধু বলিতে চাই, কেবল মাত্র সাহিত্য নহে, সমস্ত প্রকার আর্টকেই মুখ্যতঃ সৌন্দর্য্যের দিক্ দিয়াই বিচার করিতে হইবে। যাহা সুন্দর হয় নাই, তাহা যতই উচ্চ উপদেশপূর্ণ হোক না কেন, তাহাকে আমরা আর্ট বলিব না। আর যদি সুন্দর হয় তবে তাহাকে art বলিব—তাহার morality যতই নিম্ন শ্রেণীর হোক্ না কেন। সাহিত্যের মধ্যে অবশ্য কাব্য উপন্যাস ও নাটক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রচনায় এই সৌন্দর্য্যের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে—কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা আমাদের বক্তব্য নহে। রুচিবাগীশদের কথা শুনিলে বিদ্যাপতি

প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের রচনা, যাহা কাব্যমোদী পাঠকগণের অতি আদরের বস্তু, তাহা পরিবর্জ্জন করিতে হয়; এবং গ্রীকদের ভাস্কর শিল্প যাহা ললিতকলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছে, তাহাকে অবজ্ঞা করা ভিন্ন উপায় থাকে না।

প্রশ্ন হইতে পারে—তাহা হইলে সৌন্দর্য্যের দোহাই দিয়া সাহিত্যে কি যথেচ্ছ বিষয়ের অবতারণা করা যাইবে? শ্লীলতা বা সুরুচি বলিয়া আর্টে কি কিছু থাকিবে না? আমার মনে হয় সাহিত্যের বর্ণনীয় বিষয়, জগতের যাহা কিছু সমস্তই; বাহির হইতে যদি আমরা বিষয়ের কোনো সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে যাই—তাহা হইলে উহা সাহিত্যের স্বাভাবিক ও অবাধ বিকাশের প্রতিকূল হইবে। লৌকিক ধর্ম্ম, লৌকিক নীতি এবং লৌকিক রুচির দ্বারা সাহিত্যকে নিয়মিত করিবার চেষ্টা অতি সঙ্কীর্ণতার লক্ষণ। আর্ট কোনও দিনই আপনাকে এই লৌকিক শাসনের অধীন করিয়া রাখে নাই—যাহা কিছু মানুষের স্বাভাবিক ও সাধারণ, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কোনও দিনই তাহাকে অবজ্ঞা করেন নাই।

কিন্তু সাহিত্যকে এইপ্রকার স্বাধীনতা প্রদান করিলে সে যে একেবারে উদ্দাম হইয়া উঠিবে, এরূপ আশঙ্কা অমূলক। কারণ উদ্দামতা সৌন্দর্য্যের হানিকর, সুতরাং যিনি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই সংযম অবলম্বন করিতে হইবে।

কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন। শ্লীলতা ও অশ্লীলতা সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণা সর্ব্বদেশেই সভ্যসমাজে প্রচলিত আছে। যেমন, স্ত্রীপুরুষ-ঘটিত ব্যাপারে কতকগুলি বিষয়। যে সাহিত্যে শ্লীলতার এই সার্ব্বজনীন সীমার অতিক্রম দেখা যায়, তাহাতে যে সৌন্দর্য্য প্রকৃতভাবে ফুটিয়া উঠে আমার তাহা মনে হয় না। উঠিলেও, সমালোচক ঈদৃশ রচনাকে নিরুৎসাহ দিলে আমি আপত্তি করিব না। কিন্তু তাই বলিয়া যাহা কিছু আমার রুচির বিরোধী তাহাই যে ত্যাজ্য হইবে ইহা আমি মানি না।

কেবলমাত্র প্রচলিত রুচির তুলাদণ্ড দিয়াই যেমন সাহিত্যের বিচার অকর্ত্তব্য, সেইরূপ প্রচলিত সামাজিক ও জাতীয় ভাব অথবা সমসাময়িক মত বিশ্বাস দিয়া তাহার গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করা অন্যায়। সাময়িক সাহিত্য ও সার্ব্বজনীন আসল সাহিত্যের মধ্যে যে প্রভেদ, সমালোচকের তাহা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে। সুতরাং একটীকে আর একটীর তৌল দিয়া ওজন করা অযৌক্তিক। আসল সাহিত্যে লেখক যাহা মানুষের চিরন্তন সত্য তাহাই প্রকাশ করেন। কবির সম্বন্ধে এমার্সন যাহা বলিয়াছেন—The poet is not a contemporary, but an eternal man—তাহা প্রথম শ্রেণীর artist মাত্রের পক্ষেই প্রয়োজ্য। সুতরাং কোন রচনায় যদি জাতি অথবা দেশের প্রয়োজনোপযোগী কোনো কথা না থাকে, তাহা হইলেই যে তাহা সমালোচনায় নিম্নশ্রেণীর বলিয়া সাব্যস্ত হইবে, ইহা মনে করা কুসংস্কার।

অবশ্য প্রত্যেক রচনায় লেখকের গোচরে বা অগোচরে সেই কালের একটী ছাপ পড়িয়া যায় কিন্তু তাই বলিয়া এই ছাপ দেখিয়াই যে তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, তাহা নহে।

কোনো সাহিত্যে হিন্দুত্ব অথবা খৃষ্টানত্ব কতদূর রক্ষিত হইয়াছে ইহা বুঝিয়া যদি হিন্দু বা খৃষ্টান সমালোচক তাহা বিচার করিতে বসেন তবে তাঁহাকে আমি অতি নিম্নশ্রেণীস্থ বলিব।

যাহা প্রচলিত সমাজের বিরোধী, তাহাকেও কেবলমাত্র এই অপরাধে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। যাহা মানবহৃদয়ের চিরন্তন সামগ্রী, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তাহাকেই বর্ণনা করেন—সুতরাং রস ও সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হইলে সমালোচক নিন্দা করিতে পারেন না। ইহাতে যদি কেহ মনে করেন, আমি সাহিত্যকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছি, তবে তিনি ভুল করিবেন। আমি বলিতে চাহি, সাহিত্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অন্ধ অনুকরণ করিতে বাধ্য নহে। সাহিত্য বাস্তব না হইলে

যে অকিঞ্চিৎকর হয় তাহা আমি মানিয়া থাকি ; কিন্তু বাস্তবতা অর্থে য়ুরোপীয় সমালোচক যাহাকে realism বলেন তাহাই যে হইবে এমন নহে। সাহিত্যে তাহাই বাস্তব, লেখক যাহা নিজ অনুভূতি হইতে লিখিতেছেন। তাহা লেখকের চতুষ্পার্শ্বস্থ সমাজে না ঘটিলেও কিছু আসে যায় না।

সমালোচনার যে পঞ্চম দোষের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা অতিরিক্ত বিশ্লেষণ হইতে উদ্ভূত। কাব্য, নাটক অথবা উপন্যাসকে প্রথমতঃ সমগ্রভাবে বিচার করিয়া তাহার উৎকর্ষ অপকর্ষ বাহির করিতে হইবে। তৎপরে তাহার অবয়বের গুণাগুণ বিচার করা যাইতে পারে, কারণ সৌন্দর্য্য সমগ্রের সামঞ্জস্য হইতেই প্রকাশ পায়।

লেখক কি বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা কি ভাবে বলিয়াছেন, তাহা অনুভূতি হইতে বলিয়াছেন কি না, নির্দ্দিষ্ট অবস্থার মধ্যে তাহার সম্ভাব্যতা কতদূর, তাহাতে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কিরূপ হইয়াছে, সমালোচকের এই সকলই মুখ্যতঃ দর্শনীয় বিষয়। যিনি এই সকল ত্যাগ করিয়া, লেখক কোথায় কি বানান ভুল করিয়াছেন, কি শব্দ অযথা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহার দার্শনিক অথবা বৈজ্ঞানিক বিদ্যা কতদূর ইত্যাদি লইয়া ব্যস্ত হন, তিনি অনুপযুক্ত সমালোচক। সাহিত্যের প্রকৃত সৌন্দর্য্য বিচারে ইহাদের বিশেষ কিছুই প্রয়োজনীয়তা নাই।

সমালোচনার এই যে সকল সংকীর্ণতার কথা উল্লেখ উপরে করিলাম, ইহা হইতে মুক্ত থাকিবার প্রধান উপায় ভিন্ন ভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগ্রন্থ পাঠ। সমালোচকের পক্ষে হৃদয় প্রশস্ত করিবার জন্য ইহার যে কতদূর আবশ্যকতা তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যিনি যতই সহানুভূতি ও ধীরতার সহিত সমালোচনা করুন না কেন, কাল যে সকলের অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ সমালোচক তাহার আর সন্দেহ নাই। সুতরাং কালের বিচারে ভিন্ন ভিন্ন যুগের ও জাতির আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া যাহা এখনও মানুষকে আনন্দ দিতেছে, তাহাই যে সনাতন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য তাহা ত নিঃসন্দেহ। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক আপনার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি হইতেই রচনা করিয়া থাকেন—কিন্তু তাহা যখন বাহিরে ব্যক্ত হয় তখন তাহার সহিত মানবহৃদয়ের চিরন্তন সুখদুঃখ ও নৈরাশ্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই জন্যই তাহা চিরদিন আদৃত হয়।

ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন, আমি একটী বাঁধা-ধরা Canon of art অথবা সাহিত্যের সাধারণ ধর্ম্ম মানিয়া লইতে বলিতেছি। অ্যারিষ্টটল্ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আর্টের যে সকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন অথবা সাহিত্য-দর্পণকার বিভিন্ন রস ও অলঙ্কারের যাহা লক্ষণ দিয়াছেন, ক্রীতদাসের মত তাহাই যে চিরদিন সাহিত্যকে স্বীকার করিয়া চলিতে লইবে, ইহা আমি বলি না। সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিলে সাহিত্যের বিকাশের বাধা হয় এবং যাঁহারা অসীম ধীশক্তিসম্পন্ন তাঁহারা কখনই এই গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না। কালিদাস, শেক্সপিয়র, গয়টে, দান্তে, মিল্টন, ব্রাউনিং, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যাহা লিখিয়াছেন, সেই পথেই যে চিরকাল সাহিত্যকে চলিতে হইবে তাহাও নহে। তবে ইঁহাদের যে সকল রচনা classicএ পরিণত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে, সাহিত্যের উৎকর্ষ কোথা সন্ধান করিতে হয় সমালোচক তাহা বুঝিতে পারিয়া আপনার কার্য্যে দক্ষতর হইতে পারেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যে বর্ত্তমানকালে যাঁহার ইচ্ছা তিনিই সমালোচকের দায়িত্বপূর্ণ আসন গ্রহণ করিয়া বসিতেছেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান, যাঁহারা সাহিত্য সৃষ্টি করেন, সমালোচক অপেক্ষা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। কালের বিচারে যাহা মূল্যবান তাহা শত উপেক্ষা অবজ্ঞা সত্ত্বেও আপনাকে জীবিত রাখিবে। সমালোচকের দায়িত্বহীন মতামতে নিয়ন্ত্রিত হইয়া সাধারণ পাঠক, লেখককে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার মনে বেদনা দিতে থাকিলে হয়ত তাহাতে অনেক সাহিত্যিকের সমুদয় ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনাও নষ্ট হইয়া যায়। কবি কীট্‌স্‌ ও তাঁহার অদূরদর্শী সমালোচকের কথা প্রত্যেক সমালোচকেরই মনে রাখা উচিত।

শ্রীমহীতোষকুমার রায় চৌধুরী।

সলিমা সুলতান বেগম *

সলিমা সুলতান বেগম বাবরের দৌহিত্রী,—হুমায়ুনের বৈমাত্রেয় ভগিনীর কন্যা। ইনি আকবর-মহিষী ছিলেন এবং তাঁহার অন্তঃপুরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুচতুরা, বুদ্ধিমতী রমণী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল।

সলিমা সুলতানের মাতার নাম লইয়া ইতিহাসে বহু মতভেদ আছে। 'মাসিরে-রহিমী' (১) গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিবরণটী পাওয়া যায়:—

বাবরের পিতৃব্য সুলতান মামুদ মীর্জ্জার (মীরণশাহী) সহিত ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে (৮৭৩ হিঃ) পাসা বেগমের (তুর্কী) দ্বিতীয় পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই বিবাহের ফলে পাসার গর্ভে তিন কন্যা ও এক পুত্রের জন্ম হয়। তন্মধ্যে এক কন্যা,— সল্‌হা সুলতান বেগমকে বাবর বিবাহ করেন, এবং এই বিবাহের ফলস্বরূপ গুলরং বেগমের জন্ম হয়। গুলরং-এর সহিত মীর্জ্জা আলাউদ্দীনের পুত্র, কণৌজের শাসনকর্ত্তা নূরুদ্দীন মুহম্মদের (নক্সাবন্দী) বিবাহ হয়। এই গুলরংই সলিমার মাতা।

আবুল ফজল্ লিখিয়াছেন (২) যে, ফিরদউস্ মকানী (বাবর) তাঁহার কন্যা গুলবর্গের সহিত নূরুদ্দীনের বিবাহ দেন এবং এই **গুলবর্গের** কন্যাই সলিমা। অন্যত্র আবার আবুল ফজল্ সলিমার মাতাকে বাবর-কন্যা **গুলরং** বলিয়াছেন। (৩) জহাঙ্গীর 'তুজুকে-জহাঙ্গীরি'তে সলিমার মাতাকে **গুলরুখ** বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'মাসির-উল্-উমরা' লিখিয়াছেন—সলিমা মীর্জ্জা নূরুদ্দীন মুহম্মদের কন্যা ও হুমায়ুন-ভগিনী **গুলরাগ** বেগমের গর্ভজাত। (৪)

বাবর আত্মকাহিনী 'বাবর নামায়' কোথাও সল্‌হা সুলতানের কথা বা তাঁহার কন্যার সহিত নূরুদ্দীনের বিবাহের কোন উল্লেখ করেন নাই। তত্রাচ আবুল ফজল্ লিখিয়াছেন যে, বাবর গুলবর্গের বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাবর সল্‌হা সুলতানের কোন কথা লেখেন নাই বটে, তবে পাসার যে তিন কন্যা ছিল, তাহা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন; (৫) কিন্তু তিনি তাহাদের নামও করেন নাই বা কোন পরিচয়ও দেন নাই; কেবল পাসার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। (৬)

গুলবদন, পিতা বাবরের পুত্রকন্যা ও বেগমদের বিষয়ে 'হুমায়ুন-নামায়' একাধিকস্থানে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। যে সলিমা তাঁহার প্রিয়সঙ্গিনী ছিলেন, তাঁহার মাতার নামোল্লেখ করিতে গুলবদন যে ভুলিবেন, ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। এই কারণে আমাদের মনে হয় যে সল্‌হা সুলতান বেগম ও তাঁহার কন্যা, গুলবদনের প্রদত্ত বাবরের পুত্রকন্যা ও বেগমদের তালিকায় অন্য কোন নামে অভিহিতা হইয়া থাকিবেন।

বাবর, পাসার তিন কন্যার মধ্যে দুইটি কন্যার সম্বন্ধে নীরব। হইতে পারে, তিনিই ইহাদিগকে বিবাহ করিয়া থাকিবেন। বাবর আত্মকাহিনীতে অপরাপর বেগমের কথা সাধ্যমত গোপন রাখিয়াছেন, এবং পাসার এই দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়া থাকিলেও এক্ষেত্রে তাহাদের সম্বন্ধে কিছু না লেখাও তাঁহার পক্ষে বিচিত্র নহে। আর বাবর পাসার কন্যাদ্বয়ের একজনকে (সল্‌হা সুলতান) যে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা 'মাসিরে-রহিমী' হইতে সন্ধান পাইতেছি। সল্‌হার কন্যা গুলরং-এর সহিত যে নূরুদ্দীন মুহম্মদের বিবাহ হয় তাহাও পূর্ব্বোক্ত পাণ্ডুলিপি হইতে জানিতে পারা যাইতেছে। এদিকে 'হুমায়ুন-নামা' পাঠে জানা

* যশোহর সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাসশাখায় পঠিত।

১ A. S. B. Ms. p. 281 b.

২ Akbarnama, Bib. Ind. Eng Trans. ii, 98.

৩ Ibid i, 329

৪ Masir-ul-umara, (Pers. Text) i, 375.

৫ Baburnama, Ed. by A. S. Beveridge, i, 49.

৬ Ibid, i, 47.

যায় যে, গুলবদন-জননী দিলদারের গর্ভে গুলরং-এর জন্ম হয়। ইহা হইতে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, সল্‌হা ও দিলদার বিভিন্ন নহেন। অন্যান্য গ্রন্থে সলিমার মাতাকে গুলরুখ বলা হইয়াছে। আমাদের মনে হয় গুলরং, গুলরুখ ও গুলবর্গ একজনেরই নাম; আরও একটি কথা এই যে উক্ত তিন নামই একার্থবোধক।

আকবরের শাসনকালে হামিদা বাণু ও মাতৃস্বসা গুলবদনের সহিত সলিমা কাবুল ত্যাগ করিয়া ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে (৯৬৪ হিঃ) হিন্দুস্থানে আগমন করিয়াছিলেন।

হুমায়ুন মুঘল-সাম্রাজ্যের প্রকৃত পুনরুদ্ধারকারী বয়রাম খাঁর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, ভারত জয় হইলেই তিনি সলিমার সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন। এক্ষণে ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দের (১৫ সফর, ৯৬৫ হিঃ ৭) ডিসেম্বরের শেষভাগে (বা ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে) মহাসমারোহে পঞ্জাবের জলন্ধর নামক স্থানে সলিমার সহিত বয়রাম খাঁর বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত হয়; কিন্তু বয়রামের ভাগ্যে বহুদিন সুখভোগ ঘটিয়া উঠে নাই। এই বিবাহের প্রায় তিন বৎসর পরেই (৯৬৮ হিঃ) একজন আফ্‌গান গুপ্তঘাতকের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়। পরে বিধবা সলিমাকে আকবর ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে (৯৬৮ হিঃ ৮) বিবাহ করেন।

৯৮৩ হিজিরায় সলিমা গুলবদনের সহিত মুসলমানগণের পবিত্র তীর্থ মক্কা গমন করেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে কিরূপে লোহিত সাগরে পোতমগ্ন হইয়া তাঁহারা বিপদ্‌গ্রস্ত হ'ন, এবং কিরূপে বাধ্য হইয়া এডেনে তাঁহাদের অবস্থিতি করিতে হয়, তাহা আমি 'গুলবদন' প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

ইতিহাস হইতে জানা যায়,—সলিমা একজন পাঠিকা ছিলেন। (৯) কবিতা রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্তা ছিলেন। 'মখ্‌ফী' (অর্থাৎ গুপ্তব্যক্তি) নাম দিয়া তিনি বহু ফার্সী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। সলিমার নিম্নলিখিত বয়েৎটি(১০) খাফি খাঁ তাঁহার গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন। তৎকালে ইহা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল:—

"কাকুলৎ রা মন্ জেমস্তী রিষ্‌তা-ই-জান্ গোফ্‌তা আম্।
মস্তু বুদম্ জীঁ সবব্ হর্ফ-ই পরেশান্ গোফ্‌তা আম্।"

=মোহবশে তোমার চাঁচর কেশকে 'জীবন-সূত্র' বলিয়াছি—ইহা উন্মত্ত প্রলাপ।

খাফি খাঁ সলিমাকে 'খদিজে-উজ্জ-যমানি' (অর্থাৎ তৎকালীন খাদিজা) নামে অভিহিতা করিয়াছেন।

উভয় স্বামীর ঔরসে সলিমার কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই। নিঃসন্তান সলিমা তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ-মমতা কুমার সেলিমের (জহাঙ্গীর) উপরেই নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে পুত্রের মত লালিতপালিত করিয়াছিলেন। (১১) যখন নির্ব্বোধ সেলিম পিতার সহিত বিবাদ করেন, সেই সময়ে সলিমা স্বয়ং এলাহাবাদে তাঁহার নিকট গমন করেন। সেলিম বিমাতার প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ দুইদিনের পথ অগ্রসর হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হ'ন। সলিমা নানারূপে কুমারের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিণাম বুঝাইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসেন;—এইরূপে তিনি পিতাপুত্রের মধ্যে মিলন সাধন করিয়া দেন।

জহাঙ্গীর 'তুজুকে-জহাঙ্গীরি'তে লিখিয়াছেন যে, তিনি ১৬১২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর (২ জিলকদ, ১০২১ হিঃ) তারিখে সলিমার মৃত্যু-সংবাদ অবগত হ'ন। তিনি বেগমের জন্ম, বংশাদি ও বিবাহের কথার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছেন। বেগমের প্রকৃতিদত্ত গুণরাশি, মনের উৎকর্ষতা, সর্ব্বোপরি তাঁহার সুশিক্ষারও তিনি বিশেষভাবে প্রশংসা করিয়াছেন। 'তুজুক' হইতে আমরা জানিতে পারি যে ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সলিমার মৃত্যু হয়। জহাঙ্গীর তাঁহার মৃতদেহ বেগমের

৭ Masir-ul-umara, (Pers. Text) i, 375.
৮ Blochmann, Ain-i-Akbari, I, 309.
৯ Al-Badaoni, Lowe, ii, p. 389.
১০ Khafi Khan's Muntakhab-ul-Lubul, Bib. Ind. (Pers. Text,) i, 276; Masir-ul-umara (Bib. Ind. Eng. Trans.), p. 371.
১১ Khafi Khan, i, 253.

মন্দাকর উদ্যানস্থ বাটিকায় সমাহিত করিবার আদেশ দেন। (১২)

জহাঙ্গীরের লিখিত বেগমের মৃত্যুর তারিখ লইয়া আমাদের একটু গোল বাধিয়াছে। জহাঙ্গীরের মতে সলিমার মৃত্যু যদি ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে (১০২১ হিঃ) (১৩) হইয়া থাকে তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ৯৬১ হিজিরায় তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, ও মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে বয়রামের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, এবং হুমায়ুন যখন বয়রামকে ভারত জয় করিতে পারিলে পুরস্কারস্বরূপ সলিমাকে তাঁহার করে সমর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হ'ন, তখন বেগম অতিমাত্র শিশু। একজন মধ্যবয়স্ক লোকের সহিত পঞ্চমবর্ষীয় কন্যার বিবাহ একরূপ অসম্ভব এবং ইহা হুমায়ুনের সময়ে মুসলমান রীতিনীতির অনুসারী ছিল বলিয়া মনে হয় না।

সুখের বিষয়, বেভরিজ সাহেব ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে (১১৪৮ হিঃ) রচিত কামগর হুসেনীর 'জহাঙ্গীর-নামা' (১৪) গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির ৭২ক পৃষ্ঠায় একটি মন্তব্য দেখিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, সলিমার মৃত্যু ৭৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে (ন্যূনাধিক ২রা জানুয়ারী ১৬১৩; ১০ জিলকদ, ১০২১ হিঃ) সংঘটিত হয়, এবং বেগম ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৩এ ফেব্রুয়ারী (৪ শওয়ল, ৯৪৫ হিঃ) জন্মগ্রহণ করেন,—অর্থাৎ আকবরের জন্মের চারি বৎসর পূর্ব্বে। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর আকবরের জন্ম হয়; কাজেই সলিমা আকবর অপেক্ষা তিন বৎসর ৭ মাসের বড় ছিলেন। গুলরুখ কন্যা সলিমার জন্মের চারিমাস পরেই মৃত্যুমুখে পতিতা হ'ন।

উপরিউক্ত মন্তব্যটি গ্রন্থের নকলকারী রুস্তমের (অপর নাম মুতামিদ খাঁ) পুত্র মীর্জ্জা মুহম্মদের হস্তলিখিত; কিন্তু এই মীর্জ্জা মুহম্মদ কেবল নকলকারী ছিলেন না—তিনি ১৭১২ খৃষ্টাব্দে (১১২৪ হিঃ) রচিত 'তারিখ্ মুহম্মদী' (১৫) গ্রন্থের রচয়িতা। এই পাণ্ডুলিপির ১৪০ পৃষ্ঠাতেও উক্ত আছে, ৭৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সলিমার মৃত্যু হয়। এই তারিখই আমাদের বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয়।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"চোখ গেল"

'চোখ গেল চোখ গেল'—আহা ও কি করুণ রোদন,
কিসে চক্ষু দগ্ধ হলো, চক্ষু যে গো পরম রতন।
প্রাণপণে চীৎকারিছ যাতনায় আকুল অধীর,
বিশ্বতলে হায় হায় সকলে কি হয়েছে বধির?
কারো প্রাণ টলেনাক, চলে সবে আমোদে হেলায়,
বিফল বিলাপ তব, ব্যথা তব দিগন্তে মিলায়!

কোন্ অপরাধে তোর চোখ গেল রে ব্যথিত পাখী?
প্রাণ না লইয়া তোর, লয় কেহ প্রাণাধিক আঁখি?
এত কি ভীষণ পাপ, যার শাস্তি এত নিদারুণ,
কাঁদায় না প্রায়শ্চিত্ত বিশ্বজনে হলেও করুণ!

তুমি বুঝি ছিলে পাখী বাদ্শার অন্তঃপুর মাঝে
ইরাণী বেগম হয়ে হীরা মোতি জড়োয়ার সাজে
অন্দরের অন্ধকারে ছিলে বুঝি আগ্রা প্রাসাদে?
খোজারা দিতনা তোমা যাইবারে বাতায়নে, ছাদে;
পর্দ্দার উপর পর্দ্দা চারিদিকে কঠিন শাসন,
সোনার শিকল দিয়ে সে পিঞ্জরে শতেক বাঁধন;
বেগম হইয়া হায়, হাবশীর ভ্রূকুটি-তাড়িতা,
আলো নাই, হাওয়া নাই, রুদ্ধশ্বাস, রাজদণ্ড ভীতা!
শারদ সন্ধ্যায় কবে জ্যোৎস্নাভরা যমুনা দর্শনে,
ঝরোকা করিলে ফাঁক—সেই দোষে হারালে নয়নে!

এ জনমে লভিয়াছ মুক্তবায়ু উদার আকাশ,
বিশ্বভরা আলোরাশি, প্রাণভরা মুক্তির নিঃশ্বাস।
তবু সেই নিদারুণ আঁখিব্যথা পারনি ভুলিতে,
বিশ্ব কর মুখরিত 'চোখ গেল' কাতর বুলিতে।
আজো রাজভয়ে যেন, হে বেগম, বিহঙ্গম-রাণী,
কেহ নাহি কহে ফুটী মুখ ফুটি করুণার বাণী।

শ্রীকালিদাস রায়।

(১২) Tuzuk-i-Jahangiri, Rogers and Beveridge, i, 232 (১৩) খাফি খাঁও (Persian Text, i. 276) লিখিয়াছেন, জহাঙ্গীরের রাজত্বের ৭ম বর্ষে (১০২১ হিঃ) সলিমার মৃত্যু হয়। (১৪) B. M. Copy, Or. 171—Rieu, i, 257a, (১৫) Rieu, iii. Or, 1824, p, 875a

জীবনের মূল্য

(উপন্যাস)

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

দুঃসংবাদ ।

প্রাতঃকাল হইতে ফিস্ ফিস্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। বেলা নয়টার সময়, নগ্নপদে ছাতি মাথায় দিয়া জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় বাজার করিয়া ফিরিতেছিলেন। তাঁহার একহাতে অনুমান সওয়া-সের ওজনের একটি ইলিশ্ মাছ, অন্য হাতে গামছায় বাঁধা পাণ ও তরীতরকারী। প্রাতে গৃহিণী বলিয়াছেন—"জামাই এসেছে, কি দিয়ে কোলে ভাত দেব?"—তাই একটি টাকা লইয়া ব্রাহ্মণ এই জলে কাদায় বাজার করিতে বাহির হইয়াছিলেন।

বাজার হাতে করিয়া জগদীশ বাড়ী আসিতেছেন। পথে ছত্রধারী বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তাহারা জিজ্ঞাসা করিতেছে—"মাছটা কত হল?"—মূল্য সম্বন্ধে তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া, পা টিপিয়া টিপিয়া জগদীশ বাড়ী চলিয়াছেন। এক এক স্থানে বড়ই পিছল হইয়াছে।

সতীশ দত্তের বাড়ীর নিকট পৌঁছিতেই বৃষ্টিটা চাপিয়া আসিল। বাতাসের বেগও বাড়িল। সতীশ হুঁকা হাতে করিয়া তাহার বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল, বলিয়া উঠিল—"বাঁড়ুয্যে মশাই—আসুন আসুন—বসে যান—জলটা ধরুক।"—জগদীশ দেখিলেন, জলের ঝাপটায় বস্ত্রাদি সমস্তই ভিজিয়া যায় সুতরাং সতীশ দত্তের বারান্দায় উঠিয়া পড়িলেন। ছাতাটি মুড়িয়া সেটি দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করাইয়া দিয়া বলিলেন—"ওঃ—জোরে এল যে!"

সতীশ বলিল—"কাপড় কি ভিজে গেছে? কাপড় ছাড়বেন?"

"না—বিশেষ ভেজেনি।"

"খাসা মাছটি কিনেছেন যে! কত হল?"

"আট আনা। দশ আনা—দশ আনা—দশ আনার কমে মাগী কিছুতেই দেবে না—শেষে অনেক মারামারি করে আট আনায় হল।"

"বেশ হয়েছে। তা আসুন, বৈঠকখানায় এসে বসুন। জলটা ছাড়লে যাবেন এখন। বসুন, বামুনের হুঁকোটায় আমি জল ফেরাই।"

জগদীশ বলিলেন—"আবার ভিতরে যাব? পায়ে যে কাদা!—এ জল বেশীক্ষণ থাকবে না।"

সতীশ বলিল—"হলেই বা কাদা। আমার বৈঠকখানাতেই কোন কার্পেট জাজিম বিছানো রয়েছে! আসুন, ভিতরে এসে বসুন।—আর বলেন ত জল এনে দিই, পা ধুন।"

ছাদের নালী দিয়া প্রবলবেগে জলধারা পতিত হইতেছিল। বারান্দার প্রান্তে গিয়া, সেই জলধারায় জগদীশ একে একে পা দু'খানি ধরিয়া ধুইলেন। পরে সতীশ দত্তের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া তক্তপোষের উপর বসিলেন। সতীশ একটি কুলুঙ্গি হইতে কড়িবাঁধা ব্রাহ্মণের হুঁকাটি লইয়া জল ফিরাইবার জন্য বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

জগদীশ এদিকে অনেকদিন সতীশের বাড়ী আসেন নাই। কন্যার বিবাহের পর হইতে সতীশকে পথে দেখিলে ছাতা আড়াল দিতেন কারণ সতীশ ইদানী গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুস্বরূপ পরিগণিত তাহা জগদীশ জানিতেন।

সতীশ হুঁকায় জল ফিরাইয়া আনিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তামাক দিল। জগদীশ তামাক খাইতে লাগিলেন। সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"তারপর, জামাই বাবাজীর খবর কি?"

জগদীশ বলিলেন—"কাল বিকেলের গাড়ীতে এসেছে যে। প্রায়ই শনিবারে আসে।"

সতীশ বলিল—"ওঃ—বটে বটে। কাল আমি ষ্টেশনে গিয়েছিলাম—হরিপদ গাড়ী থেকে নামল দেখ-

লাম। তার সঙ্গে রোগা মত লম্বা মত আর একটি ছেলে নামলো, সেই আপনার জামাই বুঝি ?"

"সেই। কাল ষ্টেশনে গিয়েছিলে কেন ?"

"কাল ঐ গাড়ীতে গিরিশ মুখুয্যে মশাই এলেন কিনা।"

"এসেছেন ? কোত্থেকে এলেন ? দার্জ্জিলিঙ থেকে ?"

"দার্জ্জিলিঙ থেকে তিন চার দিন হল এসেছিলেন। এ ক'দিন হুগলিতে ছিলেন।"

হুগলির নাম শুনিয়াই বন্দ্যোপাধ্যায়ের বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। বলিলেন—"হুগলিতে ! হুগলিতে কি করছিলেন ?"

সতীশ দত্ত অন্য দিকে চাহিয়া নীরব রহিল, প্রশ্নটি যেন শুনিতেই পায় নাই। জগদীশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"হুগলিতে কেন হে ?"

সতীশ বলিল—"কি মোকর্দ্দমা দায়ের করবার জন্যে বুঝি।"

"কার নামে ?"

আবার সতীশ না শুনিতে পাইবার ভান করিয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিল। জগদীশ প্রশ্নটির পুনরুক্তি করিলে বলিল—"ওঃ—কার নামে জিজ্ঞাসা করছেন ? সেটা ত আমি জিজ্ঞাসা করিনি।"

এ কথা শুনিয়া জগদীশের বুকের ভিতরটায় বিলক্ষণ ভীতির সঞ্চার হইল। সতীশের মুখ চক্ষু দেখিয়া তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, সে সত্য গোপন করিতেছে। দার্জ্জিলিঙ হইতে আসিয়া তাঁহার চারিদিন হুগলিতে থাকার কথা জানে, মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন তাহা জানে, কোন ট্রেণে আসিয়া পৌছিবেন তাহা জানিয়া ষ্টেশনে আনিতে গিয়াছিল—আর, কাহার নামে নালিশ করিয়াছেন তাহা জানে না ? ইহাও কি কখন সম্ভব হয় ? তবে কথাটা গোপন করিবার উদ্দেশ্য কি ? অপ্রিয় সত্যই লোকে গোপন করিয়া থাকে। তবে কি ?—

বাহিরে ঝম্ ঝম করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, শীতল বাতাস বহিতেছে, কিন্তু তথাপি জগদীশের কপাল ঘামিয়া উঠিতে লাগিল। গিরিশ যদি তাঁহার নামে নালিস্ করিয়া আসিয়া থাকে, তবে কি হইবে ? ব্যাকুল ভাবে তিনি বলিলেন—"সতীশ, তোমার সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ। তোমাকে বরাবর নিজের ভাইয়ের মতই দেখি, তুমিও আমায় দাদা বল, সেই রকম ভক্তি শ্রদ্ধাও কর। কেবল, এই বিয়েটা হয়ে অবধিই তোমাতে আমাতে, কি বলে গিয়ে, একটু ইয়ে হয়েছে। আমার কিন্তু তাতে বিশেষ অপরাধ নেই। সে সব কথা তোমায় অন্য এক সময় বুঝিয়ে বলবো। এখন আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা কোরো না ভাই, সত্যি করে বল দেখি, গিরিশ কি আমারই নামে নালিস্ করেছে ?"

সতীশ দত্ত নতমুখে কয়েক মুহূর্ত্ত বসিয়া থাকিয়া বলিল—"আর গোপন করেই বা ফল কি ? কালই বোধ হয় সমন আসবে।"

বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁকার ডাক বন্ধ হইয়া গেল। তিনি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সতীশের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হাত কাঁপিতেছিল; পাছে হুঁকা পড়িয়া যায় এই আশঙ্কায় সতীশ তাঁহার হাত হইতে হুঁকাটি নামাইয়া লইল।

জগদীশের কণ্ঠ শুকাইয়া আসিয়াছিল। একটি ঢোক গিলিয়া, গলা ভিজাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কত টাকার দাবীতে নালিস্ করেছে জান্ ?"

সতীশ ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"সুদে আসলে দু হাজার কত টাকা বুঝি।"

জগদীশ একটু ভাবিলেন। শেষে বলিলেন—"আচ্ছা সতীশ, এর কোনও উপায় হয় না ?"

"কি উপায় ?

"আমার যে সর্ব্বস্ব যায় ভাই। ছেলে পিলে নিয়ে আমি মাথা গুঁজে দাঁড়াব কোথায় ?"—বলিতে বলিতে জগদীশ প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সতীশ বলিল—"কোন রকমে টাকাটা যোগাড়—"

"কোথায় টাকার যোগাড় করব আমি ? কে আমায় টাকা ধার দেবে ? সে উপায়ের কথা বলছিনে ভাই।"

"তবে কি উপায়ের কথা বল্‌ছেন ?"

"কোনও গতিকে, গিরিশের হাতে পায়ে ধরে তাকে রাজি করে, কিছু সময় নেওয়া যায় না কি ?"

"সময় ?"—বলিয়া সতীশ অন্যদিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"তিনি যে শোনেন, এমন ভরসা কম।"

জগদীশ হটাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সতীশের হাতখানি ধরিয়া বলিলেন—"তুমি ভাই যদি একটু বুঝিয়ে বল তাকে আমার হয়ে। সে অসময়ে আমায় টাকা ধার দিয়েছিল সে কথাও ঠিক, বাড়ী জমাজমি আমি তার কাছে বন্ধক রেখেছি তাও ঠিক—সব ত আমি স্বীকারই করছি। তবে এখন আমার বড়ই দুঃসময় যাচ্ছে, দুটো বছর যদি সময় পেতাম তা হলে দেনাটা শোধ করে দিতে পার্ত্তাম।"

সতীশ বলিল—"আহা-আহা—আমায় কেন অপরাধী করেন!—আমায় কেন অপরাধী করেন!—আমার হাত কি বলুন ?"

"তোমার হাত কিছু নেই তা আমি জানি। কিন্তু তুমি তাকে একটু ভাল করে বল্লে—"

"আমি বল্লেই বা তিনি শুন্‌বেন কেন ? তিনি আপনার উপর কি রকম বিরক্ত হয়েছেন, তা কি আপনি জানেন না ?—সুতরাং এ ক্ষেত্রে—আমি বল্লে কইলে যে কিছু হয়, তা ত মনে হয় না। তার চেয়ে, বুঝেছেন বাঁড়ুয্যে মশাই, আপনি এক কায করুন না ?—আপনি নিজে তাঁর কাছে যান। সমস্ত অবস্থা তাঁকে খুলে বলুন।—কিছু ফল হলেও হতে পারে।"

জগদীশ বলিলেন—"শুন্‌বে কি ?"

"চেষ্টা করে দেখুন। না হয়, বলেন ত আমিও বলব। কিম্বা সে সময় নিজে আমি সেখানে উপস্থিত থাক্‌ব।"

জগদীশ কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—"হাঁা ভাই। এইটুকু তুমি আমার জন্যে কর।—কখন যাই বল দেখি ? আজ ওবেলা যাব ?"

সতীশ ভাবিয়া বলিল—"ওবেলা কখন ? বিকেলে ? বিকেলে বোধ হয় তেমন সুবিধে হবে না—লোক জন প্রায়ই থাকে কি না। তার চেয়ে বরঞ্চ সন্ধ্যার পর—এই সাড়ে সাতটা কি আটটা—তিনি যখন সন্ধ্যা আহ্নিক করে জল টল খেয়ে বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন, সেই সময় ভাল। তাঁকে নিরিবিলিতে পাবেন এখন।"

"তুমি কখন যাবে ভায়া ?—তুমি, আগে থাকতে গিয়ে একটু বলে কয়ে রাখ্‌লেই কি ভাল হয় না ?"

"হাঁা, আমি ত যাবই। সন্ধ্যাবেলা ঐ খানেই আমার নেমন্তন্ন আছে কি না। আমি বিকেলবেলাই যাব। আচ্ছা—আমি ভাল করে একটু গড়ে পিটে রাখব।"

"আচ্ছা বেশ। সেই পরামর্শই রইল। জলটা ধরেছে। এখন আমি তবে উঠি ভাই।"

সতীশ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"উঠ্‌বেন ? আচ্ছা—নমস্কার বাঁড়ুয্যে মশাই।"

বন্দোপাধ্যায় তখন মৎস্য ও তরীতরকারীর পুঁটুলিটি তুলিয়া লইয়া, কোনও ক্রমে গৃহে গিয়া পৌঁছিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সতীশের দৌত্য।

দ্বিপ্রহর হইতে বৃষ্টিটা বন্ধ হইয়াছিল, বেলা সাড়ে চারিটা হইতে আকাশে আবার মেঘ-বাহুল্য দৃষ্ট হইতে লাগিল। আকাশের অবস্থা দেখিয়া, সতীশ দত্ত কাঁধে একখানা চাদর ফেলিয়া, ছাতাহস্তে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে পৌঁছিয়া দেখিল, বৈঠকখানায় তাকিয়া হেলান দিয়া তিনি একাকী বসিয়া আছেন। তাঁহার নগ্ন কালো দেহখানি ঘর্ম্ম-সিক্ত—একটা হাত-পাখা লইয়া নিজেকে বাতাস করিতেছেন। সতীশকে দেখিয়া বলিলেন—"কিহে—এস। বস।"

সতীশ বসিয়া বলিল—"উঃ—কি গুমট্‌! বাতাস

মাত্র নেই। প্রাণ যায়। দাদা, এক গ্লাস জল আন্‌তে বলুন না।"

গিরিশ বলিলেন—"বস, ঠাণ্ডা হও। এখনি জলটা খেওনা—এতখানি পথ হেঁটে এলে কিনা!"

সতীশ পাখার জন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিল, কোথাও দেখিতে পাইল না। একখানা ডাক মোড়াই করা 'বঙ্গবাসী' পড়িয়া ছিল, সেখানা তুলিয়া লইয়া বলিল—"এখানা এখনও যে খোলেনও নি।"—বলিয়া সেখানির মোড়ক ছিঁড়িয়া, ভাঁজ খুলিয়া তদ্দ্বারা নিজেকে বাতাস করিতে লাগিল।

মিনিট খানেক পরে গিরিশ হাঁকিলেন—"কেষ্টা—ও কেষ্টা—এ দিকে আয়।"

ভৃত্য কেষ্টা আসিয়া দাঁড়াইলে বলিলেন—"যা বাড়ীর ভেতর থেকে এক গেলাস জল আর রেকাবী করে কিছু জলখাবার নিয়ে আয় বাবুর জন্যে।"

জলখাবার আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়িতে লাগিল। পশ্চাতের খোলা জানালা দিয়া শীতল বায়ুর প্রখর প্রবাহ বহিতে লাগিল।

"আঃ প্রাণটা বাঁচলো" বলিয়া গিরিশ মুখোপাধ্যায় হাতপাখা ফেলিয়া দিলেন, সতীশও 'বঙ্গবাসী' খানা মুড়িয়া গুটাইয়া গিরিশের তাকিয়ার নিম্নে চাপিয়া রাখিল।

একটা রেকাবী করিয়া কয়েক টুক্‌রা আম, পাঁচ ছয় কোয়া কাঁটাল এবং দুইটি কাঁচাগোল্লা আনিয়া কেষ্টা সতীশের সম্মুখে রাখিল। সতীশ প্রথমেই জলের গেলাসটা লইয়া এক নিঃশ্বাসে তাহা নিঃশেষ করিয়া বলিল—"আর এক গেলাস এনে দে বাবা, কেষ্টা।"

গেলাস দিয়া সতীশ জলযোগে মনোনিবেশ করিল। আম্র ভক্ষণ করিতে করিতে বলিল—"খাসা মিষ্টি আম ত দাদা, হুগলি থেকে এনেছেন বুঝি! বোম্বাই?"

"না—ওগুলো মালদহ। বোম্বাই শেষ হয়ে গেছে।"

জলযোগান্তে সতীশ বলিল—"জানালাটা বন্ধ করে দিই, জলের ছাট আসছে।"

গিরিশ বলিল—"না হে—খাসা কদমফুলের গন্ধটি আসছে—বন্ধ কোরোনা।"

সতীশ জানালার দিকে চাহিয়া দেখিল, অদূরে একটি কদম্ব-তরুর শাখাগুলি জলে বাতাসে নৃত্য করিতেছে। বলিল—"ঠিক বলেছেন। ভিজে ভিজে গন্ধটি বড় মোলায়েম হয়ে আসছে। একটা শ্লোক মনে পড়ে গেল।"

"কি শ্লোক বলই না শুনি।"

সতীশ বলিল—"শ্লোকটি হচ্ছে—

মহীমণ্ডলীমণ্ডপীভূত পাথো-
ধরারব্ধহর্ম্যাসু বর্ষাসু সদ্যঃ।
কদম্বে প্রসূনং প্রসূনে মরন্দো
মরন্দে মিলিন্দো মিলিন্দে মদোদ্ভূৎ॥"

গিরিশ বলিলেন—"ওর অর্থ কি?"

সতীশ বলিল—"মহীমণ্ডলী-মণ্ডপীভূত-পাথোধর—অর্থাৎ মেঘটা এই পৃথিবীকে একবারে মণ্ডপীভূত করে ফেলেছে—সমস্ত পৃথিবীটের উপর যেন কালো বর্ণের একটা চাঁদোয়া খাটিয়ে দিয়েছে। সুন্দর বর্ণনাটি নয়?"

গিরিশ বলিলেন—"চমৎকার।"

সতীশ বলিল—"সদ্য বর্ষারম্ভে কি দেখা যাচ্ছে? না, কদম গাছে ফুল ফুটেছে, সে ফুলে মধু ভরে রয়েছে, সে মধু ভ্রমরে পান করছে।"

গিরিশ মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"বেশ বেশ। আরও বর্ষার শ্লোক জান না কি?"

সতীশ বলিল—"সংস্কৃত মহাকবিরা অনেকেই খুব সুন্দর বর্ষা বর্ণনা করে গেছেন। সে সব থাক্—দুই একটা উদ্ভট বলি শুনুন। একজন বলেছেন—

ঘনতরঘনবৃন্দচ্ছাদিতে ব্যোম্নি লোকে
সবিতুরথহিমাংশোঃ সংকথৈব ব্যরংসীৎ।
রজনিদিবসভেদং মন্দবাতাঃ শশংসুঃ
কুমুদকমলগন্ধানাহরন্তঃ ক্রমেণ॥

গিরিশ বলিলেন—"এর মানেটি কি?"

সতীশ বলিল—"ব্যোম কি না আকাশ—ঘনতর ঘনবৃন্দ দ্বারা একবারে আচ্ছাদিত। দুঘণ্টা চার ঘণ্টা নয়, দিনের পর দিন, এই রকম চলছে। আর সে

কি রকম আচ্ছাদিত ? এমন আচ্ছাদিত যে সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেছে, আকাশে এ সময় সূর্য্য আছেন কি চন্দ্র আছেন তা পর্য্যন্ত বোঝবার উপায় নেই। তবে, এটা দিন কি রাত্রি তা নির্ণয় কি করে হবে ?—আচ্ছা বলুন দেখি, কি করে হবে ? সেকালে ত ঘড়ি টড়ি ছিল না ! দিন কি রাত্রি, ও রকম অবস্থায় কি করে বোঝা যাবে বলুন দেখি ?"

গিরিশ হাসিয়া বলিলেন—"তুমিই বল।"

সতীশ বলিল—"কবিই বলে দিয়েছেন। মন্দ মন্দ বায়ু বইছে কিনা—সে বায়ুতে যতক্ষণ কুমুদের গন্ধ আসছে ততক্ষণ রাত্রি, যতক্ষণ কমলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণই দিন।"

গিরিশ বলিলেন—"হ্যা, ঠিক বলেছে।"

সতীশ বলিল—"আর, এইটুকু বলবার জন্যেই কবিকে এই অতিশয়োক্তিটি করতে হয়েছে।"

"কি অতিশয়োক্তি ?"

"এই যে, দিনের পর দিন মেঘে একবারে ত্রিভুবন অন্ধকার হয়ে রয়েছে। যতই মেঘ হোক্, দিনের বেলা কখনও গাঢ় অন্ধকার হতেই পারে না।"

গিরিশ বলিলেন—"ও রকম অন্ধকার হলে মানুষের কাযকর্ম্মই বা চলে কি রকম করে ?"

সতীশ হাসিয়া বলিল—"প্রেমিক প্রেমিকাদের পক্ষে বড় ভাল। কাযকর্ম্মের প্রতি সেকালের কবিদের ততটা লক্ষ্য ছিল না। ভর্ত্তৃহরির একটা শ্লোক আছে,—

অসারেণ ন হর্ম্ম্যতঃ প্রিয়তমৈর্যাতুং বহিঃ শক্যতে
শীতোৎকম্পনিমিত্তমায়তদৃশা গাঢ়ং সমালিঙ্গ্যতে।
জাতৈঃ শীকরশীতলৈশ্চ মরুতো রত্যান্তখেদচ্ছিদো
ধন্যানাং বত দুর্দিনং সুদিনতাং যাতি প্রিয়াসঙ্গমে॥

—এমন যে দুর্দিন, প্রিয়া সঙ্গে থাকলে তাও সুদিন বলে মনে হয়।"

গিরিশ হাসিয়া বলিলেন—"আর, প্রিয়ার বিরহে ?"

সতীশ বলিল—"তার জবাব ত সমস্ত মেঘদূত কাব্যখানাই রয়েছে।"

গিরিশ মুখোপাধ্যায় মেঘদূত পড়েন নাই সুতরাং কথার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া সতীশ বলিল—"আর একটি সুন্দর শ্লোক আছে। একজন নায়ক, তিনি বিদেশে যাচ্ছেন। স্ত্রীর কাছে বিদায় নিতে গিয়ে বলছেন—এখন আমি চল্লাম বটে, কিন্তু বর্ষা পড়তেই আমি নিশ্চয় এসে পৌছব। অর্থাৎ বর্ষাকালে, যখন বিরহ সব চেয়ে বেশী উদ্দাম হয়, তখন কি করে তুমি একাকিনী কাটাবে এ আশঙ্কা করে মনে কষ্ট পেওনা, আমি যেখানেই থাকি, বর্ষা পড়তেই তোমার সঙ্গে এসে মিলিত হব—সে সময় আমি কোথাও থাকব না নিশ্চয় জেনো।—নায়কের মুখে এই কথা শুনেই, নায়িকার নাক দিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো, তাঁর দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে কদম-ফুলের আকার ধারণ করলে, সমস্ত দেহখানি কেতকী অর্থাৎ কেয়াফুলের পাতার মত ফেকাশে হয়ে উঠলো, আর তাঁর চোখ দুটি যেন পয়োদ অর্থাৎ মেঘের মত হয়ে গেল—জল পড়ে আর কি। এইখানেই কবি থেমেছেন, কিন্তু এর ইঙ্গিতটুকু বুঝতে পেরেছেন ত ?"

"কি ইঙ্গিত ? পতি বিদেশে যাচ্ছেন শুনে স্ত্রী কাঁদতে লাগলেন—এই ত ?"

"শুধু কি তাই ? বর্ষাকালে যেমন প্রবল বায়ু বয়ে থাকে, তাঁর নাক দিয়ে তেমনি নিঃশ্বাস পড়তে লাগল ; সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হল—কি রকম ? যেন কদমফুল ফুটেছে ; সমস্ত দেহখানির রঙ হয়ে গেল কেতকীপত্রের মত ; চোখ হয়ে গেল মেঘের মত ; অর্থাৎ বর্ষাকালের সমস্ত লক্ষণ তাঁর শরীরেই প্রকাশ পেতে লাগল। ইঙ্গিত-টুকু হচ্ছে এই—হে প্রিয়তম, তুমি বলছ যে বর্ষাকালে অন্য কোথাও থাকবেনা, আমার কাছেই থাকবে ; তা, এই দেখ, আমার দেহেই ত বর্ষাকাল উপস্থিত, তুমি তবে কি করে আমায় ছেড়ে যাবে ?"

গিরিশ বলিলেন—"বাঃ সুন্দর ভাবটি ত ! শ্লোকটি কি ?"

সতীশ বলিল—"শ্লোকটি হচ্ছে—

যামি প্রেয়সি বারিদাগমদিনে জানীহি মামাগতং
চিন্তাং চেতসি মা বিধেহি কথয়ত্যেবং সবাষ্পে ময়ি।
নিঃশ্বাসৈঃ পবনায়িতং বরতনোরঙ্গৈঃ কদম্বায়িতং
কান্ত্যা কেতকপত্রকায়িতমহো দৃগ্‌ভ্যাং
পয়োদায়িতম্‌ ॥

কেষ্টা ভৃত্য এই সময় কায়স্থের হুঁকায় তামাক সাজিয়া আনিয়া সতীশকে দিল। সতীশ ধূমপান করিতে করিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল—"জলটা কমে আসছে।"

গিরিশ চোখে চশমা আঁটিয়া 'বঙ্গবাসী'খানির ভাঁজ খুলিতে লাগিলেন। সদর পৃষ্ঠায় একটা ঔষধের বিজ্ঞাপনের পানে চাহিয়া বলিলেন—"তোমাদের জগদীশ বাঁড়ুয্যের খবর কি হে? তার জামাইয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল?"

সতীশ বলিল—"ওহো! ভাল কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছেন। ভারি মজা হয়েছে একটা।"

"কি?"

"আজকে, বুঝেছেন, বেলা নটা কি দশটার সময়, ঝম্‌ ঝম্‌ করে জল পড়ছে"—এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া, প্রাতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্তই সতীশ বর্ণনা করিল। শুনিয়া গিরিশ মুখোপাধ্যায় খুব আমোদ অনুভব করিতে লাগিলেন। বলিলেন—"কালকে সমন আসবে বলেছ?"

"বলেছি বৈ কি! সেই কথা শুনেই ত বাছাধনের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল।"

গিরিশ মৃদুহাস্যের সহিত বলিলেন—"কত সময় চায়? দু'বছর?"

"হ্যাঁ।"

গিরিশ বলিলেন—"আব্দার দেখনা! দু'বছর! দু'দিন সময় দেবনা, তা দু'বছর। ঐ বাড়ী, জমিজমা —আর একমাস। তারপর!—জামাই খাওয়াবে?"

সতীশ বলিল—"আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে! নিজে সে কি খায় তার ঠিক নেই—শ্বশুরকে খাওয়াবে! অদৃষ্টে মানুষের কষ্ট থাকলে ঐ রকমই হয়।—একেই বলে, বিনাশকালে বিপরীত-বুদ্ধিঃ। কত সুখ হত—আজ ভাবনা কি ছিল জগদীশ বাঁড়ুয্যের? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা আর কাকে বলে?—রত্ন হাতে পেয়ে ফেলে দেওয়া! একটা সুন্দর শ্লোক মনে পড়ে গেল।"

গিরিশ বলিলেন—"কি শ্লোক?"

সতীশ বলিল—"জঙ্গলে, একটা সিংহ এক হস্তীকে বধ করেছিল। তার মাথার খুলিটা যখন ফেড়ে ফেল্লে, তখন তা থেকে একটা গজমুক্তা বেরিয়ে পড়েছিল। হাতীর লাসটা শেয়াল শকুনিতে খেয়ে ফেলেছে, কি হয়েছে তা জানিনে, মোদ্দা রক্তমাখা সেই গজমুক্তাটি জঙ্গলে পড়ে ছিল। এখন, একজন ভীলের স্ত্রী, সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে, দূর থেকে সেই রক্তমাখা মুক্তাটি দেখে, পাকা কুল পড়ে আছে মনে করে ছুটে এল। কুড়িয়ে নিয়ে, হাতে মেজে দেখ্‌লে সেটা শাদা, কঠিন, কুল নয়। 'আ আমার পোড়া কপাল!'—বলে, সেই মহামূল্য গজমুক্তাটি ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিলে।"

গিরিশ বলিলেন "বটে, বেশ গল্পটি ত! শ্লোকটা কি?"

সতীশ বলিল—"শ্লোকটি হচ্ছে—

সিংহক্ষুণ্ণকরীন্দ্রকুম্ভগলিতং রক্তাক্তমুক্তাফলং
কান্তারে বদরীধিয়া দ্রুতমগাদ্ভিল্লস্য পত্নী মুদা।
পাণিভ্যামবগৃহ্য শুক্লকঠিনং তং বীক্ষ্য দূরে জহা-
বস্থানে পতিতামতীবমহতামেতাদৃশী স্যাদ্গতিঃ ॥"

গিরিশ শুনিয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

এতক্ষণে জলটা ছাড়িয়া, অস্তমান সূর্য্যের শেষ করজালে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়া উঠিল। গিরিশ বলিলেন—"ওহে, 'বঙ্গবাসী' খানা পড় ত, শুনি।"

সতীশ পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া, 'বঙ্গবাসী' খানি খুলিয়া, "নমো গণেশায়" হইতে আরম্ভ করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

পড়িতে পড়িতে, কিয়ংক্ষণ পরে নিম্নলিখিত প্যারাটি আসিল—

"বিলাত হইতে তারের সংবাদ আসিয়াছে, ডার্ব্বি সুইপ্ ঘোড়দৌড়ে মেরিগোল্ড নামক অশ্বটি প্রথম হইয়াছে। ফাইফিনেলা ও কোয়াংস্ অশ্বদ্বয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। অত্রত্য টার্ফ ক্লাবের লটারিতে বোম্বাইবাসিনী এক পার্শী মহিলা প্রথম প্রাইজ পাইয়াছেন। দ্বিতীয় প্রাইজ অষ্ট্রেলিয়ার একজন বণিক ও তৃতীয় প্রাইজ জব্বলপুর ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সাহেব পাইয়াছেন। শুনা যায়, প্রথম প্রাইজের পরিমাণ ছয়লক্ষ টাকা। পার্শী মহিলাটি একজন মহাধনীর কন্যা। জলেই জল বাধে।"

পাঠ শেস করিয়া সতীশ দেখিল, গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের মুখ চক্ষু এক্‌টা বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে। তিনি তাকিয়ায় হেলান দিয়া, ঊর্দ্ধমুখে কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া আছেন। তাঁহার নিঃশ্বাস ঘন ঘন বহিতেছে।

সতীশ বলিল—"দাদা অমন করে রয়েছেন কেন?"

গিরিশ মুখ শিট্‌কাইয়া বলিলেন—"বুকটায় হটাৎ কেমন বেদনা বোধ হল।"

সতীশ তাঁহার কাছে সরিয়া গিয়া তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। বলিল—"কি রকম বেদনা? কাউকে ডাকবো? বেশী কষ্ট হচ্ছে কি?"

গিরিশ বলিলেন—"এক গেলাস জল।"

সতীশ ছুটিয়া নিজে বাড়ীর ভিতর গিয়া জল আনিয়া দিল। তাহা পান করিয়া গিরিশ উঠিয়া বসিলেন। অবনত মস্তক দুই হাতে ধারণ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—"বেদনাটা কি বাড়ছে দাদা?"

গিরিশ বলিলেন—"বুঝতে পারছিনে। আমায় বাড়ীর ভিতর নিয়ে চল। শোব।"

সতীশ দত্ত গিরিশের ডার্ব্বি লটারির টিকিট কেনার কোন কথাই জানিত না। সুতরাং এই ব্যাপারের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না। গিরিশকে ভিতরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিল। পাশে বসিয়া তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

কালাচাঁদ

ইন্দুনিভ বদন তব স্মরিলে কালাচাঁদ হে,
হৃদয় মম সিন্ধু সম উথলে ভাঙ্গি বাঁধ হে;
শুনিলে তব চরিত-চারু পুলকে কাঁপে অঙ্গ,
নৃত্যে রত চিত্ত চাহে লভিতে তব সঙ্গ;
শুনিলে তব মুরলী-রব, শ্যামল-দেহ চক্ষে
হেরিতে চাহে, ধরিতে চাহে করিতে চাহে বক্ষে।
গোপীকা-বুকে বিহরি সুখে করিলে মধুবৃষ্টি,
এ হৃদে মম সে মধুসম করহে মধু-সৃষ্টি।
হৃদয়-স্বামি, দেখেছি আমি যতটা চলে দৃষ্টি—
সৃষ্টি তত মিষ্টি নহে, তুমি গো অতি মিষ্টি।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পুরাতন প্রসঙ্গ

(নূতন কল্প)

(৩)

২৬ এ ফাল্গুন, ১৩২২

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনারা ১৮৭২ সালের নবেম্বর মাসে নীলদর্পণের রিহার্সাল করিতে লাগিলেন ; আপনি সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা লইলেন ; আর কে কি ভূমিকা লইলেন ? নীলদর্পণের প্রথম অভিনেতৃ-দলের নাম কলিকাতার ষ্টেজের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকা উচিত।' অমৃত বাবু বলিলেন,—

"অর্দ্ধেন্দু ...	উড্ সাহেব, সাবিত্রী, গোলোক বসু, একজন চাষা রায়ৎ।
নগেন্দ্র ...	নবীনমাধব।
কিরণ (নগেন্দ্রের ভাই) ...	বিন্দুমাধব (নবীনমাধবের ভাই)।
শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	গোপীনাথ দাওয়ান।
মতিলাল সুর ...	রাইচরণ ও তোরাপ। (মতিলালের মত তোরাপ আর কেহ কখনও সাজিতে পারিল না।)
মহেন্দ্রলাল বসু ...	পদী ময়রাণী।
শশিভূষণ দাস (বিসাড়ী) ...	আমিন, পণ্ডিতমশাই, কবিরাজ।
পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ...	লাঠিয়াল। (ইনি বেশী দিন অভিনয় করেন নাই।)
গোপালচন্দ্র দাস ...	আদুরী, একজন রায়ৎ।
যদুনাথ ভট্টাচার্য্য ...	একজন রায়ৎ।
অবিনাশচন্দ্র কর ...	রোগ্ সাহেব। (এই একটী পার্ট্ সে প্লে করিল ; তেমনটি আর কেহ পারিল না। আমিও রোগ্ সাহেবের পার্ট্ প্লে করিয়াছি,কিন্তু অবিনাশের মত হয় নাই।)
গোলোক চট্টোপাধ্যায় ...	খালাসী।
ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী ...	সরলা। (চমৎকার প্লে করিতেন)
অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (ওরফে বেলবাবু বা কাপ্তেন বেল)	... ক্ষেত্রমণি।
তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় ...	রেবতী। (এমন চমৎকার রেবতী আর কেহ কখনও হইতে পারিল না। বেচারা শেষটা পাগল হইয়া মারা গেল।
আমি ...	সৈরিন্ধ্রী।
ধর্ম্মদাস সুর ও যোগেন্দ্রনাথ মিত্র (এঞ্জিনীয়ার)	... ষ্টেজের অধ্যক্ষ। (ইঁহারাই পরে ষ্টার থিয়েটরের বাড়ী তৈয়ারি করিয়া দেন।)
কার্ত্তিকচন্দ্র পাল ...	Dresser।
নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	কমিটির সেক্রেটারী।
বেণীমাধব মিত্র ...	কমিটির প্রেসিডেণ্ট। ইনি যে থিয়েটরের বিষয় বেশী কিছু বুঝিতেন, তাহা নহে। আপিসে চাকরি করিতেন, বয়সে বড়, মুরুব্বি হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলেন। তাঁহাকে থিয়েটারে সাজিবার জন্য কখনও অনুরোধ করা হয় নাই।)

"খুব উৎসাহের সহিত আমাদের রিহার্সাল চলিতে লাগিল। আমি তখন থিয়েটারে গা ঢালিয়া দিয়াছি। একদিন রসিক নিয়োগীর ঘাটের বৈঠকখানায় আমি একাকী বসিয়া আছি এমন সময়ে তিনটী ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন আমাদের দলের আর সকলে সেখানে উপস্থিত ছিল না, কেন এখন আমার ঠিক মনে নাই। বোধ হয় সেদিন তাঁহারা মেটে বুরুজের নবাবের পশুশালা দেখিতে গিয়াছিলেন; আমি একাকী তামাকু সেবন করিতেছিলাম। আগন্তুকদিগকে দেখিয়া আমি সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিলাম। একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ভুবন নিয়োগীর এই বাড়ীতে থিয়েটারের রিহার্সাল হয়?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'তুমি কি সেই দলের একজন প্লেয়ার?'

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়িলাম।

'আজ তোমরা এখনও রিহার্সাল আরম্ভ কর নাই কেন?'

'আজ আমাদের রিহার্সাল বন্ধ; আজ আমি ছাড়া আর কেউ এখানে উপস্থিত নাই।'

"তাই ত; আমরা এলুম তোমাদের রিহার্সাল দেখতে—'

'আসুন, ভেতরে বসুন, তামাক খান।'

'থাক্, আর তামাক খাব না। আমাদের তুমি চিনতে পার্‌চ না। আমার নাম শিশিরকুমার ঘোষ,ইনি অক্ষয়চন্দ্র সরকার, আর ইনি প্যারিমোহন রায়।'

আমি তৎক্ষণাৎ শিশিরবাবুর পদধূলি লইলাম, অক্ষয় বাবুকে ও প্যারিমোহন বাবুকে নমস্কার করিলাম।

শিশিরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার নাম কি?'

'অমৃতলাল বসু।'

'তুমি কি সাজবে?'

'সৈরিন্ধ্রী।'

'আচ্ছা, সমস্ত পালাটা না হয় আজ নাই হল, তুমি সৈরিন্ধ্রীর পার্টটা একটু আমাদের শোনাবে?'

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া সম্মত হইলাম। আমি জানিতাম চুঁচুড়ায় অক্ষয় সরকারের দল লীলাবতীর রিহার্সাল দিয়াছিলেন; তখন আমাদের সখের দলে 'লীলাবতী' হইয়াছিল অক্ষয়বাবুর নাম শুনিয়াই আমার মনে প্রতিদ্বন্দ্বি ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল; এ সময়ে আমাদের হাতের তাস কি দেখান উচিত? যাহা হউক, আমি শিশিরবাবুকে বলিলাম—'আমি আপনার লেখা পড়েছি, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি খুব বেশী, আপনি যখন বল্‌চেন তখন আমি আমার পার্ট একটু আপনাকে শোনাতে পারি।'

আমি নবীনমাধবের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে সৈরিন্ধ্রীর অভিনয় করিয়া দেখাইলাম। তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

"সেদিন ফিরিয়া যাইবার সময় শিশিরবাবু আমাকে বলিলেন,—'এখন আমি বৌবাজারে হিদারাম ব্যানার্জির গলিতে থাকি; তুমি আমার বাসায় আমার সঙ্গে দেখা কোরো।' তখন হইতেই তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গেল। আমি তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। দেখুন, সেদিন য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে আমি শিশিরবাবুর সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম —'তিনি একজন আস্ত বাঙ্গালী ছিলেন।' এ কথাটা যে কত সত্য তা' আপনারা বোধ হয় আজ কাল উপলব্ধি করিতে পারিবেন না; তিনি দেশের সমস্ত অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া স্বদেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই যে নূতন থিয়েটার খোলা হইল, যখন তিনি শুনিলেন ইহার নাম ন্যাশনাল * থিয়েটার দেওয়া হইয়াছে, তখনই তিনি ভাবিলেন,—ইহার ভিতর দিয়া কি বাঙ্গালীজাতির বিশিষ্ট ভাবগুলিকে ফুটাইয়া তোলা যাইবে না? এই যে democratic ষ্টেজ, ইহা ত আর ধনী গৃহস্থের খেয়ালের উপর নির্ভর করিবে না; বাঙ্গা-

* কেহ কেহ ইহার নাম Calcutta National করিবার কথা তুলিয়াছেন। অমৃতবাবু আপত্তি করিয়া বলিলেন— Calcutta এবং National এ দুটো শব্দের সামঞ্জস্য হয় না; Calcutta শব্দটা বাদ দেওয়া হইল।—লেখক।

লীর সর্ব্বাঙ্গীন ভাবপুষ্টির সাহায্য করিবে না কেন? ইহারা ত সাহস করিয়া 'নীলদর্পণ' লইয়া আরম্ভ করিয়াছে। দেশের মর্ম্মস্থান হইতে যে বেদনা গুমরিয়া গুমরিয়া এতদিনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যাহার সহিত সমবেদনার জন্য লং সাহেবের কারাবাস হইল, সেই বেদনা ত এই ছোকরাদের বুকে বাজিয়াছে। ইহারা যদি সদ্বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে ইহাদের নিকট হইতে ভবিষ্যতে বঙ্গদেশ অনেক আশা করিতে পারে।...কিছু দিন পরে শিশির বাবু আমাদের থিয়েটরের একজন ডাইরেক্টর হইলেন।

"এখন যে বাড়ীতে শিশিরবাবুর ছেলেরা বাস করিতেছেন, ঐ বাড়ী আমরা শিশিরবাবুর জন্য ভাড়া করিয়া দিই। তিনি আমাদের পল্লিতে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কারণ আমাদের নিকটে থাকিতে পারিলে তাহার আহ্লাদের পারসীমা থাকিত না। অমৃতবাজার পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা যাহাতে বর্দ্ধিত হয় তজ্জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কাগজ অল্পদিনের মধ্যেই নিজগুণে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইল। পত্রিকার কাজে আমি যে কিয়ৎ পরিমাণেও নিজেকে নিয়োজিত করিতে পারিয়াছিলাম তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়া গেলাম। আমার চিত্তবৃত্তি উদ্বোধনের জন্য অমৃতবাজার পত্রিকার নিকটে আমি কত ঋণী তাহা কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারি নাই। কোনও প্রকারে যে সে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভবপর তাহা তখন মনেই হইত না। বরং শিশির বাবুর সংস্রবে থাকিয়া একটা মানুষ হইয়া উঠিতে পারিব এই আশা করিতে লাগিলাম।

"শিশির বাবু আমাদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন; মনোমোহন বসু ও নবগোপাল মিত্র প্রথম হইতেই আমাদের সঙ্গে কাজ করিতে আনন্দবোধ করিতেন। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় ভাই দেবেন্দ্রনাথ আমাদের থিয়েটরের অন্যতম ডাইরেক্টর ছিলেন। গিরীশ বাবুও ডাইরেক্টর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু গিরীশ বাবুর অভিমান তিরোহিত হইবার পূর্ব্বেই আমরা পব্লিক থিয়েটর খুলিয়া অভিনয় আরম্ভ করিয়াছিলাম।

"নবেম্বর মাসে আমাদের রিহার্শাল চলিতে লাগিল। অর্দ্ধেন্দু ছিলেন আমাদের General master, কিন্তু সব বিষয়েই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন নগেন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার মত organiser বাঙ্গালীর মধ্যে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। নিমাই চরণ সান্নালদের প্রকাণ্ড অট্টালিকার * বহির্ব্বাটীর নীচেটা ভাড়া করা হইল; চল্লিশ টাকা মাসিক ভাড়া স্থির হইল। মহাশয়, তখন আমরা চল্লিশ টাকা ভাড়া দিয়া যে অংশটুকু পাইয়াছিলাম, এখন তাহার চল্লিশ টাকা ম্যুনিসিপ্যাল টেক্স দিতে হয়। সেই বাড়ীতে আমাদের ষ্টেজ হইবে। আব্দুল মিস্ত্রীকে লইয়া ষ্টেজ তৈয়ারি করিতে বসিয়া গেলাম, কাজ বড় ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। ধর্ম্মদাস না থাকিলে সুব্যবস্থা হইবে না; কিন্তু সে ত সমস্ত দিন আমাদের কম্বুলিয়াটোলার স্কুলে মাষ্টারি করিয়া বেলা চারটার সময় অব্যাহতি পাইত; তাহারই কথা অনুযায়ী ষ্টেজ গঠিত হইতেছিল। গতিক দেখিয়া আমি তাহাকে বলিলাম,—'দেখ, এক কায করা যাক্; তোমার বদলে আমি স্কুলে পড়াব; মাসকাবারে তোমার পুরো মাইনে তোমার হাতে দোব; তুমি সমস্ত দিন ষ্টেজ নির্ম্মাণে আব্দুলকে খাটাও।' হেড্‌মাষ্টার আমাকে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। আমি ঐ বিদ্যালয়েই তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ছিলাম। স্কুলের ছুটি হইলে পর আমি ধর্ম্মদাসের সঙ্গে যোগ দিয়া রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত কাজ করিতে লাগিলাম। কাজ যখন অনেকটা অগ্রসর হইল, আমরা স্থির করিলাম যে, ৭ই ডিসেম্বর রাত্রিতে আমাদের প্রথম অভিনয় এই ষ্টেজে করিতে হইবে। ধর্ম্মদাস ষ্টেজ করিয়া দিলেন; নোটিস ও টিকিট ছাপান এবং গ্যাস-ব্যবস্থার ভার নগেন্দ্রের উপর ন্যস্ত হইল।

"সহরের গণ্যমান্য ভদ্রলোকেরা, আমাদের কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইল মাঝে মাঝে দেখিতে আসিতেন;

* যোড়াসাঁকোয় ঘড়ি-ওয়ালা বাড়ীটী।

প্রায়ই কাহারও মুখ হইতে আশ্বাস-বাণী শুনিতে পাওয়া যাইত না, বরঞ্চ অনেক বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছিল। পয়সা কড়ি নাই, মুরুব্বি নাই, অথচ এতবড় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা গিয়াছে, যেমন করিয়াই হউক ইহা সুসম্পন্ন করিতে হইবে। নগেন্দ্র ষ্ট্যান্‌হোপ প্রেস হইতে থিয়েটারের নোটিস মুদ্রিত করিয়া আনিল। তিন শ্রেণীর ব্যবস্থা করা হইল,—দুই টাকার, এক টাকার ও আট আনার। প্রথম শ্রেণীর জন্য জানবাজার হইতে চেয়ার ভাড়া করিয়া আনা হইল; দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য বাঁশের খুঁটির উপর তক্তা দিয়া এক রকম বেঞ্চি করা হইল; তৃতীয় শ্রেণীর জন্য দালানের সিঁড়ির উপর ও রকে বসিবার আসন করিয়া দেওয়া হইল।

"৭ই ডিসেম্বর, শনিবার ১৮৭২ খৃঃঅব্দ বাঙ্গালার পাব্‌লিক্ ষ্টেজের একটী স্মরণীয় দিন। অপরাহ্নকালেও আমাদের আয়োজন করা অনেক বাকী ছিল। অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া গ্যাস লাগাইয়া দিবার জন্য গৌরমোহন ধরকে রাজী করান হইল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে গ্যাস বসান হইল। সন্ধ্যার পর খবর আসিল যে অবিনাশ কর জ্বরে পড়িয়াছে, রোগ সাহেব সাজিবে কে? তাহার কাছে তৎক্ষণাৎ লোক পাঠান হইল; সে বলিল—'যে রকম করিয়াই হউক আমি প্লে করিব।' পাল্কী চড়িয়া সে আসিল।

"একটী জানালায় টিকিট বিক্রয় করা হইয়াছিল। দলে দলে দর্শক আসিতে লাগিল। এত ভিড় হইবে আমরা কখনও কল্পনা করিতে পারি নাই। সকলে টিকিট পাইল না। জাব্বা-জোব্বা-পরা ভদ্রলোকেরা চেয়ারগুলি দখল করিয়া বসিলেন। অভিনয় আরম্ভ হইল। গোলোক বোস ও উড্ সাহেব রূপে প্রথম দুই দৃশ্যে অর্দ্ধেন্দু দর্শকমণ্ডলীর মন অধিকার করিয়া বসিলেন।

"করতালি-ধ্বনিতে বৃহৎ অট্টালিকা কম্পিত হইতে লাগিল। যথাসময়ে তৃতীয় দৃশ্যে 'সীন' উঠিল; আমি সৈরিন্ধ্রী বেশে ষ্টেজের উপরে উপবিষ্ট। চাহিয়া দেখি, আমার গুরুস্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক সম্মুখে বসিয়া আছেন। মুহূর্ত্তের জন্য আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল; আমি যেন তখন সমাজচ্যুত, জাতিচ্যুত, ধর্ম্মচ্যুত হইয়া আমার ব্যর্থ জীবনের সমস্ত লজ্জার ভার শিরে বহন করিয়া আমার গুরুজনদিগের সম্মুখে নারীবেশে উপবিষ্ট হইয়াছি; যেন মনে হইল, টিকিট বেচিয়া পাব্‌লিক্ ষ্টেজে অভিনয় করিয়া আমি আমার সমাজকে, স্বদেশকে, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে আজ যে লজ্জা দিতেছি তাহার একমাত্র শাস্তি—বহিস্করণ। আমার তখনকার মনের ভাব আজ আপনারা বুঝিতে পারিবেন না। তখন সমাজ ছিল, সমাজ-বন্ধন ছিল, সমাজ-দ্রোহিতার শাস্তি ছিল। মুহূর্ত্তের জন্য আমার মাথা ঘুরিয়া গেল; পরক্ষণেই ভাবিলাম, এ যা' হ'বার তা'ত হ'ল; এখন যদি ভাল করিয়া প্লে করিতে না পারি, তাহা হইলে গঞ্জনা লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না।—কায়মনোবাক্যে নীলদর্পণের সৈরিন্ধ্রী হইলাম। বাহবা ধ্বনির তালে তালে 'সীন' পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

"আজ আমি একটুও অতিরঞ্জিত করিয়া আপনাকে বলিতেছি না। প্রত্যেক অ্যাক্টর যেন নিপুণ শিল্পীর মত দীনবন্ধুর নীলদর্পণকে নিজের মনের মত করিয়া ষ্টেজের উপর গড়িয়া তুলিল। কোন অভিনেতাকে বিশেষভাবে সুখ্যাতি করিব জানি না। বলিষ্ট দীর্ঘকায় সুপুরুষ নগেন্দ্রনাথকে নবীনমাধবের ভূমিকায় যেমন মানাইয়াছিল, তেমন নবীনমাধব আর জীবনে দেখি নাই। অনন্য-সাধারণ রূপগুণ সম্পন্ন মহেন্দ্র বসু পদীময়রানীর ভূমিকায় অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ক্ষেত্র গাঙ্গুলীর মত সরলা কোনও স্ত্রীলোক কখনও সাজিতে পারে নাই। ক্ষেত্রমণির, রেবতীর, সরলার, সাবিত্রীর ও সৈরিন্ধ্রীর বিচিত্র রোদনধ্বনি বাঙ্গালীর বিভিন্ন সমাজ-স্তরের বিভিন্ন বয়সের রমণীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ সুস্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিল। পর সপ্তাহে অমৃতবাজার পত্রিকা সৈরিন্ধ্রীর সমালোচনা করিয়া লিখিলেন—'তাহার রোদনস্বর অপূর্ব্ব বলিতে হইবে।'

(৫৭২ পৃষ্ঠার সম্মুখে)



গেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



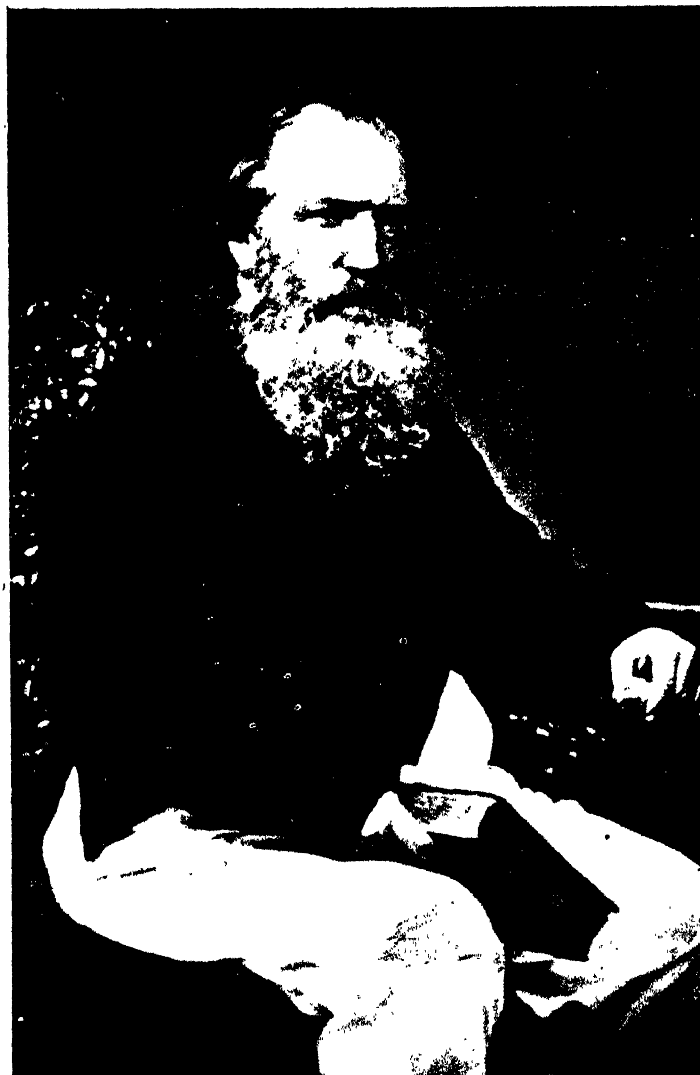
৺মহেন্দ্রলাল বসু



৺অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী



৺শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের বাগবাজারস্থ বাস-ভবন



পরলোকগত পাদরী লঙ সাহেব

"রাত্রি বারটার সময় থিয়েটর ভাঙ্গিয়া গেল। লোকের মুখে সুখ্যাতি আর ধরে না। আবার শনিবারে নীলদর্পণ অভিনয় করা হইল। আর একদিন একটী ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন—'ওহে, গিরীশ ঘোষ তোমাদের নামে একটা গান বেঁধেছে, তোমাদের খুব ঠাট্টা করেছে।' আমরা বলিলাম, 'বটে, কই সে গান, দেখি।' আমাদের গালাগালির গানটী পড়িয়া আমাদের এত ভাল লাগিল যে আমি বলিলাম,—"ওহে, চমৎকার গান; এস, গাওয়া যাক্। আমরা সকলে গান ধরিলাম,—

লুপ্তবেণী বইছে তেরোধার।
তাতে পূর্ণ অর্দ্ধ-ইন্দু কিরণ সিঁদূর মাখা
মতির হার॥
নগ হ'তে ধারা ধায়,
সরস্বতী ক্ষীণকায়,
বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভা পায়;—
শিব শম্ভুসুত মহেন্দ্রাদি যদুপতি অবতার॥
কিবা ধর্ম্মক্ষেত্র স্থান,
অলক্ষেতে বিষ্ণু করে গান,
অবিনাশী মুনি ঋষি কর্‌ছে বসে ধ্যান;—
সবাই মিলে ডেকে বলে 'দীনবন্ধু' কর পার॥
কিবা বালুময় বেলা,
পালে পালে রেতের বেলা,
ভুবনমোহন চরে করে গোপালে খেলা;—
মিলে যত চাষা, কোরে আশা, নীলের
গোড়ায় দিচ্চে সার॥
কলঙ্কিত শশী হরষে, অমৃত বরষে,
বুঝি বা দিনের গৌরব যায় খসে,
স্থানমাহাত্ম্যে হাড়ি শুঁড়ি পয়সা দে
দেখে বাহার॥

গানটির ব্যাখ্যা এই—

লুপ্তবেণী—বেণী মিত্র; অভিনয় করিতেন না, অথচ কমিটির মাথার উপরে প্রতিষ্ঠিত। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী-সঙ্গম।

তেরোধার—ত্রিধারা।

পূর্ণ—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।

অর্দ্ধ ইন্দু—অর্দ্ধেন্দু।

কিরণ—কিরণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মতি—মতিলাল সুর।

নগ হতে ধারা ধায়—বাস্তবিক নগেন্দ্রই organiser ছিল।

সরস্বতী ক্ষীণকায়—মূর্খ।

বিগ্রহ—একটা মন্দ গালাগাল। আবার অন্যপক্ষে ত্রিধারা-সঙ্গমে দেবমূর্ত্তি।

ধর্ম্মক্ষেত্র স্থান—ধর্ম্মদাস ও ক্ষেত্রমোহন ষ্টেজ তৈয়ার করিয়াছিল।

বিষ্ণু—ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক,; নেপথ্যে গান করিতেন।

অবিনাশী—অবিনাশচন্দ্র কর।

ভুবনমোহন চরে—গঙ্গাতীরে ভুবনমোহন নিয়োগীর বৈঠকখানা বাটীতে।

চাষা—অভিনেতৃদলের মধ্যে অনেকগুলি সদ্গোপ ছিলেন।

দীনবন্ধু—নীলদর্পণ রচয়িতা।

পালে পালে—পালপদবীধারিগণ।

শশী—শশিভূষণ দাস।

অমৃত—অমৃতলাল বসু।

"গিরীশবাবুর এই গানটী আমরা সকলে মিলিয়া মহানন্দে গাইলাম। তাহার ফলে তাঁহার মনে ভাবান্তর হইল; তিনি বোধ হয় আমাদের উপর কতকটা প্রসন্ন হইলেন। কিন্তু সেই সময়ে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় আমাদের অভিনয়ের একটা বিদ্রূপপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইল। লোকে বলিল, নিশ্চয়ই ঐ চিঠিখানা গিরীশ বাবু লিখিয়াছেন। দু' এক ছত্র আমার মনে আছে,—Up goes the red rag; and appears in view the rickety stage with its repulsive

hangings ইত্যাদি। সৈরিন্ধ্রীর বিশ্রী ওষ্ঠবিকৃতির (Sairindhri with her upper lips curved) উল্লেখ উক্ত পত্রে ছিল। কিন্তু গিরীশবাবুর অভিমান বেশী দিন টিকিল না। ১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে তিনি আমাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। ইতিমধ্যে আমরা 'জামাই বারিক' 'নবীন তপস্বিনী' প্রভৃতি অভিনয় করিয়া ফেলিয়াছিলাম। নবীনতপস্বিনীর জলধর-ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দু শত্রু মিত্রের হৃদয় জয় করিয়াছিল।

"কেবলমাত্র 'নীলদর্পণ' নাটকখানি লইয়া আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। সুধু একখানা নাটক কতদিন লোকের ভাল লাগিতে পারে? নীলদর্পণ দুই রাত্রি অভিনীত হইবার পরই আমরা 'জামাই বারিকে'র রিহার্সাল আরম্ভ করিয়া দিলাম। থিয়েটরের প্ল্যাকার্ড আমরা এবার ইংলিশম্যান পত্রিকার প্রেস হইতে মুদ্রিত করিয়া লইতাম।

"ক্রমে ক্রমে আমাদের সাহস ও উৎসাহ বাড়িয়া গেল। একে একে দীনবন্ধু মিত্রের সমস্ত নাটক অভিনয় করিলাম। এক এক সপ্তাহে এক এক নূতন বই প্লে করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। একখানি মাত্র বই লইয়া আমরা থিয়েটর আরম্ভ করিয়াছিলাম। মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' ও 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা', শিশির বাবুর 'নয়শোরুপেয়া' ও পণ্ডিত রামনারায়ণের 'নবনাটক' ও 'মনমোহন বসুর' প্রণয়পরীক্ষাও ঐ বাড়ীর ষ্টেজে দেখান গেল। কৃষ্ণকুমারীতে গিরীশ বাবু নামিলেন। ১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনীত হইল।*

ভীম সিংহ ... গিরীশচন্দ্র ঘোষ।
বলেন্দ্র সিং ... নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ধনদাস ... অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি।
জগৎ সিং ... কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
মন্ত্রী ... গোপালচন্দ্র দাস।
কৃষ্ণকুমারী ... ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী
রাণী ... মহেন্দ্রলাল বসু
বিলাসবতী ... বেলবাবু
মদনিকা ... আমি।

"একটী গান গাহিবার জন্য নট আবশ্যক ছিল। আমরা মাসিক বেতন চল্লিশ টাকা ধার্য্য করিয়া হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করিলাম। বঙ্গের সাধারণ নাট্যশালায় ইনিই প্রথম ও একমাত্র বেতনভোগী। তিনি পাথুরিয়া ঘাটার ঠাকুর বাড়ীতে পূর্ব্বে অভিনয় করিতেন। তিনি কেবল ফুটলাইটের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া গোড়াতেই একটি গান গাহিয়া যাইবেন। গানের অংশ খর্ব্ব করিয়া অ্যাক্‌টিংকে বড় করিয়া তুলিব ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের দেশী যাত্রায় গানই প্রধান, এই জন্য যাত্রা 'শুনিতে' হয়; থিয়েটারে অঙ্গভঙ্গী অর্থাৎ 'অ্যাক্‌টিং' প্রধান, এই জন্য থিয়েটার 'দেখিতে' হয়। নট ও অ্যাক্টর মূলতঃ একই অর্থবোধক। নট নৃত্য করিবেন; এই যে নৃত্য করা, ইহার অর্থ কেবল মাত্র dancing নহে; তিনি বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীদ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিবেন; এই জন্য ইংরাজিতে dancingকে poetry of motion বলে। তাঁহার মুখে যদি কথা বসাইয়া দেওয়া যায়, সেই কথা তাঁহার ভাবব্যঞ্জনার সহায়তা করিবে মাত্র। অ্যাক্টরও প্রধানতঃ অঙ্গভঙ্গি দ্বারাই আত্মপ্রকাশ করিবেন। দেখুন, সঙ্গীতের সুরই প্রধান; শব্দগুলি মনের ভাব দশজনকে বুঝাইবার জন্য সহায়ক মাত্র। যাত্রার অনেক উৎকর্ষ আমাদের দেশে হইয়াছিল, কিন্তু এমন দাঁড়াইয়া গেল, যে বক্তৃতার মধ্যে যেই শুনা যাইত 'আহা সখি, সে কেমন? প্রকাশ করিয়া বল'—অমনি ছেলের পল্টন গান ধরিয়া দিত! ঐ 'প্রকাশ করিয়া বল' শুনিলেই সকলে অস্থির হইয়া উঠিত। কিন্তু সমজদার শ্রোতা অস্থির হইতেন না। কারণ গানের ভিতর দিয়াই ত

* 'গিরীশবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী'তে দেখিতে পাই 'গিরীশ বাবু আপনার নাম প্রকাশে অসম্মত হওয়ায় কৃষ্ণকুমারী নাটকের হ্যাণ্ডবিলে এইরূপ লিখিত হইল—A distinguished amateur.'

(৫৭৫ পৃষ্ঠার সম্মুখে



স্বর্গীয় রাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর

যাত্রা 'প্রকাশ করিয়া' বলিবে ; গান বন্ধ করিয়া দিলে তাহার সমস্তই অব্যক্ত রহিয়া গেল। থিয়েটর কিন্তু গানকে ছোট করিয়া দিল ; অ্যাক্‌টিংই ড্রামার স্বধর্ম্ম। তাই আমরা কেবল মাত্র একটি গানের ব্যবস্থা করিলাম।

অনেক বাঙ্গালী ও ইংরাজ ভদ্রলোক আমাদিগকে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিলেন। ৺উপেন্দ্রমোহন ঠাকুরের কথায় আমরা চার টাকার একটি নূতন শ্রেণী খুলিলাম। বলাইচাঁদ মল্লিক আসিতেন। ডাক্তার হন্টার (পরে স্যর উইলিয়ম হন্টার) ও মেজর বেয়ারিং (এখন লর্ড ক্রোমার) আসিতেন ত বটেই ; অনেক সময়ে আমাদিগকে সুপরামর্শও দিতেন। শিশির বাবুর 'নয়শো রুপেয়া' অভিনয় করিতে গিয়া আমরা কিছু বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। তখন আমরা স্বাধীনভাবে কোন অংশ পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন করিতাম না ; গ্রন্থ-রচয়িতার সঙ্কেতানুযায়ী কাজ করিতাম। একস্থানে ছিল 'চুম্বন'। আমার মনে একটু খট্‌কা লাগিল। ডাক্তার হন্টারকে ভিতরে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এটা পাব্‌লিক্ ষ্টেজে দেখান উচিত কি না ? তিনি বলিলেন—'তোমাদের সমাজে উচিত কি না বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের ষ্টেজে স্ত্রী পুরুষে অভিনয় করে, সেখানে ওটা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। পুরুষ এখানে নারী সাজিয়াছে ; বোধ হয় এস্থলে উহা ভাল হইবে না। তোমরা বাদ দিয়া যাও।' ডাক্তার হন্টার তাঁহার আসনে গিয়া বসিলেন। আমরাও তাঁহার পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিলাম।

"নীলদর্পণ অভিনীত হইবার সময় একরাত্রিতে পুলিসের ডেপুটি কমিশনার জাইল্‌স্ সাহেব আসিয়াছেন শুনিয়া অনেকে মনে করিল যে তিনি দু' চার জনকে ধরিয়া লইয়া যাইবেন। তাহাতে কেহই দমিয়া গেল না ; বরং সকলেরই ফূর্ত্তি বাড়িয়া গেল। তোরাপ-বেশে মতিলাল আস্ফালন করিয়া বলিল—'ধরে নিয়ে যায় যাবে ; আমি এই লুঙ্গি পরেই যাব।' পুলিস সাহেব যখন শুনিলেন যে এই রকম ধারণা দাঁড়াইয়াছে, তিনি হাসিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, 'দীনবন্ধুবাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল ; তাই আমি তাঁহার এই উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয় দেখিতে আসিয়াছি। আপনারা আর কিছু মনে করিতেছেন কেন ?'

"এতদিন পরে নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ সম্পাদিত মাসিক পত্রিকায় আমার স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইতেছে ; ইহাতে আমি যথেষ্ট গৌরব ও আনন্দ বোধ করিতেছি। নাটোরের রাজবংশের সহিত এই 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের সময়ে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। রাজা চন্দ্রনাথের মত সহৃদয় বন্ধু আমাদের আর কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের বাঙ্গালী Attache বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্বে এবং পরে আর কেহ হয়েন নাই। বড় লাট নর্থব্রুক বাহাদুর বারাকপুরে যাইবার সময়ে মাঝে মাঝে তাঁহাকে নিজের গাড়িতে লইয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি অম্লানবদনে আমাদের থিয়েটরের গ্রীণরুমে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে পোষাক পরাইয়া দিতেন। হয় ত তাড়াতাড়ি নারীবেশ পরিত্যাগ করিয়া পুরুষবেশে রঙ্গমঞ্চে দেখা দিতে হইবে ; রাজা চন্দ্রনাথ অসঙ্কোচে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া অভিনেতার পায়ের মোজা খুলিয়া দিতেন। আজ ভক্তিপূর্ণ-প্রাণে তাঁহার কথা স্মরণ করিতেছি।"

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

শিরোমণির তীর্থযাত্রা *

(নক্সা)

পূর্ব্বকথা।

অনেকদিন পূর্ব্বে এক সময় একটা প্রচলিত কথা কলিকাতা অঞ্চলের লোকের মুখে শুনা যাইত যে, "বল্লালসেন, উইলসেন আর কেশবসেন, এই তিন সেনই দেশের জাত মজালে।" বল্লালের কৌলিন্য, উইলসেনের হোটেল আর কেশবের ব্রাহ্মসমাজ দেশের সনাতন পদ্ধতির উর্দ্ধগতি সাধন সম্বন্ধে কোন্‌টী কতটুকু সহায়তা করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা চিন্তাশীল পাঠকগণ নিজে নিজে স্থির করিয়া লইবেন। আমি কিন্তু দেখি ইদানীং আর ছুটি "সেন" বা "সন"-এর আবির্ভাবের প্রাচুর্ভাবে আমাদিগের অনেকগুলি লৌকিক আচার তৈলের পরিবর্ত্তে ভিনিগারে সিক্ত হইয়া রসনা-রঞ্জনের উপযুক্ত হইতেছে। সেই ছুটি "সন" হচ্ছেন "ষ্টেশন" আর "কন্সেশন"।

প্রবাস-গত চাকুরে-পতির বিরহিণী যুবতী এখন আর রামবসুর "যখন যায় গো প্রবাসে * বলি-বলি বলা হোল না * * পোড়া লজ্জা এসে কল্লে মানা"; গান শুনিয়া হাতের বাউটি খুলিয়া প্যালা দেন না; আজকালকার সখীরা নিজ নিজ নাইটিঙ্গেল-কণ্ঠেই গান ধরেন ;—

যখন ডেপুটির বেশে সে গো যায় প্রবাসে,
আমি ছুড়োমুড়ি তেড়ে শ্বাশুড়ীরে ছেড়ে
গাড়ী চড়ে বসি পাশে।
আমি সেমিজে কামিজে সে অবধি সই,
সাজিতে শিখেছি তোরে গোপনে লো কই,
ফিস্ ফিস্ ভুলে, কম কণ্ঠতুলে সে অবধি সখি
তারে ডাকি প্রেমভাষে॥
মাসে মাসে টাকা শ্বশুরের পাশে
যায় না লো আর,
সে অবধি সখি, আমি কেশিয়ার
মাহিনার তার,
একান্ন সংসার করিয়ে উচ্ছন্ন
যুগল মিলন সাধন আমার ;—
কাণে-কাণে কই শুন সুভাষিণী
আমি প্রবাসিনী
বেঁধেছি তারে দাস ফাঁসে॥

যাক্—আজ এইটুকু আভাস দিয়াই এ পালা বন্ধ করিতে হইতেছে, কারণ এর পর আরও—"রকম" আছে।

কলিতে প্রাণ অন্নগত, সেই অন্ন আবার ইংরাজের হস্তগত। আমরা ব্যবসা করি ইংরাজের মাল কিনিয়া বাজারে বেচিবার জন্য অথবা বাজারের মাল কিনিয়া ইংরাজকে বেচিবার জন্য। আমরা লেখাপড়া শিখি ইংরাজের আদালতে ওকালতী করিবার জন্য, ইংরাজী ঔষধের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখিবার জন্য, ইংরাজী মালে ইংরাজী ফ্যাসনের ইমারত গড়িবার জন্য, ইংরাজী স্কুলে ইংরাজী পড়াইবার জন্য আর ইংরাজের দ্বারে জজিয়তী হইতে বেলিফগিরি, বড়বাবু হইতে সরকারী পর্য্যন্ত চাকরী বা চাকরীর উমেদারী করিবার জন্য। এই অন্নার্জ্জনের পেষণে পড়িয়া আমরা কাকের অগ্রে ভোজনে বসিতে শিখিয়াছি ;—অর্দ্ধসিদ্ধ অগ্নিমান্দ্যকারী অগ্নিবৎ অন্ন আর তেলজলের ছেঁকা দেওয়া বাসি মাছ; অম্ল উদরে স্বতঃসঞ্চিত হয়, উনানে চড়াইয়া রন্ধনের আর আবশ্যক হয় না। জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে বড়মানুষের বৈঠকখানার কেদারা-কৌচের মত অঙ্গে ঘেরা-টোপ পরিতে শিখিয়াছি ; খেলা-ধূলা, আলাপ-আমোদ, গীতবাদ্য, সমাজিকতা, লৌকিকতা, পারিবারিক প্রীতি সব ভুলিয়া আনন্দকে অন্ধকার কুঠরীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি।

* এই প্রবন্ধের কিয়দংশ মাত্র "বসুমতী" সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইবে।—লেখক।

তবে ইংরাজ রাজার জাত, মনিবি করিতে জানেন, সেই জন্য মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের বন্দোবস্ত আছে। বৎসরে দুইবার অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাবকাশ হয়, এক শারদীয়া দুর্গোৎসবের সময় আর এক শীত-কম্পিত বড়দিনের সময়। এই সময় প্রবাসীরা একবার গৃহবাসে আসিতেন, গৃহবাসীরা দুদিন গৃহে বসিতেন। ক্রমে রেলবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই গৃহ-সম্মিলন সুখ উঠিয়া যাইতেছে। এখন প্রবাসী বাঙালী উপার্জ্জন-স্থলে বসিয়া পারিবারিক মিলন-চিত্র মানস-পটে আঁকিতে আঁকিতে রথের পর হইতে পূজার ছুটীর অপেক্ষায় আর দিন-গণনা করেন না। অলকাবৃতাননা, কুন্দকুসুমদশনা, রসনা-প্রদীপ্ত চিকণ-বসনা হৃদয়াসনা এখন সঙ্গে, কাহার প্রতীক্ষা ব্যাকুল কটাক্ষ আর তাঁহার প্রাণকে স্বদেশে স্বগৃহের দিকে আকৃষ্ট করিবে! কাহার কৃষ্ণোজ্জ্বল কবরীর সৌরভ-গৌরবের স্বপ্ন তাঁহার চঞ্চল মনকে চুম্বকিত করিবে! যে সকল সুহৃদের সঙ্গে মন্ত্রণা বা নিমন্ত্রণ বিনিময়ে বৎসরান্তে একবার মনোমধ্যে বড় সুখোদয় হইত, দু' একবার বাড়ী আসিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা অগ্রেই উড়িয়া গিয়াছেন; কেহ বা ওয়াল্‌টেয়ারে, কেহ বা লঙ্কায়, কেহ বা কিস্কিন্ধ্যায়; সুতরাং ভাবেন তদপেক্ষা 'সস্ত্রীক শকটারোহণে' দার্জ্জিলিং বা মশুরী যাত্রা করা ভাল। যাঁহাদের আয়-ব্যয়ের খাতা একটু সাবধানে ব্যবকলিত করিতে হয়, আবার তাহার উপর হয়তো বিদেশে কয়েকটী অপোগণ্ড দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের তো রেলের টিকিট-ঘর মনে পড়িলেই দিল্ দমিয়া যায়। এদিকে কলিকাতার বাবুরা মনে করেন, "বার মাস তো খেটে মরি; গৃহে গঞ্জনা, আফিসে লাঞ্ছনা, নির্জ্জনে চিন্তার যন্ত্রণা;—যাই না বাইরে কোথাও—দুদিন হাঁফ ছেড়ে আসি।" বাস্তবিকই তাই! গৃহ আমাদের গিয়াছে। ইংরাজেরা যাহাকে "হোম" বলে, সে "হোম" এখন আর অনেকেরই নাই! শিক্ষিত স্বামীর অভিমান—স্ত্রীর সঙ্গে কথা কহিব কি, সে বোঝে কি? আমি যদি বলি ওয়ার্‌সাতে বড়ই লড়াই বেধেছে; প্রেয়সী উত্তর দিবেন—হ্যাঁ ছেলেরা বল্‌ছিল বটে; পরশু রাতে মথুরসার গদিতেও নাকি ভারি দাঙ্গা হয়ে গেছে।—শৈশব হইতে পরীক্ষা ও উপার্জ্জনের জন্য, অশনে বসনে আলাপনে প্রতি কার্য্যে বাহিরের জন্য আমাদের জীবনটা গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। গৃহী-জীবন জানি না, গৃহে জীবন উপভোগ করিতে পারি না। ঠাকুরমার কোলে শুইয়া রূপকথা শোনা হইতে ছেলেপিলে পরিবার লইয়া বসিয়া গল্প-গুজব আমোদ আহ্লাদ করা আমাদের শিক্ষা হয় নাই—অভ্যাস হয় নাই—ও সকলের মাধুর্য্য আস্বাদনের শক্তি যে কেবল শুকাইয়া গিয়াছে তাহা নহে,—বরং অব্যবহারে কলঙ্ক-লিপ্ত হইয়া বিরক্তির কারণ দাঁড়াইয়াছে। গৃহে আমরা একপ্রকার নগ্ন; হয় উপুড় হইয়া পড়িয়া ভাবি, নয়—একখানা বইয়ের উপর চোখ রাখিয়া ঘড়ির দিকে কাণ, কখন আমার বাড়ী-ছাড়া-করা ঘণ্টা-ক'টা বাজ্‌বে। সেই জন্যই একটা অবকাশ আর কিছু খরচ হাতে পাইলেই অনেক লোকে আজকাল ছুটিয়া কোথাও বাহির হইয়া পড়ে! তাহার উপর ইদানীং পরম দয়াল রেল কোম্পানী বাহাদুরগণ কন্সেশন টিকিটের সদাব্রত খোলায় একেবারে সোণায় সোহাগা দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

একবার—সে অনেক দিনের কথা;—সবে মাত্র রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেল খুলিয়াছে, এক ভদ্রলোক কলিকাতা হাটগোলার ঘাটে স্নান করিতেছিলেন। তখন দেশের অন্তর্বাণিজ্য-কার্য্যে নৌকারই অধিক প্রচলন ছিল; চিৎপুর হইতে টাঁকশাল পর্য্যন্ত নৌকার ভিড়ে গঙ্গাস্নান কষ্টসাধ্য ব্যাপার দাঁড়াইত; অন্যদিকে নৌকার অন্তরাল স্নানরতা রমণীগণের আবরু রক্ষা করিত, সন্তরণে অপটু স্নানার্থীদিগের আশঙ্কা দূর করিত, আবার বৃহৎ নৌকার উচ্চ পাটাতন হইতে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সন্তরণশীল বালক-যুবকগণ আনন্দ ও পুরুষার্থ সঞ্চয় করিত। কথিত দিনে ঘাটে ভারী ভিড়। নৌকার গাঁদি লাগিয়াছে; বরিশাল ফরিদপুর অঞ্চলের বড় বড় 'বালাম' নৌকা, ঢাকার পদ্মাতরঙ্গ-ভঙ্গ-কুশল 'কোশ', 'পলোয়ার'; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব পশ্চিমে 'কিস্তি'। কোথাও মাল বোঝাই হইতেছে, কোন কোন নৌকার মাল খালাস হইতেছে, কোনখানি হইতে নোঙর

উঠান হইতেছে। হাঁক-ডাক হুকুম ধমক গান-গল্প গোলমাল। ছত্রিশ রকম বাঙলা, বত্রিশ বাহার হিন্দী আর ড়-কার বহুল দৌড়দার উড়িয়া বুলির মিশ্রণে ভাষার অতি শ্রবণ-রঞ্জন ছেঁচড়া প্রস্তুত হইয়াছে। আবার ভাগীরথীর পূতজলে আবক্ষ নিমজ্জমান ভক্তগণের কণ্ঠোচ্চারিত দেবভাষা-গ্রথিত মধুময় স্তবধ্বনি যেন সেই কলরব-নৈবেদ্য কমলার কোমল চরণে নিবেদন করিয়া দিতেছে। বাণিজ্যের ও পূজার—অর্থার্জ্জনের ও ধর্ম্মার্জ্জনের—ইহকালের ও পরকালের মহামেলা! একখানি প্রকাণ্ড 'কিস্তি'র নোঙর তোলা হইয়া গিয়াছে, দাঁড়ি মাঝিরা যে যার স্থানে প্রস্তুত, এইবার তাহারা নৌকা খুলিয়া বাহির জলে যাইবে। আমাদের সেই ভদ্রলোকটী একটু সদালাপীও বটে আবার অনাবশ্যক বিষয় জানিবার জন্য তাঁহার প্রাণে সতত একটু কৌতূহলেরও সঞ্চার হয়। তিনি আপ্যায়িত করিবার উদ্দেশ্যে মাঝিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"কি মেড়ুয়াবাদী জী—চলে যাতা না কি ?"

মাঝি উত্তর করিল,—"আরে বাবু, কা ক'রে!"

ভদ্র। খালি খালি যাতা হায় ?

মাঝি। আরে হাঁ বাবু, কালীমায়িকি যেইসি মর্‌জি!

ভদ্র। কোথা যাগা ?

একজন দাঁড়ি, তার মুল্লুক 'বনারস' আর মনে মনে বিশ্বাস বাংলা কথা বলিতে তাহার জবান একদম্ দুরস্ত; সে বলিল,—"কা দাদা, তু কি বোল্‌ছে ?"

ভদ্র। বলি যাগা কাঁহা, কোথামে? কোন্ দেশ্‌মে ?

মাঝি। আরে বাবু বহুৎ দূর—কানপুর।

ভদ্র। হামকো নিয়ে যাগা হায় ?

মাঝি। আরে চলো না বাবু; পাঁচঠো রুপেয়া দে দো, মজেমে লে চ'লে।

এখন ভদ্রলোকটী বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় দশ গণ্ডা পয়সা ট্যাঁকে করিয়া আসিয়াছিলেন, স্নানান্তে কিছু বাজার করিয়া ঘরে ফিরিবেন। তখনকার গৃহবাসী বাঙালীর মনে কানপুর এখনকার বিলাতের চেয়ে-ও দূরবর্ত্তী স্থান বলিয়া কল্পিত হইত। আর প্রকৃতপক্ষে কল্পনাটা একেবারে অলীকও নয়। সেই জন্য তিনি আশ্চর্য্য হইলেন যে মাঝি তাহাকে পাঁচটী মাত্র টাকায় কানপুর পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে সম্মত; কিন্তু এদিকে পাঁচ টাকাও সে কালের অনেক টাকা; সেইজন্য "দেখি না, মাঝি বেটা রাজী হয় কি না" মনে করিয়া বলিয়া ফেলিলেন,—"পাঁচ ফাঁচ নেহি, দশগণ্ডা পয়সা সঙ্গেমে হায়, নিয়ে চলো তো লে চলো।"

মাঝি ভাবিল, "খালিই তো যাচ্চি, চলুক না একজন ভদ্রলোক সঙ্গে, দশ আনা দশ আনাই লাভ! পথে কথাবার্ত্তাও চল্‌বে আর বাজার-টাজার করে রান্না বান্নাও তো কর্ব্বে, কোন্ না কিছু কিছু বখ্‌রা পাব।" —সুতরাং সে একেবারে বলিয়া ফেলিল, "তব চলা আও বাবু, দেরী জিন্ করো, জুয়ার পুরা ভয়া।"

"দশ আনায় কানপুর! এ সুযোগও ছাড়ে! এমন আহাম্মক রতন সরকার নয়!"—মনে মনে এইটুকু আলোচনা করিয়াই "দুর্গা শ্রীহরি" বলিয়া সেয়না-কুল-তিলক রতন সরকার মহাশয় সেই ভিজা কাপড়েই গামছা কাঁধে নৌকায় উঠিয়া পড়িলেন। মাঝিরাও "জয় গঙ্গামায়ী" বলিয়া নৌকা বাহিরে লইয়া গিয়া গলুয়ের মুখ উত্তর দিকে ফিরাইয়া পাল তুলিয়া দিল। একে দক্ষিণে বাতাস, তায় জোর-জোয়ার, নৌকা পাল ফুলাইয়া গা দুলাইয়া কল কল জল কাটিয়া ঘুসড়ির ট্যাঁক্ ফিরিয়া কলিকাতার দৃষ্টির বহির্ভূত হইল।

সরকার মহাশয় বলিলেন, "মাঝি জী, তোমাদের চক্‌মকি ফক্‌মকি কোথামে আছে হায় ?"

কোথায় বা রান্নাভাত! কোথায় বা বাজার করা! ঘণ্টা চারেক খোঁজাখুঁজির পর দরজীপাড়ার এক গৃহস্থ-বাড়ীতে দুপুর বেলা কান্নার রোল উঠিল। এ দিকে দুদিনের পথ পার হইয়া মাঝিরা এক জায়গায় নৌকা ভিড়াইল; সরকার মহাশয় একটা ইটখোলা হইতে একটু কাগজ-কলম চাহিয়া লইয়া বাড়ীতে বেয়ারিং পোষ্টে পত্র লিখিলেন—"সস্তায় কিস্তি পাইয়া

কানপুর যাত্রা করিলাম কোন চিন্তা করিবা না ইতি।” মাঝিরা অচিরেই যাত্রী বাবুকে চিনিয়া ফেলিল সুতরাং তাহাদিগের নিজের চাল-চানার কিছু কিছু বখ্‌রা তাঁহাকে দিতে লাগিল। যাত্রীও প্রায় দেড়মাস কাল তাহাদিগকে দাশুরায়ের গান শুনাইতে শুনাইতে ভাসিয়া রহিলেন।

রতন সরকার ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু সংসারে অনেক কাজে অনেকেই সস্তায় কিস্তি পাইয়া কানপুর যাত্রা করেন। এই কন্সেশনের দৌলতে নূতন নূতন স্থানে বেড়াইয়া আসিবার পর হিসাবের খাতা দেখিয়া অনেকেই তাহা উপলব্ধি করেন। অবশ্য যাঁহাদের অর্থের ভাবনা ভাবিতে হয় না, অর্থাগমের স্থিতি স্থাপকতা আছে, তাঁহারা আমাদিগের সমালোচনার গণ্ডীর বাহিরে। রাজার ন্যায় তাঁহারাও দশকর্ম্মাতীত; তাঁহারা বিজয়ার সন্ধ্যায় গৃহরক্ষিণী জননীর চরণে টেলিগ্রামে প্রণাম প্রেরণ করিলেও সুসন্তান বলিয়া গণ্য! অর্থপতি দশকামজ-ব্যসন হইলেও সংবাদ পত্রাদিতে এবং অন্য সর্ব্বত্র প্রশংসনীয়।

এই তো গেল কন্সেশনের কথা; এর উপর আর এক পাপ আছে—“পাস্‌”। যাঁহারা রেল-বিভাগে কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই আফিস হইতে মধ্যে মধ্যে পাস্‌ পান। এই পাস আবার অনেক সময়ে সস্ত্রীক ভ্রমণের জন্যও প্রদত্ত হয়। পূজার ছুটি, একটা পাস বিলির বড় মরসুম। যেমন শ্রাদ্ধ বাড়ীতে ক্রিয়ার পূর্ব্ব হইতে বিদায়ের পত্র পাইবার প্রাত্যাশায় বামন-পণ্ডিতদের হাঁটাহাঁটি আরম্ভ হয়, সুপারিশ চিঠি দাখিলের যেমন একটা ভিড় বাধিয়া যায়, তেমনি কতকগুলি লোক আছেন, (তাঁহারা ভদ্রলোক) যাঁহাদের জ্বালায় পাস-পাওয়া বাবুদের দিন কয়েক বাড়ীতে টেঁকা দায় হইয়া উঠে। এই সময় লোক আসিলেই তাঁহাদের মনে হয় যে পাস চাহিতে আসিয়াছে। ট্রাম গাড়ীতে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, “মশাই কেমন আছেন?” অমনি বাবু বুঝেন যে দ্বিতীয় প্রশ্ন হইবে, “এবার পাস খানা আমায় দিতে পারবেন কি?” আফিসের জল-খাবার ঘরে আসিয়া কোন আত্মীয় যদি বলেন, “ওহে ভাই তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।” অমনি পাস-পাওয়া বাবুর ত্রাস —এইবার আমার গলায় পাসের জন্য ফাঁসী লাগাইবে। মামাতো, পিসতুতো, খুড়তুতো, মাস্‌তুতো যত রকম “তুতো” ভাই আছেন, সকলে জুটিয়া রেলবাবুদের এই সময়টা তিতো করিয়া তুলেন। তারপর শালা, ভগ্নীপতী, ভগ্নীপতির ভগ্নীপতি, শালার শালা, তস্য শালীপতি, সম্পর্কে খুড়ো, ডাকের জ্যেঠা, প্রতিবেশী, গ্রামবাসী গুরু-পুরুত, যৌবনের সহপাঠী, বাল্যের শিক্ষক—ইঁহারা স্বয়ং প্রত্যক্ষ ভাবে অথবা পত্র দ্বারা অপ্রত্যক্ষ ভাবে বাবুদের এতটা উত্যক্ত করিয়া তুলেন যে কেহ কেহ এক-এক সময় মনে করেন পোড়া চাকুরীর মুখ পোড়াইয়া দিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরি, তাহা হইলে এই পাস ফেউয়েদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইব। মনে করিবেন না যে ইঁহারা সকলে নিঃস্ব; অপিচ অনেকে অর্থবান, ব্যয়শীল,—কৃপণ নহেন; কোথাও বেড়াইতে যাইলে বেশ দশটাকা খরচ করিবেন; উত্তম বাসা, গাড়ী ভাড়া করিয়া যাওয়া-আসা, খাওয়া-দাওয়া খাসা; বিদেশস্থ বিপণির প্রতি-পোষক হইবেন; হয়তো মন্দিরে প্রণামী, যাজককে দক্ষিণা ও যাচককে দানও করিবেন; কিন্তু —ওই রেল ভাড়াটা। ওইটী বাঁচাইবার জন্যই হাঁটাহাটি লাঠালাঠি কথা কাটা-কাটি! এই পাস চেয়ে না পাওয়ার জন্য কতস্থানে পরমাত্মীয় চির-সুহৃদের মধ্যেও মুখদর্শন পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন পাসে কোথাও যাওয়ায় বা কিছু দেখায় একটা সম্মানের বিশেষত্ব আছে।

আমাদের রামবিহঙ্গ শিরোমণি মহাশয় এইরূপ পাসকে উপাসনার চক্ষে দেখেন। ইনি বামুন-পণ্ডিত লোক, গৃহে যে অর্থের প্রাচুর্য্য আছে তাহা নহে, তথাপি তাঁহাকে যদি কেহ এক খানি চারি টাকা পাসের পরিবর্ত্তে নগদ ছয়টী টাকা দেয়, তাহা হইলে তিনি টাকা কয়টী হাত পাতিয়া লন বটে, মুখে একটা

"দিষ্যাযিবি হ" বলিয়া আশীর্ব্বাদও করিবেন, কিন্তু মনে মনে বলিবেন, 'লোকটা বামুনের ছেলের মান রাখলোনা।' ইনি কোন কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিলে থিয়েটার দেখিবার একখানি পাসের জন্য (সখটুকুও আছে) অভিনেতাদের বাড়ী-বাড়ী, খবরের কাগজের আফিসে আফিসে, মিউনিসিপ্যাল বাবুদের দ্বারে দ্বারে, থানায় থানায়; হাতে পইতা জড়াইয়া ঘুরিয়া বেড়ান। একবার একটা পাহারাওয়ালা কোকেন খোর বলিয়া তাঁহাকে কিছুক্ষণ হাওয়ালাতে রাখিয়াছিল। আর একবার একটা বদ্ ছোকরা ট্রামওয়ের পাস বলিয়া একখানি ইংরাজী ছাপা নিমন্ত্রণের পুরাতন কার্ড তাঁহাকে দেয়। কালীঘাট যাইবার পথে ধর্ম্মতলার মোড়ে ব্রাহ্মণ ধরা পড়েন। ইন্সপেক্টরটী ভদ্রলোক ছিল, আর ব্রাহ্মণ অজানিত অপরাধ করিয়াছে বুঝিয়া, ছয়টী পয়সা আদায় করিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দেয়।

শিরোমণি মহাশয়ের কথা ত বলিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু তিনি কে, আপনারা জানেন কি? যদিও স্বগ্রামে শিরোমণি মহাশয় জগদ্বিখ্যাত তথাপি এমন জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি অনেক আছেন যাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও একান্ত অনুগত মিত্রসঙ্ঘ ভিন্ন অপরে নাম পর্য্যন্ত কেহ কখন শুনে নাই।

বঙ্গদেশ শেষ হইতেছে, উড়িষ্যা আরম্ভ হইতেছে, এই দু'য়ের সন্ধি-স্থলে একটী সরল রেখার উপর কুলগুঁটী গ্রাম; সেই গ্রামে শিরোমণি মহাশয়ের বাস। বঙ্গবাসীরা ঐ সরল-রেখার অধিবাসিগণকে বাঙালী বলেন না, উড়িষ্যাবাসীরাও উড়িয়া বলিয়া স্বীকার করেন না। অধিবাসিগণের আহার ব্যবহার আচার-বিচার, কেশ-বেশ, ভাষা অনেকটা বাঙালীর মত, তবে উড়িয়ার ফোড়ং দেওয়া। কোন্ টোলে কানা'য়ে ঠেলে রামবিহঙ্গ ঠাকুর 'শিরোমণি' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন তাহা কেহ বিদিত নয়। ইঁহাদের বংশের সকলেরই আদ্য নাম রাম; রামদাস, রামচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া লাল, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, সেবক, লোচন, ভদ্রাদি সংযোগ করিতে করিতে শিরোমণি মহাশয় ও তাঁহার এক পিতৃব্য পুত্র দুই বর্ত্তমান বংশ-বর্ত্তিকার নাম হইয়াছে—রামবিহঙ্গ ও রামপতঙ্গ। শিরোমণি মহাশয়ের বৃদ্ধ পিতামহের জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় শুনিয়াছি একজন সত্য সত্যই শাস্ত্রাধ্যায়ী সার্ব্বভৌম পণ্ডিত ছিলেন; তাঁহার চরণতলে বসিয়া পাঠ লইবার জন্য সমগ্র বঙ্গদেশ, মিথিলা, উৎকলখণ্ড ও দাক্ষিণাত্য হইতে বিদ্যার্থিগণ আগমন করিতেন। তিনি স্বধামে গমন করিলে পরবর্ত্তী বংশপর্য্যায় কিছু কিছু শাস্ত্র-শিক্ষা করিয়াছিলেন, তৎপরে দু'একখানা কাব্য তদনন্তর কিঞ্চিৎ ব্যাকরণ,—শেষ, শিরোমণি মহাশয়ের পিতামহ যখন একাদশ বর্ষ বয়সে দণ্ড ভাসাইলেন, তখন তাঁহার ধ্রুবজ্ঞান হইল যে ব্রাহ্মণের ছেলে তো পণ্ডিত হইয়াই জন্মগ্রহণ করে, তাহার আবার পুঁথি ঘঁটাঘাঁটি কেন? সেই অবধি উক্ত বংশের দুলালগণ উপবীত গ্রহণের পূর্ব্বেই গ্রামস্থ পাঠশালার বর্ণমালার সহিত যাহা কিছু পরিচিত হইয়া আসিতেছেন, চাণক্যের শ্লোক সংগ্রহও কেহ কেহ কণ্ঠস্থ করিতেন, কিন্তু দণ্ডীঘর হইতে বাহির হইলেই, ব্রহ্মতেজ আপনি ফুটিয়া পড়িত এবং মা স্বরস্বতী বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত-হস্ত খালি করিয়া তাম্রকূট-সংযুক্ত, তাম্বূল-রসসিক্ত রসনায় আসিয়া নিজ নারীত্ব বিস্মৃত হইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতেন। উপাধি-লাঙ্গুল স্বেচ্ছামত সকলেই এক একটী বাছিয়া লইয়া আসিতেছেন। বটতলার ছাপা "নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি" পুস্তক একখানি ঘরে আছে এবং কেহ কেহ সেখানি লইয়া মধ্যে মধ্যে দেখেন। বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কর্ম্মের মন্ত্র শ্রুতির সাহায্যেই স্মৃতির দ্বার দিয়া বিস্মৃতির বনে প্রবেশ করিয়া পথহারা হইয়া ঘুরিতে থাকে; আজকাল যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া রামবিহঙ্গ বা রামপতঙ্গ ঠাকুর ক্রিয়া-বাড়ীতে চাল-কাপড়ের পুঁটলী বাঁধেন, তাহাতে যজমানের "বাপের শ্রাদ্ধ" বই আর কিছুই হয় না।

প্রত্যহ খিড়কীর ডোবায় গঙ্গাস্নান করিয়াই শিরোমণি মহাশয় স্বীয় বিস্তীর্ণ ললাটদেশে পঙ্কের কাজ করিয়া তাহাতে পীতাভ মৃত্তিকার দ্বারা তিন চারিটী

রেখা অঙ্কিত করেন ; তাহার পর লম্বকর্ণ, সলোম বাহু এবং বক্ষ-বনও চিত্রাবলী বিভূষিত হয়। "সুবোধ বালক গোপাল" যেমন যখন যাহা পায় তখন তাহা খায়, শিরোমণি মহাশয়ও তেমনি যখন যাহা পান তখন তাহাই পরেন। বাটীতে প্রায়ই মেয়েদের একখানি ছোট নীলাম্বরী বা ডুরে শাটী তাঁহার আজানু-কটি আবৃত করিয়া রাখে। কলসী-উৎসর্গ বা শ্রাদ্ধের নিয়মভঙ্গের পাওয়া চটি জুতা ঘরে অনেক জমিয়া গিয়াছে, (বড় দুঃখ, পাঁচ শালার জ্বালায় থালা ঘটি ঘড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিও বিক্রয় করিতে পারেন নাই) পুঁথির বদলে তাহার একযোড়া সর্ব্বদা বগলে বগলেই ফেরে। সহরে বা কলিকাতায় উপনীত হইলে তবে পাদুকা পদাশ্রয় পায়।

ব্রাহ্মণত্বের অভিমান ও গর্ব্ব রামবিহঙ্গ ঠাকুরকে সুরাসেবী অপেক্ষা অধিক মাতাল করিয়া রাখিয়াছে। তিনি বলেন, "বামুনের বংশে বহু পুর্ণ্যিফলে যম্ম না নিলে কেউ সোমোস্কৃত্য উশ্চারণ কত্তে পারে না।" ব্রাহ্মণেতর জাতিকে সচরাচর তিনি "গুয়োটা" বলিয়াই সম্বোধন করিয়া থাকেন এবং মনে মনে বিশ্বাস এইরূপ সম্বোধন দ্বারা তিনি সম্বোধিত ব্যক্তিকে আপ্যায়ন ও আশীর্ব্বাদ দান করেন। চাষা-ভূষা লোক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে কর্দ্দম-গোময়াদি লিপ্ত শ্রীচরণতল প্রণতের মস্তকের উপরেই রক্ষা করেন।

শিরোমণি মহাশয়ের অনেক কাজ। প্রথমে তিনি একটা গ্রাম্য-প্রাইমারী স্কুলে মাসিক সাত টাকা বেতনে পণ্ডিতী করিতে প্রবৃত্ত হয়েন ; দুই তিন সপ্তাহ অধ্যাপনার পরেই তিনি দেখিলেন, সর্ব্বনাশ! দেশ, ভাষা, সাহিত্য, পাণ্ডিত্য, ধর্ম্ম, 'বিদ্দেশাগোর' সব মজাইতে বসিয়াছে! প্রায়ই বলিতে লাগিলেন, "কেতাব নিখে ইক্‌শুলে থিষ্টেনি মত চালিয়ে ছেলেগুণোর আথের মাটি করে দিতে বশেচে।"—"যল বানান করেছে কিনা বোগ্‌গীঅ জ দিয়ে!—সত্ব-নত্যো গ্যাণ নেই, দেকেচো মরনে মৃদ্যুপ্ন ্ণ!" "নিকেচে কিনা 'ঈশ্বর চৈতন্য স্বরূপ' ; চইতোণ্ন ঠাকুরকে কেউ কেউ ইশ্বোর বলে বটেক্ কিন্তু সোরূপ গোঁশাই কবে আবার ইশ্বোর হোলো!" ধর্ম্মনাশ রোষে ব্রহ্মতেজে ও পাণ্ডিত্যে প্রদীপ্ত শ্রীমৎ রামবিহঙ্গ শিরোমণি দেবশর্ম্মা বর্ণাশুদ্ধি ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার প্রাণের দৃঢ় বিশ্বাস সর্ব্বসমক্ষে বিজ্ঞাপিত করিয়া কর্ম্ম হইতে বিদায় লইলেন অথবা কর্ম্মই তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য ৪৮৵১৫ চুকাইয়া দিয়া বিদায় দিল। শিরোমণি মহাশয়ের শাস্ত্র-জ্ঞান ও বিদ্যা-চুঞ্চুত্বের বিস্তারিত পরিচয় আর না দিয়া, তিনি একবার এক শিষ্যকে সূর্য্য-প্রণামের যে মন্ত্রটি লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহাই অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা হইতেই পাঠকগণ "পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ" করিয়া লইবেন। সে মন্ত্রটী এই—

"নোমো যবা কুষুম শংখাসুরং শুকত্বস্থ্য বিনাসিনীং
সুখোদা মোখ্‌দা গংগা পুনীপত্ব পের্ণঅতে॥"

পাণ্ডিত্যাভিমানে পণ্ডিতী হারাইয়া শিরোমণি মহাশয় বামুনপণ্ডিতের কার্য্যে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিলেন। পৈতৃক পেশা গুরুগিরি পুরুত-গিরি তো ছিলই, তাহার সঙ্গে ঘটকালী ও পাঁঠাবলির ব্রতটাও জুড়িয়া দিলেন। পাপক্ষয়কর শেষ কর্ম্মটীর জন্য নগদ পয়সা না লইয়া একটী সবস্ত্র সিধা ও যে কয়টী মুড়ি পড়ে, তাহা লইয়াই আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন ; মুড়ি, পাড়ায়—যাক্ এ সম্বন্ধে আর ব্রাহ্মণের গুপ্তকথা ব্যক্ত করিয়া কাজ নাই। ঘটকালীর পসার তাঁহার অতি শীঘ্রই জমিয়া গেল। পাত্র পাত্রীর অন্বেষণে তিনি বহুগ্রামে বিচরণ করিতেন, এমন কি খাস কলিকাতাও এই কার্য্যের জন্য তাঁহার পদধূলিতে পবিত্র হইত। ঘটকালী আরম্ভ করিয়া অবধি বিবাহ বিষয়ে তাঁহার মত বড় উদার হইয়াছিল ; অবশ্য এ মত তিনি লোকের সমক্ষে প্রকাশ করিতেন না কিন্তু মনে মনে বলিতেন, "বিয়েতে আবার যাত্ বিচের কি? পুত্তুরর্থে ক্রিঅতে ভার্জে—পুত্তুর হোলেই হোলো ; চারহাত এক কোরে দিনু, ঘোটক বিদেয় নিনু, আশীর্ব্বাদ কনু—বস্।"

কল্পনা-প্রসূত মানস-পুত্রটীর এই নব বিধানের উপর নির্ভর করিয়া শিরোমণি মহাশয় কত ইতরজাতীয়

এবং অজ্ঞাত-পিতৃনাম কুমারীর, কত বিধবার, কত সধবার-ও বিবাহ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের ঘরে দিয়াছেন। ভিটায় যে উঁচু রকওয়ালা দেড়জোড়া দোহারা পাকা কুঠরী তৈয়ার হইয়াছে, তাহা ঐ সব ঘটকালীর টাকাতেই। ইহাতে যদি মধ্যে মধ্যে দু'চার জায়গায় তাঁহার পৃষ্ঠের সহিত "ধনঞ্জয়ের" সশব্দ পরিচয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে "পেটে খেলে পিটে সয়" বচনানুসারে সে গুলো কি হজম্য নয়?

আজ সাত আট বৎসর ধরিয়া শিরোমণি মহাশয়ের নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে যে, একবার ব্রাহ্মণীকে সঙ্গে করিয়া জোড়ে কাশী দর্শন করিয়া আসেন; এজন্য সেই অবধি প্রতি বৎসর কিছু কিছু চাঁদাও আদায় করিয়াছেন, এবং পোষ্টাফিসের সেভিংস্‌ব্যাঙ্কে সেগুলি সুদে বাড়িতেছে। কিন্তু রেলের পাস এ পর্য্যন্ত এক খানিও সংগ্রহ করিতে না পারায় তীর্থযাত্রা বৎসরের পর বৎসর মুলতুবী হইয়া আসিতেছে। এবার রামবিহঙ্গ ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়াছেন যে, কাশী যাইবেনই যাইবেন। একেবারে নিজ কলিকাতায় যাইয়া পাসের জোগাড় করিবেন; না পারেন, নিজের উপবীতের অগ্নি সৎকার করিবেন। শিরোমণি মহাশয়ের মত লোক যে সাত আট বৎসর চেষ্টা করিয়া একখানি রেলের পাস সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, এ কথা শুনিয়া অনেকে আশ্চর্য্য হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধির পক্ষে একটী মাত্র বাধাই এতদিন গোল বাধাইয়া আসিতেছে। শ্যামহরি সরকার, ব্রজবল্লভ বিশ্বাস, প্রাণবন্ধু প্রামাণিক, শীতলকৃষ্ণ সাহা—এই রকম তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে আরও কেহ কেহ রেলওয়েতে কর্ম্ম করেন এবং মধ্যে মধ্যে সস্ত্রীক শুভযাত্রা করিবার জন্য পাসও পাইয়া থাকেন; তাঁহারা তাঁহাদের নিজের পাস গুরুদেবকে দিতে প্রস্তুত এবং গুরুদেবও স্বীয় শিরোমণিত্ব সরাইয়া রাখিয়া আপনাকে প্রাণবন্ধু প্রামাণিক বা শীতলকৃষ্ণ সাহা বলিয়া পরিচিত করিতে অকুতোভয়; কিন্তু শিষ্যেরা বলে, মাঠাকরুণকে কি বলিয়া ব্রজবল্লভ, শ্যামহরি কি প্রাণবন্ধুর পরিবার বলিয়া পরিচিতা করিবেন? গুরু বলেন, তাতে দোষ কি? শিষ্যেরা বলে, প্রভু আপনি ব্রাহ্মণ, সব পারেন, আমাদের যে ভয় করে। এবার ঠাকুর ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "হেদেখ বাখ্‌ড়ার বউ, এবারটে আমি এক্কাই যাওয়া করি, এই রেইলের মম্মটা আর কাশীখণ্ড যাগাটা একবার চক্ষে দেখে বুঝা করে আসি, তখন গে—"

"তোমার ছরাদ ভাল করেই হবেক।"—স্বামীর বচনের পাদপূরণার্থ গোবিন্দ বামনী ঝড়বেগে উক্ত কয়েকটী কথা নিষ্ঠীবনের ন্যায় ত্যাগ করিয়াই মাতৃমাতামহ্যাদি সঙ্কলিত স্বামীস্তোত্রমালা স্মরণ করিয়া স্বীয় পতির স্তব আরম্ভ করিলেন; যথা—"মু-পুড়া মানুষ! গতর খাগা বামুন! মশানের চাঁড়াল! ভাগ্‌গাড়ের ভাতার! আমায় ঘরকে রেখে আপুনি যাবেক্ সেই কাশী, সিথা তুমার মাশী আছেক যে ভাত রাঁধা করে দিবেক্! তারে সাথে নিয়ে যোম্‌নায় ছান করবেক্ যা'য়ে! সে তুমার সাতগুষ্ঠির পিণ্ড'—"

"হাউরা করুস্ ক্যানে ক তো গোবিন্দী, তোরে ডাক্ দিয়ে শীতল করে দু'ট্যা মনের মানস্ কইব ভাবা করল্যাম্ আর তুই বিটী পরেতের মাইয়ে এক্কেবারে কি কুক্কিলের মত চিড়িক্ পাড়িয়ে উঠা কর্‌লিক্!"

গোবিন্দসুন্দরী ক্রন্দন সখীকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার শৈশবাবস্থায় যে পিসী কাশী গিয়াছিলেন, তাঁহার শোকে "ভাল্‌কোর্ পিস্মীরে আমার তুই, কুন্ মুন্‌কন্নিক্যার ঘাট্‌কে গিয়াছুস রে"—বলিয়া হাঁড়িচাঁচা পানকৌটী বায়স গৃধিণী কুক্কুটাদি বিবিধ বিহঙ্গ-রবের একতান তুলিয়া রোদন রোলে ভবন ভাসাইতে লাগিলেন এবং ললাটে বক্ষে ও বসুমতীতে যুগল করপল্লবের চপেটাঘাতে ঐ বাজখাঁই আওয়াজের সেঙ্গে যেন পাখোয়াজ বাজাইতে লাগিলেন। ঐ সঙ্গীতালাপ শ্রবণে কত গন্ধর্ব্ব কিন্নরের অঙ্গ বিকল হইল, কত কলহোন্মাদ মার্জ্জার স্তম্ভিত হইয়া বনে গিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করিল, কত রাসভ রজকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বড় বড় বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া

তাকিয়ায় ঠেসান দিল। তুম্বোদরী গোবিন্দসুন্দরীর কণ্ঠোদ্গারিত কম্বুনাদ অম্বুনাদ হাম্বানাদ শিরোমণির শরীর কণ্টকিত, শিখাগুচ্ছ স্ফীত এবং চক্ষুদ্বয় আরক্ত করিল; বাঁ হাতে চুলের মুটি ধরিয়া ডান হাতের এক চাপড়ে গানের জমাট ভাঙ্গিয়া দিবার মতলবে হাত দু'খানা ঠিক বাগাইয়া লইলেন, কিন্তু গভীর শাস্ত্রজ্ঞান-চকিত ইঙ্গিতে তাঁহার এই প্রেয়সী-শাসন বীরত্বব্রতে প্রতিবন্ধকতা করিল। শাস্ত্রদর্শী শিরোমণি ভাবিলেন, একেতো "নারী অবোধা" তার উপর আবার—"শকাজ্জ মুদ্দারেত প্রাপ্য গয়াগংগা গদাধোরো," সুতরাং নাগর-রসসিঞ্চনে "বেম্বো-ক্ষেষটাকে" যৎকিঞ্চিৎ মোলায়েম করিয়া লইয়া, "শুন্, কাঁদ্যা-কাটা একবার রাখ্য করে আমার দুটা কথা শুনা করুস্ তো কর্, আমি তুর শুয়ামি, যারে যাম্বোরা-অলারা প্রাণনাথ বলেক্ আমি তোর সেই পত্তি, বাপ্কে চেয়ে বি বড়, আমার কুথা শুন্তি লাগে—"

ব্রাহ্মণী। না আমি শুনবুক্ নি, ভাল্বার আমার যমবাড়ী যাওয়া কচ্ছেক, কুন বিরেলখাগীর ভাম্বারের বিটার কুথা আমি শুনা কর্ব্বো!

শিরো। দেখি দুষ্টা শোরশ্বতি তুর ঘাড়কে চাপ দিছেক্; শুন্ ধন্টা আমার, বাঁহংগের বথ্যের কন্স-যাটারে, নক্ষী মা'য়েটা আমার, মুসিমুখি গোবিন্দী আমার! সাম্নে বছর্কে তুরে সাথে লিয়ে গয়ায় গিয়ে তুর গয়া কোর্ব্বো, কাশ্বীতে লিয়ে গিয়ে বিশ্বনাথ অর্ণপুন্যা দেখা করাবো, পৈরাগে যায়ে গাঁটছড়া বাঁধে ডুবনায় বইসে মাথা মুড়া কোর্ব্বো, পরেক্কে একেবারে ছীরি বৃন্দাবোণ না যাওয়া কোরে, জুগলে রাস মাচায় না বইসে, মদ্রকুরী প্যাট্টা পুরে খাওয়া কোর্ব্বো।"

ব্রাহ্মণীর রোদন-সঙ্গীত ভাষাহীন হইয়া ক্রমে কণ্ঠ-শব্দে, অন্তে সর্পশ্বাসে পরিণত হইয়াছিল; এক্ষণে উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিবার জন্য অঞ্চল খুঁজিতে গিয়া দেখিলেন, কটিতে হরিদ্রারঞ্জিত গামছামাত্র, সুতরাং প্রথম সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া শিরোভূষণ কেঁক্ড়িগুলি জড়াইয়া একটি 'কুম্ড়োবড়ি' বাঁধিয়া যুগলকরে গাত্রের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে রান্নাঘরের দাওয়া হইতে উঠিয়া পাকা ঘরের দিকে ধাওয়া করিলেন। পুলকিত-অঙ্গ রামবিহঙ্গ অমনি দন্তস্ফুট সহাস্যবদনে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং "আজ সাঁজকে খাওয়া দাওয়া কোরে জাম্বারা হই, কাপড় চুপড়টা গুচ্ছা কোরে দেওয়া কর," বলিতে বলিতে গোবিন্দমণির পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পুণ্যার্জ্জন প্রত্যাশায় প্রবঞ্চনার সাহায্যে পাসে ভ্রমণোদ্দেশে উপবীতাভিমানী রামবিহঙ্গ শিরোমণি অতঃপর কলিকাতায় মৃগয়া-যাত্রা করিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

চাতক

চিত্ত চাতক মম মত্ত তোমারি তরে,
ওগো নবজলধর কায়,
কৃষ্ণ বারিদ বিনা তৃষ্ণা নিবারি কেবা
শান্ত শীতল করে তায়?
শান্তি না হ'ল তার দীর্ঘ সে পিপাসার
শুষ্ক এ ধরণীর প্রেমে,
উর্দ্ধবদনে তাই শুদ্ধ তোমারে চায়—
প্রেমে গলে' এস হরি নেমে।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নব-প্রত্নতত্ত্ব

(রহস্য)

অনেক দিন হইতে আমি ভূগোল ও পুরাণ এই দুইটি বিষয় লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছি। নানারূপ গবেষণাও চলিতেছিল।

ভারতীয় আর্য্যগণ মধ্য এসিয়াবাসী এ মতটা পুরাতন হইয়া পড়িল দেখিয়া কোন পণ্ডিত স্থির করিলেন আর্য্যগণ মেরু প্রদেশে বাস করিতেন। আবার বাঙ্গালাদেশে (অবশ্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের দেখা দেখি) কয়েকজন পণ্ডিত একটা নূতন মত আবিষ্কার করিলেন যে, ও সব বাজে কথায় কাজ নাই, ভারতবর্ষটাই প্রাচীন আর্য্যদের দেশ। কাল যেমন অনাদি অনন্ত, আমরাও তেমনই অনন্ত কাল হইতেই ভারতে বাস করিয়া আসিতেছি। এই মতের প্রথম আবিষ্কার-কর্ত্তা কে বা ইহার "আদি স্থান" কোথায় তাহা বলিতে পারি না কিন্তু যেদিন হইতে এই কথা শুনিলাম সেই দিন হইতে মনে মনে একটা গৌরব অনুভব করিতে লাগিলাম।

আবার শুনিলাম, সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস নাকি পণ্ডিতের স্থান নবদ্বীপের কাছে কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাস কাশীদাস সমিতির ন্যায় 'কালিদাস সমিতি'ও নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ গৌরবে আমার বুকটার মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল।

আমি শুনিয়াছিলাম বলিভিয়া দেশটা বলি রাজার আর আমেরিকা মহাদেশটাই পাতাল। অপিচ, মেক্সিকো প্রদেশের পপোকাটাপট্‌ল্, বাঙ্গলা ভাষার পাকা পটোল। দক্ষিণ আমেরিকার অনেক নামের সহিত বাঙ্গলা ভাষার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। ব্রেজিলের সহিত ব্রজের, শান্তিয়াগোর সহিত শান্তনু রাজার সম্বন্ধ কে অস্বীকার করিতে পারেন ?

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র ইংরাজীতে লিখিয়া ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের নূতন নূতন আবিষ্কৃত তথ্যগুলি পৃথিবীময় প্রচলিত হইয়াছে! যেখানে আলোক জ্বলে তাহার নিকটেই যেমন অন্ধকার থাকে, সেইরূপ বাঙ্গালা দেশের লোকে অধ্যাপকদ্বয়ের নূতন তথ্যের বিষয় কিছুই জানেনা বলিলেই চলে। তাই দেখিয়া এই নব্য আবিষ্কারক দল প্রত্নতত্ত্বের এই নব সত্য বাঙ্গালায় লিখিলেন। ইহাতে কিন্তু একটা উল্টা উৎপত্তি হইল, এ সত্যগুলি বাঙ্গালা দেশেই সীমাবদ্ধ থাকিল। সে যাহা হউক, কাশ্মীর প্রদেশের শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক নূতন থিওরি বাহির করিয়াছেন যে, ভারতীয় আর্য্যগণের নিবাস ছিল আর্মেনিয়া ও পণ্টাস প্রদেশে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, রামরাবণের যুদ্ধ, সব সেই দেশেই হইয়াছিল। আমারও মনে হয় সেই জন্যই ট্রয়ের যুদ্ধ ও লঙ্কার যুদ্ধের ব্যাপারটা একরকম। এখন আমি বিষম সমস্যায় পড়িলাম কাহাকে সাহায্য করি।

আর এক বিপদে পড়িয়াছি। রিজলি সাহেব বলিয়াছিলেন ব্রাহ্মণ ব্যতীত বাঙ্গালীরা আর্য্য নহেন, ইঁহারা মঙ্গলোদ্রাবিড়ী এবং মার্হাট্টাগণ শক জাতীয়। রিজলী সাহেব নাম সাদৃশ্য দেখান নাই। তিনি পাকা কাজ করিয়াছিলেন। তিনি অনেকের নাক চোখ মুখ মাথা মাপিয়া এই তথ্য বাহির করিয়া ছিলেন। স্বর্গীয় সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় 'সাহিত্য' পত্রে ইহার একাংশের প্রতিবাদ করেন। বাঙ্গালীরা এতকাল চুপচাপ ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দেখিলেন যে, রিজলি সাহেব যখন বাঙ্গালার ব্রাহ্মণদিগকে আর্য্য বলিয়া প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন, তখন অন্য জাতিগুলি অনার্য্য হইলে কিছু যায় আসে না। তাই তিনি 'নারায়ণ' পত্রে রিজলি সাহেবের এই কথাটা মানিয়া লইলেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় ইহাতে প্রতিবাদ করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমি

এখন এই দলের সাহায্যার্থ আমার লেখনী ধারণ করিব। আপনারা অবহিত হউন।

কিন্তু শুধু নাম সাদৃশ্য দেখাইলে চলিবেনা, তাই আমি আর একটি বিষয়ে অগ্রে সাদৃশ্য দেখাইতেছি। ইহা অক্ষরের সাদৃশ্য। অবশ্য আমরা ইংরেজী অক্ষর ও ইংলণ্ডের গ্রাম নগর যতটা জানি, এক বাঙ্গলা অক্ষর ও ভারতবর্ষ দেশ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কিছু তেমন জানি না। জানিলে বোধ হয় দেখাইতে পারিতাম পৃথিবীর অনেকে ভারতের বিশেষ করিয়া বাঙ্গলার নিকট ঋণী।

ইংরেজী ছোট হাতের t ও বাঙ্গলার ট, ইংরেজী J ও বাঙ্গলার J ফলা, ইংরেজী ছোট হাতের x ও বাঙ্গলা ক্ষ প্রায় একরূপ। আবার বাঙ্গলার "স" এর দাঁড়িটি মুছিয়া দেন, ইংরেজী s হইবে, "ভ" এর নীচের বক্র-রেখাটি মুছিয়া দেন দেখিবেন ছোট হাতের v হইবে। ইহা হইতে কি বুঝায়? বাঙ্গলার অক্ষর বেশী আর ইংরেজীর অক্ষর কম। আমাদের বর্ণমালা কেমন উচ্চারণ স্থান অনুসারে সাজান,ইংরেজের বর্ণমালা এলো-মেলো। পাছে কেহ চুরি ধরিয়া ফেলে সেই জন্য অক্ষরগুলি এলোমেলো করিয়া সাজান। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত হইল, ইংরেজী অক্ষর বাঙ্গলা হইতে বেমালুম চুরি। ইহাতে না মানেন আরও প্রমাণ দেখাইতেছি। "ক্ষেত্র" ও "Chester" এক ধাতু বলিয়া মনে হয় না কি? পাছে আমরা চুরি ধরিয়া ফেলি, সেই জন্য ইংরেজ জাতি Worcester কে "উয়র্‌সেষ্টার্‌" রূপে উচ্চারণ না করিয়া "উর্ষ্টার্‌" রূপে উচ্চারণ করেন। কিন্তু "মানচেষ্টার" (Manchester)=মানব ক্ষেত্র, Doncaster (দন্‌কাষ্টার)=দানব ক্ষেত্র, এ সকল সাদৃশ্য যাইবে কোথায়?

অবশ্য সত্যের খাতিরে বলিতে হয়, ইংরেজ জাতি চুরি অস্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, "আমরা আর্য্য, আমরা মধ্য এসিয়া হইতে আসিয়াছি।" ইহার বেশী তো আর তাঁহাদের জ্ঞান নাই। ম্যাক্সমুলার শীঘ্র বুড়া হইয়া মারা গেলেন নহিলে তিনি আরও কিছু আবিষ্কার করিতে পারিতেন। যাহা হউক আমি যাহা আবিষ্কার করিয়াছি তাহাতে বাঙ্গালী জাতির ক্ষোভ আর থাকিবে না।

আপনারা এ গল্পটি অবশ্যই জানেন যে পরশু-রাম একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া-ছিলেন। তা আপনারা কি অক্ষরে অক্ষরে গল্পটি বিশ্বাস করেন? এই দেখুন না, যদি পৃথিবীকে একবার নিঃক্ষত্রিয় করিল তবে আবার ক্ষত্রিয় আসিবে কোথা হইতে? বলিতে পারেন, ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয় স্ত্রীর গর্ভে আবার ক্ষত্রিয় জন্মিয়াছিল। তাহা হইতে পারে না—কারণ এরূপ লোককে বর্ণসঙ্কর বলে। আর এইরূপ ২০ বার হইলে হোমিওপ্যাথিক ডাইল্যুশনের মত একবিংশতিবার ক্ষত্রিয় নাম না থাকি-বারই কথা। আর পরশুরাম বাবাজী তো ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেই পারিতেন, "আমি পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছি, আর তোমরা ক্ষত্রিয়ের জন্ম দিও না।" তাহা হইলে তো আর ক্ষত্রিয়ও জন্মগ্রহণ করিত না, পরশুরাম বাবাজীকেও ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস করিবার জন্য বসিয়া থাকিতে হইত না। আবার পৃথিবী যদি ক্ষত্রিয়-শূন্যই হইল তবে পরশুরামের পরে ক্ষত্রিয় দশরথ-পুত্র রাম আসিল কোথা হইতে?

আসল কথাটা কেহ অবগত নহেন। যখন দুইপক্ষে যুদ্ধ হয় তখন যে পক্ষ দেখে যে দাঁড়াইয়া মরিতে হইবে সে পক্ষ শ্রেষ্ঠপথ অবলম্বন করে অর্থাৎ পলায়ন (পরা+অয়ন) করে। যখন ক্ষত্রিয়েরা দেখিল যে পরশুরাম ধরে আর কচুকাটা করে, সে অগ্নিবাণও ছাড়িতে দেয় না সর্পবাণও ছাড়িবার সময় থাকে না, তখন নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়েরা পলায়ন করিয়াছিল! তখনকার পৃথিবী অর্থে ভারতবর্ষ। অর্থাৎ ক্ষত্রিয়েরা কতক মরিল আর অবশিষ্ট যাহারা ছিল তাহারা পলাইয়া বাঁচিল। পৃথিবী অর্থাৎ ভারত : নিঃক্ষত্রিয় হইল। তা সকলে কিছু ঘর বাড়ীর মায়া ত্যাগ করিতে পারে না। ২।৪ মাস পরে যখন দেখিল পরশুরাম ধ্যানে বসিয়া গিয়াছেন, তাহারা সব চুপচাপ নিজের নিজের বাড়ী আসিয়া হাজির। কেহ হয়তো

পরশুরামকে খবর দিল, আবার পরশুরাম কুঠার হস্তে ধাবমান, ক্ষত্রিয়গণও পলায়মান। এইরূপ মানিয়া লইলেই অল্পদিনের মধ্যেই ভারত ২১বার নিঃক্ষত্রিয় হইতে পারে, পুরাণের মাহাত্ম্যও বজায় থাকে, ক্ষত্রিয়-বংশটাও বাঁচিয়া থাকে। অবশ্য যাহারা পলায়ন করিয়াছিল তাহারা সকলেই ফিরিয়া আসে নাই, কেহ কেহ বিদেশে চিরকালের জন্য উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এইরূপে সমস্ত ভারতীয় আর্য্যজাতি (ক্ষত্রিয়ের ভাগই বেশী) ইয়ুরোপে গিয়া বসবাস করিয়াছে। সেই জন্যই ইয়ুরোপীয়েরা এত যুদ্ধ জানে, সব ক্ষত্রিয় কি না? আর একদল ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, দক্ষিণ-চীন প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

কায়স্থদিগের মধ্যে শকসেন বলিয়া একটা থাক আছে। বাঙ্গালার পুরাতত্ত্বের গ্রন্থকার মহাশয় দেখাইয়াছেন যে ইয়ুরোপের স্যাক্সন্ জাতির সহিত ইহাদের নিশ্চয়ই সম্বন্ধ ছিল। ইংরেজ জাতি আর্য্য ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং শকসেন থাক যখন আর্য্য তখন আরও সকলে আর্য্য হইবেন আমি তাহার প্রমাণ দিতেছি।

অনেক কায়স্থ স্বীকার করেন, 'আমরা পরশুরামের সময়ে উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলাম' সুতরাং সেই সময়ে যাহারা গুহায় আশ্রয় লইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল তাহারা গুহ, যাহারা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পালিত হইয়াছিল তাহারা পালিত, যাহারা গুপ্তভাবে ছিল তাহারা উপ্ত উপাধি পাইয়াছে। সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ পরশুরামের ভয়ে মিত্র, চন্দ্রবংশীয়গণ সোম ও চন্দ, ব্রহ্মদেশাগত ক্ষত্রিয়গণ বর্ম্মা উপাধি গ্রহণ করিয়াছে। উত্তরবঙ্গে বহু রাজবংশীয় ক্ষত্রিয় আছে। নামেই প্রমাণ।

যাহারা পালবংশীয় ক্ষত্রিয় তাহারাই পাল, সেনবংশীয়গণ সেন, গুপ্তবংশীয়গণ গুপ্ত, শূরবংশীয়গণ শূর ইহাতো পড়িয়াই রহিয়াছে। যাহারা পুরুষের মধ্যে সিংহ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, তাহারাই সিংহ উপাধি পাইয়াছে।

এখন আপনারা আপত্তি করিতে পারেন যে শূর, পাল, সেব, সিংহ, গুহ প্রভৃতি উপাধি বিভিন্ন জাতির মধ্যে দেখা যাইতেছে কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, এই যে বর্ত্তমান জাতিভেদ দেখিতেছেন ইহা খুব অল্পদিনের। তাহার পূর্ব্বে দেশে বড় একটা হিন্দুয়ানী ছিল না, সবাই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীই ছিল। যখন নূতন জাতিভেদ হইল তখন দেখা গেল পালবংশীয় কেহ কুম্ভকারের কার্য্য করিতেছে সে কুম্ভকার রহিল, কেহ স্বর্ণকারের কার্য্য করিতেছে সে স্বর্ণকার হইল ইত্যাদি।

হয়তো কেহ বলিতে পারেন যে, দেশে এত ক্ষত্রিয় থাকিতে ব্রাহ্মণগণ কেন বলে যে ভারতে ক্ষত্রিয় নাই? ইহার কারণ অতি সহজ। ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে তো ব্রাহ্মণের চির-বিবাদ। ব্রাহ্মণ যখন দেখিলেন মুসলমানেরা ভারত আক্রমণ করিল তখন রাজপুতকে বলিলেন, "বাপুহে তোমরাই ক্ষত্রিয়, ঐ মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের তাড়াও।" আর, যেই মুসলমান রাজা হইয়া বসিলেন, আর মুখে কথা নাই। আবার যেই শিবাজী মোগলের সঙ্গে লড়িতে লাগিলেন, আবার অমনই দলে দলে ব্রাহ্মণ আসিয়া শিবাজীকে বলিলেন, "বাপুহে তুমি ক্ষত্রিয়পুঙ্গব, বেঁচে থাক।" আবার যেই মার্হাট্টা জাতিটার হাত হইতে রাজ্য ফস্‌কাইয়া গেল, ইংরেজ রাজা হইলেন, ব্রাহ্মণ দেখিলেন ক্ষত্রিয় জাতিটা ত আর দেশে রাজা হইবে না, সুতরাং পাওনা থোওনার আশা আর নাই। তাই পুঁথিতে ব্যবস্থা লিখিলেন, 'কলিতে ক্ষত্রিয় নাই।'

প্রবন্ধটি দীর্ঘ হইল সুতরাং অদ্য এইখানেই ইতি। স্পুনার সাহেবের পদানুসরণ করিয়া আমি একটা theory বাহির করিয়াছি, চন্দ্রগুপ্তই যুধিষ্ঠির আর চাণক্যই শ্রীকৃষ্ণ। চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদের অনুকরণে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সভার পরিকল্পনা, নন্দবংশই কৌরব আর মুদ্রারাক্ষসের রাক্ষস শকুনি। সে প্রসঙ্গে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবেচারাম বিদ্যাবাগীশ।

মেঘের প্রেম

দীঘির মতন স্বচ্ছ সুনীল গগনে,
দুইটি প্রান্ত ঢাকি,
সহসা দুখানি জলদ সে কোন লগনে
মেলিল মলিন আঁখি।
হাজার যোজন তাহাদের ছাড়াছাড়ি,
গুরুভার বুকে গুমরে অশ্রুবারি।
আর্দ্র বাতাস কঠোর পরশ হানিয়া,
মাঝে মাঝে যায় শিথিল বস্ত্র টানিয়া।
অসীম আকাশে ছোট দুটি মেঘ
কাঁপিতেছে থাকি থাকি,
অতি অসহায়, এ উহারে চায়
মেলিয়া মলিন আঁখি।

বিকল হৃদয় ব্যাকুল প্রণয় পরশে,
উন্মাদ তারা আজি।
চরণে দলিয়া ছুটিয়া চলেছে হরষে
পথের বিঘ্নরাজি।
দুরু দুরু হিয়া কাঁপিয়া উঠিছে বুকে,
কখনো বা ভয়ে কখনো গভীর সুখে।
স্বপ্ন অলস নিবিড় নয়ন লুটিয়া,
কত ছন্দের স্পন্দন উঠে ফুটিয়া;
চির জীবনের মিলন রাগিণী
হৃদয়ে উঠেছে বাজি।
আজি তারা পায় দলিবারে চায়
পথের বিঘ্নরাজি।

কাছে অতি কাছে, পাশাপাশি, শেষে পলকে
উভয়ে আত্মহারা,
মিলন-পিয়াস-সঞ্চিত-রস-ঝলকে
ঝাঁপায়ে পড়িল তারা।
দুটি সুনিবিড় তৃষিত তপ্ত কর,
বাঁধিল ইহারে উহার বক্ষ'পর।
রুদ্ধ রোদন পুলকে পড়িল ভাঙিয়া,
চকিত হাসিতে অধর উঠিল রাঙিয়া।
মুগ্ধনয়ন প্লাবিয়া ঝরিল
মিলন অশ্রুধারা;
মিলন যখন ফুরাল তখন
পলকে মিলাল তারা।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

অভ্যর্থনা ও উদ্বোধন*

অদ্যকার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে করুণাময় পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি এবং আমরা যে রাজাধিরাজ ভারতসম্রাট উদারমনা প্রজাবৎসল পঞ্চম জর্জ্জের অধিকারে স্বচ্ছন্দে এবং শান্তিতে বাস করিতেছি, বিশ্বপতির চরণে অকপট অন্তঃকরণে তাঁহার কল্যাণ কামনা করিয়া বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী মহাসমরে তাঁহার চিরবিজয়ী পতাকার বিজয় কামনা করিতেছি।

তৎপরে সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর নিকট অবনতমস্তক হইয়া তাঁহাদিগকে বিপুল সম্মান এবং আন্তরিক ভক্তি জানাইতেছি। উপস্থিত বয়োজ্যেষ্ঠ এবং যাঁহারা গুরুজনস্থানীয় তাঁহাদিগকেও যথাযোগ্যসম্মান জানাইতেছি। সভাস্থ সমুদয় সভ্যবৃন্দকে রঙ্গপুরবাসীর পক্ষ

* উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনের নবম অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মাননীয় রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় মহোদয়ের অভিভাষণ।

হইতে ও তাঁহাদিগের নিয়োজিত অভ্যর্থনা সমিতির প্রধান ভৃত্য বা কর্ম্মচারীস্বরূপ, তাঁহাদিগকে আন্তরিক সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি এবং তাঁহারা যে নানারূপ অসুবিধা ও ভ্রমণজনিত ক্লান্তি উপেক্ষা করিয়া এই নগরীতে পদার্পণ করিয়া আমাদিগকে সম্মানিত করিলেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

নানা জেলায় ঘুরিয়া আবার এই নবম বৎসরে সম্মিলনের জন্মভূমি রঙ্গপুর নগরে সাহিত্য-সম্মিলন আহুত হইয়াছে। সাহসে নিভর করিয়া, পূজার উপকরণ সংগ্রহ বিষয়ে নিজের সামর্থ্যের বিচার না করিয়া আবাহন করিয়াছি। অকিঞ্চনের আবাহনে দয়া করিয়া বঙ্গবাণীর সুধী পুত্রগণ অনেকেই শুভাগমন করিয়াছেন। পূজোপকরণের সদ্ভাব নাই। কি দিয়া যে তাঁহাদিগের পূজা হইবে ভাবিয়া অবধারণ করিতে পারিতেছি না।

দেবগণ স্বর্গভূমি ত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যে আগমন করিলে, অমরাবতীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কি করিয়া তাঁহারা পাইবেন? পূজা পাইবার জন্য তাঁহাদিগের আগমন নহে। মর্ত্ত্যবাসীকে দয়া করিবার জন্যই তাঁহাদিগের আগমন। রাজপ্রাসাদের অপেক্ষা নাই। দরিদ্রের পর্ণকুটীরেও দেবতার অধিষ্ঠান হয়। যথাশক্তি পুষ্প পত্র জলেও দেবতার পূজা হয়। এই দৃষ্টান্তে আমরা আশ্বস্ত, সরস্বতী পূজার ন্যায়, সরস্বতীর বর পুত্রগণের পূজা করিবার জন্যও কোনরূপ আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। ঋষির মুখে শুনিয়াছি তৃণ, ভূমি, জল ও মিষ্টবাক্য হইলেই অতিথি সৎকার হইতে পারে। এই চারিটি দ্রব্যের অভাব কাহারও প্রায় হয় না। কিন্তু ঋষির প্রথমোক্ত তৃণ আর রঙ্গপুরে খুজিয়া পাওয়া ভার। পাটের আবাদের প্রাচুর্য্যে বংশ-স্তূপের সহিত তৃণরাশি আজ রঙ্গপুর হইতে প্রায় অন্তর্হিত। যে কারণে রঙ্গপুরের সুপ্রসিদ্ধ অড়হর আজ রঙ্গপুরে মিলে না, নানা জাতীয় সুমিষ্ট কদলীর বন উৎসন্ন, মধুর আনারস ক্ষেত্র উৎখাত; সেই কারণে তৃণরাশিও আজ অন্তর্দ্ধান। রঙ্গপুরের সুপ্রসিদ্ধ কুশাসন, সুপ্রসিদ্ধ মাদুর, সুপ্রসিদ্ধ শতরঞ্জ, সুপ্রসিদ্ধ বিচিত্র কাষ্ঠাসন; সুপ্রতিষ্ঠ গজদন্ত নির্ম্মিত মহামূল্য আসন রঙ্গপুরে আজ দুর্লভ হইয়াছে!

ঋষির আদিষ্ট অতিথি-পূজার উপকরণ চারিটির মধ্যে একটিমাত্র এখনও বাকী আছে; সেটি সুনৃতা বাণী। সুনৃত শব্দের অর্থ মধুর অথচ সত্য। মধুর সত্য বাণী বলিলেও পূজা হইতে পারে। দেবপূজায় পিতৃপূজায় অতিথি-পূজায় নিজের উপভোগ্য বস্তু প্রদানেরই ব্যবস্থা। নিজের মাতৃভাষাই সকলের কর্ণে মধুর অথচ তাহাই আবার সকলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আমি রঙ্গপুরবাসী, রঙ্গপুরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি; মাতার অঙ্কে লালিত পালিত বৰ্দ্ধিতের ন্যায় রঙ্গপুরী ভাষার অঙ্কে লালিত পালিত বৰ্দ্ধিত হইয়াছি; পরিজনবর্গের মুখে, নিত্য সহচরদিগের মুখে, প্রজাপুঞ্জের মুখে, প্রতিনিয়ত সেই ভাষাই শুনিয়া আসিতেছি; সেই ভাষায় নিত্য তাহাদিগকে প্রত্যুত্তর দিতেছি; সুতরাং রঙ্গপুরী ভাষা আমার নিত্য ব্যবহার্য্য ও উপভোগ্য। এই নিত্য ব্যবহার্য্য নিত্য উপভোগ্য আমার নিজের কর্ণসুখকর প্রকৃত সত্য রঙ্গপুরী ভাষা দিয়া আপনাদিগের পূজা হইতে পারে। তাই আমি রঙ্গপুরবাসীর প্রতিনিধি হইয়া আপনাদের সম্মুখে দুই চারিটা রঙ্গপুরী শব্দে একটি ছোটখাট ডালা সাজাইয়া উপহার স্বরূপ উপস্থাপিত করিতেছি। ভাষা লইয়াই ত সাহিত্য, শব্দ লইয়াই ভাষা, সুতরাং সাহিত্য-সম্মিলনে ভাষা ও শব্দের আলোচনার স্থান আছে। রঙ্গপুর বঙ্গের বাহিরে নয়, রঙ্গপুরী ভাষাও বঙ্গভাষার অন্তর্নিবিষ্ট। কাজে কাজেই আপনারাও এই দীনা রঙ্গপুর ভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতে পারিবেন না তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি।

রঙ্গপুরের ভাষা সম্বন্ধে আমাদিগের পূজ্যপাদ, রঙ্গপুরের গৌরবমণি, পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয়ের সহিত সময়ে সময়ে আমি অনেক আলোচনা করিয়া থাকি এবং তাঁহার নিকটেই রঙ্গপুরের ভাষা সম্বন্ধে যাহা কিছু তত্ত্ব লাভ করিয়াছি

(৭৬৮ পৃষ্ঠার সম্মুখে)



নবম উত্তর-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি

কাকিনাধিপতি মাননীয় রাজা শ্রীমহেন্দ্ররঞ্জন রায়।



নবম উত্তর বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভাপতি



রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের সভাপতি
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবি সম্রাট
শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন



রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের
স্থায়ী সম্পাদক
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী

তাহাই বলিতেছি। সংস্কৃতে বর্ত্তমান কালের ক্রিয়াপদে উত্তম পুরুষের এক বচনে 'মি', দ্বিবচনে 'বস্' বহু-বচনে 'মস্' এই তিনটি বিভক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা দ্বারা, আমি যাইতেছি এই অর্থে 'যামি', আমরা দুইজন যাইতেছি এই অর্থে যাবঃ, আমরা বহু (তিন বা তদতিরিক্ত) ব্যক্তি যাইতেছি, এই অর্থে যামঃ—সংস্কৃতে এইরূপ ক্রিয়াপদ হয়। বাঙ্গালায় দ্বিবচন নাই, এক বচন ও বহুবচন আছে। রঙ্গপুরীভাষায় একবচনে 'যাইম', বহুবচনে 'যাম্', এইরূপ ব্যবহার। সংস্কৃত যামির সহিত যাইমের ও যামঃ-এর সহিত যামের যত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, অন্যত্র প্রচলিত যাব এই ক্রিয়াপদের সেরূপ সম্বন্ধ নাই। বাঙ্গালায় দ্বিবচন নাই, অথচ সংস্কৃতের দ্বিবচন বিভক্তি লইয়া একবচন ও বহুবচনে যাব প্রভৃতি ক্রিয়াপদের সৃষ্টি হইয়াছে। রঙ্গপুরে যেমন একবচনে এক বিভক্তি, বহুবচনে অন্য বিভক্তি আছে, অন্যত্র সেরূপ ভিন্ন বিভক্তি নাই। সংস্কৃতে প্রথমার এক-বচনে ব্যঞ্জনান্তপদের যেরূপ রূপ হয়, বাঙ্গলায় সেই রূপটী পদ হইয়া দাঁড়ায়। ইহার উদাহরণে শ্রীমান্, বুদ্ধি-মান্, ধীমান, শর্ম্মা, বর্ম্মা, কৃতকর্ম্মা, কৃতবর্ম্মা, সর্ব্ববর্ম্মা, রাজা, সুতেজা, অনেক রহিয়াছে। অস্মদ্ শব্দের প্রথমার এক বচনে পদ হয় অহং। এই অহং হইতেই হিন্দীতে হইয়াছে হম্ বা হাম্, রঙ্গপুরী ভাষাতে হইয়াছে 'হামি', রঙ্গপুরী ভাষা সৃষ্টির বহুদিন পরে যেন তাহা হইতেই আবার 'আমি' হইয়াছে। ভবামি, গচ্ছামি প্রভৃতির অংশবিশেষ লইয়া আমির উৎপত্তি, এইরূপ কল্পনা করিলে বাঙ্গালা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি হয় না। অহং-এর মকারটী লইয়া রঙ্গপুরী ভাষায় 'মুই' ও হিন্দীভাষায় 'ময়' হইয়াছে। সংস্কৃতের ন্যায় রঙ্গপুরী ভাষাতেও মান্য ব্যক্তিকে বুঝাইতে বহুবচনের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এক হইলেও রঙ্গপুরী লোক বলিয়া থাকে, "তোমরা যাইবেন"। রঙ্গপুরী ভাষাতে 'আপনি' এই শব্দের প্রয়োগ পূর্ব্বে ছিল না, এক্ষণে বিদেশীয় সংশ্রবে আসিয়া রঙ্গপুরবাসী 'আপনি' বলিতে শিখিয়াছে। দুর্গা পূজাকে রঙ্গপুরবাসী দেবীপূজা বলে ও 'দেবী দেখিতে যাই' বলে, দোলকে হুলি বলে। দেবী সংস্কৃত শব্দ, হুলিও সংস্কৃত হোলাকা শব্দ হইতে উৎপন্ন। চাদরকে রঙ্গপুরবাসী চাদর বলে না, পাছড়া বা কোতা বলে। বেশ বুঝা যায় সংস্কৃত প্রচ্ছদপট হইতে পাছড়া শব্দের উৎপত্তি। কৃত্তিবাসী রামায়ণেও "ন্যাতের পাছড়ি" দেখিতে পাই। সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দ হইতে কোতা পারে। প্রাকৃতে বকার স্থানে ওকার হয়, প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণে পরিবর্ত্তন প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। উৎসবে যাইবার সময়ে রাজবংশী প্রভৃতি জাতির স্ত্রীলোকেরা চিরদিন চাদরে গা ঢাকিয়া যাইত। সেই চাদরের নাম আবরা, সে আবরা যে প্রাবার হইতে উৎপন্ন ও তাহা হইতে যে আবরু শব্দ আসিয়াছে, ইহাও স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। পট্টবস্ত্রকে রঙ্গপুরীভাষায় খুমা বলে, খুমা যে ক্ষৌম শব্দের অপভ্রংশ তাহা বুঝিতে বাকি থাকে না। বৃষ্টিকে ঝরি, ঝড়কে হুড়্কা, বিদ্যুৎকে চিল্কা, দেব-গর্জ্জনকে দেওয়ার ডাক ও মাটীর হাঁড়িকে পাতিল, রঙ্গ-পুরী ভাষায় ব্যবহৃত। ঝর হইতে ঝড়ী; হিল্লোল, হুণ্ বা হুড়্ ধাতু হইতে হুড়্কা; চলিকা হইতে চিলকা, দেব হইতে দেওয়া; পাতিলী হইতে পাতিল সহজেই নিষ্পন্ন হইতে পারে। রঙ্গপুরী ভাষায় যে আলুভাজী পটলভাজী বলে ও চিরাভাজা চাউলভাজা বলে, কোনও বৈয়াকরণিককে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি মুক্তকণ্ঠে রঙ্গপুরের ভাষাই শুদ্ধ বলিবেন।

আবার সংস্কৃত স্থালির সহিত রঙ্গপুরী ভাষা থালির যত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, স্থালির সহিত থালের তত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নয়। ধূমের সহিত ধুঁয়ার যত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, ধোঁয়ার তত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নয়। বিচালি খড়কে রঙ্গপুরী ভাষায় সংস্কৃত পলাল শব্দের অপভ্রংশে পোয়াল ও সেই বিচালি খড়ের গাদাকে সংস্কৃত পুঞ্জ শব্দের অপভ্রংশে পুঁজ শব্দের ব্যবহার। অগাধ জলকে রঙ্গপুরবাসী অগম জল ও অরণ্যানীকে গহন বন বলে। অন্নপ্রাশনকে অন্যত্র ভাত মাত্র বলে, রঙ্গপুরে ভাত ছোয়ানী বলে। অন্যত্রও স্পর্শ অর্থে ছোঁয়া এই পদের ব্যবহার আছে। রঙ্গপুর এস্থলে ভাত ছোয়ানী ক্রিয়া এই অর্থে নিজস্ব

করিয়া বিশেষণ পদরূপে ব্যবহার করিয়াছে। রঙ্গপুরের বালবৃদ্ধবনিতার মুখে 'সসাগরা পৃথিবী' এই কথা সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়। সকলেই অবগত আছেন তরবারিকে আবৃত করে বলিয়া তরবারির খাপকে কোষ বলে, গুটিপোকা যে আবরণের মধ্যে বাস করে তাহাকেও কোষ বলে ও সেই সেই সূত্রজাত বস্ত্রকেও কৌষেয় বস্ত্র বলে। রঙ্গপুরে পাটকে পাট বলে না, কোষ্টা বলে; পাঁকাটীকে আবৃত করে, তজ্জন্য আবরণের নাম কোষ, সূত্রগুলি সেই কোষে স্থিত বলিয়া কোষ্টা হইয়াছে। বৈয়াকরণিকেরা স্থা ধাতু না বলিয়া ষ্ঠা ধাতু বলিয়া থাকেন; প্যাকাটীকে রঙ্গপুরবাসী প্যাঁকাটী বলে না, অত্যন্ত কৃশ বলিয়া শীর্ণা বলে। দিগ্‌ভ্রমকে দিগ্‌ভ্রম না বলিয়া দিশাহারা বলে। দিশাও সংস্কৃত শব্দ, হারাও সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। রঙ্গপুরবাসী নিজের দৈন্য প্রকাশ করিতে যাইয়া নিজেকে দীনহীন নির্ঘিণ বলে, নির্ঘিণ নির্ঘৃন হইতে উৎপন্ন। টঙ্কণ শব্দে উচ্চ অশ্বকে বুঝায়, অন্যত্রও উচু ঘোড়াকে টাঙ্গন ঘোড়া বলিয়া থাকে। রঙ্গপুরবাসী ঠঙ্কনের উচ্চতা লইয়া উঁচু মাসকেও টংশব্দে ব্যবহার করে ও লম্বা মানুষকে টং টং বলে। রন্ধনশালাকে রসবতী বা রসনা শব্দের অপভ্রংশে রোসাইঘর, উনুনকে চুল্লীর অপভ্রংশে চুলা, ব্যঞ্জন সামান্য ব্যণন, ব্যঞ্জন বিশেষকে বেসবার শব্দের অপভ্রংশে বেস্‌সরী, চচ্চড়ীকে লাবড়া বলে। লিপ্ত হইতে লেপ্‌টা, লেপটা হইতে লাবড়া হইয়াছে। কিঞ্চিৎ সরস ব্যঞ্জনকে ইহারা রসা ও অম্বলকে চুক্র শব্দের অপভ্রংশে চুকা বলে।

শুক্তনী অপেক্ষা রঙ্গপুরে প্রচলিত শুকৃত শব্দের সহিত 'শুক্ত' শব্দের অধিক ঘনিষ্টতা। আকৃকে ইহারা কু (অর্থাৎ পৃথিবীর) সার মনে করিয়া কুসার বলে। আদাকে আদা না বলিয়া আদ্রক বলে; 'আদ্রক'ই সংস্কৃত শব্দ। বাতাপী লেবুকে 'জাম্বীর' শব্দের অপভ্রংশে জাম্বুরা বলে। প্রভাতকে পোঁয়াত ও শুকতারাকে পোঁয়াতী তারা বলে। অন্যত্র দুহিতৃ অর্থে মেয়ে শব্দের ব্যবহার, রঙ্গপুরে পত্নী অর্থে মাইয়া শব্দের ব্যবহার। রঙ্গপুরের এই ব্যবহারের অন্য প্রদেশের নরনারী হয়ত হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না; কিন্তু এই শব্দটী লইয়া ভাবিবার বিষয় আছে। ভিন্ন প্রদেশীয় ভাষাতেও স্ত্রী সামান্যকে বুঝাইতে 'মেয়ে' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন, "মেয়ে পুরুষ মিলিয়া কার্য্যটী হইল" "পুরুষের ঘাট, মেয়ে ঘাট" "মেয়েলী কথা" ইত্যাদি ইত্যাদি। স্ত্রী-সামান্যবাচী শব্দ মাত্রই সংস্কৃতে প্রাকৃতে বঙ্গভাষায় চিরদিন পত্নী অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাই আমরা 'শিব সীমন্তিনী' বলিলে শিবপত্নী দুর্গাকে বুঝি, অমুকের স্ত্রী বলিলে অমুকের পত্নীকে বুঝি। স্ত্রী-সামান্যবাচী এই 'মেয়ে' শব্দটী কি করিয়া আবার কন্যাবাচী হইবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারা যায় না বরং পত্নীকে বুঝাইতে যাইয়া রঙ্গপুরবাসী যে 'মাইয়া' শব্দের ব্যবহার করিতেছে তাহাই সঙ্গত মনে হয়। পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি ব্রহ্মা নাকি মায়ার অবলম্বনে বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলেও ত মায়া পত্নী হওয়া উচিত, কন্যা হওয়া উচিত নয়।

রঙ্গপুরের ভাষায় প্রচলিত রাশি রাশি শব্দ আছে, সেগুলির উদ্ধার করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া প্রদশন করিতে পারিলে আমাদিগের ভাষা সম্বন্ধীয় অনেক ভ্রম সংস্কার দূরীভূত হইতে পারে। জন্মভূমির কোন যোগ্যতর সুসন্তান এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া রঙ্গপুরের শব্দরাশির একখানি কোষগ্রন্থ রচনা করিলে বোধ করি উহা স্বরস্বতীর ভাণ্ডারে একটু স্থান পাইবার অযোগ্য হইবেনা এবং জন্মভূমিরও তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে।

রঙ্গপুরের পক্ষ হইতে যখন আপনাদিগের সম্মুখে আমি উপস্থিত হইয়াছি তখন রঙ্গপুরের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় না দিয়া আসন পরিগ্রহ করিলে আমি সভ্য-বৃন্দের নিকট, স্বদেশের নিকট অপরাধী হইব। তাই অল্পাকারে দুই চারিটী কথা বলিয়া শেষ করিতেছি। এক্ষণে আপনারা রঙ্গপুরকে যে আকারে দেখিতেছেন, যতটুক পরিমাণে দেখিতেছেন, পূর্ব্বে রঙ্গপুরের

এই আকার, এই মাত্র পরিমাণ ছিল না। একদিন সমস্ত বগুরা, সমস্ত ধুবড়ী, সমস্ত জলপাইগুড়ি ও ময়মনসিংহের জামালপুর সাবডিভিসন এই রঙ্গপুরের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। বিরাট কীচকের কথা তুলিব না, কীচকভীত পৃথুরাজার কথাও তুলিব না, ভগদত্তের যোজনৈকপদ হস্তীর পদচিহ্ন দেখাইব না, পালবংশ সেনবংশের কথাও উঠাইব না,—যে দিন গৌড়েশ্বর হোসেন সাহার সবল হস্তে বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালিত হইত সে দিনেও তাঁহারই প্রতিবেশী রাজা নীলাম্বর তাঁহার প্রতিদ্বন্দী হইয়া এই রঙ্গপুরের বক্ষে বসিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় অপ্রতিহত প্রভাবে পূর্ব্বদিক্ শাসন করিতেন, তখনও রঙ্গপুরের সৌভাগ্যলক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান করেন নাই। তখনও রঙ্গপুর গৌরবসূর্য্যের হিরণ্ময় কিরণে উদ্ভাসিত ছিল। মহামহোপাধ্যায় গদাধর ভট্টাচার্য্য এই রঙ্গপুর ভূমির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারই পুণ্য ধারায় বর্দ্ধিত হইয়া নব্য ন্যায়ের বিজয়-পতাকা ভারতবক্ষে প্রোথিত করিয়া জগতের সমক্ষে বাঙ্গালীর গৌরব বিঘোষিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সকলেই অবগত আছেন সে গদাধরের পাদস্পর্শেই অদ্যাপি নবদ্বীপ ভারতের পণ্ডিত রাজধানী বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে। সাইট বৎসর পূর্ব্বেও রঙ্গপুরবাসী রুদ্রমঙ্গলের প্রভাব নবন্যায়ের উপর প্রতিভাত হইয়াছিল। জয়দেব উমাপতির লেখনী মৌনাবলম্বন করিলে বঙ্গ কেন ভারতের অন্যত্রও 'পদাঙ্কদূত' 'হংসদূত' ভিন্ন সংস্কৃতে অন্য কাব্যগ্রন্থ তাদৃশ অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই 'পদাঙ্কদূত'ও নাটোর রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়াছিল। অল্পদিন পূর্ব্বে পিতামহদেবের রাজপ্রাসাদে বসিয়া মহাকবি শ্রীশ্বর লক্ষ শ্লোকে 'বিক্রমভারত' লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দিনাজপুর রাজপ্রাসাদে বসিয়া মহাকবি মহেশচন্দ্র 'কাব্যপেটিকা' লিখিয়া গিয়াছেন। কুণ্ডীর ভূম্যাধিকারী কালীচন্দ্র কেবল বঙ্গ কবি ও লেখকের উৎসাহদাতা ছিলেন না, তিনি নিজেও মুখে মুখে অনর্গল বাঙ্গলা কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। ভারতবর্ষ' ও 'নারায়ণে'র পাঠক তাঁহার রচিত কবিতা অবশ্যই পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন। পিতামহদেব ও পিতৃদেব কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া,সভায় বক্তৃতা দিয়া,সাহিত্যিকদিগের সহায়তা করিয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বংশধর হইয়া আমি আর তাহার উল্লেখ করিব না। এই মাত্র বলিতেছি, কলিকাতা মহানগরী যখন বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে উত্থিত হইয়াছিল, রঙ্গপুর তখন নিশ্চেষ্ট ছিলনা, কলিকাতার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রঙ্গপুরবাসীর সৌভাগ্য, বঙ্গের সমস্ত প্রদেশের সাহিত্যিকগণ, বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সেবকগণ, আজ রঙ্গপুরে সমবেত।

এই নগরীতেই উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম সূত্রপাত। এখানেই প্রথম অধিবেশন, বিশ্রুতনামা সাহিত্যিক মহারথের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত ও সুসম্পন্ন হইয়াছিল। আট বৎসর অতীত হইয়াছে। যে সকল স্বদেশপ্রাণ সাহিত্যসেবী মহাত্মাদিগের আন্তরিক যত্ন চেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের ফলে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে তাঁহাদিগের নিকটে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এই সম্মিলনের দ্বারা কেবল যে বঙ্গভাষার উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে, পুরাতত্ত্বঘটিত বহু অমূল্য রত্নের উদ্ধার সাধিত হইতেছে, নানারূপ ঐতিহাসিক মহামূল্য উপাদান সংগ্রহ হইতেছে, প্রত্নতত্ত্ব শিল্পতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয় অনুশীলন দ্বারা দেশের মহাকল্যাণ সাধিত হইতেছে তাহা নহে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে এই সম্মিলনী দ্বারা নানা সম্প্রদায়ের এবং নানা জাতির ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিদ্যানুরাগী সাহিত্যিকগণ একস্থানে সমবেত হইয়া বর্ষে বর্ষে ভাব চিন্তা এবং মতের আদানপ্রদান দ্বারা দেশের জাতীয় ভাব এবং পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত এবং দৃঢ় করিতেছেন ইহা আমাদিগের পক্ষে সামান্য লাভের বিষয়, সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে। এই সম্মিলনে জাতিভেদ নাই, সাংসারিক পদমর্য্যাদার বিভিন্নতা নাই, বৈষয়িক বিভব বা কুলগরিমা দ্বারা এখানে সম্মানলাভের উপায় নাই। ইহা বিদ্যানুরাগী সাহিত্যসেবীদিগের Republic। এরূপ সম্মিলনের সংস্পর্শে, আবহাওয়ায়, মানসিক উচ্চভাবগুলি অবশ্যই

পরিপুষ্ট হয়, উন্নত হয়। জাতীয় একতার ভাব সুদৃঢ় করিতে হইলে এবং উহাকে কাল্পনিক অবস্থা হইতে সত্যে পরিণত করিতে হইলে সমগ্র দেশবাসীর ভাষাও এক হওয়া আবশ্যক। বঙ্গভাষার উৎকর্ষ সাধনদ্বারা বঙ্গেরই কল্যাণ সাধিত হইবে। কিন্তু সমুদয় ভারতবাসীর সহিত এক জাতীয়-সূত্রে মিলিত হইতে হইলে তাহা যে বঙ্গভাষা দ্বারা কতদূর হইতে পারিবে তাহা বিশেষ ভাবিবার বিষয়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসিগণ যে আমাদিগের মাতৃভাষা তাহাদিগের জাতীয়ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিবে, সে আশা আমরা করিতে পারিব না; বা তাহারাও আমাদের সম্বন্ধে সেরূপ আশা করিতে পারে না। এ অবস্থায় কি উপায় অবলম্বনে এই সকল সমস্যা অতিক্রম করিয়া ভাষা দ্বারা ভারতবাসীর মধ্যে একতা এবং জাতীয় ভাব ক্রমশঃ বিস্তারিত এবং পরিপুষ্ট হইতে পারে তাহা দেশের নেতৃবৃন্দের এবং সাহিত্যিকদিগের বিশেষ চিন্তার বিষয় বটে।

আমি ক্রমে ক্রমে অনেকদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। সকলের ধৈর্য্যচ্যুতি জন্মাইয়াছি এ জন্য আমি সভাবৃন্দের নিকট লজ্জিত; নিজকে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করিতেছি।

সকলেই এই সারস্বত-মণ্ডলে সরস্বতীর বরপুত্র সরস্বতীর মুখে সরস্বতীর পরিচয় পাইবার জন্য উদ্গ্রীব। আর কিছু বলিব না, কেবল মাত্র "এস রাজেব দুষ্মন্ত" বলিয়া অবসৃত হইতেছি। নিজকে আমি অভ্যর্থনা সমিতির প্রধান ভারপ্রাপ্ত ভৃত্য বলিয়া পরিচয় দেওয়াই ইচ্ছা করি এবং সঙ্গত মনে করি। রঙ্গপুরবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায় যে আমার উপর নির্ভর এবং বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের উজ্জ্বল নক্ষত্র সম বাগ্‌দেবীর প্রিয় সন্তানদিগের সেবা এবং অভ্যর্থনার ভার আমার প্রতি ন্যস্ত করিয়াছেন, ইহা মৎ-সদৃশ গুণবিহীন এবং সাহিত্য সমাজে অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে যে কি প্রকার আশাতীত সৌভাগ্যের বিষয় তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতেছি এবং এই পদে সম্পূর্ণ অযোগ্যতা অনুভব করিতেছি বলিয়াই সভাপতি পদবীটা আমার সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছি এবং সেই কারণেই, যে ভ্রাতৃবৃন্দ আমাকে এই পদে আহ্বান করিয়াছেন, প্রাণ খুলিয়া তাঁহাদিগকে সেরূপ ধন্যবাদও দিতে পারিতেছি না। মনে হইতেছে যেন আমি অনধিকার চর্চ্চার অপরাধে নিজকে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্যই এই পদ গ্রহণ করিয়াছি। তবে যে এই পদ গ্রহণ করিতে পারিয়াছি তাহা কেবল মাত্র নিজকে এই ক্ষেত্রে সাধারণের আজ্ঞাবহ ভৃত্য বিবেচনা করাতে—নতুবা পারিতাম না। ভৃত্যের, সেবকের ত্রুটী এবং ভ্রম পদে পদেই হইতে পারে।—কিন্তু আশা এই যে, আজ আমরা মহানুভব উদারচেতা মনীষিগণের সেবায় নিযুক্ত, ক্ষমাই তাঁহাদের নিকটে জগৎ আশা করে। আর এক কথা এই যে, বিদ্যোৎসাহী, বিজ্ঞ এবং সুদক্ষ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি এই জেলার প্রধান কর্ম্মচারী এবং আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহোদয় এই অভ্যর্থনা-সমিতির কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভাপতিভাবে যেরূপ অকাতরে উদ্যম এবং উৎসাহের সহিত আজ কয়েক সপ্তাহ হইতে পরিশ্রম করিয়াছেন এবং তাঁহার সহকারী এবং অধীনস্থ ব্যক্তিদিগকে সমুদয় বিষয়ে আদেশ উপদেশ যখন যাহা আবশ্যক প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমার কার্য্যের পরিমাণ অতি অল্পই ছিল। সুতরাং যাহা কিছু হইয়াছে, তাঁহার সুদক্ষ পরিচালনের ফলেই, তাহাতে আমার কোন যশ নাই। তিনি যেরূপ অকাতর পরিশ্রম করিয়াছেন এবং গুরুতর দায়িত্বজনিত মানসিক উদ্বেগ ভোগ করিয়াছেন, তাহাতে আমি এই কয়েকটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না; আশা করি এজন্য আমি তাঁহার অপ্রীতিভাজন হইব না।

শ্রীমহেন্দ্ররঞ্জন রায়।



নবম উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি
মাননীয় বিচারপতি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, শাস্ত্রবাচস্পতি,
এম এ, ডি-এল, ডি-এস্-সি, সি-এস-আই, এফ-আর-এ-এস,
এফ আর-এস ই, এফ-এ-এস বি।

Photo by
Hop Sing & Co

নব-বধূ

উচ্ছল জল মূরছিয়া পড়ে তোমার চরণতলে,
শূন্য কলসী ভেসে চলিয়াছে চিত্রার নীল জলে ;—
সন্ধ্যা কখন সলিলের বুকে ফেলেছে রঙীন ছায়া,
নামিয়া এসেছে ধরা আবরিয়া আঁধার বিরাট কায়া ;
অস্ত-রবির ম্লান আভাটুকু কখন হয়েছে শেষ,
দূর বনানীর শ্যামল শিখরে আলোর নাহিকো লেশ।

ওগো উন্মনা, কাহার ধেয়ানে একেলা রয়েছ ভোর,
কাহার স্মৃতিটি নয়নে তোমার সঞ্চারিয়াছে ঘোর ;
কাহার বিদায়-ব্যাকুল-দৃষ্টি জাগিয়া উঠেছে চিতে
চঞ্চল করি অন্তরখানি বিরহের সঙ্গীতে!

দুইদিন আগে এমনি সাঁঝেতে শূন্য কলসী নিয়া,
সঙ্গিনী সহ চিত্রার ঘাটে যেতে এই পথ দিয়া ;
ছড়ায়ে পড়িত কৌতুক-হাসি সে পথের চারি পাশে
মুখরি তুলিতে সন্ধ্যার বায়ু চঞ্চল কলভাষে ;

রক্ত আভায় সন্ধ্যাগগন যখন উঠিত ভরে',
জলভরা ঘট কক্ষে লইয়া ফিরিয়া আসিতে ঘরে ;
আপন হর্ষে চির আনন্দে ভরা ছিল তব প্রাণ,
ব্যাকুল ব্যথার স্পর্শে তোমার হৃদয় ছিল না ম্লান!

আজ কোথা হ'তে এল এই ভাব, এই নব আকুলতা ?
দুদিন আগে যে পুঁতুলের সনে, কহিয়াছ কত কথা!
ছিল হাস্যের দীপ্তি মাখানো দুটী উৎসুক আঁখি—
এখন সরম অবনত তাহা—বুঝিতে পেরেছ তা কি ?
কোথা হ'তে এই লজ্জার ঢেউ লেগেছে হৃদয়ে এসে,
সহজ সরল চঞ্চল হাসি আজ কোথা গেছে ভেসে ?
বাসর রাতির সোহাগের মাঝে না জানি কি আছে মায়া,
হৃদয়ের প্রতি পরতে পরতে পড়িয়াছে যার ছায়া!

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ।

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পাণ্ডা পার্ব্বতীচরণের যাত্রী রাখিবার একটি বাড়ী ছিল, সেই বাড়ীতে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত ছিল, আমরা সেইখানে গিয়া উঠিলাম। পার্ব্বতীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগবতীচরণ তথায় উপস্থিত ছিল, স্নান আহার বিশ্রাম সকল ব্যাপারেরই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া সে হাঁকডাক করিয়া ফিরিতেছিল। সেদিন দৈবকার্য্য কিছু হইবে না, অপরাহ্নে পার্ব্বতীর সহিত পরামর্শান্তে যথাকর্ত্তব্য অবধারিত হইবে—মহিমখুড়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া দিলেন। পার্ব্বতী আমাদের পরিচর্য্যার্থ লোকজন রাখিয়া সভ্রাতা সেবেলার মত বিদায় লইল। সেদিন কূপোদকে স্নান সমাধা করিলাম। ঈশানচন্দ্রের অমৃতনিন্দী অন্নব্যঞ্জনের যৎপরোনাস্তি সম্মান রক্ষা করিয়া উপরের একটি ঘরে শয্যা রচনা করিয়া নিলাম, কেননা খুড়া মহিমচন্দ্র ঘন ঘন হুকুম প্রচার করিতে লাগিলেন, "একটু বিশ্রাম কর, রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় নাই, কাল পূজা অর্চ্চনায় অনেক ক্লেশ করিতে হইবে, আজ দিবাভাগে বিশ্রাম না করিলে শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িবে।" এ যেদিনের কথা সেদিনে রেলগাড়ীতে নিদ্রার কোন ব্যাঘাতই আমার হইত না। জলপূর্ণ পরিখা পরিবেষ্টিত নাটোর

রাজদুর্গে যখন বাস করিতাম নিদ্রাদেবী সেখানে প্রবেশ করিতে বহু ইতস্ততঃ করিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই জরাসন্ধের কারা প্রাচীরের বাহিরে যেই পা দিয়াছি, নিদ্রা স্বপ্ন সুষুপ্তি কিছুরই ব্যাঘাত হইত না, তথাপি মহিমখুড়ার নির্ব্বন্ধ দেখিয়া বিছানা বিছাইয়া নিতে নিতে তাঁহাকে হাসিয়া বলিলাম, "খুড়া, তুমি আমার আচার্য্যগুরু ছিলে, উপনয়নের দিনে 'মা দিবা স্বাপ্সী' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়াছ; আজ সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাইতে এত উদ্যোগ তোমার কেন?" শুনিয়াছিলাম হাসিটা সংক্রামক ব্যাপার, কিন্তু মহিম খুড়ার মনে বা তাঁহার মুখের পেশীমণ্ডলীর কোন দেশেই তাহা সংক্রামিত হইবার কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। অধিকন্তু তাঁহার মুখবিবর হইতে "জ্যেষ্ঠতাত" "বাক্যবাগীশ" এইরূপ আরও কি দুই একটি শব্দ বাহির হইতে শুনিয়া তৎকালে মৌনাবলম্বনই শ্রেয়ঃ মনে করিলাম। কক্ষান্তরে মাতুল অভয়ানাথ এবং খুড়া মহিমচন্দ্রও শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অনতিবিলম্বে খুড়ার নাসিকাধ্বনি শুনিয়া, আমাকে শয়ন করাইবার নির্ব্বন্ধের নিগূঢ় কারণ কি তাহা বুঝিতে আমার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইল না।

তখন আষাঢ়মাস। সেবারে তখনও অরুণ-সারথির পরিচালিত, সপ্তাশ্ববাহিত আদিত্যদেবতার একচক্র রথখানি গগনাঙ্গনে সদর্পেই নিত্যকর্ত্তব্য পরিপালন করিতেছে। তখনও যূথিবন-বিহারিণী পুষ্পলাবী রমণীগণের স্বেদার্দ্র মুখমণ্ডলে স্নিগ্ধচ্ছায়া বিস্তার করিতে বিরহাতুর যক্ষের অনুরোধে পুষ্করাবর্ত্তকের বংশধরগণের আবির্ভাব হয় নাই; কান্ত-সুন্দর সজল-জলদের হৃদিস্থিত স্নেহাদর আকর্ষণ করিবার জন্য নির্ব্বিন্ধ্যা তাহার নীবি মোচন করিয়া তখনও উত্তর-প্রস্থিত যক্ষসখাকে কর্ত্তব্য বিমুখ করিবার শত প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিতে আরম্ভ করে নাই; বিদিশার উৎকট বিলাসের পরিচয় গ্রহণার্থ পুষ্কর-বংশধরকে শিলাগহ্বরে যাইবার সময় তখনও আসে নাই, নিকষিত স্বর্ণাভ বৈদ্যুতিক আলোক রেখায় প্রিয়াভিসারিণী, উজ্জয়িনীর বিরুবা জনপদবধূদিগকে নিঃশব্দে পথ দেখাইবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সেবারে তখনও বোধ করি করা হয় নাই; সেই আসন্ন বর্ষার দুঃসহ গ্রীষ্মের স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে পাণ্ডা পার্ব্বতীচরণের আতিথ্য-তৃপ্ত আমি, শয্যার আশ্রয়ে বৈদ্যনাথের বিপুল মন্দিরের গগনস্পর্শী উচ্চ চূড়ার দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে আমার নিঃস মধ্যাহ্নের কর্ম্মহীন প্রহরটি কত কি ভাবনায় ভরিয়া লইতেছিলাম! ভাবিতেছিলাম, কত কোটি কল্প ধরিয়া এই পাষাণ দেবতার প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দিরের শিলাময় কঠিন সোপানতটে কত মানব মানবীর হৃদয়-রক্ত অজস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িয়াছে—কত রোগক্লিষ্ট, কত বিরহাতুর, কত বিচ্ছেদ বেদনায় মুহ্যমান জন এই পাষাণ দেবতার চরণতলে তাহাদের অবাধ উন্মুক্ত হৃদয়ের কত ব্যথাই জানাইয়া তাহার শান্তির জন্য কত কাতরে কত নিবেদনই করিয়াছে, কত পঞ্চ ষোড়শ শত সহস্র লক্ষ উপচারের কত প্রলোভনেই এই পাষাণের মন ভুলাইতে, প্রাণ গলাইতে চাহিয়াছে; কত সুবর্ণের ত্রিপত্র, কত হেমময় মালতী মালা, কত গঙ্গোত্রীর স্ফটিকনিন্দী নির্ঝর-ধারা, কত বিচিত্র বর্ণানুরঞ্জিত চীনাংশুকের দিগন্তোদ্ভাসী গগনস্পর্শী পতাকা এই পাষাণের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে; কত অন্ধ আতুরের, কত স্নেহ-কাঙ্গালের, কত ব্যথাবেদনা-নির্জ্জিতের নয়ন-নীরে এই পাষাণ-ঠাকুরের কঠিন প্রস্তরময় অঙ্গন কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহার সীমা নাই—সে সকল করুণার কথা এ পাষাণকে কি গলাইতে পারিয়াছে! পারুক আর নাই পারুক, ব্যথা বলিবার, হৃদয়ের কথা নিবেদন করিবার, নিদারুণ বেদনার দিনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিবার এই তীর্থগুলি যাঁহাদের কল্পনায় সৃজিত হইয়াছিল, দুঃখাতুর মানব মানবীর জন্য যাঁহারা অশ্রুবিসর্জ্জনের এই পবিত্র স্থানগুলি উত্তরাধিকার রূপে রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের চরণোদ্দেশে কোটি কোটি নমস্কার করি। দুঃখতাপ, ব্যথা বেদনা বুঝি মানব মনের নিত্য সঙ্গী, জীবনের অনুভূতির প্রথম মুহূর্ত্ত হইতে জীবন-শেষের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বুঝি ব্যথা বেদনার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের

উপায় নির্ম্মম ভাগ্য বিধাতা রাখেন নাই। প্রথম নয়নোন্মীলনের সঙ্গে যে রোদনের আরম্ভ, শেষ নিমেষপাত না হইয়া গেলে তাহার বুঝি শেষ হইবে না, তথাপি বেদনায় যখন আর্ত্তজনের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে চাহে, সেই দুঃসহ দুঃখের দারুণ দুর্দ্দিনেও যাহার রোদনের স্থান নাই, তাহার ন্যায় হতভাগ্য জগতে আর আছে কি? স্বজন যে দিনে বিরূপ হয়, সমাজ যখন তাহার লৌহ নিয়ম দ্বারা বাঁধিয়া হৃদয়কে অকারণ চির-উপবাসী থাকিবার জন্য কঠোর আজ্ঞা প্রচার করে, পরমাত্মীয়গণ যখন স্বার্থান্ধ হইয়া চিরদুঃখীকে আরও দুঃখ দিবার জন্য বক্ষপঞ্জরের উপর নির্দ্দয় তাণ্ডবে মাতিয়া উঠেন, জীবন-বান্ধব বলিয়া হৃদয় যাঁহার পদাশ্রয় যাচ্ঞা করিয়া আসিতেছে, সে দুঃখদিনের পরম নির্ভরটুকুও যখন অপ্রাপ্য হইয়া উঠে, সেদিনে পাষাণ দেবতার শিলাময় পাদপীঠতলে শির লুণ্ঠিত করা ব্যতীত ব্যথিতের আর কি গতি আছে! দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত যেদিন বৈদ্য কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়, সেদিনে বৈদ্যনাথই তাহার পরম সহায় ও চরম ঔষধি হইয়া দাঁড়ান। ব্যাধির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া রোগী যখন তাহার ক্লিষ্ট দেহভারকে শ্মশানশয্যায় চিরশায়িত করিবার উদ্যোগ করিতেছে, যাহার অব্যাহতির কোন উপায়ই নাই বলিয়া সকলে নিরাশ হইয়াছে, কিছু দিবস পরে সেই ব্যাধিতের দিব্য কান্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছি; তাহার বর্দ্ধিত নখ, শ্মশ্রু এবং জটাবিলম্বি কেশভার দেখিয়া বুঝিয়াছি, উৎকট রোগীর চিকিৎসার ভার কোন বৈদ্য লয় নাই, বৈদ্যনাথের কৃপা তাহাকে রোগমুক্ত করিয়া দিয়াছে। চিকিৎসকের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া একমাত্র সন্তানের জীবনাশায় যেদিন জননীকে নিরাশ হইতে হয়, সেদিন "তুলসী মঞ্চ" "হরির ধূলি" এবং গ্রামদেবতার "পাদপীঠ" শাবকের প্রাণ রক্ষা কল্পে অসহায়া জননীর কত বড় আশ্রয় হইয়া দাঁড়ায় তাহা সেই হতভাগিনীই বলিতে পারে। এ জীবন জন্ম সার্থক করিবার জন্য যাহার যে সামগ্রীর বড় প্রয়োজন, সে তাহার জন্য জীবনের প্রথমানুভূতির মুহূর্ত্ত হইতে শেষ নিমেষপাতের অন্তিমক্ষণ পর্য্যন্ত সকলগুলি তীর্থদেবতার মন্দির-দ্বারে কেমন করিয়া "ধরণা" দিয়া থাকে তাহা সেই জানে এবং তাহার অন্তর্যামী দেবতা যিনি তিনিই সে ইতিহাস অবগত আছেন।

দুরারোগ্য রোগে, দুঃসহ শোকে, দুর্লভের অভিলাষে যখন মনুষ্যের সহায়তা ও সান্ত্বনা ব্যর্থ হইয়া যায়, তখন এ ধরণীর দুর্ব্বল জীব তীর্থ-দেবতার পাষাণ বেদিকার নিকট লুণ্ঠিত ললাটে দৈববলের আশায় নিঃশ্বাস রোধ করিয়া সুদিনের অপেক্ষা করে। সে সুদিন আসুক আর নাই আসুক, ক্ষীণ আশার সূত্রটুকু অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিবার জন্য তীর্থ-মন্দিরের উপায়টুকু যাঁহারা রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের ন্যায় দুর্দ্দিনের বন্ধু বোধ করি জগৎসংসার অন্বেষণ করিয়া পাওয়া কঠিন হইবে।

আমার প্রতি নিদ্রাদেবীর সদয় করুণার কটাক্ষপাত হইল না। শুইয়া শুইয়া নানাবিধ চিন্তায় সময়টা সুখে দুঃখে কাটাইয়া দিয়া বেলা প্রায় তিনটার সময় উঠিয়া পড়িলাম। শয্যা হইতে উঠিয়া কক্ষান্তরে গিয়া দেখি, পার্ব্বতীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগবতীচরণ অপেক্ষা করিতেছে; তাহার সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিয়া দিলাম, কারণ তখনও মহিমখুড়ার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই এবং মাতুল অভয়ানাথ সবেমাত্র সুপ্তোত্থিত হইয়া তামাকু সেবনের চেষ্টায় এঘর ওঘর করিতেছেন। ভগবতীচরণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বৈদ্যনাথে "নন্দন পাহাড়" "তপোপাহাড়" প্রভৃতি দুই চারিটি স্থান দর্শনীয় আছে। বৈদ্যনাথে অবস্থিতির কাল আমাদিগের সুদীর্ঘ হইবে না সে সন্দেহ আমার মনে ছিল, তাই ভগবতীর সহিত সেই অপরাহ্নেই তপোপাহাড় দেখিবার পরামর্শ আঁটিলাম। সে বলিল, "আমাদের বাসা হইতে সেই স্থান কিছু দূরে, হাঁটিয়া গেলে পঁহুছিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে, তপোপাহাড়ে আরোহণ করিতেও কিছু সময় লাগিবার কথা। সন্ধ্যার অন্ধকারে পথে কষ্ট হইবে, সুতরাং পাল্কী করিয়া যাওয়াই সৎপরামর্শ। আমি বলিলাম, "পাল্কী কেন, গাড়ী পাওয়া যাইবে না?" ভগবতী হাসিয়া বলিল,

"মহারাজ, সব্ সহর্ কল্‌কাত্তা নাহি, গাড়ী ইহা কাঁহা মিলেগা!" জন্মাবধি পাল্কী চড়িয়া চড়িয়া এই যানটির উপর আমার মহা বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছিল। রাজধানীতে একটি দৌড়দালান ভরা পাল্কী থাকিত, কাহারও বাঁটে হাঙ্গরমুখ, কাহারও মৎস্য, কাহারও মকর ইত্যাদি নানাবিধ জন্তু জানোয়ারের কল্পিত মুখ সোনারূপায় প্রস্তুত করাইয়া নানাবিধ আকারের পাল্কীর বাঁটে তাহা যোজিত করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং শুনিয়াছি সেকালে, পাল্কীই আমীর ওমরাহের পছন্দ সই 'সওয়ারী' ছিল। এ 'সেকাল' বহুদিন গত হইয়াছে। মুসলমান রাজত্ব কোনদিনে লুপ্ত হইয়া ইংরাজী আমল পড়িয়াছে। 'কোম্পানী বাহাদুরে'র প্রসাদে ঘোড়গাড়ী, রেলগাড়ী ষ্টীমার প্রভৃতি নানাবিধ দ্রুত যান এদেশে আসিয়া পুরাতন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দিল্লীর বাদশাহ ও মুর্শিদাবাদের অনুগ্রহপুষ্ট 'নাটোর রাজ-সরকার' তখনও ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সুখস্বপ্নে মগ্ন। আরামের সওয়ারী "কিস্তি" এবং পাল্কী ব্যতীত অন্য কোনওরূপ যান বাহনে গতায়াত করা আধুনিকত্বের লক্ষণ বলিয়া খান্‌দানী ঘরে সে সকলের আমদানী তখনও হয় নাই। সুতরাং পাল্কী, নাল্‌কি, তাম্‌জাম প্রভৃতি মনুষ্যবাহিত যানারোহণে আমি অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম। ঠিক অভ্যস্ত বলিলে যাহা বুঝায় আমি তদপেক্ষা অধিক মাত্রায় ঐ সকল যানের সহিত পরিচিত ছিলাম, অর্থাৎ অতিপরিচয়ে উহাদের উপর আমার অবজ্ঞাই জন্মিয়াছিল। তদুপরি পাল্কী যানে একবার রাজসাহী হইতে বাড়ী আসিবার কালে দস্যুহস্তে পড়িয়াছিলাম, দ্রুত যানে গতায়াত থাকিলে হয়ত সে দুর্ঘটনাটা ঘটিত না, সেই জন্য মন্থরগতি পাল্কীর প্রতি আমার বিষদৃষ্টি হইয়াছিল। দস্যুর বিবরণটা এইখানে বলা আবশ্যক। সেবারে দুর্ভিক্ষ নহে, বাঙ্গলাদেশে অজন্মা হইয়া বহুলোক অনাহারে মরিতেছিল এবং ক্ষুধা পীড়িতদিগের মধ্যে অনেকে 'মারী'তেও মারা যাইতে আরম্ভ করিল। যাহারা বলশালী, সেরূপ ইতরলোকদিগের মধ্যে দস্যুবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল। এ বৃত্তি অবলম্বনের উদ্দেশ্য এই যে, যাহার অধিক আছে তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া নিয়া নিজের অভাব মোচন করা সে ক্ষুধার দিনে পাপ বলিয়া অনেকের মনে হয় নাই, এবং দস্যু হইয়া যদি ধরা পড়ে, সরকার বাহাদুরের জেলে গিয়া দুবেলা পেট ভরিয়া আহার পাইতে পারিবে, এ লোভও সেদিনে বড় লোভ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মনুষ্যকৃত আইন দেখাইয়া দোষ দিতে হয় দাও তাহাতে কেহ আপত্তি করিবে না, কিন্তু যে সামগ্রী আমার না হইলে নয়, তাহা পাইবার জন্য সচরাচর পথ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য কল্পিত আইনের চক্ষে কুপথ যাহাকে বলে, তাহা অবলম্বন করিলে, দোষ দেওয়া যতটা সোজা, অভাব মোচনের একমাত্র সোজা পথকে পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া নেওয়া ততটা সোজা নয় বলিয়া মনে হয়। কারণ দেশব্যাপী অনাহারের দিনে যাহারা অন্নদান করিয়া যশ ও খেতাব দুইই লাভ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা দেশের লোকের খাইবার ক্ষমতা থাকিতে অন্নসত্র খুলিয়া দেন না। যাক্ সে কথা।

সেই 'অজন্মার' দিনে কলেজ বন্ধ হইবার পর আমি সনাতন পাল্‌কী আরোহণে বাড়ী আসিতেছি। নাটোর-রাজসাহী রোডের উপরে 'কাণা ফকিরের তাকিয়া' বলিয়া একটি স্থান আছে। জনশ্রুতি এই যে সেই 'তাকিয়া'র আশ্রয়ে অনেক বলিষ্ঠ লোক 'রাত বিরাতে' দু' পয়সা রোজগার করিয়া দিনপাত করিত এবং কেহ কেহ বলেন যে আজও করে। কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নাও হইতে পারে, কারণ অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও সেখানে কোম্পানীর 'ডাক' মারা গিয়াছে, তাহা লইয়া থানা পুলিশ, মামলা-মোকর্দ্দমা বহু গুল্‌তন্ হইয়া গিয়াছে। আমার পাল্‌কী যখন সেই ধার্ম্মিক (?) ফকীরের 'তাকিয়ার' নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তখন আমার সঙ্গী ও লাঠিয়ালগণ এবং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী বাহকেরা সভয়ে দেখিল যে, রাস্তার দুইধারে মাঠের মধ্যে অনেক লোক 'জমায়েৎবস্ত' হইয়াছে, এবং দুই একটি মশালের আলোও দেখা যাইতেছে। পাল্‌কীর অভ্যন্তরে সুখসুপ্ত আমাকে জাগাইবার জন্য লাঠিয়ালের

জমাদার করিম খাঁ পাল্‌কির দ্বার খুলিয়া আমাকে নাড়া দিতে লাগিল। করিমের হস্ত সুকোমল নহে, তাহার বাহুস্পর্শে আমার গাঢ়তর নিদ্রা যাইবার কোন কারণ আমি না পাইয়া একটু বিরক্তির সহিতই জাগ্রত হইলাম। চক্ষুরুন্মীলন করিবামাত্র তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে সে আমাকে শুভ সংবাদ জানাইয়া দিল, "হুজুর, ডাকাতে পাল্‌কি ঘেরিয়াছে।" আমি মনে মনে ভাবিলাম, এমন সুসংবাদটা আমাকে তাড়াতাড়ি না দিলেও করিমের কোনও ক্ষতি ছিল না। যাহা হউক, সংবাদ পাইয়া খুসী হইলাম এত বড় মিথ্যা কথাটা কেমন করিয়া আজ এ বয়সে বলি! দিদিমার রূপ-কথার রাজ্যেই ডাকাত বাস করে ইহাই আমার জানা ছিল এবং সেই আনন্দময় শৈশবে দিদিমার নিকট গল্প শুনিতে শুনিতে দস্যুর দ্বারা জীবনে কখনও আক্রান্ত হইলে যেরূপ বীরত্বের সহিত তাহাদের সম্মুখীন হইয়া স্বীয় বাহুবলের পরিচয় দিবার যে সমস্ত উন্মাদ কল্পনায় সেদিনে সুনিদ্রার ক্রোড়ে সুখে নিলীন হইয়া গিয়াছি, আজ করিমের "দিঙ্‌নাগবৎ স্থূলহস্তাবলেপে" জাগরিত হইয়া দেখিলাম যে, বাল্যের সে সব বীরত্ব কল্পনা কেবল আমার বালক মস্তিষ্কের নিছক্‌ কল্পনা মাত্র—রূপ কথারই সামগ্রী। আজ এই বাস্তব-রাজ্যে তাহার কোন অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাইলাম না।

বয়স আমার তখন খুব অধিক নহে, কিন্তু সেই অল্প বয়সেই দেখিলাম, বাঙ্গালীর যথার্থ বীরত্ব যে আপদুদ্ধারের পথাবিষ্কারে, আমার সে বীরত্বের সূচনা তখন হইতেই হইতেছে। আমার এই বিদ্যালয়ে গমনাগমন কালে রাজধানীর লাঠিয়াল ৮।১০ জন আমার সঙ্গে থাকিত এবং কখন এক বা ততোধিক সংখ্যা হস্তী আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইত। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই করিম খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হস্তী কয়টি সঙ্গে আছে?" সে বলিল, "দুইটি।" প্রশ্ন করিলাল, "কোথায় তাহারা?" সে উত্তর দিল, "পাল্‌কির আগে পাছে যাইতেছে।" আমি কহিলাম, "বেশ কথা, তোমরা কয়জন আছ?" উত্তর দিল, "লাঠিয়াল আট জন, খাস দেউড়ীর ব্রজবাসী দ্বারবান ছয়জন, এবং মুসলমান বেহারা চব্বিশ জন,—লোক আমরা যথেষ্ট আছি হুজুর, তাহার উপর হাতী দুইটা আছে, হাতীর উপর খাস দেউড়ীর জমাদার রামজীবন সিং বন্দুক হাতে বসিয়া আছে; চিন্তা কিছু নাই, তবে হুজুরকে জাগাইলাম কারণ হুকুম না পাইলে আমরা কিছু করিতে পারি না; যদি আজ্ঞা হয় তবে আমরা উহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারি, আমরা লাঠিয়াল আটজন ঢাল সড়্‌কী লইয়াই প্রস্তুত আছি, ব্রজবাসীদের হাতে তলোয়ার আছে।"—বঙ্গ ব্রাহ্মণ সন্তান ব্রজনাথের তখন কি অবস্থা, আমার পাঠক পাঠিকা অনুমান করিবেন।

সহস্র বাহুভৃৎ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-বিজয়ী ভগবান পরশুরাম এবং দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামার পরে ব্রাহ্মণবংশে আর কেহ কখনও সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে বা সৈনাপত্য করিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। হঠাৎ বঙ্গদেশের গ্রামপ্রান্তবাসী নিরীহ দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান, অপ্রাপ্ত বয়স্ক, অকৃত-সমাবর্ত্তন ব্রজনাথ, সেনাপতি মহম্মদের পশ্চানুবর্ত্তী লাঠিয়াল-কুল-ধুরন্ধর করিমকে হুকুম দিয়া দস্যুদলকে আক্রমণ করাইবে, ইহাও কি সম্ভব? আর, আক্রমণ করাইব কাহার দ্বারা? ভরসা কেবল মাত্র করিম। জানি যে উহারা লাঠিবাজি ও সড়কী চালাইতে বিলক্ষণ পটু এবং বহুকাল রাজ-সংসারে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে, এই আপদ-কালে অধ্যয়ন নিরত রাজ নন্দনকে পরিত্যাগ হয় ত করিবে না, প্রাণপাত করিয়া কিশোর কুমারকে রক্ষা করিলেও করিতে পারে, কিন্তু অজ্ঞাত কুলশীল "করম-দোষী" পাল্‌কি বাহকগণকে বিশ্বাস কি? তাহারা দস্যুদলে যোগ দিবে না, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পুনরভিনয় হইবে না, তাহা কে বলিল? ব্রজবাসী দ্বারবানের অসি আমি জন্মাবচ্ছিন্নে কোষমুক্ত হইতে দেখি নাই। সিংহল-সুন্দরী পদ্মিনীর সতীত্বরক্ষা-কল্পে একবার, যোগী সমরসিংহের সহিত কাগার নদী-তীরে একবার, রাণা কুম্ভের সাহচর্য্যে একবার,

প্রতাপের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া হল্‌দীঘাটে একবার, জিজিয়ার জ্বালায় রাজসিংহের অধীনে একবার রাজপুতের নিষ্কাশিত তরবারি সূর্য্যকিরণে ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিয়াছে মাত্র, তাহার পর সব নীরব নিস্তব্ধ। জয়সিংহ, যশোবন্ত সিংহ সময়ে সময়ে তরবারি কোষমুক্ত করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহাতে কেবল নিজেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গই ক্ষতবিক্ষত করিয়াছেন। ব্রজবাসীর হস্তে আমি সিদ্ধি ঘুঁটিবার সোটাই দেখিয়াছি। সেকালে ব্রজের যত কিছু উৎপাত ঘটিয়াছে, তাহার নিবারণকল্পে ব্রজবাসী কনিষ্ঠাঙ্গুলিটি পর্য্যন্ত তোলেন নাই। গিরিধারণ, কালীয়দমন, অঘ বক কংশমারণ এবং বংশীবাদন ও রাসনর্ত্তন যাহা কিছু সব কীর্ত্তিই এক ব্রজনাথের। কিন্তু সে ব্রজনাথ দ্বাপরের, কলির নহে। যতদূরে স্মৃতির চক্ষু যায়, ভূষণার সীতারামের ধ্বংসের পর হইতে নাটোর রাজের তরবারি কোষমধ্যে সুখনিদ্রায় শায়িত, আজ বালক ব্রজনাথের কথায় সে অঙ্গাবরণ উন্মোচন করিবে এ কথা কি কেহ বিশ্বাস করেন? আমি দেখিলাম আরব বা তুরস্ক বা পারস্য বা মোগলের অতিবৃদ্ধাতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র করিমের দুষ্ট পরামর্শে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করিবার কোন প্রয়োজন নাই, সুতরাং বিশেষ গম্ভীরভাবে হুকুম দিলাম, "পাল্কি থামাইবার কোন দরকার নাই। পাল্কির দুইধারে দুই হাতী সঙ্গে সঙ্গে চলুক, তোমরা সশস্ত্র পাল্কির চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া থাক, বেহারা সবগুলি পাল্কির আগে পাছে তাহাদের 'বুলি' বলিতে থাকুক, এবং লাঠিয়ালেরা সমস্বরে তাহাদের অভ্যস্ত 'রণনিনাদ' করিয়া দস্যুদিগকে ভয় প্রদর্শন করুক; আমরা আক্রান্ত না হইলে কাহাকেও আক্রমণ করিব না, ইহাই হিন্দুর সনাতন যুদ্ধনীতি। আমি হিন্দু, সে নীতি লঙ্ঘন করিব না।" যেরূপ বন্দোবস্ত করিলাম তাহাতে একটি "চক্রব্যূহ" নির্ম্মিত হইল। ব্যূহের দ্বারে জয়দ্রথ রহিল না বটে, কিন্তু ভগদত্তের 'যোজনপাদ' দুইটি হস্তী প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের দ্বারমুখ অবরোধ করিয়া রহিল। ব্যূহমধ্যে অভিমন্যু আমি শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধ-নিরত এবং সপ্তরথীর অস্ত্রাঘাতে বিক্ষতাঙ্গ নহি এবং মিত্রপরিবেষ্টিত হইয়া পাল্‌কির অভ্যন্তরে সুখাসীন। হায়রে, দ্বাপর এবং কলির মধ্যে কত প্রভেদ! হে নিরন্তর প্রবহমান শক্তিশালী কাল, তোমার চরণারবিন্দে কোটি কোটি প্রণাম।

সেদিন পাল্‌কি না হইয়া ঘোড়গাড়ী, রেলগাড়ী বা অন্য কোনরূপ দ্রুত যান হইলে আমার কি এমন দুর্ব্বিপাকে পড়িতে হয়? তদবধি এই বিলম্বিতগতি আমিরী যানটির প্রতি আমি নিতান্তই নারাজ। কিন্তু কি করি, বিঘোরে পড়িয়া ভগবতীচরণের পরামর্শে পাল্‌কির বন্দোবস্তই করিলাম। চারিখানি পাল্‌কি আসিল; আমি, মহিমকাকা, মাতুল অভয়নাথ এবং পথ-প্রদর্শক ভগবতীচরণ পার্ব্বতীর বিপদবারণ 'দুর্গা' স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলাম।

মহিম খুড়ার কৃশতনু বহন করিয়া লইতে বাহকগণ বিশেষ ক্লেশানুভব করে নাই। আমি যদিও তাদৃশ শীর্ণ নহি, তথাপি সেদিনে কঠিন পীড়াভোগের অব্যবহিত পরে আমার ওজন তেমন অধিক ছিল না। মাতুল অভয়নাথের ব্যায়ামপটু বলিষ্ঠ শরীর দেখিতে মাংসল না হইলেও তাঁহার অস্থিগুলির ওজন সেদিনে নিতান্ত কম ছিল না। সেজন্য তাঁহার পাল্‌কিখানি প্রায়ই পিছাইয়া পড়িতেছিল, কিন্তু পথপ্রদর্শক ভগবতীচরণের পাল্‌কি সর্ব্বাগ্রে যাওয়া দূরান্তাং, তাঁহার বাহকগণ সর্ব্বশেষে অতিকষ্টে তাঁহাকে বহিয়া আনিতেছিল এবং তাহাদের সব কথা স্পষ্ট বুঝিতে না পারিলেও, পাল্‌কি বেহারার চিরাভ্যস্ত "উঁ হুঁ হুঁ হুঁ হিঁ-ও-ও-ও" রবের অন্তরালে অর্দ্ধোচ্চারিত সাঁওতালি বুলিতে ওজন গুরুতার অপরাধে ভগবতীর প্রতি অভদ্র সম্বোধনের আভাস বারম্বার পাইতেছিলাম। ভগবতীচরণও সে আভাস পাইয়া থাকিবেন, কিন্তু ভদ্রলোকে কিল খাইয়া কিল চুরি করে, সুতরাং তৎকালে বৈদ্যনাথের দধি দুগ্ধ ছানা মাখন আটা ঘৃতের প্রতি তাঁহার সাময়িক ক্রোধ হইয়াছিল না এমন কথা তিনিও বলিবেন না, আমিও বলিতে পারিব না। তিনি নীরবে

নতমস্তকে সমস্ত সহ্য করিয়া পথটুকু কাটাইয়া দিবার জন্য মনে মনে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন।

বৈদ্যনাথের রাস্তাগুলি ভাল, প্রশস্ত ও কর্দ্দম-বিহীন কঙ্করে প্রস্তুত বলিয়া দেখিতে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমরা অপরাহ্নে "তপোপাহাড়ের" পাদ-মূলে পঁহুছিলাম। ও হরি, এই কি পাহাড়! দার্জ্জিলিং দেখিবার পর হইতে পাহাড়ের প্রতি আমার মনে এক ভক্তি-মিশ্রিত সম্ভ্রমের ভাব জন্মিয়া গিয়াছিল। পাহাড় নামেই মনে হইত, "পদে পৃথ্বী শিরে ব্যোম, তুচ্ছ তারা সূর্য্য সোম, নক্ষত্র নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে"—মনে হইত অভ্রভেদীশীর্ষ, দ্রুমলতা-শ্যামল, নির্ঝর-ঝঙ্কৃত নভোনীলিমায় নিমজ্জিতাঙ্গ তপোনিমগ্ন প্রস্তরময় মহামহীধর বিশ্বের ভক্তিপ্রণতি লইবার জন্য যেন নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এ দেখিলাম যেন একটি উইয়ের স্তূপ। এই পর্ব্বত শিশুর খর্ব্বাকৃতি, বৈদ্যনাথের প্রতি আমার হৃদিস্থিত ভক্তি-স্তূপকেও যেন খর্ব্ব করিয়া তুলিল।

ভাবিয়াছিলাম নিতান্ত পক্ষে বিচিত্র বর্ণানুরঞ্জিত-মেঘাংশুকাচ্ছাদিত, সৌদামিনী-স্রজ-বিলম্বিত-কণ্ঠ শুভ্র-মণি-মুকুটোদ্ভাসিত-ললাট, তৃণ-পর্ণ-প্রসূনৈশ্বর্য্য ধরা-ধরেন্দ্রের সাক্ষাৎকার লাভ না করিতে পারিলেও, ক্ষুদ্র বল্মীক-স্তূপের দর্শনে তৃপ্ত হইতে হইবে না। মনে হইতে লাগিল সে দিনটা এবং অতটা শ্রম সবই যেন বিফল হইল; যাহা হউক মনের কথা মনেই চাপিয়া ভগবতীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিহে ঠাকুর, এই তোমার 'তপো-পাহাড়' নাকি?" কটুভাষী বাহকবৃন্দের স্কন্ধ হইতে নামিয়া যেন ভগবতীচরণ প্রাণ পাইয়াছে, তাহার উৎসাহের সীমা নাই, সে ভক্তিভরে ক্ষুদ্র "পর্ব্বতকের" (ক্ষুদ্র পর্ব্বত) পাদমূলে প্রণত হইল; তাহার পরে দাঁড়াইয়া কহিল, "জিহাঁ মহারাজ, এহি হ্যায় তপোপাহাড়, মহাত্মা লোক কভি কভি ইঁহাই আকর্ আসন করতেঁহেঁ, থোড়ে দিন্ রহ কর ফের্ দুসরে যাগামে চলে যাতেঁহেঁ।" আমি মনে মনে ভাবিলাম, না যাইয়া আর করেন কি, এই উই ঢিপির পূজা আর কতদিন চলে! জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে দেখিবার কি আছে হে ঠাকুর?" তিনি কহিলেন, "চলিয়ে মহারাজ, পাহাড় পর্ চঢ়িয়ে।" ওরে বাবা, চড়িব কোথায়, আর চড়িবার পথই বা কই? বলিলাম, "আপ্ আগে চলিয়ে, রাস্তা বাতাইয়ে গা।" তিনি তাঁহার দধি ক্ষীর-নবনীত-পুষ্ট নধর দেহ লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন, আমরা তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলাম। তিনি তাঁহার অর্দ্ধমণ ধূলি সমাচ্ছন্ন নাগরা জুতা (নাগরোচিত পাদুকা বলিয়া ইহার নাম "নাগরা" হইয়াছে, এমন ত মনে হয় না) পর্ব্বত পাদমূলে পরি-ত্যাগ করিয়া আমাদিগকেও তাঁহার কর্ম্মের অনুকরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কি সর্ব্বনাশ! সেখানে বিল্ববৃক্ষের প্রভূত প্রাচুর্য্য, এবং সেই পর্ব্বত শিশুর সর্ব্বাঙ্গে ও তাহার অঙ্গের চতুর্দ্দিকে এত অধিক পরিমাণ কণ্টক বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে যে দেখিলে মনে হয় যেন ভগবতী-কথিত পর্ব্বতশীর্ষবাসী কোনও মহাত্মা তপো-বিঘ্নকারীর সান্নিধ্য পরিহার মানসে তাঁহার শান্ত আশ্রমটিকে কণ্টকাস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি সভয়ে কহিলাম, "ঠাকুর, কাজ নাই আমার পর্ব্বতা-রোহণের পুণ্যার্জ্জনে, কাজ নাই আমার মহাত্মা দর্শনে; কণ্টককে সর্ব্বদা পাদুকার নিম্নেই রাখিতে হয় ইহাই জানি, নগ্নপদে তাহার তীক্ষ্ণাগ্রের স্বাদ-গ্রহণ করা আমার কার্য্য নহে।" ভগবতী বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে চাহিল; হয়ত মনে করিল, ভবানীর বংশধর, রাজর্ষি রামকৃষ্ণের পিণ্ডাধিকারী হইয়া এ ব্যক্তি এমন দুর্বৃত্ত ও দেব-দ্বিজে ভক্তিহীন কেমন করিয়া হইয়া উঠিল! মহিমখুড়া বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁহার বিদ্যাসাগরী বিনামা জোড়াটি সুদূরে রাখিয়া দিয়া গললগ্নীকৃতবাসে পর্ব্বত-মূলে দাঁড়াইলেন, ইচ্ছা যে আমি তাঁহার দৃষ্টান্তে বিনয় শিক্ষা করি। পারলৌকিক সদগতি অপেক্ষা ইহলোকের সুখ-সৌভাগ্য অনেকের নিকট প্রিয়তর, আমিও সেই শ্রেণীর একজন, সুতরাং পাদুকা পরিহার আমি কিছু-তেই করিলাম না। তখন অগত্যা ভগবতী বলিল, "আচ্ছা চলিয়ে, জুতা সমেত চলিয়ে মহারাজ, পাহাড়কা

টিব্বেকে পাস্ এক চার কদম আগে উতারিয়েগা জোড়া—আচ্ছা ?" আমি কহিলাম, "সেস্থান কণ্টকহীন হইলে আমার কোন বাধা হইবে না।"

বসন্ত-সমাগমে বৎসরে একবার করিয়া বিশ্বরাণীর সর্ব্বাঙ্গে যেমন বর্ণ বাস রবের মহোৎসব পড়িয়া যায়, সেদিনে আমার জীবনে বসন্ত-সমাগমের দুর্ল্লভ মাহেন্দ্র মুহূর্ত্ত সমাগত, অন্তরে বর্ণ বাস আলো গানের তুমুল তরঙ্গ উঠিয়াছে। বসন্তে কণ্টক-তরুও যেমন পর্য্যাপ্ত পুষ্প-পল্লব-ভূষায় তাহার কণ্টক আচ্ছাদন করিয়া দাঁড়ায়, আমার অন্তরেও তেমনি কোথাও কোন কাঁটা আছে এমন মনে হইতেই পারিতেছিল না। তাই ভগবতীকে বলিয়াছিলাম, "সেস্থান কণ্টকহীন হইলে আমার কোন বাধা হইবে না।" হায় আমার দুরদৃষ্ট, তখন কি জানি কণ্টহীন স্থান দুর্লভ হইতেও সুদুর্লভ !

সেই লোকসমাগম-বিহীন প্রান্তর মধ্যস্থ ক্ষুদ্র পর্ব্বত-শিশুর অঙ্গ বাহিয়া আমরা উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম। মাতুল অভয়নাথ আমার দৃষ্টান্তে উপানৎ পরিত্যাগ করিলেন না। অতি সাবধানে কঙ্কর-বিক্ষিপ্ত কণ্টকাস্তীর্ণ পথহীন পর্ব্বতে আমরা চারিজনে উঠিলাম। "উঠিলাম" বলিতে যত সহজ, ওঠা কার্য্যটা তত সহজে হয় নাই। জীবনে কেন্দ্রভ্রষ্ট পথহীন ধূমকেতুবৎ কত প্রখ্যাত নগরীতে, কত অজ্ঞাত পল্লীতে, কত দুস্তর নদী-সরিৎ-সরোবরে, কত দুরারোহ নগ-শৈল-পর্ব্বতে আমার লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যবিহীন দুর্দ্দিন কাটাইয়াছি ও কাটাইতেছি, বদরি-কেদারের দুর্লঙ্ঘ্য পার্ব্বত্যপথে, ভূস্বর্গ কাশ্মীরের শীতার্ত্ত দুর্গম বর্ত্মে, আফগানিস্থানের তৃণশস্পহীন প্রান্তরে, রাজপুতানার ও সিন্ধের মরীচিকোদ্ভ্রান্ত দুস্তর মরু-বালুকার মধ্যে, নতোন্নত গিরি-মেখলা-পরিবেষ্টিত শঙ্কর চমন কোয়েটার অধিত্যকায়, "বেলুচের" শিরশ্ছেদোদ্যত শাণিত খড়্গের ঝলকিত বিদ্যুতালোকে, জয়ন্তীয়া খাসিয়া নাগার কর্কশ হস্তের বর্ব্বর বন্ধনে, "তখ্‌তি সোলেমান" ও "মার্ত্তণ্ডে"র দুরতিক্রম্য পিচ্ছিল পথের শ্রমজনিত দারুণ পিপাসায় অনেক ক্লেশই পাইয়াছি, কিন্তু বৈদ্যনাথের এই "মহাত্মা পরি-সেবিত" পর্ব্বত-শিশুর কণ্টকাকীর্ণ অঙ্গারোহণে যে ক্লেশ সেদিনে পাইয়াছিলাম তাহা চিরকাল স্মরণ থাকিবে। আরোহণকার্য্য একরূপে শেষ হইল, কোন মহাত্মার দর্শন পাইলাম না। কেবল কণ্টকের আঘাতই সে পর্ব্বত-যাত্রার চরম ফল হইল। যখন নগশিশুর শিরোদেশে উঠিলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, তখনও নামিবার পালা বাকি আছে, ওঠা অপেক্ষা নামা আমার পক্ষে কঠিন। বিধাতা আমার পদদ্বয় বড়ই ক্ষুদ্র করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই জন্য উচ্চ নীচ এবং "গড়ন্ত" পথে সাবধানে না নামিলে পতন-ভয় আমার সমূহ, তাহার উপরে সন্ধ্যার অন্ধকারে আমার ব্যাধিগ্রস্ত চক্ষুর দৃষ্টি দূরে যায় না সুতরাং প্রতিপদক্ষেপেই আমার পতনের আশঙ্কা রহিয়াছে। জীবনে যখনই একান্ত স্নেহপরায়ণ অন্তরতম প্রিয়-জনের সাহচর্য্যে কাটাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে, সে সময়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে পা বাড়াইতে হইলেই প্রসারিত স্নেহ-বাহুটির আশ্রয় পাইতাম এবং প্রতি পাদ-বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে করুণার্দ্র কণ্ঠের সাবধান-বাণী আমার কাণের মধ্য দিয়া প্রাণ স্পর্শ করিত। কখনও বসিয়া বসিয়া কখনও বা দাঁড়াইয়া, বিল্ববৃক্ষের কাণ্ড শাখা মূল প্রভৃতি সময়ে সময়ে আশ্রয় করিয়া এবং অভয়-নাথের সবল স্কন্ধে নির্ভর করিয়া কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর নিবিড়ান্ধকারে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলাম। তখন রাত্রি প্রায় ৮টা হইবে। মহিম খুড়ার মত পাদস্পর্শ-জনিত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আরোহণ-মুহূর্ত্তে পর্ব্বতকে প্রণাম করি নাই, কিন্তু সমস্ত প্রত্যঙ্গগুলি বজায় রাখিয়া নামিয়া চিরস্থিরা সর্ব্বংসহার অভয়-ক্রোড়ে যখন স্থান পাইলাম, তখন পর্ব্বতের পাদমূলে প্রণত হইলাম। সে প্রণাম কোথায় পঁহুছিল, কে তাহা গ্রহণ করিলেন, সে কথা, জিনি সব জানেন তিনিই জানেন।

আবার পাল্কী আরোহণের পালা, ভগবতীচরণের অদৃষ্টে আবার বাহকের সম্বন্ধ স্থাপনা-সূচক অমধুর গুঞ্জন-গালি সুরের সহিত চলিতে লাগিল, অন্ধকারাচ্ছন্ন

প্রান্তর পথে সাবধান পাদক্ষেপে বাহকেরা আমাদিগকে রাত্রি প্রায় দশটার সময় পার্ব্বতীর "যাত্রী বাড়ীতে" পঁহুছাইয়া দিল। পার্ব্বতী আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

পরদিবস পূজা অর্চ্চনা শ্রাদ্ধ দান ষোড়শ যাহা কিছু হইবে তাহার পরামর্শ মহিম খুড়ার সঙ্গে চলিতে লাগিল। কামাখ্যায় সমস্ত বন্দোবস্ত আমাকে করিতে হইয়াছে। এবারে আমি আরামে আছি, কারণ মাতা এবার মহিম খুড়াকে সর্ব্ব কার্য্যের ভার দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, আমার কোন দায়িত্বই ছিল না। পর্ব্বতে আরোহণ ও অবরোহণ জনিত শ্রমে ক্ষুধার প্রাবল্য বড় কম হয় নাই—মহিম খুড়াকে তাগাদা দিলাম, তাঁহার উঠিবার কোন লক্ষণ দেখিলাম না। তিনি পার্ব্বতীর সহিত যুদ্ধে মত্ত হইয়া গিয়াছেন। পার্ব্বতীর ইচ্ছা রাজ-সংসারের ধন সম্পদ যাহা কিছু আছে তাহা এই এক পূজায় সম্পূর্ণ শেষ হইয়া যায়। খুড়া অবশ্য দেয় খরচা হইতেও কিছু কম করিবার চেষ্টায় প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়াছেন। আমি দেখিলাম এ যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হইবে না, পার্ব্বতী সহসা বা সহজে নিষ্কৃতি দিবার পাত্র নহে, সুতরাং আমি খুড়ার অনুমতি লইয়া আহারের চেষ্টায় গেলাম। গয়াসুরবৎ বিপুল দেহধারী গয়ারাম সূপকারের অপক্ক অন্ন এবং 'স্নেহ লাবণ্য শূন্য' ও 'অদত্ত বরবর্ণিনী' ব্যঞ্জনে যাহার আহারের কোনও ব্যাঘাত করিতে পারে নাই, ঈশানচন্দ্রের রন্ধন যে তাহার নিকট মন্থিত সাগরের সুধার সমতুল সে বিষয়ে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? আহার শেষ করিয়া শয়ন করিলাম, স্বপ্নহীন সুষুপ্তির মধ্যে আষাঢ়ের দুঃসহ গ্রীষ্মের স্বল্লায়ু রজনী কেমন করিয়া কাটিয়া গিয়াছিল তাহার কোন স্মৃতিই আজ নাই।

পরদিন প্রাতে মহিম খুড়ার তাড়ায় সকাল সকাল শয্যা ত্যাগ করিতে হইল। পার্ব্বতীর জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছি—সে আসিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে এবং সর্ব্ব প্রথমে মহাদেবের মন্দির সন্নিহিত "শিবগঙ্গায়"—(নাতিক্ষুদ্র এবং নাতিবৃহৎ জলাশয়) স্নান করিতে হইবে। তাহার পর পূজা অর্চ্চনা দান ধ্যান শ্রাদ্ধ শান্তি ষোড়শ-উৎসর্গ এবং সর্ব্বশেষে "সুফল লওয়া"।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই মহাদেব-মন্দিরের চূড়ায় পতাকা বাঁধিবার নিয়ম আছে; বৈদ্যনাথ আর পুরীর পুরুষোত্তমের মন্দিরে পতাকা বাঁধিবার নিয়ম অতি নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালিত হয়; যাহার যেরূপ শক্তি সামর্থ্য তদনুসারে ক্ষুদ্র বৃহৎ সাধারণ বা মূল্যবান সূতা বা রেশমের পতাকা প্রত্যেকে প্রস্তুত করাইয়া লয়।—আমারও জন্য পতাকা প্রস্তুত করান হইয়াছিল; মূল্য কত তাহা আজ ঠিক স্মরণ হইতেছে না, কিন্তু বিচিত্র-বর্ণের নানাবিধ চীনাংশুকের প্রস্তুত সুদীর্ঘ এবং মনোরম পতাকা বাঁধিয়া দিয়াছিলাম তাহা স্পষ্ট মনে পড়িতেছে। মন্দির-গাত্রে লম্বমান লৌহশৃঙ্খল ধরিয়া মন্দির শীর্ষে চড়িয়া পতাকার একাংশ ত্রিশূলের সহিত বাঁধিয়া দিতে হয়; এই কার্য্য করিবার জন্য সেখানে কতকগুলি লোক আছে যাহারা পূজার্থী যাত্রীর নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ মজুরী লইয়া মন্দির-চূড়ায় চড়িয়া যায় এবং তীর্থযাত্রীর সর্ব্বপ্রকার মনোবাঞ্ছা পূরণের আবেদন ভগবচ্চরণে নিবেদন করিয়া, শূলীর সংহার-ত্রিশূলকে ক্ষৌমবস্ত্রে শোভিত করিয়া নামিয়া আইসে। নিয়ত অভ্যাসবশতঃ উহারা এই আরোহণ অবরোহণ কার্য্য এরূপ অবলীলায় সম্পন্ন করে যে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। যদি এই পতাকা বাঁধিবার কার্য্য পূজার্থী যাত্রীর স্বয়ং নির্ব্বাহ করিবার নিয়ম থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় নিরতিশয় ভক্ত যাত্রীকেও পতাকা বাঁধিবার পুণ্যার্জ্জন হইতে বিরত হইতে হইত।

আমার বিশ্বাস ছিল পতাকা স্বয়ং পূজার্থীকেই বাঁধিয়া দিতে হয়, কিন্তু বৈদ্যনাথ মন্দিরের উচ্চতা যখন আমার চক্ষুগোচর হইল তখন "বারবাজি"তে পটু এবং নানাবিধ বৃক্ষে আরোহণক্ষম আমাকেও ভাবিত করিয়া তুলিয়াছিল। রজনীর অন্ধকারে সুবৃহৎ নারিকেল বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ফল সংগ্রহ করিয়াছি, বাল্যকালে

নানারূপ বিপদ-সঙ্কুল কার্য্যে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হইয়াছি, দহ্যমান গৃহের চালে চড়িয়া অগ্নিদাহ হইতে সমগ্র গ্রাম বা নগরকে রক্ষা করিবার চেষ্টা অকুতোভয়ে করিয়াছি, বাজি রাখিয়া বর্ষা-তরঙ্গ-সঙ্কুলা খরস্রোতা ভাগীরথী সন্তরণে পার হইবার উদ্যম করিতে কিছুমাত্র ভীত হই নাই, বন্ধুকে রক্ষা করিবার মানসে ক্রোধোন্মত্ত সশস্ত্র ৪০।৫০ জন 'গুণ্ডার' সহিত নিরস্ত্র এককের যুদ্ধ সম্ভাবনা দেখিয়া মনে কিছুমাত্র ভয় বা ভাবনার উদয় হয় নাই, কিন্তু কেবলমাত্র একটি লৌহ-শৃঙ্খল অবলম্বন করিয়া দেবমন্দিরের চূড়াগ্রভাগে আরোহণ করিবার সম্ভাবনা আমাকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। যখন পার্ব্বতীর মুখে শুনিলাম ঐ কার্য্য করিবার জন্য এক শ্রেণীর লোক সেখানে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে এবং আমার জন্যও একজনকে নিয়োগ করিয়া রাখা হইয়াছে, তখন একটি বড় ভাবনার গুরুভার আমার মন হইতে নামিয়া গেল।

সর্ব্ব প্রথমে ক্ষৌরকার্য্য শেষ করা গেল। নিয়ম মস্তক কেশহীন করা, তবে একবার বাড়ী হইতেই "মানতের" চুল পাঠান হইয়াছিল, সেই যুক্তিতে এবার আর সর্ব্ব-মুণ্ডন করিলাম না। সাঁওতালি নরসুন্দর নরকে যে পরিমাণে সুন্দর করিতে পারে তাহাই করিয়া লইলাম। "শিবগঙ্গায়" স্নান সমাপন করিয়া দান উৎসর্গ কার্য্য শেষ করিলাম। ব্যাপার অতি বৃহৎ দেখিলাম, ষোড়শ প্রকারের দান শেষ করিতে সময় নিতান্ত কম লাগিল না। তাহার পরে শিবপূজা। আমি দীক্ষিত নহি, কিন্তু তাহাতে "মানত" পূজায় কোন বিঘ্ন হয় না এই বিধান পার্ব্বতী পাণ্ডা দিল, বিশেষতঃ উপনয়নান্তে ব্রাহ্মণ, নারায়ণ এবং শিবপূজার অধিকারী হয়। আমার আচার্য্যগুরু মহিমখুড়াও এ বিধান দিলেন, সুতরাং আমি ভৈরব মন্দিরে একাগ্র-নিষ্ঠার সহিত দেবাদিদেবের পূজায় বসিলাম।

৺কামাখ্যার মন্দিরে তীর্থদেবতার পূজা আমার প্রথম আরম্ভ—এই পূজা নিষ্কামভাবেই করিয়াছিলাম। সে সময়ে কাম্য আমার কি, তাহা বুঝি নাই। বৈদ্য-নাথে দ্বিতীয়বার তীর্থাধিষ্ঠাতা দেবতার সম্মুখে আরোগ্য-কামী হইয়া পূজায় বসিলাম। ইহার কিছু দিবস পর হইতে আজ পর্য্যন্ত নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছি—জীবনারম্ভের প্রথম প্রভাতে, জীবনের অনুভূতির আদি মুহূর্ত্তে, নিতান্ত অভিলষিত প্রিয়াৎ প্রিয়তর, জীবন সার্থককারী কামনার সামগ্রী আমার কি তাহা জানিয়াছি, সেই স্পর্শমণি অপেক্ষা মহার্ঘ্য, আমার সকল-বাড়া অমূল্য-নিধির আশায় শতাব্দীর একপাদ কাল তীর্থ-দেবতার পাদপীঠতলে একান্তমনে তপস্যা করিতেছি, আমার ভাগ্য-বিধাতা কবে প্রসন্ন হইবেন তাহা একমাত্র তিনিই জানেন।

ফল জল পুষ্প পত্র যাহাই কিছু মহাদেবের নামে উৎসর্গ করা হয়, তাহার মন্ত্র এখানে কেবল "ওঁ নমঃ শিবায়" নহে, এই শিবের একটি বিশেষণ দেওয়া হয়, সে বিশেষণ "রাবণেশ্বরায়।" কোন্ তন্ত্রের কোন্ পটলে, কিংবা কোন্ পুরাণের কোন্ গল্পে এই বিশেষণের হেতু বিবৃত আছে তাহা পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে তন্ত্র বা পুরাণের নাম বলিতে পারিল না, কিন্তু নিম্নলিখিত গল্পটি আমায় শুনাইল।

বহু কষ্টসাধ্য তপস্যায় পরিতুষ্ট মহাদেব কৈলাস ত্যাগ করিয়া রাবণের স্বর্ণপুরী লঙ্কায় যাইয়া চিরবসতি করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তবে সর্ত্ত এই মাত্র ছিল যে পথে যদি তাঁহাকে কোথাও নামানো হয় তবে তিনি সেই স্থানেই থাকিবেন। পরিতুষ্ট ইষ্টদেবতাকে স্কন্ধে লইয়া রাক্ষসাধিপতি মহোল্লাসে লঙ্কাভিমুখে চলিলেন।—এদিকে দেবলোক মহা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। আশুতোষ যদি লঙ্কায় তাঁহার চিরনিবাস স্থাপনা করেন, তবে তাঁহার অনুগ্রহ-দর্পিত দশানন ত্রিলোকে দুর্ব্বার হইয়া উঠিবে। সমস্ত দেবতারা পরামর্শ করিয়া বরুণকে রাবণের শরীরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। রাবণ 'নিতান্ত প্রয়োজনে' একবার স্কন্ধ হইতে মহাদেবকে নামাইতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু পুনরায় তুলিয়া স্কন্ধে করিয়া লঙ্কায় যাইবার সময় যখন সমাগত হইল, মহাদেব বিশ্বম্ভর হইয়া বসিলেন। মহাবলশালী রাবণ তাঁহার বিংশতি হস্তে প্রাণপণ চেষ্টা

করিয়াও মহাদেবকে তিলমাত্র নড়াইতে পারিলেন না। বিফল মনোরথ লঙ্কেশ্বর বুঝিলেন, দেবচক্রে এ দুর্ঘটনা ঘটিল। দেবতারা তখন দূরে, সুতরাং সমস্ত ক্রোধ গিয়া পড়িল বাক্যহীন পাষাণ দেববিগ্রহটির উপর। ক্রোধোন্মত্ত রাক্ষসেশ্বর, কৈলাসপতির পাষাণ-মস্তকে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া চলিয়া গেলেন।—রাবণ কর্ত্তৃক আনীত বলিয়া মন্ত্রে "রাবণেশ্বরায়" বিশেষণটি সংযোজিত হইয়াছে এবং জ্যোতির্লিঙ্গ বৈদ্যনাথের পাষাণ মস্তক রাবণের মুষ্টির আঘাতে তদবধি চাপিয়া গিয়াছে।

পূজা শেষ হইয়া গেল। মন্দির প্রাঙ্গণকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেক ঘরে এক একটি দেব বিগ্রহ স্থাপিত আছে, পদমর্য্যাদা অনুসারে তাঁহারাও কিছু কিছু পূজা পাইয়া থাকেন—যেমন রাজধানীতে রাজার পূজা দিয়াই ভক্তের নিষ্কৃতি হয় না, গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকপাল-রূপী রাজকর্ম্মচারিগণকেও তাঁহাদের পদমর্য্যাদা ও ইষ্টানিষ্ট করিবার ক্ষমতার অনুপাতে পূজা দিতে হয়। শুধু দিক্‌পালাদি বা আদিত্যাদি দেবতার পূজা দিয়াই নিষ্কৃতি পাইলে ক্ষতি ছিল না; রাজধানী স্থানে শনি রাহু কেতুরও পূজা দিতে হয়—কারণ তাহারাই অনিষ্ট অধিক পরিমাণে করিতে পারে; রাহু কেতুর দৃষ্টিতেই মানুষ ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়ে।

মহাদেবের "ভারবহন" একটি প্রথা বৈদ্যনাথে প্রচলিত আছে। বিষয়টি এই—পূজার্থী যাত্রী দেবার্চ্চনার অঙ্গীয় সমস্ত কার্য্য সমাধা করিলে পর, তাহাকে গেরুয়াবসন পরাইয়া সন্ন্যাসীর সাজে সজ্জিত করা হয়, এবং গোয়ালা যেমন বাঁকে করিয়া তাহার পণ্য লইয়া হাটে বাজারে বিক্রয়ার্থ যায়, সেইরূপ একটি বাঁকের উভয় পার্শ্বে ডালায় করিয়া কতকগুলি সামগ্রী সজ্জিত করিয়া সন্ন্যাসী-বেশধারী যাত্রীর স্কন্ধে তাহা তুলিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাকে সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করানো হইয়া থাকে।

নিদাঘের দুঃসহ সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত পাষাণ প্রাঙ্গণ অগ্নি বিকীরণ করিতেছে; পাদুকাহীন পদে সেই বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সাতবার মন্দির-প্রদক্ষিণ যিনি করিয়াছেন, তিনিই জানেন উহা কি কষ্টকর ব্যাপার। প্রাতঃকাল হইতে অনাহারে দেবার্চ্চনার অঙ্গীয় নানাবিধ করণীয় অনুষ্ঠান শেষ করিতেই পিপাসা ও শ্রান্তিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। তাহার উপর অগ্নিবর্ষী সূর্য্যের তাপতপ্ত প্রাঙ্গণতলে সপ্তবার মন্দির প্রদক্ষিণ করায় ধর্ম্ম থাকিতে পারে, কিন্তু সে ধর্ম্ম অর্জ্জনের ক্লেশ নিতান্ত পুণ্য-লোভাতুর জনেই স্বেচ্ছায় স্বীকার করে; অধিকাংশ ব্যক্তিই যে দায়ে পড়িয়া স্বীকৃত হয় ইহাতে আমার সন্দেহ মাত্র নাই। আমাকে যখন সন্ন্যাসী-বেশে শ্মশান-বিহারীর প্রসন্নতার কামনায় ভার স্কন্ধে নিদাঘ দ্বিপ্রহরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে হইয়াছিল, তখন বারংবার মনে হইতে লাগিল, "মূর্দ্ধ্নি সহঃ রবেস্তেজঃ সিকতায়াঃ পদেহপি ন" কথাটা অবিসম্বাদিত রূপে সত্য, কারণ মার্ত্তণ্ড-দেবতার ময়ূখতেজ মাথায় করিয়া বহন করিতে তাদৃশ ক্লেশ পাই নাই; কিন্তু তাপতপ্ত পাষাণ প্রাঙ্গণের অগ্নিস্পর্শ পদদ্বয়কে সত্য সত্যই দগ্ধ করিয়া দিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

লর্ড কিচ্‌নার

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশেষ প্রয়োজনের সময় লর্ড কিচ্‌নারের মৃত্যু হইল। ম্যাক্‌বেথের কথাটা একটু পরিবর্ত্তন করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—He should have died hereafter! বোধ হয় খার্টুমে জেনারেল গর্ডণের মৃত্যুতে ইংরাজ এত বিচলিত হন নাই। গর্ডণকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে পারা যাইত;:কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। দুটী দিন পূর্ব্বে গর্ডণের সাহাযার্থ সৈন্য পাঠাইলে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইত। খার্টুমে গর্ডণের মৃত্যু ইংরাজ কখনও ভুলিতে পারিবেন না।

অনেক বৎসর অতিবাহিত হইল। সুদানের মরুভূমিতে মাহ্‌দি যে অনর্থ ঘটাইয়াছিল, তাহার কোনও প্রতিকার হইল না। ফ্রান্স তখন ইংরাজকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত। সে ইংরাজকে বলিল—"মিশর এখন কাহারও পরামর্শ না লইয়া স্বয়ং শাসন কার্য্য চালাইতে সক্ষম; মিশরের কোনও সীমান্তে বিপদের কোনও আশঙ্কা নাই;—অতএব এখন তোমাদের মিশর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসা উচিত।" ইংরাজ পত্রিকা-সম্পাদক লাবুশীয়রও ইংরাজ গভর্মেণ্টকে এই পরামর্শ দিলেন। ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন এমন সময়ে সুদানে আর একজন মাহ্‌দির আবির্ভাব হইল। ভাগ্যবিধাতা নূতন সূত্রে মিশরকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত গ্রথিত করিয়া দিলেন।

মিশরের পশ্চিম প্রান্তে আর একজন মাহ্‌দির আবির্ভাব হইল। মরুভূমির বালুকারাশির উপর দিয়া প্রচণ্ড সাইমুম্ বাত্যার মত আব্দুল্লাহীর দরবেশবাহিনী দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়া তুলিল। ইংরাজ তখন পশ্চিমাঞ্চলে রেল পাতিতেছিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন; তাঁহারা ফরাসি গভর্মেণ্টকে বলিলেন—"এখন মিশর পরিত্যাগ করিবার কল্পনা সম্ভবপর নহে।" আব্দুল্লাহী জেহাদ ঘোষণা করিল। ইংরাজ গভর্মেণ্ট্ তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সর্দ্দার কিচ্‌নারকে মিশরের সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

সে আজ বিশ বছরের কথা। তখন কে জানিত যে ওম্‌দার্ম্মাণ-জয়ী মাহ্‌দি-সমাধি-বিধ্বংসী 'খার্টুমের কিচ্‌নার' আজ অর্ক্নি দ্বীপ পুঞ্জের নিকটে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন!

তখন পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা ছিল; আন্তর্জাতিক বিরোধের আশঙ্কা ছিল; কিন্তু একনিষ্ঠ চিরকুমার কিচ্‌নার পলিটিক্স্-এর কোনও ধার ধারিতেন না বলিয়া অবিচলিত ভাবে নিজের গন্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ফ্যাশোদায় ফরাসী সেনানী মেজর মার্শ্যাং স্বদেশীয় ত্রিবর্ণপতাকা উড্ডীন করাইয়া যে ফ্যাসাদ বাঁধাইয়াছিলেন, আপন পৌরুষবলে সর্দ্দার সে হাঙ্গামা কাটাইয়া উঠিলেন; তাঁহার দৃঢ়তা দেখিয়া ডাউনিং ষ্ট্রীটও দৃঢ়স্বরে বলিতে পারিয়াছিল—'ফ্যাশোদায় ফরাসীপতাকা উড়িতে পারে না, কারণ ও অঞ্চলে সমস্ত ভূখণ্ডের উপর জেনারল গর্ডণের ব্রিটিশ পতাকা একদিন উড্ডীয়মান হইয়াছিল।' ফরাসী গভর্মেণ্ট মার্শ্যাংকে পতাকা নামাইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। মেজর তখনও ইতস্ততঃ করিতেছিলেন; ইংরাজের দৈনিক পত্রের টেলিগ্রাম-স্তম্ভে বড় বড় অক্ষরে লেখা হইল—Major Marchand shows his teeth!—মেজরের সুবুদ্ধি হইল। ফ্যাসাদ মিটিয়া গেল। কিন্তু ফরাসী দৈনিক পত্র 'মাতিঁয়ে' (Matin) বলিল—'ইংরাজের এই pin-pricks কতদিন আমরা সহ্য করিব?' তদবধি এই pin-pricks কথাটি পলিটিক্স-এর করেন্সিতে সব দেশে চলিয়া গেল।

ঐ কথাটি রহিয়া গেল বটে, কিন্তু সে ব্যথাটা রহিল না। আজ ইংরাজ ও ফরাসী পরস্পরের সখা। সে দিন যখন হঠাৎ গুজব রটিল যে সেনাপতি মার্শ্যাং রণক্ষেত্রে নিহত হইয়াছেন, তখন সমস্ত ইংরাজি পত্রিকা

গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল ; পরে যখন প্রকাশ পাইল যে এ সংবাদ মিথ্যা, রয়টার সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্রিকায় এই আনন্দ সংবাদ ঘোষিত করিয়া দিল। আজ লর্ড কিচ্‌নারের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া ফরাসী প্রেসিডেণ্ট্ পোঁয়াকর্ সমগ্র ফরাসী জাতির মর্ম্মান্তিক বেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

মিশর পরিত্যাগ করা হইল না বটে, কিন্তু সর্দ্দার মাহ্‌দি-বহ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।

বূয়রের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বাধিল। স্যর জর্জ্জ হোয়াইট্ লেডিস্মিথ দুর্গে, ও জেনারল্ ব্যাড্‌ন্ পাউএল্ ম্যাফেকিং দুর্গে শত্রুকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন। লর্ড রবার্টস্ প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন ; সর্দ্দার কিচ্‌নার তাঁহার ষ্টাফের অধ্যক্ষ (Chief of the staff)। অশ্বারোহী সেনার অধিনায়ক স্যর আয়ান্ হ্যামিণ্টন্ ম্যাফেকিং দুর্গ হইতে ব্যাড্‌ন্ পাউএল্‌কে মুক্ত করিলেন। বূয়র-বীর ক্রনী (Cronje) লর্ড রবার্টস্-এর নিকট আত্মসমর্পণ করিল। কিছুদিন পরে সর্দ্দার কিচ্‌নারের হস্তে সমগ্র ব্রিটিশ সেনার ভার ন্যস্ত করিয়া লর্ড রবার্টস্ দেশে ফিরিয়া গেলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বূয়র ইংরাজের সহিত সন্ধি করিল। এই 'বিয়ারি-নিঙ্গিং-এর সন্ধি' কিচ্‌নারের কথানুযায়ী সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহারই পরামর্শে ডাউনিং ষ্ট্রীট সন্ধির সর্ত্ত নিরূপিত করিয়াছিল।

তাহার পর তাঁহাকে আমরা ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করিয়া লই। তাঁহার নেতৃত্বকালে সেনাবিভাগের আমূল পরিবর্ত্তন হইল। বাঙ্গালা বোম্বাই পঞ্জাবের বিভিন্ন সেনাদলকে এক কেন্দ্রভুক্ত করা হইল ; বড় লাটের সভায় প্রধান সেনাপতি 'মিলিটরি মেম্বর' হইলেন ; দেশী ও গোরা সেনার হাতে নূতন প্যাটার্ণ্-এর বন্দুক দেওয়া হইল।

লর্ড কর্জ্জনের সহিত লর্ড কিচ্‌নারের বিরোধ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে। তাহার ফলে লর্ড কার্জ্জন পদত্যাগ করিলেন। আজ সে কথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ওদিকে মিশরের ন্যাশনালিষ্ট দলকে লইয়া লর্ড ক্রোমার কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি দেশে ফিরিয়া গেলেন ; তাঁহার পরিবর্ত্তে লর্ড কিচ্‌নার মিশরে ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি হইলেন। মিশরের মতি গতি ফিরিয়া গেল। কালক্রমে তিনি মিশরের 'ফেলাহীনদিগের' বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইলেন। আজ তাহারা তাঁহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিতেছে।

কিছু দিন কাটিয়া গেল। ১৯১৪ খৃঃ অব্দের ৪ঠা আগষ্ট ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট্ জর্ম্মনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। লর্ড কিচ্‌নার তখন ইংলণ্ডে ছিলেন। ৬ই আগষ্ট মিশরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার মানসে তিনি জাহাজে চড়িয়া ডোভর বন্দর পরিত্যাগ করিলেন ; কয়েক ঘণ্টা পরেই তাঁহাকে ইংলণ্ডে ফিরাইয়া আনা হইল। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি সমর সচিব হইলেন। 'টাইম্‌স্' ও 'ডেলি মেল' লর্ড হল্‌ডেনকে জর্ম্মনির বন্ধু বলিয়া পদত্যাগ করিতে বাধ্য করাইলেন।

তখন বিদেশে অভিযানোপযোগী ব্রিটিশ সৈন্য সওয়া লক্ষের অধিক ছিল না। তিনি বলিলেন—'এ যুদ্ধ অন্ততঃ তিন বৎসর চলিবে ; প্রচুর সৈন্যবল চাই।' তাঁহার আহ্বানে ব্রিটিশ জাতি জাগিয়া উঠিল। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে মহামহিম ভারত-সম্রাট প্রজাপুঞ্জকে জানাইয়া দিলেন যে ব্রিটিশ ভলণ্টিয়র সৈন্য পঞ্চাশ লক্ষের কিঞ্চিদধিক দাঁড়াইয়াছে!

এমন সময়ে কর্ম্মবীর লর্ড কিচ্‌নারের জীবন-নাট্যের সহসা অবসান হইল।

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

গ্রন্থ-সমালোচনা

পোষ্যপুত্র। (উপন্যাস)— শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ৪২৩ পৃষ্ঠা। দ্বিতীয় সংস্করণ। কাগজের মলাট, মূল্য ২।০

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী অল্প দিনের মধ্যেই বঙ্গসাহিত্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে একাধিক প্রতিভাশালিনী মহিলা সম্প্রতি সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস উপহার দিয়াছেন, এবং তাঁহারা যেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছেন তাহাতে আশা করা যায় যে, তাঁহাদের সাধনার ফলে বঙ্গ-সাহিত্যের উপন্যাসবিভাগ এক অভিনব গৌরবে মণ্ডিত হইয়া উঠিবে।

'পোষ্যপুত্র' উপন্যাসের আখ্যানভাগটি মোটামুটি এই :— জমীদার শ্যামাকান্ত চৌধুরীর একমাত্র পুত্র বিনোদকুমার কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িত। পুত্র বিলাত যাইবার জন্য উৎসুক, জানিতে পারিয়া তখন তিনি তাহার বিবাহ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বিনোদ একদিন তাহার পিতাকে স্পষ্ট বলিল যে, সে বিবাহ করিবে না, এবং বিলাত যাইবে। পিতার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি বলিলেন, 'তবে আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে যা!' পুত্র তখনই গৃহত্যাগ করিয়া লক্ষ্যহীনভাবে বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। শরীর পূর্ব্বাবধি অসুস্থ ছিল। এখন জ্বরে অচেতনপ্রায় অবস্থায় রাত্রে এক গৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয় পাইল। সেই গৃহে কেবল দুইজন ব্রাহ্মণ-রমণী—মাতা ও কন্যা—থাকিতেন। অনূঢ়া কিশোরী কন্যা শিবানীর সেবায় বিনোদ রোগমুক্ত হইল, কিন্তু নিজের পরিচয় না দিয়া নীরদকুমার নামে সেখানে রহিল। শিবানী বিনোদকে ভালবাসিয়াছিল। তাহার মাতা তাহা বুঝিয়া এবং সুন্দর যুবকটি কোন ছদ্মবেশী রাজকুমার হইতে পারে মনে করিয়া শিবানীর সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিল। বিনোদ শিবানীকে বিবাহ করিল। কিন্তু যখন বিনোদ সেইখানেই রহিয়া গেল এবং সে যে ছদ্মবেশী রাজকুমার তাহার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না, তখন প্রত্যহ সে শিবানীর মাতার নিকট অত্যন্ত অপমানিত হইতে লাগিল। এই কারণে এবং অন্যত্র নিজের পড়াশুনা করিবার জন্য সে অধিকাংশ সময় বাহিরে বাহিরেই থাকিত। শিবানীর মাতা তাহার চরিত্র-দোষের অপবাদ দিতে লাগিল। একদিন শিবানীও অভিমান করিয়া তাহার প্রাণে আঘাত দিল। বিনোদ সেই মুহূর্ত্তে বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। নানা স্থানে ঘুরিয়া শেষে মাদ্রাজে আসিয়া সে একটা কারবার আরম্ভ করিয়া দিল। তাহাতে তাহার যথেষ্ট উন্নতি হইতে লাগিল।

এদিকে পুত্রের নিরুদ্দেশে মর্ম্মাহত বৃদ্ধ শ্যামাকান্ত কয়েক বৎসর অপেক্ষা করিয়াও যখন দেখিলেন যে বিনোদ ফিরিল না, তখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হেমেন্দ্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন; এবং যে সুন্দরী বালিকার সহিত বিনোদের বিবাহ দেওয়া তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল, তাহার সহিত হেমেন্দ্রের বিবাহ দিলেন। বিবাহের কিছু পূর্ব্বে এই মেয়েটি (ইহার নাম শান্তি) তাহার মাতার সহিত মাদ্রাজে বেড়াইতে গিয়াছিল। সেখানে বিনোদ ইহাকে দেখে এবং ইহাকে এমনই ভালবাসিয়া ফেলে যে, যখন সে শুনিল হেমেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিল এবং নদীতীরে নিভৃত স্থানে এক আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিল। গুরুজীর উপদেশে কিছু দিন পরে সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া সংসারাশ্রমে ফিরিতে বিনোদের মতি হইল। তখন সে শিবানীর উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনে গেল। ইতিমধ্যে শ্যামাকান্ত পুত্রবধূ শান্তিকে লইয়া তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনে আসিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে শিবানী তাঁহার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের স্ত্রী। বিনোদের একটি পুত্রসন্তান হইয়াছিল। শ্যামাকান্ত শিবানী ও তাহার পুত্রকে লইয়া দেশে ফিরিলেন। হেমেন্দ্র ক্রমেই দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিতেছিল। এখন শিবানী ও তাহার পুত্রকে দেখিয়া উহাদিগকে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া জ্বলিতে লাগিল। কোনরূপে তাহাদিগকে তাড়াইতে না পারিয়া শেষে সে নিজে শান্তিকে লইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল। চন্দননগরে গিয়া সেখান হইতে শ্যামাকান্তকে জব্দ করিবার নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল। শান্তির দুঃখের অবধি ছিল না। সে চন্দননগরে আসিয়া অত্যন্ত পীড়িতা হইয়া পড়িল। শিবানী তাহাকে দেখিতে আসিল। বিনোদ শিবানীকে বৃন্দাবনে না পাইয়া স্থির করিল তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তখন তাহার এক বন্ধুর সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে চন্দননগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এইখানে শিবানীর সহিত বিনোদের মিলন হইল, এবং ইহাদের উভয়ের শুশ্রূষায় শান্তির রোগের উপশম হইলে হেমেন্দ্রেরও মতিগতি ফিরিয়া গেল।

উপন্যাসখানি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে বর্ণিত সকল ঘটনাই যে বাস্তব জগতে সম্ভব, তাহা আমরা বলিতে পারি না। চরিত্রগুলিও সব ভাল করিয়া ফুটে নাই। বিনোদ

কতকটা রোমান্টিক, তাহার ক্রিয়া-কলাপ সবই প্রায় আজগুবি; তাহার সম্বন্ধে মনে হয় এ বুঝি নিছক উপন্যাসেরই জীব, বাস্তবের নহে। ইহার তুলনায় হেমেন্দ্র-চরিত্রে প্রাণ আছে। লেখিকা বোধ হয় নিজেই তাহা বুঝিতে পারিয়া নায়ক বিনোদকে বরখাস্ত করিয়া পোষ্যপুত্রকেই চরিত্রগুলির মধ্যে প্রাধান্য দিয়াছেন। শ্যামাকান্ত আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করেন; কিন্তু শান্তির পিতা রজনীনাথ একেবারে আদর্শ সৃষ্টি, এমন কি তাঁহার ভুলভ্রান্তিগুলিও গুণের আকার ধারণ করিয়াছে। স্ত্রীচরিত্রগুলির মধ্যে শান্তি ও শিবানী উভয়েই সুন্দর, কিন্তু তথাপি আমরা দেখি, শান্তি স্বাতন্ত্র্যহীনা এবং শিবানীচরিত্র কিছু অস্পষ্ট। শিবানীর মাতা সিদ্ধেশ্বরী অনেকটা জীবন্ত; কিন্তু তাহাকে এত ইতর করিয়া চিত্রিত না করিলে কি ক্ষতি হইত?

সময় এবং বয়স, লেখিকা প্রায়ই উহ্য রাখিয়াছেন; ইহাতে আমাদিগকে বড় গোলে পড়িতে হইয়াছে। একটা উদাহরণ দিই। গ্রন্থারম্ভে আমরা যখন শান্তিকে দেখি তখন তাহার বয়স ছয় বৎসর। তাহার যখন বিবাহ হয়, তখন সে কিশোরী। তাহার ১৪।১৫ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, এইরূপই আমাদের অনুমান হয়। ইহার এক বৎসরের মধ্যেই উপন্যাসের শেষাংশের ঘটনাগুলি ঘটে। সুতরাং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ধরিলে ৯।১০ বৎসরের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এখন, গল্পের একটা অংশের সহিত ইহা মিলাইয়া দেখা যাক্। শান্তি যখন ছয় বৎসরের, তখনই অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক বিনোদ গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গিয়া শিবানীকে বিবাহ করে। সেখানে সে কতদিন ছিল, তাহা লেখিকা আমাদিগকে বলেন নাই। সম্ভবতঃ এক বৎসরের বেশী নহে। তাহা হইলে শান্তির বিবাহের পর শ্যামাকান্ত যখন বৃন্দাবনে আসিলেন তখন বিনোদের পুত্রের বয়স ৬।৭ বৎসর হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা তখন তাহার যেরূপ বর্ণনা পাই তাহাতে তাহাকে আড়াই কি তিন বৎসরের অধিক বয়স্ক বলিয়া মনে হয় না। এই অসঙ্গতির কারণ কি? বৃন্দাবনে কি বিনোদ ৩।৪ বৎসর ছিল? তাহা হইলেও ত আরও অনেক নূতন অসঙ্গতি আসিয়া উপস্থিত হয়।

শিবানী ও তাহার মাতার কোন পরিচয় লেখিকা আমাদিগকে দেন নাই। মাতা ও কন্যার কোন পুরুষ অভিভাবক ব্যতিরেকে বৃন্দাবনে বাস কি এতই স্বাভাবিক ও সাধারণ যে সে সম্বন্ধে আর বেশী কিছু জানিবার প্রয়োজন নাই? আজমীর প্রভৃতি স্থানের অনাবশ্যক বর্ণনা সংক্ষেপ করিয়া এই সব দিকে লেখিকা যদি একটু মনোযোগ দিতেন ত ভাল হইত।

৩০ পৃষ্ঠায় দেখি, ছয় বৎসর বয়স্কা শান্তির 'মাথার কাপড় খসিয়া পড়িয়াছিল।' এত অল্প বয়সে বাঙ্গালীর মেয়ে পিতৃগৃহে মাথায় কাপড় দেয় নাকি? পশ্চিমাঞ্চলে এরূপ প্রথা আছে বটে, কিন্তু লেখিকা বঙ্গমহিলা হইয়াও বঙ্গবালিকা সম্বন্ধে এ রকম ভুল করিলেন কিরূপে?

ভাষায় লেখিকার বিলক্ষণ অধিকার দৃষ্ট হয় কিন্তু কয়েকটি দোষও আছে। প্রধান দোষ ইহার কৃত্রিমতা। স্থানে স্থানে ভাষা কিরূপ ঘোরালো আকার ধারণ করিয়াছে তাহার একটু নমুনা দিই। 'এমনি করিয়া দুঃখের যে ভারী মেঘখানা অম্লান পুষ্পকোরকের মত ক্ষুদ্র বক্ষটিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, সেখানাকে বহুদূরে সরাইয়া দিয়া আবার আনন্দের স্নিগ্ধ আলোটুকু যখন তরুণ হৃদয়ের একটি প্রান্ত দিয়া সবেমাত্র মুক্ত দ্বারপথে ঊষালোকের স্নিগ্ধ মধুর হাস্যচ্ছটার মত তাহার হৃদয়প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময়ে একটা আসন্ন ঝটিকায় সজোরে সেই দ্বারখানা সব আলোটুকু চাপিয়া ফেলিয়া রুদ্ধ হইয়া গেল।'

—আমাদেরও এই ভাষার 'চাপে' নিশ্বাস 'রুদ্ধ' হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

ভাষার দ্বিতীয় দোষ উপমাবাহুল্য। স্থানে অস্থানে এত বেশী উপমা কেন? তাহাও কি সকল স্থলে সুপ্রযুক্ত হইয়াছে? ইহা কি রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ? কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা না থাকিলে এরূপ চেষ্টা যে বিড়ম্বনা মাত্র। উপমা দিতেই হইবে; অথচ সহজ স্বাভাবিক উপমা প্রতিপদে দেওয়া বড় সহজ কথা নয়। ফলে দেখি, এক 'অকস্মাদ্দৃষ্ট সর্পে'র উপমাই দশবার দেওয়া হইয়াছে। এরূপ করিয়াও যখন কুলাইল না তখন স্থানে স্থানে যেরূপ উৎকট উপমার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার একটা উদাহরণ এই—"তখন সবেমাত্র সন্ধ্যার ধূসর আকাশে কলিকাতার বাজারের কুমড়ার ফালির মত ক্ষীণ অৰ্দ্ধচন্দ্র দেখা দিয়াছে।"

লেখিকার ভাষার তৃতীয় দোষ এই যে ইহা স্থানে স্থানে ইংরাজীগন্ধী হইয়াছে। উদাহরণ (১) "রজনীনাথ আপনার সময়ে কলেজের মধ্যে একজন উৎসাহশীল উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন।" (২) 'প্রথম আঘাত জনিত অসহ্য বেদনা সহ্যের সীমার মধ্যে ফিরিলে নীরদকুমার ঈষৎ লজ্জিত হইল।"

এতদ্ব্যতীত লেখিকার অসাবধানতার পরিচয়ও আছে। যথা, যাহা কিছু পাইত ক্ষোভে অভিমানে গুমরিয়া মরিত।' (১৪ পৃঃ) অন্য একস্থলে দেখি, "ঝটিকা যখন আসন্ন তখন মেঘ আর কতক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারে?" মেঘ কখনও কখনও ঝড় আনে বটে, কিন্তু আসন্ন ঝটিকা কি কখনও মেঘের কারণ হয়?

লেখিকা শক্তিশালিনী। আমরা তাঁহার নিকট অনেক আশা করি। তাই তাঁহার এই উপন্যাসে যত কিছু দোষ ত্রুটি আমাদের চোখে পড়িয়াছে তাহা এইরূপে বিস্তারিতভাবে নির্দ্দেশ

করিয়া দিলাম। এই সকল দোষ সত্ত্বেও আমরা উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। বিচিত্র ঘটনার বর্ণনায়, মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে এবং বিবিধ চরিত্রের অঙ্কনে লেখিকা যে শক্তি ও কলাকুশলতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। কৃত্রিমতার হাত এড়াইতে পারিলে তাঁহার ভাষা সুন্দর হইবে তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।

"শ্যামচাঁদ।"

বারুণী। গল্প গ্রন্থ—শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম-এ, বি-এল প্রণীত। কলিকাতা কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। প্রকাশক, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি ১৫৮ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য ১৲

মাসিক পত্রের পাঠকগণ শরৎ বাবুর নানাবিষয়িণী রচনার সহিত সুপরিচিত। বেদান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট গল্প অবধি, বহু বিষয়েই তিনি লেখনী চালনা করিয়া থাকেন। তাঁহার লেখার প্রধান গুণ এই, যে বিষয়েই তিনি লেখেন, সরল সরস ভাষায় নিজের বক্তব্যটি বেশ গুছাইয়া বলিতে পারেন।

সমালোচ্য গ্রন্থ খানিতে এগারটি গল্প আছে। প্রথম গল্প বারুণী—ইহা একটি ছোট দুষ্ট মেয়ের নাম। মেয়েটি বড়ই দুষ্ট, ঠাকুরের সাজানো নৈবেদ্যের শশা খাইয়া ফেলে, বাগানে গিয়া কোকিলের ডাক শুনিয়া তাহাকে ভেঙাইয়া বলে 'কু-উ'। বালিকার চিত্রটি বড় মিষ্ট, পরিণাম বড়ই করুণ।—অনেকগুলি গল্পেই করুণরস বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। করুণরস ফুটাইতে পারেন এমন লেখক বঙ্গসাহিত্যে আরও আছেন, কিন্তু যে ঘটনাগুলির মধ্যে দিয়া তাঁহারা ঐ রসের বিকাশ সাধন করেন, তাহা প্রায়ই বড় একঘেয়ে হইয়া পড়ে। শরৎ বাবুর গল্পগুলি কিন্তু সে জাতীয় নহে—তিনি নানা বিচিত্র ঘটনার ভিতর দিয়া করুণ-রসকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ঘটনাগুলি শুধু বিচিত্র নহে, তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু অভিনবত্বও আছে। ইহাই ছোট গল্পের প্রকৃত উপাদান। বর্ণিত ঘটনাটি বেশ স্বাভাবিক হওয়া চাই—পড়িয়া কাহারও না মনে হয়, 'না এরূপ বাস্তব জীবনে হয় না'—অথচ এমন হওয়া চাই, যাহা সচরাচর ঘটে না।—অর্থাৎ, 'ঘটিয়া থাকে' ঘটনার চেয়ে, 'ঘটিলে ঘটিতে পারিত'—ঘটনাই ছোট গল্পের পক্ষে সমধিক উপযোগী। এই গ্রন্থে—সকল গল্পে এমন কথা বলিতে পারি না—অনেকগুলি গল্পেই ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়।

এই সংগ্রহের একটি গল্পের নাম 'নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী।' এই নামে বঙ্কিম বাবুর একটি অসমাপ্ত ছোট গল্প, শ্রীযুক্ত শচীশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত "বঙ্কিম জীবনী" গ্রন্থে অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন। শরৎ বাবু ভূমিকায় বলেন, "এ পর্য্যন্ত কোনও লেখক এই অসমাপ্ত গল্পটির একটা 'উপ'সংহার পর্য্যন্ত করেন নাই। এতদিন বাদে শুধু 'উপ'সংহার করাটা ভাল দেখায় না বলিয়া ইহা পুরাদস্তুর 'সংহার'ই করিয়া দিয়াছি।"—সুখের বিষয়, শরৎবাবু গল্পটি সংহারে কৃতকার্য্য হন নাই। বঙ্কিম বাবুর মনে কি ছিল তাহা বলা যায় না; তবে শরৎবাবু ইহার যে পরিণামটি কল্পনা করিয়াছেন, তাহা বেশ সঙ্গত ও কৌশলপূর্ণ হইয়াছে।

সাহিত্য-সমাচার

মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স তাঁহাদের আট আনা সংস্করণের আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। ইহা "অর্চ্চনা"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত "বিবাহ বিভ্রাট" নামক একখানি উপন্যাস।

ঔপন্যাসিক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত একখানি ধর্ম্মমূলক নাটক রচনা করিয়াছেন। ষ্টার থিয়েটারে সেখানির মহলা চলিতেছে; শীঘ্রই নাকি অভিনীত হইবে।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একখানি নূতন গ্রন্থ "গল্পবীথি" নামে প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৷৹

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি-এ প্রণীত নূতন কবিতা গ্রন্থ "ব্রজবেণু" প্রকাশিত হইল, মূল্য ৷৵৹

"আর্য্যসাহিত্য সমাজ" আবার উপাধি পরীক্ষার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন—আগামী কার্ত্তিক মাসে পরীক্ষা গৃহীত হইবে।—যৎসামান্য নামমাত্র পরীক্ষা দিয়া, পরীক্ষার্থী ইচ্ছানুসারে যে কোনও উপাধিলাভ করিতে পারেন। উপাধির একেবারে হরির লুট। দুই টাকা মূল্যের এই সকল কবিভূষণ, কাব্যরত্নাকর, বিদ্যার্ণব, সাহিত্য-বিশারদে দেশটা ছাইয়া গেল যে! ইঁহাদের অনেকের রচিত ব্যাকরণদুষ্ট ও বানানভুলপূর্ণ প্রবন্ধে, গল্পে, কবিতায় আমরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি—বোধ করি, আমাদের সহযোগিগণের অবস্থাও তদ্রূপ।

শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন রায় এম-এ প্রণীত একখানি নূতন গল্পগ্রন্থ "স্নেহের ঋণ" এবং একখানি উপন্যাস "বেণী রায়" প্রকাশিত হইল। মূল্য প্রত্যেক খানির ১৷৹

মানসী ও মর্ম্মবাণী—



[illegible] বন্দরে [illegible]

W. [illegible] A. R. A. [illegible]

MANASI PRESS

মানসী
ও
মর্ম্মবাণী

৮ম বর্ষ | ১ম খণ্ড
১ম খণ্ড | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ ১৩২৩ সাল

বিরহ-বাণী

(১)

একং বস্তু দ্বিধা কর্ত্তুং বহবঃ সন্তি ধন্বিনঃ।
ধন্বী স মার এবৈকো দ্বয়োরৈক্যং করোতি যঃ॥

এমন অনেক ধন্বী আছে এ সংসারে,
একেরে করিতে দুই অনায়াসে পারে;
প্রণিপাত হে অনঙ্গ মহা ধনুর্দ্ধর,
দুয়ে এক করে শুধু তব পঞ্চশর।

(২)

বরমসৌ দিবসো ন পুনর্নিশা
নম্নু নিশৈব বরং ন পুনর্দিনম্।
উভয়মেতদুপৈত্বথবা ক্ষয়ং
প্রিয়জনেন ন যত্র সমাগমঃ॥

দিন যদি হ'তে হয়, হোক্ তবে দিন;
অথবা আসুক রাত্রি সূর্য্যালোকহীন;
প্রিয়-বিরহের ব্যথা যার মনে, হায়—
দিন রাত্রি যাই হোক্ কিবা আসে যায়?

(৩)

হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষভীরুণা।
ইদানীমন্তরে জাতাঃ পর্ব্বতাঃ সরিতো দ্রুমাঃ॥

হে প্রিয়, বিশ্লেষ-ভয়ে কণ্ঠে কভু পরি নাই হার;
আজ দুজনের মাঝে নদী গিরি সাগর কান্তার।

(৪)

আয়াতা মধুযামিনী যদি পুনর্নায়াত এব প্রভুঃ
প্রাণা যান্তু বিভাবসৌ যদি পুনর্জন্মগ্রহং প্রার্থয়ে।
ব্যাধঃ কোকিলবন্ধনে হিমকরধ্বংসে চ রাহুগ্রহঃ
কন্দর্পে হরনেত্রদীধিতিরহং প্রাণেশ্বরে মন্মথঃ ॥

এসেছে বসন্ত রাতি—
যদি আজ নাহি আসে প্রিয়,
অনলে সঁপিব প্রাণ ;
দে দেবতা, এই বর দিও—
হিমকর-ধ্বংস তরে
রাহু হয়ে উদিব আকাশে,
জনমিব ব্যাধরূপে
পরভৃতে নাশিবার আশে,
অনঙ্গে করিতে দগ্ধ
হ'ব আমি হর-নেত্রানল,
কাম-রূপে জনমিয়া
প্রিয়তমে করিব চঞ্চল।

(৫)

ত্বঞ্চাগমিষ্যসি ভবিষ্যতি সঙ্গমো নৌ
সম্পৎস্যতে চ মম সোঽপি মনোভিলাষঃ।
বিদ্যুদ্বিলাসচপলা নবযৌবনশ্রী-
রেষা গতা ন পুনরেষ্যতি জীবিতেশ ॥

আবার আসিবে তুমি—
হইবে মিলন তব সনে,
পূর্ণ হবে সব সাধ
যা কিছু রয়েছে মোর মনে ;
হে বন্ধু, তড়িৎ সম
চপল এ যৌবন আমার
একবার, চলে' গেলে,
ফিরে কভু আসিবে না আর।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

ব্রজ কাহিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বঙ্কিমবাবু 'কৃষ্ণচরিত্রে' ৪র্থ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন, "এই বৃন্দাবন কাব্য জগতে অতুল্য সৃষ্টি। হরিৎপুষ্প-শোভিতা পুলিন-শালিনী কলনাদিনী কালিন্দীকূলে কোকিল-ময়ূর-ধ্বনিত কুঞ্জবন পরিপূর্ণা, গোপ-বালকগণের শৃঙ্গবেণুর মধুর রবে শব্দময়ী, অসংখ্য কুসুমামোদ সুবাসিতা, নানাভরণভূষিতা, বিশালায়ত-লোচনা ব্রজসুন্দরিগণ সমলঙ্কৃতা বৃন্দাবনস্থলী, স্মৃতিমাত্র হৃদয় উৎফুল্ল হয়।"

কি সুন্দর সুবিমল সুকোমল, সুমধুর চিত্র। এই কয়েকপংক্তি পাঠ করিবামাত্র মনোমধ্যে কেমন একটি সুপবিত্র ভাবের উদয় হয়!

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নরপতি লক্ষণ সেনের সভাসদ্-কবি জয়দেব বোধ হয় এই রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক ও বৃন্দাবন বর্ণনাত্মক গীতি কবিতাবলী (সংস্কৃত ভাষায়) রচনা করিবার পথ প্রথম প্রদর্শন করেন। তাঁহার পর ও চৈতন্যদেবের শত বৎসর পূর্ব্বে, মৈথিল কবি বিদ্যাপতি ও নান্নুরের চণ্ডীদাস, নিজ নিজ ভাষায় তাঁহার পদানু-সরণ করেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর হইতেই গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি দুই শতাধিক বাঙ্গালার কবিকুল তাঁহাদের গীতের প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন; আজিও করিতেছেন। সেই সকল কীর্ত্তন-পদ বাঙ্গালার প্রতিগ্রামে প্রতিগৃহে কতই না আনন্দধারা ঢালিয়া দেয়। বঙ্কিমবাবু সেই জন্যই বৃন্দাবনকে "কাব্য জগতের অতুল্য সৃষ্টি" বলিয়াছেন।

Washington Irving ইউরোপ দেখিয়া বলিয়া-ছিলেন, Every mouldering stone is a chronicle. আমরাও তাঁহার ন্যায় বলিতে পারি যে, ব্রজমণ্ডলের প্রত্যেক ক্ষয়শীল পাষাণ খানিতে ইতিহাস অঙ্কিত আছে।

ব্রজমণ্ডলের কথা বাল্মীকির রচিত রামায়ণে এইরূপ লিখিত আছে।—মধুনামে একজন দৈত্য কঠোর তপস্যা করিয়া, মহাদেবের নিকট হইতে একটি ত্রিশূল প্রাপ্ত হন। তাঁহার পত্নীর নাম কুম্ভনসী। মধু এই স্থানে একটি সুন্দর পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম হইতে এই স্থানের নাম মধুপুরী হইয়াছে। ইঁহার পুত্রের নাম লবণ। ইনিই শিব-দত্ত ত্রিশূলপ্রভাবে ঋষিগণের প্রতি অত্যাচারী হইলে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে বধ করিবার জন্য শত্রুঘ্নকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। শত্রুঘ্ন লবণকে বধ করিয়া এই স্থানে প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন।

মহাভারতের সময়ে এখানে উগ্রসেন, কংশ প্রভৃতি রাজগণ রাজত্ব করিতেন। যদুবংশীয় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বপুরুষ শূরসেনের নামে এই ব্রজমণ্ডলের নাম শূর-সেনপুরী হইয়াছিল। তাঁহাদের ভাষাকে লোকে শৌর-সেনী ভাষা বলিত। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে নাটকাদিতে উচ্চবংশীয়া মহিলাগণের মুখে শৌরসেনী ভাষা (মধুর ব্রজভাষা) দিবার বিধান আছে।

প্রাচীন পুরাণ সকলে ব্রজমণ্ডলের নৈসর্গিক শোভার বর্ণনা পাওয়া যায়।

কালিদাসের সময়েও ইহার উপবনাদির সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ ছিল; কেন না, তিনি রঘুবংশ কাব্যে, স্বয়ম্বর প্রসঙ্গে সুনন্দা-মুখে ইন্দুমতীকে বলিতেছেন "বৃন্দাবনে চৈত্ররথাদনূনে"—বৃন্দাবন স্বর্গের চৈত্ররথ কানন অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে; এবং "শিখণ্ডিনাং প্রাবৃষি পশ্য নৃত্যং কান্তাসু গোবর্দ্ধনকন্দরাসু"—বর্ষাকালে মনোহর গোবর্দ্ধন-গুহায় ময়ূরগণের নৃত্য দেখিও। আজিও এ অঞ্চলে ময়ূর বিস্তর।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই, যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থান সময়ে পরীক্ষিতকে হস্তিনাপুরে ও শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভকে ব্রজমণ্ডলের (মথুরা প্রদেশের) রাজ্য দিয়া যান।

পণ্ডিতগণের মুখে শুনি, স্কন্দপুরাণান্তর্গত চতুর্ধ্যায়ী ভাগবত মাহাত্ম্যে লিখিত আছে, বজ্রনাভ

ব্রজমণ্ডলে ষোলটি দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। চারিটি দেব যথা—বৃন্দাবনে গোবিন্দদেব, মথুরায় কেশবদেব, গোবর্দ্ধনে হরিদেব এবং মহাবনে বলদেব; চারিটি গোপাল যথা—গোবর্দ্ধনে শ্রীনাথগোপাল, বৃন্দাবনে সাক্ষীগোপাল, গোপীনাথগোপাল ও মদন-গোপাল; চারিটি শিবলিঙ্গ যথা—বৃন্দাবনে গোপেশ্বর,মথুরায় ভূতেশ্বর, গোবর্দ্ধনে চক্রেশ্বর, এবং কাম্যবনে কামেশ্বর; চারিটি দেবীমূর্ত্তি যথা—মথুরায় মহাবিদ্যা, বৃন্দাবনে বৃন্দাদেবী, চীর বা বস্ত্রহরণ ঘাটে কাত্যায়নী এবং সঙ্কেত গ্রামে সঙ্কেতবাসিনী।

সাধারণ ব্রজবাসীরা বলেন যে, বজ্রনাভ তিনটি মাত্র বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথমে মদন-মোহন নির্ম্মাণ করান, তাঁহার চরণ দুইটি শ্রীকৃষ্ণের মত হইয়াছিল। পরে গোপীনাথ বিগ্রহ নির্ম্মিত হইলে তাঁহার বক্ষস্থল শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ হয়। শেষে যখন গোবিন্দদেব নির্ম্মিত হইলেন তখন তাঁহার মুখারবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের এত সুসদৃশ ও সজীবের ন্যায় হইয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া বজ্রনাভের জননী উষাদেবী লজ্জায় ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিলেন।

পুরাণাদি হইতে আমরা এই পর্য্যন্ত জানিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণের অথবা বজ্রনাভের পর ব্রজমণ্ডলে কি ঘটিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। প্রাচীন বা পরবর্ত্তী সংস্কৃত গ্রন্থ সকলে মথুরা ও বৃন্দাবনাদির মাহাত্ম্য বিষয়ক শত শত শ্লোক কীর্ত্তিত হইয়াছে; কোন তীর্থে, কুণ্ডে বা নদীতে স্নান, দান করিলে অথবা কোন দেবতার প্রণাম প্রদক্ষিণ বা প্রসাদ ভক্ষণ করিলে, কয়পুরুষ পর্য্যন্ত কোন দেবলোকে বাস করিতে পারিবে তৎসম্বন্ধে অসংখ্য আখ্যান পাওয়া যায় কিন্তু দেশের প্রকৃত ইতিহাস একছত্রও পাওয়া কঠিন।

রামচন্দ্র অথবা শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরাদির সময়ের পর কত শত যুগ অতীত হইয়াছে। সে সময় আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কি করিয়াছিলেন, কোন্ দেবতার পূজা করিতেন, কিরূপ প্রণালীতে রাজ্যশাসন হইত, অথবা তাঁহাদিগকে বৈদেশিক কোন্ কোন্ জাতি আসিয়া উৎপীড়ন করিত, তাহার কোন কথাই আমাদিগের গ্রন্থ মধ্যে পাওয়া দুর্ল্লভ। রোমান, গ্রীক প্রভৃতি ইউরোপীয় ঐতিহাসিক, বুদ্ধনিষ্ঠ চৈনিক পরিব্রাজক এবং ধনরত্ন-লোলুপ মুসলমান লুণ্ঠনকারিগণের গ্রন্থ হইতেই আমরা যাহা কিছু দুই একটা ছিন্ন পৃষ্ঠা দেখিতে পাই। হায়! আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যদি ধ্যানদৃষ্ট পরলোকের এতটা বাহুল্য বৃত্তান্ত না লিখিয়া প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট ইহলোকের মুখ্য ঘটনাগুলির কোনরূপ ধারাবাহিক বিবরণ লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আর পরবর্ত্তী বংশধরগণকে বহু অনুসন্ধান করিয়া তাম্রশাসন, প্রাচীন মুদ্রা, ভগ্নমূর্ত্তি, শিলালেখ বা কুলগ্রন্থ প্রভৃতি ঘাঁটিয়া, যোড়াতাড়া দিয়া, সংশয়-সঙ্কুল ইতিহাসের খণ্ডিত প্রতিমা খাড়া করিতে হইত না।

গজনিপতি মামুদ ১০১৭ খৃঃ অব্দে মথুরামণ্ডল লুণ্ঠন করেন। ব্রজমণ্ডল ধ্বংশ করিয়া গেলে বহুদিন এ প্রদেশ জনশূন্য জঙ্গলাকীর্ণ ও পতিত প্রায় হইয়াছিল। কদাচিৎ দুই এক জন ধর্ম্মপ্রাণ সন্ন্যাসী ভয়াকুলিত চিত্তে এ সকল স্থান দেখিতে যাইতেন। পূজারীরা কোথাও বনমধ্যে, কোথাও বা কূপ, নদী অথবা সরোবরে, কোথাও বা মৃত্তিকাভ্যন্তরে দেবমূর্ত্তি সকল লুকাইয়া ম্লেচ্ছভয়ে প্রাণ লইয়া পলাইয়া গিয়াছিল। দেশ তখন হীনবল শেষ পাঠান রাজগণের শিথিল হস্তচ্যুত হইয়া, খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত। তখন মুসলমানগণের প্রলোভনে বা উৎপীড়নে দেশের অনেকেই হিন্দুধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ। তদুপরি দস্যু, তস্কর ও ঠগীগণের উপদ্রবে পথ বিপদ-সঙ্কুল। সেই তমসাচ্ছন্ন ঘোর দুর্দ্দিনে একজন 'তৃণ-পর্ণশালাবাসী' 'কৌপীনধারী' বাঙ্গালী সন্ন্যাসী—শ্রীচৈতন্যদেব—ব্রজমণ্ডলে লুপ্ততীর্থ ও গুপ্তদেবমূর্ত্তি সকলের উদ্ধার করিবার জন্য সঙ্কল্প করেন। তৎপ্রেরিত পার্ষদ ও ভক্তগণের প্রযত্নেই ব্রজমণ্ডল পুনঃ প্রকটিত ও সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এই সময় হইতে ব্রজকাহিনী আরম্ভ করিব।

শ্রীচৈতন্যদেবের পবিত্র জীবনকাহিনী অনেকেই পাঠ করিয়া থাকিবেন, তথাপি সংক্ষেপতঃ এই

স্থানে তাহার পুনরাবৃত্তি করিলে হানি নাই।—শ্রীহট্ট হইতে জগন্নাথ মিশ্র নামে জনৈক পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীর-বাস-কামনায় পত্নী শচীদেবী সহ তখনকার প্রধান নগর ও "সরস্বতী পীঠ" নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তাঁহাদের অনেকগুলি পুত্র ও কন্যা হইয়া অকালে মরিয়া যায়। বিশ্বরূপ নামে একটি পুত্র কিশোর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করেন। চৈতন্যদেব পিতামাতার শেষ সন্তান। ইঁহার প্রকৃত নাম বিশ্বম্ভর। মৃতবৎসা জননী সভয়ে ইঁহাকে নিমাই বলিয়া ডাকিতেন (কারণ নিম তিক্ত, যমে ছুঁইবে না)। ১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খৃঃ অব্দে) ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে ইনি কিছু চপল স্বভাব ছিলেন। অল্প বয়সেই সেই সময়ে প্রচলিত ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তর্কে এতদূর পটু ছিলেন যে, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতেরা ইঁহার নিকট পরাস্ত হইয়া যাইতেন। 'অদ্বৈত প্রকাশ' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ইনি অদ্বৈত প্রভুর নিকট, লোকনাথ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে একত্রে, বেদ বেদান্তাদি দর্শন শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই নিকট বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। ইহাঁর প্রথমা পত্নী লক্ষ্মী দেবীর সর্পাঘাতে মৃত্যু হইলে বিষ্ণুপ্রিয়া নাম্নী দ্বিতীয়া ভার্য্যা গ্রহণ করেন। পিতৃবিয়োগের পর যখন ইনি পিণ্ড দিবার জন্য গয়াধামে গিয়াছিলেন, তখন সেখানে বিষ্ণু পাদপদ্ম দর্শনে ইঁহার প্রেমাবেশ হইল। গয়াধামে ঈশ্বরপুরী নামক জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট ইনি বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। হরি-প্রেমে বিভোর হইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার বাটীতে ছাত্রদিগকে পড়াইবার যে টোল ছিল তাহা উঠিয়া গেল। ২৫ বৎসর বয়ক্রম কালে তিনি স্নেহময়ী জননী, প্রিয়তমা ভার্য্যা, নবদ্বীপবাসী আত্মীয় স্বজনকে কাঁদাইয়া কণ্টকনগরে (কাঁটোয়া) গিয়া কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরম সুন্দর 'চাঁচর চিকর' মুণ্ডিত হইল। এই ঘটনার পর হইতে ইঁহার নাম হইল কৃষ্ণচৈতন্য বা চৈতন্যদেব। তিনি বর্ণ-চিহ্ন যজ্ঞসূত্র ফেলিয়া দিয়া, সন্ন্যাসী বেশে দেশে দেশে হরিনাম প্রচার জন্য বহির্গত হইলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে পুরীধামে থাকিবার জন্য অনুমতি করিয়াছিলেন। তিনি ছয় বৎসরকাল দক্ষিণ ভারতে নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া ৩১ বৎসর বয়সে (১৫১৬ খৃ অঃ) শরৎকালে ঝাড়িখণ্ড বা বনপথে বৃন্দাবন দর্শন করিতে গেলেন। সে সময়ে ব্রজধামে যে সকল দেবমূর্ত্তি ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে তাহার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন :—

কেশবজী, দীর্ঘবিষ্ণু ও বিশ্রামদেব নামে তিনটি বিষ্ণু মূর্ত্তি। ভূতেশ্বর ও স্বয়ম্ভু নামে দুইটি শিবলিঙ্গ ও গোকর্ণেশ্বর নামে একটি শিব বিগ্রহ এবং মহাবিদ্যা-নামে যোগমায়া মূর্ত্তি—মথুরায় এই সাতটি মাত্র দেবমূর্ত্তি ছিল। খাস বৃন্দাবনে কোন দেবমূর্ত্তি মোটেই ছিল না। কেবল দুই চারিটি টীলা বা স্তূপ ও চারি পাঁচটি ঘাটের নাম পাই। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে মানস-গঙ্গা, নিকটে হরিদেব এবং পর্ব্বতোপরে গোপালদেব ছিলেন। খদির বনে অনন্তনাগ-শয্যায় শয়ান লক্ষ্মী-নারায়ণ বা 'শেষশায়ী'। তাহার পর নন্দীশ্বর পর্ব্বতে গুহামধ্যে ;—

দুই দিকে পিতামাতা পুষ্ট কলেবর।
মধ্যে হয় শিশু এক ত্রিভঙ্গ সুন্দর॥

তখন সর্ব্বসমেত সমগ্র ব্রজমণ্ডলে এই দ্বাদশটি মাত্র দেবমূর্ত্তি বিদ্যমান ছিলেন। চৈতন্যদেব ব্রজমণ্ডলের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া রূপ ও সনাতন নামক দুইজন বাঙ্গালীকে নানা উপদেশ দিয়া ব্রজমণ্ডল উদ্ধারের জন্য পাঠাইয়া দেন। তিনি বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া ১৮ বৎসর কাল পুরীধামে অবস্থান করিয়াছিলেন। এবং "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে" শিখাইয়াছিলেন। এই পুরীধামে ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ১৫৩৩ খৃঃ অঃ আষাঢ়ী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে পদস্ফোটে আক্রান্ত হইয়া তিনি লীলা সম্বরণ করেন, জয়ানন্দ রচিত 'চৈতন্যমঙ্গলে' এইরূপ বিবৃত আছে।

ব্রজমণ্ডলের ইতিহাস বলিতে হইলে, যে সময়ে (১৫১৬

খৃঃ অঃ) চৈতন্যদেব ও তাঁহার ভক্তমণ্ডলী বৃন্দাবনে গিয়া লুপ্ত উদ্ধার করিতেছিলেন, সেই সময়ের রাজশাসনের বিবরণ দিতে হয়, নতুবা বিষয়টা বুঝিবার সুবিধা হইবে না। তখন উচ্ছৃঙ্খল, অত্যাচারী, দুর্ব্বল শেষ পাঠান সম্রাট ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট। দিল্লী, আগ্রা ও তন্নিকটবর্ত্তী যৎকিঞ্চিৎ স্থান মাত্র তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। অনেক হিন্দু ও পাঠান নরপতিরা বাঙ্গালা, গুজরাট ও রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। কাবুলাধিপতি বাবর আসিয়া ১৫২৬ খৃঃ অব্দে পাণিপথের যুদ্ধে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই পশ্চিমে পঞ্জাব হইতে, পূর্ব্বে বিহার পর্য্যন্ত দেশ সকল বাবরের করতলগত হইল। ১৫৩০ খৃঃ অঃ বাবরের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন তাঁহার ভারতবর্ষ মধ্যগত রাজ্যের অধিকারী হইলেন। এই হুমায়ুনের রাজত্বকালেই (১৫৩৩ খৃঃ অঃ) মদনগোপাল এবং ১৫৩৫ খৃঃ অব্দে গোবিন্দদেব প্রকট হইয়াছিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা কেবল ভক্তি গ্রন্থ রচনা ও গোবর্দ্ধন, মহাবন, গোকুল, নন্দগ্রাম, বর্ষানা ও যাবট প্রভৃতি স্থানে শ্রীকৃষ্ণ কোথায় কি লীলা করিয়াছেন, মথুরা মাহাত্ম্য প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিয়া তাহারও অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিতেন। কেহ কেহ বা সেবার্চ্চনা করিয়া কালযাপন করিতেন।

হুমায়ুন দশ বৎসর রাজত্ব করিলে পর বিহারের পাঠান জায়গীরদার সের শাহ ১৫৪০ খৃঃ অব্দে হুমায়ুনকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল্লীর সম্রাট হইলেন। অতি দক্ষতার সহিত সের শাহার রাজত্ব চালিত হইয়াছিল। তিনি বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যে উন্নতি জন্য রাজ্যমধ্যে অনেক পথ, খাল, কূপ ইত্যাদি কাটাইয়া দিয়াছিলেন। বাঙ্গালা হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত যে সহস্র ক্রোশ ব্যাপী সুদীর্ঘ সুপ্রশস্ত রাজপথ তিনি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ, প্রতি ক্রোশে কূপ খনন এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর পথিকের জন্য পৃথক পৃথক সরাই নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এই পথ দিয়া বাঙ্গালা হইতে বৈষ্ণবগণের বৃন্দাবন যাতায়াতের অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল।

সের শাহ ও তাঁহার বংশীয়েরা ১৬ বৎসর রাজত্ব করিলে পর হুমায়ুন কাবুল হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সার্হিন্দের যুদ্ধে পাঠানদিগকে পরাস্ত করিয়া ১৫৫৬ খৃঃ অঃ নিজ সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। মোগল ও পাঠানেরা সিংহাসন লইয়া পরস্পরে বিবাদ ও যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া হিন্দুগণের বৃন্দাবনাদি স্থানে লুপ্ততীর্থ প্রভৃতির অনুসন্ধানে অবকাশ ও অনেকটা সুযোগ হইয়াছিল বলিতে হইবে। অল্প দিন পরেই হুমায়ুনের মৃত্যু ঘটিলে ১৫৫৬ খৃঃ অব্দে আকবর উত্তর-ভারতের সম্রাট্ হইলেন। এই উদার-হৃদয় বাদশাহের রাজত্বকালে তাঁহার হিন্দু সেনাপতি মানসিংহ, রায়সিংহ প্রভৃতির অজস্র ব্যয়ে বৃন্দাবনধাম নানা কারুকার্য্য খচিত নয়নাভিরাম মন্দির ও ঘাট প্রভৃতির দ্বারা বিভূষিত হইয়াছিল।

এখন আমরা একবার বাঙ্গালার কথা বলিব। ১৪৯৪ হইতে ১৫২৫ অঃ পর্য্যন্ত হুসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে বিরাজিত ছিলেন। তিনিও প্রজাগণের সুবিধার জন্য নিজ রাজ্যে অনেকগুলি রাজবর্ত্ম ও পান্থনিবাস প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বাঙ্গালী কবি ও পণ্ডিতগণের সম্মান করিতেন। তাঁহার রাজ্যকালেই কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দী বাঙ্গালা ভাষায় মহাভারত ও দ্বিজ-অনন্ত রামায়ণ প্রথম রচনা করেন। কাশীদাসের 'অমৃত সমান' মহাভারতও নাকি ইহাঁর রাজত্বসময়েই অনূদিত হইয়াছিল। হুসেন শাহ আকবরের মত হিন্দুদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। রূপ ইহাঁর দবির-খাস (প্রধান মন্ত্রী) সনাতন ইহঁার সাকর-মল্লিক (কোষাধ্যক্ষ) ছিলেন। চৈতন্যদেব এইরূপ সুদক্ষ সুপণ্ডিত ধর্ম্মপ্রাণ ভক্ত পাওয়াতে, বিষ্ণুভক্তি প্রচারের ও তীর্থ উদ্ধারের সুবিধা হইয়াছিল। এই সময় বাঙ্গালার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা "যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপালের গীত" গাহিয়া বেড়াইত। অথবা বিষহরী

(মনসা) দেবীর পূজা ও রাত্রিজাগরণ করিয়া গীত বাদ্যাদি করিত। ধনী ও জমিদার শ্রেণীর লোকেরা অনেকেই তন্ত্রোক্ত মতে শক্তির সেবা করিতেন। 'চণ্ডী-চরণ পরায়ণ' মহেন্দ্রদেব ও দনুজদেবের মুদ্রা হইতে সে সাক্ষ্য আমরা পাই। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা কেহ শৈব কেহ বা বৈদান্তিক মতে ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। শঙ্করাচার্য্য নিগৃহীত বৌদ্ধমূর্ত্তি সকল কোথাও শিবশক্তি কোথাও বা ধর্ম্ম ঠাকুর রূপে হিন্দু পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়াছিল।

পাঠান রাজগণের সময় হইতে এদেশে ধর্ম্মের অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের নাগপাশের ভীষণ পেষণে, জাতিভেদের অনুচিত বৈষম্যে ও যাবনিক প্রলোভন প্ররোচনা বা প্রপীড়নে, অথবা মুসলমান হইলে জিজিয়া কর হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর অসংখ্য লোকেরা দলে দলে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। ইহার প্রতিকার ও ধর্ম্মস্থাপন জন্য তৎকালে কয়েকজন মহাপুরুষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল—মহারাষ্ট্রে তুকারাম, গুজরাটে ও রাজপুতনায় বল্লভাচার্য্য, পঞ্জাবে নানক, বারাণসীতে রামানন্দ, বিহারে কবীর এবং বঙ্গ ও উড়িষ্যায় চৈতন্য দেব। ইহাঁরা হিন্দুধর্ম্মের বাঁধন অনেকটা শিথিল করিয়াছিলেন। নানক, কবীর ও চৈতন্যদেব হিন্দু মুসলমান উভয়কে শিষ্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আমরা চৈতন্যদেবের উদারতার একটা উদাহরণ দিব। হুসেন শাহ কোন কারণে বিরক্ত হইয়া নবদ্বীপের জমিদার সুবুদ্ধি রায়ের মুখে করোয়াক্য জল দিয়া জাতিচ্যুত করিয়া ছাড়িয়া দেন। নবদ্বীপ ও কাশীর স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা তাঁহাকে তপ্ত ঘৃত পান বা তুষানলে প্রাণত্যাগ করিতে ব্যবস্থা দিলেন। চৈতন্যদেব তখন বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত হইয়া কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন। সুবুদ্ধি রায় ইহাঁর শরণাপন্ন হইলে চৈতন্যদেব বলিলেন, "তুমি মথুরায় গিয়া অবশিষ্ট জীবন একান্তমনে হরিনাম করিয়া কাটাও, তাহা হইলেই তোমার সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।" কি উদার কি সহজ ব্যবস্থা! কোথায় তপ্তঘৃত পান আর কোথায় হরিনাম গান!

উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি প্রতাপরুদ্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরুষোত্তম জানা ইঁহার শিষ্য। রায় রামানন্দ, রঘুনাথ দাস, শিবানন্দ প্রভৃতি অনেক ধনী সন্তানেরাও ইঁহার নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম, প্রকাশানন্দ স্বামী প্রভৃতি বড় বড় বৈদান্তিক পণ্ডিতেরাও ইহাঁর নিকট পরাস্ত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল জাতির লোকেরাই ইঁহার প্রবর্ত্তিত মত গ্রহণ করিতে লাগিল।

আভিজাত্য-সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ-শাসিত দেশে চৈতন্যদেব সাম্য ঘোষণা করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

—হরিভক্তি-পরায়ণ চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, হরিভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল অপেক্ষা অধম। এই নজীর বলেই কায়স্থ রঘুনাথ দাস, সদ্গোপ শ্যামানন্দ—গোস্বামী পদ লাভ করিয়াছিলেন।

অনেক ব্রাহ্মণ বৈদ্যাদি উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা শূদ্র নরোত্তম ও বাসুঘোষ প্রভৃতি বৈষ্ণব ঠাকুরের নিকট দীক্ষা লইয়া তাঁহাদের পদধূলি লইতেন। বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি তীর্থস্থানে আজি পর্য্যন্তও শূদ্র জাতীয় লোকেরা ভেক লইয়া মোহান্ত খ্যাতি পাইয়া শালগ্রাম শিলা এবং দেববিগ্রহ সকল স্পর্শ ও পূজা করিতেছেন। তাঁহারা স্বহস্তে অন্নপাক করিয়া ঠাকুরকে ভোগ এবং উচ্চ শ্রেণীর লোকগণকেও প্রসাদ খাওয়াইয়া থাকেন।

এখন আমরা বৃন্দাবনের বর্ণনা আরম্ভ করিব।

মথুরার চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী চৌরাশী ক্রোশ পরিমিত ভূমিকে ব্রজমণ্ডল বলে। ব্রজমণ্ডলে প্রধান ১২টি বন আছে। যমুনার পূর্ব্বতীরে ভদ্র, ভাণ্ডীর, বেল, লোই ও মহাবন; এবং পশ্চিমতীরে মধু, তাল, কুমুদ, কাম্য, বহুলা, খদির বৃন্দা-বন। এতদ্ভিন্ন কোকিলবন, লাঠাবন প্রভৃতি অনেক উপবনও আছে। বন বলিলে কেহ বিজন

অরণ্য মনে করিবেন না। এগুলি গ্রাম মাত্র। এই সকল স্থান শ্রীকৃষ্ণের লীলা-ভূমি।

বৃন্দাবনের পশ্চিম,উত্তর ও পূর্ব্ব তিনদিকেই যমুনা। পশ্চিম দিকে কালীদহ ঘাট হইতে কেশীদহ ঘাট পর্য্যন্ত অনেকগুলি লাল পাথরে গাঁথা সুন্দর সুন্দর বাঁধান ঘাট আছে, তাহার অনেকগুলিই অযত্নে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। যমুনায় চড়া পড়িয়া সে গুলি অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। সেই প্রশস্ত চড়ার উপর এখন শস্যক্ষেত্র। তবে বর্ষাকালে যখন বন্যা আইসে, তখন 'কালীন্দীজলকল্লোলকোলাহলে' দিক মুখরিত হইয়া উঠে। ঘাটগুলি ডুবিয়া গিয়া তীরস্থ বাটীগুলির ভিতর পর্য্যন্ত প্লাবিত হয়। শীত বা গ্রীষ্ম কালে চড়ার উপর ধূ ধূ করে, সেখানে গরু মহিষাদি চরে,—এমন কি বন্য শূকর পর্য্যন্ত দেখা যায়। আমি ১৮৮০ সালে যখন বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম, তখন অনেকগুলি ঘাটেই জল দেখিয়াছিলাম। আবার কেশীঘাট হইতে উত্তর ও পূর্ব্ব দিকে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। অনেক উদ্যান ও মন্দিরাদি যমুনা গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। যমুনার শুষ্ক গর্ভে বহুসংখ্যক মোটা মোটা থামের মত ইঁট বা পাথরে গাঁথা ইন্দারাগুলি আজিও দণ্ডায়মান থাকিয়া,এখানে যে পূর্ব্বে উদ্যান ভবনাদি ছিল তাহার পরিচয় দিতেছে।

পূর্ব্বে বৃন্দাবনের পরিধি ৫ ক্রোশ ছিল, এখন ভাঙ্গিয়া গিয়া ৩॥০ ক্রোশ মাত্র অবশিষ্ট আছে। তাহাও থাকে কি না। বৃন্দাবন অনেকগুলি পল্লীতে বিভক্ত, তাহাদের সকলের নাম দিলে পুঁথী বাড়িয়া যায়।

দুই একটা ছাড়া বৃন্দাবনের অধিকাংশ পথই অপ্রশস্ত ও আঁকা বাঁকা, কিন্তু তাহাতে ইঁট বা পাথর বসান আছে বলিয়া বর্ষাকালেও কলিকাতার ন্যায় কাদা হয় না। অধিকাংশ বাটী একতালা। দোতালা বা তেতালা বাটীর সংখ্যা খুব কম। অধিকাংশ বাটীতেই কোন না কোন দেবমূর্ত্তি, অভাবে শালগ্রাম শিলা ও তুলসীমঞ্চ আছেই, —এইজন্য বৃন্দাবনের বাটীগুলিকে 'কুঞ্জ' বলে। বাটীর প্রবেশপথ বা ফটকগুলা কারুকার্য্য করা পাথরের খিলানে শোভিত। সে কালের বাটীগুলি ছোট ছোট ইঁটে গাঁথা হইত ; বালির পলস্তারার বদলে অনেক বাটীর দেয়ালে পাথরের (slab) ফলক আঁটা, বাটীর কপাট জানালাগুলা কব্জার বদলে উপরে ও নিচে কীলক দিয়া আঁটা। আজি কালিকার বাটীতে কলিকাতার ন্যায় বড় বড় ইঁটের গাঁথুনী ও কল কব্জার ব্যবহার চলিতেছে। অনেক বাটীর ছাদে পাথরের কড়ি লাগান। ছাদে টালির বদলে বড় বড় পাথরের ফলক বসান। ভাল ভাল মন্দিরগুলি জয়পুরী লাল পাথরে নির্ম্মিত। তাহাতে লোণা ধরে বলিয়া আজ কাল ভরতপুরের অন্তর্গত পাহাড়পুর হইতে ঈষৎ পীতবর্ণ পাথর আনাইয়া গাঁথনি চলিয়াছে। মুসলমান আমলে চোর ডাকাতের বড় ভয় ছিল বলিয়া প্রতি পল্লীর প্রবেশ পথে এক একটা ফটক লাগান থাকিত। প্রধান প্রধান মন্দিরে যেখানে অধিক ধন রত্নাদি থাকিত, সে সকল মন্দিরগুলির চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা ; তাহাতে দুই একটা বুরুজ অর্থাৎ তীর বা বন্দুক চালাইবার স্থান আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে এত বসতি যে, সহর বলিয়া ভ্রম হয়।

খাস বৃন্দাবনে "খগ মৃগ তরুবল্লী কুঞ্জ বাপী তড়াগ" প্রভৃতি প্রাকৃতিক শোভা এখন আর বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে যমুনায় জলে কচ্ছপ, স্থলে বানর ও গৃহমধ্যে 'রেতে মশা দিনে মাছি'—যাত্রিগণকে বিব্রত করিয়া তুলে।

বৃন্দাবনের বাহিরে গেলে আজিও ময়ূর দলের অবাধ নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও কখন দুইটা হরিণও যে না মেলে এমন নহে। আমি সময়ে সময়ে শুক জাতীয় (টিয়া চন্দনা প্রভৃতি) পাখীর ঝাঁক উড়িতে দেখিয়াছি। শারিকা বা শালিক জাতীয় পাখীও বিস্তর। কিন্তু কাকের সংখ্যা অল্প। ভক্তেরা বলেন 'কেলি-ক্লান্তা-কমলিনীর প্রভাত নিদ্রাভঙ্গ-ভয়ে এখানে কাক ডাকে না।' অবিশ্বাসীরা বলেন, 'বানরের উপদ্রবে কাকেরা এখানে বাসা বাঁধিতে পারে না তাই গ্রামান্তর হইতে তাহা-

দিগকে আসিতে হয়'। এখানে আরও একটা আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তেঁতুল সুপক্ক হয় না, কাঁচাফল শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। এই ফলের উপর নাকি শ্রীরাধার অভিশাপ আছে।

সে সময়ে যে সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবন উদ্ধার করিতে গিয়াছিলেন, চরিতামৃতে তাঁহাদের এইরূপ একটি তালিকা আছে :—রূপ, সনাতন, রঘুনাথভট্ট, জীব, গোপালভট্ট ও রঘুনাথদাস—ইঁহারা ছয় জন প্রধান গোস্বামী। তৎসঙ্গে ভূগর্ভ যাদবাচার্য্য, গোবিন্দ গোঁসাই, উদ্ধবদাস, মাধব নামক দুইজন, লোকনাথ, গোপালদাস, নারায়ণ দাস, গোবিন্দভক্ত, বাণী কৃষ্ণদাস, পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, জগদানন্দ এবং লঘু হরিদাসের নাম পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আরও কতকগুলি লোক বৃন্দাবনে যাইয়া দেবমূর্ত্তি স্থাপন ও গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন, যথা :—বল্লভ ভট্ট ও তাঁহার দুই পুত্র, বিঠলনাথ ও গোপীনাথ, হিত হরিবংশ, হরিদাস স্বামী, হরিরাম ব্যাসজী, থানেশ্বরী জগন্নাথ, অন্ধ সুরদাস এবং সুরদাস মদনমোহন। আরও হয়ত কেহ কেহ গিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম কেহ জানে না। ইহাঁদের পরবর্ত্তী কালে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ, বিশ্বনাথ কবিরাজ, বলরাম বিদ্যাভূষণ, জাহ্নবা ঠাকুরাণী প্রভৃতি অনেকে তথায় গিয়াছিলেন। তখন বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের বিশেষ প্রাধান্য ছিল।

আকবর বাদশাহ যখন বৃন্দাবন দেখিতে গিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালীদিগের শিখা-শোভিত মুণ্ডিত মস্তক, ললাটে দীর্ঘ তিলক, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামাঙ্ক, এবং কৌপীন মাত্র পরিচ্ছদ দেখিয়া তিনি এ স্থানের নাম 'ফকীরাবাদ' রাখিয়া যান। বাঙ্গালীগণকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহাদের কি অভাব তিনি পূরণ করিতে পারেন? ঐহিক কামনা নিস্পৃহ সকল বাঙ্গালীই একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের কিছুই অভাব নাই। আকবর বিনীতভাবে বলিলেন, "আমার এখানে আগমন স্মরণার্থ আপনারা কিছু প্রার্থনা করিলে আমি কৃতার্থ ও ধন্য হই।" বাঙ্গালী গোস্বামীরা বলিলেন, "রাজ্যেশ্বর, এই পবিত্র ধামে আসিয়া অনেক নৃশংস লোকে মৃগয়া করিয়া জীব হত্যা করে, আপনি সকলের শাসনকর্ত্তা, এখানে যেন কোনরূপ জীব হিংসা আর না হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দিন।" আকবর ইহা শুনিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে ব্রজমণ্ডলে জীবহিংসা নিবারণের ফর্ম্মান দিয়া যান। তাহাতে বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত ছেদনের নিষেধ আছে। এরূপ অপরাধীকে দণ্ডনীয় হইতে হইত। সে ফর্ম্মান্ খানার ইংরাজী অনুবাদ ১৯১৩ সালের হিন্দু রিভিউ (Hindu Review) পত্রিকার ৩৩৯—৩৪০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। ১০১৪ হিজরী সনে ফর্ম্মান দেওয়া হইয়াছিল। আকবরের এইরূপ আদেশ যে তাঁহার সময়েই প্রবল ছিল তাহা নহে, পরবর্ত্তী মোগল সম্রাটেরা (কেবল আরঙ্গজেব ব্যতীত) জা'ট ও মহারাষ্ট্রীয় রাজারা এমন কি ইংরাজ বাহাদুর পর্য্যন্ত সেই আদেশ বজায় রাখিয়াছেন।

আকবরের সময়ে আরও একটি গল্প শুনা যায় যে, তিনি আগ্রায় ফিরিয়া গিয়া এই সকল মহানুভব ফকীরগণের চিত্র লইবার জন্য বাদশাহী চিত্রকরকে পাঠাইয়াছিলেন। গৌড়ীয়গণ কেহই আপনাদের চিত্র দিতে সম্মত হইলেন না। চিত্রকরেরা কেবল বল্লভ ভট্ট ও তাঁহার বংশধরগণের এবং হিত হরিবংশ ও হরিদাস স্বামীর চিত্র লইয়া গিয়াছিল। সেগুলি অনেকদিন পর্য্যন্ত আকবরের গৃহ-প্রাচীর শোভিত করিত। তাঁহার লোকান্তরের পর সে চিত্রগুলি জয়পুরের রাজাদিগের হস্তগত হয়। ঐ মহোদয়গণের প্রসঙ্গকালে আমরা তাহার প্রতিলিপি দিব।

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

ইংলণ্ডে পলায়ন

("FUITE EN ANGLETERRE")

[অধর্ম্মাচারী শত্রুদের আগমনে বেল্‌জিয়ম্ হইতে শিশুরূপী যীশুকে কোলে লইয়া মেরী তাঁহার স্বামী যোসেফ্‌কে অনুসরণ করিয়া পুণ্যময় ইংলণ্ডে পলাইতেছেন, এইরূপ কল্পনায় বেল্‌জিয়ান্-কবি M. Emile Cammaerts এই কবিতাটি রচনা করেন।]

আঁধার নিশীথে যায় দূরান্তে চলে,—
নাহিক বিরাম নাহি বিশ্রাম পথে;
শিশুটি চাপিয়া শূন্য বক্ষ-তলে,
পলায় জননী স্বামী সাথে হেথা হ'তে।

আঁধার নিশীথে যায় দূরান্তে চলে,—
পশ্চাতে ফেলি নগর পল্লী যত;
ত্যজিয়া রক্ত-পিপাসু ঘাতক দলে,
আঘাতে যাদের কাঁদে অসহায় শত।

"কার তরে কোথা চলিছ বৃদ্ধ তুমি,
সঙ্গে লইয়া যুবতী পত্নী তব?"
"লুকাতে শিশুটি খুঁজি মোরা নব-ভূমি,
খুঁজিগো নূতন মানুষ, হৃদয় নব।"

নিশীথ আঁধারে সুনীলাম্বর তলে,—
দ্রুতগতি ঐ পলায় তাহারা হায়!
চরণ-শব্দ ক্ষীণ হয় পলে পলে,
পদাঙ্কগুলি ধূলায় মিলায়ে যায়।

শ্রীসুনীতি দেবী।

জৈনধর্ম্ম ও দর্শন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অজীব

অজীব পাঁচ প্রকার। পুদ্গল, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কাল এবং আকাশ।

পরমাণু অথবা পরমাণুসমূহ দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যকে পুদ্গল বলে। পুদ্গলে বর্ণ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই চারিটি গুণ আছে। জীব বা আত্মা ব্যতীত সকল বস্তুই পুদ্গল হইতে উৎপন্ন কিন্তু পুদ্গল অজ ও নিত্য। সাংখ্যের প্রকৃতির সহিত পুদ্গল তুলনীয়। সাংখ্য-মতেও পুরুষ ব্যতীত যাবতীয় বস্তু প্রকৃতি হইতে জাত। কিন্তু সাংখ্যে যেরূপ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বরূপ নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়ানুসারে পরিণাম ও লয়কার্য্য সংসাধিত হয়, জৈনমতে পুদ্গলের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে সেরূপ কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খলা স্বীকৃত হয় না। জৈন দর্শন মতে কর্ম্ম এক প্রকার সূক্ষ্ম পুদ্গল। পাপ পুণ্যানুসারে কর্ম্মপুদ্গল জীবকে আচ্ছন্ন করে, বিকৃত করে, তাহার অন্তর্নিহিত গুণকে বাধা দেয়।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম।—সাধারণতঃ যে অর্থে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম শব্দ ব্যবহৃত হয়, জৈন দর্শনে সে অর্থে তাহা ব্যবহৃত হয় না। জীব এবং পুদ্গলকে গমন করিতে যে সাহায্য করে তাহাকে ধর্ম্মদ্রব্য বলে, যেমন জল মৎস্যকে চলিতে সাহায্য করে। জীব ও পুদ্গলের স্থিতিতে যে সাহায্য করে তাহা অধর্ম্ম-দ্রব্য, যেমন গমন-কারী পথিককে পথে বৃক্ষ ছায়াদান করে। এই দুই দ্রব্য অখণ্ড, সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয় এবং লোকাকাশে ব্যাপ্ত।

কাল।—সমস্ত পদার্থকে পরিবর্ত্তিত হইতে যাহা সাহায্য করে তাহা কাল-দ্রব্য। ইহা সমস্ত লোকা-কাশে ঘটপূর্ণ রত্নরাজির ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরমাণুর মত রহিয়াছে।

আকাশ।—যে সমস্ত দ্রব্যকে স্থান দান করে তাহা আকাশ-দ্রব্য। ইহা নিত্য ও অপরিসীম।

জীব এবং কাল ব্যতীত অজীব অর্থাৎ জীব, পুদ্গল, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং আকাশ এই পাঁচ প্রকার দ্রব্যের প্রত্যেকেরই প্রদেশ বা কায় আছে। কেবল কালের প্রদেশ নাই। প্রদেশ একরূপ সূক্ষ্ম আকাশ; আকাশের সূক্ষ্মতম স্থানকে প্রদেশ বলে। এই প্রদেশ বা কায়ের কল্পনা জৈনদর্শনের একটি বিশেষত্ব। কায় বা প্রদেশ আছে বলিয়া জীব পুদ্গলাদি পাঁচটিকে পঞ্চাস্তিকায় বলে। ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত 'পঞ্চাস্তিকায়' নামক পুস্তক জৈনদর্শনের একখানি বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থ।

ছয়প্রকার দ্রব্যের বিচার করিয়া জৈন দার্শনিকগণ সপ্তুতত্ত্বের আলোচনা করেন।

জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জ্জরা এবং মোক্ষ এই সাতটি জৈনধর্ম্মের মুখ্য তত্ত্ব। এই সাতটি ভিন্ন ধর্ম্মাধর্ম্ম অথবা পাপপুণ্য এই দুইটি দ্রব্যকে পৃথক তত্ত্বরূপে কোন কোন দার্শনিক উল্লেখ করিয়া তত্ত্বসংখ্যা নয়টি নির্দ্ধারিত করেন। মুখ্যতত্ত্ব সাতটি কি নয়টি এ সম্বন্ধে জৈনদর্শনে নিশ্চয়তা না থাকায় মাধবাচার্য্য 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে' জৈনদর্শনকে বিদ্রূপ করিয়াছেন।

জীব ও অজীব তত্ত্ব দ্রব্য পরিচয়ে আলোচিত হইয়াছে। কর্ম্মপুদ্গল সংসারী জীবকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্মের অষ্টবিধ মূলপ্রকৃতি অনুসারে আটপ্রকার বিচিত্র আকারে পরিণত হয় এবং জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া একটি সূক্ষ্মশরীর নির্ম্মাণ করে। এই কার্ম্মণ শরীর সাংখ্য ও বেদান্তের সূক্ষ্মশরীরের অনুরূপ। নির্ব্বাণলাভ পর্য্যন্ত জন্মজন্মান্তর এই কার্ম্মণ শরীর জীবের সহিত সংযুক্ত থাকে। কার্ম্মণশরীর অষ্টরূপ :—

(১) জ্ঞানাবরণীয়	ইহারা শ্রদ্ধা ও জ্ঞানকে বাধা দেয়।
(২) দর্শনাবরণীয়	
(৩) মোহনীয়	মোহের সঞ্চার করে। ইহাই রাগ-দ্বেষের কারণ।
(৪) বেদনীয়	সুখ দুঃখের কারণ।
(৫) আয়ুষ্ক	জীবের আয়ুকাল পরিমিত করে।
(৬) নাম	যাহা কিছুর দ্বারা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তাহাই নাম। (Principle of Individuality)
(৭) গোত্র	মানুষের শ্রেণী বা জাতি নির্দ্দেশ করে।
(৮) অন্তরায়	জীবের শক্তি ও গুণের বিকাশে বাধা দেয়।

যদ্দ্বারা কর্ম্মপুদ্গল জীবের মধ্যে প্রবেশ করে সেই প্রক্রিয়ার নাম আস্রব। নৌকা ছিদ্রযুক্ত হইলে যেমন নদীর জল নৌকার মধ্যে প্রবেশ করে সেইরূপ জীব রাগদ্বেষাদিবৃত্তিযুক্ত হইলে কর্ম্মস্রোত তদ্দ্বারা জীবমধ্যে প্রবেশ করে। দর্শনাবরণীয় প্রভৃতি উপরোক্ত অষ্টবিধ কর্ম্মপ্রকৃতির সম্পর্কে প্রত্যেক কর্ম্মের কারণীভূত পৃথক্ পৃথক্ আস্রব বা কর্ম্মাগম হইয়া থাকে।

বেদান্তদর্শনে সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ ও প্রারব্ধ এই তিন প্রকার কর্ম্মের বিভাগ দৃষ্ট হয়। জৈনদর্শনে তাহাদিগকে যথাক্রমে সত্তা, বন্ধ ও উদয় বলে। পূর্ব্বজন্মের ও ইহজন্মের যে সকল কর্ম্ম, আত্মার সহিত মিলিত আছে এবং এখনও যাহাদের ফলভোগ হয় নাই সেই সকল কর্ম্মকে সত্তা বলে। পূর্ব্বকালকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করাকে উদয় বলে। নবীন কর্ম্মের সংযোগকে বন্ধ বলে। এই বন্ধই চতুর্থ তত্ত্ব। যে প্রক্রিয়ায় কর্ম্ম আত্মার মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারে তাহা আস্রব, এবং কর্ম্ম প্রবিষ্ট হইবার পর আত্মা ও কর্ম্ম একীভূত হইয়া যাওয়ার নাম বন্ধ।

আত্মকর্ম্মণোরন্যোঽন্যপ্রদেশানুপ্রবেশাত্মকো বন্ধঃ। আত্মার প্রদেশ ও কর্ম্মপুদ্গলের প্রদেশ পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার নাম বন্ধ।

আস্রব ও বন্ধতত্ত্বের প্রসঙ্গে জৈনদর্শনে কর্ম্মতত্ত্বের অতিশয় বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। কর্ম্মের পূর্ব্বকথিত অষ্টবিধ মূলপ্রকৃতি ব্যতীত ১৪৮ প্রকার উত্তরপ্রকৃতি আছে। এই সকল বিভাগ উপবিভাগের অরণ্যে একটা বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

কর্ম্ম আস্রবদ্বার দিয়া আসিবার পর জীব তাহার সহিত জড়িত হইয়া বন্ধপ্রাপ্ত হয়। সকল সংসারী জীবেরই সেই অবস্থা হইয়াছে এবং নিয়ত কর্ম্মাস্রবে নিত্য নূতন কর্ম্মবন্ধ সঞ্চিত হইতেছে। এই কর্ম্মবন্ধ হইতে জীবের স্ব-ভাব প্রাপ্তির উপায় উদ্ভাবন করাই জৈন

সাধনের উদ্দেশ্য। সংবর, নির্জ্জরা ও মোক্ষ এই তিনটি তত্ত্ব সেই সাধনপথের সম্বন্ধে উদ্দিষ্ট। তন্মধ্যে সংবরতত্ত্বই প্রধান, কারণ ইহাই মুখ্য সাধনপথ। নির্জ্জরা ও মোক্ষ ইহারই ফল।

আস্রবনিরোধলক্ষণঃ সংবরঃ।

যদ্দারা কর্ম্মাস্রব নিরুদ্ধ হয় তাহাই সংবর। রাগদ্বেষাদিবৃত্তি নিমিত্তই কর্ম্মাস্রব হয়; নানারূপ বাসনা ও কামনাই জীবকে কর্ম্মের দাস করিয়া বন্দীভূত করিয়া রাখিয়াছে। বাসনা ও প্রবৃত্তির পথ নিরোধ করাই সংবরতত্ত্বের উদ্দেশ্য। এই সংবর সাধন তিন গুপ্তি, পাঁচ সমিতি, দ্বাদশ অনুপ্রেক্ষা, দ্বাবিংশতি পরিষহজয়, পঞ্চ চারিত্র এবং দ্বাদশ তপঃ, এই সকল দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। সংবর তত্ত্ব অতিশয় বিস্তারিত, ইহা জৈনগণের সুবৃহৎ নিত্য-কর্ম্মপদ্ধতি। সাধনার সুমহৎ তপস্যা হইতে সংসারের নিতান্ত খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্ত্তব্যের মধ্যে সংবর-তত্ত্বের বিধিনিষেধ পল্লবিত ও বিস্তারিত হইয়া আছে। চিত্তের একাগ্রতাস্থাপন, শরীরের প্রতি মমতাত্যাগ, নিত্যস্বাধ্যায় প্রভৃতি হইতে, পথে চলিতে চলিতে কোন ইতরপ্রাণীকে পীড়া না দেওয়ার বিধি, জীববিহীনস্থানে মলমূত্রবিসর্জ্জন বা শ্লেষ্মা ত্যাগের নিষেধ, এমন কি কোন দিন বা ক্ষুধা রাখিয়া কিছু কম করিয়া আহার করিবার সংকল্প প্রভৃতি যাবতীয় নিয়ম এই সংবরতত্ত্বের অন্তর্গত।

কর্ম্মের একদেশ বা আংশিক নাশ হওয়ার নাম নির্জ্জরা এবং সমস্ত কর্ম্মরাশি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়াকে—আত্মা কর্ম্মবন্ধন হইতে কেবলীভূত হওয়াকে—মোক্ষ বলে। কর্ম্মবন্ধের যতই নাশ হইতে থাকে, আত্মার অবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। এই অবস্থা পরিবর্ত্তনকে জৈনমতে গুণস্থান বলে। গুণস্থান ১৪ প্রকার। এই সকল গুণস্থানের বর্ণনাপ্রসঙ্গে জৈনযতিগণের সাধনাঙ্গের অনেক রহস্য জানিতে পারা যায়। শ্রদ্ধা, ব্রতানুষ্ঠান, অহিংসা প্রভৃতির আচরণ, দোষকষায়াদির নাশ এবং যোগ প্রভৃতির দ্বারা আত্মা সপ্তমগুণস্থানে উত্থিত হয়। এই গুণস্থানে যোগদ্বারা চিত্তের একাগ্রতাবৃদ্ধি করিতে হয়। দ্বাদশ গুণস্থানের পর কয়েক প্রকার ধ্যানের দ্বারা সযোগ-কেবলী নামক ত্রয়োদশ গুণস্থানের আবির্ভাব হয়। এই গুণস্থানে আত্মার অনন্তদর্শন, অনন্তজ্ঞান, অনন্তসুখ ও অনন্তবীর্য্য এই চারিটি স্বাভাবিক গুণ প্রকাশিত হয়, এবং সেইরূপ আত্মা কেবলী-ভগবান পদবাচ্য হইয়া সর্ব্বদেশ পর্য্যটন করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতে থাকেন। তৎপরে তিনি ক্রমশঃ চতুর্দ্দশ গুণস্থানে আরূঢ় হন। ত্রয়োদশ গুণস্থানে কেবল শরীর যোগই থাকে, আত্মার তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। এই জন্য ইহাকে সযোগকেবলী বলে। চতুর্দ্দশ গুণস্থানের আবির্ভাব হইলে শরীরও নষ্ট হইয়া যায়; সেই অবস্থায় শরীর কর্পূরবৎ যত্র তত্র উড়িয়া যায়। ইহাই নির্ব্বাণ বা মোক্ষ। আত্মা শরীর হইতে পৃথক হইয়া তিনলোকের অগ্রভাগে সিদ্ধশিলা নামক স্থানে যাইয়া স্থিতি করে। সেখান হইতে আর কখনও প্রত্যাগমন করে না। সযোগকেবলী ও অযোগকেবলী অবস্থার সহিত আমাদের শাস্ত্রের জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির তুলনা লইতে পারে। বিভিন্ন গুণস্থানের ন্যায় মোক্ষপ্রাপ্তির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আমাদের শাস্ত্রেও স্বীকৃত হইয়া থাকে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, সত্ত্বাপত্তি, সংসক্তি, পদার্থাভাবনী এবং তুর্য্যগা নামক সাতটি ব্রহ্মবিদ্-ভূমি বর্ণিত হইয়াছে।

মোক্ষসাধনার উপদেশক্রমে সম্যক্ দর্শন সম্যক্ জ্ঞান এবং সম্যক্ চারিত্র এই 'রত্নত্রয়' উপদিষ্ট হইয়া থাকে।

সম্যগ্দর্শন।—জীব প্রভৃতি সাতটি তত্ত্বের অর্থে, তীর্থঙ্কর সত্যার্থদেব, শাস্ত্র এবং সদ্গুরুর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা করাই সম্যগ্দর্শন। 'দর্শন' এই কথাটি জৈনদর্শনে শ্রদ্ধা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "তত্ত্বার্থশ্রদ্ধানং সম্যগ্দর্শনম্।"*

'শ্রদ্ধাবাল্লঁভতে জ্ঞানং'—তাই সম্যগ্দর্শন হইলে সম্যক্জ্ঞানের উপদেশ।

*সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের ইংরাজী অনুবাদে পণ্ডিতপ্রবর মিঃ কাউয়েল 'সম্যগ্দর্শনে'র অনুবাদ করিয়াছেন Right intuition. তাহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। আধুনিক জৈন লেখকগণ সম্যগ্দর্শনকে Right faith বলিয়া অনুবাদ করিয়া থাকেন।—লেখক।

সম্যক্‌জ্ঞান।—সংশয়-বিপর্য্যয়-রহিত তত্ত্বার্থাদির যথার্থ জ্ঞানকে সম্যক্‌জ্ঞান বলে।

সম্যক্ চারিত্র।—সম্যগ্‌দর্শনে বিগলিতমোহ ও ও সম্যক্‌জ্ঞানে স-সমঞ্জস-বিদিত-তত্ত্বার্থ হইয়া রাগদ্বেষ-রহিত পবিত্র আচরণকে সম্যক্ চারিত্র বলে। চারিত্র-আচারী গৃহীকে শ্রাবক বা দেশব্রতী বলে। শ্রাবক একাদশ শ্রেণী বা প্রতিমাপালন করিবেন। স্বকীয় চরিত্রের উৎকর্ষদ্বারা ক্রমশঃ উচ্চতর শ্রেণীতে উঠিতে থাকিবেন।

পূর্ব্বকথিত সংবরতত্ত্ব এবং এই প্রতিমাপালন জৈন-দর্শনের চারিত্রভাগ (ethics) ইহাতে এক অতি উচ্চ-দরের নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার আসক্তি বিরহিত হইয়া কর্ম্ম করাই চারিত্র সাধনের মূল-কথা। আসক্তিহেতুই কর্ম্মবন্ধ হয়; অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে তদ্দ্বারা কর্ম্মবন্ধ হয় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নিষ্কামধর্ম্মের যে অনুপম উপদেশ নিহিত আছে, জৈনশাস্ত্রে 'চারিত্র-উপদেশে' তাহার ছায়া বিশেষ-ভাবে লক্ষিত হয়।

উপরোক্ত একাদশ প্রতিমার মধ্যে পঞ্চানুব্রতের প্রাধান্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কোন কোন জৈনগ্রন্থে এই পঞ্চানুব্রতই সম্যক্‌চারিত্র বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ।

অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য এবং গ্রাসাচ্ছাদনের অতিরিক্ত কোন বস্তু গ্রহণ না করা, এই পাঁচটিকে পঞ্চানুব্রত বলে। হিংসা, মিথ্যাকথন প্রভৃতি পঞ্চদোষ হইতে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইলে তাহাকে কাৎস্নচারিত্র এবং কিয়ৎপরিমাণে নিরস্ত হইলে তাহাকে একদেশচারিত্র বলে। যতি সন্ন্যাসীর দ্বারাই কাৎস্নচারিত্র পালন করা সম্ভব; শ্রাবক বা গৃহস্থ উপাসকগণের জন্য একদেশ-চারিত্র বিহিত হইয়াছে। পতঞ্জলির যোগদর্শনে যোগের প্রথমাঙ্গ যমের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে

অহিংসাসত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।

যোগসূত্র। ২।৩০

তাহার সহিত জৈনশাস্ত্র-দত্ত পঞ্চানুব্রত সংজ্ঞার বাক্যগত অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে একটি অপরটি হইতে গৃহীত।

পঞ্চানুব্রতের মধ্যে অহিংসা সর্ব্বপ্রধান। জৈনদের মতে 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' এবং অহিংসা তাঁহাদের বর্ত্তমান ব্যাবহারিক জীবনেরও একটি মূল্যবান বিশেষত্ব। 'পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়' নামক জৈনগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—

আত্মপরিণাম-হিংসন-হেতুত্বাৎ সর্ব্বমেব হিংসৈতৎ।

অনৃত-বচনাদি কেবলমুদাহৃতং শিষ্যবোধায়॥ ৪২॥

হিংসা, অসত্য, চৌর্য্য, অব্রহ্মচর্য্য এবং পরিগ্রহ, ইহারা সকলেই আত্মার স্ব-ভাবে পরিণত হইতে হিংসা করে অর্থাৎ বাধা দেয়। তজ্জন্য এই দোষগুলিকে হিংসা বলা যাইতে পারে। হিংসাই সর্ব্ববিপত্তির কারণ। কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর বোধসৌকার্য্যার্থে অসত্য, চৌর্য্য প্রভৃতি হিংসার দৃষ্টান্তস্বরূপ পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। রাগদ্বেষ প্রভৃতি কষায়-জনিত প্রাণশক্তির ক্ষতিকর কার্য্য করাই হিংসা। * সম্পূর্ণরূপে অনাসক্তিই অহিংসা। অহিংসার এই বিশেষ ব্যাপক অর্থের সহিত যোগশাস্ত্রে প্রদত্ত অহিংসার অর্থের তুলনা করা যাইতে পারে। † সকল জৈনগ্রন্থে কিন্তু অহিংসা শব্দ এরূপ ব্যাপক অর্থে গৃহীত হয় না। ত্রস বা জঙ্গম জীবের স্বয়ং বধ না করা বা অন্যের দ্বারা বধ না করান, ইহাই সাধারণতঃ অহিংসা বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে এবং এই অর্থে জৈনগণ অহিংসানুব্রত পূর্ণমাত্রায় প্রতিপালন করিয়া থাকেন। সর্ব্বপ্রকার জীবহিংসা-বিরতি জৈনধর্ম্মজীবনে এত প্রাধান্য ও বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে যে সাধারণের মনে নিরামিষভোজন, পিঁজরাপোল প্রভৃতি অনুষ্ঠান জৈন নামের সহিত স্বাভাবিক

* যৎ খলু কষায়যোগাৎ প্রাণানাং দ্রব্যভাবরূপাণাম্।
ব্যপরোপণস্য করণং সুনিশ্চিতা ভবতি সা হিংসা॥
পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়। ৪৩।

† কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা।
অক্লেশজননং প্রোক্তমহিংসত্বেন যোগিভিঃ॥
যোগিযাজ্ঞবল্ক্যম্। ১ম অধ্যায়, ৫০ শ্লোক।

বন্ধনে সম্বদ্ধ। জৈন সন্ন্যাসী তো দূরের কথা, জৈন গৃহীগণের অনেকেই দীপশিখায় কীটপতঙ্গাদি পুড়িয়া মরিবে এই ভয়ে রাত্রিকালে কোন প্রকার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন না। সেই কারণে জৈনগণ রাত্রিকালে ভোজন করেন না,—সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই রাত্রের আহার সমাধা করিয়া থাকেন। মধুসংগ্রহকালে অনেক মক্ষিকার প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে বলিয়া জৈনশাস্ত্রে মধুব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে। এমন কি সর্প ব্যাঘ্র প্রভৃতি আততায়ী হিংস্র পশুকেও হত্যা করিবার নিষেধ আছে। জৈনধর্ম্ম অহিংসাতত্ত্বকে এইরূপে অতিশয় বিস্তারিত করিয়া ব্যাবহারিক জীবনকে প্রতিপদবিক্ষেপে নিয়মিত ও বিধিবদ্ধ করিয়া এক উপহাসাস্পদ সীমায় পৌছাইয়া দিয়াছে। এ সম্বন্ধে যত বিধিনিষেধ আছে তাহা সবগুলি মানিয়া চলা এই বিংশ শতাব্দীর জীবন সংগ্রামে যুক্তিযুক্ত ও সম্ভবপর কি না তাহা বিচার্য্য। সর্ব্বপ্রকার জঙ্গম জীবের প্রাণহানিকর কোনরূপ কার্য্য করা অবিধেয়, ইহা মূলসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া আমাদের দৈনন্দিন ব্যাবহারিক জীবনকে সংযত ও সঙ্কুচিত করিতে হইলে আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষানুসারে আমাদের জীবনযাপন একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। স্থূলচক্ষুর অদৃশ্য হইলেও কোটী কোটী জঙ্গমজীব জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আমাদিগকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে; জলপান, নিঃশ্বাসগ্রহণ প্রভৃতি অবশ্য সম্পাদ্য কর্ম্মেও সেই সকল আণুবীক্ষণিক জীবসংঘের সংহার অবশ্যম্ভাবী।

জৈনধর্ম্মে অহিংসাকে এত প্রাধান্য কেন দেওয়া হইয়াছে তাহা ঐতিহাসিকগণের গবেষণার যোগ্য। জৈনসিদ্ধান্তে অহিংসা শব্দের অর্থ ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইয়া অবশেষে অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন গ্রন্থে তাহা গীতোক্ত নিষ্কামধর্ম্মের রূপান্তরভাবে পরিগৃহীত হইলেও, প্রথমে যে অহিংসাশব্দ সাধারণ প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হইত তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বৈদিকযুগে যজ্ঞানুষ্ঠানে পশুহিংসা নিরতিশয় নিষ্ঠুর সীমায় উপনীত হইয়াছিল। সেই ক্রূরকর্ম্মের বিরুদ্ধে তৎকালে অহিংসাবাদী কয়েকটি সম্প্রদায় যে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল তাহা একরূপ সুনিশ্চিত। বেদের মধ্যে "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" এই সাধারণ বিধি থাকা সত্ত্বেও, যজ্ঞকর্ম্মে পশুহত্যার বহুসংখ্যক বিশেষ বিধি উপদিষ্ট হওয়ায়, সেই সাধারণ বিধি কেবল মাত্র বিধিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল; পদে পদে ব্যাহত ও অতিক্রান্ত হইয়া তাহার কল্যাণকর উপদেশ বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছিল এবং অবশেষে পশু যজ্ঞের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে এই অদ্ভুত মতবাদ প্রণীত ও প্রচলিত হইয়াছিল। * ইহার ফলে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড আলম্বিত পশুর রক্তে রঞ্জিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার সাত্বিক ভাবের বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। জৈনেরা বলেন যে সেই সময়ে যজ্ঞের নামে নৃশংস পশুহত্যার বিরুদ্ধে যে কয়টি সাম্প্রদায়িক মত উত্থিত হইয়াছিল তন্মধ্যে জৈনগণ সর্ব্বপ্রথম ছিলেন। "মুনয়ো বাতবসানাঃ" বলিয়া ঋগ্বেদে যে নগ্ন মুনিগণের উল্লেখ আছে, জৈনগণ বলেন যে তাঁহারাই জৈন দিগম্বর সন্ন্যাসী।

বুদ্ধদেবের উদ্দেশে জয়দেব গাহিয়াছেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্।—

কিন্তু এই অহিংসাতত্ত্ব জৈন ধর্ম্মের সহিত এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত যে জৈনধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী স্বীকৃত হইলে পশুঘাতাত্মক যজ্ঞবিধির বিরুদ্ধে প্রথম দণ্ডায়মান হইবার প্রশংসা বুদ্ধদেবের অপেক্ষা জৈনধর্ম্মেরই প্রাপ্য। বেদবিধির নিন্দা করার নিমিত্ত আমাদের শাস্ত্রে চার্ব্বাক,জৈন ও বৌদ্ধ পাষণ্ড বা নাস্তিক মত বলিয়া বিখ্যাত। এই তিন সম্প্রদায়কে অযথা নিন্দাবাদ করিয়া যে সকল শাস্ত্রকারগণ নিজেদের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, যে গ্রন্থ যত প্রাচীন, তাহাতে বৌদ্ধদের অপেক্ষা জৈনদের উপর আক্রোশ

* যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
অতস্ত্বাং ঘাতয়িষ্যামি তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥

তত বেশী। অহিংসাবাদী জৈনগণের নিরীহ মস্তকের উপর কোন কোন শাস্ত্রকার শ্লোকের উপর শ্লোক গ্রথিত করিয়া মুষলধারে বর্ষণ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিষ্ণুপুরাণ উল্লেখ করিতে পারা যায়। আধুনিক গৃহীত মতানুসারে বিষ্ণুপুরাণ, পুরাণ সকলের মধ্যে প্রাচীনতম না হইলেও অতিশয় প্রাচীন। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায় কেবলমাত্র জৈনদের নিন্দায় পূর্ণ। নগ্নদর্শনে শ্রাদ্ধকার্য্য পণ্ড হয় এবং নগ্নের সহিত সম্ভাষণ করিলে দিনপুণ্য নষ্ট হয়। শতধনু নামে রাজা ঐরূপ 'পাষণ্ডে'র সহিত সম্ভাষণ করায় কুক্কুরযোনি, শৃগালযোনি, বৃকযোনি, গৃধ্রযোনি ও ময়ূরযোনিতে ক্রমান্বয়ে জন্মপরিগ্রহ করিয়া অবশেষে অশ্বমেধ যজ্ঞের জলে স্নাত হওয়ায় মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। জৈনদের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা নিম্নোদ্ধৃত প্রসিদ্ধ শ্লোকটিতেও প্রকটমান—

ন পঠেৎ যাবনীং ভাষাং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।
হস্তিনা পীড়ামানোঽপি ন গচ্ছেজ্জিনমন্দিরম্॥

জৈনগণ চব্বিশজন জিন বা তীর্থঙ্করের পূজা করেন বলিয়াছি কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বহু-ঈশ্বরবাদী (Polytheists) মনে করা সঙ্গত নয়। শুধু চব্বিশজন তীর্থঙ্কর কেন, মোক্ষপ্রাপ্ত অনন্ত আত্মার তাঁহারা উপাসক। জৈনধর্ম্মে আত্মার মোক্ষপ্রাপ্ত অবস্থাকে পরমাত্মভাব বলে। এক দৃষ্টিতে জৈনগণ বহু পরমাত্মার উপাসক বলিয়া স্বীকৃত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা ব্যক্তিত্ব বিরহিত পারমাত্মস্বভাবেরই পূজা করিয়া থাকেন। ব্যক্তিত্ব বিরহিত বলিয়া জৈন পূজাপদ্ধতিতে বৈষ্ণব বা শাক্ত মতের ন্যায় ভক্তির বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গের সম্ভাবনা নিতান্তই কম।

পরমাত্মাবস্থাপ্রাপ্ত সাধু মহাত্মাগণের গুণরাজি সাধারণকে স্মরণ করাইয়া সেই পথের জন্য ব্যাকুলিত করিবার উদ্দেশ্যে জৈনগণ তাঁহাদের ধ্যানাবস্থ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। মূর্ত্তি দুইপ্রকার, খড়্গাসন এবং পদ্মাসন, তন্মধ্যে খড়্গাসন মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। পূজাপদ্ধতি হিন্দুপূজাপদ্ধতির অবিকল অনুরূপ। প্রদীপ জ্বালিয়া, ধূপ পোড়াইয়া, চন্দন, কেশর, তণ্ডুল পুষ্প ও নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া মূর্ত্তির পূজা সম্পাদিত হয়। পূজাস্থানে আহবনীয় গার্হপত্য ও দক্ষিণ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া হোম করিবারও বিধি আছে। পূজায় যে সকল দ্রব্য অর্পণ করা হয় তাহাকে নির্ম্মাল্য বলে। নির্ম্মাল্য প্রসাদ বলিয়া গৃহীত হয় না; নির্ম্মাল্য ভক্ষণে পাপ হয় বলিয়া জৈনশাস্ত্রে লিখিত আছে। জৈনদের মধ্যে আজকাল যে কয়টি সম্প্রদায় আছে, এই মূর্ত্তি পূজার বিষয় লইয়াই তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। দিগম্বর সম্প্রদায়ীগণের পূজিত মূর্ত্তিমাত্রই নগ্ন। শ্বেতাম্বরীয়গণ মূর্ত্তিকে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। স্থানকপন্থী বা ঢুণ্ডিয়াপন্থীগণ আদৌ মূর্ত্তিপূজার কর্ত্তব্যতা স্বীকার করেন না।

জৈনমত বৌদ্ধমতের সহিত অভিন্ন বলিয়া অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা ছিল। উভয় ধর্ম্মের মধ্যে কতকাংশে সাদৃশ্য থাকিলেও তাহাদের মধ্যে অনেকস্থলে বিরোধও দৃষ্ট হয়। সাদৃশ্যের মধ্যে প্রথমতঃ, উভয় ধর্ম্মেই অহিংসানীতির প্রাধান্য অতিশয় বেশী। দ্বিতীয়তঃ জিন, সুগত, অর্হৎ, সর্ব্বজ্ঞ, তথাগত বুদ্ধ, সম্বুদ্ধ প্রভৃতি নাম বৌদ্ধ ধর্ম্মে বুদ্ধদিগের প্রতি এবং জৈনধর্ম্মে তীর্থঙ্করগণের প্রতি নির্ব্বিশেষে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, উভয় ধর্ম্মেরই লোকগণ বুদ্ধদেব বা তীর্থঙ্করগণের একই প্রকারের প্রস্তরময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক চৈত্যে বা স্তূপে তাহা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। স্তূপ বা মূর্ত্তির গঠনে সাদৃশ্য এত বেশী যে কোনও স্তূপ বা মূর্ত্তি বৌদ্ধ কি জৈন তাহা বিশেষজ্ঞের সাহায্য ভিন্ন নির্ণয় করা অনেকস্থলেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এই সকল বাহ্যিক সাদৃশ্য ব্যতিরেকে মতবাদের মধ্যেও উভয় ধর্ম্মে অনেকস্থলে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু সে সকল বিষয়ে প্রায়ই হিন্দুধর্ম্মের সহিত জৈন ও বৌদ্ধ উভয়

মতেরই ঐকমত্য আছে। ঐ প্রকার অনেকানেক সাদৃশ্য থাকিলেও বৌদ্ধ ও জৈনমতে অনেকস্থলে বিরোধ আছে। * প্রথম বিরোধ, বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদী। জৈনেরা ক্ষণিকবাদের ঐকান্তিকতা স্বীকার করেন না। জৈনেরা বলেন, কর্ম্মফলাত্মক জন্মান্তরবাদের সহিত ক্ষণিকবাদের সামঞ্জস্য হইতে পারে না। ক্ষণিকবাদ স্বীকার করিলে কর্ম্মফল মানা অসম্ভব। যে ব্যক্তি কর্ম্ম করিল সেই ক্ষণেই তাহার বিনাশ হইল এবং অপর এক ব্যক্তি তাহার কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিল, ইহা কর্ম্মফল বাদের বিরুদ্ধ কথা। জৈনদের মধ্যে অহিংসানীতির যত কড়াকড়ি, বৌদ্ধদের মধ্যে সেরূপ নহে। অন্য কেহ হত্যা করিয়া আনিয়া দিলে বৌদ্ধদের সেই মাংস খাইতে নিষেধ নাই, নিজে হত্যা করাই নিষিদ্ধ। বৌদ্ধ দর্শনের পঞ্চস্কন্দের ন্যায় কোন মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জৈন দর্শনে স্বীকৃত হয় নাই। বৌদ্ধদর্শনে জীব পর্য্যায় অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ, জৈন দর্শনের ন্যায় তাহা উদার ও ব্যাপক নহে। হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় জৈনধর্ম্মে মুক্তির পথে যেরূপ উত্তরোত্তর স্তরের কথা আছে, বৌদ্ধ ধর্ম্মে সেরূপ কিছু স্বীকৃত হয় না। জৈনেরা জাতি বিচার মানিয়া থাকেন, বৌদ্ধেরা জাতি মানিতেন না।

জৈন ও বৌদ্ধ মতকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিবার জৈনমতের সম্যক্ আলোচনার অভাব ভিন্ন আর অন্য কোন কারণই ছিল না। আমাদের শাস্ত্রে কোনকালে জৈন ও বৌদ্ধ মত অভিন্ন বলিয়া ভুল করা হয় নাই। বেদান্তসূত্রে বিভিন্নস্থলে বিভিন্ন হেতুবাদে বৌদ্ধ ও জৈন মত নিরাস করিবার প্রসঙ্গ আছে। 'শঙ্করদিগ্বিজয়ে' বর্ণিত আছে যে শঙ্করাচার্য্য কাশীতে বৌদ্ধগণের সহিত এবং উজ্জয়িনী ও বাহিলকে জৈনগণের সহিত বিচার করিয়াছিলেন; উভয় মত এক হইলে বিভিন্নস্থলে দুইবার বিচারের আবশ্যকতা ছিল না। 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নামক দার্শনিক নাটকে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও জৈনদিগম্বরের দার্শনিক কলহ বর্ণিত হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্মের সহিত জৈনধর্ম্মের অনেকস্থলে সাদৃশ্য এবং অনেক স্থলে বিরোধ আছে কিন্তু বিরোধের অপেক্ষা সাদৃশ্যই বেশী। এতদিন ধরিয়া কয়েকটি মুখ্য বিরোধের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখায় ক্ষুদ্র হিংসা, ক্ষুদ্র বিদ্বেষ উদ্বেলিত হইয়া পরস্পরকে ভাল করিয়া বুঝিবার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। প্রাচীন হিন্দু সব সহ্য করিতে পারিতেন, বেদ পরিত্যাগ তাঁহাদের চক্ষে অমার্জ্জনীয় ছিল।

হিন্দুধর্ম্মের জন্মকর্ম্মবাদ জৈন ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মের মেরুদণ্ড স্বরূপ এবং তাহা উভয় ধর্ম্মেই অবিকৃত ভাবে গৃহীত হইয়াছে। জৈনগণ কর্ম্মকে একপ্রকার আণবিক সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া কল্পনা করায় কেবলমাত্র কয়েকটি গুরুতর দার্শনিক সমস্যারই সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কর্ম্মফলবাদের মূল কথাটি পূর্ণ মাত্রায় অক্ষুণ্ণ আছে। হিন্দু দর্শনের দুঃখবাদ এবং জন্ম-মরণাত্মক দুঃখরূপী সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য নিবৃত্তিমার্গানুসারী মোক্ষান্বেষণ—ইহা হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সকলেরই মুখ্যসূত্র; নিবৃত্তিতপঃ দ্বারা কর্ম্মবন্ধ ক্ষয়িত হইলে আত্মা কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া স্বভাবে উপগত হইবে—স্বকীয় নিত্য-মুক্ত-বুদ্ধ-শুদ্ধ স্বভাবের অমিত গৌরবে মহিমান্বিত হইবে। তখন

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

ইহা স্পষ্টভাবে জৈন ও হিন্দুশাস্ত্রে ঘোষিত হইয়াছে। নির্ব্বাণ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হইলেই বুদ্ধদেব নিরুত্তর হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতেন; তদ্দ্বারা ইহা অনুমান করা অসঙ্গত যে বৌদ্ধ নির্ব্বাণ বৈদান্তিক মোক্ষ হইতে বিভিন্ন। ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্ন হইলে

গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ

ইহাই প্রাচীন রীতি, কারণ প্রশ্ন এরূপ বিষয়ক

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ—

তাহা অনির্ব্বচনীয়।

* সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে মাধবাচার্য্য জৈনদর্শন দ্বারা বৌদ্ধ দর্শন নিরস্ত করিয়াছেন।—লেখক।

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥

"যিনি (ব্রহ্মকে) জানেন না, তিনিই জানেন; যিনি জানেন, তিনি জানেন না। ব্রহ্ম যিনি জানেন তাঁহার অজ্ঞাত, আর যিনি জানেন না তাঁহারই জ্ঞাত।"

ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে বৌদ্ধ নির্ব্বাণ ও হিন্দুর মোক্ষ, মুক্তি, নিঃশ্রেয়স, অপবর্গ, কৈবল্য—সব মূলতঃ একই কথা। বৌদ্ধধর্ম্মের যাহা অনাত্মা, তাহা বেদান্তের আত্মার প্রতিযোগী নহে, তাহা ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ অহংবুদ্ধিরই প্রতিযোগী। বৌদ্ধ ধর্ম্মের যাহা মহাশূন্য তাহা অসতের আকর সর্ব্বশূন্যময় অন্ধতমস নহে, তাহা সেই নির্ব্বিশেষ অখণ্ড-সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরম জ্যোতিঃ

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

কঠোপনিষদ্।

জন্ম জন্মান্তরার্জ্জিত কর্ম্মরাশি বাসনাবিধ্বংসী নিবৃত্তি-মার্গের দ্বারা ক্ষয় করিয়া পরমপদ প্রাপ্তির সাধনা হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন এই তিন ধর্ম্মেই তুল্যভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। দার্শনিক মতবাদের বিস্তারে এবং সাধন প্রক্রিয়ার বিশিষ্টতায় বিভিন্নতা থাকিতে পারে কিন্তু উদ্দেশ্য গন্তব্যস্থল সকলেরই এক—

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল-নানাপথজুষাং
নৃণাং গম্যস্ত্বমেকঃ পয়সামর্ণব ইব।

মহিম্নস্তবের এই সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বহুমান-কারিণী উদারতা আমাদের শাস্ত্রে বহুস্থলে বারবার উপদিষ্ট হওয়া সত্বেও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক-বুদ্ধি-জনিত বিদ্বেষ প্রাচীন গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু আজকাল আমরা সেই সঙ্কীর্ণতার ক্ষুদ্র মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া বলিতে শিখিয়াছি—

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এইরূপ মহদুদারভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া জৈনাচার্য্য ভট্ট অকলঙ্কদেব বলিয়া গিয়াছেন—

যো বিশ্বং বেদ বেদ্যং জননজলনিধের্ভঙ্গিনঃ পারদৃশ্বা
পৌর্ব্বাপর্য্যাবিরুদ্ধং বচনমনুপমং নিষ্কলঙ্কং যদীয়ম্।
তং বন্দে সাধুবন্দ্যং সকলগুণনিধিং ধ্বস্তদোষদ্বিষন্তং
বুদ্ধং বা বর্দ্ধমানং শতদলনিলয়ং কেশবং বা শিবং বা॥

শ্রীঅম্বুজাক্ষ সরকার।

মৃত্যুর মাধুরী

অস্ত-অরুণ বুলিয়ে দিল অবশ-অঙ্গ 'পরে
কাঁচা সোণার রঙটি পরিপাটী;
ছায়ায় ঘেরা পরপারের কোন মোহিনী মায়া
ছুঁইয়ে গেল মোহন মরণ-কাঠি!

সাগর পারের আগল-হারা, পাগল বাতাস এসে
সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিয়ে গেল;
জীবন ভরা শ্রান্তি 'পরে শান্তি-পরশ পেয়ে
নয়ন দুটি আপনি মুদে এল।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

সতীনাথ

(উপন্যাস*)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিনামেঘে বজ্রাঘাত।

পরদিন বর-কন্যার বিদায়-আয়োজন আরম্ভ হইল। রাজলক্ষ্মী হাতে কায করিতেছিলেন এবং অনবরত অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছিলেন। আজ অনেক দিনের পুরাতন স্মৃতি তাঁহার মনের ভিতর উথলিয়া উঠিতেছিল। আর এক দিন এমনই দিন তাঁহার জীবনে আসিয়াছিল। তখন তাঁহারও জীবনের সূর্য্য তরুণ-মূর্ত্তিতে সবেমাত্র পূর্ব্বাকাশে উদয়োন্মুখ। দীপ্ত মধ্যাহ্নের জ্বালাময়ী তীব্রতা তখনও তাঁহার অজ্ঞাত। তাহার পর কত প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা মাথার উপর দিয়া বহিয়া তাঁহার একত্রিংশ-বর্ষীয় জীবনটাকে জর্জ্জরিত করিয়া তাঁহাকে অকাল-বৃদ্ধত্বে উপনীত করিয়া দিয়াছে। আজ আসন্ন কন্যা-বিদায়-বিয়োগ-ব্যথাও সে সব স্মৃতিকে ডুবাইতে পারিতে-ছিল না।

উমার চুল বাঁধিয়া মুখ মুছাইয়া ললাটে শুভ-চন্দনের চিত্রলেখা আঁকিয়া দিবার অধিকার অন্নপূর্ণার আজ না থাকায় সে প্রতিবাসী-কন্যা মঞ্জুভুষণের কোন শ্যালিকার দ্বারা সে সকল করণীয় সম্পন্ন করাইয়া লইল। চুল-বাঁধা কিন্তু অন্নপূর্ণার মনঃপূত হইল না। সে ভাবিতে লাগিল—"হইলই বা এলো খোঁপা, দুই খি করিয়া চুলের গুছি পাকাইয়া সর্পাকৃতিতে জড়াইয়া দিলে কেমন চমৎকার মানাইত! সামনে-টাও যেন কেমন কেমন হইয়াছে; বাঁ দিকের ঝাপ্‌টাটা বেশ পরিপাটী আঁচড়ান হয় নাই।"—এতদিনের পরিশ্রমের শিক্ষা অন্নপূর্ণার আজ বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হইল। আসল কাযের সময়ই যদি তাহার বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা নাই, তবে এ বিফলা বিদ্যার আরাধনায় পণ্ডশ্রম কেন করিয়াছিল! অকল্যাণের ভয়ে সে অদম্য ইচ্ছাটাকে চাপিয়া ফেলিয়া, উমার ললাটে একটা সিন্দুরের টিপ্‌ও পরাইয়া দিল না। তাহাকেও যে একদিন এমনই সন্তর্পণে দুর্ভাগিনী স্বামীহীনাদের বাতাস বাঁচাইয়াও শেষে রক্ষা করিতে পারা যায় নাই, কেবল সেই কথাটা একবারও তাহার মনে পড়িল না।

চুল বাঁধা সাজসজ্জার অবসানে ছাড়ান পাইয়া উমা দুই হাতে দিদিকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকে মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"দিদি, আমি যাব না ভাই, তোমাদের ছেড়ে কোথাও আমি থাক্‌তে পারব না।"

অন্নপূর্ণার এতক্ষণের শাসনতাড়িত চোখের জল আর বারণ মানিল না। উচ্ছ্বসিত বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার স্রোতের মত সবেগে বাহির হইয়া বক্ষলগ্ন উমার শাড়ী ভিজাইয়া তুলিল। তবুও সে মুখে হাসিতে-ছিল। সে রৌদ্র ও বৃষ্টির অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখি-বার উপযুক্ত দর্শক সেখানে কেহই ছিল না। অন্নপূর্ণা হাসিয়া উমাকে সান্ত্বনা দিবার ছলে কহিল—"দেখ্‌ব রে দেখ্‌ব, এর পর আবার তুই-ই বল্‌বি, 'দিদি, এনোনা ভাই, ছেড়ে যে থাক্‌তে পারিনে'।" উমা তাহার হাত ঠেলিয়া রোদনরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—"কক্ষোন না, দেখে নিও! আর কখনও যাব কি না!"

অন্নপূর্ণা হাসি ছাড়িয়া গম্ভীর হইয়া কহিল—"ছিঃ, ও কথা বল্‌তে নেই। জন্ম জন্ম সেই ঘরই কর্—কর্‌তে যেন পাস্। সে ঘরে থাকবার সুখ যখন বুঝ্‌বি তখন কিন্তু দিদিকে ভুলে যাস্‌নি উমা।"

"দিদি—শুভ-সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্চে, আর দেরী কোরোনা"—বলিয়া সেই স্নেহের গঙ্গা-যমুনা মিলন-ক্ষেত্রে বিদ্যানাথ আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চিরপ্রসন্ন শান্ত সহিষ্ণু মুখখানাও আজ আর অন্তর্নিহিত বেদনাটি লুকাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না। হাসির জ্যোৎস্না-

লোকের মধ্যে মেঘের কালো ছায়া তাই অতি স্পষ্ট-রূপেই প্রকাশ পাইতেছিল।

অন্নপূর্ণা কর্তৃক আদিষ্ট উমা পিতামহের পায়ের তলায় মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলে, তিনি তাহাকে বুকে টানিয়া মুদিত নেত্রে ভাষাতীত আশীর্ব্বাদে সিঞ্চিত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। মনে মনে কহিলেন, "যে গৃহ আজ লক্ষ্মীরূপে তোমায় বরণ করে নিয়ে যাচ্ছে, সেইখানেই তুমি অচলা হয়ে প্রতিষ্ঠিতা থেক। সংসার শুধু শান্তি-ভোগের স্থান নয়, এখানে ঝড় ঝাপ্‌টা অবশ্যম্ভাবী; তোমার কেন্দ্র যেন স্থির থাকে, এইটুকুই আমার আশীর্ব্বাদ।"

তাঁহার মনে পড়িল আর এক দিনের কথা, সেও এমনই অম্লান উজ্জ্বল প্রভাত। প্রথম জীবনের আঘাত-বেদনাহীন দিবসে কি সুগভীর বিশ্বস্ত হৃদয়েই তিনি আর একখানি এমনই কল্যাণপূর্ণ হস্তের সহিত আর একটি অপরিচিত তরুণ হস্ত রাখিয়া জীবন গ্রন্থি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণা তখনও শিশু, পিতৃগৃহ ও আত্মীয়জনের বিচ্ছেদ-ব্যথা অনুভব করিবার শক্তিও তাহার ভাল করিয়া জন্মে নাই। সুধু ঘোমটা দিয়া পাল্কী চড়িয়া বধূ হইবার প্রলোভনটাই তাহার কাছে সব চেয়ে প্রবল মনে হইয়াছিল। কেমন হাসিমুখে মায়ের আদেশে দাদামণির পায়ের ধূলা লইয়া সে পাল্কী চড়িয়া বসিয়াছিল। এই সেদিনের কথা! তার পর কত অল্প সময়ের ভিতর কত বড় অঘটনই না ঘটিয়া গেল! মুকুল না ফুটিতে গাছেই শুকাইল। সেই সঙ্গে অতীতের অনেক কথাই বৃদ্ধের মনে জাগিতেছিল। যাহার কন্যা, সে আজ কোথায়? সেই জ্ঞানে দীপ্ত বুদ্ধিতে মার্জ্জিত স্নেহে করুণ ভক্তিতে নত তাঁহার চণ্ডীচরণ—সে আজ কোথায়?

উমাকে লইয়া বিশ্বনাথ যখন বিব্রত, তখন পাশের ঘরে সরিয়া আসিয়া জানালার পাশে দাঁড়াইয়া অন্নপূর্ণা আত্মসম্বরণের চেষ্টা করিতেছিল। তাহার ব্যর্থ জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা একমাত্র সুখই যে উমা! সেই উমাও আজ তাহার কোল ছাড়া হইয়া গেল, চিরদিনের মতই তাহার 'পরে দাবী ফুরাইল, চোখের দেখা—তাহাও আর কখনও দেখিতে পায় কি না সন্দেহ স্থল। পায় যদি, সে আশার অতীত। পাত্র আশীর্ব্বাদ করিতে গিয়া দাদামহাশয় যতটুকু দেখিয়া ও বুঝিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে উমার পিত্রালয়ে প্রত্যাগমনের আশা বড়ই অল্প।

বিবাহের পর উমা অন্ততঃ একটিবার মাত্র ফিরিয়া আসুক; তাহার হাসিমুখ খানা দেখিয়া, সে যে সুখী হইয়াছে, এইটুকু জানিতে পারিলেই অন্নপূর্ণার তৃপ্তি। তার পর, তাহার চিরদিনের আপন ঘরে সে অচলা হইয়া চিরপ্রতিষ্ঠিতাই থাক্, সেই ঘরই তাহাকে লক্ষ্মীর আসনে বরণ করিয়া লউক।—এইরূপ নানাকথা অন্নপূর্ণার মনে উদয় হইতেছিল। তবু অন্তরের রোদন সে ঠেলিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। তাহার মেঘাচ্ছন্ন জীবনটা আজ যেন একান্তভাবে উমাকেই অবলম্বন করিতে চাহিতেছিল। মনকে সে চোক্ রাঙ্গাইয়া বলিতেছিল, এ দিন যে আসিবে এবং আসাই যে প্রার্থিত, তাহা ত জানাই ছিল, তবে এত ব্যাকুলতা কিসের?

সহসা অন্নপূর্ণার চিন্তা ও দৃষ্টি ভিন্ন পথে ফিরিল। জানালার নীচেই ফুলবাগান। তথায় বরবেশী সতীনাথ ও তাহার বন্ধু অমর দাঁড়াইয়া ফুলের সৌরভকে ডুবাইয়া চুরুটের গন্ধে ও ধূমে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশি মুখ হইতে ছাড়িয়া দিয়া বরের বন্ধু কহিল, "কেমন কনে হল বল? এখন মনের গতি বোধ করি ফিরেছে?"

সতীনাথ দগ্ধাবশিষ্ট চুরুটের ছাই বাম হস্তের অঙ্গুলির আঘাতে ঝাড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে উত্তরে কহিল—"নয় কেন?"

"তা তোমার মনের কাছে জিজ্ঞাসা কর। মেয়ে যে সুন্দরী তা বোধ হয় অস্বীকার কর্‌তে পার না।"—অমর প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে বন্ধুর পানে তাকাইল।

সতীনাথ একটু খানি শ্লেষের হাসি হাসিয়া কহিল—"ভট্‌চাযি্য বামুনের ঘরে যেমন হয়ে থাকে, তাই। রামী শ্যামীর চেয়ে খুব বেশী তফাৎও নয়।"

ইহা শুনিয়া অমর কহিল—"ওঃ, ঠাট্টা হচ্চে? তাই বল ভায়া, ডুবে জল খেতে চাও! ভয় কি ভাই, তোমার জিনিস তোমারই থাকবে, ওখানে ত আর বন্ধুত্বের দাবী চলবে না! আমরা মিষ্টি মুখ করেই তুষ্ট হব।"

সতীনাথ উদাসীন ভাবে দ্বিতীয় চুরুটে অগ্নি সংযোগ করিয়া জ্বলন্ত দেশালাইয়ের কাঠিটা পায়ে মাড়াইয়া জোর দিয়া কহিল—"সুবিধা ঐখানেই। তোমরা মিষ্টি মুখ করেই খালাস, আর বোঝাটা পড়্ল আমার ঘাড়ে। তা অবশ্য এ ঘাড় সে বোঝা বইতে বাধ্য নয়, সে বুঝ্বেন জ্যেঠা মশাই।"

অমর হাসিল; বলিল—"আচ্ছা হে আচ্ছা, দেখা যাবে যদি বেঁচে থাকি। এর পর পদপল্লব ছাড়িয়ে বন্ধু-বান্ধবদের দর্শন পাওয়াই ভার হবে। তখন কোথায় থাক্বেন জেঠা মশাই!"

অব্যবহৃত অগ্নিসংস্কৃত চুরুট্টা সতীনাথ সজোরে একটা জবাগাছের উপর ছুড়িয়া ফেলিল। নাড়া পাইয়া কয়েকটা বাসিফুল ও একটা সদ্য ফোটা পঞ্চ-মুখী জবা মাটীতে ঝরিয়া পড়িল। সতীনাথ সজোরে মাটীতে পা ঠুকিয়া গম্ভীর অথচ চাপা স্বরে কহিল—"তুমি ত জান, জ্যেঠা মশায়ের কুলমর্য্যাদার প্রয়োজন ছিল, সংসারের একজন কর্ত্রীর প্রয়োজন ছিল, তাই বিবাহ কর্লাম। আর—আর—না সে সব কথা জন্মের মতই ফুরিয়ে গেছে। এটা ঠিক যে—স্ত্রীর প্রয়োজনে ওকে আমি বিয়ে করিনি।"

সতীনাথের কুঞ্চিত-ভ্রূ, ক্রুদ্ধ মুখ দেখিয়া অন্নপূর্ণা শিহরিয়া সরিয়া আসিল। এই বিবাহের বর! গতরাত্রে ইহারই হাতে হাত রাখিয়া দেব-গুরু-অগ্নি-সাক্ষ্যে উমার চিরজীবনের বন্ধন ঘটিয়া গিয়াছে! জীবনব্যাপী অনুতাপেও যে সে বন্ধন মোচন করিবার কাহারও আর সাধ্য নাই। কুমারীর পবিত্র বিশ্বস্ত হৃদয়ের দান অম্লান ফুলের মালা এখনও যে তাহার কণ্ঠলগ্ন!

অন্নপূর্ণার পায়ের নীচে পৃথিবী যেন ভূমিকম্পে কাঁপিতে লাগিল। চোখে অন্ধকার দেখিয়া সে ভূমিতে প্রায় লুটাইয়া পড়িল। দুই হাতে বুক চাপিয়া আর্ত্ত-স্বরে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—"উমা, দিদি আমার, কি কল্লাম! আমরা তোমার এ কি কল্লাম!"

সহসা তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইল—"দিদি, ভগবানের বিধান মাথা পেতেই নিতে হবে, তাঁর কাযের উপর কারও হাত দেবার উপায় ত নেই।"

একি দৈবাদেশ? চমকিয়া অন্নপূর্ণা মুখ তুলিয়া চাহিল। বলিল—"কে, অনাথ? শুনেছ সব-ই?"

অনাথ নতমস্তকে বলিল—"শুনেছি দিদি। তাই বলে ঝড়ের আগে ভেঙ্গে পড়্বেন কেন? উমাও ত সে শিক্ষা পায়নি! সে তার নিজের স্থান করে নিতে পার্বে। না পারে, তাতেই বা এমন দুঃখ কি? এখানে আমরা চিরদিনের বাসস্থান ত স্থির করে আসিনি। পরীক্ষা দেবার জন্যে যেমন ছেলেরা বিদ্যামন্দিরে আসে, এও যে আমাদের পরীক্ষাগার দিদি! আমি জানি, উমা আমাদের নীচে পড়ে থাক্বে না। বর কনে বিদায় হবে, তাদের আশীর্ব্বাদ কর্বেন চলুন।"

বাহিরে কর্ম্মকর্ত্তা-রূপে বরের ভাই মুরারি যুবকদের গ্রামভাটী বারোয়ারী কাঙ্গালীভোজন ইত্যাদিতে আশাতিরিক্ত রূপে খুসী করিয়া দেওয়ায় তাহার খাতি-রের অন্ত ছিল না। বরকে ছাড়িয়া সকলে তাহার সহিত আলাপ করিতেই ব্যস্ত।

তেজস্বী কৃষ্ণবর্ণ অশ্বযুগল সহ বৃহৎ ফেটন গাড়ী বরকন্যার জন্য এবং কয়েকখানা ঠিকাগাড়ী বরযাত্রি-গণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। মোটা মোটা সোণার তাগা হাতে, পাগড়ী বাঁধা দরোয়ানের দল এবং বরের সহযাত্রী লোকজনেরা বরের বহির্গমন প্রতীক্ষায় রাস্তায় দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছে।

উমার লাল চেলীর আঁচলের সহিত গাত্রাবরণের গ্রন্থি বাঁধিয়া বর বাহির হইয়া আসিল। বিশ্বনাথ-দত্ত চেলী ছাড়িয়া নিজ শাদা ধুতিই সে পরিয়া লইয়াছে। গলার ফুলের মালা এবং টোপরটা পরামাণিকের হাতে।

বরকন্যা আসিয়া ফেটনে আরোহণ করিল। সহরের ভিতর দিয়া গাড়ী ছুটিল।

সতীনাথ অন্যমনে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া ছিল। অদূরে একটা দ্বিতল বাড়ীর বাতায়নে দৃষ্টি পতিত হইবামাত্র, একটি যুবতী-মুখ দেখিয়া তাহার চক্ষু নিশ্চল হইয়া গেল।

সেই মুহূর্ত্তেই বিপুল বিস্ময়ের মধ্যেও একটা বিজাতীয় ঘৃণা ও জয়ের আনন্দ সতীনাথের আয়ত চক্ষুতে জ্বলিয়া উঠিল। ভাবিল—তাহার সাধনা তবে সার্থক হইয়াছে! সে দেখিয়াছে, দাঁড়াইয়া নিজের চক্ষে সে দেখিয়াছে! কে বলে ভগবান নাই, বিচার নাই? মনে মনে বলিল—"আছ প্রভু, তুমি সর্ব্বব্যাপী, তুমি ন্যায় বিচারক।"

গাড়ী ক্রমে হুগলী ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইল। সতীনাথের তখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। রণজয়ী বীরের মত সে যুদ্ধজয়ের প্রাপ্ত পুরস্কার নববধূর পানে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু তখনই সহসা তাহার বিজয়ানন্দ দারুণ অবসাদে পরিণত হইল। তাহার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিল। এতক্ষণ যাহা ভগবানের দেওয়া পুরস্কার বলিয়া সে মনে করিতেছিল, এখন তাহাই যেন নিজ মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা বলিয়া অনুভব করিল।

হায় মানবের মন, তুমি কি চাও তাহা তুমি নিজেই জান না! সতীনাথ সেই মুহূর্ত্তেই হৃদয়ঙ্গম করিল যে, না বুঝিয়া, ক্রোধে প্রতিহিংসার প্রবৃত্তিতে জ্ঞানহারা হইয়া সে তাহার জীবনের গতি যে পথে আনিয়া ফেলিয়াছে, সেখান হইতে ফিরিবার পথ আর নাই। তাহার ভবিষ্যৎ-জীবন দিক্‌শূন্য অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হাতের পাশা একবার ফেলিয়া দিলে আর ফিরাইবার উপায় থাকে না। তখন অন্ধের কিং জিতং কিং জিতং প্রশ্নের উত্তরে রাজ্য ধন পত্নী পর্য্যন্ত পণের মূল্যে বিকাইয়া রিক্ত হস্তে দাঁড়ান ছাড়া আর কোন পথই নাই।

একটা অসহ্য যন্ত্রণার সহিত সতীনাথের কেবলই মনে হইতে লাগিল, এ অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার যদি কোন উপায় থাকিত, এই বিবাহ-বন্ধনটা কোন উপায়ে কেহ যদি ছিন্ন করাইয়া দিতে পারিত, তবে তাহাকে সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া এখনই ফকিরী লইয়া সে চলিয়া যাইতে প্রস্তুত ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিজয়ার পরে।

হিন্দুগৃহে কন্যা-বিবাহ-রাত্রি কালীপূজার রাত্রির সহিত উপমিত হইয়া থাকে; যেদিন পূজা সেইদিনই বিসর্জ্জন। একরাত্রেই উৎসব শেষ হইয়া যায়। কন্যা-বিবাহেও তাই, বিবাহের পরদিন প্রভাত না হইতেই বিদায়ের পালা।

আপনার জিনিষটি সম্পূর্ণরূপে কোন অপরিচিত অজ্ঞাত-হৃদয় ব্যক্তির হস্তে চিরদিনের জন্য নিঃস্বত্ব হইয়া দান করিয়া পর হইয়া দাঁড়াইতে হয় বলিয়াই, বোধ হয় কন্যা সন্তানের প্রতি স্নেহটি এরূপ সশঙ্ক ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। মেয়ে জন্মিবার পর মুহূর্ত্ত হইতেই সর্ব্বদা মনে হয়—সে পরের জিনিষ, কেবল দুইদিনের জন্য গচ্ছিত দ্রব্যের মত কাছে রহিয়াছে। তাই ভয়ে ভয়ে কখন হারাই কখন হারাই মনে করিয়া তাহাকে একটু যেন বেশী কাছে কাছে রাখিতে ইচ্ছা করে!

যে ক্ষুদ্রা নগণ্যা বালিকা এতদিন পুঁতুল সাজাইয়া অথবা হাঁড়ী কুঁড়ি ধূলা মাটীতে কৃত্রিম গৃহস্থালী পাতিয়া কোথায় কোন্ গৃহকোণে দিন যাপন করিত, কার্য্য ব্যস্ততায় তাহার সংবাদ লইতেও সময় পাওয়া যাইত না, একদিন সেই যখন রঙ্গীন চেলী পরিয়া মাথায় অবগুণ্ঠন টানিয়া একজন অপরিচিতের হস্তে হস্ত রাখিয়া বিদায় চাহিয়া বসে—তখনই সারা অন্তঃকরণ ব্যাকুল ব্যথায় বিদীর্ণ হইয়া বলিয়া উঠে, 'এখনি, এত শীঘ্র চলিলি রে? দুই দিন যে চোখ ভরিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া লওয়াও হইল না।'—তখন সংসারের সকল কাযে সকল ঝঞ্ঝাটের মাঝে সেই হেমন্তের শিশির মণ্ডিত করুণ ক্ষুদ্র মুখখানিই দিবা নিশি মনের মধ্যে জাগিতে থাকে। তাহারই কথাগুলি, হাসিটুকু, কবে কোন্ বায়না করিয়া কি চাহিয়া পায় নাই—এই সব তুচ্ছ বিষয়ই মনের যেন একমাত্র খোরাক হইয়া পড়ে।

দেবী-প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া উৎসব গৃহ যেমন নিরানন্দে ভরিয়া যায়, কন্যা-বিবাহের পরদিনও বিবাহ বাড়ী তেমনি আনন্দহীন হইয়া পড়ে। বিদায়প্রাপ্ত রৌসনচৌকীর বিলাপরাগিণী সেই মর্ম্মবাণীরই অনুকরণে যেন বাজিতে থাকে। বিরহ-ব্যাকুল অন্তরের অন্তর হইতে সেই বিষাদেরই করুণ সুর পাষাণ টুটিয়া ব্যাকুল বেগে বাহির হইতে চায়। শুধু হিন্দুগৃহ নয়, সকল গৃহে সকল জাতির মধ্যে এই ভাবই অল্প বিস্তররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এখানে ধনী দরিদ্রে ভেদ নাই। শকুন্তলাকে স্বামী-সকাশে পাঠাইতে গিয়া মহর্ষি কণ্ব বলিতেছেন—

"যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ।"

—সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরও যদি স্নেহপাত্রের জন্য এমন হৃদয়-বৈক্লব্য জন্মে,তবে গৃহীদের যে কন্যা বিচ্ছেদ-বেদনা অসহনীয় হইবে ইহা আর বিচিত্র কি ?

বিশ্বনাথের গৃহও আজ দেবী-প্রতিমা-বর্জ্জিত পূজার দালানের মতই একান্ত শ্রীহীন নিরানন্দ হইয়া গিয়াছিল। বিবাহ উপলক্ষে যে সব কুটুম্ব কুটুম্বিনীরা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের এবং তাঁহাদের ছেলে মেয়েদের কল-কোলাহলে হাসি ক্রন্দন কলহে বাড়ীখানা দুইদিন একটু জাঁকাইয়া রাখিয়াছিল। ফুলশয্যা পাঠান দেখিয়া যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গিয়াছেন। সকলেরই সংসার আছে, কুটুম্ব বাড়ী বসিয়া থাকিলে ছেলেরা স্কুলের ভাত পাইবে না, গৃহকর্ত্তারও উপর-ওয়ালার নিকট জবাব দেওয়া দায় হইবে। তাই রাজলক্ষ্মীও বৃথা অনুরোধে বাধ্য করিয়া কাহাকেও বেশী দিন রাখিতে পারিলেন না। এখন উত্তেজনার পর গভীর অবসাদের সময় খালি বাড়ীটা নিতান্তই যেন দুঃসহ মনে হইতেছিল।

সেই একটি মাত্র বালিকার হাসি-খেলার অভাবে সারা বাড়ীখানা যেন গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চাহিতেছিল। কাযকর্ম্মেও মন বসিতে চাহে না, কায করিতে গেলে কখন্ যে সম্পন্ন হইয়া যায় বোঝা যায় না। তখন কাযের জ্বালায় অন্নপূর্ণার দুই দণ্ড উমার কাছে বসিয়া গল্প করিবার সময় মিলিত না। এখন সেই কাযই অল্প মনে শেষ হইয়া যায়। যখন বুঝিতে পারে তখনই মনে হয় তবে আর দিন কাটিবে কি করিয়া? ব্রহ্মার যুগের মত এ যেন অফুরন্ত সময়, ইহার শেষ নাই। শুধু দিনই নয়, রাত্রিও যে তেমনই দীর্ঘ। আজ আর গল্প শুনিবার জন্য কেহ বিছানার ভিতর ব্যাকুল আগ্রহে জাগিয়া নাই। "এতক্ষণে হল? কায আর তোমার ফুরোয় না দিদি!"—বলিয়া মৃদু অনুযোগের সহিত দুইখানি কোমল বাহুলতা তেমন করিয়া আর জড়াইয়া ধরিবে না। মাথার বালিসটিতে এখনও তাহার চুলের মাথাঘসার গন্ধ, বিছানাতে তাহারই সুরভিস্পর্শটুকু লাগিয়া আছে, সে-ই কেবল নাই। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বুকের বাধা ঠেলিয়াও বাহির হইয়া আসে, শূন্য মনটা শূন্য ঘরখানায় হায় হায় করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

ফুলশয্যার দিন তত্ত্ব লইয়া যাহারা কলিকাতায় কুটুম্বগৃহে গিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া যে রিপোর্ট দাখিল করিল তাহাতে রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা, বিশ্বনাথ—কেহই খুসী হইতে পারেন নাই। উমার ভবিষ্যৎ-জীবন ঠিক সুখের হইল কি না এই সংশয়ই সকলের মনে জাগিতেছিল। কুলীনশ্রেষ্ঠ রুদ্রকান্ত "পরের" অর্থ গ্রহণ করেন না, তাই অকল্যাণ-ভীতা সতীনাথের পিসীমার কান্নাকাটিতে কেবল ফুল চন্দন ও কনের ঢাকাই শাড়ীখানি মাত্র লইয়াছিলেন। বাকী জিনিষ যেমন গিয়াছিল, তেমনি ফেরৎ আসিয়াছে। সেই সঙ্গে পুনরায় তত্ত্ব না পাঠানর জন্যও আদেশ আসিয়াছে। বাড়ীর দাসী মাতঙ্গিনী অনেক চেষ্টায় উমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইয়াছিল। আর কাহারও সে সুযোগটুকুও ঘটে নাই। বাপের বাড়ীর দাসী চাকরদের দেখিলে আদুরে মেয়ে কান্নাহাটী করিবে, অকারণ মন উতলা করাইবার প্রয়োজন নাই—কর্ত্তার নিকট

হইতে এমনই হুকুম আসায়, কেহ আর সাহস করিয়া উমার কাছে তাহাদের লইয়া যাইতে পারে নাই। মাতী কাহারও মানা মানিবার পাত্রী নয়, তাই সে কতকটা জোর করিয়াই দিদিমণিকে দেখিয়া আসিয়াছে।

অন্নপূর্ণা প্রতিদিন একটু একটু করিয়া সে দিনের সব কথাগুলি খুঁটাইয়া মাতীর কাছে জানিয়া লইয়াছে, তবু তাহার শুনিবার আশা মিটে নাই। মাতীরও সেই একই কথা বলিয়া বলিয়া শ্রান্তি ছিল না—কিন্তু তাহার বর্ণিত সংবাদে অন্নপূর্ণা বা রাজলক্ষ্মী প্রীত হইতে পারিলেন না। উমার অঙ্গে পিত্রালয়ের দুই চারিখানা গহনা ছাড়া সেখানকার কোন অলঙ্কার স্থান পায় নাই। মাতী তাহা ভাল করিয়াই দেখিয়া লইয়াছে। পরণেও একখানা সামান্য শাড়ী, চেলী বেনারসী এমন কি একখানা রং করাও নয়। সারা বাড়ী ঘুরিয়াও সে একটা লোককে পাত পাড়িয়া ভাত খাইতে দেখে নাই। অথচ সেইদিনই নাকি বৌ-ভাত হইয়াছে। নিমন্ত্রিতা স্ত্রীলোকের নাম গন্ধও ত পাইল না! পুরুষ কেহ ছিল কি না তাহার সংবাদও সে জানে না। কেবল পাগড়ী বাঁধা দরোয়ান ও তেরী-কাটা চাকরের দল সারা বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। দাসীরাও কার্য্যাভাবে কেবল গণ্ডগোল করিয়া সময়টা কাটাইতে ব্যস্ত। মাতীকে দেখিয়া ভয়েই হউক বা যে কারণেই হউক উমা কাঁদে নাই, বরং একটু হাসিয়াই ছিল।

জামাই বাবুর কথা তুলিতেই মাতঙ্গিনীর মুখে বাগ্‌দেবীর অধিষ্ঠান হইত—"তা অন্য সব যাই হোক্, মায়ের আমার জামাই যা হয়েচে, অমন কারোদেরও হয় না। আহা ছেলে ত নয় যেন ময়ূর ছাড়া কাত্তিক। কিবে রং, কিবে গড়ন, যেন পটের ঠাকুরটি। খালি গায়ে বসে আছে, ঘর যেন আলো করে রয়েচে। ছোট দিদিমণি সাক্ষেৎ শিবপুজো করেছিল বাবু, নৈলে কি আর অমন শিবতুল্যি সোয়ামী হয়। আর, বাড়ী ঘর নয় ত—যেন ইন্দুর ভুবন। কিবে শোবা কিবে আলো কিবে জাঁকজমক! আবার আয়না সব কি! দাঁড়ালে মনিষ্যির পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত দেখা যায়। দেখে নজ্জায় মরি। 'এ পোড়ার মুখ আর আয়নায় কেন,' বলে তাড়াতাড়ি বেরুতে পথ পাইনে। ভাগ্যি ঘরে কেউ নোক ছ্যালোনা, থাক্‌লে বল্‌তো বুড়ো মাগীর সখ্ দেখ, আয়নায় মুখ দেখ্‌চে! তা, দিদিমণি আমাদের খুব সুখে থাক্‌বে। সে এক রাজার রাজ্যি। এর পর দেখে নিও, তখন বলবে যে হ্যাঁ মাতী বলেছ্যাল।"

রাজলক্ষ্মী কতক বিশ্বাসে কতক সন্দেহে মনে মনে কহিলেন—"তাই হোক্! মা আমার সেখানে সুখেই থাকুন। আমি ত তাকে কাছে রাখতে চাইনি। মেয়ে কাছে রাখার যে কত জ্বালা, তা যে হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌ছি। সিঁদুর নোয়া নিয়ে মা আমার সেই ঘরই করুন।"

অন্নপূর্ণা অশ্রু সম্বরণের জন্য উঠিয়া গিয়া আলনার কাপড়গুলা পাড়িয়া পুনরায় গুছাইতে বসিল। কুটুম্বগৃহ প্রত্যাখ্যাত ক্ষীরের ছাঁচ চন্দ্রপুলি আম সন্দেশ প্রভৃতি রাজলক্ষ্মী পাড়ার ছেলেমেয়েদের ডাকিয়া বিতরণ করিয়া দিলেন।

কয়েকদিন পরে বিদ্যানাথ নিজে কলিকাতায় গিয়া 'যোড়ে' বরকনের আসিবার প্রস্তাব করিলেন। শুনিয়া রুদ্রকান্ত রুদ্রমূর্ত্তি ধরিলেন। "কুলীনের ঘরে ও সব যোড়-ফোড় হয় না। মেয়ে নিয়ে যেতে হয় একেবারেই যান্। আমাদের বাড়ীর বৌয়ের বাপের বাড়ী যাবার নিয়ম নেই। ও সব পণ্ডিতী মত টত এখানে চল্‌বে না। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন ব্যস্। আবার নিত্যি বাহানা, আজ যোড়ে যাবে, কাল বিযোড়ে যাবে—সে সব হবে না।"

উমার সহিতও সাক্ষাৎ হইল না, তাহাতে তাহাকে নাকি অবাধ্যতা শিক্ষার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। "মেয়ে ত একেই কত কেতাদুরস্ত! তার উপরে নিত্যি নিত্যি বাপের বাড়ীর লোকের সঙ্গে দেখা হলে আর ঘরে মন টিকবে?"

বিদ্যানাথ নীরবে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। বুঝিলেন, ধনী দরিদ্রের কুটুম্বিতার ফল এমনই হইয়া থাকে,

এজন্য প্রস্তুত হইয়া আসাই উচিত ছিল। কিন্তু উচিত-বোধ যতই থাক, সকল সময় সকল উচিতকে মানিয়া লওয়া যায় না। বিদ্যানাথের উচিত-জ্ঞানের অন্তরাল-বাসী মনের ভিতরটা যে কি বলিতেছিল, তাঁহার অন্তর্যামীই বলিতে পারেন। বাহিরে তাঁহার প্রসন্ন মুখে খুব বেশী ছায়া দেখা গেল না। তবু এক সময় অন্নপূর্ণার সতর্ক চক্ষু এবং নীরব প্রশ্নের কাছে মনের লুকান ইচ্ছাটাকে লুকাইতে না পারিয়া একদিন তিনি বলিয়া ফেলিলেন, 'তার সঙ্গে আর দেখা হবে না রে! তাকে বড়লোকের বউ করে দিয়েছি। সে আর এখানকার কেউ নয়।'

* * * *

সারাদিন বর্ষণের পর সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি থামিয়াছে। পথে জল জমিয়া আছে। স্কুলের ছেলেরা ছাতি মাথায় দিয়া জুতা হাতে হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় তুলিয়া সঘন পদ-চালনায় কাপড় জামা মুখ মাথা কর্দ্দমাক্ত জলে ভিজাইয়া মহানন্দে বাড়ী ফিরিতেছিল। তাহাদের উৎসাহ বা আনন্দে বাধা দিবার শক্তি প্রকৃতির নাই। যোগী ঋষিদের মতই তাহাদের প্রসন্ন চিত্ত সমভাবে বর্ষার ধারা ও রৌদ্রের তেজ গ্রহণ করিতে সমর্থ। কোন বাড়ীর ছেলে কাগজের নৌকা পথের জলে ভাসাইয়া দিয়া উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাহার গতি নিরীক্ষণ করিতেছে। মেয়েরা কাপড় কাচিয়া ঠাকুরঘরের প্রদীপ সাজাইতেছিল; কেহ বা রাত্রের রন্ধনের আয়োজনে ব্যস্ত। এমন সময় বিদ্যানাথ গৃহে ফিরিয়া স্কুলের কাপড় ছাড়িয়া মুখ হাত ধুইয়া, কি একটা প্রয়োজনে দালানে উঠিতে গিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

ভিতর বাড়ীর সাম্‌নের দালানে একখানা বিস্তৃত কুশাসনের পার্শ্বে মাটীতে বসিয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা এক বিধবা নারী, অদূরোপবিষ্টা অন্নপূর্ণার সহিত গল্প করিতে-ছিলেন।

বিদ্যানাথের খড়মের শব্দে সচকিত হইয়া দুইজনেই ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিধবা অগ্রসর হইয়া বিদ্যানাথের পায়ের কাছে নতজানু হইয়া মাটীতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া মাথা দিয়া একবার চরণ ধূলা স্পর্শ করিলেন। বিদ্যানাথ মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার পানে চাহিয়া চোখ ফিরাইয়া লইলেন। প্রসন্ন মুখে কহিলেন—"কখন এলে মা? বাঁশবেড়ে থেকেই আস্‌ছ ত? সঙ্গে কে আছে?"

রমণী প্রবল চেষ্টায় মানসিক উচ্ছ্বাসটুকু গোপন করিবার জন্য কিছুক্ষণ নতমুখে চুপ করিয়া থাকিয়া, তাহার পর মুখ না তুলিয়াই কহিলেন—"সেখানে আমার ঠাঁই হোলনা বাবা! আমি কল্‌কাতা থেকেই এসেচি। নৈহাটীতে মাসীর বাড়ী ক'দিন ছিলাম, সঙ্গে আমার মেয়ে কল্যাণী।"

বিদ্যানাথ একটু খানি বিস্মিত হইলেও স্নেহের স্বরে কহিলেন—"এখন তা হলে দিন কতক এখানেই থেকে যাও মা। কল্যাণীকে পেলে অন্নপূর্ণাও খুসী হবে। কলকাতার বাসার তাহলে কি বন্দোবস্ত করে এলে?"

রমণী মুখ তুলিয়া নিম্ন স্বরে কহিলেন—"সেখানকার বাস উঠিয়েই এসেচি। সংসারের ঘা খেয়ে খেয়ে মন আমার ভেঙ্গে গেছে—তাই আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় নিতে এলাম বাবা।"—রমণীর চোক দিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

বিদ্যানাথ মনে করিলেন, কল্যাণীরও হয়ত অকাল-বৈধব্য ঘটিয়া গিয়াছে। একটা ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন—"তারা—তারা!"

পাশের ঘরের দরজা খুলিয়া এক ক্ষীণাঙ্গী কিশোরী বাহিরে আসিয়া তাঁহার পায়ের উপর দুইটি ফুটন্ত স্থল-পদ্ম রাখিয়া মাটীতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। হাসি মুখে সে উঠিয়া দাঁড়াইতেই, বিদ্যানাথের প্রশান্ত দৃষ্টি প্রশংসায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ভাবিলেন, এযে শুক্লবর্ণা স্মিতাননা বীণাবাদিনীর শরীরী মূর্ত্তি! কিন্তু সে প্রশংসার দৃষ্টি শীঘ্রই রূপান্তরিত হইয়া তাঁহার মুখের আলোক যেন সঙ্গে সঙ্গে মেঘে ঢাকা পড়িল। ভাবি-লেন, তাঁহার অনুমান ত তবে ভ্রান্ত নয়। মেয়েটীর বাম হস্তে লোহা বা সীঁথায় সিঁদুর, এয়োতীর কোন চিহ্নই

বিদ্যমান নাই। বক্ষ কাঁপাইয়া একটা ব্যথিত নিঃশ্বাস নির্গত হইল।

বিধবা সম্ভবতঃ তাঁহার মনোভাব পাঠ করিতে পারিলেন, তাই একটু ব্যথিত একটুখানি লজ্জিতভাবে মৃদুস্বরে যেন তাঁহারই অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে কহিলেন—"ওর বিয়ে দিইনি। ওকে আপনার পায়েই ফেলে দিতে এসেছি বাবা! মন আমার শান্তিহারা, আমায় দয়া করে কেবল তাই দিন।"

মেয়েটিকে অবিবাহিতা জানিয়া বিদ্যানাথ বিস্মিত হইলেন না। ভাবিলেন, লোকবল ও অর্থবল না থাকায় হয়ত মেয়ের বিবাহের সুবিধা করিয়া উঠিতে না পারিয়াই শিষ্যা তাঁহার সাহায্য প্রার্থনায় আসিয়াছেন; মেয়ে একটু ডাগর হইয়া পড়িয়াছে, উপায় না থাকিলে কাযেই এমনি হইয়া যায়।

অন্যান্য অবান্তর কথার পর বিদ্যানাথ তাঁহাদের আহারাদি হইয়াছে কি না সংবাদ লইলেন। অন্নপূর্ণা মৃদু হাসিয়া অনুযোগের স্বরে কহিল—"কাকীমা বুঝি আজ এসেছেন দাদামশাই? উমার বিয়ের আগের দিন ওঁরা এসেছেন। ঐ যে গঙ্গার উপর দোতালা বাড়ী খানা—ঐতে রয়েচেন, তবু বিয়ের সময় খবর দিলেন না।"

বিদ্যানাথের বিস্মিত দৃষ্টিপাতে লজ্জিত মুখে অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া রমণী কহিলেন—"মাসীর ছেলে প্রকাশ বাড়ী ঠিক করে আমাদের সেই দিন সন্ধ্যের সময় একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এল। এসেই শুনলুম উমার বিয়ে। কল্যাণীর শরীর তখন এম্নি খারাপ যে বিয়ে বাড়ীতে রোগীর ঝঞ্ঝাট ঢোকাতে সাহস হলনা। তারপর—"

কন্যার সহিত দৃষ্টি বিনিময় হওয়ায় রমণী বাকী কথা আর শেষ করিলেন না। বিদ্যানাথ কিছুই বলিলেন না। কিন্তু গুরুর এত কাছে থাকিয়াও তিনি যে গুরু-দর্শন করিতে আসিতে পারেন নাই, এই অপরাধের লজ্জায় রমণীর মুখখানি সঙ্কুচিত হইয়া রহিল।

কল্যাণী সরিয়া গিয়া দালানের অপর অংশে দাঁড়াইয়া ছিল। উঠানের ফুলগাছগুলি অথবা খোঁটায় বাঁধা রোমন্থন-রত সুখশায়িত মুংলী গাইটী, কি যে তাহার তত খানি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল ভাল বুঝা গেলনা। বিদ্যানাথকে গমনোদ্যত বুঝিয়া সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, মেঘভাঙ্গা রৌদ্রালোক সূর্য্যাস্তের অপরূপ আভায় রঞ্জিত, তাহারই খানিকটা তরঙ্গিত আলো তাঁহার শান্ত মুখে আসিয়া পড়িয়া এক অবর্ণনীয় মহিমময় সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। সে মুখের পানে চাহিয়া শ্রদ্ধাপূর্ণ বিস্ময়ে তরুণীর হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে কাছে আসিয়া পুনরায় ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই, বিদ্যানাথ তাহার মাথায় হাত রাখিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন—"সাবিত্রী-সমানা ভব।"

ক্রমশঃ

শ্রীইন্দিরা দেবী।

"ভ"কারের ভ্রূকুটি

ইংরেজী ভাষায় একটা প্রবচন বাক্য আছে যাহার ভাবার্থ এই যে, মানুষের মুখ দেখিয়াই অনেক সময় তাহার স্বভাব বুঝিতে পারা যায়। আমার বোধ হয় সেইরূপ মানুষের সৃষ্ট অক্ষরগুলির আকৃতিও তাহাদের প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করে।

'ভ' অক্ষরটির দিকে চাহিলেই মনে হয়, যেন সে ভুজঙ্গের মত গ্রীবা বক্র করিয়া সর্ব্বদা ফণা উদ্যত করিয়াই রাখিয়াছে। তাহার ভ্রূকুটির ভয়ে সকলেই ভীত ও সন্ত্রস্ত।

ভীতি-প্রকাশক ভয়ানক শব্দ সমূহে 'ভ'কার ভীষণ ভাবে তাহার ভ্রূকুটি বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। সেই ভীম ভৈরবনাদ শ্রবণ করিলে কে না ভয়ে অভিভূত

হইয়া পড়ে ? কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে একটা বিধান রহিয়াছে—"বিষস্য বিষমৌষধম্"—বিষই বিষকে বিনষ্ট করে। তাই এই ভব সংসারের সকল ভয়ভীতি বিনাশ করিবার জন্য ভক্তের প্রাণের অভ্যন্তরে যখন সকল ভীতিভয় হারী ভূতভাবন ভগবান 'ভ'কারের বর্ম্মভূষণে বিভূষিত-হইয়া "মাভৈ, মাভৈ" রবে অভয় দান করেন, তখন ভয় ও ভাবনার অভাব ঘটে।

'ভ'কার ভিন্ন খুব কম শব্দেই আমরা ভ্রূকুটি দেখিতে পাই। গাম্ভীর্য্য ও ভীতিব্যঞ্জক শব্দ সকল 'ভ'কারের ভারে অভিভূত হইয়া বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছে। যথা—ভীষণ, ভয়ানক, বিভীষিকাময়, বীভৎস, ভয়ঙ্কর, ভৈরব, ভীম, ভয়াবহ—ইত্যাদি। ভীত, ভীরু, ভীলু, ভয়াল, ভয়ার্ত্ত, ভয়দ, ভয়াতুর ভয়াভিভূত, ভীমনাদ প্রভৃতি শব্দে 'ভ'কারের ভয় লাগিয়াই রহিয়াছে।

কোপন-স্বভাবা স্ত্রীর ভ্রূকুটি অভিব্যক্ত করিবার জন্য ভামিনী শব্দের প্রথমেই 'ভ'কার ফণিনীর মত ফোঁস্ ফোঁস্ করিতেছে। গৃহের ভামিনী সত্য সত্যই নামের অনুরূপা হইলে তাঁহার ভ্রূভঙ্গির ভয়ে ভৃত্য দূরের কথা,—ভর্ত্তাকে পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই যে ভয়াভিভূত হইয়া থাকিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের বোধগম্য হওয়া অসম্ভব। এমন কি,—মধুকৈটভারি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেও সত্যভামার ভ্রূকুটি ও অভিমানের ভয়ে সর্ব্বদা ভীত ও ভাবিত থাকিতে হইত। দেখা যাইতেছে যে 'ভ'কারের প্রভাবের নিকট সকলেই পরাভূত।

ভুজঙ্গের ভয়ে কে ভীত নয় ? তুমি ভল্লুক ও ভীষণ ব্যাঘ্রের ভয়ে ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে পার বটে কিন্তু সেখানে আবার ভুজঙ্গের ভয় রহিয়াছে। শুধু এক—ভূতভর্ত্তা ভবানীপতি, যিনি কালকূট ভক্ষণ করিয়া নীলকণ্ঠ নাম লাভ করিয়াছিলেন এবং যিনি ভুজঙ্গের মালা পরিধান করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া বিভূতিভূষণে ভূষিত হইতেন, সেই ভূতনাথই ভুজঙ্গ-ভয়-হারী ছিলেন। দেখা যাইতেছে যে তিনিও 'ভ'কারের ভীম বর্ম্মে আচ্ছাদিত রহিয়াছেন বলিয়াই—তাঁহার কাছে ভয় পরাভূত হইয়াছে।

ভুজঙ্গ-ভুকেরও আদি এবং অন্তভাগ 'ভ'কারের ভুজবেষ্টনে আবৃত বলিয়া ভুজঙ্গগণ তাহার ভয়ে ভীত। ভুজঙ্গাহারী ভুজঙ্গভুকে যেমন আমরা 'ভ'কার দেখিতে পাই তেমনই আবার ভুজঙ্গের প্রিয়খাদ্য ভেকেও 'ভ'কারের শব্দ শুনিতেছি। কিন্তু এই শব্দ ভীতি প্রকাশক নয়, পরন্তু ইহা ভোজ্য কর্ত্তৃক ভোজকের আহ্বান মাত্র।

ভীষণ ভূমিকম্পে ভূমণ্ডল যখন লণ্ডভণ্ড হইতে থাকে, তখন সকলের প্রাণই ভয়ে কাঁপিতে থাকে।

ভাদ্রের ভরা নদী যখন ভৈরব কল্লোল তুলিয়া—ভীষণ বেগে ছুটিয়া চলে, এবং ভীম প্রভঞ্জন যখন তাহাকে উত্তাল তরঙ্গে বিক্ষোভিত করে, তখন সেখানে ভেলা লইয়া উপস্থিত হইতে কে না ভীত হয় ?

"অভ্রভেদী উচ্চশির ভীষণ দর্শন,
শুভ্র দেহ উর্দ্ধবাহু বিভূতিভূষণ।"

'ভ'কারের ভারে কি ভীষণ একটা ছবি চক্ষের সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে! 'ভ'কারের গুরু গম্ভীর নিনাদ যেখানে, সেখানেই ভারি ভয়।

ভয়, ভাবনা ও বিভীষিকা অনেক সময় আমাদের প্রাণে দুঃখ ও বেদনার সৃষ্টি করিয়া থাকে। পরিণামে সেই বেদনাই আবার ভগবানে ভক্তি আনিয়া দেয়। তাহা হইলে দেখিতে পাই যে 'ভ'কারের ভয়ে ক্রমে আমরা ভগবদ্ভক্তিতে অভিরত হইয়া ভজনা করিতে শিখি। মানুষ বিপদের ভয়ে যেমন ভগবানকে ডাকে, সুখে সম্পদে কখনই তেমন ডাকে না। 'ভ'কার নিজে যাহাই হউক কিন্তু সে সত্য সত্যই আমাদিগকে সকল ভয় ও বিভীষিকার ভিতর দিয়া ভক্তির পবিত্র উৎসধারার সম্মুখে নিয়া উপস্থিত করে। "ভক্তিহীন ভজন" আর—"লবণহীন রন্ধন," সমান; তাই, 'ভ'কারকে এতক্ষণ আমরা ভীষণ রূপে ভয়ে ভয়ে দেখিয়া থাকিলেও এখন তাহাকে ভগবদ্ভক্তি, ভাব ও ভজনার আভরণ জানিয়া অভিনন্দন করিতেছি।

এখন আমরা 'ভ'কারের ভাল দিকটা ভাল করিয়া দেখি ও সম্ভোগ করি আসুন।

'ভ'কারকে আমরা বিশাল, বিরাট ও প্রাধান্য-প্রকাশক শব্দের ভিতরে বিরাজিত দেখিতে পাই। তাহার উচ্চারণে যেমন গুরু গাম্ভীর্য্যের দুন্দুভি বাজিয়া উঠে, তেমনই সে বাছিয়া বাছিয়া আপনাকে সকল বিপুলতার ভিতরে অভিলিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। কোনও ক্ষুদ্রতা কিম্বা সঙ্কীর্ণতা তাহার অন্তরাভ্যন্তরের আভাটুকু ম্লান করিতে পারে নাই।

বিপুল পৃথিবী তাহার বিশালতা বুঝাইতেই যেন কতকগুলি 'ভ'কার-যুক্ত নাম ধারণ করিয়াছে। যথা—ভূ, ভূমি, ভুবন, ভূলোক, ভূগোল ভূমণ্ডল, ভূগোলক ইত্যাদি। এই ভূমণ্ডলে সেই ভাগ্যবান, যে ভূমি ও বৈভবের ভারে অভিভূত, এবং লোকে তাহাকেই ভূপতি বলিয়া অভিহিত করে। পর্ব্বতের মহান্ বিরাট ভাব বুঝাইতে তাহার 'ভূভৃৎ' নামে যুগল 'ভ'কার নিযুক্ত রহিয়াছে।

আমরা 'ভ'কারের অভিভাবকতার ভ্রূণরূপে মাতৃ-গর্ভে নির্ভয়ে বাস করিয়া ক্রমে অভিনব জীবন লাভ করি, পরে অভাবনীয় ভগবৎ কৃপায় ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমে ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিতে অভ্যস্থ হই। ভীম পরাক্রমশালী 'ভ'কার আমাদের সঙ্গে সঙ্গে না থাকিলে আমরা ভয়ে ভয়েই হয়ত ভবের পটল তুলিতাম। অতএব এহেন 'ভ'কারের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া পারি না।

নভোমণ্ডলে জ্যোতির শ্রেষ্ঠ আকরের নাম ভাস্কর। ভানুর অভ্যুদয় ভিন্ন ভূমণ্ডলের কোনও প্রাণী কিম্বা পদার্থেরই অস্তিত্ব থাকিত না। ভাস্করের প্রভাবেই আবার—ভুবনমোহন শশাঙ্ক আভাযুক্ত; নতুবা এই ভাবে তাহাকে কেহ দেখিতেই পাইত না।

ভগীরথ ভূভারতে শ্রেষ্ঠ নদী ভাগীরথীকে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। পাপভারে ভীত মানব ভব-ভয় নিবারণের ভরসায় ভাগীরথীতে অবগাহন করিয়া থাকে।

ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া মানুষ যখন ভগবানকে ভজনা করিতে থাকে তখন সে যে আনন্দ লাভ করে তাহাকে "ভূমানন্দ" বলে;—সেই আনন্দই এই ভুবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ।

মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ কার্য্য ভজন এবং ভোজন। ভূরিভোজনের ভাল ব্যবস্থা না হইলে ভাই বল, ভগিনী বল, ভাগিনেয় বল আর ভাইপোই বল, ভৃত্যই বল কিম্বা ভর্ত্তাই বল—সবার মুখই ভার হইয়া উঠে এবং অভিমানের অভিনয় আরম্ভ হয়। ভোজনে অভিরুচিই এই ভূমণ্ডলে মানুষ পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণী মাত্রকেই কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। ভোজনের ভয়ানক অভাব যখন উদরের ভিতরে উপলব্ধি হইতে থাকে, তখন মান অভিমানের ভয় থাকেনা, ভিক্ষা করিয়াই হৌক, অভ্যাহার করিয়াই হউক, ভদ্র-ভাবেই, হউক কিম্বা অভদ্র ভাবেই হউক—ভক্ষ্যদ্রব্য তাহাকে সংগ্রহ করিতেই হয়। ভক্ষ্যদ্রব্যের ভাবনাতেই সকলকে মাতৃভূমি পর্য্যন্ত ভুলিয়া বিভূঁই বিদেশে ভূতের বেগার খাটিয়া বেড়াইতে হয়। তাই কবি বলিয়াছেন—

"ভুবনে ভোজনে ভক্তি কর ভাজন,
ভয়াবহ ভব ভয় হবে নিবারণ।"

'ভ'কারের অভিব্যক্তি আমরা এইখানে আরও ভাল করিয়া অনুভব করিতেছি।

ভারতবাসীর ভক্ষ্যদ্রব্যের মধ্যে ভাতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বতোভাবে উপযোগী। তাই কবি লিখিয়াছেন—

"ভাজা বল ভুজো বল ভাতের মত নয়"

'ভ'কার ভারতবাসীর ভক্ষ্য ভাতকে এমনই উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছে যে ভারতবাসী ত দূরের কথা, এই ভারতবর্ষে ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশ-বাসীরাও ভাত ভোজন করিয়াই তাহাদের বুভুক্ষা দূর করিয়া থাকে।

ভাইয়ের মত মধুর ও শ্রেষ্ঠ সম্পর্ক আর নাই। ত্রিভুবনের সকলে ভুলিয়া গেলেও ভাই ভাইকে কখনও ভুলিতে পারে না। ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম ভারতবাসীর হৃদয়ে ভ্রাতৃ অভিরতির যে নয়নাভিরাম দৃশ্য অভিলিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহাতেই ভারতবর্ষে এখনও ভ্রাতায়

ভ্রাতায় অভেদ ভাবের অভাব নাই। পবিত্র ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিনে ভগিনী ভাইকে হৃদয়ের সকল ভক্তি ও ভালবাসা লইয়া যে ফোঁটা দেন, সেই শুভ্র-তিলক-শোভিত-ভাল লইয়া ভ্রাতা হৃদয়ের অভ্যন্তরে ভুবন বিজয়ীর দম্ভ অনুভব করিয়া থাকেন।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন কনিষ্ঠা ভগিনী ভ্রাতার ভালে শুভ্র তিলক দান করিয়া অন্নাহার কালে নিম্নোক্ত মন্ত্র বলিয়া ভ্রাতাকে গণ্ডুষ করাইয়া থকেন—

"ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্ক্ষ ভক্তমিদং শুভম্।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ।"

এই ভ্রাতৃপ্রেম হইতেই বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের আবির্ভাব হইয়া বিশ্বভুবনে মহৎ কার্য্য সকলের অভ্যুদয় হইতেছে। অতএব ভাই 'ভ'কারকে আমার ভবনে অভিনন্দন করিতেছি।

আমরা ক্রমেই দেখিতে পাইতেছি যে 'ভ'কার ভুবন বিদিত শ্রেষ্ঠ বীরপুরুষগণের নামের ভিতর বিজয় দুন্দুভি বাজাইয়া আপন জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রথমেই দেখুন—ভীম;—যাঁহার ভুজবল ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় ছিল, এবং যিনি ভারতের সেই ভীষণ কুরুক্ষেত্র-প্রাঙ্গণে ভীমপরাক্রমে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভীমের ভীষণতায় ভীম শব্দ এখন ভয়ানক-অর্থ প্রকাশেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তৎপরে—ভীষ্ম, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, শুম্ভ, নিশুম্ভ, কৈটভ প্রভৃতি 'ভ'কারের আভরণে ভূষিত হইয়া অল্প কীর্ত্তি রাখিয়া যান নাই।—ভগদত্ত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষণ যোদ্ধা ভীমসেনকেও পরাভূত করিয়াছিলেন।

দাম্ভিক জার্ম্মাণ জেনারেল্‌দের নামের পূর্ব্বে 'ভ'কার "ভন্" রূপে আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগকে ত্রিভুবনের চক্ষে কি ভীষণ রূপেই অভিব্যক্ত করিয়াছে। অনেক রুষ জেনারেলের নামের মধ্যেও 'ভ'কার 'ভেচ্‌কী' দিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাই। এমন কি, তাহাদের অনেক নগরের সঙ্গেও 'ভ'কার মিশ্রিত হইয়া সেগুলিকে দুর্ভেদ্য করিয়া রাখিয়াছে এবং 'ভন্' গণকেও সেখানে অভিগ্রস্ত হইয়া পরাভূত ও অভিপন্ন হইতে হইয়াছে।

ভারবী, ভাস, ভবভূতি, ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর তাৎকালীন ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী কবি।

ভাস্করাচার্য্য ভারতে গণিতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। 'ভ'কার এখনে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিয়াছে।

ভারতেশ্বরী রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নাম প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরের অভ্যন্তরে ভক্তি ও ভালবাসার জ্বলন্ত অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। তাঁহার সময়েই ভারতের রাজপ্রতিনিধি গভর্ণর জেনারেল্‌কে 'ভাইসরয়' নামে অভিহিত করা হয়। তিনিই স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্র দ্বারা ভারতীয় প্রজাকে বৃটিশ্ প্রজার তুল্যাধিকারে ভূষিত করিয়া অভয়দান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগে ভূমণ্ডলে ভিক্টোরিয়ার ন্যায় কোনও ভূপতির ভাগ্যেই দীর্ঘ ৬৪ বৎসর কাল রাজ্যশাসন ঘটিয়া উঠে নাই।

বিভিন্ন আকারে আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 'ভ'কারের আবির্ভাব দেখিলাম এবং তাহার আলোচনা করিলাম। এখন 'ভ'কারকে ভয় ও ভক্তির সঙ্গে অভিবাদন করিয়া বিদায় লইতেছি।

শ্রীললিতকৃষ্ণ ঘোষ।

পৃথিবীর পুরাবৃত্ত

তৃতীয় খণ্ড।

পৃথিবীদেহের গঠনরীতি

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জলস্থলের অনিত্যতা

পৃথিবীর উন্নত অংশকে মহাদেশ এবং ইহার জলাবৃত অবনত অংশকে মহাসাগর বলা হয়।

পৃথিবীর এই জলস্থলের অবস্থান চিরদিন সমভাবে ছিল কি না এ সম্বন্ধে স্বতঃই মনে প্রশ্নের উদয় হয়।

প্রাচীন পণ্ডিতগণের অধিকাংশেরই ধারণা ছিল যে ভূপৃষ্ঠের কোথাও কোথাও অল্পপরিসর স্থানে জল স্থলের স্থানবিনিময়ের সাক্ষ্য পাওয়া গেলেও মোটের উপর জলস্থলের অবস্থানগত বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। আজ যেখানে মহাদেশ ও মহাসাগর বিরাজমান, চিরদিনই তথায় মহাদেশ ও মহাসাগরই ছিল। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেল্‌ভিনের সিদ্ধান্ত অনুসারে পৃথিবী যখন নীহারিকা অবস্থায় ছিল, তখন হইতেই জলস্থল বিভাগের সূচনা হইয়াছিল। ইহার স্থিরতর অংশে মহাদেশের এবং অস্থিরতর অংশে মহাসাগরের উৎপত্তির ব্যবস্থা হইয়াছিল।

১৮৭২ সাল হইতে ১৮৭৪ সালের মধ্যে Challenger Expedition নামে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ব্যবস্থা হয়, তাহার ফলে নির্দ্ধারিত হয় যে গভীর সমুদ্রতলে এমন একপ্রকারের পদার্থ দেখা যায়, যাহার উপাদান ভূভাগ বা উপকূলভাগস্থ সকল প্রকার পদার্থের উপাদান হইতে স্বতন্ত্র। এই পদার্থ অধিকাংশ স্থলে আনুবীক্ষণিক জীব ও উদ্ভিদদেহের ধ্বংসাবশেষ এবং অতি সূক্ষ্মকণাবিশিষ্ট মৃত্তিকার সমবায়ে গঠিত। এই পদার্থের মধ্যে কোথাও কোথাও উল্কাপিণ্ডের ভগ্নাংশ এবং অধুনা-বিলুপ্ত নক্র বিশেষের দন্তখণ্ড বিরাজমান এবং কোথাও বা আগ্নেয়গিরি নিঃসৃত রক্ত কর্দ্দমের অস্তিত্ব সূচিত।

Challenger Expedition (আপত্তিকারী অভিযান)-এর সময়ে বা তৎপূর্ব্বে ভূপৃষ্ঠে কোথাও উক্ত পদার্থের অনুরূপ পদার্থের পরিচয় পাওয়া না যাওয়ায় মীমাংসিত হইয়াছিল যে, সমুদ্রের উপকূলভাগের সময়ে সময়ে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকিলেও গভীর সাগরতল চিরদিন অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

কেহ কেহ এরূপ অনুমানও করিয়াছিলেন যে, সাগরতলে যে সকল পদার্থ বর্ত্তমান তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব ভূপৃষ্ঠস্থ পদার্থসমূহের গুরুত্ব অপেক্ষা অনেক অধিক। এই গুরুত্বের জন্য সাগরতলস্থ পদার্থসমূহ চিরদিনই নিম্নপ্রদেশে অবস্থিত আছে—এবং তাহাদের জন্য সাগরতল কখনই উন্নত হইয়া ভূমিখণ্ডে পরিণত হইতে পারে নাই।

ডাক্তার ওয়ালেস্ ১৮৮০ সালে প্রকাশিত "দ্বীপ জীবন" (Island Life) নামক গ্রন্থে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কাম্ব্রীয় যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি যুগেই প্রত্যেক মহাদেশে হ্রদজাত স্তরসমূহ গঠিত হইয়া আসিয়াছে। ইহা হইতে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় যে, সময়ে সময়ে মহাদেশ সকলের আকারের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকিলেও মোটের উপর তাহাদের অবস্থান চিরদিনই অপরিবর্ত্তিত রহিয়া গিয়াছে। ডাক্তার ওয়ালেসের মতে মহাসাগরসমূহের বিশালতা ও গভীরতাই তাহাদের চিরস্থায়িত্বের প্রকৃষ্টতর প্রমাণ। এতদ্ভিন্ন সাগরবক্ষস্থ কোন দ্বীপেই উপগিরির অস্তিত্ব দেখা যায় না এবং সিচিলিস্ (Seychelles) ও নিউজিলণ্ড (New Zealand) ব্যতীত আট্‌লাণ্টিক, প্রশান্ত, ভারতীয় এবং দক্ষিণ মহাসাগরের কুত্রাপি কোন জলমগ্ন মহাদেশ বা মহাদ্বীপের ভগ্নাবশেষের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। ইহা হইতেও মহাসাগরসমূহের নিত্যতা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয়।

কিন্তু বর্ত্তমানকালে মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহের ভূতত্ত্ব,

প্রাণীতত্ত্ব এবং উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব-সম্বন্ধে নব নব সাক্ষ্য-প্রমাণ আবিষ্কৃত হওয়ায় জলস্থলের অপরিবর্ত্তনীয়তা সম্বন্ধীয় প্রাচীন মতের প্রতি এখন আর তাদৃশ সমাদর প্রদর্শিত হয় না।

Challenger Expedition সাগরতলে যে অভিনব পদার্থের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানকালে ভূপৃষ্ঠের স্থানে স্থানেও সেরূপ পদার্থের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে এবং এই পদার্থ সচরাচর কি কারণে ভূপৃষ্ঠে দৃষ্ট হয় না তাহারও যুক্তিসঙ্গত কারণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

গভীর সাগরতলস্থিত স্তরে বিলুপ্ত নক্রের দন্ত এবং অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ উল্কাখণ্ড দেখিয়া মনে হয় যে এই সকল স্তর অত্যন্ত ধীরে ধীরে গঠিত হইয়াছে। ইহাদের বেধ এত অল্প এবং ইহাদের উপাদানগুলি এত লঘু যে, যদি ইহারা কোন সময়ে সমুদ্রপৃষ্ঠে উত্থিত হয়, তাহা হইলে তরঙ্গের আঘাতে তাহাদের শীঘ্রই ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া জলের সঙ্গে মিশিয়া যাইবার সম্ভাবনা। যদি এ প্রকারের কোন স্তর প্রশান্ত সমুদ্রমধ্যে গঠিত হইয়া কোন কারণে হঠাৎ সমুদ্র-পৃষ্ঠে উঠিয়া পড়িবার অবসর পায়, তবেই তাহার কোন প্রকারে টিকিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এরূপ অবসর অল্পই ঘটিয়া থাকে। এইজন্যই ভূপৃষ্ঠে সহজে এরূপ স্তরের সন্ধান পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিকগণের অক্লান্ত গবেষণার ফলে সম্প্রতি বার্ম্মুডাস, কিউবা, বোর্ণিও এবং কোন কোন প্রশান্ত-মহাসাগরীয় দ্বীপে ভূপৃষ্ঠে এইরূপ স্তরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

জুকস্ ব্রাউন (Jukes Browne) এবং অধ্যাপক হ্যারিসন (Harrison) নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বার্ম্মুডাস দ্বীপে এইরূপ স্তরের উৎপত্তির সূত্রপাত প্রথমে কোন সাগরশাখার (Estuary) মধ্যে ঘটে। ক্রমশঃ এই শাখার তলদেশ নিম্ন হইয়া সাগরতলের সঙ্গে এক হইয়া যায়। এবং ইহার উপর পূর্ব্বোক্ত প্রকারের স্তর ক্রমশঃ ন্যস্ত হইতে থাকে। কালক্রমে ইহার উপর প্রবালজাত চূর্ণ প্রস্তরের আবরণ পড়িয়া যাওয়ার পর ইহা আবার ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধগামী হইতে থাকে। ক্রমশঃ ইহা সাগরপৃষ্ঠের ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় এবং প্রবালের আবরণ থাকায় সাগরতরঙ্গ ইহাকে চূর্ণ করিতে অসমর্থ হয়। এই কারণে এই স্তর আজিও ভূপৃষ্ঠে টিকিয়া আছে এবং স্থানে স্থানে ইহা ১২০০ ফীট উচ্চ গিরিশৃঙ্গে স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল সাক্ষ্য-প্রমাণের আলোচনা করিয়া সহজেই মনে হয় যে পৃথিবীর কোন কোন অংশ (যথাঃ—স্কাণ্ডিনেভিয়া ও ফিন্‌লাণ্ডের অধিকাংশ, লাব্রেডর এবং ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ) কোন কালে সাগরগর্ভে নিমগ্ন না হইলেও ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভূপৃষ্ঠস্থ জলস্থলের যে অবস্থানগত নানাপ্রকারের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ভূপৃষ্ঠস্থ উদ্ভিদ ও প্রাণীপুঞ্জের অবস্থান প্রণালীও এই অনুমানের সমর্থন করে :—

ভূপৃষ্ঠের একস্থান হইতে আর একস্থানে গমনাগমন করিবার পক্ষে পক্ষীজাতির যেমন সুযোগ ও সুবিধা এমন আর কোন জন্তুর নহে। বিশেষ বিশেষ পক্ষীজাতির অবস্থান অনুসারে ভূপৃষ্ঠকে ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলে বিভক্ত করা হইয়া থাকে ; যথা :—

১। নবমেরুমণ্ডল (Neo-arctic Region)। উত্তর আমেরিকা হইতে দক্ষিণ মেক্সিকো পর্য্যন্ত প্রদেশ এই মণ্ডলের অন্তর্গত।

২। নবোষ্ণমণ্ডল (Neo-tropical Region) মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকা ইহার অন্তর্গত।

৩। মেরুবেষ্টনী মণ্ডল (Pale-arctic Region) ইউরোপ, আশিয়া (ইহার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশ এবং ভারতবর্ষ ব্যতীত) এবং উত্তর আফ্রিকার আটলাস পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ ইহার অন্তর্গত।

৪। কাফ্রিমণ্ডল (Ethiopean Region)। পূর্ব্বোক্ত অংশ ব্যতীত সমস্ত আফ্রিকা ইহার অন্তর্গত।

৫। প্রাচ্য মণ্ডল (Oriental Region)। ভারতবর্ষ, এসিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশ এবং মালয় উপদ্বীপের কিয়দংশ ইহার অন্তর্গত।

৬। অষ্ট্রেলীয় মণ্ডল (Australian Region)।

অষ্ট্রেলিয়া, টাস্‌মেনিয়া, নিউগিনি এবং কতকগুলি প্রাচীন দ্বীপ ইহার অন্তর্গত।

৭। নিউজিলণ্ডীয় মণ্ডল (New Zealand Region)। নিউজিলণ্ড ইহার অন্তর্গত।

পশুজাতির অবস্থান অনুসারে ভূমণ্ডলকে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে।

লাইডেকার (Lydekker) ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পশু-জাতির অবস্থান অনুসারে ভূমণ্ডলকে নিম্নলিখিত তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :—

আর্কটোজিয়া (Arctogœa)। ইউরোপ, এশিয়া আফ্রিকা এবং উত্তর আমেরিকা ইহার অন্তর্গত।

২। নিয়োজিয়া (Negœa)। মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকা ইহার অন্তর্গত।

৩। নটোজিয়া (Notogœa) অষ্ট্রেলেশিয়া এবং পলিনেশিয়া ইহার অন্তর্গত। লাইডেকারের মতে নটো-জিয়া আবার ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ উপবিভাগে বিভক্ত।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জীবজন্তুর অবস্থানের কারণ এই যে, যে সময়ে এই সকল প্রাণী ভূপৃষ্ঠে অভিব্যক্ত হইতেছিল, সে সময়ে পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থা অন্য প্রকারের থাকায় এই সকল প্রাণীর বিচরণের সীমা অন্যপ্রকারে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল।

উদাহরণ স্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বর্ত্ত-মান কালে কঙ্গেরু জাতীয় (Marsupial) দ্বিদন্ত জন্তু কেবল অষ্ট্রেলিয়া এবং তৎসন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জেই দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকাস্থ পাটাগোনিয়া প্রদেশে যে প্রস্তরীভূত জীবাস্থির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে. পণ্ডিতমণ্ডলীর মতে তাহাও পূর্ব্বোক্ত দ্বিদন্ত জীবেরই দেহাবশেষ। পাটাগোনিয়া ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন প্রদেশে এরূপ জীবের চিহ্ন পাওয়া যায় না। সুতরাং এই শ্রেণীর জীব এক সময়ে যে অষ্ট্রেলিয়া হইতে পাটা-গোনিয়ায় গমন করিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমিত হয়। এই জীব যে উত্তর ভূখণ্ড দিয়া অষ্ট্রেলিয়া হইতে দক্ষিণ আমেরিকায় গমন করিয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং এ স্থলে অগত্যা সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, কোন সময়ে অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা দক্ষিণ দিক দিয়া পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।

এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমানকালেও অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকায় এমন কতকগুলি বিশেষ জাতির প্রাণী দেখা যায়, যাহারা উত্তর ভূখণ্ডে সম্পূর্ণ অপরিচিত। মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকায়, আফ্রিকার দক্ষিণাংশে এবং ইহার বিষুবরেখাসন্নিহিত প্রদেশে, ভারতবর্ষে এবং অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে এক প্রকারের অন্ধ সর্প (Typhlopidœ) দেখিতে পাওয়া যায়; ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা বা এশিয়ার অন্যান্য প্রদেশে এ প্রকার সর্পের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। এক প্রকারের বৃক্ষ-বাসী সর্প (Dipsadomorphidœ) এবং এক প্রকা-রের টিক্‌টিকি (Geckos) সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

অষ্ট্রেলিয়া, টাসমেনিয়া এবং উত্তর-আমেরিকার মেক্সিকো হইতে ফ্লরিডা পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে এক প্রকারের ভেক (Cystignathidœ) দৃষ্ট হয়। এক প্রকারের প্রজাপতিকেও (Acradœ) কেবল দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব্ব-এশিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়াতেই দেখা যায়। এশিয়ার অন্যান্য প্রদেশ, ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকায় ইহাদের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। যদি এই সকল জীব অষ্ট্রেলিয়া হইতে উত্তর ভূখণ্ড হইয়া দক্ষিণ আমেরিকায় যাইত তাহা হইলে উত্তর প্রদেশেও ইহাদের কিছু না কিছু চিহ্ন পাওয়া যাইত। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে এক সময়ে পৃথিবীর দক্ষিণাংশে, দক্ষিণ-আমেরিকার সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়া সংযুক্ত ছিল।

অধুনা-বিলুপ্ত উদ্ভিদ্ এবং প্রাণী বিশেষের ধ্বংসা-বশেষের আলোচনা দ্বারাও এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়।

যে বিরাট দেহ কূর্ম্মবংস এক সময়ে অষ্ট্রেলিয়ায় বাস করিত, পাটাগোনিয়াতেও তাহাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা-বিলুপ্ত উদ্ভিদ্ বিশেষের ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। অঙ্গারীয় যুগে

যে সকল উদ্ভিদ্ বিদ্যমান ছিল তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে, এককালে দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যভাগ হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল মহাদেশ পৃথিবীর দক্ষিণাংশে বিরাজিত ছিল। ব্রেজিল, আফ্রিকার উন্নতাংশ, ভারতবর্ষ এবং সমস্ত ভারত-মহাসাগর এই মহাদেশের অন্তর্গত ছিল।

ভারতবর্ষের "গণ্ডোয়ানা" (Gondowana) প্রদেশের স্তররাজি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে এই মহাদেশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুমানের প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী এই বিলুপ্ত মহাদেশের নাম রাখিয়াছেন "গণ্ডোয়ানা ভূমি" (Gondowana Land.)

অতএব পূর্ব্বোক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, পৃথিবীর জলস্থলের অবস্থান চিরদিন বর্ত্তমানকালের অনুরূপ ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশ কালক্রমে ভগ্ন ও ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং যে স্থলপথ দ্বারা এক মহাদেশ অন্য মহাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল তাহা কালক্রমে সাগর গর্ভে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল, আবার এক সময় যে স্থান জলমধ্যে নিমগ্ন ছিল তাহা অন্য সময়ে ভূপৃষ্ঠে উত্তোলিত হইয়াছিল।

পৃথিবীর গঠন-প্রণালী বুঝিবার জন্য এই কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখা আবশ্যক। পৃথিবীর আকার ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া কিরূপে বর্ত্তমান অবস্থার উপনীত হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত মনে না রাখিলে সে কথা ভাল করিয়া বুঝা যাইবে না।

ক্রমশঃ

শ্রীসতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।

নগর-পথে

সেদিন আমি মাঘের দারুণ শীতে
পথের মাঝে চলেছিলাম একা,
বিশ্ব ছেয়ে হঠাৎ এলে তুমি,
প্রাণের মাঝে দিলে আমায় দেখা।
ঝিরি ঝিরি আনন্দেরি হাওয়া
ব'য়ে গেল সারা অঙ্গে মম,
সুপ্ত যত অণু পরমাণু
উঠ্‌লো নেচে সঙ্গীতেরি সম।
তন্ময়তা জাগে আমার মনে,
চরণ আমার চলে কি না চলে,
চোখের আলো বক্ষ উজলিল,
উছলিল মগ্ন আঁখি জলে।
পথিকেরা চলে পথের মাঝে,
আমার পানে সবাই গেল চেয়ে,
তখন আমি থেমে আছি পথে
তোমার মাঝে চরাচরে পেয়ে।
আনন্দেতে পাগল হল দেহ,—
পথের ধূলায় চাহে লুটাইতে,—
মনে হল, সৃষ্টি খানি টেনে
ভরে রাখি ক্ষুধার্ত্ত এ চিতে।

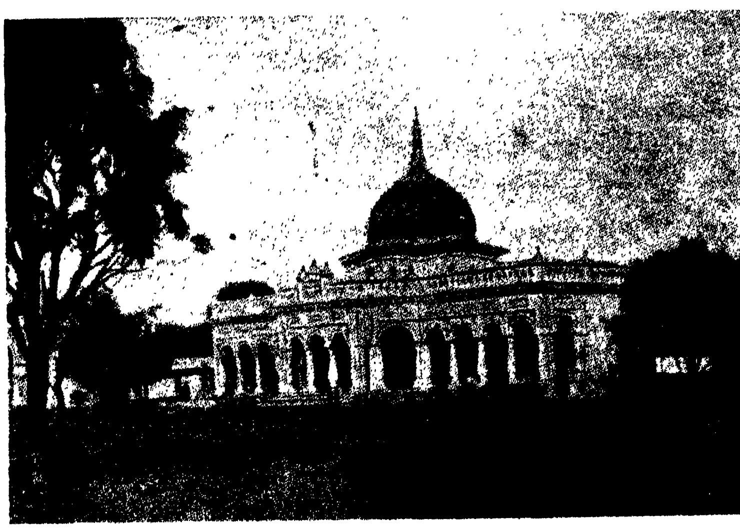
শ্রীদুর্গামোহন কুশারী।

কোচবিহার।

আন্দাজ সাড়ে পাঁচটার সময় দার্জ্জিলিং মেল ছাড়িল। গাড়ীতে খুব ভীড়। এক হিন্দুস্থানী পণ্ডিত সরিয়া গিয়া একটু বসিবার স্থান দিলে সেই স্থলটুকু তাড়াতাড়ি দখল করিয়া বসিয়া পড়িলাম। পরে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপ্ কাঁহা যায়েঙ্গে?"

তিনি উত্তর করিলেন, "কোচবিহার।" পণ্ডিত মানুষের সহিত আলাপ করিতে কখনও বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় না। একটু কথা তুলিলেই সমস্ত খবর কাশীতে জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পণ্ডিতজীর মুখে লীলাবতী, গোলাধ্যায়, গণিতাধ্যায়ের বহু শ্লোক যেন খই ফুটিতে লাগিল। বহু কূট বিষয় উত্থাপন করিয়া মীমাংসা করিতে লাগিলেন। ইনি বেশ বাঙ্গালা বলিতে পারেন। একে পণ্ডিত মানুষ বেশী বলাই অভ্যাস, তার উপর আমার আগ্রহ দেখিয়া আরও বিশদভাবে সমস্ত বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, "পণ্ডিতজি, আপনাদের বাড়ী ত দ্বারভাঙ্গায়। কোচবিহারে গিয়া পড়িলেন কিরূপে?"



ঠাকুরবাড়ী—কোচবিহার

অনায়াসে জানিতে পারা যায়। আমিও শীঘ্রই জানিতে পারিলাম, ইনি কোচবিহারের ভূতপূর্ব্ব দ্বারপতি ঈশ্বরীদত্ত ঝার পুত্র। নাম, যদুনাথ ঝা। ইনি এবং ইঁহার পিতা কোচবিহারের পরলোকগত মহারাজ রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ ও নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। জ্যোতিষ পণ্ডিতরূপে ইঁহার পিতা কোচবিহারে প্রভূত যশোলাভ করিয়াছিলেন। ইনিও কোচবিহার-রাজদত্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া

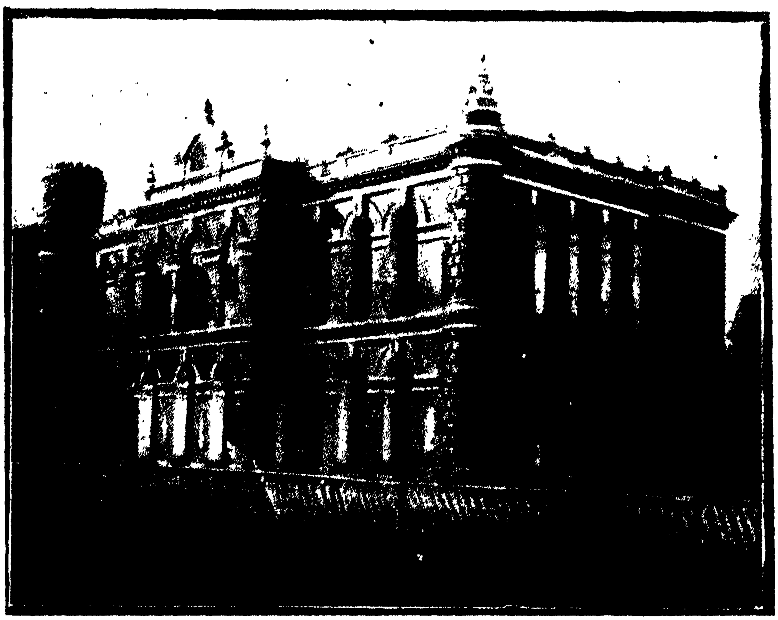
পণ্ডিতজী বলিলেন, "বাবু, আমার পিতাই প্রথম কোচবিহারে যান। দ্বারভাঙ্গা হইতেই কোচবিহারাধিপতির পণ্ডিতপ্রীতি ও দানশীলতার কথা তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। প্রাচীন কোচবিহারাধিপতিগণ অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। পণ্ডিতগণকে বহু আদর করিতেন। সংস্কৃত ভাষার বিশেষ চর্চ্চা ছিল। 'ভোজ-প্রবন্ধে' যেরূপ ভোজরাজ কর্ত্তৃক পণ্ডিতগণকে উৎসাহ দিবার কথা পাঠ করা যায়, কোচবিহারেও ঐরূপ ছিল।

মহারাজ অনুচরকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'ও কি চায়?' কেহ কন্যাদায়, কেহ পিতৃশ্রাদ্ধ, কেহ বা অন্য কোনও কারণে সাহায্য প্রার্থনা করিত। তৎক্ষণাৎ দুই চারি বা পাঁচশত টাকা দানের হুকুম হইয়া যাইত। দানের কোনও সীমা ছিল না।"

পণ্ডিতজি একটু থামিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "যে যাহা বলিত অমনই পাইত। মিথ্যা কথা বলিয়া যদি কেহ চাহিত?"

তাৎকালীন রাজমন্ত্রী শিবপ্রসাদ বক্সীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। রাজমন্ত্রী সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন ও 'আহ্নিকতত্ত্ব' নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

"আমার পিতা শীতল সিংএর নির্দ্দেশমত রাজমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সেকালে সকালে বিকালে কাছারী হইত। এখন আপনারা যেমন



প্রিন্স ভিক্টরের প্রাসাদ (পুরাতন দেওয়ান-কুঠী)—কোচবিহার

পণ্ডিতজি বলিলেন, "বাবু, তখন মিথ্যা কথা বলিয়া বড় একটা কেহ অর্থ যাচ্ঞা করিত না। যাচ্ঞা করা অতি ঘৃণিত বলিয়া বিবেচিত হইত। নিতান্ত নিরুপায় না হইলে কেহ কাহারও নিকট হাত পাতিত না। আর কোচবিহার তখন যেরূপ দুর্গম ছিল তাহাতে বেশী লোকও আসিত না।"

আমি বলিলাম, "তারপর, আপনার পিতা কি করিলেন?"

পণ্ডিতজি বলিলেন, "শীতল সিং আমার পিতাকে

দুপুরেই নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া অফিসে ছুটেন সেরূপ ছিল না। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বোধ হয় এই ব্যবস্থাই ভাল ছিল। রাজমন্ত্রী সকালে কাছারী করিয়া প্রায় বেলা এগারটার সময় পাল্কী চড়িয়া বাড়ী ফিরিতেন। আমার পিতা একদিন ঐ সময়ে গিয়াছিলেন। তখন রাজমন্ত্রী বাসায় ফিরিয়াছেন। ভৃত্য কাছারীর পোষাক খুলিয়া দিতেছে। চারিদিকে বহুলোক দাঁড়াইয়া আছে। সকলেই বাঙ্গালী। তাহাদিগকে ঠেলিয়া ভিতরে যাওয়া অসম্ভব। আমার পিতা হস্তে একটি

নারিকেল ও একটি যজ্ঞোপবীত লইয়া গিয়াছিলেন। রাজমন্ত্রী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণকে নারিকেল ও যজ্ঞোপবীত দিয়া আশীর্ব্বাদ করাই রীতি।

"আমার পিতা রাজমন্ত্রীর নিকটে যাইবার কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া দূর হইতে উচ্চকণ্ঠে এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন—



কোচবিহার-রাজপ্রসাদ

"কণ্ঠে যস্য বিরাজতে হি গরলং শীর্ষে চ মন্দাকিনী
বামাঙ্গে গিরিজাননং কটিতটে শার্দ্দূলচর্ম্মাম্বরম্।
মায়া যস্য রুণদ্ধি বিশ্বমখিলং পায়াৎ স বঃ শঙ্করঃ
জম্বূবজ্জলবিন্দুবজ্জলজবজ্জম্বালবজ্জালবৎ ॥*

"স্বভাবতঃই আমার পিতার কণ্ঠস্বর উচ্চ ছিল। তাহার উপর সে স্বর আরও উচ্চ করিয়াই তিনি শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন। রাজমন্ত্রীর মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি হস্তসঙ্কেতে আমার পিতাকে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিলেন। তখন সমবেত জনগণ উভয় পার্শ্বে সরিয়া গিয়া তাঁহাকে পথ করিয়া দিল।

"আমার পিতা তখন অগ্রসর হইয়া রাজমন্ত্রীর হস্তে নারিকেল ও যজ্ঞোপবীত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজমন্ত্রী আমার পিতার মস্তকে পাগড়ী দেখিয়াই স্থির করিলেন যে ইনি নিশ্চয়ই বিদেশী। এই অনুমানে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপ্ কাঁহাসে তস্‌রিফ্ লাতে হেঁ?'

"পিতা বলিলেন—

"জাতা সা যত্র সীতা সরিদমলজলা বাগ্‌বতী যত্র পুণ্যা
যত্রান্তে সন্নিধানে সুরনগরনদী ভৈরবো যত্র লিঙ্গম্।
মীমাংসান্যায়বেদাধ্যয়নপটুতরৈর্পণ্ডিতৈর্ম্মণ্ডিতা যা
ভূদেবো যত্র ভূপো যজতি বসুমতী সাস্তি মে তীরভুক্তিঃ ॥ †

* যাঁহার কণ্ঠের গরল জম্বুফলের ন্যায় নীলবর্ণ, যাঁহার মস্তকে (অতি বেগবতী) মন্দাকিনীও জলবিন্দুবৎ প্রতীয়মান, যাঁহার বামাঙ্গে পার্ব্বতীর বদন কমলের ন্যায় শোভমান, যাঁহার কটিতটে শার্দ্দূলচর্ম্ম শৈবালের ন্যায় কোমল ও যাঁহার মায়া জালের ন্যায় এই বিশ্ব আচ্ছাদন করিয়াছে, সেই মহাদেব আপনাকে রক্ষা করুন।

† যেখানে সীতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যেখানে নির্ম্মল-সলিলা শুভদায়িনী বাগ্‌বতী নদী বহিতেছে, যাহার নিকটে

"এই কথায় প্রীত হইয়া রাজমন্ত্রী আমার পিতার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই আমার পিতার সহিত কথোপকথনে তাঁহার উপর প্রসন্ন হইলেন ও অপরাহ্ণ-কালে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া স্নান ও আহ্নিকাদি করিবার জন্য উঠিয়া গেলেন।

"বাসায় ফিরিয়া আসিলে সকল কথা শুনিয়া শীতল সিং বলিল, 'আর কি ? কাজ হাঁসিল করে এসেছেন।'

"সেইদিন রাজমন্ত্রী আমার পিতার বাসস্থান ও খোরাকীর বন্দোবস্তের জন্য তাঁহাকে দ্বারমোক্তার তারামোহন বক্সীর নিকট যাইতে বলিলেন। তারামোহন বক্সীও ব্রাহ্মণ ও সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। আমার পিতা বলিতেন, সেকালে অধিকাংশ রাজকর্ম্মচারীই ব্রাহ্মণ ছিলেন ও সংস্কৃত জানিতেন। সংস্কৃতে পণ্ডিত না হইলে কেহ রাজসভায় আদর পাইতেন না। যাহা হউক, আমার পিতা তারামোহন বক্সীর নিকট গিয়া এই শ্লোকে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—

"বিরাজরাজপুত্রারের্যন্নাম চতুরক্ষরম।
পূর্ব্বার্দ্ধং তব শত্রূণাং পরার্দ্ধং তব বেশ্মনি ॥ *



ব্রাহ্মসমাজ মন্দির—কোচবিহার

"এই শ্লোক শুনিয়াই তারামোহন বক্সী উহাকেই একটু পরিবর্ত্তন করিয়া হাসিয়া বলিলেন—

"বিরাজরাজপুত্রারের্যন্নাম চতুরক্ষরম্।
পূর্ব্বার্দ্ধং মম শত্রূণাং পরার্দ্ধং মম বেশ্মনি ॥

"পরে আমার পিতার থাকিবার স্থান ও খোরাকীর জন্য অর্থ প্রদান করিলেন।"

পণ্ডিতজীর গল্প শুনিতে শুনিতে এত তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে রেলগাড়ী যে ষ্টেশনের পর ষ্টেশন পার হইয়া যাইতেছে সে দিকে লক্ষ্য রাখি নাই। এখন দেখি যে গাড়ী প্রায় সান্তাহারে উপস্থিত।

সান্তাহারে গাড়ী বদল করিতে হইল। রাত্রি তখন প্রায় এগারটা। একেবারে কোচবিহার পর্য্যন্ত যায়

গঙ্গা, যেখানে ভৈরব নামক শিবলিঙ্গ অবস্থিত, যেস্থল মীমাংসা, ন্যায় ও বেদ-অধ্যয়নপটু পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা অলঙ্কৃত ও যেখানে ব্রাহ্মণ নৃপতি যাগ করেন সেই তীরভুক্তি (ত্রিহুত) আমার নিবাস।

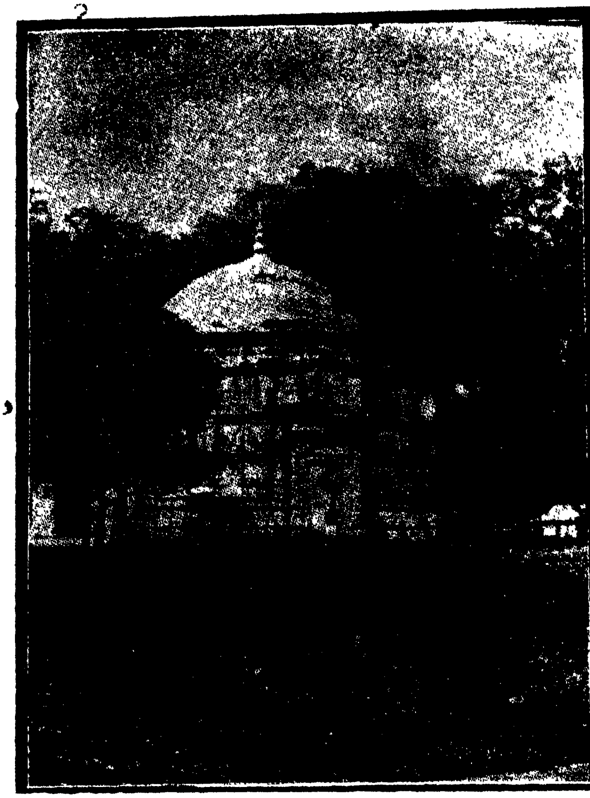
* বি অর্থাৎ পক্ষীর রাজা গরুড়, তাহার রাজ অর্থাৎ বিষ্ণু, তাঁহার পুত্র প্রদ্যুম্ন, তাঁহার যে অরি অর্থাৎ শিব, তাঁহার চার অক্ষরে যে নাম আছে (মৃত্যুঞ্জয়) তাহার পূর্ব্বার্দ্ধ (অর্থাৎ মৃত্যু) আপনার শত্রুদের হউক ও শেষার্দ্ধ (জয়) আপনার গৃহে থাকুক।

এমন একখানি দার্জ্জিলিং মেল সংলগ্ন গাড়ীতে আমি উঠিয়া পড়িলাম। ইহাতে সুবিধা হইল এই যে পথে আর গাড়ী বদল করিতে হইবে না। পণ্ডিতজীকে আর দেখিতে পাইলাম না।

গাড়ীতে উঠিয়াই আমি শয়নের আয়োজন করিয়া লইয়াছিলাম। ঢুলিতে ঢুলিতে তন্দ্রা আসিল। তন্দ্রার ঘোরে পণ্ডিতজী বর্ণিত কোচবিহারের প্রাচীনকালের চিত্র চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল।

ভোরের বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া মুখ হাত ধুইতেই গাড়ী লালমণির হাট নামক ষ্টেশনে আসিয়াছে দেখিলাম। শুনিলাম রাত্রিতে পার্ব্বতীপুর ষ্টেশন হইতে আমাদের গাড়ীখানিকে দার্জ্জিলিং মেল হইতে কাটিয়া আনা হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী ছাড়িল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গিতালদহ জংসন নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ইহার পর হইতেই কোচবিহার রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে এইখানে নামিয়া "কোচবিহার ষ্টেট্ রেলওয়ে" নামক ছোট গাড়ীতে উঠিতে হইত। এখন ছোট গাড়ী নাই। বড় গাড়ীই বরাবর চলে। গিতালদহ হইতে আলিপুর-দুয়ার ষ্টেশন পর্য্যন্ত প্রদেশ কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত। এই রেলপথটুকুতে যে আয় হয় তাহা কোচবিহারের মহারাজা পাইয়া থাকেন। এই রেলপথটুকুর রক্ষা ও পরিচালনব্যয়ও অবশ্য মহারাজাকে দিতে হয়। এই রেলওয়ে হইতে প্রায় দেড়লক্ষ টাকা বাৎসরিক লাভ হয়।



বাণেশ্বর শিবমন্দির

গিতালদহ ছাড়াইয়া দুইধারে মাঠ দেখিতে পাইলাম। কৌপীনমাত্র পরিধান, বাকি দেহ সম্পূর্ণ উলঙ্গ এরূপ কৃষক লাঙ্গল দিতেছে। মধ্যে মধ্যে খড়ে ছাওয়া কুটীর প্রান্তে অনাবৃত-শীর্ষা রমণী ও উলঙ্গ বালকবালিকা দেখা গেল। স্থানে স্থানে কূপ। সেখান হইতে রমণীগণ জল তুলিতেছে, কাপড় কাচিতেছে। গাড়ী ক্রমে ফলিমারি, দিনহাটা, ভেটাগুড়ি, দেওয়ানহাট ষ্টেশন অতিক্রম করিল। চারিদিক দেখিয়া মনে হইল রাজ্যের অধিবাসীরা দরিদ্র। একখানিও পাকা বাড়ী দেখা গেল না। ক্বচিৎ দুই একখানি টিনের ছাদ দৃষ্ট হইল। এই সকল ষ্টেশনে যে সকল এদেশী যাত্রী উঠিতে ও নামিতে লাগিল তাহাদের অধিকাংশেরই নগ্নপদ। কেহ কেহ শার্ট ও খালি গায়ে বুকখোলা কোট পরিয়াছে। কেহ শুধু একখানা উত্তরীয় গায়ে জড়াইয়া রাখিয়াছে। এ দেশের স্ত্রীযাত্রীরা অবগুণ্ঠন দেয় না। পরিধানে একখানি শাড়ী, আর একখানি বস্ত্রে দেহের ঊর্দ্ধভাগ আবৃত করিয়াছে। ইহাদের ভাষা বাঙ্গালা ভাষা হইতে একটু বিভিন্ন। যাত্রীরা সকলেই তাম্বুলচর্ব্বণে বিশেষ আসক্ত



প্রাচীন রাজধানী কামতাপুরের ধ্বংসাবশেষ

দেখিলাম। প্রায় প্রত্যেকের নিকটই তাম্বুলরচনার উপাদান রহিয়াছে।

বেলা প্রায় নয়টার সময় টিনের ছাদ ঢাকা বারান্দা সমন্বিত লাল ইঁটে গাঁথা কোচবিহার ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া পৌছিল।

কুলীর মাথায় ট্রাঙ্ক ও বিছানা চাপাইয়া টিকিট দিয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া এক পক্ষীরাজবাহিত জীর্ণ ভাড়াটিয়া গাড়ীতে দুর্গা স্মরণ করিয়া আত্মসমর্পণ করিলাম। গাড়ী চলিতে লাগিল। কিছুদুর আসিয়া বামে ডাক বাংলা দেখিতে পাইলাম। সাহেবী খানায়



কামতাপুর গোসানিমারি মন্দির

আপত্তি না থাকিলে এখানে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারা যায়। সাধারণ জনগণ সহরের মধ্যে ধর্ম্মশালায় এক-দিন বিনা ব্যয়ে থাকিতে ও খাইতে পায়। বিশেষ প্রয়োজন হইলে একাধিক দিন থাকিবারও অনুমতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ধর্ম্মশালা ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের ভগিনী মহারাজকুমারী আনন্দময়ীর অকাল মৃত্যুর স্মৃতিচিহ্নরূপে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ৪ ঠা মে তারিখে সাধারণের ব্যবহারার্থ উন্মুক্ত হয়। ইহা 'আনন্দময়ী ধর্ম্মশালা' নামে পরিচিত। নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর লোকের থাকিবার জন্য ষ্টেশনের নিকট 'পান্থশালা' আছে। সেখানে কেবল থাকিবার স্থান পাওয়া যায়। ইহা জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত।

ভদ্রলোকেরা প্রায়ই এখানকার কোনও পরিচিত অধিবাসীর গৃহে অতিথি হন। আর, এখানে পর্য্যটকের সমাগমও অতি অল্প হয়। আমিও এক আত্মীয়ের গৃহে গিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

বিকালে সহর দেখিতে বাহির হওয়া গেল। প্রথমে ঠাকুরবাড়ীতে গেলাম। ধর্ম্মশালার সংলগ্ন এই ঠাকুর-বাড়ীতে এক অট্টালিকার তিনটি কক্ষে তিন দেবতার অবস্থান। মধ্যস্থলে মদনমোহন। বামে তারা, দক্ষিণে কালী। বামদিকে একটি পৃথক মন্দিরে ভবানীমূর্ত্তি।

মদনমোহন রৌপ্যসিংহাসনস্থিত। বামে রাধা নাই। আসামে প্রথিত শঙ্করদেবের 'মহাপুরুষিয়া' মতে রাধার পূজা নাই। শঙ্করদেব নিজ মত প্রথম প্রচারের সময় আসামে অত্যাচার প্রাপ্ত হন। সেই সময় কোচবিহার-রাজ নরনারায়ণ, শঙ্করদেবকে আশ্রয় দেন ও ভূমি দান করেন। মহাপুরুষিয়া মতানুসারে এই মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এখানে একটা নূতন ব্যাপার দেখা গেল। মাঝখানের কক্ষে মদনমোহন, তাঁহার দুই পার্শ্বে কালী ও তারা। কালী ও তারার সম্মুখে ছাগ, পায়রা, কচ্ছপ ও মহিষ পর্য্যন্ত বলি হইয়া থাকে। বৈষ্ণবমত ও শাক্তমতের এত গলাগলিভাব অন্য কোথাও বড় একটা দেখা যায় না।

ঠাকুরবাড়ীতে রাসযাত্রার সময় খুব ধূমধাম হইয়া থাকে। কৃষ্ণনগর হইতে কারিকর আসিয়া পৌরাণিক ঘটনার চিত্র-পুঁতুল গড়িয়া দেখাইয়া থাকে। রাসযাত্রার অঙ্গস্বরূপ একটি মেলাও বসিয়া থাকে। যাত্রা, থিয়েটার বায়স্কোপ প্রভৃতি আমোদেরও ব্যবস্থা হয়।

ঠাকুরবাড়ী দেখিয়া পশ্চিমদিকে চলিতে চলিতে দক্ষিণে একটি দ্বিতল অট্টালিকা দেখিলাম। শুনিলাম, এই বাড়ীতে দেওয়ান থাকেন। মিষ্টার এন্, এন্, সেন বার-এট-ল কোচবিহার রাজ্যের বর্ত্তমান দেওয়ান।

আর একটু অগ্রসর হইয়া এক প্রশস্ত দীর্ঘিকা দেখিতে পাওয়া গেল। ইহার নাম সাগরদীঘি। ইহার তিনপাশে রাজ্যের অফিস আদালতগুলি অবস্থিত।

উত্তর পার্শ্বে সরকারি ছাপাখানা, ষ্টেট কাউন্সিল অফিস ও জজ আদালত। জজ আদালত ও ষ্টেট-কাউন্সিল অফিস একই অট্টালিকায় অবস্থিত। তাহার পার্শ্বে রেজিষ্ট্রি অফিস ও এসিষ্টাণ্ট সিভিল জজের আদালত। তাহার পার্শ্বে বার লাইব্রেরী নির্ম্মিত হইতেছে।

সাগরদীঘির পূর্ব্বদিকে মাল-কাছারী ও দেবত্তর বিভাগের অফিস ও ষ্টেটফৌজদারী আদালত। তাহার পার্শ্বে দেওয়ানের অফিস ও ট্রেজারি অফিস্। তাহার পাশে কিছু দূরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ ষ্টেট ও একাউণ্টাণ্ট জেনেরালের অফিস্।

সাগরদীঘির উত্তরদিকে বড় ফৌজদারী আদালত ও মিউনিসিপাল অফিস। পশ্চিমদিকে ল্যান্স্‌ডাউন হল। ইহার একতলে সরকারী লাইব্রেরী ও দ্বিতলে ফ্রি মেসন লজের কোচবিহার শাখা অধিষ্ঠিত। তাহার পার্শ্বে বর্ত্তমান মহারাজের সহোদর প্রিন্স ভিক্টর নিত্যেন্দ্র-নারায়ণের আবাস। অল্পদিন হইল প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মতিলাল গুপ্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর সহিত ইহাঁর বিবাহ কলিকাতায় মহোৎসবে সম্পন্ন হইয়াছে।

সাগরদীঘির চারিদিক দেখিয়া রাজবাড়ী দেখিতে গেলাম। রাজপ্রাসাদ বিস্তৃত উদ্যান মধ্যস্থিত ও বিলাতী

ধরণে সজ্জিত। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের শিকার-স্মৃতির অনেক চিহ্ন ও ক্রীড়ানৈপুণ্য-লব্ধ অনেক পুরস্কার রাজপ্রাসাদে রক্ষিত আছে। রাজবাড়ীর মধ্যে বৃহৎ একটি লাইব্রেরী আছে। ড্রয়িং রুম, ডাইনিং রুম প্রভৃতি কক্ষগুলি আধুনিক বিলাতী রুচি অনুযায়ী সজ্জিত।

রাজপ্রাসাদের পশ্চাৎদিকে আস্তাবল। বর্ত্তমান প্রাসাদ বহুদিনের নহে। প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ একটি দেওয়াল বর্ত্তমান আছে। তাহাও যে খুব পুরাতন তাহা বলিতে পারা যায় না। এই দেওয়ালে বিবিধ মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়।

সহরের মধ্যভাগে বাজার। অধিকাংশ বড় বড় ব্যবসায়ী মাড়োয়ারী মহাজন। বাঙ্গালী বড় ব্যবসায়ী নাই বলিলেই হয়। তামাক, পাট ও চাউলের কারবারই প্রধান।

সহরের বাহিরে নীলকুঠি নামে প্রসিদ্ধ স্থলটিতে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফ ষ্টেটের বাসগৃহ। সহর হইতে এক সুন্দরবৃক্ষচ্ছায়া সমন্বিত পথ দিয়া নীলকুঠিতে যাইতে হয়।

কোচবিহার সহরটি ছোট। রাস্তাগুলি ভাল। পাকা বাড়ীর সংখ্যা অতি অল্প। অধিকাংশই টিনের ছাদবিশিষ্ট। জলের কল নাই। সাগরদীঘির জলই সাধারণতঃ ভদ্রলোকগণ পানের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কোচবিহারে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পৃথক উপাসনা গৃহ আছে। এতদ্ব্যতীত দুইটি মসজিদও বিদ্যমান। পূর্ব্বোক্ত ঠাকুরবাড়ী ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালীবাড়ী, শিবমন্দির প্রভৃতি দেবালয়ও অনেকগুলি আছে।

কোচবিহারের বর্ত্তমান মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর ও বরোদা-রাজকুমারী মহারাণী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী সর্ব্বজনপ্রিয়। বর্ত্তমান মহারাজ শিকার-পটু, প্রতিবৎসরই শিকারের আয়োজন হয়। মহারাজের বহুসংখ্যক হস্তী আছে। শিকারের সময় এগুলি ব্যবহৃত হয়। পিলখানা নামক স্থানে হস্তী-গুলিকে সাধারণতঃ রাখা হইয়া থাকে।

কোচবিহার সহরে আর বিশেষ কিছু দ্রষ্টব্য নাই। ল্যান্সডাউন হলে যে লাইব্রেরী অবস্থিত তাহাতে অনেক প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি রক্ষিত আছে। এ সকল পুঁথি অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। প্রায় সকলগুলিই পুরাণাদির বঙ্গানুবাদ। কতকগুলি কোচবিহারের ভূতপূর্ব্ব অধিপতি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের রচিত। সম্প্রতি নবস্থাপিত কোচবিহার 'সাহিত্য-সভা' কর্ত্তৃক এগুলি ছাপাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত রাজাশ্রিত পণ্ডিত-রচিত বহু বাঙ্গালা পুঁথি আছে। তন্মধ্যে হিতোপদেশের বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ গ্রন্থখানির প্রচার বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

কোচবিহারের পরের ষ্টেশন বাণেশ্বর। তথায় বাণেশ্বর নামক শিবের অতি প্রাচীন মন্দির আছে। এ শিব-লিঙ্গ যে কতকালের তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। শিবরাত্রির সময়ে এখানে বহু যাত্রী সমাগম হইয়া থাকে। মন্দির সন্নিকটস্থ পুষ্করিণীতে বহু কচ্ছপের আবাস। কলা বা অন্য কিছু তীরে ধরিলে ও "মোহন মোহন" বলিয়া ডাকিলে বহু কচ্ছপ প্রায় জল ছাড়িয়া পুষ্করিণীর পাড়ে উঠিয়া পড়ে ও কলা প্রভৃতি খাইয়া আবার জলে নামিয়া যায়।

কোচবিহার রাজ্যমধ্যে গোঁসানিমারী নামক স্থলটিতে প্রাচীন কোচবিহারের অনেক ঐতিহাসিক তথ্য গুপ্ত আছে। পূর্ব্বে এই স্থলটি কোচবিহারের রাজধানী ও কামতাপুর নামে প্রসিদ্ধ ছিল। দিনহাটা নামক ষ্টেশনে নামিয়া গোযানে এই স্থানে যাইতে হয়। এখনও প্রাচীন দুর্গপ্রাকার ও সিংহদ্বারের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। অধিকাংশ চিহ্ন মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত হইয়াছে। রীতিমত খননের ব্যবস্থা করিলে বহু লুপ্ত তথ্যের উদ্ধার হইতে পারে ও গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের ন্যায় প্রাচীন কোচবিহার রাজ্যের গৌরব বাঙ্গালার ঐতিহাসিকগণকে আকৃষ্ট করিতে পারে।

এখানে এখনও বহুদিনের একটি দেবী-মন্দির বিদ্যমান।—ইহার নাম গোসানিমারি মন্দির। প্রবাদ এইরূপ যে কোচবিহারের কোন নর-

পতি এই মন্দির দেখিতে আসিতে পারেন না। দেবীর শাপ আছে যে যদি কোন নরপতি এখানে আসেন তাহা হইলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। 'গোসানি মঙ্গল' নামক পুঁথিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে দেবী রজনীতে মন্দির মধ্যে নৃত্য করিয়া থাকেন। কোনও রাজা কৌতূহলপরবশ হইয়া তাহা দেখিতে যাওয়াতে দেবী এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন।

কোচবিহার রাজ্য-শাসনপ্রণালী বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরবের বিষয়। বাঙ্গালী রাজা ও বাঙ্গালী কর্ম্মচারী-শাসিত রাজ্যের ব্যবস্থা যে কতদূর সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইতে পারে তাহার নিদর্শন এই রাজ্যে আসিলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাঙ্গালী শাসনভার গ্রহণে অপটু এই অপবাদ যাঁহারা দেন তাঁহারা কোচবিহার রাজ্য-শাসন-প্রণালী দেখিলে নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। ব্রিটিশ ভারতের আইন কানুন নিয়ম পদ্ধতি সকলই এখানে প্রচলিত অথচ জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি পদে বাঙ্গালীরাই কার্য্য করিতেছেন। এখানে সর্ব্বোপরি মহারাজের কর্ত্তৃত্ব। তাঁহার আজ্ঞাধীনে ষ্টেট্ কাউন্সিল। ইহার সভাপতি মহারাজ স্বয়ং, সহকারী সভাপতি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ্ ষ্টেট্। এতদ্ব্যতীত দেওয়ান ও অপর একজন সভ্য লইয়া এই কাউন্সিল গঠিত। অতিরিক্ত সভ্যও একজন লওয়া হইয়া থাকে। এই ষ্টেট কাউন্সিল, ব্রিটিশ ভারতে হাইকোর্টের পদবীতে অধিষ্ঠিত।

ষ্টেট্ কাউন্সিলের নিম্নে সিভিল ও সেসন জজ আদালত। একজন জজই দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার মোকর্দ্দমার আপীলের বিচার ও সেসনের মোকর্দ্দমার বিচার করিয়া থাকেন। ফৌজদারী বিভাগে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ এখানে 'ফৌজদারী আহিলকার' নামে অভিহিত। সদর ব্যতীত আর চারটি মহকুমায় রাজ্যটি বিভক্ত। এই সকল মহকুমায় কোথাও একজন কোথাও বা দুইজন হাকিম থাকেন। ইঁহারা 'নায়েব আহিলকার' নামে পরিচিত। দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার মোকর্দ্দমার বিচার ইহাঁরা করিয়া থাকেন। একাধারে ইঁহারা মুন্সেফ্ ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। এতদ্ব্যতীত রাজস্ব ও আবগারী বিভাগও ইঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে। মহকুমার যাবতীয় দলিলাদি রেজিষ্ট্রিও ইহাঁদের নিকট হয়।

পুলিস বিভাগ ব্রিটিস পুলিস কোড্ অনুযায়ী গঠিত ও শাসিত। এ বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ্ পুলিস।

কোচবিহারে স্বতন্ত্র জেল আছে। এখানে অপরাধিগণ দণ্ড ভোগ করে। কাহারও দ্বীপান্তর হইলে সে আণ্ডামানে প্রেরিত হয়—ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত আছে। এইরূপ অপরাধীর পোষণব্যয় রাজ সরকার হইতে দেওয়া হইয়া থাকে।

কোচবিহারে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ ও অনেকগুলি স্কুল আছে। সহরে ও মফস্বলে বালিকাবিদ্যালয় ও অনেক পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত আছে।

চিকিৎসাবিভাগ একজন সিভিল সার্জ্জনের অধীনে। সদরে ও মফস্বলে হাঁসপাতাল ও ডিস্‌পেন্‌সারি আছে। সদরে একটি দাতব্য আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়ও আছে।

মোটের উপর রাজ্যটির পরিচালনব্যবস্থা ভাল বলিয়াই বোধ হয়। তবে সংশোধন বা উন্নতির একেবারেই স্থান নাই তাহা বলা যায় না। আশার কথা, সে দিকে মহারাজের সতর্ক দৃষ্টি আছে।

কয়েকদিন বেশ আনন্দে কাটাইয়া, একটি দেশীয় রাজ্যের অবস্থা ও পরিচালনার সুন্দর স্মৃতি লইয়া, একদিন সন্ধ্যার সময় কোচবিহার পরিত্যাগ করিলাম।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল।

পরলোকগত উমেশচন্দ্র দত্ত

বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বলকারী পণ্ডিতাগ্রগণ্য উমেশচন্দ্র দত্ত (গুপ্ত) বিগত ২২শে জুন তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তন-যুগে তাঁহার মনীষায় বাংলার শিক্ষিত-সমাজ বিশেষ-রূপে গৌরবান্বিত হইয়াছিল। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল,—এমন কি ইংরাজ অধ্যাপক-দিগের মতে লালবিহারী দেও তাঁহার সমকক্ষ বিবেচিত হইতেন না। তিনি বঙ্কিম দীনবন্ধুরও পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের লোক ছিলেন। বহুকাল যাবৎ তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নির্লিপ্তভাবে কৃষ্ণনগরে জীবন যাপন করিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স সাতাশী বৎসর হইয়াছিল।

১৮২৯ সালে জুন মাসে উমেশচন্দ্রের জন্ম হয়। দীনবন্ধু মিত্রও ঐ বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রণয় ছিল। দীনবন্ধু তাঁহার সুরধুনী কাব্যে কৃষ্ণনগর বর্ণনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

এ কালেজ একবার উমেশ-প্রভায়
উঠেছিল সর্ব্বোপরি বিদ্যা পরীক্ষায়।

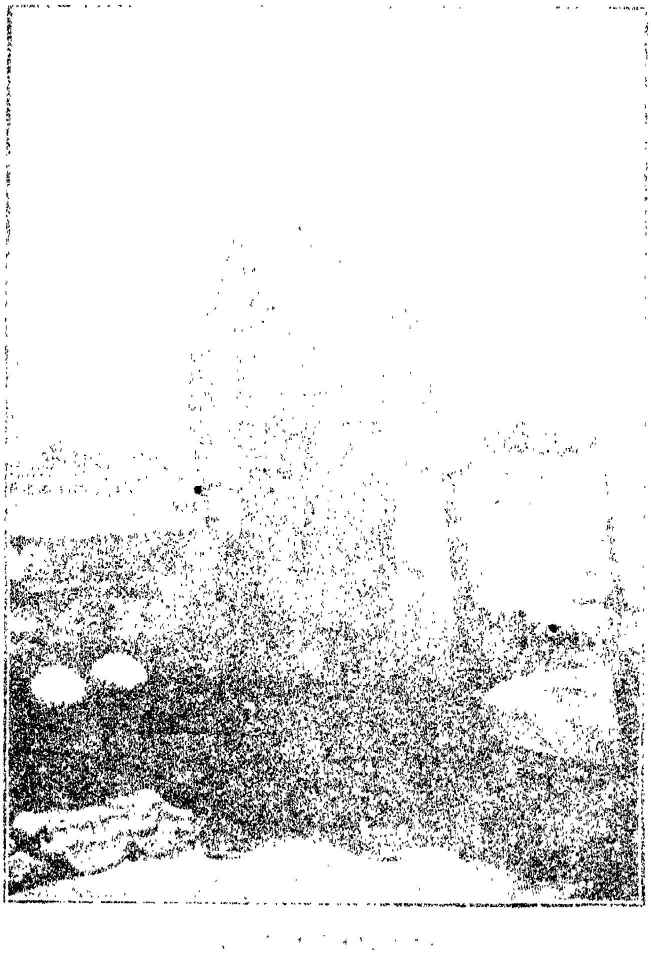
উমেশচন্দ্রের আর একজন সমসাময়িক, চন্দ্রশেখর গুপ্ত (শ্রীযুক্ত বি, এল্ গুপ্তের পিতা) সম্প্রতি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। উমেশচন্দ্রের পূর্ব্বে চারিজন মাত্র সিনিয়র স্কলার হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুইজন ছিলেন চন্দ্রশেখর গুপ্ত ও প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী। দ্বারিকানাথ মিত্র উমেশচন্দ্রের দুই তিন বৎসর পরে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

দুই বৎসর বয়সে উমেশচন্দ্র পিতৃহীন হন। তাঁহার পিতা কলিকাতায় চাকরি করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উমেশচন্দ্রকে ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে পালিত হইতে হইয়াছিল।

পাঠশালায় তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। দশ বৎসর বয়সে তিনি স্থানীয় মিশনরী স্কুলে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু পড়াশুনা তথায় ভাল না হওয়ায় তিনি অল্প দিন পরেই বিদ্যালয় ছাড়িয়া দেন। সেই সময়ে পুণ্যচরিত রামতনু লাহিড়ীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ীর নিকট তিনি কিছুদিন ইংরাজী শিখিয়াছিলেন। তখনও কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপিত হয় নাই।

এইরূপে তিনি যেটুকু বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা লইয়াই যখন রেজেষ্টরি অফিসে তাঁহার এক আত্মীয়ের নিকট নকল-নবিশী কায করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন জেলার অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এই তীক্ষ্ণবুদ্ধিমান মেধাবী বালকটিকে দেখিয়া নিজব্যয়ে ইহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কৃষ্ণনগরে কলেজ স্থাপিত হইবার দুই মাস পরে ১৮৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে, এই মহানুভব ইংরাজ রাজ-পুরুষের কৃপায় উমেশচন্দ্র সেই কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। সুপ্রসিদ্ধ কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন তখন কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। শেক্ষপীয়র-সাহিত্যে তাঁহার যে কিরূপ অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, তাহা শিক্ষিত মাত্রেই জানেন। উমেশচন্দ্রও তাঁহার অযোগ্য ছাত্র ছিলেন না। একবার তাঁহার মুখে শেক্ষপীয়রের আবৃত্তি শুনিয়া রিচার্ডসন সাহেব তাঁহাকে পঞ্চাশের মধ্যে ষাট নম্বর দিয়াছিলেন। বাংলা পড়াইতেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। রামতনু লাহিড়ীর নিকটও কলেজে তিনি কিছুদিন ইংরাজী পড়িয়াছিলেন।

১৮৪৯ সালে বিংশ বৎসর বয়সে উমেশচন্দ্র সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। তখন হিন্দু, হুগলি, কৃষ্ণনগর ও ঢাকা এই চারিটি মাত্র কলেজ ছিল। তাঁহার প্রশ্নোত্তরগুলি শিক্ষা-সমিতির বাৎসরিক রিপোর্টে কিছু কিছু মুদ্রিত আছে। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি দর্শন শাস্ত্রে লাইব্রেরী পরীক্ষা দিলেন। এই পরীক্ষায় বহু গ্রন্থ লাইব্রেরী হইতে বাছাই করিয়া পড়িতে হইত। শতকরা একশত



MANASI PRESS

নম্বর আদায় করিয়া তিনি ইহাতেও প্রথম স্থান অধিকার করিলেন।

পর বৎসর তিনি একশত টাকা বেতনে চট্টগ্রাম স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া সেখানে গমন করিলেন। কয়েক মাস পরেই তিনি কৃষ্ণনগর কলেজেই বদলি হইয়া আসিলেন এবং বেতন দেড়শত টাকা হইল। এখন হইতে তাঁহার খুব শীঘ্র শীঘ্র পদোন্নতি হইতে লাগিল। ১৮৬৬ সালে ঢাকা কলেজের হেড মাষ্টার হইয়া তথায় যান। একবৎসর পরে পুনরায় কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া আসেন। কিছুদিন পরে অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকারের মৃত্যু হইল। উমেশচন্দ্র তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন,—প্রতিদ্বন্দী লালবিহারী দে ও মহেশ ন্যায়রত্ন সে পদ পাইলেন না। এই সময়ে কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল লেথব্রিজ্ (Roper Lethbridge) সাহেব ছয় মাসের ছুটি লইলে উমেশচন্দ্র এই কয়মাস কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কায করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আবার তাঁহার উপর কিছুদিনের জন্য অধ্যক্ষের ভার অর্পিত হইয়াছিল। ১৮৮১ সালে তিনি দুই বৎসরের ছুটি লইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আর কার্য্যভার গ্রহণ করেন নাই। ১৮৮৩ সালে তিনি একেবারে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি জ্ঞানের চর্চ্চাতেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত যখন তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আসে তখন তাঁহাকে তাঁহার মনোমত পুস্তকাদি পড়িয়া শুনাইবার জন্য একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার স্মৃতিশক্তি যে কত প্রখর ছিল, তাহা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত তাঁহার স্মৃতিকথা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে ব্যারিষ্টারপ্রবর মনোমোহন ঘোষ তাঁহার ভ্রাতা বাগ্মীশ্রেষ্ঠ লালমোহন ঘোষ এবং দেশমান্য মতিলাল ঘোষ স্বনামধন্য হইয়াছেন। তাঁহার বিদ্যার গৌরব এত বেশী ছিল যে বঙ্কিমচন্দ্র একবার দীনবন্ধু মিত্রের সহিত তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। রামতনু লাহিড়ীর সহিত তাঁহার বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা ছিল। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে উমেশচন্দ্রের চরিত্রের জন্য দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি আশ্রিতের প্রতিপালক এবং অনেক দুঃস্থ পরিবারের অবলম্বনস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার বন্ধুপ্রীতি যে কিরূপ অসাধারণ ছিল, তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহার স্মৃতিকথা হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাঁহার সতীর্থ ও প্রতিদ্বন্দী অম্বিকাচরণ ঘোষ সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—

"তিনি যে আমার জীবনে কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা আর তোমায় কি বলিব! পরীক্ষার কিছু পূর্ব্বে বসন্ত রোগে তিনি শয্যাপন্ন হইলেন। এখানে তাঁহার আত্মীয় পরিজন ছিল বটে, কিন্তু আমি সমস্ত রাত্রি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতাম। আমার শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়গণ অনেক নিষেধ করিতেন; আমি তাহাতে কর্ণপাত করিতাম না। শেষে তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘরে বন্দী করিয়া রাখিলেন। আমি উন্মত্তের মত সেই ঘরের অপেক্ষাকৃত একটা জীর্ণ অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অম্বিকার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। অম্বিকাচরণকে সেবা করিবার অধিকার হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। কিন্তু তাঁহাকে বাঁচানো গেল না।"

এই অপূর্ব্ব বন্ধুত্বের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল; এমন কি, শিক্ষা-সমিতির সভাপতি বীটন (Drinkwater Bethune) সাহেবেরও ইহা কর্ণগোচর হইয়াছিল। অম্বিকাচরণের স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে সভাপতির আসন হইতে বীটন সাহেব উমেশচন্দ্রকে অজস্র প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'May such examples multiply among us.' মনস্বিতার সহিত হৃদয়-মাধুর্য্যের এরূপ সম্মিলন দুর্ল্লভ।

উমেশচন্দ্রের পুত্রগণের সকলেই সুশিক্ষিত ও কৃতী। জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দত্ত এম্-এ, বি-এল, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক; মধ্যম শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত, পূর্ত্তবিভাগের সুপারভাইজর; কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত এম্-এ, দিল্লী হিন্দু-কলেজের অধ্যাপক।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

অনুযোগ *

আমি চির নিশিদিন অনিমেষ আঁখি
চেয়ে আছি তার পথ ;
জানি না, কখন এ পথে আসিবে
মোর দেবতার রথ !

দিবানিশং নম্বনিমেষলোচন-
শ্চিরায় তদ্বর্ত্ম সমীক্ষ্য সংস্থিতঃ।
কদা পথানেন মমেষ্টদেবতা-
রথঃ সমায়াস্যতি নৈব বেদ্মি তৎ ॥

কাণ পেতে আছি শুনিব কখন
চক্রের ধ্বনি কাণে,
মোর অশ্রু-অন্ধ-নয়নে কবে গো
চাহিব শ্রীমুখ পানে ;

প্রকর্ণয়িষ্যামি কদা নু কর্ণয়ো-
র্যুগেন চক্রধ্বনিমিত্যতঃ শ্রুতৌ।
নিযোজ্য বৃত্তোঽস্মি কদা পুনর্নু তন্-
মুখেন্দুমীক্ষিষ্য উদশ্রুলোচনঃ ॥

ধূলি লুণ্ঠিত কুণ্ঠিত হৃদি
পাতি চরণের তলে,
চিরদিবসের সব নিবেদন
করিব নয়ন-জলে।

কদা নু ধূলীলুঠিতং সুকুণ্ঠিতং
হৃদেতদাপাত্য পদাব্জয়োস্তলে।
চিরস্য সর্ব্বং নিহিতং নিবেদনং
করিষ্য আকাঙ্ক্ষিতনেত্রবারিভিঃ ॥

তাই যুগযুগান্ত যুড়ি দুই পাণি
অশ্রু-সাগর তটে
করি আরাধন, দৈবে যদি গো
দেব-দরশন ঘটে।

তদশ্রুবারাংনিধিকূলমাশ্রিতো
যুগে যুগে যুক্তকরঃ করোম্যহম্।
তদীয়মারাধনমেব কেবলং
নিরীক্ষণং দৈববশাদ্ ভবেদ্যদি ॥

আশা নিরাশায় কেটেছে দিবস
আসে বিভাবরী আজ,
জীবনে আমার নেমেছে সন্ধ্যা
পরনে গেরুয়া সাজ ;

দিনস্তু নীতম্ন নিরাশয়াশয়া
বিভাবরী সম্প্রতি তূপগচ্ছতি।
নিশামুখং গৈরিকসজ্জয়া যুতং
বতীর্ণবন্ মে বত জীবনে যতঃ ॥

এখনও যদি হয়নি সময়
আর কি সময় হবে !
ঘনায়ে আসিল মৃত্যু-লগন
মিলন-লগ্ন কবে ?

নচেদিদানীমপি বীক্ষণক্ষণো
ভবিষ্যতীতোঽপি স কিং সুদুর্লভঃ।
ইদং সমাসীদতি লগ্নমত্যয়ে
কদা নু লগ্নং মিলনস্য সম্ভবি ॥

এত দিবসের এত তপস্যা
ব্যর্থই যদি হয়,
জীবন-শেষের নিমেষেও যদি
নয়নে অশ্রু বয় ;

ইয়দ্দিনানামিয়তী তপঃক্রিয়া
মদীয়ভাগ্যে বিফলৈব চেদ্ভবেৎ ॥
বহেত চেদশ্রুচয়ো নু নেত্রয়ো-
রিহাপি জীবান্ত্যনিমেষকে পুনঃ ॥

চির দিবসের দেবতা আমার,
জীবন-বন্ধু মোর—
এমন করিয়া জীবন ভরিয়া
কে চাবে করুণা তোর ?

তদামদারাধ্য চিরাধিদেবতে
মদীয় জীবৈকবিশিষ্টবান্ধবে।
ক ইত্থমাজীবনশেষমুৎসহন্
কৃপাং ত্বদীয়াং পরমর্থয়িষ্যতে।

শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্তরত্ন।

* মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর বিরচিত এই "অনুযোগ" কবিতাটি সন ১৩২১ সালের পৌষ সংখ্যা "মানসী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি সেই কবিতাটির একটি সংস্কৃত অনুবাদ করিয়া "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে প্রকাশার্থ পাঠাইলাম।—শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মা।

আমার সেতার শিক্ষা

সে আজ অনেক দিনের কথা। দিন চলিয়া যায়, কিন্তু গোধূলির সুবর্ণচ্ছটা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দিনান্তের আকাশ আলো করিয়া থাকে। আমারও মনে সে দিনের স্মৃতি এখনও স্নিগ্ধ তরল মধুরতায় কমনীয় হইয়া রহিয়াছে।

তখন আমি বি এ পড়ি। পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটে পণ্ডিত তারাকুমারের বাড়ীর পশ্চাতে আমাদের মেস্ ছিল। সম্মুখের অংশে পণ্ডিত মহাশয় নিজে থাকিতেন, পিছন দিকের অংশ ভাড়া দিয়াছিলেন। গলি দিয়া প্রবেশ করিতে হইত। মেসের বাড়ী প্রায়ই যেমন হয়—একটু আলো, একটু আঁধার, একটু থট্‌খটে, একটু সেঁত-সেঁতে—সেই রকমের বাড়ী। আমরা দ্বিতলে থাকিতাম। "আমাদের" একটু পরিচয় দিয়া রাখি। নেপাল বাবু ব্রাহ্ম, চস্‌মা-মণ্ডিত, সদা প্রফুল্ল স্কুল-মাষ্টার। কুঞ্জ বাবু ব্রাহ্মভাবাপন্ন, উদার ব্যয়শীল ছাত্র। তিনি আমাদের উপরে পড়িতেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁহার পাঠের বিঘ্ন ঘটায় তখনও তিনি বি-এর চেষ্টা দেখিতেছিলেন। আমরা সকলেই তাঁহাকে মুরুব্বির মত মান্য করিতাম। মেসের ব্যবস্থা, ম্যানেজারি প্রভৃতির ভার তাঁহারই স্কন্ধে পড়িত। 'নারাণ' বেচারী মারা গিয়াছে, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিব না। নারাণ শেষে বরিশালে এবং কলিকাতার কলেজে অধ্যাপকতা করিয়াছিল। রাসবিহারী লোক মন্দ ছিলেন না, কিন্তু মেজাজ গরম হইলে রক্ষা থাকিত না। আমার মনে আছে, একদিন নারাণের উপর চটিয়া গিয়া রাসবিহারী যখন তাহাকে শিম্পাঞ্জী (Chimpanzee) "bulky fellow" প্রভৃতি নানাবিধ মৌলিকতাপূর্ণ সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া তুলিলেন, তখন মেসের ছেলেরা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মহেন্দ্র একটু বেশী রকমের ভাল মানুষ ছিল, সেইজন্য, যেমন হয়, অন্য ছেলেরা তাহাকে লইয়া মাঝে মাঝে একটু রহস্য করিতে ছাড়িত না। মহেন্দ্র যে তাহাতে মনে মনে খুব সন্তুষ্ট হইত না, সে কথা বলাই বাহুল্য। হেম অতি শান্ত শিষ্ট ধরণের ছেলে ছিল, কিন্তু বুদ্ধির কিঞ্চিৎ প্রাখর্য্য থাকায়, তাহাকে নিরীহ ভাল মানুষ বলিয়া কেহ উপেক্ষা করিতে পারিত না। হেম পরে বিলাতে গিয়া কৌঁসুলী হইয়া আসিয়াছে। যতি মেসে থাকিত বটে, কিন্তু পদ্মপত্রের জলের মত নির্লিপ্ত-ভাবে থাকিত। মেসের জীবনের সহিত সে যে ঘনিষ্ঠ-ভাবে মিশিতে পারিত, তাহা আমার মোটেই বোধ হইত না। যতির কণ্ঠস্বর এখন যেমন আছে, তাহা অপেক্ষাও মিষ্ট ছিল। "মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে" আরও অপূর্ব্ব মধুরতায় আমাদিগকে মোহিত করিত। তবে কথকতা, পাঁচালী প্রভৃতি তখনও স্ফূর্ত্তিলাভ করে নাই; এ সকল পর জীবনে আমদানী হইয়াছে। অনাদিনাথ ছিলেন আমাদের মধ্যে রসিক ভাবসাগর। তাহার সঙ্গীতের গলা ছিল না; কিন্তু প্রতিভা গুণে সে কালোয়াতী হইতে কথকতা পর্য্যন্ত, কীর্ত্তন হইতে কবির তর্জ্জা পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে আমাদের শুনাইয়া যাইত। ষ্টিফেন সাহেবের লেক্‌চার, হেক্‌টর সাহেবের অঙ্গভঙ্গী আমরা মেসের কক্ষে বসিয়াই উপভোগ করিতে পারিতাম। অনাদিনাথের গান

এস হে পিয়ন সখা ঐ রূপে দেও দেখা
তোমার পায়েতে নাগরার জুতা হে,—
তায় আগাগোড়া কাদামাখা
ঐ রূপে দেও দেখা।
তোমার গলে দোলে চামড়ার ব্যাগ হে,
তায় ঝম্ ঝম্ কেবল বাজে টাকা
ঐ রূপে দেও দেখা।

আমরা কত বর্ষার দিনে মুড়ি মটর ভাজার সঙ্গে উপভোগ করিয়াছি। অনাদিনাথের এই গান সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ের "প্রতিশোধ" গল্পে স্থান পাইয়াছে। ইঁহারই নিকট হইতে যতীন্দ্রনাথ অনেক রস-সঙ্গীত

শিক্ষা করিয়াছিলেন। যতি সে সময়েও অনেক বড় আসরে গান গাহিত। সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক উৎসবে আমরা দুজনে গান গাহিয়াছিলাম—সে আজ প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে। আমি যখন রাজসাহী কলেজে যাই, তখন ছেলেদের মধ্যে কেহ কেহ একথা জানিতেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেজন্য আমাকে রাজসাহী হইতে পাততাড়ি গুটাইয়া চলিয়া আসিতে হয় নাই! ছেলেরা অনেক সময়ে যে ক্ষমা-ঘৃণা করিয়া অধ্যাপকের বেয়াদবী সহিয়া থাকেন, তাহা এই ঘটনা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। মেসে অনেক সময় যতির সঙ্গীতে আমাদের মন পুলকাকুল হইয়া উঠিত; পাশের বাড়ীতে অনেকে আসিয়া সে সঙ্গীতের মোহে দু'ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়া গিয়াছেন এমনও আমরা শুনিয়াছি। যতি গাহিত

কেন আর গাঁথলো মালা, মালা গেঁথনা মালিনী
তোরে হতে হ'বে পাগলিনী
এ মালা তোর জপমালা হবে লো রাই রাজনন্দিনী।

অনাদিনাথ গানের গমক কোথায় কোথায় হইবে, তাহা অতি বাস্তব ভাবে অঙ্গভঙ্গী-সহকারে দেখাইয়া দিত। অনাদিনাথ ত গাহিতে জানিত না কাজেই ভাব ভঙ্গীর দ্বারা বুঝাইয়া দিতে বাধ্য হইত! যতি ও অনাদিনাথের সঙ্গে আমিও সুর মিলাইতাম। জয়দেবের পদাবলী আমার খুব ভাল লাগিত। কিন্তু মুখস্থ করিবার কষ্ট স্বীকার করিতে ইচ্ছা হইত না; সুতরাং বাঙ্গালা পদাবলী রচনা করিয়া লইলাম ঃ—

মঞ্জু কুঞ্জবনে, কুঞ্জ বিনোদনে, অঞ্জনে রঞ্জিত আঁখি
চমকিতে চুম্বন পুলকে আলিঙ্গন মধুমুখে মৃদুহাস মাখি।

যতি আর হেম এক ঘরে থাকিত। আমারও অধিকাংশ সময় সেই ঘরেই কাটিত। আমি সবচেয়ে তাহাদিগকে বেশী ভালবাসিতাম। বাল্যকাল হইতেই আমি তাহাদের সহপাঠী ছিলাম। কলিকাতার একটি স্কুল হইতে ডবল প্রোমোশন লইয়া নড়ালে গিয়া যখন ভর্ত্তি হইলাম, তখন যতির সেই প্রথম সম্ভাষণ "সোণার চান্‌ছেল্" (অর্থাৎ সোণার চাঁদ ছেলে) আজও আমার মনে আছে। তখন মনে মনে ভারি চটিয়া গিয়াছিলাম; তখন কি জানি যে, পর-জীবনে যতি আমার জীবনের এত বড় একটা অংশ ব্যাপিয়া থাকিবে! কলিকাতার মেসে ছেলেরা পড়াশুনা অপেক্ষা আড্ডা দেওয়ার বিদ্যাটা বেশী করিয়া শিখিয়া থাকে। মেসে আসিবার পূর্ব্বে আড্ডা দিবার জন্য সাজ-সজ্জা করিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিতে হয়; আর মেসে এক স্থানেই সব মিলে; সুতরাং আড্ডাটা চট্ করিয়া জমিয়া যায়। আমাদেরও বেশ জমিয়া গিয়াছিল। তবে যতি প্রায়ই বাহিরে বাহিরে থাকিত। আমরা মনে করিতাম যে বোধ হয় সে একটা ভাল বিবাহের সন্ধানে ঘুরিতেছে। (যতি আমার নামে মানহানির মোকদ্দমা করিবে না ত ?) সে পক্ষে যতির নানা সুবিধাও ছিল; যতির চেহারাও সুন্দর, সঙ্গীতে সে মন ভুলাইতে পারিত, চিত্রাঙ্কনে সুপটু। এত গুণ কি পড়িতে পায় ? আমাদের অনুমান মিথ্যা হয় নাই। সে লাকি ডগ্ (বাঙ্গালায় বলিলে পাছে কেহ তিরস্কার মনে করেন!) সত্য সত্যই তাহার গুণের পুরস্কার বা তদপেক্ষাও অনেক বেশী লাভ করিয়াছিল।

মেসের দৈনন্দিন জীবন যেমন কাটে, আমাদেরও জীবন তেমনই কাটিত। আড্ডা, তর্ক, কোলাহলেই আমাদের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত। কিছু কিছু পড়া যে না হইত এমন নহে। যতি পাঠ্যপুস্তক ভিন্ন আর যাবতীয় পুস্তকের গুণগ্রাহী পাঠক ছিল। আমি চেষ্টা করিতাম, পাঠ্য পুস্তকে তাহার প্রবৃত্তি লওয়াইতে; সে তাহার উত্তরে ছবি আঁকিতে বসিত। দেয়ালের গায়ে Trilbyর পা এত সুন্দরভাবে আঁকিয়াছিল, যে সকলেই তাহার সুখ্যাতি করিতেন। যতি চেষ্টা করিত, "সাহিত্যের" জন্য আমাকে প্রবন্ধ লেখাইতে। তাহার কথা আমি রক্ষা করিয়াছিলাম। সে কিন্তু আমার কথা রাখে নাই।

মেসের আহার যেমন হইয়া থাকে, থোড় বড়ি খাড়া, আমাদেরও তাই হইত। আমাদের এক বর্ষীয়সী বামুন ঠাকুরুণ ছিল, সে যাহা মাপিত, তাহাই আমরা

পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার করিতাম। তাহার মাছের ঝোলে বিরল মৎস্যখণ্ড সাঁতার খেলিত। এই মাছের ঝোলও সে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে দিতে কুণ্ঠিত ছিল; বলিত, "বাবা, ডাল যত চাও দিতে পারি, মাছের ঝোল তোমাদের সব দিলে, আর ছেলেদের দিব কি ?" একদিন অনাদিনাথ একলা সমস্ত ডাল খাইয়া ফেলিয়া তাহাকে জব্দ করিয়া দিল। যতি তাহাকে মা বলিয়া ডাকিত। অনাদিনাথের সে পুত্রবধূ ছিল। শ্বশুর ও ছেলেকে সে যথেষ্ট খাতির করিত। আমাদেরও সে যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা করিত। তবে সে সবচেয়ে বেশী ভাল বাসিত—কুঞ্জ বাবুকে। কিছু বকশিশ্ সে যে আদায় করিত না, এমন নহে। কুঞ্জ বাবুকে সে বাছিয়া বাছিয়া মাছ মাংস দিতে ভুলিত না; নেপাল বাবুকে দিত আলু। নেপাল বাবু মাংসের ঝোলে শুধু আলু পাইয়া তাহার প্রতিবাদ করিলে বামুন ঠাক্রুণ অতি স্নেহের স্বরে বলিয়াছিল, "আলু যে তুমি ভালবাস।" আমাদের কাহারও অসুখ হইলে সে ব্রাহ্মণকন্যার উদ্বেগের অবধি থাকিত না। কাহারও টাকা আসিতে বিলম্ব হইলে, সে টাকা দিয়া সাহায্য করিত। একবার আমার পরীক্ষার ফী সংগ্রহ হইয়া উঠিল না। সেবার কলিকাতায় দুরন্ত বর্ষা; রাস্তায় তিন চার দিন পর্য্যন্ত স্রোত বহিয়াছিল। বামুন ঠাকরুণ আমাকে বাড়ী হইতে ফিজের টাকা না আনিয়া দিলে অন্য কোথাও গিয়া টাকা যোগাড় করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। বামুন ঠাকরুণ মারা গিয়াছে, কিন্তু আজিও তাহার কথা মনে হইলে হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়।

শনি রবিবারে মেসের ছেলেদের মধ্যে কেহ কেহ থিয়েটার দেখিতে ছুটিত। সকলেই যে যাইত এমন নহে। কাহারও কাহারও মতে থিয়েটার যাওয়া নীতি-বিরুদ্ধ ছিল। কুঞ্জবাবু, নেপালবাবু, আমি—এই শেষোক্ত-দলের ছিলাম। একদিন সন্ধ্যায় হেম, যতি, মহেন্দ্র, নারা'ণ প্রভৃতি সকলে জুটিয়া থিয়েটারে গেল। আমা-দেরও টানিয়াছিল, কিন্তু আমরা রাজি হইতে পারি নাই, তাই আহারের পর আমরা জন কয়েক মিলিয়া আড্ডা দিতেছিলাম। কিছু দিন পূর্ব্বে যতি একটি সেতার কিনিয়া আনিয়াছিল, আমি সেই সেতারটি লইয়া, সুর বাঁধিয়া বাজাইতে বসিয়া গিয়াছি, আর আমার শ্রোতৃগণ মনোযোগ-পূর্ব্বক তাহা শুনিতেছিলেন। আমি যে ভাল বাজাইতে পারিতাম, তাহা নহে। আমি কখনও কাহারও নিকট শিখি নাই। অপরকে বাজাইতে শুনিয়া, তাহার ছায়া যেটুকু ধরিতে পারিতাম, ততদূরই আমার বিদ্যা।

আমি বাজাইতেছি, এমন সময় রাসবিহারী আসিয়া খবর দিলেন, "নীচে একজন ভদ্রলোক আসিয়া আপনা-দিগকে সেতারসহ ডাকিয়াছেন।" আমরা গর্জ্জিয়া উঠিলাম, "প্রয়োজন হয়, তিনি আমাদের নিকট আসিতে পারেন। পর্ব্বত মহম্মদের নিকট কি হেতু যাইবে ?"

রাসবিহারী বলিলেন, "তাহা নয়, সে ব্যক্তি বাতে পীড়িত। উপরে উঠিয়া আসিতে পরেন না, তাই বলিয়াছেন যে যদি আপনারা অনুগ্রহ করিয়া নীচে যান।"

সকলেই "তা, বটে ; তাই বল" ইত্যাদি অভিমত প্রকাশ করিয়া নীচে চলিলেন। সেতারও লওয়া হইল। আমি কি না ওস্তাদ; সুতরাং সেতারটি কোনও সাগ্রেতের স্কন্ধে বাহিত হইল। নীচে নামিয়া দেখিলা্ম, পণ্ডিত তারাকুমারের বৈঠকখানায় এক ভদ্রলোক তক্ত-পোষের উপর বসিয়া আছেন। তিনি অনেক বিনয় সম্ভাষণে আমাদিগকে তুষ্ট করিলেন এবং বলিলেন, "আপনাদের মধ্যে কে বাজাইতেছিলেন, যদি একবার বাজান !"

আমার সাগ্রেতেরা তৎক্ষণাৎ আমার দিকে সেতার লম্বিত করিয়া দিলেন। আমি কিন্তু বুঝিয়াছিলাম যে আগন্তুক একজন গুণী ব্যক্তি ; আমি বলিলাম, "আপনিই বাজান, আমরা শুনি।"

তিনি বলিলেন, "আমি পরে বাজাইব, আগে আপনাদের একখানা হউক।" আমার প্রতিবাদ ব্যর্থ হইল, বাজাইতে বাধ্য হইলাম। বোধ হয় জয়জয়ন্তী

কি এমনই কিছু একটা বাজাইয়াছিলাম। বাজনা শুনিয়া আগন্তুক বলিলেন, "আমি পথে যাইতে যাইতে সেতার শুনিয়া ভাবিয়াছিলাম যে আপনি বুঝি ভাল বাজাইতে পারেন। তবে আপনি সুর বাঁধিয়াছেন খুব ভাল, আপনার সঙ্গীতের কাণ আছে।" আর কাণ আছে! আমি সাগ্‌রেৎদিগের মাঝখানে ভারি অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম।

তিনি অনেকক্ষণ বাজাইলেন। অতি সুন্দর হাত; সচরাচর সেরূপ সেতার বাজনা শুনা যায় না। তিনি আমাকে বলিলেন, "আপনি যদি সেতার শিখিতে ইচ্ছা করেন; তবে আমার বাড়ীতে এই সেতারটি লইয়া আসিতে পারেন। আপনার যেরূপ সঙ্গীতের taste আছে, তাহাতে ছ' মাসের মধ্যে আপনাকে এমন শিখাইয়া দিব যে আপনি সকলের সমক্ষে বাজাইতে পারিবেন। আমার বাড়ী বেশী দূর নয়, এই গলির মোড়েই সাদা বাড়ী। আপনি কি পড়েন?"

আমি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই আমার একজন বন্ধু বলিলেন, "উনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়েন; ছেলে খুব ভাল।"

তখন সেই ভদ্রলোক বলিলেন, "দেখুন, তবে আমি আপনাকে জিদ্ করিব না। আপনার যদি নিতান্ত ইচ্ছা হয়, আসিতে পারেন।"

তিনি সকলের অজস্র প্রশংসাবাদের মধ্যে বিদায় লইলেন। আমরাও শয়ন করিতে গেলাম। আমার ঘুম হইল না। ছেলেবেলা হইতে সঙ্গীতের প্রতি আমার একান্ত অনুরাগ ছিল। যত বুঝি আর না বুঝি, সঙ্গীতের সম্মোহন প্রভাব জীবনের প্রত্যেক অণুতে অনুভব করিবার শক্তি ভগবান দিয়াছিলেন। আমার বয়স যখন বার বৎসর, তখন আমি গান গাহিতাম, সেতার এসরার বাঁয়া তবলা খোল পাখোয়াজ বাজাইতে পারিতাম। কিন্তু কোনটাই ভাল পারিতাম না। তাহার কারণ আমি কখনও ইহার কিছুই রীতিমত শিখি নাই, শিখিবার সুযোগ হয় নাই। আজ বিধাতা এক অপূর্ব্ব সুযোগ আমার দ্বারে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। বীণাপাণি তাঁহার প্রিয় যন্ত্রটি আমার হস্তে তুলিয়া ধরিয়াছেন, আমি অনায়াসে ছ'মাসের মধ্যে বাজনা শিখিয়া সাধারণে বাজাইতে পারিব, এ আশা আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। আমি সকল শরীরে উৎসাহের এমন অপূর্ব্ব উন্মাদনা অনুভব করিলাম যে, জীবনে তেমন বোধ হয় আর কদাচিৎ ঘটিয়াছে।

ঘুম হইল না। রাত্রি যখন ৩ টা তখন থিয়েটারের যাত্রীরা আসিয়া গলির দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিলেন। তাহার পূর্ব্বেই আমি তাঁহাদের কলরব শুনিতে পাইয়াছিলাম। আমি সমস্ত শরীর কাপড়ে ঢাকিয়া আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া দিতে গেলাম। থিয়েটারওয়ালারা এক একবার সমবেত ভাবে দরজায় আঘাত করিতেছেন, আবার তখনই থিয়েটারের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। কে ভাল নাচিয়াছিল, কে কোন স্থল ভাল অভিনয় করিয়াছিল, কোন্ গানটি সবচেয়ে ভাল হইয়াছিল—তাহাই অভিজ্ঞের মত ব্যক্ত করিতে সকলে ব্যস্ত। আমি সেই অবসরে দরজার খিল খুলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলাম। পরমুহূর্ত্তে ধাক্কা দিতে গিয়া যখন দরজা খুলিয়া গেল, তখন সকলেই, বিস্মিত হইয়া গেলেন। বিস্মিত হইল না কেবল মহেন্দ্র, আর নারাণ। তাহারাই প্রথমে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং আমার পলায়নপর মূর্ত্তি একবার মাত্র চকিতে দেখিতে পাইয়াছিল। তখন অস্তমিতপ্রায় জোৎস্না মলিন হইয়া আসিয়াছিল। আমার থান কাপড় খানিও শুভ্র ছিল। সেই স্তিমিত জোৎস্নায় আপাদমস্তক শুভ্র বসনে মণ্ডিত মূর্ত্তি তাহাদের সম্মুখে যখন মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন তাহাদের বুক যে ধড়াস করিয়া উঠিয়াছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। নারা'ণ মনস্তত্ত্বের ছাত্র ছিল, সে ঘটনাটাকে মায়া বা মতিবিভ্রম বলিয়া প্রথমে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু মহেন্দ্র যখন তার পরদিন সকালে বিষয়টি উত্থাপন করিল, তখন, তাহারও মন কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়াছিল।

আমি দরজা খুলিয়া দিয়া আসিয়াই শুইয়া পড়িলাম। পরদিন বিকালে কলেজ হইতে ফিরিয়া

মহেন্দ্রের ভীতির কথা অবগত হইলাম। মহেন্দ্রের মনের অবস্থা ক্রমশঃই যখন শোচনীয় হইয়া উঠিল, তখন আমি আসল কথা চাপিয়া রাখা আর নিরাপদ মনে করিলাম না। কিন্তু মহেন্দ্র বেচারীকে সকলে গিয়া সে কথা বলিলে, সে ভাল করিয়া যে বিশ্বাস করিল তাহা বলা যায় না।

আমি সারাদিন মন্ত্রমুগ্ধের মত দিনের কাজগুলি সমাপন করিয়া গেলাম। কখন সন্ধ্যা আসিবে, আর আমার জীবনের সাধ পূর্ণ করিতে যাইব, সেই চিন্তাই কেবল আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। সন্ধ্যা সে দিন যেন কিছু বিলম্বে আসিল। আমি সেতার শিক্ষা করিতে চলিলাম। প্রথম দিন বলিয়া সেতারটি সঙ্গে লইলাম না, বিশেষতঃ যতির সম্মতি লওয়া হয় নাই।

গলির মোড়ে সাদা বাড়ী; বাহিরের ঘরেই বৈঠকখানা। সমস্ত মেঝেটায় ফরাস করা। জানালা দিয়া দেখিলাম, ঘরের কোণে কতকগুলি যন্ত্র—সেতার, তানপুরা, এস্রার, বাঁয়া-তবলা রক্ষিত আছে। ফরাসের উপর একস্থানে একব্যক্তি বসিয়া পাখোয়াজের পিছনে ভুম্ ভুম্ করিয়া আঘাত করিতেছে। সম্মুখে একখানা কলাই করা ডিশে একতাল ময়দা রহিয়াছে, তাহা হইতে ময়দা লইয়া সে ব্যক্তি পাখোয়াজের বাঁয়ায় লাগাইতেছে। অনতিদূরে আর একব্যক্তি তানপুরায় 'জোয়ারে' লাগাইতেছে। তানপুরা সম্মুখে রাখিয়া বাম হস্তে সোয়ারির নিম্নে তারের মধ্যে সুতা দিয়া একবার উপরে উঠাইতেছে, একবার নীচে নামাইতেছে, আর তারে ঝঙ্কার দিয়া 'জোয়ারে' সুর বাহির করিতেছে। অপর একজন সেই তানপুরার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সুর ভাঁজিতেছে; তানপুরার সুরবাঁধা পর্য্যন্ত বিলম্ব তাহার সহিতেছে না।

আমি দেখিলাম, সে এক বিপুল আড্ডা। গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতেই এই, এর পর না জানি আরও কত রকম বিরকমের লোক আসিয়া জুটিবে! আমি আর ঘরে ঢুকিলাম না। মন্ত্র চালিতের মত সে স্থান ত্যাগ করিয়া গোলদীঘিতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে একটি নির্জ্জন স্থানে ঘাসের উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। সম্মুখে মৃদু বাতাসে গোলদীঘির বক্ষ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল, আর চতুর্দ্দিকের প্রতিবিম্ব আলোকমালা যেন শত হীরকখণ্ডে ভাঙ্গিয়া ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিতেছিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিলাম। বুঝিলাম বীণাপাণি তাঁহার বীণাটি আমার হস্তে তুলিয়া দিয়া আমার মস্তক হইতে ফাঁকি দিয়া পুস্তকের বোঝাটি নামাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিতেছেন! বস্তুতঃ সে আড্ডায় একবার গেলে বি-এ পাস করা ত দূরের কথা, মাথাটি চর্ব্বিত হইত। সে বিষয়ে যখন আর সন্দেহ রহিল না, তখন সংকল্প স্থির করিয়া উঠিলাম। সেতার শিক্ষার কল্পনা গোলদীঘির জলে ভাসাইয়া দিয়া আসিলাম।

রাত্রি তখন ৯ টা। মেসে ফিরিয়া প্রথমেই হেম যতির ঘরে প্রবেশ করিলাম। তাহাদিগকে সমস্ত বলিয়া মনটা যখন একটু পাতলা হইল তখন আমি আমার নিজের ঘরে গেলাম।

সকালে উঠিয়া দেখি, যতি বাহিরে গি পড়িতেছে। আর, ঘরের মেঝেয় সেই সেত চূর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে।

সেতারটির জন্য বড় দুঃখ হইল। ছোট ছিল, কিন্তু অতটুকু সেতারে অমন মিষ্ট সুর প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। পাছে ঐ সেতারের জন্য আবার আমি প্রলোভনে পড়ি, এই জন্যই যে যতি আমার জীবনপথ হইতে সেতারটিকে দূর করিয়া দিয়াছিল, তাহা আমার বুঝিতে বাকী রহিল না। সেতারই যদি গেল, তবে আর শিখিব কি? আমার আর সেতার শেখা হইল না।

মহেন্দ্রের মন হইতেও ভূতের ভয়ও গেল না।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

শ্রাবণে

গগন-ধারায় তিতিল ধরণী,
নয়ন ধারায়, বুক ;
তোমার চিত্ত, হা নিঠুর ! তবু
ভিজিল না এতটুক্ ?
নব বরষার চুম্বন-রসে
কেতকী ফুটিয়া উঠিল হরষে
নীপ-নিকুঞ্জ পুলকে শিহরে
কাঞ্চন-আভা ধরি' ;
আমারি প্রাবৃট্ কাটিবে কি, স্বামি,
স্মৃতি শুধু ধ্যান করি' ?

শিখী-শিখিনীর কি রভস আজি !
দাদুরী মুখরা সুখে ;
চাতক-চাতকী খেলে লুকোচুরি
কাজল-মেঘের বুকে ;
ভরি প্রকৃতির সকল অঙ্গ
উছলিয়া চলে প্রেমতরঙ্গ—
আমারি পরাণ জ্বলিতেছে শুধু,
হে সখা ! দিবস যামি ;
বিশ্ব-ভুবনে মিলনোৎসব—
বঞ্চিত শুধু আমি।

প্রতিধ্বনিত নূপুর তোমার
ঝিল্লীর ঝঙ্কারে ;
বিজুরী-জড়িত ঘননীল মেঘ-
মালা তব অনুকারে ;
তোমার চরণ-পরশ লাগিয়া
নবীন শষ্প উঠেছে জাগিয়া ;
আভাষ তোমার ফুটে চারিদিকে—
তুমি আসিলে না তবু !
সারা ভুবনের এত আয়োজন
ব্যর্থ কি হবে প্রভু ?

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

শিরোমণির তীর্থযাত্র

(নক্সা)

কলিকাতা।

ধন্য সহর কলিকাতা ! দেশ হাজুক পচুক জগৎ জ্বলিয়া যাক, কলিকাতার চাল বিগড়ায় না। কোথাও রৌদ্র-দীপ্ত আকাশের উপর চক্ষু রাখিয়া কৃষক হাল ছাড়িয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে, কোথাও নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া বন্যার জল নেত্র-সুখকর ধান্যক্ষেত্র ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, কোথাও ভূমিকম্পে পাহাড় ভাঙ্গিয়া হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে, কোথাও ম্যালেরিয়ার কম্প গ্রামকে গ্রাম শ্মশান করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু কলিকাতার চাল বিগড়ায় নাই—কলিকাতা যেমন চলে তেমনি চলিয়াছে। কোথাও কামানের কালানল কোটী কোটী মুদ্রা ধূমের ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া লক্ষ লক্ষ বীরকে বৈতরণী তীরে প্রেরণ করিতেছে, কোথাও কীর্ত্তি-মন্দির-মালা শোভিত সুন্দরী নগরী অধিবাসিগণের সহিত সহমরণের অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, পুত্রের বক্ষোদ্দারিত রক্তে পিতা, অগ্রজের রক্তে অনুজ, স্নান করিতেছে, সাগরতরঙ্গ ইতস্ততঃ ভাসমান শবের শিরে ফেণার সিতজিত-হার পরাইতেছে, স্বর্গচ্যুত আত্মার ন্যায় বিমান হইতে মৃতদেহ মৃত্তিকায় পতিত হইতেছে ; আর কলিকাতা সংবাদপত্র পাঠ করিতেছে, সমালোচনা করিতেছে, চাঁদা দিতেছে ও আপনার চালে আপনি চলিতেছে। কোথাও গৃহস্থ পলায়িত, ভিক্ষাকপাল করে লক্ষ্মীহারা কুললক্ষ্মী পথে পতিতা ; যাহারা ভিক্ষা দিত তাহারাই ভিখারী, ভিখারী আর কাহার দ্বারে যাইবে ? মাতার স্তন টানিয়া ক্ষীর নীর রুধির কিছুই না পাইয়া হৃদয়-শায়ী শিশু শীতলতা প্রাপ্ত হইতেছে, ক্ষুধার্ত্ত অপত্যের আর্ত্তনাদে লুপ্ত-জ্ঞান পিতা তিন্তিলী বৃক্ষের শাখায় উদ্বন্ধনে লম্বমান—কিন্তু কলিকাতার কোঁচা যেমন লম্বমান তেমনি লম্বমান ! কলিকাতার বৈঠকে বিহার, ফটকে অনাহার, দোতলায় মদের রল্লা, দরজায় কাঙ্গালীর হল্লা। কলিকাতার এক বাড়ীতে মড়া-কান্না ওঠে, পাশের বাড়ীতে

"এখনি মর্ এখনি মর্ যমের বাড়ী যা" গালাগালির ফোয়ারা ছোটে। কলিকাতার রাস্তায় বরযাত্রার ঢোল আর গঙ্গাযাত্রার খোল পাশাপাশি বাজিতে থাকে। কলিকাতায় ক্রেতা অপেক্ষা বিক্রেতা বেশী, নগদ অপেক্ষা কর্জ্জ বেশী, আয় অপেক্ষা দায় বেশী, আসল অপেক্ষা স্বপ্ন বেশী। "এখন তো পেট চলুক মান বাঁচুক, এর পর যা হয় তা হবে" এই বীজমন্ত্র জপিয়া জীবন জাগাইয়া রাখিতে মায়াময়ী কলিকাতা-সুন্দরী তাঁহার সন্তানগণকে সতত শিক্ষা দেন। "পরে যাহা হইবার" তাহাও হয়; কলিকাতায় তাগাদা আছে, আদালত আছে, দেওয়ানী ফৌজদারী জেলও আছে, আর আছে চাঁদার খাতা, দাতব্য-সভা, আফিঙের দোকান।

সেই কলিকাতা আবার পূজার সাজে সাজিয়াছে। অবশ্য পূর্ব্বে পূজার বাজারে কলিকাতায় যে ভিড় হইত এখন আর ততটা হয় না; তখন একজন লোক পূজার বাজার করিতে আসিলে তাহার সঙ্গে চারি-জন লোক কলিকাতা দেখিতে আসিত। রেলের কল্যাণে সুদূর মফঃস্বলের নিভৃত-গ্রাম-বাসিনী কুলবধূরও এখন কলিকাতা দেখার সাধ মিটিয়া গিয়াছে। বাজার এখন কতকটা ভি-পিতে হয়, আবার অনেক দ্রব্য সামগ্রী এখন মফঃস্বলেও পাওয়া যায়। তথাপি কলিকাতার মোহিনী শক্তি এখনও দূরদূরান্তর হইতে লোক আকর্ষণ করে। চাঁদনীর চক, বড় বাজারের চক, বেণ্টিক ষ্ট্রীট জুতা চক্‌চকাইয়া, জোড়াসাঁকোর বডিশ্ বুক ফুলাইয়া এখনও কলিকাতায় লোক টানিয়া আনে। যাঁহারা ভাল করিয়া বাজার করিবেন তাঁহারা কলিকাতায় আসেন, বাজার করার সঙ্গে যাঁহাদের একটু মজা মারিবার ইচ্ছা আছে তাঁহারাও কলিকাতায় আসেন; যাঁহারা ঠকিবেন তাঁহারা কলিকাতায় আসেন, যাঁহারা ঠকাইবেন তাঁহারাও কলিকাতায় আসেন; যাঁহারা গাঁট খুলিয়া পয়সা খরচ করিবেন তাঁহারা কলিকাতায় আসেন, যাঁহারা গাঁট কাটিয়া দুপয়সা সঞ্চয় করিয়া ঘরে ফিরিবেন তাঁহারাও কলিকাতায় আসেন।

স্কুল কলেজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, মফঃস্বলের ছাত্রেরা ঘাড় ছাঁটিয়া, চশমা আঁটিয়া, ডসন্ পায়, ফ্যাসান গায়, অঙ্গে বকুলগন্ধ, প্রাণে আকুল আনন্দ—যে যার দেশের দিকে চলিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়েরা মাথাঘসা কিনিয়া-ছেন, মাষ্টার মহাশয়েরা সাবান লইয়াছেন, অধ্যাপক মহাশয়দের পকেট যৎকিঞ্চিৎ ভারি—তাঁহারা জাঁকোড়ে জ্যাকেট লইয়া যে যার দেশে চলিয়াছেন। 'হোম রুলে'র তাড়ায় কেরাণীকুল আকুল, নগদ খদ্দেরের ভিড় ভাঙার অবসর প্রতীক্ষায় কাপড়ের দোকানে বসিয়া আছেন; দোকানদারের কৃপা-প্রত্যাশায় তার্কিক ক্রেতাকে বুঝা-ইতেছেন যে "শম্ভুবাবুর দোকানে মশায় এক কথা, দর দস্তর নাই", আর মধ্যে মধ্যে কাটা-ছাঁটা ফর্দ্দখানি এক একবার পড়িতেছেন; ইঁহারা তিন টাকার শাড়ী ধারে পাঁচ টাকায় লইবেন।

চির-জনতা-প্রবাহপূর্ণ কলিকাতায় এ কয়দিন যেন ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডাকিয়াছে। মোটর রথের ভেঁপু বাজাইতেছে; ট্রাম নীলামের ঘণ্টা আর ছক্কর আপনার সর্ব্বাঙ্গ বাজাইতেছে। ফেরিওলা-দলের উদারা মুদারা তারা ত্রিবিধ গ্রাম নিঃসৃত নাদে নগরী উন্মাদিনী হইয়া উঠিয়াছে। তার উপর মুদ্রিত বিজ্ঞাপন; ফুটপাতে বিজ্ঞাপনের গড়াগ
বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি, আর বেগে :
বিজ্ঞাপন ঝুড়িঝুড়ি। সখের পোষাকের
অলঙ্কারের বিজ্ঞাপন, সখের সাবানের,
সখের তৈলের বিজ্ঞাপন, আর সঙ্গে স... ... ...
রকম সখের অসুখের ঔষধেরও বিজ্ঞাপন। কেহ বিজ্ঞাপনে তামাক মুড়িয়াছেন, কেহ চুড়ি জড়াইয়াছেন, কেহ শাঁখা ঢাকিয়াছেন; কেহ ট্রামের বেঞ্চির ধূলা বিজ্ঞাপন বুলাইয়া পরিস্কার করিতেছেন, কেহবা বিজ্ঞাপন গুলি পরিস্কার করিয়া মুড়িয়া পকেটে পুরিতেছেন—বাড়ী গিয়া বড় বউকে দিবেন, তিনি স্বরস্বতী জ্বালাইয়া লক্ষ্মীর উনান ধরাইবেন।

রঙ-বেরঙে ছাপা প্লাকার্ডে অঙ্গ আবৃত করিয়া কলিকাতার দেওয়াল গুলি আনন্দময়ীর আগমনে নব-বসন পরিধানের সাধ মিটাইয়া লইতেছে।

কোক্ কয়লার প্ল্যাকার্ড, কেমিক্যাল গয়নার প্ল্যাকার্ড, অশ্বগন্ধার প্ল্যাকার্ড, অশ্বত্ব প্রাপ্তির প্ল্যাকার্ড, হুই-স্কির প্ল্যাকার্ড, জ্যাকেটের, বুকেটের, কোকেটের, এইরূপ পকেট-মারা আরও কত প্ল্যাকার্ড, সব খুলিয়া প্রকাশ করিতে গেলে দমবন্ধ হইয়া যায়, কমায় আর কুলায় না। একটা লোক প্ল্যাকার্ড মারিয়া গেল, অমনি আর একটা লোক পাছু পাছু আসিয়া সেই প্ল্যাকার্ড চাপা দিয়া বা অর্দ্ধ চাপা দিয়া আর এক প্ল্যাকার্ড মারিল; তাহার উপর আবার আর এক জালিকের আর এক প্ল্যাকার্ড। এইরূপে প্ল্যাকর্ডগুলি অদ্ভুত-পাঠ পদার্থে পরিণত হইল যথা ;—

আশ্চর্য্য! অদ্ভুত! কিম্ভূত!!!

যাহা ভদ্রগণ কখন ভাবেন নাই তাহাই হইল

কুরুক্ষেত্র আয়োজন!

একরাত্রে ৮ খানি দৃশ্যকাব্য

নাটকের বৃষোৎসর্গ! অভিনয়ের

দানসাগর শ্রাদ্ধ!

সাধারণের প্রিয়া বাঁশ-নিমি গায়িকা

পাপিয়াকণ্ঠে রঙ্গভূমি

কাঁপাইবেন!!

নদোহন থিয়েটার

অষ্টমীর সন্ধিপূজার পর আরম্ভ

নবমীর বলিদানে শেষ!

একেশ্বর নাট্যসম্রাট কবিকুলগজেন্দ্র

শ্রীযুক্ত প্যালারাম ধর তর্কভুষণ প্রণীত

বীররসোদগারী

পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক

সীলেট চূণ

* * * *

* * * *

কিলবরণ কোম্পানিকে পত্র লিখুন।

আর একখানি যথা ;—

আর মরিবার ভয় নাই। আমাদের

নব আবিস্কৃত মহৌষধি। নিউজি-

ল্যাণ্ড নিবাসী জনৈক

ব্রহ্মচারী প্রদত্ত।

ম্যালেরিয়া, প্লেগ, কলেরা, হিষ্টিরিয়া

এক শিশিতেই সব শেষ!

প্রাতে সেব্য

১। নন্দবিদায়

তৎপরে

২। বেজায় রগড়।

* * * *

* * * *

* * * *

ভিন্ন সহরের উভয় বিভাগের সকল রাস্তায় বৈকাল ৪টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত বাজনা বাজাইয়া যাইতে পারিবে। ইহার পরে কেহ বাজাইলে * * *

নবগ্রহের তুষ্টির জন্য ষোড়শোপচারে পুজা দিতে ও রুষ্ট গ্রহের শান্তির জন্য কবচ ধারণ করিতে হইবে।

শ্রীমল্লহরি ধূমকেতু জ্যোতিষী।

Traffic Manager

Howrah—Amta Light Railway.

মিঠাইওয়ালা ঘিয়ের কড়া চড়াইয়াছে; নাকে কাপড় চাপিয়া ধরিয়া খরিদ্দার লুচি, কচুরি, গজা, পান্তুয়া কিনিতেছে; পূজার বাজারে ছানা ধাড়ীর দামে দাঁড়ীতে চড়ে সুতরাং ময়রারা ডালবাটা ও সফেদা মিশাইয়া একরকম নূতন রসগোল্লার পাক চড়াইয়াছে, আর বাটা চিনির ঠাসায় যৎকিঞ্চিৎ তৈলগন্ধ নারিকেল মিশাইয়া মোটা মোটা ছাপা প্রস্তুত করিতেছে। ক্রেতারা হাঁপাইয়া পড়িয়া সেরকরা পাঁচসিকা, দেড়টাকা দাম দিয়া ঐ

ছাপা খরিদ করিতেছেন। এ সন্দেশ তাঁহার বাড়ীর ছেলেরা খাইতে পারিবে না, যে কুটুম্বদের বাড়ী তত্ত্ব পাঠাইবেন তাঁহাদের কেহই উহা মুখে দিতে পারিবে না, যে ভৃত্য তত্ত্ব বহন করিয়া লইয়া যাইবে, সে জল খাইতে যে সন্দেশখানি পাইবে, তাহা ফিরিবার পথে প্রথম যে ভিখারীকে দেখিবে তাহারই ঝুলিতে ফেলিয়া দিবে; তবু সন্দেশ কিনিতেই হইবে, না কিনিলে মান থাকে না। পৃথিবীর মধ্যে এক বঙ্গদেশেই সন্দেশের সূতিকাগার। বাঙালী সন্দেশ প্রস্তুত করিতে জানে বাঙালী সন্দেশ খাইতে জানে, কিন্তু তত্ত্ব সকল দেশেই আছে, সর্ব্বত্রই মিষ্টান্ন প্রেরণের ব্যবস্থা আছে। বাঙলায় সন্দেশ না কিনিলে লোক খাওয়ান হয় না, লৌকিকতা হয় না, লোকমুখে বাহবা উঠে না! আমার মনে হয় কলিকাতা ইউনিভারসিটী যদি একজন সন্দেশ প্রস্তুতের লেক্‌চারার নিযুক্ত করেন তাহা হইলে কতকগুলি গ্র্যাজুয়েট বেচারা স্বল্প মূলধনে চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে স্বচ্ছন্দে সংসার চালাইয়া তেতালা কোঠা তুলিতে পারেন। বঙ্গভাষায় লেক্‌চারাদির পদটা তুলিয়া দিয়া অবাক সন্দেশ কস্তুরো আদির লেক্‌চারার নিযুক্ত করিলে হয় না? বঙ্গভাষায় পাণ্ডিত্য তো আপনা আপনিই জন্মে; যাঁহারা বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণী অতিক্রম করেন নাই, তাঁহারাই তো বাঙলার অধিক পুস্তক প্রবন্ধ কবিতা লেখেন এবং যাঁহারা বই ঘাঁটিয়া মরিয়াছেন তাঁহাদের দিকে নাক সিঁটকাইয়া বলেন আমরা জিনিয়স্।

ভিড়ের মেলা। ফুটপাতে ভিড়, পথে ভিড়, রথে ভিড়, গাড়ীর আড্ডায় ভিড়। পাহারাওলারা অনন্যমন হইয়া টার্মিন্যাল্ ট্যাক্স আদায় করিতেছেন; গাড়ীর ভাড়া জুটিলেই গাড়ওয়ানকে পাহারাওলা সাহেবের হস্তে দুইটী পয়সা দিতে হয়, সে পয়সা অবশ্য গাড়ীওয়ালা তাহার চাচার নিকট হইতে আনিয়া দেয় না। ভাড়া গাড়ীর এই টার্মিন্যাল ট্যাক্স বহুকাল হইতে নগরে নগরে আদায় হইয়া আসিতেছে, আর অবনতমস্তকে আমরাও তাহা প্রদান করিয়া আসিতেছি। কিন্তু কলিকাতা নগর-সংস্কার উদ্দেশে যখন রেলওয়ে যাত্রীদের উপর টার্মিন্যাল ট্যাক্স ধার্য্য হয় তখন অনেক বাবু কাগজে গজ্ গজ্ করিয়াছিলেন।

ছক্করে চড়িয়া বড়িশের দোকানে বাবু নামিলেন, চীনেম্যানের দরজায় ছেলের পল্টন লইয়া বাবা নামিলেন, আর আধা-মোদা গাড়ী চড়িয়া ছুটিলেন বিবি, বেবি ও বুবি। জুতার দোকানে ছেলেদের লইয়া বাবা কাকা ও মামারা মহাগণ্ডগোলে পড়িয়াছেন। কোন ছেলের জুতা পছন্দ হইতেছে না, কোন ছেলের জুতা পছন্দ হইয়াছে কিন্তু পাঁচ টাকা মাত্র মূল্য শুনিয়া বাবাজী নাক সিট্‌কাইতেছেন, কেহ বা চ্যাটা-বোনা শুঁড় ঘুরোনো দশ টাকা দামের জুতা কিনিতে না পাইয়া বাবার পানে চাহিয়া ঠোঁট ফুলাইতেছে,—বাবার মাসিক বেতন পঁয়তাল্লিশ টাকা, ছেলে মেয়ে গণনায় সাড়ে চারিটী। হায়রে, মনে পড়ে সেদিন, যেদিন আমরা মেছোবাজারের জরীর জুতার পরিবর্ত্তে চীনের বাড়ীর দুই টাকা দামের জুতা প্রথমে পূজার পার্ব্বণীরূপে পাইয়াছিলাম। কতবার সেই আর্‌শী সদৃশ বার্ণিসে স্বীয় সহাস্য অধর প্রতিফলিত দেখিয়াছি। সেই প্রজাপতি-প্রকৃতি ভ্রমর-কৃষ্ণ ফিতার প' হইয়া চাহিয়া থাকিয়াছি, আর বার্ণিশ অপেক্ষা, জুতা অপেক্ষা, জুতার এ-পিঠ ‹ বহু বহু বহু মূল্যবান সেই ভিতর-পিঠ— সাহেবের নাম ছাপা টিকিট খানি মারা সম্রাটের কিরীটের অপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল, অধিক-তর প্রলোভনীয় সমধিক অর্থ সার্থক-কর আমার সেই চির আদরের টিকিট! শিয়রে কোঁচান শান্তিপুরের ধুতি চাদরখানি আর লাল মেরিণোর চীনে কোটটী রাখিয়া সেই টিকিট মারা জুতোজোড়াটী বুকে চাপিয়া সপ্তমীর প্রত্যূষ প্রত্যাশায় কি সুখের কষ্টেই ষষ্ঠীর রাত্রি কাটাইয়াছি, কতক্ষণে নবপত্রিকা স্নানের প্রথম মঙ্গল-বাদ্য বাজিয়া উঠিবে, কতক্ষণে আমি কলা-বউ দেখিয়া আর জুতা কাপড় কোট দেখাইয়া আমার বুকভরা আহ্লাদের মোট দশজনকে বাঁটিয়া দিব! সলমা

চুমকি শোভিত মখমল-মণ্ডিত অঙ্গে সিল্কের জুতায় বিচিত্র রঙে এখনকার বৎসগণের বক্ষ আর কি তেমন আনন্দের নর্ত্তনে স্পন্দিত হয়? জানি না—লোলচর্ম্ম লইয়া শিশুহৃদয়ের মর্ম্ম কি বুঝিব? তবে অনেক বালকের পরিচ্ছদের ঝলকে ভ্রূতে অহঙ্কারের টঙ্কার দেখিয়াছি; অধরে হাস্যের অলঙ্কার দুর্লভ দানের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

শ্যাম-সপ্তক

জয় নন্দ-নয়ন-চিরানন্দ!
চঞ্চল শিখিচূড়া, কুঞ্চিত কেশপাশ,
লম্বিত কটিতট-চুম্বিত পীতবাস,
সুন্দর ভাল-তল মণ্ডন-ঝলমল,
চন্দন-আলেপন-গন্ধ;
জয় নন্দ-নয়ন-চিরানন্দ!

গুঞ্জন-নিনাদিত কুঞ্জ-কানন-ছায়
বঙ্কিম বেণুরব-ঝঙ্কার মূরছায়,
রঙ্গিল নীলাকাশে অঙ্গ-লাবণি ভাসে,
নন্দিত রুণুঝুণু ছন্দ;
নন্দ-নয়ন-চিরানন্দ!

ঝু-দোদুল-দোলে হিন্দোল-নীলোপর
কম্পিত নীলদেহ অঙ্কিত মনোহর,
নর্ম্ম-মিলন-গীত মর্ম্মর-মুখরিত
ইন্দু ধবল রাতে মন্দ;
জয় নন্দ-নয়ন-চিরানন্দ!

মন্থন-ননী আজো লুণ্ঠিত অনিবার,
সন্তান স্নেহ-গলা অন্তর রাধিকার,
চঞ্চলচিতে অতি বঞ্চে মথুরাপতি,
নন্দ যশোদা কেঁদে অন্ধ;
জয় নন্দ-নয়ন-চিরানন্দ!

সঙ্গীত-মুখরিত রঙ্গে যমুনাজল,
বিম্বিত বরতনু চুম্বন-ঢলঢল,
কুঞ্জে গোপিকাসাথে মঞ্জুল মধুরাতে
সুন্দর বাহুপাশবন্ধ;
জয় নন্দ-নয়ন-চিরানন্দ!

লুণ্ঠিত ধূলিতলে কণ্ঠ মুকুতাহার,
সিঞ্চিত আঁখিজলে অঞ্চল রাধিকার,
শঙ্কিত দ্বারভাগে কম্পিত পদে জাগে
মন্দ নূপুর-রব-ছন্দ;
জয় নন্দ-নয়ন-চিরানন্দ!

অন্তবিহীন লীলা অন্তরে নিশিদিন,
সুন্দর দেহ হৃদি-মন্দির চির-লীন,
মঞ্জু মরমবনে মঞ্জীর-জাগরণে
মন্দার-মনোহর গন্ধ;
জয় নন্দ নয়ন-চিরানন্দ!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।



ফিজি দ্বীপে কদলীবন

পুরাতন-প্রসঙ্গ

(নূতন কল্প)

(৪)

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩

অমৃত বাবু বলিলেন—"বিশ্বকোষ অভিধানে 'রঙ্গালয়' শীর্ষক প্রবন্ধে একটু আধটু ভুল রহিয়া গিয়াছে। প্রথম দেখুন—রেবতীর ভূমিকা লইয়াছিলেন তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি মান্না নহে। তিনকড়ি মুখুয্যেকে আমরা 'ঠাকুর্দ্দা' বলিয়া ডাকিতাম, যদিও তাঁহার বয়স বেশী ছিল না। আবার দেখুন, গিরীশ বাবুর গানে আছে—'কলঙ্কিত শশী হরষে, অমৃত বরষে'; এস্থলে বিশ্বকোষের লেখক টীকা করিয়াছেন—'অমৃত বরষে—অমৃতলাল পাল একজন অভিভাবক।' অথচ সকলেই জানিতেন যে ঐ 'অমৃত' সৈরিন্ধ্রীবেশী অমৃতলাল বসু। সৈরিন্ধ্রীর অশ্রুবর্ষণের উল্লেখ করিয়া 'অমৃত বরষে' লেখা হইয়াছে। আর অমৃতলাল পাল কোনও কালে 'অভিভাবক' অথবা থিয়েটরের ভাবুকও ছিলেন না। এই রকম ছোটখাট অনেক ভুল উক্ত প্রবন্ধে আছে। পুনশ্চ দেখুন, লেখক একস্থলে বলিতেছেন,—নবীনমাধবের মৃত্যুশয্যার দৃশ্যে সৈরিন্ধ্রীকে যে 'মড়াকান্না' কাঁদিতে হইত, অমৃতবাবু সহজে তাহা আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শেষে অমৃতবাবু নিজ বাড়ীর পার্শ্বস্থ একটা খালী ভাঙ্গা-বাড়ীতে প্রত্যহ দুপ্রহর বেলায় গিয়া এই ক্রন্দন শিখিবার জন্য সাধনা করিতেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু সেখানে গিয়া কাঁদিতে শিখাইতেন, উভয়ে গলা মিলাইয়া কান্না অভ্যাস করিতেন। আট দশ দিন এইরূপ কঠোর সাধনায় অমৃতবাবু মড়াকান্না আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যহ এই সাধনার বিষয় পল্লীস্থ স্ত্রীলোকেরা জানিত না, কাজেই রটিয়া গেল যে 'ভাঙ্গা বাড়ীতে ভূতে রোজ কাঁদে।'—এই বর্ণনায় কিছু গলদ্ আছে। ব্যাপারটা এই :—আমি ত সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা গ্রহণ করিলাম। প্রথমে নিজে নিজেই আমার পার্টটা আয়ত্ত: করিবার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করি নাই। এক



মাইকেল মধুসূদন দত্ত

দিন অর্দ্ধেন্দু বাবু বলিলেন, 'তোমার পার্টটা কেমন হ'ল দেখি ?' তিনি আমার পরীক্ষা লইয়া বলিলেন—'না, হয় নি।' এই বলিয়া সৈরিন্ধ্রীর প্রথম দৃশ্যে চুলের দড়ি বিনানর সময় কথার ভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত, তাহা তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। আমার মেয়েলিপনা ঠিক হইল না। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমি ভাবিলাম, বক্তৃতার ধরণটা ঠিক করিয়া লইতে বেশী দেরি হইবে না; আসল ব্যাপারটা হইতেছে ঐ কান্না। ঐটাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। এই মনে করিয়া আমি আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী কালিদাস সান্যাল মহাশয়ের নিকটে কান্না শিখিতে গেলাম। তাঁর সেকেলে ধরণের কান্না; সুরটাই মেয়েলি, কিন্তু আমার মনে হইল যেন emotion এর অভাব। আমার ঠিক উহা ভাল লাগিল না। আমি একাই চেষ্টা করিয়া দেখিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রত্যহ ঐ পোড়ো-বাড়ীতে দ্বিপ্রহরে আমি মড়াকান্না অভ্যাস করিতাম। একাকী করিতাম; অর্দ্ধেন্দ বা অন্য কেহ আমার দোসর ছিলেন না। কয়েক আমি অর্দ্ধেন্দকে বলিলাম, 'একবার আমার জায়গাটা শোনো দেখি।' মড়াকান্নার অভিনয় তিনি সানন্দে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—াচ্ছা! বেশ হয়েছে।' আমার নাট্যজীবনে অর্দ্ধেন্দু প্রথম গুরু বটে; কিন্তু এই কান্না সাধনায় আমি গুরুকে লুকাইয়া স্বয়ং সিদ্ধিলাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার নাট্যগুরু অর্দ্ধেন্দুশেখরের আশীর্ব্বাদে সফলপ্রযত্ন হইলাম। তাঁহার নিকটে আমি যে কত ঋণী তাহা স্বীকার করিতে আমি কখনও সঙ্কোচ বোধ করি নাই। সঙ্কোচ বোধ করাটাই অত্যন্ত লজ্জাকর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে ভুল ধারণা দাঁড়াইয়া যাইবে ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। তিনি বাস্তবিক যাহা করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি থাকিয়া যাইবে। আমার সঙ্গে সেই পোড়ো বাড়ীতে গলা সাধেন নাই বলিয়া তাঁহার কৃতিত্বের কিছুমাত্র খর্ব্বতা হইবে না।

"নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথের কথা বলিতেছিলাম। কাশীতে অবস্থানকালে আমি তাঁহার মহত্ত্ব ও সৌজন্যের পরিচয় পাইয়াছিলাম। সমস্ত প্রবাসী বাঙ্গালীর মন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে রাজা চন্দ্রনাথ attache পদে প্রতিষ্ঠিত হন। আমি তখন কাশীতে ছিলাম। লোকনাথ বাবু বলিলেন, রাজাকে অভিনন্দন দিতে হইবে। তাঁহার কথায় প্রবাসী বাঙ্গালীরা আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বঙ্গীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের উজ্জ্বল রত্ন রাণী ভবানীর কুলতিলক প্রথম বাঙ্গালী attacheকে কাশীধামে পাইয়া প্রবাসী বাঙ্গালীরা যদি উপযুক্তরূপে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে না পারে তাহা হইলে অত্যন্ত লজ্জার কথা। লোকনাথ মৈত্র মহাশয়ের উদ্যোগে উদারপ্রকৃতি বিজিয়ানাগ্রামের মহারাজ ও কাশী-নরেশ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; ডাক্তার ল্যাজারস্ তাঁহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। প্রকাণ্ড সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইল। তত্রত্য কলেজের আইনের অধ্যাপক গিরীন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তৃক ইংরাজি ভাষায় অভিনন্দনপত্র রচিত হইল; গিরীন্দ্র বাবু তখন লোকনাথ বাবুর বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন। আমরা কয়জনে মিলিয়া একটি বাঙ্গালা রচনা খাড়া করিলাম। আয়োজনের ত্রুটি হইল না। আমার কিন্তু মনটা বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। রাজা চন্দ্রনাথকে আমি তখনও চোখে দেখি নাই। কেবলই মনে হইতে লাগিল যে এই প্রকাণ্ড সভামণ্ডপে নানা দেশ বিদেশের রাজা মহারাজ সমবেত হইবেন, আমাদের এই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ রাজা তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃতিদত্ত রাজটীকা লইয়া দাঁড়াইতে পারিবেন ত? মনে হইল যেন তাঁহার চেহারার উপর সমস্ত বাঙ্গালী জাতির মান ইজ্জৎ নির্ভর করিতেছে। আমার যেন ছট্‌ফটানি ধরিল। সন্ধ্যা হইল। দেবমন্দিরে সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইল। অসংখ্য দীপালোকে সভাস্থল ঝল্‌মল্ করিতে লাগিল। রাজা চন্দ্রনাথ তাঞ্জাম হইতে অবতরণ করিলেন। আমি বিস্ফারিত নেত্রে দেখিলাম—হাঁ, রাজা বটে। কাশীপ্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরবমুকুট

বটে। রাণী ভবানীর বংশের উজ্জ্বল প্রদীপ আজ বিশ্বনাথের চরণতলে দীপ্ত হইয়া জ্বলিতেছে। বেশের অদ্ভুত পারিপাট্য ছিল, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের বাহুল্য ছিল না। আনন্দে আমার চোখে জল আসিল। অভিনন্দন পত্র পঠিত হইল। তিনি বিনীতভাবে তৎপ্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলিলেন। সভাভঙ্গ হইল।

"কলিকাতায় পাবলিক ষ্টেজের প্রথম অবস্থায় তাঁহার আনুকূল্যে ও সৌজন্যে আমরা কৃতার্থ হইয়া গেলাম। তিনি যে কখনও আমাদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন এমন কথা আমি বলিতেছি না। বাস্তবিকই আমরা ধনী ও অভিজাত সমাজের নিকটে অর্থ ভিক্ষা করি নাই। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আসিবেন; যদি ভাল লাগে, দুটি ভাল কথা বলিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন; যেখানে ভাল লাগিল না সেখানে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবেন; — ইহার অধিক আমরা কিছু আশা করিতাম না। এইখানে আপনাকে একটু সতর্ক হইতে হইবে; যেন পাঠক পাঠিকার ভুল ধারণা না হয় যে আমরা অভিজাতবর্গের অন্ততঃ moral patronage এর ভিখারী ছিলাম। ন্যাশনাল থিয়েটরের ষ্টেজ বাস্তবিকই democratic ছিল; দেশের আপামর সাধারণের আনন্দের সামগ্রী হইবে, ইহাই তাহার একান্ত আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার বিষয় ছিল। আমাদের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া পুণ্যশ্লোক শিশির বাবুর মত বোধ হয় মহাত্মা উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও গুণগ্রাহী রাজা চন্দ্রনাথ আমাদের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ভীমসিংহের ভূমিকায় গিরীশ বাবুর রিহার্স্যাল দেখিয়া রাজা চন্দ্রনাথ স্বহস্তে গিরীশ বাবুকে নিজের রাজবেশ পরাইয়া দিয়া তাঁহার কটিদেশে নিজের তরবারি ঝুলাইয়া দিলেন। আমি যখন মদনিকার ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলাম, তিনি গ্রীণরুমে অপেক্ষা করিতে



৺কেশবচন্দ্র সেন

লাগিলেন; আমি প্রত্যাবৃত্ত হইলেই ক্রমে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আমার পায়ের মোজা খুলিয়া দিলেন; আমার সলজ্জ প্রতিবাদ তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। রাজা চন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল যে তিনি 'শর্ম্মিষ্ঠা'য় যযাতি সাজিবেন; কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

"মাইকেলের শর্ম্মিষ্ঠার উল্লেখ করিতে গিয়া তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের কথা মনে পড়িল। সে সম্বন্ধে আমার দু একটি কথা বলিবার আছে। দেখুন, 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিল। য়ুরোপীয় ধরণে উৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডি যে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইতে পারে তাহা মাইকেল বাঙ্গালীকে দেখা-



কালীপ্রসন্ন সিংহ

বোধ হয় অনেকে তাহা জানেন না। গিরীশ বাবুর পদ্যের ছন্দ গিরীশ বাবুর নিজের আবিষ্কৃত নহে। ঐ ছন্দের আবিষ্কর্ত্তা আর কেহ নহেন—স্বয়ং কালীপ্রসন্ন সিংহ। সত্যপ্রিয় কৃতজ্ঞ গিরীশবাবু তাঁহার প্রথম নাটক রাবণবধের title:pageএ হুতোম প্যাচায় ঐ ছন্দে রচিত লাইন কয়টি তুলিয়া দিয়াছিলেন ; ছন্দ হিসাবে তাঁহারই প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন। এ সকল কথা পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা করিতেছি।

"কিন্তু মজা এই যে, গতিক দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, —'কৃষ্ণকুমারী' নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের পক্ষে বড়ই unlucky ; কেহ বোধ হয় উহা লইয়া সামলাইতে পারে নাই। দেখুন, পাইকপাড়ায় উহা অভিনীত হয় নাই। হইবার উদ্যোগ করিতেই রঙ্গমঞ্চের মজ্‌লিসি দল ভাঙ্গিয়া যায়। শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে ভাঙ্গা দল লইয়া অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয় হইবার পূর্ব্বেই কিন্তু শোভাবাজার প্রাইভেট্‌ থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি ভাঙ্গিয়া গেল। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, কি কারণে জানি না, উক্ত নাট্যসভার সহিত নিজের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেন। আরও অনেকে চলিয়া গেলেন। এক রকম করিয়া অভিনয় করা হইল বটে, কিন্তু পূর্ব্বের দল ভাঙ্গিয়া গেল। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয় করিবার কিছু দিন পরেই আমাদের ন্যাশনাল থিয়েটরের অভিনয় বন্ধ করিতে হইল। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের উপরে নারদের একটু অনুকম্পা আছে। কিসে গোলমাল বাধিল

ইয়া দিলেন। তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তী বাঙ্গালী নাট্যকারগণ যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। মাইকেল ও দীনবন্ধুর নিকটে আমাদের নাট্যসাহিত্য যে প্রভূত পরিমাণে ঋণী ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। 'নীল-দর্পণ' বাঙ্গালী সমাজের সমসাময়িক চিত্র লইয়া বাঙ্গালীকে করুণরসাত্মক নাটকের আদর্শ দেখাইয়া দিল ; মাইকেল বিলাতী classic ধরণে ট্র্যাজেডির আদর্শ কৃষ্ণকুমারীতে দেখাইলেন। প্রহসন রচনার পন্থাও মাইকেল দেখাইয়া দেন। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়িয়া গেল। বাঙ্গালী সাহিত্যসেবিগণ

ঠিক এখন বলিতে পারিব না; টাকা কড়ির খরচ পত্র লইয়া মনোমালিন্য দাঁড়াইয়া গেল। ভীমসিংহের ভূমিকায় গিরিশ বাবু নিজেকে a distinguished amateur বলিয়া বিজ্ঞাপিত করাইয়াছিলেন; কিন্তু তখন আমরা সকলেই amateur, তবে গিরিশ বাবু অবশ্যই 'distinguished' ছিলেন। কেহই মাহিনা লইতেন না। আমরা পেশাদার-ই ছিলাম না। ভাল থিয়েটর নির্ম্মাণ করিতে হইবে তজ্জন্য টাকা আবশ্যক, আমাদের সকলেরই ঝোঁক ছিল যে ষ্টেজের উন্নতি করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থসঞ্চয় করিতে হইবে। এই জন্য থিয়েটরের জন্য যখন আমরা প্লাকার্ড ছাপাইতাম, প্রতি রাত্রির প্লাকার্ডের শিরোদেশে লেখা থাকিত—'For the benefit of the stage' (ষ্টেজের উন্নতির জন্য)। এই কয়টি কথা আমিই মৎলব করিয়া প্রথম প্লাকার্ডের উপর বসাইয়া দিয়াছিলাম। গিরীশ বাবুর কাছে একজন ন্যাশনাল থিয়েটরকে পেশাদারী থিয়েটার বলায় তিনি বলিয়াছিলেন,—'ভুনেটা * বাঁচিয়ে দিয়েছে রে,—পেশাদারী নয়!' দেখুন, গিরীশ বাবুর সঙ্গে আমাদের একটা তখনকার মনোমালিন্যের কথায় **পরমহংসদেবের** কথা মনে পড়িয়া গেল! একদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কেশব বাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সামাজিক নানা প্রশ্ন লইয়া তখন সভাসমিতিতে ও পত্রিকার স্তম্ভে উভয়ের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতেছিল। ঠাকুর জানিতেন উভয়ের মধ্যে প্রীতিবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'দেখ, তোমাদের দুজনকার ঝগড়া যেন রাম-শিবের লড়াই। রাম শিবের গায়ে বাণ মারছেন, শিবও রামের গায়ে বাণ মারছেন; আবার তখনই রাম শিবকে স্তব করছেন, আর শিব রামকে স্তব করছেন, কেন না রামের গুরু শিব, আর শিবের গুরু রাম। দুজনের মধ্যে মিটমাট হয়ে যাবার বাধা কিছু নাই, কিন্তু যত গোল বাধিয়ে দেয় রামের বাঁদরগুলো আর শিবের ভূতপ্রেতগুলো। তোমাদেরও ঝগড়া সহজেই মিটমাট হয়ে যায়, কিন্তু যত গোল করছে ঐ বাঁদর আর ভূতপ্রেত গুলো।'...গিরীশ বাবুর সঙ্গে ন্যাশনাল থিয়েটরের প্রণয়ভঙ্গের জন্য ভূতপ্রেত বানর যে কতকটা দায়ী



বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

---

* আত্মীয় স্বজনের মধ্যে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু 'ভুনি বোস' বলিয়া পরিচিত।—লেখক।

ছিল না এমন কথা বলা যায় না। সে যাহা হউক, টাকার কথা বলিতেছিলাম। আমরা কেহই বেতন-ভোগী ছিলাম না। অর্দ্ধেন্দুর কিছু টানাটানি ছিল; তাহাকে প্রায়ই টাকা দিতে হইত। নীলদর্পণের তৃতীয় অভিনয় রজনীতে অর্দ্ধেন্দুর অদর্শনে আমরা অস্থির হইয়া পড়িলাম; কোনও রকম করিয়া যোগেন্দ্র নাথ মিত্রকে দিয়া তাঁহার কাজ চালাইয়া লইলাম। পরদিন প্রাতে অর্দ্ধেন্দুর বাড়ীতে গিয়া তাঁহার পিতা ৺শ্যামাচরণ মুস্তফী মহাশয়ের হস্তে নগেন বন্দ্যো চল্লিশটি টাকা দিয়া আসিলেন। তখনকার মত গোল মিটিয়া গেল। ইহার জন্য অর্দ্ধেন্দুকে দোষ দিতে পারি না। থিয়েটরের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করিতে গিয়া তিনি নিজের সংসারের দিকে দৃক্‌পাত করিবার অবসর পান নাই। তাঁহারা পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ী হইতে বরাবর মাসে মাসে যে বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিলেন, 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনের অভিনয়ের পর হইতেই তাহা বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং থিয়েটরের জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে হইল। যদি আমরা তাঁহার অর্থাভাব মোচ-নের চেষ্টা না করিতাম, তাহা হইলে আমাদের আচরণ গর্হিত হইত। সে যাহা হউক, টিকিট বিক্রয় মাদের থিয়েটরের খরচ চলিয়া গেলেই টাকা যে আবার বাড়ীতে লইয়া যাইতে ন কল্পনা আমাদের কাহারও ছিল না। তছিলাম, কেন যে আমাদের মধ্যে গোলযোগ বাধিয়া য়েটর বন্ধ হইয়া গেল, তাহা ঠিক আপনাকে বলিতে পারিব না; কেন না, যখন টাকা-হিসাবে আমাদের দলের মধ্যে কেহই স্বার্থপর ছিলেন না, তখন টাকা লইয়া গোলযোগ হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহাই হইল। থিয়েটরে আমাদের অভিভাবক স্থানীয়গণ সকলকে সন্তোষজনক রূপে টাকার হিসাব বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না। থিয়েটরের শেষ অভিনয়রজনীতে যবনিকা পতনের পূর্ব্বে "জ্যাঠা" বেহারী (বিহারীলাল বসু) নারী-বেশে ফুটলাইটের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া গিরীশবাবুর রচিত একটি গান গাহিয়া দর্শকবৃন্দের নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়।
সাধি ওহে সুধিব্রজ ভুলোনা আমায়॥
এ সভা রসিকমিলিত,
হেরিয়ে অধিনী চিত
আধ পুলকিত
আধ হুতাশে শুকায়॥
অস্তগামী দিনমণি
যেমতি হেরি নলিনী
আধ ধনি বিমলিনী,
আধ হাসি চায়॥
মম প্রতি ঋতুপতি
হয়েছে নিদয় অতি;
হাসাইছে বসুমতী,
আমারে কাঁদায়॥
নির্ম্মাইয়ে নাট্যালয়,
আরম্ভিব অভিনয়,
পুনঃ যেন দেখা হয়
এ মিনতি পায়॥

"গান শেষ হইল। দর্শকবৃন্দ চঞ্চল হইয়া আক্ষেপোক্তি করিতে লাগিলেন। মধুচক্রে লোষ্ট্রক্ষেপ করিলে মক্ষিকার দল যেমন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গুণ গুণ করিতে থাকে, তদ্রূপ সেই দর্শকমণ্ডলী অস্ফুট কলরব করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সকলেই বলিলেন—'কেন তোমরা বন্ধ কর্‌বে? কেন তোমরা বিদায় চাও? তোমাদের ভুল্‌ব কেন? যেখানে অভিনয় কর্‌বে আমরা আস্‌ব বৈকি!' বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা চাঁদার খাতা খুলিয়া তাঁহাদের সম্মুখে ধরিতাম, তাহা হইলে একটা নাট্যালয় নির্ম্মাণের খরচ তখনই সহি করাইয়া লইতে পারি-তাম।

"১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের মধুযামিনীর সেই করুণ বিদায়গীতি আজিও থাকিয়া থাকিয়া আমার হৃদয়-নিকুঞ্জে গুঞ্জরিত হইয়া উঠে। আমার সেই উদ্দাম যৌবনের বসন্তোৎসবে সেই 'আধ-পুলকিত আধ-হুতাশে-শুকায়' হৃদয় আজ আপনাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? তা'র পরে কত বসন্ত আসিল ও গেল; কত হাসি কান্নার ভিতর দিয়া আমার জীবন-নাট্য লীলায়িত হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু সেই রাত্রির সেই বেদনা আজিও বিস্মৃত হই নাই। তখন যৌবন ছিল, মনে সাহস ছিল, 'পুনঃ যেন দেখা হয়' বলিয়া মিনতি করিতে পারিয়াছিলাম; কায়মনোবাক্যে সাধনা করিয়াছিলাম; সিদ্ধিলাভও হইয়াছিল। সেই সাধনা ও সিদ্ধির কথা পরে বলিতেছি।"

ক্রমশঃ

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত।

সখের ডিটেক্টিভ

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শরৎকাল। রাত্রি ৮টা ২২ মিনিটে ডায়মণ্ড-হারবার হইতে আগত কলিকাতাগামী প্যাসেঞ্জার গাড়ী খানি সংগ্রামপুর ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। অল্প কয়েকজন আরোহী ওঠা নামা করিতেই ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল।

ঠিক এই সময় ব্যাগহস্তে একজন মধ্যবয়স্ক স্থূল-কায় ভদ্রলোক দৌড়িয়া প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্যম বৃথা হইল। পোঁ করিয়া বাঁশী বাজাইয়া, এঞ্জিন মহাশয় বাবুটিকে উপহাস ছলেই যেন "ধেৎ ধেৎ" করিতে করিতে ছুটিতে আরম্ভ করিল। বাবুটি হতাশ হইয়া চলন্ত ট্রেণখানির প্রতি চাহিয়া রহিলেন—আর, হাঁফাইতে লাগিলেন।

গাড়ী বাহির হইয়া গেলে বাবুটি ধীরপদে আবার ফটকের দিকে অগ্রসর হইলেন। সেখানে গোল লণ্ঠন হাতে দাঁড়াইয়া ছোট ষ্টেশন মাষ্টার বাবু আগন্তুক আরোহিগণের টিকিট লইতেছিলেন। বাবুটি পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষ ব্যক্তি ফটক পার হইয়া গেলে ছোট বাবুকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"মশায়, আবার ক'টায় ট্রেণ?"

ছোটবাবু বাতির আলোকে টিকিটগুলি দেখিতে দেখিতে বলিলেন—"কোথাকার ট্রেণ?"

"কল্‌কাতায় ফেরবার।"

"আবার সেই রাত্রি ১টা ১৮মিনিটে।"

বাবুটি আপন মনে হিসাব করিতে লাগিলেন—"একটা আঠারো। আমাদের হ'ল, আঠারো প্লস্ চব্বিশ—একটা বেয়াল্লিশ্ মিনিট—পৌনে দুটোই ধর। তাই ত!"

ইত্যবসরে ছোটবাবু সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়াছিলেন। একজন খালাসী চাকাওয়ালা মই ঘড়্ ঘড়্ করিয়া টানিতে টানিতে প্ল্যাটফর্ম্মের আলোগুলি নিবাইয়া দিতেছিল। বাবুটি ধীরে ধীরে ফটকের বাহির হইয়া সিঁড়ি নামিয়া নিম্নে গিয়া দাঁড়াইলেন। সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন, নিকটেই একটি হালুইকরের দোকানে মিটি মিটি করিয়া আলোক জ্বলিতেছে—তাহার পর যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল অন্ধকার। নিকটতম গ্রামও এখান হইতে অন্ততঃ একক্রোশ দূরে অবস্থিত—রাস্তাটির দুই ধারে

কেবল গাছ ও জঙ্গল। সেই জঙ্গলে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিতেছে, মাঝে মাঝে শৃগালেরও হুক্কা হুয়া রবও শুনা যাইতেছে।

সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাবুটি অনুভব করিলেন, কিঞ্চিৎ আহার্য্য সামগ্রী অভ্যন্তরভাগে প্রেরণ না করিলে সমস্ত রাত্রি কাটিবে না। যদিও, যাহাদের বাড়ীতে গিয়াছিলেন সেখানে সান্ধ্য জলযোগটা একটু গুরুতর গোছই হইয়াছিল এবং তাঁহাদের আয়োজনে বিলম্ব-জন্যই গাড়ীটি ফেল হইয়া এই বিপত্তি উপস্থিত—তথাপি সারারাত্রির উপযুক্ত বোঝাই ত লওয়া হয় নাই। হালুইকরের দোকানটি আছে তাই রক্ষা নচেৎ অর্দ্ধাশনেই রাত্রি কাটাইতে হইত। ভাবিতে ভাবিতে বাবুটি হালুইকরের দোকানের সম্মুখে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

বৃদ্ধ হালুইকর চশমা চোখে দিয়া রামায়ণ পড়িতেছিল, বলিল—"আস্তাজ্ঞে হোক্, আসুন।" দোকানের ভিতর দেওয়াল ঘেঁসিয়া একটি সরু বেঞ্চি ছিল, তাহার উপর বাবুটি উপবেশন করিয়া বলিলেন—"কি কি আছে?"

হালুইকর বলিল—"আজ্ঞে, বাবুর কি চাই বলুন। রসগোল্লা আছে, পান্তয়া আছে, মিহিদানা আছে, কচুরি আছে, সিঙ্গাড়া আছে—তাজা, আজই ভেজেছি।"

ইচ্ছামত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া বাবুটি আহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সুযোগে ইহাঁর পরিচয়টি দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে। সুখের বিষয় তজ্জন্য আমাদিগকে বিশেষ শ্রম স্বীকার করিতে হইবে না, নামটি প্রকাশ করিলেই যথেষ্ট হইবে। কারণ, বিজ্ঞাপন অনুসারে, "বঙ্গসাহিত্যে ইহাঁর নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া সম্পূর্ণ নিস্প্রয়োজন।"

আপনারা নিশ্চয়ই ইহাঁর লেখনীপ্রসূত কোন না কোন ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন। স্বয়ং না পড়িয়া থাকেন বাড়ীর মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিবেন।

ইহাঁর নাম শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন দত্ত। কলিকাতায় বাস করেন। এই ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ দূরে কোন গ্রামের একজন ভদ্রলোকের কন্যার সহিত ইহাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। আজ বেলা তিনটার গাড়ীতে ইনি কলিকাতা হইতে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। মেয়ে দেখিয়া আটটা চব্বিশের গাড়ীতে যদি রওয়ানা হইতে পারিতেন তবে রাত্রি পোনে দশটায় কলিকাতায় পৌছিয়া গরম গরম লুচী, ঘন বুটের দাল, সদ্য ভর্জ্জিত রোহিত মৎস্য, হংস-ডিম্বের কালিয়া প্রভৃতি ভক্ষণান্তে নিরাপদে লেপমুড়ি দিয়া শয়ন করিতেন—কিন্তু বিধিলিপি কে খণ্ডাইতে পারে?

বাসি কচুরী, ভিতরে আঁঠিওয়ালা রসগোল্লা প্রভৃতি যথাসাধ্য ভক্ষণ করিয়া গোবর্দ্ধন বাবু হাত মুখ ধুইয়া ফেলিলেন। হালুইকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার দোকান কতক্ষণ খোলা থাকে?"

হালুইকর বলিল—"রাত্তির ন'টা, বড়জোর সাড়ে ন'টা।"

"তার পর?"

"তার পর দোকান বন্ধ করে, গিয়ে আহারাদি করি। আহারাদি করে শয়ন করি।"

গোবর্দ্ধন বাবু ব্যাগটি হাতে করিয়া উঠিলেন। হালুইকর বলিল—"বাবু তা হলে ইষ্টিশান চল্লেন?"

"করি কি?"—বলিয়া গোবর্দ্ধন বাবু ধীরে ধীরে আবার ষ্টেশনে গিয়া উঠিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সংগ্রামপুর ছোট ষ্টেশন। তার-আপিস, টিকিট-আপিস প্রভৃতি সমস্ত একই কামরায় অবস্থিত। ওয়েটিং রুম পর্য্যন্ত নাই।

গোবর্দ্ধন বাবু প্ল্যাটফর্ম্মে পৌছিয়া দেখিলেন, সেই আপিস কামরা তালাবন্ধ। বাহিরে কম্বল গায়ে দিয়া একজন খালাসী বসিয়া ঝিমাইতেছে। একটি মাত্র লণ্ঠন জ্বলিতেছে, তাহারও আলোক অত্যন্ত কমাইয়া দেওয়া।

গোবর্দ্ধন বাবু খালাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবু কোথা রে?"

"খেতে গেছেন, বাসায়।"

"কখন আস্‌বেন ?"

"এই এলেন বলে।"

একখানি বেঞ্চি ছিল, গোবর্দ্ধন বাবু তাহারই উপর উপবেশন করিলেন। ব্যাগটি খুলিয়া পাণের ডিবা বাহির করিলেন, সিগারেট ও দিয়াশলাই বাহির করিলেন। জুতা খুলিয়া রাখিয়া পা দুটি বেঞ্চির উপর তুলিয়া গাত্রবস্ত্র খানি বেশ করিয়া ঢাকা দিয়া বসিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ ও ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলেন।

চারিদিকে খোলা মাঠ, হু হু করিয়া হাওয়া আসিতেছে। কিছুক্ষণ পরেই গোবর্দ্ধন বাবুর শীতবোধ হইতে লাগিল। কোথায়, বাড়ীতে এতক্ষণ চারিদিকের দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া লেপ মুড়ি দিয়া শয়ন, কোথায় এই তেপান্তর মাঠে এই কষ্টভোগ! যদি না মেয়ে দেখিতে আসিতেন, তাহা হইলে ত এই কর্ম্মভোগ হইত না! মেয়ের বাপেরা জলযোগের অনাবশ্যক আড়ম্বর করিয়া গাড়ী ফেল করাইয়া দিয়াছে বলিয়া তাহাদের উপর রাগ হইল; বিধবা ভ্রাতৃজায়ার উপর রাগ হইল—ছেলের বিবাহের জন্য এত তাড়াতাড়িই কেন তাঁহার? বধূ আসিয়া কি চতুর্ভুজ করিয়া দিবে? বাল্যবিবাহের উপরও তাঁহার রাগ হইতে লাগিল। শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবার বাল্যবিবাহকে আচ্ছা করিয়া গালি দিয়া একখানি নূতন ধরণের উপন্যাস তিনি লিখিবেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সিঁড়িতে জুতার শব্দ উঠিল। প্ল্যাটফর্ম্মের উপর খানিকটা আলোক আসিয়া পড়িল। বাতি হাতে করিয়া ছোট বাবু আসিলেন, আপিস কামরা খুলিয়া প্রবেশ করিয়া, দরজাটি ভেজাইয়া দিলেন।

আরও কিয়ৎক্ষণ শীতভোগ করিবার পর গোবর্দ্ধন বাবু ধৈর্য্য হারাইলেন। উঠিয়া গিয়া, দরজাটি ফাঁক করিয়া বলিলেন—"ষ্টেশন মাষ্টার বাবু, পৌনে দুটোর গাড়ীর ত এখনও অনেক দেরী, বাইরে বড্ড শীত, ভিতরে এসে কি বস্‌তে পারি?"—বাবুটি ষ্টেশন মাষ্টার নহেন, 'ছোট বাবু' মাত্র, তাহা গোবর্দ্ধন বাবু জানিতেন; কিঞ্চিৎ খোসামোদ করার অভিপ্রায়েই ওরূপ সম্ভাষণ করিলেন।

ছোট বাবু বলিলেন—"আসুন, বসুন।"

প্রবেশ করিয়া গোবর্দ্ধন বাবু একখানি পিঠভাঙ্গা চেয়ারে বসিলেন। এইবার ভাল করিয়া দেখিলেন, ছোট বাবুর বয়স ৪০ বৎসরের উপরে উঠিয়াছে। শাদা প্যাণ্টালুনের উপর কালো মোটা গরম কোট পরিয়া রহিয়াছেন। মোটা মোটা গোল গোল বোতামগুলাতে কি সব ইংরাজি অক্ষর লেখা রহিয়াছে। টেলিগ্রাফের কলের কাছে বসিয়া খুট্ খুট্ করিয়া কায করিতেছেন।

গোবর্দ্ধন বাবু যেখানে বসিয়াছিলেন তাহার কাছেই লম্বা গোছের একটি টেবিল, তাহার উপর ঘষা কাঁচের একটি সরু উচ্চ লণ্ঠন রক্ষিত, লাইন ক্লিয়ার বহি ও অন্যান্য খাতা পত্র যথাতথা ছড়ান, একটি টিনের গঁদদানি, অপর একটি টিনের আধারে তেলকালীর প্যাড্ এবং সেই ষ্টেশনের একটি মোহরছাপ, সীসার কাগজ চাপা, একগাছা রুল—এই সব দ্রব্য রহিয়াছে।

ছোটবাবু তারের কায শেষ করিয়া, আগন্তুকের প্রতি চাহিয়া একটি হাই তুলিলেন। দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত দুটি পিঠের দিকে করিয়া 'গা ভাঙ্গিলেন'। তাহার পর একটি দেরাজ ধরিয়া খড়্ খড়্ করিয়া টানিয়া তাহার মধ্যে হইতে একখানি বহি বাহির করিয়া, আলোকের নিকট সরিয়া আসিয়া পড়িতে বসিলেন। গোবর্দ্ধন বাবু গলাটি বাড়াইয়া দেখিলেন, বহিখানি তাঁহারই প্রণীত "ভীষণ রক্তারক্তি" উপন্যাস।

গোবর্দ্ধন বাবু নূতন লেখক নহেন; যাহাদের বহি বৎসরের পর বৎসর সিন্দুক বা আলমারিতে কীটভোগ্য হইয়া বিরাজ করে সে শ্রেণীর গ্রন্থকার নহেন, তথাপি এই দূর পল্লীতে একজনকে নিজ পুস্তক পাঠে নিবিষ্টচিত্ত দেখিয়া তাঁহার মনটা উলসিয়া উঠিল। তাঁহার শীত কোথায় চলিয়া গেল।

ছোটবাবু একমনে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। গোবর্দ্ধন বাবু একদৃষ্টে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। আত্মপ্রসাদে তাঁহার

মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল। মনে মনে বলিলেন—"বিজ্ঞাপনে যে লিখি,—'একবার পড়িতে বসিলে আহার নিদ্রা ত্যাগ'—সেটা কি নিতান্ত মিথ্যা কথা লিখি ?"

কিছুক্ষণ এইরূপে কাটিলে এই ভক্ত পাঠকটির নিকট আত্ম-পরিচয় দিবার জন্য গোবর্দ্ধন বাবুর প্রাণটা ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। ভাবিলেন—"পুরাতন এক-খানা মলিদা গায়ে দিয়া কাদামাখা জুতা পায়ে দিয়া নিরীহ ভাল মানুষটির মত বসিয়া রহিয়াছি—আমি যে কে, জানিতে পারিলে বাবুটির কি বিস্ময়ের অবধি থাকিবে! ইহার পর চিরদিন উনি লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইবেন না কি—'একবার বিখ্যাত ডিটেক্টিভ ঔপন্যাসিক গোবর্দ্ধন বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। লোকটি এমন সাদাসিধে যে দেখ্‌লে গোবর্দ্ধন বাবু বলে মনেই হয় না। অতি মহাত্মা লোক!'—না হয়, আমিই উহাঁর নামটি প্রথমে জিজ্ঞাসা করি। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার নামও উনি জিজ্ঞাসা করিবেন।"

গলা বাড়াইয়া গোবর্দ্ধন বাবু দেখিলেন, ছোটবাবু তখন ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ পড়িতেছেন—যেখানে প্রসিদ্ধ গুণ্ডা মির্জ্জা বেগ পঞ্চদশবর্ষীয়া সুন্দরী নায়িকা বকুল-মালাকে তাহার পিতৃগৃহ হইতে গভীর রাত্রে ডাকাতী করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছে।—এই পরিচ্ছেদটি বিশেষভাবে 'চমকপ্রদ' সুতরাং রসভঙ্গ করিতে ইচ্ছা হইল না।

পরিচ্ছেদটি শেষ হওয়া মাত্র গোবর্দ্ধন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"মশায়ের নামটি কি জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি ?"

বাবুটি পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়াই উত্তর করিলেন—"শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ।"—বলিয়া চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদে মনোনিবেশ করিলেন।

গোবর্দ্ধন বাবু সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার নিবাস ?"

বাবুটি পূর্ব্ববৎ বলিলেন—"হুগলির কাছে।"

"কোন গ্রাম ?"

"শঙ্করপুর"—বলিয়া তিনি চতুর্ব্বিংশতি পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা উন্মোচন করিলেন।

গোবর্দ্ধন বাবু মনে মনে বলিলেন—"কোথাকার অভদ্র লোক!"—প্রকাশ্যে বলিলেন—"আপনার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করছি বলে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন না ত মশায় ? আজকাল ইংরিজি ফ্যাসান অনুসারে এগুলো বেয়াদবি বলে গণ্য তা জানি। আমরা কিন্তু মশায় সেকেলে লোক—অত মেনে চল্‌তে পারিনে। কিছু মনে করবেন না।"

বাবুটি তাঁহার পানে এক নজর মাত্র চাহিয়া একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"না।"

গোবর্দ্ধন বাবু তখন আত্ম-পরিচয় দান সম্বন্ধে হতাশ হইয়া কড়িকাঠ গণিবার অভিপ্রায়ে উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন কড়িকাঠ নাই, ঢেউ খেলান করোগেটেড্ লোহার ছাদ মাত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ছোটবাবু যখন বহিখানি শেষ করিলেন তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটা। বহি বন্ধ করিয়া, একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রায় এক মিনিট কাল তিনি সম্মুখস্থ দেওয়ালের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর গোবর্দ্ধন বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"সেই অবধি বসে রয়েছেন ?"

"আজ্ঞে কি করি বলুন!"

"ভারি কষ্ট হল ত আপনার। পাণ খাবেন ?"—বলিয়া পকেট হইতে পাণের ডিবাটি বাহির করিয়া আগন্তুকের নিকট ধরিলেন। পাণ লইয়া গোবর্দ্ধন বাবু ভাবিলেন—"হায়, এ ব্যক্তি জানিতেও পারিতেছে না, যাহাকে পাণ দিতেছে সে কে!"

ছোটবাবু বলিলেন—"মশায় মাফ্ করবেন। আপনি প্রায় তিন ঘণ্টা এখানে বসে আছেন, আপনাকে কোনও খাতির করিনি। ঐ বই খানা নিয়ে এমনি ইয়ে হয়ে পড়েছিলাম—একেবারে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য। কোথা থেকে আসছেন ? মশায়ের নামটি কি ?"

গোবর্দ্ধন বাবু বলিলেন—"আমার ভাইপোর জন্যে মেয়ে দেখ্‌তে গিয়েছিলাম ; আমার নাম শ্রীগোবর্দ্ধন দত্ত।"

নামটি শুনিবামাত্র ছোট বাবু পূর্ব্বপঠিত বহিখানির সদর পৃষ্ঠাটি খুলিয়া আলোকের নিকট ধরিলেন। বহি নামাইয়া গোবর্দ্ধন বাবুর পানে চাহিলেন। আবার বহি খানির সদর পৃষ্ঠাটি দেখিতে লাগিলেন।

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া গোবর্দ্ধন বাবু হাসিয়া বলিলেন—"কি ভাবছেন ?"

বাবুটি সঙ্কোচের সহিত বলিলেন—"মশায়—আপনিই কি—এই বই লিখেছেন ?"

গোবর্দ্ধন বাবু নেকা সাজিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বই ওখানা ?"

"ভীষণ রক্তারক্তি।"

"ওঃ—হ্যাঁ— আমারই একখানা বই বটে।"

ছোটবাবু বলিলেন—"অ্যাঁ—আপনি !—আপনিই গোবর্দ্ধন বাবু ? মশায়, আপনার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার আমি করেছি, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। ছি ছি।"

গোবর্দ্ধন বাবু বলিলেন—"না না—কিছুই অন্যায় ত আপনি করেন নি। কি অন্যায় করেছেন ?"

"অন্যায় করিনি ? আপনি এখানে তিন তিন ঘণ্টা কাল ঠায় বসে আছেন, আপনাকে জিজ্ঞাসাও করিনি মশায় আপনি কে, কোনও কষ্ট হচ্ছে কি না—বই নিয়ে এমনিই মেতে ছিলাম। অন্যায় করিনি ?"

"কিছু না কিছু না। বরং আমার বই নিয়ে আপনি মেতে উঠেছিলেন সেটা ত আমার পক্ষে কম্প্লিমেণ্ট। আমার আর কোন্ কোন্ বই আপনি পড়েছেন ?"

"আর কিছু পড়িনি, তবে পাঁজিতে আপনার অনেক বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখেছি বটে। এবার আনাতে হবে এক এক খানা করে মাঝে মাঝে। আজই কি এ বই পড়া হত ? বইখানি একজন প্যাসেঞ্জার ফেলে গেছে। পাঁচটার গাড়ীতে এসেছিল কল্‌কাতা থেকে—মস্ত একদল। বাইরে প্লাটফর্ম্মে ঐ যে বেঞ্চিখানি রয়েছে—তারই উপর জন কতক বসেছিল। তারা চলে গেলে দেখি, বইখানি বেঞ্চির নীচে পড়ে রয়েছে। এনে পড়তে আরম্ভ করলাম।—বাপ্‌! আরম্ভ করলে কি আর ছাড়বার যো-টি আছে ? আচ্ছা মশায়, ও সব ঘটনা কি সত্যি না আপনি মাথা থেকে বের করেছেন ?"

গোবর্দ্ধন বাবু এই ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"মাথা থেকে বের করেছি।"

"আপনার খুব মাথা কিন্তু! কি অসাধারণ কৌশল! আপনি যদি পুলিশ লাইনে ঢুকতেন ত খুব ভাল ডিটেক্টিভ্ হতে পার্‌তেন। হ্যাঁ—ভাল কথা মনে পড়ে গেল। আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। দেখুন, এই বইখানার ভিতর একটি চিঠি ছিল। আশ্চর্য্য চিঠি। আমি ত মশায় পড়ে কিছুই বুঝতে পারলাম না। আপনি দেখুন দেখি।"—বলিয়া দেরাজ খুলিয়া একখানি পত্র বাহির করিয়া তিনি গোবর্দ্ধন বাবুর হাতে দিলেন।

ব্যাগ হইতে চশমা বাহির করিয়া, চোখে দিয়া, আলোর কাছে ধরিয়া গোবর্দ্ধন বাবু পত্রখানি পাঠ করিলেন—

ভাই কুঞ্জ,

মঙ্গলবার রাত্রে শক্রদুর্গ আক্রমণ, মনে আছে ত ? তুমি সদলবলে ঐ দিন বিকাল পাঁচটার গাড়ীতে আসিয়া পৌছিবে, অন্যথা না হয়। সকলে এখানে সমবেত হইয়া সন্ধ্যার পরই মার্চ্চ করিতে হইবে। রাত্রি দশটায় যুদ্ধারম্ভ। কার্য্য সমাধা করিয়া ভোর তিনটার গাড়ীতে তোমরা ফিরিয়া যাইতে পারিবে। ইতি

তোমাদের

নিতাই।

পত্রখানি পড়িয়াই গোবর্দ্ধন বাবুর মনে হইল, ইহা স্বদেশী ডাকাতী ভিন্ন আর কিছুই নহে। জিজ্ঞাসা করিলেন—"তারা একদল এসেছিল বল্লেন না ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ক'জন ?"

"জন কুড়ি হবে।"

"বয়স কত সব ? চেহারা কি রকম ?"

"বয়স—পনেরো ষোল থেকে উনিশ কুড়ির মধ্যে। চেহারাগুলো ষণ্ডা ষণ্ডা। খুব হাসি, ফূর্ত্তি, গোলমাল করতে করতে গেল।"

"ভদ্রলোকের ছেলে সব ?"

"হ্যাঁ। বেশ ফিট্‌ফাট কাপড় চোপড়। কারু কারু চোখে সোণার চশমা।"

"কোন ক্লাসের টিকিট নিয়ে এসেছিল ?"

"ইণ্টারমিডিয়েট।"

"সিঙ্গিল না রিটার্ণ ?"

"রিটার্ণ।"

"তাদের টিকিটগুলো বের করুন।"

ছোট বাবু একটা দেরাজ টানিয়া একগাদা টিকিট হইতে লাল রঙের আধখানা টিকিটগুলি বাছিয়া বাছিয়া গোবর্দ্ধন বাবুর সম্মুখে ফেলিতে লাগিলেন। শেষ হইলে গোবর্দ্ধন বাবু গণিয়া দেখিলেন সর্ব্বসুদ্ধ উনিশখানা আছে। প্রত্যেক খানিই কলিকাতা হইতে, নম্বরগুলিও পরপর। পকেট বুক বাহির করিয়া টিকিটের নম্বর ও ছাপগুলির বিবরণ গোবর্দ্ধন বাবু নোট করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"স্বদেশী ডাকাতী।"

ছোট বাবু বলিলেন—"স্বদেশী ডাকাতী! অ্যাঁ? স্বদেশী ডাকাতি! বলেন কি ?"

"পরিষ্কার স্বদেশী ডাকাতী। আপনার কাছে ম্যাগ্নি-ফাইং গ্লাস আছে ?"

"না। কেন বলুন দেখি ?"

চিঠিখানির একটি স্থানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গোবর্দ্ধন বাবু বলিলেন—"এই দেখুন, খামের উপর যে ছাপ পড়ে, তারই শাদা দাগ এ চিঠিতে রয়েছে। একটা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস পেলে ছাপটা পড়তাম।"

ছোট বাবু চশমা চোখে দিয়া দাগটা পড়িতে চেষ্টা করিলেন। শেষে বলিলেন—"কিছু পড়া গেল না।"

গোবর্দ্ধন বাবু সেই ঘষা-কাঁচের লণ্ঠনটির দ্বার খুলিয়া ভিতরে কি যেন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শেষে এক টুকরা কাগজ লইয়া লণ্ঠনের একটা স্থানে ঘষিতে লাগিলেন। কাগজ টুকু ভুষা-কালী মাখা হইয়া গেল। বাহির করিয়া, তাহার উপর জোরে দুই তিনটা ফুঁ দিয়া, গোবর্দ্ধন বাবু সেখানি চিঠির সেই শাদা-ছাপ-পড়া অংশে লঘুহস্তে বুলাইতে লাগিলেন। ছোটবাবু অবাক্ হইয়া ইহাঁর কার্য্য পরম্পরা দেখিতেছিলেন।

ছাপটি পরীক্ষা করিয়া গোবর্দ্ধন বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"আজই, বেলা ৯ টার ডিলিভারিতে বউ-বাজার পোষ্ট আপিস থেকে এ চিঠি বিলি হয়েছিল।"—বলিয়া চিঠিখানি ছোটবাবুর হস্তে দিলেন। ছোটবাবু সেখানি আলোক ধরিয়া দেখিলেন, কালো জমির উপরে শাদা অক্ষরে OW AZA তাহার নিম্নে 9 A তাহার নিম্নে 5 JY ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিঠিখানি গোবর্দ্ধন বাবুর হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"ধন্য আপনার বুদ্ধি!"

গোবর্দ্ধন বাবু বলিতে লাগিলেন—"এই ডাকাইত-দের অন্ততঃ একজন—যার নাম কুঞ্জ—বউবাজার অঞ্চলে থাকে। দলের একজন পূর্ব্বেই এসেছিল—যা কিছু দেখ্‌বার শোনবার খবর নেবার সমস্ত ঠিকঠাক করে এই চিঠি লিখেছে। এই অঞ্চলের কোনও ধনী লোকের বাড়ী আজ রাত্রি দশটার সময় তারা ডাকাতী করেছে—ভোর তিনটের গাড়ীতে তারা ফিরে যাবে।"

এমন সময় কলিকাতার ট্রেণ খানি আসিয়া পৌঁছিল। ছোটবাবু লণ্ঠন হাতে করিয়া সেখানি 'পাস' করিতে ছুটিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গোবর্দ্ধন বাবু একাকী বসিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"এ ডাকাইতগণকে যে কোনও উপায়ে হউক ধরিতে হইতেছে। ধরিতে পারিলে গভর্ণমেণ্টের কাছে যথেষ্ট সুনাম হইবে, চাইকি একটা রায় বাহাদুরী খেতাবও মিলিতে পারে।"—অনেক দিন হইতেই রায় বাহাদুর হইবার জন্য গোবর্দ্ধন বাবুর আকাঙ্ক্ষা। নভেল লিখিয়া অর্থোপার্জ্জন যথেষ্টই করিয়া-ছেন কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে তেমন মান হইল সম্ভ্রম কৈ ?

ইহাঁর পুস্তক সংখ্যার তুলনায় অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক বহিও যাঁহারা লেখেন নাই, যাঁহাদের বহি আলমারি-জাত হইয়া থাকে, বৎসরে ২৫ খানির বেশী বিক্রয় হয় না, তাঁহাদের কত মান কত সম্ভ্রম, মাসিকপত্রে ছবি বাহির হইতেছে, কত সভার সভাপতি হইয়া তাঁহারা বক্তৃতা করিতেছেন —কিন্তু গোবর্দ্ধন বাবুকে কেহ ত ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না!—তিনি ইহার একমাত্র কারণ নির্দ্দেশ করেন—ঐ সকল লোক কেবল মাত্র গ্রন্থকার নহেন—সাহিত্যক্ষেত্রে গ্রন্থকার এবং অপর কোনও ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ। তাই অনেকদিন হইতেই তাঁহার মনে হইতেছে, যদি কোনও একটা সুযোগে রায় বাহাদুর বা অন্ততঃ রায় সাহেবও তিনি হইতে পারেন তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার এই "কেবলমাত্র গ্রন্থকার" অপবাদটি ঘুচিয়া যায়—সমাজে নিজ প্রাপ্য সম্মান তিনি আদায় করিয়া লইতে পারেন। তাঁহার মনে হইল, বোধ হয় এই সুযোগেই তাহা হইবে; নহিলে ভগবান তাঁহারই একখানি গ্রন্থের মধ্যে করিয়া মূলসূত্র স্বরূপ ঐ চিঠিখানি পাঠাইয়া দিবেন কেন?

ট্রেণ চলিয়া গিয়াছিল। ছোটবাবু যাত্রীদের টিকিট্ কালেক্ট করিয়া আপিসে ফিরিয়া আসিলেন। পকেট হইতে ডিবা বাহির করিয়া পাণ খাইলেন, গোবর্দ্ধন বাবুকেও দিলেন। নিকটস্থ চেয়ার খানিতে বসিয়া বলিলেন—"তাইত মশায়—কার সর্ব্বনাশ হল কে জানে!"

গোবর্দ্ধন বাবু বলিলেন—"দেখুন, আজ এ ডাকাত-দের ধর্‌তে হবে।"

ছোটবাবু বলিলেন—"কে ধর্‌বে?"

"আপনি, আমি।"

"আমি? সর্ব্বনাশ!—তাদের কাছে রিভল্‌ভার আছে, মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে না!"

গোবর্দ্ধন বাবু হাসিয়া বলিলেন—"না, এখন আর তাদের কাছে রিভল্‌ভার নেই। সে সব কোথাও লুকিয়ে রেখে তারা আস্‌বে।"

"তা হলেও, ধরা কি সোজা কথা মশায়? তারা উনিশ কুড়ি জন লোক—"

"ঝাপ্‌টে ধর্‌তে গেলে কি আর হবে? কৌশলে ধর্‌তে হবে।"

"তার পর?"

"তার পর পুলিস ডেকে তাদের হাণ্ডোভার করে দেওয়া।"

"তার পর?"

"তার পর সকলের শ্রীঘর।"

"তার পর?"

"তার পর আবার কি?"

"ওদের দলের অন্যান্য লোক যারা আছে, তারা যে আপনাকে আমাকে কুকুরমারা কর্‌বে!"

একথা শুনিয়া গোবর্দ্ধন বাবুর মনে একটু ভীতির সঞ্চার হইল। তিনি কয়েকমুহূর্ত্ত নীরবে চিন্তা করিলেন। কিন্তু রায় বাহাদুরীর প্রলোভনই অবশেষে জয়লাভ করিল। বলিলেন—

"আপনি কি বল্‌ছেন মশায়? আমরা কি মগের মুল্লুকে বাস কর্‌ছি যে আমাদের অমনি কুকুরমারা কর্‌বে? একার্য্য করে যদি আমরা সফল হই, আমাদের যাতে কোনও অনিষ্ট না হয় সে বন্দোবস্ত গভর্ণমেণ্ট কর্‌বেন। তার জন্যে লাখ টাকা যদি খরচ হয় তাতেও তাঁরা পিছপাও হবেন না। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আসুন, এ কাযে আমায় সাহায্য করুন। দেখুন দেখি, এই স্বদেশী ডাকাতেরা দেশের কি মহা অনিষ্ট কর্‌ছে। নিরীহ লোকদের সর্ব্বনাশ কর্‌ছে—এই কি ধর্ম্ম, এই কি স্বদেশপ্রেম! প্রত্যেক রাজভক্ত প্রজারই কর্ত্তব্য তাদের কার্য্যে বাধা দেওয়া, তাদের সমুচিত প্রতিফল দেওয়া।"

ছোটবাবু গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন, কোনও উত্তর করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া গোবর্দ্ধন বাবু বলিলেন—"কি বলেন? আমায় সাহায্য কর্‌বেন?"

হাত দুটি যোড় করিয়া ছোটবাবু বলিলেন—"গোবর্দ্ধন বাবু, আমায় মাফ্ কর্‌তে হচ্ছে। আমি

ছাঁপোষা মানুষ, অনেকগুলি কাচ্চা বাচ্চা, আমি ও কাযটি পারব না। আমায় বাঁচান।"

"আমি বাঁচাব কি ? আপনি যদি আমায় সাহায্য না করেন, আমি নিজেই অবিশ্যি যথাসাধ্য চেষ্টা করে দেখ্‌ব। কিন্তু এ স্থান আমার অপরিচিত, আমি একা কি করতে পারব ? আমায় সাহায্য না করলেই কি আপনি বাঁচবেন মনে করেছেন ? গভর্ণমেণ্ট যখন শুন্‌বে যে আপনি আমায় সাহায্য করতে অস্বীকার করাতেই ডাকাতগুলো ধরা পড়্‌ল না, তখন গভর্ণমেণ্ট কি ভাব্‌বে বলুন দেখি ? ভাব্‌বে, আপনিও ষড়যন্ত্রকারীদের দলের লোক, তাই সাহায্য করেন নি। উল্টো বোধ হয় আপনারই জেল হয়ে যাবে।"—এই কথা বলিয়া গোবর্দ্ধন বাবু মনোযোগের সহিত ছোটবাবুর মুখপানে চাহিয়া তাঁহার মনের ভাব নির্ণয়ে সচেষ্ট হইলেন।

ছোটবাবু হঠাৎ উঠিয়া গোবর্দ্ধন বাবুর পদযুগল ধারণ করিলেন। বলিলেন—"আপনি বড়লোক, মহাত্মা লোক, এ গরীবকে দয়া করুন। আমায় এর মধ্যে জড়াবেন না। যদি কিছুর জন্যে আপনার সাহায্য দরকার হয় তা বরং আমায় অনুমতি করুন। গোপনে যা পারি তাতে প্রস্তুত আছি, প্রকাশ্যে কিছুই পারব না।"

"উঠুন—উঠুন।"—বলিয়া গোবর্দ্ধন বাবু ছোটবাবুকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন। বলিলেন—"আচ্ছা, আপনার যদি এতই ভয়, তাহলে কায নেই। আমি একাই যা হয় করব। যা বলি তা শুনুন।"

গোবর্দ্ধন বাবু ভাবিতেছিলেন, "সাহায্য যদি এ করে, তবে কার্য্য সফল হইলে গৌরবের ভাগ না-ই লইল।"—বলিলেন—"দেখুন, কাছাকাছি এমন কোনও বাড়ী আছে যার মধ্যে তাদের পুরে আটক্ করতে পারি ?"

ছোটবাবু বলিলেন—"আছে—আছে—খুব ভাল জায়গাই আছে।"

"কোথা ?"

"বাইরে চলুন, দেখাই।"

কিছু পূর্ব্বেই চন্দ্রোদয় হইয়াছিল। গোবর্দ্ধন বাবুকে প্ল্যাটফর্ম্মের প্রান্তদেশে লইয়া গিয়া ছোটবাবু বলিলেন—"ঐ যে মস্ত বাড়ীটা দেখ্‌ছেন, ওটা ধানের আড়ত করবার জন্যে রেলি ব্রাদারেরা এই নতুন তৈরি করেছে। মস্ত একখানা গুদাম ঘর আছে ওর মধ্যে, প্রায় ৪০ ফুট লম্বা ২৫ ফুট চৌড়া। খালি আছে, এখনও ওদের আড়ত খোলে নি। যদি কোনও কৌশলে সেই দলকে ঐ ঘরখানার মধ্যে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালাবন্ধ করতে পারেন, তাহলেই কায হাঁসিল। পুলিস আসা পর্য্যন্ত ঐখানে ওরা আটক্ থাক্‌বে এখন।"

"অনুগ্রহ করে আপনার লণ্ঠনটা নিয়ে আসুন, ঘরখানা দেখি।"

ছোটবাবু লণ্ঠন আনিতে চলিয়া গেলেন, গোবর্দ্ধন বাবু সেই অন্ধকারে দাঁড়াইয়া কৌশল চিন্তায় ব্যাপৃত হইলেন।

ছোটবাবু লণ্ঠন লইয়া আসিলে উভয়ে গিয়া ঘরখানি দেখিলেন। একটি মাত্র দরজা। উপরে, ছাদের প্রায় কাছে, এদিকে দুইটি ওদিকে দুইটি বায়ু চলাচলের জন্য জানালা কাটা রহিয়াছে, তাহাতে এখনও সার্সি বসানো হয় নাই। গোবর্দ্ধন বাবু দেখিলেন, সেগুলি মেঝে হইতে প্রায় ২০ ফুট উচ্চে—সুতরাং ওখান দিয়া পলায়নের সম্ভাবনা নাই। বলিলেন—"এই ঠিক হবে।"

ঘরের বাহিরে আসিয়া গোবর্দ্ধন বাবু দরজাটি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পুরু শালকাঠের ফ্রেমে আড়ভাবে সেই কাঠের ছোট ছোট তক্তা বসানো, আগাগোড়া রিভেট করা। উপরে একটি নিম্নে একটি মোটা শিকলও আছে। খুব মজবুদ, সহজে ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে পারিবে না। ছোটবাবু বলিলেন—"রেলের ভাল তালা আছে, আপনাকে দিই চলুন।"

"চলুন। আরও সব সরঞ্জাম দরকার। চলুন আপিসে বসে তার পরামর্শ করিগে।"

ফিরিবার পথে ছোটবাবু বলিলেন—"কিন্তু আমি যে আপনাকে কোনও বিষয়ে সাহায্য করছি, তা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না হয়, দোহাই আপনার।"

"না, তা হবে না।"

আপিসে ফিরিয়া ঘণ্টাখানেক ধরিয়া পরামর্শ চলিল। ইতিমধ্যে পৌনে দুইটার গাড়ী আসিল ও চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতাবাসী সেই নিরীহ যুবকগণ আসিয়াছিল, তাহাদের বন্ধু নিতাইয়ের বিবাহে বরযাত্র হইয়া। নিতাই ছেলেটি অনেকদিন হইতেই কিঞ্চিৎ মিলিটারি-ভাবাপন্ন। রঙ্গ করিয়া পত্রে যখন নিজ বিবাহকে "যুদ্ধারম্ভ" এবং ভাবী শ্বশুর-বাটীকে "শত্রুদুর্গ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিল তখন স্বপ্নেও জানিত না, তদ্দ্বারা বন্ধু-গণকে সে কি বিপজ্জালে জড়াইতেছে!

যে গ্রামে বিবাহ হইল তাহা ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বিবাহ ও আহারাদির পর, বরের নিকট সকলে বিদায় গ্রহণ করিল। তাহাদের জন্য গো-যান প্রস্তুত ছিল কিন্তু সেগুলি তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখান করিয়া পদব্রজেই ষ্টেশন অভিমুখে অগ্রসর হইল। বরাবর সরকারী রাস্তা, পথ ভুল হইবার আশঙ্কা ছিল না। জ্যোৎস্নালোকে গান গাহিতে গাহিতে অতি আনন্দেই তাহারা পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

রাত্রি যখন দুইটা তখন ষ্টেশনের আলোক তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। একজন বলিল—"এস ভাই 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গাইতে গাইতে যাই।"—'বঙ্গ আমার জননী আমার' গাহিতে গাহিতে, তালে তালে পা ফেলিয়া, দশমিনিটের মধ্যে তাহারা ষ্টেশনে পৌছিল।

প্ল্যাটফর্ম্মে পৌছিয়া দেখিল, এক ভদ্রলোক মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া মলিদা গায়ে দিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল —"ট্রেণের আর দেরী কত মশাই?"

বাবুটি বলিলেন—"আপনারাই কি আজ বিকেলে পাচটার গাড়ীতে এসেছিলেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনাদের দলের কেউ কলকাতা থেকে ছাড়বার সময় গাড়ী মিস্ করেছিল?"

"তা ত জানিনে। তবে আরও তিনজনের আস্বার কথা ছিল বটে, তারা আসেনি; হয়ত সময় মত ষ্টেশনে এসে জুটতে পারে নি। কেন মশায়?"

বাবুটি বলিলেন—"তবে ঠিক হয়েছে। আপনাদেরই দলের লোক। তিনজন নয়, দুজন লোক সন্ধ্যা ৭টার গাড়ীতে এসে পৌঁছেছিলেন। তার মধ্যে একজন-কার ভয়ানক জ্বর।"

"কোথায়? কোথায় তারা?"

"ঐ রেলি ব্রাদারের আড়তে তাঁরা আছেন। যিনি সুস্থ, তিনি আমাদের এসে বল্লেন মশাই এই ত বিপদ, একটু আশ্রয় দিতে পারেন? কোথায় আর আশ্রয় দিই, ঐ রেলি ব্রাদারের আড়ত দেখিয়ে দিলাম। বাসা থেকে তক্তপোষ, লেপ, বিছানা সব পাঠিয়ে দিলাম। দু তিনবার গিয়ে দেখেও এসেছি—খুব জ্বর, ১০৫ এর কম ত হবে না। আর, পিপাসা কি!—দশমিনিট অন্তর বলে জল দাও। সুস্থ লোকটির কাছেই শুন্‌লাম আপনারা রাত্রি তিনটের গাড়ীতে কলকাতা ফির্‌বেন।"

যুবকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—"ওহে, বোধ হয় শান্তি আর শৈলেন। শান্তিরই বোধ হয় জ্বর হয়েছে—তার ত ম্যালেরিয়া লেগেই আছে কি না।"

পাগড়ী বাঁধা বাবুটি বলিলেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ—শান্তি বাবুরই জ্বর হয়েছে। নামটি ভুলে গিয়েছিলাম। চলুন, দেখ্‌বেন।"—বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। বলা বাহুল্য, ইনি গোবর্দ্ধন বাবু ভিন্ন আর কেহই নহেন।

যুবকেরা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল—"জ্বর যদি একটু কমে থাকে, গাড়ীতে নিয়ে যাবার মত অবস্থা থাকে, তবে নিয়েই যাব; নৈলে আমাদের সকলকেই থাক্‌তে হবে।"

রেলি ব্রাদারের আড়তে পৌছিয়া বাবুটি বলিলেন —"ঐ ঘরে আছে, চলুন।"—দ্বারের ফাঁক দিয়া একটু একটু আলো আসিতেছিল।

দ্বার ঠেলিয়া মাথাটি ভিতরে প্রবেশ করাইয়া বাবুটি বলিলেন—"মুচ্ছে, বোধ হয়। ফীভর মিক্‌শ্চারটায়

কিছু উপকার হয়ে থাক্‌বে। দুজনেই ঘুমুচ্ছে। পা টিপে টিপে আপনারা যান।"

যুবকগণ দেখিল, সেই লম্বা ঘরের একেবারে প্রান্তভাগে পালঙ্ক পাতা রহিয়াছে। পাশে একটি টেবিলের উপর গোটা দুই ঔষধের শিশি যেন দেখা গেল। দেওয়ালে একটা ল্যাম্প মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। যুবকগণ জুতার গোড়ালি শূন্যে তুলিয়া নিঃশব্দে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সকলে প্রায় এক সঙ্গেই শয্যার নিকট পৌছিল। একজন লেপের প্রান্তটি আস্তে আস্তে উঠাইতে লাগিল। ক্রমে অনেকখানি উঠাইয়া ফেলিয়া বলিল—"কৈ ?"

অপর দুই তিনজনে লেপটা টানিয়া বলিল—"গেল কোথা ?"

অপর সকলে বলিল—"সে বাবুটি কৈ ? তিনি গেলেন কোথা ?"

কেহ কেহ বলিল—"দেখত দেখত, বাইরে বোধ হয় আছেন।"

তিন চারিজনে দ্বারের কাছে গিয়া দ্বার টানিল, তাহা বাহির হইতে বন্ধ। চীৎকার করিয়া তাহারা বলিল—"ওহে, বন্ধ যে।"

বাকী সকলে তখন দ্বারের নিকট গেল। সকলেই দ্বার ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল, দ্বার এক চুলও নড়িল না।

সকলেরই মনে তখন একটু ভয় হইল। কেহ কেহ বলিল—"ওহে কুঞ্জ—এ কি ব্যাপার ?"

কুঞ্জ বলিল—"কিছুই ত বুঝ্‌তে পারছিনে। আমাদের এ রকম করে বন্ধ করলে কেন ? লোকটার উদ্দেশ্য কি ?"

অভয় বলিল—"একবার ডেকে দেখা যাক্।" —বলিয়া সে দরজার কাছে মুখ রাখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—"ও মশায় ? বলি, শুন্‌ছেন ? দোরটা বন্ধ করে দিলেন কেন ? খুলে দিন খুলে দিন।"

একে একে দুইয়ে দুইয়ে তখন তাহারা এই প্রকার ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল কিন্তু কোনই ফল হইল না। কেহ কেহ তখন হতাশ হইয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়াছে।

অবনী বলিল—"ওহে, গতিক ভাল নয়। এর মধ্যে বন্ধ থাকলে প্রাণে মারা যাব যে। এ মজবুদ কপাট ভাঙ্গা যাবে না। ঐ ল্যাম্পটা নিয়ে এস। ওর তেলটা কবাটের গায়ে মাখিয়ে আগুন ধরিয়ে দাও। কবাট পুড়িয়ে ফেল।"

কুঞ্জ বলিল—"সর্ব্বনাশ!—তাহলে ধোঁয়ায় শেষকালে দমবন্ধ হয়ে মারা যাব যে। জানালা নেই কিছু নেই—শুধু ছাদের কাছে ছোট ছোট ঐ দুটি ভেন্টিলেটর, তাও কাচবন্ধ বলে বোধ হচ্ছে। অন্য উপায় চিন্তা কর।"

শ্যামাপদ বলিল—"সে বোধ হয় পালিয়েছে। চেঁচামেচি করি এস, কারু না কারু সাড়া পাব।"

কেশব বলিল—"এই শীতের ভোরে কে আছে এখানে যে আমাদের সাড়া পেয়ে এসে আমাদের উদ্ধার কর্‌বে ?"

সকলে তখন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে বাহির হইতে ভস্ ভস্ করিয়া একটা শব্দ আসিল। অভয় বলিল—"ঐ আমাদের ট্রেণও চলে গেল।"

জল্পনায় কল্পনায় আরও ঘণ্টাখানেক কাটিল। কেন যে সে লোকটা এরূপ ব্যবহার করিয়া গেল, তাহাই সকলে নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনও কূলকিনারা পাইল না। অবশেষে স্থির করিল, লোকটা বোধ হয় পাগল হইবে।

কুঞ্জ ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, খাটখানি ধরিয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে সকলকে সে ডাকিয়া বলিল—"দেখ উপরে যে ঐ ভেন্টিলেটর রয়েছে, ওতে সার্সি টার্সি বোধ হয় নেই। আমি অনেকক্ষণ থেকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছি। ঐ দিয়ে ছাড়া বেরুবার আর কোনও উপায় নেই কিন্তু।"

অভয় কহিল—"ও ত বিষম উঁচু, ওখানে পৌছান যায় কেমন করে ?"

কুঞ্জ বলিল—"এ নেওয়ারের খাট খানা ভাঙ্গা যাক, টেবিলটা ভাঙ্গা যাক। খাটের কাঠ চারখানা, টেবিলের পায়া চারটে, নেওয়ার দিয়ে দিয়ে খুব কষে বাঁধা যাক্ এস। দেওয়ালের গায়ে সেইটে দাঁড় করালে জানালার ও ফুটো অবধি পৌছান যাবে বোধ হয়।"

তিন চারিজন দেখিয়া অনুমান করিয়া বলিল—"বোধ হয়।"

কুঞ্জ বলিল—"তিনকড়ে, তুই সাইজে সব চেয়ে ছোট আছিস্। পারবি উঠতে ?"

তিনকড়ি বলিল—"খুব পারব। তারপর ? ও দিকে নাম্ব কি করে ?"

"এই মই, জানালা গলিয়ে ও দিকে ফেলে, ধরে নাম্‌তে পারবিনে ?"

"ওদিকে আবার জমি অবধি পেলে ত। ওদিকে যদি বেশী নীচু হয় ?"

কুঞ্জ বলিল—"আগে উঠে ত দেখ্।"

তখন সেই ল্যাম্পের আলোকের সাহায্যে সকলে মিলিয়া খাটের নেওয়ার খুলিতে আরম্ভ করিল। খোলা শেষ হইলে, অনেকে মিলিয়া খাটের পায়া হইতে পাট্‌রিগুলা বিচ্যুত করিয়া ফেলিল। টেবিলও এইরূপে ভাঙ্গা হইল। খাটের পাট্‌রী এবং টেবিলের পায়া নেওয়ার দিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বাহিরে কাক ডাকিয়া উঠিল, গবাক্ষ পথে ভোরের আলো প্রবেশ করিল।

সকলে ধরাধরি করিয়া তখন সেই মইকে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করাইয়া দিল। উহা গবাক্ষ ছাড়াইয়াও প্রায় একহাত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে—দেখিয়া সকলের বুকে এই প্রথম কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল।

তিনকড়ি বলিল—"যদি বেরুতে পারি, বেরিয়ে আমি কি করব ? ষ্টেশনে যাব ?"

কুঞ্জ বলিল—"না না—ষ্টেশনে গিয়ে কি হবে ? তারাই ত আমাদের শত্রু। প্রথমে দরজায় গিয়ে দেখ্‌বি। যদি দেখিস্ শুধু শিকল বন্ধ আছে, শিকল খুলে দিবি। যদি দেখিস্ তালা বন্ধ, থানায় গিয়ে দারোগাকে সব কথা বল্‌বি। কাছে কোথাও নিশ্চয়ই থানা আছে—দারোগা এসে আমাদের উদ্ধার করবে।"

সকলে মিলিয়া সেই মই ধরিয়া রহিল। তিনকড়ি অতি কষ্টে, বাঁধনের গাঁটে গাঁটে পা দিয়া, উপরে উঠিতে লাগিল। ক্রমে গবাক্ষের নিকট পৌছিয়া তথায় উঠিয়া সে বসিল।

নিম্নে হইতে জিজ্ঞাসা হইল—"তিনকড়ে, কি দেখ্‌ছিস্ ?"

"মাঠ। মাঠে একটা শেয়াল চর্‌ছে।"

"মানুষ টানুষ কাউকে দেখ্‌ছিস্ ?

কাউকে নয়।"

"কতখানি নীচে জমি ? এ কাঠ পৌছবে ?"

"না। অনেক নীচু। এক কায কর না।"

"কি ?"

"নেওয়ার খোল। মুখে মুখে করে গিরো বাঁধ। দুখাই করে পাকিয়ে দড়ার মত কর। একটা মুখ আমায় দাও। নীচে সেটা আমি নামিয়ে দিই। আর একটা মুখ তোমরা সকলে ধরে থাক। আমি নেমে পড়্‌ব এখন।"

সকলে বলিল—"বেশ বুদ্ধি করেছ—বাঃ।"

তখন সেই আঠারো যোড়া হাত, নেওয়ার খুলিতে, বাঁধিতে এং পাকাইতে লাগিয়া গেল। কুড়ি মিনিটের মধ্যে সমস্ত প্রস্তুত।

নিম্ন হইতে সকলে বলিয়া দিল—"আগে গিয়ে দেখ্ দরজায় খালি শিকল বন্ধ আছে না তালা দেওয়া আছে। যদি তালা দেখিস্ এসে নীচে থেকে আমাদের বলবি। যত শীঘ্র পারিস থানায় যাবি—গিয়ে দারোগাকে সব কথা বলে এখানে নিয়ে আসবি।"

"আচ্ছা, আমি নাম্‌লাম।"—বলিয়া, দড়ি ধরিয়া জানালার ভিতর দিয়া তিনকড়ি নিজেকে গলাইয়া দিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

প্রাণভয়ে ভীত ছোট বাবু, পূর্ব্বেই চুপি চুপি আসিয়া নিজের ডুপ্লিকেট্ চাবি দিয়া তালাটি এবং শিকলটিও খুলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। যুবকেরা কেহই তখন দ্বারের কাছে ছিল না, কোনও শব্দ পায় নাই। ছোটবাবু ভাবিয়াছিলেন, অনতিবিলম্বেই ইহারা জানিতে পারিবে এবং দ্বার খোলা পাইয়া পলায়ন করিবে—তাহা হইলে ভবিষ্যতে 'কুকুরমারা' হইবার আশঙ্কা আর থাকিবে না।

দরজা খুলিয়া দিয়া ছোটবাবু আবার আপিসে ফিরিয়া গেলেন। দেখিলেন, গোবর্দ্ধন বাবু সেই লম্বা টেবিল খানির উপর খানকতক লাইন ক্লিয়ার বহি মাথায় দিয়া মলিদা মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছেন। ছোট বাবু ডুপ্লিকেট চাবিটি লুকাইয়া রাখিয়া, বসিয়া আপনার কায করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে গোবর্দ্ধন বাবু একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিলেন। মলিদা হইতে মুখ বাহির করিয়া বলিলেন—"ভোর হয়েছে যে। থানায় লোক পাঠালেন ?"

ছোট বাবু বলিলেন—"না। একবেটা খালাসীকেও দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।"

"আমি নিজেই যাব না কি ? থানা কতদূর এখান থেকে ?

"এক মাইল হবে।"

"আচ্ছা মশাই, এক কায করিনা কেন ?—থানায় বলে না পাঠিয়ে বরং কল্‌কাতায় একখানা টেলিগ্রাম করে দিই, পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর জেনেরালের নামে। মিলিটারি পুলিস নিয়ে, একবারে বন্দুক নিয়ে তারা আসুক। এ সব স্থানীয় পুলিস্‌কে বিশ্বাস নেই মশায়। আমি যে এত কষ্ট করে ধর্‌লাম, দারোগা নিজে নাম নেবার জন্যে শেষে হয়ত আমায় আমলই দেবে না। টেলিগ্রাফ একখানা করে দিই, কি বলেন ?"

"সে মন্দ নয়। বেশ ত, আপনি বসে টেলিগ্রাম্ লিখুন, আমি ততক্ষণ বাসায় গিয়ে আপনার চায়ের যোগাড় করে আসি।"

"আঃ—এ সময় এক পেয়ালা গরম গরম চা পেলে ত বেড়ে হয় মশাই !—একে এই শীত, তাতে সমস্ত রাত্রি জাগরণ !"

ছোট বাবু বাসায় গেলেন। গোবর্দ্ধন বাবু কাগজ কলম লইয়া টেলিগ্রাম লিখিতে বসিলেন। অনেক কাটকুট করিয়া শেষে মুসাবিদাটা এই প্রকার দাঁড়াইল—

"আমি কার্য্যবশতঃ এ অঞ্চলে আসিয়া অদূরে কোনও গ্রামে একটি ভীষণ স্বদেশী ডাকাতী হইয়াছে জানিতে পারিয়া অনেক কষ্টে এবং কৌশলে উনিশ জন ডাকাইতকে ধৃত করিয়া একটা ঘরে তালা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি মিলিটারি পুলিস লইয়া শীঘ্র আসুন।

গোবর্দ্ধন দত্ত।"

মুসাবিদাটি দুইতিন বার পড়িয়া, গোবর্দ্ধন বাবু অবশেষে নিজ স্বাক্ষরের নিম্নে লিখিয়া দিলেন "বেঙ্গলি নভেলিষ্ট"—বাঙ্গালা উপন্যাসিক। দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল সাহেব না মনে করেন যে কোনও দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক এই টেলিগ্রাম পাঠাইতেছে—দ্বিতীয়তঃ, কে ধরাইয়া দিল সে সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কোনও গোলযোগ না হয়।

এই সময় বাহিরে গোবর্দ্ধন বাবু অনেক লোকের কোলাহল ও জুতার আওয়াজ শুনিয়া, টেলিগ্রামখানি হাতে করিয়া কৌতূহলবশতঃ বাহিরে গেলেন।

যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। সেই তাহারা—সেই দল—কাঁধে তাহাদের খাটভাঙ্গা টেবিলভাঙ্গা বড় বড় কাঠ। একজন বলিয়া উঠিল—"ঐরে, পাগড়ী মাথায় ঐ শালা।"

গোবর্দ্ধন বাবু বুঝিলেন—তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত। তথাপি প্রাণটা বাঁচাইবার জন্য একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে হয়।

সুতরাং তিনি ছুটিলেন। বিপরীত দিকে কিয়-

দূর ছুটিয়া, প্ল্যাটফর্ম্মের তারের বেড়া টপ্‌কাইয়া মাঠ দিয়া জঙ্গল দিয়া প্রাণপণে ছুটিলেন। গাছের কাঁটায় তাঁহার কাপড় ছিঁড়িল, গা ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, তথাপি তিনি ছুটিলেন। একপাটি জুতা খুলিয়া পথে পড়িয়া রহিল, এক পায়ে জুতাসুদ্ধ তিনি ছুটিলেন। ক্রমে দ্বিতীয় জুতাপাটিও খুলিয়া পড়িল, তথাপি ছুটিলেন। পায়ে কাঁটা ফুটিতে লাগিল, পাথরকুচি বিঁধিতে লাগিল ক্রমে তাঁহার গতি মন্দ হইয়া আসিল। অবশেষে হাঁফাইতে হাঁফাইতে একস্থানে বসিয়া পড়িলেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, ঘন জঙ্গল। কাণ পাতিয়া রহিলেন, ডাকাইতগণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আসিতেছে কি না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন কিন্তু কাহারও কোনও শাড়াশব্দ পাইলেন না।

মনে মনে তখন গোবর্দ্ধন বাবু ভাবিলেন, ষ্টেশনে উহারা বেশীক্ষণ অপেক্ষা নিশ্চয়ই করিবে না, কারণ নিজদের প্রাণের ভয় ত আছে। তাই ঘণ্টা দুই সেখানে বসিয়া থাকিয়া তিনি ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। পা কাটিয়া ব্যথা হইয়াছে, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিতে লাগিলেন। পথ ভুলিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেলা ৯টার পর ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন।

ডাকাইতগণ কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইলেন না। অনুসন্ধানে জানিলেন, ছোট বাবু বাসায় গিয়াছেন। বাসায় গিয়া ছোট বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

ছোট বাবু হাসিয়া বলিলেন—"কি, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? ডাকাতেরা আপনাকে খুঁজছিল যে।"

গোবর্দ্ধন বাবু নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় গেল তারা?"

"তারা এতক্ষণ কলকাতায় পৌঁছে গেছে।"

ছোট বাবু তখন যুবকগণের নিকট যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, বাদসাদ দিয়া বর্ণনা করিলেন। অবশ্য নিজে গিয়া যে তালা খুলিয়া দিয়াছিলেন, সেটুকুও গোপন রাখিলেন।"

গোবর্দ্ধন বাবু বলিলে—"আচ্ছা, কি করে বেরুল তারা?"

"সে মশায় আশ্চর্য্য কৌশল! সাতটার ট্রেণে তারা চলে গেলে, আড়তে গিয়ে দেখ্‌লাম কি না। বাইরে তালা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি রয়েছে। খাট ভেঙ্গে, নেওয়ার খুলে তারই মই তৈরি করেছে, করে সেই জানালার ফুটোয় উঠে, একে একে টুপ্‌ টুপ্‌ করে বেড়িয়ে পড়েছে। উঃ—কি কৌশল, কি সাহস!"

গোবর্দ্ধন বাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—"দেখুন, তারা ডাকাতই বটে, বিয়ের বরযাত্র নয়। বিয়েতে বরযাত্র এসেছিল এটা আপনাকে মিথ্যে করে বলে গেছে।—যা হোক্, আমার নামটাম তাদের বলেননি ত?"

"রামঃ। আমাকে অনেকবার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে বটে কিন্তু আমি বল্লাম—'মশায়, কত লোক আসছে কতলোক যাচ্ছে, কতলোকের খবর রাখ্‌ব বলুন। তবে হাঁ, মলিদাচাদর গায়ে,মাথায় পাগড়ী জড়ানো একটা লোককে প্লাটফর্ম্মে রাত্রে দেখেছিলাম বটে। ঐ যা বল্‌ছেন আপনারা, বোধ হয় পাগল টাগল হবে।"

গোবর্দ্ধন বাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "নামটি আমার বলেন নি যে, এইটি ভারি উপকার করেছেন। ফের যদি তারা কি তাদের দলের লোক এসে আমার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে, তবে দোহাই আপনার, বলবেন না।"—বলিয়া গোবর্দ্ধন বাবু ছোট বাবুর হাত দু'খানি জড়াইয়া ধরিলেন।

ছোট বাবু বলিলেন—"ক্ষেপেছেন, সে কি আমি বলি? জিভ কেটে ফেল্লেও না।"

ছোট বাবুর বাসাতেই স্নানাহার করিয়া দ্বিপ্রহরের গাড়ীতে গোবর্দ্ধন বাবু কলিকাতা রওয়ানা হইলেন।

পরদিন ডাকেই ছোট বাবু একটি বৃহৎ বুকপ্যাকেট্‌ পাইলেন—গোবর্দ্ধন বাবু তাঁহাকে নিজ গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ একসেট উপহার পাঠাইয়াছেন। প্রত্যেক পুস্তকে উপহারে কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন, "আপনার চিরকৃতজ্ঞ গোবর্দ্ধন।"

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

শ্রুতি-স্মৃতি

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শুনিয়াছিলাম, দেবাদিদেবের 'ভার' বহন করিলে এ সংসারে আর দুঃখের ভার বহন করিতে হয় না, তাই দুঃসহ সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত পাষাণ-প্রাঙ্গণে 'ভার' স্কন্ধে করিয়া মানুষ মহাদেবের মন্দির কোনমতে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া লয়। হায় মানুষের দুরাশা! গেরুয়া পরিয়া নগ্ন পদে ভার স্কন্ধে সখের সন্ন্যাসী সাজিয়া সাতবার বৈদ্যনাথের পাষাণ-মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেই যদি সংসারের দুঃখভার হইতে নিষ্কৃতি লাভের পথ পাওয়া যাইত, তবে আর ভাবনা কি ছিল! কত মানুষ বৈদ্যনাথের পাষাণ-প্রাঙ্গণতলে তাহার নগ্ন পদদ্বয় দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, তথাপি সংসারের জ্বলন্ত অঙ্গারাস্তীর্ণ পথে চলিবার দুঃসহ দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। দুর্ব্বহ দুঃখের বোঝা মাথায় লইয়া ভাষাহীন মৌনমুখে দীর্ঘপথ অতিবাহিত করিবার সময় মেরুদণ্ড কেমন করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, এই দুঃখযাত্রার পথের পাংশুর উপরে তাহার শেষ-শয়ন কেমন করিয়া বিছাইয়া লয়, সে ইতিহাস মানবের অন্তর্যামী পাষাণ-দেবতার পাদপীঠতলে গিয়া পহুঁছায় কি?—কে বলিবে! 'ভার' স্কন্ধে লইয়া সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম; পূজার অঙ্গীয় যাহা কিছু করিতে হয়, পাণ্ডার উপদেশমত সমস্তই করা হইল; দক্ষিণান্ত করিয়া 'সুফল' লইয়া এখন বাসায় ফিরিবার পালা। দক্ষিণান্তের ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই মহিমখুড়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং সে অধ্যায় শেষ হইতে বিশেষ সময় লাগে নাই, 'সুফল'ও যথাসম্ভব সত্বরতার সহিতই লাভ করা গেল। প্রাতে উঠিয়া কল-বিহঙ্গ-কূজন-মুখরিত ঊষার মৌক্তিকালোকে ভক্তি-বিনম্র-হৃদয়ে স্থূল শরীরের বিরোধী ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তির কামনায় দেবাদিদেব ভগবান ভোলানাথের মন্দিরাভিমুখে প্রসন্ন মনেই চলিয়াছিলাম; শিবগঙ্গায় অবগাহন করিয়া, শ্মশানবিহারীর প্রসন্নতার কামনায় শ্মশানভস্মভূষিতাঙ্গে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিয়া, রক্ত-কৌষেয়বাসে অঙ্গ আবৃত করিয়া পবিত্র মনে যখন মহাদেবের পূজায় বসিয়াছিলাম, পূজান্তে পুষ্পদন্ত বিরচিত সদ্যফলপ্রদ মহিম্নস্তোত্রের যখন আবৃত্তি করিতেছিলাম—

> "অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং
> সুরতরুবরশাখালেখনী পত্রমুর্ব্বীম্।
> লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
> তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥"

প্রভৃতি শ্লোকে যখন ভূতভাবন ভবানীপতির অপার বিভূতির কল্পনায় সমস্ত বুদ্ধি মন আত্মা অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল, সময় তখন আনন্দেই কাটিয়া গিয়াছে। খর সূর্য্যকিরণ-প্রতপ্ত প্রাঙ্গণে সন্ন্যাসীর বেশে যখন 'ভার' স্কন্ধে মন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরি, তখন পদতল দগ্ধ হইয়া গেলেও সে দাহ-বেদনা মন পর্য্যন্ত পহুঁছিতে পারে নাই; ক্ষণিক কষ্টে সংসারের দুর্ব্বহ দুঃখভার হইতে চিরনিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে এ প্রলোভন দুঃখ-দৈন্য-আধি-ব্যাধি-পরিপূর্ণ সংসারের জীবের পক্ষে কম প্রলোভন নহে। কিন্তু সর্ব্বকর্ম্মান্তে 'বৈগুণ্য' সমাধান করিয়া সমাসন্ন সন্ধ্যার স্তিমিতালোকে শ্রান্তপদে যখন বাসায় ফিরিতেছি, মহাদেবের প্রাচীর-পরিবেষ্টিত বৃহৎ পুরীর তোরণদ্বার যেমন উত্তীর্ণ হইয়া পথে বাহির হইয়াছি, কোন্ অদৃশ্য স্থান হইতে দশ বারো জন 'বাজনদার' ঢাক কাঁধে করিয়া তাহার প্রচণ্ড শব্দে শিবপুরীর শান্তি ভঙ্গ করিয়া দিল বুঝিতে পারিলাম না। তাহার মাধুর্য্যবিহীন প্রবল শব্দে শ্রবণ-পটহ বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। দেবধামীর সমস্তই আশ্চর্য্য এবং আমার পক্ষে অদৃষ্টপূর্ব্ব। মনে করিয়াছিলাম এই ঢক্কা-নিনাদও বুঝি মহাদেবের প্রীত্যর্থ নিত্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যাঁহার পট্টাম্বর ও বাঘাম্বরে সমজ্ঞান, ভুজঙ্গে ও মৌক্তিকস্রজে যাঁহার ভেদবুদ্ধি নাই, মহীমহেন্দ্র ও অকিঞ্চনে যাঁহার সমদৃষ্টি,

বৈকুণ্ঠ অলকা কৈলাসে ও শকুনি-সেবিত শিবা-রবাকুল শ্মশানে যাঁহার সমপ্রবৃত্তি—তাঁহার প্রীতির জন্য সান্ধ্য-নিস্তব্ধতার শান্তিভঙ্গকারী ঢাক দৈনিক একবার বাজিয়া উঠিবে উহা আর বিচিত্র কি ? যখন দেবমন্দির-সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া আমার বাসার দিকে চলিয়াছি, তখনও ঢাকীর দল আমার পশ্চাতে তাহাদের আতঙ্কপ্রদ যন্ত্রগুলি বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে দেখিয়া পাণ্ডা পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ব্যাপার কি ?" সে কহিল, বৈদ্যনাথের এই প্রথা, যাত্রী আসিয়া পূজা দিলে তাহারই প্রীতির জন্য এই সুমধুর যন্ত্রসঙ্গীত হইয়া থাকে—আশা যে, যাত্রীও দান দক্ষিণায় যন্ত্রীপ্রবরের প্রীতি উৎপাদন করিবেন। আমি ভাবিলাম, কি সর্ব্বনাশ ! এমন যন্ত্র না বাজাইয়া, যে হাতে বাজায় সেই হাত দুইটা পাতিলেই ত তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারি—ঢাক বাজাইয়া দাতার কাণের মাথা এ আঁটকুড়ির নন্দনেরা খায় কেন ?—তখন ব্যাকুলনেত্রে মহিমখুড়ার দিকে চাহিলাম। সে চাহনির অর্থ,"খুড়া, কাণ প্রাণ দুই যে যায় ; এ বিপদ হইতে রক্ষা কর।" খুড়া আমার চক্ষুর দৃষ্টিতে বুঝিলেন, আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায় হইয়াছে। তিনি টাকার থলিটা বাহির করিতেই ঢাকীর দল আমায় ছাড়িয়া তাঁহারই চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে দাঁড়াইল এবং সে সময়ের বাদ্যোদ্যম শুধু বৈদ্যনাথ কেন, বোধ করি শিব-রাজধানী কৈলাসে গিয়া পঁহুছিয়াছে। আমি মনে করিলাম, নিরাপদ হইয়াছি। ও মা, এ কি ব্যাপার ! নিমেষমধ্যে দেখি, আর এক সম্প্রদায় বাদ্যকর তাহাদের "ওৎ পাতিবার" প্রচ্ছন্ন গলির মধ্য হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া অমানুষিক উৎসাহে নিজ নিজ ঢক্কায় নির্ম্মম হইয়া লগুড়াঘাত করিতেছে, এবং পলকমধ্যে আমাকে ঘেরিয়া ফেলিবে সেইরূপ উদ্যম ও চেষ্টার লক্ষণও তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে দেখিলাম। সে বিশাল ঢক্কারবে দিক্‌হস্তী পর্য্যন্ত অস্থির হইয়া উঠে, দিগঙ্গনাগণের কা কথা। মহিমখুড়া যেখানে পূর্ব্ব ঢাকীবৃন্দকে অর্থদান করিতেছেন, সে স্থানটা অঙ্গুলিসঙ্কেতে ইহাদিগকে দেখাইয়া দিলাম। তাহারা একলম্ফে সেইদিকে গিয়া হাজির হইল ; আমি নিষ্কৃতি পাইলাম। দুই পা অগ্রসর না হইতেই আর একটা ক্ষুদ্র গলির মধ্যে লোকসমাগমের সন্দেহ মনে উদয় হইল। যা ভাবিয়াছি তাই—আর এক সম্প্রদায় বাদ্যকর; বাস্‌রে ! গৈরিক পরিহিত বিভূতিভূষিতাঙ্গ রুদ্রাক্ষ-বিলম্বিত সন্ন্যাসীর আশ্রমোচিত গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা এই নবীন সন্ন্যাসীর পক্ষে তখন কঠিন হইল। আমি গত্যন্তর না দেখিয়া প্রাণভয়ে পার্ব্বতীপাণ্ডার বাসার অভিমুখে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলাম। আক্রমণকারী বাদ্যকর-সম্প্রদায় শীকার পলায় দেখিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইবার উদ্যম করিল বটে, কিন্তু পর্ব্বতপ্রমাণ চর্ম্ম-যন্ত্রটা স্কন্ধে করিয়া, ব্যায়ামপটু ক্ষিপ্রগতি প্রাণভয়ভীত জগদিন্দ্রের সঙ্গে দৌড়াইয়া পারে হেন সাধ্য তাহাদের ছিল না। আমি নিরাপদে বাসায় পহুঁছিয়া গেলাম। গৈরিকধারী কিশোর সন্ন্যাসী নগ্নপদে রুদ্ধশ্বাসে দৌড় দিয়াছে, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দশবিশজন ঢাক কাঁধে করিয়া বক্‌শিসের জন্য তাড়া করিয়াছে—এ দৃশ্য বৈদ্য-নাথধামে আর দেখা গিয়াছে কি না সে ইতিহাস আমি অবগত নহি। স্বীকার করিতেছি, ওরূপ প্রগল্‌ভতা সন্ন্যাসীর পক্ষে শোভন হয় নাই, কিন্তু প্রাণের ভয় বড় ভয় ; ওরূপ অবস্থায় পলায়নই স্বাভাবিক কিনা তাহা আমার পাঠক পাঠিকাগণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আমাকে দোষী করিবেন না সে সাহস আমার আছে।

বাসায় আসিয়া নিমেষের মধ্যে উপর তালায় গিয়া রাস্তার ধারের বারান্দায় দাঁড়াইয়াছি, আমার চিরসঙ্গী ভৃত্য নবীনচন্দ্র (হায়, আজ সে তাহার এই চির-অক্ষম প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রামার্থ লোকান্তরে চলিয়া গিয়াছে) আমার সন্ন্যাসবেশ ত্যাগ করাইবার জন্য কাপড় আনিতে কক্ষান্তরে গিয়াছে, এমন সময়ে দেখি প্রায় ৫০।৬০ জন ঢাকী কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া খুল্লতাত মহিমচন্দ্র উন্মত্তের মত বিকট মুখভঙ্গী করিতে করিতে বাসার দিকে যথাসম্ভব দ্রুত-পদক্ষেপে আসিতেছেন ; বাদ্যকর সম্প্রদায় মহাদর্পে, মহোল্লাসে তাহাদের নিজ নিজ যন্ত্রের উপর নির্ম্মম প্রহার করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে নৃত্য-ভঙ্গীতে চলিয়াছে। মহিমখুড়ার হাতে

একটি ছাতা, সেই ছাতাটি আতপ-তাপ নিবারণের জন্য সঙ্গে ছিল; কিন্তু ঢক্কানিনাদ তাঁহাকে সূর্য্য-রশ্মি সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন করিয়া দিয়াছিল। তিনি সেই ছাতাটি গুটাইয়া তাহাকেই ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ ঢাকীদিগের উপর ব্যবহার করিতে উদ্যত হইতেছেন। কিন্তু কলির ব্রহ্মাস্ত্রে তাদৃশ তেজ নাই জানিয়া ঢাকীবর্গ সেই অমোঘ প্রহরণের প্রতি যৎপরোনাস্তি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিতেছিল—এ দৃশ্য দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারে এমন লোক বাঙ্‌লা দেশে বোধ করি নাই। বাদ্যকরদিগের দুর্ব্যবহারে উন্মত্ত প্রায় খুল্লতাত মহিম তাহাদের এবং তাহাদের অনুপস্থিত আত্মীয় স্বজনগণের উদ্দেশে বঙ্গভাষায় যে সকল মাধুর্য্যহীন শব্দ উচ্চারণ করিতেছিলেন, তাহা ঢাকীর দল বুঝিতে পারিলে, ঢাকের কাঠি মহিম খুড়ার মস্তকে ও পৃষ্ঠদেশে পড়িত না এমন কথা বলিতে পারি না। এখন আমার পাঠক পাঠিকাগণকে করযোড়ে জিজ্ঞাসা করি, সন্ন্যাসীর বেশে দ্রুতধাবনে যে চাপল্য আমি প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহার কি যথেষ্ট কারণ ছিল না?

আমার পাঠক পাঠিকাগণের নিকট অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক হইলেও আমার চির-সহচর, চির-ভক্ত, চির-হিতৈষী, চির-বন্ধু, চির-সেবক নবীনচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদটা আমার এই জীবন-কথার মধ্যে না দিয়া আমার মন মানিল না। এই জীবনেতিহাসের সম্পর্কেই নবীনচন্দ্র আমার পাঠকপাঠিকার সহিত পরোক্ষ সম্বন্ধে পরিচিত হইয়াছিল। এই অকিঞ্চনের সেবাপরায়ণ ভৃত্যরূপে তাহাকে আমি পরিচিত করাই নাই; সে যে ছায়ার মত আমার অনুগমন করিয়াছে, সহোদরের মত আমাকে ভালবাসিয়াছে, বন্ধুর মত আমার হিতকামনা করিয়াছে—সেই কথাটাই আমি আকার ইঙ্গিতে আমার পাঠক-পাঠিকাকে জানাইয়াছি। আজ সে ইহলোকের স্তুতি-নিন্দার অতীত কোন্ মহৈশ্বর্য্যময় লোকে গিয়াছে তাহা সর্ব্বলোকের ঈশ্বর যিনি তিনিই জানেন। আজ আর আকার ইঙ্গিতে নহে, আজ তাহার বিয়োগ ব্যথার তপ্ত অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে, আমার প্রতি তাহার সোদরোচিত স্নেহ ও বন্ধুজনোচিত হিতৈষণার দুই একটি কথা বলিব। পরলোকগত সেই মহাপ্রাণ সেবকটির কিঞ্চিৎ পরিচয় না দিলে আমার এই জীবন-কথা অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে।

নবীনের পিতা আমার পিতার চাকর ছিল। সেই সূত্রে নবীনচন্দ্র অতি শৈশবেই রাজবাটীতে গতায়াত করিত; এমন কি যখন সে হাঁটিতেও শিখে নাই সে সময়েও তাহার পিতার কোলে চড়িয়া সে রাজবাটীতে আসিয়াছে। অতি বাল্যকালের অনেক কথা আমার স্মরণ আছে,—অনেকেরই থাকে। আমার মনে আছে, নিতান্ত শৈশবে আমি এবং আমার দুই ভগিনী (রাজ-কুমারীদ্বয়, আমার সহোদরা নহে) যখন প্রাতে ও সন্ধ্যায় আহার করিতে বসিতাম—তখন নিজহাতে ভাত খাইবার বয়স আমাদের কাহারই নহে,—আমার মাতা (স্বর্গগতা মহারাণী নজসুন্দরী দেবী) আমাদিগকে খাওয়াইয়া দিতেন। এক থালায় ভাত মাখিয়া আমাদের ভ্রাতা ভগিনীর, মুখে দিয়া, অদূরে উপবিষ্ট শূদ্র বালক নবীনের হাতেও অন্নমুষ্টি তুলিয়া দিতেন। সংস্পর্শ-দোষে ব্রাহ্মণ বালকবালিকা আমাদের জাতি যাইবে সেই আশঙ্কায় নবীনকে তখন খাওয়াইয়া দিতেন না। যখন দেখিতেন বালক নবীন নিজহাতে ভাল করিয়া খাইতে পারিতেছে না, তখন বলিতেন, "নবীন, তুই একটু বসিয়া থাক্, খোকা খুকীদের খাওয়া হইয়া গেলে তোকে খাওয়াইয়া দিব।" আমার মার হাতে খাইতে পাইবে এই আনন্দে বালক নবীন নিস্পন্দভাবে আহারের স্থানে বসিয়া থাকিত, এই দৃশ্য আমার এখনও মনে পড়ে; এবং আজ নবীন নাই, আমার মাও জীবিতা নাই, আজ সে কথা দিনে কতবার কেমন করিয়া মনে পড়িতেছে তাহা বলিতে গেলে চক্ষুর জলে দৃষ্টি-লোপ হইয়া যায়। সেই শৈশব সময় হইতেই নবীনচন্দ্র আমাদের পরিবারে দাসপুত্ররূপে প্রতিপালিত হয় নাই; সে যেন আমাদের ভ্রাতা-ভগিনীদেরই একজন, আমার মাতারই সন্তানের মত। আমি চিরদিন তাহাকে সেই

চক্ষেই দেখিয়াছি, সেও আমার মাতৃহস্ত-দত্ত সেই অন্ন-পানের মর্য্যাদা তাহার জীবনের শেষতম নিমেষ পর্য্যন্ত অতি যত্নে রক্ষা করিয়া গিয়াছে। যখন আমি পাঠশালে যাইতে আরম্ভ করিলাম, সেও তালপত্র কাগজ দোয়াত কলম প্রভৃতি ঝুলির মধ্যে নিয়া কাঁধে ঝুলাইয়া পড়িতে যাইত। তাহার পিতৃস্বসার স্নেহাধিক্যে বেশীদিন তাহার বিদ্যাশিক্ষা করা হইল না। সে কুমারের (অর্থাৎ আমার) ভৃত্যরূপে জীবনপাত করিয়া দিবে এই ব্যবস্থা তাহার স্নেহশীলা পিতৃস্বসা করিয়া দিয়াছিল। সেও অনন্য-কর্ম্ম হইয়া শোণিত-সম্বন্ধের বাড়া করিয়া চিরকাল আমার সেবা যত্ন ও শুশ্রূষা করিয়া গিয়াছে, সে ঋণ আমি জন্মে জন্মেও পরিশোধ করিতে পারিব না। অতি অল্প দিন পূর্ব্বে, আষাঢ় মাসের এক শেষ-রাত্রিতে আমার কলেরার মত হইয়াছিল। রাত্রি সাড়ে তিনটার সময়ে আমার ভয়ঙ্কর পীড়ার সূত্রপাত হয়। কিছুকাল পর্য্যন্ত কাহাকেও জানাই নাই যে আমার হয়ত বা সাঙ্ঘাতিক পীড়াই হইল। কিন্তু প্রথমবার বমনের শব্দ নবীনের কাণে যাইতেই সে দৌড়াইয়া আমার ঘরে যায় এবং রোগ উপশমের লক্ষণ যতক্ষণ হয় নাই, সে আমার শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিয়া আহার পর্য্যন্ত করিতে যায় নাই। বিসূচিকার লক্ষণযুক্ত রোগীর শুশ্রূষা করা কি পরিমাণ কঠিন, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। কিন্তু একক নবীন তাহার এই প্রাচীন অবস্থাতেও যাহা করিয়া গিয়াছে, তাহা কোন শোণিত-সম্বন্ধবিশিষ্ট আত্মীয়ের দ্বারাও সম্ভব হইত না, এবং হইবে না ইহা আমি মুক্তকণ্ঠেই বলিলাম। ভেদ, বমন, পিপাসা, পেটের ব্যথা—সমস্ত লক্ষণগুলিই হইয়াছিল। শেষ রাত্রির বিসূচিকা প্রায়শঃই মারাত্মক হয় একথা আমার শোনা ছিল, কিন্তু আমার অন্ধকারে অনির্দ্দেশ-যাত্রার মুহূর্ত্তে বিয়োগভয়াকুল সাশ্রু নেত্রে দাঁড়াইবার পাত্র আমার সম্মুখে নাই এবং মৃত্যু যথার্থ হইলে তৎ-পূর্ব্বে আসিবারও কোন সম্ভাবনা নাই, এমন সময়ে আমার দেহ মনের কি অবস্থা তাহা আমার পাঠক-পাঠিকা অনায়াসে অনুমান করিতে পারিবেন। কিন্তু সেই জীবন মরণের সন্ধিস্থলে শুইয়া আমার চির সহচর নবীনচন্দ্র কি সেবা করিয়াছে তাহা দেখিয়াছি এবং নানা কারণে নিরাশ মনকে সবল করিবার উপযোগী কত আশ্বাস-বাণীই যে আমাকে সেদিনে শুনাইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া আজ চোখের জলে আমার দৃষ্টিলোপ হইয়া যাইতেছে।

এইরূপ সেবা আমার সে একবারমাত্র করিয়াছে তাহা নহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমি বিধি-বিড়ম্বনায় শৈশবে অন্ধ হইয়া চিকিৎসার্থ আটবৎসর বয়ঃক্রমকালে দূরদেশে প্রেরিত হই, সেই হইতেই আমি দাস-দাসীর সেবা যত্নেই মানুষ হইয়াছি। যতদিন রামলাল দাদা ও রামধন দাদা জীবিত ছিল (উহারা উভয়েই আমার পিতার সময়ের চাকর ছিল) আমার জন্য যাহা কিছু করিবার প্রয়োজন তাহা তাহারাই করিত; তাহাদের মৃত্যুর পরে নবীনচন্দ্র ছায়ার মত আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়াছে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত ভালবাসিয়াছে, ক্রীত-দাসের মত সেবা করিয়াছে। এমন অনেক আপদ জীবনে উপস্থিত হইয়াছে যে, সে সময়ে নবীনচন্দ্র তৎপর হইয়া কায়মনে চেষ্টা না করিলে এই জীবন-কথার লেখক আজ বাঁচিয়া থাকিয়া আপনাদিগকে তাহার দুঃখময় অকিঞ্চিৎকর জীবনেতিহাস শুনাইবার অবসর পাইত না। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পর আমি নিতান্ত যাতনাপ্রদ অর্শরোগে শয্যাশায়ী হই, তখন আমার বয়স সতের বৎসর। রাজসাহীর সিভিল সার্জ্জন আসিয়া দুইবার আমাকে ক্লোরোফর্ম্ম করিয়া আমার দেহে অস্ত্র প্রয়োগ করেন, কিন্তু কোন ফল হয় না; কেবল ক্লোরো-ফর্ম্ম এবং অস্ত্র প্রয়োগের যাতনাই সার হইয়াছিল। চিকিৎসার্থ কলিকাতায় প্রেরিত হইলাম। ডাক্তার রে, ডাক্তার ম্যাক্লিওড্, ডাক্তার জহীরুদ্দিন, জগ-বন্ধু, দেবেন্দ্র রায় প্রভৃতি আমার চিকিৎসায় নিযুক্ত হন। পুনরায় তিনবার আমার শরীরে অস্ত্র প্রয়োগ হয়। আমি প্রায় বৎসরাবধি শয্যায় পড়িয়া থাকি। সেই একবৎসর কাল নবীনচন্দ্রের দিন অনাহারে এবং রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়া গিয়াছে;

যখনই চক্ষু মেলিয়া চাহিয়াছি, দেখিয়াছি, চিরসহচর সহিষ্ণু নবীনচন্দ্র বিশুষ্ক মুখ লইয়া আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছে; রোগীর সেবার সবগুলি কৃত্য সে নিজহাতে না করিয়া তৃপ্তি পাইত না। অশিক্ষিত নিরক্ষর নবীনের প্রাণ যে কত বড় ছিল তাহা দেখিবার অবসর পৃথিবীতে কেবল আমিই পাইয়াছি।

আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে ধনীগৃহের অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালকের দেহ-মনের সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট করিবার জন্য অনেক দুষ্ট লোকের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অল্প বয়সে আমারও চতুর্দ্দিকে সেরূপ 'হিতৈষী' লোকের নিতান্ত অসদ্ভাব ছিল না। আমার অভি-ভাবকবর্গ ও শিক্ষকের তাড়নায় তাহারা আমার চতুষ্পার্শ্বে শিকড় গাড়িয়া বসিবার অবসর পায় নাই সে কথা ইতিপূর্ব্বে আমার পাঠক-পাঠিকাগণকে জানাই-য়াছি। আজ একটি দিনের কথা বলিয়া, পরলোকগত নবীনচন্দ্রের নিকট আমি কি প্রকার ঋণী তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। আমার দূর-সম্পর্কের একটি আত্মীয় তাঁহার অল্প বয়সেই নানা গুণের আধার-রূপে দশের নিকট পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালককে তাঁহার সংসর্গে দেখিলে বালকের অভিভাবকেরা চিন্তিত হইয়া পড়িত—তাঁহার এতই সুযশ! সেদিনে তাঁহার কোথাও স্থান হওয়া কঠিন ছিল, কিন্তু আমাদের বাড়ীর 'চিড়িয়া-খানা'য় তাঁহার গতিবিধি অবারিতই ছিল, কারণ তিনি রাজধানীর হোমিওপ্যাথিক শত ডাইলিউসনের আত্মীয়। তিনি আসিলেন, আমার সঙ্গে 'ভাব' করিয়া নিলেন, আমার 'ঘুড়ি লাটাই লাট্টু'র সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় হইল। বয়স্ক লোক বালকের খেলা ধূলার সঙ্গে মিশিয়া গেলে সে যে বালকের কত বড় বন্ধু হইয়া দাঁড়ায় তাহা সকলেই জানেন, আমার নিকটও এই আত্মীয়-প্রবর অপরিত্যাজ্য হইয়া উঠিলেন।

এই আত্মীয়টির চরিত্রে বহু দোষের মধ্যে পান-দোষও ছিল। আমার বয়স তখন বারো তেরোর অধিক কোন মতেই হইবে না। আমার জীবনের সেই পুষ্প-পেলব দিনে আমাকে আসব-লোলুপ করিবার জন্য সেই আত্মীয়টির প্রাণপাত চেষ্টার ত্রুটী ছিল না। দোল, রাস, শারদীয়া পূজা উপলক্ষে তিনি নানাবিধ খেলনা কিনিয়া উপহার দিবার ছলে তাঁহার কক্ষে আমায় লইয়া যাইতেন এবং শ্রান্তিহারী সরবৎ আখ্যা দিয়া Champagne প্রভৃতির মধুরতার শতমুখে প্রশংসা করিতেন। নবীনের বয়স তখন ১৭।১৮ হইবে। সে যখন এই দুষ্ট আত্মীয়ের দুরভিসন্ধি বুঝিল তখন অকুতোভয়ে সেই বয়স্ক লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিল, "মহাশয়, সরবৎ আপনিই পান করুন, ইঁহাকে উহা দিবেন না। যদি আমার কথায় আপনি নিবৃত্ত না হন্, আমি মহারাণী মাতার নিকট একথা জানাইয়া আপনাকে রাজধানী ছাড়াইব, নিশ্চয় জানি-বেন।" এই বলিয়া সে আমার হাত ধরিয়া টানিয়া সে ঘর হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেল। আমি হতভম্বের মত তাহার সঙ্গে চলিলাম। খেল্‌নাগুলি পর্য্যন্ত লইবার অবসর সে আমায় দিল না। অন্তরালে লইয়া গিয়া সে আমায় কহিল, "ও সব খেলনা তোমার লইতে হইবে না, তোমার খেল্‌নার অভাব কি? যাহা চাও আমি তোমায় আনিয়া দিব। তুমি '—বাবুর' নিকট আর কখনও যাইও না, ও লোক ভাল নহে, ও তোমায় মদ খাওয়াইবার ফিকিরে ফিরিতেছে।" সে বয়সে মদের নামে মহা আতঙ্ক আমার ছিল, (সকল বালকেরই বোধ করি থাকে)। সেই দিন হইতে নবীন আমাকে সেই আত্মীয়ের ত্রিসীমায় যাইতে দিত না। সর্ব্বদা ছায়ার মত ফিরিয়া আমায় তাঁহার সংসর্গ হইতে রক্ষা করিত। শৈশবে যখন পীড়িত হইয়া শয্যা লইতাম, তখন মাতার অশ্রান্ত সেবা আমায় অনেকবার প্রাণদান দিয়াছে। কিন্তু যে বয়সে শিশু মাতৃক্রোড় বিনা আর কিছুই জানে না, সেই অনুত্তীর্ণ-শৈশবেই আমাকে বিধি-বিড়ম্বনায় রোগের তাড়নায় দেশ বিদেশে ঘুরিতে হইয়াছে। সেই সময় হইতেই আমি দাসদাসী ও ভৃত্য-দিগের তত্ত্বাধীনে জীবন অতিবাহিত করিতেছি। প্রাপ্ত-বয়সে কার্য্যভার লইয়া সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্ব

হইতেই নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতার মধ্যে সমস্তই বিরস বলিয়া বোধ হইত। দুর্দ্দমনীয় দেশভ্রমণ-পিপাসা আমার মধ্যে দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছিল, সে কথা আমি পূর্ব্বে জানাইয়াছি। সমগ্র জীবনব্যাপী এই পর্য্যটন-ব্রতের সঙ্গী ছিল আমার ওই নবীনচন্দ্র। নির্ব্বান্ধব দেশদেশান্তরের পথে প্রান্তরে, তীর্থভূমির যাত্রী-নিবাসে, মরুপ্রদেশের মৃগতৃষ্ণিকার মধ্যে, পর্ব্বতশৃঙ্গের দুরারোহ অপরিসর উপলাস্তীর্ণ বর্ত্মে, ঝটিকাবিক্ষুব্ধ নদীতরঙ্গে, লবণাম্বুরাশির বালুবেলায়, জনাকীর্ণ নগরীর রোগাকুল পান্থশালায়,শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের পথহীন দুর্ভেদ্যতার মধ্যে কতদিন কত দুঃখে, রোগে, মনস্তাপে—কত অনাহারে ও কত অনিদ্রায় কত কষ্টই পাইয়াছি, তাহা জানি কেবল আমি—আর জানিত সেই চির পুরাতন চিরসঙ্গী ভৃত্য, আমার নবীনচন্দ্র।

সুখে দুঃখে রোগে শোকে সুদিনে দুর্দ্দিনে তাহার মত বন্ধু সেবক আমার আর কেহ ছিল না এবং ভবিষ্যতে হইবে সে আশা করিবার মত আমার শুভাদৃষ্টের পরিচয় আমি আজও পাই নাই। জীবনাকাশে আয়ুঃসূর্য্য আজ অস্তশিখরীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; ভাবিয়াছিলাম আমার এই দৃষ্টিক্ষীণ চক্ষু-তারকা যেদিন স্থির হইবে, সেদিনের সেবাটুকুও নবীনই করিবে এবং বিষণ্ণমনে আমার শবদেহের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশান পর্য্যন্ত যাইয়া আমার ইহ-পৃথিবীর শেষ সেবার কাজও সেই করিয়া যাইবে। বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ হইল। আজ তাহার শ্রাদ্ধের উদ্যোগ আমাকেই করিয়া দিতে হইতেছে। এরূপটা ঘটিবে তাহা ভাবি নাই। যখন চরম-দিনে একান্ত কাতর হইয়া শেষ শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিব, সেদিন আমার তৃষিত ওষ্ঠপ্রান্তে জলবিন্দুটুকু কে তুলিয়া ধরিবে, কাহার হস্ত আমার মরণাহত লুণ্ঠিত মস্তকের আশ্রয় স্বরূপ হইবে,—তাই ভাবিয়া এই সমাসন্নপ্রায় সন্ধ্যায় আজ আকুল হইতেছি। আমার পাঠক পাঠিকাগণের নিকট এই সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির সুদীর্ঘ চরিত-চিত্র অবান্তর ও একান্ত অনাবশ্যক হয়ত মনে হইবে। কিন্তু আমার জীবনের সঙ্গে এব্যক্তি বড় ঘনিষ্ঠ ভাবে সংসৃষ্ট থাকায় আমার জীবন-কথায় ইহা অবান্তর নহে। একান্ত অনুগত হিতৈষী চিরসহচরের বিয়োগে শোকাচ্ছন্নের প্রলাপ আমার পাঠক পঠিকারা ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন এ আশা আমার আছে, নতুবা যে ব্যথা নিতান্ত একা আমারই, তাহা এমন অকপটে দশের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া ধরিতাম না। নবীনচন্দ্র তাহার চির-অক্ষম প্রভুকে একাকী ফেলিয়া আজ লোকান্তরের শান্তির কামনায় পলাইয়া গিয়াছে। আমার স্নানে আজ বিলম্ব হইলে দশবার আসিয়া তাড়া দেয়, কম আহার করিলে নিতান্ত প্রিয়জনের মত সস্নেহে আরও দু'টি খাইবার অনুরোধ করে, মনোব্যথায় বিষণ্ণ মলিন মুখ দেখিলে দণ্ডে দশ-বার আকুল নয়নে মুখের পানে চায়, বিনিদ্র নিশীথে দুঃখাভিভূত জাগরণশীলকে শতবার করিয়া শয়ন করিতে কাতর মিনতি জানায়—এমন একটি লোকও আজ আমার নিকটে নাই। আমার ক্ষুদ্র পৃথিবীর কতখানি শূন্য করিয়া সে চলিয়া গিয়াছে তাহা কেবল আমিই জানি। *

বৈদ্যনাথের পূজা শেষ হইল, মহিম খুড়া বাটীর মধ্যে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া কোন মতে ঢাকীর দলের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। আমি সন্ন্যাসী-বেশ ত্যাগ করিয়া সমস্ত দিনান্তে কিছু আহার করিবার চেষ্টায় এদিক ওদিক করিতেছি, এমন সময়ে খুড়া কহিলেন, "আজ চর্ব্ব্য চোষ্য আহার চলিবে না, বৈদ্যনাথের মানত পূজার দিনে হবিষ্যান্নেই ক্ষুন্নিবারণ বিধি।" আমি প্রমাদ গণিলাম। সমস্ত দিবসের অনাহার ও শ্রান্তির পরে ক্ষুধায় পৃথিবী গ্রাস করিবার ইচ্ছা হইতেছিল, এমন সময় খুল্লতাতের নিদারুণ বাণী আমার কর্ণে মধুবর্ষণ করিল না এ কথা বলা বাহুল্য; কিন্তু উপায় কি আছে! খুড়া এবং আচার্য্য-গুরু তিনি একাধারে দুই-ই, তাঁহার আদেশ অলঙ্ঘনীয়।

* বিগত ২২ শে জুন তারিখে নবীনচন্দ্রের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে।—লেখক।

তাহার উপর পাণ্ডা পার্ব্বতী মহাবিজ্ঞের মত আধা বাঙ্গালা আধা হিন্দীতে মিশাইয়া মত প্রচার করিলেন —"সে ত ঠিক কোথা, মহিম বাবু যেমোন্ বোল্লেন্ সে কোথা বরাবর যোথার্গো।" একজনের আদেশ করা ও অপর জনের সেই আদেশের সহিত একমত হওয়া যতটা সহজ, আমার পক্ষে সে আদেশ পালন করা ততটা সহজ ছিল না। কারণ হবিষ্যান্নে গররাজি আমি ছিলাম না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বপাকের ব্যবস্থা করিয়াই আমাকে বিপন্ন করিয়াছিলেন। আমি রন্ধনে দ্রৌপদী নহি সে কথা বহু পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। কিন্তু গত্যন্তর না থাকায় "বল্লভীয়" কর্ত্তব্যভার স্কন্ধে লইয়া তাহার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলাম। অর্দ্ধপক্ক আতপতণ্ডুল, অপক্ক রম্ভা (অর্থাৎ কাঁচকলা) এবং নিতান্ত দুর্ব্বিনীত অর্দ্ধসিদ্ধ মটরের দাল দিয়া সে সন্ধ্যায় হবিষ্যাশী শৈব সন্ন্যাসীর কোন মতে ক্ষুন্নিবারণ হইল। মহিম খুড়া ও মাতুল অভয়ানাথের চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুঃষষ্টি উপকরণের সমীচীন আহার্য্য সম্মুখে দেখিয়া এই কিশোর-বয়স্ক যোগীর তৃতীয় রিপুটি প্রবল বেগে মথা নাড়া দেয় নাই একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে।

হাতোয়া কি বেতিয়া ঠিক আজ স্মরণ নাই, এতদুভয়ের কোনও এক রাজার অর্থানুকুল্যে বৈদ্যনাথের মন্দিরে অষ্টপ্রহর নহবৎ সেদিনে বাজিত; পশ্চিম প্রদেশীয় সেই শানাইওয়ালার বাঁশীতে দ্বিপ্রহরে 'গৌড় সারঙ্গ' এবং সন্ধ্যায় 'গৌরী' রাগিণীর যে মধুর আলাপ শুনিয়াছিলাম তাহার আবেশময় রেশ আজও কাণে লাগিয়াই রহিয়াছে। তাহার পরে বহুস্থানের দেবমন্দিরে, বহু সমৃদ্ধ লোকের বিবাহ বাসরে, অনেক 'ললিত' 'পূরবী' 'কানাড়া' 'সাহানা'র মিড় মূর্চ্ছনার সহিত 'বিস্তারিত আলাপচারি' শুনিয়াছি, কিন্তু "ত্রিয়ম্বকের" তৃপ্তির জন্য বাঁশী সেদিনে যেমন করিয়া বাজিয়াছিল, আমার কাণে তেমন করিয়া আর কখনও বাজিল না। বাঁশীতে সেদিন গৌড় সারঙ্গের সর্ব্বজনবিদিত খেয়াল—

যোগীয়ারে তু কাহে বীণা বাজাওয়ে

সুর বাজিতেছিল। ঐ গান আমি আরও কতবার রৌশন্ চৌকী ও নহবতের বাঁশীতে এবং গায়কের মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু সেদিনের মত আর শুনিলাম না।

রাত্রি এক প্রহরের 'চৌকী'তে বাঁশীওয়ালা যখন 'ছায়ানট' ও 'কেদার' ধরিয়াছে তখন সেই সকল রাগের 'জানসুর' গুলির করুণ রোদন-গুঞ্জন শুনিতে শুনিতে কখন নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম মনে নাই। যখন জাগিলাম তখন দেখি, যাহার আরোগ্য কামনায় মহাদেবের নিকট এত 'মানত', আমার পুরাতন বন্ধু সেই দুরারোগ্য ও দুশ্চিকিৎস্য শূল ব্যথায় আমার শ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিতেছে। চিকিৎসক কেহ সঙ্গে ছিলেন না, সাঁওতাল পরগণার ক্ষুদ্র 'মহকুমা'য় ভাল চিকিৎসক পাইবার সেদিনে কোন সম্ভাবনা ছিল না। এহেন নিরুপায় অবস্থায় প্রাণান্তকারী বেদনার তাড়নে আমার অবস্থা কি শোচনীয় হইয়াছিল তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। পরলোকগত নবীনচন্দ্রের সে দিনের ব্যাকুলতার কথা আজ আরও অধিক করিয়া আমার মনে পড়িতেছে; সে মিনিটে পাচবার মহিমখুড়া ও অভয়ানাথের নিকট গিয়া বলিতেছিল, "আপনারা একটা উপায় করুণ, ছেলেটা যে বিনা চিকিৎসায় আজ মরিয়াই যাইবে।" নবীন আমা অপেক্ষা ৬।৭ বাৎসরের মাত্র বড় ছিল, কিন্তু ঐ এক 'ছেলেটা' শব্দ হইতেই আমার পাঠক পাঠিকারা বুঝিতে পারিবেন যে, এই বেদনা পীড়িতের ক্লেশ দেখিয়া তাহার কোমল মনের কোন তন্ত্রী কেমন করিয়া বাজিয়া উঠিয়াছিল। তাহার ব্যগ্রতায় রোগ যদি উপশম হইত তবে বহু পূর্ব্বেই আমি সেই ভীষণ যাতনা হইতে মুক্তি পাইতে পারিতাম। কিন্তু এ সংসারে তাহা হয় না। আমিও আমার একটি পরমপ্রিয় প্রাণীকে শূল বেদনায় কষ্ট পাইতে দেখিয়াছি; ইচ্ছা হইত আমার পরমায়ুর অর্দ্ধেক দিয়াও যদি তাঁহার ক্লেশ নিবারণ করিতে পারি তাহা হইলে নিজকে ভাগ্যবান মনে করি; ইচ্ছা হইত, কাঁটা তুলিবার মত করিয়া

হাতে ধরিয়া সেই নিদারুণ শূল রোগকে চিরদিনের জন্য তাঁহার শরীর হইতে টানিয়া তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করি। কিন্তু এই দুঃখের ধরণীতে মনের ইচ্ছা মিটাইবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নাই, তাই ব্যথা নিবারণের ঔষধ দিয়া সময়ের প্রতীক্ষায় আমাকে নিরুপায় ভাবে বসিয়া থাকিতে হইত।

নবীনের ব্যগ্রতায় বৈদ্যনাথে যখন ভাল ডাক্তার সৃজন অসম্ভব হইল, তখন চিকিৎসার ভার সে নিজে লইল। গরম জলে লবণ মিশাইয়া একবাটী আনিয়া আমাকে খাইতে দিল। আমি রোগের তাড়নায় এবং উপশমের আশায় এক নিঃশ্বাসে সবটা পান করিয়া ফেলিলাম। কয়েক মিনিট পরেই অবিকৃত হবিষ্যান্ন সমস্তটা পাকস্থলী হইতে উঠিয়া গিয়া আমাকে কথঞ্চিৎ শান্তি দিল বটে কিন্তু ব্যথা একেবারে গেল না। সকলে মিলিয়া যুক্তি করিলেন যে প্রাতের গাড়ীতেই আমাকে লইয়া কলিকাতা রওনা হইবেন। সে ট্রেণটা সোজা কলিকাতায় আইসে না, রাস্তায় গাড়ী বদল করিতে হয়, কিন্তু through trainএর জন্য অপেক্ষা করিয়া কাল হরণ করা তখন যুক্তি হইল না;—ভোরের ট্রেণেই আমরা কলিকাতা যাত্রা করিলাম। যে ট্রেণে চড়িলাম সেটা স্থানে স্থানে বহু বিলম্ব করে, যায়গায় যায়গায় সে গাড়ী হইতে নামিয়া অন্য গাড়ীতে চড়িতে হয়, এক এক ষ্টেশনে বহুক্ষণ করিয়া সে গাড়ী দাঁড়াইয়া থাকে, এই সকল নানা প্রকার অসুবিধা থাকা সত্বেও আমাকে লইয়া মহিমখুড়া প্রভৃতি প্রভাতের সর্ব্বপ্রথম ট্রেণেই কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন।

সে সময়ে কলিকাতায় আমাদের বাড়ী ছিল না। যখন চিকিৎসার্থ বা অন্য কোন কারণে কলিকাতায় আসিবার প্রয়োজন হইত, পূর্ব্বে লোক আসিয়া বাড়ী ভাড়া করিত। এবারে সে সময় নাই। নিতান্ত বিপন্ন হইয়া শূল বেদনার হাত হইতে প্রাণ বাঁচাইবার আশায় কলিকাতায় আসিতে হইল, নতুবা 'মানত' পূজা অন্তে বৈদ্যনাথ হইতে বাড়ী যাইবার ব্যবস্থাই মাতা ঠাকুরাণী করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া কোথাও উঠিয়া কাহারও বাসায় অন্ততঃ কিছুকালের জন্য স্থান পাইলে ডাক্তার বৈদ্য ডাকাইবার ব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু কে এ বিপন্ন রোগক্লিষ্ট আশ্রয়-হীনকে ক্ষণকালের জন্য বাড়ীতে স্থান দিয়া তাহার প্রাণ-রক্ষার উপায় করিয়া দিবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিবারও সময় নাই। যাইতেই হইবে, যেরূপে হউক কিছুকালের জন্য আশ্রয় পাওয়া যায় এমন স্থান ভগবান মিলাইয়া দিবেনই, এই আশায় বুক বাঁধিয়া বৈদ্যনাথের লীলা-নিকেতন সাঁওতালভূমি ত্যাগ করি-লাম। গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, কোথায় গিয়া আশ্রয় লইব? পরিচিত লোকের অভাব নাই, নিকট এবং দূর অনেক আত্মীয়ই হয়ত বা এই কলিকাতা সহরে আছেন, কিন্তু এই জনতারণ্যে তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন এবং এই যাতনাপ্রদ শূলব্যথা লইয়া ঠিকা গাড়ী করিয়া আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়ানো সহজ ব্যাপার নহে। হঠাৎ মনে পড়িল, নাটোর রাজধানী ছোটতরফের ৺রাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের বিধবা পত্নী রাণী ক্ষেত্রমণি দেবী এবং তাঁহার দুই দেবরপত্নী, রাণী স্বর্ণময়ী দেবী ও রাণী বসন্তকুমারী দেবী, কলিকাতায় বাস করেন। তাঁহারা আমার অতি নিকট আত্মীয়া, সম্পর্কে বড় রাণীমা আমার জ্যেঠাই মা হইতেন এবং অপরা দুইজন আমার খুল্লতাতপত্নী। বেদনাক্লিষ্ট রোগাতুর গৃহহীন নিরাশ্রয়ের আশ্রয় মিলিবে কি না ভাবিয়া নিজকে বড় বিপন্নই মনে করিয়াছিলাম, মাতৃকল্পা জ্যেষ্ঠতাতপত্নীর গৃহে আমার স্থান হইবেই ভাবিয়া অকূলে যেন কূল পাইলাম। এক ষ্টেশনে গাড়ী বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, সেই অবসরে জ্যেঠাইমার নামে 'তার' করিয়া দিলাম এবং ষ্টেশনে লোক পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জানাইলাম; গাড়ী আবার গজেন্দ্র-মন্থর গতিতে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইল।

নবীনের ঔষধ 'নুনজলে' বেদনার তীব্রতা পূর্ব্বেই অনেক পরিমাণে কম হইয়া আসিয়াছিল। অনেক সময় কাটিয়া গেল সেইজন্যই হউক, দ্রুত যানের

গত্যুৎকম্পেই হউক, উদার উন্মুক্ত প্রান্তরাগত বিমল বাতাসের গুণেই হউক, কিংবা দুঃখ সুখ কিছুই চিরস্থায়ী নহে সেই কারণেই হউক—আমার ব্যাধির ক্লেশ ক্রমেই কম হইয়া আসিতে লাগিল। আসেনসোলে যখন আসিলাম, তখন ব্যথা আর নাই; শরীর বড় দুর্ব্বল, বড়ই ক্লান্ত। যাঁহাদের Colic কখনও হয় নাই তাঁহারা বুঝিবেন না এ ব্যাধির কি দুঃসহ যাতনা। যখন ব্যথা অত্যন্ত প্রবল হইয়া ওঠে তখন প্রতিমুহূর্ত্তে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে চাহে। মৃত্যুর পূর্ব্বে ধাতুক্ষয় আরম্ভ হইলে মানুষ যেমন ঘামিয়া ঘামিয়া হিম হইয়া যায়, শূল-রোগীরও অবিকল সেই লক্ষণ হয় এবং আত্মঘাতী হইবার কোন সহজ উপায় তখন হাতের কাছে পাইলে আত্মহত্যা করিতেও বোধ করি লোকে ইতস্তত: করে না।

আমার অতি শৈশবে এই রোগের সূত্রপাত হয়। আমার জনক জননী উভয়েরই এ ব্যাধি ছিল, আমি শূল বেদনার উত্তরাধিকার হয়ত তাঁহাদের নিকট হইতেই পাইয়াছি। বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে এই রোগে আমাকে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে। আজও সম্পূর্ণরূপে উহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাই নাই। অনেকবার ব্যথায় এতই কষ্ট পাইয়াছি যে তখন মরণ হইলে সে মরণ ঈশ্বরের দয়া বলিয়া আনন্দে তাহাকে বরণ করিয়া লইতে কোন দ্বিধা আমার মনে আসিত না। শূল-বেদনার আধিক্য যখন কম হইয়া আসে, শরীর স্বভাবতঃই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তাহার উপরে পূর্ব্ব-রাত্রির অনিদ্রায় সেদিন এত অধিক ক্লান্তিবোধ করিতেছিলাম যে, আসেনসোলে গাড়ী যখন আসিল তখন নিদ্রায় আমার দুই চক্ষু ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। যে ট্রেণখানি সজ্জিত ছিল, তাহার একখানি গাড়ীর একটিমাত্র কামরা প্রথম শ্রেণীর দেখিতে পাইলাম। আমি দুর্ব্বল দেহে কোন মতে তাহার দরজার নিকট গিয়া দেখি, একটি বৃহৎকায় 'বাবু' একখানি বেঞ্চে তাঁহার বিছানা বিছাইয়া শয়ন করিয়াছেন, অপর বেঞ্চ-খানির উপর তাঁহার বাক্স পেটরা তোরঙ্গ সজ্জিত রহিয়াছে। কামরার মধ্যে দাঁড়াইয়া তাঁহার ভৃত্য তামাকের কলিকাতে ফুঁ দিতেছে। দ্বারদেশে এক হিন্দুস্থানী দ্বারবান 'সিদ্ধি শোণিমা' রঞ্জিত-নেত্রে ভ্রূকুটি করিয়া অপর আরোহীদিগকে "তফাৎ যাও, তফাৎ যাও" হাঁকিতেছে। আমি ভাবিলাম, তৃতীয় শ্রেণীর নিরক্ষর এবং রেলওয়ের নিয়মানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে সরাইয়া দিবার জন্যই তাহার বাজ-খাঁই সুর বাহির করিয়াছে। সে 'তফাৎ যাও'-এর বিষয়ীভূত যে আমিই ইহা কোন মতেই ভাবিতে পারি নাই। সুতরাং আমি সোজা গাড়ীর দরজায় গিয়া বলিলাম, "হঠো, হামকো অন্দর জানে দেও।" সে তাহার চন্দন চর্চ্চিত ললাট কুঞ্চিত করিয়া অর্দ্ধনিমীলিত রক্তনেত্রের কোণে একবার আমাকে চাহিয়া দেখিল, আমার "জাগরণক্ষীণ বদন মলিন" দেখিয়া আমাকে প্রথম শ্রেণীর উপযুক্ত লোক বলিয়া কোন ক্রমে তাহার মনে হয়ত হইল না; ঘৃণাভরে বলিল, "এ গাড়ী তোমারা ওয়াস্তে নেহি, তোম্ ঠাড্ কেলাশ্ মে যাও, উধার উধার" এই বলিয়া যে ধারে থাড ক্লাশ প্যাসেঞ্জারের দল ভিড় করিতেছিল সেই দিকে অবজ্ঞার অঙ্গুলি হেলাইয়া আমাকে পথ চিনাইয়া দিল। আমি ঈষৎ হাসিয়া কহিলাম, "ময় বিমার আদ্‌মি হুঁ, মুঝে দিক্ না করো। রাস্তা ছোড়ো, ময় অন্দর যাউঙ্গা।" সে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "বাত কাহে নাই শুনতে হো? ধাক্কা খাওগে? বে-অকুফ্!" এক মিনিট পূর্ব্বে জাগরণক্লান্ত, শূলরোগ-ক্লিষ্ট, উপবাস-দুর্ব্বল দেহভার বহন করিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে চলিয়া যাওয়াই আমার পক্ষে কষ্টকর ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছিল, হিন্দুস্থানীটির মুখে "বে-অকুফ্" সম্বোধন শুনিবামাত্র কি জানি কোথা হইতে ক্রোধ আসিয়া আমাকে অন্ধ করিয়া ফেলিল। আমি আর দ্বিতীয় কথা মাত্র না বলিয়া সজোরে তাহাকে ধাক্কা দিলাম। ইচ্ছা ছিল তাহাকে সরাইয়া গাড়ীতে উঠিবার পথ করিয়া লইব, কিন্তু তাহা হইল না। সে ঐ ধাক্কা খাইয়া গাড়ীর মধ্যে লম্বা হইয়া পড়িল এবং অপর পার্শ্বের দরজায় তাহার মাথা সজোরে ঠুকিয়া

গেল। দ্বারবানজির মাথায় একখান কাপড়ের পাগড়ী ছিল বলিয়া রক্তপাত হইতে পারিল না, কিন্তু গুরুতর আঘাত লাগায় সে অনেকক্ষণ ধরিয়া তদবস্থাতেই রহিল। আমি সেই অবসরে গাড়ীতে উঠিয়া অপর বেঞ্চে যে সকল বাক্স পেট্‌রা ছিল তাহা নামাইয়া আমার বসিবার স্থান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। গাড়ীর পূর্ব্বাধিকারী বাবু মহা চীৎকার করিয়া "পুলিশ পুলিশ" রবে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার ভৃত্যটি কলিকায় ফুঁ দিতে বিরত হইয়া একপার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। বাবুটির হুঙ্কারে সেখানে অনেক লোক জমা হইতে দেখিয়া মাতুল অভয়ানাথ ও মহিম খুড়া মাল ওজন করিবার স্থান হইতে দৌড়িয়া ঘটনা-স্থানে উপস্থিত হইলেন। আমি সংক্ষেপে বৃত্তান্ত বলিলাম। তাঁহারা আমাকে বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতি সরাইবার পরিশ্রম হইতে বিরত করিয়া নিজেরাই সে সমস্ত সরাইয়া আমার জন্য স্থান করিয়া দিলেন; নিজেরাও বসিলেন।

ইতিমধ্যে ষ্টেশন মাষ্টার প্রভৃতি ষ্টেশনের লোক ও রেলওয়ে পুলিশের কনেষ্টবল আসিয়া সেখানে হাজির হইল। ভূপতিত দ্বারবান মহাশয় তখন উঠিয়া খাস হিন্দুস্থানী ভাষায় অতিরঞ্জিত করিয়া আমার বিরুদ্ধে আরজি পেশ করিল। তাহার 'হাউ মাউ' চীৎকারে ষ্টেশন মাষ্টার সাহেব বিরক্ত হইয়া তাহাকে ধমক দিয়া থামিতে বলিলেন, এবং আমাকে ব্যাপার কি হইয়াছিল সে ইতিহাস সংক্ষেপে বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি সকল কথা যথাযথ বর্ণনা করিলাম। তাঁহাকে জানাইলাম যে চন্দনচর্চ্চিত-ললাট ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ দ্বারবানকে ভূপতিত করিবার কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না এবং পর্ব্বত প্রমাণ দেহধারী গুরুভার মধ্যবয়স্ক লোকটি যে অত সামান্য কারণে মাতা ধরিত্রীর ক্রোড়ে লুণ্ঠিত হইবে তাহাও আমি ভাবিতে পারি নাই। যাহা হউক, উহারা আমার বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করিতে যদি চাহে তাহা হইলে আমার নামধাম উহাদের জানা আবশ্যক হইবে।—এই কথা সাহেবকে বলিয়া, আমার নামের একখানি কার্ড তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি সেখানি পড়িয়া নিজের পকেটে রাখিয়া দিলেন এবং আমাকে বলিলেন, "অন্যায় করিয়া পথরোধ যে করিয়াছে সে আবার নালিশ করিবে কি? যেমন অনধিকার-চর্চ্চা করিয়াছে তাহার শাস্তিও পাইয়াছে।" বাবুটি ইংরাজি জানেন না, হিন্দীতে বারম্বার নালিস্ করিয়া ষ্টেশন মাষ্টারকে বিরক্ত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। সাহেব অতিষ্ঠ হইয়া তাহাকেও ধমকাইয়া উঠিলেন। প্রভু ভৃত্য উভয়েই নীরব হইল।

এই সকল গোলমালের মধ্যে এক সময়ে বাবুটি তাঁহার জামার পকেট হইতে টিকিট বাহির করিয়া ক্যাশ বাক্সে রাখিয়া দিতেছিলেন। টিকিটের রঙ দেখিয়া আমার মনে হইল, উহা প্রথম শ্রেণীর নহে, দ্বিতীয় শ্রেণীর। আমার দুষ্টবুদ্ধি জাগিয়া উঠিল। আমি সাহেবকে বলিলাম, "বাবুর টিকিট্‌টা একবার দেখিলে হয় না?" তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়। এবং এখানে টিকিট দেখিবার বিধানও রহিয়াছে।" সাহেব তাহার নিকট টিকিট চাহিলে সে সভয়ে টিকিট খানি বাহির করিয়া ধীরে ধীরে সাহেবের হাতে দিল। যা ভাবিয়াছি তাই! টিকিট দ্বিতীয় শ্রেণীর। সাহেব জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এ গাড়ীতে কেন উঠিয়াছ?" বাবুর মুখশ্রী তখন সত্য সত্যই দেখিবার মত। নিজে দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট লইয়া প্রথম শ্রেণীতে বসিয়াছেন তাহাতেও তৃপ্তি নাই—অপর কেহ সেখানে আসিয়া তাঁহার সুখভ্রমণের ব্যাঘাত না করে, সেজন্য দ্বারবান নিযুক্ত করিয়া দরজায় পাহারা দেওয়াইতেছেন!—সংসারের গতিই এইরূপ। 'চোরের মার বড় গলা' একটা কথা আছে, কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নহে দেখিলাম। নিজে দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট লইয়া প্রথম শ্রেণীতে চড়িয়াছে, তাহার উপর গলাবাজি করিয়া অপর কাহাকেও সেখানে চড়িতে দিবে না,—এ দুঃসাহস কেন তাহার হইয়াছিল জানিনা। সেই ট্রেণটায় প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী সব সময় থাকে না, বোধ

করি সেই ভরসায় ও ব্যক্তির এতদূর সাহস হইয়াছিল। তাহার দুরদৃষ্টক্রমে আমি সেই গাড়ীখানায় আসিয়া চড়িতে চাহিব এমন দুর্ঘটনা সে স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই। ষ্টেশন মাষ্টার সাহেব দ্বিতীয় শ্রেণীর লোককে প্রথম শ্রেণীতে যাইতে দিবে না। তাহাকে গাড়ী হইতে নামিতে বলিল এবং প্রশ্ন করিয়া যখন জানা গেল সে ঐ ট্রেণে এলাহাবাদ হইতে ঐ গাড়ীতেই আসিয়াছে, তখন সমস্তটা পথের অতিরিক্ত মাসুল তাহার নিকট হইতে তলব করিল। বাবুটি বণিক্-সম্প্রদায় ভুক্ত, সুতরাং অতিরিক্ত মাসুল দেওয়াটা বড়ই কষ্টকর ব্যাপার। এবং যে ব্যক্তি আমাকে গাড়ীতে উঠিতে দিতে নিতান্ত নারাজ ছিল, আমার সম্মুখেই অপমানিত হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীতে নামিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কি ভীষণ শাস্তি তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

বাবু বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। আমার সহিত কলহ করায় আমার সঙ্গীও সকলেই বাবুর উপরে বিরূপ হইয়াছিলেন একথা বলাই বাহুল্য। মাতুল অভয়ানাথ সময় পাইয়া বাবুর সহিত যেরূপ কথোপকথন আরম্ভ করিয়া দিলেন তাহার একটু নমুনা দিতেছি।

অভয়া।—কর্ত্তা বাবু, এবার পুলিস আমরাই ডাকি ?

(বাবু নীরব)

অভয়া।—কি মহাশয়, হঠাৎ বাক্‌রোধ হইল নাকি ? এখানে রেলের ডাক্তার বাবু থাকেন, যদি বলেন এবং ভিজিট দিতে রাজি থাকেন তবে তাঁহাকে ডাকিয়া রোগনির্ণয় ও ঔষধের ব্যবস্থা করান যাইতে পারে। কি অভিপ্রায় হয় কর্ত্তা বাবুর ?

(বাবু পূর্ব্ববৎ নীরব)

অভয়া।—বাবু মহাশয়, একটু শীঘ্র করিয়া যদি বেঞ্চওটা ছাড়িয়া দেন তবে আমরা আমাদের বিছানাটা বিছাইয়া লইতে পারি। কাল সমস্ত রাত্রি আমাদের অনিদ্রায় কটিয়াছে। আশা করি আপনাকে নামাইতে আমাদিগকে আর দ্বারবান নিযুক্ত করিতে হইবে না।

এবার বাবুটি দীন নেত্রে মহিম খুড়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনিই আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ, দেখিতেও বয়স অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় ;—তাঁহার দিকে চাহিবার উদ্দেশ্য, তিনি অভয় বাবুকে নিরস্ত হইতে বলিবেন। কিন্তু বাবুর মনের আশা মনেই রহিয়া গেল। মহিম খুড়ার দিকে চাহিতেই তিনি উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং ছড়ার সুরে রায়-গুণাকরের কবিতার্দ্ধ আওড়াইতে লাগিলেন—"ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।"—নিরুপায় বাবু তখন যথার্থই অপমানের বেদনায় কাতর। মহিম খুড়ার নিকট কোনরূপ আনুকূল্য না পাইয়া মুখের অবস্থা তাঁহার এমন হইল —আমি ভাবিলাম এখনই বুঝি কাঁদিয়া ফেলিবে। জানিনা কেন, যে বাবু আমার উপরেই অত্যাচার করিয়াছেন এবং যাঁহার এই অপমানের মূল কারণও আমি—বাবুর সে সময়ের অবস্থায় আমার মনে করুণার সঞ্চার হইল। আমি অভয়কে ওরূপ বাচালতা করিতে নিষেধ করিয়া বাবুটির বেঞ্চে গিয়া বলিলাম, "মহাশয়, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন আপনি অতিরিক্ত মাসুলটা দিয়া এই খানেই থাকুন, কয়জনে মিলিয়া মিশিয়াই যাওয়া যাইবে। এই টিকিট বিভ্রাটের পরে এ গাড়ী ত্যাগ করিতে আপনার অনিচ্ছা যে কতদূর স্বাভাবিক তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি।"—আমার নিকট হইতে এই অপ্রত্যাশিত সহানুভূতি পাইয়া বাবুর চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "দেখুন, সে জন্য তত নহে, বাত ব্যাধিতে আমার দক্ষিণ পা খানি অকর্ম্মণ্য, নামা ওঠা চলা ফেরা করা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন। সেই জন্য আমার চাকরকেও আমার সঙ্গে রাখি, কোন সময়ে প্রয়োজনবশতঃ গাড়ীতে এঘর ওঘর করিবার দরকার হইলে সে সাহায্য করিতে পারিবে। এখন অপর গাড়ীতে যাই কি করিয়া ?" আমি কহিলাম, "হিসাব করিয়া বাকী যে টাকাটা হয় দিয়া দিন, এবং এখান হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত টিকিটখানা বদ্‌লাইয়া লউন, আমি ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া আমি অভয়

বাবুকে আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্য পাঠাইলাম। ষ্টেশন মাষ্টার ফিরিয়া পুনরায় বাবুকে নামিবার তাগাদা দিতে আসিলে আমি সব কথা বুঝাইয়া বলিলাম। সাহেব আমার দিকে একটু আশ্চর্য্য হইয়া তাকাইল—মনের ভাব বোধ হয় এই যে, 'তোমায় অকারণ জ্বালাইয়া তুলিয়াছিল, তাহার জন্য ওকালতী তুমি কেন কর?'—কেন করি তাহা জানি না, সেদিন কেন করিয়াছিলাম তাহাও বলিতে পারি না; বিপন্ন মানুষের ছল ছল সাশ্রু নেত্র দেখিলে বোধ করি সকলেই এরূপ করিয়া থাকে।

আসেনসোলের বিভ্রাট মিটিয়া গেল; গাড়ী ছাড়িল। আমি একখানি বেঞ্চে শয়ন করিয়া নিদ্রা দিলাম। ট্রেণ সন্ধ্যার পরে হাওড়ায় যাইবে, প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক নিদ্রার সময় পাওয়া যাইবে দেখিয়া আমি শ্রান্তদেহে অল্প সময়েই নিদ্রিত হইলাম।

গাড়ী যখন হাওড়া ষ্টেশনে পঁহুছিল, প্ল্যাটফর্ম্মে দেখিলাম জ্যেঠাইমার বাড়ীর লোক অপেক্ষা করিতেছে। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, গাড়ীও তাঁহারা পাঠাইয়াছেন এবং লোকের মুখে শুনিলাম আমার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। যখন রাজসাহী কলেজে পড়িতাম, আমাদের বাসা এই রাণীমাতাদিগের আবাসস্থানের সন্নিকটেই ছিল। ইঁহারা তিনজনেই নিঃসন্তান ছিলেন, সুতরাং এই হতভাগ্য দেবর-পুত্রের প্রতিই তাঁহাদের সমগ্র হৃদয়ের সন্তানস্নেহ অকাতরে ঢালিয়া দিয়া তাঁহারা তৃপ্তি পাইতেন এবং এই মাতৃক্রোড়বিচ্যুত স্নেহাশ্রয়হীন অকিঞ্চনও স্নেহপরায়ণা জননীকল্পাদিগের উপর স্নেহের আবদার করিয়া তাহার ক্ষুধিত হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা অনেক পরিমাণে মিটাইয়া লইত। আজ এই দুঃসময়ে রোগকাতর দুর্ব্বল দেহভার লইয়া তাঁহাদের নিকট আশ্রয় না পাইলে আমাকে অনেক কষ্টই ভোগ করিতে হইত। তাঁহাদের নিঃস্বার্থ স্নেহনীড়ের আশ্রয়ে কষ্ট দূরের কথা, যে কয়দিন ছিলাম, বড় সুখেই কাটিয়াছিল। আজ তাঁহাদের মধ্যে দুইজন স্বর্গে গিয়াছেন। যিনি জীবিত আছেন, তাঁহার নিকট আজও আমি অনেক স্নেহ যত্ন পাইয়া থাকি।

ব্যথার কষ্ট তখন গিয়াছে, সুতরাং ডাক্তার ডাকিবার কোন প্রয়োজন হইল না। ব্যাধির মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা শেষ করিয়াই বৈদ্যনাথের দয়ার প্রতি নির্ভর করা হইয়াছিল। যখন ব্যথায় নিতান্ত কাতর করিত, সেই সময় ডাক্তার ডাকাইয়া কোনক্রমে কষ্টের আপাত-নিবারণের উপায় করিতাম মাত্র। সে প্রয়োজন এখন ছিল না, সুতরাং ডাক্তার আনানো হইল না। সামান্য কিছু আহার করিয়া সে রাত্রি শয়ন করিলাম।

পরদিন উঠিয়া বাড়ী যাইবার কথা বলায় জ্যেঠাইমা রাজি হইলেন না। অনেক দিন পরে আসিয়াছি, তাঁহার ইচ্ছা দুই চারি দিন নিকটে থাকি। তিনি সন্তান-নির্ব্বিশেষে আদর যত্ন করেন এবং আহারাদির অনুষ্ঠান করিয়া এই পেটুক বালকের মনস্তুষ্টির বিধান করিয়া দেন। থাকিবার জন্য অধিক অনুরোধ আমার করিতে হয় নাই। অন্যের কথা বলিতে পারি না;—স্নেহের আকিঞ্চন অবহেলা করিতে পারি, এ পরিমাণ স্নেহসম্পদে সম্পন্ন আমি কোন দিনই নহি। স্নেহশীলজনের সান্নিধ্যে সাহচর্য্যে এবং সঙ্গে অন্তর-মন যে বিমলানন্দে উল্লসিত হইয়া উঠে, জীবনে সে আনন্দ ভোগ করিবার সৌভাগ্যও আমার অধিক ঘটে নাই। স্নেহহস্তদত্ত দিনান্তের দুটি অন্ন যে অন্নপূর্ণার সুবর্ণ-দর্ব্বীদত্ত পায়সান্নেরও বাড়া, সে কথা আমা অপেক্ষা অধিক আর কেহ জানে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। সুতরাং অযাচিত এই স্নেহ—ভাগ্য কর্ত্তৃক বঞ্চিতা পুত্রহীনাদিগের সর্ব্বান্তঃকরণের এই স্নেহের আকিঞ্চন—অবহেলা করিবার সাধ্য আমার হইল না। আমি আরও দুই দিন তাঁহাদের নিকট থাকিয়া, তৃতীয় দিনে মাতৃদেবীর 'তারের' আদেশ মাথায় করিয়া, জলপূর্ণ-পরিখা-বেষ্টিত নাটোর রাজপুরীর মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিলাম।

ক্রমশঃ

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

মনীষী কৈলাসচন্দ্র বসু

(জীবনবৃত্ত)

উপক্রমণিকা। এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের প্রথম যুগে আমাদের মৃতপ্রায় সমাজে এক নূতন জীবনস্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল। কি ধর্ম্ম সংস্কারে, কি সমাজ সংস্কারে, কি শিক্ষাবিস্তারে, কি রাজনীতিক ক্ষেত্রে, নূতন ও মহান্ আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া অনেকগুলি একনিষ্ঠ সাধক অবিচলিত উৎসাহ ও অসীম আগ্রহের সহিত, অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও প্রশংসনীয় অধ্যবসায়ের সহিত, অপূর্ব্ব প্রতিভা ও অতুল শক্তি লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যে যুগে রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ধর্ম্মবীরের আবির্ভাব হইয়াছিল, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কিশোরীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সমাজ সংস্কারক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষী রাজনীতিকগণ আবির্ভূত হন, রমাপ্রসাদ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর দ্বারকানাথ মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রভৃতি মনীষিগণ জন্মগ্রহণ করেন, রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণের উদ্ভব হয়, সেই অসামান্য মানসিক উদ্দীপ্তির যুগের বিস্তৃত ইতিহাস এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। ইতিহাসের অভাবেই হউক বা উপকারকের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অভাবেই হউক, যে সকল অগ্রণীর হৃদয়-শোণিতে আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ পুষ্ট হইয়াছে, শিক্ষা-প্রণালী উন্নত হইয়াছে, রাজনীতিক অধিকার বিস্তৃত হইয়াছে, জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইতে না হইতেই আমরা তাঁহাদের অনেকেরই সাধনা ও আত্মত্যাগের কথা, অনেকেরই কীর্ত্তিকাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছি। যে প্রতিভাশালী বাঙ্গালীর নাম লইয়া আজি আমরা পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহার নাম আজ অনেকের নিকটেই অপরিজ্ঞাত। অথচ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই অকৃত্রিম সাহিত্যসেবক, দেশপ্রিয় বাগ্মী ও স্থিতপ্রজ্ঞ জননায়কের নাম শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিত্য স্মরণীয় ছিল। বেথুন সোসাইটি নামক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-সভার সুযোগ্য সম্পাদকরূপে তিনি দীর্ঘকাল য়ুরোপীয় ও দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতুস্বরূপ বিরাজিত ছিলেন। তিনি শক্তিশালী লেখক ছিলেন এবং যেখানেই তিনি দেখিতেন

"দুর্ব্বল হইছে চূর্ণ প্রবলের বিজয় গৌরবে"

সেই খানেই তিনি দুর্ব্বলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সমগ্র শক্তির সহিত প্রবলকে আক্রমণ করিতেন। দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য, বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি কায়মনোবাক্যে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ঢক্কানিনাদে আত্ম-ঘোষণা না করিয়া তিনি নীরবে যথাশক্তি দেশের সেবা করিতেন। তাঁহার ন্যায় উচ্চশিক্ষিত জননায়কগণই চরিত্রের মহত্বে, নিরহঙ্কার পাণ্ডিত্যে, নির্ভীক দেশপক্ষ-সমর্থনে, অপূর্ব্ব ন্যায়নিষ্ঠায় য়ুরোপীয়দিগের নিকট আমাদের জাতীয় সম্মান প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহাদিগকে সমগ্র জাতির প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ করিয়াছিলেন; তাহাতে দেশের যে কি মহদুপকার সাধিত হইয়াছিল, তাহা আমাদিগের সামাজিক ইতিহাসে সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত হইবে। আমরা দীর্ঘ ভূমিকা অপ্রয়োজনীয় বোধে সংক্ষেপে এই বিস্মৃতকীর্ত্তি বাঙ্গালীর পরিচয় প্রদান করিতে অগ্রসর হইব।

জন্ম ও বংশ পরিচয়। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে কৈলাসচন্দ্র কলিকাতার একটি অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রপিতামহ দেওয়ান ভবানীচরণ বসু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কার্য্য



[illegible]

করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সমসাময়িক সমাজে অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব অতি বিশুদ্ধ ও পবিত্র ছিল এবং দানশীলতার জন্য তিনি তাৎকালীন সমাজে সুবিখ্যাত ছিলেন। তিনি অতিশয় মিষ্টভাষী ছিলেন এবং শিষ্টাচারে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি অতি বিরল ছিল। দরিদ্র-পালন ও অতিথি-সেবা তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। তাঁহার অতিথিশালায় যত অতিথি আসিতেন কেহই বিফল মনোরথ হইতেন না, সকলেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোজন করিতেন। শুনা যায়, অতিথিগণের নিক্ষিপ্ত পাতা ও গেলাসে অতিথিশালার পুষ্করিণীটি প্রায় বুজিয়া গিয়াছিল। তিনি সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া বিষয়কার্য্য করণান্তর, সন্ধ্যাকালে অতিথি কেহ অভুক্ত আছেন কিনা দেখিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন করিতেন। ভবানীচরণের পত্নী ভুবনেশ্বরীও তাঁহার স্বামীর উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী ছিলেন। ভবানীচরণের চারি পুত্র—রামনিধি, রামতনু, রামমোহন ও ফকীরচন্দ্র। জ্যেষ্ঠ রামনিধি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কার্য্য করিতেন। ইনিও পিতার ন্যায় চরিত্রবান্ পুরুষ ছিলেন। ইঁহাদের বাটীর সম্মুখস্থ রামতনু বসুর লেন, মধ্যম ভ্রাতা রামতনুর সামাজিক প্রতিপত্তির পরিচায়ক। রামনিধির চারি পুত্র ছিল—জ্যেষ্ঠ হরলাল, মধ্যম দুর্গাচরণ, তৃতীয় নন্দলাল ও কনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র। হরলালের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ কৈলাশচন্দ্র ও কনিষ্ঠ যদুনাথ। জ্যেষ্ঠ কৈলাসচন্দ্রের জীবন-কাহিনী বিবৃত করাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।



৺কালীপ্রসন্ন সিংহ (তরুণ বয়সে)

প্রাথমিক শিক্ষা। শৈশবে কৈলাসচন্দ্র নবীন মাধব দে কর্ত্তৃক পরিচালিত একটি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরে তিনি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রবিষ্ট হন। তাঁহার ছাত্রজীবনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ও উহার প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য গৌরমোহন আঢ্য মহাশয় সম্বন্ধে দুই একটি কথা এইস্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

উচ্চশিক্ষা। ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী ও গৌরমোহন আঢ্য। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারি দিবসে গৌরমোহন আঢ্য জন্ম পরিগ্রহ করেন। বাল্যকালে তিনি সামান্য শিক্ষাই প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি সাধু ও ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন এবং স্বদেশপ্রেম ও জনহিতৈষণার জন্য, বিশেষতঃ এতদ্দেশে ইংরাজীশিক্ষা বিস্তারের একজন প্রধান উদ্যোগী বলিয়া, তিনি দেশবাসীর চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে Calcutta Literary Observer নামক অধুনাবিলুপ্ত একটি পত্রে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা রিভিউ' নামক সুপ্রসিদ্ধ ত্রৈমাসিকের ত্রয়োদশ খণ্ডে একজন লেখক তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের 'কলিকাতার ইতিহাসে' উহা পুনরুদ্ধৃত হইয়াছে। আমরাও এস্থলে উহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

"সপ্তবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি (গৌরমোহন) উপার্জ্জনের অন্য কোন সুবিধাজনক পথ না দেখিয়া স্বদেশীয়দিগের নিমিত্ত একটি স্কুল স্থাপন করিলেন এবং কয়েক বৎসর অবিচলিত অধ্যবসায়ের সহিত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহার ছাত্র-সংখ্যা যখন প্রায় ২০০ হইয়া উঠিল, সেই সময়ে তিনি টার্ণবুল নামক এক সাহেবকে অংশী করিয়া লইলেন। ইহার পর ক্রমশঃই তাঁহার স্কুলের উন্নতি হইতে লাগিল। তাঁহার অংশীর মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার নিজ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি অতি দক্ষতার সহিত নিজ তত্ত্বাবধানে স্কুলের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি হার্ম্মান জিওফ্রি নামক একজন দুঃস্থ ব্যারিষ্টার প্রাপ্ত হন; সেই ব্যারিষ্টারের উৎকৃষ্ট শিক্ষায় গৌরমোহনের স্কুল বিলক্ষণ প্রাধান্য লাভ করিল। গৌরমোহনকে দেখিলেই ধর্ম্মভীরু বলিয়া বোধ হইত; তিনি এরূপ সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনি প্রথম শ্রেণীর বালকদিগকে অকপটে বলিয়া ফেলিতেন যে, আমি তোমাদিগকে পড়াইতে পারি না। বৃথা অভিমানের লেশমাত্র তাঁহাতে ছিল না। যাহা তিনি জানিতেন, তাহা অন্য সমস্ত দেশীয় শিক্ষক অপেক্ষা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। তিনি অতি মৃদু-স্বভাব ছিলেন; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নানা প্রকার স্বভাব ও মেজাজের লোকের সহিত তাঁহাকে কার্ কারবার করিতে হইলেও তিনি অতি সুকৌশলে আপনার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তিনি কখনও কাহারও বিরাগভাজন হন নাই। তিনি ছাত্র-মণ্ডলীর অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন; আর যদিও তিনি নিয়মানুগামিতা ও বশবর্ত্তিতা সম্বন্ধে কঠোর শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না এবং যদিও তাঁহাকে এমন অনেক স্বেচ্ছাচারী বালককে লইয়া চলিতে হইত যাহাদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি তাহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কিন্তু তথাপি তিনি সকলেরই সম্মানভাজন ও অনেকের প্রণয়াস্পদ হইয়াছিলেন।" *

'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের লেখক লিখিয়াছেন, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু উক্ত বিদ্যালয়ের বাৎসরিক বিবরণী প্রভৃতি হইতে প্রতীত হয় যে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ দিবসে উহা স্থাপিত হয়। বোধ হয় এই সময়েই টার্ণবুল সাহেবের মৃত্যু হয় এবং গৌরমোহন বিদ্যালয়ের একমাত্র সত্ত্বাধিকারী হন। যাহা হউক, গৌরমোহনের প্রযত্ন ও চেষ্টাতেই এই বিদ্যালয় অসামান্য প্রতিপত্তি লাভ করে এবং এই বিদ্যালয় বরাবর 'গৌরমোহন আঢ্যের স্কুল' বলিয়াই পরিচিত।

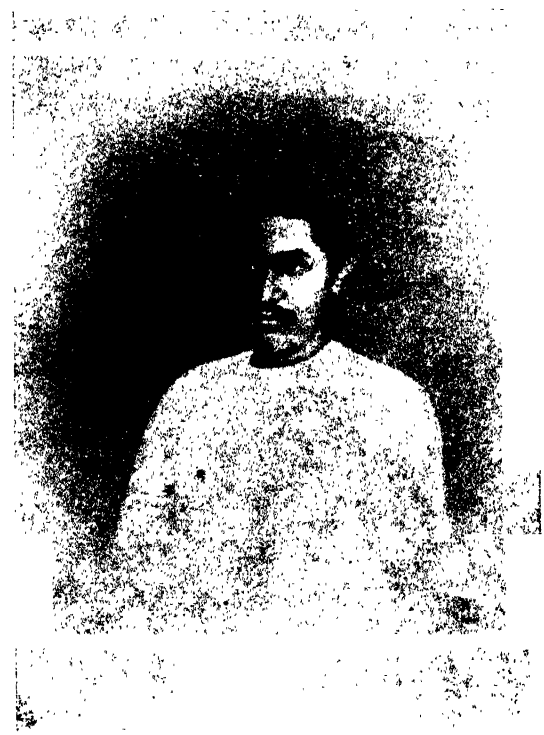
গৌরমোহন তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। উৎকৃষ্ট বালকগণকে তিনি প্রয়োজন হইলে বিনাবেতনে শিক্ষা দিতেন এবং তাহাদের কেহ কোনও দিন অনুপস্থিত হইলে স্বয়ং তাহার বাটীতে গিয়া সংবাদ লইতেন। প্রত্যেক ছাত্রের চরিত্রের প্রতি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুশিক্ষা প্রদানের জন্য ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী অসামান্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। হিন্দুকলেজে ডিরোজিওর হিন্দু ছাত্রগণ স্বাধীনচিন্তা শিক্ষা করিয়া যে ভাবে হিন্দুসমাজের বক্ষে শেলাঘাত করিয়া চিরানুসৃত আচারাদি পদদলিত করিতেছিলেন, সংস্কারের নামে যথেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন, তাহাতে হিন্দু অভিভাবকগণ সন্তানদিগকে উচ্চ ইংরাজীশিক্ষা প্রদান করিতে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডার ডফ্

* রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের "কলিকাতার ইতিহাস।"
৺সুবলচন্দ্র মিত্রের অনুবাদ।

প্রভৃতি প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ হিন্দু বালকদিগকে উচ্চশিক্ষা প্রদানের সহিত যে ভাবে তাঁহাদের স্বধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল করিয়া দিতেছিলেন তাহা দেখিয়া হিন্দুসমাজ বিচলিত হইয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও এই জন্য সকল হিন্দু অভিভাবক সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা প্রদানে তাদৃশ উৎসুক ছিলেন না। গৌরমোহন আঢ্যের চেষ্টাতেই এদেশে ইংরাজি শিক্ষার আদর বাড়িয়াছিল। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর ছাত্রগণ ইংরাজীশিক্ষা লাভ করিয়াও স্বধর্ম্ম ও দেশাচার পরিত্যাগ করেন নাই। বিদ্যার সহিত বিনয় ও শিষ্টাচার সম্মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে সমাজের যথার্থ অলঙ্কার রূপে পরিণত করিয়াছিল। যে বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক অক্ষয়কুমার দত্ত, হাইকোর্টের সর্ব্বপ্রথম দেশীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত, 'হিন্দুপেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক দেশব্রত গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অদ্বিতীয় রাজনীতিবিশারদ কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি মহাত্মাগণ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, সে বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী যে কিরূপ উৎকৃষ্ট ছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

পূর্ব্বে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে কেবলমাত্র স্কুল পাঠ্য গ্রন্থাদি পঠিত হইত না; আজিকালি উচ্চশ্রেণীর কলেজে যে উচ্চশিক্ষা প্রদত্ত হয়, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর প্রথম শ্রেণীতে সেইরূপ উচ্চশিক্ষা প্রদত্ত হইত। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে এই বিদালয়ে কেবল মাত্র স্কুলপাঠ্য পুস্তক পড়ান হইতেছে। যাহাতে ছাত্রগণ বিশুদ্ধভাবে ইংরাজী পড়িতে ও লিখিতে পারেন সেই দিকে গৌরমোহনের বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। তিনি স্বল্পবেতনে সঙ্গতিহীন অথচ কৃতবিদ্য য়ুরোপীয় শিক্ষক সংগ্রহ করিতেন এবং নিম্নতম শ্রেণীতেও বালকগণকে ইংরাজ শিক্ষকের দ্বারা ইংরাজীভাষায় শিক্ষাপ্রদান করিতেন। ফলে, শৈশব হইতেই বালকগণ ইংরাজী শব্দ বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে শিখিত।

যে সময়ে কৈলাসচন্দ্র ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে প্রবিষ্ট হন, সেই সময়ে হার্ম্মান জেফ্রয় নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইনি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। য়ুরোপীয় অনেকগুলি ভাষায় ইহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি প্রথমে ব্যারিষ্টার হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন কিন্তু অত্যধিক পানদোষ থাকায় ইনি ব্যারিষ্টারিতে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই এবং নিতান্ত দারিদ্র্যদশায় পতিত হন। গৌরমোহন ইঁহাকে একশত মুদ্রা বেতনে স্বীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। হার্ম্মান জেফ্রয় তাঁহার ছাত্রগণকে অতিশয় যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার একজন ছাত্র তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন যে এক একদিন তিনি প্রমত্ত অবস্থাতেও ইংরাজী গ্রন্থাদি হইতে সুন্দর



৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ (তরুণ বয়সে)

সুন্দর অংশের এরূপ মনোহর আবৃত্তি করিতেন যে তদ্দারা তাঁহার ছাত্রেরা যথেষ্ট উপকৃত হইতেন। গৌরমোহন বিদ্যালয়ে একটি পাঠাগারেরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। জ্ঞানপিপাসু ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের ছুটির পরেও তথায় পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অন্যান্য সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পাইতেন। হার্ম্মান জেফ্রয়ের সভাপতিত্বে বিদ্যালয়ে ছাত্রগণের একটি তর্ক সভাও

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই স্থানে শম্ভুনাথ পণ্ডিত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কৈলাসচন্দ্র বসু প্রভৃতি ছাত্রাবস্থায় বিচার ও তর্কশক্তি অর্জ্জন করিতেন।

গৌরমোহন আঢ্য সম্বন্ধে আমরা এত অল্প জানি যে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ তৎসম্পাদিত 'হিন্দুপেট্রিয়ট' পত্রে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ১৬ই মার্চ্চ দিবসে তাঁহার ও তাঁহার বিদ্যালয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এস্থলে অনুবাদ করিলে, আশা করি, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। গিরিশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই :—

"কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির চেষ্টা ও উদ্যম কিরূপে জনসাধারণের কুসংস্কার ও ঔদাসীন্য পরাভূত এবং শিক্ষার আদর্শ উন্নত করিতে পারে তাহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর ইতিহাসে যেরূপ পরিলক্ষিত হয়, শিক্ষার ইতিহাসে বোধ হয় আর কুত্রাপি সেরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। এই সুপরিচালিত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এক্ষণে ইহলোকে নাই। যে মহৎকার্য্য তিনি তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কার্য্যেই তিনি তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। যদি তাঁহার অদৃষ্ট তাঁহাকে অন্যভাবে পরিচালিত করিত তাহা হইলে হয়ত তিনি একজন প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিশারদ হইতে পারিতেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে অবশ্যই তিনি অসামান্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সামান্য স্তূপ হইতে তিনি তুঙ্গ পর্ব্বতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রথম অবস্থায় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর ছাত্রসংখ্যা এক শতও ছিল কি না সন্দেহ তাঁহার মৃত্যুকালে উহার ছাত্রসংখ্যা আটশত হইয়াছিল। এই বিদ্যালয় কেবল মাত্র একজন ব্যক্তির চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত বলা যাইতে পারে এবং উহা অবিচলিত উদ্যম ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। হিন্দু কলেজ ও মিশনারী বিদ্যালয়গুলির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা উহার গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে, উহার পরলোকগত প্রতিষ্ঠাতা যে উত্তম শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফলে, উহা সর্ব্বসাধারণের নিকট যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে। সুকুমারমতি বালকগণের মনে উচ্চ নৈতিক ভাব অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান, অমায়িক ও নির্ম্মল স্বভাব, এবং চরিত্রগত বিবিধ সদ্গুণাবলীর সুদৃঢ় ভিত্তি নির্ম্মিত করিয়া দেওয়াই এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, দাম্ভিক, পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তির পরিবর্ত্তে বুদ্ধিমান এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ নাগরিকের সৃষ্টি করাই ইহাঁর উদ্দেশ্য ছিল এবং এই উদ্দেশ্য অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লর্ড অক্‌লাণ্ড স্যর এডওয়ার্ড রায়ানের সহিত এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি ও লর্ড জোস্‌লিন বিদ্যালয়ের তরুণ বয়স্ক ছাত্রদিগের সাহিত্যে অধিকার ও ব্যুৎপত্তি দেখিয়া যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন সে কথা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন। গভর্ণর জেনারেল একথাও বলিয়াছিলেন যে এই বিদ্যালয় হিন্দু কলেজ হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। গবর্ণমেণ্ট কলেজে যে সকল সুবিধা আছে এখানে তাহা নাই, তথাপি যে উহা গবর্ণর জেনারেলের নিকট এরূপ উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে ইহা নিশ্চিতই অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।"

কৈলাসচন্দ্র ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। তাঁহার সতীর্থগণের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্রের ইংরাজীতে যথেষ্ট অধিকার থাকিলেও তিনি গণিত শাস্ত্রে তাদৃশ পারদর্শী ছিলেন না। সেই জন্য বাৎসরিক পরীক্ষায় গিরিশচন্দ্র প্রতিবারই দ্বিতীয় স্থান এবং কৈলাসচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। উভয়েরই সুন্দর আবৃত্তি শক্তি ছিল। তাঁহাদের সেক্ষপীয়রের আবৃত্তি যাহারা শুনিতেন তাঁহারাই মুগ্ধ হইতেন। প্রসিদ্ধ বক্তাদের বক্তৃতাভঙ্গী অনুকরণ করিবার কৈলাসচন্দ্রের অসামান্য ক্ষমতা ছিল। কৈলাসচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র যে ভবিষ্যতে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন তাঁহাদের শিক্ষকগণ এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণী আশাতীতরূপে সফল হইয়াছিল।

হস্তলিখিত সাময়িকপত্র। ছাত্রাবস্থায় কৈলাসচন্দ্র বিদ্যালয়ে এক হস্তলিখিত সাময়িক পত্রের প্রবর্ত্তন করেন। কৈলাসচন্দ্র, তাঁহার সতীর্থ গিরিশচন্দ্র এবং গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম অগ্রজ ক্ষেত্রচন্দ্র ও শ্রীনাথ (যিনি পরে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন) এই পত্রে সুন্দর সুন্দর সন্দর্ভাদি লিখিতেন। কৈলাসচন্দ্রের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। তিনি সুন্দর হস্তাক্ষরে সেই সকল প্রবন্ধ

একটি খাতায় নকল করিয়া পত্রিকা-খানি সহপাঠিগণকে পাঠ করিতে দিতেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ২১শে ফেব্রুয়ারি দিবসে গৌরমোহন আঢ্য পরলোকে গমন করেন। গৌরমোহন বাল্যকাল হইতে জলপথে ভ্রমণ করিতে ভয় করিতেন। জীবনে একবার মাত্র তিনি বিদ্যালয়ের জন্য একজন য়ুরোপীয় শিক্ষকের অন্বেষণে শ্রীরামপুরে জলপথে গমন করেন। প্রত্যাগমনকালে ঝটিকা-বেগে তাঁহার ক্ষুদ্র নৌকা উল্টাইয়া যায় এবং গৌরমোহন জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। গৌরমোহন আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নাম তাঁহার কৃতজ্ঞ দেশবাসীর হৃদয়ে চিরদিন সমুজ্জ্বল থাকিবে। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী বাস্তবিকই গৌরমোহনের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। কিছুদিন হইল বঙ্গেশ্বর স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর গৃহে গৌরমোহনের একটি প্রস্তরময় স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই মহাত্মার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।



৺শম্ভু চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পিতৃবিয়োগ। গৌরমোহনের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে কৈলাসচন্দ্র উচ্চতম শিক্ষালাভের জন্য হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু তাঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অধিককাল তিনি হিন্দুকলেজে পাঠ করিবার সুযোগ পান নাই। তাঁহার পিতার অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর কৈলাসচন্দ্রের পিতৃব্যগণ পৃথক হইলেন। অল্প বয়সেই কৈলাসচন্দ্র অভিভাবকশূন্য হইয়া নিতান্ত দুরবস্থায় পতিত হইলেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া তিনি অল্প বয়সেই কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইলেন।

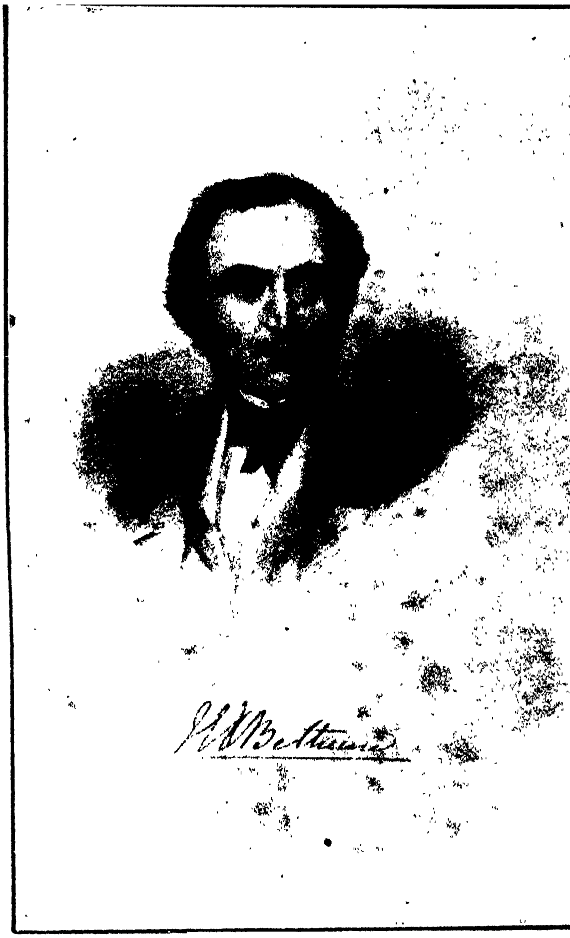
কর্ম্মজীবনে প্রবেশ। তিনি প্রথমে মেসার্স ককারেল্ এণ্ড কোম্পানীর (Messrs. Cockerell & Co.) আফিসে একটি সামান্য কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হন। পরে, বোধ হয় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে, তিনি মিলিটারি একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের আফিসে তদানীন্তন রেজিষ্ট্রার মিষ্টার হিলের অধীনে একটি কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। এই সময়ে নিমতলা ষ্ট্রীটে অবস্থিত ফ্রী চার্চ্চ ইনষ্টিটিউসনের গৃহে প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক ও বাগ্মী রেভারেণ্ড ডাক্তার

আলেক্‌জাণ্ডার ডফ্‌ খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে ধারাবাহিক রূপে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। কৈলাসচন্দ্র সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া অপূর্ব্ব তর্কশক্তি দ্বারা আলেক্‌জাণ্ডার ডফের যুক্তিগুলির ভ্রম প্রদর্শন করিতেন। তরুণ বাঙ্গালী যুবকের এই অদ্ভুত তর্কশক্তি অবলোকন করিয়া সমাগত ব্যক্তিমাত্রেই মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইতেন। এই সময়ে তিনি ইংরাজীতে Christianity, what is it ? বা "খ্রীষ্টধর্ম্মের স্বরূপ কি ?" শীর্ষক একটি প্রস্তাব প্রণয়ন করিয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করেন। এই স্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে কৈলাসচন্দ্র হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি তত্ত্ববোধিনী সভার প্রধান সভ্যগণ বেদান্ত প্রভৃতি হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে শিক্ষাদানের জন্য তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা নামক যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন, কৈলাসচন্দ্র উহাতে কিছুকাল হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

লিটারারী ক্রনিক্‌ল্‌। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কৈলাসচন্দ্র 'The Literary Chronicle' নামক একখানি ইংরাজী মাসিক-পত্রিকা প্রবর্ত্তিত করেন। সেপ্টেম্বর মাসে উহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তাঁহার সুযোগ্য সম্পাদকতায় এই পত্রিকাখানি শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজে যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল। পত্রিকাখানি কিঞ্চিদধিক দুইবৎসর কাল প্রকাশিত হয়। পরে উহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। কৈলাসচন্দ্রের অকৃত্রিম সুহৃদ ও সহচর গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই পত্রিকায় অনেকগুলি সুন্দর প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। সে প্রস্তাবগুলিতে নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে তিনি সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় প্রশ্নাদির আলোচনা করিতেন। প্রথম সংখ্যায় তিনি East India Company's Policy বা "ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নীতি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে কোম্পানীর সর্ব্বগ্রাসিনী নীতির যে ন্যায় ও যুক্তি-সমন্বিত অথচ কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহা পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়। মৎসম্পাদিত "Selections from the writings of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of the Hindoo Patriot and the Bengalee" নামক গ্রন্থে এই প্রস্তাবটি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। কৈলাসচন্দ্রের অনেকগুলি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। হিন্দু ও য়ুরোপীয় নাটক সম্বন্ধে তাঁহার একটি সুন্দর প্রবন্ধ এই পত্রিকায় পড়িয়াছি বলিয়া আমাদের স্মরণ হয়। এই পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে উৎকৃষ্ট ইংরাজী কবিতাও প্রকাশিত হইত। 'রেইস এণ্ড রায়ত' সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার সাহিত্য-গুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষের একটি বিস্তৃত জীবন চরিত লিখিবার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রকাশিত 'Notes' হইতে প্রতীত হয় যে কৈলাসচন্দ্রের Literary Chronicle পত্রে গিরিশচন্দ্র শিখ যুদ্ধ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রাণোন্মাদিনী কবিতা লিখিয়াছিলেন। কৈলাসচন্দ্রের পূর্ব্বে আর কোনও দেশীয় ব্যক্তি ইংরাজী মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করেন নাই। সুতরাং এই ক্ষেত্রে কৈলাসচন্দ্র অগ্রণী ছিলেন। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালী আজ এই কৃতী পুরুষের নাম পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়াছে।

'চার্টার' সভা। কৈলাসচন্দ্র কেবল সুলেখক ছিলেন না। তাঁহার অপূর্ব্ব বক্তৃতাশক্তি ছিল। জনহিতকর প্রকাশ্য সভা সমিতিতে তিনি প্রায়ই উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুন দিবসে বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি সার চার্লস উড্‌ হৌস্‌ অব্‌ কমন্স সভায় ভারতবর্ষীয় রাজকর্ম্মচারী নিয়োগ বিষয়ক একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তখন কি কি সর্ত্তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নূতন চার্টার বা সনন্দ প্রদত্ত হইবে, কমন্স সভায় তাহা আলোচিত হইতেছিল। স্যর চার্লসের প্রস্তাবটী কতিপয় বিষয়ে অতি উত্তম হইলেও অনেক বিষয়ে উহা শিক্ষিত ভারতবাসীর আশার অনুরূপ হয় নাই। উহাতে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং সিবিল সার্ভিসে ভারতবাসীর নিয়োগ, বিচার বিভাগে দেশীয় কর্ম্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি, লাভজনক পূর্ত্তকার্য্যের বিস্তার প্রভৃতি অনেকগুলি অতি

প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ ছিল না। এই সকল বিষয়ে এদেশে রাজনীতিক আন্দোলনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বাঙ্গালার জননায়কগণ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে জুলাই দিবসে টাউন হলে এক বিরাট সভা আহূত করেন। উহার পূর্ব্বে এদেশে কোনও প্রকাশ্য সভায় এত জনতা হয় নাই। টাউনহলে ও উহার সন্নিহিত স্থানে যে লোকসমাগম হইয়াছিল তাহার সংখ্যা সম্বন্ধে ৩০০০ হইতে ১০০০০ পর্য্যন্ত নানালোকে নানাপ্রকার অনুমান করিয়াছিলেন। কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ সকল সম্প্রদায়ের সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনেক ব্যক্তিকে স্থানাভাবে নিরাশ হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, রামগোপাল ঘোষ, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র দত্ত, প্যারিচাঁদ মিত্র, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৈলাসচন্দ্র বসু ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি এই সভায় বক্তৃতা করেন।



পরলোকগত ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন

পঞ্চবিংশবর্ষীয় যুবক কৈলাসচন্দ্রের বক্তৃতাটি এত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে এই সময় হইতেই কৈলাসচন্দ্র সুবক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পার্লিয়ামেণ্টের কমন্স সভায় এই সভার কার্য্যবিবরণী ও শিক্ষিত ভারতবাসীর একটি আবেদন পত্র * প্রেরিত হয়। ফলে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টার স্থানে স্থানে সংশোধিত হয় এবং ভারতবাসী সিবিল সার্ভিসে প্রবেশাধিকার লাভ করেন।

'বেথুন সভা'। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর দিবসে শিক্ষাপরিষদের সভাপতি ও ভারতবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু পুণ্যশ্লোক ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ডাক্তার মৌয়েট এতদ্দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের সহযোগিতায় 'বেথুন' সোসাইটী নামক এক সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞান আলোচনার অনুরাগ জন্মাইবার এবং য়ুরোপীয় ও দেশীয়দিগের মধ্যে জ্ঞানানুশীলন বিষয়ক সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা। † এই সভা এক্ষণে মৃত কিন্তু

* সুপ্রসিদ্ধ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই আবেদন-পত্রের পসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন।—লেখক।

† যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি এই সভার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা

বহুবৎসরকাল ধরিয়া এই সভা আমাদের মানসিক উন্নতির জন্য যে প্রয়াস পাইয়াছে তাহা আমাদের সামাজিক ইতিহাসে সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত হইবে। যখন ডাক্তার মৌয়েট, ডাক্তার ডফ্, কর্ণেল ম্যালিসন,



পরলোকগত কর্ণেল ম্যালিসন

কর্ণেল গুড্উইন, ডাক্তার রোয়ার, ডাক্তার চেভার্স, রেভারেণ্ড ডল প্রভৃতি য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এবং গুডিব চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবিহারী দে, কৈলাস চন্দ্র বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নবীনকৃষ্ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালীর বাগ্মিতায় বেথুন সভার গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিত তখন সভার কি গৌরবের দিনই গিয়াছে! তখন গবর্ণর জেনারেল, লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা বিনা নিমন্ত্রণে এই সভায় বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আসিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। কৈলাসচন্দ্র কেবল এই সভার প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য ছিলেন না, তিনি এই সভায় বহু সারগর্ভ সন্দর্ভাদি পাঠ



সার সেসিল বীডন্

করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য বক্তাদের বক্তৃতার পরে যে তর্কবিতর্ক হইত তাহাতে প্রায়ই যোগদান করিতেন। এই সভায় সর্ব্বপ্রথমে তিনি 'A comparative view of the European and Hindu Drama' (য়ুরোপীয় ও হিন্দু নাটকের তুলনায় সমালোচনা) শীর্ষক একটি

করেন এবং সর্ব্বপ্রথম এই সভার সভ্য হন তাঁহাদের নাম এস্থলে উল্লেখযোগ্য :—

এফ্, জে, মৌয়েট, এম-ডি ; পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ; রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ ; মেজর জি, টি, মার্সাল ; রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ; ডাক্তার স্প্রেঙ্গার ; ডাক্তার গুডিব চক্রবর্ত্তী ; এল, চাটৃ ; বাবু রামগোপাল ঘোষ ; বাবু রাধানাথ শিকদার ; বাবু রামচন্দ্র মিত্র ; বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু ; বাবু হরমোহন চট্টোপাধ্যায় ; বাবু জগদীশনাথ রায় ; বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র ; বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ; বাবু প্যারীমোহন সরকার ; বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র ; বাবু রসিকলাল সেন ; বাবু প্রসন্নকুমার মিত্র ; বাবু গোপালচন্দ্র দত্ত ; বাবু হরিচন্দ্রদত্ত ; বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

প্রস্তাব পাঠ করেন। বোধ হয় Literary Chronicleএ প্রকাশিত সন্দর্ভটী ঈষৎ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াই এই প্রস্তাবটী রচিত হইয়াছিল। প্রস্তাবটী পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এই সভায় তিনি The Women of Bengal (বঙ্গনারী) সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব পাঠ করেন। উহাও পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের তদানীন্তন সেক্রেটারী মিষ্টার (পরে স্যর) সিসিল বীডন এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া এতদূর প্রীত হন যে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে একটি উচ্চবেতনের পদ শূন্য হইলে কৈলাসচন্দ্রকে সেই পদে নিযুক্ত করেন। কৈলাসচন্দ্র প্রায় আটবৎসরকাল বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে কার্য্য করেন।

কৈলাসচন্দ্র এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ১৪ই আগষ্ট দিবসে বেথুন সভায় কৈলাসচন্দ্র "On the Education of Hindu Females—how best achieved under the present circumstances of Hindu Society"—অর্থাৎ "হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে প্রকৃষ্ট উপায়" সম্বন্ধে একটি মনোহর প্রস্তাব পাঠ করেন। এই বক্তৃতায় তিনি বাজে কথা না বলিয়া কিরূপে তাৎকালীন সমাজের প্রতিকূল অবস্থায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তৃত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি এরূপ সারগর্ভ ও প্রয়োজনীয় কথায় পরিপূর্ণ ছিল যে সভা নিজব্যয়ে বক্তৃতাটি মুদ্রিত করিয়া উহার প্রচার করেন। বক্তৃতাটির উপসংহারাংশে এরূপ ওজস্বিনী ভাষায় দেশবাসীকে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন যে উহা পাঠকালে মনে হয়, বক্তার উচ্চ হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে বাক্যগুলি নিঃসৃত হইতেছে। এরূপ শব্দচয়ন-নৈপুণ্য ও আবেগময়ী ভাষা তাঁহার সতীর্থ ও সহকর্ম্মী গিরিশচন্দ্র ঘোষ ব্যতীত আর কোনও বাঙ্গালী লেখকের রচনায় দৃষ্ট হয় না। প্রস্তাবটি এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট দিবসের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' গিরিশচন্দ্র এই প্রস্তাবটির যে সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিলেন মৎসম্পাদিত 'Selections from the writings of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of the Hindoo Patriot and the Bengalee' নামক গ্রন্থের ২২৩-২২৬ পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠকগণ এই সমালোচনাটি পাঠ করিলে কৈলাসচন্দ্রের প্রস্তাবটির সম্বন্ধে অনেক কথা জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে শিক্ষার বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ হেনরী উড্রো সাহেবের মৃত্যু হইলে কৈলাসচন্দ্র তাঁহার সম্বন্ধে বেথুন সভায় যাহা বলিয়াছিলেন, Laurie's Distinguished 'Anglo-Indians' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে তাঁহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

বৈদেশিকী

চীন-প্রসঙ্গ।

("Asiatic Review," May.)

ডি. এ. উইলসন লিখিয়াছেন যে, আমেরিকা ও য়ুরোপ, চীন দেশকে জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কাল শিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু নীতিশাস্ত্র ও শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে চীন পাশ্চাত্যদিগের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিতে অধিকারী। চীনের ধর্ম্ম-শাস্ত্রকার কনফিউশাসের এবং আধুনিক আমেরিকানের, রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শে ঐক্য লক্ষিত হয়। এই উভয় জাতিই, সংসদের পরিবর্ত্তে, বিশেষজ্ঞের হস্তে শাসনকার্য্য ন্যস্ত করিয়া থাকে। ("The similarity between Amer-

ican and Confucian political ideals is familiar in the East. Both trust administration to experts in preference to committees and assemblies.")। চীন-সম্রাট ইয়াও (Yao), নিজের পুত্রদের অপেক্ষা রাজগোষ্ঠীর বাহিরের লোক শান (Shun) কে যোগ্যতর ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকে রাজমুকুট অর্পণ করিয়াছিলেন। সম্রাট শানও, স্বীয় পুত্রের পরিবর্ত্তে, য়ু (Yu) নামক একজনকে রাজসিংহাসনের অধিকারী করিয়াছিলেন। প্রজাদের অপরিণামদর্শিতার ফলেই, সম্রাট য়ুর বংশধর তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা, চীন দেশের নব-প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালীকে, মার্কিন প্রজাতন্ত্রের অকর্ম্মণ্য অনুকরণ বলিয়া মনে করেন; কিন্তু ইহা ভুল। চীনদেশ গত আড়াই সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রজাতন্ত্রের সহিত পরিচিত, এবং মুদ্রাঙ্কন ও প্রজার অভিমতে রাজ্য-শাসন এই দুই ব্যাপারের জন্য পাশ্চাত্য জাতিবৃন্দ চীনের নিকট ঋণী। ("Government by consent is, like printing, a discovery which the Chinese had made, before we thought about it.")। প্রায় আট শতাব্দী পূর্ব্বে, সিংহলদ্বীপের রাজা, কয়েকজন চীন-দেশীয় বণিকের উপর অত্যাচার করেন বলিয়া, চীন-সম্রাট কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত ও কারারুদ্ধ হন। কয়েক বৎসর পরে, চীন-সম্রাট সিংহলের পরাধীনতা মোচন করিয়া, ঐ দ্বীপবাসীদিগকে একজন উপযুক্ত ভূপতি নির্ব্বাচন করিতে সাহায্য করেন। চীন-দেশীয়েরা গর্ব্ব করিয়া বলে যে তাহাদের রাজা নিরপেক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই গর্ব্ব ভিত্তিহীন নহে।

আসল দর ও বাজার দর।

("Quarterly Journal of Economics," May.)

প্রয়োজনের তীব্রতা ও মৃদুতার উপর বাজার দরের আধিক্য ও অল্পতা নির্ভর করে। গ্রীনল্যাণ্ডে বরফের দাম নাই, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উহা ব্যয়সাধ্য। এক জনের নিকট শেক্‌স্‌পীয়রের হস্তলিপির মূল্য অনেক সহস্র মুদ্রা; আর এক জনের কাছে উহা কলমের আঁচড় মাত্র। যেমন অনেক লোকের অভিমতে "সাধারণ মত" (public opinion) গঠিত হয়, আবার সাধারণ মতই প্রত্যেকের অভিপ্রায় নিয়ন্ত্রিত করে, সেইরূপ দশ জনে মিলিয়া জিনিসের বাজার দর খাড়া করিয়া, প্রত্যেকে ঐ দরের জালে জড়াইয়া পড়ে। ("What a man will offer or take for any commodity depends not merely on how badly he needs it, but on what he thinks it to be 'worth.'...The process re-acts upon itself, just as private opinion is confirmed by the public opinion, which it helps to form.")। সমাজের সকলেই যদি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইত, তাহা হইলে কোনও জিনিসের বাজার দর বলিয়া কিছু থাকিত না। প্রয়োজন আছে অথচ দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই রেডিয়ামের এত দর। পয়সা, সেবা ও সম্মান দিয়া প্রজারা জমিদারদের 'দর' বাড়াইয়া দিয়াছে—অধিকাংশ জমিদারই প্রজাকে পায়ের তলায় রাখিতে চায়। মিউনিসিপালিটি, পুলিস প্রভৃতির হস্তে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা দিয়া, মানুষ তাহাদের 'দর' চড়ায় ও পরে তাহাদেরই পদতলে লুণ্ঠিত হয়। ("All human institutions are rooted in human interests. This fact is easily overlooked, because all human institutions become stereotyped and traditional and man easily forgets that he made them.")।

কোনও দ্রব্যের আসল মূল্য স্থির করিতে হইলে উহা কতদূর কল্যাণপ্রসূ তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। যদি একজন বদমায়েসের সিঁদকাঠি, জাল করিবার যন্ত্রতন্ত্র, বিষ, ছোরা প্রভৃতিতে একশত টাকার জিনিস থাকে, আর একজন ধর্ম্মভীরু কৃষকের হাল, বলদ, কুঁড়ে ঘর প্রভৃতিতে একশত টাকার জিনিস থাকে, তাহা হইলে দুই জনের বাজার দর সমান, কিন্তু উভয়ের আসল দরে কত প্রভেদ! এমন কতকগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস আছে যাহার বাজার দর নাই,

যেমন পিতামাতার স্নেহ। এই সব প্রশ্ন মীমাংসা করিতে অর্থশাস্ত্র ও নীতি-বিজ্ঞানের সীমানা এক হইয়া যায়। ("Economics is a nomadic science and does not respect fences.")

কোনও জাতির বা দেশের সম্পত্তির মূল্য এত লক্ষ বা এত কোটী টাকা, ইহা বলিলে অনেক সময়ে চক্ষে ধূলা দেওয়া হয়। পাঁচ জনকে পাঁচটা করিয়া টাকা দিলে, কেহ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়, কেহ পুস্তক ক্রয়, কেহ দরিদ্রকে দান, কেহ মদ্যপান ইত্যাদি করিবে। পাঁচ জনের কাছেই পাঁচটা টাকা এক হিসাবে তুল্য অর্থাৎ পাঁচটা গোলাকার রজত-খণ্ড, কিন্তু উহার সঞ্চয় ও ব্যয়ের উদ্দেশ্যেই, উহা সম্পদ কি বিপদ তাহা নির্দ্দিষ্ট হয়। ("Collective wealth expressed in terms of money is a formula with only hypothetical applications.") এক সঙ্গে সহস্র প্রকার রুচি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকের সম্পত্তির 'আসল' দর নির্ণয় করা সুকঠিন ব্যাপার।

শ্রমোপজীবির বেতন ও কর্ম্মণ্যতা

("*Fortisnghtly Review*," *June*)

Fabian Society কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'Facts for Socialists" নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে বিলাতের এমন সাত লক্ষ লোকে মোটের উপর দশ শত পঞ্চাশ কোটী টাকা মূল্যের সম্পত্তি ভোগ করিতেছে, যাহাদের কেহই জীবিকা অর্জ্জনের জন্য এক দিনও পরিশ্রম করে নাই। সোশ্যালিষ্টদের মতে, এই দশ শত পঞ্চাশ কোটী টাকার সম্পত্তি, উক্ত সাত লক্ষ 'কুড়ের বাদশা'র কবল হইতে উদ্ধার করিয়া, নিঃস্ব কর্ম্মঠ লোকদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলে, বিলাতের দারিদ্র্যানল চিরদিনের মত নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। জার্ম্মান সোশ্যালিষ্ট মার্ক্‌সের (Marx) মতে, আধুনিক য়ুরোপে শ্রমোপজীবিরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কেবল-মাত্র মোটামুটি খাওয়াপরা পাইতেছে, আর তাহাদের শ্রমলব্ধ অর্থে মহাজনেরা ফুলিয়া উঠিতেছে। ("The wages of the great mass of wage-earners are always forced downwards to the lowest possible level.")।

ডব্‌লু. এচ্. ম্যালক (Mallock) ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, ইংলণ্ড, জার্ম্মানি, য়ুনাইটেড ষ্টেটস্ প্রভৃতি দেশের সম্পত্তির দশভাগের নয়ভাগ মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবীদের হস্তে, আর মাত্র এক-দশমাংশ অকর্ম্মণ্য ধনীদের ("idle rich") হস্তে ন্যস্ত আছে। Dr. King প্রণীত "The wealth and income of the people of the United States" নামক পুস্তক হইতে, গ্রেট-ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ড এবং য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের আর্থিক অবস্থার তারতম্য উদ্ধৃত হইল:—

বাৎসরিক আয়	গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ড	য়ুনাইটেড ষ্টেট্‌স্
৫০০ পৌণ্ডের কম	৭৫	৭৭
৫০০ হইতে ১০০০ পৌণ্ড	১০	৭
১০০০ হইতে ৫০০০ পৌণ্ড	৯	১০
৫০০০ পৌণ্ডের অধিক	৬	৬
	১০০ জন	১০০ জন

ম্যালক বলেন যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ২২ পৌণ্ড আয়ের লোকের সংখ্যা ৩০ পৌণ্ড আয়ের অপেক্ষা অধিক, ৩০ পৌণ্ড আয়ের লোকের সংখ্যা ৪০ পৌণ্ড আয়ের অপেক্ষা অধিক ইত্যাদি প্রকার ছিল। ("The distribution of wage-income was pyramidical.")। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহার ঠিক উল্টা হইয়াছে, অর্থাৎ ৪০ অপেক্ষা ৫০ পৌণ্ডের আয়ের লোক অধিক, ৫০ অপেক্ষা ৬০ পৌণ্ডের আয়ের লোক বেশী ইত্যাদি। বাৎসরিক ৯৫ পৌণ্ড আয় পর্য্যন্ত এইরূপ। তাহার অধিক আয়ে, একশত বৎসরের পূর্ব্বেকার অবস্থার ব্যতিক্রম হয় নাই।

সোশ্যালিষ্টদের মতে, মহাজনের 'দাও-কষাকষি'র

ফলেই শ্রমজীবীদের বেতন বাড়িতে পায় না। তাঁহারা বলেন যে, অভাবের তাড়নায়, শ্রমজীবীদিগকে বাধ্য হইয়া, মহাজনের নির্দ্দিষ্ট বেতনে সম্মতি জ্ঞাপন করিতে হয়। কিন্তু এই প্রকার অভিমত প্রকাশকালে তাঁহারা শ্রমজীবীদের কর্ম্মণ্যতার অল্পতা বা আধিক্যের হিসাব আমলেই আনেন না। অথচ কর্ম্মঠ লোকে অকর্ম্মণ্যের অপেক্ষা অধিক বেতন চাহে ও পায়, ইহা প্রমাণিত সিদ্ধান্ত। কার্য্য-সম্পাদিকা শক্তির অনুপাত আধুনিক য়ুরোপের অধিকাংশ দেশেই সমান এবং এই শক্তির অল্পতা ও আধিক্যবশতঃ বেতনের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। ("The factor which really determines wages is not individual acts of collective or personal bargaining—except within narrow limits—but the actual value of the products contingent on the work of workers, who differ in natural efficiency, and the distribution of natural efficiency is much the same in one country as in another.")। কেবলমাত্র প্রাণধারণের জন্য যতটুকু কার্য্য আবশ্যক, তাহাকে যদি 'ক' বলা যায়, তাহা হইলে প্রতি এক শত জনের মধ্যে

১০ জন	ক,
২০ „	ক+১,
৪০ „	ক+৩,
১৫ „	ক+৪,
১০ „	ক+৬,
এবং ৫ „	ক+১০,

কার্য্য করে। কেন এইরূপ কর্ম্মপটুতার প্রভেদ হয় এবং অধিকাংশ সভ্যদেশেই কেন এই অনুপাতের তারতম্য লক্ষিত হয়, তাহা আজও নির্ণীত হয় নাই।

শ্রীগৌরহরি সেন।

জীবনের মূল্য

(উপন্যাস)

একবিংশ পরিচ্ছেদ

পটুলি বড় হইয়াছে।

বাড়ী গিয়া মাছ তরকারীর পুঁটুলি রান্নাঘরের বারান্দায় নামাইয়া দিয়া জগদীশ হস্তপদাদি ধৌত করিলেন। স্বহস্তে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া মেঝের উপর বিছানো একখানি ছিন্ন মলিন মাদুরের উপর বসিলেন। এই মাদুরের প্রান্তভাগে তাঁহার শয্যাটি গুটানো রহিয়াছে, তোষকটির অঙ্গে নানাস্থানে তুলা দেখা যাইতেছে। এটি জগদীশের শয়নঘর নহে। তক্তপোষ ও বিছানা-সুদ্ধ পার্শ্ববর্ত্তী নিজ শয়নঘর তিনি জমাতার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন।

খোলা জানালাটি দিয়া বাহিরে কৃষ্ণবর্ণ আকাশের দিকে চাহিয়া ম্লানমুখে জগদীশ ধূমপান করিতে লাগিলেন। জানালার বাহিরে খানিকটা পতিত জমির পরে অন্যলোকের বাগান। পচা পাতার গন্ধ এবং অদূরস্থিত একটি ডোবা হইতে ভেকগণের অবিশ্রাম ধ্বনি জানালা দিয়া প্রবেশ করিতেছে। ধূমপান করিতে করিতে জগদীশ নিজ অদৃষ্টচিন্তা করিতে লাগিলেন। নালিস ত করিয়া দিয়াছে, এখন কি উপায় হইবে? বলিলে কহিলে, হাতে পায়ে ধরিলেও গিরিশ মুখোপাধ্যায় শুনিবে কি? নালিস্ উঠাইয়া লইবে কি? না যদি শুনে, ডিক্রী করিয়া জমিজমাগুলি, ভদ্রাসনখানি বেচিয়া লইবে। তখন স্ত্রীকন্যা লইয়া দাঁড়াইবেনই বা কোথা, তাহাদের জন্য দিনান্তের অন্নমুষ্টিই বা কেমন করিয়া সংগ্রহ করিবেন? লোকের স্ত্রীর গায়ে পাঁচখানা অলঙ্কার থাকে, এইরূপ অসময়ে তাহা কাযে লাগিয়া যায়; নিকট আত্মীয় স্বজন থাকে, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য আশ্রয় পাওয়া যায়, তাঁহার সে সব কিছুই যে নাই।

ভাবিতে লাগিলেন, সুন্দরবনের চাকরি ছাড়িয়া এ পাঁচবৎসর ভিটার মাটী কামড়াইয়া পড়িয়া না থাকিয়া, অন্য কোনও জমিদারীতে যদি একটা চাকরির চেষ্টা দেখিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় এরূপ ভাবে পন্ন হইতে হইত না। এখন সেইরূপ একটি চাকরির চেষ্টা দেখা ভিন্ন আর কি উপায় আছে?—জমিদারীর কাযকর্ম্ম তাঁহার ত জানাই আছে; একটা গোমস্তাগিরি পাইলে অনায়াসেই করিতে পারেন। নায়েবী পাইলেও যে না করিতে পারেন এমন নহে। আসে পাশে গ্রামগুলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জমিদারগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এইবার সেই চেষ্টাই করিতে হইবে। জুটিবে না কি? অদৃষ্টে থাকে ত জুটিবে।

বাহিরের বৈঠকখানা ঘরটি এই ঘরখানির পাশেই, মাঝে দেওয়াল মাত্র ব্যবধান। হঠাৎ, বৈঠকখানি হইতে পুত্র ও জামাতার উচ্চ হাসির শব্দ তাঁহার কাণে আসিল। ইহাতে তাহার চিন্তাস্রোত বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন পথে ধাবিত হইল। জগদীশ ভাবিতে লাগিলেন, হরিপদ যদি ওরূপভাবে পীড়াপীড়ি না করিত, তাহা হইলে গিরিশের সহিত কন্যার বিবাহে ত কোন বিঘ্নই ঘটিত না! নালিস্‌ও কেহ করিত না, এ প্রাণান্তকর মহাসমস্যাও উপস্থিত হইত না। বুড়া বরে কেহ কি মেয়ে দেয় না? কতলোক ত দেয়। কোথা হইতে এ রাজকুমার আসিয়া জুটিয়া সমস্ত উলট্ পালট্ করিয়া দিল! উহাদের কি? দিব্য আরামে আছে, কোনও ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, হৃদয় লঘু—হাসি মস্করার ফোয়ারা ছুটিতেছে। নাঃ—অপরিণত-বুদ্ধি বালক-পুত্রের কথা শুনা বুদ্ধির কার্য্য হয় নাই। বিপদকে পায়ে ধরিয়া যেন ডাকিয়া আনা হইয়াছে, এখন হায় হায় করিলে কি হইবে?—রাজকুমারের প্রতি বিদ্বেষে তাঁহার মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে পট্‌লি আসিয়া, দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল—"বাবা, স্নান কর্‌বেন না? অনেক বেলা হয় যে!"

জগদীশ মুখ তুলিয়া কন্যার পানে চাহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"হরিপদ, "রাজকুমার ওরা গেছে স্নান কর্‌তে?"

"বরের" নামোল্লেখে পট্‌লি মুখখানি নত করিল। বলিল—"হ্যাঁ, দাদা এই বেরুলেন।"

"আচ্ছা, আমিও যাচ্ছি।"

"আপনাকে তামাক সেজে দেব কি, বাবা?"—বলিতে বলিতে পট্‌লি ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

"তুই কি পার্‌বি মা?"

একটু হাসিয়া, মাথাটি দুলাইয়া পট্‌লি বলিল—"কেন বাবা? আর কি কখনও তামাক সেজে আপনাকে দিইনি আমি?"

"দিবি?—আচ্ছা, দে।"

পট্‌লি দেওয়ালে ঠেসানো হুঁকাটি হইতে কলিকাটি খুলিয়া লইয়া মন্থরপদে প্রস্থান করিল।

সে চলিয়া গেলে জগদীশ বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—তিনমাস মাত্র বিবাহ হইয়াছে, এই তিনমাসেই মেয়ে যেন ডাগর হইয়া উঠিয়াছে। মেয়ের রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। গায়ের রঙটি আরও গোলাপী হইয়াছে; পূর্ব্বে রোগা ছিল, এখন চোখের কোলগুলি, গালদুটি যেন পুরন্ত হইয়া আসিতেছে; তখন ছুটাছুটি চেঁচা-মেচি করিয়া বেড়াইত, এখন কেমন একটি সম্ভ্রম ও লজ্জাজড়িত সঙ্কোচের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে।

জগদীশের মনে প্রশ্নের উদয় হইল, "সেই বুড়ার হাতে দিতাম যদি, তবে আজ মায়ের এই আনন্দময়ী মূর্ত্তি কি দেখিতে পাইতাম?" মনই তাহার উত্তর দিল—"না। তাহা হইলে মেয়ে আমার দিন দিন শুকাইয়া যাইত। নিজের স্বার্থ ও সুবিধার জন্য বাছাকে যে বলিদান দিই নাই, তাহা ভালই করিয়াছি।"

গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া পুত্র ও জামাতার সহিত জগদীশ আহারে বসিলেন বটে, কিন্তু অন্যান্য দিন অপেক্ষা আয়োজনাদি আজ একটু অধিক হইলেও, কিছুই খাইতে পারিলেন না। মাথায় আধ ঘোমটা দিয়া গৃহিণীই পরিবেষণ করিতেছিলেন, তিনি

স্বামীর আহারে অনিচ্ছা এবং তাঁহার মুখে চক্ষে দুশ্চিন্তার ছায়াপাত লক্ষ্য করিয়া শঙ্কিত হইয়া অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁগা, তুমি কিছুই খাচ্চ না যে?"

জগদীশ উত্তর করিলেন—"আজ তত ক্ষিধে নেই।"

হরিপদ জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, আপনার শরীর ভাল আছে ত?"

"হ্যাঁ, ভাল আছে।"—বলিয়া জগদীশ অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

গৃহিণী স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, কিছু একটা ঘটিয়াছে যাহার জন্য উহাঁর মন খারাপ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জামাতার সাক্ষাতে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। মনটা তাঁহার বিষণ্ণ হইয়া রহিল। আর চারিটি খাইবার জন্য স্বামীকে দুই একবার অনুরোধ করিলেন, জামাতার সাক্ষাতে লজ্জায় অধিক বলিতে পারিলেন না।

আহারান্তে, দ্বিপ্রহরে কিয়ৎক্ষণ নিদ্রার অভ্যাস জগদীশের ছিল। ছেলে, জামাই পান লইয়া বৈঠকখানা ঘরে গিয়া বসিলে, গৃহিণী স্বামীর কাছে গিয়া সকল ব্যাপার অবগত হইলেন। শুনিয়া তাঁহারও মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। চোখে যেন তিনি অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

জগদীশ বলিলেন—"যাও, খাওয়া দাওয়া করগে; ভেবে আর কি হবে?"

গৃহিণী বলিলেন—"সে হবে এখন, আমার খাবার তাড়াতাড়ি নেই।"

"মেয়েটা ক্ষিধেয় সারা হল যে।"

"ও খেয়ে নিক্"—বলিয়া গৃহিণী পটলি পটলি করিয়া ডাকিতে ডাকিতে বাহিরে গেলেন। পটলি রান্নাঘরের বারান্দায় থালাগুলি আগ্লাইয়া বসিয়া ছিল। তাহাকে বলিলেন—"ওঁর পাতে যে ভাতগুলি আছে, সেগুলি আমার জন্যে ঢাকা দিয়ে রেখে দাও। দাদার পাতে তোমার ভাত বেড়ে নিয়ে তুমি খেতে বস মা।"

পটলি বলিল—"তুমি কখন খাবে?"

"বড্ড গুমট্ হয়েছে, ওঁকে আমি ততক্ষণ একটু বাতাস করিগে, উনি ঘুমুলে আমি এসে খাব এখন।"

"আমিও তখন খাব।"

"না মা, অনেক বেলা হয়ে গেছে তুমি আর দেরী কোরো না, ভাত বেড়ে নিয়ে খাও।"

পটলি দাঁড়াইয়া কি একটা ভাবিল। তাহার পর বলিল—"আচ্ছা মা, তুমি বাবার কাছে যাও।"

মা চলিয়া গেলে, পিতার থালাখানি সরাইয়া সযত্নে ঢাকা দিয়া রাখিল। নিজের ভাত বাড়িতে বাড়িতে, স্বামীর থালাখানির প্রতি লুব্ধ-দৃষ্টিতে পটলি চাহিয়া রহিল। দাদা বাড়ী থাকিলে পূর্ব্বে চিরকাল সে দাদার পাতেই খাইয়াছে, এ তিন মাস যখন যখন হরিপদ ও রাজকুমার একত্র বাড়ী আসিয়াছে, তখনও পূর্ব্ব অভ্যাস মত মা তাহাকে দাদার পাতেই ভাত দিয়াছেন। পটলি ভাবিতে লাগিল—"সবাই ত স্বামীর পাতেই খায়, আমার সে সাধ হয় না বুঝি? মা ত এখন কাছে নেই, এই সুযোগে আজ আমার মনের সাধ আমি পূর্ণ করি।"—এই ভাবিতে ভাবিতে অন্নব্যঞ্জন হাতে করিয়া পটলি থালা দুইখানির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল—"কিন্তু মা যদি হঠাৎ এসে পড়েন? বাবাকে বাতাস করছেন, এখন আস্বেন না বলেছেন—তবু যদি আসেন? যদি এসে দেখে ফেলেন? কি বল্বেন?—বল্বেন আর কি! এমন ত বিশেষ কোনও অন্যায় কায করছিনে আমি! বোধ হয় মনে মনে ভাব্বেন—'ওমা দেখ একবার কলিকাল! একরত্তি মেয়ে, এখনও তিনমাস বিয়ে হয় নি, এরই মধ্যে টান দেখ!'—তা মনে করেন, করবেন। সত্যিই ত আমি এতটুকু নই, কচি খুকীটি নই, আমি ত বড় হয়েছি।"—এইরূপ স্থির করিয়া পটলি উঠানের দিকে চাহিতে চাহিতে কম্পিত হস্তে অন্নব্যঞ্জনগুলি স্বামীর পাতেই ঢালিল।

থালার নিকট বসিয়াও বারম্বার উঠানের দিকে সে চাহিতে লাগিল,—মা হঠাৎ না আসিয়া পড়েন!

তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, গলায় কাপড় দিয়া থালাখানিকে প্রণাম করিয়া তবে আহার আরম্ভ করে। যে ভাত ক'টি, তরকারীগুলি স্বামীর পাতে পড়িয়া ছিল, নূতন অন্নব্যঞ্জনের সহিত পট্‌লি সেগুলি বেশ করিয়া মিশাইয়া লইয়া, খাইতে আরম্ভ করিল। তাহার মন যেন বলিতে লাগিল—"হে আমার স্বামীর প্রসাদ, যতদিন পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন তোমায় যেন পাই।"

উঠানে কি একটা শব্দ হইতেই পট্‌লি চমকিয়া উঠিল—মা আসিতেছেন বুঝি? দেখিল মা না, তাহারই মেনি বিড়ালটা কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিল, চাল হইতে উঠানে লাফাইয়া পড়িয়াছে। পট্‌লির তখন মনে হইল, "আচ্ছা, আমি ত এখন বড় হয়েছি, তবু আমার এত লজ্জা করে কেন? কে জানে! বোধ হয়, যার যেমন স্বভাব! আমার বরেরও ত ভারি লজ্জা। আমরা দুজনেই সমান, যেমন দেবা তেমনি দেবী।"—ভাবিতে ভাবিতে আপন মনে সে অল্প অল্প হাসিতে লাগিল—তাহার নোলকটি দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল।

"বরের লজ্জাশীলতা" সম্বন্ধে পট্‌লির কেন এমন ধারণা হইল তাহা শুনিবার জন্য আমাদের পাঠিকাগণের স্বভাবতঃই কৌতূহল হইতে পারে। সে মশারি-রহস্যটুকু আমাদের অগোচর নাই, কিন্তু প্রকাশ করিয়া দেওয়াটা উচিত হইবে কি? কিন্তু পাঠিকারা নিতান্তই যদি না ছাড়েন, অগত্যা তবে বলিতেই হয়।—বিশেষ কথা কিছুই নয়—গতরাত্রে উভয়ে গল্প করিতে করিতে থানার ঘড়িতে যখন তিনটা বাজিতে লাগিল, "বর" তখন বলিয়াছিল, "বেশী রাত্তির অবধি জাগি, সারাদিন ঘুমে চোখ জড়িয়ে জড়িয়ে আসে।"—পট্‌লি বলিয়াছিল—"খাওয়া দাওয়ার পর শুয়ে একটু ঘুমোও না কেন।"—"বর" বলিয়াছিল—"না, সে আমি পারি নে—আমার ভারি লজ্জা করে।"

মেনি বিড়ালটা ইতিমধ্যে পাতের কাছে আসিয়া বসিয়াছিল। খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিয়া কোনও ফল না হওয়াতে, পট্‌লির পানে চাহিয়া কাতরস্বরে সে বলিল—"ম্যাও"—অর্থাৎ; "আমায়ও দু'টি দাও।"

"তুই আমার সতীন নাকি লা?"—বলিয়া পট্‌লি হাসিতে হাসিতে ইলিশ মাছ মাখিয়া তাহাকে ভাত দিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

জগদীশের সঙ্গীতচর্চ্চা।

রাত্রি অন্ধকার, কিন্তু আকাশের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে, নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। আন্দাজ পৌনে আটটার সময় একহাতে হরিকেন লণ্ঠন অপর হাতে একটি মজবুদ বাঁশের ছড়ি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গিরিশ-ভবনে উপনীত হইলেন। তাঁহার পায়ে ঘোরতোলা জুতা, বক্ষদেশ নগ্ন, একখানি উড়ানি চাদর গলদেশ হইতে লম্বিত।

পৌঁছিয়া দেখিলেন, বৈঠকখানা ঘরটি খোলা রহিয়াছে, মেঝেতে ফরাস বিছানা পাতা, দেওয়ালে একটি ল্যাম্প মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, কিন্তু কেহ কোথাও নাই। ভাবিতে লাগিলেন, "সতীশ দত্ত যে বলেছিল সন্ধ্যাবেলা এখানে তার নিমন্ত্রণ আছে, বিকাল-বেলাই আস্‌বে—এখনও আসে নি নাকি? একটু বলে' কয়ে' গড়ে পিটে রাখ্‌বে কথা ছিল, কিছুই ত হয়নি দেখ্‌ছি!"

বৈঠকখানার সম্মুখের বারান্দায় লাঠি ঠক্ ঠক্ করিয়া জগদীশ কিয়ৎক্ষণ পায়চারি করিয়া বেড়াইলেন—শব্দ শুনিয়া যদি কেহ আসে। অন্তঃপুর হইতে একজন ভৃত্য বাহির হইতেছিল, জগদীশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওহে, বাবু কোথায়?"

ভৃত্য বলিল—"আজ্ঞে, বাবু বাড়ীর ভিতরে আছেন।"

"তাঁকে একবার খবরটা দিতে পার? বোলো যে বিশেষ একটু দরকারে এসেছি।"

"আপনি বৈঠকখানায় বসুন, আমি বাবুকে খবর দিচ্ছি।"—বলিয়া ভৃত্য প্রস্থান করিল।

জগদীশ তখন লণ্ঠনটির বাতি কমাইয়া বারান্দার উপর রাখিলেন। ছড়িটি দ্বারের কোণে রাখিয়া জুতা ছাড়িয়া ভিতরে গিয়া বসিলেন। "বঙ্গবাসী"খানা পড়িয়া ছিল, ইহাতে মাঝে মাঝে নায়েবী গোমস্তা-গিরি প্রভৃতি চাকরি খালির বিজ্ঞাপন থাকে তাহা তিনি জানিতেন। "বঙ্গবাসী"খানি লইয়া, দেওয়াল ল্যাম্পের আলো বাড়াইয়া দিয়া, দাঁড়াইয়া বিজ্ঞাপন পড়িতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু চশ্‌মা অভাবে ভাল দেখিতে পাইলেন না। তখন বসিয়া গৃহকর্ত্তার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার মনে হইতেছিল—কতদিন পরে আজ দেখা; সেই যে দিন আসিয়া এই বৈঠকখানায় বসিয়া গিরিশকে "আশীর্ব্বাদ" করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার পর হইতে উভয়ে একদিনও আর চোখাচোখি হয় নাই। ভাবি-লেন—লোকটির সহিত অসদ্‌ব্যবহার একবারেই যে করা হয় নাই এমন নহে; কথা দিয়া কথার খেলাপ করা হইয়াছে—কিন্তু গিরিশ তজ্জন্য যে পরিমাণ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন তাহা যেন নিতান্তই বাড়াবাড়ি।—সে যাহা হউক্, এখনি দেখা হইবে, অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে হইবে, জগদীশের কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করিতে লাগিল।

প্রায় দশমিনিট অপেক্ষা করিবার পর, পার্শ্বের একখানি ঘর হইতে পদশব্দ আসিল। কৈ, এ ত বুড়ার দুর্ব্বলপদের শব্দ নহে—এ ত জোয়ান লোকের জুতার খট্‌খট্। দেখিতে দেখিতে দ্বার খুলিয়া সতীশ দত্ত প্রবেশ করিল।

জগদীশ বলিলেন—"কিহে, কখন এসেছিলে?"

"আমি সে বিকেলেই এসেছি। দাদা কতক্ষণ?"

"এই ত এলাম। তোমায় দেখ্‌তে না পেয়ে ভাবছিলাম, তুমি আসনি বুঝি। বলেছিলে, আগে থাক্‌তে এসে একটু বলে কয়ে—"

সতীশ হাসিয়া বলিল—"এসেওছি, বলেওছি দাদা—কথার খেলাপ করিনি!

বিদুষাং বদনাদ্বাচঃ সহসা যান্তি নো বহিঃ।
যাতাশ্চেন্ন পরাঞ্চন্তি দ্বিরদানাং রদা ইব॥

সেই থেকেই ত কথা হয়েছে—মরদ্‌কী বাত, হাতীকি দাঁত।"

জগদীশ ভাবিলেন, তাঁহার কথার খেলাপ হইয়াছে, তাই সতীশ এই প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গটুকু করিয়া লইল। কিন্তু সে বিচার করিতে গেলে এখন চলে না। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল্লেন?"

সতীশ ওষ্ঠ গুটাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—"সে সুবিধে নয়। বল্লেন, উনি আমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করেছেন, আমি কোন কথাই শুন্‌ব না।"

ইহা ত এক প্রকার জানাই ছিল। তথাপি শুনিয়া জগদীশের প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন—"জমির দাম আজ কাল যে রকম চড়া, বোধ হয় আমার জমিগুলিতেই ওঁর প্রাপ্য টাকাটা উঠে যেতে পারে। তাই নিয়ে যদি ভদ্রাসনখানি আমায় ছেড়ে দেন, তা'হলেও কতকটা রক্ষে পাই।"

সতীশ বলিল—"সে কি আমি বলিনি, সে প্রস্তাবও করেছিলাম।"

"কি বল্লেন তিনি?"

"বল্লেন, জমির দামেই আমার দাবী যদি মিটে যায়, আদালত থেকেই বাড়ীখানি উনি যেন ছাড়িয়ে নেন।—আসল কথা হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণকে দুর্য্যোধন সেই যা বলেছিলেন—

সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ ভিদ্যতে যা চ মেদিনী।
তদর্দ্ধং নৈব দাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব॥

আপোসে কিছুই হবে না দাদা, যা হবে সেই আদালতে।—তামাক খাবেন?—ওরে কেষ্টা, একছিলিম তামাক সেজে আন ত। আমার হুঁকোটাও ভিতর্ থেকে নিয়ে আসিস্।"

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া জগদীশ বলিলেন—"তা হলে কি বল? এখন ওঁর সঙ্গে দেখা কর্‌ব কি? কিছু

যে হবে বলে ত বোধ হচ্ছে না। বাবু কখন বেরুবেন? কি কচ্ছেন?"

"শুয়ে আছেন।"

"কেন, এমন অসময়ে শুয়ে কেন?"

"শরীরটা বড় ভাল নেই তাঁর।"

"আর, বয়স হয়েছে, শরীরের অপরাধ কি ভাই! কলিতে মানুষের পরমায়ুই বা ক'দিন? এ বয়সে, এখন ঐ রকমই হবে। দুদিন বা শরীর ভাল থাকবে, আবার চার দিন বা খারাপ হবে। আমারই দেখ না কেন! অসুখ বিসুখ কাকে বলে আগে জান্‌তামই না। এখন, নানান্ খানা লেগেই আছে। আমার চেয়ে উনি আর কতই ছোট হবেন? দু-বছর কি বড় জোর তিন বছর। তা, গিরিশের কি হয়েছে?"

"আজ বিকেলে হঠাৎ বুকের ভিতরটায় কি রকম বেদনা ধরেছিল। এখন কতকটা ভালই আছেন।"

"তবে আর বসে কি করব, উঠি ভাই। তুমি, বুঝেছ"—বলিয়া জগদীশ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—"কাল এ দিকে আস্‌বে কি?"

"রোজই ত আসি।"

"তা হলে, বুঝেছ, কাল আর একবার, বুঝিয়ে সুজিয়ে বোলো। যদি বলেন, জমিগুলো না হয় ওঁরই নামে আমি কওলা লিখে দিচ্ছি। মোকদ্দমাটি তুলে নিয়ে দলিলগুলি আমায় ফিরে দিন। আমার নাম করে বোলো যে—তিনি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণকে ভিটে মাটী উচ্ছন্ন করাটা—"

এই সময় হঠাৎ পাশের ঘরের দ্বার খুলিয়া গিরিশ মুখোপাধ্যায় টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই উভয়ে চম্‌কিয়া উঠিলেন। গিরিশ অদূরে দাঁড়াইয়া, মাথা হেলাইয়া জগদীশের প্রতি সরোষ দৃষ্টিপাত করিয়া কম্পিত ভগ্নস্বরে বলিতে লাগিলেন—"ব্রাহ্মণ!—তুমি ব্রাহ্মণ? তুমি অন্ত্যজ—তুমি চণ্ডাল।"

জগদীশ বলিলেন—"কেন? আমি অন্ত্যজ চণ্ডাল কিসে হলাম শুনি?"

গিরিশ উচ্চস্বরে বলিলেন—"তুমি ঠগ, তুমি মিথ্যুক, তুমি জোচ্চোর।"

জগদীশও হাত নাড়িয়া মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন—"ঈঃ—আমি মিথ্যুক জোচ্চোর, আর উনি বড় সাধু! বুড়ো হয়েছেন, গঙ্গা পানে পা করেছেন, এখনও বিয়ে করবার জন্যে লিক্ লিক্ করে' বেড়াচ্ছেন! ও-রে আমার সাধু পরমহংস! দাঁত পড়েছে, চোখে দেখ্‌তে পান না, গায়ের চাম থল্‌থলে হয়ে গেছে,—বিয়ে কর্‌বার জন্যে একেবারে উন্মত্ত। পাকাচুলে টোপর মাথায় দিয়ে বর সাজ্‌তে লজ্জাও করে না! মোকদ্দমা করেছেন! আমার বাড়ী, জমিজমা সব নীলাম করে নেবেন! নিস্‌রে নিস্, গির্‌শে, তাই নিস্। নিয়ে, কতদিন খাস্ তাও দেখ্‌ব।"—বলিয়া জগদীশ বাহির হইয়া, জুতা পায়ে দিয়া, লাঠি ও লণ্ঠন লইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

* * * *

রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া পটলির মা রুটি বেলিতেছিলেন, পটলি নেচি পাকাইয়া তাঁহাকে দিতেছিল। কি বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে, কিয়ৎক্ষণ হইল পটলি মার নিকট তাহা শুনিয়াছে। পিতা এখন কোথা গিয়াছেন, কেন গিয়াছেন, তাহাও সে জানে।

দুঃখ ও দুশ্চিন্তার ভারে মা ও মেয়ে উভয়েই মৌন। মাঝে মাঝে মার বক্ষ কাঁপাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িতেছে, পটলি ব্যাকুলভাবে তাঁহার দিকে চাহিতেছে, কিন্তু কিছুই বলিতেছে না।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রাঙ্গণের প্রান্তদেশ হইতে পদশব্দ শুনা গেল। গৃহিনী তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া দিলেন। ধীরে ধীরে, অন্ধকারে জগদীশ রান্নাঘরের নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার হাতের লণ্ঠনটি পথেই নিবিয়া গিয়াছে, তেল কম ছিল।

গৃহিনী উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেখা হয়েছে?"

জগদীশ নীরব।

প্রশ্ন পুনরুক্ত হইল—"হাঁগা কি হল? দেখা পেলে?"

জগদীশ কোন কথাই বলিলেন না।

পটলিও শঙ্কিতভাবে পিতার পানে চাহিয়া দেখিতেছিল। সে বলিয়া উঠিল—"বাবা, কথা কচ্চনা কেন?"

জগদীশ তখন লণ্ঠনটি নামাইয়া রাখিয়া রান্নাঘরের সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িলেন। লাঠির উপর হাত দুটি স্থাপন করিয়া, অবনত মুখ সেই হাতের উপর রক্ষা করিলেন।

গৃহিণী ইহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। স্বামীর কাছে আসিয়া, তাঁহার হাতটি ধরিয়া বলিলেন—"এখানে বস্‌লে কেন? ওঠ ওঠ। বড় ঘরের বারান্দায় জল রেখে এসেছি, পা ধোবে চল। পট্‌লি তুই রুটিগুলি ঢাকা দিয়ে রাখ্‌ ত মা"—বলিয়া, স্বামীর হাত ধরিয়া, একরূপ টানিয়াই তিনি বড় ঘরের দিকে চলিলেন।

ঘরের ভিতর একটি তেলের প্রদীপ দেড়কোর উপর মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহারই সংসামান্য আলো বারান্দায় আসিয়া পড়িয়াছিল। বারান্দার কোণে একটা গাড়ুতে জল এবং তাহার উপর পাট্‌পিট্‌ করা একখানা গামছা রাখা ছিল। গৃহিণী স্বামীকে সেখানে লইয়া গিয়া বলিলেন—"পা-টা আল্‌গা কর, জুতো খুলে দিই।"

জগদীশ বলিলেন—"আমি আপনিই পা ধুচ্ছি।"—বলিয়া জুতা পরিত্যাগ করিলেন।

"আমি ধুইয়ে দিই"—বলিয়া গৃহিণী গাড়ুটি ধরিলেন।

তাঁহার হাত হইতে গাড়ুটি লইয়া, পদ ধৌত করিতে করিতে জগদীশ বলিলেন—"হরি রাজু কোথা? এখনও বেড়িয়ে ফেরেনি?"

"তারা যে ও পাড়ায় নেমন্তন্ন খেতে গেছে। মামীমা নেমন্তন্ন করেছিলেন কিনা।"

"ওঃ, ভুলে গিয়েছিলাম।"

পা ধুইয়া জগদীশ বলিলেন—"একখানা মাদুর পেতে দাও, আমি শোব।"

গৃহিণী বলিলেন—"এখন শোবে কেন? একবারে খেয়ে দেয়ে শোও। রান্না হয়ে গেছে, রুটি ক'খান সেকে নিয়ে আসি।"

জগদীশ বলিলেন—"না, এখন আমার ক্ষিধে নেই।"

ঘরের ভিতর হইতে একখানা মাদুর একটা বালিস আনিয়া গৃহিণী স্বামীর জন্য পাতিয়া দিলেন। জগদীশ শয়ন করিলেন। গৃহিণী তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

গিরিশের বাড়ী যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, ক্রমে জগদীশ সমস্তই ব্যক্ত করিলেন।

শুনিয়া, গৃহিণী সজলনেত্রে বলিতে লাগিলেন—"অ্যাঁ!—তোমাকে অপমান করেছে! এত বড় আস্পর্দ্ধা তার! টাকার গরমে চোখে কাণে দেখ্‌তে পাচ্ছে না! বড় বাড় বেড়েছে গিরিশ মুখুর্য্যের! ভগবান কি নেই?"

অন্ততঃ বাড়ীখানি যাহাতে বাঁচে হুগলি গিয়া উকীলের সহিত তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করিতে হইবে, একটা চাকরি বাকরীর জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে—কর্ত্তা গৃহিণীতে এইরূপ পরামর্শ হইতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিল। গৃহিণী তখন বলিলেন—"যাই, রুটি সেকে তোমার জন্যে খাবার নিয়ে আসি।"

রান্নাঘরে গিয়া দেখিলেন, পটলি রুটিগুলি বেলিয়া, সেকিয়া, ঢাকিয়া রাখিয়া দিয়াছে। মেঝের উপর আঁচল বিছাইয়া শুইয়া সে ঘুমাইতেছে।

কন্যাকে ঠাঁই করিতে পাঠাইয়া দিয়া গৃহিণী স্বামীর খাবার ঠিক করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে খাওয়াইয়া, পাণ দিয়া, তামাক সাজিয়া দিয়া, মায়ে ঝিয়ে আসিয়া আহারে বসিলেন।

রাত্রি যখন প্রায় এগারোটা, তখন হরিপদ ও রাজকুমার নিমন্ত্রণ বাটী হইতে বাহির হইল। পথে আসিতে আসিতে রাজকুমার বলিল—"হ্যাঁ ভাই, আমার সে

চন্দ্রগড়ের চাকরির কথা ত বাবাকে জিজ্ঞাসা করা হল না।"

হরিপদ বলিল—"কাল ত রথের ছুটি, কাল সারাদিন ত আমরা আছি, এক সময় জিজ্ঞাসা করলেই হবে।"

অন্ধকার নির্জ্জন গ্রাম্যপথ। দুইজনে লঘুচিত্তে হাস্য পরিহাস করিতে করিতে চলিয়াছে। বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া উভয়ের কর্ণে গীতধ্বনি প্রবেশ করিল। সেই নিস্তব্ধ নিশীথে স্বরটি বড় করুণ বড় মোলায়েম শুনাইতেছিল।

রাজকুমার দাঁড়াইল জিজ্ঞাসা করিল—"আমাদের বাড়ী থেকেই না? কার গলা ভাই?"

হরিপদ বলিল—"বাবার গলা।"

উভয়ে সেই খানে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল—

চিরদিন কখনো সমান না যায়!
অদৃষ্টেরি ফলো কে খণ্ডাবে বলো,
তারো সাক্ষী দেখ মহারাজা নলো—
রাজ্যভ্রষ্ট হলো, দময়ন্তী হারালো,
অবশেষে বনে যায়।

রাজকুমার বলিল—"বাবার ত বড় সুন্দর গলা ভাই!"

হরিপদ বলিল—"এস এস, অনেক রাত্রি হয়েছে।"

দুইজনে তখন বাড়ীর সদর দরজার নিকট গিয়া পৌছিল। দ্বারে আঘাত করিতে করিতে হরিপদ ডাকিতে লাগিল—"মা, ওমা, দরজাটা খুলে দিয়ে যাও।"

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা

গয়াকাহিনী।—শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত, প্রথম সংস্করণ, কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ২্, প্রকাশক শ্রীমথুরানাথ সেন, সিটি বুক সোসাইটী, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পণ্ডিতরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্নলিখিত সুবৃহৎ ভূমিকা বাদে এই পুস্তক ডবল ক্রাউন ষোলপেজী ফর্ম্মার ৩৪৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। পণ্ডিতরাজ বলিতেছেন, "সেই সমস্ত যুক্তি সেই সমস্ত উপপত্তি আনিয়া বালক বালিকার পাঠ্য পুস্তকের ভূমিকায় সন্নিবেশিত করিতে চাই না।" গ্রন্থকারের ভাষা সরল, সুললিত এবং বালক বালিকাগণের উপযোগী হইলেও বিষয় নির্ব্বাচনে এবং বিষয় সমাবেশে তিনি লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারেন নাই। ধর্ম্মশিলার অভিশাপ আর একটু নৈপুণ্য সহকারে রচিত হওয়া উচিত ছিল। গয়াকৃত্য, শ্রাদ্ধে বিরাট পাঠ, বেদে পুনর্জ্জন্ম, বেদান্তে পরলোকতত্ত্ব,পরাবিদ্যায় শ্রদ্ধাতত্ত্ব, জীবের গতি, ডাঃ স্পুনারের আবিষ্কার ও মত প্রভৃতি প্রসঙ্গ সুকুমারমতি শিশুগণের উপযোগী নহে। বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের একত্র সমাবেশ হওয়াতে পুস্তকখানি বোদ্ধার চক্ষে মূল্যবান হইয়াছে বটে, কিন্তু কাহিনী শুনিতে কৌতূহলপরায়ণ বালকবালিকাগণের পক্ষে জটিল ও নীরস হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সকল বিষয়ের সার গ্রহণ করিয়া মূল কাহিনীর অন্তর্নিবিষ্ট করিতে পারিলে, গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হইত। মিত্রবংশের বর্ণনার পার্শ্বে গুপ্তবংশের হেডিং দেওয়া হইয়াছে, ফাহিয়ানের উল্লেখই করা হয় নাই। পিতামহেশ্বর ও মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরের কথা, গোক্ষুরচিহ্নের কথা, বুদ্ধগয়ার পঞ্চ পাণ্ডবের কথা, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সিদ্ধিলাভের কথা, এবং ঐ সকল কথার অন্তরালে যে বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক ও আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের কাহিনী আছে, তাহা না কহিলে গয়াকাহিনী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। গ্রন্থকার বয়সে নবীন হইলেও শিশুসাহিত্য রচনায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তাঁহার রচনাভঙ্গী আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। স্পষ্ট, সুন্দর ও মৌলিক আলোকচিত্রগুলি পুস্তকের উপাদেয়তা বৃদ্ধি করিয়াছে।

পুণ্যক্ষেত্র গয়াধামের সহিত আমাদের সহস্র পুরুষের স্মৃতি বিজড়িত; হিন্দুর ইহলোকের ও পরলোকের মিলনসেতু গয়াভূমি; হিন্দু-গৃহস্থের জীবনের প্রধান ঋণ পরিশোধের একমাত্র উপায় গদাধরের পাদপদ্ম; গয়াকৃত্যের "মাতৃষোড়শী" পাঠকালে

কল্পনা-নেত্রে এখনও যেন পরলোকে জননীর বক্ষে স্তন্যধারা বহিতেছে দেখা যায়—সেই গয়াক্ষেত্রের কাহিনী যিনি কহেন তিনিও পুণ্যবান্ এবং যিনি শুনিবেন তিনিও পুণ্যবান্।

"রায় বাহাদুর।"

দই-খ্রই।—শ্রীরাধাবিনোদ সাহা প্রণীত। ১৪-এ রামতনু বসুর লেনে মানসী প্রেসে মুদ্রিত ও শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন ষোল পেজী ৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা।

এখানি গানের বই সুতরাং পদ্যে লিখিত। গানগুলি সবই ভগবদুদ্দিষ্ট; কিন্তু কেবল মামুলী ঝাঁড়নী ও ন্যাকামি ছাড়া আর কিছুই নাই। সমস্ত গানেই একটা উৎকট কৃত্রিমতা এবং কষ্টকল্পনা বিকট অঙ্গভঙ্গী করিয়া ভক্তিরসকে যেন বিদ্রূপ করিতেছে।

"ঋতুরাজ"।

সংগ্রাম সিংহ। Lion of the War। ঐতিহাসিক নাটক। মূল্য ॥০

গ্রন্থারম্ভে লেখক লিখিয়াছেন, প্রবেশিকা পরীক্ষান্তে সহপাঠী ছাত্রগণের অনুরোধে এই নাটকখানি তিনি রচনা করিয়াছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের পক্ষে এরূপ রচনা বিশেষ প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। লেখক অল্প বয়সেই অনেক খ্যাতনামা বাংলা নাটক অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহা পুস্তকখানি পড়িলেই বেশ বুঝা যায়। তবে স্থানে স্থানে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ও স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব ও ভাষা এমনই স্পষ্ট করিয়া ব্যবহার করা হইয়াছে যে তাহা ক্ষমার্হ বলিয়া মনে হয় না। "উন্মুক্ত খড়্গ হস্তে লক্ষ্মীর প্রবেশ" ও দুই তিনটা পতন ও মৃত্যু আছে বটে, তথাপি উপাখ্যান-ভাগ জমে নাই। সেরখাঁর চরিত্রাঙ্কনটী বেশ হইয়াছে, আর কোন চরিত্রই ভাল করিয়া ফুটে নাই। অবশ্য শিক্ষার্থী লেখকের নিকট আমাদের এ সমস্ত আশা করা অন্যায়। ভবিষ্যতে যদি লেখক পুনরায় আর কোনও নাটক লেখেন তাহা হইলে সাবধান হইবেন, এই আশায় এতগুলি কথা বলিলাম। চরিত্রাঙ্কন বা উপাখ্যান ভাগ যাহাই হউক, ভাষা, কবিতার গতি ও ছন্দ সম্বন্ধে তাঁহার সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। "নাহিক আর লণ্ড ভণ্ড, মিটিয়াছে সব দ্বন্দ্ব ফন্দ" এইরূপ ভাষা প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষেও নিন্দনীয়। দ্বিজেন্দ্রলাল ও গিরীশচন্দ্র উভয়ের অনুকরণ না করিয়া (আমি এমন কথা বলিতেছি না লেখক আর কাহারও নিকট ঋণী নহেন) এক জনকে আদর্শ করিলেই যথেষ্ট হইত। লেখক লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রত্যেক দৃশ্যের প্রথমে স্থান ও সময় দেওয়া আছে, লেখক তাহা দেন নাই কেন?

"অঘাসুর।"

সাহিত্য-সমাচার

"মানসী" প্রেসে শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের একখানি নূতন গল্পগ্রন্থ ছাপা হইতেছে। বহিখানির নাম "আশীর্ব্বাদ"। ইহাতে অনেকগুলি ত্রিবর্ণ চিত্র থাকিবে; শ্রাবণের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে।

বিগত ২৯শে জুন, অপরাহ্ণ পাঁচঘটিকার সময় লোয়ার সার্কুলার রোড সমাধি-ভবনে মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিরক্ষার্থ সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি-আই-ই সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "নবীন-সন্ন্যাসী" ও "রত্ন-দীপ" উপন্যাসদ্বয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ, ভাদ্র মাসে প্রকাশিত হইবে।

মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের "নূরজাহান" গ্রন্থ যন্ত্রস্থ, আগামী শারদীয়া পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় প্রণীত নূতন উপন্যাস "জলপ্লাবন" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৲

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রণীত "চয়ন" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে উপনিষৎ, বৌদ্ধসাহিত্য, জৈনসাহিত্য প্রভৃতি হইতে কতকগুলি "কথা" সংগৃহীত হইয়াছে, মূল্য ৸০